…এটা তোমার

"আর স্বাদও কত ভাল দেখ!"

কেননা বোর্নভিটায় আরো বেশী কোকোর থাকায় এটি অনেক বেশী সুস্বাদু ও অনেক বেশী পুষ্টিকর হয়ে উঠেছে।

বোর্নভিটার কোকো রক্ত গ'ড়ে-তোলার আয়রণে সমৃদ্ধ, এছাড়াও এতে আছে ভিটামিন বি এবং ডি আর ক্যালসিয়াম, ফসফোরাস, সোডিয়াম ও পটাশিয়ামের মত খনিজ পদার্থ। শুধু তা'ই নয়—বোর্নভিটা মল্ট, দুধ আর চিনির সমস্ত পুষ্টিগুণেও ভরপুর।

আপনার বাচ্চাদের বোর্নভিটা রোজই খাওয়ান, দিনে দু'বার ক'রে। তাদের বাড়ন্ত বয়সে মূল্যবান যে-সব পুষ্টিগুণ দরকার—বোর্নভিটা সে-সব যোগাতে সাহায্য করে। আর বোর্নভিটা আপনারও দরকার …ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে!

OBM-67

শুভ উৎসবে টেলিরাড-এর শুভেচ্ছা!

টেলিরাড—ভারতের সব রকমের রেডিও'র প্রস্তুতকর্তা

আর পি ১০২
মিডিয়াম ওয়েভ, পকেট ট্রানজিস্টার। নিখুঁত ডিজাইন। ছোট্ট দু'টি পেনলাইট ব্যাটারিতে চলে—৮৫ টা.

আর পি ২১৩
ছোট, অথচ শক্তিশালী, ২ ব্যাণ্ডের পোর্টেবল্—খাঁটি সুন্দর গ্রিল লাগানো। মিডিয়াম ওয়েভ ছাড়াও শর্ট ওয়েভের পুরোটাই—১৩ মি. থেকে ৬০ মি. পর্যন্ত ধরা যায়
৩টি বড় ব্যাটারিতে চলে—১৮৫ টা.

আর পি ২২২
২ ব্যাণ্ডের পোর্টেবল্। শর্ট ওয়েভে ১৯ মি. থেকে ৬০ মি. পর্যন্ত ধরা যায়। সুন্দর ধাতুর গ্রিল লাগানো। ৩টি মাঝারি সাইজের ব্যাটারিতে চলে—১৫০ টা.

আর পি ২১৬
অনবদ্য ২ ব্যাণ্ডের পোর্টেবল্। ৪টি মাঝারি সাইজের ব্যাটারিতে চলে—১৬৫ টা.

আর পি ২২০ টি এল
২ ব্যাণ্ডের পোর্টেবল্। ধরা যায় পুরো মিডিয়াম ওয়েভ আর শর্ট ওয়েভে ১৬ মি. থেকে ৬০ মি. পর্যন্ত। ৪টি বড় ব্যাটারি অথবা সরাসরি এ.সি. মেইন্স-এ চলে—২২০ টা.

আর পি ২২৩
সুন্দর ২ ব্যাণ্ডের পোর্টেবল্। আড়াআড়ি অ্যারাল। মোল্ড করা ক্যাবিনেট। ভেতর-বাইরে করা যায় এমন হ্যাণ্ডেল। শর্ট ওয়েভে ধরা যায় ১৬ মি. থেকে ৬০ মি. পর্যন্ত। ৩টি বড় ব্যাটারিতে চলে—১৬৫ টা.

আর পি ৩২২
৩ ব্যাণ্ডের পোর্টেবল্ ট্রান্সমেইন্স। হাই-লো টোন আর ফাইন টিউনিং কন্ট্রোল।
৪টি বড় ব্যাটারিতে বা এ.সি. মেইন্স-এ চলে—৩৩০ টা.

আর টি ৩০২ ডিলাক্স
৩ ব্যাণ্ডের এ.সি. মেইন্স রেডিও। সাধারণের টোন কন্ট্রোল। সুন্দর পলিয়েস্টার ফিনিশ ক্যাবিনেট। আলাদা স্পীকার আর কোনো পিক-আপের সকেট—৪১০ টা.

আর টি ৪২৩ এস
৪ ব্যাণ্ডের মেইন্স রেডিও।
পিক-আপ আর টেপ রেকর্ডারের সকেট। পিয়ানো কী সুইচ দেওয়া স্পেস-এজ ডিজাইন—৬৭৫ টা.

সব দামই আবগারী আর স্থানীয় কর বাদে।

Shilpi TR-17A/76 BEN.

টি. সি. ৫০৩৭ টি ডি ৩১৭১ এ পি ০২ এ অ

টেলিরাড টি ভি রেডিও স্টিরিও সিস্টেমস ক্যাসেট রেকর্ডারস রেকর্ডপ্লেয়ারস

TELERAD

এর পেছনে মারফি ইলেকট্রিক রিসার্চ সেন্টারের টেকনিকাল কৌশল আছে।

সূচীপত্র

আরশোলা আর মাছির থেকে রেহাই পাবার জন্য আপনার চিরপছন্দের ওষুধ

ট্যুগন বেট-এর নতুন নাম

আপনা থেকেই আকর্ষণ!

আর খাওয়া মাত্রই মরণ!

বেগন বেট কিভাবে কাজ করে:
যেখানেই আরশোলা আর মাছি দেখবেন সেখানেই বেগন বেট ছিটিয়ে দিন: এর প্রতি এই সব পোকামাকড় খুব তাড়াতাড়ি আপনা থেকেই আকৃষ্ট হবে—এবং এতে শক্তিশালী উপাদান 'বেগন' থাকায় এরা চিরতরে নিপাত যাবে নিশ্চিতভাবে।

বেগন বেট বাজারের প্রমাণিত অধিক প্রভাবশালী কীটনাশক

OBM 6322

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি : ইণ্টাগ্লিও প্রিণ্ট (২২″×১৮″ রঙীন ছাপাছবি) —কাজটি বিমূর্ত। রঙে রেখায় বেশ একটা আবেশ সৃষ্টি করে। নীল পটভূমির সবিতাসদৃশ সোনালী গোল আকার ও নীচে যেন তারই সম্পূরক ক্ষুদ্রকায় গোল। ওপরের গোলের চারপাশে ডিম্বাকৃতি আকারের গণ্ডী যেন জ্যোতিষ্কের গতিপথ। ছোট বড় রেখার আঁচড় আর ছিট ছিট রঙে মহাকাশী কাব্য রচনা করতে চেয়েছেন অমিতাভ। ঘোর শূন্যে গ্রহতারার আবর্তনের কথাই মনে হয়।

PHILIPS
এক বহুরূপী*
মিউজিক সিস্টেম
OBM/6114 Ben
PHILIPS
জি এফ ৫৩৩
আসল মেইনস্-ব্যাটারী
মিউজিক সিস্টেম
এখন দাম
৬৯৮† টাকা।
তা'র সঙ্গে কর।
এর ডিজাইন আর রূপায়ণের পেছনে আছে ফিলিপ্‌সের সৃজনশীল কারিগরী
* অসাধারণ মোনো থেকে অসাধারণ আসল স্টিরিওতে বদলে নেওয়া যায়।
* অপূর্ব মেইনস্ সিস্টেম থেকে পোর্টেবল ব্যাটারী-সিস্টেমে বদলে নেওয়া যায়।
* বিদ্যুৎসরবরাহ বন্ধ হ'য়ে গেলে মেইনস্ থেকে ব্যাটারীতে আপনা-আপনি চলতে থাকবে।
* সরাসরি টেপ-রেকর্ডিং ও প্লেব্যাকের জন্য সুবিধাজনক এমপ্লিফিকেশন ইউনিটে বদলে নেওয়া যায়।
রেকর্ড শেষ হয়ে গেলে আপনা-আপনি সুইচ বন্ধ হয়ে যায়। এর অপূর্ব ইলেকট্রনিক স্পীড 'গভর্ণরের' সকল স্পীড বরাবর ঠিক থাকে। বাড়ীতে চালান বা বাড়ীর বাইরে নিয়ে যান। আমোদ ও বিনোদনের জন্য এটি অযুক্ত সম্ভাবনায় ভরা। অতুলনীয় এর আওয়াজ। অসাধারণ এর গঠন-শৈলী। নিঃসন্দেহে এটি ফিলিপ্‌সের এক অসাধারণ সৃষ্টি।
† এক্সাইজডিউটি সমেত সুপারিশ-করা দর। স্থানীয় কর আলাদা।
ফিলিপ্‌স
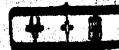
দিব্যেন্দু পালিত-এর

নতুন কবিতার বই

কিছু স্মৃতি কিছু অপমান

দাম ৫.০০

ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে ব্যাপক খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে একালের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী কবি হিসেবেও দিব্যেন্দু পালিত সুপরিচিত। কবিতার মেজাজে ও চরিত্রে তিনি তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে শুধু যে স্বতন্ত্র তা নয়; বস্তুত, কবিতায় তাঁর

প্রকাশিত হল

মতো বুদ্ধি ও মননের এমন সংযত প্রয়োগ কমই দেখা যায়।

প্রেম-স্মৃতি-অপমান বিজড়িত এক অনাঘ্রাত রহস্য তাঁর কবিতায় যাবতীয় ঔজ্জ্বল্যের মধ্যেও নিয়ে আসে বহুদূরব্যাপ্ত বিষাদ—মানুষের ভিতর থেকে রূপ নেয় অন্য মানুষঃ জেগে ওঠে চুম্বনরহিত প্রেমিকের সাদা ওষ্ঠ, প্রেমিকার চোখের ক্ষমাহীন নোনা, প্রতিশ্রুতিহীন বুক ও নিষিদ্ধ-প্রবেশ ঘর। ঘুমের মধ্যে অদৃশ্য হাত করাঘাত করে দরজায়। হাতে আম্রশাখা ও চোখে অশ্রু নিয়ে, তবু, স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে ক্রমাগত ভ্রমণের আবহময় এইসব কবিতা স্বাদে, বর্ণে ও শব্দ-সংকল্পে এতই আলাদা যে, আমাদের আবিষ্ট না করে পারে না। দিব্যেন্দু পালিত-এর তৃতীয় ও সবচেয়ে পরিণত কাব্যগ্রন্থ 'কিছু স্মৃতি কিছু অপমান' ইদানীং কালের অন্যতম স্মরণীয় কাব্যপ্রকাশন।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস

গোলাপ কেন কালো ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

একা এবং কয়েকজন ৩০.০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

অবনী বাড়ি আছো ৪.০০

সুধাংশু ঘোষের উপন্যাস

কে বাজায় ৬.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তীর

ছোটদের নতুন ধরনের বই

ম্যাজিকের মত মজা

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা-কাহিনী | দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

জয় বাবা ফেলুনাথ ৬.০০

প্র কা শি ত হ ল

মিত্রাণী ভালোবাসত সুহাসকে। সে, সুতরাং, তার অক্ষমতা জানাল। ক্ষুণ্ণ সজল সেদিন ফিরে গেল। দিন তিনেক পরে সজল এক পিকনিকের আয়োজন করল বটানিক্যাল গার্ডেনে ওই পুরোনো দশজন বন্ধুবান্ধবীকে নিয়ে। সেখানে ঘটল এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ-ওঠা ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগের মাঝে মিত্রাণী খুন হল। থানা তদন্তে জানা গেল, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে তাকে, এবং মৃত্যুর পর ধর্ষিত হয়েছে মিত্রাণী। কে এইরকম জঘন্যভাবে হত্যা করল তাকে? এবং কেন? —এই জটিল বিভ্রান্তিকর রহস্যের উন্মোচন করেছেন স্বনামধন্য র… কাহিনীকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত তাঁর মানসপুত্র সুবিখ্যাত সত্যসন্ধানী কিরীটী রায়কে দিয়ে তাঁর এই নতুন উপন্যাসে ॥ দাম ৭.০০ ॥

মিত্রাণী, সুহাস, সজল, বিদ্যুৎ, অমিয়, সতীন্দ্র, কাজল, পাপিয়া, মণি আর ক্ষিতীশ—ওরা দশজন ছিল কলেজের ঘনিষ্ঠ সহপাঠী। কলেজ ছাড়ার পর কর্মজীবনে এক-একজন ছিটকে পড়েছিল এক-এক দিকে। তবুও তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগটি একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি। হঠাৎ একদিন সজল মিত্রাণীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রহস্য-উপন্যাস

আলোকে আঁধারে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ ৩ সংখ্যা
শনিবার ২৭ কার্তিক ১৩৮৩

নগরশোভার ভাস্কর্য

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের রাবণ তার নানা বিষাদের কথা বলতে গিয়ে লঙ্কার পৌর রূপের একটি বিষণ্ণ অবস্থার কথাও বলেছে। 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল এ মোর সুন্দরী পুরী।' উজ্জ্বল রূপের সেই লঙ্কাপুরী যেন আঁধারে ভরে গিয়েছে। 'একে একে নিভিছে দেউটি'। লঙ্কার পৌর রূপের এই বিষণ্ণ অবস্থা একটি করুণ দুর্ভাগ্যেরই পরিচয় সংকেতিত করেছে। আধুনিক কালের বাস্তুকার এবং পূর্তবিদ্যার কৃতী বিজ্ঞজনেরা পৌর রূপের ছবিটিকে 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম' বলে কল্পনা করতে পছন্দ করবেন না, যদিও আধুনিক কালের উন্নত সৌষ্ঠবের নগর অবশ্য ওর রাত্রিকালীন চেহারাটাকে 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম' শোভায়িত করতে অভ্যস্ত। বলা বাহুল্য, কোন শহরের রাত্রিকালীন চেহারাটা ঝলমলে ও উজ্জ্বল রূপের কোন সার্থকতা থাকতে পারে না, যদি তার দিবসকালীন চেহারার মধ্যে যথোচিত সৌষ্ঠব ও পরিচ্ছন্নতা না থাকে। কল্পনা করা চলে, সুন্দরী লঙ্কাপুরীর চেহারাটা দিনমানেও সুন্দর ছিল।

সংবাদে প্রকাশ, আমাদের কলকাতাকে সুন্দর করে তোলবার নানা প্রয়াসের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রকারের রূপন্যাসের-প্রয়াসও করা হবে। সহরের নানা স্থানে মূর্তি বিন্যস্ত করে সহরের পূর্ত-শোভাকে রম্যকলার সম্বন্ধ দিয়ে সুন্দরতর করা হবে। সি এম ডি এ'র এই রম্য উদ্দেশ্যের কিছু বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ থেকে আরও ধারণা করবার তথ্য পাওয়া যায় যে, কলকাতা সহরের স্থানে স্থানে কিংবা বিশেষ একটি-দুটি স্থানে মূর্তি ও ভাস্কর্য-নিদর্শনের সংগ্রহ স্থাপিত করা হবে। মূর্তিকলা তথা ভাস্কর্য সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা এবং দায়িত্বশীল অভিজ্ঞতা আছে, এমনতর কয়েকজনের প্রস্তাব ও পরামর্শের সহযোগিতায় নগর-উন্নয়নের জন্য সংস্থাপিত ওই সংস্থা কলকাতার পৌর সৌষ্ঠবের একটি নতুন নির্মাণ সম্ভব করবেন। কোন সন্দেহ নেই, পৌর-শোভাকে উন্নত করবার এহেন পরিকল্পনা নাগরিক জনসাধারণের আন্তরিক অনুমোদন পাবে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভাস্কর্যের সৌষ্ঠব দিয়ে সহরের পৌর অবয়বের সৌষ্ঠব রম্যতর করে তোলবার কাজ খুব সহজসাধ্য নয়। লণ্ডনের মাদাম তুসোদের মোমমূর্তি সংগ্রহ সাংস্কৃতিক পরিচয়ের রম্য নিদর্শন বটে, কিন্তু সেটা নিতান্তই জাদুঘরের অনুরূপ একটা সংগ্রহ। এরূপ সংগ্রহের ভবন সংস্কৃতির পক্ষে মূল্যবান বটে, কিন্তু নগর শোভার কোন সহায়ক নয়। আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট পরিমাণে সুলভ হলেই যে এ ধরনের পৌরশ্রী সহজেই সৃষ্টি অথবা নির্মাণ করতে পারা যাবে, এরকমের আশা যুক্তিসম্মত নয়। স্থানে স্থানে সুন্দর-সুন্দর মূর্তির সমাবেশ ঘটিয়ে দিলেই পৌর আয়তনের চেহারাটাকে সুন্দর দেখাবে না। সুন্দর উদ্যানের সমাবেশ ঘটিয়ে যত সহজে পৌরশোভা সমৃদ্ধ করা যায়, ততটা সহজে মূর্তির সমাবেশ দিয়ে নগরশোভা সমৃদ্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ মূর্তির সমাবেশের এবং উদ্যানের সমাবেশের দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন মিল নেই। যেমন উদ্যানের নিজস্ব সৌষ্ঠবের মধ্যে দীনতা থাকলে উদ্যানের চেহারা জংলী হয়ে যায়, তেমনি এক্ষেত্রেও ভয় আছে, মূর্তির তথা ভাস্কর্যের সৌষ্ঠবের মধ্যে কোন বিকার কিংবা দীনতা ও অপকর্ষের ছাপ থাকলে সেটাও জংলী চেহারার একটা সমাবেশ সৃষ্টি করবে। তাই বলতে হয়, উদ্যোগ এবং পরিকল্পনার সাধুরা খুব সাবধান। সহরের স্থাপত্য এবং স্থানিক পরিবেশের সঙ্গে সুন্দর মানাবে, এমনতর ভস্কর্যের বিন্যাস চাই।

চীনা পরিব্রাজক হিউ এন সাং যে পাটলিপুত্রকে দেখেছিলেন, সেই পাটলিপুত্রের পৌর রূপ সুন্দর স্থাপত্যে এবং সুন্দর ভাস্কর্যে শোভান্বিত ছিল। ভারতীয় অভিরুচির ঐতিহ্যের দিক দিয়ে নগরশোভার সঙ্গে ভাস্কর্যের রম্যতা সমন্বিত করা খুব অভিনব অথবা অভিরুচির ব্যাপার নয়। সাধারণভাবে পৌরশোভাকে সুন্দর করে রাখা ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি সংস্কার যদিও সেই সংস্কার দুর্বল হয়ে জাতীয় সংস্কৃতির দুর্ভাগ্যকেই সবল করেছিল। ইতালীয় পর্যটক প্রাচীন গৌড়ের পথ-শোভা এবং তরুবীথিকার সৌষ্ঠব লক্ষ্য করে অনেক প্রশস্তির কথা লিখে গিয়েছেন। বিজয়নগরের পৌর সৌষ্ঠবের উন্নত মান এবং সমৃদ্ধ রূপ আগন্তুক রোমক পর্যটকের মনে বিপুল বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছিল। পূর্ত স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং উদ্যান সবই সেই বিজয়-নগরের প্রতিভার কৃতিত্বে উদ্যানের নয়নরম্য শোভা লাভ করেছিল। মুসলিম রাজনীতিক আধিপত্যের কালে নগরস্থাপত্যের নানা অভিনব বিচিত্রতা ও সৌন্দর্য সম্ভাবিত হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু মূর্তিকলার সাহায্যে পৌররূপ শোভান্বিত করবার রীতি কখনও স্বীকৃত ও [illegible] হয়নি। কিন্তু যেমন প্রাচীন [illegible] গ্রীস ও রোমের সাংস্কৃতিক [illegible] খৃষ্টীয়তার অনুগত [illegible] ইউরোপের নগরায়তনের মধ্যে মূ[illegible] ভাস্কর্যের বিচিত্রতা পরিশোভিত [illegible] বস্তুত একটি অভ্যস্ত সাং[illegible] পরিণত হয়েছে।

জাতির ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিচ্ছবিত ভাস্কর্য, জাতির শ্রদ্ধান্বিত মনস্বী, মহাপুরুষ ও বীরের মূর্তি, যাঁরা জাতির সাংস্কৃতিক আনন্দের মহান স্রষ্টা, তাঁদের সবারই মূর্তি চাই। এক্ষেত্রে ভাস্কর্যে জাতির ইতিহাসের একটি জাগ্রত আবেদন বিমূর্ত করে রাখা চাই। এমন কি সাহিত্যের অর্থাৎ কাব্য কাহিনী ও রূপকথার জনপ্রিয় এক-একটি ঘটনার এবং নায়ক-নায়িকার মূর্তি সহরবাসীর শুধু দুইচক্ষুর আনন্দের অঙ্গীকার নিয়ে নয়, জনশিক্ষারও অঙ্গীকার নিয়ে সহরের নানা স্থানের পারিবেশিক শোভার সঙ্গে বিন্যস্ত হতে পারে। মেদিনীপুরের এক গ্রাম্য নির্জনতার মধ্যে, রসুলপুরের নদীর সান্নিধ্যে একটি স্মরণ-ফলক স্থাপিত আছে বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলার কল্পনাক্ষেত্র'। বলতে হয়, শিল্পীর কৃতিত্বে কপালকুণ্ডলার একটি মূর্তি নির্মিত হতে পারে এবং সে-মূর্তি কলকাতার পৌর পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত হলে ভালই হবে।

বৈদেশিকী
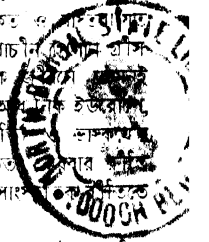
সব ঝুট

দক্ষিণ আফ্রিকার ধলা বর্ণবিদ্বেষীরা বেশ বুঝতে পারছে তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। দেশটায় দু কোটি বারো লাখ লোকের বাস। তাদের মধ্যে চামড়ার রঙ সাদা মোটে আটত্রিশ লাখ লোকের। কিন্তু ক্ষমতা কব্জা করেছে তারাই। শুধু তাই নয়, কালাদের তারা মানুষ বলেই গণ্য করে না। যে অত্যাচার ধলারা কালাদের ওপর দক্ষিণ আফ্রিকায় করছে তা কহতব্য নয়। কালাদের ধলারা এমনই ঘেন্না করে যে, কালাদের ছায়া মাড়ালেও বুঝি ধলাদের গা ঘিন ঘিন করে। কালা-ধলা এক এলাকায় থাকতে তো পারেই না, ইস্কুলে যেতে পারে না, বাসে-ট্রেনে চাপতে পারে না, বারে-রেস্তোরাঁয় যেতে পারে না, নাচগান করতে পারে না, খেলা-ধুলো করতে পারে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় কালা বাসিন্দাদের যে হাল তার চেয়ে বোধ হয় সেকালে কেনা গোলামদের অবস্থাও ঢের ভালো ছিল।

এ লজ্জা কালারা আর মুখ বুজে সহ্য করতে রাজী নয়। গোটা দুনিয়ার মানুষ তাদের দিকে—কেবল কালারা না ধলারাও। তবে ধলাদের ওপরতলার মানুষদের কথা আলাদা। কালারা যে দাবি করছে তারা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন দেশ শাসনের ভার ন্যায়ত-ধর্মত তাদেরই পাবার কথা—সে অধিকার তাদের মেনে নেওয়া হোক। ধলারা অবিশ্যি জেঁকে বসে আছে তখতে—নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ তারা দেখাচ্ছে না। অত্যাচার তারা সমানে চালিয়ে যাচ্ছে কালাদের ওপর—দাবিয়ে রেখেছে বুটের তলায় সব কালা আদমীদের। কবে তারা অতলে তলিয়ে যেত ইউরোপ-আমেরিকার ভাইবেরাদরেরা মদত না দিলে! কিন্তু কেবল গাজোয়ারি করে কতদিন আর ন্যায়নীতিকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। মুখে লম্বা-চওড়াই করলে কী হয়, শেষের দিন তো আর খুব বেশী দূরে নয়, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার কটা চামড়া শাসকগোষ্ঠী।

এখন তারা এক চাল চেলেছে ভরাডুবি থেকে বাঁচবার জন্যে। দক্ষিণ আফ্রিকার কেবল কালা আদমীদের নিয়ে তারা গোটা আষ্টেক কালা এলাকা বানিয়েছে। নাম দিয়েছে বান্টুস্তান। এ সব এলাকার আলাদা প্রশাসনের ঠাট খাড়া করা হয়েছে। আইনসভা আছে, প্রধানমন্ত্রী আছে, মাঝে মাঝে ভোটাভুটিও হয়। কিন্তু এ সবই ভাঁওতা, ছেলেভুলানো ব্যাপার। ধলারা ভেবেছে মেকী স্বাধীনতার রস খাইয়ে বান্টুস্তানের বাসিন্দাদের বুঁদ করে রাখবে—তারা তাহলে ধলাদের পোষা কুকুরটি হয়ে থাকবে, পরের মুখের ঝাল খেয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতার জন্যে বায়না ধরবে না। ধলারা ধরে নিয়েছে বান্টুস্তানের টোপ কালাদের গেলাতে পারলেই কেল্লা ফতে। শক্তিশক্ত হয়ে কালারা মজে যাবে পুতুল খেলায় আর দিব্যি আখের গুছিয়ে নেবে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ধলারা। তখন সব কালা আদমী এককাট্টা হয়ে স্বাধীনতার ধুয়ো তুলবে না—যে যার সে তার হয়ে মনের সুখে দিন কাটাবে।

বান্টুস্তানের ছিপে গেঁথে যে সব মাছ ডাঙায় তুলেছে তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্ছে ট্রানসকেই। লাখ দুই লোক সেখানে থাকে। তাদের বেশীর ভাগই কালা, ধলাও কিছু আছে। আইনসভার নির্বাচন নিয়মিত হয়। তার নির্বাচিত সদস্য পঁচাত্তরজন। সেখানে শেষ ভোটাভুটি হয়েছে অক্টোবরে। তাতে জিতেছে যে দলটি তার গালভরা নামটি হচ্ছে ট্রানসকেই জাতীয় স্বাধীনতা দল। বিরোধী নতুন গণতান্ত্রিক দল পাত্তাই পায় নি। বিজয়ী দলের চাঁই কাইজার মাটানজিমা এখন বান্টুস্তানটির প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনে তেমন ঝক্কি তাঁকে পোয়াতে হয় নি। এক তো দক্ষিণ আফ্রিকার ধলা সরকার তাঁর সহায়। তার ওপর বিরোধীরা প্রায় সবাই জেলে। তিনি খুব বোয়াব দেখিয়ে বলেছেন, দুনিয়াকে আমি বুঝিয়ে দেব, আমরা বর্ণবিদ্বেষীদের চেলা নই—আমরা যা করি তা বুঝেসুঝেই করি, কারুর ভয়ে নয় কিংবা কাউকে খোশামোদ করতেও নয়। তাঁর সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের টাঁকে গোঁজা নয় তার নিজস্ব জোর আছে—এই কথাটাই তিনি চাউর করতে চেয়েছেন।

তাতে কিন্তু কোনো ফল হয় নি। তাঁর গলাবাজিতে কেউ ভোলে নি। ঘটা করে দক্ষিণ আফ্রিকা ট্রানসকেইকে স্বাধীনতা দিয়েছে ২৫ অক্টোবর থেকে। দেশের রাজধানী উমটাটাতে ওদিন খুব ধুমধাম হয়েছে, বাদ্য বেজেছে, রোশনাই হয়েছে, বাজী পুড়েছে। সব দেশকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল সে উৎসবে যোগ দিতে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। অবিশ্যি হাজির ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ডঃ নিকোলাস ডিডেরিখস। তাতেই বোঝা গেছে ট্রানসকেইয়ের স্বাধীনতা সাচ্চা নয়, ঝুটো। অক্টোবরে সাউথ আফ্রিকা তার বশম্বদ দেশটির কপালে মেকী স্বাধীনতার ছাপ এঁকে দেবে এ কথা আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্য বান্টুস্তানগুলোকেও স্বাধীনতার লোভ দেখানো হয়েছিল। তারা কিন্তু ভাঁওতায় ভোলেনি। তাদের কথা হচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সব কালা আদমীর ভাগ্য এক সুতোয় গাঁথা—তারা হয় সবাই স্বাধীন হবে, নয়তো কেউ হবে না। টুকরো স্বাধীনতার কোনো মানে নেই—এই তাদের বিশ্বাস।

ট্রানসকেইকে ঝুটো স্বাধীনতা দেওয়ার আগাম খবর পেয়েই আফ্রিকার অন্য দেশগুলো একবাক্যে বলেছিল ওকে আমরা কেউ স্বীকৃতি দেব না, দুনিয়ার কেউ যেন না দেয়। তাদের কথা শুনেছে দুনিয়ার সব দেশই, এক দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া। খোদ জাতিপুঞ্জের মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহাইম কবুল করেছেন ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। ব্যাপারটা জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের বৈঠকেও উঠেছিল। ট্রানসকেইকে স্বীকৃতি না দেবার প্রস্তাব সেখানে পাস হয়েছে নির্বিবাদে। পক্ষে ভোট পড়েছিল ১৩৪। বিপক্ষে একটিও নয়। তবে মার্কিন প্রতিনিধি ভোট দেননি। তিনি মুখে কিন্তু বলেছেন, ট্রানসকেইকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো মতলব আমেরিকার নেই। আমেরিকার মনে মনে যাই থাকুক না কেন, যে ব্যাপারে সারা দুনিয়া এক দিকে তার উল্টো দিকে যাবার ইচ্ছে তার নেই। দুনিয়াকে ধোঁকা দেবার ফন্দি এঁটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীরা। তাদের সে মতলব ভেস্তে গেছে। বেচারা মাটানজিমার নাচনকোঁদনই সার।

দেবরাজ

এক নজরে

সত্যের এপিঠ ওপিঠ

কলকাতার একটি নামকরা হোটেলে লাঞ্চ অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। পার্টি দিচ্ছেন কোন বিখ্যাত শিল্পপতি। তাঁদের একজন তরুণ কর্মীকে বিদেশে পাঠান হয়েছিল সুলভে বাসগৃহ তৈরির কলকৌশল, তার মানে নো হাউ শিখে আসার জন্যে। তিনি সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষা তো সমাপ্ত করেছেনই, মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উচ্চ প্রশংসাও অর্জন করে এনেছেন। স্বভাবতই এই কৃতী কর্মীকে কোম্পানির তরফ থেকে সম্বর্ধিত করার প্রয়োজন আছে এবং বর্তমান পার্টি হল তারই অনুষ্ঠান। কিন্তু এ হেন উৎসবে আমার মত নেহাৎ কলমজীবীকে কেন আমন্ত্রণ করা হল, সেটাই বুঝলাম না। সুলভ দুর্লভ কোন রকম গৃহনির্মাণ বিদ্যার সঙ্গেই কস্মিনকালে সম্পর্ক নেই যার এবং চার দশকে ছড়ান চাকরি জীবনের সবটাই যার কেটেছে ভাড়াটে বাড়িতে, এক মাত্র চর্বচোষ্য উদরস্থ করা ছাড়া এই আসরে তার কি আর করণীয় থাকতে পারে?

একজন গুণগ্রাহী বন্ধু বললেন, আরে একজন গণনীয় লেখক বলে ডেকেছে তোমাকে। চলে যাও বাবু, পরের পয়সায় যাহোক কিছু ভাল মন্দ খাবে। তোমারই বল, আমারই বল, দামী খানা তো এখন কালে ভদ্রে ছাড়া পেটে পড়ে না! কথাটা বলা বাহুল্য অর্থহীন নয়। কিন্তু সত্যি সত্যিই রসনার স্বাদ ফেরানর জন্যে নয়, গেলাম দোলগোবিন্দ চৌধুরীর বক্তৃতা শোনার জন্যে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দোলগোবিন্দ শুনেছিলাম জাঁদরেল বক্তা এবং আজকের পশ্চিম বাংলায় অর্থনীতি ও সমাজ বিজ্ঞানে নাকি তাঁর জুড়ী স্কলার নেই আর কেউ। কৌতূহল ছিল ভদ্রলোককে দেখারও এবং তাঁর ভাষণ শোনারও। সে কৌতূহল নিবৃত্ত হল। প্রথমত জানাই যে দোলগোবিন্দ কৃশকায় এমন কি, তাঁকে রোগাই বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত তাঁর গলায় আওয়াজ বেশ একটু খনখনে। কিন্তু হ্যাঁ, তুখোড় বক্তা বটেন তিনি। কোলে ন্যাপকিন পেতে কাঁটা চামচ হাতে সবাই যখন সাজান প্লেটের সামনে উদগ্র অধীরতায় বসে প্রতীক্ষা করছেন একে একে গরম গরম ভোজ্য বস্তু পাতে পড়ার জন্যে, তিনি তখন ঝাড়া চল্লিশ মিনিট ধরে চালালেন তাঁর বাগবিভূতি। আকার ইঙ্গিত, হাই তোলা, কোন কিছু দিয়েই কেউ থামাতে পারলেন না তাঁকে, পুরো বক্তব্য পেশ করে এবং জয় হিন্দ বলে অনিচ্ছুক শ্রোতাদের কাছ থেকে করতালি আদায় করে তবেই বসলেন তিনি।

কিন্তু কি বললেন তিনি? কি না বললেন? সেচ প্রকল্প, সার উৎপাদন, বিদ্যুৎ বিকিরণ ও নদী নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে পরিবার পরিকল্পনা, ভূগর্ভ রেল, ভারী শিল্প প্রবর্তন পর্যন্ত আবার শান্তি ও সহস্থিতি থেকে আফ্রিকার মুক্তি যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক বাট্টা হার ও রুশ ভারত মৈত্রী পর্যন্ত চরাচর বিশ্বের সব কিছুর উপরই এমনভাবে আলোকপাত করলেন তিনি, যেন চিন্তার সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ থেকে শেষ রায় উচ্চারিত হল তাঁর মুখ দিয়ে। এমন কি পরীক্ষায় গণ টোকাটুকি, খাদ্য ও ওষুধে ভেজাল, ট্রামবাসে ও নিকট পাল্লার রেলে বিনা টিকেটে ভ্রমণ পর্যন্ত বাদ গেল না এই সারগর্ভ ভাষণ থেকে। জিজ্ঞাসা করতে পারেন হয়ত যে সুলভ বাসগৃহ নির্মাণ সম্বন্ধে কি বললেন তিনি। কিছুই বললেন না। যে অনিমেষ মজুমদারের সম্বর্ধনায় ভোজ আহূত হয়েছে, তার সম্বন্ধেও কিচ্ছুটি বললেন না। তা সত্ত্বেও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন কে পাইন বক্তার উচ্চ প্রশংসা করলেন, তাঁর প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ ভাষণের জন্যে এবং দু কথায় শ্রীমজুমদার কি শিখে এসেছেন এবং তাতে দেশ কতটা উপকৃত হবে তাও বোঝালেন তিনি। যদিও তা বোঝার ধৈর্য ছিল না মোটেই কারোর, কারণ তখন পরিবেশন শুরু হয়ে গেছে। এসে গেছে সুরুয়া, ফ্রায়েড রাইস ও চিকেন কারি।

এর পরই দোলগোবিন্দ হঠাৎ একদিন সশরীরে এসে হাজির হলেন এই দীনের ভবনে। না না, চাঁদা আদায় করতেও না, ভোট প্রার্থনা করতে বা কোন গণ ইস্তাহারে মদীয় দস্তখত সংগ্রহ করতেও না। আমার মত প্রান্তাবসর একজন ফালতু আদমির কাছে এগুলো ছাড়া আর কি জন্যেই বা দোলগোবিন্দের মত রথী মহারথীদের আবির্ভাব হবে? কিন্তু অবাক হলাম দোলগোবিন্দ যখন তাঁর শুভাগমনের উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন, মেদিনীপুরের এক বিদুষী তরুণী বৌদ্ধ দর্শন ও মার্ক্সীয় সাম্যতত্ত্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে ডক্টরেটের থিসিস লিখতে মনস্থ করেছেন। ওটা আমাকে লিখে দিতে হবে। এ জন্যে তিনি আমাকে দেড় হাজার টাকা দক্ষিণা দেবেন এবং বইপত্র সংগ্রহ ও খরিদের জন্যে দেবেন আরো পাঁচশো টাকা। আমি বললাম, আপনি বলছেন কি মিঃ চৌধুরী? আমি থিসিস লিখে দোব এবং তা পেশ করে অন্য একজন পি এইচ ডি হবেন? এগ্রারেণ্ড হোটেলে দেওয়া গণ টোকাটুকি ও যুব শক্তির নৈতিক অধঃপতন সম্বন্ধে আপনার বক্তৃতা যে এখনো আমার কানে বাজছে। কিন্তু আপনি যা বলছেন, সে তো গণ টোকাটুকির ঠাকুরদা! বিরক্ত হয়ে দোলগোবিন্দ বললেন, আহা এজন্যে হাজার দুই টাকা তো পাচ্ছেন আপনি! এবার আমার বিরক্ত হওয়ার পালা। বললাম, দোলগোবিন্দবাবু, আমি অভাবী বটে, কিন্তু অপকর্মের আড়কাঠি নই। আমাকে মার্জনা করতে হবে এ ব্যাপারে!

বিষয়টা ভুলেই গিয়েছিলাম। বছর আড়াই পরে, একদিন কাগজে দেখলাম নিস্তারিণী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মানসী চৌধুরী বৌদ্ধ দর্শন ও সাম্যবাদের তুলনামূলক আলোচনা করে ডক্টরেট পেয়েছেন। শ্রীমতী চৌধুরী মেদিনীপুরের বিখ্যাত ব্যবসায়ী গুরুপদ ভঞ্জের কন্যা এবং প্রখ্যাত পণ্ডিত ডঃ দোলগোবিন্দ চৌধুরীর সহধর্মিণী। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল দোলগোবিন্দ সফরের সেই ছোট্ট ঘটনাটি। বুঝলাম পরোপকার ছাড়া আরো কিছুর অনুপ্রেরণা ছিল ভদ্রলোকের ঐ দৌত্যের পিছনে। আমাদের বড় খোকাও ক' বছর হল ডক্টর হয়েছে এবং অধ্যাপক মহলে চলা বলাও আছে তার। জিজ্ঞাসা করলাম তাকে, হ্যাঁ রে, বুডিজম ও মার্কসিজম নিয়ে কম্পেয়ারেটিভ স্টাডি করে ডক্টরেট পেয়েছেন মানসী চৌধুরী, চিনিস না কি তাঁকে? বড় খোকা হেঃ করে মুখে একটা আওয়াজ করল, তারপর বলল, অনুতোষদার লেখা থিসিস সাবমিট করেছিলেন। অনুতোষদা দু হাজার টাকা রেমুনারেশন নিয়েছেন এ জন্যে। কি করে জানলি? বড় খোকা বলল, যিনি নিয়েছেন তিনিই বলেছেন। পরীক্ষকদের মিটিঙে দেখা হতে বললেন, মহিলাকে তো তোমার বাবা পত্রপাঠ ফেরৎ দিয়েছেন, আমি কিন্তু ভাই পারলাম না।

এর পরই পাড়ার এক সংস্কৃতি সম্মেলনে বক্তা তথা সভাপতি হয়ে এলেন দোলগোবিন্দ। নাতনীকে সঙ্গে নিয়ে টফি কিনতে যাচ্ছি, হঠাৎ কানে এল সেই ঈষৎ সানুনাসিক কণ্ঠ, সত্য-সত্যই আমাদের এক মাত্র আশ্রয়! এই অমোঘ অস্ত্রেই আমরা সমস্ত বাধার বন্ধনকে কেটে কুটি কুটি করব। দৈন্য, নীচতা ও ভয়কে পর্যুদস্ত করব আমরা। শুনে হাসিই আসছিল অবশ্য, কিন্তু সামলে নিলাম, কারণ সঙ্গে বাচ্চাটা রয়েছে। সে এখনি প্রশ্ন করবে, হাসছ কেন দাদু?

সুদর্শন গুপ্ত

যৎসামান্য গোষ্পদ এবারে

বিষ্ণু দে

আজও বর্ষা এড়িয়ে দিলো না তার মেঘময় বেণী।
মাঠে-ক্ষেতে জল   যৎসামান্য গোষ্পদ এবারে।

বিশেষজ্ঞ স্থানীয় সবাই বলে : খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবীই।
তবু এরই মধ্যে শারদীয় আলোকের আভা
স্ফটিক ও নীলা আর চুনি
এই মেঘের সম্ভারে আর আকাশের হীরক ধারে।

অবশ্য হাওয়াও আজ   পুবালির পক্ষীরাজ
সাদা জ্যোতির্ময় মেঘে ওড়ে, ভাসে, বসে নীলাকাশে—
হয়তো বা অন্যত্র   সৌভাগ্য খোঁজে প্রাচুর্য-প্রত্যাশে।

আদিগন্ত স্বচ্ছ আলো শুচিস্মিত দেখা যায় পাহাড়ে পাহাড়ে
আর টিলার বাহারে।

তবু এ অঞ্চলে সংগ্রামী চৈতন্য প্রায় ক্ষীণকায়,
শুধু শ্রেণী উত্তরণ, শুধু এরা সাজের চমক চায়—
অবশ্য সবাই নয়, তবে অনেকেই, অর্ধজ্ঞানী, শিকি-বিজ্ঞ
কিছু নবনবীনের বংশ।
তাই সততাও ক্ষীণ-প্রাণ, অন্তত তা দোআঁশলা, খিন্ন।
গ্রামীণ সমাজে আজ গ্রামতাই প্রায় ছিন্নভিন্ন।

বর্ষাও কি সততায় বুঝি নেই, বৃষ্টি এতই সামান্য!

কিন্তু তবু এরই মধ্যে শরতের পুষ্পময় আভা
সাহায্যে পাঠাবে নাকি প্রাচুর্যের সত্যে ধনধান্য?

প্রতিমার মতো মুখ

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

ভাসানের আগেই ভাসান, তা কি হয়।
কিছু তো প্রতিমা নয়
তবু প্রতিমার মতো মুখ
দুঃস্বপ্নবদ্ধ ওষ্ঠাধর, দীর্ঘ পক্ষ্মরেখা
পানপাতা চিবুকের ডৌল
ভাসানের মতো শুয়ে পেতেছে শরীর।

কেন শুধু শুয়ে থাকে? —জিগগেস করেছে এক শিশু
কেউ তাকে সত্য জানাবে না,
কেন শুধু শুয়ে থাকে মাতৃনামে বীতবন্ধ প্রমা
শুয়ে থাকে বাক্যহীন অশ্রুবিন্দু হয়ে
আমাদের সকলের ক্ষমা।

ভাসানের নৌকো ঘাটে আসে
—যাই, তবে যাই, তবে আসি—
ঘাটের কিনারে কারা? কজনের মুখ?
প্রতিমা চোখের জলে ভাসে।

পাপড়ি

বনফুল

(১)

তুমি যখন বেঁচে ছিলে
তোমার মধ্যে
দেহাতীতকে খুঁজতাম,
আজ তুমি দেহাতীত
তোমার দেহকে খুঁজছি!

(২)

তুমি পান্নার আংটি ভালোবাসতে।
আজ তুমি নেই
সে আংটিও নেই
এখন তাই ভালবাসি
আমাদের তিন বছরের নাতনীটিকে
সে দুরন্ত, দামাল, অবুঝ
কিন্তু নিখুঁত সবুজ।

(৩)

আকাশে লক্ষ তারার ভীড়ে
তোমাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না
কে যেন কানের কাছে বলল,
ধ্রুব তারার দিকে চাও—
কে বললে?
তুমি?

(৪)

টকটকে লাল-পাড় শাড়ি পরে'
তুলসীতলায় জল দিচ্ছিল মেয়েটি।
চমকে উঠলাম
তুমি কি তাহলে—
মেয়েটি মুখ ফেরাল
মনে পড়ল নিদারুণ সত্যটা
তুমি নেই।

(৫)

বহুদিন আগে
তোমার খোঁপায় পরিয়েছিলাম
বেলফুলের মালা।
সে মালা কবে শুকিয়ে গেছে
সে খোঁপাও নেই
তুমিও নেই।
আজ সহসা সেই স্মৃতিটা
জীবন্ত হয়ে উঠল
আমার চোখের সামনে,
বলে গেল—আমরা আছি।

চলতে চলতে

বিমল মিত্র

॥ ৩ ॥

এই ভোর চারটের সময় কলকাতা ছেড়ে দিল্লি এসেছিলাম। তারপর সব কাজকর্ম যখন শেষ হলো তখন ঘড়িতে বেলা চারটে। তখন যে-যার বাড়ি চলে গেল। কিন্তু আমার তখনও ছুটি নেই। দুপুরের খাওয়াও হয়নি। কোথায় টিকে দেওয়া হয় এই শহরে তাও জানি না। কে তা বলে দেবে আমাকে?

ফাদার কামিল বুলেকে আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। আমার জন্যে যেন তাঁরই মাথা-ব্যথা বেশি। শেষকালে তিনিই লোকেদের জিজ্ঞেস করে ঠিকানাটা বার করলেন। আমাকে তার নির্দেশ দিয়ে তিনিও বাড়ি চলে গেলেন। খুঁজে-খুঁজে বার করা গেল মিউনিসিপ্যাল বোর্ড। সেখানে তখন প্রায় পাঁচশো লোক জড়ো হয়েছে টিকে নেবার জন্যে। পাঁচ টাকা জমা দিয়ে আমিও তাদের মত বাঁ হাতের দু' জায়গায় টিকে নিয়ে নিলাম। একটা কলেরার, আর একটা বসন্তর। আর তার জন্যে একটা রসিদ পেলাম। ওই রসিদটাই হলো আসল জিনিস।

ইণ্ডিয়ার সব শহরেই এই রসিদ কিনতে পাওয়া যায়। চার-পাঁচটা টাকার শুধু রাস্তা। তোমাকে হাতে-কলমে টিকে দিতেও হবে না। ডাক্তার শুধু টাকা পেলেই একটা সার্টিফিকেট তোমাকে দিয়ে দেবে। তাতে লেখা থাকবে যে তুমি কলেরা আর বসন্তর টিকে নিয়েছ!

ফাদার কামিল বুলকে বলেছিলেন—ওই রসিদটা না দেখালে তোমাকে মরিসে নামতেই দেবে না।

যারা সংসার-সমুদ্রে নিশ্চিন্তে ভাসমান থাকতে চায় তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হিসেবী মানুষ হয়। শুধু হিসেবী নয়, অন্য অনেকগুলো আইনও মেনে চলেন তাঁরা। যেমন ঠিক সময়ে চিঠির জবাব দেওয়া, সময় মত কর্মক্ষেত্রে হাজির হওয়া, সব লোকের সঙ্গে অমায়িক হাসি হেসে কথা বলা। এমনি আরো অনেক সব আইন। অথচ আমার দ্বারা এগুলোর একটাও মানা সম্ভব হয় না। নইলে কলেই বখন টিকে দেওয়ার সার্টিফিকেট যোগাড় করেছে, তখন আমিই বা তা যোগাড় করতে পারিনি কেন?

যখন টিকে নিয়ে বাইরে এলাম তখন এক গ্লাস জলের তেষ্টায় গলা প্রায় শুকিয়ে আসছে। ভাবলাম রাস্তায় কোনও পানের দোকান থেকে কোনও একটা পানীয় কিনে খেয়ে নেব। কিন্তু আশেপাশে কোনও পানের দোকান নজরে পড়লো না। হাঁটতে হাঁটতে আরো অনেক দূর চলতে লাগলাম। অচেনা শহর, ভারতবর্ষের রাজধানী। "হায় রে রাজধানি পাষাণ কায়া।" হাঁ সত্যিই দিল্লীর শরীর পাথর দিয়ে গড়া। এক ফোঁটা রস-কষ কোথাও নেই। তবু জলের পিপাসা মেটাতে কোথায় চলেছি জানি না। যেদিকটা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অফিস সেদিকটায় ফাঁকা ফাঁকা বাড়ি। রাস্তায় লোকের ভিড়। দফতর সেরে সবাই তখন দলে-দলে যে-যার আস্তানায় ফিরছে।

খানিক দূর হাঁটতেই ভাবলাম এবার একটা স্কুটার বা ট্যাক্সি খুঁজে নিই। একেবারে হোটেলে গিয়েই না-হয় জল-পিপাসা মেটাবো। কিন্তু হঠাৎ কানে এল একটা শব্দ—ঠাণ্ডা পানি, ঠাণ্ডা পানি—

সেই দিকে চাইতেই দেখি একটা চারচৌকো বাক্স; তার তলায় চাকা লাগানো। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা লোক চেঁচাচ্ছে আর দলে-দলে লোক জল খাচ্ছে।

সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম—জল পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ, তিন পয়সা—

জল বিক্রি করার এই অভিনব ব্যবস্থা আগে কোথাও কখনও দেখিনি। কলকাতা শহরেও রাস্তায় ঘাটে এ-রকম তেষ্টার জল পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্যে পয়সা দিতে হয় না। বড় বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে যেখানে কিছু মানুষের জমায়েত হয় সেখানেই দেখেছি শ্রীকাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি'র জলদানের ব্যবস্থা। তাঁরা লরিতে জল বহন করেন এবং কোথাও-কোথাও বা জলদানের জন্যে স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। ফুটপাথের ওপর অস্থায়ী বাঁধা ঘর থাকে। তার ভেতরে একজন কর্মচারী থাকে, আর থাকে জল রক্ষা করবার মাটির জালা। কোথাও কোথাও আবার ভিজে ছোলা ও গুড়ও থাকে।

বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট রবার্ট ম্যাকনামারার মদ বা সিগারেট না-খাওয়ার সংবাদে আমি যেমন অবাক হয়েছিলাম, এই শহরের জল-বিক্রির ব্যাপার দেখেও আমি তেমনি অবাক হয়ে গেলাম। হয়ত আমার দৃষ্টিটাই সেকেলে। একালে বিনামূল্যে কিছু দান করাও নাকি প্রতিক্রিয়াশীলতার চিহ্ন। হয়ত তাই, কিম্বা হয়ত তাই নয়। যে-কাজটা আমরা অপছন্দ করি সেইটেকেই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল বলি। মনু-সংহিতাতে পড়েছিলাম—যুগের হ্রাস যেমন-যেমন ঘটে তেমনি ধর্মেরও হ্রাস ঘটে। সত্যযুগে তপস্যাই ধর্ম, ত্রেতায় জ্ঞানই ধর্ম, তেমনি দ্বাপরে ধর্ম যজ্ঞ আর কলিযুগে দানই ধর্ম। কিন্তু দিল্লিতে দেখলাম দান প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ, তাই তেষ্টার জলও সেখানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

এই পাশের ছেলেটার কথাই ভাবছিলাম।

এ কি জানে অতীতকাল বা ভবিষ্যৎ-কাল বলেও একটা কাল আছে? এ কি জানে তার জন্মের আগেও একদল লোক এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং তার মৃত্যুর পরও আর একদল লোক জন্ম-গ্রহণ করবে! এরা কি জানে যে একদিন তারাও শৈশব অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করবে আর সেই যৌবন অতিক্রম করে একদিন বার্ধক্যেও উপনীত হবে? জার্মান কবি গেটের লেখায় পড়েছিলাম—Everyone believe in his youth that the world really began with him and that all merely exist for his sake."

এই ছেলেটা মাসে একাশ্ন হাজার টাকা উপায় করে কিন্তু খরচ করবার কোনও পথ খুঁজে পায় না বলেই এ মদ খায়। কিন্তু দান করার কথাও কি এর মনে পড়ে না? অবশ্য যে সমাজে তেষ্টার জলও পয়সা দিয়ে কিনতে হয় সেখানে তা মনে পড়বেই বা কেন? সত্যিই তো কেন মনে পড়বে?

হোটেলের অনুচরকে বলে রেখেছিলাম যে আমাকে যেন রাত সাড়ে তিনটের সে আমাকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু যথারীতি সে আমাকে যথাসময়ে ডেকে দেয়নি। এবং তার ফলে যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখে চমকে উঠলাম যে হাত-ঘড়িতে সাড়ে চারটে বেজেছে।

তাই তখন আর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ধরে হাওয়াই-আড্ডায় ছুটলাম। সেখানে গিয়ে পৌঁছে দেখি আমি ছাড়া আর সবাই আগে থেকেই হাজির। সুধাকর দ্বিবেদীজী, ফাদার কামিল বুলকে, সুধাকর পাণ্ডেয়, তাঁর ভাই রত্নাকর পাণ্ডেয়, প্রভৃতি আরো অনেকে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার সময় ছিল না তখন। ভারতীয় টাকা বদলে ডলার নেওয়া, সুটকেশ ওজন করা। আরো হাজার রকম ঝামেলা। সবাই কাজের-কর্মা লোক। সবাই যথাসময়ে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নিয়ে এসেছে। আমিই একমাত্র লোক যার সব ব্যাপারেই দেরি। বরাবর ট্রেন ছেড়ে যাবার পর আমি স্টেশনে গিয়ে হাজির হই, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পড়ানো আরম্ভ হবার পর আমি ক্লাশে গিয়ে ঢুকি, উপন্যাসের কিস্তি দিই ছাপা আরম্ভ হবার আগের মুহূর্তে। রেডিও-স্টেশনে আগে টেপ-রেকর্ড করবার ব্যবস্থা ছিল না। তখন মনে আছে বিজ্ঞাপিত সময়ের পরে গিয়ে হাজির হয়েছি, গিয়ে দেখি তখন আমার পাণ্ডুলিপি অন্যে পাঠ করছে। এ আমার জন্মগত স্বভাব। এই জন্মগত স্বভাবের জন্যেই আমি আজ সকলের পেছনে পড়ে আছি।

পাশের ছেলেটি এতক্ষণ নিজের কথায় পঞ্চমুখ ছিল।

এবার জিজ্ঞেস করলে—আপনি কী করেন?

আমি ছোট্ট জবাব দিলাম—লিখি।

—লেখেন মানে?

বললাম—লিখি, মানে লিখি।

—কী লেখেন?

বললাম—এই বই-টই...

ছেলেটি এবার বললে—সে তো বুঝলুম, কিন্তু কী করেন?

বললাম—আর কিছু করি না।

—কিন্তু তাহলে চলে কী করে?

বললাম—মোটেই চলে না তো—

—তাহলে তো খুবই মুশকিল আপনার—

বললাম—মুশকিল বলে মুশকিল!

ছেলেটি বললে—আপনি কুয়েত-এ চলে আসুন, আমি আপনাকে একটা কাজ জুটিয়ে দেব—আমাদের ফ্যাক্টরির পাবলিসিটি-পাম্ফলেট লিখতে হবে। খুব সোজা কাজ, না পারলে আমি আপনাকে শিখিয়ে দেব, তার জন্যে ইণ্ডিয়া কারেন্সিতে আপনি মাসে হাজার চারেক টাকা করে মাইনে পাবেন, তাতে চালাতে পারবেন না?

সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুমি বই-টই কিছু পড়ো?

ছেলেটি ততক্ষণে আমাকে করুণা করা শুরু করেছে। বললে—সাধারণত খারাপ বই পড়তে আমার ভালো লাগে না, আমি শুধু ভালো বই পড়ি—

—কী-রকম?

ছেলেটি বললে—এই যেমন 'স্ট্রীট অ্যাট মিড-নাইট', 'লোলিটা' এইসব ব

ছেলেটির সঙ্গে কথা বলতে আমা খুবই ভালো লাগছিল। জীবনটাকে কে সহজ-সরল করে নিয়েছে। জেনে নিয়ে যে যেদিন থেকে সে পৃথিবীতে এ
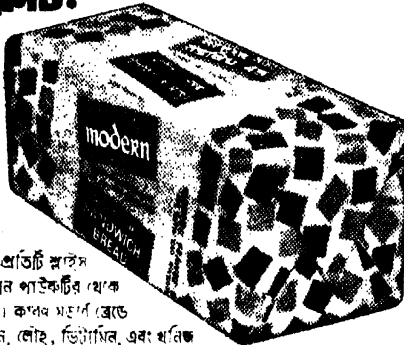
নিয়েছে সেইদিন থেকেই এই পৃথিবীর জন্ম। তার জন্মের আগে এ পৃথিবীর নাকি কোনও অস্তিত্বই ছিল না, আর এই পৃথিবীর যা কিছু ভোগ্য-বস্তু সমস্তই নাকি তারই ভোগের জন্যে। তাকে দেখে আমার নিজের ওপরে দুঃখ হতে লাগলো। 'ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব-বেদুইন' কথাটা তো কি সাধ করে মনে এসেছিল কবির? এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের ভাবনার দায়ভাগ কেন একলা আমার মাথাতেই এসে চাপলো, আর এই ছেলেটাই বা কেন সব ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে এমন করে বলতে পারছে—'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।'

আমার যিনি গৃহ-চিকিৎসক, তিনিও এই ছেলেটির মতন বেপরোয়া। চিকিৎসা সূত্রে আমার বাড়িতে প্রায়ই আসেন। এসে আমাকে পরীক্ষা করেন। কোনও রোগ বলতে যা বোঝায় তা নেই আমার। না আছে ডায়াবেটিস, না ব্লাড-প্রেশার, না কিছু। তবু কেন এত যন্ত্রণা!

আমি বলি—ডাক্তার, আমার যন্ত্রণাটা কমিয়ে দিন—

আবার সব রকম যন্ত্রণা কমাবার ওষুধ দিয়েও যখন তা কমাতে পারেন না তখন বলেন—আপনি callous হতে পারেন না? একটু callous হয়ে যান—

আসলে callous বলতে তিনি বোঝাতে চান নিরাসক্ত হতে। আমার দৈনিক সংবাদপত্র পড়লেও যন্ত্রণা হয়, বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোলেও যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা হওয়ার সূত্রের কি অভাব আছে সংসারে? কিন্তু একথা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে পৃথিবীর কোটি কোটি অগণিত মানব-সমাজের মধ্যে আমিও একজন মানুষ, আর সেই কোটি কোটি অগণিত মানব-সমাজের কল্যাণের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কল্যাণও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কোথাও কোনও স্খলন, কোথাও কোনও ত্রুটি দেখলেই আমার যন্ত্রণা হয়।

আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষই পৃথিবীতে প্রথম শ্রেষ্ঠ মানুষের সংজ্ঞা নির্ধারিত করে দিয়েছিল। শ্রেষ্ঠ মানুষ কে?

বিশ্ব-সংসারে কেউ গায়ের জোরকে মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ বলে মনে করে, কেউ বা অর্থের জোরকেই মনে করে মানুষের সবচেয়ে বড় গুণের নিদর্শন, আবার কেউ বা চারিত্র্যগুণকে মানুষের শ্রেষ্ঠতার সবচেয়ে বড় লক্ষণ বলে ঘোষণা করে থাকে। আবার কেউ কেউ বুদ্ধি-চাতুর্যকেই শ্রেষ্ঠতার চরম পরাকাষ্ঠা বলে নিজের নিজের কার্যাবলী সেই গুণের দ্বারা পরিচালিত করে।

কিন্তু ভারতবর্ষ সেই আদিযুগেই জেনে গিয়েছিল যে সেই মানুষই শ্রেষ্ঠ যে

পরকে আপনার করতে পারে। পরকে ধ্বংস করতে পারা নিশ্চয়ই বড় ক্ষমতা. কৌশলে পরের অর্থ-অপহরণ করে অর্থবান হতে পারাও কম বড় ক্ষমতার নিদর্শন নয়, হিসেব করে খরচ করে অর্থ-সঞ্চয় করাকেও বড় ক্ষমতা বলা হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই কি ছোট গুণ? কিন্তু সেগুলোকে শ্রেষ্ঠ মানুষের লক্ষণ বলে মনে করেনি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ সেই মানুষকেই নর-শ্রেষ্ঠ বলেছিল যিনি ছোট-বড়-উচ্চ-নীচ-স্বজন-পরিজন-শত্রু-মিত্র সবাইকে বলতে পেরেছিলেন তাঁরা তাঁর পরমাত্মীয়।

এই তৃতীয় বিশ্ব-হিন্দী-সম্মেলন অনুষ্ঠানটি ভারতবর্ষের সেই আদি চিন্তারই প্রতিফলনের প্রচেষ্টা। সেখানে গিয়ে আমরা জানবো যে তারা আর আমরা এক. আর জানাবো যে বিশ্বব্যাপী যে মানব-সমষ্টি আমরা আর তারা তারই ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। ভাষাটা এখানে উপলক্ষ্য, প্রধান লক্ষ্যটা হলো বিশ্ব-মৈত্রী। এক কথায় বলা চলে বিশ্ব হিন্দী সম্মেলনটা হলো বিশ্ব-মৈত্রী-সম্মেলন।

*

সেটা ১৯৭৪-এর ডিসেম্বর মাস। নাগপুরে প্রথম বিশ্ব হিন্দী সম্মেলনের অধিবেশন বসলো। এই বিশ্ব-মৈত্রীর কথাটা আগে থেকেই ভারতবর্ষের ঋষিদের মাথায় উদয় হয়েছিল। তাই তাঁরা লিখে গিয়েছিলেন—"বসুধৈব কুটুম্বকম্"। একজন মহারাষ্ট্রীয়ভাষী হিন্দি সাংবাদিক এবং ঔপন্যাসিক শ্রীঅনন্তগোপাল শেবড়ের মাথাতেই প্রথম এর একটা কার্যকরী পরিকল্পনা রূপ নেয়। তাঁর পেছনে ছিল কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার শ্রীসুধাকর পাণ্ডের আর দিল্লী নাগরী প্রচারিণী সভার শ্রীরত্নাকর পাণ্ডেয়। আর সকলের পেছনে ছিল ভারত সরকার। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার শিউসাগর রামগুলাম সেদিন নাগপুরে এসে সেই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন।

আমার মত একজন ঘর-কুনো এবং একান্তে থাকা মানুষকে কেন জানি না সেই সম্মেলনের অন্যতম একজন আহ্বায়ক করা হয়েছিল। তখনই ঠিক হয়েছিল যে পরের বছর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হবে মরিশাসে।

আজ সেই মরিশাসেই যাচ্ছি। আর আমার সঙ্গে আছে সেই নাগপুরের বন্ধুদের অনেকেই। সবাই কোট প্যান্ট চড়িয়েছেন, কেউ বা আচকান শেরওয়ানি। আর আমিই কেবল ধুতি পাঞ্জাবি। আমার হাতে একটা হ্যাণ্ড-ব্যাগও নেই। তাড়াতাড়িতে একটা ডায়েরি বা নোট-বইও আনতে আমি ভুলে গিয়েছি। কারণ তখন তো জানি না যে এর কথা আবার লিখতে হবে। লেখা থেকে ছুটি পেয়েছি কিছুদিনের জন্যে, এইটেই তো বড় কথা। সুধাকর দ্বিবেদীজীর জন্যেই তো এই ছুটি পাওয়ার সৌভাগ্য হলো। নইলে কে ছুটি দেবে আমাকে? জীবনে তো কখনও ছুটি পাইনি।

আজ যখন সেই মরিশাসের কথা লিখতে বসেছি তখন সেখানকার সেই শিউ-পূজনের কথা মনে পড়ছে। বিষণ দয়াল শিউপূজন।

বিষণ দয়াল শিউপূজন আমাকে বলেছিল—আপনি আমাকে শুধু বিষ্ণু বলেই ডাকবেন স্যার—

আমি বলেছিলাম—বিষ্ণু নামটা বড় সাধারণ, মনে হয় যেন ইণ্ডিয়ান নাম শুনেছি—

আমাদের গাইড ছিল জালিম। সে বলেছিল—তাহলে শিউপূজন বলে ডাকুন—

বলেছিলাম—আমি তোমার কবিতা শুনতে চাই শিউপূজন—

শিউপূজন বলেছিল—আমি কবিতা লিখি কে বললে আপনাকে?

বলেছিলাম—জালিম—

শিউপূজন জালিমের সঙ্গে একই স্কুলে মাস্টারি করে। দুজনেই ভালো মাইনে পায়। বড় শান্তশিষ্ট অমায়িক মানুষ দুজনেই। যে কদিন ছিলাম জালিম সব সময়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত জালিমের ডিউটি। খাতির যত্নের একটুকু খুঁত থাকতো না কোথাও। এক-এক দল আছি মরিশাসের এক-এক জায়গায়, এক-এক হোটেলে। কেউ কণ্টিনেণ্টাল, কেউ অ্যামব্যাসাডার, কেউ থ্রিবিশ হোটেলে। আবার কেউ বা হোটেল বেল-ভিউতে।

শিউপূজন জিজ্ঞেস করলে—আপনি কোন্ হোটেলে আছেন?

বললাম—হোটেল বেল-ভিউতে—

—তাহলে আমি যাবো আপনার হোটেলে—

বললাম—না, আমার হোটেলে নয়, অন্য কোথাও—আমি তোমার বাড়িতে যাবো—

শিউপূজন আমার কথা শুনে যেন লজ্জায় পড়লো। আজ এই কলকাতার ইট-কাঠ-পিচ আর কংক্রিটের শহরে বসে সেই আখ আর হিন্দিভাষার বহির্ভারতের একটা স্বপ্নের দেশের কথা ভাবাও যেন অন্যায় মনে হচ্ছে। চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছি সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে মরিশাসের মাটির ওপর। কিম্বা কখনও মনে পড়ছে হোটেলের বারান্দা থেকে দেখতে পাওয়া সেই ন্যাড়া পাহাড়টার কথা। অ্যান্টিনিউ অলিয়ারে সেই ফরেস্ট অফিসারের পেঁপে গাছে ঘেরা বাংলো বাড়িটার কথা, কিম্বা থ্রিবিশ হোটেলের সামনে যতদূর দেখা যায় ধু-ধু করা সেই ইণ্ডিয়ান ওশানের জল-বিস্তারের কথা। আর রাস্তা ধরে যতদূর যাও দুপাশের আখের ক্ষেত আর মাঝে মাঝে এক-একটা ছোট ছোট কংক্রিটের বাঙলো বাড়ির কথা। মনে হয়নি আমি ইণ্ডিয়া ছেড়ে বিদেশে বাস করছি। আশে-পাশে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা আমারই লোক, আমাদেরই মত তাদের গায়ের রং, আমাদেরই মত অনর্গল হিন্দী ভাষা তাদের মুখে। আমাদের মত পোশাক-সজ্জা, আমাদের মতই তাদের চেহারা।

আর কানে ভাসছে শিউপূজনের সেই কবিতার লাইনগুলো—

"প্রভু, আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—"

শিউপূজন বললে—আপনাদের দেশে আখ হয় তো?

বললাম—হ্যাঁ খুব আখ হয়।

শিউপূজন বললে—জানেন, আখ আমাদের সোনা।

—কেন, সোনা কেন?

শিউপূজন বললে—আপনাদের ইণ্ডিয়ার যেমন ইস্পাত, জাম্বিয়ার যেমন তামা, সাউথ আফ্রিকার যেমন সোনার খনি, আমাদের তেমনি আখ। আখের ক্ষেতি। এই আখ দিয়েই আমরা চাল কিনি, ডাল কিনি, পেট্রল কিনি, সিগারেট কিনি, মটর গাড়ি কিনি, কাগজ কিনি, তেল কিনি, সব কিছু কিনি, আখই আমাদের লক্ষ্মী—তাই এই কবিতাটার নাম দিয়েছি 'প্রভু আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—'

কিন্তু না, শিউপূজন সত্যি কথা বলেনি। আখ সোনা নয়। যদি সোনা হতো তাহলে মরিশাসকে সে স্বতন্ত্র করে দিত। মরিশাস যে আজ ভারতের বন্ধু সে সেই সোনার আকর্ষণে নয়। আকর্ষণটা ভালবাসার। আখ সেই ভালবাসারই প্রতীক। আখ মিষ্টি, ভালবাসাও মিষ্টি। আখ মিষ্টি তা স্বীকার করি। কিন্তু হে প্রভু, তুমি সেই আখকে আরো মিষ্টি করো, তুমি সেই আখের রসে আরো মিষ্টি মিশিয়ে দিও—। যাতে পৃথিবীর সবাই আরো মিষ্টির আস্বাদ পায়, যাতে পৃথিবীর সবাই মরিশাসের আরো ভালবাসার আস্বাদ পায়। আমরা যে সবাইকে ভালবাসি আমাদের আখ সেই বাণী আখের রস মিষ্টি হলে পৃথিবীর সকলের অনুভূতির সঙ্গে আমাদের অনুভূতি মিলে যাবে। আজ যে পৃথিবীর চারদিকে হানাহানি কাটাকাটি রেষারেষি তা কমে যাবে।

"কত দূর চলে এলাম
চলতে চলতে
জ্বলতে জ্বলতে—
প্রভু, আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—"

এক শতাব্দী আগে ইণ্ডিয়ার কোন্ এক জেলা থেকে আমার এক পূর্ব পুরুষ এখানে এসেছিল। জানি না তার নাম কী। হয়ত আরা কিম্বা গয়া কিম্বা হয়ত ছাপরা বা বারভাঙ্গা। সেদিন সেই নিরুদ্দেশ যাত্রার সময় কি আমি জানতুম যে চলতে চলতে এত জ্বালা যন্ত্রণায় জ্বলতে হবে—কিন্তু এসে পড়েছিলাম এই আখের দেশে, এই ভালবাসার দেশে। এই অহিংসা দয়া আর মৈত্রীর দেশে—

বললাম—তারপর?

শিউপূজন তার কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো—

"কত দূরে চলে এলাম
চলতে চলতে
জ্বলতে জ্বলতে,
প্রভু, আখের রসে আরো মিষ্টি দিও

এই আগুনের ডেলাটা কবে সৃষ্টি হয়ে
বলতে পারো?
কবে ঘুরতে শুরু করলো এটা
তোমায় ঘিরে?
কিন্তু আমি জানি কবে আমার চলা
শুরু হবে
জ্বলতে জ্বলতে
প্রভু, আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—

*

হঠাৎ আমার পাশের ছেলোটি আমা স্বপ্ন ভাঙিয়ে দিলে। বললে—উঠুন সা এবার স্যাণ্টা-ক্রুজ এসে গেছে—

বোম্বাই! এক ঝটকায় আমি কোমে বেলট বেঁধে নিলাম। তারপর হাওয়া আড্ডার রানওয়ের ওপর দিয়ে গাড় গড়িয়ে চলতে চলতে একটা জায়গায় এ থেমে গেল জাম্বোটা। সবাই যার-যার বস জায়গা থেকে উঠে দাঁড়া । দরজার বাই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নের দিকে দেখি হাওয়াই-আড্ড বারান্দার সাম বহুলোক বহু ছে য়ে স্ত্রী-পুরুষ স দিয়ে দাঁড়িয়ে আ । প্লেনে যারা এসে তাদেরই সব আত্মীয়-স্বজন। যার- আত্মীয়-পরিজনদের স্বাগত জানাতে উদগ্র হয়ে আছে তারা। আগে আগে না পাঞ্জাবী লেখিকা অমৃতা প্রীতম। অশ্বিনী কাকা, তুমি মিছিমিছি দুঃখ করে তুমি দেখে যেতে পারলে না এসব। এমন এক যুগে জন্মেছিলে যখন শ গরুর গাড়ি ছিল আর ছিল রেলগাড়ি। দ যাবার ইচ্ছে থাকলেও কেউ দূরে যে পারতো না। তবু গ্রামের বারোয়ারিতল বসে বসে সবাই বিড়ি টানতো আর রথত পুকুরের ধারে বসে বসে ছিপ দিয়ে ধরতো। কিন্তু সেই আদিকালেও অশ্বি কাকা চাইতো মানুষ নিজেকে বিস্ত করুক। যতই সে নিজেকে বিস্তার ক ততই তার অহংকার আর বাসনার ব কেটে যাবে। ভালো গৃহস্থ হতে গে ভালো সামাজিক মানুষ হতে গেলে, ভ দেশভক্ত হতে গেলে প্রথমেই ত্যাগ ক হবে অহংকে। অহংকে ত্যাগ কর অহং-এর বিস্তার হয়। অশ্বিনী হয়ত তাই কেবল সকলকে দূরে বলতো। কবিও হয়ত তাই সকলকে বল 'গৃহছাড়া' 'লক্ষ্মীছাড়া' হতে।

হাওয়াই জাহাজ থেকে নেমেই একটা
সব ব্যবস্থা ছিল। বাসে উঠে সবাই মিলে
পৌঁছোলাম গিয়ে লাউঞ্জের ভেতরে। সেখানে
ন যে-যার আত্মীয়-পরিজনকে কাছে
য়ে দুই হাতে আলিঙ্গন করার পালা
াছে। লাউঞ্জের ভেতরে মানুষের
ানুষিক ব্যস্ততা। কেউ কিউ দিয়েছে
কিউরিটি-চেক-এর জায়গায়, সেখানে
ামার পাশপোর্ট লাগেজ চেকিং হবে।
বার কেউ দাঁড়িয়েছে গিয়ে পোস্ট-বক্সের
মনে। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে
ুরী চিঠি লিখছে কেউ। চিঠিটা লিখেই
াস্ট-বক্সে ফেলে দেবে।. তবে নিশ্চিন্ত।
ত্মীয় স্বজনকে জানিয়ে দেবে... চলতে
তে তারা কতদূরে চলে এসেছে—

সেখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ নজরে পড়লো
ই ছেলেটাকে। লাগেজ-কাউন্টারে, ঘেঁষা-
ষি দাঁড়িয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে একমনে
কথা বলছে। আশ্চর্য, ছেলেটা তো ঠিক
টা মেয়ে জোগাড় করে নিয়েছে! দিনে
তরো শো টাকা মাইনে পায়, তার মানে
স একান্ন হাজার টাকা। সকাল থেকে মদ
ার মত পয়সা আছে তার পকেটে। তাকে
ার্থনা করতে অত সুন্দরী মেয়ে আসবে
তো কাকে অভ্যর্থনা করতে আসবে! সে
চ্ছ করলে যে-কোনও মেয়েকে রাণী বা
ারাণীর পদ দিয়ে ফেলতে পারে এটা
নতে পারলে লক্ষ লক্ষ মেয়ে হয়ত এখনি
স হাজির হবে এখানে, এই স্যাণ্টা-ক্রুজের
ওয়াই আড্ডায়।

কিন্তু, কিন্তু হঠাৎ আমার মাথায় যেন
াঘাত হলো! মেয়েটার মুখটা যেন হঠাৎ
 চেনা-চেনা মনে হলো। ও সেই সত্য-
ন্দরের মেয়ে না? সেই আমার বন্ধু জজ
ত্যসুন্দর! এ কি সেই সত্যসুন্দরের মেয়ে
ল্প নাকি?

সেই কল্প! সত্যসুন্দর যাকে মনে-
ণে সংস্কৃত পড়িয়েছে। 'রঘুবংশম'
মার-সম্ভব' 'বিক্রমোর্বশী' যার মুখস্থ
ল। আমি সত্যসুন্দরের বাড়ি গেলেই এই
ল্পকে ডেকে পাঠাতো সে। সেখানে গেলেই
ল্পর সংস্কৃত আবৃত্তি শুনতে হতো
ামাকে। সত্যসুন্দরের ধারণা ছিল সংস্কৃত
ড়লে মানুষের চরিত্র দৃঢ় হয়, ভারতীয়
ংস্কৃতির ওপর আস্থা আসে। উপনিষদ
ীতা পড়া মেয়ে সেই কল্পকেই কি আমি
াখের সামনে দেখছি নাকি? আমি যেন
ামার দুটো চোখকে বিশ্বাস করতে পার-
লাম না। এই ছেলেটাই তো এতক্ষণ আমাকে
বোঝাচ্ছিল যে বিয়ে করার মত বোকামি
 করবে না। হোটেলে উঠে পয়সা ছাড়লেই
ড়-হুড় করে দলে দলে মেয়েমানুষ এসে
াজির হয়। তাহলে এই কল্পও কি সেই
 ভাড়া-খাটা মেয়েদের একজন?

পেছন থেকে ফাদার বুলকে বললেন—
দেখছো বিমল?

বললাম—ওই যে ওখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলছে, ওই ছেলেটা এতক্ষণ দিল্লী থেকে আমার পাশে বসে এসেছিল, আর ওই মেয়েটা মনে হচ্ছে আমার এক বন্ধুর মেয়ে—সেই মেয়ে এখানে এল কী করে তাই ভাবছি—

আর একজন যাত্রী আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বোধহয় আমাদের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। আমাদের কথার জবাবে বললেন—ওই মেয়েটির কথা বলছেন? ও তো মিস দাশ, মিস কল্প দাশ, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস-এর এয়ার হোস্টেস—

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল! খারাপ হয়ে গেল এই ভেবে যে মেয়েটার সংস্কৃত শিক্ষা কোনও কাজেই এল না কেন। মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল এই ভেবে যে, ও এয়ার হোস্টেস হয়েছে বেশ করেছে, কিন্তু ওই ছেলেটার সঙ্গে ওর এত ঘনিষ্ঠতা কেন। যে ছেলেটা অতীতকাল বা ভবিষ্যৎকাল বলে কোনও কালকেই স্বীকার করে না, শুধু বর্তমানকালটাকেই চরম এবং পরম মনে করে নিশ্চিন্ত থাকে তার সঙ্গে তো সংস্কৃত পড়া সত্যসুন্দরের মেয়ের কোনও সম্পর্ক থাকাই উচিত নয়।

*

আর দু ঘণ্টা। দু ঘণ্টা সেই লাউঞ্জে কাটিয়ে আবার আমাদের যাত্রার ডাক পড়লো। এবার যে জাম্বোতে উঠবো সেটাই সোজা আমাদের নিয়ে পৌঁছে দেবে একেবারে মরিশাসে। যে-মরিশাসে জাহাজে যেতে তেইশ দিন লাগে সেখানে জাম্বোর সাহায্যে আমরা পৌঁছে যাবো সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায়। এই মরিশাসে প্রথমে এসেছিল পর্তুগীজরা। তারা সেখানে বেশী দিন থাকতে পারেনি। দু সপ্তাহ থেকেই তারা তল্পি-তল্পা গুটিয়ে পালিয়ে যায়। তার পরে এল ওলন্দাজরা। তারা ১৫৯৮ থেকে ১৭১০ পর্যন্ত রাজত্ব করে গেছে। তারপর এসেছে ফরাসীরা। ১৭১৫ থেকে ১৮১০ সাল পর্যন্ত তারা কায়েম ছিল। তারপর এল ইংরেজ। ১৮১০ সালে। তারপর এখান থেকে জাহাজ ভর্তি কুলি মজুর নিয়ে গেল। নিয়ে গেল বিষণ দয়াল শিউপূজনদের পূর্বপুরুষদের। সেই যে-শিউপূজন কবিতা লিখেছে—

কত দূর চলে এলাম
চলতে চলতে
জ্বলতে জ্বলতে
প্রভু আখের রসে আরো মিষ্টি দিও—

(ক্রমশ)

ল্যাক্মে
সৌন্দর্যের স্রষ্টা
দুর্দান্ত
ল্যাকমে
প্রদীপ্ত
ল্যাকমে
চমকপ্রদ
ল্যাকমে
কোমল
ল্যাকমে
সৌন্দর্যের সাধনায়
ল্যাকমে
daCunha/L. Com/5 c BEN

বিতর্কিত। তবু আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছেন দু-দুবার নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং। এবারকার প্রসঙ্গ ক্যানসার চিকিৎসায় ভিটামিন সি-র ভূমিকা।

সম্প্রতি বি বি সি'র এক টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে স্কটল্যান্ডের জনৈক শল্য-চিকিৎসককে সমর্থন করতে গিয়ে পাউলিং মন্তব্য করেছেন, 'আমার মনে হয়, সম্ভবত শরীরে ভিটামিন সি-র অভাবই ক্যানসার রোগের কারণ।'

'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার জনৈক প্রতিবেদককে স্কটল্যান্ডের ওই শল্যচিকিৎসক অনুরোধ করেছেন, 'দয়া করে আমার নাম প্রকাশ করবেন না। এমন কি যে হাসপাতালের সঙ্গে আমি জড়িত রয়েছি, তার নামও নয়। এখনই এসব প্রকাশ পেলে আমাদের কোন কোন রোগীর মানসিক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা।' তবে প্রসঙ্গত তিনি জানান, 'অতিরিক্ত ভিটামিন সি প্রয়োগ করার পর আমরা লক্ষ করেছি, মৃত্যুমুখী ক্যানসার রোগীদের আয়ু যেন চারগুণ বেড়ে গেছে।' মৃত্যুমুখী বলতে এখানে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন 'টারমিনাল কেস'। অর্থাৎ সেই সব রোগীদের, প্রচলিত পদ্ধতিগুলির সাহায্যে চিকিৎসা চালানর পর যাঁদের নিরাময়ের ব্যাপারে চিকিৎসকরা হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের।

পাউলিং-এর বক্তব্য, আয়ুর মেয়াদ বাড়ানই শুধু নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ভিটামিন-সি আরও 'নাটকীয় ঘটনাও' ঘটাতে পারে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ভিটামিন সি-র প্রভাবে বেড়ে যাওয়া ক্যানসার রোগের উপশমও সম্ভব।

পাউলিং এবং ওই শল্য-চিকিৎসকের মতামত প্রচারিত হওয়ার পর বিতর্কের ঝড় তুলেছেন কেউ কেউ। স্কটল্যান্ডের জনৈক ক্যানসার বিশেষজ্ঞ তো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, এ সব কথাবার্তা প্রকাশের অযোগ্য। জনৈক ভিটামিন-সি বিশেষজ্ঞ সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, নিরাময় তো দূরের কথা, ভিটামিন সি-র মাত্রা বেশি হলে বরং ক্যানসার রোগের উপসর্গ আরও দ্রুত বেড়ে যেতে পারে।

দেহ-কোষের ফাঁকে ফাঁকে থাকে এক ধরনের জৈব-রাসায়নিক যৌগের আস্তরণ। বিষাক্ত টিউমার, বা সাধারণ ভাবে যাদের আমরা বলি ক্যানসার, তার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে এই আস্তরণ। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যাদের বলছেন 'বেরিয়ার'। পাউলিং-এর

ক্যানসার
এবং
ভিটামিন সি

বক্তব্য, ভিটামিন সি এই আস্তরণের মধ্যে সংহত রাখার ব্যাপারে সাহায্য করে। যার ফলে আক্রান্ত অঞ্চল থেকে ক্যানসার কোষ শরীরের অন্যত্র আরো ছড়িয়ে পড়তে বাধা পায়। তবে এই সঙ্গে এ কথাও তিনি বলেছেন, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে, যেমন, একস-রে, শল্য-চিকিৎসা, রাসায়নিক যোগ এবং রোগ-প্রতিরোধী ঔষধপত্র, এ সবের সাহায্যে স্থানিক টিউমারগুলি ধ্বংস

লাইনাস পাউলিং

করা দরকার। অর্থাৎ কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই, প্রচলিত পদ্ধতিতে সনাক্তকৃত ক্যানসার কোষগুলি নির্মূল করতে হবে। ওই সঙ্গে রোগীকে দিতে হবে অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন সি। এই ভিটামিন সি-র কাজ, ক্যানসার কোষ শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে গিয়ে ক্যানসার গড়ে তুলতে যাতে না পারে সে ব্যাপারে সাহায্য করা।

*

দেহের কোষকলার প্রাচীর ছিন্ন করে বাইরে বেরিয়ে আসা এবং বিশেষ করে রক্ত সংবহনকারী নল ভেদ করে তার ভেতরে ঢুকে শরীরের অন্য কোথাও ক্যানসার কোষ বা 'ম্যালিগনান্ট সেল'-এর ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটার ওপরই পাউলিং গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। এর কারণও আছে। অনেক সময় দেখা যায়, শরীরের কোন অংশে টিউমার দেখা দিল। বিষাক্ত টিউমার। প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্য নিয়ে সেই টিউমারটি ধ্বংস করার পর রোগী সেরেও উঠলেন (?)। কিন্তু কয়েক মাস বা বছরের পর অনেক সময় দেখা যায় শরীরে আবার বিষাক্ত টিউমার দেখা দিয়েছে। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, অঞ্চল বিশেষে টিউমার কোষ চিকিৎসার সাহায্যে ধ্বংস করা গেলেও কোন এক সময়ে তার কিছু অংশ শরীরের অন্যান্য অংশে নিশ্চয় (?) ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব কোষই শেষ পর্যন্ত সেখানে নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলায় সাহায্য করে। পাউলিং এবং ওই স্কটল্যান্ডের শল্য-চিকিৎসক ক্যানসার কোষের এ ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধ অথবা নিয়ন্ত্রণের জন্যে বছর তিন আগে ভিটামিন সি'র কার্যকারিতা নিরূপণে হাত দেন।

তাঁদের যুক্তি, সাধারণ অবস্থায় কোষের দ্রুত বংশবৃদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ কাজ করে এক ধরনের আঠাল বস্তু। ইংরেজিতে এদের বলা হয় 'গ্রাউণ্ড সাবস্ট্যান্স'। এরা থাকে যে কোন দুটি কোষের অন্তবর্তী অঞ্চলে। আঠাল হওয়ার কারণ, এই বস্তুগুলির মূল উপাদান হাইয়ালিউরোনিক অ্যাসিড (hyaluronic acid) নামে এক ধরনের জৈব-যৌগের পলিমার এবং বিভিন্ন ধরনের গ্লাইকসঅ্যামাইনোগ্লাইকানস যৌগ। উল্লেখ্য, একই ধরনের রাসায়নিক যৌগের একাধিক অণু মিলিত হয়ে যখন বৃহত্তর একটি অণু তৈরি করে সেই অণুকেই তখন বলা হয় 'পলিমার' বা 'বহুযৌগিক অণু'। হাইয়ালিউরোনাইডেজ (hyaluronidase) নামে এক ধরনের উৎসেচক পদার্থ বা এনজাইম-এর সংস্পর্শে ওই পলিমার ভেঙে যায় এবং তারা তাদের আঠাল ধর্মটি হারিয়ে ফেলে। স্বাভাবিক প্রাণীকোষ বংশবৃদ্ধির বা বিভাজনের সময় এই এনজাইমটি উৎপাদিত হয়। তখন এক কোষ থেকে সৃষ্ট হচ্ছে

থাকে একের পর এক নতুন কোষ। তারপর নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ তৈরি হয়ে গেলে শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিতে নির্গত হয় আর এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। যাকে বলা হয় হাইয়ালিউরোনাইডেজ ইনহিবিটর (PHI)। এই শেষোক্ত যৌগ ওই এনজাইমের উৎপাদন বন্ধ করে অথবা তার সক্রিয়তাকে বাধা দিয়ে পুনরায় পরিমার তৈরি করতে সাহায্য করে। পারস্পরিক কোষের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে 'আঠাল গ্রাউণ্ড সাবস্টান্স' আবার জমে ওঠে। ফলে কোষের বংশবৃদ্ধি আর অনিয়ত ধারায় চলতে পারে না।

পাউলিং বলছেন, পার্থক্য এই : স্বাভাবিক কোষের ক্ষেত্রে হাইয়ালিউরোনাইডেজ-এর উৎপাদন নির্দিষ্ট সময় ধরে চলে বলে এক্ষেত্রে কোষ-বিভাজনের ব্যাপারটা কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে আর এগোয় না। কিন্তু ক্যানসার কোষের বেলায় তার ব্যতিক্রম। এ ক্ষেত্রে বাধাহীনভাবে চলতে থাকে হাইয়ালিউরোনাইডেজ উৎপাদনের কাজ। ফলে ক্যানসার কোষের বংশবৃদ্ধিও অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। অতএব 'গ্রাউণ্ড সাবস্ট্যান্সের' পরিমার ভেঙে যাওয়াটা যদি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, ক্যানসার নিয়ন্ত্রণের কাজটি হয়ত সহজতর হতে পারে। কারণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে কোষ বিভাজন চললে সেই কোষ কোষকলার প্রাচীর ভেদ করে রক্তবাহী নালের মধ্যে দিয়ে শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব নয়। সেটা বন্ধ করা গেলে শরীরের এক অঞ্চল থেকে অপর অঞ্চলে ক্যানসারের ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করা যায়।

ভিটামিন সি-র ভূমিকা এই শেষোক্ত কাজটির ব্যাপারে সাহায্য করা। কি ভাবে? পাউলিং-এর মতে, শরীরে হাইয়ালিউরোনাইডেজ নামক উৎসেচক রস বা এনজাইম (যার কাজ গ্রাউণ্ড সাবস্ট্যান্সের আঠাল ধর্ম নষ্ট করা) উৎপাদনে বাধা দেবার জন্যে হাইয়ালিউরোনাইডেজ ইনহিবিটর (PHI) নামক যে বস্তুটির প্রয়োজন, তার সংশ্লেষণের জন্যে দরকার ভিটামিন সি। অতিরিক্ত পরিমাণ ভিটামিন সি প্রয়োগ করলে রোগীর দেহে যথাযথ পরিমাণে এই প্রতিবন্ধক বস্তুটি সংশ্লেষণ করা হয়ত অসম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে ক্যানসার কোষ বিভাজনে বাধা পাবে।

না, পুরোপুরি নিরাময় বলতে যা বোঝায়, পাউলিং কিন্তু সে কথা বলেননি। পাউলিং-এর বক্তব্য, 'টিউমার কোষের হত্যা বলতে যা বোঝায়, তা নয়। ব্যাপারটাকে বলতে পারেন এক ধরনের নিরস্ত্রীকরণ। টিউমার থাকবে। তাকে অনুভব বা স্পর্শ করাও যাবে। একস-রে পরীক্ষায় ধরা পড়বে। তবে তার কোষ বিভাজন হয়ত রোধ করা যাবে। সেই সঙ্গে ক্যানসারজনিত রক্তক্ষরণ, ব্যথা বেদনা এবং কষ্টকর উপসর্গের হাত থেকে রোগীরা হয়ত রেহাই পেতেও পারেন।

*

'নিউ সায়ান্টিস্ট' পত্রিকার প্রতিবেদকের কাছে স্কটল্যাণ্ডের সেই শল্য চিকিৎসক বলেছেন, সব রকমের চিকিৎসাগত চেষ্টার পর যে সব রোগীর ক্যানসার নিরাময়ের ব্যাপারে চিকিৎসকরা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন তাঁদের তিনি গোড়ায় দৈনিক ১০ গ্রামের মত ভিটামিন সি খেতে দেন। পরে অবস্থা বুঝে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন সি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে অনেক রোগীর কষ্টই লাঘব হয়েছিল। যন্ত্রণা কমেছে। খাবারে আগ্রহ বেড়েছে। এবং ইত্যাদি। ১৯৭১-এর পর গত চার মাস আগে পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন রোগীর ওপর অতিরিক্ত ভিটামিন সি প্রয়োগ করা হয়। তাতে দেখা গেছে, স্বাভাবিক চিকিৎসা শেষ হওয়ার পর তাঁদের যতদিন বেঁচে থাকার কথা, তার চেয়ে এই রোগীরা আরও প্রায় চার গুণ বেশী সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি এ-কথাও বলেছেন, সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দেওয়া রোগীদের শুধু ভিটামিন সি'র সাহায্যে চিকিৎসা করে বেশ কিছুটা সুফলও পেয়েছেন।

যদিও এ ব্যাপারে প্রতিবাদেরও ঝড় তুলেছেন বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী, যেমন, অকসফোর্ডের র‍্যাডক্লিফ ইনফার্মারির বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ রিচার্ড পেটো এবং লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ক্যানসার রিসার্চ ফাণ্ডের বিশিষ্ট ক্যানসার কেমোথেরাপিস্ট অধ্যাপক কুর্ট হেলমান মন্তব্য করেছেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করার মত যতটা তথ্যের প্রয়োজন গবেষকরা তা এখনও যোগাতে সমর্থ হননি। তা ছাড়া তাঁরা যে বলছেন, ভিটামিন সি খাইয়ে অনেক 'টার্মিনাল'

রোগী, অর্থাৎ যাবতীয় চেষ্টার পর চিকিৎসকরা যাঁদের বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁদের অনেকটা তাঁরা আরাম দিতে পেরেছেন, এটাও বিশ্বাস করা শক্ত। প্রশ্ন হল, কি করে তাঁরা বুঝলেন, ওই সব রোগী 'টার্মিনাল'? এখনও পর্যন্ত কি কি ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে কোন রোগীকে টার্মিনাল বলা চলে, ক্যানসারের বেলায় হলফ করে এমন কথা বলা যায় কি? এমনও তো হতে পারে, টার্মিনাল রোগীর আরাম বলতে যা বলা হচ্ছে, আদপে তারা সে ধরনের রোগীই নন? প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি তাদের হয়ত আরাম দিয়ে থাকবে।

'দেখা যায় বেশির ভাগ ক্যানসার রোগীই বয়স্ক। এ ক্ষেত্রে তাদের দৈহিক পুষ্টি এমনিতেই কম। ফলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও কম। এর জন্যেই যে কোন রোগ তাদের ওপর চেপে বসে বেশি। ভিটামিন সি তাদের দৈহিক পুষ্টির ব্যাপারে সাহায্য করে বলে কিছুটা সুফলও পাওয়া যেতে পারে।' এ কথা বলেছেন অধ্যাপক হেলম্যান। তবে তার সঙ্গে তিনি এটুকুও যোগ করেছেন, 'ভিটামিন সি ক্যানসার সারায় এমন একটা ধারণা যেন বিশ্বাসে পরিণত করা না হয়। ব্যাপারটা আরও খতিয়ে দেখা দরকার।'

উল্লেখ করা যেতে পারে, লেবু, সবুজ শাকসব্জির মধ্যে থাকে ভিটামিন সি। প্রায় ৫০ বছর আগে নোবেল বিজ্ঞানী আলবার্ট সেজ্জন্ট-গিওর্গি (Szent-Gyorgyi) এ বস্তুটির সংশ্লেষণ পদ্ধতি তৈরি করেন। তারপর কত কথাই না জানা গেছে এর সম্পর্কে। ভিটামিন সি স্কার্ভি রোগের প্রতিরোধক। সর্দি এবং ঠান্ডাজনিত রোগেরও অব্যর্থ প্রতিষেধক। 'দ্য কমন কোল্ড অ্যান্ড ইটস কিওর' গ্রন্থে পাউলিং বলেছেন, দৈনিক ১-২ মিলিগ্রাম এই ভিটামিন খেলে সর্দি লাগার ভয় থাকে না। অতিরিক্ত ভিটামিন সি নাকি কারোর 'মেধা' বাড়ানোর পক্ষেও উপকারী, এমন কথাও তিনি বলেছেন। সে নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। এখনও হচ্ছে। এবার দেখা যাক ক্যানসার প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

পাঠকের পত্র

প্রসঙ্গ : জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-প্রতিভা অনুসন্ধান ॥ শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ, কলকাতা—৭০০০২৩ থেকে লিখেছেন : সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-প্রতিভা অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেল, বৃত্তি লাভে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের লিখিতভাবে ইংরাজী ভাষায় বিজ্ঞান পরীক্ষায় বসিতে হইবে। বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হবার কিছু দিন পরেই আবার সংবাদপত্রে দেখা গেল, উক্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত দশটি ছাত্রছাত্রীর নাম, যাদের মধ্যে নয়জনই কলকাতার বিশিষ্ট ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত। খবর পড়ে মনে হয় যেন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিভা কেবলমাত্র ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমি সুযোগ পেলেই বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের, বিশেষ করে বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে কিশোর-কিশোরী পরিচালিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী বেশ কিছুদিন ধরেই দেখে আসছি। এখানে তাদের মৌলিক এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রসঙ্গে বাংলা ভাষায় সাবলীল প্রকাশভঙ্গী আমাকে এই ধারণাই দিচ্ছিল যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার দিন এসে গেছে। প্রশ্ন : জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান-প্রতিভা অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষ কি অনুসন্ধান করে দেখেছেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের এই বৃত্তি লাভের ব্যাপারে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে বঞ্চিত করছেন কেন? এই লোভনীয় বৃত্তি কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কি অপচেষ্টা নয়? একদিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার বহুল প্রচলন, অপর দিকে সকল সুযোগ-সুবিধার জানালা কেবল মুষ্টিমেয় ইংরাজী মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্তদের উন্মোচন, এর তাৎপর্য বোঝা শক্ত। ফলে বহু প্রতিভা শুধু মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অপরাধে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এ প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের কি বক্তব্য?

সমরজিৎ কর

সংশোধন : ১৬ অকটোবর **বিশ্ব-বিজ্ঞান** পর্যায়ে সংবাদ চিত্রের ব্লকটি উল্টো ছাপা হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত।

গানের আসর

আধুনিক গান

প্রতি বৎসরই পুজোর সময় বেশ কিছু আধুনিক গানের রেকর্ড বেরোয় এবং তা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা চলে। অনেক রেকর্ড ভাল বিক্রি হয় বলে শুনি, আবার অনেক রেকর্ড সম্বন্ধে নৈরাশ্যজনক খবর পাওয়া যায়। হয়তো বিক্রির সংখ্যা আজকাল আগেকার চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু রেকর্ড সম্বন্ধে "সেই উচ্ছ্বাস" যা পুরনো আমলে দেখা যেত তা আর আজকাল অনুভব করা যায় না। বাড়িতে বসে অনেকে হয়তো তাঁদের নির্বাচিত রেকর্ড বাজিয়ে আনন্দ পান, কিন্তু আগেকার মত কোনও গানই তেমন করে লোকের মুখে মুখে ফেরে না। সবই আছে, কিন্তু কোথায় যেন আগেকার সেই "চার্ম"টা হারিয়ে গেছে। কার কাছ থেকে যেন শুনলুম আধুনিক গানের বিক্রি আজকাল অনির্দিষ্ট—কমে যাবার প্রবণতাই যেন বেশী দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও নজরুল—এঁদের গানের রেকর্ড কতটা বিক্রি হবে তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়, কেননা এক একটি বিশেষ শ্রেণী আছেন যাঁরা এই পর্যায়ের গান নিয়মিতভাবে কিনে থাকেন, কিন্তু আধুনিক গান সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই আন্দাজ করা যায় না—ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কাটতি হল, নইলে নয় এবং যা হলো না তা বোধ হয় একেবারে নষ্ট করে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। খ্যাতিমান রচয়িতাদের রেকর্ড ধরে রাখা চলে কারণ হয়তো তার চাহিদা ভবিষ্যতে কোন সময় হতে পারে, কিন্তু আধুনিক গান একবার না চালু হলে আর প্রচার হবার কোন আশাই থাকে না।

এই অনির্দিষ্টতাকে মেনে নিয়েও রেকর্ড কোম্পানীগুলি যে আধুনিক গানের রেকর্ড বের করেন সেটি প্রশংসনীয়। কারণ, বহু শিল্পীর প্রত্যাশাকে তাঁরা নিরাশ করেন না এবং এতে তাঁদের বাংলা গানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি উদার মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান তো সুযোগ পেয়েও এটি করেন না, পরন্তু এ সব বিষয়ে তাঁদের কোনও আগ্রহেরও পরিচয় পাওয়া যায় না। বরঞ্চ যাঁরা আধুনিক গান লেখেন, সুর দেন এবং অনুগামী সংগীত পরিকল্পনা করেন তাঁদেরই আত্মসমালোচনা করা প্রয়োজন। তাঁরা যদি সার্থকতা লাভ করতে পারেন তা হলে ভবিষ্যতে নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা দেখা দেবে, নইলে বছরের পর বছর কতকগুলি গান বাজারে বেরুবে যায় নিয়মমাফিক কেনা-বেচা ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য বোধগম্য হবে না।

আধুনিক গান সম্বন্ধে বরাবরই যে সমালোচনা হয়ে আসছে আজও তা থেকে নিবৃত্ত হবার মত কারণ ঘটেছে বলে মনে হয় না। আজও অধিকাংশ আধুনিক গানকে কেবলমাত্র ভঙ্গিসর্বস্বই বলা চলে—কেননা, সংগঠন, শব্দচয়ন, উপমা, গীতিধর্মিতা সবই যেন শ্রোতাকে কোনো বিশেষ উপলব্ধি বা প্রত্যয়ে পৌঁছে দেয় না, কেমন যেন গাইবার ছলে একটা সুরে বলা শব্দসমষ্টির মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। অনেকদিন ধরে একই বস্তু শ্রবণগোচর হবার পর লোকে যদি নিস্পৃহ হয়ে পড়ে তা হলে তাদের উপর দোষারোপ করা যায় না। অনেক গানের প্রথম ছত্রটি বেশ খানিকটা চটকদার হলেও তেমন অর্থবহ হয় না এবং স্বভাবতই এই ধরনের রচনা শেষ পর্যন্ত অসংলগ্ন বা পারম্পর্য-বিহীন হয়ে পড়ে। কোনও কোনও গীতিকারের বোধ হয় এরকম ধারণা আছে যে এই রকম অভাবনীয় উপমাসমন্বিত গানই লোকের কাছে চিত্তাকর্ষক হবে, কিন্তু এ ধারণা যে ভুল তারও তো প্রমাণ রয়েছে স্বল্প চাহিদার উদাহরণ থেকে। নূতনত্ব মানে স্বভাবের ব্যতিক্রম নয়; স্বভাবের মধ্যে যা আমাদের অনুভূতিকে এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে সেই বস্তুটিই হচ্ছে নূতনত্বের প্রধান উপাদান। আমাদের গীতিকারগণ একান্ত স্বাভাবিক রীতিতে কার্যক্রম নিরূপণ করাকে বোধ করি প্রাচীনপন্থীর সমগোত্রীয় বলে নির্ধারণ করেছেন, যার ফলে বহু চেষ্টাকৃত কষ্টকল্পনা সত্ত্বেও তাঁদের অভীষ্ট সার্থকতা তাঁদের অভ্যর্থনা জানায় নি। সুরের দিক থেকে দেখা যায়, ইচ্ছে

কয়ে মেলডিকে ব্যাহত করা হচ্ছে; সুর যেখানে আপনার নিয়মে পৌঁছোতে চায় তাকে সেখানে যেতে না দিয়ে কৃত্রিম পথে পরিচালনা করা হচ্ছে—ফলে সেই ক্ষতি ঘটছে যা ঘটে থাকে রাগসঙ্গীতে উদ্দেশ্যহীন বিবাদী স্বরের প্রয়োগে। অথচ আধুনিক গানের সুরকারগণ ভাবছেন প্রত্যাশিত সুরেলা জায়গায় একটা বেসুরো পর্দা লাগিয়ে তাঁরা গতানুগতিকতাকে পরিহার করছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই অনুগামী সঙ্গীত গানের সেন্টিমেন্টকে মেনে চলে না, কোনো কোনো ক্ষেত্রে গানের সঙ্গে তার লেশমাত্র সঙ্গতিও থাকে না। আধুনিক গান যদি সার্থকতা লাভ করতে অসমর্থ হয়ে থাকে তাহলে এইগুলিই তার মূল কারণ। ... আজ পর্যন্ত দেখা গেছে শ্রোতারা স্বাভাবিক সুললিত রচনার বরাবরই সমাদর করে এসেছেন। নজরুলের গানের অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তার কারণও মুখ্যত এইটাই। এ যুগে আর কারুর রচনায় এরকম বলিষ্ঠ, সুন্দর এবং মাধুর্যপূর্ণ মানবিক আবেদন দুর্লভ। সংগীতে ইনটেলেকচুয়াল আবেদন কিন্তার করা অন্য জিনিস। জনচিত্ত সেটা যে অবধারণ করতে পারে না তা নয়—তারও একটা স্বীকৃতি তারা প্রদান করতে প্রস্তুত; কিন্তু গভীরতার জায়গায় কৃত্রিমতা যে কতটা অসার্থক সেটা তারা উপলব্ধি করতে পারে বলেই তাকে তারা বরদাস্ত করতে রাজী নয়।

আধুনিক গান যে সর্বাংশে নিন্দনীয় এটা বলা এই লেখকের উদ্দেশ্য নয় এবং রচয়িতাদের প্রচেষ্টাকে লঘু বা অসার প্রতিপন্ন করাও তাঁর অভিপ্রেত নয়; তাঁর বক্তব্য হচ্ছে একটা সৃষ্টি যেন যথার্থ আর্ট হতে পারে, এই সচেতনতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ট্র্যাডিশনকে একেবারে উপেক্ষা করে বোধ করি এটি সম্ভব নয়, আবার মেলডির বিকৃতি ঘটিয়েও কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না;—প্রত্যেক রচয়িতাকেই এমন একটি পথ খুঁজে নিতে হবে যা আর্টের পথ, যা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে না অথচ তা পূর্বতন রচয়িতাদের একান্ত অনুকৃতিতেই পর্যবসিত হবে না। আমাদের সুরকারগণ আজকাল পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের অনেক শব্দ উচ্চারণ করে থাকেন এবং বিদেশী রেকর্ড থেকে কিছু কিছু টেকনিক তাঁদের রচনায় প্রয়োগও করেন সাহসিকতার সঙ্গে; কিন্তু তার ফল সর্বাংশে ভাল হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে তার কারণ আমাদের অনেকেই পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ভাল করে শেখেননি, হার্মনি তথা ধ্বনিবিজ্ঞানে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের যে বিপুল তত্ত্ব গড়ে উঠেছে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেননি। যদি তা করতেন তাহলে খাইরেকার অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ আমাদের আধুনিক গানের সুরকে বা সহযোগী সঙ্গীতকে মাঝে মাঝে এমন বিকৃত করে তুলত না।

অনেক সময় একটা কথা শোনা যায়, সঙ্গীতের একটা "ইউনিভার্সাল" আবেদন আছে। বিষয়টা বিতর্কিত। হয়তো কিছুটা থাকতে পারে, যেমন পাশ্চাত্ত্য সিমফনি আমাদের অনেক স্থলে মনোরম লাগে, কিন্তু সর্বাংশে নয়। সঙ্গীতের কতকগুলি প্রিন্সিপল্ আছে যা সর্বজনীন, মেলডির একটা দিক আছে যা সব দেশকেই কিছু না কিছু গ্রহণ করতে হয়েছে;—কিন্তু "ওয়ার্লড মিউজিক" বলে কি কোনও সঙ্গীত সৃষ্টি করা সম্ভব যা তাবৎ বিশ্বের একটি সর্বগ্রাহ্য সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃত হবে? এটা বোধ করি হতে পারে না। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত মানসিক বিভেদ এত প্রচণ্ড রকমের বেশী যে, এক বস্তুকে গ্রহণ করা সব জাতির প[illegible] সম্ভব নয়। এরকম একটা চেষ্টা আ[illegible]র দেশেও হয়েছিল, কিন্তু বোধ হয় তার সার্থকতা এত নগণ্য হয়েছিল যে প্রযোক্তারা তাতে উৎসাহিত হতে পারেননি। যাক, এটা খুব বড় পদক্ষেপ, অসাধারণ মেধা বা প্রতিভার অধিকারী না হলে এদিকে কোনও পরীক্ষানিরীক্ষা ফলপ্রসূ হবে না; কিন্তু আমাদের এই দেশের মধ্যে সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে যে রুচি ও সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে তার মাধ্যমে একটা সুস্থ সুন্দর সাঙ্গীতিক পরিবেশ রচনা করাটাই তো আমাদের সবাইকার অভিপ্রেত। নূতনত্বের অভিযানে কষ্টকল্পনা, বিরুদ্ধ স্বরপ্রয়োগ, ধ্বনির অসংগতি—এইগুলি পরিহার করলে বোধ হয় রচয়িতাদের পক্ষে জনচিত্তে প্রবেশ করা আরো অনেক বেশী সুগম হবে।
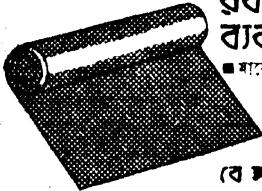
শার্ঙ্গদেব

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

বীণা ভার্গবের 'ফুটপাত' চিত্রমালা
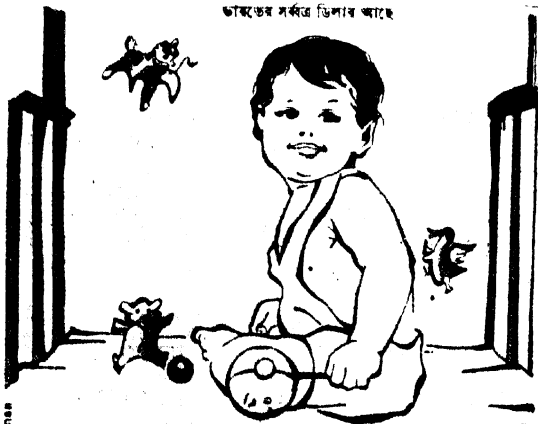
বীণা ভার্গবের সাম্প্রতিক প্রদর্শনী দেখে (বিড়লা আকাদমী ২০-৩১শে অকটোবর)-বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি পশ্চিম বাঙ্গলার প্রথম সারির তরুণ শিল্পীদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করতে পারবেন স্বাধিকারে এবং এদিকে শানু লাহিড়ী ছাড়া তাঁর সমকক্ষ মহিলা চিত্রশিল্পী নেই।

তাঁর কানভ্যাসগুলো বিরাট (৬৪×৪২ ইঞ্চি থেকে ৮৪×৫৪ ইঞ্চির মধ্যে যে কোনো আকারের হতে পারে)।

এ সিরিজের নাম 'ফুটপাথ চিত্রমালা'। পাত্রপাত্রী ঠিক চেনা যায় না, ফুটপাতের বাসিন্দাদের গোড়ালির নীচে থেকে পায়ের পাতা দেখে স্ত্রী-পুরুষ চেনা, একমাত্র ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টের বিশেষজ্ঞরাই পারেন। এসব অবশ্য তাঁর কাছে জরুরী নয়। তিনি বাঁ হাতে তুলি চালান তাই রচনার গতি বাঁ থেকে ডানে—একটু সরে ডান দিকে দাঁড়ালে ছবি খোলে বেশি। দ্বিতীয়ত, ফুটপাত সিরিজের তাঁর বেশিরভাগ রচনার অনুভূমিক রেখা—তা সে মোটামুটি সোজা হোক বা বক্র হোক—চলে গেছে এদিক থেকে ওদিক। কখনো আছে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা একটা দেহ—অনুভূমি রেখার সমান্তরাল বা প্রায় ক্ষেত্রে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা অংশ। 'ফুটপাত ৮' চিত্রে খাড়া কিছু পায়ের পাশে বা অনুভূমিক রেখার সমান্তরাল একটি আধনেংটো নিতম্বের মধ্যে থেকে দুটি ভাঁজ করা পা—একটি খাড়া, অপরটি কোনাকুনি—বেরিয়ে এসে রচনার মধ্যে দৃঢ়তা এনেছে। পা বা

বীণা ভার্গব "ফুটপাথ—৮"

হাত তাঁর ছবির প্রধান স্থান জুড়ে রয়েছে এবং এঁকেছেন দক্ষ হাতে। এর ওপর নিপুণ হাতে রঙ চাপিয়ে এনেছেন ত্বকের বৈশিষ্ট্য। আর আছে ফুটপাথ বা তার আভাস। চটাওঠা বা দাঁত বের করা বিলিতী মাটির চাঁই।

কখনো আবার এসেছে বড়লোকের বাড়ির স্নোসেম করা গেট, কখনো শিক দেওয়া রাস্তার নর্দমার চৌকো ঝাঁঝরি। বস্তুত কতো সামান্য আয়োজনে বক্তব্য বলা যায় সেটাই তাঁর লক্ষ। সামান্য দীর্ঘায়িত এবং ঈষৎ বিকৃত করা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এঁকে তিনি বিড়ম্বিত মানুষের যন্ত্রণার ভঙ্গি তুলে ধরেছেন। যেন বা দুঃখকষ্টের কোনো মুখ নেই, আত্মপরিচয় নেই, নেই সনাক্ত করার কোনো উপায়। আর যেখানে ব্যতিক্রম হিসাবে পূর্ণাবয়ব মানুষ এঁকেছেন সেখানেও মুখ যেন মুখোশ, শীতল, শীর্ণ, নরমুণ্ডের উপর জড়ানো চামড়া। আর হাত পা বা মুখ আঁকতে গিয়ে তিনি বিষাদের ঝড়ে বিপন্ন হয়েছেন, তা তাঁর কম্পমান তুলি ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায়। একটি হাতের চামড়ার ছবি অবিস্মরণীয়—চামড়ার তলা থেকে স্বচ্ছ রঙ উঁকি

দেওয়ার ফলে কুষ্ঠরোগীর বিবর্ণ ত্বকের কথা মনে হয়েছে। আর তাঁর চিৎ হয়ে থাকা মানুষ যেন মর্গে শুয়ে আছে। এক সময় ডাক্তারী পড়তেন তিনি, তাই লাস-কাটা ঘরের ঘেঁটলানো স্মৃতি আছে মনে। আর এই কলকাতার হতশ্রী ফুটপাতের বাসিন্দারা আমাদের পড়শী।

বীণা পট সাজানোর জন্য কাঠামো দৃঢ় করেছেন রচনার প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে। ভারসাম্যের ব্যাপারে তাঁর অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টি আছে। অথচ পটসজ্জার ব্যাপারে এতো সহজ তাঁর ভঙ্গী যে কলা কৌশল নজরে পড়ে না।

রঙ চাপানোর মুন্সীয়ানা আর সংযম প্রশংসনীয়। লাল ছাড়া কোনো চড়া রঙ ব্যবহার করেননি। মৌলিক বা মাধ্যমিক বর্ণ এসেছে—কিন্তু তা কখনোই স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিয়ে নয়। কালচে নীল বা কালচে সবুজ—এসবও চোখকে উৎপীড়িত করে না এমনই স্নিগ্ধ। বরং নম্র ধূসর, সাদা বা ছায়াচ্ছন্ন বর্ণ ব্যবহার করে তিনি আবেগের রাশ টেনেছেন। অবশ্য পট জুড়ে একাধিক সমতল রঙ ব্যবহার করার রীতির সঙ্গে মানুষের অবয়ব বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রঙ চাপানোর ধরনটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে যায়নি। চারপাশটা এমন নিস্তরঙ্গ করে দেবার ফলে তাঁর ছবির চরিত্র কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

'ফুটপাত-৮' (৭০" ৫২") ছবিটা ধরা যাক। ছবির মধ্যস্থলে দুটি সমান্তরাল রেখা এঁকেবেঁকে গেছে। একপাশে পাঁচটা পা খাড়া হয়ে আছে, অন্যপাশে অর্ধ উলঙ্গ নিতম্বেও ভাঁজ করা দুটো পা। আর উপরে নীচে নদীর পাড়ের মতো অংশ। দুটি পাড় হলদে সমতল রঙ দিয়ে ভরাট। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অংশটুকু কালচে নীল। আর দুই রঙের সংযোগস্থলে লাল রঙের রিবনের মতো পাড় যেন আবেগে কম্পমান। ঠাণ্ডা অনুজ্জ্বল রঙ ব্যবহারে তাঁর সংযম দর্শককে বশীভূত করলেও, সমতল রং ব্যবহারের বিলম্বিত মেজাজ মেনে নিতে কষ্টই হয়। একমাত্র সমতল রক্তবর্ণ লাল টকটকে শোণিতের মত লাল—উগ্র, উষ্ণ, উত্তেজক লাল—তাঁর সংবেদনশীলতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে।

অথচ রঙ ব্যবহারে তিনি দক্ষ। চিত্রের পর চিত্র মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। তাঁর তৈরী নিকট বাস্তব জগৎ শ্বাপদসংকুল নয়, কিন্তু নিরাপদও নয়। এখানে আকাশ, অবকাশ, বিনোদন, নিরাপত্তা বা আব্রু—কিছু নেই। কী ভয়াবহ এইসব আর্তি।

তাঁর রেখাচিত্রও ভাল। দ্রুত হিজিবিজি রেখার মধ্যে মুখের আভাস বা মোটা রেখার টানের মধ্যে দেহের রূপ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বা স্নায়বিক উত্তেজনায় আঁকা রেখার জালের মধ্যে মুখের ডৌল। সব যেন বাস্তব ও সম্ভাবিত, চেতন আর অবচেতনের সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে।

নিঃসন্দেহে সফল প্রদর্শনী। আগামী ৪-১৪ জানুয়ারী এই প্রদর্শনী দিল্লির ব্ল্যাক পার্টরীজ এবং ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর গালারীতে হবে।

সন্দীপ সরকার

সাহিত্য প্রসঙ্গ
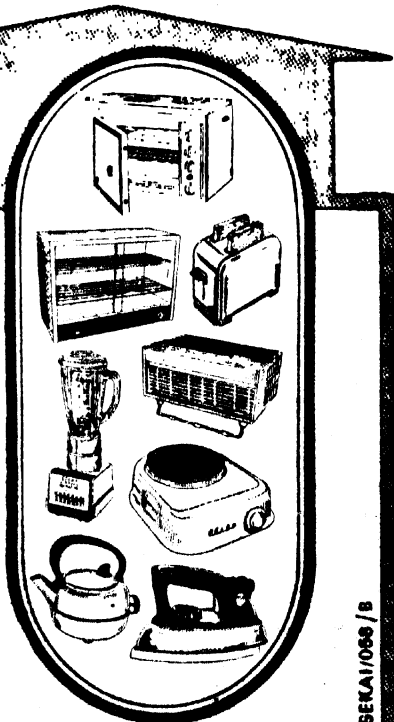
চীনের সাহিত্য-শিল্পে পালা বদল

কাগজে দেখলাম, চীনের বর্তমান কর্তাব্যক্তিরা ওখানকার চলতি সাহিত্য-শিল্পের নীতি পালটাতে চলেছেন। কথাটা এভাবে বললে হয়ত অনেকে ভুল বুঝতে পারেন; বরং বলি—উনিশ শো ষাট সাল থেকে মাও পত্নী চিয়াং চিং ও তাঁর দলবল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে যে অভিযান গড়ে তুলেছিলেন তার অন্যতম নির্দেশ ছিল—বিদেশী শিল্প সাহিত্য থেকে তফাতে থাকো। বিদেশী শিল্প সাহিত্য মানেই বুর্জোয়া সৃষ্টি। এর প্রভাব থেকে চীনের শিল্প সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্যেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হোতারা বিদেশী শিল্পকর্মকে বর্জন করতে হুকুম করেছিলেন। এখন চীনের রাজনৈতিক পট একেবারে পালটে গিয়েছে, এক সময় যাঁরা মাথার ওপর চড়ে বসেছিলেন মাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁরা চোখের পলকে পায়ের তলায় ছিটকে পড়েছেন, আর যাঁরা আমাদের কাছে প্রায় অখ্যাত অশ্রুতনাম ছিলেন এখন তাঁরাই চীনের ভাগ্যবিধাতার ভূমিকা নিয়েছেন। রাজনীতি আমার বিষয় নয়, চীনের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি আরও জটিলতম বিষয়- কাজেই ও প্রসঙ্গে আমার কিছু বলার নেই। এই সদ্য পট পরিবর্তনের ফলে চীনের সাহিত্য শিল্পেও অকস্মাৎ কিছু পালা বদল ঘটছে দেখে সে বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

পিকিং থেকে পাঠানো নাইজেল ওয়েড-এর একটি বিবরণে দেখলাম একেবারে হালে চীনের কর্তাব্যক্তিরা বিদেশী শিল্প-সাহিত্য যা কিনা মাত্র কিছুদিন আগেও বুর্জোয়া প্রভাবের বীজাণু বলে অস্পৃশ্য ও বর্জনীয় ছিল সরকারীভাবে; আচমকা সেই বুর্জোয়া শিল্প-সাহিত্যকে আবার গ্রহণের জন্যে সুপারিশ করেছেন। হয়ত সরাসরি নয়, খোলাখুলিভাবে নয়। সামান্য পরোক্ষ পথে। চীনের বিখ্যাত ও বিপ্লবী লেখক লু হাউনের স্মরণে চীনের সংবাদ সংস্থা যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, লু হাউনের মতন লেখক যখন বহু বিদেশী লেখার প্রশংসা করে গেছেন, এবং নিজে বহু বিদেশী লেখার অনুবাদও করেছেন—তখন চীনের জনগণের এইসব বিদেশী লেখার রস গ্রহণের সুযোগ পাওয়া উচিত। লু হাউনের পথই নতুন চীনের জাতীয় সংস্কৃতির পথ।

আরও একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, চিয়াং চিং গোষ্ঠী যখন হটে গিয়েছে তখন আর দুশ্চিন্তা কী, চীনের সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও সাহিত্য এবার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে। এইসব প্রবন্ধ প্রকাশ পাবার পর চীনের বহু লেখক ও শিল্পী পথে পথে চিয়াং-বিরোধী মিছিল করে বেড়াচ্ছেন।

চীনের সাহিত্য শিল্প, বিশেষত গত বিশ পঁচিশ বছরের চীনা সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের খোঁজ খবর প্রায় কিছুই নেই। কদাচিৎ একটি আধটি অনুবাদ হয়ত চোখে পড়েছে কিন্তু তাতে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় নি। শুনেছি, গত পনেরো বছর ধরে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে উগ্রপন্থী মাওবাদ প্রচার করা হত শিল্প সাহিত্যে। তার আগেও যে সরকারী নির্দেশ মেনে সাহিত্য রচনা হত না এমন নয়। তবে সম্ভবত কোনো ইতর বিশেষ ছিল। আপাতত আমরা দেখছি, চীনে শিল্পের নামে যা চলত—বর্তমান কর্তাব্যক্তিরা তা পছন্দ করছেন না। বা অন্যভাবে বলা যায়, হালে এমন একটি সুযোগ এসেছে যাকে বলা যায়—বরফ গলতে শুরু করেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার মনে পড়ছে। স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভের আমলে রাশিয়ায় যে নরম ভাব সাহিত্য-শিল্পে দেখা গিয়েছিল মাওয়ের মৃত্যুর পর চীনে কি সেই নরম ভাব দেখা দিয়েছে? এ-রকম অনুমান অসঙ্গত নয়। মাও নিজে কবি ছিলেন, তাঁর নিজস্ব সাহিত্যাদর্শ ছিল, কোনো সন্দেহ নেই তাঁর সাহিত্যানুরাগ সত্ত্বেও তিনি চীনের আধুনিককালের সাহিত্যকে এমন কিছু সম্পদ দিয়ে যান নি যাতে পরবর্তী লেখকরা বড় কিছু করতে পারেন। মাওয়ের কবিতার সারল্য, কোথাও কোথাও প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা নিশ্চয় আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু তাঁকে অন্তত ওআল্ট হুইটম্যানের সমগোত্রীয় মনে করতে পারি না। মাও-ভক্তরা অবশ্য তা করতে পারেন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

মাও এবং তাঁর পরবর্তী লেখকরা চীনের সাহিত্যকে কতটা সমৃদ্ধ করেছেন যোগ্যজনে সে আলোচনা করবেন। আমার বক্তব্য মাত্র এই যে চীনে যে-ধরনের লেখাপত্র চলছিল তার সবটাই সেখানকার লেখক কিংবা সাধারণের পছন্দ ছিল না। বহু নেতারও নয়। অর্থাৎ জাতীয় সংস্কৃতির নামে কিংবা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে মাওবাদ প্রচারের ব্যাপারটা অনেকের পছন্দ হয় নি। আজ যখন মাও বিগত, মাওয়ের পত্নী ও তাঁর সহযোগীরা ক্ষমতাচ্যুত তখন নতুন ক্ষমতাসীন দল এই যে নরম ও উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্যে অবশ্যই শুধু উদ্দেশ্য নয়, কিছু বিতৃষ্ণাও আছে গত দু যুগের সাহিত্য সম্পর্কে।

মনে রাখতে হবে, স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভ যে নরম ভাব দেখিয়েছিলেন তা সাময়িক এবং সীমাবদ্ধ ছিল। মাওয়ের মৃত্যুর পর চীনের নতুন শাসকরা যে নরম ভাব ও উদারতা দেখাচ্ছেন তা কতদিন স্থায়ী হবে কিংবা কী পরিমাণ বিদেশী সাহিত্যের রস তাঁরা সাধারণকে আস্বাদন করতে দেবেন তা এখনই অনুমান করা চলে না। তবু আপাতত যা পাওয়া যাচ্ছে তার জন্যে চীনের লেখকরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করতে পারেন।

অভিনন্দ

এমনিতে এ পোষাক আপনি রোজ পরতে পারেন কিন্তু তবুও এ পোষাক সবচেয়ে চমৎকার। সত্তর দশকের গোড়ার দিকের পোষাকের চেয়ে এখন অনেক হাল্কা রঙের পাওয়া যায়। এর স্টাইল ও লোভনীয়। আর সেলাই ও চমৎকার নতুন ঢঙের।

যেখানে পুরুষের পোষাকের কথা আসে, সেখানে রঙ আর বুনোটের পন্থা এর ছিটের কাপড় ও আপনার পছন্দ হবে ফিক ফিকে, হাল্কা হাল্কা একের সঙ্গে অন্যের ম্যাচ করা রঙ।

বিনী
সংমিশ্রিত কাপড়
হরেক মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে হরেক রকমের পোষাক

Interpub/BB/2/78 Ben

এই কলকাতায়

পর্যটন উৎসব

দার্জিলিঙে কাঞ্চনজঙ্ঘা, বীরভূমে শান্তিনিকেতন ও বিষ্ণুপুরে চোখ-জুড়ানো কিছু টেরাকোটা মন্দির মঙ্গ রাজারা বানিয়ে রেখে গেছেন বলেই দূরে দূরান্তর থেকে ভ্রমণার্থীর অভাব হয় না এই বাংলায়। এ সবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দীঘা ও বকখালির সমুদ্রতীর্থ, জলদাপাড়ার অভয়ারণ্য ও আরো কিছু দ্রষ্টব্য স্থান যার আকর্ষণে বিদেশ থেকে ছুটে আসছেন ট্যুরিস্টরা। এর থেকেই আমরা অর্জন করছি বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা। হস্ত-শিল্প ও কুটীরশিল্পের চাহিদা বেড়েছে এবং বিভিন্ন উড়োজাহাজ কোম্পানীর কোনো ফ্লাইটই প্রায় খালি আসছে না বলা যেতে পারে! দেশ ও দৃশ্য দেখার আকর্ষণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে ভালো সাড়া তো পাওয়া গেছেই, এমন কি পিছিয়ে নেই অন্যান্য রাজ্যের আগন্তুকবৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ আঠার মতো লেগে থেকে বিভিন্ন কাগজে এক একটি দ্রষ্টব্য স্থানের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, থাকা খাওয়া, কেনাকাটা ও দেখাশুনোর ব্যাপারে যাবতীয় খুঁটিনাটি তথ্য সরবরাহ করেছেন উৎসাহীদের কাছে। ছবি ও মানচিত্র সমেত একের পর এক বের করেছেন সুদৃশ্য লোভনীয় সব ফোল্ডার। এত কিছু নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাচ্ছে হাতেনাতে। যাঁরা বাড়ি থেকে দু'পা ফেলে ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু কখনো দেখতে যান না, তাঁরাই আজ বাক্স বিছানা বেঁধে, ঘুম থেকে উঠে পাড়ি দিচ্ছেন দার্জিলিঙ না হয় মাসাঞ্জোর, না হয় অন্য কোথাও। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবাধ ভ্রমণও আজ বেশ বেড়েছে। এবং মানুষের মধ্যে দেশভ্রমণেচ্ছা যে অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে পর্যটন বিভাগের কার্যকলাপ এ বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

সম্প্রতি কলকাতায় সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখ থেকে শুরু করে অক্টোবরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত তাঁরা করলেন ট্যুরিজম ফেস্টিভাল। এই ফেস্টিভালকে বাৎসরিক 'ফিচারে' পরিণত করার কথা ভাবছেন কর্তৃপক্ষ। ঠিক পুজোর মরসুমে, হেমন্ত-কালীন ছুটির অবসরে উৎসবমুখর কলকাতার রঙিন ছবি বাইরের ভ্রমণার্থীদের হৃদয়ে-মনে রঙের আবির ছড়িয়ে দেয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ বাঙালীর এই শারদ উৎসবকে চমৎকারভাবে কাজে লাগান। প্রস্তুতি হিসেবে তাঁরা ভারতের বাইরে বিভিন্ন ভারতীয় দূতাবাস, ট্রাভেল এজেন্টস, হোটেল মালিক ইত্যাদির মাধ্যমে জোর প্রচার চালান যাতে বিদেশী ট্যুরিস্টদের একটা অংশকে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গমুখী করে তোলা যায়। তাঁরা যে সফল হয়েছেন তার প্রমাণ বহু সংখ্যক দেশী ও বিদেশী ট্যুরিস্টের উপস্থিতি। এই ধরনের ফেস্টিভাল বিভিন্ন রাজ্য পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে মুসৌরি, শিলং, নৈনিতাল, কেরালা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি স্থানে হয়েছে। প্রতিটি স্থানের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তৈরী করা হয় উৎসবের কার্যসূচী। কলকাতায় 'সাইট সিইং' হিসেবে ভ্রমণার্থীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো কুমারটুলির পোটোপাড়ায়। বিদেশী দর্শকের কাছে নির্মীয়মাণ দেবীপ্রতিমা ছিল এক পরম আশ্চর্যের বিষয়। তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতে চাননি যে, এত পরিশ্রমের পর এত সুন্দর এক একটি প্রতিমা নির্মাণ করেও কেন তাকে সব মায়ামমতা ত্যাগ করে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। আরামপ্রদ ট্যুরিস্টকোচের ডানলোপিলোর গদিতে ডুবে গিয়ে জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে, কেউ বা আবার দর্শকের ভিড়ে মিশে দেখেছেন আলোর মুকুট-পরা পুজোর প্যাণ্ডেল। গঙ্গাবক্ষে লঞ্চবিহার করে দেখেছেন প্রতিমার ভাসান। আয়োজনে কোনো ত্রুটি ছিল না। ট্যুরিস্টরা চষে বেড়িয়েছেন বকচাবী গ্রাম থেকে ডায়মণ্ড-হারবার, কামারপুকুর, তারকেশ্বর। আরেকটু দূরে বিষ্ণুপুর-কংসাবতী। উৎসবের ছবি তুলতে এসেছিলেন একদল জাপানী কলা-কুশলী। একজন শিশুশিল্পী কিভাবে নাচ-গান শেখেন, তার পারিবারিক পরিবেশ কেমন, মা ও বাবার জীবিকা কি ইত্যাদি বিষয় নিয়েও তাঁরা ছোট একটি ছবি তুলে নিয়ে গেছেন। উৎসব ও শিশু শিল্পীর ছবি জাপানের বিভিন্ন শহরের টেলিভিশনে প্রদর্শিত হবে। ফেস্টিভালের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবিও তুলেছেন আমাদের কলকাতা টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ।

উৎসবে পর্যটন বিভাগের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচীর প্রথম দিনে রবীন্দ্র সদন প্রেক্ষাগৃহে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ও লোকসংগীত পরিবেশন করেন ইণ্ডিয়ান ইয়ুথ কোরাল গ্রুপ। অক্টোবরের এগার তারিখ থেকে শুরু করে পনের তারিখ পর্যন্ত চলেছিলো পুতুল খেলা, মণিপুরী নৃত্যকলা মন্দিরের রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', ইণ্ডিয়ান কালচারাল

ইনডিয়ান কালচারাল গ্রুপের "বাল্মীকি প্রতিভা" ফটো : সুধীর চ্যাটার্জী

গ্রুপের 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও নৃত্যনাট্য হারশংকরের 'কবি'। বিদেশী ও অন্যান্য রাজ্যের নবীন পর্যটকদের কাছে সমস্ত অনুষ্ঠানই ছিল আনকোরা নতুন। বিস্ময় ও ভালো-লাগার ঘোরে তাঁরা বাঙালীর অনুষ্ঠানেরই তারিফ করেছেন। এক যাত্রায় রথ দেখা ও কলা বেচার মতো তাঁরা নতুন দেশ দেখেছেন, এবং একই সঙ্গে পেয়েছেন দেশজ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। পর্যটন উৎসবের শেষ পর্বে দার্জিলিঙ ভ্রমণও

...দের কাছে উভয় দিক থেকেই আকর্ষণীয় ...ব্যঞ্জন বলে শুনেছি।

...উপস্থিত ছিলেন বিদেশিনী এক বিখ্যাত ফ্রি লান্স সাংবাদিকা। তিনি ...তার রেস্তোরায় বাংলা খাবার খেতে ...ছিলেন। কিন্তু কলকাতার সাহেবী ...রেস্তোরাগুলোয় বাংলা খাবার কি কোথাও পাওয়া যায়? সাংবাদিকার পেট ভরেছিলো শুনেছি, কিন্তু মন ভরেনি।

বরং পর্যটন বিভাগ ওবেরয় গ্র্যান্ডের বল রুমে প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকলকে বাঙালী প্রথায় মিষ্টিমুখ করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। বিশুদ্ধ বাঙালী ঘরানার পাটিসাপটা, পিঠেপুলি ও মালপোয়ার সেদিন ছিলো ব্যাপক চাহিদা। রসের জোরে ছিলো প্রকৃত রসিকজনের আমন্ত্রণ। পর্যটকরা নাচগান দেখেছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন পশ্চিম বাংলার পাহাড়ে-জঙ্গলে, খেয়েছেন মিষ্টি; অতঃপর আমরা আশা করবো প্রাণখুলে তাঁরা আমাদের সুখ্যাতি করবেন আত্মীয়কুটুম্বদের কাছে, ফলস্বরূপ মা লক্ষ্মীর কৃপায় বৎসর বৎসর আমরা পাবো উজ্জ্বল কয়েক ঝাঁক ট্যুরিস্ট।

কাঠের জেব্রা

দুর্ঘটনা মাত্রই মর্মান্তিক। প্রাণহানি হলে তো কথাই নেই। অসাবধানতা ও ভুলভ্রান্তির জন্যে ভিড়ের শহরে মানুষকে অনেক সময় দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়, হতে হয় পথের বলি। সতর্ক থাকলে হয়ত আমরা পথের বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। এই উদ্দেশ্যে অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া একটি শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন কলকাতা ময়দানে, বিড়লা তারামণ্ডলের পাশের জমিতে। পথের নিরাপত্তা বিষয়ক এই প্রদর্শনীটি আমাদের যথেষ্টই শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছে। প্রদর্শনীটির উপলক্ষ ষষ্ঠ সর্বভারতীয় পথ নিরাপত্তা কংগ্রেসের অধিবেশন, যা বহু বিদেশী প্রতিনিধির অংশ গ্রহণে আন্ত-র্জাতিক সম্মেলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রদর্শনী সফল করেছেন এ এ ই আই সম্পাদক কল্যাণ ভদ্র, শঙ্কর গুপ্ত প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী পুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রম।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কলকাতা পুলিসের প্যাভিলিয়ন। বড় বড় অক্ষরে তাঁরা পোস্টার দিয়েছেন—'পথ চলাতে সাবধান। গত বছর পথের বলি ৪১৩ জন।' ভারতের প্রধান কয়েকটি শহরের পথদুর্ঘটনার পরিসংখ্যান ও তুলনামূলক হিসাবটি আমি এই প্যাভিলিয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পোস্টার থেকে সংগ্রহ করেছি। যাঁরা এই বিষয়ে কৌতূহলী তাঁদের জন্য হুবহু পরিসংখ্যানগুলো আমি এখানে উদ্ধার করছি:

তুলনামূলক হিসাব ১৯৭৫

	মৃত্যু	আহত	দুর্ঘটনার মোট সংখ্যা
কলকাতা	৪১৩	৩,৯৩৩	১১,৪৬৮
বোম্বাই	৫৭৬	৭,৭৯০	২২,৫৩৮
দিল্লী	৫১০	২,৮৫৩	৩,৩২৮
মাদ্রাজ	২৩২	৪,০১৯	৬,৬৫২

দেখা যাচ্ছে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হার মাদ্রাজের তুলনায় কলকাতায় বেশী হলেও, অন্য দুটি শহরের তুলনায় তা কম। দুর্ঘটনার মোট সংখ্যার দিক থেকে বোম্বাইয়ের পরেই কিন্তু কলকাতার স্থান। এই সব পরিসংখ্যানের দিক থেকে কলকাতার অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনকই বলতে হবে। কিন্তু আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করলে আমরা হয়ত আরো ভালো ফল আশা করতে পারবো। যাত্রী, পথিক ও যানবাহনের চালক—সকলকেই ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করলে যেন হাতেনাতে শাস্তির ব্যবস্থা থাকে।

পথচলার নিয়মকানুন শেখানোর জন্যেই

ষষ্ঠ সর্বভারতীয় পথ নিরাপত্তা উপলক্ষে কলকাতা ময়দানে আয়োজিত প্রদর্শনীতে স্কুলের ছেলেমেয়েদের ট্রাফিক আইন শিক্ষা — ফটো: কল্যাণ সরকার

একটি অস্থায়ী স্কুল করেছেন কলকাতা পুলিস, প্রদর্শনীর খোলামেলা মাঠে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যেই এই স্কুল। বিভিন্ন স্কুল এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। জেব্রা দিয়ে রাস্তা পার হতে হয়—এটি বোঝানোর জন্যে ছিল একটি কাঠের জেব্রা। দেখতে অনেকটা জ্যান্ত শিশু জেব্রার মতোই। ছিল অজস্র সাইকেল। আর বাচ্চাদের মিনি মোটর। ছেলেরা সাইকেলে, মিনি মোটরে চেপেই শিখেছে ট্রাফিকের প্রয়োজনীয় সব নিয়ম-কানুন। ওরা এলেই হাসিখুশির হাট বসে যেতো ওখানে। ওরা হাসছে, ছুটছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, লুটোপুটি খাচ্ছে হাওয়ায় —আমরা দেখতাম।

সি এম ডি এ একটি প্যাভিলিয়ন করেছিলেন। কলকাতা করপোরেশন নিয়েছিলেন অনেকখানি জায়গা। সেখানে ছিলো এই মহানগরীর জঞ্জাল সাফ করার জন্যে নতুন যে যন্ত্রযানের মডেল তাঁরা চালু করবেন তার নমুনা, পাতাল-নর্দমার ময়লা সাফ করার উপযোগী যন্ত্র ও কেরিয়ার ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গাড়ির যে মডেল কলকাতা করপোরেশনের প্রদর্শনীতে আমরা দেখলাম সেগুলো ছিল যেমন স্মার্ট, তেমনি আধুনিক। তবে কি পথের আবর্জনা ও জঞ্জাল সাফ করার কাজে নিযুক্ত আবর্জনার চেয়েও নোংরা, লজ্‌ঝড় যে সব ডিজেল ট্রাক বিকট আওয়াজ তুলে যত্রতত্র বিচরণ করে এবং ডাস্টবীন থেকে আহৃত ময়লার অনেকটাই পথে ছড়াতে ছড়াতে অজানা গন্তব্যের দিকে ছুটে যায় তাদের দিন দ্রুত ফুরিয়ে আসছে? নিকট ভবিষ্যতে কুৎসিৎ-দর্শন ওই সব যন্ত্রদানব চিরতরে আশ্রয় নিতে চলেছে অটোমোবাইল গ্রেভইয়ার্ডে? পথ নিরাপত্তার প্রদর্শনীতে এই সুখবরটি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো।

আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের 'জেনারেল অ্যাসেম্বি' বসেছিল পার্ক হোটেলের রুদ্ধদ্বার কক্ষে। তাঁরা পথ চলা সংক্রান্ত বেশ কিছু টাটকা রেকোমেনডেশনস শোনা গেল, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছেন। বোধ হয় বিভিন্ন রাজ্য সরকারের কাছেও গেছে তার প্রতিবেদন। বিশেষজ্ঞগণ ভেবে-চিন্তে যে সব পথ বাতলেছেন, কার্যক্ষেত্রে সেগুলো গৃহীত হলে আমরা তার

উপকারিতা বুঝতে পারবো। সুতরাং এখনই এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। প্রদর্শনী থেকে নতুন মডেলের ট্রাম দেখে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন। এ বিষয়ে কিছু বলে বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করি।

ট্রাম কোম্পানি যাত্রীদের বসে যাওয়ার চেয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভ্রমণই বেশী পছন্দ করছেন মনে হল। নতুন ট্রামে বসার জায়গা ন্যূনতম। ভালো যে, বেশী সংখ্যক যাত্রী অন্তত দাঁড়িয়েও যেতে পারবেন। নতুন ট্রামের মনুষ্যবহন ক্ষমতা অনেক বেশী। মাথার উপর ফ্যানের সংখ্যাও বেড়েছে। অফিস টাইমে যাত্রীদের অবস্থা হয় কৌটোর ভিতর সার্ডিন মাছের মতো। বগির ভিতর বোধ হয় অক্সিজেনের অভাব অনুভূত হয়েছে এতদিন! নতুবা এবং নতুন ট্রামে কেন জানলাগুলো আগের তুলনায় বেশ বড় করা হয়েছে? এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় একজন বললেন—'স্ট্যাণ্ডিং লোকেরাও যাতে হাওয়া পান তাই এই ব্যবস্থা।' জানলা বুক বরাবর না পৌঁছলেও বুক পর্যন্ত পৌঁছবে! সর্ব-ব্যাপী এয়ার পলিউশন যুগে যাত্রীদের সুখসুবিধার প্রতি মনোযোগী ট্রাম কোম্পানি যে সর্বসাধারণের জন্যে এটুকুও উদারতা দেখিয়েছে তার জন্যে আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ তাঁদেরও, যাঁরা পথের নিরাপত্তার বিষয়টিকেই একমাত্র প্রাধান্য দেননি, পথ চলার আরাম ও আনন্দের প্রতিও যথাযোগ্য দৃষ্টি দিয়েছেন।

ফুলের গভীর বাণী

ডাল, লতাপাতা ও কুঁড়ি নিয়ে নানা রঙের ফুল সাজানোর যে জাপানী পদ্ধতি তা জাপানের কতটা নিজস্ব? শোনা যায়, সুদীর্ঘ তের শতাব্দী আগে আজকের জাপানী ফুলসজ্জা পদ্ধতি বা ইকেবানা জাপানে নিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় বৌদ্ধগণ। ভারতে কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম তিরোহিত হলে বৈচিত্র্যময় নানা বৌদ্ধ শিল্পও আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জাপান বিশেষ এই বৌদ্ধ শিল্পটিকে জাপানের জল হাওয়ার সঙ্গে এক করে নেয়। এখন আর ইকেবানাকে জাপানী শিল্প ছাড়া কিছুই বলা যাবে না। সম্প্রতি চৌরঙ্গীর ব্রিটিশ পেন্টস ডেকর সার্ভিস প্রদর্শনীকক্ষে কৃত্রিম ইকেবানার সৌন্দর্যের হাট বসিয়েছিলেন শ্রীমতী নোবুকো সফ্ট যিনি পাঞ্জাবী এক ডাক্তারের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে বিশ বৎসরেরও অধিক কলকাতায় আছেন এবং বাঙালীর অতি প্রিয় দুটি কাজ—খাওয়া এবং ঘুম—এ দুটি প্রতিদিন বিশ্বস্তভাবে পালন করেও, খুলতে পেরেছেন একটি ইকেবানা শেখানোর স্কুল যেখানে ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আ

সপ্তাহে, আশি টাকার বিনিময়ে আটটি বিভিন্ন ফুলসজ্জা পদ্ধতি শিখিয়েই শ্রীমতী সফট নিশ্চিন্ত থাকেন না, মনের মধ্যে সঞ্চার করেন এক সৌন্দর্যের বোধ যা দিনগত পাপক্ষয়ের জীবন ও বেঁচে থাকাকে গভীরভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত করে।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই লিখেছিলেন, গাছের ফুল ছিঁড়ে এনে ফুলদানীতে সাজালে মনে হয় পড়া না-পারা ছাত্রের মতো ওদের ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে! বাস্তবিকই ফুলদানীর নুন মেশানো জলে আমরা কোনো সমুদ্রের কলকল্লোল শুনতে পাই না! কিন্তু ইকেবানার জাতই আলাদা। তার প্রয়োজনীয়তা তো শুধু ঘর সাজানোর জন্যেই নয়, রেখা, রঙ ও ছন্দের লালিত্যের মাধ্যমে ইকেবানায় ফুটিয়ে তোলা হয় মানুষ, পৃথিবী ও স্বর্গের নানা অনুষঙ্গ। এই ইকেবানা আজ জাপানী ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত। এখানে ফুলের প্রতীকী ব্যবহার সম্পর্কে দুয়েকটি কথা বলি। অতীত বোঝাতে ইকেবানা শিল্পী ব্যবহার করেন পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত একটি রঙিন ফুল—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বোঝাতে ব্যবহৃত হয় আধ-ফোটা কুঁড়ি ও গাছের সব থেকে কম বয়সী, তাজা, কচি কুঁড়িটি। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বিষয়টি ইঙ্গিতের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই কুঁড়ির নির্বাচন। সুতরাং, দেখতে পাই প্রতীকের গভীরে না পৌঁছতে পারলে ইকেবানার পরিপূর্ণ রসগ্রহণ সম্ভব নয়। প্রতীকের এই সাবলীল ব্যবহারই এক সময়ের বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধমূর্তির বেদীর দুপাশে শোভিত 'রিক্কাকে, আজকের জনপ্রিয় ইকেবানা শিল্পে উত্তীর্ণ করেছে। আজ ইকেবানার ওপর থেকে খসে পড়েছে অপ্রয়োজনীয় ধর্মের খোলস। এমন কি পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ইকেবানা রূপান্তরিত হয়েছে মোরিবানায়। তবুও জাপানীরা তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবচরিত্রকে যতটা সম্ভব অটুট রেখেই ইকেবানার চর্চায় এখনো একনিষ্ঠ।

শ্রীমতী নোবুকো সফটের বর্তমান প্রদর্শনীতে কিন্তু আসল ডালপালার পাশাপাশি প্রযুক্ত হয়েছিল সিল্কের ফুল ও লতাপাতা। সিল্কের তৈরী ফুল, কিন্তু তা এমনই সুন্দর ও স্বাভাবিক যে দেখে সত্যিকারের ফুল বলেই আমাদের ভ্রম হয়েছিল। শ্রীমতী সফটের অবলম্বন ছিল বাংলার আটপৌরে মনমাতানো সব ফুল। জাপানী শিল্প, কিন্তু তাকে তিনি দিয়েছেন বাঙালী ঘরানার শীলমোহর। গত বছর আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে শ্রীমতী সফট, শ্রীমতী কাজুকো নিগামের ইকেবানার পাশাপাশি পেয়েছিলাম নমিতা

শ্রীমতী নোবুকো সফটের 'রিবন ফ্লাওয়ার' প্রদর্শনীর প্রথম দিন

ভট্টাচার্য প্রমুখ কিছু বাঙালী ও ভারতীয় রমণীর কাজ। কিন্তু কোন্‌টা ভারতীয়, কোন্‌টা জাপানী আলাদা করে বোঝার উপায় ছিল না। এবার শ্রীমতী সফটের ছাত্রীদের কাজগুলোও বেশ উতরেছিল। কিন্তু শ্রীমতী সফট বাজিমাত করেছিলেন 'আশা' নামে একটি ইকেবানা দিয়ে। শুকনো, তীক্ষ্ণ মুখ বাবলা কাঁটার উপর তিনি বসিয়েছিলেন গোলাপী, ডাগর চোখের মতো সুন্দর লিলিফুল। বাস্তব জীবন আমাদের যথার্থই কণ্টকিত কিন্তু তবুও আশা আছে, আছে বিশ্বাস, যা কাঁটার বুকে ফুলের মতো ফুটে ওঠে। আমাদের নিরানন্দ জীবনে এই আশার মূল্য অনেক। বারবার আশাহত হয়েও কিছু একটা আশাকে অবলম্বন করেই আমরা বেঁচে থাকি। শ্রীমতী সফটের রচনা আমাদের এই গভীর সত্যের কথাই জানিয়ে দিয়েছে। শিল্পহীন, বিবর্ণ ধূসর দৈনন্দিন জীবনে যথার্থই এই শিল্পের প্রহারের প্রয়োজন ছিলো।

শান-বাঁধানো শহর কলকাতায় পুষ্প-প্রেমিকের সংখ্যা এখনো নেহাৎ কম নয়। এই শহরে আছে বেশ কয়েকটি ফুলের দোকান ও নার্সারী। গড়িয়াহাটের মোড়ে কিংবা দেশপ্রিয় পার্কের কোণায় এক ফুটপাতে জলের দামে বিক্রী হয় নানা জাতের, নানা রঙের মরসুমী ফুল। বিবাহ বাসরে, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর পদতলে নিবেদিত হতে, কিংবা মৃতের খাট সাজাতে এই ফুলের সবটাই নিশ্চয় খরচ হয়ে যায় না। প্রতিকৃতির মালা হয়ে অবশেষে শুকিয়ে যাওয়ার জন্যেও নিশ্চয় এত ফুলের দরকার হয় না। প্রিয় নেতাদের বরণ করার জন্যেও অল্প ফুলের প্রয়োজন। সুতরাং অবশিষ্ট ফুল দিয়ে আমরা ইকেবানা না পারি, অন্তত কিছু একটা যেন করি যা আমাদের মনন, রুচি ও সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে।

এই শহরের রুচির আবহাওয়া ইতিমধ্যেই কিছুটা বদলাতে শুরু করেছে। এসপ্লানেডে পাবলিক ইউরিনালের পাশেই ছবির মতো সুন্দর একটি বাড়ি ইদানীং দেখা যাচ্ছে। সেখানে হবে অর্কিডের প্রদর্শনী এবং বিক্রয়। এই শহরে এখনো প্রথম আষাঢ়ে কদম ফুল ফোটে, দাবদাহ উপেক্ষা করে ফোটে কৃষ্ণচূড়া ও আরো অনেক ফুল, যা দেখছে ভালোবাসতে এখনো রসিক প্রেমিক মানুষের অভাব হয় না। শ্রীমতী সফটের প্রদর্শনী দেখতেও বেশ ভিড় হয়েছিল। দর্শকের অনুরোধে বাড়ানো হয়েছিল প্রদর্শনীর দিন। কলকাতার জাপানী কনসাল জেনারেল শ্রী এইচ টাকাসু স্বয়ং প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে পুষ্পপ্রেমিকদের উৎসাহ বর্ধিত করেছিলেন। প্রদর্শনী যতদিন চলেছিল শ্রীমতী সফটের পাশে ছিলেন তাঁর ছাত্রীরা, যাঁরা ফুলের মতো সুন্দর। ফুলের মতোই রঙিন। ভালো লাগল তাঁদের উৎসাহ ও প্রাণ চাঞ্চল্য। ভালো লাগবে, আরো ভালো লাগবে যদি তাঁরা ফুলের গভীর বাণী কলকাতার পাড়ায় পাড়ায়, নিষ্প্রভ রঙহীন অলিগলির নিরালা কোণে ছড়িয়ে দিতে পারেন।
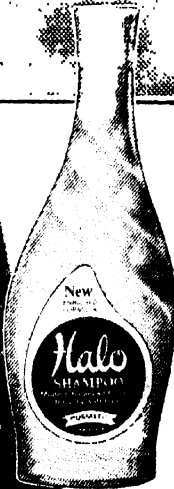
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

গল্পটা মুখে মুখে অনেক দূরে ছড়িয়েছে। কার লেখা এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু আমার ধারণা আপনারা সবাই পড়েছেন কিংবা শুনেছেন লটারী নিয়ে বিখ্যাত সেই গল্পটি। যাঁরা পড়েননি বা শোনেননি তাঁদের জন্যে গল্পটি সংক্ষেপে নিবেদন করছি। হার্টের রুগী জনৈক ভদ্রলোক কোনো এক লটারী খেলায় লক্ষাধিক টাকার প্রথম পুরস্কার বিজয়ী হয়েছিলেন। ভদ্রলোকের বাড়িতে অচিরেই যখন এই সুখবর এসে পৌঁছল সবাই তো ভেবে অস্থির কী করে খবরটা তাঁকে দেওয়া যায়! উনি পুরনো রুগী, বহুদিন ধরেই ভুগছেন হার্টের অসুখে—পুরস্কারপ্রাপ্তির উত্তেজনায় কিংবা আনন্দে হঠাৎ যদি হার্ট ফেল করেন! শেষে পরামর্শ করে ঠিক করা হলো গৃহ চিকিৎসক কায়দা করে, সুযোগ-মতো কথাটা তাঁকে জানিয়ে দেবেন। আচমকা খবরটা জানালে তাঁর প্রতিক্রিয়া খারাপ হতে পারে ভেবেই এমনটি ঠিক করা হলো। গৃহ চিকিৎসক তাঁর রুটিন ভিজিটে গিয়ে এ-কথা সে-কথার পর গল্পচ্ছলে আসল কথাটির অবতারণা করলেন। ভদ্রলোকের খোশ মেজাজ দেখে চিকিৎসক বলে বসলেন—ধরুন যদি লটারীতে আপনি লখ টাকা পান। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ভদ্রলোক হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—সব টাকাটাই আপনাকে দিয়ে দেবো! সত্যনিষ্ঠ এই ভদ্রলোকের কথার কোনো খেলাপ হয় না, চিকিৎসক জানেন। হার্টের রুগীর কথা শুনে ডাক্তারই শেষে হার্ট ফেল করলেন!

মুখে মুখে এই গল্পটি ছড়িয়ে গিয়ে মূল গল্পের থেকে সরে গিয়ে হয়ত অন্য বাঁক নিয়েছে। কিন্তু আসল প্লটের কোনো বিকৃতি হয়নি। এমনই লটারী খেলা! অদম্য এর আকর্ষণ! রগরগে উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য। আনন্দের পাশে হতাশা। হতাশার সঙ্গে সঙ্গে আবার নতুন করে বুক বেঁধে টিকিট কেনার উদ্যম! গোয়েন্দা গল্পের মতো পাতায় পাতায় চমক আর শেষ পরিণতির জন্য রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর ৯০তম খেলায় গণেশ অ্যাভেনুর লটারী কক্ষে ২৩শে অক্টোবর এক সুন্দর অপরাহ্ণে দেখলাম এমনই উত্তেজনা আর রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। ছোট ঘরটিতে তিল ধারণের স্থান নেই। ক্রেতার ভাগই এজেন্ট আর টিকিট সেলারদের ভিড়। খাতা কলম নিয়ে বসে পড়েছেন সবাই। এক-একটা ফল ঘোষণা হচ্ছে আর তাঁরা চটপট লিখে নিচ্ছেন খাতায়। কানে আসছে নানা মন্তব্য টিপ্পনী, হা-হুতাশ আর আনন্দের চাপা কলরোল। দেখে ভালো লাগল যে এতগুলো মানুষ অন্তত শেষ পর্যন্ত এই একটি কাজ খুঁজে পেয়েছেন, যা তাঁদের সম্পূর্ণভাবে মানবজীবনের

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর ৮৯তম খেলায় 'লাকি' নম্বর তুলছেন ভারত-সুন্দরী নাফিসা আলী

চিরন্তন কিছু সুখ-দুঃখ-আনন্দের অনুভূতির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধতে পেরেছে, কিংবা হয়ত শুধু বাঁধতেই পারেনি, সম্পূর্ণ নিমগ্ন রেখেছে তাঁদের কাজের মুহূর্তগুলোকে। লটারী তাঁদের ধ্যানজ্ঞান, লটারী তাঁদের স্বপ্ন, আবার লটারীর দৌলতেই তাঁদের দরজায় বাঁধা হাতি! রাজ্য লটারীর তরুণ ডাইরেকটর, সদা কর্মতৎপর শ্রীশুভ্রাংশু ঘোষ জানালেন, লটারীর টিকিট বিক্রী করেই এই রাজ্যে কম করে দু হাজার পরিবার প্রতিপালিত হয়। রুজি রোজগার অন্য কোনো উপায় এই এতগুলো পরিবার খুঁজে পাননি।

কথাটা যে সেণ্ট-পার্সেণ্ট সত্যি, বুঝলাম নদীয়ার কাগলাচণ্ডী থেকে আসা এক এজেন্টের সংগে কথা বলে। তাঁর জীবিকার সমস্যা সমাধান করেছে লটারী। গ্রাম বাংলার দূরে দূরে অঞ্চল থেকে ছুটে আসা আগ্রহী আরো কিছু এজেন্টের সংগে সেদিন কথা বললাম। সকলের কাছ থেকেই পাওয়া গেল একই উত্তর—লটারী না থাকলে এত দিনে মরে ভূত হয়ে যেতাম! অতঃপর, লটারী কি জুয়া খেলা, অথবা অনৈতিক প্রলোভনের জাল বিস্তার করে কিনা—এসব শৌখীন প্রশ্ন অর্থহীন ও অবান্তর মনে হল আমার কাছে। অর্থনৈতিক সংগ্রামের

হাতিয়ার আজ লটারী। ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে প্রথম খেলা শুরু হওয়ার পর, হঠাৎ যখন ১৯৭২-এ ভালো রকমের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলো পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী, তখনো এই বৃহত্তর অর্থনৈতিক মঙ্গলের কথা ভেবেই নতুন করে এমনভাবে বিভাগটিকে ঢেলে সাজানো হলো, সংশোধন করে নেওয়া হলো অতীতের সব ভুলত্রুটি যে আজ ১৯৭৬-এর মার্চ মাসের মধ্যেই তহবিলে জমা পড়েছে ৩৫ লক্ষ টাকার লাভের অঙ্ক। শুভ্রাংশুবাবুর ধারণা, এই অঙ্ক বর্ধিত হয়ে এবার দাঁড়াবে ৫৫ লক্ষ টাকায়। পরিকল্পনা খাতে পশ্চিমবঙ্গের মোট বার্ষিক ব্যয়ের তুলনায় এই অঙ্ক হয়ত কিছুই নয়। কিন্তু ভালো কথা যে, সব টাকাটাই যাবে উন্নয়নখাতে। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারীর মতো ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজ্যে আর সাপ্তাহিক খেলা নেই। সেদিন ৯০তম খেলার পর, হাতে গুণে এবং সাদা কাগজে কলমে নব্বই জন লাখপতির হিসেব আমরা পাচ্ছি। কোনো কোনো রাজ্যে বিরাট অঙ্কের প্রথম পুরস্কারের ঘোষণা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের এই রাজ্য কখনোই খুব বেশী টাকা একজনের হাতে তুলে দেবার পক্ষপাতী নন। তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়। এক-একটি খেলায় বেশ কিছু লোক পুরস্কার পান। ফলে রাজ্য লটারীর জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছে। বাড়ছে সব শ্রেণীর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল অংশ গ্রহণ।

খেলাও হয় সকলের চোখের সামনে। কবি, অধ্যাপক, সাংবাদিক, খেলোয়াড়, শিল্পী, গাইয়ে, চিত্র-পরিচালক প্রভৃতি মান্যগণ্য মানুষদের নির্বাচন করা হয় বিচারক হিসেবে। ৮৯তম খেলায় মহাজাতি সদনে অন্যতম বিচারক হয়ে এসেছিলেন ভারত-সুন্দরী এবং বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় তৃতীয় কলকাতার নাফিসা আলী। জানি না বিধ্বস্ত আশাবাদী মানুষের চোখ সেদিন কেড়ে নিয়েছিল পুরস্কার ঘোষণার বোর্ড না শ্রীমতী আলীর ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস! পুজোর পরে বিজয়া সম্মিলনীর মতো আন্তরিক ও ঘরোয়া ছিলো এই অনুষ্ঠানটি। নাম দেওয়া হয়েছিল 'উৎসবের উপহার'। রাজ্য লটারী কর্তৃপক্ষ সেদিন তাঁদের এজেন্ট, সেলার ও শুভানুধ্যায়ীদের আপ্যায়ন করেছিলেন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, যেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ বাংলার সংগীত জগতের সুর্য-তারকারা! লটারীকে এর পর আর ভাগ্য পরীক্ষার রসকষহীন নিছক একটি উপায় বলা যাবে না, কর্তৃপক্ষ তাকে বাংলার বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে মেলাতে চাইছেন!

অনেক চেষ্টা করেও পুরস্কার প্রাপকদের কারো সঙ্গেই আমি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারিনি। পুরস্কারের অর্থে তাঁদের জীবনধারা কতটুকু বদলায় জানার ইচ্ছে ছিল, ইচ্ছে ছিলো জানার হঠাৎ-পাওয়া এই অর্থে কোনো ব্যর্থ পিতা তাঁর আদরের মেয়েটিকে আরেকটি সুখী সংসারে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন কিনা, কিংবা তুলতে পেরেছেন কিনা ছোট্ট একটি বাড়ি, সুখে-শান্তিতে যেখানে কাটিয়ে দেবেন তিনি তাঁর অবশিষ্ট জীবন। মোটর গ্যারাজে কর্মরত এক ক্লিনারের কথা আমাকে বলেছেন শুভ্রাংশুবাবু, যে-যুবক কখনোই আশা করেনি যে লটারীর প্রথম পুরস্কার পাবে। যে-টিকিটে তার পুরস্কার উঠেছিল সেটি ছিল জামার পকেটে এবং ... ধোপাবাড়ি থেকে ফিরে এসে শতছিন্ন ... কাগজের টুকরোতে পরিণত হয়। টিকিটের নম্বরটি কোনো রকমে উদ্ধার ... গিয়েছিল এবং ফরেনসিক পরীক্ষায় কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হয়েছিলেন যে সেটি সাচ্চা! তারপর তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিতে আর কোনো বাধা থাকেনি। পুরস্কার পাওয়ার পর চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সে জানিয়েছিল তার বাসনার কথা। প্রিয় ছোট বোনটিকে সে সুপাত্রস্থ করবে, এবং তুলবে একটি ছোট বাড়ি—সাদাসিধে, ছোট্ট এই ছিলো তার বাসনা! ছেলেটি কি তার ইচ্ছে পূরণ করতে পেরেছে? জানি না। কিন্তু ভেবেছি ঠিকানা যোগাড় করে আমি নিজেই একদিন ঘুরে আসব তার সোনার সংসার আর দেখে আসব দু' চোখ ভরা আনন্দের জল!

আনন্দের কথায় মনে পড়ল পাগলা-চণ্ডীর সেই এজেন্টের কথা। সেদিন তার বিক্রী করা টিকিটের মধ্যে একটিই ভাগ্যে উঠল একশ টাকার পুরস্কার। নাই বা হলো লাখ টাকা, কিন্তু তাতেই উনি খুশী। সুখী, খদ্দেরের সুখে।

গোয়েন্দা গল্পে অজস্র অমর সত্যান্বেষীর কানের পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে যাওয়ার কথা পড়েছিলাম। সেদিন শুনলাম কানের পাশ দিয়ে লটারীর টিকিট বেরিয়ে যাওয়ার আক্ষেপ। ২০০৪৮ এই নম্বরের একটি টিকিট সেদিন পুরস্কার পেল। আমার আসনের পিছন থেকেই ভেসে এলো চুল-ছেঁড়া আক্ষেপের ধ্বনি! আঃ—উঃ—ঈস্! অল্পের জন্য বেরিয়ে গেল! মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম জগদ্দলের এজেন্ট প্রৌঢ় অবসন্ন মানুষটিকে। আমার দিকে হাত উঁচু করে টিকিটটা দেখিয়ে বললেন—আমি এটাকে ধরে রেখেছিলাম। দেখুন এই টিকিটটাকে—২০৪৮৮। মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে করছিল এই নম্বরটা। বিক্রী করিনি কাউকে। দেখলেন তো অল্পের জন্যে বেরিয়ে গেল! এই মানুষটিকে আমি কী সান্ত্বনা দেবো? পুরস্কারপ্রাপ্ত টিকিটগুলোয় সেদিন ৪ (চার) এই নম্বরটা বার বার ঘুরে আসছিল। ঘোষক বলছিলেন ফোর—ফোর এগেইন। কে যেন বলে উঠলেন, 'চারটা বড় মারছে! কি ব্যাপার, বলুন তো?'

ব্যাপার কিছুই নয়! এরই নাম লটারী খেলা। নম্বরগুলো বাক্সের মধ্যে ঘুরছে। ঘুরে ঘুরে এক একটা নম্বর উঠে আসছে। সেই সঙ্গে ঘুরছে মানুষের ভাগ্য। আসন্ন শীতের বিকেল সেদিন দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। আগের দিন ছিলো কালীপুজো। এই শান্ত উৎসবের পটকার স্টক যে অনিঃশেষ ও বিপুল আমাদের তা বিলক্ষণ জানিয়ে যাচ্ছিল বাইরে থেকে ভেসে-আসা সঘন শব্দ। এরই মধ্যে ডাইরেকটারের জলদগম্ভীর ঘোষণা—খেলা শেষ হলো, আমাদেরও এবারের খেলা শেষ হলো।

যাঁরা নোট নিচ্ছিলেন তাঁরা তাঁদের ঝরনা-কলম বন্ধ করলেন।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আলোচনা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনস্টিটিউট প্রসঙ্গে

২৮।৮।৭৬, ২৫।৯।৭৬ ও ৬।১১।৭৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকার সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল সায়েন্সেস সম্পর্কে আলোচনাগুলি পড়ে এবং এই ইনস্টিটিউট সম্বন্ধে আমাদের যা জানা আছে, তাই থেকে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে যে, ইনস্টিটিউটটির পরিচালনায় প্রচুর গলদ আছে এবং এর মধ্য দিয়ে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর চেয়ে অসম্মানই দেখানো হচ্ছে বেশী।

২৮।৮।৭৬ ও ২৫।৯।৭৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকার 'বিশ্ববিজ্ঞানে' এই ইনস্টিটিউট সম্পর্কে যে-সব গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছিল, ইনস্টিটিউটটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ মহাদেব দত্ত ৬ই নভেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আলোচনায় সেগুলির বেশীর ভাগের পাশ কাটিয়ে গেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, প্রতিষ্ঠানটির বুলেটিনে প্রকাশিত শিক্ষক-তালিকা ও গবেষণা পত্র-তালিকায় যে অসত্যের পরিচয় রয়েছে, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-তালিকায় এমন বিজ্ঞানীর নাম রয়েছে, যিনি সেখানে শিক্ষকতা করা সম্বন্ধে সম্মতি পর্যন্ত জানান নি।

উক্ত ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় পরিকল্পনার অভাব রয়েছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডঃ বিমল মিত্রের এই বক্তব্যের উত্তরে ডঃ দত্ত 'ধান ভানতে শিবের গীত' গেয়েছেন—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচিত হয়েছিল, তা তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির জন্য স্থান, অর্থ, যন্ত্রপাতি, শিক্ষক ইত্যাদি সম্পর্কে কী পরিকল্পনা হয়েছিল, তা তিনি কিছুই জানান নি। কোন পরিকল্পনা হয়ে থাকলে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার দু বছর পরেও কেন এটি বিজ্ঞান কলেজের একটিমাত্র ঘরে সীমাবদ্ধ রয়েছে? ইনস্টিটিউটটির কোন গবেষণাগার নেই কেন? প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব পুরো সময়ের (full time) শিক্ষকমণ্ডলীই বা নেই কেন?

এই ইনস্টিটিউটের কাজকর্মের ধারা দেখে পদার্থবিদ্যা বিভাগের পালিত অধ্যাপক ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ডঃ চঞ্চলকুমার মজুমদার ইনস্টিটিউটটির সংগে তাঁর সব সংস্রব সম্প্রতি ত্যাগ করেছেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডঃ মহাদেব দত্তের কাজকর্মের ধারা সম্বন্ধে একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের ৮০তম জন্মবার্ষিকী পালন ও 'বসু সংখ্যায়ন'-এর ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে লোকাল কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক (ডঃ দত্ত 'দেশে' প্রকাশিত তাঁর আলোচনায় অবশ্য নিজেকে এই কমিটির 'সম্পাদক' বলে দাবী করেছেন) হিসাবে ডঃ দত্তের উপর এর কাজকর্মের অনেকখানি দায়িত্ব দেওয়া আছে। এই কমিটির পক্ষ থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের একটি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করবার যে সিদ্ধান্ত হয়, সে বিষয়ে কাজ যৎসামান্যই এগিয়েছে—শ্রীসমরজিৎ কর ২৫।৯।৭৬ তারিখের 'দেশে' এ-বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। আমরা আরও জানাচ্ছি যে, সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় যে প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন, সেগুলির একটি সংকলন প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লোকাল কমিটিতে। তারপর দু বছরের মত সময় পার হয়ে গেলেও এই সামান্য

কাজটি এখনো করা হয় নি। বস্তুত প্রায় বছরখানেক হল লোকাল কমিটির কোন সভাই ডাকা হয় নি।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ইন্‌স্টিট্যুটের কোর্সের পাঠ্যসূচী সম্বন্ধে ডঃ দত্ত অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু এই সত্য কথাটা বলেন নি যে, ঐ পাঠ্যসূচী অনেকাংশেই লোক-দেখানো, গত ২ বছরের প্রতি বছরই পাঠ্যসূচীর বহু অংশ ছাত্রদের পড়ানো হয় নি। এই কোর্সের পরীক্ষা সম্বন্ধে এটুকু আপাতত বলা যেতে পারে যে, গত জুন মাসে যে পরীক্ষা হবার কথা ছিল, তা আজ পর্যন্ত নেওয়া হয় নি।

ডঃ দত্ত তাঁর আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে নিজের কথা অনেক বলেছেন, কিন্তু এ কথাটা বলেন নি যে, তিনি এবং আর একজন অধ্যাপক যখন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফলিত গণিতে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্রটি (Centre of Advanced studies in Applied Mathematics) দেখাশোনা করছিলেন, তখন তাঁর কাজকর্ম এমনই হয়েছিল যে, তা পর্যালোচনা করে বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ঐ কেন্দ্র থেকে তাঁদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিয়ে-ছিলেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের নামে নতুন ইনস্টিট্যুট প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন এবং ১৯৭৪ সালের ২২শে জানু-য়ারী একটি প্রকাশ্য সভায় তাঁর এই মত প্রকাশ করেছিলেন। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ডঃ বিমল মিত্রের এই বক্তব্যের যথাযথ প্রতিবাদ করতে না পেরে ডঃ দত্ত জানাচ্ছেন, ২২শে জানুয়ারী সত্যেন্দ্রনাথ নতুন নতুন ইন্‌স্টিট্যুট প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও ২ দিন পরে ২৪শে জানুয়ারী ডঃ দত্তের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনায় তাঁর নিজের নামে ইন্‌স্টিট্যুট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন ও আশী-র্বাদ জানিয়েছিলেন। এই রকম ব্যক্তিগত আলোচনার সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয় (বিশেষত, আচার্যদেব যখন আর ইহলোকে নেই), তবে সত্যেন্দ্রনাথের মত মহৎ চরিত্রের মানুষ তাঁর নিজের নামে ইন্‌স্টিট্যুট হবে শুনে তাঁর মাত্র ২ দিন আগেকার অভিমত পাল্টে ফেললেন, এ ধরনের কথা বিশ্বাস করা খুবই শক্ত। ডঃ দত্ত কি ভেবে দেখে-ছেন, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের নামকে একস-প্লয়েট করতে গিয়ে তিনি আচার্যদেবের স্মৃতিকে কতখানি অসম্মান দেখাচ্ছেন?

ডঃ বিনায়ক দত্ত রায়
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর,
সাহা ইনস্টিট্যুট অব
নিউক্লিয়ার ফিজিক্স

ডঃ জয়ন্ত বসু
রীডার, সাহা ইনস্টিট্যুট
অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
কলিকাতা-৭০০০০৯
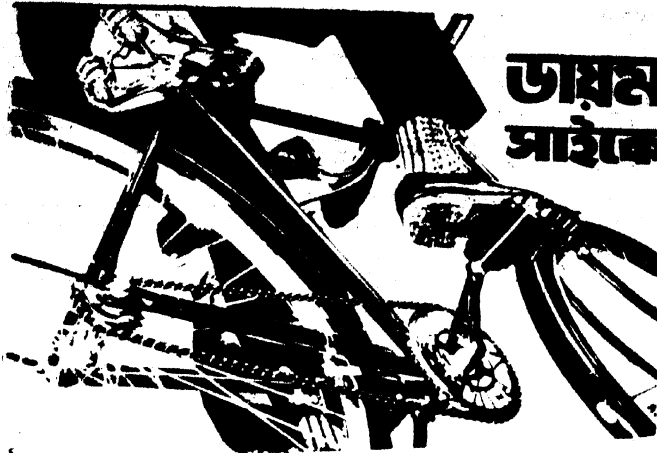
ইন্দ্রনাথ এবং একটি দালাল

বীরেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় 'পাশ কাটিয়ে গেছি, সৎসাহস নেই' ইত্যাদি বলে আমাকে আক্রমণ করে লিখেছেন—আমার বইয়ের ঘটনাপঞ্জীতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দকে আদমপুর ক্লাবে শরৎচন্দ্রের অভিনয়-বৎসর বলে আমি ভয়ংকর ভুল করেছি।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—আমার 'শরৎচন্দ্র' ১ম খণ্ড ১ম সংস্করণ একটি ৫০০ পাতার বই। এই বইয়ের সব শেষে পাঠক-পাঠিকাদের এক নজরে দেখার জন্য শরৎচন্দ্রের জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী দিয়েছি। এতে সব বছরও নয়, কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বছর নিয়ে দেখিয়েছি, সেই সেই বছরে তিনি কি কি করেছিলেন বা কিভাবে কাটিয়েছিলেন। এইভাবে ১৮৯৬ সালটা নিয়ে এর পাশে লিখেছি—মামার বাড়ি ছেড়ে পিতার সহিত খঞ্জরপুর পল্লীতে বাস, অর্থাভাবে পড়াশুনা ত্যাগ ইত্যাদি। এই ১৮৯৬-এর পরেই ১৯০০ সাল নিয়ে লিখি—খেলাধুলো, সাহিত্যচর্চা, আদমপুর ক্লাবে অভিনয় ইত্যাদি।

১৯০০ সালের সঙ্গে এই অতি সংক্ষিপ্ত লেখাটায় দেখাতে চেয়েছি, এই সালটা শরৎচন্দ্রের কিভাবে কেটেছিল। এই সালে খেলাধুলো ও অভিনয়ের কথা বলেছি বলে, এর আগে বা পরে শরৎচন্দ্র খেলাধুলো ও অভিনয় করেন নি, এমন কথা আমি কখনো বলিনি। আমার লেখা থেকে তা বোঝায়ও না।

তা ছাড়া আমি তো আমার বই-এর প্রথম দিকে একটা পৃথক অধ্যায়ে যেমন শরৎচন্দ্রের 'ছেলেবেলার খেলাধুলো' প্রভৃতি লিখেছি, তেমনি 'সতীশদের বাড়িতে' এবং 'অভিনয় ও গানবাজনা' নামে দুটি পৃথক অধ্যায়ও লিখেছি। শরৎচন্দ্রের খঞ্জরপুরের প্রতিবেশী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে বলেছিলেন—আমি বলছি, ১৮৯৭ সালের কথা, শরৎচন্দ্র তখন দিনের অধিকাংশ সময় কাটান কুমার সতীশদের বাড়িতে এবং আদমপুর ক্লাবে অভিনয় করে ক্লাবের সুনাম বর্ধিত করেন—এই ১৮৯৭ সালের উল্লেখ সহই 'সতীশদের বাড়িতে' অধ্যায়ে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন নাটকে অভিনয়ের কথা বলেছি। শুধু এই নয়, ঐ অধ্যায়ে এও বলেছি, শরৎচন্দ্র মা'র মৃত্যুর আগে (১৮৯৫-এর নভেম্বর) মামার বাড়িতে থাকার সময়ও, মাতামহদের নিষেধ সত্ত্বেও সতীশচন্দ্রের আদমপুর ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন অর্থাৎ অভিনয়ও করতেন।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে লিখেছেন—আমি বলিতেছি ১৮৯৭ সালের কথা—বীরেনবাবু এইটাকে নিয়ে বলেছেন—১৮৯৭ যতীনবাবু সূক্ষ্ম অর্থে প্রয়োগ করেন নি—১৮৯৬-৯৭-এর কথাই স্থূল অর্থে বলেছেন।

স্থূল অর্থে বললে যতীনবাবু নিজেই তো বলতে পারতেন, আমি বলছি ১৮৯৬-৯৭-এর কথা। আর বীরেনবাবু নিজের সুবিধার জন্য স্থূল অর্থে বলে ১৮৯৬-৯৭ যেমন করছেন, তেমনি একে ১৮৯৭-৯৮ও তো করা যায়। আসলে স্থূল-টুল আদৌ নয়, যতীনবাবু পরিষ্কারই বলেছেন—আমি বলিতেছি ১৮৯৭-এর কথা।—আর এই বলা মানে ১লা জানুয়ারির অন্তত কিছু দিন পরেরই কথা।

বীরেনবাবু লিখেছেন—হরিদবাবুর 'কে জানে' শব্দের অর্থ না বুঝে আমি খাপ্পা

হয়েছি। —বীরেনবাবু তাঁর লেখায় অযথা আমার বিরুদ্ধে খাপ্পা, উষ্মা প্রভৃতি শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করেছেন।

আমি লিখেছিলাম শরৎচন্দ্র নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন ১৯০১-এর জুলাই মাস নাগাদ। রাজু ১৮৯৭-এর ১লা জানুয়ারি নিরুদ্দেশ হলে দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পরে শরৎচন্দ্র 'আকৈশোরের সুহৃদে'র সন্ধানে বেরিয়েছিলেন এটা মনে হয় না। বরং মাখনবাবুর কথাটা সত্য বলে মেনে নিলে এটাই স্বাভাবিক হয় যে, রাজুর নিরুদ্দেশের অল্প দিন পরেই শরৎচন্দ্র বন্ধুর সন্ধানে বেরিয়েছিলেন।

বীরেনবাবু 'কে জানে'র অর্থ নিয়ে আমাকে উপদেশ দিয়েছেন, অথচ আমার এই যুক্তিসহ, মনে হয় না, বরং স্বাভাবিক হয়, এ কথাগুলোর অর্থ বুঝলেন না। উল্টে বিকৃত ব্যাখ্যা করে ব্যঙ্গ করলেন।

বারিদবাবু লিখেছিলেন—রাজুর বাবা তাঁর সাত ছেলের জন্য সাতটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন। উইলের সময় রাজু না থাকায়, তার ছ' ভাই ছ'টি বাড়ি এবং তার মা একটি বাড়ি পায়।

বারিদবাবু রাজুকে বাড়ি দেওয়া হয়নি বলেও তাঁর প্রবন্ধে একটা বাড়ির ছবি ছেপে বলেন, এটা রাজুর বাড়ি।

এইটাতেই আমি বলেছিলাম, রাজুকে যখন বাড়িই দেওয়া হল না, তখন আবার তার বাড়ি আসে কোথা থেকে? এটা তার এক দাদার বাড়ি।

বীরেনবাবু এখন বলছেন—উইলে রাজুকে বাড়ি দেওয়া হয়নি বলেও বারিদবাবু বাড়ির ছবি ছেপে এবং সেটিকে রাজুর বাড়ি বলে কোন ভুল করেন নি। কারণ, ঐ বাড়ি রাজুর পৈতৃক। ভাল কথা, ওটা রাজুর পৈতৃক হলে তার দাদারও তো পৈতৃক! অতএব পৈতৃক বাড়িকে রাজুর বাড়ি বললে যখন দোষ হয় না, তখন রাজুর দাদার বাড়ি বললেই বা দোষ হবে কেন? তা ছাড়া, পৈতৃক হলেও ঐ বাড়ি তো রাজু পায়ই নি, সে পেয়েছিল শুধু জমি। বরং ঐ বাড়ি পায় তার এক দাদাই। আর ঐ দাদা হলেন সুরেন মজুমদার।

এটা ঠিক যে, রাজু নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে তার মা, দাদা প্রভৃতিকে কখনই বলে যায় নি, আমি সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছি। এইজন্যই আমি লিখেছিলাম, সঠিক না জেনেও যখন দলিলে লেখা হল 'সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনার্থে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে', তেমনি অনেক দিন পরে দলিল করতে গিয়ে দলিলে একটা আনুমানিক তারিখ দেওয়াও আশ্চর্য নয়। বিশেষত এতে যখন কারও কোন ক্ষতি হবে না।

রাজু যে প্রকৃতির মানুষ ছিল অর্থাৎ জেলেদের মাছ চুরি, বড়লোকের বাগানের ফল চুরি, মিষ্টির দোকানের মিষ্টি চুরি, সাহেব ও পুলিসকে ঠ্যাঙানো, দুর্ধর্ষ ডাকাতদের ক্ষ্যাপানো ও তাদের ক্ষতি করা, সাপ নিয়ে খেলা করা প্রভৃতি কাজের জন্য সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত রাজুর দাদারাও নিশ্চয়ই জানতেন ঐ ডানপিটে হয়তো বেঁচে আছে, হয়তো নেই। কারণ, শুধু মাছ চুরির ব্যাপারেই রাজুর নিজের কথাতেই বলি, 'জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির খায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।'

আমি যেটাকে কেবল দলিলে নির্দোষ আনুমানিক তারিখ বসানো বলেছি, বীরেনবাবু সেটাকে বড় করে তুলে ধরে অকারণ যে মিথ্যাচার মিথ্যাচার করছেন, এখন বলুন তো, রাজুর সঠিক হদিস না

জেনেও সন্ন্যাসী হতে গেছে বলাটাই কি সত্যাচার হয়েছে? সত্যিকারের সত্যাচার হত, যদি দলিলে লেখা হত, রাজুর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

গোপালচন্দ্র রায়
কলকাতা-৭০০০১২

মহালয়া

সর্বত্র এত বিরূপ সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পড়ার পর শ্রদ্ধেয় শাঙ্গর্দেব মহাশয়ের আলোচনাটি ভাল লাগলো। তবে তাঁর আক্রমণ একটু একপেশে হয়ে গেছে মনে হয়। এবারে আকাশবাণীর 'দেবীং দুর্গাং দুর্গতিহারিণীং' অনুষ্ঠানটির এতখানি অসাফল্যের জন্যে দায়ী যে প্রধানত আকাশ-বাণীর কর্তৃপক্ষ তাতে কোন তর্কের অবকাশ নেই। তাঁদের অদূরদর্শিতা ও জ্ঞানের অভাবে এতে সামগ্রিক অসংগতি ও সমন্বয়ের অভাব ঘটেছে, যার ফলে অনুষ্ঠানটি তাৎপর্যহীন ও নিরস হয়েছে সত্য, কিন্তু এর সব কটি আঙ্গিকই একেবারে নিম্নমানের হয়েছে বলেই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এর জন্য বিভাগীয় কর্তারাও কম দায়ী নন। শাঙ্গর্দেবের ভাষায় বহুপঠিত শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত অধ্যাপকগণ ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরও পরিচিত; নানা জায়গায় তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাও শোনা গেছে, নিশ্চয় খারাপ লাগেনি। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এ ধরনের অনুষ্ঠান রচনা ও জনপ্রিয় করবার জন্যে যে সব গুণ ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা তাঁদের নেই; মামুলি ধারা-ভাষ্য ও কথিকা এটাকে একটি সাধারণ গীতি-আলেখ্যর পর্যায়ে নিয়ে এসেছিল। 'জনপ্রিয়তার লেভেলে নেমে আসা' বলে শাঙ্গর্দেব মহাশয় জনসাধারণকে হেয় করতে চেয়েছেন, কিন্তু এটা সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, এই অনুষ্ঠানটি নিম্নস্তরের হয়েছে বলেই এত ব্যঙ্গবিদ্রূপ—যা করেছেন জনসাধারণই। তাঁদের আশা ছিল, পূর্বেকার 'মহিষাসুরমর্দিনী'র চেয়ে উচ্চমানের কিছু পাবেন এবার। গোবিন্দগোপাল মহাশয় ও মাধুরী দেবী তো সংস্কৃত স্তোত্র পাঠে বিখ্যাত হয়ে আছেন, অধিক সন্ন্যাসীর ফলে তাঁদের সুযোগও ছিল সীমিত এবং স্তোত্র পাঠ ছিল না বললেই হয়।

শাঙ্গর্দেব মহাশয়ের পরের আক্রমণ, আগেকার কতকগুলি গানে লিরিক ছিল না ও সুরও ক্লান্তিকর ছিল। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, এবারের গানে কত লিরিক পেয়েছেন?

জননীর সঙ্গে জন্মভূমি, বিশ্বমাতার সঙ্গে দেশের শান্তির মত অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যার মধ্যে চমৎকার লিরিক! 'সুধা-তরঙ্গিনী' গানটির ভাষায় বিভিন্নধর্মী অর্থের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল, 'নম বরবর্ণিনী'র রচনা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ বলা যায়। এই 'আধুনিক' গানগুলির সম্বন্ধে সুযোগমত যথাস্থানে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইলো। আর সুরের কথা! এবারের কোন্ গানে গাম্ভীর্যপূর্ণ ভক্তিরস বা আগমনীর পদশব্দ পাওয়া গেল? সবচেয়ে বড় কথা—আগেকার অমূল্য সম্পদ, সংস্কৃত গানগুলি—সমবেত কণ্ঠে, মধ্যে কিছু কিছু কাউণ্টারমেলডি গুরু-গম্ভীর পাখোয়াজ সহযোগে, যা এবার একেবারেই অনুপস্থিত এবং যার জায়গা নিয়েছে কতকগুলো প্রাণহীন ও লঘু ছন্দের সিনেমার গানের সুর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরিণত ও অভিজ্ঞ সুরকার, এ অনুষ্ঠানে অন্য কোন সুরকারের নাম পছন্দ হয় না, তা হলেও বলি, এখানে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। শিল্পীদের তালিকাতেও দেখি সেখানেও ঐ অধিক সন্ন্যাসী! বেচারী হেমন্তবাবু, সবাইকে চান্স দেবার জন্যে প্রায় প্রতিটি গানে দুজন, তিনজন, চারজনের কণ্ঠ পর পর জুড়ে দিতে হয়েছে। একবার গীত একটি গানের কেবলমাত্র প্রথম লাইনটি খালি গলায় গাইবার জন্যে লতা মুঙ্গেশকারের শরণাপন্ন হতে হয়েছে! আবহসঙ্গীতও বিরক্তিকর। প্রায় সব গানের সঙ্গে চড়া সুরে বাঁশির আওয়াজ, মাঝেমধ্যে আবার ননটেকনিকাল হারমনাইজিং রীতিমত কর্ণপীড়ার কারণ হয়েছে; বম্বের শিল্পীদের গানগুলি বাঁশিহীন ছিল বলে যেন অনেক রিলিফ পাওয়া যাচ্ছিল। এর পরিচালক নিজে বংশীবাদক বলেই কি তাঁকে সর্বত্র বাজাতে হবে? আর এক কথা, বেতারের অনুষ্ঠানে দেখা যায় শাঁখের আওয়াজ সর্বদাই বেসুরো। সুরের সঙ্গে মিলিয়ে বাজারে শাঁখ কেনা যায়, শাঁখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে পুরো একপর্দা সুর নামানো যায়, বিভিন্ন যন্ত্রেও ঠিক শাঁখের আওয়াজ বার করা যায়—সঙ্গীত পরিচালকদের এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

রবি দত্ত
কলকাতা ২৯

শরৎচন্দ্রের শেষ হস্তাক্ষর

'দেশ' শরৎজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের শেষ হস্তাক্ষরের ফটোস্টাট কপি আমার মত অসংখ্য পাঠকের দৃষ্টিকে প্রচণ্ডভাবে জখম করেছে। অত্যন্ত বিসদৃশভাবে দেখা যাচ্ছে যে তাঁর এই শেষ হস্তাক্ষরে বেশ কিছুটা বানান ভুল রয়ে গিয়েছে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ অনুযায়ী ১৯৩৮-এর ১২ই জানুয়ারি অপারেশনের আগে ডাক্তার কুমুদশঙ্কর শরৎচন্দ্রের কাছে লিখিত অনুমোদন প্রস্তাব করেন। শরৎচন্দ্র হাসি মুখে জানালেন অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে আনতে, তিনি তার তলায় সই করে দেবেন। ডাক্তার তখন নিজে হাতে লেখেন, 'I take on myself all risks of operation and request Dr. K. S. Ray to operate on me, Park Nursing Home, 12. 1. 38' শরৎচন্দ্র এই লেখার তলায় পুনরায় তারিখ দিয়ে সই করেন। তারপর নিজে থেকেই সই-এর নীচে যোগ করেন, with all my senses and courage intact.' কিন্তু যে কোন

কারণেই হোক, আমরা সেই শেষ হস্তাক্ষরে দেখতে পাই 'Senses' বানানকে 'Senseses' এবং 'courage' বানানকে 'couraage' লেখা হয়েছে। এত ছোট একটি বাক্যের মধ্যে পর পর দুটো ভুল ভীষণ দৃষ্টিকটু লাগে। রোগীর অসুস্থতাজনিত ভ্রমের একটা যুক্তি খাড়া করা গেলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে উপরোক্ত শেষ হস্তাক্ষরের বাক্যটির অর্থের মধ্যেই পরিস্ফুট যে তিনি সকলকে জানাতে চান তিনি তখন পর্যন্ত সমস্ত চেতনা ও সাহসের অধিকারী হয়েই এই কথাগুলো লিখছেন। তাছাড়া উমাপ্রসাদবাবুর লেখা অনুযায়ী এ কথা পরিষ্কার যে সেখানে উপস্থিত কোন ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করেননি তাঁকে আরো কিছু লিখতে, তেমন প্রয়োজনও ছিল না তাঁর লেখবার, কারণ ডাক্তার কুমুদশঙ্করের প্রতিলিপিটিই যথেষ্ট ছিল। তবু শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র লিখলেন, অথচ ভুল লিখলেন—ঠিক বোধগম্য হল না ব্যাপারটা। আমি এ বিষয়ে শরৎ-বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমরকুমার বসু
কলিকাতা-৬

বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে—

গত ২৮শে আগস্ট দেশ পত্রিকায় বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে "বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে এখনও অপচয় কেন" এই শিরোনামে একটি বিশেষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বেশ কিছু ভিত্তিহীন মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার ২৫শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় ঐ একই বিভাগে "বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে অপচয় প্রসঙ্গে" এই শিরোনামে "সত্যেন্দ্রনাথ বোস ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল সায়েন্স" সম্বন্ধে কিছু বিতর্কমূলক আলোচনা প্রকাশ করে এই পত্রিকাটির নিরপেক্ষতার ইমেজকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

ইতিমধ্যে এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত বাদানুবাদ হয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এইটুকু নিবেদন করতে চাই যে, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদনে স্থাপিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান এখনও এমন অর্থকৌলীন্য অর্জন করেনি যে সর্বসময়ের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক নিয়োগ করা যায়। সেইজন্যই অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানের খ্যাতিমান অধ্যাপকেরা এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছেন এবং যথাসাধ্য সময় ব্যয় করে এখানকার পঠন-পাঠনের কাজে সাহায্য করছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বেশ কিছু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, যেমন ডঃ গগনবিহারী বন্দোপাধ্যায় (প্রফেসর, আই আই টি খড়্গপুর), ডঃ চঞ্চলকুমার মজুমদার (পালিত প্রফেসর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী (প্রফেসর, প্রেসিডেন্সি কলেজ), ডঃ হরিদাস ব্যানার্জি (প্রফেসর, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স), প্রফেসর পরিমলকান্তি ঘোষ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং আরও অনেকে। আমাদের মনে হয় খুব কম প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রছাত্রীরা এইরকম বিখ্যাত ও সুদক্ষ অধ্যাপকদের কাছে পড়ার সুযোগ পান।

বিমানবিহারী সিংহ
প্রমুখ রিসার্চ স্কলার বৃন্দ,
ফলিত গণিত বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঘরের মধ্যে ঘর

শংকর

॥ ২৩ ॥

ডিক্রি জারির আদালতী হুকুমটা অবশেষে পকেটস্থ করতে পেরে আমার উল্লাসের সীমা নেই। মনের গোপনে যে রীতিমত গর্ববোধ করছি তাও স্বীকার করতে লজ্জা নেই। গোলাপ বক্সী অ্যাডভোকেট নিজেও আমাকে অভিনন্দন জানালেন। জ্বলন্ত চুরুট ঠোঁট থেকে সরিয়ে আঙুলের ফাঁকে ধরে বক্সী সায়েব বললেন, "ভাড়াটে কোর্টের হিসট্রি লেখা হচ্ছে না তাই। হলে আপনার নাম উঠে যেতো। এতো অল্প সময়ের মধ্যে কাউকে মামলা জিতে দখল নেবার ব্যবস্থা পাকা করতে দেখিনি।"

মনে মনে গণপতিবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। গোরুর গাড়িকে বোম্বাই মেলের স্পীডে চালিয়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দেবার পরিকল্পনা তাঁরই। অভিজ্ঞ সেনাধ্যক্ষদের মতো তিনি কখনও প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন নি, নেপথ্য থেকে সমস্ত কলকাঠি নেড়ে গুরুপুত্রকে সাহায্য করেছেন।

বেলিফ শীতলাপ্রসাদ কোলে হাতের কাগজপত্র সামলে আমাকে বললেন, "আর দেরি করছেন কেন? শুভস্য শীঘ্রম! চলুন আপনাকে দখলটা দিয়ে আসি।"

পাকানো দড়ির মতন শুকনো এমন অদ্ভুত চেহারা সহজে একটা নজরে পড়ে না। ভদ্রলোকের হাফ শার্টখানাও দেখবার মতো—বহু জায়গায় সেলাই খোলা। দু' এক জায়গায় বিড়ির আগুনে পোড়া মনে হচ্ছে। এক কথায় মিউজিয়ামে রাখবার মতো একখানা শার্ট।

বিড়িতে লম্বা টান দিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "দখল দেবার সময় আমি এসপেশালি এই জামাখানা পরে যাই। জানেন না তো, আমাদের কাজের রিস্ক কতো। আমাদের দেখলে লোকে তো সন্দেশ-রসগোল্লা দিয়ে অভ্যর্থনা করে না। অনেকে এসে রেগে-মেগে জামার কলার চেপে ধরে, যা তা গালাগালি দিয়ে শাসায়—যদি জান না রেখে যেতে চাস তা হলে এখনই কেটে পড়।"

হাসির নাটকের টাইপ চরিত্রের মতো চশমার ফাঁকে আড়চোখে তাকিয়ে শীতলা-প্রসাদ বললেন, "আমাদের গায়ে হাত দেওয়া যা আর স্বয়ং গভরমেণ্টের গায়ে হাত দেওয়াও তা—একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, অনেকে মারধোর করে, পরে কোর্টের শমন পেয়ে কাঠগড়ায় উঠে অভিযোগ স্রেফ অস্বীকার করে বসে। হলফ নিয়ে বলে, ধর্মাবতার সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা, আমি বেলিফকে চলে যেতে রিকোয়েস্ট করেছিলাম, কিন্তু কখনও ওঁর বডি স্পর্শ করিনি। ছি ছি! আমি স্টেটের প্রতিনিধির গায়ে হাত তুলবার কথা ভাবতেও পারি না।"

শীতলাপ্রসাদ বললেন, "ঠেকে-ঠেকে আমিও মতলব বার করেছি। এই যে শার্টখানা দেখছেন, এর সঙ্গে ইয়ার্কি চলবে না! এমন শার্ট, কলার ধরেছে কি ফড়-ফড় করে ছিঁড়ে যাবে। এমন এভিডেন্স হয়ে থাকবে, যে কোর্টে গিয়ে মিথ্যে বলা চলবে না।"

শীতলাপ্রসাদের সহকারী গজানন পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে এবার একগাল হেসে বললো, "ক্ষতিপূরণের কথাটা বললেন না?"

"তোর আবার সব তাতেই পাকামো!" শীতলাপ্রসাদ বিরক্ত হয়ে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন গজাননকে। তারপর আমার কাছে ব্যাখ্যা করলেন, "গত সপ্তাহে দু'বার ক্ষতিপূরণ আদায় করেছি বলে, ওর বুক টাটাচ্ছে! পার্টি তো জানে না শার্টের অবস্থা—রেগেমেগে যেমনি আমার কলার টেনে ধরেছে, অমনি ফ্যাঁশ! গজানন অমনি চিৎকার করে উঠলো, 'বেলিফের গায়ে হাত দিয়েছেন—আপনার ভাগ্যে ছ' মাস শ্রীঘর-বাস নাচছে।' লোকটা তখন ভয় পেয়ে গিয়ে মাপ চাইলে। আমিও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলাম, শার্টের ক্ষতিপূরণ না-দিলে মাপ করবার কথাই ওঠে না। শার্টের জন্যে আঠারো টাকা আদায় করেছি। বাড়িতে গিয়ে মেয়েকে দিয়ে ছেঁড়া শার্ট সেলাই করাতে মাত্র দশ মিনিট লাগলো!"

গজানন এবার একগাল হেসে বললো, "খুব পয়মন্ত শার্ট। দু দিন পরে আবার ছিঁড়লো এবং বাবুর পকেটে উনিশ টাকা এল!"

"মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পেলি না?" প্রতিবাদ জানালেন শীতলাপ্রসাদ। "পেয়েছি সাড়ে-আঠারো টাকা! তোকে আটগণ্ডা পয়সা দিলাম না?"

"নেমখারাম মশায়, নেমখারাম। পয়সাও নেবে, অথচ সত্যি কথা বলবে না। তুই তো আপিসের মাইনে খাচ্ছিস, তোর তো এক পয়সা উপরি পাওয়া উচিত নয়। কী মশাই? ঠিক বলছি কিনা?" শীতলাপ্রসাদ আমাকে দলে টানবার চেষ্টা করলেন।

গজানন ততক্ষণে অন্য প্রসঙ্গ তুলে ফেলেছে। রাস্তার অদূরে চায়ের দোকান দেখে সে চা-পানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। শীতলাপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে গজাননের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখালেন এবং বললেন, "দখল দিতে কতক্ষণ সময় লাগবে কেউ বলতে পারে না। আগে একটু গলা ভিজিয়ে গেলে চটজলদি কাজের সুবিধে।"

অগত্যা আইনপাড়ার এক মিষ্টান্ন-কাম-চায়ের দোকানে ঢুকে পড়া গেল। বহুদিন আগে, দীর্ঘদিনের খানিকক্ষণ পরে হাইকোর্টের বিশিষ্ট বাবু খোকাদা বলে-ছিলেন, "দেশের সর্বত্র আদালতের কাছাকাছি

মিষ্টির দোকানগুলোর রমরমা ভাব—এরকম মিষ্টির সাইজ এবং স্টক অন্য কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।”

মামলা মোকদ্দমার সঙ্গে মিষ্টান্নের কি অদৃশ্য যোগসূত্র আছে জানি না, কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের বিশেষ জানা শোনা একজন ব্যারিস্টারের বাবু তো দাবি করতেন, খাবারের দোকানের কাচের শো-কেসের দিকে তাকিয়েই তিনি বলে দিতে পারেন কাছাকাছি কোনো আদালত আছে কিনা! কতকগুলো রাক্ষুসে সাইজের রাজভোগ ও চমচম নাকি আইন-পাড়া ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না।

স্যুইট হাউসে একটি টেবিল দখল নিয়েই গজানন চোখের সিগন্যালে পরিচিত বয়কে তৎক্ষণাৎ হাজির করালো। এবং হোস্টের সৌজন্যের জন্য অপেক্ষা না করেই বেলিফ শীতলাপ্রসাদের মতামতের জন্যে বললো, “দুখানা করে খাঁটি ঘিয়ের খাস্তা কচুরি, দুখানা করে গজা, দুখানা করে স্পেশাল পাশবালিশ এবং দুখানা আপালিভোগ বলা যাক?”

পাশবালিশ বলতে যে রাক্ষুসে পান্তুয়া এবং আপালিভোগ বলতে যে রাজভোগের তিনগুণ সাইজের ছানার টেনিস-বল তা পরে বুঝতে পেরেছি। সে যুগেও এই আপালিভোগের দাম ছিল প্রতিটি দেড় টাকা!

স্যুইট হাউসের ছোকরাটি আদেশমানা করবার জন্য তড়িৎগতিতে বিদায় নিচ্ছিল। কিন্তু শীতলাপ্রসাদ তাকে বাধা দিলেন। এবং গজাননকে তীব্র বকুনি লাগালেন: “সব জিনিসের একটা সীমা আছে গজু। ইনি কে জান? গণপতিবাবুর আপন ছোট ভাই?”

গণপতিবাবুর নামোচ্চারণ করতেই সাপের ফনার ওপর যেন মন্ত্রঃপূত জল পড়লো। একবারে চুপসে গেল গজানন। গণপতিবাবুর এই মন্ত্রশক্তির কারণ বুঝতে পারলাম না কিন্তু গজানন সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললো, “কিছু মনে করবেন না, স্যর। বললেন তো, আপনি গণপতিবাবুর ‘ব্রাদার অফ সেম উম্ব’। আমি শুধু এককাপ গরম চা খাবো।”

শীতলাপ্রসাদও বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধু এককাপ চা হলেই চলবে।”

মুখের খাবার নিয়ে এমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে জীবনে পড়িনি। আমার স্বর্গত পিতৃদেব মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসতেন এবং নিঃস্ব হয়েও অতিথি আপ্যায়নে বিশ্বাস করতেন। বিব্রত অবস্থায় গজাননকে কিছু খাবার জন্যে অনুরোধ করলাম। কিন্তু গজানন সে পথে আর পা বাড়াল না। বললো, চা ছাড়া কিছুছু নয়—এখন খিদেই পায়নি।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, “গণপতিবাবুর ছোট ভাই আপনি—আমাদের লাইনের সুখ-দুঃখের কথা সব শুনেছেন নিশ্চয়। বাপ বোধ হয় বুঝে-সুঝেই আমার নামকরণ করেছিলেন। কাজ করতে গিয়ে প্রতিদিন মা-শীতলার ঝাঁটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। হাঁড়ি-কুঁড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে লোককে ভদ্রাসন থেকে টেনে বার করে পথে বসিয়ে পার্টিকে সম্পত্তি দখল দেওয়াই আমাদের কাজ। কত লোক যে আমাদের অভিশাপ দেয় আপনাকে কী বলবো।”

বেলিফের অপ্রিয় কাজের এই দিকটার কথা আমার কখনও খেয়াল হয়নি। চায়ের কাপে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, “আমরা কী করতে পারি বলুন?
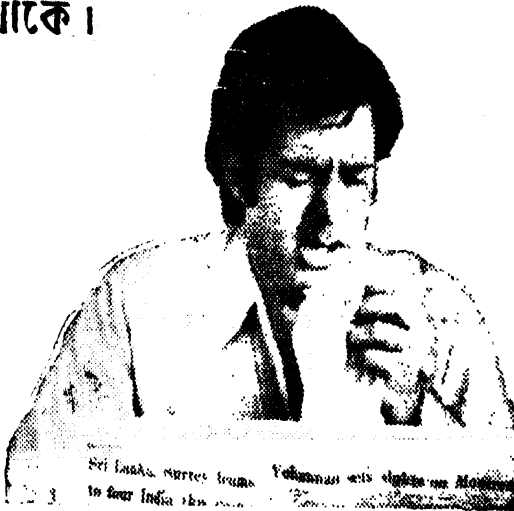
আমরা তো হুকুমের চাকর। ধর্মাবতার যদি হুকুম দেন, তা হলে নিজের বাপকেও ভিটে-মাটি ছাড়া করতে হবে আমাদের।"

গজানন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকালো। তারপর বললো, "বিশ্বাস করছেন না বুঝি, স্যার? সাধে কি আর আমাদের দেওয়ানি কোর্টের জল্লাদ বলে! জল্লাদরা ক্রিমিনাল কেসে ফাঁসি দেয়, আর আমরা সিভিল কেসের পর লোককে উচ্ছেদ করি, তাদের অস্থাবর সম্পত্তি ঠেলা-গাড়ি করে কেড়ে নিয়ে চলে আসি; এক-জনের মাথা গুঁজবার ঠাঁই আর একজনকে দখল দিই।"

শীতলাপ্রসাদ কোনো রকম প্রতিবাদ করছেন না। চায়ের সঙ্গে একটা বিড়ি ধরিয়ে আপন মনে টানছেন। এবার কোমর থেকে একটা ট্যাঁক-ঘড়ি বার করে সময়টা দেখে নিলেন।

গজানন একগাল হেসে শীতলাপ্রসাদকে দেখিয়ে বললেন, "এ'র কাছে কাম ই'জ কাজ। একেবারে গুরুদেব লোক। ডিক্রি-জারির অর্ডারে শীলমোহর করিয়ে ও'র হাতে দিলে ও'র আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। দখল উনি পার্টিকে দেওয়াবেনই—সে যে করেই হোক। বাপকে ভিটেমাটি ছাড়া না করলেও গত মাসে তো বাপের বোনকে উচ্ছেদ করে এলেন!"

মানে? আমি রীতিমত অবাক হচ্ছি। উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দখল নিতে গিয়ে যে এ-রকম বিচিত্র মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ হবে আন্দাজ করিনি।

শীতলাপ্রসাদ আপন মনে বললেন, "মিথ্যে বলেনি গজু। যখন কাজে বেরিয়ে-ছিলাম তখনও জানতাম না। জানলে হয়তো অবলা মিত্তিরকে পাঠাতাম নিজে না গিয়ে। আপনার দাদা গণপতিবাবুরই কেস। ও'র মালিকদের একখানা বারওয়ারি ভাড়াটে বাড়ি নিয়ে অনেকদিন ধরে মামলা-মোকদ্দমা চলছিল। শেষে ডিক্রি পেয়েই জারি করবার জন্যে ছোটাছুটি। আপনার দাদার আবার আমাকে না হলে পছন্দ হয় না। হুড়মুড় করে রাধারমণ দত্ত লেনের সেই বাড়িতে ঢুকে দেখি তখন অনেক ভাড়াটে রান্না-বান্না চাপিয়েছে। দু-একখানা তোলা উনুন থেকে ঝটপট হাঁড়ি নামিয়ে দিলুম—আমাদের দেখে বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো কান্না-কাটি লাগিয়ে দিল। তারপর মশাই, উচ্ছেদ করতে করতে দোতলায় উঠে দেখি আমার সুধা পিসি একখানা প্যাঁটরা নিয়ে নেমে আসছে। এই ব্যাটা গজানন সুধা পিসির ভাতের হাঁড়ি উনুন থেকে নামিয়ে দিয়েছে।'

"আমি কী করে বুঝবো যে উনি আপনার পিসীমা? জানলে বলতুম, ঠিক হ্যায়। রান্নাবান্না সেরে তাড়াতাড়ি বিদেয় হোন।"

শীতলাপ্রসাদ নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, "আমার আপন পিসী নয়—বাবার মাসতুতো বোন।"

"ঐ হলো—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন," মন্তব্য করলো গজানন।

"আমাকে দেখে পিসী তো তাজ্জব! আমিও স্তম্ভিত। কিন্তু কী করবো? আমি তো হুকুমের চাকর। হুকুম না-মানলে আমারও অন্ন উঠবে। যে-বাড়িতে ভাড়াটে আছি, সেখানেও একদিন এই হতভাগা গজানন গিয়ে হয়তো আমাকে উচ্ছেদ করে আসবে।"

দাঁত বার করে গজানন বললো, "আমি কিন্তু অত নির্দয় হতে পারবুনি। আপনাকে ফিস ফিস করে বলে দেবো: দাদা, রান্নাবান্না শেষ করে, খেয়েদেয়ে, একপ্রস্থ ঘুমিয়ে নিয়ে বিকেল তিনটে-চারটে নাগাদ রাস্তায় বের হোন।"

বেলিফ শীতলাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে রইলেন। কিন্তু গজাননের কথা শেষ হতে চায় না। পানের কষে হলদে হয়ে-যাওয়া দাঁতগুলো বার করে সে বললো, "যেমন কম্মো তেমন ফল—ধম্মের কল যে বাতাসে নড়ে!"

কী বলতে চায় গজানন তা বুঝতে পারছি না। গজানন কিন্তু শান্তভাবে জানিয়ে দিল, "আপনার বড়দার কাজকম্ম সেরে পুরো দখল দিয়ে সেদিন রাধারমণ মিত্তির লেন থেকে বেরিয়ে দেখি দাদার বিধবা পিসী তাঁর প্যাঁটরাটির ওপর গতরখানি রেখে তখনও রাস্তায় বসে আছে। তখন নিজের ময়লা নিজেকেই সাফ করতে হলো —ওই রাধারমণ মিত্তির লেন থেকে রিকশ ভাড়া করে পিসিকে নিয়ে নিজের বাড়িতে তুলতে হলো দাদাকে। কী করবে বলুন—হাজার হোক পিসী তো! লাভের গুড় পিঁপড়ের মেরে দিল।'

শীতলাপ্রসাদ এবার কাজের কথা তুললেন। অর্ডারের কাগজপত্রে তিনি এখনও নজর দেননি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন তালাচাবির ব্যবস্থা রেখেছেন তো? এক একজন পার্টি এত অনভিজ্ঞ থাকে যে দখল নিতে যায় অথচ সঙ্গে তালাচাবি রাখে না। দখল নেবার পরে তখন ছোটাছুটি, কোথায় তালা কোথায় চাবি দেখো।"

বেলিফকে আশ্বস্ত করলাম তালাচাবির অসুবিধা হবে না। আমাদের ম্যানসনে সব সময় স্পেশাল সাইজের তালাচাবি মজুত থাকে। সকালে তেজকালিবাবুকে রিকোয়েস্ট করে এসেছি, একটু পরেই যেন আমাদের লাগানো তালার-ওপর-তালাটা উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা থেকে খুলে নেওয়া হয়।

পুলিস এবং আদালতের লোকের সামনে আমাদের তালাটা যেন দেখতে পাওয়া না যায়।

শীতলাপ্রসাদ আর একটা বিড়ি ধরাবার জন্যে দেশলাইয়ের খোঁজ করলেন। বললেন, "তেইশ বছর চাকরি করছি, তবু যুদ্ধে নামবার আগে আমার নার্ভাসনেস বেড়ে যায়। এই সময়টা আমি ঘন ঘন বিড়ি ধরাই।" বিড়ি ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে শীতলাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, "ক'জনকে উচ্ছেদ করতে হবে?"

ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, আমাদের ম্যানসনে উচ্ছেদটা অন্য রকমের। সেখানে কেউ ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে উনুনের সামনে বসে নেই। সব শুনে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "বলবেন তো মশাই! এ তো মেডিক্যাল কেস—সার্জিক্যাল কোনো ব্যাপারই নেই! যাকে উচ্ছেদ করতে হবে তাঁরই পাত্তা নেই। এ তো নাম-কা-ওয়াস্তে বেলিফের বুড়ি ছুঁইয়ে রাখা!"

পুলিসকে খবর দিয়ে রেখেছি কিনা জানতে চাইলেন শীতলাপ্রসাদ। গণপতিবাবুর কথা চিন্তা করেই বোধ হয় ভদ্রলোক আমার ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ নিচ্ছেন।

পুলিসে খবর দেওয়া আছে শুনে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "পুলিস অনেক সময় মশায়, বেশী দেরি করিয়ে দেয়। ঠিক সময়ে হাজির হয় না। অথচ আমাদের এই উচ্ছেদের কাজে বেলিফ এবং পুলিস হলো পুরুত আর নাপিত। দুজনেই সমান ইমপর্টান্ট।"

আদালতের এই অপ্রিয় কাজে কে পুরুত এবং কে নাপিত তা বুঝতে পারলাম না।

শীতলাপ্রসাদ বললেন, "আপনার ক্ষেত্রে পুলিসকে খুব প্রয়োজন। কারণ বেওয়ারিশ মালপত্তর সব রাস্তায় টেনে বার করে দিতে হবে। এবং পুলিস সে-সব মালের লিস্টি বানিয়ে তোষাখানায় পাঠিয়ে দেবে। কুলি এবং ঠেলাগাড়ির ব্যবস্থা রেখেছেন তো? যদি ভেবে থাকেন পুলিস নিজে ঠেলাগাড়ি ডেকে এনে আপনার ভাড়াটের মাল নিয়ে গিয়ে আপনাকে ভেকান্ট পজেশন দেবে, তা হলে খুব ভুল করেছেন।"

গণপতিবাবুর গোপন উপদেশ মতো এ সব ব্যবস্থা আমি আগে থেকেই করে রেখেছি। আজ বিশেষ করে যাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করছি তিনি হচ্ছেন বরদাপ্রসন্ন। কয়েকদিন আগে তিনি ছুটি নিয়ে বাবা বিশ্বনাথ দর্শনে গিয়েছেন। হোল লাইফে কোনোদিন ছুটি পান নি ভদ্রলোক—একাই এই যক্ষের সম্পত্তি পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন, একদিনের জন্যেও মুক্তি নেই। আমি আমার সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজী হন নি ভদ্রলোক—দিন কয়েকের জন্যে উধাও হয়েছেন।

উনিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ব্যাপারটা যে এত অল্প সময়ে পাকা হবে তা আমি নিজেও আন্দাজ করতে পারিনি নি। পারলে, অবশ্যই উচ্ছেদ না-হওয়া পর্যন্ত বরদাপ্রসন্নকে ছাড়তাম না। কিন্তু অসুবিধার কিছু নেই। তেলকালিবাবু আমাকে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলেছেন, "আমি তো আছি, আপনার কোনো চিন্তা নেই। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শুভ কাজ নির্বিঘ্নে শেষ করিয়ে দেবো।"

তেলকালিবাবুকে আমি পুলিশের খবরা-খবর নেবার জন্যে পাঠিয়েছি। বাড়ির ঠিকানা দেখে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "খুব সম্ভব অ্যাসিসটেন্ট দারোগা গণেশ সরকার আসবেন। ও-পাড়ায় যত উচ্ছেদের মামলায় যাই সব জায়গাতেই তো গণেশবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়। একেবারে সিদ্ধিদাতা লোক—আপনার কোনো চিন্তা নেই! আগে থাকতে যদি একটু পুজো-অর্চনার ব্যবস্থা করে রাখেন তা হলে কোনো অসুবিধাই হবে না—তরতর করে কাজ হয়ে যাবে। ভাড়াটে তাড়াচ্ছেন মনেই হবে না, ভাববেন ঠিক যেন নতুন তৈরি নিজের বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করছেন!"

থ্যাকারে ম্যানসনের অফিস ঘরের সামনেই তেলকালিবাবু আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। গণেশ সরকার তখন তাঁর ফোর্স সহ অফিসঘরের ভিতর বসে চা খাচ্ছিলেন। বুদ্ধিমান তেলকালি ওঁর সামনে এক টিন পানও রেখেছেন।

বোঁটায় চুন লাগিয়ে জিভে ঠেকাতে ঠেকাতে গণেশ সরকার তাঁর পরিচিত বেলিফ শীতলাপ্রসাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ শুরু করলেন। আমরা কিছু ট্রাবল প্রত্যাশা করছি কিনা জানতে চাইলেন গণেশবাবু।

তেলকালি মনের দুঃখে আমার কানে কানে বললেন, "ট্রাবল দেবার মতো লোক তো ছিলেন না, ফিলিপ সায়েব।"

গোলমালের সম্ভাবনা কম শুনে পুলিস ও আদালতের প্রতিনিধিরা খুশী হলেন। গণেশ সরকার জিজ্ঞেস করলেন, "আজ যে আপনারা দখল নিচ্ছেন খবরটা বেশী ছড়ান নি তো?"

"কাক-পক্ষীতে পর্যন্ত জানে না, সার।" তেলকালি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন।

গণেশ সরকার বললেন, "যত চুপি চুপি ব্যাপারগুলো সারা যায় ততই ভাল। পাঁচ কান হলেই বিপদের সম্ভাবনা।"

ট্যাঁকঘড়ির দিকে তাকিয়ে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "তা হলে এবার ওঠা যাক, চলুন পার্টিকে পজেসন দিয়ে তারপর বরং গপ্পো-গুজব করা যাবে।"

গণেশবাবু বললেন, "সাক্ষী? দুজন নিরপেক্ষ সাক্ষী নেওয়া যাক—লিস্টি তৈরির সময় দরকার হবে।"

মুচকি হেসে শীতলাপ্রসাদ বললেন, "যাকে খুশী তুলে নিন। আপনাদের পুলিসের সব সাক্ষীই তো সব সময় নিরপেক্ষ!"

গণেশবাবু মুচকি হাসির অর্থ বুঝলেন। কিন্তু দাদাদের পরিচয়ের কথা স্মরণ করেই বোধ হয় কোনো মন্তব্য করলেন না।

এবার সত্যিই আমি বিজয়গর্ব অনুভব করছি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট আমাদের অধিকারে এসে যাবে। থ্যাকারে ম্যানসনে আমার স্মরণীয় কাজের মধ্যে এইটিই যে উজ্জ্বলতম তা ভাবতে বেশ আনন্দ হচ্ছে।

তেলকালি ও দুজন সাক্ষী আমাদের সঙ্গেই সিমেন্ট-বাঁধানো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোয়ার্টারের দিকে চলেছেন। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায় পুরনো ফ্ল্যাটের ভাড়াটের কথা ভদ্রলোক কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

"সায়েবরা বিবাগী হয়ে কোথায় চলে গেল বলুন তো", আমার কাছে দুঃখ করলেন তেলকালি। মেমসায়েবকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছেন না তেলকালি। আমার কানে কানে বললেন, "কি মেয়েমানুষ দেখুন! লোকটা কোথায় বিবাগী হয়ে ভেসে গেল একবার খোঁজ করলে না।"

পুরোপুরি এডিথ মেমসায়েবকেই যে দোষী সাব্যস্ত করেছেন কালিবাবু, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রেমের এই সব জটিল পরচর্চায় আমার একটুও উৎসাহ নেই। তাই চুপ করে রইলাম। কিন্তু তেল-কালি আবার শুনিয়ে দিলেন, "খুব শান্ত নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন ফিলিপ সায়েব। দেখবেন, ওই প্রেমিক বাঙালী ছোকরার ভাল হবে না। পরস্ত্রী ভাঙানোর চেয়ে মহাপাপ আর হয় না।"

বেলিফ শীতলাপ্রসাদ যে তালা ভাঙায় এত অভ্যস্ত তা আমার জানা ছিল না। প্রয়োজনীয় আইনপ্রক্রিয়ার শেষে পুলিসের উপস্থিতিতে তিনি খড়াং করে ফিলিপ সায়েবের তালা ভেঙে ফেললেন। তারপর একগাল হেসে আমাকে বললেন, "এই নিন আপনার পজেসন। লাগান আপনার তালা।"

রসিক গণেশ সরকার বললেন, "এখনই তালা লাগাচ্ছেন কি? এখনও ভিতরে কী আছে দেখা হয় নি।"

"খালি বাড়িতে কী এমন কোহিনুর মণি রেখে যাবেন, স্যার। ডিফলটার ভাড়াদেদের তো আমার জানতে বাকি নেই! তার ওপর প্রেমবিবাগী সায়েব!" রসিকতা করলেন শীতলাপ্রসাদ। তারপর গণেশবাবুকে অনুরোধ করলেন, "ভিতরে তো আপনার কাজ। লিস্টি বানিয়ে মালপত্তর নিয়ে চলে যান। তবে একটু হাত চালিয়ে সার, মেয়েটার এখন-তখন অবস্থা—কখন ডেলিভারির ব্যথা ওঠে ঠিক নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাবার দ্বিতীয় লোক নেই।"

জয়ের আনন্দে আমি রামসিংহাসনকে কয়েক কাপ চা এখানে দ্রুত আনিয়ে দেবার জন্যে বললাম।

দরজা ঠেলে খুলতেই একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরিয়ে এল। বহুদিন ফ্ল্যাটের দরজা জানলা বন্ধ থাকলে বোধ হয় এরকম হয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হাল্কা মেজাজে সকলে উনিশ নম্বরে পদার্পণ করলাম। তেলকালিবাবু নিজেই বললেন, "আহা সাজানো সংসার।"

শীতলাপ্রসাদ বললেন, "তেমন কিছু মালপত্তর দেখছি না। গণেশবাবু, আপনার লিস্টি তৈরি হতে বেশী সময় লাগবে না।"

গণেশ সরকার ইতিমধ্যে নিজের কাজে লেগে গিয়েছেন। ফ্ল্যাটের আকারের তুলনায় সত্যি কিছুই জিনিসপত্তর অবশিষ্ট নেই।

গণেশবাবু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এর মধ্যে আবার চুনের বস্তা এল কী করে? সায়েব কি নিজের ঘর নিজেই রঙ করাবার ব্যবস্থা করছিলেন?"

তার পরেই বিস্ফোরণ ঘটলো, এই রকম চাঞ্চল্যকর ঘটনার জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না।

শীতলাপ্রসাদবাবু একটা কাঠের ওয়ার-ড্রোব খুলে ফেললেন। ভিতর থেকে কয়েকটা সিল্কের শাড়ি হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়লো। দেখলাম কিছু ব্লাউজ এবং

মহিলাদের অন্তর্বাস একদিকে হ্যাঙ্গারে ঝুলছে।

তেলকালি ফিসফিস করে আমাকে বললেন, "মেমসায়েবের জামাকাপড়গুলো সায়েবকে ছেড়ে গেলেও মেয়েরা তো এই সব জামাকাপড় ছাড়ে না!"

"মেয়েদের মন, কিছুই বোঝা যায় না", আমি তেলকালিকে শুনিয়ে দিলাম।

তেলকালি এবার সামনের স্টীল আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। আলমারির এক পাল্লায় মানুষ-প্রমাণ কাচের আয়না। বিছানায় শুয়ে শুয়েও এই আলমারির আয়নার প্রতিফলন দেখা যায়।

পাশেই বিরাট এক কালো রঙের টিনের তোরঙ্গ। চাবিটা তোরঙ্গের গায়েই ঝুলছে। গণেশ সরকারের নির্দেশে তেলকালি এবার চাবি ঘুরিয়ে ট্রাঙ্কের ডালা খুলে ফেললেন এবং ভিতরে নজর দিয়েই তীব্র আর্তনাদ করে উঠলেন—"মেম সাহেব!" তারপর হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করে মেঝেতে ফেন্ট হয়ে পড়লেন তেলকালিবাবু।

"মে ম সা হে ব এখানে কোথেকে আসবেন?" আমি দ্রুত তেলকালির দিকে এগিয়ে গেলাম। গণেশ সরকারও ছুটে এলেন।

সে এক বীভৎস দৃশ্য। ট্রাঙ্কের মধ্যে চুনের গুঁড়োর ভিতরে শায়িতা এক নারীদেহ। চুনের কটু গন্ধ ভেদ করেও অবর্ণনীয় এক দুর্গন্ধ সমস্ত শরীর ঘুলিয়ে দিল।

এডিথ মেমসায়েবকে চিনতে তেলকালির একটুও অসুবিধা হয় নি। বিগলিত দেহের চারদিকে তাঁর প্রিয় আকাশী রঙের সিল্ক শাড়িটা তখনও অক্ষত রয়েছে।

হতভম্ব গণেশ সরকার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মিস্টার ফিলিপ কি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন? বউকে গলাটিপে খুন করেছেন মনে হচ্ছে। এবং খুনের পর চুনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে যে বাইরে একটুও দুর্গন্ধ ছড়াবে না সে খবরটাও রাখেন তিনি।"

সামান্য দশ মিনিটে যা শেষ হবে অন্দাজ করেছিলাম তা যে এমন জটিল ব্যাপার হয়ে উঠবে কে জানতো? পুলিসের বড় বড় অফিসারদের পদধূলিতে আমাদের উনিশ নম্বর ফ্ল্যাট ধন্য হয়ে উঠলো। কিন্তু কোথায় ফিলিপ সাহেব? তিনি এখন পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে অথবা কোন্ দরিয়ায় আত্মগোপন করে রয়েছেন তা কেউ জানে না।

অফিসাররা সবাই স্বীকার করলেন, "বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। এত দিন পরে মৃতদেহ আবিষ্কারের খবর তাঁদের জানা নেই।"

আমার মনে পড়লো, বরদাপ্রসন্ন শেষবারে ফিলিপ সায়েবকে চুনের বস্তা কিনে আনতে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এখানে নেই। বেচারাকে আর এই বীভৎস ব্যাপারে জড়াতেও ইচ্ছে করলো না। বিশেষজ্ঞদের কাছে শুনলাম, "সাধারণত, কয়েকদিনের মধ্যে মৃতদেহের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু জাহাজের বিরাট ট্রাঙ্কটা চুনে বোঝাই করে তারই মধ্যে মৃতদেহ শুইয়ে দিয়ে আসামী অবিশ্বাস্য বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে, পুলিসের হাঙ্গামা সাময়িকভাবে চুকিয়ে রাত্রে ছাদের ঘরে আমি অসুস্থ তেলকালিকে দেখতে গিয়েছিলাম।

গায়ে একটা বিছানার চাদর জড়িয়ে শুকনো মুখে তেলকালিবাবু পাথরের মতো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

"কেমন আছেন?" আমি শান্তভাবে বললাম তাঁকে।

"আসুন স্যার," বরফের মতো ঠান্ডা স্বরে তেলকালি আমাকে আহ্বান জানালেন।

এবার দীর্ঘ নীরবতা।

তারপর তেলকালি বললেন, "খুব নরম মানুষ ছিলেন ফিলিপ সায়েব। তিনি এই কাজ কী করে করলেন, স্যার?"

আমি কী উত্তর দেবো? বললাম, "আমাদের জানাশোনা এক বুড়ো দারোয়ান ছিল—সে বলতো, বাবুজী সব হোতি হ্যায় তব্ এইসী হোতি হ্যায়! কখন কী হয়, কেউ জানে না।"

তেলকালিবাবুর ঘরে আলো নেভানো। কিন্তু দূরে ছাদের আলোর কিছুটা এসে অস্পষ্ট আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে।

তেলকালি রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমার পাপের শেষ নেই, স্যার।"

"এসব কী বলছেন আপনি?" ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম আমি।

চাদর দিয়ে চোখ মুছতে-মুছতে তেলকালি বললেন, "আমিই সায়েবকে মেমসায়েব সম্বন্ধে একটা উড়ো চিঠি দিয়েছিলাম। কী বদ খেয়াল হলো কে জানে, মেমসায়েবের কাণ্ডকারখানা দেখে লিখে দিলুম সায়েবকে। আমি ভেবেছিলুম, মেমসায়েব হাতে-নাতে ধরা পড়লে বেশ জমবে—দূর থেকে মজা দেখবো।"

"কিন্তু এমন হবে কেমন করে জানবো? আমার যে নরকেও স্থান হবে না। আমি নাক কান মলছি আর কখনও কাউকে উড়ো চিঠি লিখবো না।" এই বলে তেলকালি আমারই সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

(ক্রমশ)

নীললোহিতের চোখের সামনে

আমার সহপাঠীদের মধ্যে সুব্রত ছিল সবচেয়ে ভালো ছেলে। যেমন পড়াশুনোতে ভালো, তেমনি লাজুক। এই লাজুকতার জন্যই সুব্রত আই এস-সি পরীক্ষার সময় একটা কেলেংকারি করে ফেললো।

সেদিন ছিল কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যালের দিন। এখনকার নিয়ম কী জানি না। আমাদের সময় অন্য কলেজের লেবরেটরিতে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে হতো। সুব্রতর আর আমার দুটো আলাদা কলেজে সেণ্টার পড়েছে। পরীক্ষা টরিক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখি আমার কলেজের গেটের সামনে সুব্রত শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনই শেষ পরীক্ষা, এরপর দারুণ দারুণ হুল্লোড়ের পরিকল্পনা আছে। সুব্রতর কাঁধে চাপড়া মেরে বললাম, চল্, আগে অনাদির মোগলাই পরোটা খাবো, তারপর অন্য কথা।

আরও সব বন্ধুবান্ধবরা মিলে চাঁ্যাচামেচি করছে, সুব্রত তার মধ্যে চুপ। হঠাৎ ওর চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী রে, কী ব্যাপার?

সুব্রত বললো, আমার পরীক্ষা হয়নি!

ঘটনা শুনে আমরা স্তম্ভিত। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সময় হঠাৎ সুব্রতর হাত থেকে পড়ে ওর টেস্ট টিউব ভেঙে যায়। টেস্ট টিউবে করে প্রত্যেককে সল্ট দেওয়া হয়, পরীক্ষা করে সেটার নাম বলতে হয়। সুব্রত ডিমনস্ট্রেটারের কাছে গিয়ে আবার সল্ট চেয়েছিল, তিনি বলেছেন, আমি কি জানি! ব্যাস, সুব্রত আর লজ্জায় কিছু বলতে পারেনি!

আমরা সবাই ওকে ছি ছি করতে লাগলাম। সল্ট টেস্ট করা তো কোনো ব্যাপারই না। নিজেরা পরীক্ষা করে যা পেলাম তা তো পেলামই, তা ছাড়া লেবরেটরির বেয়ারাদের প্রতিটি সল্ট মুখস্থ। ওরা একটুখানি নিয়ে জিভে ছুঁইয়েই নাম বলে দেয়। আমিও তো বেয়ারাকে দু-টাকা বখশিস দিয়ে নাম জেনে নিয়েছি। সুব্রত তা পারলো না? যে-কোনো বেয়ারাকে বললেই মাটি থেকে একটু তুলে নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে নাম বলে দিত। কিংবা আর একটা সল্ট আদায় করতে পারলো না? আমরা হলে চ্যাঁচামেচি করে সকলের পরীক্ষাই বন্ধ করে দিতাম। সুব্রত লাজুক, সে কিছুই করেনি, টেস্ট টিউব ভাঙার জন্য

—হ্যাঁরে নীলু, সুব্রত কোথায়?

নিজেকে অপরাধী মনে করে বেরিয়ে এসেছে।

আমরা সবাই সুব্রতকে সান্ত্বনা দিলাম, যাক গে, যা হয়েছে, হয়েছে! একটা সল্টের নেক্সটের জন্য আর কি নম্বর কাটবে! এমন কিছু ক্ষতি হবে না!

কিন্তু একথা মুখে বললেও আমরা মনে মনে জানি, টেস্ট টিউব ভেঙে পুরো পরীক্ষাটা না দিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য হয়তো সুব্রতকে কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়ে দেবে! সুব্রতর ফার্স্ট ডিভিশান বাঁধা ছিল, এর পর ওর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তিও প্রায় ঠিকঠাক—কিন্তু কম্পার্টমেণ্টাল হলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে। সুব্রত কেন আমাদের তক্ষুনি খবর দেয়নি? আমরা হই হই করে ছুটে গিয়ে ঠিক একটা কিছু ব্যবস্থা আদায় করে নিতাম। এখন যে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এখন তো আর কিছুই করার নেই!

প্রকাশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুব্রত কাঁদতে লাগলো।

কিন্তু আমাদের মধ্যে তখন পরীক্ষা-শেষের আনন্দ, আমরা ছটফট করছি, কতক্ষণ আর সুব্রতর দুঃখ নিয়ে আমরা দুঃখিত হয়ে থাকবো! ওকে বললাম, আচ্ছা, আর মন খারাপ করিস না। একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই যাবে! কাল ঐ কলেজের প্রিন্সিপালকে গিয়ে ধরবো।

সবাই আমরা এসপ্লানেড পাড়ায় যাবো, সুব্রতকেও বাসে তুলবার জন্য টেনে নিয়ে গেলাম। সুব্রত শেষ মুহূর্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, তোরা এগো, আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি।

সেই সময় সুব্রতকে একা ছেড়ে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। আমরা সবাই তো

স্বার্থপর। আমরা নিজেদের আনন্দে মশগুল হয়ে চলে গেলাম।

সেদিন রাত্তির বেলা সুব্রতর দিদি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁরে নীলু, সুব্রত কোথায়? ও তোদের সঙ্গে ছিল না?

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠলো। মনে পড়লো, সুব্রতর সেই জলে ভেজা বিবর্ণ মুখ। আমি বললাম, সুব্রত বাড়ি যায় নি? ও যে বললো বাড়িতে যাচ্ছে।

অনুপমাদি বললো, না, ও তো পরীক্ষার পর বাড়িই ফেরেনি। মা চিন্তা করছেন খুব।

সুব্রত আমাদের মতন উড়নচণ্ডী নয়। আড্ডায় বসেও কখনো বেশী রাত করে না। ঠিক সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরে। ওর আর ভাই বোন, এক দিদি আর তিন ছোট বোন। সুব্রতর বাবা দু-মাস আগে বিলেতে গেছেন।

অনুপমাদির সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কোথায় খোঁজ করবো? আমরা অন্য বন্ধুবান্ধবরা তো সবাই এক সঙ্গে ছিলাম, সুব্রত আর কার কাছে যাবে? তবু ট্যাকসি নিয়ে ঘুরলাম কয়েক জায়গায়। প্রত্যেকেই সুব্রতর কথা শুনে মুখ শুকনো করে ফেললো, প্রত্যেকের মধ্যেই অপরাধীর ভাব। আমরা ঠিকঠাক পরীক্ষা দিয়েছি, সুব্রত পারে নি। অথচ, তারই সবচেয়ে ভালো পরীক্ষা দেবার কথা।

খানিকক্ষণ বাদে, অনুপমাদি জিজ্ঞেস করলো, সত্যি কথা বলতো নীলু, আজ পরীক্ষা হলে সুবু কিছু গণ্ডগোল করেছিল?

আমি বললাম, না, না! সুব্রত কি কখনো গণ্ডগোল করতে পারে নাকি?

অনুপমাদি শেষ পর্যন্ত থানায় ডায়রি করতে গেল। থানার অফিসারও বললেন, আজ শেষ পরীক্ষা ছিল না? দেখুন কোথায় ফার্তি টুর্তি করতে গেছে!

কিন্তু সুব্রত যে সেরকম ছেলেই নয়, সে কথা কি করে বোঝাবো! সুব্রত পরীক্ষার হলে বেয়ারাকে ঘুষ দিতে পর্যন্ত শেখেনি। সামান্য একটা টেস্ট টিউব ভাঙার জন্য ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে?

অনুপমাদিকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে এলাম। কিন্তু সারারাত আমার ঘুম হলো না। সুব্রত প্রচণ্ড অভিমান আর দুঃখ নিয়ে কোথায় চলে গেল। আমরা পাস করে যাবো, আর সুব্রত পাস করবে না এ কি ভাবা যায়! শেষ পর্যন্ত সুব্রত রেললাইনে গিয়ে গলা দেবে না তো?

সকালবেলাতেই অনুপমাদি আর অন্য বোনরা এসে হাজির। অনুপমাদি আমাকে এক ধমক দিয়ে বললো, তুই কাল বলিস নি যে সুবু পুরো পরীক্ষা দেয় নি?

আমি ঘাড় হেঁট করে রইলাম।

অনুপমাদির সব বোনেরাই বেশ স্মার্ট। কাল সারারাত ওরা কেউ ঘুমোয়নি। রাত তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর ঐ সাহসিনী মেয়েরা পাড়ার এক গাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে ডেকে তুলে কলকাতায় সমস্ত হাসপাতাল দেখে এসেছে। সুব্রত কোথাও নেই। আমার শুধু মনে হতে লাগলো, ইস্, কেন সুব্রতর বদলে আমার টেস্ট টিউব ভাঙলো না! আমি এক বছর ফেল করলেই বা কার কি আসে যায়? সেই লেবরেটরির ডেমনস্ট্রেটার ভদ্রলোকটি কি হৃদয়হীন! একটি ছেলের টেস্ট টিউব ভেঙে গেলে তাকে আর একটা টেস্ট টিউব আর সল্ট দেবার [illegible] না? তাঁর ঐটুকু গ[illegible] জন্য একটা সংসারে কতখানি দুঃখ ঘনিয়ে এলো। সুব্রতর মা সারারাত [illegible] কেঁদেছেন।

তিনদিনের মধ্যে সুব্রতর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিন ননী এসে খবর দিল সুব্রত বিষ খেয়েছে। সে আছে টালিগঞ্জের এক হাসপাতালে।

ননী আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়তো। ক্লাস টেন পর্যন্ত এসে পড়া ছেড়ে দেয়। আমাদের খুব বন্ধু ছিল ননী। ওর বাবা হঠাৎ মারা যাবার পর কী একটা বিষয় সম্পত্তির গোলমালে ওদের কলকাতার বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়, ওরা চলে যায় ওদের মামাবাড়িতে বোড়াল গ্রামে। তারপর আর ননীর সঙ্গে বেশী দেখা হয়নি। সেই ননীর কাছে সুব্রত কেন গিয়েছিল কে জানে! হঠাৎ ননীর কথাই বা তার কেন মনে পড়লো? ননী তো জানে না যে সুব্রত বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে—তার ধারণা পরীক্ষার পর পুরোনো বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে সুব্রত। তিনদিন তো সে ভালোই ছিল, কথাবার্তা তো ও চিরকালই কম বলে। তারপর কী ভাবে বিষ জোগাড় করলো তা ননী জানে না।

অনুপমাদিকে নিয়ে আমরা ছুটলাম টালিগঞ্জে। সেটা একটা বিশ্রী হাসপাতাল—তাও সীট পাওয়া যায়নি বলে সুব্রতকে শুইয়ে রাখা হয়েছে মেঝেতে। তাকে দেখলেই ভয় করে। এর মধ্যেই কী রকম রোগা, শুকনো হয়ে গেছে চেহারা, মুখখানা নীলচে ধরনের, প্রাণ আছে কিনা বোঝা যায় না। তক্ষুনি ব্যবস্থা করে সুব্রতকে নিয়ে আসা হলো পি জি হাসপাতালে। অনুপমাদি তখন এম এ ক্লাসের ছাত্রী, নিজেই সব ব্যবস্থা করলেন। সেখানে শোনা গেল, আরও চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে বলা যাবে না, সুব্রত বাঁচবে কিনা।

পি জি হাসপাতালের চত্বরে সারা রাত

রইলাম আমরা। প্রত্যেকটি বন্ধু এসেছে, কেউ বাদ যায়নি। আমাদের দলের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ছেলে, সে-ই মুমূর্ষু হয়ে শুয়ে আছে হাসপাতালে। কারণ, সে একটা টেস্ট টিউব ভেঙেছে। সে অন্য ডাকাবুকো ছেলেদের মতন টেবিল-চেয়ার ভাঙেনি, পরীক্ষার হলে গার্ডকে ছুরি দেখায়নি। শুধু অসাবধানে একটা টেস্ট টিউব ফেলে দিয়েছিল, তবু কেউ তাকে একটু সহানুভূতি দেখালো না, কেউ একটু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো না।

আমাদের কারুর মুখে একটি কথা নেই। ঘাড় হেঁট করে আমরা দশ-বারোজন সদ্য আই এস-সি পরীক্ষা দেওয়া ছেলে বসে আছি—একটু দূরে ঘাসের ওপরে অনুপমাদি আর তার এক বোন। অন্য দু বোনের সঙ্গে সুব্রতর মাকে একটু আগে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে জোর করে। আমাদের মনে হচ্ছে, এই রাতটা আমাদের জীবনে সবচেয়ে লম্বা রাত, কিছুতেই যেন শেষ হবে না।

অনুপমাদি দারুণ সপ্রতিভ, এই ক' দিনে একটুও ভেঙে পড়েনি। বাড়িতে অন্য পুরুষ মানুষ নেই, তবু নিজেই সব দিক সামলে রেখেছে। হঠাৎ অনুপমাদি মুখ দিয়ে কী রকম যেন শব্দ করলো। অনেকটা হেঁচকির মতন। আমরা চমকে তাকালাম। অনুপমাদি কি কাঁদছে? না তো। কিছুক্ষণ বাদে আবার একটা ঐ রকম শব্দ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, অনুপমাদি, জল খাবে? জল এনে দেবো?

অনুপমাদি বললো, না।

তারপর অনুপমাদি গলা তুলে, দুটি স্থির চোখ মেলে আমার দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বললেন, হ্যাঁ রে নীলু, যদি সুরু শেষ পর্যন্ত না বাঁচে, তা হলে কী হবে?

আমি একেবারে কেঁপে উঠলাম। এর আমি কী উত্তর দেবো? আমি কি সব প্রশ্নের উত্তর জানি?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বেঁচে উঠেছিল সুব্রত। কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিল, নেয়নি, পরের বছর আবার পরীক্ষা দিল। কিন্তু আগের থেকে ও আরও বেশী গম্ভীর হয়ে গেল, আমাদের সঙ্গেও আর মিশতে চাইতো না।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। আমাদের মধ্যে কেউ ব্যাংকের কেরানী, কেউ অধ্যাপক, কেউ ডবলু বি সি এস, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। সুব্রতও ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দুর্গাপুরে চাকরি করে। সকলেরই প্রায় কাছাকাছি অবস্থা। আই এস-সি পরীক্ষায় কে একটু ভালো রেজাল্ট করেছিল, কে একটু খারাপ —তাতে কিছু যায় আসেনি—প্রায় সব জীবন নিজস্ব গতি নিয়েছে। একটা বছর নষ্ট হবার জন্যই বা কী এমন ক্ষতি হয়েছে সুব্রতর? এখন তো সে আর অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে নেই।

সেদিন দেখলাম গড়িয়াহাটার মোড়ে সুব্রত ওর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কালী-পুজোর বাজি কিনছে। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। আমার মনে পড়লো, পি জি হাসপাতালের সেই রাতটা। আর দু-তিন কণা বিষ বেশী খেলেই সুব্রত আর বাঁচতো না। তা হলে এমন সুন্দর শিশুটিও জন্মাতো না! কত সামান্য কারণে জীবনের ভারসাম্য টলে যায়। একটা টেস্ট টিউব ভাঙার জন্য একটি সতেরো বছরের ছেলের জীবন মুচড়ে ভেঙে যেতে বসেছিল! অনেকদিন বাদে সুব্রতকে দেখে আমার সত্যি খুব আনন্দ হলো। পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে বেঁচে থাকা।

পুস্তক পরিচয়

নিঃসঙ্গ অবলম্বিতের ছবি

মানুষ খুন করে কেন। দেবেশ রায়। মনীষা। কলকাতা। দাম ৩০.০০।

দার্জিলিং ও সংশ্লিষ্ট চা-বাগানের সমাজব্যবস্থা, ব্যবসা ও রাজনীতি নিয়ে লেখা প্রায় সাত শো পৃষ্ঠার এই বিশাল উপন্যাসটি খুব সম্ভবত দেবেশ রায়ের দ্বিতীয় উপন্যাস। ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাজনীতির পারস্পরিক টানা-পোড়েনে এই বিশাল কাহিনী গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের নায়ক চা-বাগানের এক্সাইজ-ইন্সপেক্টরের চাকরি নিয়ে আসে। প্রথমে ওঠে দার্জিলিং-এ তার শালীর (সং-বোন, দিদি) বাড়িতে। সং-বোনের সঙ্গে নায়কের স্ত্রীরও প্রথম দেখা। কিন্তু অদেখা আত্মীয়দের সঙ্গে বেশ একটা সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে সহজেই। দিদি, দিদির স্বামী (ব্যাঙ্কের ভালো চাকুরে), দুটি ছেলেমেয়ে আর বিধবা ননদ বেণু—এই আত্মীয় পরিবেশে থেকে নায়ক চলে যায় চা-বাগানে গ্লেনভিউ-তে। তার কোয়ার্টার্সে। প্রসঙ্গক্রমে চাকরি পাবার নানা অবৈধ কৌশলের বর্ণনায় বুঝিয়ে দেওয়া হয় সমাজব্যবস্থায় দুর্নীতিপরায়ণ কৌশলীরা কিভাবে সুযোগ আয়ত্ত করে। যৌথ পরিবার থেকে চলে এসে নতুন জায়গায় গল্পের নায়ক স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে সংসার শুরু করে। সেই সূত্রে স্বামী-স্ত্রীর নতুনভাবে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, নিজেদের নতুন করে জানা। কিন্তু একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যায়। স্ত্রী যতটা স্বামীকে নতুন করে পায়, স্বামী সে তুলনায় উদাসীন। কিন্তু এই স্বামীই চাকরি-জীবনে বেশ গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। চা-ম্যানুফ্যাকচারিং-এর সূত্রে বাগানের ম্যানেজার, অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার, বড়বাবু, কলবাবু, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, শ্রমিকের নেতা, এম এল এ, এমপ্লয়িজ ক্লাব ইত্যাদির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝেই কাজে বা অকাজে নায়ক যখন আত্মীয়ের বাড়ি দার্জিলিং-এ গিয়ে ওঠে সেখানকার বনেদী সমাজ-জীবনের সঙ্গেও সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে একটু বেশী উল্লাসিত পুরুষ-ঘেঁষা বড় শালীর সঙ্গে ঘুরে। গ্লেনভিউ চা-বাগানের ওপরওয়ালা ব্যবসাদার ও ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কিংবা এম এল এ দার্জিলিং-এর বনেদী সমাজেরও কেউকেটা। কাজেই ঔপন্যাসিক ব্যক্তির পারিবারিক জীবন ও দাম্পত্যজীবনের সূত্রে, এমন কি একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরির সূত্রেও ধীরে ধীরে শ্রমিকজীবন, কলকারখানার শাসন-ব্যবস্থা, ওপরওয়ালাদের মন কষাকষি ও সেই সূত্রে উলুখাগড়াদের ধরে টানা-টানির সূত্রগুলিও জড়িয়ে দিয়ে ব্যক্তি-সমাজের সম্পর্কটিকে বড় ঔপন্যাসিকেরই দক্ষতায় জটিল করতে পেরেছেন। অভিজ্ঞতার উপর খুব দৃঢ় বিশ্বাসে ঔপন্যাসিক এই চা-বাগানের শ্রমিক-সমস্যার ছবি এঁকেছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডে, যেখানে দরজী আর বড়বাবুর নানা যুক্তি-প্রযুক্তিতে অশ্বিনী প্রথমে দিশেহারা হয়ে পরে ধীরে ধীরে সিদ্ধান্তে এগোয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ততা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে তথ্যের প্রাবন্ধিকও করে ফেলেছে। অনেক ক্ষেত্রে সংলাপে কোনো প্রসঙ্গ তুলে অবান্তর বর্জনীয় তথ্যও এনেছেন। যাই হোক, বাগানের শাসন-ব্যবস্থার জটিল ছকে ব্যক্তি-অশ্বিনী গোপন টাকার ক্রমশ সুখী হতে থাকে, শাসন-ব্যবস্থা যান্ত্রিক নিয়মেই চলে। পুজোর সময়ে দার্জিলিং গিয়ে বেশ টাকা উড়িয়ে বউকে খুশী করে বেড়িয়েও আসে। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি উদাসীন নায়ক দার্জিলিং-এ বড় শালী আর তার বিধবা ননদের প্রতি টান অনুভব করতে থাকে। উৎসাহী স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য-অভিনয়টা কিন্তু ভালোই করে যায়। স্ত্রীকে বলে বা না বলে দার্জিলিং-এর ওপর মহলে মেশামেশির ফাঁকে ফাঁকে বড় শালীর সঙ্গে রোমান্টিক ঘনিষ্ঠতা হয়, বিধবা ননদের মনের নিঃসঙ্গতার সঙ্গী সে হতে চায়। এদিকে নিয়তি তৈরী হয়ে যায়। ওপরওয়ালাদের চোরাই চালান ও পারস্পরিক বিরোধিতার চক্রান্তে নায়ক সাসপেণ্ড হয়ে যায়। স্ত্রীকে শারীরিক তৃপ্তি দিয়ে তাকে না বলেই দার্জিলিং-এ একটি শীতের সন্ধ্যায় তুষার-ঝড়ে শালীর সঙ্গে রোমান্টিক অভিসার করে, বিধবা ননদ বেণুর সঙ্গে শীতের রাত্রিতে আগুনের আঁচে কুয়াশার রঙবদলের

"লিওর শ্যাম্পুর
মনমাতানো সুরভির রেশ...
তাজা হয়ে থাকবে
আপনার তাঁর মনে."
বলেন, অ্যানিটা রবিন্‌স্‌, এক্সপোর্ট হাউস একজিকিউটিভ
লিওরের রকমারি নতুন শ্যাম্পুর প্রত্যেকটিতে আছে নিজস্ব বিশিষ্ট সৌরভ। আর, এই শ্যাম্পুগুলি সবরকম যত্ন নিয়ে আপনার চুল করে তোলে পরিষ্কার, সুন্দর, আকর্ষণীয়, সৌরভে ভরপুর...যাতে আপনার তাঁর মন মেতে ওঠে।
লিওর আমার চুলে আনে লোভনীয় সৌন্দর্য্য, লিওর শ্যাম্পুর যত্নে হয়—নির্মল, সুন্দর, সুরভিত অনিবার্য্য।
Lure
BEAUTY SHAMPOO
Lure
EGG SHAMPOO
Lure
LIME SHAMPOO
Lure
SHIKAKAI SHAMPOO
Creative Unit-A 2351-Ben.

গল্প করে রাত কাটিয়ে, পরের দিন সকালে ঘুম থেকে বেড়িয়ে এসে নায়ক তার সাসপেনশনের খবর পায়। তারপর আত্মীয়চ্যুত, নিঃসঙ্গ, ক্রুদ্ধ নায়ক হোটেলে মদ খেয়ে এক দারুণ নেশাচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফিরে এসে প্রতীক্ষারতা স্ত্রীকে দাম্পত্য আহ্বানে ডেকে মিলনের অভিনয় করে তাকে খুন করে। তারপর নিশ্চল হয়ে পরবর্তী ঘটনার হুকের জন্য অপেক্ষা করে। সামাজিক হুকে ব্যক্তির এই নিঃসঙ্গ অবলুপ্তির ছবিটা ঔপন্যাসিক অপূর্ব সংযমের সঙ্গে দেখিয়েছেন।

কিন্তু যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে উপন্যাস জমে উঠেছে তার সঙ্গে ব্যক্তির এই বিপর্যয়ের দ্রুত গতি ঠিক যেন ছন্দে মেলে না। উপন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ঘটনার যে জাল বিস্তার দেখি, তার তুলনায় চতুর্থ খণ্ডের জাল-সংহরণ অনেক দ্রুত। তা ছাড়া নায়কের বিশেষ কোন্ অভাববোধ থেকে স্ত্রীর সঙ্গে অভিনয় এবং শালীর সঙ্গে ও শালীর ননদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ইচ্ছে ঘটলো সেটাও স্পষ্ট নয়। আর স্পষ্ট নয় বলেই সাস-পেণ্ডেড নায়কের যে আক্রোশের শিকার হলো তার স্ত্রী, সেই খুনেরও যথেষ্ট পূর্ব-প্রস্তুতি আছে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে গেলেও, এবং ভাষা ও সংলাপে মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হলেও বলবো সমাজ ও ব্যক্তির এমন বিশাল ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, এবং ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্কের মাধ্যে সূক্ষ্ম ও গভীর সুর তোলার এমন নৈপুণ্য সাম্প্রতিক কালের উপন্যাসে খুব একটা দেখিনি।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

যোষকে সাহায্যই করেছে। তাঁর লেখার স্বাভাবিক সপ্রতিভতা, বর্ণনার গতিময়তা, সংলাপের স্বাচ্ছন্দ্য—এই গুণাবলী প্রথমেই চোখে পড়ে। ছোট হবে এবং গল্পও হবে—ছোটগল্পের এই চিহ্নিত সংজ্ঞার্থে তাঁর অটল বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এই সংকলনের প্রতিটি গল্পেই চমৎকারভাবে ছড়ানো। কিন্তু একটি বিশেষ প্রবণতা তাঁর গল্পকে কিছুটা একপেশে ও অনাধুনিক করে তুলেছে। গল্পের চরম পরিণতি হবে নাটকীয় ও চমকপ্রদ—এই প্রাচীন ধারণার হাতে তিনি অসহায়ভাবে বন্দী হয়ে পড়েছেন। 'অনন্য পুরুষ' কি 'অন্য বলয়' গল্পের পরিণতির চমক কি আদৌ স্পর্শ-যোগ্য? মনোজবাবু নিশ্চিত ভেবে দেখবেন। কেননা, ভালো গল্প রচনার অনেক গুণই তাঁর করায়ত্ত। এই বইতেও 'হাড়' কিংবা 'মফিজুল বিবি' গল্পের পরিবেশ রচনায় তিনি অনায়াস নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

'শিল্পের স্বপ্নময়' গল্পটির মুখ্য থীম সম্পর্কে একটি প্রশ্ন শুধু জাগে। কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সহবাস' উপন্যাসের কথা তীব্রভাবে মনে পড়ে যায় এই গল্পে। 'স্ত্রী-বদলের' সেই দুঃসাহসিক উপাখ্যান কি মনোজবাবু পড়েন নি? বিশ্বাস করতে দ্বিধা জাগে।

✻

"ভালবাসাই মরি/সে আমায় বাঁচিয়ে দেয় ভালবাসায়/তাই বারেবারেই মরি/ভালবেসেই মরি/ঐ পোড়া দুরন্ত আশায়"—পাঁচ চরণের এই আত্মসম্পূর্ণ কবিতা ভালবাসারই এক গভীরগহন পাঁচালি এতে সন্দেহ নেই। ভালোবেসে মৃত্যু এবং ভালোবাসারই উজ্জীবনস্পর্শে নতুন জীবন লাভের 'পোড়া আশা'র সহজ অথচ মর্মস্পর্শী স্বীকারোক্তি অনায়াস দক্ষতায় যে-কবি ছড়িয়ে দিতে পারেন, তাঁর স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশতায় অবিশ্বাসী হবেন না পাঠক। বস্তুত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালবাসার ছড়া (প্রাপ্তিস্থান : ভবানীপুর বুক ব্যুরো, কলকাতা-২৫, দু টাকা) বইটির প্রত্যেকটি সরল-অতল ছড়া খুব সহজেই মনকে আপ্লুত করে। কোনো কষ্টকল্পনার চিহ্ন নেই কোথাও, তাঁর তীব্র উপলব্ধির আন্তরিক উচ্চারণে এই প্রকাশ কবিতাবলী অনায়াসসুন্দর। ছড়ার অনেক সুরে গ্রথিত, তাই আবেদনও প্রত্যক্ষ।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলা ছোট গল্প একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় এসে পৌঁছেছে—এ কথা কঠোরতম সমালোচকও স্বীকার করবেন। তরুণ গল্পকার মনোজ ঘোষও ছোট গল্পের সেই ঐতিহ্যে যে আস্থাশীল—তাঁর প্রথম গল্পসংকলন অন্য তপস্যার (পরিবেশক : দে বুক স্টোর, কলকাতা ১২) ভূমিকায় তার সানন্দ স্বীকৃতি পাওয়া গেল। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি যে পূর্ণসজাগ সচেতন তাও বোঝা যায় এই আত্ম-অভিব্যক্তির স্বল্পভাষ বর্ণনায়—"আমার এই সংকলনও সেই ঐতিহ্যেরই একটি অনতি-স্পষ্টরেখ পদধ্বনি।" কিংবা "প্রথম সংকলনের যে অসমতলতার শিথিলতা থাকা স্বাভাবিক এখানে সম্ভবত তার দেখা মিলতেও পারে।"

এই সচেতনতা প্রত্যক্ষভাবে মনোজ

খেলার মাঠে

পূর্বাঞ্চলের ব্যর্থতা
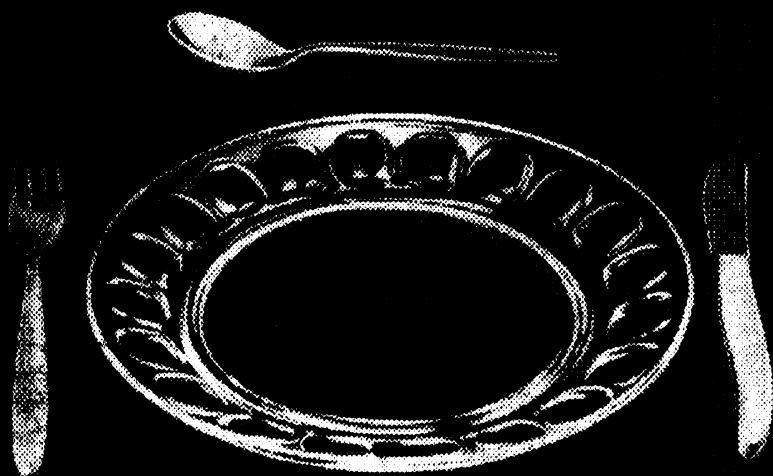
ভারতীয় ক্রিকেটে পূর্বাঞ্চল চিরদিনই পশ্চাদবর্তী। এবারও যেভাবে পূর্বাঞ্চল দেওধর ট্রফি ও দলীপ ট্রফির খেলায় হেরে গেল সেভাবে হারা ক্রিকেট খেলায় প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা এবং সংযমের অভাবেরই পরিচয়।

প্রথম হেরেছে দেওধর ট্রফির ৬০ ওভারের খেলায় পশ্চিমাঞ্চলের কাছে, ৮ উইকেটে। অথচ পূর্বাঞ্চলের দুই ওপেনার পলাশ নন্দী (৬১) সম্বরণ ব্যানার্জি (৬৮) চমৎকারভাবে ইনিংস শুরু করেছিল। দুজনে প্রথম উইকেটে করেছিল ১২৬ রান। সীমায়িত ওভারের খেলায় ম্যাচ জেতার জন্য প্রয়োজন ছিল পরবর্তী ব্যাটসম্যানদের মেরে খেলে দ্রুত রান তোলা। কিন্তু অম্বর রায় এবং রমেশ সাকসেনা হাত খুলে মারতে পারেননি। দৃঢ়তাও দেখাতে পারেননি। ফলে পূর্বাঞ্চলের ৪ উইকেটে ২০০ রানের উত্তরে পশ্চিমাঞ্চল ৫৭.১ ওভারে ২ উইকেটে ২০১ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। ম্যাচ জিততে হলে যেভাবে ব্যাট করা দরকার ঠিক সেইভাবেই ব্যাট করেছেন দিলীপ বেঙ্গসরকর (৮৫) ও অশোক মানকড় (৮০)। অশোক ৮০ রান করেছেন মাত্র ৭৮ মিনিটে।

আমেদাবাদে দেওধর ট্রফি থেকে বিদায় নিয়ে ওখানেই দলীপ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের কাছেই হেরেছে ৭ উইকেটে।

এ হার শক্তসমর্থ জোয়ান ছেলের শুকনো মাটিতে আছাড় খাওয়ার মত। কেউই আশা করতে পারেনি ৩৮৯ রানে ইনিংস শেষ করে এবং প্রথম ইনিংসের খেলায় ১১০ রানে এগিয়ে থেকে পূর্বাঞ্চল হেরে যাবে। শুধু ১১০ রানেই এগিয়ে থাকা নয়, চারদিনের খেলার শেষ দিনের সকালে দ্বিতীয় ইনিংসে বিনা উইকেটে ৩১ রান সংগৃহীত হওয়ায় ১৪১ রানেই এগিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পূর্বাঞ্চলের ব্যাটসম্যানরা মাত্র ৪৯ রানের মধ্যে ১০টি উইকেট হারিয়ে এবং মাত্র ৭০ রানে ইনিংস শেষ করে এক রকম আত্মহত্যা করেছেন। জয়ের প্রয়োজনীয় ২৮১ রান তুলেছে পশ্চিমাঞ্চল মাত্র ৩ উইকেটের বিনিময়ে।

পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক অম্বর রায় জেতা-ম্যাচ হেরে যাবার কারণ সম্পর্কে কতকগুলি যুক্তি দেখিয়েছেন। যেমন—যদি গোপাল বসু ও দলজিৎ সিং দলে থাকতেন, যদি অলোক ভট্টাচার্যের প্রথম দিনের খেলায় চোট না লাগত কিংবা আর একজন স্পিনার দলে থাকত, যদি দ্বিতীয় ইনিংসে তাকে আম্পায়ার বাজে আউট না দিতেন এবং গাভাসকারের হুক-আউট উপেক্ষা না করতেন, যদি সম্বরণ এবং পলাশ অশোক মানকড়ের দুটি ক্যাচ ফেলে না দিতেন তা হলে পশ্চিমাঞ্চল কিছুতেই ম্যাচ জিততে পারত না। এরপর অম্বর বলেছেন, উইকেটে বল প্রথম দিন থেকে বেশ ভাল টার্ন নিচ্ছিল এবং একটি স্পটও হয়েছিল। দুই বাঁ-হাতি স্পিনার শিভলকর ও পারসানা তার চমৎকার সদ্ব্যবহার করেছেন।

সত্যিই শিভলকর ২৯ রানে ৭টি এবং পারসানা রানে ৫ রানে ৩টি উইকেট দখল করে মাত্র ৭০ রানে পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংস খতম করেন। কিন্তু প্রথম দিন থেকে যে উইকেটে বল টার্ন করছিল সেই উইকেটেই তো অম্বর ১২৭ রান করেছেন প্রধানত দুই স্পিনার শিভলকর ও পারসনার বলে। পূর্বাঞ্চলও করেছিল ৩৮৯ রান। এ কথাও তো সত্যি যে উইকেটে দ্বিতীয় ইনিংসে পূর্বাঞ্চল ৪৯ রানের মধ্যে ১০টি উইকেট হারিয়েছে সেই উইকেটেই পশ্চিমাঞ্চল পরে করেছে ৩ উইকেটে ১৮১ রান। আসল কথা ব্যর্থতা, যার কৈফিয়ৎ দিতে যাওয়া বোকামি।

পাকিস্তানের রাবার

লাহোরের প্রথম টেস্টে ৬ উইকেটে এবং হায়দরাবাদের দ্বিতীয় টেস্টে ১০ উইকেটে জিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'রাবার' দখল করে পাকিস্তান তৃতীয় এবং শেষ টেস্টেও জয়ের মুখে। কোনো অঘটন না ঘটলে করাচী টেস্টেও নিউজিল্যান্ডের হার অনিবার্য। ইতিমধ্যে করাচী টেস্টে পাকিস্তানের ওপেনার মাজিদ খাঁ এক বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরি করে।

এ বছরেই টেস্ট ক্রিকেটের শতবর্ষ পূর্ণ হল। এই ১০০ বছরের মধ্যে ইংলণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, নিউজিল্যান্ডের কোন ব্যাটসম্যান লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরি করতে পারেননি। শুধু অস্ট্রেলিয়ার [illegible]- ভিক্টর ট্রাম্পার [illegible] চার্লস ম্যাকার্টনি (১৯২৬) [illegible] ব্র্যাডম্যান (১৯৩০) এই বিরল [illegible] অধিকারী হন। তিনজনই লাঞ্চের [illegible] অর্থাৎ ১২০ মিনিটের মধ্যে [illegible] ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের [illegible]।

তৃতীয় টেস্টের [illegible] পরে আলোচনা করা যাবে। দ্বিতীয় [illegible] সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে—পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে যে রান (৪৭৩) তুলে দান ছেড়ে দেয়, নিউজিল্যান্ড দুই ইনিংসে ঠিক সেই রান করে প্রথম ইনিংসে [illegible] পর। ফলে জয়ের মাত্র একটি রানের জন্য পাকিস্তানকে আবার ব্যাট হাতে মাঠে নামতে হয়।

পাকিস্তানের দুই [illegible] অধিনায়ক মুস্তাক মহম্মদ (১০১) ও সাদিক মহম্মদের (নট আউট ১০৩) সেঞ্চুরি দ্বিতীয় টেস্টের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

স্কোর:

পাকিস্তান প্রথম ইনিংস ৮ উইঃ ডিঃ ৪৭৩। নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংস ২১৯; ও দ্বিতীয় ইনিংস—২৫৪

(পাকিস্তান ১০ উইকেটে জয়ী)

ফুটবল

প্রথম দিনেই খেলা শুরু না হওয়ায় আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান ও ইস্ট বেঙ্গলকে যেমন যুগ্মজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল দার্জিলিং গোল্ড কাপ ফাইনালেও তাই করা হয়েছে। ফলে দুই বছরের এই প্রতিযোগিতায় গতবারের জয়ী মোহনবাগান এবারও জয়ের ভাগ পেয়েছে, ইস্ট বেঙ্গলও জয়ের ভাগী হল প্রথম অংশ গ্রহণ করে।

মেয়েদের দ্বিতীয় জাতীয় ফুটবলে গতবছরের চ্যাম্পিয়ন বাংলা আবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। শ্রীরামপুরের অনুষ্ঠিত এবারের খেলায় বাংলা হারিয়েছে মহাকোশলকে ৯—০, কেরালাকে ১—০, বিহারকে ৪—০, কর্ণাটককে ২—০ এবং ফাইনালে গোয়াকে ১—০ গোলে। পাঁচটি খেলায় বাংলার বিরুদ্ধে একটিও গোল হয়নি। বাংলার রাইট হাফ শুক্লা দত্ত পেয়েছেন প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলারের সম্মান। শুক্লা হাফব্যাকের খেলোয়াড় হয়েও পাঁচটি গোল করেছেন।

ভুল সংশোধন—৩০ অক্টোবরের পত্রিকায় লেখা হয়েছে—জীবনের প্রথম টেস্টে হ্যাট্রিক করায় নিউজিল্যাণ্ডের পেথেরিক প্রথম। পেথেরিক দ্বিতীয়। প্রথম ইংলণ্ডের এম জি সি অ্যালম। ১৯২৯-৩০এ প্রথম টেস্ট আবির্ভাবে হ্যাট্রিক করেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

ইংলণ্ডের সহ-অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ার্লির প্রথম টেস্টের রান ০ ও ১৭, দ্বিতীয় টেস্টে ৪০ ও ১৩ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ল্যারি গোমেজের প্রথম ইনিংসে ০, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করেননি।

একলব্য

শীতের ক্রিকেট অতিথি (৪)

এম সি সি দলের এক নম্বর উইকেট-কিপার হয়ে অ্যালান নট চার বছর আগে যখন ভারতে এসেছিলেন তখন তাঁর টেস্ট-জীবনের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। তখনই পৃথিবীর এক নম্বর উইকেট-কিপারের মর্যাদা। এখন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হিসাবে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। তবু এবার, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরবর্তী ভূমিকা আপেক্ষিকভাবে কিছুটা ম্লান।

কেননা ৭২-৭৩ সিরিজ খেলার জন্য ভারতে আসার আগে ৩৬টি টেস্টে ক্যাচ ধরায় ও স্টাম্প করায় তাঁর শিকার ছিল ১২৩টি। তারপর ৪২টি টেস্টের শিকার ৯৮। বেশী হবারই কথা ছিল। এখন মোট শিকার ২২১—একমাত্র গডফ্রে ইভান্স ছাড়া পৃথিবীর কোন উইকেট-কিপার এর ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেননি। অ্যালান নট ইংলণ্ডের কেণ্ট কাউন্টির খেলোয়াড়। ইভান্সও ছিলেন কেণ্টের খেলোয়াড়। ৯১টি টেস্টে ইভান্সের শিকার যেখানে ২১৯, ৭৮ টেস্টে সেখানে নট-এর ২২১।

১৯৭৪-এ ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার রস এডওয়ার্ডসের ক্যাচটি ধরার পর নট ১৭৬টি ক্যাচে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হন। এ বছর ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজে বিশ্ব রেকর্ড করেন সামগ্রিক শিকারে। ক্যাচের সংগে যদি স্টাম্পের সামঞ্জস্য থাকত তবে উইকেট-কিপারের কৃতিত্বে বিস্তর পথ এগিয়ে থাকতে পারতেন। নট-এর ক্যাচের সংখ্যা ২০৪, স্টাম্পিং-এর মাত্র ১৭। ৯১ টেস্টে কিন্তু ইভান্সের ক্যাচ ১৭৩, স্টাম্পিং-৪৬। স্টাম্প করার কৃতিত্বে সদ্য পরলোকগত অস্ট্রেলিয়ার বার্ট ওল্ডফিল্ডের সংগে অবশ্য কারও তুলনা চলে না। মাত্র ৫৪টি টেস্টের ১৩০টি শিকারের মধ্যে তাঁর ক্যাচ ৭৮টি, স্টাম্পিং ৫২টি। তবে খেলার ধারা অনেক বদলে গেছে। এখন ব্যাক ফুটেই খেলোয়াড়রা ব্যাট করার বেশী চেষ্টা করে। ফলে স্টাম্প করার সুযোগ ঘটে কম।

অ্যালান নট প্রকৃত অর্থেই উইকেট-কিপার-ব্যাটসম্যান। রানের ঝুলিও অনেক বড়। সব উইকেট-কিপারের শীর্ষে। ৯১ টেস্টে ইভান্সের রান ২৪৩৮, ৭৮ টেস্টে নট-এর ৩৫৯৩।

উইকেট-কিপারের উইকেট দখলের সুযোগ নেই, বল করার সুযোগ মেলে না বলে। মিললে নট হয়তো ওই বিষয়েও পিছিয়ে থাকতেন না। কারণ, বোলার হিসাবেই ক্রিকেটে হাতেখড়ি হয়েছিল।

বাবাই উইকেট-কিপারের পথ আগলে রেখেছিলেন। সুযোগ এসে না গেলে পৃথিবী হয়তো উইকেট-কিপার নটকে পেত না—পেত বোলার নটকে।

সংক্ষিপ্ত নাম—এ পি ই নট। পুরো নাম অ্যালান ফিলিপ এরিক নট। বাবার নাম ছিল এরিক নট। বাবা ছিলেন এরিথ টেকনিক্যাল কলেজ টিমের উইকেট-কিপার, সে টিম এখন বেলভেডিয়ার ক্রিকেট ক্লাব নামে পরিচিত। বড় নট যে ক্লাবের উইকেট-কিপার, ছোট নট-এর সে ক্লাবে উইকেট-কিপিং-এর সুযোগ কোথায়? অফ স্পিনার হিসাবেই ওই ক্লাবে ক্রিকেট শুরু। কেণ্টের সেক্রেটারি লেসলি এমস ১৯৬২-তে অফ স্পিনার হিসাবে ছোট নটকে দলভুক্ত করেছিলেন। তখন কেণ্টে ছিল দু'জন উইকেট-

কিপার—ডেরেক আপটন ও টনি ক্যাণ্ট। এক বছর পরে আপটন ক্রিকেট ছেড়ে ফুটবলে মেতে ওঠেন। তার পরের বছর ক্যাণ্ট চলে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। পিতৃসূত্রে স্টাম্পের পেছনে দাঁড়ানোর কিছু রেওয়াজ আগেই ছিল। তখন (১৯৬৪) থেকে পাকাপাকিভাবে উইকেট রক্ষার দায়িত্ব পড়ে নট-এর উপরে। ১৯৬৫-তে ৬৩০ রান ও ৭৫টি শিকারের সুবাদে ইংলণ্ডের "ইয়ং ক্রিকেটার অব দি ইয়ার"-এর সম্মান।

১৯৬৭-তে চমকপ্রদ টেস্ট অভিষেক। ট্রেণ্ট ব্রিজ টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে একটিও বাই রান দেননি। ৭টি ক্যাচ ধরে নতুন রেকর্ড করেছিলেন। এই কৃতিত্ব সত্ত্বেও ১৯৬৮-তে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের প্রথম তিনটি টেস্টে অ্যালান নটকে বসিয়ে রাখা [illegible] কিপার [illegible] সুযোগ মেলে। [illegible] ১—০ এগিয়ে ছিল। পঞ্চম টেস্ট ড্র হলেই 'রাবার'। কিন্তু হারের সম্ভাবনা দেখা দিল পঞ্চম টেস্টের শেষ দিনে যখন লাঞ্চের আধ ঘণ্টা আগে মাত্র ৪১ রানে ৫টি উইকেট পড়ে গেল। এডরিচ, বয়কট ব্যারিংটন, গ্রেভনি, ডলিভেরা প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন। প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বাকি শুধু কাউড্রে। কিন্তু তাঁর তো একজন সহযোগীর দরকার যে অন্তত ঠেকা দিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে পারে। ল্যান্স গিবস তখন বলে ভেল্কি দেখাচ্ছেন। আর একটি, দুটি উইকেট পড়লেই ইংলণ্ডের হার অনিবার্য।

নট ব্যাট করছিলেন কাউড্রের সংগে। যারা ভেবেছিল নট শুধু ঠেকা দেবেন, তারাই দেখল রোলা, লয় এবং ব্যাট-বলের সূক্ষ্ম ও চটাং বোলে নট ম্লান করলেন কাউড্রেকে। কাউড্রে আউট হলেন আউট হলেন আরও তিনজন। নট রইলেন ৭৩ রানে নট আউট। ইংলণ্ডের হার বেঁচে গেল।

বিজ্ঞ ক্রিকেট-লিখিয়ে ইয়ান উল্ডরিজ লিখেছেন—অসাধারণ ইনিংস—তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠগুলির অন্যতম। ওই খেলাতেই অ্যালান নট-এর গায়ে এক নম্বর উইকেট-কিপার-ব্যাটসম্যানের ছাপ পড়ে গেল।

ক্রিকেটের প্রতি অন্তহীন ভালবাসা। শারীরিক পটুতা বজায় রাখার জন্য চার্লটন অ্যাথলেটিক ক্লাবে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করেন। হাতুনার দৃষ্টি আর হরিণের তৎপরতা নিয়ে ওঠ পেছে রয়েছেন স্টাম্পের পেছনে। বল বা ক্যাচ ধরার জন্য ডাইনে বাঁয়ে এমনভাবে ডাইভ দেন, অনেকের পক্ষে বা কল্পনাতীত। পেলব দেহদণ্ড। সুন্দর ছন্দ। অদ্ভুত চটুলতা। স্টাম্পের সামনে ব্যাটের হাতও চমৎকার। কাট ও সুইপ ফেভারিট স্ট্রোক। ড্রাইভও ভাল করেন। বহু স্মরণীয় ইনিংস খেলেছেন। টেস্টেই আছে চারটি সেঞ্চুরি এবং চৌদ্দটি অর্ধ সেঞ্চুরি। ১৯৭১-এ ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাটিং অ্যাভারেজে শীর্ষস্থানে ছিলেন। ওই সিরিজে তিনটি টেস্টে করেছিলেন ৬৭ : ২৪; ৪১ : × ও ১০ : ১ রান। ভারতের বিরুদ্ধে পরবর্তী ৮টি টেস্টে কিন্তু খুব ভাল রান করতে পারেননি। যেমন ৪ : ×; ৩৫ : ২; ১০ : ১৬; ৪০ : ×; ৫৬ : ৮; ০ : ×; ২৬ : × এবং × : ×।

ভারতের মাঠে ভারতীয় স্পিনার সম্পর্কে নট-এর বেশ একটু আতঙ্ক আছে। কারণ ৭২-৭৩ সিরিজে ৮টি ইনিংস খেলে পাঁচবার আউট হয়েছিলেন চন্দ্রের বলে, দুবার বেদীর এবং একবার প্রসন্নর বলে।

মুকুল

অরণ্যদেব লী ফক

কী হচ্ছে, দেখে আসি চল্ !
আমাদের যাওয়া দরকার!
!

ওই তো উনি!
বাব্বা··· কী সাহস!

মানুষসুদ্ধ ঘোড়ার ধাক্কায় নীল দৈত্য পড়ে যাচ্ছে!

!!!
ঠঙ..
ঝন্..
পড়ে গিয়ে চুরমার!

নীল দৈত্যের পেট থেকে,
শিগগির জাহাজে চল্...

?!

তাড়া কর্ ওদের!
!
!
!

গুরেব্বাস.. এরা কারা?
অন্য গ্রহের জীব...
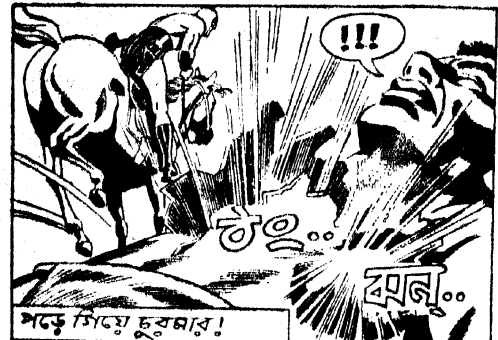
সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, সন্তু মুখোপাধ্যায়/**শেষরক্ষা** পরিচালনা : শংকর ভট্টাচার্য   ফটো : দেশ

রঙ্গজগৎ

ফরাসী ছবির উৎসব

আলিয়াঁস ফ্রাঁসেস ও ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজ-এর যৌথ উদ্যোগে সাতখানি ফরাসী ফিল্মের প্রদর্শনী উৎসব সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর এই তিন বছরের ফসল ছবিগুলি। ওদেশের চিত্র জগতের সাম্প্রতিক গতি ও প্রকৃতির কিছুটা আভাস পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে। যাঁরা সিনেমাকে কেবলমাত্র প্রমোদ মাধ্যম হিসেবে দেখেন না তাঁদের কাছে উৎসবের ছবিগুলির তাই একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে।

গোড়াতেই বলে রাখা ভাল, যুদ্ধোত্তর ফরাসী সিনেমায় যাঁরা নব তরঙ্গ তুলেছিলেন তাঁদের মত বা তাঁদের কাছাকাছি নতুন কোন

চলচ্চিত্র

প্রতিভাধরের সাক্ষাৎ মেলে নি এই উৎসবে। পূর্বসূরীদের প্রভাব অবশ্য অনেকে এড়াতে পারেন নি। সেই প্রভাব যখন অন্ধ অনুকরণের রূপ নিয়েছে তখনই ঘটেছে বিপদ।

সাম্প্রতিককালের ফরাসী সিনেমায় দুটি বিপরীত ধারা প্রবহমান। টেলিভিশনের প্রতিযোগিতা ঠেকাতে একদিকে যেমন সাধারণ দর্শকদের রুচি অনুযায়ী বেশ কিছু ছবি তোলা হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি সৃষ্টধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বন্ধ হয় নি ছবির পর্দায়। আবেগ-প্রধান ও শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য এই দু ধরনের ছবির সহাবস্থান ঘটেছে ফরাসী সিনেমায়। তারই কিছুটা আভাস পাওয়া গেল এই উৎসবে।

উৎসবের প্রথম ছবি "লিরনি দ্যু সর" (L'Ironie Du Sort) মনকে নাড়া দেয় প্রধানত ঘটনা-বিন্যাসের অভিনবত্বে। কত তুচ্ছ ঘটনার হেরফেরে মানুষের জীবনের ধারা পাল্টে যেতে পারে, তাই নিয়ে কাহিনীর টানা-পোড়েন। যুদ্ধের সময়ে নাৎসী-অধিকৃত একটি ছোট শহর গল্পের ঘটনাস্থল। সেখানকার প্রতিরোধবাহিনীর এক তরুণ সদস্যের ওপর ভার পড়েছে জনৈক জারমান অফিসারকে খুন করবার। অফিসারটির গতিবিধি দিনের পর দিন লক্ষ্য করবার পর সেখান থেকে গুলি ছোড়া হবে তা ঠিক হয়েছে। কিন্তু সব ভণ্ডুল করে দিল একটি অচল মোটরগাড়ি হঠাৎ সচল হয়ে উঠে। গুলি ছুটল, কিন্তু আততায়ী ধরা পড়ল। তারপর যথাসময়ে প্রাণ-দণ্ড। তার প্রণয়িনীর গর্ভে তখন তার অনাগত সন্তান। মেয়েটিকে বিয়ে করল নায়কেরই বন্ধু যে তাকে বরাবর ভালবেসে এসেছে। মেয়েটি কিন্তু স্বামীর শয্যা-সঙ্গিনী হয়েও তার প্রেমাস্পদকে ভুলতে পারে না।

কিন্তু সেদিন গাড়ির ভাঙা এনজিন যদি স্টার্ট না নিত তাহলে কী হতে পারত? প্রতিরোধ বাহিনীর পরিকল্পনা তাহলে নিশ্চয়ই ব্যর্থ হত না এবং নায়ক-নায়িকার মিলনে কোন বাধা ঘটত না। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে একটি জীর্ণ মোটরগাড়ি ওদের জীবনের সুখদুঃখ কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়।

আরো কত কী ঘটতে পারত। ধরা যাক—অন্য নারীর প্রতি নায়কের আসক্তির ফলে ওদের বিয়ে টিঁকল না, এবং—এবং—আরো কত 'যদি'-ই না ওদের জীবনকে কখনও ভারাক্রান্ত কখনও উচ্ছ্বসিত করে তুলতে পারত।

একটি সামান্য "যদি"-কে কেন্দ্র করে একই ঘটনার পুনর্বিন্যাস গোড়ার দিকে দর্শকদের কিছুটা বিভ্রান্ত করে। তবে পরিচালকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবার পর ছবির আসল "মজা" বোঝা যায়। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণ, গুপ্ত খুন সংক্রান্ত সাসপেনস গঠন এবং আঙ্গিকের পরিমিত ব্যবহার পরিচালকের মুনশিয়ানার পরিচায়ক। পরিচালকের নাম—এদুয়ার মলিনারো।

এরই বিপরীত প্রান্তে আছে মারগোরিত দুরা পরিচালিত "নাতালি গ্রানিয়ে" (Nathalie Granger)। প্রাত্যহিক জীবনের নীরসতা এবং সমাজ ব্যবস্থার হৃদয়হীন অনুশাসন বেঁচে-থাকাটাকে যে ধরনের absurd বা অবাস্তবতার পর্যায়ে এনে ফেলেছে তারই রূপায়ণ এই ছবির লক্ষ্য। কিন্তু স্টাইলের ভনিতায় ভারাক্রান্ত ছবিটি গতির অভাবে দর্শকের মনে রেখাপাত করতে পারে না। জান মরো ও লুসি বো সের মত দুজন নামকরা অভিনেত্রীর উপস্থিতি সত্ত্বেও ছবির বিরসতা দূর হয় না।

কোন রকম ভনিতার আশ্রয় না নিয়েও পিতা-পুত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বুদ্ধি-গ্রাহ্য বিশ্লেষণ করেছে "ল পেলিকা" (Le Pelicar) ও "লোরলজের দা সাঁ পল" (L' Horloger De St Paul) এই দুটি ছবি।

প্রথম ছবিতে দেখানো হয়েছে, ছেলেকে কাছে পাবার জন্যে এক স্নেহান্ধ বাপের আকুলিবিকুলি। দীর্ঘ কারাবাসের পর সে বাইরে এসে দেখে তার স্ত্রী অন্যের ঘরণী হয়েছে এবং যে-ছেলেকে শিশু অবস্থায় রেখে গিয়েছিল সে কৈশোরে পৌঁছে গেছে। এই ছেলেকে ঘিরেই তার যত কিছু স্বপ্ন। অথচ তার সঙ্গে দেখা করবারও উপায় নেই। গলা-ধাক্কা খেয়েও লুকিয়ে চুরিয়ে ছেলেকে দেখবার চেষ্টা করে সে, রাস্তায় ভাব জমাতে গিয়ে পুলিস-হাঙ্গামায় পড়ে যায়। তবুও তার স্বপ্ন দেখার বিরাম নেই। ভাবে—আজ হল না, কাল হয়তো দেখা হবে। জরার ব্র্যাঁ-র পরিচালনার কাজ পরিচ্ছন্ন। তবে পূর্ব-প্রস্তুতির অভাবে বাপের এতখানি উন্মত্ততা কিছুটা অতি-রঞ্জিত মনে হয়।

"লোরলজের দা সাঁ পল" (পরিচালক: বারনার তাভ্যারনিয়্যার) ছবিতে অবশ্য এ ধরনের কোন বাড়াবাড়ি নেই। সৎ-প্রকৃতির বাপ নিজের আদলেই ছেলেকে মানুষ করেছে, কিন্তু সে যখন খুনের দায়ে ধরা পড়েছে তখন বাপের মনে স্বতই প্রশ্ন জেগেছে কোথায় ভুল হয়েছিল। এই আত্ম-জিজ্ঞাসা একটি সরল মানুষকে রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। আবেগের স্পর্শ থাকলেও পরিচালনার গুণে তা কখনো অসহ্য মনে হয় নি।

ফ্রাঁসোয়া ল্যাতোরিয়্যার পরিচালিত "প্রজেকসিওঁ প্রিভ" (Projection Privee) এক চিত্র-পরিচালকের জীবনের কাহিনী। তাঁর প্রথমা প্রণয়িনী মারথা আত্মহত্যা করেছিল পরিচালক তাকে ছেড়ে যখন ক্যামিলি নামের একটি অল্পবয়সী মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি ছবি তুলতে শুরু করলেন পরিচালক, কিন্তু কীভাবে তা শেষ করবেন সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিল। ক্যামিলি সে সংশয়ের নিরসন করল নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কারণ, ছবির এক অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচালকের মাথামাখি দেখে তার মনে হয়েছিল, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে এবং তার সুখের দিন ফুরিয়েছে। ভাগ্যক্রমে ক্যামিলি বেঁচে উঠল ও নিজের ধারণা যে ভুল তা বুঝতে পারল। তার ফলেই পরিচালক তাঁর ছবির একটি সুসংগত পরিণতি খুঁজে পেলেন।

ছবির দুটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বার মত —মনের ভাবনার চিত্রায়ণ এবং সুলিখিত চিত্রনাট্য।

উৎসবের বাকি দুটি ছবি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। নিটোল কোন গল্পের পরিবর্তে নানাবিধ চরিত্রের আনাগোনা সেখানে।

"কেলক পার কেলকয়া" (Quelque Part Quelpu'un) ছবিতে পরিচালক ইয়ানিক বেল' প্যারিসের মত বড় শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাবলী তুলে ধরতে চেয়েছেন। যোগ-সূত্রের অভাবে ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে তা দানা বাঁধতে পারে নি।

"রুদ জুরনে পুর লা র‍্যান" (Rude Journee Pour La Reine) রিয়্যালিটি ও ফ্যানট্যাসির এক অসম্বদ্ধ জগাখিচুড়ি। পরিচালক র‍্যান আলিও খানিকটা গদারের ধাঁচে ছবি তুলতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর শিল্পপ্রতিভার অধিকারী হতে পারেন নি। ফলে অনধিকারীর হাতে একটি বিশিষ্ট শৈলীর অপমৃত্যু ঘটেছে।

মনের প্রসার বাড়াবার মত বিদেশী ছবি এ দেশে খুব কমই আসে। তাই মাঝে মাঝে এই ধরনের বিদেশী ছবির উৎসব যাঁদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় তাঁরা চিত্রামোদী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

—অনুজেন্দু ভক্ত

সেই আদ্দিকালের পুরোনো ধারণাটা আজো টালিগঞ্জে চালু আছে যে অত্যন্ত ঢংয়ের একটি গল্প হলেই যদি তাতে ঘাতপ্রতিঘাতের অতিনাটকীয়তায় আর্থিক সাফল্যের কোনো সুদূর মরীচিকাও চিকচিক করে, তা থেকে ভালো ছবি হতে পারে। স্বভাবতই যে-গল্পের চরিত্রগুলি সহজে ধরা দেয়, যার বিন্যাসে কোনো পাশকাটানো তির্যকতা নেই, যেখানে কোনো স্বল্পালোকিত অর্থের তৃতীয় আয়তন অস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয় না, তা-ই অধিকাংশ বাঙালী পরিচালকের পক্ষে অবিরামভাবে উপাদেয়, লোভনীয়, নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ। কেননা এই ধরনের কাহিনীর মোড়কে রেডিমেড মালমশলাগুলি—যেমন, প্রেম, বিচ্ছেদ, বিরহ মিলন দেশপ্রেম, মাতৃভক্তি, বাৎসল্য—ঠ্যাসাঠেসিভাবে থেকে পরিচালককে সৃষ্টিশীল পরিশ্রমের অহেতুক দীর্ঘ ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ দেয়। তা বলে একথা বলছি না যে কিছু তুংগতম গল্প-উপন্যাস নিয়ে বাংলা ছবি হয় নি। কিন্তু সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক ঢিলে সিনেমা ও সাহিত্যের দুটি পাখিকেই খতম করা হয়েছে। বিদেশেও যে এমন ঘটনা ঘটে না তা নয়। 'ডঃ জিভাগো' ছবিটি একটি অপারগ 'সাহিত্যিক' সিনেমার উদাহরণ।

সুতরাং সাহিত্যে যা কিছু ভালো তাই কিন্তু হুবহু সিনেমার নিজস্ব মান ও ভাষার দ্বারা অনুমোদিত হতে পারে না। অতএব সিনেমায় কাহিনীর চেয়ে যেটা বড় সেটা হল ট্রিটমেনট—পরিচালকের নিজস্ব ভাবনা, ভঙ্গি, স্টাইল। কাহিনী ছাড়াও আটসাট প্লটের গল্প ছাড়াও ছবি হতে পারে, এবং সেটা যে শুধু তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি এমন নয়। কিছু সার্থক ছবি তো নিশ্চয় তৈরি হয়েছে যা কোনো ঘনবন্ধ কাহিনী বা লিখিত স্ক্রিপ্ট থেকে গড়ে ওঠেনি। এদেশে তো মৃণাল সেন ও মণি কাউলের ছবিতে এ জাতীয় কাহিনী-বিরোধী সাহসী ভাঙচুর যে কতদূর যেতে পারে তা আমরা দেখেছি। এবং একটি অতি পাতলা ঘটনা-বিন্যাসের ওপর নির্ভর করেও একটি ছবি শৈল্পিক উদ্ভাবনায় কোন চূড়ান্ত বিন্দু ছুঁয়ে আসতে পারে সেটা দেখি সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবিতে। আর বিদেশে তো কিছু কালজয়ী সিনেমা একেবারে সরাসরি ক্যামেরার সন্তান হয়েই জন্মেছে, ভাবনার কোনো পর্যায়েই সাহিত্য তাদের স্পর্শ করেনি। এই জ্যং-এর ছবির প্রসঙ্গে গোদার-এর পুরোনো উদাহরণ যদি আপনাদের ভালো না লাগে তাহলে আপনারা লেলুশ-এর 'এ ম্যান অ্যাণ্ড এ উওম্যান' ছবিটির কথা ভাবুন। এই মুহূর্তে কলকাতায় ঐ ছবির যে স্ক্রিপ্টটি পাওয়া যাচ্ছে সেটি কিন্তু ছবিটি থেকে তৈরি তার হুবহু বর্ণনা মাত্র।

আজকের বাঙালী দর্শক সিনেমার নানান সম্ভাবনা সম্বন্ধে এতো বেশি ওয়াকিবহাল বলেই টালিগঞ্জের কাছে তার প্রত্যাশা অনেক। সে যে শুধু ভালো ছবি দেখতে তীব্রভাবে উৎসুক তাই নয়, সে চায় বিচিত্র রকমের ভালো ছবি। তার চাই সত্যিকারের উত্তীর্ণ থ্রিলার যা তার মেরুদণ্ডকে অন্তত ঘণ্টা দুই ধরে ধনুকের ছিলার মতো টানটান রাখবে; তার চাই গা-ছমছম রহস্যচিত্র কিংবা 'ওয়েট আনটিল ডার্ক' পর্যায়ের (দয়া করে এরকম ছবিতে খান ছয়েক গান জুড়ে দেবেন না) গায়ে কাঁটা-দেয়া কি-হয়-কি-হয় ছবি; তার চাই এমন ছবি যা আমাদের সিনেমা-বিষয়ক প্রাচীন সংস্কারগুলিকে একেবারে চুরমার করে দেবে, যেমন দিয়েছিল একদা 'পথের পাঁচালী।' এবং তার চাই সত্যিকারের মননশীল ফ্যানট্যাসি। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সার্থক ফ্যানট্যাসির সিকে মাত্র একবারই ছিঁড়েছে, সত্যজিৎ রায়ের ১৯৬৯-এ তৈরি 'গুপী গাইন' ছবিতে, যদিও সেটির শৈল্পিক ও আর্থিক সাফল্য চূড়ান্ত। তারপর সাত-সাতটা বছর কেটে গেছে, এবং বাঙালী পরিচালকের পাড়-ঘেঁষা, ডুবসাঁতারী সন্ধানে ক্রমাগত ধরা দিয়েছে ঠুনকো রঙীন ঝিনুক, কিন্তু কোনো অতলান্ত মণিমুক্তো একবারও নয়।

অথচ যে প্রশ্নটা এ পর্যন্ত কেউ তুললেন না, বা মনে মনে ভেবেও এড়িয়ে গেলেন, সেটা হল এদেশে 'গুপী গাইন'-এর আগে বা পরে নেহাৎ পাতে দেবার মতো ফ্যানট্যাসিও তৈরি হল না কেন? এ প্রশ্নের সমাধান কিন্তু কোনো গভীর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। তৈরি হল না, কেননা প্রিয়-বান্ধবী, মোমবাতি, বাঘবন্দী খেলা, হোটেল স্নো-ফকস ইত্যাদি অধিকাংশ বাংলা ছবির চেহারা ভাবলেই বোঝা যায় যে, যে ধরনের বা যে জাতীয় কল্পনা, সিনেমা-চেতনা ও প্রতিভার প্রয়োজন একটি ফ্যানট্যাসিকে তার সম্পূর্ণতায় ভেবে নিয়ে রূপ দেয়ার জন্যে তার একান্ত অভাব আজকের টালিগঞ্জে। কেন যে টালিগঞ্জ তার কল্পনাকে আরো বেশি বিন্যাসিত করে না, কেন যে ক্যামেরার ভাষায় নিয়ে আসে না সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর পারের তেপান্তরী উল্লাস, কেন যে সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রে যেসব উদভ্রান্ত বাতাস অহরহ বইছে তার সংক্রমণ থেকে টালিগঞ্জ নিজেকে এমনি সযত্নে সরিয়ে রাখে, এসব প্রশ্নের উত্তরও একটু ভাবলে পরিষ্কার হয়ে যায়। উত্তরটা এই যে টালিগঞ্জ আজো সিনেমা-বিষয়ক কুসংস্কারগুলিকে ট্র্যাডিশান বলে ভুল করে, কূপমণ্ডূকতাকে মনে করে জাতীয়তাবোধ, এবং চলচ্চিত্রের মতো একটি বিদেশী মিডিয়ামকে সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ভুয়ো ধারণা পোষণ করে। অবিশ্যি এ ছাড়াও বাঙালী পরিচালক কেন যে এ পর্যন্ত একটিও সার্থক ফ্যানট্যাসি তৈরি করতে পারলেন না তার একটি গভীর কারণ আছে। ফ্যানট্যাসির জন্যে প্রয়োজন 'উদ্ভট' বা 'আজগুবী' প্রাসঙ্গিক গভীর মনন যে [illegible] ভাবনা, বিশেষ করে ফরাসী শিল্পে, সাহিত্যে, [illegible] পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। [illegible] ফরাসী [illegible] সঙ্গে অ্যাবসার্ড-বিষয়ক চিন্তার একটা অ-ব্যাখানীয় সংলগ্নতা আছেই আছে। এবং একেবারে খাঁটি ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যে সেই বিশেষ ধরনের মনীষিতা চোখে পড়ে না যার ফলে সম্ভব হয় একজন আঁদ্রে ল্যামরস কিংবা স্যামুয়েল বেকেট। ভিন্ন পর্যায়ের ফ্যানট্যাসি হিসেবে সুকুমার রায়ের 'আবোলতাবোল' বা 'হযবরল' তাই বাংলা সাহিত্যে একটি আশ্চর্য একক ঘটনা। কুমড়োপটাশের [illegible], দক্ষিণ হাওয়ার সুড়সুড়ি, কিংবা হাঁসজারুর অলৌকিক সম্ভাবনার চেয়ে অ্যাবসার্ড কিংবা ফ্যানটাসটিক আর কি হতে পারে? মনে হয় কলকাতার বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের মধ্যে উদ্ভট-ভাবনার এই ফরাসী বীজটি কোনো আশ্চর্য বাতাসে উড়ে এসে পড়েছিল প্রায় চার পুরুষ আগে, উপেন্দ্র-কিশোরের কল্পনায়। এক পুরুষ পরে

উপেন্দ্রকিশোরের গল্প নিয়ে সত্যজিৎ যখন 'গুপী গাইন' ছবিটি করলেন তখন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে অর্জিত ফ্যানট্যাসির প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতাটা ধরা পড়লো। 'গুপী গাইন'-এর পরে বাংলা ছবিতে অন্যের কখনো ফ্যানট্যাসির খুব আনাচে কানাচে ছাপ দেখা গেছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি একটি সার্থক ফ্যানট্যাসি—যেখানে আপাত উদ্ভট স্বপ্নের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে ভিশন বা পরাদৃষ্টির সুদূর-স্পর্শী উদ্ভাস—এ পর্যন্ত টালিগঞ্জের নাগালের বাইরে থেকে গেছে।

ফ্যানট্যাসি ছবির মূল কথা হল, বাস্তবকে, প্রাত্যহিককে একেবারে এমন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যে আমাদের চোখে তার অত্যন্ত চেহারাটা যেন আমূল পাল্টে যায়। এই ধরনের র‍্যাডিকাল ডিসটরশান-এর জন্যে প্রয়োজন সেটিংস, কসটিউমস, মেকআপ প্রভৃতির এতদূর নতুনত্ব যে আমাদের চেনা পৃথিবীটাকে আমরা নতুন ভঙ্গিতে অচেনা অবয়বে আবিষ্কার করতে পারি। তারপর দরকার কিছু আমূল ভিসুয়াল ডিসটরসানস যাতে পারস-পেকটিভস, প্রপোরসানস দৃশ্যবস্তুর পারস্পরিক সাযুজ্য ও সম্পর্ক সব কিছু নতুন ছন্দে, বিভঙ্গে, আয়তনে ধরা দেয়। সার্থক ফ্যানটাসির মধ্যে অর্থের যে অ্যামবিভ্যালেনস বা ব্যাখ্যা-বিমুখ অসম্ভাবনার তাৎপর্যটি থাকে সেটা সিনেম্যাটিক্যালি বোঝানো যায় দৃশ্যবস্তুর অসমঞ্জস সংলগ্নতাকে কাজে লাগিয়ে এবং অনভ্যস্ত ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল বা ক্যামেরা-চালনার মধ্যে দিয়ে। এ ছাড়া সার্থক ফ্যানট্যাসিতে অনেক সময়েই টোনাল ডিসটরশনস বা টোনাল রিলেশনসিপস-এর আমূল পরিবর্তন কাজে লাগে। স্বপ্ন ও ফ্যানটাসির আর একটি অবিকল ভাষা অ্যানিমেশন, যার প্রয়োগ বাংলা চলচ্চিত্রে খুবই বিরল। পূর্ণেন্দু পত্রীর 'স্ত্রীর পত্রে' ফ্যানটাসির ক্ষণিক আভাস নিয়ে আসতে অ্যানিমেশন-এর প্রয়োগ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। কোনো ছবির শাব্দিক পরি-মণ্ডলটিও ফ্যানট্যাসির রূপায়ণে অনেকদূর সাহায্য করে। কতদূর, সেটা বুঝবেন যদি এই কটি দৃশ্যের কথা অস্পষ্টভাবেও ভাবতে পারেন—(১) 'নায়ক' ছবিতে টাকার পাহাড়ে উত্তমকুমারের তলিয়ে যাবার দৃশ্য; (২) 'নায়ক' ছবির আর একটি স্বপ্ন-দৃশ্য যেখানে উত্তমকুমার একটি 'অলৌকিক' ক্লাবের মধ্যে ঢুকে পড়ছেন এক স্বপ্ন-চারিনীর সন্ধানে; (৩) প্রতিদ্বন্দ্বী ছবির সেই স্বপ্ন-দৃশ্য যেখানে সিদ্ধার্থর বিকৃত মুণ্ডুটি একটি গিলোটিনে রাখা হয়েছে; (৪) 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবির দ্বিতীয় স্বপ্ন-দৃশ্যটি যেখানে শব্দপ্রয়োগের নিপুণতা ঐ সামুদ্রিক পরিবেশের ফ্যানট্যাসিকে অনেক-দূর পর্যন্ত ভাষা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বুলগেরিয়ার ছবি 'সান অ্যান্ড শ্যাডো'র একটি দৃশ্য মনে পড়ে যেখানে নদী-তীরবর্তী একটি মাছের জাল থেকে জল বা মাছের বদলে ঝরে পড়ে আশ্চর্য নরম, তরল সংগীত!

বিদেশী ছবিতে ফ্যানট্যাসির বিচিত্রতা অসম্ভব অবাস্তবের জন্যে যে আমাদের সব রকম বাসনার শুধু রসদ জোগায় তাই নয়, সেই সঙ্গে প্রাত্যহিকতায় ক্লান্ত আমাদের চেতনাকে নতুন সম্ভাবনার ইশারায় জাগিয়ে দেয়। কখনো-সখনো এইসব গভীরস্পর্শী ফ্যানট্যাসি তাদের আপাত-আবোলতাবোলকে পেরিয়ে আমাদের অবচেতনার অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে, কখনো আমাদের অভ্যস্ত চেনো জগৎটার মধ্যে যেসব হাস্যকর অসামঞ্জস্যভরা পাতলা আড়ালে লুকিয়ে আছে সেগুলিকে ভিসুয়ালি আমাদের সামনে তুলে ধরে, আর কখনো কখনো আমাদের এই চূড়ান্ত উপলব্ধিতে নিয়ে আসে যে প্রাত্যহিক আর অলৌকিকের মধ্যে বেড়া দিয়ে আছে শুধুমাত্র একটি হাওয়ার দেয়াল। যেমন ধরুন, অ্যালবার্ট ল্যামোরিজ-এর 'দ্য রেড বেলুন' ছবিতে। এখানে একটি বেলুনের সঙ্গে বন্ধুতা হচ্ছে একটি ছোট্ট ছেলের। ক্রমেই পাগলা বাতাসে উড়ে যাওয়া এলোমেলো বেলুন হয়ে উঠছে ছেলেটির বাধ্য, তার চরিত্রের নির্লিপ্ত উদাসীনতা বর্জন করে মেনে নিচ্ছে ছেলেটির প্রবল আধিপত্য। কিন্তু ছেলেটি তো সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, তার ছোট্ট সুন্দর হালকা পৃথিবীর বাইরে সে অন্যের দ্বারা শাসিত তাড়িত। ছেলেটি কোনো কারণে একদিন তিরস্কৃত হলে, শুধুমাত্র জটুকথায় ধাক্কায় বেলুনটি ফেটে গেল। এবং তার পরে আবার অন্য আর এক সুন্দর পৃথিবীতে—যেখানে কেউ রাগ করে না আর যেখানে মনের আনন্দে ভেসে যাবার জন্যে আছে শুধু নীল আকাশ—বেলুনটি আবার জন্মালো আর খুঁজে পেলো তার হারানো আত্মীয়দের, অন্য অনেক রঙিন বেলুনকে, আর ভেসে চললো তারা অনন্ত-কালের তীর্থপথে, আর ঐ ছোট্ট ছেলেটিও চললো তাদের সঙ্গে ভাসতে-ভাসতে, কেননা সেও তো সব ছোটদের মত আকাশের, মেঘের, চাঁদের দেশের ছেলে।

যে-প্রশ্নটি আমি এখানে না-তুলে পারছি না, তা হল, 'দ্য রেড বেলুন' ছবিতে এতক্ষণ যা দেখলাম তা কি শুধু উদ্ভট, অসম্ভবের রূপায়ণ, না কি প্রাত্যহিকের মধ্যে অন্য এক উদ্ভাসকে ধরে ফেলার চেষ্টা? আর তৎক্ষণাৎ এই প্রশ্নের জের টেনে আমাদের চলে আসতে হয় আর্ট-এর জগতে 'দাদাইস্ট' মুভমেন্ট-এর গোড়ার কথায়। এই মুভমেন্ট-এর একটি স্রোত অন্তত ফ্রয়েডীয় স্বপ্ন-বিন্যাসে তার ভবিষ্যতের প্রবাহ পথটি খুঁজে পেল। তার ফলে বোঝা গেল অবচেতনার উদ্ভাসে বাস্তবের মধ্যে ধরা দেয় আরো এক বাস্তব, এবং প্রাত্যহিক দৃষ্টিতে ধরা-পড়া রিয়েলিটির চেয়ে পরা-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত রিয়েলিটির ভিন্ন মুখটি অন্যভাবে মিথ্যে নয়। একটিকে যদি রিয়েলিটি বলা যায়, অন্যটিকে বলতে হবে সুররিয়েলিটি—অর্থাৎ বাস্তব-অতিক্রান্ত-বাস্তব! এবং এখানেই ফ্যানট্যাসির নিবিড়তম শিকড়। আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় কষ্ট তা হল 'টালিগঞ্জীয়' [illegible]ফ্যানট্যাসিতে (যে-কটি এ-পর্যন্ত হয়েছে কখনই এই সুররিয়েলিসটিক ব্যঞ্জনা[illegible] আসে না, এবং আসে না বলেই সে তার স্থূল বাস্তব বিরোধিতা নিয়ে টাল সামলাতে পারে না। তবু টালিগঞ্জের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। এবং টালিগঞ্জের দায়িত্বও তাই শিখরস্পর্শী।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

কার অ্যাকসিডেন্টের সূত্রে আমজাদ খান এখন সারা ভারতের সকল ভাষার সংবাদ-পত্রের বড় খবর। আসলে দুর্ঘটনার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে আর একটি দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়লেন আমজাদ। আগেই ঠিক ছিল আমজাদের স্ত্রী ও তিন বছরের পুত্র ছুটি কাটাতে যাবে গোয়ার পানাজিতে।

আমজাদ যাবেন 'দ্য গ্রেট গ্যাম্বলার' ছবির শুটিং করতে ওখানেই। প্রথমে ঠিক ছিল ওঁরা যাবেন প্লেনে। কিন্তু সান্তাক্রুজের সেই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পর স্থির হল যাওয়া হবে আমজাদের গাড়িতে। সেইমত যাত্রা হল শুরু। পানাজি পৌঁছতে যখন আর শ'খানেক মাইল বাকি, তখন আমজাদ নিজে স্টিয়ারিং-এ বসলেন ড্রাইভারকে একটু বিশ্রাম দিতে। গোয়া আর মহারাষ্ট্রের বর্ডারের কাছাকাছি এসে গাড়ির একটি টায়ার বার্স্ট করল। গাড়ির স্পিড ছিল দারুণ, আমজাদ আর সামলাতে পারলেন না, গাড়ি গিয়ে ধাক্কা খেল একটি গাছে। আমজাদ দারুণভাবে আহত হলেন। শ্রীমতী আমজাদও আহত, তবে ওঁর আঘাত তত মারাত্মক নয়। ড্রাইভার এবং আমজাদের ছেলের কোন চোট লাগেনি।

পথ চলতি স্টেট ট্রানসপোর্টের একটি বাস আমজাদকে সাওন্তবাদি হাসপাতালে নিয়ে যায় তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্যে। পরে তাঁকে পানাজির এক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়ে 'দ্য গ্রেট গ্যাম্বলার' ছবির পরিচালক শক্তি সামন্ত এবং অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এসে পৌঁছোন হাসপাতালে। ওঁরা সেই থেকে সর্বক্ষণ হাসপাতালেই আছেন। বম্বে আর দিল্লি থেকে একদল সাংবাদিক প্রযোজকের আমন্ত্রণে ছবির শুটিং দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের কাছে ছবির চেয়ে আমজাদই এখন বড় খবর।

—সুরঞ্জন

সান্ধ্য আসরে বিলায়েৎ ও সুজাত

রবীন্দ্রসদনে শ্যামশ্রী ঠাকুর আয়োজিত এক সান্ধ্য আসরে বসেছিলেন প্রখ্যাত সেতারী ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ ও তাঁর পুত্র সুজাত খাঁ গত ২৩শে অকটোবর। তাঁর প্রধান নিবেদন ছিল অপ্রচলিত রাগ সাঁজ সারাবরী। এই রাগে বিলায়েৎ খাঁ ও সুজাত খাঁ বিস্তৃত আলাপ, জোড়, ঝালা, বিলম্বিত গৎ ও দ্রুত গৎ বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন। আলাপের স্বরবিস্তারে বিলায়েৎ খাঁর স্বাভাবিক শিল্পবোধ ও ভাবপ্রবণতা ছিল। সুজাত খাঁও বাজিয়ে গিয়েছিলেন নির্ভীক চিত্তে বিখ্যাত পিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কখনো পিতার সুরের নকশা বেজে উঠছিল তাঁর সেতারে, কখনো একই সুরের জাল বুনেছিলেন পিতা পুত্র অংশে অংশে।

জোড়ের মীড়খন্ড, গমক, তান-তোড়া ও ঠোক ঝালাও ছিল সুর ও দক্ষতায় ভরপুর। সুজাত খাঁ এই অংশেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, তবে তাঁর সেতারটির আওয়াজ অতি কর্কশ হওয়ায় তাঁর বাজনা সব সময় শ্রুতি-মধুর হয়নি। দোষটা

সান্ধ্য আসরে বিলায়েত, সুজাত ও শান্তাপ্রসাদ — ফটো : সুধীর চ্যাটার্জী

সেতারেরই, শিল্পীর হাতের নয়, এ-ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ কারণ যখন সুজাত খাঁ বিরতির পর তাঁর পিতার সেতারে ভাটিয়ালি পরিবেশন করেছিলেন তখন বিলায়েৎ খাঁই বাজাচ্ছেন বলে মনে হয়েছিল।

বিলম্বিত গৎ কিন্তু সেরকম জমেনি কারণ আলাপে এই রাগের যা যা করা সম্ভব প্রায় সবই করা হয়ে গিয়েছিল। কাজেই সুরের দিক থেকে একটা একঘেয়েমি বড় প্রবল হয়ে উঠেছিল। তবে দ্রুত গতে তান-কারি ও ঝালা এই ভাবটা খানিকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। আসরের শেষ অংশে বিলায়েৎ খাঁ বাজিয়েছিলেন একটি গারা ঠুংরী, যা আস্তে আস্তে রাগমালার রূপ ধারণ করেছিল। এরপরে বাজিয়ে ও গেয়ে শুনিয়েছিলেন এক পাঞ্জাবী গীত। নিপুণতার সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন বেনারসের প্রখ্যাত তবলিয়া পন্ডিত শান্তা-প্রসাদ।

সাঁজ সারাবরী খুবই অপ্রচলিত রাগ কাজেই এর বিষয়ে দু একটি কথা বোধ হয় বলা উচিত। রাগটির প্রযোজ্য স্বর স র গ ম হ্ম প ধ ন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে স্বরের দিক থেকে ইমনকল্যাণের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্যটা রাগের চলনে। এতে ইমনের অঙ্গ প্রায় নেই বললেই চলে। আরোহণে তীব্র মধ্যমও বর্জিত। রাগটি কল্যাণ অঙ্গ প্রধান। অর্থাৎ প ধ প স, র গ প, প র স, গ ধ প র স এর মধ্যে স্বর-বিন্যাস। প্রত্যেকটি আসছে কল্যাণ অঙ্গের জনক রাগ শুদ্ধ কল্যাণ থেকে। যেমন কামোদ বা কেদারে প ধ প স বা প স র স। কল্যাণ অঙ্গের প্রসঙ্গে রাগরসিকদের একটি মজার খবর জানাই। কিছুদিন আগে এক ইংরেজী সংবাদপত্রে দেখলাম এক সমালোচক লিখেছেন যে শুদ্ধ কল্যাণে প ধ প স বিন্যাস বর্জনীয় কারণ এটি হেম কল্যাণে ব্যবহার করা হয়। কথাটা পিতার মুখে পুত্রের আদল এসেছে বলার মত—কল্যাণ অঙ্গের উৎস শুদ্ধ কল্যাণ এবং হেম কল্যাণে প ধ প স ব্যবহার্য কারণ এটিও কল্যাণ অঙ্গের রাগ।

যা হোক সাঁজ সারাবরীতে গ ম র গ— এই ভাবে শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ থাকায় এবং প ধ ম ধ প—এই ভাবে শুদ্ধ নিখাদের ব্যবহার থাকায় এটি একটি স্বতন্ত্র রাগ।

—মীনাক্ষ গুপ্ত

একাকী মিছিল

ত্রিপুরা থেকে এসেছিলেন জলধর মল্লিক। কলকাতার থিয়েটার সেনটারের সহযোগিতায় তিনি উপস্থাপন করলেন তাঁর 'চেয়ার' নাটক। এ নাটকে চরিত্র অনেক, কিন্তু রূপকার একজনই—তিনি আগর-তলার জলধর মল্লিক। একক অভিনয় এই কলকাতায় অপরিচিত নয়, তবে শ্রীযুক্ত মল্লিক আর একটু এগিয়েছেন, প্রসেনিয়ম ছেড়ে, মঞ্চের তিন দেওয়ালের বাধা সরিয়ে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। ত্রিপুরায় তিনি নিয়মিত এই নাটক ও 'মাচিরাম গুড়' একক অভিনয় করেন। থিয়েটার সেণ্টার প্রেক্ষাগৃহের ঢোকার মুখে ফাঁকা জায়গায় চারপাশে সতরঞ্চি বিছানো ছিল, আর ছিল কিছু বেঞ্চ ও তক্তাপোষ, দর্শক আসন চার পাশে এইভাবে ছড়ানো। চার পাশের টিউব লাইট ছাড়া শুধু নাটকের প্রয়োজনে একক অভিনেতার মাথার উপরে লাগানো ছিল দুটি আলো—লাল ও সবুজ। মাঝে একবার দুটি চরিত্র বোঝাতে জলধর-বাবু ব্যবহার করেছেন পিজবোর্ড কাটা একটি মানুষের সাজেশন, এবং আর একবার শুধুই একটি মুখোশ। এ ছাড়া সময় বিশেষে চেয়ারের বিবর্তন বোঝাতে চার পাশে চারটি সিংহাসনের ছবি (পালানু-ক্রমিক) ঝুলিয়ে দেওয়া হল এবং ওলটাতেই শুধুই বিভিন্ন ধরনের চেয়ারের ছবি দেখা

গেল। প্রয়োজনমত শ্রীযুক্ত মল্লিক পায়ে ঘুঙুর বেঁধেছেন, মন্দিরা বাজিয়ে গান গেয়েছেন। সম্পূর্ণ স্বনির্ভর প্রযোজনা। অবশ্য একে প্রযোজনা না বলে উপস্থাপনা বলাই সঙ্গত—শ্রীযুক্ত মল্লিকও তাই বলেছেন। এক ঘণ্টা পনের মিনিটে শিল্পী নানাভাবে কথা বলেছেন, গান গেয়েছেন, নেচেছেন, বর্তমান থিয়েটারের প্রায় সব কটি ভঙ্গিমাই এই নাটকের অন্তর্গত। কোন সময় তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে দর্শক হেসেছেন, কোন সময় তাঁর যন্ত্রণায় দর্শক দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। অনেক সময় হয়ত কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন ক্লান্তিতে। শুধু একটি চেয়ার নিয়ে কোন রকম কলাকৌশলের সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র অভিনয়ের উপর ভরসা করায় শিল্পীর দুঃসাহস নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় তবুও একটা কিন্তু থেকে যায়। শ্রীযুক্ত মল্লিকের বক্তব্য অনেক, অথচ সেই বক্তব্যকে গুছিয়ে নাটকীয় করা অনেক সময়েই সম্ভব হয়নি তীব্র কণ্ঠের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অভাবে। জলধর মল্লিক এই নাটকের আখ্যা দিয়েছেন 'অন্তরঙ্গ নাটক'। সকলকে চার পাশে বসিয়ে মাঝে মাঝে ম্যাজিশিয়ানের মত দর্শককে চেয়ারের কাঠ ঠুকে যাচাই করতে বলা, আসনের তলা থেকে মুখোশ বের করা, কাউকে প্রশ্ন করে প্রকৃষ্ট ভাবে অন্তরঙ্গ পরিবেশ রচনা করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন কিন্তু তাঁর আখ্যার পরবর্তী শব্দ 'নাটক' যার প্রাথমিক শর্ত অভিনয় ক্ষমতা বিশেষত একক অভিনয়ে—সে ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত মল্লিককে আরও যত্নবান হতে হবে।

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

নৃত্যালোচনা

যথার্থ নৃত্যাভিনয়

সংগীত-কলামন্দিরের উদ্যোগে নয়াদিল্লির ইনডিয়ান রিভাইভাল গ্রুপ সম্প্রতি কলামন্দিরে নৃত্যাভিনয় দেখিয়েছিলেন। প্রথমে মণিপুরী মহারাষ্ট্রী লোকনৃত্য, নাগা এবং রাস। মণিপুরী অংশটি ছিল

'শ্যামা'র একটি দৃশ্য

যোগসুন্দর, মহারাষ্ট্রের 'তামাশা' লোক-নাট্যের নৃত্যাংশে ছিলেন চন্দ্রা সিং : সমস্ত মঞ্চ জুড়ে তাঁর লোকনৃত্য বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছিল। নরেন্দ্র সিং 'কাবুই নাগা' নৃত্যে বলিষ্ঠতা এবং ভাবাভিনয়কে চমৎকার সম্মিলিত করেছিলেন। রাস-নাচের উৎপত্তি কাংড়া উপত্যকা থেকে—এখানেও নাচের কম্পোজিশন কাংড়া চিত্রাবলী থেকে আহৃত হয়েছে। সেই বর্ণাঢ্য গরিমায় চিত্রের মত এই অভি-রস নৃত্য সবচেয়ে সুখদৃশ্য হয়ে উঠেছিল।

তারপরে মহাভারতের 'কীরাতার্জুন' সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যে অভিনীত হয়। নির্দেশক যোগসুন্দর স্বয়ং অর্জুনের ভূমিকা নিয়েছিলেন। বয়স থেকে মেদ উপহার দিয়েছে কিন্তু ধ্রুপদী নৃ[...] সাধনালব্ধ স্বাভাবিক মহিমাকে হ[...] করতে পারেনি। সেখানে অন্যান্য চরি[...] নৃত্য ম্লান মনে হয়েছে।

প্রতিটি খণ্ড নৃত্য বা মহাভারত[...] নৃত্যনাট্যের ভিত্তি ছিল ক্লাসিক[...] পরিচ্ছদ থেকে পদক্ষেপ পর্যন্ত সম[...] কিছুই সনাতনী সংযত; কোরিওগ্রা[...] যোগসুন্দরের কীর্তিমান প্রতিভা: প্রযোজ[...] তালিমবদ্ধ আর মুখভঙ্গী অপেক্ষা দে[...] ভঙ্গীতে অধিক নজর। এমন চমক[...] নৃত্যাভিনয় আমাদের এই শহরের বি[...] নৃত্যনাট্যদর্শী তিক্ত অভিজ্ঞতার সামনে এ[...] নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়।

শেষ প্রযোজনা 'শ্যামা'র হি[...] রূপান্তর দেখতে গিয়ে সে কথা আর[...] অনুভব করা যায়। উত্তীয়র হত্যা পর্য[...] দেখানো হয়েছে, কারণ চরিত্রাভিনেতা[...] অনুপস্থিত ছিলেন। মুখোশধারী প্রহরী[...] দের চোর ধরার প্রস্তুতি বা শ্যামার প্রসাধ[...] বেশ দীর্ঘস্থায়ী; হিন্দী ভাষায় কবির গা[...] সুর প্রায় অবিকৃত রেখেও যে নাট্যের সঙ্গে[...] যথার্থ সম্মিলিত করা যায় তাও প্রমাণ হল[...] দরকারে গদ্য সংলাপও ব্যবহৃত হয়েছে[...] কোটালের সংযত স্টেপিং এ শহরে দুর্লভ[...] আর প্রয়োজনবোধে ওড়িশী, যক্ষগা[...] কর্ণাটকী কথক আর কথাকলির প্রয়োগ[...] বিভিন্ন চরিত্রকে মুক্ত করে দেয়। এই ধ্রুপদী[...] আঙ্গিকের সামান্য রেশও সমস্ত নৃত্য-নাট্যকে একটি গম্ভীর মর্যাদা দান করেছে[...]

সংগীতাংশও প্রশংসনীয়। পরিচ্ছ[...] (মালতী মেহতা) মঞ্চ (গোবর্ধন পাঞ্চাল[...]) আলোকসম্পাত (রাজকুমার) কোনটি[...] প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে ওঠেনি। প্রথমদিকের নৃত্যাংশে খোল এবং তবলার বোল (সনৎ অবধবিহারী, সুশীল সিংহ) যেমন চমৎকার পরে, বিশেষত 'শ্যামা'র নৃত্যাংশে মণি[...] দাসের সরোদ বারেবারেই মনে রাখার মত। আর ছিল শরাফৎ হোসেনের বেহালা এবং রামকান্তের সেতার। বহুসংখ্যক যন্ত্র-সংগীতও তাদের ভূমিকাতে সংযত ছিল—এটাও একটা ঘটনা।

—অপ্রতিম বসু

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাসুলে
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদলচন্দ্র রায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮০৫১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

প্রোটিন চুলের অপরিহার্য্য খোরাক।

বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন, প্রোটিনই মানুষের চুলের অতি প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক উপাদান। দুর্ভাগ্যবশতঃ রোদ-বাতাস, কোনও কোনও সাবান, রং বা কলপ এমন কি শরীরের ঘাম সকলে মিলে চক্রান্ত করে চুলের বলকারক প্রোটিন কেড়ে নিচ্ছে। এর পরিণাম ? আপনার চুল নিস্তেজ, শুকনো আর কর্কশ হয়ে যায়। প্রোটিনের নিঃসরণে চুলের ডগা চিরে যেতে সুরু করে। চুল এত কম জোর হয়ে পড়ে যে যতবার চুল আঁচড়াবেন, চুল উঠতে সুরু করবে। চুল কে আগের স্বাভাবিক সতেজ ও সজীব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে, কেবল প্রোটিন-পুষ্ট টিয়ারা এগ শ্যাম্পু।

টিয়ারা এগ শ্যাম্পুই চুলের খোরাক জোগায় স্বাভাবিক এগ প্রোটিন দিয়ে।

ইহা সর্বজনবিদিত যে ডিম স্বাভাবিক প্রোটিনের একটি অত্যুৎকৃষ্ট উৎস। বৈজ্ঞানিক মতে তাজা ডিমের সংমিশ্রণে প্রস্তুত, টিয়ারা এগ শ্যাম্পু, অ্যালবুমেন, অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' এবং প্রকৃতিদত্ত চুলের পুষ্টিকারক উপাদানে ভরপুর। চুলে নতুন প্রাণ আনতে, চুল ওঠা বা ডগায় ভাঙ্গন রোধ করতে, সুস্থতা, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শক্ত এবং আগাগোড়া কালো ও চকচকে করতে নিয়মিত টিয়ারা এগ শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

প্রোটিনহীন চুলের ডগা চিরে যায়। চুল নিস্তেজ ও কর্কশ হয়ে যায়।

প্রোটিনপুষ্ট চুল ওঠে না, বরং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন থাকে, চুল সুস্থ ও সজীব হয়।

টিয়ারা

এগ শ্যাম্পু

চুলের স্বাভাবিক ভাবে বাড়া সতেজ ও চকচকে রাখার জন্য প্রোটিন যোগায়।

ভারতে প্রস্তুতকারক :
জে. কে হেলীন কার্টিস লি.
বোম্বাই ৪০০০৩৮

Interpub/JK/T/1/75 Ben

এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : জি. এথারটন এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পাটনা, গৌহাটী, কটক ও ভিলাই।
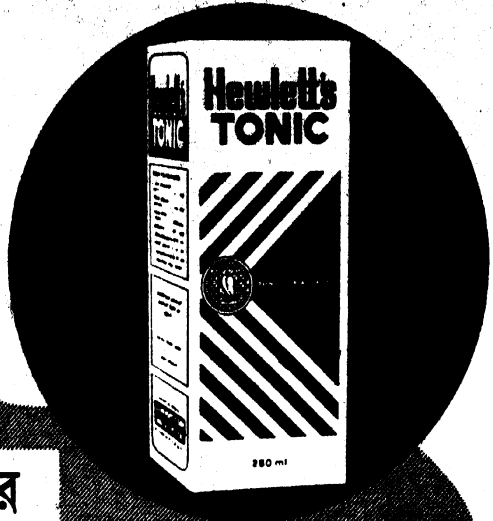
হিউলেট'স্
টনিক
Hewlett's
TONIC
উন্নততর স্বাস্থ্যের
লক্ষ্যে অব্যর্থ
দৈনন্দিন খাদ্য থেকে মানব-শরীর সব সময় যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ গ্রহণ করতে পারে না। অতি উপাদেয় এবং সহজ পাচ্য হিউলেটস্ টনিক পূরণ করে সেই ঘাটতি। নিস্তেজ ভাব দূর করে, দেহে ফিরে আসে শক্তি, তেজ, এবং কর্মে উৎসাহ। তাছাড়া দুর্বল পরিপাক ব্যবস্থার পক্ষেও উপকারী।
সি. জে. হিউলেট এণ্ড সন (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ
কলকাতা-৭০০০০১
মাদ্রাজ-৬০০০১৪

দেশ

৬ - ১৩৬৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

থ্রিল
৪ টি প্রথম পুরস্কার— বিজয় স্কুটার
৪ টি দ্বিতীয় পুরস্কার— সুভেগা মোপেড
৮ টি তৃতীয় পুরস্কার— সুমীত মিক্সী
আছাড়া, ১০০ টি সান্ত্বনা পুরস্কার ওয়েস্টক্লক এলার্ম টাইম পিস
প্রেস্টিজ-এর সঙ্গে ৪টি বিজয় স্কুটার এবং
১০০টির চেয়েও বেশী অন্যান্য আকর্ষণীয় পুরস্কার।
Prestige
পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই ৪ অঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সান্ত্বনা পুরস্কার আছে। সব মিলে ১০০ টির চেয়েও বেশী পুরস্কার।
প্রেস্টিজ প্রেশার কুকার নির্মাতাদের "বিরাট পুরস্কার" প্রতিযোগিতায়!
প্রতিযোগিতার বিশদ বিবরণ ও প্রবেশ-পত্রের জন্যে আপনার নিকটবর্তী প্রেস্টিজ ডীলারের সঙ্গে আজই যোগাযোগ করুন।
প্রতিযোগিতার ফলাফল শেষ তারিখ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ঘোষণা করা হবে।
Prestige
PREETT
টিটি. (প্রাইভেট) লিমিটেড
ব্যাঙ্গালোর ৫৬০০১৬
SAA/TTP/2289 B/BN

সূচীপত্র

প্রচ্ছদঃ অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ "লতাপাতা ফুলফল" (মিশ্র মাধ্যম—২২"×২৬")—ক্রান্তীয় অঞ্চলের জংলা গাছপালা নিয়ে অ. লা. চা. (এই নামেই তিনি অধিকতর পরিচিত) একটা আবহাওয়া তৈরী করতে চেয়েছেন। কালো রেখার জটিল নৃত্যশীল গতি পরস্পরকে ছেদ ক'রে বিচিত্র আকার তৈরী ক'রেছে। রেখাবন্ধের মধ্যে নানা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বর্ণের জটলা। পেছনে ধূসর বর্ণের পট। মন মিলিয়ে নিষ্পাপ নন্দনকাননের স্মৃতির রেশ যেন মনে জেগে ওঠে।

সমরেশ বসুর

নতুন উপন্যাস

সংকট

দাম ৬·০০

পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বাড়ির রকে, পার্কের কোণে, চায়ের দোকানে যে লাখ লাখ ছেলেকে দিনের পর দিন দলবদ্ধ হয়ে জটলা করতে আর নেশাভাঙ করতে দেখা যায়, তারা সবাই কিছু অশিক্ষিত, বেকার এবং সমাজের নীচুতলার মানুষ নয়, তাদের অনেকেরই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কারুর বা এখনও সেখানে আনাগোনা চলছে, কেউ কেউ কিছু কাজকর্ম চাকরি-বাকরিও করে, বেশির ভাগই তাদের শান্তিপ্রিয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের সন্তান, তবুও তাদের দেখলেই কেন যেন মনে হয়

প্রকাশিত হল

তারা সবাই কিসের এক বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, ছাড়াছাড়াভাবেই ছোট ছোট গ্রুপগুলো যেন কোনও এক প্রকাণ্ড বিদ্রোহের নান্দীমুখ পাঠ করছে।—কিসের বিরুদ্ধে তাদের এই বিদ্রোহ? কি তাদের সঙ্কট?

'বিবর'-এর কাল থেকেই সমরেশ বসু অনলসভাবে সমকালীন যুবজীবনের উপর বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্নভাবে বিচিত্র রঙের আলো ফেলে বারবার সেই সঙ্কটটিকে পূর্ণ চেহারায় পাঠকদের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন ও চাইছেন। 'বিবর'-এর পর 'স্বীকারোক্তি', 'প্রজাপতি', 'পাতক' প্রভৃতি সেই একাগ্র প্রচেষ্টারই এক একটি নতুন পর্ব। সমরেশ বসুর নতুন উপন্যাস 'সঙ্কট'ও তাই—সেই মহাকাহিনীরই আর এক পর্ব, এবং সর্বাধুনিকতম পর্ব। কিন্তু তাই বলে চর্বিতচর্বণ নয়, নয় পুরনোর পুনরাবৃত্তি; বরঞ্চ, বলা যায়, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে সেই মহাসঙ্কটকে আবার নতুন আলোয় নতুন করে দেখা॥

সুধাংশু ঘোষের উপন্যাস

কে বাজায় ৬·০০

শুভ্র রায়ের উপন্যাস

হৃদয়ের শবদ ৭·০০

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস

চরিত্র ৬·০০

সন্ধিক্ষণ ৪·০০

সমরজিৎ দাশগুপ্তের উপন্যাস

বিদ্ধ করো ১০·০০

মিহির মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

শঙ্খমালা ৫·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস | চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

সূর্যসাক্ষী ২০.০০

প্র কা শি ত হ ল

রাধাকৃষ্ণ একটি আশ্চর্য বিষয়বস্তু স্মরণের অতীত কাল থেকে যা দেশের সমগ্র সত্তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে এসেছে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে বৈষ্ণব কবিতায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে রাধাকৃষ্ণের চিন্তা, এবং সেইখানেই থেমে না থেকে—নতুন করে আবার বাঁক নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। যে ভাবনা দেবতারে প্রিয় করে, প্রিয়েরে দেবতা সেই আশ্চর্য সুন্দর ভাবনাকেই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রূপ দিয়েছেন তাঁর এই উপন্যাসে; প্রাচীন শাস্ত্র থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়ে, এ-দেশের শাশ্বত ভাবনার ভিত্তির উপরে নির্মাণ করেছেন প্রেমধর্মের এই নবীন সৌধ। এই কাহিনী চিরকালের, তাই বর্তমান কালের প্রেমিক-প্রেমিকারাও এই কাহিনীর দর্পণে স্পষ্ট দেখতে পাবেন নিজেদের।

বইটি আগাগোড়া ঝকঝকে লাইনো টাইপে দামী ম্যাপ লিথো কাগজে সুন্দর ছাপা। অপূর্ব বাঁধাই এবং নয়নাভিরাম প্রচ্ছদ ও জ্যাকেট। উপরন্তু আছে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক মূল্যবান বর্ণাঢ্য রাজস্থানী চিত্রাবলীর অফসেটে ছাপা চাররঙা পূর্ণপৃষ্ঠা দৃষ্টিনন্দন বারোটি প্রতিচিত্র। প্রকাশন-সৌকর্যের দিক থেকে বাংলা গ্রন্থ-প্রকাশন ক্ষেত্রে 'রাধাকৃষ্ণ' এক অতুলন সংযোজন।

হৃদয়রসে সিঞ্চিত জীবনের মধুরতম মুহূর্তগুলিকে চিরন্তনতায় ভরিয়ে তুলতে এমন অভিজ্ঞান আর দুটি পাওয়া যাবে না॥ দাম ১০·০০ ॥

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সাহিত্যে এক অনবদ্য সংযোজন

রাধাকৃষ্ণ

রমাপদ চৌধুরীর

সদ্য-নতুন উপন্যাস

হৃদয়

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ ৬ সংখ্যা
শনিবার ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৮৩

কৃষিপ্রধান ভারতজীবন

রোমক সাম্রাটের সেই উপদেশের বাণী আধুনিক অর্থনীতিক পণ্ডিতদের নানা মতের ও বাদ-প্রতিবাদের আসরে খুব-একটা বিবেচ্য বিষয় বলে মর্যাদা লাভ করবে বলে মনে হয় না। 'সিনসিনেটাস, এখন ঘরে ফিরে গিয়ে লাঙ্গল ধর।' সেনাপতি সিনসিন্নটাস যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসবার পর সম্রাট তাঁকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন। সম্রাটের উপদেশের বাণীতে যে সত্যের স্বীকৃতি আপনি পরিস্ফুট হয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই এই যে, জাতির সম্পদ ও সমৃদ্ধির সব চেয়ে বড় সম্বল হলো কৃষি। জয়লব্ধ ধনরত্ন অথবা টাকা-পয়সার পরিমাপের হিসাবে যে সম্পন্নতা বিশুদ্ধ অর্থবল বলে বিবেচিত হতে পারে, জাতির পক্ষে সেটা সার্থক প্রাণবল নয়।

গৌহাটিতে ভেটেরেনারী সায়েন্স কলেজের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধী তাঁর ভাষণে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন। অনুরূপ মন্তব্য ইতিপূর্বে এত স্পষ্ট করে দেশের কোন মুখ্য প্রবক্তার ভাষণে কিংবা বিবৃতিতে উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি। প্রধান-মন্ত্রী বলেছেন : ভারত চিরকাল কৃষির দেশ হয়ে থাকবে। এটা কোন ঘটনা অথবা অবস্থার দ্বারা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া একটা বাধ্যতার পরিণাম নয়। আমরা আমাদের স্বার্থেরই প্রয়োজনে এই পথ বেছে নিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের নিহিতার্থ এই যে, ভারতের শিল্প যন্ত্র-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সবই উন্নত উৎকর্ষ লাভ করবে বটে, কিন্তু দেশের প্রধান সম্পন্নতার আধার হবে কৃষি।

দেশের মানুষ অবশ্যই স্মরণ করে একটু দুঃসহ রকমের বিস্ময় সহ্য করবে যে, ভারতের কৃষিপ্রধান অবস্থাকে অনেক বিজ্ঞ মহাশয় কৃষির অধীনতা-জনিত একটা অবাঞ্ছিত দুরবস্থা বলে প্রচার করেছেন। উচ্চকণ্ঠে তাঁরা প্রচার করেছিলেন যে, শিল্প-কারখানার এবং যান্ত্রিক প্রযুক্তির প্রসার বিস্তার এবং প্রাধান্য হলো জাতীয় জীবনের অর্থ-নীতিক সম্বলের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষের হেতু। উন্নতির এবং সমৃদ্ধির রীতি-নীতি উদ্ভাবিত করবার দায়িত্ব যাঁদের যুক্তি-বিচারের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁদের বেশীর ভাগই কৃষি এবং শিল্পের যথার্থ মূল্যায়ণ করতে পারেন নি। কৃষি যেন জাতির পক্ষে হীনতায় অভিভূত একটা অনুন্নত অবস্থার পরিবেশ এই ধরনের যুক্তিহীন সংস্কার একশ্রেণীর বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞের চিন্তাতে অদ্ভুত রকমের প্রগল্ভ প্রত্যয় সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা স্মরণ করতে হয়।—কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান, বাঁশের মাচাটি তার পুষ্পক বিমান। কুষ্মাণ্ড এই সত্য বিস্মৃত হয়েছিল যে, তার অস্তিত্ব এবং প্রাণের মূল মাটির মধ্যে নিহিত। মাটির সঙ্গে সংযোগ আছে বলেই সে আছে। কিন্তু এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হয়ে কুষ্মাণ্ড নিজেকে আকাশচারী গ্রহের অনুরূপ একটি অস্তিত্ব বলে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ঝড় দেখা দিল, বাঁশের মাচাটি ভেঙ্গে গেল এবং কুষ্মাণ্ড মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তুলনা করে বলা চলে যে, ভুল অহমিকার প্রাবল্যে মাটিকে অস্বীকার করে মাচার কুষ্মাণ্ডের যেমন অধঃপতন ঘটেছিল, তেমনই অধঃপতন ভারতের জাতীয় অদৃষ্টেরই অপঘাত হিসাবে দেখা দিতে পারে, যদি কোন বিভ্রমের ক্রীড়ণক হয়ে জাতীয় চিন্তাটা কৃষিকে ক্ষুদ্র প্রয়োজনের অনুশীলন বলে বোধ করে।

প্রাণ-বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা সহজে একটি অমোঘ অক্ষয় ও অব্যয় সত্যের পরিচয় বুঝিয়ে দিতে পারেন। সেটা এই যে, রূপকথার রাজকুমারী হীরের খই খেয়ে ক্ষিধে মেটালেও বাস্তবতার জগতে সব রাজকুমারী থেকে শুরু করে সব কাঠকুড়ুনী মেয়েকে মাটির দেওয়া খাদ্য খেতে হবে। আমিষ হোক বা নিরামিষ হোক, সবই তো মাটির উপহার। প্রাণ-বিজ্ঞানী বলবেন, প্রাণ প্রাণকে খেয়ে বেঁচে থাকে। অজৈব বস্তু কোন প্রাণীর খাদ্যবস্তু হতে পারে না। সুতরাং কৃষিপ্রধান জীবন ভারতের পক্ষে কখনই দীনতা-হীনতা ও রিক্ততার জীবন হতে পারে না। বরং বলা উচিত যে, এবং পঞ্চম যোজনার গুণীরাও নিশ্চয় বলবেন —ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে থেকেই তার শিল্প বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক উন্নয়নের সাধনা করে যাবে। এই নীতিই ভারতের পক্ষে বস্তুত সবচেয়ে প্রশস্ত উন্নয়নের সার্থক নীতি।

প্রসঙ্গত আমাদের প্রাচীন বৈদিক ঋষির একটি উপলব্ধির বাণী স্মরণ করা চলে। 'সুশস্যা কৃষি স্কৃধিঃ'— সুশস্য সৃষ্টি করে কৃষিকর্ম কর। অর্থাৎ তোমাদের কৃষিকর্ম সুশস্য সৃষ্টি করুক। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে আর-একটি বাস্তব সত্যের সহস্র প্রমাণ পাওয়া যাবে। সাংস্কৃতিক সম্বল, জীবনের যাবতীয় রম্য সম্বল, কাব্য কাহিনী গীত নৃত্য ও চিত্র এবং মূর্তির কান্তকলা, সবই বিশ্বের সকল জাতির জীবনে কৃষিপ্রধান জীবন-দশারই ভাবনা ও কল্পনার নিদর্শন। শুধু এক স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক তথা আধুনিকতা যান্ত্রিক শিল্পবৈভবের তাগিদ অনুসরণ করে কিছু নতুন রকমের রূপ নির্মাণ করতে পেরেছে। কিন্তু সাংস্কৃতিক শীলের আর সবই মূলত ও প্রধানত কৃষিপ্রধান জীবনেরই রূপাভাস বহন করে চলেছে।
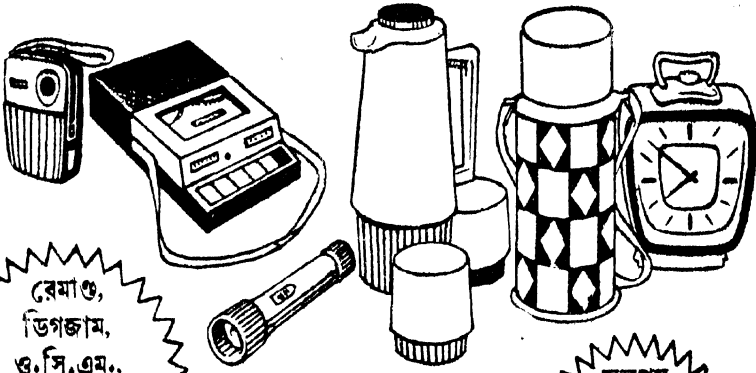
বৈদেশিকী

দেশ না প্রদেশ

দশ ফুলের গাঁথা মালা উত্তর-আমেরিকার উত্তরে দেশ কানাডা। তার সব ফুল এক জাতের নয়। ন'টা বিলিতী আর একটা ফরাসী। এককালে তামাম কানাডা ছিল ফরাসীদের। গোটা এলাকাটা ছিল ফরাসী উপনিবেশ। ১৭৬৩ সালে কানাডার সব এলাকার ওপর স্বত্বাধিকার ছেড়ে দেয় ফরাসীরা ইংরেজদের কাছে। দেশটা ইংরেজদের উপনিবেশ বনে গেল। এখন অবিশ্যি কানাডা স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু আরও পাঁচটা স্বাধীন হয়ে যাওয়া বিলিতী উপনিবেশ আর অধীন দেশের মতো কমনওয়েলথের সভ্য। ফরাসীদের সঙ্গে তার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ একদিন ছিল তার চিহ্ন আজও পুরোপুরি মুছে যায়নি, কানাডার মাটি, মানুষ আর সংস্কৃতি থেকে। দেশের সরকারী ভাষা ইংরিজী। সে ভাষা সবাই বলে আর বোঝে। কিন্তু কুইবেকে আজও চল রয়েছে ফরাসী ভাষার। সেখানকার বিস্তর লোকই মনে-প্রাণে ফরাসী। কেউ কেউ আবার ইংরেজবিদ্বেষীও। অন্য এলাকাতেও বেশ কিছু লোক ফরাসী বলে। অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের মতো কানাডাতে ইংরিজীই একমাত্র চালু ভাষা নয়।

তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনই ইংরিজী আর ফরাসী এক হয়ে যায়নি কানাডায় দুশো বছর পরেও। মাঝে মাঝে ফরাসী বোলনেওলারা ধুয়ো তুলেছে— আমরা আলাদা, আমরা ভিন্ন হয়ে যাব— তারপর আবার চুপ করে গেছে। তাদের খুশী রাখার কিছু কিছু ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করেওছেন। কিন্তু ইদানীং আলাদা হয়ে যাবার ধুয়োটা আবার উঠেছে। মনে হচ্ছে সেটা বেশ দানা বেঁধেছে। বিভেদপন্থীদের আন্দোলনের আগুনে ঘি ঢেলেছিলেন ফরাসীদের দিকপাল রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল দ্য গল। ১৯৬৭ সনে কুইবেক বেড়াতে এসে তিনি জয়ধ্বনি দিয়েছিলেন স্বাধীন কুইবেকের—আওয়াজ তুলেছিলেন বেঁচে থাক স্বাধীন কুইবেক। তাঁর সে ডাক যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল কানাডার ফরাসী বোলনেওলাদের মনে তা আর নেবেনি, বরঞ্চ বেড়েই চলেছে। 'লড়কে লেঙ্গে আজাদ কুইবেক' এমনতর জঙ্গী বুলিও কারু কারু মুখে শোনা গিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়ে মতলব হাসিল করার তালে ছিল কুইবেক মুক্তি ফ্রন্ট। ফরাসী সরকার তাদের পেছন থেকে উস্কানি দিচ্ছেন এমন অভিযোগও উঠেছিল।

ব্যাপার দেখে কানাডা সরকার কেবল হকচকিয়ে যাননি ভাবিত হয়েছিলেনও। হালে নিয়ম হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের ইংরিজী আর ফরাসী দুটো ভাষাই সমান রপ্ত করতে হবে। কুইবেকে পয়লা ভাষা নয় ফরাসী একমাত্র ভাষা এ বিধান আইন পাস করে করা হয়েছে। মিটমাট করতে চেষ্টার ত্রুটি করছেন না কানাডার প্রধানমন্ত্রী ত্রুদো। তিনিও তো ফরাসী এলাকার লোক। ১৯৭৪-এ তিনি ফ্রান্সে পাড়ি দিয়েছিলেন যাতে ভুল বোঝাবুঝি ঘুচে যায়, বিভেদপন্থীদের ফ্রান্স আমল না দেয়। কুইবেকের তখনকার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট বুরাসাও তারপর প্যারিসে গিয়েছিলেন ফ্রান্সকে তোয়াজ করতে। মনে হয়েছিল ফরাসী সরকার আর কানাডার ব্যাপারে নাক গলাবেন না। কানাডায় ফরাসী ভাষা আর সংস্কৃতির উন্নতির জন্যে যা সেখানকার সরকার করছেন তাই যথেষ্ট, এ সব নিয়ে ফরাসীদের দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই। এও মনে হয়েছিল বিভেদপন্থীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সে প্রত্যয় জোরদার হয়েছিল যখন দেখা গিয়েছিল ১৯৭৩-এর নির্বাচনে কুইবেক বিধানসভার ১১০টা আসনের মধ্যে বিভেদপন্থী দল পার্তি কুইবেকোয়া পেয়েছে কুল্লে ৬টা।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে হিসেবটা ভুল। পাশা উলটে গেছে পনেরোই নভেম্বরের প্রাদেশিক নির্বাচনে। সে নির্বাচনে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে শাসক দল লিবারালকে বিভেদপন্থী পার্তি কুইবেকোয়া। প্রধানমন্ত্রী রবার্ট বুরাসা হেরে ভূত হয়েছেন। তাঁর দল পেয়েছে মোটে ২৭টা আসন অথচ আগের বার তারা দখল করেছিল ১০২। জয় জয়কার এবার বিভেদপন্থী কুইবেকী দলের। তারা কব্জা করেছে ৭০টা আসন। এককালের প্রধান দল রক্ষণশীল যুনিয়ঁ নাশিয়োনালেরও বরাত ফিরেছে। তারা পেয়েছে ১১টা আসন। আগেরবারে তাদের বরাতে জুটেছিল শূন্য। বাকী গোটা দুই আসন পেয়েছে হেঁজিপেজি দল। আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকার আর ইংরিজী বোলনেওলা কানাডার লোকদের। এর পর কী দেশের ভাঙন রোখা যাবে? কুইবেক কানাডার প্রদেশ থাকবে না আলাদা হয়ে গিয়ে স্বাধীন দেশ বনে যাবে? স্বাধীন হওয়া অবিশ্যি কুইবেকের সহজ হবে না। প্রচণ্ড বাধা দেবে অন্য প্রদেশগুলো, প্রাণপণে যুঝবেন কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু দারুণ অশান্তি দেখা দেবে গোটা দেশে, তা সামলানো বেশ শক্ত হবে।

কুইবেকী দলের পাণ্ডা রেনে লেভেক অবিশ্যি ভোটের লড়াই করতে করতেই হুঙ্কার ছাড়েন নি—এবার আমাদের স্বাধীনতা চাই। কিন্তু তাঁর দলের লক্ষ্য তো তাই। সেই জন্যেই তো আলাদা দল গড়েছেন তিনি, নইলে তিনি তো ছিলেন লিবারাল দলের চাঁই, তাদের উর্দি পরে মন্ত্রিত্বও করেছেন দিন কতক। আলাদা দল তিনি গড়েছেন কুইবেকের স্বাধীনতা আদায় করতে। নির্বাচনের সময় তিনি এ কথা তোলেন নি। লড়েছিলেন লিবারাল দলকে হটিয়ে কুইবেকের বৈষয়িক সমস্যার সমাধান করতে আর প্রশাসন থেকে দুর্নীতি বিদেয় দিতে। কুইবেকে বেকারি হালে বেড়েছে। অনেক কেলেঙ্কারিতেও প্রদেশ সরকার জড়িয়ে পড়েছিলেন। কাজেই তাঁদের হার মানেই এ নয় যে, কুইবেকের লোক চাইছে আলাদা হয়ে যেতে। রক্ষণশীলরা বলছে লোকে সরকারের কাজে অখুশী, তাই বদল চেয়েছে আলাদা হবার কথা ওঠে কোথা থেকে? তাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ত্রুদোও। তাঁর মতে, লোকে প্রদেশের সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। কাজেই সে সরকার যাবে নতুন সরকার আসবে। কুইবেকী দলকে নতুন সরকার গড়ার পরোয়ানা দিয়েছে ভোটাররা; স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করার নয়, এই হচ্ছে তাঁর মোদ্দা কথা।

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে তিনি কিছু ভুল বলেন নি। কুইবেকী দল বিধানসভায় গরিষ্ঠতা পেলে কী হয় মোট ভোটের তারা পেয়েছে ৪১ শতক। তার মানে ৫৯ শতক লোক তাদের আর তাদের নীতির বিরুদ্ধে। অন্তত স্বাধীনতার দাবি উঠলে তারা যে তার বিরুদ্ধে যাবে তাতে ভুল নেই। দিন কতক আগে একটা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল কুইবেকের ৬০ লাখ লোকের মধ্যে ১২ লাখের বেশী কানাডা থেকে বেরিয়ে যেতে চায় না। নতুন দলও খুব সাবধানে পা ফেলছে। কিন্তু আলাদা হবার দাবি তারা ছেড়ে দেয় নি। নতুন নেতা লেভেক কথা দিয়েছেন, স্বাধীনতা ঘোষণা করার আগে তিনি গণভোট নিয়ে লোকের মন জেনে নেবেন। তবে আপাতত সে কথা উঠছে না। তিনি যে চট করে এত বড় একটা ঝুঁকি নেবেন তা মনে হয় না, কিন্তু অনেকেরই বুক ধুকধুক করছে কানাডার ফরাসী মুলুকের বাইরে। চাপা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে খোদ ফ্রান্সে। এতদিন পরে কী কানাডার যুক্তরাষ্ট্রে ভাঙন ধরতে চলেছে?

দেবরাজ

॥ ছয় ॥

জালিম চলে যাবার পর হোটেলের মেরী আমাদের ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করলে। রাত্রে বরাবর আমার রুটি খাওয়া অভ্যেস। রুটি চাইলাম, মেরী দিয়ে গেল পরোটা। পরে জানলাম, পরোটাকেই এরা রুটি বলে। কিন্তু নাকে কী-রকম একটা অস্বাভাবিক গন্ধ লাগলো।

সবাই-ই বললেন—এরকম গন্ধ বেরোচ্ছে কেন বলুন তো?

আমি বললাম—হয়ত লার্ড দিয়ে ভাজা হয়েছে—

প্রত্যেক দেশের নিজস্ব একটা খাওয়ার বৈশিষ্ট্য আছে। ফ্রান্সের যা খাদ্য ইংলণ্ডের তা নয়। আর জার্মানীর তো তা নয়ই। অভ্যস্থ জিভে আস্বাদের ব্যতিক্রম হলেই মানুষ চমকে ওঠে। কিন্তু উপায় তো নেই। মরিশাসে যখন এসেছি, তখন মরিশাসের খাদ্যই খেতে হবে।

পরে একদিন ফরেস্ট অফিসার গাঙ্গুলীবাবুর বাড়িতে যখন খেতে গিয়েছিলাম তখন সাহস করে কথাটা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

তিনি বললেন—ওটা সাফোলা তেল। আমরা এখানে সব খাবার সাফোলা তেল দিয়েই রান্না করি—

সাফোলা তেল মানে সূর্যমুখী তেল।

কলকাতাতেও সাফোলা তেল কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তার বহুল প্রচলন নেই। ডাক্তারদের মতে সাফোলা তেল স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। সুতরাং কথাটা শোনার পর থেকে আর কোনও খাদ্যই কোনও দিন আমাদের বিস্বাদ লাগলো না। মরিশাসে সমস্ত জিনিসই বিদেশ থেকে আমদানি। এমন কি চাল আটা ডাল পর্যন্ত। শুধু চিনি আর গুড় রফতানির টাকায় অধিবাসীদের বিলাস-ব্যসনের প্রয়োজন মেটে।

শুনলাম লোকমুখে নাকি এ ধারণাটা বদ্ধমূল যে এককালে এখানে একটা আগ্নেয়গিরি ছিল। বিরাট আগ্নেয়গিরি সেটা। এবং একদিন তাতে বিস্ফোরণ ঘটে। আর সেই বিস্ফোরণ থেকেই এই মরিশাসের জনপদটি সৃষ্টি হয়। এটা যে সত্যিই আগ্নেয়গিরি থেকে সৃষ্টি তার প্রমাণ পাওয়া যাবে "শ্যামারেলে" গেলে। কথাটার উচ্চারণ যা-ই হোক, বানানটা হচ্ছে শ্যামারেল Chamarel।

১৯০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ায় ফেরবার পথে একদিন এই মরিশাসে নেমেছিলেন গান্ধীজী। সেদিন তিনি মহাত্মা গান্ধী হননি। সেদিন তিনি মাত্র জনৈক তরুণ ব্যারিস্টার মিঃ এম কে গান্ধী। মরিশাসের হিন্দু মুসলমান সবাই তাঁকে সেদিন অভ্যর্থনা করতে দৌড়ে গিয়েছিল। তখন গান্ধীজীর নাম পৃথিবীর চারদিকে সামান্য সামান্য ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সত্যাগ্রহের পর থেকে কালো চামড়ার লোকদের কাছে তিনি প্রায় মহাপুরুষবিশেষ হয়েছেন।

আমাদের ইণ্ডিয়ায় তখন সেই ইংরেজ আমলে যে অবস্থা চলছে মরিশাসেও তখন ছিল ঠিক তাই। মরিশাসে যাঁরা একদিন কুলি হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা ইংরেজ সরকারের চোখে তখনও অস্পৃশ্য। সামান্য যা তাঁদের আয় তা থেকে সঞ্চয় করে তখন তাঁরা বেশ অর্থবান। বড় বড় বাড়িও করেছেন কেউ কেউ। তাঁরা অর্থের দিক দিয়ে মান্যগণ্য হলেও মান-মর্যাদার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন শূন্য। তবে তাঁদের সংখ্যাও ছিল খুব নগণ্য। যেমন ইংরেজ আমলে কেউ কেউ রায়সাহেব রায়বাহাদুর হলেও সংখ্যাধিক্য ছিল আমার আপনার মত লোকদেরই। তাই এখানে ইণ্ডিয়ায় আমরা তখন চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াতে পারতাম না। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাশে উঠতে পারতাম না। এককথায় বলতে গেলে আমরা ছিলাম তাদের দৃষ্টিতে অন্ত্যজ।

গান্ধীজী যেদিন জাহাজ থেকে নেমে মরিশাসের শহরে ঢুকলেন সেদিন দেশের

সেই সব অভ্যাগতরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা তাঁদের মুখ থেকেই তিনি সব শুনলেন। শুনে তিনি বললেন—আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা তো আমি সব শুনলুম। যেখানে যেখানে কালোদের ওপরে সাদারা রাজত্ব করছে সেখানেই সকলের একই দশা। আপনারা যেমন এখানে কষ্ট পাচ্ছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় কালোরাও সেই একই অত্যাচারে ভুগছেন। আমার জন্মভূমি ভারতবর্ষেরও সেই একই দুরবস্থা।

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন—এই অবস্থায় আপনি আমাদের কী করতে বলেন?

গান্ধীজী বললেন—আপনারা কী করবেন তা আমাকে ভেবে বলতে হবে, আমি ইণ্ডিয়ায় গিয়ে আপনাদের কথা ভাববো, তারপর আপনাদের জানাবো—এখন আপনাদের প্রধান কাজ আপনাদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। লেখাপড়া না শিখলে কোনও কাজই হবে না। নইলে চিরকালই আপনাদের বংশধরদের এই সাদা চামড়াদের গোলামী করে যেতে হবে—

—কিন্তু লেখাপড়া যে তারা করবে সে-রকম স্কুল-কলেজ এখানে কোথায়?

গান্ধীজী বললেন—আপনারা নিজেরাই স্কুল তৈরি করুন। সরকারের ওপর নির্ভর করে হাত কোলে করে বসে থাকলে চলবে না। আপনাদের মধ্যে কিছু লোক তো টাকা-পয়সা করেছেন। তাঁরা সকলের ভালোর জন্যে স্কুল-কলেজ করে দিন। তাতে বড়-লোকদেরও ভালো হবে, গরীব লোকদেরও ভালো হবে—

গান্ধীজী মাত্র একুশ দিন ছিলেন সেখানে। সেই একুশ দিনের মধ্যেই তিনি দেশটার সব জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন। 'গঙ্গা তালাও' দেখেছিলেন, 'শ্যামারেল' দেখেছিলেন—

আমরা যখন খেতে বসেছিলাম তখন আমাদের কথার মাঝখানে সেই ভদ্রলোক হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। সেই যাঁর কথা আগে বলেছি। যিনি 'বার'-এর সামনে উঁচু টুলের ওপর বসে একলা গেলাসের পর গেলাস মদ খাচ্ছিলেন।

আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম। মরিশাস দেশটা তখনও দেখিনি। আমরা সবাই তখন নতুন আগন্তুক। হঠাৎ ভদ্রলোক তাঁর নিজের টুলের ওপর বসেই আমাদের কথার মধ্যে কথা বলে উঠলেন।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমরা নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি কী করে জানলেন যে এটা আগ্নেয়গিরির দেশ?

ভদ্রলোক বললেন—এখানে শ্যামারেল বলে একটা জায়গা আছে, আপনারা যদি সেখানে যান দেখবেন সেখানকার মাটির রং নানান রকমের—কোনও মাটি হলদে, কোনও মাটি লাল, কোনও মাটি কালো আবার কোনও মাটি সাদা—

—'শ্যামারেল' মানে?

—মানে সাত রং-এর মাটি। সেখানকার মাটির রং আছে বলেই জায়গাটার নাম হয়েছে শ্যা মা রে ল (Chamarel)। কিন্তু আসলে সাত রকম রং নয়। বারো তেরো রকমের রং দেখেছি আমি—বড় বিউটিফুল জায়গাটা।

—এখান থেকে কত দূরে?

—দূর আছে। সেখানে গেলে দেখতে পাবেন একটা ওয়াটার-ফল। গান্ধীজী ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে

ছিলেন। আপনাদের ইণ্ডিয়ার দার্জিলিং-ও সুন্দর। শুনেছি দিনের এক-একটা সময়ে তার এক-এক রকম রং হয়, কিন্তু এ অন্যরকম, এখানে সমস্ত দিন ইণ্ডিয়ান ওশ্যানের দিকে চেয়ে থাকুন, চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছে করবে না আপনাদের—

অদ্ভুত ভদ্রলোক। আমরা সবাই তাঁর দিকে চেয়ে আছি, আর তিনি মাঝখান থেকে আমাদের কথার মধ্যে নাক গলিয়েছেন। কবে মহাত্মা গান্ধী এখানে এসেছিলেন, কবে এখানকার লোকদের কী বলে গেছেন, কবে কোথায় কী দেখেছেন, সমস্ত জানেন। এত কিছু জেনেও কিনা এখানে বসে বসে মদ খাচ্ছেন!

সেটা প্রথম দিন বলে তখনও ভদ্রলোককে ঠিক বিচার করতে পারিনি।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনি এত জানলেন কী করে? বই পড়ে?

ভদ্রলোক বললেন—বইতে পড়বো কেন, বইতে এ-সব লেখা নেই, আমি আমার বাবার কাছে এ-সব শুনেছি—

—আপনার নাম কী?

ভদ্রলোক বললেন—আমার নাম রামফল, এস রামফল—

বলতে বলতে তিনি নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন। বোধহয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাঁর হঠাৎ খেয়াল হলো যে অনেক রাত হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পানীয়ের দাম চুকিয়ে দিয়ে উঠলেন! তারপর পেছনের দরজা দিয়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। আর তারপর একটা গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট দেবার শব্দ হতেই বুঝলাম ভদ্রলোক গাড়ি চালিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেও ভদ্রলোকের আসল চরিত্রটা আন্দাজ করতে পারলাম না। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা যে-যার ঘরের দিকে যাচ্ছি। ডঃ গুপ্তের ঘরের নম্বর চব্বিশ, আমাদের দলের একজন মহিলার ঘরের নম্বর পঁচিশ, আর তারপরেই রুম নম্বর ছাব্বিশ। আমার ঘর। অন্যান্য যাঁরা আছেন তাঁরা একতলায় ঘর বেছে নিয়েছেন। আমাদের ঘরে যেতে গেলে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে একটা উঠোন পেরোতে হয়। উঠোনটার চারদিকে ফুলের বাগান। একে কনকনে ঠাণ্ডা, তার ওপর ঘুটঘুটি অন্ধকার। আমাদের সঙ্গী মহিলাটি হঠাৎ ভয়ে আঁতকে আর্তনাদ করে উঠলেন।

বললাম—কী হলো? কী হলো আপনার?

মহিলাটি তখনও হাঁফাচ্ছেন। তারপর একটু সংবিত পেয়ে বললেন—সাপ—

সাপ! সাপ কথাটা শুনে আমরা দুজনও একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। বিদেশ-বিভুঁইতে এসেছি, এখানকার হাল-চাল কিছু জানি না, তার ওপর চারিদিক

জঙ্গলে ঘেরা, শুধু সাপ কেন, অন্য আরো হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকলেও কিছু বলবার নেই। কিন্তু কী আর করা যাবে। আস্তে আস্তে চারদিক ভালো করে দেখে-শুনে দুই হাতে তালি দিতে দিতে হোটেলের একতলার লাউঞ্জে গিয়ে ঢুকলাম। সেখানে আলোয় আলোময়। সোফা-কোচ সাজানো। এক কোণ দিয়ে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। একবার ওপরে উঠতে পারলে আর কোনও সমস্যা নেই। তারপর আরামে কম্বল চাপা দিয়ে ঘুম।

*

খুব ভোরেই আমার ঘুম ভেঙে গেল। শ্রীরূপাসে প্রথম রাত কাটানো তাই হয়ত ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। তাই ভোরেই উঠে পড়েছি। গরম জলের এলাহি বন্দোবস্ত ছিল। স্নান করে নিয়ে তৈরি হয়ে গেলাম। ভাবলাম দুদিন প্রাতঃভ্রমণ হয়নি, শহরটা একটু পায়ে হেঁটে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে আসি। রথ দেখাও হবে, সঙ্গে সঙ্গে কলা বেচাও হয়ে যাবে। গাড়ি চড়ে বেড়ালে কি আর দেশ দেখা হয় না মানুষ দেখা হয়!

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখি বিপর্যয় কাণ্ড। ঝম-ঝম করে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ে চলেছে, ঘরের ভেতর থেকে কিছুই টের পাইনি। অনেক দূরে নিঃসীম সমুদ্র। ঠিক তার আগে ছোট-ছোট অনেক পাহাড়। রংটা গাঢ় সবুজ। কিন্তু তারই মধ্যে একটি পাহাড় একেবারে ন্যাড়া। তাতে গাছপালার একেবারে নাম-গন্ধ নেই। আফ্রিকার কালো-চামড়ার লোকের ভিড়ের মধ্যে যেন সাদা চামড়ার একটা সাহেব। কিংবা বিরাট আম-বাগানের মধ্যে অনেকটা বিরাট মাপের একটা উই-ঢিবির মত।

এ-রকম আমি আগেও দেখেছি। তখন ছোটনাগপুরের জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম। একবার একটা অদ্ভুত দৃশ্য নজরে পড়েছিল। চার-পাঁচটি কুচকুচে কালো উলঙ্গ সন্তান নিয়ে তাদেরই মা জঙ্গলে কাঠ কুড়োচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি সন্তান একেবারে ফুটফুটে ফরসা। তাকে দেখে কে বলবে যে ওই মায়ের সন্তান!

সেদিন সেই ঘটনা দেখে মনে হয়েছিল যে ইংরেজরা ইণ্ডিয়াতে এসে শুধু যে আমাদের ভাতে হাত দিয়েছিল তাই-ই নয়, আমাদের জাঁতেও ঘা দিয়েছিল। কিন্তু পুরোপুরি যে ঘা দিয়ে আমাদের মেরে ফেলতে পারেনি বোধ করি তার একমাত্র কারণ ওই 'তুলসীদাসের রামচরিত মানস।'

সে অনেক দিন আগেকার কথা। এস ওয়াজেদ আলি নামে একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন বাঙলাদেশে। পেশায় তিনি ছিলেন বার-অ্যাট-ল, কিন্তু আবার অবসর সময়ে সাহিত্য রচনাও করতেন। এখন তিনি প্রায়-বিস্মৃত কিন্তু ছোটবেলায় আমরা তাঁর রচনা পড়েছি 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায়। একটা রচনার কথা আমার এখনও মনে আছে। রচনাটির নাম 'ভারতবর্ষ'। তিনি ছোটবেলায় কাটিয়েছেন তাঁর গ্রামে। সেখানে তাঁর বাড়ির পাশেই ছিল একটা মুদিখানার দোকান। বৃদ্ধ মুদি সেই দোকানে বসে বসে তেল বেচতো, মশলা বেচতো, নুন-চিনি-গুড় বেচতো আর রাত্রে যখন আর খদ্দের আসবার আশা নেই তখন রেড়ির তেলের একটা প্রদীপ জেবলে আপন মনে বানান করে করে রামায়ণ পড়তো।

এমনি প্রতিদিন। ওয়াজেদ আলি সাহেব সেই ছোটবেলায় লেখা-পড়া শেষ করে যখন অনেক রাত্রে বিছানায় শুতে যেতেন তখনও জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতেন মুদি তার রামায়ণখানা পড়ে চলেছে। যতদিন তিনি সেই গ্রামে ছিলেন ততদিন সেই একই দৃশ্য। তারপর গ্রাম ছেড়ে তিনি কলকাতায় এলেন কলেজে পড়তে। এম-এ পাস করে ল' পড়লেন। তারপর ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন বিলেতে। সেখানেই কয়েক বছর কেটে গেল তাঁর। তারপর যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন প্র্যাকটিস করা আরম্ভ করে মক্কেল নিয়েই দিন-রাত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন কী খেয়াল হলো হাইকোর্টের ছুটিতে তিনি অন্য কোথাও না গিয়ে সোজা নিজের গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন। রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার সময় জানালা দিয়ে নজর পড়লো সেই মুদি-খানাটার দিকে। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে দেখলেন সেই মুদি লোকটি তখনও একমনে রেড়ির তেলের প্রদীপ জেবলে বানান করে করে রামায়ণ পড়ে চলেছে।

অবাক কাণ্ড। তিনি তাঁর বাবুর্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—ওই হারাণ মুদি দেখছি এখনও সেই আগেকার মত তেমনি করে রামায়ণ পড়ছে—

বাবুর্চি বললে—না হুজুর, ও হারাণ
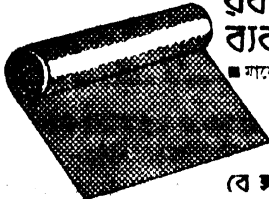
মৃদি নয়, হারাণ মৃদি অনেক কাল আগে মারা গেছে। ও তার ছেলে, ছিদাম মৃদি— একদিন যারা ভাতে হাত দিয়েছিল তারা যে কেন আমাদের পুরোপুরি আঁতে ঘা দিতে পারেনি তার কারণ ওই রামায়ণ। চারদিকের সেই ঝমঝম বৃষ্টিপড়া মরিশাসের হোটেলের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে তাই ভাবছিলাম—সত্যিই তো, ওই রামায়ণই তো ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের আত্মাই তো ওই রামায়ণ!

ধর্মসাধনার যেটি শক্তির দিক, রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন বিশ্বাসের দিক। তিনি বলেছেন "এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন এইটুকুমাত্র বিশ্বাস করাকে আমি বিশ্বাস বলি নে। আমি যার কথা বলছি এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা : এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিত করে— আপনাকে সে কোনও অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।"

সেদিন এই মরিশাসে যারা কুলি বা ক্ষেত-মজুর হয়ে গিয়েছিল তারা হাতে করে তুলসীদাসের রামচরিত মানসে'র সঙ্গে এই বিশ্বাসটুকুও বুকের ভেতরে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর সেইজন্যেই হাজার দুঃখ হাজার কষ্টের মধ্যেও তারা বলতে পেরেছিল—সীতা রামময় এই জগৎ, তোমাকে আমি মুক্তকরে প্রণাম করি।

"সীয়া-রামময় সব জগ জানী।
করহুঁ প্রণাম জোরি-যুগ পাণি॥"

যেমনভাবে এস ওয়াজেদ আলি সাহেবের গ্রামের সেই গরীব হারাণ মুদি আর ছিদাম মুদি সংসার-যাত্রার সমস্ত বিপদ আপদ তুচ্ছ করতে পেরেছিল এও ঠিক তাই। তারা কেউ-কেউ গিয়েছিল জাঞ্জিবারে, কেউ গিয়েছিল টাঙ্গানাইকাতে, কেউ বা দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার কেউ এসেছিল এই মরিশাসে। কিম্বা সুদূরে মেক্সিকোতে। হাতে তাদের শক্তি ছিল না, দেহে তাদের বল ছিল না, পকেটে তাদের অর্থও ছিল না, ছিল শুধু তুলসীদাসজীর একখানা 'রামচরিত মানস'। তার মানে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই বিদেশ-বিভূঁইতে তাদের রক্ষা করেছিল, নিরাশ্রয় নিঃসহায় হওয়ার ভীতি থেকে তাদের বাঁচিয়েছিল। পরের দেশকে নিজের দেশ বলে ভাবতে শিখিয়েছিল। তাদের সাহস জুগিয়েছিল, বিশ্বাস জুগিয়েছিল।

তখনও একটানা ঝমঝম্ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। হোটেলের সব বাসিন্দাই তখন অঘোর ঘুমে অচেতন। তখনও ব্রেকফাস্ট দিতে ঘণ্টা দুই-তিন দেরি। কল্পনা করতে পারি যারা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভোরবেলা চা পেতে অভ্যস্ত তাদের এখানে নিশ্চয় খুবই অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু আমার কোনও অসুবিধে নেই, আমি নির্বিকার। আমাকে তুমি ভালবেসে যা দেবে তাই-ই আমি গ্রহণ করবো। খাওয়া জিনিসটাকে আমি কখনও অনাবশ্যক আড়ম্বরের দ্বারা ভারাক্রান্ত করিনি। আমরা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অনেকবার অনেক বন্ধুর বিয়ের ব্যাপারে বর-যাত্রী হয়ে বহু দূরের পাত্রীপক্ষের বাড়িতে গিয়েছি। পাত্রীপক্ষের বাড়িতে অন্তত একটা রাতও অনেকবার কাটাতে হয়েছে। কিন্তু পরদিন সকালবেলা চা দিতে দেরি হওয়ার জন্যে আমাদের মধ্যে যে-হুজ্জতের সৃষ্টি হয়েছে সে-সব কথা আমার এখনও মনে আছে।

জীবনের আহার-বিহারের ব্যাপারে স্যার পি সি রায় যত সহজ সরল হতে পেরেছিলেন অত সহজ সরল হতেও আবার এ যুগে কাউকেই দেখা যায়নি। তাঁর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা জানেন, নতুন করে আর নতুন কিছু বলবার নেই। কিন্তু একটা ঘটনা আমি এখনও ভুলতে পারিনি।

একবার সি ভি রমণকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে। তাঁর সঙ্গে আরো অনেক বৈজ্ঞানিকেরও সেখানে আসবার কথা। আচার্য পি সি রায় তখন বিজ্ঞান-কলেজের অধ্যক্ষ। সমস্যা হলো অতিথিদের বিকেলবেলা কীভাবে আপ্যায়ন করা হবে, অর্থাৎ কী খেতে দেওয়া হবে তাই নিয়ে।

ছাত্ররা অনেক রকম প্রস্তাব দিলে। কেউ বললে—হান্টলি-পামার কোম্পানীর বিস্কুট আর তার সঙ্গে চপ-কাটলেট আর ফিশ ফ্রাই—

কেউ বললে—না, কাজু-বাদাম আর গরম গরম সিঙ্গাড়া—

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বললেন—না, ওসব কিছুর দরকার নেই, আমি বলছি শুধু মুড়ি আর বাতাসা দিব,—

আচার্যদেবের কথা শুনে ছেলেরা সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ কী করে সম্ভব! মুড়ি-বাতাসা তো ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে লুকিয়ে খাওয়ার জিনিস। ওটা দারিদ্র্যের চিহ্ন। ওতে আভিজাত্য নেই। মাননীয় অতিথিদের তা কী করে খেতে দেওয়া যায়? কিন্তু মুখ ফুটে আচার্যদেবের কথার প্রতিবাদ করার সাহস কারো নেই।

প্রফুল্লচন্দ্র বুঝতে পারলেন। বললেন— কী রে, তোদের লজ্জা করছে বুঝি? ওরে, এই মুড়ির মত আর কী আছে শুনি? এই চিঁড়ে মুড়িই বিলেত গিয়ে নাম বদলে টিনের কৌটোতে ভর্তি হয়ে এলে তখন আর তোদের লজ্জা করবে না, কী বলিস?

তারপর বললেন—বাঙালীর ছেলেরা, তোদের এই বড় দোষ। বাপের মুখে রক্ত ওঠা পয়সা খরচ করে হান্টলি-পামারের বিস্কুট কিনে খাবি, তবু সস্তা বলে খই-মুড়ি চিঁড়ে খাবিনে। ভিটামিন কি শুধু

বিলেতের মাটিতেই আছে রে, আমাদের দেশের মাটিতে নেই?

আকাশ তখনও ভালো করে পরিষ্কার হয়নি। একমনে বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করে চলেছি।

হঠাৎ দেখলাম অন্য এক ঘর থেকে একজন মহিলা প্রতিনিধি গায়ে শাল চাপিয়ে আমার সঙ্গে ভ্রমণে যোগ দিলেন। তিনি রাজস্থান থেকে এসেছেন। আগের দিন খাওয়ার সময় অনেকের সঙ্গে তিনিও ছিলেন আমাদের টেবিলে। ওদিককার কোনও কলেজের অধ্যাপিকা। স্বভাবে অত্যন্ত বিনীতা এবং আত্মপ্রচার বিমুখ।

বললেন—আজই সকালে সম্মেলন আরম্ভ আর দেখছেন আজই কী উপঝরণ বৃষ্টি! সম্মেলন হবে কী করে?

বললাম—মরিশাস সরকার রয়েছে, আমাদের কী ভাবনা!

—তা বটে!

বলে তিনি কোথা থেকে এসেছেন, কী করেন, সমস্ত বলতে লাগলেন। তারপর এক সময়ে বললেন—জানেন, আপনাদের কলকাতায় আমার বোন থাকে। তার স্বামী সেখানে চাকরি করেন।

আমিও জানালাম যে আমি রাজস্থানে অনেকবার গিয়েছি। সেখানকার শহরে গ্রামে আমি অনেকদিন কাটিয়ে এসেছি। রাজস্থান আমার খুব প্রিয় রাজ্য।

তিনি বললেন—জানেন, আমার বোন কলকাতায় গিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছে যে কলকাতার লাইফ নাকি ভারি ডেলা—

আমি কথাটা শুনে হেসে উঠলাম। কলকাতা সম্বন্ধে বাইরের লোকের মুখে এত বদনাম শুনেছি যে নতুন কোনও বদনাম শুনলে আমি আর অবাক হই না। জিজ্ঞেস করলাম—তার মানে?

—মানে ডাল, বোরিং। সেখানে তাই তার খুব একঘেয়ে লাগছে!

বললাম—সে-কথা যদি আপনার বোন লিখে থাকেন তো সেটা তো দোষের নয়, বরং প্রশংসার। আপনার বোনের কথা শুনে আমার তো আনন্দই হচ্ছে। কিন্তু আমার নিজের ধারণা ঠিক তার উল্টো—

—কী রকম?

বললাম—আমি জন্মেছি ওই কলকাতায়। কলকাতার নাড়ির সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে আমি পাঁচখানা মোটা মোটা হাজার হাজার পাতার উপন্যাস লিখেছি। কলকাতাকে আমি যেমন ভাবে জানি হয়ত অনেক লোকই তেমন করে জানে না। আমার মতে বোম্বাই মাদ্রাজ দিল্লি আর কলকাতার মধ্যে কলকাতার বোধহয় আর জুড়ি নেই। মোগল আমলে নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌল্লার মাথা-ব্যথা ছিল ওই কলকাতা, তারপর ইংরেজ আমলেও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মাথা-ব্যথা ছিল ওই কলকাতা। তাই তারা কলকাতা থেকে রাজধানী রাতারাতি সরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লিতে, আর এখন স্বদেশী আমল, এই স্বদেশী আমলেও গভর্নমেণ্টের ওই একই সমস্যা কলকাতা। আসলে প্রধানত কলকাতার জন্যেই ইণ্ডিয়া দুভাগ হলো, তা জানেন?

মহিলা অবাক হয়ে শুনছিলেন আমার কথা।

আমি আবার বলতে লাগলাম—জানেন, কলকাতায় এমন এক-একটা পাড়া আছে যেখানে রাত ন'টার সময় সকাল হয়। মদের দোকান সরকারীভাবে বন্ধ হয় রাত আটটার সময় কিন্তু যদি কেউ রাত দু'টোর সময়ও মদ কিনতে চায় তাও সে অনায়াসে পেয়ে যাবে যদি তার সুলুক-সন্ধান জানা থাকে। যুদ্ধের আগে তো সমস্ত রাতই বাস চলতো। আমার নিজের চোখে তা দেখা। সেইজন্যেই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তাড়াহুড়ো আর হট্টগোলের থেকে দূরে নিরিবিলিতে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বর্তমান যুগের তাড়াহুড়ো আর হৈ-হট্টগোল মোটে পছন্দ করতেন না—কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক চিন্তাশীল মানুষই তা পছন্দ করে না—

তারপর একটু থেমে আবার বললাম—জানেন, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথাটা কী?

মহিলাটি বললেন—না, কী কথা?

—তাঁর শরীরে তখন অস্ত্রোপচার করা হবে। ডাক্তার-নার্স সবাই সন্ত্রস্ত। সবাই তটস্থ। সবাই শশব্যস্ত। চারদিকের এই ব্যস্ত-সন্ত্রস্ত ভাব দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তারপর তাদের উদ্দেশে বললেন—'অত তাড়া কেন?' আর তারপরে আর তাঁর জ্ঞান ফেরেনি—

কথার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম, হঠাৎ

খেয়াল হলো কখন বৃষ্টি থেমে গিয়ে রোদ উঠে গেছে। রোদ দেখে দুজনেই হতবাক হয়ে গিয়েছি। এ কী কাণ্ড! এই বৃষ্টি, এই রোদ!

পরে আমাকে মরিশাসের রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অপরানন্দজী বলেছিলেন—না, এখানে বর্ষাকাল বলে কোনও কালই নেই। এখানে আমাদের কখনও ছাতার দরকার লাগে না। এখানকার দোকানে আপনি জুতো জামা কাপড় চশমা ছুঁচ পেরেক সবকিছু কিনতে পাবেন, কিন্তু ওয়াটার-প্রুফ বা ছাতা হাজার হাজার টাকা খরচ করলেও কিনতে পাবেন না, এখানে ও দুটো জিনিস বিক্রিই হয় না—

সত্যিই তাই। যে কদিন ওখানে ছিলাম সে কদিনই ওইরকম। এই উপর্যুপরি বৃষ্টি, আবার দু মিনিট পরেই আকাশ পরিষ্কার। বৃষ্টির জন্যে যে একটু জল জমবে তাও না। বললাম—দেখছেন কাণ্ড। এই পচা ভাদ্র মাসে কলকাতায় এখন পচা গরম, আর এখানে কী কনকনে শুকনো ঠাণ্ডা। কাল থেকে গায়ে এক ফোঁটা ঘাম হয়নি আমার। জালিম বলছিল এখানে সারা বছরটাই নাকি পৌষ মাস। এখানে যারা বাস করে তাদের কী আরাম বলুন তো। সত্যিই মরিশাসের লোকেদের ওপর আমার খুব হিংসে হচ্ছে—।

মহিলাটি বললেন—চলুন, এবার হোটেলের সদর দরজা খুলেছে—ব্রেকফাস্ট দেবে এবার—

আমরা ডাইনিং-হলের দিকে যাবার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নেমে এলাম।

✻

মরিশাসে সম্মেলনের সেই-ই প্রথম দিন। যে জায়গাটায় সম্মেলন বসবে সেই অঞ্চলের নাম 'মোকা'। সেখানে যেদিকে চাও দেখবে শুধু লম্বা-লম্বা ঘন আখের ক্ষেত। প্রচণ্ড হাওয়ার তালে তালে আখের গাছগুলো মাথা দোলাচ্ছে। তারই ভেতর দিয়ে গাড়ি যাবার রাস্তা। গাড়িটি গেটের ভেতর ঢোকবার আগেই দুজন পুলিস গাড়ি থামিয়ে দিলে। গাড়ির ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখলে ভেতরে বোমা-বারুদ গুলি কিছু আছে কিনা। তারপর ছেড়ে দিলে। তা সেটা ওই প্রথম দিনই মাত্র। তারপরে আর কোনও দিন তার পুনরাবৃত্তি হয়নি। কেন পুনরাবৃত্তি হয়নি তা জানি না। হয়ত ওপর মহল থেকে অন্যরকম কোনও নতুন নির্দেশ এসেছিল।

ঘড়িতে মরিশাস সময় তখন সকাল সাড়ে দশটা। আমাদের সময় দুপুর বারোটা। সামনেই একটা বিরাট গেট তৈরি হয়েছে। তার মাথায় লাল শালুর ওপর সাদা হরফে লেখা রয়েছে 'সুস্বাগতম্'। আর আরো আশ্চর্য, সমস্ত গেটটাই আখ দিয়ে তৈরি। আমাদের এখানে যেমন বাঁশ দিয়ে গেট তৈরি হয়, এও তেমনি তৈরি হয়েছে আখ দিয়ে। জানি না কার মস্তিষ্ক থেকে এই পরিকল্পনাটির উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু যিনিই উদ্ভাবনা করে থাকুন, জিনিসটি যে অভিনব তা স্বীকার করতেই হলো। তাঁর শিল্পবোধের প্রশংসা না করে উপায় রইল না।

বাঁদিকে চেয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। দেখি এক সুবিরাট স্মৃতি-মন্দির। তখন প্রায় সমাপ্ত। সবাই শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আর বিস্ময়-ভরা চোখে হাঁ করে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

সেই কবে সেদিনকার এক তরুণ ব্যারিস্টার এম কে গান্ধী এখানে একদিন জাহাজ থেকে নেমেছিলেন। এ সেই তাঁরই স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত।

তখন ১৯০১ সাল। ইংরেজ-রাজত্বের তখন মধ্যযুগ। তাদের পায়ের বুটের তলায় কালা আদমিরা তখন মুখ ফুটে কথা বলতে পর্যন্ত সাহস পায় না। ফরাসীদের বিদ্রোহ আর নেপোলিয়নের যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজরা তখন হল্যাণ্ডের কাছ থেকে মোটা টাকা দিয়ে কেপ-অব-গুড-হোপ, সিলোন আর গায়ানার খানিকটা অংশ কিনে নিয়েছে। তার পরে বাজেয়াপ্ত করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। স্পেনের কাছ থেকে পেয়ে গেছে ট্রিনিদাদ, সেন্ট জন-এর নাইটদের কাছ থেকে পেয়েছে মালটা, আর ফরাসীদের কাছ থেকে পেয়েছে এই মরিশাস আর শ্যেসেল্‌স। আধখানা ভূগোলের সিংহ-ভাগ পেয়ে তখন পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করছে ইংরেজ। ইণ্ডিয়া থেকে কাঁচা মাল আর সোনা দানা নিজের দেশে পাচার করার পথ একেবারে পরিষ্কার। তখন সাদা চামড়াদের দেশের সমাজে ইংরেজই বা কে আর জগদীশ্বরই বা কে। এককথায় ইংরেজরাই তখন গড, ইংরেজরাই তখন আল্লা, ইংরেজরাই তখন ভগবান। সাদা চামড়ার ভৌগোলিক সমাজে বলতে গেলে ইংরেজরাই হলো গিয়ে তখন যাকে বলে খাঁটি নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণ!

কিন্তু ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য-ভাগ্য-বিধাতা তখন কল্পনাও করতে পারেনি যে 'তাহাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। গোকুলে যিনি তখন বাড়ছিলেন তিনি হলেন সেদিনকার সেই তরুণ ব্যারিস্টার এম. কে গান্ধী। পরবর্তীকালে যাঁর নাম হয়েছিল মহাত্মা গান্ধী।

তাই সেই মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে অতীতের সব কথা আবার নতুন করে মনে পড়তে লাগলো। এ সেই গান্ধীজী আর সেই অতীতের ইতিহাস। মনে পড়তে লাগলো—তুমি আমাদের বলেছিলে—অহিংসা আর সত্যাগ্রহ এই তোমাদের ধর্ম হোক। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো, কিন্তু অত্যাচারীকে কখনও হিংসা কোরো না। অন্যায়কে ঘৃণা কোরো কিন্তু অন্যায়কারীকে ঘৃণা কোরো না কখনও—তুমি আরো বলেছিলে—

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
"পতিত-পাবন সীতা রাম॥"

আর সেইদিনই গান্ধীজী আর তুলসীদাসজী দুজনেই অত্যাচারিতদের দৃষ্টিতে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। সেইদিন থেকেই গান্ধীজী আর তুলসীদাসজীর বাণী অহিংসা দয়া মৈত্রী মরিশাসবাসীর মূলমন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। বড় নিঃশব্দে স্বাধীনতার বীজ সেইদিনই মরিশাসের মাটিতে পোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো—স্যার—

পাশ ফিরে দেখি জালিম। তার পাশে আর একজন আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

—এই স্যার বিষণদয়াল শিউপুজন। একে নিয়ে এসেছি আপনার কাছে—

আমি সেই ছেলেটির দিকে চেয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে গিয়েছি। একেবারে অবিকল বাঙালীর চেহারা। ঠিক যেন অনাথ। সেই অশ্বিনী কাকার ছেলে অনাথ যেন বহুদিন পরে আবার আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছে।

ছেলেটি আমাকে দুই হাত জোড় করে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোমার নামটা কী বললে?

ছেলেটি বললে—শিউপুজন। বিষণ-দয়াল শিউপুজন।

আমি যেন হতাশ হয়ে গেলাম তার কথা শুনে! সে যদি বলতো তার নাম অনাথ রায়, তাহলেই যেন আমি বেশি খুশী হতাম। সত্যিই, কী আশ্চর্য মানুষের মন! সেই অশ্বিনীকাকার ছেলে অনাথ খামোখা এখানে আসতে যাবে কেন? কিন্তু চেহারার সামঞ্জস্য কি এত নিখুঁত হতে হয়?

(ক্রমশ)
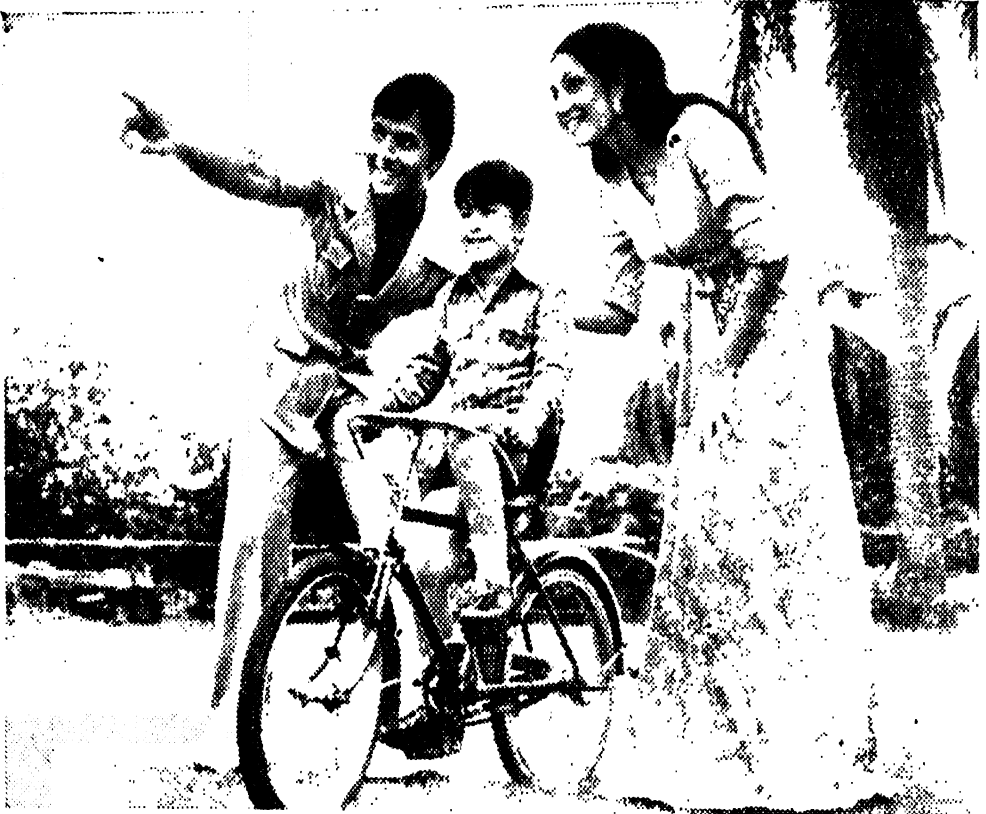
গণেশচরিত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

একঠেঙে মুখোশওয়ালা ক্রাচে ভর দিয়ে বাস থেকে নামল। নাড়ুর চায়ের দোকানে তখন বনবিহারীর বড় ছেলে গণেশ চা খাচ্ছিল। আজ এখানে হাটবার। এখনই রাস্তার দু-ধারে আনাজপাতির ভিড় বসে গেছে। ভিড়ের মধ্যে জায়গা খুঁজে মুখোশওলা দাঁড়াল। তারপর ঝোলা থেকে একটা মুখোশ বের করে পরল। অমনি গণেশ উঠে গেল। খপ করে মুখোশটা ওর মুখ থেকে খুলে নিল। মুখোশওলা গণেশকে চেনে। হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকল অগত্যা।

মুখোশটা রাবণরাজার। রাস্তার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে মুখোশপরা গণেশ কোমরে দু-হাত রেখে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গেছে। রিকশোগুলো দু-দিক থেকে এসে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। এই সময় গাঁয়ের দিক থেকে গাড়ু মুখুজ্যে এসে বলল- গণা নাকি রে? রাস্তা ছেড়ে দাঁড়া না বাবা!

গণেশ বলল তোমার বাপের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি! যেখানে যাচ্ছ, যাও না!

গাড়ু মুখুজ্যে টের পেল গণেশের মেজাজ ভাল নেই। সেও ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে হাসতে নাড়ার চায়ের দোকানে ঢুকে গেল। —কায়েতের পো দিনে তারা দেখেছে। বাপের ট্যাঁক মেরে ফূর্তি ওড়াচ্ছে তো! রোস, দেখবখন। বনবিহারী যেমনি বোঁটা থেকে খসবে, গ্রামের পিণ্ডচটকেটিও ধুলোয় নিপাত হবে!

নাড়ু জিভ কেটে বলল—চুপ। আসছে!

মুখোশপরা গণেশ রাস্তা থেকে সরে এসেছে। কিন্তু নাড়ুর দোকানে আর এল না। চেঁচিয়ে উঠল কাকে দেখে। —হাই বাণী!

সর্বাণী গেলাসে দুধ নিতে এসেছে। নাড়ু দুধও বেচে। সর্বাণী গণেশের দিকে তাকালও না। দুধ নিয়ে ঘুরতেই মুখোশ খুলে গণেশ বলল—কেমন দেখাচ্ছিল বললে না বাণী?

সর্বাণী বলল— প্যাঁচার মতো।

গণেশ আবার মুখোশটা পরে ওর পিছনে হাঁটতে থাকল। গাঁয়ে ঢোকার রাস্তায় ঘুরে সর্বাণী বলল— পেছন ধরেছ কেন?

গণেশের কী হল, মুখোশটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর ফের পিচের রাস্তায় হন হন করে হাঁটতে থাকল। আজ শালা কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। জমছেই না। কেউ তার দিকে মন দিচ্ছে না। এলোমেলো যা হোক কিছু করে বেড়াতে ইচ্ছে করছিল। সকাল থেকে মন খারাপ। সকালেই প্রোগ্রাম ভণ্ডুল। তা না হলে এতক্ষণ কোথায় চলে যেত—রেল লাইন ডিঙিয়ে, চৌত্রিশ নম্বর হাইওয়ে দিয়ে...বাবা!

সক্কালে সবে মোটর সাইকেলটা বের করেছে, বনবিহারী দাঁত ব্রাশ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। গম্ভীর মুখে বললেন—আমার মামলার দিন আছে। গণেশ অভিমান দেখিয়ে বলল—ঠিক আছে। আর কক্ষনো হাত দেব না। বনবিহারী অকারণে খাপ্পা হয়ে বললেন—হ্যাঁ, দিও না। কাজকম্ম নেই, খালি মাস্তানী! অমনি গণেশ রেগে বলল—সক্কালবেলা যা তা বলবেন না বলছি। বনবিহারী আরও খাপ্পা হয়ে বললেন—মেজাজ দেখানো হচ্ছে? হাফ পেণ্টুল পরিয়ে বের করে দেব। নাপিত ডেকে ন্যাড়া করে দেব।...

গণেশের মাথায় লম্বা চুল আছে। ছেলেবেলায় তার চুল রাখার সাধ ছিল—তবে এতবড় চুল নয়। অথচ বাবার জোরাজোরি মাথা যেত না। নিজেই গোঁফছাঁটা কাঁচি দিয়ে মুড়িয়ে দিতেন। তখন গণেশের মা বেঁচে। মা বলত—আ ছিছি! ও কি ভেড়া না মানুষ? তারপর বনমালী নাপিতকে ডেকে পাঠাত। বনমালী ক্ষুর দিয়ে মাথাটা ন্যাড়া করে দিত। সে এক দিনকাল গেছে। এখন মা বেঁচে নেই। বাবার মনও ছেলের দিকে নেই। দ্বিতীয়বার বিয়ে করে বিষয়সম্পত্তির দিকে ঘুরে গেছে। আর গণেশও বড় হয়েছে। বাবা কাঁচি বাগিয়ে এলে গণেশ কী করবে, সবাই জানে। তার পকেটে পাণ্ড থাকে। ঢোল পাতলুন পরে বলে বোঝা যায় না।

এ মায়ের এক ছেলে এক মেয়ে। পিঠোপিঠি ভাইবোন—এক বছরের ফারাক। গণেশের চেয়ে অবশ্য বারো বছরের ছোট ছোটন এখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। মিতুন

ক্লাস সিক্স। আর গণেশ তো বার তিনেক স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল! গাঁয়ে বিদ্যুৎ এলে বর্নবিহারী অনেক কিছু করে ফেলেছিলেন। ধানভানা গমপেষা আর ঘানিকল। কিছুদিন গণেশকে সেখানে বসতে হত। তারপর একবার গণেশ ক্যাশ ভেঙে কলকাতা পালাল। আরেকবার বোম্বাই অব্দিও ঘুরে এল। তাই বলে বর্নবিহারী কাগজে বিজ্ঞাপন দেননি, কিংবা থানাতেও জানাননি। কিছুই করেননি। লোকে কথা তুললে বলতেন, খাবেটা কোথায়? ফিরে এল বলে! হ্যাঁ, গণেশ ফিরেছিল। রীতিমতো ধারালো চেহারা। গাঁয়ের রাস্তায় জ্বলজ্বল করত তার মূর্তি। মেয়েরা প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকত। সর্বাণীও।

এখন বর্নবিহারীর কোলে ছোটন মাঝে মাঝে বসে। ভারি হিসেবী আর বুদ্ধিমান ছেলে। গণেশকে কাছে ঘুরঘুর করতে দেখলে ক্যাশ বাক্সের ডালায় ছোট্ট হাতটা চাপিয়ে রাখে। গণেশ টের পেয়ে রাগ করে সরে আসে। দয়ালু সৎ-মায়ের সুপারিশে অবশ্য মাসে পনের টাকা হাত-খরচার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ওই দিয়ে চলে আজকাল! তাই মাঠের খামার থেকে গোপনে ধান বেচতে হয় গণেশকে। চাষী মুনিশরা ওকে সাহায্য করে। আহা! এও তো বাপের ছেলে বটে! মা বেঁচে থাকলে কি টাকাপয়সার অভাব হত? এরকম একটা করুণা, গণেশ টের পায়, গোপনে তার উপর বয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোকে বর্নবিহারীর বদনাম কি কম করে?

যেমন সর্বাণীর মা। সর্বাণীর মা সুরমা উঠতে-বসতে বর্নবিহারীকে শাপশাপান্ত করে—গণেশের সামনেই। যখ! গাঁয়ে যখ জেগেছে গো! হয়েহন্মে লুটেপুটে করে খাচ্ছে! এই দেখ না—আমার কী অবস্থা করল? বাণীর বাবা কবে অভাবের সময়ে বন্ধক রেখেছিল—বন্ধক বলেই জানি। বাণীর বাবাও মারা গেল, আমাকেও যখ সর্বস্বান্ত করল! বলল কিনা, বিক্রি কবালা করে গেছে। আমি মেয়ে হয়ে ওই যখের সঙ্গে লড়তে পারি? বলো বাবা!

এই সুরো বামনী প্রতি ভোরবেলা বাসি চুলোর ছাই ছড়িয়ে বর্নবিহারীর নামে উৎসর্গ করে। নামটা বলে না। নয় তো গণেশের সৎ-মা দোতালা থেকে ঢিল ছুঁড়ে সর্বাণীদের উঠোন ভরে দি... একবার ছুঁড়েছিল যে! সর্বাণী... মুখ ফসকে নাম বলে ফেলেছিল। শে... অব্দি বর্নবিহারী বউকে সামলে ছাদ থেকে নামিয়ে নিয়ে যান।

তো ওই ঢিল ছোঁড়া দেখেই গণেশের মাথায় ...বার এ...টা আইডিয়া আসে। এক টুকরো কাগজ 'আমি তোমাকে ভালবাসি লিখে' সেটা ছোটনের ঘুড়ির সুতো চুরি করে ঢিলে জড়িয়ে বেঁধে গণেশ ঠিক দুক্কুরবেলা ভূতের মতো ছুঁড়েছিল। সর্বাণী সবে চান করে চুল শুকোচ্ছে উঠোনে। শীতের দুপুর। সুরমা রান্না সেরে খিড়কি দিয়ে পুকুরে নেমেছে। সর্বাণী একা। আর কী সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে! পিচুটিপড়া রোগা সেদিনকার মেয়েটা হঠাৎ করে পুরনো খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার সামনেই টুপ করে মেঝেতে পড়ল। চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল সে। তখন গণেশ ভারি জাঃ নিয়ে সিঁড়িতে বিপদে পড়েছে। বলে দিলে প্রচণ্ড কেলেঙ্কারি হবে। সুরো বামনী যা মেয়ে! এদিকে পরাক্রমশালী একচোখো বাবাটা রয়েছেন!

সর্বাণী, আশ্চর্য, একেবারে চেপে গিয়েছিল। তেমনি স্বাভাবিক—যেমন বরাবর থেকেছে। কিন্তু গণেশের সাধ্য কী যে

চিঠির কথা পাড়তে যায়! অতএব কিছুই হয়নি এমন ভাব দেখিয়ে রইল। ভেতরে হইচই হাহাকার অনন্ত জিজ্ঞাসা। কী হল সর্বাণী? কী হল? কিছু না, তা অবশ্য বেশ বুঝল।...

সেই সর্বাণী আরও বড় হয়েছে। গণেশও আরও বড় হয়েছে। এখন গণেশ শহরে বন্ধুবান্ধব করেছে। সেখানে অনেক মেয়ের সঙ্গেও চেনাজানা হয়েছে। এখন সে প্রেমিকা বাছতে জানে। হাসপাতালের সিস্টার ভদ্রমহিলার স্বামী কালেকটরির পিওন শম্ভু। শম্ভু এক সময় গণেশদের গাঁয়ে থাকত। পরে শহরে চলে যায়। সেই সূত্রে শম্ভুর মেয়ে নন্দিতার সঙ্গে আলাপ। স্মার্ট মেয়ে, ধারালো মুখচোখ। চঞ্চল। গণেশের সঙ্গে বার তিনেক ইতিমধ্যে সিনেমা দেখেছে। রেস্তোরায় খেয়েছে। গণেশ ভালবাসার কথা সোজাসুজি বলতে পারেনি—আভাসে বলেছে। নন্দিতার তাতে যেন সায় আছে। এবং এমন একটা চরম অবস্থায় গণেশ ডেট ফেল করল!

দেখা হলে ওই কথাটা নন্দিতাই বলবে। —কী? ডেট ফেল করলে যে গণেশদা? ডেটিং ব্যাপারটা গণেশ ইদানীং চমৎকার বুঝেছে। দুঃখে ক্ষোভে অস্থির গণেশ যখন বাজার ছাড়িয়ে কাঁচা রাস্তার মোড়ে পৌঁছেছে, বনবিহারী আওয়াজ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ধুলোয় ডুবে গণেশ ঠোঁট কামড়ে আবার মুখ খারাপ করল।

*

মোটর সাইকেলটা বনবিহারী কিনেছেন গত বছর। প্রথম-প্রথম ছোটখাট অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন কয়েকবার। তারপর বড় রকমের একটা হয়ে যায়। মাস তিনেক হাসপাতাল আর বাড়িতে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। ওই সময় গণেশ মোটর সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত এবং তালিম নিত। আশ্চর্য, সৎ-মা বরং উৎসাহ দিতেন। পরে গণেশের মনে হয়েছিল, কী যেন চক্রান্ত আছে এতে। সৎ-ছেলে মারাত্মক চোট খেয়ে পটল তুলুক তখন ছোটন আর মিতুন বনবিহারীর সম্পত্তি নিষ্কণ্টক ভোগ করবে। এই তো? অতএব সাবধান হয়ে যেত গণেশ। যখন স্বচ্ছন্দে চালাতে শিখল, তখনও স্পিড রাখত হিসেবের মধ্যে। রাস্তায় গাড়ি দেখলে আগে পাশে নেমে যেত। এ যেন সৎ-মায়ের কুচুটে ইচ্ছের সঙ্গে এক ধরনের চোরাগোপ্তা লড়াই। তাই বলে সৎমার মুখ দেখলে বোঝা যাবে না কিছু। বাড়ি ফিরে ভট্ ভট্ ভট্‌রর্‌র্‌ বিকট আওয়াজ দিয়ে গণেশ চাইত, সৎমা ওর বেঁচেবর্তে ফেরা দেখে চমকে যাক। কিন্তু মহিলাটির মুখে চমৎকার হাসির পর্দা টানা। পরে বনবিহারী সুস্থ হয়ে গণেশকে বলেছিলেন—না বলে কক্ষনো গাড়িতে হাত দিবিনে। গণেশ বলেছিল—বললে কি আপনি গাড়ি ছুঁতে দেবেন? বনবিহারী বরাবর গোঁয়ার রাগী মানুষ। কিন্তু ও-কথায় হেসে ফেলেছিলেন। সেই হাসিতে তাল দিয়ে ছোটনের মা বলেছিল—বাবার গাড়ি। ছেলে চাপবে না তো ভূতে চাপবে? তুমি চেপো তো বড় খোকা যখন মন হবে চেপো! এই কথার পর বনবিহারীর সিদ্ধান্ত ছিল : ঠিক আছে, চাপবে। তবে আমার কোথাও যাওয়া আছে কি না, জেনে নিয়ে। গণেশ বরাবর সেই নিয়ম মেনে আসছে। আজ ব্যাপারটা......

গণেশ বোঝে, আসলে বনবিহারী গাঁয়ে দাপট দেখাতে চান। ধানভানা গমপেষা ঘানিকল এ সবের আওয়াজ তো এক জায়গায়। মোটর সাইকেলটায় ঘুরে-ঘুরে নানা জায়গায় আওয়াজ দিয়ে বেড়াবে—তবে না! গণেশের এই হিসেব। বনবিহারী নিজে যখন ব্যস্ত, তখন তাঁর ছেলে তাঁর গাড়ি নিয়ে আওয়াজ দিয়ে বেড়াবে—এতে বনবিহারীরই কীর্তি প্রকাশ পাবে। গণেশ এভাবেই ব্যাপারটা বোঝে। জমি চষতে পাওয়ার-টিলার অব্দি কিনবেন নাকি। সেচের পাম্পও এসে যাচ্ছে শিগগির। ক্যানেলের জলে নাকি পোষাচ্ছে না। গণেশ মনে মনে বলে—ভাল। চালিয়ে যাও বাবা! ওসব তোমার ছোটনের পোষাবে, এ গণেশের নয়।

বাবা মারা গেলে গণেশ কী করবে? গণেশ একটা মোটর সাইকেল কিনবে—আরও দামী। জমিজমা ভাগে যা পাবে, বেচে শহরে চলে যাবে। একটা ব্যবসা-ট্যাবসা করবে। কী ব্যবসা? সে দেখা যাবে'খন। গজুবাবুর মতো মনোহারি মন্দ কি! মাথায় এই সব অস্পষ্ট ভাব ঘুরঘুর করে আজকাল। আর নন্দিতা এগুলো সবই জানে। শুধু জানে না, মোটর সাইকেলটার মালিক বনবিহারী, গণেশ নয়। নন্দিতার সঙ্গে

এত ভাব ওই মোটর সাইকেলটা আছে বলেই। নইলে গণেশ পাত্তা পেত না, তা সে নিজেই জানে। তাই কথনো ওটা ছেড়ে পায়ে হেঁটে পিসিমা, পিসিমা আছেন নাকি বুঝতে বলতে ওদের [illegible] যায় [illegible] ওই ভটভটে আওয়াজ শুনেই নন্দিতা বেরোয়। আজ এমনি-এমনি পায়ে হেঁটে যাবে, আর নন্দিতা বলবে—এই মা! তোমার গাড়ি কোথায়? গণেশ বলতে পারে—সারাতে দিয়েছি। কিন্তু নিজের মনের কাছে কেমন খাটো হয়ে থাকা নয় কি? তা ছাড়া আজ নন্দিতা তার কোমর জড়িয়ে বসে থাকত। গণেশের মাথা খারাপ হয়ে গেল প্রায়। সব প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দিলে বাবাটা। মলে মুখে আগুন দেব, না কচু!

*

কিছুক্ষণ পরে গণেশ আনমনে বাড়ির কাছাকাছি যেতেই সুরমার সঙ্গে দেখা। সুরমা বামনী ভুরু কুঁচকে বাঁকা হাসল। তারপর ফিসফিস করে বলল—কী হয়েছিল বাবার সঙ্গে? খুব চেঁচামেচি হচ্ছিল যেন?

গণেশ বলল—কিছু না। বাবার ব্যাপার তো জানো মাসিমা। দিনে তারা দেখছেন, নাকি সাপের পা। হাতে মাথা কেটে বেড়াচ্ছেন।

তার মানে, গ্যাস বের করে দেওয়া। গণেশ আরও খানিকটা বের করে দিত। সুরমা কপট জিভ কেটে বলল—এই মা! ও কী কথা! হাজার হলেও বাবা তো বটে! আসলে হয়েছে কী জানো?...সুরমা গণেশদের বাড়ির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে ফের ফিসফিস করে উঠল। ছোটনের মা—বুঝেছ? ছোটনের মা বাঁশনে ঢুকেছে। তাদ্দিন এই রকম। আহা, ছিল একজন সতী-লক্ষ্মী মেয়ে গো! যেদিন গেল, সাসুদ্ধ শ্মশান হয়ে গেল। তখন ভূতপেত্নী এসে জুটবে—তার কথা কী?

গণেশ কতবার এসব শুনেছে। আর ভাল লাগে না। তার ইচ্ছে, সর্বাণীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা। নন্দিতার পাশে এই মেয়েটা কাঠের পুতুল! তা হলেও এখন মন খারাপের সময়ে যা হোক একটা পেলেই হল। মেয়ে তো বটে। গণেশ মরিয়া হয়ে বলল—বাণী কী করছে মাসিমা?

বাণী? বাণী সেলাই করছে।...সুরমা মুখে অন্য রকম দুঃখ ফুটিয়ে বলল। আর কী করবে, বলো? বাজারের মুকবুল দর্জি ছাট কেটে পাঠিয়ে দেয়। ও সেলাই করে। কোথাও একটা সম্বন্ধ করতে পারলুম না এখনও। তোমার বাবাকেও তো বললুম। আসলে ওই মেয়েটা—মানে তোমার সৎমা... বুঝেছ তো? কথা উঠতে না উঠতে ভাংচি দিয়ে চিঠি লিখে পাঠায়! অথচ তোমরাই বলো, মেয়ের আমার খুঁতটা কোথায়?

ভেতর থেকে সর্বাণীর গলা শোনা গেল। —কার সঙ্গে কথা বলছ? ও মা!

গণেশ গটগট করে ঢুকে গেল। —কী করছ বাণী?

সর্বাণী একটা চকরাবকরা জামার বোতামের ঘাটি সেলাই করতে করতে নিস্পৃহ ভঙ্গীতে তাকাল। একটু হাসলও যেন। —গণেশদা যে! আচ্ছা, মুখোশটা তখন ছিঁড়ে ফেললে কেন?

এই শুনে গণেশ বারান্দায় একরাশ ছাটকাটা কাপড়ের পাশে বসে পড়ল। জামাটা দেখে বলল—বাঃ! ভারি সুন্দর ছিটটা তো? কার?

সর্বাণী ঘাড় নাড়ল। —জানি না।

গণেশ ভুরু কুঁচকে এবং একটু হেসে বলল—পিবেন ছাড়া কারু না। পলিয়েস্টার —তাই না?

—আমি কাপড়-টাপড় চিনিনে। দেয়, সেলাই করি।

সুরমা উঠোনে কাজের ভঙ্গীতে ঘুরছেন তখন। তারপর রান্নাঘর থেকে একটা এনামেলের বাটি নিয়ে বেরোলেন। গণেশ আড়চোখে দেখছিল। সর্বাণী বলল—ও নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? ও মা!

সুরমা মিষ্টি হাসল। —নবীনের বউ দুধ দিতে চেয়েছিল। নতুন গাই বিইয়েছে!

—আবার দুধ কী হবে? দুধ তো এনেছি!

—শোন কথা! নিজে থেকে দিতে চাইলে। আমি কি ভিক্ষে আনতে যাচ্ছি?...

বলে নায় চাইল গণেশের কাছে। —কী বলো বাবা?

গণেশ বলল—হ্যাঁ, মাসিমা। এ বাজারে যা চলে। বাণী তো টের পায় না!

সর্বাণী বলল—টের পাইনে মানে?

—কত ধানে কত চাল! গণেশ পা বাড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে চেপ্টে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট বের করল এবং হো হো করে হাসতে থাকল।

সুরমা হাসিমুখে বেরিয়ে গেল। সর্বাণী তারপর চুপ এবং বেজায় গম্ভীর। গণেশ বলল—দেশলাই চাই বাণী। আমারটা নাড়ুর ওখানে ফেলে এসেছি।

—ফেলে এসেছ। গিয়ে সিগারেট ধরিয়ে আনো।

গণেশ খিকখিক করে হেসে বলল—তুমি আমাকে কেন দেখতে পার না! কেন বল তো বাণী? আবার রাস্তায় দেখা হলে হাসো।

—কে হাসে?

—হাসো না? সেদিন...

সর্বাণী নড়ে উঠল। —এই! করেছ কী গণেশদা? ড্যাট্! কাপড়গুলো এখন মেলাব কী করে দেখ তো! সে গণেশের পাছার তলা থেকে ছাটগুলো টানতে থাকলো।

—কাজকম্ম নেই! সক্কালবেলা এল ফস্টি-নস্টি করতে। ড্যাট্!

গণেশ সরে বসল। —মাইরি, দেখিনি। বসে পড়েছি। কই, দেশলাই দাও।

সর্বাণী আপনমনে গজগজ করছে আর ছাট মেলাচ্ছে। হাতে চালানো সেলাইকলটার ওপর রোদ্দুর ঝিলিক দিচ্ছে। গণেশ বলল—পায়ে চালানো মেসিন কেননি কেন?

—আহা! কী সিমপ্যাথি! যেন এক্ষুনি কিনে দেবে।

গণেশ বাজী রাখার ভঙ্গীতে বলল—আলবাৎ দিতে পারি!

—হুঁ! তারপর বনোকাকা পুলিস এনে হামলা করুক।

—কেন?

—বাবার ক্যাশ ভাঙবে। সেই টাকায় মেসিন কিনে দেবে, তাই।

গণেশ ক্ষুব্ধ—কিন্তু মুখে হাসি এনে বলল—তোমার তাই মনে হয় বুঝি? তুমি জানো? মা আমার জন্যে একগাদা টাকা লুকিয়ে রেখে গেছে?

সর্বাণী চোখ বড় করল সকৌতুকে। —ও মা! তাই বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কত টাকা গো?...সর্বাণী খিলখিল করে হেসে উঠল।

—বলব। আগে দেশলাই দাও।...

এই সর্বাণীর জন্যে একবার অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল গণেশ। মাঠে একটা পুকুর আছে। তার পাড়ে থাকে পিরিমল ওস্তাদ। তুকতাক তন্ত্রমন্ত্র দারুণ জানে। তার কাছে বশীকরণ আনতে গিয়েছিল গণেশ। প্রথমে পাত্তা দিতে চায়নি পিরিমল। জটা নেড়ে বলত—যা, যা! হবে না। অনেক হাঁটাহাঁটি আর বেশ ক' ভরি গাঁজা ঘুষ দিয়ে শেষে নিমরাজী হয়েছিল গুণীন। দক্ষিণা পাঁচ টাকা। ফেরতযোগ্য নয়। যদি না ফলে বুঝতে হবে ঠিকমতো প্রয়োগ হয়নি গণেশ বাবার পকেট মেরে টাকা নিয়ে গিয়েছিল। পিরিমল বলেছিল—ঠিক আছে এবার কন্যের আঁচলের টুকরো চাই। গণেশ ঘেমে সারা। সর্বাণীর আঁচলের টুকরো কাটবে কীভাবে? পিরিমল বুদ্ধি বাতলে দিয়েছিল।—এটুকুন সাহস না থাকলে কন্যের মন পাবি কেমন করে বাবা? যখন ঘুমোবে, তখন কেটে আনবি। কিন্তু খবরদার! ওই সময় কিছুতেই পিছু ফিরে তাকাবিনে!

টাকা যে গণেশই নিয়েছে, বনবিহারী

টের পেয়েছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে প্রেমের খাতিরে গণেশ মার হজম করেছিল। সর্বাণীর জন্যে তখন মনের যা অবস্থা, প্রাণটাও দিতে আপত্তি ছিল না। মারধোর খেয়েও রাত দুপুরে সে দিব্যি বেরিয়ে পড়েছিল। দিনের বেলা বনমালী নাপিতের খোশামুদি করে একটা কাঁচি এনে রেখেছে। সেই কাঁচি নিয়ে সুরো বামনীর জানালা দিয়ে টপকেছিল। ভাগ্যিস তখন গরম কাল। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে মা ও মেয়ে ঘুমোয়, সে জানে। রাতটা ছিল অন্ধকার।...

সকালে সুরো বামনী পাড়া মাথায় করেছিল। ঘাটে আঁচলে মুখ মুছতে গিয়ে টের পেয়েছে আঁচলের কোণা কাটা। এই তুকতাকের রীতি গাঁয়ে সবাই জানে। ঘাটে মেয়েরা খুব হাসাহাসি না করে পারেনি। ও বামুনদিদি! তোমার ওপর কার নজর পড়ল গো! এ কী কেলেঙ্কারি বাপু এ বয়সে! সুরমার মাথায় খুন চড়ে যাবার কথা নয়?

আর গণেশও টের পেয়েছিল, যে টুকরোটা কেটে এনেছে—তা চুলপাড় ধুতির। সে তো ভয়ে কাঠ। যদি সর্বাণীর বদলে তার মা 'বশীকরণ' হয়ে...

অ্যাই রামো॥! ভয়ে গণেশের চোখ ফেটে জল। দালানীমাতলার বটগাছের খোকরে লুকিয়ে খুব কেঁদে ফেলেছিল। ওদিকে সুরো বামনীর চেঁচামেচি যখন চলেছে, তখন বনমালী কামাতে এসেছে বনবিহারীকে। ওর পেটে কথা থাকে না। এ পাড়ার কথা ও-পাড়ায় বয়ে নিয়ে যায়। বনবিহারীর দাড়িতে সাবান ঘষতে ঘষতে বলল—বড়বাবু, ছেলেটার একটা বিহিত করুন। কাল বিকেলবেলা আমার কাছে গিয়ে বললে, নতুনমা ন্যাতার জন্যে পুরনো কাপড় কাটবে। আমি বললুম—কাপড় কাটবে? পুরনো ট্যানা। ছিঁড়লেই ছেঁড়া যায়। চালাকির জায়গা পাওনি? আর কাপড়কাটা কাঁচি আমি পাব কোথায়? তখন বললে—না না ছোটনের মাথায় ফোড়া হয়েছে। চুল কাটবে। ভাবলুম, তা হতে পারে অবশ্যি। দিলুম। তে, এই কীর্তি করবে কে জানে!

বনবিহারী দাড়িতে সাবান নিয়ে উঠে হাঁক দিলেন—গণা! অ্যাই গণা!

গণেশ পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন থেকে মাঠের পুকুরপাড়ে পিরিমল ওস্তাদেরও দেখা নেই। এ-গাঁ ও-গাঁ থেকে গরুর ব্যামো আর ভূতেধরা রুগীর খবর যারা এনেছিল, তারা অন্তেপন্তে চলে যায়।

তারপর যথারীতি গণেশের বিয়ের কথাও চলতে থাকে। কিন্তু এই সর্বাণীর বেলায় যেমন নাকি হয়ে আসছে, গণেশের বেলাতেও তাই। কে কোত্থেকে ভাংচি দেয়। হাউণ্ডুলে উচ্ছন্নে যাওয়া মাস্তান ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে কোন বাবা চাইবে? তার ওপর সৎমায়ের সংসার। গণেশ এইসব গণ্ডগোলে আইবুড়ো থেকে গেছে। আগের দিনকাল তো নেই। আর গণেশেরও এখন চোখমুখ হয়েছে। তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। এখন সে বলে —ভাতঅ্যারেজ করব, যদি নিয়ে করি তো আঁখ কাঁর। গাঁয়ের লোকে বোঝে, আজকাল এটা অসম্ভব নয়। মেয়েরা যা হয়েছে। ওই গ্যাড়াবাবু সেদিন বলছিলেন—আইবুড়ো নাড়ু। অমন সুন্দর সুন্দর মেয়ে—সঙ্গে মাস্তান নিয়ে ঘোরে! বোঝ ঠ্যালা! কেন বলো তো? নাড়ুও বলল—কেন বলুন তো? গ্যাড়াবাবু বললেন—মালগাড়ির পেছনে গার্ড। কী? ভুল বলছি? হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ! এই গণশাটা বুঝবে। কী রে গণা? আই না?...

*

গণেশ রাগ দেখিয়ে বলল—আমার গরজ হয়েছে তোমার বাণী! তখন থেকে দেশলাই চাচ্ছি। যাঃ, আর কখনো আসব না।

—বয়ে গেল! সর্বাণী সেলাইকলের চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল।

গণেশ উঠে দাঁড়াল। সেই সময় সুরমা দুধের বাটি নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে। হন্তদন্ত ভাব তার। বলল—ও বাণী! গ্যাড়ার বাবা যাচ্ছে!

—যাচ্ছে মানে? ও মা। কোথায় যাচ্ছে?

সুরমা বারান্দার কোণায় উঁচু তাকে বাটি রেখে মুখ ঝামটা দিল।—কথা শোন মেয়ের! আজ সাতদিন যমে-মানুষে লড়াই চলছিল না? কাল কাপালীর কোবরেজও জবাব দিয়ে গিয়েছিল। মন মানে? ক্যাটারা সকালে গিয়েছিল টাউনের বড় ডাক্তার আনতে। ডাক্তারও বাড়ি ঢুকছে, মুখুয্যে মশাইও চোখ বুজেছেন। ও বাণী! দুধটা রইল। দেখিস মা। জ্বাল দিস। আমি আসছি! আহা হা, গাঁয়ের সেরা মানুষটি ছিলেন গো! গাঁ যে অনাথ হয়ে গেল গো!

চোখ মুছতে মুছতে সুরমা দৌড়ল। গণেশ চাপা নিশ্বাস ফেলে বলল—বুড়োটা

YOU KNOW THE NAME
Solid State
Stereo
NOW KNOW THE SOUND
COSMIC
STEREO SYSTEMS
Distributors: COSMIC ELECTRONICS Andheri, Bombay-400 093

গেল? যাক সে বাবা! আমি ওদিকে যাচ্ছিনে তাই বলে। ওই তিনমনী মস্তা... খপস!

সর্বাণী বললে—তোমাকে কাঁধ লাগাতে হবে কেন? গাড়ি করে নিয়ে যাবে। ভেল্টুবাবুর লরী আছে না?

—সঙ্গে তো যেতে হবে। মিনটা লস পুরো। আমার বাবা অনেক কাজ। চলি।

—দেশলাই নেবে না?

এই কথাটা গণেশের ভেতরে কোথায় গিয়ে লাগল। তার শরীর কেঁপে উঠল। গলা ঝেড়ে নিয়ে দুপা এগোল সে।—যাক। দয়া হল শেষ অব্দি!

সর্বাণী সাবধানে ছাট গুছিয়ে রেখে উঠল।—দয়া কিসের? এমন ঢঙের কথা শিখেছ না!

বারান্দার কোণায় খানিকটা জায়গা তালপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওটাই রান্নাঘর। তালপাতার ভেতর দিকটা বিকট কালো আর ঝুলপড়া। একটা উনুন। কয়েকটা এনামেলের হাঁড়ি আর কাঁসার থালা-গেলাস-বাটি উপুড় ক'র রাখা আছে। জায়গাটা আবছা অন্ধকার। একটু উঁচুতে দেয়ালের তাকে মশলার কৌটো আছে। সুরমা তার মধ্যে দুধের ঘটি রেখে গেছে। সর্বাণী সাবধানে ঘটিটা নামিয়ে উনুনের ধারে রাখল। তারপর বলল—মায়ের কোন মানে হয় না! দেশলইটা কোথায় রেখেছে দেখ তো! ও মা!

বলেই সে ফিক করে হাসল।—মা এতক্ষণ মুখুযোবাড়িতে সানাইয়ের পোঁ ধরেছে। তাই না গণেশদা।

গণেশ বারান্দায় উঠেছে। সামনে ঘরের দরজা। ঘোঁত ঘোঁত করে হাসল শুধু। আঙুলে সিগারেট কাঁপছে।

সর্বাণী তেতো মুখে বলল—প্রত্যেকবার উনুন জ্বালতে আলো ধরাতে দেশলাই দেশলাই দেশলাই। যেন যখের ধন সাতরাজার মানিক! একমিনিট গণেশদা, দিচ্ছি।

সে গণেশের সামনে দিয়ে ঘরে ঢুকল। দেশলাইয়ের ব্যাপারে সুরমা সাবধানী। ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রাখতে ভোলে না। নিশ্চয় ঘরে আয়নার তলার খোপে রেখেছে। সুরমার এই অভ্যাস আছে। ভুল করে এক জায়গার জিনিস অন্য জায়গায় রাখে। সর্বানী আয়নার দিকে অভ্যাসমতো একবার তাকিয়ে চমকাল। গণেশ তার পিঠের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

সর্বানীর হাতের মুঠোয় দেশলাইটা মচমচ করে উঠল। গণেশের আর একটা চাপা নিশ্বাসও একই সঙ্গে বেরিয়ে গেল। গলা ঝেড়ে গণেশ বলল—কই, দাও দেশলাই।

সর্বাণীর নাকের ফুটো কাঁপছিল। শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বলল—না।

হঠাৎ গণেশ নড়ে উঠল। সিগারেটটা দলা পাকিয়ে সর্বাণীর বুকে ছুঁড়ে সে বেরিয়ে এল। তারপর আর পিছু না ফিরে ভাঙা দরজা দিয়ে রাস্তায় নামল। হনহন করে হাটতে থাকল।

সর্বাণী তখনও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে নিল। আয়নাটা বিলিতী। বাবা এনেছিলেন কলকাতা থেকে। এখনও মোটামুটি পরিষ্কার আছে। শুধু একটা কোণায় ফাটল। বাবা একবার রাগ করে হাতের চাবি ছুঁড়েছিলেন। তখন সর্বাণী ফ্রকপরা মেয়ে। রোগা, পিচুটিপড়া। পেটে কৃমির বাসা।

মা মুখুয্যেবাড়ি কেন কাঁদতে গেল, সর্বাণী বুঝেছে। আয়নার ভেতর তার চোখে জলের ফোঁটা টলটল করছে। দুঃখে অপমানবোধে—কিংবা বেঁচে যাওয়ার সুখে। কেন অমন করে গণেশ পিঠের কাছে দাঁড়িয়েছিল? হঠাৎ চলে গেলই বা কেন? দুটোই ভীষণ অপমানজনক। এইসব সাতপাঁচ ভাবনা নিয়ে সর্বাণী ঘটির দুধে

জবাব দিতে ফেরাল। খুব অন্যমনস্ক হাতে সে পাটকাঠি ধরাতে থাকল। অ পনে ধরতে তার হঠাৎ হাসি পেল। গণেশের সব জেনেই। তাকে বশীকরণ করতে তার মা দাঁড়াল ফেলেছিল! কায়েতের ছেলের এত দুঃখ!

*

তখন গণেশ বাসে চেপেছে। এ লাইনের বাসে বা ভিড়! পাদানীতে দাঁড়িয়ে এতক্ষণে সিগারেট টানছে। বিশাল চুলে বাতাসের উপদ্রব। কণ্ডাক্টারটা চেনা ছেলে। তাকেও সিগারেট দিয়েছে। সে খাতির জমাতে বলেছে—দাদার গাড়ি কী হল?

—সারতে দিয়েছি।

সুরো বামনীর বাড়ির ব্যাপারটা ভাবতে এখন ভয় করছে। বলে দেবে না তা সর্বাণী? হয়তো বলবে না। সেবার ঢিলেবাঁধা প্রেমপত্রের ব্যাপারটা তো বলেনি। খুব চাপা মেয়ে। কায়েত হলেও কি ওকে বিয়ে করত গণেশ? রামোঃ! বিয়ে এক ব্যাপার—প্রেম অন্য ব্যাপার। সে সর্বাণীর সঙ্গে নিষ্কলুষ প্রেমই চেয়েছিল। তাতে জাতপাতের দরকারই হয় না। সর্বাণী শিক্ষিত মেয়ে হয়েও বোঝেনা! আর গণেশের চেহারাও তো সুন্দর। একটু শ্যামলা, এই যা।

—দাদা, টাইম কটা দেখুন তো? ট্রেনের প্যাসেঞ্জার আছে।

—নটা প্রায়।

—অনেক টাইম আছে।...কণ্ডাক্টার ছেলেটা গলা ছেড়ে গান ধরল। দুধারে হেমন্তের হলুদ মাঠ। আট কিলোমিটারে হাইওয়েতে এসে বাস চলেছে ব্রিজের চড়াইয়ে। বুকের ভেতরটা গরগর করে গণেশের। এতক্ষণ কতদূরে চলে যেত। সে অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখে। ওই রেললাইন ডিঙিয়ে চলে গেছে বাবলা বন পেরিয়ে আকাশর শেষ দিকটায়—কতদূরে!

ব্রিজ পেরিয়ে বাস দাঁড়াল। গণেশ নামল। কণ্ডাক্টার হাত নেড়ে বলল—টা টা! গণেশ গ্রাহ্য করল না। নন্দিতাদের কোয়ার্টারের দিকে তার চোখ। বারান্দা খালি। হয়তো অপেক্ষা করে-করে রেগে বেরিয়ে গেছে। কোথাও।

গণেশ স্মার্ট হয়ে উঠেছে পর। একটু দূরে থেকেই সে ডাকে সমা! পিসিমা! তারপর বারান্দায় যায়। তখনও কারও সাড়া নেই। নন্দি বাবা-মায়ের এখন থাকার কথা নয়। তা একা থাকবে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গণেশ ডাকে—নন্দিতা!

একটু পরে এক অচেনা বুড়ি দরজা খুলল।—কাকে চাই?

গণেশ ভড়কে যায়। মানে, ওরা কেউ নেই?

বুড়ি এতক্ষণ মনের সুখে চান করছিল। চুল থেকে জল ঝরছে। বলে—নেই তো বাবা। কোত্থেকে আসছ তুমি?

গণেশ বলে—নন্দিতা কোথায় গেল বুড়িমা?

—বুড়ি? বুড়ি তো একটু আগে বেরুল। জ্ঞান ডাক্তারের ছেলে গাড়ি এনেছিল। গাড়িতে করে গেল।

বুড়ি নন্দিতার ডাকনাম? গণেশ জানত না। জ্ঞান ডাক্তারের ছেলের কথা জানত। গাড়ির কথা জানত না। গণেশ দম আটকানো গালয় বলে—গাড়ি, মানে মোটর গাড়ি? চারটে চাকা?

—হ্যাঁ।...বুড়ি হাসতে থাকে। আজকাল কি ঘোড়ার গাড়ি হবে?

—আপনি কে বুড়িমা?

—আমি বুড়ির ঠাকমা।

—আপনাকে তো কখনও দেখিনি।

—দেখবে কী করে? অ্যাদ্দিন বড়ছেলের কাছে থাকতুম। কলকাতায় মলঙ্গা লেন চেনো? সেখানে। বড়ছেলের শিশিবোতলের কারবার আছে।

গণেশ নেমে আসে। নন্দিতার ঠাকমা পেছনে ব্যাকুল হয়ে বলে—ও ছেলে! জিগ্যেস করলে কী বলব? কে তুমি এসেছিলে...। বুড়ির মায়ের আবার বড্ড কড়া মেজাজ।

গণেশ ঘুরে বলে—বলবেন ডি এমের ছেলে এসেছিল!

—ও ছেলে! ওগো ছেলে:

গণেশ ব্রিজের দিকে যখন ঠেলে উঠছে, নিজেকে মনে হচ্ছে আস্ত মোটর সাইকেল। রক্ত-মাংস-হাড় থরথর করে কাঁপিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ উঠছে ভট্ ভট্রর...ভট ভটররর! চোয়াল আঁটো। দাঁতে দাঁত। শিরা ফুলে দড়ি। ওপরে উঠে সে ফুসফুসে যতটা পারে বাতাস ভরে নিতে থাকে। নীচে শহর মানুষজন গাড়ির ভিড় একটুকুন। গঙ্গায় ফরাক্কার জল এসে কানাঅব্দি টলটল করছে। নয়তো এখন নদী সরু ফিতে হয়ে যেত। গণেশ রেলিঙে ঝুঁকে ভাবে, লাফ দিয়ে পড়লে সব ল্যাঠা চুকে যায়। বেঁচে কী লাভ হচ্ছে তার?

—দাদা, টাইম কটা?

তেঁতো হয়ে গণেশ ঘোরে। আজকাল সবাই টাইম জানতে চায়। টাইম বলে গণেশ পা চালায়। কোথায় যাবে? শহরের বন্ধুরা এখনও কল্পনা রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিচ্ছে। থাক গে। মাস্তানী আর ভাল্লাগে না।

জজকোর্টে যাবে? বাবার মামলাটার আজ রায় দেবার দিন। জয়নাল হাজির সঙ্গে জমি নিয়ে হ্যাঙ্গামার মামলা। বাবা মূল আসামী। জেলটেল হয় যদি? আফটার অল বাবা হচ্ছে বাবা। গণেশ মমতায় নুয়ে পড়ে। শেষ অব্দি বাবা ছাড়া আর আপন বলতে কেউ তো নেই তার।

কিন্তু সকালের কথা মনে পড়তেই গণেশ আবার বদলে যায়। মোটর সাইকেলটা আজ বাবা কেড়ে না নিলে গণেশের জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেত। জ্ঞান ডাক্তারের ছেলে আসার আগেই বনবিহারীর ছেলে নন্দিতাকে তুলে নিয়ে কাঁহা-কাঁহা মুলুকে চলে যেত। হেমন্তের কড়া রোদ থেকে বাঁচতে গণেশ ছায়ার খোঁজে পা বাড়াল।

সন্ধ্যায় বনবিহারী গাঁয়ে ফিরছেন। মোটর সাইকেলের আলোয় দেখতে পেলেন কে এক লম্বা চুলো ঢোলা পাতলুন পরা ছোকরা রাস্তার মাঝামাঝি হেঁটে চলেছে। হর্নের আওয়াজ দিয়েও নড়ল না। কাছাকাছি গিয়ে বনবিহারী ধমকের সুরে বললেন—কে?

ছোকরা ঘুরতেই বনবিহারী চমকালেন। —গণা! হেঁটে যাচ্ছিস কেন?

গণেশ কাঁচুমাচু হাসে।—এমনি। তুমি ফিরলে?

বনবিহারী গর্জে বলেন—উঠে আয় হতভাগা! রাস্তার মাঝখানে যাচ্ছে। বাপের রাস্তা পেয়েছ! ওঠ গাড়িতে।

গণেশ বলে—থাক।

—থাপ্পড় মারব। উঠে আয়। ব্যাকসিটে বস।

অগত্যা গণেশ ব্যাকসিটে ওঠে।

—কোমর ধর!

গণেশ কোমর জড়িয়ে ধরে।

—নেশা করেছিস?

—না।

মোটর সাইকেল চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বনবিহারী বলেন—মামলায় জিতে গেলুম। তো খালি তখন থেকে তোর মায়ের কথা ভাবছিলুম। বলেছিল, আমি বর দিয়ে যাচ্ছি—সবেতে তোমার জয়...

হঠাৎ বনবিহারী চুপ করে গেলেন। পিঠে গণেশ মুখ গুঁজেছে। সেই জায়গাটা যেন ভিজে লাগছে। এই উজুক বলে গর্জে উঠতে গিয়ে বনবিহারী সংশয়ে ঢোক গিললেন। হেমন্তের দিনটা প্রচণ্ড গরম গেছে। নিছক ঘাম হতেও পারে।...

বিশ্ববিজ্ঞান

মস্তিষ্কের বার্ধক্য

[illegible] মস্তিষ্ক-কোষ দ্রুত বার্ধক্যের দিকে [illegible] নারী [illegible] পুরুষের? সম্প্রতি [illegible] এক চিকিৎসক সম্মেলনে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শারীরবিজ্ঞানী। সত্তরজন নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্ক-কোষ নিয়ে তাঁরা গবেষণা চালিয়েছেন গত কয়েক বছর ধরে। ওইসব নারী এবং পুরুষের কারোর বয়স ছিল এগারো বছর। কারোর নব্বই। তাঁদের সিদ্ধান্ত : পুরুষের মস্তিষ্ক-কোষ কুড়ি বছর বয়েস থেকেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়। এই সময় থেকেই তাদের মস্তিষ্ক-কোষে জরার আবির্ভাব ঘটে। এই জন্যই ধীরে ধীরে তাদের মস্তিষ্ক-কোষগুলিকে বার্ধক্যের দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু নারীরা তার ব্যতিক্রম। কুড়ি বছর বয়েসে তাদের মস্তিষ্ক-কোষ যথেষ্ট পুষ্ট অবস্থায় থাকে। জরার কোন লক্ষণই তখন চোখে পড়ে না। বয়েস চল্লিশে পৌঁছানর পর নারীদের মস্তিষ্ক-কোষে জরার লক্ষণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। উল্লেখ্য, দেহের অন্যান্য অংশের বেশির ভাগ কোষ থেকে মস্তিষ্ক-কোষের বড় রকমের একটি পার্থক্য এই, আর সব কোষ জরা (?) বা অন্যকোন কারণে নষ্ট হয়ে গেল সেক্ষেত্রে কোষ-বিভাজন পদ্ধতিতে নতুন কোষ সৃষ্ট হয় এবং বিনষ্ট কোষের অভাব দূর করে। এ ব্যাপারে মস্তিষ্ক-কোষ ব্যতিক্রম। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, জন্মের পর প্রায় কুড়ি মাস বয়েসের মধ্যেই মানুষের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ আকৃতি বা আয়তন লাভ করে। মস্তিষ্কের যাবতীয় কোষ (নিউরোনস) ওই সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায়। তারপর বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে নানা রকম অবক্ষয়ের মধ্যে পড়ে তাদের কিছু কিছু অংশ জড়ত্ব লাভ করে। হয়ত মরেও যায়। অন্যান্য কোষের মত বিভাজন পদ্ধতিতে নতুন কোষ তৈরি হয়ে যে তাদের প্রতিস্থাপন করবে, এক্ষেত্রে সেটা আর ঘটে না।

প্রশ্ন : মেয়েরা চল্লিশে পড়ার পর তাঁদের মস্তিষ্ক-কোষের চালচলন কেমন অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়?

এর উত্তরে কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই শারীর-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আমরা দুঃখিত। কারণ এর পর থেকেই গোলমালের শুরু। চল্লিশের পরই মেয়েদের মস্তিষ্ক-কোষে দ্রুতগতিতে জরা এসে গ্রাস করতে শুরু করে। আর তার মাত্রা সবচেয়ে বেড়ে যায়, যখন তাঁদের বয়েস গিয়ে দাঁড়ায় ষাটে। তুলনায় পুরুষদের অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। কুড়ি বছর বয়েসেই তাঁদের মস্তিষ্ক-কোষে জরার আবির্ভাব ঘটলেও তার গ্রাস করার ব্যাপারটা ঘটে খুবই ধীর গতিতে। এই ধীর গতি তাঁর চল্লিশ, পঞ্চাশ অথবা ষাট বছর বয়স কালেও অটুট থাকে। একমাত্র —বলতে পারেন, যখন তাঁদের বয়েস গিয়ে দাঁড়ায় আশি বছর, অর্থাৎ বয়েসে যখন তাঁরা পাকা বুড়ো, তখনই মস্তিষ্ক-কোষে জরার প্রকোপ ঘটে অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে।

বার্লিনের ওই সম্মেলনে 'স্ট্রোক' নিয়েও আলোচনা করেছেন কয়েকজন মস্তিষ্ক-রোগ বিশেষজ্ঞ। গত কয়েক দশক আগেই প্রমাণিত হয়েছিল, শরীরের সমস্ত কোষকলার মধ্যে সবচাইতে বেশি সংবেদনশীল মস্তিষ্কের কোষকলা বা ব্রেইন টিস্যু। অক্সিজেনের এতটুকু অভাব ঘটলেই এই সব কোষকলা অকর্মণ্য হতে শুরু করে। দেখা গেছে, মাত্র এক

স্ট্রোকের পর মস্তিষ্ক-কোষকলা বা ব্রেইন টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কতটা ব্যাহত হয়? রক্ত চলাচলের কারদাকানুনই বা কিভাবে চলে? মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে পরীক্ষা করছেন দুজন বিজ্ঞানী (পিছনে)। সামনে বসে রয়েছেন জনৈকা রোগিণী। তাঁর মাথার দুপাশে দুটি গামা-রশ্মি ক্যামেরা। নলের সাহায্যে মুখ দিয়ে তিনি শ্বাস নিচ্ছেন। শ্বাসের বাতাসের মধ্যে মেশানো রয়েছে জেনন গ্যাস। রক্তের মধ্যে দিয়ে এই গ্যাস তাঁর মস্তিষ্কের কোথায় কোন্ অংশে কতটা যাচ্ছে ধরা পড়বে গামা-রশ্মি ক্যামেরায়। তারপর কম্পিউটারের সাহায্যে হিসেব করে বিশেষজ্ঞরা বলে দেবেন, তাঁর মস্তিষ্কের কোন্ অংশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত।

মিনিটের জন্যেও যদি রক্তচলাচল বন্ধ থাকে মস্তিষ্ক-কোষ মারা যায়।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, অন্যান্য কোষের চেয়ে মস্তিষ্ক-কোষের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষমতা কি খুবই কম?

সম্প্রতি এর উত্তরে বলা হচ্ছে, কথাটা ঠিক নয়। মস্তিষ্কে রক্তের চলাচলে সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলেই যে মস্তিষ্কের কোষ একেবারে নেতিয়ে পড়বে, অথবা তারপর স্বাভাবিক রক্তচলাচল শুরু হলে সবল হতে পারবে না, এমন ভাবাটা হয়ত ভুল হবে।

আসলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম। ধরুন, দুর্ঘটনায় পড়ে কেউ মস্তিষ্কে আঘাত পেলেন। অথবা শারীরযন্ত্রের গোলযোগে কারোর 'স্ট্রোক' হল, কিংবা হৃদরোগে আক্রান্ত। এমন অবস্থায় পড়লে মস্তিষ্ক-কোষে রক্ত চলাচল বাধা পায়। দেখা গেছে সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে তখন মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের ব্যবস্থা করলেও অনেক সময় কাজ হয় না। এর কারণ এই নয় যে মস্তিষ্ক-কোষ রক্ত-চলাচলের বিরতি মুহূর্তে তাদের কর্ম-

ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে। আসলে স্ট্রোক, মস্তিষ্কে আঘাত প্রভৃতি কারণে যে মুহূর্তে মস্তিষ্ক-কোষে রক্ত-সংবহন বন্ধ হয়, সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে ছড়িয়ে থাকা 'ব্লাড ভেসলস' বা সূক্ষ্ম রক্তবাহী নলগুলি আঠার মত জুড়ে যায়। কৃত্রিম উপায়ে এই সব নলের মধ্যে দিয়ে পরে রক্তচলাচলের ব্যবস্থা করলেও দেখা যায় এই জোড় যেন আর খুলতে চায় না। ফলে মস্তিষ্ক-কোষে অকসিজেন বা খাবার পাঠান বন্ধ হয়ে যায়। যার পরিণতি মস্তিষ্ক-কোষকলার মৃত্যু।

মৃত্যু যদি নাও হয়, মস্তিষ্ক-কোষে নানা রকম প্রোটিন উৎপাদন বাধা পাবে। বলেছেন কোলোনের ম্যাকস প্লাঙ্ক ব্রেইন রিসার্চ ইনসটিটিউটের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ। উল্লেখ্য, শরীরের যাবতীয় কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং ভারসাম্য নির্ভর করে এই সব প্রোটিনজাতীয় রাসায়নিক যোগেরই ওপর। কোলনের বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রক্ত চলাচল একবার ব্যাহত হলেই মস্তিষ্কে প্রোটিন তৈরির কাজ বাধা পায়। পরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে এলেও সে কাজ আর স্বাভাবিক অবস্থায় পুনরুদ্ধার করা যায় না।

মস্তিষ্কের রক্ত যাতে না জমাট বাঁধে, তার জন্যে কিছু কিছু ওষুধপত্র অবশ্য কাজে লাগান হয়। তবে এক্ষেত্রেও ঝুঁকি যে একেবারে নেই তাও নয়। অনেক সময় কোন কোন রক্তসংবহনকারী নলে হয়ত কিছু কিছু সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা গেল। তখন রক্ত-জমাট বন্ধ করায় ওই সব ওষুধ, যাদের বলা হয় 'অ্যান্টি-কোঅ্যাগুলেন্ট', রক্তের তারল্য ফিরিয়ে আনে। এই তরল রক্ত ওই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে চুইয়ে অস্বাভাবিকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় হেমারেজ। এর ফলে রোগী মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলেও তাঁর মধ্যে নানা রকম মানসিক রোগ দেখা দেবার সম্ভাবনা থাকে। কখনও মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এক্ষেত্রে সিসেনের বিশিষ্ট মস্তিষ্ক-রোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ শাকের এবং গোয়টিং-গেনের ডঃ স্পার মন্তব্য করেছেন, মস্তিষ্ক রোগের ক্ষেত্রে অ্যান্টি কোঅ্যাগুলেন্ট যথেষ্ট সাবধানে প্রয়োগ করা দরকার।

মস্তিষ্কে টিউমার প্রসঙ্গে ভিয়েনার বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জেলিংগার বলেছেন, রঞ্জনরশ্মির চেয়ে ওষুধের সাহায্যে ক্যানসার-কোষের বিভাজন অনেক তাড়াতাড়ি রোধ করা যায়।

মস্তিষ্ক-রোগের কার্যকারণ সম্পর্কে অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত। তবে যার্গিনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গোটিং-গেনের তিনজন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের সাহায্যে জীবিত মানুষের মস্তিষ্ক-কোষের যৎসামান্য নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা সম্ভব হলে অনেক মস্তিষ্ক-রোগের চিকিৎসার কাজই হয়ত সহজতর হবে।

কম আহার দীর্ঘ আয়ু

আপাতত পরীক্ষাটি চালান হয়েছে এক ধরনের ইঁদুরের ওপর (B/W strain)। ওদের একদলকে খেতে দেয়া হয়েছিল স্বাভাবিক খাবার। এই খাবারের মধ্যে দিয়ে দৈনিক তারা পেত শতকরা ২০ ভাগ প্রোটিন, ৫ ভাগ ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় পদার্থ এবং ২০ ক্যালোরি শক্তি। শেষোক্তটির উৎস শর্করা বা কার্বহাইড্রেট। দৈনিক এই পরিমাণ খাবার খেয়ে দেখা গেল পুরুষ ইঁদুররা বেঁচে রইল গড়ে ৩৩৪ দিন, এবং মেয়েরা আরও ৪৭ দিন বেশি। অর্থাৎ ৩৮১ দিন।

এরপর খাদ্যের উপাদানের নানা রকম হেরফের ঘটিয়ে এবং সেই সঙ্গে এক একটি ইঁদুরকে কখনও বেশি প্রোটিন, অথবা কম, কখনও বা বেশি কার্বহাইড্রেট অথবা কম, খাইয়ে পর্যবেক্ষণ চালান হল। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে চমকপ্রদ ফলাফল দেখা গেল কার্বহাইড্রেটের ব্যাপারে। দৈনিক আহার্যের গোড়ায় যে হিসেবটি দেয়া হয়েছে, সেটি ঠিক রইল। অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ প্রোটিন এবং ৫ ভাগ চর্বি, শুধু ২০ ক্যালোরির ক্ষেত্রে কমিয়ে করা হল ১০ ক্যালোরি। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, অন্যান্য উপাদানের মাত্রা অপরিবর্তিত রেখে শুধু ক্যালোরির পরিমাণ অর্ধেক করার ফলে শত-করা প্রায় ৭০টি ইঁদুরের আয়ুষ্কাল স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। তাদের অনেকেই বেঁচেছিল ৭০০ দিন।

সম্প্রতি এই তথ্যটি পরিবেশন করেছেন মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জি ফার্নাণ্ডেজ এবং এডোয়ার্ড ইউনিস এবং নিউইয়র্কের স্লোয়ান কেটেরিং ইনসটি-টিউটের রবার্ট গুড। নিজেদের গবেষণা-গারে তাঁরাই ইঁদুরের ওপর খাদ্যসংক্রান্ত এই পরীক্ষার কাজটি চালিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা, কম খাবার, বিশেষ করে স্বল্প পরিমাণ ক্যালোরিই ইঁদুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবার ব্যাপারে সম্ভবত অনেক বেশি কার্যকর। মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের পদ্ধতি কতটা কাজে লাগতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁরা অবশ্য এখনও পর্যন্ত কিছু বলেন নি।

সমরজিৎ কর

আলোচনা

সুরেশ সমাজপতি

শ্রীসুজিতকুমার সেনগুপ্তের লেখা 'জ্যোতির্ময় রবি ও কালো মেঘের দল' পড়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকা' সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলাম। কিন্তু লেখক সুরেশচন্দ্রকে যতটা কুখ্যাতি দিতে চান আমরা তা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না।

'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-সমালোচনার কিছু কিছু নিছকই ঈর্ষা-জনিত রচনা। সব বড় লেখককেই এই ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, এবং শুধু এর জন্যে সুরেশচন্দ্রকে নিয়ে মাতামাতি করা সজে না। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের কিছু লেখা এবং দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের লেখা থেকে বোঝা যায় যে এ'রা সত্যিই রবীন্দ্রনাথের লেখার রীতি পছন্দ করতেন না। তার জন্যে কি এদের ঠিক দোষ দেওয়া যায়? মুশকিল হচ্ছে যে সাহিত্যে বাঁধাধরা কোনো নিয়ম থাকে না যা দিয়ে একটা লেখাকে ভাল কি খারাপ বিচার করা যেতে পারে। আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাবে গড়ে উঠেছি ছেলেবেলা থেকে তাই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা দেখলে আমরা আশ্চর্য হই। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের দল তো সেই হাওয়ায় মানুষ নন, তাঁদের সঙ্গে আমরা কি ভাবে তর্কে প্রবৃত্ত হব? সুরেশচন্দ্র যদি দাবি করেন যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাথা 'চিবিয়ে খেয়েছেন', সেই জন্যেই আমরা আজ রবীন্দ্রনাথের লেখার দোষ দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আমরা কি জবাব দিতে পারি? সুরেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে যে পথে চালাতে চেয়েছিলেন সে পথে চালাতে পারেননি, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই জয়ী হয়েছেন। এবং আজ যে বাংলা ভাষা গড়ে উঠেছে তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকে আমরা একশ'বার ভাল বলব। কিন্তু সুরেশচন্দ্র যে রকমের বাংলাভাষা চেয়েছিলেন সেই বাংলাভাষা লিখে পড়ে যারা মানুষ হত তারাও কি সেই ভাষা নিয়েই খুশি থাকত না? নিজের মাকে ভালবাসব বলে অন্যের মাকে কি ছোট করতে হবে? আরো একটা কথা বলার আছে। সুরেশচন্দ্র প্রমুখ যে বাংলাভাষার বিরোধিতা করছিলেন তাকে তাঁরা তখন নতুন দেখছেন। আমরা এত বছর ধরে সেই সাহিত্যধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যদি সেই নিয়ে সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে তর্কে নামতে যাই সেটা কি অসম প্রতিযোগিতা হয়ে পড়বে না?

সুজিতবাবু লিখেছেন জ্যোতির্ময় রবির পেছনে কালো ছায়ার মত সুরেশ-চন্দ্রের নাম চিরকাল লেগে থাকবে। আমরা সুরেশচন্দ্রের দলকে এতটা অপমান করতে রাজী নই। বাংলা ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথই করেছেন, সুরেশচন্দ্র করেননি, কিন্তু সেটা এক ধরনের historical accident। সুরেশচন্দ্র বাঙলা ভাষাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলে সে ভাষা যে আজ খুবই নিকৃষ্ট পদার্থ হয়ে দাঁড়াত এ রকম কথা আমাদের গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। বরং যে রাজা যুদ্ধে হেরে রাজ্য খুইয়েছেন তাঁর মত সুরেশচন্দ্রকেও ইতিহাসের পাতা থেকে বিদায় দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। জ্যোতির্ময় রবি একা দীপ্ত হয়ে থাক বাংলাদেশের আকাশে।

পার্থসারথি মিত্র
বোম্বাই-৫

বিশ্ববিজ্ঞান

১৬ অকটোবর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসমরজিৎ করের 'প্রাচীনতম চিংড়ি' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম। প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাতের উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি। শ্রীকর প্রাচীনতম যে চিংড়ির কথা উল্লেখ করেছেন তাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা বিবর্তন-তত্ত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ৭ কোটি বা তারও বেশী বছর অপরিবর্তিত অবস্থায় জীবনের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখে আজও বেঁচে আছে। ডারউইন ও ওয়ালেসের বিবর্তন-তত্ত্ব অনুযায়ী যাদের হয় দেহের গঠন পরিবর্তন করার কথা, অথবা আজকের দিনে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে শুধু জীবাশ্ম-রূপে আজ থেকে ৭ কোটি বছর আগের পাথরের তলায় সমাহিত হওয়ার কথা। এই নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই এবং এই প্রসঙ্গে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে যে বিষয়টি আরও আশ্চর্যের বলে ধরা পড়েছে তা হলো ১৯০৮ সনে ফিলিপিনের নিকটবর্তী সমুদ্রের যে স্থানে এদের পাওয়া গিয়েছিল অতি সম্প্রতি সেই সমুদ্রের সেই স্থানে ঠিক সেই ধরনের আরও নয়টি চিংড়িকে ধরতে পারা গেছে।

জীববিজ্ঞানের ভাষায় এই জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ 'জীবন্ত জীবাশ্ম' বা Living fossil নামে পরিচিত। এদের বৈশিষ্ট্য হলো কোটি কোটি বছর ধরে এরা অপরিবর্তিত দেহ ও দৈহিক-গঠন নিয়ে বেঁচে থাকে। বিবর্তনবাদের মূল কথা যেখানে আজকের পৃথিবীর তাবৎ জীব কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ তাদের প্রাচীনতম দেহটিকে ক্রমশ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমানরূপে প্রকাশিত হয়েছে। আর এইখানেই 'জীবন্ত জীবাশ্মে'র সঙ্গে বিবর্তনবাদের সংঘাত। এরা বিবর্তন-তত্ত্বের একটি সমস্যাস্বরূপ, যার সঠিক ব্যাখ্যা আজও জীববিজ্ঞানীরা দিয়ে উঠতে পারেন নি। বরং মনে হয়, যতই বেশী সংখ্যায় 'জীবন্ত জীবাশ্মে'র সন্ধান পাওয়া যাবে বিবর্তনবাদের ভিত্তি ততই দুর্বল হতে থাকবে।

ইতিমধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদকুলে এই জাতীয় বহু জীবন্ত জীবাশ্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গত উদ্ভিদ জগতের উল্লেখযোগ্য কতকগুলি জীবন্ত জীবাশ্মের উদাহরণ নীচে লিপিবদ্ধ করলাম। যেমন—১৯৭২ সনে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর ই গার্ডেন্ড cibotium tasmanense নামে এমন এক জীবাশ্ম-ফার্নগুঁড়ির সন্ধান পেয়েছেন যার মত ফার্ন গাছ আজ থেকে ২০ কোটি বছর আগে বেঁচে ছিল এবং এদের জীবাশ্ম tertiary যুগের পাথরে ধরা আছে। উল্লেখযোগ্য আজকের দিনের cibotium-এর সঙ্গে এই জীবাশ্ম ফার্নের আকৃতি ও প্রকৃতির কোন তফাৎ নেই। ঠিক একইভাবে, Equisetum প্রাচীন carboniferous যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃত-অপরিবর্তিত অবস্থায় বেঁচে আছে। cycad ও Ginko biloba জাতীয় উদ্ভিদেরাও জীবন্ত জীবাশ্মের দলভুক্ত।

হয়তো বা প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও অপরিবর্তনীয় ভৌগোলিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ জীবদেহের প্রকৃতিকে অপরিবর্তিত রাখতে সাহায্য করে

যা প্রকৃতপক্ষে বিবর্তনবাদের বিপক্ষে ও জীবন্ত জীবাশ্ম হওয়ার পক্ষে যুক্তির অনুকূলে। কিন্তু 'মহাদেশীয় সঞ্চরণ', 'মেরু সঞ্চরণ' ও 'প্লেট টেকটনিকস' তত্ত্বগুলি কোটি কোটি বছরের হিসাবে কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থাকে বা প্রাকৃতিক পরিবেশকে একই রকম থাকতে দিতে পারে না। ফলে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বা অন্য কোন তত্ত্ব এ পর্যন্ত কোন প্রাণী বা উদ্ভিদকে প্রাচীনতম কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তন-হীন অপরিবর্তিত থাকার পক্ষে যুক্তির সহায়ক হয়নি। জীবন্ত জীবাশ্মরা সেই কারণেই জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিবর্তন-বাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে এবং কোন দিন হয়তো নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে বিবর্তন-তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎও করতে পারে।

ডঃ অশোককুমার ভট্টাচার্য
পূর্ব পুটিয়ারী

॥ ২ ॥

'দেশ' পত্রিকার ১৬ অকটোবর সংখ্যায় বিশ্ববিজ্ঞান বিভাগে সমরজিৎ কর লিখেছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের ৮৭,৬৬০ ফুট (প্রায় ১৬·৫ মাইল) গভীর অঞ্চলে সমুদ্র-সন্ধানী জাহাজ 'গ্লোমার চ্যালেঞ্জার' অভিযান চালিয়েছিল, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম স্থান মারিয়ানা-খাতের গভীরতা ৩৫,৮০০ ফুট (প্রায় ৬·৭ মাইল)। এই প্রসঙ্গে Leonard Engel-এর 'The Sea' দ্রষ্টব্য। The Pacific contains the earth's most stupendous heights and depths, the 32,024 foot-high-peak of Hawaii [from the ocean-floor to its peak) and the 35,800 foot-deep Mariana Trench] Page 68.

প্রশান্ত মাইতি
ময়না, মেদিনীপুর

লেখকের সংযোজন: Peter Briggs রচিত 200,000,000 Years Beneath the Sea (প্রকাশক: Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York 100017) গ্রন্থের ১৫ পাতায় ১১ আগস্ট ১৯৬৮ Glomar Challenger নামক জাহাজের মহাসাগরীয় অনুসন্ধান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "One of the aims had been to find out how deep the sea rally is. One of ts soundings in the Pacific had reached a depth of 87,660 feet, the world's record at that time."

॥ ৩ ॥

১৩ই নভেম্বর, ১৯৭৬-এর দেশ পত্রিকায় 'ক্যানসার এবং ভিটামিন সি' শীর্ষক প্রবন্ধে ভিটামিন সি-র আর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকাটি এখনও অমীমাংসিত। তাই আমি কিছু মতবাদ প্রকাশ করলাম।

যদিও অকাট্য প্রমাণ এখনও নেই বললেই চলে, তবু ক্যানসার রোগে 'জিন তত্ত্বে' অনেকেই বিশ্বাসী। ভিটামিন সি-র হাইয়ালিউরোনাইডেজ (hyaluronidase) ইনহিবিটর সংশ্লেষক জিনের ইনডিউসার হিসাবে কাজ করা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়ার পক্ষেও তেমন কোন প্রমাণ নেই। এই ইনডিউসার হিসাবে ভিটামিন সি ছাড়া অন্য বস্তুও কাজ করতে পারে না তা বলা যায় না। এক্ষেত্রে অন্যান্য বস্তুর মত ভিটামিন সি-র মাত্রা নির্ধারণ একটা বড় প্রশ্ন হতে পারে। দশ গ্রাম কারো কারো ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক হলেও, অন্য কারো

পক্ষে প্রয়োজনের তুলনায় কম বা অতিরিক্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ভিটামিন-সি ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। অতিরিক্ত হলে ভিটামিন সি-র বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন-এর আলফ্রেড হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাঃ মাইকেল ক্রিস-এর মন্তব্যে অধিকমাত্রায় ভিটামিন সি-দ্বারা শরীরের পক্ষে ক্ষতির ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যানসার রোগের আপনা থেকেই উপশমের খবরও পাওয়া গেছে। তাই ভিটামিন সি যদি তেমনি কোন পদ্ধতির অনেকগুলির মধ্যে একটি পদক্ষেপের সহায়ক হয়, তবে অবাক হবার কি আছে?

ডঃ বিমল তালুকদার
কানপুর-২০৮০০৫।

রহস্যমণ্ডিত ঈস্টার দ্বীপ

পুষ্পেন্দু লাহিড়ীর 'রহস্যমণ্ডিত ঈস্টার দ্বীপ' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। পুষ্পেন্দুবাবুর লেখাতে কোন মৌলিকত্বের সন্ধান পেলাম না।

দানিকেনের সেই বিখ্যাত প্রশ্ন, কি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল মূর্তিদের? কোথায় পেল এত লোক? কোথায় পেল এত খাদ্য? কিসে করে তাদের বহন করা হয়েছিল? লেখককেও প্রভাবিত করেছে নিশ্চয়—তাই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কিন্তু অন্য গ্রহের জীবের কথা চিন্তা না করে কি এর রহস্যের সমাধান করা যায় না?

যদি বলা যায় ঈস্টার দ্বীপ, দ্বীপ নয় আসলে ওটা হচ্ছে ডুবে যাওয়া মহাদেশের জেগে থাকা একটা অংশ তবে কি সমস্ত রহস্যের সমাধান হবে না?

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ঈস্টার দ্বীপ যে ডুবে যাওয়া মহাদেশের অংশ তার প্রমাণ কোথায়। প্রমাণ আছে যেমন (১) হিমালয় সমুদ্রের তলায় ছিল। এটা যখন সত্যি তখন কিছু সমুদ্র অতীতে স্থল ছিল তাই বা হবে না কেন?

(২) বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ১২০০০ বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ এখনকার চাইতে ৬০০ ফুট নীচে ছিল।

(৩) অ্যাটলান্টিক রিজ যেটা একটা জলমগ্ন পর্বতমালা তাতে পাওয়া গেছে সুপেয় জলের ডায়াটম কঙ্কাল। এতে প্রমাণিত হয় পর্বতটি পূর্বে সমুদ্রের তলায় ছিল না।

(৪) ১৭৬৪ সালে নিউজিল্যাণ্ডের নদীতে গ্যালাক্সিয়াস নামে এক প্রকার সুপেয় জলের মাছ পাওয়া গিয়েছিল। যে মাছের প্রকৃত বসবাসস্থান দক্ষিণ গোলার্ধের দ্বীপগুলিতে। অবশ্যই তারা সমুদ্রের হাজার হাজার মাইল নোনা জল সাঁতরিয়ে নিউজিল্যাণ্ডে যায়নি; কারণ নোনা জল তাদের কাছে বিষতুল্য। এতে এটাই প্রমাণিত হয়, ইউরোপ এবং নিউজিল্যাণ্ডের ভিতরে যোগাযোগ ছিল স্থলপথে।

(৫) ড্রমণ্ড আর মেরেনহুটের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় মহাদেশের সভ্যতা ও অধিবাসীদের অবশিষ্ট অংশ এই ঈস্টার দ্বীপ। যে কারণেই হোক সেখানে প্রলয় হয়েছিল, ডুবে গিয়েছিল সভ্যতা, কেবল স্মৃতিচিহ্ন হয়ে বেঁচে আছে

দ্বীপের দ্বীপ, তাই তো ঐ দ্বীপের অনেক শানবাঁধানো রাস্তা সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে থেমে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ রায়

আসানসোল

গুমানী দেওয়ান

৩০ অক্টোবর দেশ পত্রিকায় 'চারণসম্রাট গুমানী দেওয়ান' ক্ষুদ্র স্মৃতিচারণটি পড়লাম। স্মৃতিচারণটি সুন্দর এবং ক্ষুদ্র হলেও পূর্ণ। ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যেও লেখক লোককবির জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি পর্যায়কে নিখুঁত শিল্পীর মত কলমের দু-একটি আঁচড় ফুটিয়ে তুলেছেন।

লম্বোদর গুমানীর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। লেখকের এমত সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য। একবার আমাদের গ্রামের মেলায় এই দুই ধুরন্ধর লোককবির গান শোনার সুযোগ আমার হয়েছিল। পালা ছিল মুসলমান ধর্ম-সাধনের দুই বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ সরিয়ত ও মারফৎ। গুমানী দেওয়ান লড়েছিলেন সরিয়ত পক্ষ নিয়ে, আর লম্বোদর মারফৎ পক্ষ নিয়ে। এই মারফৎ তত্ত্ব বা বিদ্যা নিতান্ত গোপন ও একান্ত-ভাবে গুরুমুখী। অর্থাৎ গুরু না ধরলে এই মারফৎ বিদ্যা সম্বন্ধে কিছুই জানার উপায় নেই। কিন্তু লম্বোদর হিন্দু হয়েও আশ্চর্য সুন্দরভাবে মারফৎ বিদ্যা সম্বন্ধে বলেছিলেন। নৈষ্ঠিক কোনো

মুসলমানও এত জানেন কিনা সন্দেহ। এর থেকে কি এ-কথাই প্রমাণিত হয় না কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এ'দের কোনো জাত নেই। জাত ধর্মের ক্ষুদ্র সীমার অনেক উপরে এ'দের পদচারণ।

আবদুল কাদের
বর্ধমান

মহিলা সাহিত্যিক

সাহিত্য বা সাহিত্যিকের মূল্যায়ণে পুরুষ ও মহিলার শ্রেণীভেদ অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক। নারীর লেখনীতে নারীর জগৎ একটি নিবিড়তর অন্তরঙ্গতায় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হবে শ্রীযুক্ত অভিনন্দের এই আশা (৩০ অকটোবর, দেশ) ও এই আশার ভিত্তিতে সাহিত্যিককে মহিলা ও পুরুষে চিহ্নিতকরণ, এও খুব যুক্তিসহ মনে হয় না। বিষয়ের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যা অব্যবহিত সংযোগ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে। সৃষ্টির জন্য বিষয়ের সঙ্গে স্রষ্টার একটু ব্যবধান আবশ্যক। এই দূরত্ব দর্শনকে স্বচ্ছতা ও গভীরতা দান করে। নারীর জগতের ভোক্তা নারী, কিন্তু তার অন্যতম শরিক পুরুষ। নারীর জগৎ সম্বন্ধে স্রষ্টা-সুলভ কিছুটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। অন্তত নারীর তুলনায় সহজতর। এই দৃষ্টি নারীর একান্ত নিজস্ব মাতৃত্বের বেদনা ও মহিমাতেও অবগাহন করতে পারে। তাই শ্রীযুক্ত অভিনন্দের মন্তব্যটিতে মহিলা লেখিকাদের প্রতি অসম্মান না থাকলেও সাহিত্যরসপিপাসু একটি মনের কোন বিশেষ আশার ভিত্তিতে এই রকম শ্রেণী বিভাগের যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়।

অনুরাধা মাইতি
কলিকাতা-৬

শরৎচন্দ্র কি ছিলেন

দেশ 'শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী' সংখ্যায় অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন। অনেকের মত আমিও ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রের বিষয়ে কিছু জানি। সেই কথাগুলো লিখছি যাতে তিনি কিরকম ছিলেন তার আরও কিছুটা 'দেশ'-এর পাঠকরা পায়।

(১) আমার পৈতৃক বাড়ি ৬০ মহানির্বাণ রোড। শরৎচন্দ্রের বাড়ি ও আমাদের বাড়ির মাঝখানে ১৯৩৩-৩৪ সালে একটা মাঠ ছিল। আমরা পূর্বে হাওড়ায় থাকতাম। আমার দাদা শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন ছিলেন। সেই কারণেই যখনই শরৎচন্দ্র বাড়ি তৈয়ারির সময় অশ্বিনী দত্ত রোডে আসতেন তখন প্রায়ই মাঠ পেরিয়ে আমাদের বাড়ি এসে সদর ঘরের বিরাট তক্তাপোশে বসে বাবার গড়গড়ায় তামাক খেতেন ও গল্প করতেন। একদিন দাদাকে গল্পচ্ছলে বললেন, 'শম্ভু, তোমার বাবা খুবই রসিক লোক মনে হয়।' দাদা বললেন, 'না তো, উনি খুবই গম্ভীর প্রকৃতির। আপনি কি করে জানলেন উনি রসিক?' শরৎচন্দ্র বললেন, 'এই তামাক থেকে—উনি যে বালাখানা তামাক খান।' দাদা বললেন, 'বালাখানা তামাক খেলেই রসিক হতে হবে?' শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই, আমিও যে ঐ তামাকই খাই।'

(২) শরৎচন্দ্র মুখে চুরুট দিয়ে প্রায়ই রাস্তা দিয়ে বেড়াতেন। মহানির্বাণ রোড, অশ্বিনী দত্ত রোড ও মনোহরপুকুর রোড যেখানে একসাথে মিলেছে, সেইখানে বহু দিনের পুরানো একটা হলদে রঙের বাড়ি ছিল (বোধ হয় এখনও আছে)। ঐ রাস্তাতে তখন গ্যাসের আলো—পরিবেশটা সেকেলে

অর্থাৎ আদি বাসিন্দারা পুরনো দিনের মত রাস্তার ফুটপাথে মাদুর শতরঞ্চি বিছিয়ে গ্যাসের আলোতে দাবা বা তাস খেলতেন বিনা দ্বিধায়। একদিন সেইরকম খেলা চলেছে ঐ হলুদ বাড়ির সামনের ফুটপাথে। সামনে আমি দাঁড়িয়ে দেখছি—এমনি সময়ে শরৎচন্দ্র মুখে চুরুট দিয়ে অশ্বিনী দত্ত রোড দিয়ে আসতে আসতে খেলা দেখে আমার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওখানের সকলেই হইহই করে উঠলো চেয়ার আনার জন্য। তিনি বললেন, 'থাক থাক—আমি বেশ আছি—এখনই চলে যাবো।' খেলা চলতে লাগলো—তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ কালীবাবু একটা চাল কিছু ভুল দিতেই, শরৎচন্দ্র 'কালী, ও কি করছ—ও কি করছ' বলতে বলতে সেই ফুটপাথে মাদুরের ওপরেই বসে পড়লেন কালীবাবুকে সরিয়ে দিয়ে এবং খেলতে লেগে গেলেন। ব্যাপারটা আমার নিজের চোখেই দেখা।

(৩) মহানির্বাণ রোড আর পন্ডিতিয়া রোডের মোড়ে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের বাড়িতে সরস্বতী বলে একটি মেয়ে থাকত। সে খুব সুন্দর গান করত। একদিন সে ভোরে গান করছে, শরৎচন্দ্র বেড়িয়ে ফেরার সময় তার গান শুনে রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিচের ঘরের কে যেন

তাঁকে ঐভাবে দেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ওপরে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বললেন, 'এই তো বেশ গান শুনছি—ও এখন প্রাণ খুলে গাইছে। আমাকে দেখলে ঘাবড়ে যেতে পারে—আমি যে বিখ্যাত লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।' ঐ ঘটনা আমার ঐ বাড়ির লোকের মুখেই শোনা।

এখন বুঝুন, শরৎচন্দ্র কি ছিলেন আর কি ছিলেন না।

শীতল মুখার্জী
পুনা-৭

মহালয়া

শ্রীযুক্ত রবি দত্ত (দেশ—১৩ নভেম্বর) শার্ঙ্গদেবের মহালয়ার আলোচনা সম্পর্কে কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আমারও কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমত লেখক বলেছেন, "নানা জায়গায় তাঁদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতাও শোনা গেছে, বিশেষ খারাপ লাগে নি।" এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য, বক্তৃতার বিশেষণই যেখানে 'জ্ঞানগর্ভ' তাঁরই মতে, সে ক্ষেত্রে তাঁর "বিশেষ খারাপ না লাগায়" কিছু যায় আসে না; বরং বলা যায়, তিনি হয়তো সেই বক্তৃতা শোনবার পুরোপুরি যোগ্য ছিলেন না।

তিনি বলেছেন, "হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরিণত ও অভিজ্ঞ সুরকার, এ অনুষ্ঠানে অন্য কোনও সুরকারের নাম পছন্দ হয় না।" এ কথা কেন? হেমন্তবাবু 'বাঘিনী', 'মণিহার', বিশ সাল বাদ ইত্যাদিতে অপরূপ সুর দিয়েছেন বলেই মহালয়ার সংস্কৃত স্তোত্রেও সুর দিয়ে জনসাধারণকে তৃপ্ত করতে পারবেন, আর অন্য কোনও নবীন অথবা অভিজ্ঞ সুরকার তা পারবেন না—এ কি কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে? তিনি শার্ঙ্গদেবের আলোচনা "একটু একপেশে" বলেছেন কিন্তু লেখকের নিজেরও তো এ বিষয়ে আর একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল। রবিবাবু শার্ঙ্গদেবকে জিজ্ঞাসা করেছেন "এবারের গানে কত লিরিক পেয়েছেন?" তিনি ভুল করেছেন; শার্ঙ্গদেব একবারও বলেননি, তিনি এবারের গানে মুগ্ধ হয়েছেন; বরং তিনি গানের উপর কোনও গুরুত্বই দেননি, আলোচনাটি আরেকবার পড়লেই লেখক বক্তব্য বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন। সর্বশেষে বলি, "জনপ্রিয়তার লেভেলে নেমে আসা" কথাটি লিখে শার্ঙ্গদেব কখনোই জনসাধারণকে হেয় করতে চাননি। "সিনেমায় নামা" কথাটি যেমন অতি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তা ছাড়া, জনপ্রিয় কথাটির কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। আশা ভোঁসলের পপ্‌ সংগীত জনপ্রিয় এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহালয়ার অনুষ্ঠানও জনপ্রিয়, কিন্তু দুটি এক নয়। দ্বিতীয়টির

ভাল লাগার সঙ্গে মিশে গেছে শ্রদ্ধা। আমি অনেককে বলতে শুনেছি "মহালয়ার অনুষ্ঠান (পূর্ববর্তী) না শুনলে মনে হয় পাপ হল, দুর্গাপূজোর অঙ্গহানি হল।" এই পাপবোধের উৎস কিন্তু শ্রদ্ধা থেকে, শ্রদ্ধার উৎস ভাল লাগা থেকে। বর্তমান অনুষ্ঠানে সেই শ্রদ্ধারই অভাব থেকে গেছে, ফলত ভাল লাগার পর্যায়ে আর অনুষ্ঠানটি পৌঁছাতেই পারল না—এ আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য।

সুচেতা মিত্র
শ্রীরামপুর

কবিতার জন্ম

বাল্মীকিই মনুষ্য সমাজের আদি কবি এবং 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং...কামমোহিতম্' পৃথিবীর প্রথম কবিতা—এই দুটো প্রচলিত কথার অর্থ আগেও বুঝিনি, এখনও না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কবিতার জন্ম' (দেশ ২০ নভেম্বর, ১৯৭৬) পড়বার পর মনে হচ্ছে ঐ 'ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক আলোচনায়' গবেষকরা মেতে থাকুন, আমার কোনও লাভ নেই। সুনীলবাবুর লেখাটিতে আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি, 'সমস্ত কবিতা রচনার ইতিহাস' এত গভীরভাবে এর আগে উপলব্ধি করতে পারিনি। এই উপলব্ধির স্বাদ, রোমাঞ্চ কেমন যেন ভিন্ন—বর্ণনা করার কলম আমার নেই। বনে রাম-সীতার সুখের জীবনের সঙ্গে ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর মিলনক্ষণ, নিষাদের সঙ্গে রাবণকে তুলনা করে বাল্মীকির যে মানসিক প্রতিচ্ছবি তিনি তুলে ধরেছেন তা অপূর্ব। সত্যিই তিনি বহু কথিত কবি-কাহিনীর 'প্রতিটি শব্দের ভিতরের অর্থে' আমাদের প্রবেশ করিয়েছেন।

যুগলকান্তি রায়
কলকাতা-৩৭

সাহিত্য প্রসঙ্গ

২০শে নভেম্বর ১৯৭৬-এর 'দেশ' পত্রিকায় সাহিত্য প্রসঙ্গ লিখবার জন্য অভিনন্দ মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা যারা 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী' এবং পরবর্তীকালের 'কল্লোল' এবং 'পরিচয়ে'র যুগের লোক, তাঁরা বহু-কাল ভাল উপন্যাসের জন্য বুভুক্ষা নিয়ে কাল কাটাচ্ছেন।

'অভিনন্দ'-র মতে প্রতি বছরই প্রায় সত্তর আশীটি পূজা সংখ্যায় উপন্যাস বেরোয়। এ ছাড়াও নিয়মিত মাসিক, সাপ্তাহিকেও নিয়মিত উপন্যাস বেরিয়ে থাকে। পরে সেইগুলিই সামান্য পরিবর্তন করে অথবা না করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। আমার মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে

বোধহয় খুব কম লোকই এই সব উপন্যাস টাকা খরচ করে কেনেন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। দেশে এখন অজস্র লাইব্রেরী হয়েছে। তাদের সৌজন্যেই এই সব বইয়ের বেশ ভালই কাটতি হয়। রবীন্দ্রনাথের বই চার আনা থেকে দু' চার টাকা দাম ছিল, তাই বিক্রী হত না। অথচ এই সব 'প্রগলভ অশ্বীবাহন'গুলি বিশ, তিরিশ, চল্লিশ টাকাতেও বেশ বিক্রী করা যায়!

প্রতি বছর সাহিত্য সংখ্যা 'দেশ'-এ বছরের শ্রেষ্ঠ বইগুলির একটি তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। 'দেশ'-এর পাঠক পাঠিকাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তাঁরা গত বিশ বছরে প্রকাশিত বিশখানি উপন্যাসের নাম করুন যা কালের খেয়ায় পাড়ি দেওয়ার যোগ্য। কারুর নাম করতে চাই না, কিন্তু এ কথা মানতেই হবে যে অন্তত 'উপন্যাসের' ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য আজ দেউলে। এখনও মাঝে মাঝে অসাধারণ এবং আশ্চর্য সুন্দর ছোট গল্প বা কবিতার সাক্ষাৎ মেলে। এ-কথাও মানতে হবে যে সাম্প্রতিক যুগে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ ইতিহাস, সাহিত্য আলোচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক ভাল বাংলা বই প্রকাশ হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রায় লেখকই নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন নন। কখন থামতে হয় তা না জানার জন্যেই এই বিপদ।

সুশান্ত হালদার
নয়া দিল্লী-১৯

চলচ্চিত্র ঃ ছোট ছবি

গত কয়েকটি সংখ্যায় দেশ পত্রিকায় রঙ্গজগৎ বিভাগে প্রকাশিত চলচ্চিত্র সম্পর্কে আলোচনা পড়লে বোঝা যায় কয়েকজন চলচ্চিত্র দরদী দর্শকদের রুচি বদলাবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। চেষ্টাটা অত্যন্ত শুভ সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় ছোট ছবির আন্দোলন যদি বাংলা ছবিতে গড়ে তোলা না যায় তাহলে দর্শকদের রুচি বদলানো কোনোমতেই সম্ভব হবে না।

আমার এক বন্ধু আমায় একবার প্রশ্ন করেছিলেন যে সাহিত্যে যেমন প্রবন্ধ আছে, উপন্যাস আছে, আবার ছোট গল্পও আছে, রচনা শৈলীর গুণে তা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের, শিল্পে তেমনটা হয় না কেন? কথাটা সত্যিই ভেবে দেখবার মত।

ছোট ছবি অর্থে কিন্তু এখানে সরকারী তথ্যচিত্রের কথা বলা হচ্ছে না। শিল্পের ন্যূনতম শর্ত মেনে দু হাজার বা তিন হাজার ফুট দৈর্ঘ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ যে ছবি সেই ছবির কথাই বলা হচ্ছে।

কাহিনী আঙ্গিক আলো বা শিল্প নির্দেশনা সম্পাদনা অথবা প্রয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে যেখানে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষা বিনা আয়াসেই করা যেতে পারবে এবং সেটাই হবে প্রকৃত ছোট ছবির ক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে পরিচালক থেকে আরম্ভ করে আর সবাই যার যার বিভাগীয় বিষয়ে কাজ করে যেতে প্রভূত স্বাতন্ত্র্যবোধ করবেন। এই ছোট ছবি হবে একান্তই শিল্পনির্ভর। এই ছোট ছবি হবে সেই ছবি যা পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের ছবির সঙ্গে দেখানো চলবে অনায়াসে এবং এর পরিবেশনা ব্যবস্থা প্রাথমিক অবস্থায় পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির পরিবেশক এবং প্রদর্শকদের মাধ্যমেই করতে

হবে। সেনসরের ছাড়পত্রের তারিখ অনুযায়ী এই সব ছবি প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের সুযোগ থাকবে অবারিত। পরিবেশক এবং প্রদর্শকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে সুস্থ আলোচনার মাধ্যমে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এবং এইভাবেই ভাল বাংলা ছবির দর্শক তৈরী করা যেতে পারবে। অবশ্য এ জন্য চাই বেসরকারী মহলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা এবং উদ্দীপনা।

অমিতাভ দাশগুপ্ত
কলকাতা-২৫

লাল হলুদ সবুজ আলো নেই

এবারের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় দীপালি দত্তরায়ের 'লাল হলুদ সবুজ আলো নেই' শীর্ষক উপন্যাসটি পড়ে চমৎকৃত হলাম। সাপ্তাহিক 'দেশে'র পাতায় তাঁর লেখা দুটি ছোট গল্পও ইতিপূর্বে পড়েছি। তখনই তাঁর সম্ভাবনা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। সম্পাদক মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি একজন নবীন গল্প লেখককে দক্ষ ঔপন্যাসিকরূপে বাংলা সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করে দিলেন। সুনীলও একদিন এইভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছিলেন। নবীনা দীপালিকে পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাই।

অতি আধুনিক সমাজের পটভূমিকায় লেখা এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ নতুন এক স্বাদ পাঠক-চিত্তে এনে দিতে সমর্থ হয়েছে। বর্তমান উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের পিতা মাতা এবং সন্তানদের চরিত্রগুলি তিনি যে রকম স্পষ্ট করে এবং সহজে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বাইরে সামাজিক বিবর্তনে মেয়েরা নিজেদের যতই অগ্রসর করে নিয়ে চলুক না কেন, সন্তানের দাবীর কাছে তার সমস্ত অধিকারের দাবী অনায়াসেই তুচ্ছ হয়ে যায়। এবং উপন্যাসের পরিণতিটি ঔপন্যাসিক শান্ত মাতৃমূর্তিতে নায়িকার অন্তর সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে একটি সুস্থ সুন্দর চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

এই উপন্যাসটি পড়ে সবচেয়ে বড় কথা যেটি বলতে ইচ্ছে করছে, তা হল—এটি কোন মহিলা লেখিকার লেখা উপন্যাস বলে মনে হয়নি একবারও। প্রথম উপন্যাসেই লেখিকা নিজেকে লেখক বলে দাবী করার

শক্তি অর্জন করেছেন। মেয়েদের হাতে লেডিজ স্পেশাল রচনার দিন আশা করি শেষ হলো।

অপর্ণা ভট্টাচার্য
শান্তিনিকেতন

জ্যোতির্ময় রবি...

'দেশ'-এ 'জ্যোতির্ময় রবি এবং কালো মেঘের দল' নিবন্ধটিতে সুজিতকুমার সেনগুপ্ত একটি অজানা জগতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। রবির ভাস্বরতার আড়ালে মেঘদলের গোপন কারসাজির এই মনোজ্ঞ এবং অন্তরস্পর্শী বিবরণ আমাদের নতুন করে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভাবতে শেখায়। আজকের দিনেও কোনো কোনো বিদগ্ধজন যখন রবীন্দ্রসমসাময়িক সমালোচকদের মতো একদেশদর্শী মতামত ব্যক্ত করেন তখন মনে হয় এঁরা বুঝি সেই মেঘদলেরই উত্তরসূরী যাদের অবলুপ্তি পরবর্তী যুগেও ঘটবে না। সহস্র তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের উপরে পা রেখেও কি অভাবনীয় রকমের সুরুচি, সহনশীলতা এবং মানসিক স্থৈর্যের প্রমাণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তা ভাবলে দু চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, এবং গৌরব ও যশঃ-মহিমার ঊর্ধ্বলোকে বিচরণেচ্ছু ব্যক্তির পথ যে কোনো কালেই সাবলীল নয়—এ কথা আর একবার মনে পড়ে যায়। ভাবতে অবাক লাগে, এই সমস্ত বিরুদ্ধ সমালোচনার পূতিগন্ধময় পরিবেশের মধ্যে থেকেও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসৃষ্টিতে কি পরিমাণ অবিচল এবং স্থিতধী থাকতে পেরেছিলেন। অতি সংবেদনশীল কবিমনও সহনশক্তিতে যে কত দূর ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে তার উজ্জ্বল প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ।

অজিত মিশ্র
কাঁথি, মেদিনীপুর

ডাকঘরের রচনা...

'ডাকঘরের রচনাকাল : রবীন্দ্রপত্রের আলোকে' প্রবন্ধটির প্রসঙ্গে ৪৪ বর্ষ ২য় সংখ্যার দেশ-এ প্রবীরকুমার দেবনাথের চিঠিখানি পড়লাম এবং জেনে আনন্দিত হলাম যে, শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আমার সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত হয়েছেন এবং তাঁর রবীন্দ্র-জীবনী, ২য় খণ্ডের আসন্ন তৃতীয় সংস্করণে এই তথ্য ব্যবহারও করেছেন।

প্রবীরবাবু আমার প্রবন্ধের যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন এবং বক্তব্য বিষয়ে একমত হন নি বলে লিখেছেন তা বস্তুত আমার 'বক্তব্য' নয়। প্রবন্ধের ওই অংশে আমি বলেছি ডাকঘর নাটকটির রচনাকাল সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় জীবনীকার রবীন্দ্র-জীবনীর ২য় খণ্ডে যে সব আনুমানিক তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন তাতে এই কথাই মনে হয় যে, ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণের গোড়ায় ['অগ্রহায়ণের গোড়ায়'—কথাটি রবীন্দ্র-জীবনী থেকেই উদ্ধৃত] অর্থাৎ নবেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে ডাকঘর রচিত হয়েছিল—যা কিনা আমাদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে যথার্থ নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে। আর সেই কথা বলতেই তো আমাদের প্রবন্ধের অবতারণা।

গৌরচন্দ্র সাহা
শান্তিনিকেতন

সাহিত্য প্রসঙ্গ

প্রকাশক ও সম্পাদক

বাংলা কাগজে অনেকরকম বিজ্ঞাপন বেরোয়। বইয়ের বিজ্ঞাপনও। এরকম বইয়ের বিজ্ঞাপনও আমার চোখে পড়েছে যাতে নতুন, অজ্ঞাত, প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন লেখকদের বই ছাপার ব্যাপারে দু-একজন প্রকাশক উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। কলকাতার পেশাদারী প্রকাশক অবশ্যই এঁরা নন। অনেক সময় দেখেছি বই ছাপার আগ্রহে অজ্ঞাত লেখকরা যথাস্থানে পাণ্ডুলিপি এবং ছাপা খরচ বাবদ টাকাপত্র পাঠিয়ে শেষ পর্যন্ত হাহুতাশ করছেন। বোধ হয় সব ব্যবসাতেই কিছু ভেজাল কারবারী থাকে, বাংলা বইয়ের ব্যবসায় দু-একজন না থাকবে কেন? এরকম প্রকাশকের কথা বাদ দিচ্ছি। এমন কোনো বিজ্ঞাপন কেন বাংলা কাগজে বেরোয় না যেখানে পেশাদারী প্রকাশকরা তাঁদের প্রকাশনার জন্যে অভিজ্ঞ সম্পাদক চান না? কিংবা এমন কোনো বিজ্ঞাপন কেন আমাদের চোখে পড়ে না যেখানে কোনো পেশাদারী লেখক বই সম্পাদনার কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন?

আমরা এই উভয় ব্যাপারেই অনভ্যস্ত। অর্থাৎ কোনো পক্ষই মনে করি না, এ ধরনের কাজের প্রয়োজন আছে, বা এর কোনো যুক্তি আছে। প্রকাশকরা মনে করেন, কিছু অর্থ ব্যয় করা ছাড়া কিই বা লাভ হবে এতে। আর পেশাদারী লেখকরা তো রীতিমত লজ্জাই বোধ করবেন যদি তাঁদের এমন কাজ করতে বলাও হয়।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে। বেশ কয়েক বছর আগে এক আমেরিকান কবি ও প্রবন্ধ-লেখক কলকাতায় এসেছিলেন বেড়াতে। ঘটনাচক্রে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আমি তাঁকে টমাস উলফ-এর কথা জিজ্ঞেস করি। টমাস উলফ আমাদের এখানে অতি পরিচিত লেখক নন; এবং নিতান্ত আচমকাই সে সময় টমাস উলফ-এর একটি উপন্যাস আমার হাতে এসেছিল। কৌতূহলবশেই জিজ্ঞেস করেছিলাম টমাস উলফ-এর কথা। কেননা, টমাস উলফ আমেরিকান লেখক; খ্যাতি অর্জন করলেও তেমন জনপ্রিয় নন। আমার মনে হল, যাঁকে আমি প্রশ্নটা করেছি—তিনি নিজেই টমাস উলফ্ সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু একটা কথা তিনি আমায় বললেন। বললেন, উলফ্ উপন্যাস লিখতে বসে অকারণে এবং অপ্রয়োজনে রাশি রাশি লিখতেন, তাঁর মতন ক্ষমতাশালী লেখকের পাণ্ডুলিপিও যদি সম্পাদকরা আগাগোড়া পরিমার্জন, বর্জন ও সংশোধন না করতেন—তবে সেসব বই পড়া দুঃসাধ্য ছিল।

কথাটা শুনে একটু দুঃখই হয়েছিল তখন। লেখকের লেখা—তাও আবার অত নাম-করা একজন লেখকের লেখার ওপর সম্পাদকরা কাঁচি ও কলম চালালেন। পরে শুনেছি, বিদেশে এ ধরনের ব্যবস্থা আছে। পাণ্ডুলিপি সংশোধন করার জন্যে সম্পাদক থাকেন। সেখানে প্রকাশক ও লেখকদের মধ্যে রয়েছেন আরও দুই কর্মকর্তা—সম্পাদক ও এজেণ্ট। সম্পাদকরা অবশ্য শুধুই প্রকাশকের প্রয়োজনীয় কাজটুকু করে দেন। এজেণ্টরা এক দিকে যেমন লেখকদের স্বার্থ দেখেন, অন্য দিকে প্রকাশকদেরও কাজে আসেন। বিশেষ করে নতুন লেখকদের সঙ্গে প্রকাশকদের যোগাযোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এজেণ্ট মারফতই ঘটে থাকে।

এই একই নিয়ম সর্বত্র সমানভাবে চালু আছে কিনা, কিংবা সব লেখকই সম্পাদকের অধিকার মেনে নেন কিনা তা আমি জানি না। ধরে নিতে পারি, নিয়মের ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে। তবে এই নিয়মটির কিছু সুফল আছে।

আমরা যদি কোনো বাংলা গল্প-উপন্যাস খুঁটিয়ে নজর করি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ ভুল-ত্রুটি চোখে পড়বে। বানান ভুলের কথা বলছি না, অন্যরকম ভুল, যা লেখার সময় লেখকের নজরে পড়েনি, বা যা তাঁর খেয়ালে আসে নি। বাংলা উপন্যাসে হরদম নামের ভুল চোখে পড়ে, নায়ক-নায়িকার নামও অদলবদল হয়ে যায়, ছোটখাট চরিত্রদের বেলায় তো কথাই নেই, নরেন হয়ে যায় বরেন, নিমাই হয়ে যায় নিতাই। গলির নাম, বয়েস, গায়ের রঙ, মাথার চুল—এ তো যখন তখন বদলে যায়। মামা হয়ে যায় মেসোমশাই। একজন হয়তো প্রথমে লিখলেন যে, তাঁর নায়ক বরাবর ডায়রী লিখতেন, মাঝখানে লিখলেন নায়ক কোনোদিনই ডায়েরী লিখতেন না। এই ধরনের ভুল—যা লেখকের অনবধান-হেতু ঘটে যায়, অজস্র চোখে পড়ে। তা ছাড়া অন্যরকম ভুল আছে—যাকে এক কথায় অসঙ্গত বলা যায়,

তেমনি ভুলের মধ্যে। লিখতে বসে কিছু অসাবধানে ভুলও ঘটে যায়। আবার এও দেখা যায়, লেখক যে কোনো কারণেই হোক কখনও কখনও অপ্রয়োজনে অনেকটা লিখে ফেলেছেন ঝোঁকের মাথায়। হয়তো পরে তিনি নিজেই সেটা কেটে দিতেন।

এই সব ত্রুটি, অসঙ্গতি, ভুল একজন ভাল সম্পাদক সংশোধন করতে পারেন। তিনি যদি আরও যোগ্য হন, পাণ্ডুলিপির—এমন কি কাহিনী অথবা চরিত্রের কোনো কোনো দুর্বল অংশ সম্পর্কে লেখককে সচেতন করতে পারেন। তাঁর পরামর্শ লেখককে সাহায্যও করতে পারে। বিশেষ করে নতুন লেখকদের বেলায় সম্পাদকের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

বাংলা বইয়ের বাজারের যা অবস্থা তাতে কোনো প্রকাশককে সম্পাদক রাখার কথা বললেই তিনি ব্যতীত খরচের কথা তুলবেন। আমাদের লেখকদেরও অসম্মানে লাগবে। কাজেই ওই প্রস্তাবটি করতে ভরসা পাই না। যদি কোনো প্রকাশক এরকম চেষ্টা করেন—অবস্থা কেমন দাঁড়ায় দেখার অবশ্য ইচ্ছা আছে।

শ্রীঅমনন্দ

॥ ২৬ ॥

ডরোথি মুখ গম্ভীর করে বললেন, "স্ট্রেঞ্জ। ছেলেটির শেষ প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পারলাম না। ছোকরা জিজ্ঞেস করলো, যিনি লেস্‌ন দেবেন তিনি কোথায়?"

"কোথায় আবার তিনি? তোমার সামনেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।"

"কী যে হলো জানি না। আমার কথা শুনেই ছোকরা অ্যাবাউট টার্ন করে ফিরে গেল। যাবার সময় সামান্য ধন্যবাদের সৌজন্যও দেখালো না।"

ব্যাপারটা আমার কাছেও খারাপ লাগলো। বৃদ্ধার বিজ্ঞাপনে সাড়া দিয়ে এতখানি এসে সকালবেলায় তাঁর মনে এই-ভাবে আঘাত দিয়ে চলে যাবার কোনো মানে হয় না।

ডরোথি ওয়াটের ইংরিজী উচ্চারণও সুন্দর। টিপিক্যাল টোটি লেন উচ্চারণ বলতে যে-ইংরিজী কানে বাজতে থাকে তার সঙ্গে ডরোথি ওয়াটের বাচনভঙ্গীর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ডরোথির মুখেই শুনেছি, তাঁর বাবা যথাসম্ভব ভাল ইস্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেই ইস্কুলে কয়েকজন বিদুষী বিদেশিনী ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষিকা ছিলেন।

এগারো নম্বর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মুখেই মদনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মদনাকে মনে আছে তো? আমাদের সাইপারের ছেলে। থ্যাকারে মানসনেই জন্ম এবং এখানেই বড় হয়ে উঠেছে। পুরোপুরি থ্যাকারে প্রোডাক্ট বলতে মদনাকেই বোঝায়। হিন্দিতে মদনার দখল কতখানি জানি না; কিন্তু বাংলাটা সে চমৎকার আয়ত্ত করেছে। কোনো প্রকার টুইশন না-পেয়েও স্পোকন ইংলিশটাও যে অনায়াসে আয়ত্ত করতে পেরেছে তার মগজ যে বেশ সরেস সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মদনার অন্যান্য গুণাবলির পরিচয় যথাসময়ে পেশ করা যাবে। প্রথম দিকে সেসব আমার জানা হয় নি। তবে মদনা নিজের জামাকাপড় সম্বন্ধে সব সময় ওয়াকিবহাল—সব সময় ফিটফাট থাকতে সে ভালবাসে। মদনার মাথায় এক ঝাঁক কোঁকড়া চুল—অবাধ্য চুলকে সামলে রাখবার জন্যে সে বোধ হয় বিশেষ কোনো ক্রিম ব্যবহার করে। কারণ ওর চুলের জেল্লাই অন্যরকম। যে-যুগের কথা বলছি, তখন চামড়ার কটিবন্ধনের বড় দুর্দিন। সুবিশাল ভুঁড়ির মালিক এবং ট্রাফিক কনস্টেবল ছাড়া অন্য কেউ তখন কটিদেশে বন্ধনী ব্যবহার করতেন না। (ফ্যাশনের প্রবক্তারা কোমরবন্ধনী নিয়ে পর্যায়ক্রমে এমন গ্রহণ ও ত্যাগের লীলা-খেলায় মত্ত হন কেন জানি না!) আগামী ফ্যাশনের গোপন হাওয়া বোধ হয় মদনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তার সুশাসিত কোমরে একটি সুশোভন চামড়ার বেল্ট শোভিত থাকতো, দূর থেকে যা দেখলে মনে হতো একটি কালো সাপ। মদনা নিজেই বলেছিল, "একেবারে ফোরেন জিনিস, স্যার!" ফ্রি স্কুল স্ট্রীট উইলিয়াম মের্কাপস থ্যাকারের পবিত্র জন্মস্থানের সামনে এক মুক্তিবাজ মার্কিন যুবক মদনার দালালি সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে এই বেল্টটি নিজের কোমর থেকে খুলে তাকে উপহার দিয়েছিল।

মদনা আমাকে দেখেই সসম্ভ্রমে নমস্কার জানালো। মদনা ছেলেটি সম্বন্ধে যতই বদনাম শুনি না কেন, আমার সঙ্গে সে সব সময় বিনীত ব্যবহার করে।

মদনার সামনে এই মুহূর্তে আর একটি ঝকমকে বুশ শার্ট পরিহিত যুবক। এই ছোকারার হাতেও আজকের সকালের ইংরিজী কাগজ এবং মদনা তাকেও ১১ নম্বরে ডরোথি ওয়াটের ফ্ল্যাটের নির্দেশ দিয়ে দিল।

একটু আগেই যে-যুবকটি অজ্ঞাত কারণে কোনো প্রকার উৎসাহ না দেখিয়ে ফিরে গিয়েছে, মদনা তাকেও লক্ষ্য করেছে।

মদনার হাতে এখন কোনো কাজ আছে কিনা জেনে নিলাম। তারপর অনুরোধ করলাম, এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে। মনে হচ্ছে ডরোথি ওয়াটের বিজ্ঞাপন দেখে কিছু ইংরিজী শিক্ষার্থী পর পর হাজির হবেন।

মদনা এক কথায় রাজী হয়ে গেল। তার সহানুভূতি উদ্রেকের জন্যে বললাম,

[illegible] বাড়িওলার [illegible] প্রসঙ্গ মন্তব্য

মদনা [illegible] তখন [illegible] তবে [illegible] শব্দে [illegible] খোঁজ করে [illegible] পড়বে।"

মদনার কথা আমার ভাল লাগছে না। কলকাতা শহরে কত লোকই তো স্পোকেন ইংলিশ শেখবার জন্যে উৎসাহী। জাপানে তো শুনেছি, মিলিয়নেয়ার হবার সহজ উপায় হলো হাউ টু স্পিক ইংলিশ নামে বই লেখা। আমাদের দেশের অবস্থাও ক্রমশ তাই হয়ে উঠছে। ইংরিজীতে যারা দু'কথা গুছিয়ে বলতে পারে না চাকরিবাকরি, ব্যবসা বাণিজ্যে তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। এমন কি ইংলিশ স্পিকিং আয়া এবং গৃহ-ভৃত্যও নির্ধারিত বাজার দরের ডবল রোজগার করে।

কিন্তু মদনার নৈরাশ্য কমবার লক্ষণ নেই। আর একজন মধ্যবয়সীকে সে ইতি-মধ্যেই ১১ নম্বর ফ্ল্যাটের পথ নির্দেশ করলো। তারপরেই বললো "দেখুন স্যার। ইনিও যদি এখনই ফিরে না আসেন তা হলে ওই নেড়ি কুত্তাটাকে মদনা বলে ডাকবেন।"

আমার কৌতূহল বেড়ে উঠেছিল। ভবিষ্যদ্বাণী পরীক্ষার জন্যে মদনার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম। পাঁচ মিনিটও সময় লাগলো না, মুখ বেজার করে প্রৌঢ় ভদ্রলোক নেমে গেলেন।

মদনার মুখ চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। এবং বলে উঠলো, "দেখলেন তো স্যার। পার্টি দেখলেই বুঝতে পারি, কে পাঠশালা খুঁজছে আর কে কালীবাড়ি খুঁজছে।"

পবিত্র কালীবাড়ি শব্দটা জীবনে এই প্রথম আমার কাছে রহস্যময় ঠেকছে। এ পাড়ার কালীবাড়ি কোথা থেকে আসবে? মদনা আমার হাবভাব দেখে নিজেই ভুল ভাঙিয়ে দিল। সলজ্জভাবে বেশ দ্বিধার সঙ্গে বললো, "কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনি গুরুজন। কোটে বলে ফেলেছি। আমাদের এ-পাড়ায় কালীবাড়ি মানে প্রাইভেট আনন্দবাজার।"

এরপর তার নিজস্ব সংকেতে [illegible] আমাকে যা বললো, তার অর্থ, [illegible] ডরোথি ওয়াটের বিজ্ঞাপনে [illegible] শব্দটি থাকার এবং [illegible] থ্যাকারে ম্যানশন হওয়ায়, [illegible] কিছু বিলাসগামী পুরুষেরা [illegible] বিজ্ঞাপনটি অন্য ইঙ্গিত গ্রহণ করে এসেছে। বড় বড় শহরে [illegible] কোনো বিজ্ঞাপনের কী গোপন অর্থ হয় তা জানতে

[illegible] আমার কাছে [illegible] সাবধানতা [illegible] অবলম্বন [illegible] নব শব্দ প্রয়োগ করেছিল। [illegible] এইসব শব্দের সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। কলকাতার এক এক পাড়ায় এক এক কর্মসূত্রে যে এক এক ধরনের ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয় তা এই প্রথম আমার মনে হলো। ৪২০ শব্দটি ভারতীয় দণ্ডবিধির সেকশন ৪২০-র কল্যাণে আইনপাড়া থেকে ক্রমশ আসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত হয়েছে মনে হয়। তেমনি আর একটি উকিলপাড়ার

[illegible] করলো, "আপনি কাজে যান, স্যার। কোনো চিন্তার কারণ নেই। আমি এখানেই

প্রত্যেকটি পার্টিকে ফাঁকি দিয়ে করে ফেললো। খেলার খোঁজে ঘোরাতেছে দুঃখলেই এখান থেকে নগদ বিদায় করে দেবো, বুড়ী মাকে আর কষ্ট পেতে হবে না।"

যে কোনো কারণেই হোক বরদাপ্রসন্নবাবু জগোশি ওয়াট সম্পর্কে বিশেষ সন্তুষ্ট নন। আমার সঙ্গে এই মহিলার প্রীতির সম্পর্ক তাই তিনি খোলা মনে গ্রহণ করতে পারছেন না। বরদাপ্রসন্ন সোজাসুজি বললেন, 'দেখবেন স্যর! দু একখানা পদ্য শুনে যেন গলে যাবেন না। এসব বুড়ী কখনই সুবিধের লোক হয় না। এদের মনে যে কী থাকে তা ডুবুরি নামিয়েও জানতে পারবেন না।"

বরদাপ্রসন্ন শুনিয়ে দিলেন, "বড় ডিফিকাল্ট কেস মশায়। ফ্যামিলিটাও যেন কেমন। এই ফ্ল্যাট আছে বারবারা উড-এর নামে। উড তো উড! এমন কেঠো মেমসায়েব বড় একটা নজরে পড়ে না। এই উড মেমসায়েবেরও এখানে ফ্ল্যাট পাবার কথা নয়। কিন্তু সেবারে আমাদের মালিকের শ্বাস রোগ হলো। বুকে বালিশ দিয়ে সারারাত শ্যামবাজারেরর বাড়িতে জেগে থাকতেন। সেই সময় এই উড মেমসায়েব মাঝে মাঝে নার্সিং-এ যেতেন। কী করে এই মেমসায়েবকে মালিক সহ্য করতেন ভগবান জানেন, ওই মূর্তি দেখলে তো রোগ বেড়ে যাবার কথা। যাই হোক মেমসায়েব ভাল বুঝে কীভাবে ম্যানেজ করলেন—নামমাত্র ভাড়ায় এসে উঠলেন এই এগারো নম্বর ফ্ল্যাটে।"

গলার সর্দিটা পরিষ্কার করে নিয়ে বরদা বললেন, "ঐটুকু ফ্ল্যাট—জাস্ট এক জনের জন্যে তৈরি। তা মশায়, আগে থেকে নিশ্চয় মতলব ভাঁজা ছিল। বারবারা উড একদিন গাই বাছুর সমেত এই ওয়াট মেমসায়েবকে এনে ঘরের মধ্যে তুললেন। আমাদের বললেন, নিজের বোন। কিন্তু আমরা কি আর মানুষ চিনি না একই গাছে কি আম আর আমড়া একই সঙ্গে হতে পারে? দেখলেন তো ওয়াট মেমসায়েবকে। বয়সকালে আরও সুন্দরী দেখতে ছিলেন। উড মেমসায়েবের কথা কী বলবো আপনাকে, ঠিক যেন অমাবস্যার কালী। তবে উড মেমসায়েবের একটা গুণ ছিল—কর্মচারিদের কলেরা টাইফয়েডের ইনজেকশন বিনা পয়সায় দিয়ে দিতেন।"

বরদাপ্রসন্ন আরও যা খবর দিলেন তার সারাংশ হলো : এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের কেসটা বেশ গোলমেলে হয়ে আছে। বারবারা উডকে এখন আর দেখা যায় না। যতদূর মনে হয় তিনি ভাল কাজকর্মের সন্ধান পেয়ে কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় চলে গিয়েছেন। সেক্ষেত্রে যোসেফ ভাড়াটে থাকবার কোনো অধিকার জন্মায় না। কিন্তু

ডরাথি ওয়াট তো প্যাট হয়ে ১১ নম্বর অকুপাই করে বসে আছেন। জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, সঙ্গে সঙ্গে উকিলের শেখানো বুলি কপচাবেন : "হ্যাঁ, বারবারা উড এখন কলকাতায় নেই তা ঠিক। কিন্তু সে মাত্র কিছুদিনের জন্যে। আমি এখন তাঁর ঘরদোর দেখাশোনা করছি—বারবারা উড নিজেই আপনাদের ভাড়া গুনছেন এবং তিনি ফিরে এলেন বলে!"

"কোত্থেকে ভাড়া আসছে, কে টাকা গুনছে, এখন কী আর আমাদের জানবার উপায় আছে? এখন যা-দিনকাল, দয়া করে মাসের ভাড়াটা দিলেই বাড়িওলার সাতগুষ্টি ধন্য হয়ে যান," বরদাপ্রসন্ন মন্তব্য করেছিলেন।

বরদাপ্রসন্ন আরও বলেছিলেন, "ফাইলটা এক সময় মন দিয়ে দেখে রাখবেন, স্যর। অনেক পাপ করেছিলেন গত জন্মে। না-হলে এই থ্যাকারে ম্যানসনে ম্যানেজার হয়ে আসবেন কেন? ফাইলগুলো পড়তে-পড়তে এবং ব্যাটাছেলে-মেয়েমানুষের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে এক এক সময় মনে হবে হোল কলকাতা শহরে নর্মাল ফ্যামিলি বোধ হয় একটাও নেই। থাকলেও তারা কখনও এই সব ম্যানসন বাড়ির খুপরিতে বাসা বাঁধে না। জায়গা চিনে-চিনে কিম্ভূতকিমতকার লোকরা এখানে বাসা ভাড়া নেয় নিশ্চয়।"

তেলকালিবাবু আমাদের সামনে বসে বসে একখানা পাখায় তেল দিচ্ছিলেন। বরদাপ্রসন্নর কথায় প্রতিবাদ করে তিনি বললেন, "এসব কী বলছেন হালদারমশাই? মানুষ মাত্তরই ভাল—থ্যাকারে ম্যানসনে ভাড়া গুনে থাকলেই কী তাদের সিং গজিয়ে যায়?"

"তুমি আর ভাগবত শুনিও না!" মুখের উপর উত্তর দিয়েছিলেন বরদাপ্রসন্ন। "আড়ালে ডেকে দুখানা পুরনো পাখা অয়েলিং-এর কাজ দিলেই লোক ভাল হয়ে যায় তোমার কাছে।"

তেলকালি জিভ কেটে বললেন, "১১ নম্বরের পাখা সেরেছি বটে, কিন্তু মাতা মেরীর দিব্যি কখনও একটা পয়সা নিই নি। নেবো কী করে? সেবার ওই উড মেমসায়েবই তো মাথা রাত্তে আমাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে বাঁচালেন—অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় মনে হচ্ছিল যাবার সময় এসেছে। উনিই তো যত্ন করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন—ফ্রি বেডে ভর্তি করিয়ে দিলেন।"

তেলকালি এবার দুঃখ করলেন, "বিপদে-আপদে উড মেমসায়েব মস্ত ভরসা ছিলেন, কিন্তু কপালে টিকলেন না। ফরেনে চলে গেলেন।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "সায়েব মেমসায়েব বলে কোনো জিনিস আর এদেশে থাকবে না তেলকালি। যখন এ-পাড়ায় এসেছিলুম তখন সায়েব মেমে ছয়লাপ—রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটলে মেমসায়েবের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেতো।"

তেলকালি একই সুরে মন্তব্য করলেন, "যা বলেছেন দাদা। প্রথমে খাঁটি সায়েবগুলো তল্পিতল্পাগুলো, তারপর আধুলি সিকি সায়েব-মেমদের মধ্যে দেশ ছেড়ে পালাবার হিড়িক পড়ে গেল। যে-রেট এন্টক ক্লিয়ার হচ্ছে তাতে ফিরিঙ্গিপাড়ায় লাল বাতি জ্বলতে আর দেরি নেই।"

তেলকালি আন্দাজ করতে পারছেন না

কেন এঁরা দেশ ছেড়ে চলে যান। মুখ বেঁকিয়ে তিনি বললেন, "কীপিং সায়েবের বউ তো সেদিন বললেন এখানকার ক্লাইমেট সহ্য হচ্ছে না, অস্ট্রেলিয়া নাকি অনেক ভাল।"

বরদাপ্রসাদ বিরক্ত হয়ে বললেন, "হা কপাল! নজর আলি লেনে জন্ম, রিপন লেনে লেখাপড়া, এলিয়ট রোডে যার বিয়ে-থা—সেও কিনা বলে কলকাতার জল-হাওয়া সহ্য হচ্ছে না।"

তেলকালি বললো, "অনেকে অবশ্য সেকেন্ড্ক্লাস স্বীকার করে বিলেত এবং অস্ট্রেলিয়ায় অনেক পয়সা, অঢেল সুখ।"

সুখ নিশ্চয় আছে, না-হলে, ওয়াট ফ্যামিলারেকেল ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই কেন বয়েসে কেটে পড়লো? কিন্তু যে-প্রশ্নটা এঁরা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তা হলো বোন এবং ছেলেমেয়েকে বিদেশে চালান করে বুড়ী ডরোথি ওয়াট কেন এখনও এই ধ্যাকারে ম্যানসনের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন?

তেলকালি জিজ্ঞেস করলেন, "অস্ট্রেলিয়ায় ক্যানেস্তারা বলে একটা জায়গা আছে?"

মুখটিপে হেসে বললাম, "বোধ হয় ক্যানবারা—অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলি ক্যানেস্তারা তো বাংলা কথা, সায়েবরা তার মানে জানবে কী করে! ওখানেই বারবারা উড মেমসায়েব রয়েছেন। বাড়ি কিনেছেন, গাড়ি হয়েছে। কী সুন্দর রঙীন ছবি পাঠিয়েছেন দিদির কাছে, দেখলে মনে হয় ঠিক যেন রূপকথার রাজবাড়ি। বুড়ী মেমসায়েব নিজেই ডেকে আমাকে ছবি দেখিয়েছেন।"

সবাইকে ছেড়ে বুড়ী ডরোথি ওয়াট কে এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে আছেন তা আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। ডরোথি ওয়াটের সিসটার সম্পর্কেও এ অঞ্চলে কারুর তেমন ধারণা নেই। তেলকালিবাবু তো ধরেই নিয়েছেন ডরোথি বিধবা।

নিজের সুবিধের জন্যেই বরদাপ্রসাদ বলেছিলেন, "নিজের বোন, নিজের ছেলে পড়ে রইলো বিদেশে, আর তুই বিধবা কীসের লোভে এখানকার মাটি কামড়ে পড়ে আছিস?"

এসব ব্যাপারে প্রথম দিকে মাথা ঘামাতে সময় পাই নি। ফিলিপ সায়েবের মামলায় তখন বড্ড বেশী জড়িয়ে পড়েছিলাম।

ডরোথি ওয়াট অবশ্য মাঝে মাঝে আমার কাছে নিজেই চলে আসতেন। আমাকে দিয়ে দু একখানা চিঠি টাইপ করিয়ে নিতেন। ডরোথির চোখের অবস্থা মোটেই ভাল নয়—ছানির অস্বচ্ছ পর্দা ক্রমশ তাঁর চোখের সামনে নেমে আসছে। ডরোথি বললেন, "এক
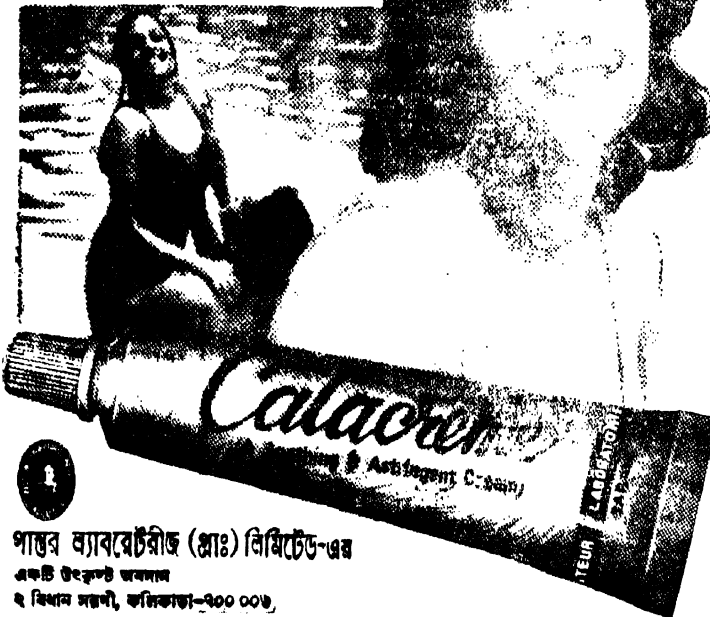
সময় আমার নিজের টাইপরাইটার ছিল। এখন তোমাকে জ্বালাতন করতে খুবই লজ্জা হয়। কিন্তু বারবারা আমার সংবাদ প্রত্যাশা করে। চিঠির উত্তর না দিলে আমার ঘুম আসে না। আমার স্বামী আর্নল্ডও ওইরকম। প্রতিটা চিঠির উত্তর তিনি দেবেনই। ওই যে সোনালী বাসু—যে আমার সংসার ভাঙলো—সি ওয়াজ এ টোটাল স্ট্রেঞ্জার। হঠাৎ আমার স্বামীকে বাড়ির ঠিকানায় পার্সোনাল চিঠি দিয়েছিল—লেখাপড়া শিখে বসে আছি, ছোট ছেলে-মেয়েদের ভালবাসি, মাস্টারি করবার খুব ইচ্ছে। আর্নল্ডের মনটা এত নরম ছিল যে লোকের কষ্ট দেখতে পারতো না। তখনই চিঠি দিয়েছিল সোনালী বাসুকে, দেখা করবার জন্যে। সেই দেখাটাই কাল হলো।"

এসব কথার কী উত্তর দেবো? এতো-দিনেও ডরোথি ওয়াট দাম্পত্য বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলতে পারেননি এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন অবস্থায় মৌখিক সহানুভূতি দেখানোর মানে হয় না।

এই অফিসে একটা আদ্যিকালের টাইপ মেশিন আছে। মেশিনটা মোটেই ব্যবহার হয় না। বরদাপ্রসন্ন হাত থাকতে যন্তর দিয়ে লেখালিখিতে বিশ্বাস করেন না। তেলকালি দয়াপরবশ হয়ে যন্ত্রটা একদিন ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। দয়াপরবশ হয়ে বলেছিলেন, 'দরকার হলে ডাকবেন—বুড়ীকে একটু তেলকালি খাইয়ে যাবো।"

এই মেশিনেই আমি ডরোথি ওয়াটের চিঠিপত্র টাইপ করে দিয়েছি। ডরোথির উত্তর টাইপ বাঁধবার সময় বিদেশ থেকে আনা বারবারা উড এবং জন ওয়াটের চিঠিগুলো আমার নজরে পড়েছে। মেয়ে মাথাও এখন স্বামীর সঙ্গে ভেনেজুয়েলা না কোথায় রয়েছে।

মেয়েকে ডরোথি লেখেন, "তোমার চিঠি পেয়ে খুব সুখী হলাম। আমি এখানে ভাল আছি। কলকাতার আবহাওয়া এখন অতি চমৎকার। আমার কোনোরকম কষ্ট নেই।"

চিঠি টাইপ করতে করতেই আমার মনে পড়ে ডরোথি ওয়াটের অঙ্গে মাত্র দু'খানা ফ্রক দেখেছি। ওঁর গায়ে জড়ানো স্কার্ফ-খানাও বহু ব্যবহারে বিবর্ণ হয়ে এসেছে। ওই স্কার্ফের দিকে আমাকে তাকাতে দেখে ডরোথি হেসে বলেন, "আমার স্বামী উপহার দিয়েছিলেন—যে বছর টেগোর আমাদের ইস্কুলে এলেন, সেইবার।"

কথার খেই হারিয়ে ডরোথি বলেন, "টেগোরকে কী উপহার দেওয়া হয়েছিল জানো? একখানা ছোট্ট কার্পেটের আসনে আমার স্বামীর কথা মতো পোয়েটের লেখা নিজের হাতে এমব্রয়ডার করেছিলাম। লাইনগুলো আর্নল্ড কোথায় পেয়েছিল জানি না:

"From the solemn gloom of the temple
Children run out to sit in the dust.
God watches them play and forgets the priest."

হস্তলিপির এই সুশোভন সূচীকর্ম পেয়েই যে কবিগুরু ইংরিজী গীতাঞ্জলির একটি কপি উপহার দিয়েছিলেন তাও শুনিয়ে দিলেন ডরোথি।

আমি ততক্ষণ অন্য একটা ফরেন এরো-গ্রাম ফর্ম টাইপ মেশিনে চাপিয়ে ফেলেছি। বারবারা লিখেছেন, "জন এবং আমার দু'জনেরই ইচ্ছে ইন্ডিয়ার পাট চুকিয়ে তুমি যথাশীঘ্র সম্ভব এখানে চলে এসো।"

ডরোথি লিখলেন, "আমার আদরের বোন বারবারা, তোমার পাঠানো টাকা

পেয়েছি। এখানে আমার কয়েকজন ছাত্রী হয়েছে—তাদের আমি ইংরিজী শেখাচ্ছি। কলকাতার বড়লোক ইণ্ডিয়ান গৃহিণীদের একমাত্র মুশকিল তারা আমার ফ্ল্যাটে আসতে চায় না—সবাই বাড়ি বসে ইংরিজী শিখতে চায়। এখানে এখন চমৎকার সময়। পুবদিকের ব্যালকনিতে টবগুলোতে প্রতিদিন ফুল ফুটছে। আর এখানকার গ্লোরিয়াস সানরাইজ—তার কথা তোমাকে আর কী বলবো!"

ফেরার কোনো কথাই লিখলেন না ডরোথি। চিঠি টাইপ করা আমার কাজ, কিন্তু কোনো প্রশ্ন করা শোভন নয়। নিজের চোখের কথাও লিখলেন না ডরোথি অথচ এখন ও'র যা অবস্থা তাতে প্রিয়-জনের কাছে ফিরে গেলেই বোধ হয় ভাল করতেন ডরোথি। এ-দেশের প্রতি বিচিত্র এক মায়া রয়েছে ডরোথি ওয়াটের. দলে দলে লোক কেন দেশত্যাগী হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারেন না।

ডরোথির চোখের দৃষ্টি ক্রমশ বিপজ্জনক সীমায় এসে পৌঁছচ্ছে। এরই মধ্যে বড়লোকের বউদের ইংরিজী শেখানোর জন্যে তাঁকে পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। অগতির গতি মদনা না-থাকলে আমার দুশ্চিন্তা আরও বাড়তো। মদনা ছেলেটি আমার কথার অবাধ্য হয় না। মেমসায়েবকে সে প্রতিদিন চৌরঙ্গীর ট্রামে তুলে দি'য় আসে। ডরোথি অবশ্য বলেন, "এসব দরকার নেই। আমি চমৎকার ফিট রয়েছি।"

মদনা নিজেও মজা পায়। আমার কাছে একদিন বলেই ফেললো, "বুড়ী যে অ্যান্ডা ব্যান্ডা কী সব বলেন, বুড়ীর বোধ হয় মাথার ঠিক নেই। বলেন কিনা, আমার এই শার্ট, আমার এই ফুচুকল (সিগারেট লাইটার) সুন্দর নয়। সুন্দর নাকি আমার মাথার চুল, সুন্দর আকাশের নীল রঙ, সুন্দর গড়ের মাঠের সবুজ ঘাস, সুন্দর সূর্যের আলো। শলা আকাশের রঙে, মাঠের ঘাসে কী সুন্দর আছে আমি বুঝতে পারি না!"

একদিন শুনলাম, ডরোথি ওয়াট ট্রাম থেকে নেমে ফেরবার পথে পড়ে গিয়েছেন। হাত পা ছড়েছে। রিকশওয়ালা ঈশ্বরপ্রসাদ দেখতে পেয়ে তাঁকে তুলে নিয়ে এসেছে।

অন্য সময় হলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতাম। এ বাড়ির এই একটি মানুষকেই আমি ভালবেসে ফেলেছি।

কিন্তু আমি নিজেও এখন বেশ দ্বিধায় পড়ে গিয়েছি। বোধ হয় এই কারণেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বাড়িওয়ালার সঙ্গে ভাড়াটিয়ার, হোটেল কর্মীর সঙ্গে হোটেল অতিথির অতিমাত্রায় অন্তরঙ্গতা নিষেধ করেন। আমার সঙ্গে ডরোথি ওয়াটের সম্পর্কটা জেনেশুনে, আমাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যেই তীর্থস্বামীর আগে বরদাপ্রসন্ন এগারো নম্বর ফ্ল্যাটের ফাইলখানা এগিয়ে দিয়েছিলেন। নামমাত্র ভাড়া, তাও চার মাস বাকি পড়েছে।

"চার মাস! আর আপনারা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন?"

বরদাপ্রসন্ন বললেন, "আপনার সঙ্গে এতো জানাশোনা। আমরা জানি নিশ্চয় আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করছেন।"

এই অপ্রিয় কাজ নিয়ে আমাকেই ১১ নম্বরে যেতে হবে। গীতাঞ্জলির আবৃত্তি বন্ধ করে সঙ্গতিহীন বৃদ্ধকে আমাকেই মনে করিয়ে দিতে হবে, এ সংসারে ভাড়া বলে একটা অপ্রিয় দায়িত্ব আছে। নিজ গৃহে যারা বসবাস করে না তাদর ভাড়া দিতে হয়। অথচ একদা কত অসুবিধার মধ্যে রামসিংহাসনের হাতে নিয়মিত ভাড়াটি দিয়েছেন। পুরনো কাগজ-পত্তর দেখেছি, সেখানে যাঁরা 'ইরেগুলার' বলে চিহ্নিত তাঁদের মধ্যে ডরোথির নাম নেই।

তাগাদা জিনিসটা আমার কাছে চিরদিনই অপ্রিয়। পুরনো এক কর্মক্ষেত্রে তাগাদাকারী এক দারোয়ানের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত—তার মুখ দেখলেই আমার মনের আলো হঠাৎ ফিউজ হয়ে যেত। আমি নিজে দেনাদার নই—দেনাদার আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি তার মালিক। তবু দূর থেকে ওই লোকটা আমার সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিত।

ডরোথি ওয়াট, আপনাকে বাকি ভাড়া সম্বন্ধে তাগাদা না দিয়েও চালাতে পারি। কিন্তু তাতে আপনারই বিপদ এগিয়ে আসবে। আইনে অভিজ্ঞ বাড়িওয়ালা চাইবে আপনি স্বভাব-ডিফলটার হোন, যাতে আদালতের শরণ নিয়ে সহজেই আপনাকে উৎখাত করা যায়।

বাকি ভাড়ার কথা তুলতে গিয়ে আমার জিভ জড়িয়ে আসছে। ঈশ্বর কেন যে আমাকে এমন অপ্রিয় কাজের মধ্যে ফেললেন? কিন্তু কর্তব্য এড়িয়ে যাবারই বা উপায় কী? এই থ্যাকারে ম্যানসন তো আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়—এখানকার কাউকে একদিনও বিনা ভাড়ায় রাখবার ক্ষমতা তো আমাকে দেওয়া হয়নি। এবার নিজেকেই নিঃশব্দ ভর্ৎসনা করলাম, "একখানা ভাঙা পুরনো বাড়ির মাস-মাইনের অস্থায়ী ম্যানেজার, ওঠো, নিজের কাজ করো। শুধু প্রিয় কর্মে ও প্রিয় ভাষণের জন্য তোমাকে এখানে নিয়োগ করা হয় নি।'

এগারো নম্বরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে

কিন্তু সঙ্কোচে মুখ খুলতে পারলাম না। টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে ডরোথি ওয়াট বসে বসে তখনও টেগোর পড়ছিলেন:

Day after day, O lord of my life, shall
I stand before thee face to face. With
Folded hands, O lord of all worlds, shall
I stand before thee face to face.

ডরোথির ছাত্রী সংখ্যা আরও কমেছে। চোখের অবস্থা কবে ভাল হবে তারও ঠিক নেই। ডরোথি প্রতিদিনই ডাকপিওনের দিকে তাকিয়ে থাকেন কবে বিদেশ থেকে কিছু টাকা আসবে।

ডরোথির মুখে কিন্তু এখনও উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। বললেন, "আজ আমার ব্যালকনিতে একটা রঙীন পাখি এসে বসেছিল।"

ডরোথির ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হেঁটে থমকে দাঁড়ালাম। যে কাজের জন্যে এসেছিলাম সে প্রসঙ্গ তোলাই হয়নি। ফিরে যাবো কিনা ভাবছিলাম, এমন সময় মদনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একগাল হেসে মদনা আমাকে স্যালুট করলে। "আপনি হুকুম দিয়েছেন স্যার, সেই জন্যে এগারো নম্বরের মেমসায়েবকে ঠিক দেখে যাচ্ছি।"

"বিদেশ থেকে কোনো টাকাকাড় আসে নি মেমসায়েবের?" মদনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কোথায় টাকা! ফরেন চিঠির জন্যে মেমসায়েব তো আমাকে আর ডাকপিওনকে জ্বালিয়ে মারছেন।"

মদনা এবার দাঁত বার করে বললো, "মেমসায়েবকে কিছু বলে আসতে হবে স্যর?"

এবার আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। যে কথা মুখে বলতে পারিনি তাই চিঠিতে লিখে দিলাম। যথাসময়ে ভাড়া আদায় না করতে পারলে আমারও [illegible] তা ও সবিনয়ে জানিয়ে দিলাম ডরোথি ওয়াটকে।

মদনার হাতে চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে খুবই দুঃখ পেলাম। আমার নিজের সম্পত্তি থাকলে পকেট থেকেই কিছু ভাড়া দিয়ে দিতাম।

চিঠি পাঠিয়েও দুশ্চিন্তার অবধি নেই। বৃদ্ধ ডরোথির কী অবস্থা হলো জানবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইলাম।

পরের দিন মদনার সঙ্গে আমার দেখা হলো। ভেবেছিলাম ডরোথি হয়তো মদনার মাধ্যমে একটু করো উত্তর পাঠাবেন। ব্যাপারটা মদনার জানার কথা নয়। কিন্তু দেখলাম, সে অনেক খবর রাখে।

মদনা বেশ নির্লিপ্তভাবে বললো, "কিছু ভাববেন না, স্যার। [illegible] একটা ব্যবস্থা শিগগির হবে।"

মদনার কথাবার্তায় আমি কোনো গুরুত্ব দিই নি। শুধু ভেবেছি, ডরোথি ওয়াট কেন এইভাবে অভাব ও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা একই সঙ্গে সহ্য করছেন?

আশ্চর্য ব্যাপার, তিন দিনের মধ্যেই ফল ফললো। মদনার হাতেই ডরোথি ওয়াট এক মাসের ভাড়া নগদ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

তেলকালি বিশ্বাস একগাল হেসে সুর করে বললেন, "না চাহিতে কিছু যায় না পাওয়া এই দুনিয়ায়! নিশ্চয় কলকাঠি টিপেছেন, তাই সুড়সুড় করে ভাড়া এসে গেল।"

কোনো মন্তব্য করবার মতো মানসিক অবস্থা নেই আমার। মাথা নিচু করে রসিদ লিখে মদনার হাতে দিয়ে দিলাম।

দুপুরের কাজকর্ম সেরে স্নানের জন্য নিজের ঘরে ফিরছি। টোর্টি লেনের এক মাদ্রাজি রেস্তোরাঁর সঙ্গে মাসিক ব্যবস্থা করেছি, তারা দুপুরের খাবারটা টিফিন কেরিয়ারে দিয়ে যায়। নিজের হাত পুড়িয়ে রাঁধবার বিদ্যা আয়ত্ত না থাকায় মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। বন্ধুবর সহদেব নিয়মিত সুখাদ্য

সরবরাহের লোভ দেখিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করি নি—কখন কে কী বদনাম ছড়িয়ে দেয় তার ঠিক নেই।

যাবার পথে ডরোথি ওয়াটকে দেখতে পেলাম নীল আকাশের নিচে, দুপুর রোদে তিনি একটা বেতের মোড়ার ওপর ফয়ারের ছায়ায় বসে আছেন। মুখোমুখি হতে বেশ লজ্জা লাগলো আমার। মনে হলো যেন গুরুতর কোনো অন্যায় করেছি।

ডরোথি আমাকে দেখে হাসলেন, ঘড়ির কাঁটা বারটা পেরিয়ে যাওয়ায় শুভ অপরাহ্ণ জানালেন। ডরোথি এর পর নিচু গলায় বললেন, "আমি স্যরি, শংকর। তোমাদের অনেক কষ্ট দিচ্ছি। বাকি ভাড়াটা বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি আমি শোধ করে দিতে পারবো।"

আমি কী বলবো? লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

বললাম, "এই রৌদ্রে এখানে বসে আছেন?"

ডরোথি এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলেন. তারপর হেসে বললেন, "গ্লোরিয়াস ইণ্ডিয়ান সানসাইন—আমার খুব ভাল লাগছে।"

পরের দিন, বিকেলের পড়ন্ত বেলায় ডরোথি ওয়াটকে আবার বাড়ির বাইরে দেখলাম। আমাদের আপিস ঘরের পাশে যেখানে একটু গাছের ছায়া আছে সেখানে বেতের টুলে চুপচাপ বসে আছেন ডরোথি ওয়াট। অনেকক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়ে ডরোথি তাঁর মুখখানা ক্রমশ তামাটে করে ফেলছেন।

ডরোথি আমার দিকে তাকিয়ে সেই পুরনো হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। এই সময় আমার হাতে তেমন কাজ থাকে না। কখনও কখনও এই সময় ডরোথি ওয়াটের ঘরে বসে বহুক্ষণ গল্প করেছি। ওঁকে বললাম, "আজ তো তেমন কাজ নেই।"

কিন্তু ডরোথি ওয়াট তেমন উৎসাহ দেখালেন না। অন্যবারের মতো বললেন না, "চলো ইয়ংম্যান, আমার ফ্ল্যাটে বসে এক কাপ চা খাবে।"

এমনই হয়ে থাকে সংসারে। আমাদের দুজনের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্বের অদৃশ্য বাধা সৃষ্টি হয়েছে।

আজকাল বেলা এগারোটা নাগাদ প্রায়ই ডরোথি মেমসায়েবকে একটা লেডিজ ছাতা হাতে বেরিয়ে পড়তে দেখা যায়। চোখের ওই অবস্থায় বেশী দূরে যাওয়া উচিত নয়—তবু মাঝে মাঝে তিনি গড়ের মাঠে গাছের তলায় অনেকক্ষণ বসে থাকেন। তারপর ফিরে এসে হয় থ্যাকার্স মানসনের ফয়ারের ছায়ায় না হয় আপিসের পাশে বটতলায় চোখে কালো চশমা লাগিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আরও এক

বাকের বকেয়া ভাড়া মিটিয়ে দিতে এলেন ডরোথি নিজে। লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে রইল। এমনিভাবে খুব শীঘ্রই তিনি সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দেবেন—শুধু শুধু আমি অপ্রিয় চিঠি লিখে বসলাম।

আজ আমি কিছুটা অপরাধের স্খালন করতে চাই। দুপুরের কর্মহীন অফিস ঘরে একটাও লোক ছিল না। কোনো কথা না শুনে আমি দু কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। অনেক চা খেয়েছি ডরোথির ঘরে, আজ না হয় এক কাপ শোধ করা গেল।

ডরোথি বললেন, "বাকি ভাড়ার জন্যে চিন্তা কোরো না, শংকর।"

আমাকে লজ্জা দেবার জন্যেই কী ডরোথি ওয়াট এই এসঙ্গ তুলছেন?

অপমান গায়ে না-মেখে বললাম, "একদিন দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে আপনার ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করবো।"

গম্ভীর হয়ে ডরোথি বললেন, "আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে এসো না, আমি দুপুরে আজকাল বেরিয়ে যাই।"

আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম, "আমার কাছে আজকাল চিঠি টাইপ করাতে আসেন না তো? আমার ওপর রাগ করেছেন আপনি?"

রাগ স্বীকার করলেন না ডরোথি। বরং বললেন, "ক্যানবারার চিঠির উত্তর দিতে ইচ্ছে হয় না। সেই এক প্রশ্ন—কেন তুমি কলকাতায় পড়ে রয়েছো? এখানে চলে এসো।"

আমার সঙ্গে ডরোথির আজ আর সেই আন্তরিক সম্পর্ক নেই, থাকলে হয়তো বলতাম, "ও'রা যা বলছেন তা শুনতে বাধা কী?"

ডরোথি ওয়াটের মুখের দিকে তাকালাম আমি। রোদে পুড়ে এবং ঘেমে নেয়ে ডরোথির তেল চকচকে মুখখানা বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ডরোথি এবার যেন কেমন হয়ে গেলেন। বললেন, "কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কথাই ওঠে না। যখন সময় হবে তখন অবশ্যই যাবো।"

চায়ের আগে ঢক ঢক করে এক গ্লাস ঠান্ডা জল খেলেন ডরোথি। বললেন, "মে আই হ্যাভ আনাদার গ্লাস অব ওয়াটার?"

"অবশ্যই।" আপিস ঘরের কুঁজো থেকে আমি নিজে জল গড়িয়ে দিলাম। জল খেয়ে একবার প্রান্তিতে চোখ বুজলেন ডরোথি। তারপর বললেন, "বারবারার ওপর আমার রাগ হয় সবচেয়ে বেশী। সে জানে আমি আর্নল্ডকে ড্যাইভোর্স দিইনি। সোনালী বাসু আমাকে অনেক রিকোয়েস্ট করেছিল, টাকার লোভও দেখিয়েছিল—কিন্তু আমি রাজী হইনি। কারণ, আমি জানি আর্নল্ডকে একদিন ফিরে আসতে হবে।"

কিসের বিশ্বাসে এতদিনের বিচ্ছেদের পর ডরোথি এ সব কথা বলছেন আমি জানি না। সংসারের জটিল নারীপুরুষ সম্পর্কের কতটুকুই বা বুঝি আমি?

ডরোথি বললেন, "চ্যাটার্জি দি অ্যাসট্রলজার আমাকে এই কথা বলে গিয়েছে। চ্যাটার্জি আমাদের ইস্কুলের কেশিয়ার ছিল। সোনালী বাসু আসবার আগেই সে লিখিতভাবে ফোরকাস্ট করেছিল আর্নল্ডের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ এবং মিলন হবে আবার।"

ডরোথির কণ্ঠস্বরে এবার যেন অন্য এক ডরোথিকে আবিষ্কার করলাম—যার ছবি দেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। এতদিন এবং এত দুঃখের পরেও যে স্বামীর অপেক্ষা করে আছে 'তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে বলে।'

চায়ের কাপ শেষ করেই ডরোথি অপিস ঘর থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কাজেই তিনি আমাকে আর ডিস্টার্ব করেন না। আপিসের জানলা দিয়ে দেখলাম, ফয়ারের তলায় লিফটের কাছে ছাতা খুলে তিনি তখনও নিশ্চল পাথরের মতো বসে আছেন।

দুপুরের কাজ শেষ করে ওপরে নিজের ঘরে ফিরবার পথে আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার তাঁর দৃষ্টি বিনিময় হলো। জিজ্ঞেস করলাম, "ঘরে যাবেন না?"

উনি হেসে বললেন, "আরও একটু পরে।"

কয়েকদিন পরে দুপুরে তিনটের সময়ে দেখলাম ডরোথি ওয়াট সেই একই ভাবে উঠোনের এক কোণে গাছের ছায়ায় বসে আছেন। সমস্ত পৃথিবীর দিনশেষের বিষণ্ণতা ওর চোখে জমে রয়েছে। কাছে গিয়ে জ্বালাতন করতে সংকোচ হলো। হে যোগেন্দ্রাণী যোগাসনে বসি ঢুলু ঢুলু নয়নে কাহারে ধেয়াও?

দূরে থেকে উঁকি মেরে সবে আপিস ঘরে এসে বসেছি, এমন সময় টি-বয়টা ছুটতে
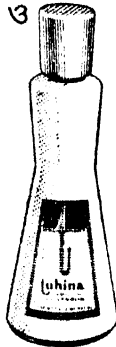
ছুটতে এসে বললো, "বাবু, আসুন, মেমসায়েব পড়ে গিয়েছেন।"

ছুটে গিয়ে দেখি অপরাহ্নের অসহ্য সূর্যতাপে ডরোথি ওয়াট সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন। ওই হাল্কা শরীরটা পাঁজাকোল করে আপিস ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছি। তেলকালিবাবুও কাছাকাছি ছিলেন, তিনিও ছুটে এসেছেন।

চোখে দু'একবার জলের ঝাপটা দিতে ডরোথি ওয়াট নড়ে উঠলেন। বললেন, "আই অ্যাম অল রাইট।"

ওঁকে ওর ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু শরীরের এই অবস্থাতেও ডরোথি কাতরভাবে বললেন, "এখন নয়—চারটের সময়।"

পাগল নাকি ভদ্রমহিলা! আমি কোনো কথাই শুনতে চাই না। ১১ নম্বরের চাবি কোথায়?

চাবি মেমসায়েবের কাছে পাওয়া গেল না। ক্ষীণকণ্ঠে ডরোথি বললেন, "চাবি মদনের কাছে।"

কোথায় মদন? চাবির সন্ধানে আমি বিদ্যুৎবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। এ-করিডর, ও-করিডর, এমন কি থ্যাকারে ম্যানসনের ছাদেও মদনকে খুঁজে পেলাম না। মদনা হতভাগা হয়তো মেমসায়েবের ফ্ল্যাটেই বিশ্রাম করছে। এই আশায় ছুটে গেলাম ১১ নম্বরে।

যা আন্দাজ করেছি, তাই! ১১ নম্বর ফ্ল্যাটে কোনো তালা ঝুলছে না। জোরে বেল বাজালাম। কোনো সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে এবং তিনগুণ জোরে এবার অনেকক্ষণ বেল বাজালাম। এবারে ভিতরে মানুষের উপস্থিতির আওয়াজ পেলাম। কিন্তু দরজা খোলার কোনো লক্ষণই নেই।

মদনা কি ডরোথি মেমসায়েবকে বার করে দিয়ে নিজেই ঘুমিয়ে পড়লো?

দরজায় লাথি মারতে যাচ্ছি এমন সময়, একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের মুখ গেঞ্জিপরা অবস্থায় উঁকি মারলো। এক ঝলকে আরও একটি শিথিলবসনা বিস্রস্ত বাঙালী বালিকাকেও দেখলাম মনে হলো।

দূরে ম্যানসন করিডরের এক কোণে একটা সতরঞ্চিতে মদনাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। তার সামনে একটা এলার্ম ঘড়ি।

হৈ হৈ-তে মদনাও কখন উঠে এসেছে। আমি তখন সেই যুবককে জিজ্ঞেস করছি, "আপনারা কারা? এখানে আপনারা এলেন কী ভাবে?"

মদনা ততক্ষণে অবস্থা আয়ত্তে এনে ফেলেছে। আমাকে দেখেই তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। আমার পায়ে হাত দিয়ে সে বলছে, "আমি পাঁচ মিনিটে ঝুটঝামেলা বিদেয় করে দিচ্ছি—আপনি মেমসায়েবকে নিয়ে আসুন।"

তেলকালিবাবু ততক্ষণে ধরাধরি করে মেমসায়েবকে ওপরে তুলেছেন। এগারো নম্বরের আগন্তুকদ্বয় মুহূর্তের মধ্যে একখানা এয়ারব্যাগ কাঁধে করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তেলকালিবাবুর অভিজ্ঞ চোখে পুরো রহস্য ততক্ষণে ধরা পড়ে গিয়েছে। অর্ধচৈতন্য মেমসায়েবকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, ফিস ফিস করে তিনি আমাকে বললেন, "এঁরা ঘর ছেড়ে চলে না গেলে কিছুই করতে পারতেন না, স্যার।"

"কিছু বুঝলেন?" আবার চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তেলকালি।

"আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে তেলকালিবাবু। এখন একজন ডাক্তার ডাকা দরকার।"

তেলকালি বললেন, "সিম্পল ব্যাপার। এগারোটা থেকে চারটে এই পাঁচঘণ্টার জন্য খুব মোটা টাকায় এখানে ঘর ভাড়া দেওয়া যায়। ভীষণ ডিমান্ড। বুঝতেই পারছেন কেন! রাতের কলকাতা এখন যে দিনের কলকাতার কাছে হার মেনেছে! অন্ধকারের ব্যাপারগুলো আলো থাকতে-থাকতেই সেরে নেবার সুবিধে অনেক! টাকার অভাবে মেমসায়েব নিশ্চয় মদনার খপ্পরে পড়েছেন—ক'ঘণ্টা টাকার লোভে মদনা দুপুরবেলায় এই ফ্ল্যাটের চাবির মালিক হয়ে যায়।"

আমি নির্বাক। ক'দিন ধরে দুপুরবেলায় মিসেস ওয়াটের একলা-একলা ঘুরে বেড়ানোর রহস্যটা এমনভাবে সমাধান হবে ভাবতে বুকের কাছটা মুচড়ে উঠলো। কিন্তু এই হয়তো সংসারের নিয়ম।

মদনা ততক্ষণে ১১ নম্বর ঘরের সামনে থেকে কেটে পড়েছে।

নির্বাক নিস্তব্ধ আমি নতমস্তকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ডরোথি ওয়াটের বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ডরোথি ওয়াট এবার চোখ খুললেন। আমার দিকে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডরোথির ঠোঁট নড়ে উঠলো। কাতর কণ্ঠে এবার ডরোথি বললেন, "মিস্টার শংকর, তোমরা আরও দু' মাস আমাকে সময় দাও। তারপর আমি চলে যাবো। এসপ্ল্যানেডের মিস্টার চ্যাটার্জি আমাকে লিখে দিয়েছিলেন, সামনের মাসের মধ্যেই আর্নল্ড তার ভুল বুঝতে পারবে—সে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে—আর ক'টা দিন তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।"

(ক্রমশ)

নীললোহিতের চোখের সামনে

আমার ছোট মাসীর প্রাণের বন্ধু ছিলেন ঝর্নাদি। আমরা তাঁকে ঝর্নামাসী না বলে ঝর্নাদিই বলতাম, কারণ তাঁর দাদা রতনদা ছিলেন পাড়ার সকলের দাদা। দাদার বোনকে তো আর মাসী বলা যায় না। অবশ্য সব জায়গায় এরকম সম্পর্ক আমরা মেনে চলতে পারিনি, আমার বন্ধু বিজুর কাকাকে আমরা সবাই কাকা বলে ডাকতাম, কিন্তু তিনি যখন বিয়ে করলেন, তাঁর স্ত্রীকে আমরা কাকীমা না ডেকে বউদি বলতে লাগলাম প্রথম থেকেই। কারণ কাকার স্ত্রী জয়শ্রীর এমন ছোটখাটো ফুরফুরে চেহারা যে তাকে ঠিক কাকীমা হিসেবে মানায় না।

ছোটমাসী আর ঝর্নাদি এক সঙ্গে স্কুলে যেতেন। প্রায় একরকম চেহারার বেণী-ঝোলানো দুই কিশোরী। ওঁদের পড়াশুনো, বিকেলবেলায় ছাদে আড্ডা কিংবা সিনেমা দেখা, সব একসঙ্গে। একবার ঝর্নাদির টাইফয়েড হলো বলে আমার ছোটমাসী অশোককুমার কাননবালার 'চন্দ্রশেখর' সিনেমাটা দেখলোই না। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই গেলাম। ঝর্নাদি দেখতে পারবে না বলে ছোটমাসী কিছুতেই দেখবে না। স্কুল থেকে কলেজে গিয়েও ওঁদের বন্ধুত্ব সেরকমই থেকে গেল। ওঁদের আরও বন্ধু হলো বটে কিন্তু দুজনের যে নিবিড় সম্পর্ক তা একটুও আলগা হলো না। আমরা পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গেলাম দার্জিলিং, আর ছোটমাসী গেল ঝর্নাদিদের সঙ্গে দেওঘরে। কে না জানে, দেওঘরের চেয়ে দার্জিলিং অনেক ভালো জায়গা, তা ছাড়া দেওঘর আমাদের আগেই দেখা।

বি-এ পাস করার পর ছোটমাসী আর ঝর্নাদি দুজনেই এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার উদ্যোগ করছেন, এই সময় ঝর্নাদির বউদির মাসতুতো দ্যাওর ঝর্নাদিকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানালো। সেই প্রস্তাব শুনে ঝর্নাদি কেঁদে আকুল। কিন্তু ছেলেটি বড্ডই ভালো, চেহারা সুন্দর, পড়াশুনোয় ব্রিলিয়াণ্ট, সদ্য দারুণ চাকরি পেয়েছে—একে প্রত্যাখ্যান করার কোনো যুক্তিই তো নেই। মেয়েদের তো এক সময় না এক সময় বিয়ে হয়ই। যদি বহু বিবাহের যুগ থাকতো, তা হলে ঝর্নাদি বোধ হয় তাঁর বরকে অনুরোধ করতেন ছোটমাসীকেও বিয়ে করে ফেলার জন্য। প্রাণের বন্ধুকে সতীন করে নিয়ে দুজনে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন।

এক মাসের মধ্যে ঝর্নাদির বিয়ে হয়ে গেল এবং জানা গেল, ঝর্নাদিকে তাঁর বরের সঙ্গে মীরাটে গিয়ে থাকতে হবে। যাওয়ার দিন ঝর্নাদির কি কান্না! আমার ছোটমাসীকে জড়িয়ে ধরে হেঁচকি তুলে তুলে বলতে লাগলেন, আমি কী করে পারবো? আমি পারবো না অতদূরে থাকতে! কিছুতেই পারবো না! আমাদের ভয় হলো, ঝর্নাদি বুঝি অজ্ঞানই হয়ে যাবে!

প্রথম বছরেই দুবার কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন ঝর্নাদি। দ্বিতীয় বছরে একবার। তৃতীয় বছরে একবারও না। পঞ্চম বছরে আর একবার এলেন, সেবারই তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মালো।

এদিকে এম-এ পড়তে পড়তেই প্রেমে পড়লেন ছোটমাসী। না, কোনো সহপাঠীর সঙ্গে নয়, এক সহপাঠিনীর দাদার সঙ্গে। জাতের কিছু গরমিল ছিল, তাই নিয়ে বাড়িতে সামান্য কিছু মনকষাকষি হলো, শেষ পর্যন্ত মেনেও নিল সবাই। এম-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগেই ছোটমাসীর বিয়ে হয়ে গেল তরুণদার সঙ্গে। এবারেও আমরা একটা সম্পর্কের গোলমাল করে ফেললাম। তরুণদা দারুণ স্পোর্টসম্যান, সব খেলাই ভালো খেলেন, তার মধ্যে ক্রিকেটে বেশ নাম আছে। একবার রঞ্জি ট্রফিতে বেঙ্গলের উইকেট-কীপার হয়েছিলেন পর্যন্ত। একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে কি মেসোমশাই বলে ডাকা যায়? বিশেষত যার নাম তরুণ? ছোটমাসীর বর হয়েও উনি আমাদের কাছে তরুণদাই রয়ে গেলেন। বিয়ের পর ছোটমাসী চলে গেলেন নিউ আলীপুরে তরুণদার ফ্ল্যাটে, তিন বছর পর তাঁর একটি মেয়ে হলো। মাঝে মাঝে আমি যাই ছোটমাসীর কাছে, বিশেষত টাকা ধার করার জন্য। ছোটমাসী খুব ভালো পার্টি, কক্ষনো ফেরৎ চান না।

একদিন শুনলাম, ঝর্নাদির বর ট্রান্সফার হয়ে চলে এসেছেন কলকাতায়। এবং অফিস থেকে ফ্ল্যাট পেয়েছেন নিউ আলীপুরেই। ছোটমাসীর বাড়ির খুব কাছেই। এটা একটা সাংঘাতিক যোগাযোগ। দশ বছর বাদে দুই সখীর আবার পুনর্মিলন।

বিয়ের পর মেয়েদের আগেকার বন্ধুত্ব সবসময় টেঁকে না। অনেকখানি নির্ভর করে তাদের বরেদের সামাজিক মর্যাদার ওপর। একজনের বর গরীব আর একজনের বর অবস্থাপন্ন হলে কি আর আগেকার সেই বন্ধুত্ব সমান থাকে; বড়লোক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে জল খেতে চাইলে সে যদি ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বার করে দেয়, অমনি মনে হয়, ইস্ খুব চাল মারছে। আর যে গরীব, সে দেখাবে [illegible] অহংকার। কথায় কথায় শুনিয়ে দেবে, ওর আপিসে তো বাবুদের [illegible], কিন্তু ও কিছুতেই নেবে না, [illegible] এমন জেদী......। আসলে হয়তো [illegible] কোনো সুযোগই নেই। যাই হোক, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা [illegible] বন্ধুত্ব।

কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ছোটমাসী আর ঝর্নাদি—দুজনেরই স্বামী বেশ সুপুরুষ, দুই সমান অবস্থাপন্ন, বাড়িও একই পাড়ায়। এবং প্রত্যেকেরই একটি করে সন্তান।

ঝর্নাদিকে পেয়ে ছোটমাসী একেবারে উচ্ছ্বসিত। যেন আবার ফিরে গেছেন সেই কৈশোর বয়েসে। দুজনের যেন একটাই বাড়ি হয়ে গেল। ও-বাড়ি থেকে রান্না আসছে এ-বাড়িতে, কিংবা ছোটমাসী স্পেশাল কিছু রান্না করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন ও-বাড়িতে, ঝর্নাদির সঙ্গেই বসে খাচ্ছেন। ওঁদের দুজনের দুই স্বামীর মধ্যেও বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল—প্রায়ই সন্ধেবেলা একসঙ্গে আড্ডা দেন।

এই যে দুটি পরিবার, পরস্পরের মধ্যে এত বন্ধুত্ব, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় এঁরা কত সুখী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলুম, এঁদের সুখের জীবনে একটা সূক্ষ্ম ফাটল ধরেছে। তার জন্য দায়ী এক খলনায়ক আর এক খলনায়িকা। প্রকৃতপক্ষে তারা দুজন হচ্ছে আসলে দুটি সরল নিষ্পাপ শিশু। ঝর্নাদির ছেলে আর ছোটমাসীর মেয়ে।

একদিন বিকেলে ঝর্নামাসীর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম দুটি সমবয়সী বালক-বালিকা বসবার ঘরে হুটোপুটি করছে।

ছোটমাসীর মেয়ে পাপিয়াকে তো আমি একটি খাঁটি দাসা বলে জানিই। ঝর্নাদির ছেলেটিকে দেখে বেশ শান্ত শিষ্টই মনে হয়, যদিও সেই মুহূর্তে সে একটি টাইম ম্যাগাজিনের পাতা ছিঁড়ছিল খুব মনোযোগ দিয়ে।

ভেবেছিলাম ঝর্নাদির সঙ্গে দেখা হবে কিন্তু ঝর্নাদি নেই সেখানে। ছোট-মাসী বললেন, ঝর্নারা জমি দেখতে গেছে যাদবপুরের দিকে, তাই ওর ছেলেকে রেখে গেছে এ-বাড়িতে।

আমি বললাম, বাঃ, তোমাদের তো বেশ সুবিধেই হয়েছে। তুমিও কোথাও গেলে পাপিয়াকে ওদের বাড়িতে রেখে যেতে পারো।

ছোটমাসী গম্ভীর হয়ে গেলেন, কোনো কথা বললেন না।

আমরা গিয়ে খাবার টেবলে বসলাম। ছোটমাসীর একটাই মাত্র দোষ, বাড়িতে গেলেই জোর করে কাস্টার্ডের পুডিং খাওয়াতে চান। কিন্তু ওগুলো যে কি বিচ্ছিরি খেতে হয়।

চায়ের কাপে সদ্য চুমুক দিয়েছি এমন সময় শাইরের ঘরে বেশ জোরে ঝনঝন করে শব্দ হলো।

ছোটমাসী বললেন, এই রে, আবার বুঝি কিছু ভাঙলো।

দুজনেই উঠে গেলাম।

একটা সুন্দর পোর্সিলিনের বুদ্ধমূর্তি মেঝেতে চুরমার হয়ে পড়ে আছে।

আমরা যাওয়া মাত্রই পাপিয়া বললো,

বুদ্ধমূর্তি চুরমার হয়ে পড়ে আছে

আমি ভাঙিনি! আমি ভাঙিনি! ঐ বাবলু ভেঙেছে।

বাবলুর মুখে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে। একবার মুখ তুলে বললো, আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়।

ছোটমাসীর মুখখানা থমথমে। টুকি-টাকি পুতুল টুতুল দিয়ে ঘর সাজাতে খুব ভালোবাসেন। ঐ জিনিসগুলো তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু রেগে গেলেও পরের বাচ্চাকে তো আর বকতে পারবেন না। তাই বললেন, বাবলু, থাক ওতে আর হাত দিও না, হাত কেটে যাবে?

মূর্তিটা ছিল একটা বেশ উঁচু বইয়ের র‍্যাকের ওপরে। অত উঁচুতে বাবলুর হাত যাওয়ার কথা নয়। তবু হাত গেল কি করে? পাপিয়া জানিয়ে দিল, বাবলু বুক শেল্ফ বেয়ে বেয়ে উঠেছিল। সর্বনাশের ব্যাপার, পুরো বুক শেলফটাই উল্টে পড়ে যেতে পারতো!

ভাঙা টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলে আমরা আবার চলে এলাম খাওয়ার টেবলে। ছোটমাসী বললেন, ঝর্না এমনিতে এত বুদ্ধিমতী, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ। ছেলেকে কক্ষনো বকে না। এত জিনিসপত্র ভাঙে।

আমি বললাম, ঝর্নাদি বুঝি ডঃ স্পকের বই পড়েন নি? তোমার তো বইটা আছে, দিয়ে দাও না।

আমরা দেখেছি, পাপিয়া জন্মাবার পরই ছোটমাসী সব সময় ঐ বইখানা সঙ্গে রাখতেন। বাচ্চার তিন মাস, চার মাস, পাঁচ মাস বয়েসে মাকে কী কী করতে হবে, সবই নাকি বইতে লেখা আছে। পাপিয়া দোলনা থেকে মাটিতে পড়ে গেল, ছোট-মাসী দৌড়ে গিয়ে বই খুলে দেখলেন, এগারো মাসের বাচ্চা মাটিতে পড়ে গেলে কী হয়। ছোটমাসী বই পড়ে বাচ্চা মানুষ করেন বলে আমরা এক সময় হাসাহাসি করতাম। আমরা বলতাম, আমাদের মা কিংবা দিদিমারা তো ঐ বই পড়েন নি, তবু আমরা ঠিকঠাক মানুষ হলাম কি করে?

এ কথা ঠিক, পাপিয়া জিনিসপত্র ভাঙে না। ছোটমাসী তাকে এক বছর বয়েস থেকেই শিখিয়েছেন, কোনটা কোনটা পাপিয়ার নিজস্ব জিনিস। আর কোনটা বড়দের জিনিস। পাপিয়ার খেলনা বা বেলুন বা প্লাস্টিকের ছবির বই তার নিজের, সেগুলো সে ভাঙতে বা ছিঁড়তে পারে, কিন্তু মায়ের সেন্টের শিশি কিংবা বাবার হাতঘড়িতে সে হাত দেবে না। এই শিক্ষায় কাজ হয়েছিল। কিন্তু পাপিয়ার অন্য দোষ আছে। ডক্টর স্পকের শিক্ষাতেও একেবারে আদর্শ শিশু গড়ে তোলা যায় না। ছোট-মাসী ঝর্নাদিকে ছেলের ব্যাপারে অন্ধ বললেন, সেই হিসেবে ছোটমাসীও অন্ধ। আজকাল অধিকাংশ মায়েদেরই একটা করে বাচ্চা। সুতরাং সমস্ত মাতৃস্নেহ ঐ একটি শিশুর ওপর বর্ষিত হয়—অতখানি স্নেহ সহ্য করা সব শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মা-ই ভাবে, তার সন্তানটির কিছু দোষ নেই।

ছোটমাসী বললেন, বাবলুর পাঁচ বছর বয়েস হয়ে গেছে, এখন আর ঝর্নার ডক্টর স্পকের বই পড়ে কী লাভ হবে? একদম গোড়া থেকে সাবধান না হলে...... অথচ বাবলু এমনিতে এত ভালো ছেলে......

একটু বাদেই ঝর্নাদি এসে উপস্থিত হলেন। দরজা খোলা মাত্র পাপিয়া বলে উঠলো, ঝর্নামাসী, ঝর্নামাসী, আজ না বাবলু না বুদ্ধমূর্তিটা ভেঙে ফেলেছে। একদম ভেঙে ফেলেছে!

ছোটমাসী নিজের মেয়েকে একটু বকুনি দিয়ে বললেন, ছিঃ পাপিয়া ওরকম নালিশ করতে নেই।

ঝর্নাদি হেসে বললেন, আবার বুঝি বাবলু কিছু ভেঙেছে! ওকে নিয়ে এমন লজ্জায় পড়তে হয়! সেইজন্য আমি যে বাড়িতেই যাই, তাদেরই বলি, দামী দামী জিনিসপত্র সরিয়ে রাখতে। কখন যে কোনটা ভেঙে ফেলবে!

ছোটমাসী আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। অর্থাৎ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, ঝর্নাদি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন ছেলেকে। জিনিসপত্র সরিয়ে রাখাটা মোটেই ঠিক কাজ নয়। বরং বাচ্চাদের শেখাতে হবে যে সব জিনিস ভাঙা চলে না। বাড়িতে কোনো বাচ্চা ঢুকলেই কি লোকে ঘড়ি-পেন-সেন্টের শিশি-কাপ-ডিস-গেলাস সব লুকিয়ে ফেলতে পারে?

একটু বাদে বাবলু এসে বললো, মা দ্যাখো, পাপিয়া আমার পায়ে আঁচড়ে দিয়েছে।

ঝনাদি বললেন, খেলতে গেলে ওরকম হয়। নালিশ করতে নেই।

বাবলুর ডান পায়ে স্পষ্ট লোহার দাগ। ছোটমাসী তখন এমন গল্পে মত্ত যে সেটা দেখলেনই না। নিউ মার্কেটে কবে তিনি অপর্ণা সেনকে সামনাসামনি দেখেছিলেন সেই বৃত্তান্ত সবিস্তারে জানাচ্ছেন।

একটু বাদে আবার বাবলু ও পাপিয়ার মারামারির প্রবল শব্দ শোনা গেল। মেয়ে হলেও পাপিয়া বেশি গুণ্ডা ধরনের, সেই বেশি মারছে বাবলুকে।

ছোটমাসী হালকা গলায় বললেন, এই ওরকম মারামারি করে না!

বাবলু এসে আবার নালিশ করলো, দ্যাখো না মা, পাপিয়া আমার মাথায় স্কেল দিয়ে মেরেছে।

বাবলুর কপালের খানিকটা জায়গা ফুলে গেছে। ছেলের সেই অবস্থা দেখে ঝনাদির মুখমণ্ডলে একটা ব্যথার ছাপ ফুটে উঠলো। কিন্তু তিনি তো আর পাপিয়াকে বকতে পারেন না। নিজের ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুই এই ঘরে থাক।

ছোটমাসী পাপিয়াকে মৃদু, খুবই মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, পাপিয়া, এরকম করে না! এমনি এমনি খেলতে পারো না? মারামারি করবে কেন?

ডক্টর স্পকের বইতে কী লিখেছে জানি না, আমার মনে হলো, এই সময় পাপিয়ার কান ধরে একটা চড় মারা উচিত ছিল। যাতে সে লোহার স্কেল দিয়ে আর কারুকে মারতে সাহস না পায় ভবিষ্যতে। কিন্তু ছোটমাসী প্রায় কিছুই বললেন না। এর আগে একদিন বড় জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে আর একটা বাচ্চা ছেলে পাপিয়াকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল বলে রাগে-দুঃখে ছোটমাসী বলেছিলেন, ও-বাড়িতে আর কক্ষনো যাবেন না! কিন্তু নিজের মেয়ের ব্যাপারে তিনি অন্ধ।

আবার একটু বাদে শোনা গেল, বাবলু একটা চামচ জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। একটা চামচ হারানোর চেয়েও সেটা রাস্তায় কোনো লোকের মাথায় যদি পড়ে তাহলে অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। ছোটমাসী চাকরকে নীচে পাঠালেন।

ঝনাদি এবারও কিন্তু ছেলেকে বকলেন না। হালকাভাবে বললেন, ছেলেটার জ্বালায় হাতের কাছে কিছু রাখবার উপায় নেই। আমার তো এই মাসে তিনটে চামচ হারিয়েছে।

এই সময় আমি প্রস্থান করলুম।

মাস তিনেক বাদে আমি আবার গিয়েছিলাম ছোটমাসীর বাড়িতে। কথায় কথায় ঝনাদির প্রসঙ্গ উঠলো। জিজ্ঞেস করলাম, ঝনাদিদের খবর-টবর কি?

ছোটমাসী উদাসীনভাবে জানালেন যে ওদের খবর-টবর সব জানেই। তবে দিন-দশেক দেখা হয় না।

আমি স্তম্ভিত। দুজনে এত প্রাণের বন্ধু, এখন এক পাড়াতে থেকেও দিন দশেক দেখা হয় না। প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি, শুধু ছেলেমেয়ে সামলে আর সময় পান না। এক কালের দুই সখী এখন হয়ে উঠেছেন দুই অন্ধ জননী।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম অন্য দৃশ্য। ছোটমাসীর চাকরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে পাপিয়া আর ঝর্নাদির চাকরের সঙ্গে বেরিয়েছে বাবলু। দুজনে মহানন্দে খেলা করছে ত্রিকোণ পার্কে। শিশুদের হৃদয় জলের মতন। কোনো দাগ স্থায়ী হয় না, ঝগড়াঝাঁটি ভুলে যায় দু মিনিটে। পাপিয়া আর বাবলু দুজনেই যখন আর একটু বড় হবে, তখন পাপিয়া আর মারামারি করবে না, বাবলুরও জিনিসপত্র ভাঙার নেশা চলে যাবে—তখন আশা করা যায়, ছোটমাসী আর ঝর্নাদি—এই দুই সখীর পুনর্মিলন হবে।

পুস্তক পরিচয়

রাজনীতি ও শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা। শ্রীপুলকেশ দে সরকার। দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স, এম টি ৭২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০০০৭। মূল্য ষোল টাকা।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে শরৎচন্দ্রকে নানা কোণ থেকে দেখার বাসনা স্বাভাবিক। এ পর্যন্ত মানুষ-শরৎচন্দ্র ও শিল্পী-শরৎচন্দ্রের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি, তার চেয়ে অনেক কম জেনেছি শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয়। যদিও রাজনৈতিক কর্ম ও ভাবনা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার বিষয়—তাকে সুস্পষ্ট আকারে দেখাতে হলে জীবনী রচনার চেয়ে স্বতন্ত্র আকারে সাজানো দরকার। এই 'সাজানো' যাকে ইংরেজীতে বলা হয়েছে methodology—সেটাই এই ধরনের গ্রন্থে খুব বড় কথা। কারণ রাজনৈতিক চিন্তা বা মতবাদের একটি বিকাশের ক্রম থাকে। তার মূল, কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পত্র-পল্লব—সমস্তটা নিয়ে সে একটি অখন্ড ধারা। এই ধারার পরিচয়ই রাজনৈতিক ভাবনার পরিচয়।

শরৎচন্দ্র—মূলত যিনি শিল্পী তিনি যথার্থ অর্থে রাজনীতির লোক ছিলেন না। কিন্তু পরাধীন দেশ রাজনীতির ঘূর্ণি হাওয়ায় ধীরে ধীরে কিভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন—রাজনীতির ওঠা-নামা দুর্নিবার টানে কিভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন তা সত্যই অতি মনোগ্রাহী গল্প। শরৎচন্দ্রকে পরিপূর্ণভাবে জানবার আর একটা ডায়মেনসান।

শ্রীপুলকেশ দে সরকার সে কাহিনী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর গ্রন্থটিতে। তিনি দেখিয়েছেন চিত্তরঞ্জনের সংস্পর্শে এসেই শরৎচন্দ্রের মধ্যে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চিন্তার বীজ উপ্ত হয়। সাল তারিখের হিসেবে ১৯২০ সালে নন্-কোঅপারেশান আন্দোলনকে সমর্থন করে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দেন। ক্রমে হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপদে আসীন হয়েছিলেন। তারপর থেকে কংগ্রেসের নীরব ও নির্বিবাদী সমর্থক হিসেবে একদিনও তিনি ছিলেন না। একদিকে যেমন গভীর শ্রদ্ধা ছিল চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজী, সুভাষ ও রবীন্দ্রনাথের উপর—প্রয়োজনবোধে এবং নিজস্ব বিচারের তাগিদে প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেছেন অনেকেরই অনেক সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক, গান্ধীজীর সঙ্গে মতানৈক্য তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মৌলিকতা প্রমাণ করে। শ্রীপুলকেশ দে সরকার অজস্র উদ্ধৃতি সহযোগে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা বিচার ও বিশ্লেষণের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং এটা করতে শ্রীদে সরকার প্রভূত পরিশ্রমও করেছেন।

তবে সমস্তটা মিলিয়ে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনার পরিপূর্ণ চেহারাটা ফুটে উঠেছে এমন বলা যায় না। গ্রন্থের উৎসর্গপত্র থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থ শেষে কয়েকটি প্রায় অসম্পর্কিত প্রবন্ধের সংযোজন গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। লেখক অত্যন্ত বেশি সাবজেকটিভ হয়ে উঠেছেন এমন একটি গ্রন্থ রচনায়। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি, অপ্রয়োজনীয় তথ্যের অতিরিক্ত সংস্থাপন, এবং একই গ্রন্থের ১৬৮ বার উল্লেখ গ্রন্থটির মহৎগুণ ভালভাবেই নষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে।

তবু শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ভবিষ্যতের গবেষণায় গ্রন্থটি মূল্য পাবে বলে মনে করি। প্রকাশের ভাষা সুন্দর।

অমল মুখোপাধ্যায়

সং[illegible]

উৎপল চক্রবর্তীর আঁকা সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, হরপ্রসাদ মিত্রের প্রশংসামুখর ভূমিকা, প্রকাশকের গৌরবঘোষণানো নিবেদন, বনফুল, মন্মথ রায় প্রমুখের অভিনন্দনপূর্ণ অভিমত এবং বিস্ময়কর একটি লেখকপরিচিতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সুধীর বেরার চতুর্থ কবিতার বই অর্ব্বাদন (বাক্-সাহিত্য, কলকাতা ৯, সাড়ে পাঁচ টাকা)।

'বাংলা কবিতা যে দুরকম লেখা হয়, জানা গেল বনফুল-এর অভিমত থেকে। কিছু কবিতা আর কিছু ধাঁধা। সুধীর বেরা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন—'যে কবিতাগুলি তিনি লিখেছেন সেগুলি ধাঁধা নয়।' অর্থাৎ বাকি অনেক কবিতাই ধাঁধা!

বনফুল কাকে ধাঁধা বলেন জানি না, তবে লেখক পরিচিতির একটি পঙক্তি সত্যিই ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। সুধীরবাবু যে ছাত্র হিসেবে কত মেধাবী ছিলেন সে কথা জানাতে গিয়ে লেখক-পরিচিতিকার জানাচ্ছেন—'গোটা' (সুধীরবাবুর অন্যতম ডাকনাম—হেড মাস্টারমশাইয়ের দেওয়া) অঙ্কে বরাবর ১০০ পেয়েছে, সংস্কৃতে ৯৭।' অঙ্কে বরাবর ১০০ পাওয়া যতখানি কৃতিত্বপূর্ণ তার থেকে বহুগুণ চমকপ্রদ সংস্কৃতে ৯৭ পেয়ে যাওয়া। কখনো যে ৯৬ কিম্বা ৯৮ হয় নি—এর থেকে আশ্চর্যের আর কী হতে পারে।

এহ বাহ্য। সুধীরবাবুর কবিতার সঙ্গে অবশ্যই কোনো সম্পর্ক নেই এই সব রহস্যময় বাক্যবন্ধের। বস্তুত, রহস্য ব্যাপারটাই তাঁর যে অপছন্দ বোঝা যায় কবিতাগুলি পড়লে। তিনি প্রাঞ্জলতায় বিশ্বাসী, অতি সরলীকরণের দিকেই তাঁর ঝোঁক। এই সরলতা একদিকে যেমন গুণ, অন্যদিকে কবিতা থেকে বহুক্ষেত্রে সরিয়ে নেয় সেই আবরণ যা কবিতাকে আলাদা করে রেখেছে গদ্যের থেকে। যেমন, 'বাংলাদেশ' সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—'বঙ্গবন্ধুর সুমহান নেতৃত্বে/যে মুক্তি-যুদ্ধের শুরু—/ইন্দিরার গৌরবময় নেতৃত্বে/ হল তার সফল সমাপ্তি।' আলাদাভাবে এই পঙক্তিগুলি পড়ে বোঝা দুষ্কর, এটি কবিতার অংশ না কোনো প্রবন্ধের উপসংহার। এই জাতীয় বহু পঙক্তি যেমন সুধীরবাবুর রচনায় রয়েছে, তেমনি—সুখের বিষয়—এই বোধও তাঁকে পীড়িত করেছে যে 'যে কথার কথা বলি—/কতো বার মনে হয়েছে/তা পর্যাপ্ত নয়।' 'নোতুন কথা নোতুন ভাষা' তৈরি করার প্রতিশ্রুতিও তিনি রেখেছেন। 'ট্রেনে যেতে [illegible] আমি বই পড়ি না', 'ওয়েটিং [illegible] আনে হলো লোকটা কত চেনা' [illegible] কবিতা-বলীতে সেই প্রতিশ্রুতির কিছু আভাস স্পষ্ট অনুভব করা গেল—এ কথা সানন্দে স্বীকার্য।

*

পরেশচন্দ্র সরদার-এর দশ বছরের রচনা থেকে বাছাই-করা কাব্যসংকলন দিগন্তে সবুজ (মন মনন প্রকাশনী, আলিপুর, ২৪ পরগণা, তিন টাকা)। এই বইটিরও ভূমিকা লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' অধ্যাপক-এর অন্যতম কাজ যদি ভূমিকা রচনা হয়, তা হলে তো খুবই কাটার আসন বলতে হবে। তবে, এই ভূমিকায় ডঃ মিত্র খুবই অল্প কথায় পরেশচন্দ্রের মূল ত্রুটির দিকে আঙুল তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, শিক্ষানবিশী পর্ব পেরিয়ে চলেছেন পরেশ-চন্দ্র, এবং 'শিল্পীর ব্রহ্মাস্ত্র' যে 'পরিমিতি বোধ' 'সে অস্ত্র যখন তাঁর কলমে পুরোপুরি ধরা দেবে, তখন বাণী হবে সঞ্জীবনী, রচনা হবে যথার্থ সৃষ্টি।'

হরপ্রসাদবাবুর মতো আমরাও 'সেই ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলুম।'

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

হকি গরিমা আরও ম্লান
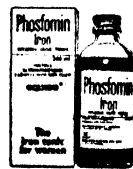
অনেক দিন আগে থেকেই ভারতের হকি সাম্রাজ্যে ঘুণ ধরেছে। অতীতের গরিমা এইভাবেই দিন দিন ম্লান হয়ে যায়। না হলে কি মন্ট্রিল অলিম্পিকের বিপর্যয়ের পর পাকিস্তানে কায়েদ-ই-আজম জিন্নার শতবার্ষিকী উপলক্ষে লাহোরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক হকিতে আবার বিপর্যয় ঘটে? মন্ট্রিলে মোট ৮টি খেলার মধ্যে ৪টি খেলায় পরাজয় এবং ১৯টি গোল খাওয়ার কথা অনেকবার লেখা হয়েছে। পাকিস্তানেও প্রায় সেই রকম ফল। চারটি খেলার মধ্যে দুটি খেলায় পরাজয়। একটি পরাজয় মালয়েশিয়ার কাছে ১—২ গোলে, আর একটি পরাজয় পাকিস্তান কলার্স দলের কাছে ০—৫ গোলে। বাকি দুটি খেলায় অবশ্য ভারত ৫—০ গোলে মিশরকে এবং ৪—১ গোলে পোল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে। কিন্তু গ্রুপে দুটি খেলায় পরাজয়ের ফলে সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি।

স্বীকার করছি ভারত শক্তিশালী দল নিয়ে পাকিস্তান যায় নি। কিন্তু কেন যায় নি? যে প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী পশ্চিম জার্মানী আছে, বিশ্ব-কাপজয়ী হল্যাণ্ড আছে, লড়িয়ে জাপান আছে, আর পাকিস্তান তো আছেই, সেখানে দুর্বল দল পাঠানোর যুক্তি কি? আর এক দফা পরাজয়ের গ্লানি বহন করা? "

ফেডারেশন সভাপতি রামস্বামী দল গড়ার পর এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন, মন্ট্রিল অলিম্পিকের অনেককে বাদ দিয়ে আমরা বেশীর ভাগ তরুণদের নিয়ে দল গড়েছি আগামী বিশ্ব কাপের খেলার দিকে চোখ রেখে। আমরা চাই তরুণ দল তৈরি করতে।

ভাল কথা। শুধু কি দল গড়া সকলেই কাজ শেষ হয়ে যায়? দল গড়ার প্রশিক্ষণ নিয়ে যে তামাশা হয়েছে পাতিয়ালার নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টসের ডিরেক্টর আর এল আনন্দ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ওখানেই প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচিত ২২ জনের মধ্যে ক্যাম্প চালু হবার পর অনেকেই অনুপস্থিত ছিল। কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন অনেক দেরীতে। ফেডারেশনের কোন কর্মকর্তাও প্রথম দিকে ক্যাম্পে ছিলেন না। আনন্দ ফেডারেশনের এই নিস্পৃহ ভাব দেখে গভীর হতাশা প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, নির্বাচিতদের মধ্যে অন্তত ৮ জন কোন দিন প্রথম শ্রেণীর হকি খেলেনি। তাই এন আই এস-এর ডিরেক্টর ফেডারেশনের কাছে তার পাঠিয়ে কয়েকজন সিনিয়র খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এও বলেছিলেন, লাহোরের ওই প্রতিযোগিতায় বিদেশের বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দল আসছে। বিনা প্রস্তুতিতে ওই আসরে উপস্থিত হলে ফল ভাল হবে না।

স্বীকার করছি আন্তর্জাতিক হকি ক্ষেত্রে বড় রকমের বিবর্তন এসেছে। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, এখনো খেলার টেকনিক ট্যাকটিকস, স্টিক কন্ট্রোল এবং সামগ্রিক শক্তিতে ভারত কোন দেশের চেয়ে দুর্বল নয়। শুধু মন রেখে, মুখ চেয়ে দল গড়া, অগোছালো পরিকল্পনা এবং অন্তর্বিরোধের ফলে ভারতীয় হকির আজ এই হাল।

প্রশংসনীয় উদ্যোগ

বাংলায় হকি চিরকালই উপেক্ষিত খেলা। চিরদিনই কলকাতার চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবু অতীতে বাংলার বহু খেলোয়াড় অলিম্পিক দলে স্থান পেয়েছে এবং অন্য রাজ্যের অলিম্পিকখ্যাত নামী খেলোয়াড়রাও কলকাতার হকিকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু কলকাতা হকির সাম্প্রতিক অবস্থা গভীর নৈরাশ্যজনক। এই অবস্থার মধ্যে একটি ক্লাবের উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে জেনারেল ইউনাইটেড ক্লাব আয়োজিত ৩০ দিনের হকি কোচিং ক্যাম্পের কথাই বলছি। দু শ'র বেশী ছেলে ওখানে কলাকৌশল, টেকনিক ট্যাকটিকস, শারীরিক পটুতা অর্জনের ট্রেনিং নিয়েছে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। শুধু কলকাতার ছেলেরাই নয়, কোন্নগর, মধ্যমগ্রাম, নৈহাটি, বরানগর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে অনেক ছেলে ট্রেনিং নিয়েছে। ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তিনটি গ্রুপে ভাগ করে। ৮ থেকে ১৪, ১৪ থেকে ১৬ এবং ১৬ থেকে ১৮ বছরের ছেলেদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছিল। ছেলেদের অসাধারণ আগ্রহ ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে প্রধান পরিচালক জেসলী ক্লডিয়াস মন্তব্য করেছেন, হকিতে আবার সুদিন আসতে বাধ্য যদি এইভাবে ক্যাম্প করে প্রতিভাবান প্রতিশ্রুতি-বানদের বেছে বার করা যায়।

বক্সিংয়ের প্রসার

পশ্চিমবঙ্গ বক্সিং লীগের বয়স বেশী নয়। সদ্যজাতও বলা যেতে পারে। কিন্তু মাত্র দুই বছরের চেষ্টায় বক্সিংয়ের ব্যাপারে বেশ একটু আলোড়ন এনেছে সারা বাংলায়।

প্রথম বছর ১১টি দল সাতটি জেলায় ঘুরে ঘুরে লীগ প্রথায় লড়াই করেছে। দ্বিতীয় বছরে ১৮টি দলের ১৯৬ জন বক্সার ২৮৪টি লড়াই করেছে ১০টি জেলায়। এবার তৃতীয় বছরে সাড়া আরও বেশী। আরও বেশী বক্সার লড়াই করবে। লীগ শুরু হবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। চলবে এপ্রিল পর্যন্ত।

বক্সিং লীগের উদ্যোগে বহু জেলায়

এবং শিল্পনগরীতে নতুন রিংয়ের উদ্বোধন হয়েছে। বেশ কিছু বক্সার জীবিকারও সন্ধান পেয়েছে বক্সিংয়ের মাধ্যমে।

মুষ্টিযুদ্ধকে জেলায় এবং শিল্পনগরীতে ছড়িয়ে দেওয়ার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। তা ছাড়া বক্সারদের চরিত্রগঠন এবং সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ও উদ্দেশ্যে সিটিজেনশিপ ট্রেনিং ক্যাম্পেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবার ক্যাম্প বসবে চুঁচুড়া ময়দানে হুগলী জেলা বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে।

রাজ্যের ঝিমিয়ে পড়া বক্সিংয়ে প্রাণ সঞ্চার করতে গত বছর উদ্যোক্তাদের খরচ হয়েছে ২৭ হাজার টাকা। বেশীর ভাগ অনুদান এসেছে ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে। রাজ্য ক্রীড়া পরিষদের কাছ থেকে একটি পয়সাও পাওয়া যায়নি। এবার খরচ হবে আরো হাজার দশেক টাকা বেশী। খেলাধুলোর একটি শাখায় সত্যিই যারা ভাল কাজ করছে তাদের উৎসাহ দেওয়া, আর্থিক সাহায্য করা এবং ট্রেনার সরবরাহ করাই তো ক্রীড়া পরিষদের নীতি।

একলব্য

বাবা ছিলেন ক্রিকেটার। বাড়ির পিছনেই ছিল ম্যাটিং উইকেট পাতা। সেখানেই ছেলেটি বোলিং প্র্যাকটিস করত। বাবা ছিলেন শিক্ষাগুরু। পরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে বল করে গেছে কলিন কাউড্রের বিরুদ্ধে কাউড্রের বাগানবাড়িতে। একজন ব্যাটসম্যান, একজন বোলার। সেখানে আম্পায়ার থাকত বাগানের মালী।

স্কুলের এক ক্রিকেট-পাগল মাস্টার-মশাই ছেলেদের প্রায়ই নিয়ে যেতেন ওভালে—মে, লক, লেকার, বেডসার প্রভৃতির খেলা দেখাতে। দেখতে দেখতেই ছেলেটির মনে গেঁথে গেল বড় ক্রিকেটার হবার বাসনা। তারপর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম দু বছরেই শত উইকেট পূর্ণ করল। ১৭ বছর বয়সে কেন্টের কাউন্টি ক্যাপ পেয়ে ১৩·৮০ গড়ে উইকেট পেল ১৫৭টি। পেল 'বেস্ট ইয়ং ক্রিকেটার অব দি ইয়ার'-এর সম্মান। তারপর সম্মানের সিঁড়ি ভাঙার পালা।

৬৩টি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ৩১ বছর বয়সী বাঁ-হাতী স্পিনার ডেরেক লেসলী আন্ডারউডের সাম্প্রতিক ভূমিকাটা খতিয়ে দেখা যাক। সাম্প্রতিক বলতে আমি এ বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ইংলন্ড সিরিজ এবং তার আগে অস্ট্রেলিয়া-ইংলন্ড সিরিজের কথা বলতে চাইছি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চারটি টেস্টে পেয়েছিলেন মাত্র ৬টি উইকেট, ২৬৬ রানে। গড় ৪৪·৩৩। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে পেয়েছেন ১৭টি উইকেট ৬৩১ রানে। গড় ৩৭·১১। দুটি সিরিজ যোগ করলে গড় দাঁড়ায় ঠিক ৩৯।

একটি উইকেট পেতে গড়ে যদি ৩৯ রান দিতে হয় তবে ১০টি উইকেটে রান হয় ৩৯০। তার মধ্যে একজন থাকে নট আউট। সুতরাং ইনিংস শেষ হয় চার শো কিংবা ৪২৫ রানে। কোনো বোলারের পক্ষেই এটা বড় কৃতিত্বের কথা নয়। বোলাররা তো শূন্য রানে কোনো সময় তিনটি উইকেট পেতে পারে। পেয়েছেও যারা হ্যাটট্রিকের অধিকারী। কোন খেলায় খুব অল্প রানেও বেশী উইকেট জুটে যেতে পারে। যেমন ১৯৭৪-এ লর্ডস টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই আন্ডারউডেরই জুটেছিল ৭১ রানে ১৩টি উইকেট—প্রথম ইনিংসে ৫১ রানে ৮টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২০ রানে ৫টি। কিন্তু একটি টেস্ট নিয়ে তো বোলারের বিচার হয় না। একটি সিরিজ দিয়েও না। গুণী বোলার বিচার করা হয় শেষ পর্যন্ত গড় দিয়ে। সেদিক দিয়ে মোট ৬৩টি টেস্টে ডেরেক আন্ডারউডের ২৫·৯১ গড়ে ২১৯টি টেস্ট উইকেট দখল বড় বোলারেরই পরিচয়।

শীতের ক্রিকেট অতিথি (৭)

কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে আন্ডারউডের ভূমিকা কি? ১৪টি টেস্ট ইনিংসে যাঁর ৫টি করে উইকেট দখলের নজির আছে, ৬টি টেস্ট ম্যাচে আছে ১০টি করে উইকেট পাবার কৃতিত্ব, তিনি ভারতের বিরুদ্ধে একবারও ইনিংসে পাঁচটি উইকেট পাননি। হ্যাঁ, ইংলন্ডের মাঠে বা ভারতের মাঠে, কোন জায়গাতেই না। শ্রেষ্ঠ বোলিং ৭২-৭৩ সিরিজে দিল্লি টেস্টে ৪—৫৬।

সুতরাং আন্ডারউডকে ভারতের শঙ্কার কারণ আছে বলে মনে হয় না।

কথা উঠতে পারে, ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানদের জুজু তো ফাস্ট বোলাররা। তারা যখন দু হাত ভরে উইকেট কুড়িয়েছে তখন স্পিনারের প্রয়োজন কি? কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। ৭৪-এর লর্ডস টেস্টের কথা ধরা যাক। ভারতকে মাত্র ৪২ রানে শেষ করতে ওল্ড আর আরনল্ডকেই বল হাতে নিতে হয়েছিল। আন্ডারউডের বল করারই প্রয়োজন হয়নি।

তবে নিঃসন্দেহে ডেরেক আন্ডারউড ব্যাটসম্যানদের বহুক্ষণ ধরে প্রায় বন্ধ্যা রাখতে পারেন, নিখুঁত লেংথ, নিশানা এবং অভ্রান্ত লক্ষ্যে। বল করার ছন্দও সুন্দর। আর বৃষ্টিভেজা পীচ পেলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। নাম-করা ক্রিকেট-লিখিয়ে জন আরলট তাই লিখে-ছিলেন : বৃষ্টির ভয়ে যেমন সব জায়গায় ছাতা নিয়ে যাওয়া উচিত, তেমন বৃষ্টির আশাতেই ইংলন্ডের সব সফরে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া উচিত আন্ডারউডকে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছেও। হোম সিরিজেও নিয়মিত খেলানো হচ্ছে ব্যাটসম্যানের সমীহ আদায়-কারী বোলার হিসাবে।

আন্ডারউড সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের প্রশস্তিও প্রচুর। বলা হয়েছে, তিন কাঠি তাক করে যে অভ্রান্ত লেংথ ও নিশানায় তিনি বল করেন তাতে ফিল্ডারদের শঙ্কার কারণ থাকে না। কেননা, তারা ব্যাটসম্যানের প্রায় নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে ফিল্ড করতে পারে। বাঁ-হাতী বোলারের রাউন্ড দি উইকেট বল মিডল ও লেগ স্টাম্পের অ্যাঙ্গেলে এসে পীচ খাওয়ার পর চকিতে পাক খেয়ে অফ স্টাম্পের দিকে ঘোরে। ডান-হাতী ব্যাটসম্যানের পক্ষে সুইপ বা কাট করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তা ছাড়া আন্ডারউডের বলের গতি স্লো স্পিনারের মত নয়। বেশ জোরের উপর বল করেন। কোন কোন সময় গতি থাকে মিডিয়াম পেসারের মত। তাই তার বিরুদ্ধে এগিয়ে পিছিয়ে খেলাও শক্ত। খাটো লেংথের বলের জন্যই ব্যাটসম্যানকে অপেক্ষা করতে হয়। সে অপেক্ষা বহু ক্ষেত্রে শবরীর প্রতীক্ষার মতও হয়ে দাঁড়ায়।

আন্ডারউডের বলের সবচেয়ে প্রশংসা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেল, ১৯৭২ সিরিজে যখন অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে তিনি সবচেয়ে বেশী সমীহ আদায় করেছিলেন। লীডস টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হার স্বীকার করতে হয়েছিল তিন দিনের মধ্যে, মুখ্যত আন্ডারউডের বলে। দুই ইনিংসে ৩৭ রানে ৪টি ও ৪৫ রানে ৬টি উইকেট পেয়েছিলেন। চ্যাপেল লিখেছেন, ডাগ ওয়াল্টার্স আন্ডারউডের যে বলটিতে আউট হয়েছিল সেটি ছিল 'ভয়ঙ্কর মৃত্যু-বাণ'। গুড লেংথ থেকে পাক খেয়ে ওয়াল্টার্সের গ্লাভস ছুঁয়ে এত বেগে উইকেটকিপার অ্যালান নটের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে স্লিপ ফিল্ডার পারফিটের হাতে আশ্রয় নিল যে, আমরা বুঝতেই পারলাম না পাক খাওয়ার পর বলে এত গতি থাকে কিভাবে। চ্যাপেল আরও লিখেছেন, তারপর স্ট্যাকপোল, আমি ও এডওয়ার্ডস যে বলে আউট হয়েছিলাম, গ্রেগ চ্যাপেলও সেই ধরনের বলে আউট হতে পারত। আউট অবশ্য সে হয়নি, তবে প্রায় সমকোণে বাঁক নেওয়া বলটি তার গলায় ঘা দিয়ে তাকে ভূতলশায়ী করেছিল, মহম্মদ আলীর মুষ্ট্যাঘাতে বক্সারের ভূতলশায়ী হবার মতই ব্যাপার।

এটা অবশ্য চার বছর আগের কথা। ওই খেলার পর আন্ডারউড ভারতে এসে-ছিলেন। চার বছর পরে আবার আসছেন।

মুকুল

তনুজা, রঞ্জিৎ মল্লিক/লালকুঠি/পরিচালনাঃ কনক মুখোপাধ্যায়

রঙ্গজগৎ

নন্দিতা/ডি কে ফিল্মস এণ্টারপ্রাইস

নন্দিতা ছবিকে দর্শক-বন্দিতা করবার জন্য সব রকমের মাল-মশলাই ব্যবহার করেছেন পরিচালক স্বদেশ সরকার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল কাহিনীতে একটি আদর্শবাদী যুবকের সংগ্রাম এবং জয়লাভের কথাই ছিল। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত চিত্রনাট্যে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গরিষ্ঠসংখ্যক দর্শক যা পছন্দ করেন তেমন নানা বিষয়। মোট কথা, ছবির চিত্রনাট্যে আবেগের উপাদানই বেশি এবং সেগুলি অতিরিক্ত আবেগ দিয়েই চলচ্চিত্রায়িত। এই জাতীয় ছবিতে সূক্ষ্ম কাজকর্মের অবকাশ কম, আধুনিক চলচ্চিত্রের প্রথা-

চলচ্চিত্র

প্রকরণও বাহুল্য। পরিচালক সে রাস্তায় হাঁটার চেষ্টা করেননি এটা একদিক দিয়ে বরং ভালই।

তা সত্ত্বেও নন্দিতাকে আরও বেশি উপভোগ্য করা যেতে পারত যদি না চিত্রনাট্যের গ্রন্থনা কিছুটা শিথিল হত। ছবিতে অনেক কিছুরই সমাবেশ ঘটেছে। আদর্শবাদী স্লোগান আছে (ডাক্তার গ্রামে চলো), হিন্দী ছবির মতো নায়ক ও খলনায়কের ঘুষোঘুষি আছে অবশ্যই অমানুষিক ব্যাপার), সেন্সর বাঁচিয়ে একটি চুম্বন এবং একাধিক আলিঙ্গন আছে (অর্পিতা ও সৌমিত্রকে বেশ রোম্যানটিক করে তুলেছিল কৃষ্ণ চক্রবর্তীর ক্যামেরা), একটি গর্ভপাতজনিত মৃত্যু আছে (সুব্রতা সত্যিই বড় দুঃখী), মতলববাজ গ্রাম্য মাতব্বরদের ঘোঁট পাকানোর সঙ্গে থানার দারোগার জড়িয়ে পড়া আছে (বাংলা ছবি ক্রমশই দুঃসাহসী হয়ে উঠছে), নায়ক-নায়িকার জমজমাট প্রেম আছে (জন্মদিনের মিষ্টি খাবার ব্যাপারটা খুবই হাততালি এবং সিটি পায়), এবং সর্বোপরি নিজের বাবাকে চোর বলে ধরিয়ে দেবার মত আদর্শবাদ আছে (যে কারণে ছবির নন্দিতা নাম সার্থক), এবং চোর পিতার জন্যে সজলচোখে ভেঙে পড়াও আছে (আবেগবিহ্বল অকথা আর কি)। এই সমস্ত ব্যাপারের পর অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, প্রযোজক ধীরেশ চক্রবর্তী এবং পরিচালক স্বদেশ সরকার সর্বাগ্রে টিকিটঘরের ব্যাপারটা সম্পর্কেই নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। আমাদের দেশে ছবি তৈরির ব্যাপারে ওইটাই ইদানীং বড় কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখছি। ওই দুর্ভাগ্য মেনে নিতে মন কিন্তু সায় দেয় না।

ছবির প্রয়োগের ক্ষেত্রে আধুনিকতার বড়ই অভাব। শেষ দৃশ্যে রাস্তার উপর ছবির প্রায় তাবৎ শিল্পী দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত আবেগ দিয়ে অভিনয় করে পুরনোকালের রঙ্গমঞ্চের সেই বিশেষ সমাপ্তি দৃশ্যটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছবিতে একটি উদাসী উদাসী ধরনের মুসলমান যুবকের কথা আছে যে ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায়, চমৎকার গান গায়, ব্যর্থ প্রেমের জন্য চোখের জল ও বুকের দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এবং আদর্শবাদী ডক্তারের পাশে প্রকৃত দোস্তের মতই দাঁড়ায়। এই জাতীয় চরিত্রগুলি

সৌমিত্র, আরতি/নন্দিতা

কখনোই বাস্তবের শর্তে পা ফেলে না। তবে দিলীপ রায়ের অসাধারণ অভিনয় চরিত্রটিকে খুবই প্রাণবন্ত করে তুলেছে। তাঁর কণ্ঠে হেমন্ত মুখোর্জির গানও বেশ উপভোগ্য। মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় গানের সুর বেশ ভালই দিয়েছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ডাক্তারের আদর্শবাদী চরিত্রটি যেমন ফুটিয়েছেন তেমনি প্রেমের ব্যাপারেও বেশ সাবলীল। আরতি ভট্টাচার্য অভিনয়ের দিক থেকে টুক টুক করে বেশ উপরে উঠেছেন। মেরুদণ্ডহীন চোর কম্পাউন্ডারের চরিত্রে বিকাশ রায় ঠিক ঠিক অভিনয় করে গেছেন। অন্যান্য চরিত্রে যাঁদের মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে সুব্রতা চ্যাটার্জী, হারাধন ব্যানার্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য, প্রমোদ গাঙ্গুলী এবং ভানু ব্যানার্জী অন্যতম। ক্যামেরা-ম্যান কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু দিয়েছেন। সেটা হল গ্রাম-বাংলার নিসর্গ শোভা।

—রবি বসু

প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্র

'দ্য টাওয়ারিং ইনফারনো'র মতো হলিউড-এর রীতিমত হৈ-চৈ করা ছবিটি যখন কদিন আগে কলকাতাতেই বেশ কিছু-দিনের জন্যে দারুণ জমিয়ে দিয়েছিলো সে-সময়ে কাগজপত্রে ছবিটির সমালোচনায় এক ধরনের পলায়নী-প্রবণতা, দায়িত্ব-এড়ানো মনোবৃত্তির নিরুত্তাপ প্রশ্রয় দেখে-ছিলাম। ছবিটি তার সহজ সার্বজনীনতার জন্য প্রশংসিত হলেও, সেই বিস্তীর্ণ প্রশংসার বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে ছবিটির সামাজিক রাজনৈতিক শূন্যগর্ভতা প্রসঙ্গে কিছু নির্মম কটাক্ষ ছিল সন্দেহ নেই। এর ফলে এ ছবির সবচেয়ে যেটি উল্লেখ্য প্রসঙ্গ—অর্থাৎ দৈলীয় বিচার—সেটিই অধিকাংশ সমালোচনায় অনুচ্চারিত রয়ে যায়। আর একটা কথা ঃ যাঁরা কাগজে কিংবা চায়ের পেয়ালায় এ-ছবির সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্যহীনতা নিয়ে তুফান তুললেন, এবং বুঝিয়ে দিলেন এই মিলিয়ন-ডলার ফিল্ম-এর মূল উদ্দেশ্য স্থূলভাবে বাণিজ্যিক, তাঁরা কিন্তু এই স্পষ্ট সত্যটিকে প্রায় শাক দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করলেন যে ১৯৭৪-৭৫-এ যে-সব ধ্বংসাত্মক, ভীতিপ্রদ, দম বন্ধকরা ছবি হলিউড-এ তৈরি হয়েছিলো সেগুলির শিকড় কিন্তু শুধু আমেরিকার নয়, প্রায় সমস্ত পৃথিবী-জোড়া ভীতিপ্রদ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যেই গ্রথিত রয়েছে। আধুনিক মনের অবচেতনায় এই অনুচ্চারিত ভীতি কতো বিস্তৃত সেটা জানতে পারি প্রথমে এয়ারপোর্ট ছবিতে। তারপর একে-একে এলো আর্থকোয়েক, হিনডেনবুর্গ, জাগারনাট এবং পোসাইডন অ্যাডভেনচার। দ্য টাওয়ারিং ইনফারনোকে বলা যেতে পরে এই চিত্রমালার মধ্যমণি।

ছবিটি তৈরি করতে প্রয়োজন হয়েছিল প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার। প্রায় ১৬৫ মিনিট-এর ছবি, কিন্তু নিখুঁত বাস্তবতার তাগিদে কাজে লাগাতে হলো ৫৭টি সেটস। এবং কোনো-কোনো জটিল, ক্ষিপ্র দৃশ্যের জন্যে একই সঙ্গে ৮টি পর্যন্ত ক্যামেরা। গড়ে প্রতি দৃশ্যে তিনটি করে ক্যামেরা কাজে লাগাতে হয়। টোয়েনটিয়েথ সেনচুরি ফকস ও ওয়ারনার ব্রাদার্স-এর দ্বৈতভূমিকা ছাড়া এতোটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এ-ছাড়া ছিলো স্টিভ ম্যাকুইন, পল নিউম্যান, উইলিয়াম হোলডেন, ফে ডানওয়ে, ফ্রেড অ্যাসটেয়ার প্রভৃতি তারকার বিরল সংলগ্নতা। ছবির দুর্ধর্ষ সিনারিওটি ছেঁকে তোলেন স্টারলিং সিলিফ্যানটস্ যে-দুটি গল্পের আশ্চর্য সংমিশ্রণ থেকে তাদের নাম ঃ স্টারনস-এর 'দ্য টাওয়ার' এবং ফ্রাংক রবিনসন ও টম স্করটিয়ার 'দ্য গ্লাস ইনফারনো।' পরিচালনায় নিখুঁত সুশ্রীতার জন্যে ছবিটির সিকোয়েনসগুলিকে দু-পর্যায়ে ভাগ করা হলো—অ্যাকশন ও ড্রামাটিক। স্বয়ং আরউইন অ্যালেন, যিনি এ-ছবির প্রযোজকও, তাঁর চাতুর্য, দক্ষতা ও কল্পনা দিয়ে অ্যাকশন সিকোয়েনসগুলিকে নিরেট করে তুললেন। আর গিলারমিন অপেক্ষাকৃত শ্লথ, ভাবনা-প্রবণ দৃশ্যগুলির বিন্যাসে নিয়ে এলেন তীব্র সাসপেনস। এই দুই ভিন্ন পর্যায়ের সিকোয়েন্স-এর জন্যে স্বভাবতই প্রয়োজন হলো দুটি পৃথক ক্যামেরা ইউনিটস। ভাবনাপ্রবণ দৃশ্যগুলিতে ক্যামেরা পরি-চালনা করলেন ফ্রেড কোয়েনিক্যাম্প। আর

অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলিতে জোসেফ বিরোক। সবশেষে বলতে হয় ওয়ার্ড প্রেসটন আর ব্যান্ডেল ব্রেটন-এর কথা, যাঁদের অতি-আধুনিক গৃহ-কল্পনা ছাড়া সেই আকাশচুম্বী সোনালি রঙের কাঁচের বাড়িটি সম্ভব ছিলো না যেখানে এক আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডকে ঘিরে এ-ছবির মূল ঘটনাবলী। পুরো বাড়িটিকে অবশ্য মাত্র কয়েকটি দৃশ্যে বাইরে থেকে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখানো হয়েছে। সেটা হয়েছে অ্যাবট-এর তৈরি একটি অসাধারণ মডেল-এর ছবি দিয়ে। (এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে-ছবিটি ছাপা হলো সেটি ঐ মিনিয়েচার বাড়িটির-ই ছবি।) বাড়িটির ভিতরের দৃশ্যগুলির জন্যে ফকস-এর ম্যালিবু র‍্যানচ-এ আলাদা করে ৫টি তলা তৈরি করা হয়েছিল। একটি সেনচুরি সিটি অফিস-এর নীচের তলাটাও—যেখানে সত্যি-সত্যিই ইলেকট্রনিক কনট্রোলস ও চেক সিস্টেমস আছে—কাজে লাগানো গেছলো। সবচেয়ে বেশি সাহস, কল্পনা আর অর্থ খরচ হয়েছিল এমন একটি বাগান বানাতে যেটি দেখলে মনে হবে সত্যিই ১৩৬ তলার ওপরে। ১১ হাজার স্কোয়ার ফিট নিয়ে এই প্রমিনেড ডেকটি স্টেজ থেকে মাত্র ১০—১২ ফিট ওপরে তৈরি হল এবং আরো ২৫ ফিট-এর মতো ওপর দিকে হেলানোভাবে রইল। কিন্তু মনে হল যেন সত্যিই ১৩৬ তলার ওপরে এটি তৈরি হয়েছে, কেননা এখান থেকে আমাদের একাধিকবার দেখান হয়েছে সানফ্রানসিসকোর বিখ্যাত স্কাই-লাইন বা আকাশস্পর্শী বাড়িগুলি। সেটা কিভাবে হয়েছিল জানেন? স্টেজ-এর মধ্যে বাগানের এই সেটটি ঘিরে রাখা হয়েছিল একটি ৩৪০ ফুট-এর সাইক্লোরামা যেখানে আমরা অ্যাবট-এর আঁকা সানফ্রানসিসকোর বিখ্যাত আকাশরেখা দেখতে পাই। এ-ছাড়া বাড়িটির পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে কিছু আকাশ থেকে তোলা দৃশ্যাবলী বা এরিয়াল শটস্ যেগুলির আলাদাভাবে তত্ত্বাবধান করেন জিম ফ্রিম্যান।

'দ্য টাওয়ারিং ইনফারনো'র ড্রামাটিক সিকোয়েন্সগুলি তুলতে কোয়েনিক্যাম্প-এর অভিজ্ঞতার কথা এবার তাঁর মুখ থেকে শোনা যাক ঃ গিলারমিন আমাকে ড্রামাটিক সিকোয়েন্সগুলি আলাদা করে তোলার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হতেই বুঝলাম ছবিটিকে সব দিক থেকে রিয়েলিসটিক করে তোলার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভেবে নেয়া হয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যের ছবি এঁকেছেন বিল ক্রেবার। এ-ছাড়া আছেন স্বয়ং অ্যাবট যাঁর মতো প্রতিভা পৃথিবীতে দুর্লভ। আমরা শুধু তিন সপ্তাহ ধরে সান ফ্রানসিসকোর ওই বাড়িটির পরিবেশ

দ্য টাওয়ারিং ইনফারনো

রচনার জন্য দৃশ্যগুলি তুললাম। রাত্রের দৃশ্যগুলি তোলা ছিল সবচেয়ে ঝামেলার। দেখুন, বিরোক-এর কথা ছিল শুধুমাত্র অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলি তোলার, অর্থাৎ এক্সপ্লোশান, আগুন ইত্যাদি। সুতরাং বিরোক-এর কাজের পর অধিকাংশ সেটস নষ্ট হয়ে যাবার কথা। অতএব আমাকে আগে কাজ করে নিতে হয়েছিল। বিরোক কিন্তু প্রত্যেকদিন আমার কাজ দেখতে আসতেন, কেননা তা-ছাড়া তাঁর পক্ষে ঐ-সব সেটস-এর পরের দৃশ্যগুলি ঠিক সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা সম্ভব হত না।'

এবার চলে আসি বিরোক-এর অভিজ্ঞতায়। বিরোক-এর কাজটি ছিল অনেক বেশি বিপজ্জনক। ফায়ার এক্সপার্টদের সাহায্য নিয়ে তাঁকে সব সময় কাজ করতে হয়েছে। পাইপে করে আগুন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আগুন যাতে না সেটস-এর বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে অসম্ভব সতর্ক থাকতে হচ্ছিল সবাইকে। কিন্তু আগুনের হল্কা এবং তাপ এমনি চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে ফায়ার এক্সপার্টরা বিরোককে প্রতিটি দৃশ্য তিরিশ সেকেন্ড-এর মধ্যে শেষ করতে বললেন, কেননা তার বেশি ঐ উত্তাপে এক নাগাড়ে কাজ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। দুটি দৃশ্যে অভিজ্ঞতার কথা বিরোক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। একটি দৃশ্য হল যেখানে আগুন নেভানোর জন্যে ওয়াটার-ট্যাংকটি ফাটিয়ে বাগানের বারান্দাটিকে ভাসিয়ে দেয়া হচ্ছে। সত্যি-সত্যিই ঐ দৃশ্যে একটি ১২,০০০ গ্যালন-এর ট্যাংক থেকে জল ফেলা হয়েছিল। অত জলের মধ্যে ক্যামেরা ও ইলেকট্রিক-এর জিনিসপত্র শুকনো রেখে কাজ করা যে কত শক্ত সেটা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। অন্য দৃশ্যটি হলো যেখানে একটি আগুনের পিণ্ডকে আমরা একটি লিফট-এর মধ্যে ঢুকে যেতে দেখি। এই বিপজ্জনক দৃশ্যটি দুটি ক্যামেরার সাহায্যে তোলা হয়েছিল। প্রথমে একটি প্রোপেন-পাইপ থেকে যেই আগুনের বলটিকে ছুঁড়ে দেয়া হল বিরোক ছবি নিলেন পিছন থেকে। একই সঙ্গে আর একটি ক্যামেরা ছবি তুললো লিফট-এর ভিতর থেকে। আমরা আগুনের পিণ্ডটিকে প্রথমে পিছন থেকে লিফট-এর দিকে যেতে ও পরে সামনে থেকে লিফট-এর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। লিফট-এর একেবারে সামনে রাখা ছিল একটি মোটা অথচ স্বচ্ছ প্লাসটিক-এর চাদর যেটা শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই আগুনের পিণ্ডটিকে লিফট এর মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। কিন্তু সেই সাহসী ফাঁকিটুকু আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। এই রকম অনেক ফাঁকি সারা ছবিটিতে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু দ্য টাওয়ারিং ইনফারনোতে যা নেই তা হলো প্রতিভার ফাঁকি। এই জন্যই ছবিটিতে শিল্প আর বাণিজ্যের এমনি চূড়ান্ত মিশ্রণ সম্ভব হয়েছে। —রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত

কলাসঙ্গমের সম্মেলন

কলাসঙ্গমের চতুর্থ বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনে গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল ও মল্লিকার্জুন মনসুরের গানই সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল। রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত এই তিন দিনব্যাপী (নভেম্বর ১০—১৩) অনুষ্ঠানের অন্য শিল্পীরা ছিলেন বিলায়েৎ খাঁ, আমজাদ আলি খাঁ, তেজপাল সিং ও সুরিন্দর সিং (সিং বন্ধু) ও ওড়িশি নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা পানিগ্রাহি।

গাঙ্গুবাঈ (১১ নভেম্বর) শুরু করেছিলেন গোধূলিলগ্নের রাগ মারোয়া দিয়ে। যে কয়েকজন শিল্পীকে মারোয়াসিদ্ধ বলা যায়—যেমন স্বর্গীয় ওস্তাদ আমীর খাঁ ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর—তাঁদের মধ্যে গাঙ্গুবাঈও যে পড়েন সেই কথাটি নতুন করে প্রমাণ করে দিল এই অনুষ্ঠান। আরোহী ও অবরোহী ধৈবতের ওপর ঝোঁক, ষড়জের স্বল্পতা ও এক সপ্তকের ঋষভ থেকে আরেক সপ্তকের ঋষভে চকিতে ছুটে যাওয়ার অতুলনীয় ভঙ্গি তাঁর বিলম্বিত খেয়ালের বিস্তার পর্বকে এক মহৎ মুহূর্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম করেছিল। এই রাগে বার বার ধ ন ঋ ন ধ—অঙ্গের কাজ করার পর ধ স মীড় দিয়ে অন্তরার ষড়জে দাঁড়ালে
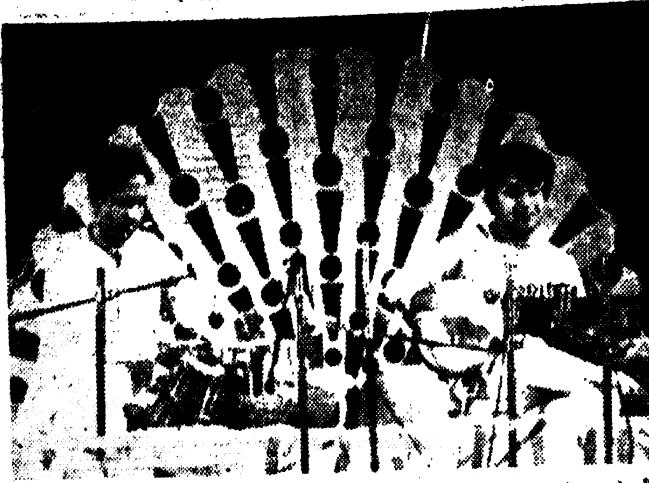
আমজাদ আলি ও শংকর ঘোষ : কলাসংগীতের অনুষ্ঠানে ফটো : সুবীর চ্যাটার্জী

যে গভীর রসের সৃষ্টি হয় তাও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে গুণ্ডাবোঙ্গী-এর অন্তরা পর্বে। নিজস্ব সঙ্গীত চিন্তারও যথেষ্ট পরিচয় ছিল এখানে সেখানে—যেমন জলদ তারানার ধ ঋ স, ধ ঋ ঋ স (স ও ঋ তার সপ্তক) বিন্যাসে। গমক তানেও ছিল শিল্পীর সবজনস্বীকৃত গাম্ভীর্য, দক্ষতা ও মাদকতা। তুলনামূলক বিচারে পরের পুরিয়া ধানেশ্রী বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল তত ভাল হয়নি। তবে অতি কোমল ধৈবতের প্রয়োগ লক্ষণীয় ছিল। দ প স, দ ঋ দ স এইভাবে অন্তরার ষড়জ লাগানোর কায়দায় কোন যুক্তি পেলাম না। শেষের শুদ্ধ কল্যাণ খেয়াল দুটির বিস্তার পর্বই ভাল লেগেছে, তবে মাঝে মাঝে আরোহণে মধ্যম লেগে যাওয়ায় শোনার আনন্দ নিটোল হতে পারেনি। প ধ প স বিন্যাসের বহুল প্রয়োগ অবশ্য শিল্পীর পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিল। কন্যা কৃষ্ণা হাংগল নিপুণতার সঙ্গে গেয়েছিলেন।

মল্লিকার্জুন মনসুর (১০ই নভেম্বর) শুরু করেছিলেন ললিতা গৌরী রাগে বিলম্বিত খেয়াল দিয়ে। বিস্তারে এক নতুন ধীর স্থির ভাব লক্ষ করলাম। কাজেই শিল্পীর স্বর প্রয়োগের কৌশল, ঝোঁক, ঝটকার উপর দখল ও জটিল সুরের নকশা বোনার ক্ষমতা, সবকিছুই যেন দ্বিগুণ আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছিল।

ললিতা গৌরী ললিত ও পূরবী ঠাটের গৌরীর মিশ্রণে সৃষ্ট। কাজেই ভৈরব ঠাটের গৌরীর বিন্যাস এতে সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। মল্লিকার্জুন মনসুর এই দ্বিতীয়োক্ত গৌরীর ঋ প ও স দ বিন্যাস প্রয়োগ করে আমাদের আশ্চর্য করলেন। এতে রাগের মাধুর্য যেন আরো বেড়ে গেল আর কাজটি যুক্তিসম্মতও বটে—বিন্যাস গৌরীরই, অন্য ঠাটে হলেও। বিস্তার পর্বে উত্তরাঙ্গ কিন্তু বড় বেশী অবহেলিত হয়েছিল। শিল্পী হঠাৎ অন্তরার স লাগিয়ে তানকর্তবে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন। তানকারিতে অবশ্য তাঁর নিজস্ব দক্ষতা ও আলাদিয়া খাঁ ঘরানার আশ্চর্য গতিমা পরিস্ফুট হয়েছিল। দ্রুত খেয়ালটি ছিল জয়েত কল্যাণ রাগে। দুর্বল ধৈবত ও প ধ প স বা কল্যাণ অঙ্গের সাহায্যে রাগটিকে একই স্বরে নির্মিত এবং খুব কাছাকাছি রাগ দেশকারের হাত থেকে রাগটিকে বাঁচানোর নিপুণ কায়দাই ছিল লক্ষণীয় ব্যাপার। বিহারী রাগে বিলম্বিতে ছিল দেশ, ঝিঁঝোটি ও তিলক কামোদের আশ্চর্য মিশ্রণ ও মনমাতানো সূক্ষ্ম স্বরের মায়াজাল। শেষের জলদ নট খেয়ালে ছিল কিছু অপূর্ব দুনিগমকতান।

আমজাদ আলী খাঁ (১০ই নভেম্বর) শুরু করেছিলেন বাগেশ্রী রাগে আলাপ, জোড় ঝালা দিয়ে। সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনে তাঁর এই রাগের বিস্তারপর্বে যে মহত্ত্ব ছিল এবার তা পাওয়া গেল না। সুসম্বদ্ধতার অভাব বড় বেশী ছিল। আর অন্তরার অবরোহী পঞ্চমের সে মজাও ছিল না : মাঝে মাঝে র জ্ঞ ম বিন্যাসও তাঁর ব্যবহার করা উচিত হয়নি। স্বর্গীয় আমীর খাঁ এই বিন্যাস অবশ্য ব্যবহার করতেন তবে এটি কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

জোড়ের গমক, তারপরের ঝালা ও তান-তোড়া অবশ্য ভালই হয়েছিল। বিলম্বিত গৎকারী একঘেয়ে লেগেছে, যদিও কিছু দৌড় ছন্দের কাজ ও তান ভাল হয়েছিল। দ্রুত গতি ঝোঁক ছিল লড়ান্তের ওপর, দ্রুত একতাল গতে অবশ্য যথেষ্ট ভাল তান-তোড়া ছিল। কামোদ রাগে আওচার ও মধ্যদ্রুত গৎ মোটামুটি ভালই হয়েছিল তবে দু-একবার শ্যাম কল্যাণের র ক্ষ প গ ম র স বিন্যাস ব্যবহার করা উচিত হয়নি। আমাকে সবচেয়ে আনন্দ দিয়েছে তিলক কামোদ রাগে বিলম্বিত গৎকারি যাতে ছিল খানদানী র গ স ন্‌ প বিন্যাস। শিল্পী স্বরচিত ভাটিয়ালি বাজিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। নিপুণতার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেছিলেন শঙ্কর ঘোষ।

সম্মেলনের শেষ শিল্পী বিলায়েৎ খাঁ ও তাঁর পুত্র সুজাত খাঁ শুরু করেছিলেন বাগেশ্রী রাগে আলাপ, জোড় ও ঝালা দিয়ে। আলাপ ভালভাবে আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এলোমেলো স্বরপ্রয়োগ ও স্থায়ীবর্ণের অভাবে আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। সুজাত খাঁ মীড় বাজাতে গিয়ে বেসুরো হয়ে পড়ছিলেন। জোড়ের তান তেড়া ও ঠোক ঝালা মোটামুটি ভাল হয়েছিল। দ্রুত গৎ মন্দ না হলেও বিলায়েৎ খাঁর পক্ষে যথেষ্ট ভাল হয়নি। অবশ্য শেষের ভৈরবী আওচার ও দাদরার বিষয়ে ওই মন্তব্য করা যায় না। আসলাম খাঁর তবলা সঙ্গত নিষ্প্রাণ ও কর্কশ লেগেছিল।

শেষ দিনের প্রথমার্ধে মারুবেহাগ, কলাবতি ও আড়ানা গেয়ে শুনিয়েছিলেন তেজপাল সিং ও সুরিন্দর সিং। এঁদের বিস্তার সুসম্বদ্ধ ও চিন্তাশীল [illegible] কিছু, কিছু তান ঠিক শ্রুতিমধুর [illegible]। সংযুক্তা পানিগ্রাহির নৃত্যাতে [illegible]র স্বাভাবিক সাবলীলতা ও দক্ষতা ছিল। **—নীলাক্ষ গুপ্ত**

সেই নিঠুর দরদী

আকাশবাণী বা রেকর্ডে আপাতত অতুলপ্রসাদের গান শোনা যায়, নচেৎ আমাদের এই সংস্কৃতিগর্বী শহরে সেই প্রবাসী পাখির 'কাকলি' বিস্ময়করভাবে অশ্রুত থাকে। 'গীতিগুচ্ছ' সংগীত শিক্ষায়তনের উদ্যোগে সে কারণেই অতুল-প্রসাদের পঞ্চাধিকশত জন্মবার্ষিক অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য হতে পারে। ২৪ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় কালীপুজোর বিসর্জনের সশব্দ অনুবৃত্তি চলেছে, তিথিটি ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার। অতুলপ্রসাদের ভাগ্য, অতএব, যথারীতি প্রতিকূল। ছোট সভাগৃহে শ্

থানেক শ্রোতার সমাগমে অনুষ্ঠানে একটা ঘরোয়া আমেজ ছিল। তার চেয়েও বলা যাক, অতিরিক্ত মাত্রায় বৈঠকী হয়েছিল অর্থাৎ কথাবার্তা আর চলাফেরায় গানের আসরটা কিছু বিধ্বস্ত হয়েছিল।

'আমারে এ আঁধারে' সম্মেলক গান দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। সভাপতি সন্তোষকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বললেন, তিনি বলে রাখলেন যে, এই আসরে রবীন্দ্রনাথের আর অতুলপ্রসাদের গানের দ্বিবেণী রচিত হবে। এই শর্ত পালনে হয়ত শিল্পীরা স্বস্তি পেলেন, কেমনা যথারীতি রবীন্দ্রনাথের গানই বেশি পরিবেশিত হল। এখানে বলে রাখি, রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা অতুলপ্রসাদের প্রিয় যে দুটি রবীন্দ্র-সংগীতের কথা শুনেছি—সেই দুটি গানই অগীত থাকল। অমিত ঘোষ রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেন; ভণিতা উচ্চাকিত এবং ভংগীটি নাটকীয়।

গীতানুষ্ঠানে মহাশ্বেতা ঘোষের কণ্ঠটি অপরিচ্ছন্ন ছিল—সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান না জমলেও অতুলপ্রসাদের গান তাঁর গীতভঙ্গীতে বেশ উৎরেছে। হিমঘ্ন রায়চৌধুরীর কণ্ঠস্বর হয়ত মনোরম নয় কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানের চরিত্র তিনি নিপুণভাবে ধরতে পারেন। একটি প্রশ্ন থাকে : ঝিঁঝিট-খাম্বাজের 'আমারে ভেঙে ভেঙে' গানটি কি বেশি কীর্তনঘেঁষা হয়ে যায়নি? শিখা বসুর কণ্ঠটি বড় চাপা, তাই ছোট হল-ঘরেও 'কে যেন আমারে' গানের জমাটি ভাব স্তিমিত হয়ে গেল। সুমিত্রা বসু শুধুই রবীন্দ্রনাথের গান করলেন—দুটোই এক রাগের, শ্রী-অংগের, আর দেখাতে পারলেন কঠিন গানের ছোটখাট মীড়ের কাজ এখনও রপ্ত করতে পারেননি। রনো গুহঠাকুরতার গলার আওয়াজটি শোভনীয়। রবীন্দ্রনাথের 'কে জানিত তুমি' গানটির নির্বাচনও সঠিক, কেমনা সাহানা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত এই গানে অতুলপ্রসাদী ঘরানার স্পর্শ রয়েছে: কবির আরেকটি গান 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে' পরিবেশযোগ্য। কিন্তু তাঁর গাওয়া 'তুমি অবসর যদি' গানটি অতুলপ্রসাদ রচিত বা সুরযোজিত কিনা সে বিষয়ে [illegible] সন্দেহ [illegible] সিংহের কণ্ঠে [illegible] আছে, [illegible] তাঁর গানে অতুলপ্রসাদের গানের একটা পুরনো ধাঁচের মেজাজ পাওয়া যায়। সুশীল চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ আর ভঙ্গী বড় সুরমী, অতুলপ্রসাদের গান সেখানে [illegible]। নগেন্দ্র মুক্তির থেকে সংগীত আরেকটু কম হলে ভাল হত. উল্লেখযোগ্য অকারণেই হিরণ্য রায়চৌধুরীর মন্দিরাবাদ্য।

সম্মেলক কণ্ঠে সমাপ্তি সংগীত ছিল 'তব [illegible] সদা।' গানটি জৌনপুরীতে গ্রথিত; সকালের সুর। এই জৌনপুরীকে ধূর্জটিপ্রসাদ চমৎকার বলেছিলেন 'দিনের আলোর দরবারী'। স্বভাবতই, সন্ধ্যাবেলায় আর সম্মেলক কণ্ঠে এই গানটির পরিবেশনে তার কথা সুর ভাবের রসহানি ঘটেছে। সকলের ব্যস্ততার ফলে সাহানা দেবীর টেপধৃত গান শোনা হল না। এ-বিষয়টিও বিষাদের।

—অপ্রতিম বসু

রেকর্ড

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গান

বাংলার সংগীতে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবদান কতখানি তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু তাঁর বিরাট প্রতিভার পরিচয় এ যুগের শ্রোতৃসাধারণ লাভ করেননি বললে অত্যুক্তি হবে না। সম্প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানী (এইচ এম ভি) শ্রীবিমান ঘোষের প্রযোজনায় এলপি রেকর্ডে (ECSD 2535 Stereo) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পোনেরোটি সুনির্বাচিত গান প্রকাশ করে দেশবাসীর বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সংগীত নির্দেশনা করেছেন শ্রীসুভাষ চৌধুরী, যন্ত্রানুষংগ পরিচালনায় ছিলেন শ্রীশুভংকর মিত্র এবং শব্দগ্রহণ করেছেন শ্রীসমীর মজুমদার। এঁদের সকলের প্রচেষ্টাই উত্তমরূপে সার্থক হয়েছে। পাঁচটি সম্মেলক গান করেছেন ইন্দিরা শিল্পিগোষ্ঠী এবং এর প্রত্যেকটিই সুগীত। বিশেষ করে 'চল রে চল সব ভারত সন্তান' গানটি গম্ভীরভাবে সার্থক হয়েছে। একক গানের মধ্যে প্রত্যেকটিই সুগীত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ভি ভি ওয়াঝলওয়ার, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতু গুহ, অর্ঘ্য সেন, প্রসূন দাশগুপ্ত, সুপূর্ণা চৌধুরী এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি অপ্রচলিত সুরের পরিচয় এই গানগুলি থেকে পাওয়া যাবে। যথা, সিন্ধুবিজয়, ধোরিয়া (ধুরিয়ান?) এবং দেওনট। তালের দিক থেকেও চৌতাল, আড়াঠেকা, তেওরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি বিচিত্র ছন্দের পরিচয় পাওয়া যাবে। দুটি সম্মেলক গানে তালফেরতার প্রয়োগ উপভোগ্য। বিভিন্ন ধরনের দিক থেকে ব্রহ্মসংগীত, প্রেমের গান ও হাসির গান এই রেকর্ডটিকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক পরিচয় এই উল্লেখযোগ্য রেকর্ডটিই বহন করে—এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি বাহুল্য হবে। এই ক্লাসিক্যাল সংগীত সংযোজনের জন্য রেকর্ডটির বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

—রাজেশ্বর মিত্র

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাসুদেব রায়(?)
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮৩
২৩-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায়, সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন আফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

অরণ্যদেব শিকার করতে বেরিয়েছেন
ধরব!

শিকার মানে হত্যা করা নয়, বন্দী করা।
কাছে যাসনে ডেভিল।

সারাদিন পরিশ্রমের পর।
কী খবর?
ভাল।

এবারে চলেছেন খুলি-গুহায়।
পৌঁছে দেব?
না, মিস টোগারা, কিছুক্ষণ বাদে।
4/18

1534 1619
1700
গুহার মধ্যে অরণ্যদেব।

ঐশ্বর্যের ঘর পার হয়ে গেলেন

যেখানে চারশো বছরের ইতিহাস থরে থরে সাজানো রয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস দেখতে দেখতে...
সে কী. সম্রাট জুনকর ক্রীতদাস? ভাবা যায়?
১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ রথীন মৈত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ "জাগরণ" (৩০½"×২০" তৈলচিত্র)–রূপবন্ধের সারল্য এই ছবির বিশেষত্ব। কালো আকাশে শীতল শুভ্র চাঁদ। একপাশে কতগুলো ত্রিভুজ—যেন পরিচিতের কল্পমায়া। উড়ে চলে ভোরের পাখি। ধূসর আর হলুদ বর্ণের দ্যোতনা। আর ওড়ার গতিময়তা স্পষ্ট করার জন্যে পাখির গলা দীর্ঘায়িত করেছেন রথীন। পাখির নীল চোখে নীলিমার ছায়া যেন। রচনার বৈশিষ্ট্য হলো নানা আকারের সকল কিছুর মধ্যে ভারসাম্য।

সুদেব রায়চৌধুরীর

মা টেরেসা সম্পর্কিত
ভারতীয় ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ

মা টেরেসা

দাম ১০·০০

ভালোবাসা আর সেবার মূর্তিময়ী প্রতিমা মা টেরেসা। যেখানেই—পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তেই—আর্ত অসহায় মানুষের চোখের জলে ধরণী সিক্ত হচ্ছে, সেখানেই—তা সে ভিয়েতনামই হোক, হোক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড, ভেনিজুয়েলা, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, ইতালি, মাল্টা, ভারতবর্ষ, অথবা পৃথিবীর যে-কোনও দেশ—ছেষট্টি বছরের লোলচর্মা এই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী জগন্মাতার মতো দু' চোখে অপার মমতা আর বুকে অসীম ভালোবাসা নিয়ে সেবার হাত দুটি বাড়িয়ে তাঁর স্নেহময় কোলে আশ্রয় দিয়ে চলেছেন জাত ধর্ম

প্রকাশিত হল

সম্প্রদায় নির্বিশেষে সেইসব পীড়িত নিরাশ্রয় লক্ষ লক্ষ দুঃখী মানুষকে। যীশুর পায়ে নিবেদিতপ্রাণা এই করুণাময়ীর কাছে তাঁর পরমারাধ্য যীশু আর পরিত্যক্ত অনাথ শিশু, নির্বান্ধব কুষ্ঠরোগী, মৃতপ্রায় নিরাশ্রয় মানুষ, পঙ্গু অক্ষম অসহায় মানবাত্মা এক হয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর যীশুকে। তাঁর 'মিশনারিস অব চ্যারিটিজ' সেই বিবস্ত্র ক্ষুধার্ত যীশুদেরই ভালোবেসে সেবা করে চলেছে আজ পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তে—সকল দেশে।

গ্রন্থপ্রকাশ এবং প্রায় ত্রিশটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মাধ্যমে বিশ্বের বহু দেশ এই মমতাময়ী লোকমাতাকে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধন্য হয়েছে। এখন, বাংলা ভাষায়, এবং সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায়ও, একই সঙ্গে তাঁর 'লীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'কথামৃত',—না, তাঁর জীবনচরিত নয়,—প্রকাশ করে ধন্য হলাম আমরা—বাংলা দেশের মানুষরা; যে বাংলাকে—বাংলার হৃৎপিণ্ড কলকাতাকে—সুদূর ইউরোপের অধিবাসিনী হয়েও, বেছে নিয়েছেন মা টেরেসা তাঁর বিশ্বজোড়া কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে॥

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস
বাসবদত্তা ৪·০০

সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুবাদ-উপন্যাস
প্রেম ৫·০০

বুদ্ধদেব বসুর নাটক
পুনর্মিলন ৪·০০

সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস
জল দাও ৩·৫০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস
যাও পাখি ২৫·০০

মতি নন্দীর উপন্যাস
স্টপার ১০·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন কবিতা-সংকলন

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বিমল করের
মজার কিশোর-উপন্যাস

দ্বিতীয় মু[illegible]
প্রকাশিত হল

ওআণ্ডার মামা ৬·০০

প্র কা শি ত হ ল

পর পর তিন বছর শারদীয় 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার'-এ তিনখানি অসামান্য উপন্যাস লিখলেন রমাপদ চৌধুরী। 'খারিজ' 'লজ্জা' এবং তারপর এই 'হৃদয়'। 'খারিজ' বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল, 'হৃদয়' রাতারাতি সমগ্র পাঠক-সমাজের হৃদয় জয় করে নিয়েছে প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। হার্দিক আবেদনের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত মননের এমন সুসমঞ্জস সমন্বয় বুঝি বা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। বিশুদ্ধ শিল্পকর্মের যাদু-দণ্ড স্পর্শে আপাত-তুচ্ছ সাধারণ বিষয়কে মুহূর্তে অসাধারণ করে তোলার কৃতিত্বে সম্ভবত রমাপদ চৌধুরী অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্ট্রোক—একটি ছোট্ট শব্দ, একটি অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেই যেন সমস্ত সমাজের চেতনা আলোড়িত হয়ে উঠেছে এ উপন্যাসে। একটি কৃত্রিম যন্ত্রের পেস-মেকার লাগিয়ে হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকে আওয়াজটা টিঁকিয়ে রেখে লেখক যেন সমস্ত সমাজের কৃত্রিমতাকেই চোখের সামনে মেলে ধরেছেন। অথচ পাঠকের মনকে পৌঁছে দিয়েছেন তুলনারহিত গভীরতায়। 'খারিজ', 'লজ্জা' এবং 'হৃদয়'—যেন তিনটি পর্বে সম্পূর্ণ মধ্যবিত্ত তথা শহর কলকাতার জীবনসঙ্গীত॥ দাম ৬.০০॥

রমাপদ চৌধুরীর

সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং
সম্পূর্ণ নতুন উপন্যাস

হৃদয়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৮

শনিবার ৩ পৌষ ১৩৮৩

'আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু'

জাতীয় স্বাস্থ্যের মান উন্নত করবার কর্তব্য দেশের সরকার অস্বীকার করেন নি। শহরের জীবনে স্বাস্থ্যের নানা সমস্যার কথা সরকারী চিন্তার আসরে আলোচিত হতে শোনা যায়। গ্রামীণ স্বাস্থ্যের কথাও কম মুখর নয়। যদি জাতির সাংস্কৃতিক যোগ্যতার মহত্তর প্রকাশ আশা করতে হয়, যদি জাতির জীবনে মানবীয় মমতার সৌন্দর্য সার্থক প্রকারে বিকশিত করতে হয়, যদি জাতিকে দৈহিক কর্মিষ্ঠতার সম্বল ষোল-আনা প্রকারে লাভ করতে হয়, তবে জনস্বাস্থ্যের মান উন্নত না করে উপায় নেই। জনস্বাস্থ্য, সহজ ও সরল এই কথাটি বস্তুত জাতীয় অস্তিত্ব এবং প্রাণসত্তার একটি অমোঘ প্রয়োজনের পরিচয় বহন করে।

এখন প্রশ্ন, আমাদের স্বাধীন ভারতের জাতিক জীবনে জনস্বাস্থ্যের মান কতটা উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে ? একথা অবশ্য সত্য নয় যে, ইংরাজের সাম্রাজ্যিক মমতার অনুগত ভারতীয় স্বাস্থ্যদশার তুলনায় স্বাধীন ভারতের স্বাস্থ্যদশা অবনত হয়েছে। বিদেশের সংবাদপত্রে এই মর্মের প্রচার নিতান্ত গর্হিত এবং ভারতবিদ্বেষের উদ্গার, নিতান্ত এক মিথ্যার প্রচার। বরং বাস্তব তথ্য ও প্রমাণের উপর নির্ভর করে অনায়াসে এমন ধারণা করা যায় যে, ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্য রাজনীতিক অধীনতাকালীন নিম্নমানের দশা থেকে বেশ উন্নত দশায় উপনীত হতে পেরেছে।

কিন্তু এই সত্যও উপলব্ধি করতে হয় যে, এই উন্নতি আকারে প্রকারে ও পরিমাণে জাতীয় জীবনের একটি রূপগত বলিষ্ঠতার সুস্পষ্ট অভ্যুত্থান বলে কথিত হতে পারে না। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সেটা বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে আশ্রিত। সার্বিক ও সাধারণ উন্নতি বলে অভিহিত হতে পারে, এমনতর কৃতিত্ব ভারতের এই ত্রিশ বছরের আত্মনির্ভর জাতীয় আচরণে সফল রূপে প্রতিচ্ছবিত হয়েছে বলে মনে করা যায় না। জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নয়নের পদ্ধতিটা সার্বিক প্রয়োজনের অনুগত কোন কৃতিত্ব প্রদর্শিত করতে পারেনি, যদিও নানা বিভিন্ন সীমায়িত আয়তনের সংক্ষিপ্ত পরিবেশের মধ্যে স্বাস্থ্যের সুপ্রতিষ্ঠার সকল প্রয়াস বিশেষ প্রকারে সফল হয়েছে। যেমন, প্রতিরক্ষার বিপুলসংখ্যক কর্মী ও সৈনিক সমাজের স্বাস্থ্যগত মান আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে। কোন-কোন খনি-অঞ্চলে বা নতুন শিল্প-অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য বিশেষ উদ্যমের গুণে ও প্রভাবে অল্পকালের মধ্যে উন্নত হয়েছে। সবই সত্য। কিন্তু একথা মেনে নেবার মতো এবং জাতি হিসাবে আশ্বস্ত হবার মতো সফলতা ও কৃতিত্বের বাস্তব সত্যতার কোন হিসাব পাওয়া যায় না যে, আজিকার সাধারণ ভারতীয় মানুষটি কবির আকাঙ্ক্ষিত সেই সম্বল লাভ করে ফেলেছে—আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। উন্নতমানের জনস্বাস্থ্য 'আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু'র সবচেয়ে বড় অঙ্গীকার। বিশেষজ্ঞের হিসাব নানা অঙ্কের সমাবেশ ঘটিয়ে এ সত্য প্রমাণিত করে দিয়েছে যে, ভারতীয় ব্যক্তির গড়পড়তা আয়ুর কালপরিমাণ বেড়েছে। 'গড়পড়তা' নামক কথাটা অনেক ক্ষেত্রে যথার্থ এবং বাস্তব অবস্থার পরিচয় চাপা দিয়ে অদ্ভুত রকমের ছলনাকর একটি পরিচয় বিজ্ঞাপিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং 'গড়পড়তা' হিসাবের গুরুত্বকে একেবারে লঘু করে না দেখলেও খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখবার প্রয়োজন হয় না।

মহাত্মা গান্ধী ভারতের গ্রামীণ জনজীবনের স্বাস্থ্যগত দুর্দশার প্রতিকার সম্বন্ধে তাঁর যে-সব চিন্তা ও ধারণার কথা বলেছেন, সেটা এক মানবতাবাদীর মহান্ অন্তরের মমতার প্রকাশ বটে, কিন্তু মহান্ এক গবেষণারও পরিচয়। গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের জাতীয় ভাগ্যের সমূহ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হলো, জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নয়ন। সার্বিক উন্নয়ন। গ্রাম ও শহরের দীনতম ব্যক্তিটিরও স্বাস্থ্যসংগত 'আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু'র জীবন চাই। তিনি বিদেশী ও স্বদেশী তথ্য-বিশেষজ্ঞের সহযোগিতায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ভারতের গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষ যদি তাদের পানীয় জল ফুটিয়ে নেয়, তবে তাদের কর্মশক্তি দ্বিগুণিত হবে এবং ভারতীয় কৃষকের এই দ্বিগুণিত কর্মিষ্ঠতার সহজ স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষ সুফল হিসাবে ভারতীয় কৃষির উৎপাদিত বার্ষিক শস্যের পরিমাণও দ্বিগুণিত হবে। এই হিসাবের মধ্যে সহজ অতিশয়োক্তি আছে বলে অনেকে সংশয় প্রকাশ করতে পারেন। যদি অতিশয়োক্তির মান অর্ধেক খণ্ডিত করে দেওয়াও হয়, তবে দেখা যাবে যে, ভারতীয় কৃষিবল এবং শস্যের পরিমাণবৃদ্ধি সামান্য হবে না। আরও বলা চলে, যদি শুধু এক বিশুদ্ধ জল পান করবার অভ্যাস জাতীয় কর্মিষ্ঠতার মান এতটা উন্নত করে অর্থনীতিক সম্বল লাভ করবার এতটা যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারে তবে সুপ্রশস্ত স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্য-প্রকল্পের কল্যাণ সর্বজনীন প্রয়োজনে সুলভ হলে জাতীয় কর্মশক্তির কী বিপুল অভ্যুদয় সম্ভাবিত হবে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। জাতির স্বাস্থ্যগত এই উন্নতি যে জাতির সাংস্কৃতিক যোগ্যতার এবং চারিত্র্য ও প্রতিভার এক নূতন অভ্যুদয়ের প্রতিশ্রুতি সেটাও সামাজিক জীবনের একটি অভিজ্ঞাত সত্যের নিয়ম বলে মেনে নেওয়া যায়। সংস্কৃতিতত্ত্বের গবেষক আর-একটি সত্যের পরিচয় বিজ্ঞাপিত করবেন। মানুষের কায়িক সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় অবলম্বন বলে স্বীকৃত হয় যে সৌষ্ঠব, সেটা স্বাস্থ্যেরই প্রত্যক্ষ সৃষ্টি। এবং সেই জাতিই সুন্দরদেহী বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে, যার সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যদশা গুণে ও মানে যথার্থ উন্নত।

বৈদেশিকী

ধাপে ধাপে

বাংলাদেশে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ যে রাজনৈতিক পালা শুরু হয়েছে তা এখনও সারা হয়নি। মুজিব আর তাঁর প্রধান অনুগামীদের নৃশংসভাবে খুন করে সেদিন পালা বদল ঘটানো হয়েছিল। যাঁরা সেই জঘন্য কাজ নিজের হাতে করেছিলেন বাংলাদেশের সেই ক্ষুদে অফিসাররা কিন্তু ক্ষমতা কব্জা করতে পারেননি। তবে তাঁদের অনেককেই অনুগ্রহ করেছেন বাংলাদেশের সরকার। বিদেশে আরামে সরকারী চাকরি করছেন মেজর ডালিম আর ক্যাপটেন মাজেদ [illegible] নয় তাঁদের অনেক সাঙ্গোপাঙ্গও। ফাঁকে পড়েছিলেন করনেল ফারুক রহমান আর খোন্দকার মুস্তাক আহমদের ভাগ্নে আবদুল রসিদ। পরে তাঁদেরও হিল্লে হয়েছে। মুজিব খুন হবার পর ঢাকার মসনদে বসেছিলেন তাঁরই ঘনিষ্ঠ সহযোগী খোন্দকার মুস্তাক আহমদ। খুনী ফৌজী অফিসাররা বলে তাদের তিনি পেছন থেকে মদত দিয়েছিলেন যদিও কথাটা তিনি অস্বীকার করেছেন। তবে দেশের মাথা হবার সুখ তাঁর বেশী দিন সয়নি। প্রধান বিচারপতি আবু সায়েমের হাতে রাজ্যপাট সঁপে দিয়ে তাঁকে চলে যেতে হলো পর্দার আড়ালে।

তিনি বোধ হয় মতলব ভেঁজেছিলেন ডামাডোল চুকলে তিনি আবার গদিয়ান হয়ে বসবেন ঢাকায়—আর এবার ঢুকবেন খিড়কি দিয়ে রক্তমাখা পথ বেয়ে নয়, সোজাসুজি সদর দরজা দিয়ে বুক ফুলিয়ে নির্বাচনে জিতে। বঙ্গবন্ধুর বিরোধীরা তাঁকে সদলবলে খুন করলেও বাংলাদেশের সংবিধান বাতিল করে দেননি। অবিশ্যি তা পুরোপুরি মেনে তাঁদের গড়া সরকার চলছিলো না। কিন্তু ইচ্ছে করলে নির্বাচন করতে কোনো আইনের বাধা ছিল না। রাষ্ট্রপতি থাকতে খোন্দকার সাহেব কবুল করেছিলেন বাংলাদেশে খুব শীগগিরই সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা হবে। ছিয়াত্তরেই সে নির্বাচন হবে এমন আভাসও দেওয়া হয়েছিল। খোন্দকার সাহেব গদি হারাবার পর নতুন রাষ্ট্রপতি সায়েমও একই সুরে কথা বলছিলেন। নির্বাচনের অঙ্গীকার নতুন করে শুধু দেননি তার তোড়জোড়ও শুরু করেছিলেন। ভোটের লড়াইয়ে পাল্লা দেবার জন্যে নতুন করে সতেরোটা বাছাই করা রাজনৈতিক দলকে জিইয়ে তোলা হলো। মুজিবের বাকশালকে কিন্তু কবরে মাটি চাপা দেওয়া হলো চিরদিনের জন্যে।

নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়লেও সব দল সমান উৎসাহে নেচে ওঠেনি। অনেকেই ধুয়ো তুলেছিল নির্বাচন বন্ধ রাখার। তাদের চাঁই মৌলানা ভাসানির ন্যাপ। মৌলানা নিজেই জোর গলায় বলেছিলেন নির্বাচনের সময় এ নয়। তিনি মারা যাবার পর দশটা দল মিলে যে শোকসভা করে তাতে তারা নির্বাচন বন্ধ রাখার দাবি তোলে। সরকার শেষ পর্যন্ত সে দিকেই ঢললেন—নির্বাচন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। রাষ্ট্রপতি সায়েম এক সরকারী ঘোষণায় জানালেন নির্বাচন বরবাদ করার মতলব সরকারের নেই বটে, তবে আপাতত তা মুলতবি রাখা হলো। তাঁর মতে দেশের লোক তাড়াহুড়ো নির্বাচন চায় না। এও তিনি বললেন ঘরে বাইরে অবস্থাটা ঠিক নির্বাচনের উপযোগী নয়—এক তো দেশের মধ্যে অশান্তি লেগেই আছে তার ওপর রয়েছে সীমান্তের গণ্ডগোল আর ফরাক্কা সমস্যা। বাংলাদেশের ভেতরে গণ্ডগোল চলছে, কিন্তু সীমান্ত কিংবা ফরাক্কা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নির্বাচন মুলতুবি রাখার এসব ওজর ছাড়া কিছু নয়।

আসলে যাঁদের হাতে বাংলাদেশের ক্ষমতা তাঁরা নির্বাচন চান না। নাটের গুরু হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি সায়েম নন, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি এই সেদিনও ছিলেন খোন্দকার মুস্তাক আহমদের পেয়ারের লোক। ডালিম-ফারুকের চক্রান্তের পেছনে তিনিও ছিলেন বলে লোকের সন্দেহ। খোন্দকার সাহেব মসনদে বসেই তাঁকে সেনাবাহিনীর প্রধান করে দিয়েছিলেন জেনারেল সফিউল্লাকে সরিয়ে। খালেদ মোশারফ পালটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করলে জিয়াউর রহমানকেও দিন কয়েকের জন্যে বিদেয় নিতে হয়। খালেদ খুন হলে আবার যে কে সেই—এবার জাঁকিয়ে বসলেন ফৌজী প্রধানের গদিতে জিয়াউর রহমান। এর পর আরম্ভ হলো তাঁর ধাপে ধাপে ওপরে ওঠার পালা। জঙ্গী আইন দেশে চালু হলে তিনি হলেন তিনজন ডেপুটি মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের একজন—অন্য দুজন হলেন এয়ার মার্শাল গফফর মামুদ আর নৌবাহিনীর বড়কর্তা এম এইচ রহমান। রাষ্ট্রপতি আবু সায়েম হলেন চীফ মার্শাল ল' অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অর্থাৎ মুখ্য সামরিক প্রশাসক।

ক্ষমতার কলকাঠিটি ছিল কিন্তু মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের হাতেই। সেটি তিনি নেড়েছেন ২৯ নভেম্বর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজমূর্তি ধরেছেন—সেদিন তিনি বনে গেলেন বাংলাদেশের মুখ্য সামরিক প্রশাসক। আবু সায়েমই অবিশ্যি রাষ্ট্রপতি রইলেন, কিন্তু নাম কা ওয়াস্তে। জিয়াই যে এখন বাংলাদেশের ভাগ্যবিধাতা তা তিনি প্রমাণ করেছেন ইদুজ্জোহার দিন জাতের উদ্দেশে বেতারে ভাষণ দিয়ে। কেন রদবদল করা হয়েছে তার কোনো কৈফিয়ত দেননি, কিন্তু লোককে মালুম করাতে চেয়েছেন দেশের সর্বেসর্বা এখন তিনিই। বাংলাদেশের সংবিধান বরবাদ তিনি করেননি, করার ইঙ্গিতও দেননি—কিন্তু সে সংবিধানের ভিত যে চারটে নীতি—জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র—তা তিনি বেমালুম চেপে গিয়েছেন। গণতন্ত্রী তিনি নন। সমাজতন্ত্রেও তাঁর বিশ্বাস নেই। জাতীয়তাবাদে হয়তো আছে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা? সে আদর্শ থেকে তিনি কী দেশকে সরিয়ে আনতে চাইছেন?

ক্ষমতা হাতে নেবার আগে ঢাকায় খুনোখুনি তাঁকে করতে হয়নি। কিন্তু জনকয়েক নেতাকে তিনি গারদে পুরেছেন। যাঁদের মধ্যে আছেন তাঁর পয়লা মুরুব্বি খোন্দকার মুস্তাক আহমেদও। পাঁচমিশেলী লোক নিয়ে খোন্দকার সাহেব যে গণতন্ত্রী লীগ বানিয়েছেন ভোটাভুটি মুলতুবি রাখার পক্ষপাতী তারা নয়। ও'কে [illegible]ার করা হয়েছে মনে হচ্ছে নির্বাচন চাওয়ার অপরাধেই। নির্বাচন যাঁরা চান তাঁরা কেউই প্রায় রেহাই পাননি দু-একজন যাঁরা জিয়াউর রহমানের বিচারে চুনোপুঁটি তাঁরা ছাড়া। বাংলাদেশে যাতে নির্বাচনের ধুয়ো না ওঠে তার জন্যেই জোর ধরপাকড় করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সরকারী তরফ থেকে খোলাখুলি কিছু না বলা হলেও আভাস দেওয়া হয়েছে যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁরা সবাই দেশদ্রোহী, কেউ কেউ আবার দুর্নীতিবাজও। তবে জিয়ার আসল খুঁটি হচ্ছে ফৌজ। ফৌজীরা এখন মোটামুটি তাঁরই দিকে। সেই ভরসাতেই তিনি মুখ্য সামরিক প্রশাসক বনে আঘাত হেনেছেন তাঁর বিরোধীদের ওপর নভেম্বরের শেষাশেষি।

দেবরাজ

নানাবিধ কংস

বিষ্ণু দে

এ ভূখণ্ডে শিলা-মাটি তৃষিত ঊষর,
বর্ষা বুঝি প্রায় নেই।
অন্তত এবারে বুঝি যৎসামান্যই—
এ অঞ্চলে ধনধান্য প্রায়শই প্রাচুর্যবিহীন,
মাটিও গৈরিক রিক্ত।

বর্ষা প্রায় বুঝি নেই, সব উবে যায়।
বিশেষজ্ঞ স্থানীয় লোকেরা বলে :
খাদ্যাভাব অবশ্যম্ভাবীই—
যদিও বেশ কিছুকাল ধরে চাষপ্রথা উন্নতই,
শ্রমশক্তি সমাজ কিছুটা জাগ্রতই।

কিন্তু এরই মধ্যে শারদীয় আলোকের আভা—
স্ফটিক ও নীলা আর গেরি।
অবশ্য এখনও হাওয়া থেকে থেকে পুবালিই,
মাঝে মাঝে সাদা লঘু মেঘ নীলাকাশে
পশ্চিমের হাওয়া আর স্বচ্ছ শ্বেত মেঘে ভাসে।

হয়তো বা এখানে সৌভাগ্য কম, মাটিও কৃপণ।
হয়তো বা অন্যত্র সৌভাগ্য বেশী প্রাচুর্য-প্রত্যাশে,
তবুও এখানে আলো স্বচ্ছশুচি পাহাড়ে আকাশে।
অথচ শ্রেণীর শুচিতাও নেই, উত্তরণ শুধু উত্তরণ!
সাজগোজ চায়—অবশ্য সবাই নয়, তবে কিনা অনেকেই—

অর্ধজ্ঞান সিকিবিজ্ঞ নবীনের বংশ!
সততই ক্ষীণপ্রায়, নিদেন তা মিশ্র, খিন্ন।
গ্রামীণ ভূখণ্ডে তাই গ্রাম্যতাও আজ ছিন্নভিন্ন,
বর্ষা প্রায় সততায় বুঝি আর নেই।
অধিকাংশ মনেপ্রাণে নানাবিধ কংস॥

স্বজন বিদ্রোহ

যোগব্রত চক্রবর্তী

সম্মুখে তাকাও পার্থ,
দেখ স্বজন বিদ্রোহ
সারি সারি উদ্যত কৃপাণ তীক্ষ্ণ তীর
সমুদ্যত সব তোমা প্রতি।
এখনও তোমার ক্লৈব্য স্থবির গাণ্ডীব
মুহ্যমান শোক, হাহাকার...
কে তোমার জন্মদাতা...?
কার রক্ত তোমার শিরায়
মাতৃ জঠর তুমি ঠিক চিনেছিলে।
কিন্তু রক্ত...
সম্মুখে তাকাও পার্থ, তোল গাণ্ডীব টংকার
স্বজনের প্রতি সদয়তা পাপ
যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত
[illegible] গীতায় পার্থ এর কোন বিকল্প রাখিনি।

জাগ্রত

(নজরুল ইসলাম স্মরণে)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কে কোন্‌খানে ঘুমোন সেটা
একেবারেই গৌণ
দেখব তিনি কোথায় জেগে
কোথায় নন মৌন

কোথায় ভাঙেন শিকল, বাঁধেন
ভাইয়ের হাতে রাখী
মনের কথা মুখে আনতে
করেন পরোয়া কি

তিনি কোথায় ঘুমোন সেটা
আমার চোখে বাহ্য
কোথায় জেগে আছেন তাই
একমাত্র গ্রাহ্য

গুণীকে দেয় মালা কোথায়
খুনীকে দেয় সাজা
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে
তাকেই করে রাজা

কে কোন্‌খানে ঘুমোন সেটা
করি না আমি গণ্য
খুঁজব তিনি জেগে আছেন
কোথায় কিসের জন্য

কোথায় তিনি শান্তির রথ
সাজান ময়ূরপঙ্খে
ঝড়ের বেগে গড়েন দেশ
ফুঁ দেন মুক্তিশঙ্খে

তিনি কোথায় ঘুমোন সেটা
আমার কাছে গৌণ
দেখব কোথায় আছেন জেগে
কোথায় নন মৌন॥

আনান্য

বটকৃষ্ণ দে

সমুদ্রের দিকে দ্যাখো : অপার সবুজ ঢেউ
বড় ভালো, কিন্তু অবগাহন করতে চেয়ো না!
কৃষ্ণচূড়ার দিকে চাও, স্পর্শ কোরো না
শুধু রক্তিম চন্দনগন্ধ নাও, দূর থেকে।
আকাশে নিবন্ধ দৃষ্টি, মেঘে রঙ, কত মুখচ্ছবি—
নীলের দিগন্ত জোড়া, কিন্তু আকাশে উড়ো না!
যদি ওড়ো, শুধু শূন্য, শূন্যতায় লীন!
তোমাকে দেখব আমি, ঘুমোলে,—অন্য জানালা থেকে
দূরের দরোজা দিয়ে—
ছোঁব না, তোমার শরীর না, মুখ না, চোখ বুক,
কিছুই না!
এরা সব তুমি নও, তুমি ভিন্ন, অন্য ও অনন্য॥

এক নজরে

হাবু ফিরে আয়

আপনিই তো কাগজের এডিটার সুদর্শনবাবু? দোরগোড়া থেকে এই প্রশ্নটি নিক্ষেপ করলেন বছর পঞ্চাশ বয়সের [illegible]ক ভদ্রলোক। বললাম, এক সময় ছিলাম। এখন শুধুই সুদর্শনবাবু। সে যাই হোক, বলুন, আপনার কি কাজে লাগতে পারি? ভদ্রলোক ভিতরে এলেন। পিছন পিছন এলেন এক তরুণী। এবার কথা বললেন তিনিই। বললেন, আপনার কাছে একটু সাহায্য চাইতে এসেছি। আমার নাম চামেলী, আমি একজন শিক্ষিকা। আমার ভাই চঞ্চলকে পাওয়া যাচ্ছে না কাল সকাল থেকে। পুজোর ছুটির পর কালই স্কুল খুলেছে। চান করে খেয়ে স্কুল যাচ্ছি বলে বেরিয়েছে, তারপর আর ফেরেনি। পুরো একটা দিন হয়ে গেল। মা আছেন, ভীষণ কান্নাকাটি করছেন তিনি। আপনি দয়া করে কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন খোঁজ খবরের? এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি বিমর্ষ মুখে। সঙ্গের ভদ্রলোকটি বললেন, ওরা থাকে যাদবপুর বাঘা যতীনে। আমার ভাগনে ভাগনী। আমি পূর্ব রেলে কাজ করি, থাকি বারুইপুরে। খবর পেয়ে ছুটে এসেছি। আমিই নিয়ে এলাম ওকে আপনার কাছে, এই দেখুন সেই ছেলের ছবি। মাত্র বিজয়ার দিনে তোলা। দেখলাম পরনে প্যান্ট, গায়ে হাতকাটা শার্ট, পায়ে চপ্পল, বছর ষোল বয়সের একটি কিশোর। চেহারাটা একটু ঢ্যাঙার দিকে, তবে মুখচোখ বেশ সুশ্রী।

এতক্ষণ মামা-ভাগনীর বক্তব্য একটানা শুনেই গেছি। এবার বললাম, আমি দুভাবে আপনাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারি। এক, পুলিসের হারান মানুষ সন্ধান কেন্দ্রে ওপরওয়ালা বন্ধুদের বলে কয়ে ভালমত তল্লাসির ব্যবস্থা করাতে পারি। আর, ছবিসহ বিষয়টি কোন কাগজের কর্তৃপক্ষকে ধরে অল্প খরচে ছাপানর ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু তার আগে দুচারটি দরকারি কথা জানতে হবে। সাধারণত এই রকম ব্যাপার ঘটে কি কি ভাবে তা ত জানেনই। ছেলেরা নিখোঁজ হয় চলতি পথে গাড়ি চাপা পড়লে এবং অচৈতন্য অবস্থায় তাকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে গেলে, কেউ শত্রুতা করে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখলে, আর পরীক্ষায় ফেল করে, কিংবা কোন অপকর্ম করে, কিংবা কোন বদ মতলবের তাড়নায় বাড়ি থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিয়ে নিজে পালালে। এর কোনটা বর্তমান ঘটনার পিছনে আছে কিনা, যাচাই করে দেখেছেন তো ভাল করে? তরুণী বললেন, এ অঞ্চলে দুর্ঘটনা ঘটলে সাধারণত বাঙুড় হাসপাতালেই নিয়ে যায়। সেখানে দেখেছি ঐ নামের কেউ ভর্তি হয়নি। আমাদের কেউ শত্রু নেই। আমরা উদ্বাস্তু মানুষ, বাবা চলে যাবার পর মাস্টারি করে কষ্টেসৃষ্টে ভাইবোনদের মানুষ করছি। কলোনির মধ্যে ছোট একটা বাড়ি বানিয়ে কোনমতে বেঁচে আছি আমরা। আমাদের অনিষ্ট কে করবে বলুন? আর বাড়িতে আমাদের আছেই বা কি যে নিয়ে পালাবে? তাছাড়া সেরকম ছেলে নয়! পড়াশোনাতেও মোটামুটি ভালই। ফেলটেল করে না।

বললাম, দেখুন, ছেলেরা বাড়ির বাইরে পা দিলেই চোখের আড়ালে চলে গেল। তখন কি করছে, কার সঙ্গে মিশছে, তা বাড়ির কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। একে কলকাতা শহর, তাতে এখনকার দিন। কুপথে টানার জন্যে তো লোকের অভাব নেই। সঙ্গের ভদ্রলোকটি বললেন, নিতান্তই পোলাপান! কুবুদ্ধি করার এখনো বয়স হয়নি, সবে ত নাইনে পড়ছে। বললাম, এই বয়সটাই মারাত্মক, বিচারশক্তি জন্মায়নি, কিন্তু কৌতূহল জেগেছে সব বিষয়ে। ভীষণ ভীষণ ভুল করে ছেলে-মেয়েরা এই বয়সে এবং করে অন্যের প্ররোচনায়। যাই হোক ছবিটা আর আপনাদের ঠিকানা রেখে যান। দেখছি কি করা যায়। পুলিসে আর কাগজের অফিসে ফোন-টোন করছি, আপনারাও চেনাজানা-দের মধ্যে খোঁজ করুন। ছোট্ট একটা বিজ্ঞপ্তি মত লিখে এনেছিলেন। সেটা এবং ছবিখানা রেখে ওঁরা চলে গেলেন। চা খেয়ে সবে প্রভাতী কাগজের স্তূপটি নিয়ে বসে ছিলাম, আগন্তুকদ্বয়ের আবির্ভাবে তা পড়ার আর ফুরসৎ হয়নি। এইবার পৃষ্ঠা ওল্টালাম। প্রথমেই চোখ পড়ল প্রধান বাংলা সংবাদপত্রটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় হারান প্রাপ্তি ও নিরুদ্দেশের দীর্ঘ ফিরিস্তিটির ওপর। কি কি খবর আছে জানেন? কালীঘাটের এম দত্ত নামক জনৈক উকিল লিখছেন, তাঁর মা দীন-তারিণীদেবী (৬৯) প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে আর ফেরেননি। নিউ আলিপুর থেকে কে এক সাকসেনা জানাচ্ছেন, তাঁর নবমবর্ষীয়া কন্যা অমৃতাকে বুধবার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। পাড়ার ক্লাবে ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিল। রিষড়া থেকে গৌরীপদ গাঙ্গুলী কাতরভাবে ডাকছেন, হাবু ফিরে আয়, ভয় নেই, তোর কথামত কাজই হবে। গার্ডেনরিচ থেকে নুরুল আলম বলছেন, তাঁর ছেলে গনি ওষুধ কিনতে বেরিয়ে গত সোমবার উধাও হয়েছে। তার পরনে পাজামা, গায়ে নীল ডোরার পাঞ্জাবি, হাতে ৭৫টা টাকা আছে। ডানদিকের গালে কাটা দাগ। ষোল বছর বয়স। ছেলের জন্যে তার মা অন্নজল ছেড়েছেন।

আরো আছে দু-একটি। একদিনের কাগজেই এতগুলো! অর্থাৎ ওপর থেকে সাজান এই সমাজজীবনের তলায় তলায় কত রকম সংকট, সমস্যা, অনর্থ ও অশান্তি প্রতিনিয়ত তাল পাকাচ্ছে, খবরগুলো তারই জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ, তাতে আর সন্দেহ নেই। পরিস্কার বোঝা যায় কোনটা পথ হারানর, কোনটা চাপা পড়ার, কোনটা চুরি হবার, কোনটা বা পালানর ঘটনা এবং কাগজে যা বেরিয়েছে, বাস্তবে ঘটছে নিশ্চয় তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ ঘটনা ত রোজই ঘটছে, কটা আর ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে? আর একটা জিনিসও বোঝা যায় যে, শুধু হাবুরাই নিখোঁজ হয় না, হয় হাবীরাও। কিন্তু মেয়ের ফেরার হওয়ার সংবাদ একমাত্র বৃদ্ধা বা মনোবিকারগ্রস্তা না হলে কেউ তা বাইরে ব্যক্ত করেন না। ওটা এখনো মস্ত অসম্ভ্রমের ব্যাপার যে আমাদের সমাজে! কিন্তু অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে সহ-অধ্যয়ন, সহ-উপার্জন, সহ-সংস্কৃতি অনুশীলন ও রাজনীতি অনুসরণের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা যত বাড়ছে, ততই যুগ্ম পলায়ন অনেক ক্ষেত্রে অনতিক্রম্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। কারণ, পরিচয় থেকে পরিণয়ে পৌঁছানর পথটা সব সময় সুগম নয়। মাঝে রয়েছে পয়সা, পরিজন, প্রয়োজন, নানা আপদ মাথা উঁচিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে। কাজেই পলায়ন ছাড়া সহজ বিকল্প ব্যবস্থা কি আছে? কিন্তু পালান কাজটা যত সোজা, তাকে টিঁকিয়ে রাখাও কি তাই? উঁহু! কাজেই যুগ্ম পলায়নের পরের অধ্যায় হল

যে কোন একজনের, প্রধানত পুরুষেরই একক পলায়ন!

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে শুধু হাবু-হাবীরাই পালায় না। পালানর প্রয়োজন হয় নিগৃহীত নিঃসম্বল নারীরও। হয় সংসার বিড়ম্বিত বেকারেরও, অথবা প্রাপ্ত বয়সের অনাদৃত বৃদ্ধেরও। হয় অন্তরের আদর্শ ও বাস্তব সংস্থিতির মধ্যে সমন্বয় করতে না পারা উচ্চশিক্ষিত নরনারীরও। ভাবতে ভাবতে যেন অভিভূতই হয়ে গিয়েছিলাম একটু, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। তুলতেই একটি নারীকণ্ঠে সাড়া এল, স্যার, আমি চামেলী চাটুজ্যে। একটু আগেই মামার সঙ্গে আপনার কাছে গিয়েছিলাম ভাই হারানর আরজি নিয়ে। সে ফিরে এসেছে। বললাম, গিয়েছিল কোথায়? চামেলী বললেন, সে আর পাড়ার সংঘ্যা বলে একটি মেয়ের দুই দুই চার মাসের স্কুলের বেতন নিয়ে বোম্বাই যাচ্ছিল, ফিল্মে নামতে। হাওড়ায় রেল পুলিস ধরেছেন। বললাম, আচ্ছা করে উত্তম-মাধ্যম দিন, আর কাল সকালে এসে ছবিখানা নিয়ে যাবেন।

সুদর্শন গুপ্ত
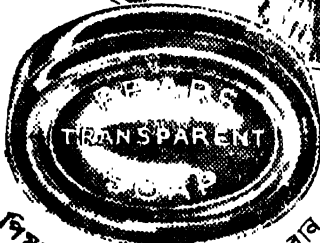
॥ ৪ ॥

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার। সংসারে মানুষ যখন জন্মায় তখন অন্য জীব-জন্তুর সঙ্গে তার কোনও তফাৎ থাকে না। দুটো চোখ দিয়ে সে দেখে, দুটো হাত দিয়ে সে সব কিছু ধরতে যায়, দুটো পা দিয়ে সে চলতে চেষ্টা করে। কিন্তু বয়স হলেই যত গণ্ডগোল। তখনই তার বুদ্ধি গজাতে আরম্ভ করে। সেই বুদ্ধি যদি বিকৃত হয় তো সেই বিকৃতির ফাঁক দিয়ে কুটিলতার সাপ ঢুকে মনের ভেতরে গোপন ফণা তোলে, আর সেই বুদ্ধি যদি শুদ্ধ হয় তো দেব-শিশু হয়ে সে সেখানে ঢুকে স্বর্গ রচনা করে।

কিন্তু এই বুদ্ধি-বৃত্তি, এই মনন, এই ধ্যান-ধারণা সমস্তই আসে শিশুর শিক্ষা আর পরিপার্শ্ব থেকে। ভালো গৃহস্থ হতে গেলে ভালো সামাজিক মানুষ হতে গেলে, ভালো কর্মী হতে গেলে প্রথমেই যেটা দরকার সেটা হলো সংযম। পরকে আঘাত করার যে প্রবৃত্তি, পরকে আঘাত করে নিজেকে বড় প্রতিপন্ন করার যে বাসনা তাকে খর্ব করতে হয়। সকলের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যাবার সাধনাই ভারতবর্ষের কাছে শ্রেষ্ঠ সাধনা। সেই সাধনায় কিছু ত্রুটি ঘটলেই মানুষের জীবনের যত অশান্তি। যে-মানুষ এইরকম কুট প্রবৃত্তির শিকার হয় তার শান্তি দূর করা চিকিৎসক বা ঈশ্বরেরও অসাধ্য।

এসব কথা আমার নয়। ছোটবেলায় আমার এক শিক্ষক আমাকে এই সব কথা শিখিয়েছিলেন। আমি নিজেও আবার অন্য সকলকে এই সব কথা শুনিয়েছি। তাতেও যে তারা শান্ত হয়নি তাও আমি জেনেছি। তবে বড় আদর্শ সামনে রাখলে যে উপকার হয় তার প্রমাণও আছে ভুরি ভুরি।

শিউপূজন যখন আমাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো তখন আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে এই সব উপদেশই তার বউকে শোনাবো। আমি জানি যে এযুগে উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। পৃথিবীর কোনও মানুষই আজ জ্ঞান চায় না। আমরাও ছোটবেলায় জ্ঞান চাইনি।

আমার নাম করে শিউপূজন তার বউ-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। বড় সুশ্রী, বড় ভদ্র আর বড় অমায়িক মহিলা এই শিউপূজনের স্ত্রী। আমাকে বাড়িতে পেয়ে শিউপূজনের স্ত্রী কী ভাবে আপ্যায়ন করবে তাই ভেবেই বিব্রত হয়ে পড়লো।

আমি বললাম—ওসব কিছু আয়োজন করতে হবে না, আমি হোটেল থেকে পেট ভরে খেয়ে এসেছি, আবার এখনি আমাদের দুপুরের-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, 'মহারাজা হোটেলে'। তারপরে সন্ধেবেলা আবার সম্মেলন আছে। তারপরে রাত দেড়টা পর্যন্ত আবার কবি-সম্মেলন না কী-সব আছে—তোমরা খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না—

রায়না বললে—তাহলে একটু বাতাবী লেবুর রস করে দিচ্ছি খান—

—তা দাও—

আমার অনুমতি পেয়েই বউটি বাড়ির ভেতরে চলে গেল। শিউপূজন সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে সরে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গলা নিচু করে বললে—আপনাকে যা বলেছি তা আপনার মনে আছে তো? ঠিক সেইরকম কিন্তু বলবেন স্যার—

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। শিউপূজন আমার কথায় যেন একটু শান্তি পেলে বলে মনে হলো। আমি ঘরটার চার-দিকে চেয়ে দেখলাম। বেশ বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ শিউপূজন। ঘরের দামী আসবাবপত্র দেখে তাই-ই প্রমাণ হলো। মরিশাসের সমস্ত জিনিসই আমদানি করা। টেপ-রেকর্ডার থেকে রেডিওগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত কিছু বিদেশে তৈরি। বাড়ির গৃহিণী যে সুগৃহিণী তার পরিচয় পেলাম গৃহ-সজ্জায় সুরুচির নমুনা দেখে। শিউপূজন উদাসীন কমি মানুষ, তার হাতের স্পর্শ যে এতে নেই তা বোঝাই যায়।

জিজ্ঞেস করলাম—এই বাড়ি কি তোমার বাবা তৈরি করে গিয়েছিলেন?

শিউপূজন বললে—না স্যার, বাবার তৈরি বাড়ি কবে ঝড়ে প'ড়ে গেছে। বাবার এত টাকা ছিল না। বাবা গরীব মানুষ ছিল যা কিছু টাকা বাবার ছিল সব চলে গিয়ে ছিল বাড়িটা তৈরি করতে। আর আমাকে লেখাপড়া শেখানোতেই বাকি টাকাটা ফুরিয়ে গিয়েছিল—

—আর এ-বাড়িটা?

—এ-বাড়িটা আমি নিজের টাকায় তৈরি করেছি স্যার।

চেয়ে দেখলাম বাড়িটা আগাগোড়া কনক্রিটের তৈরি। শিউপূজনই বললে—এদেশে যে কনক্রিটের বাড়ি তৈরি না করলে থাকে না। ইটের বাড়ি তৈরি করলে তা ঝড়ে উড়ে যায়।

আমি বললাম—ঝড়ে উড়ে যায়?

—হ্যাঁ স্যার, এ ইণ্ডিয়ার মত ঝড় নয়, এ একেবারে সামুদ্রিক সাইক্লোন। বছর বারো-চোদ্দ অন্তর-অন্তর এদেশে ভীষণ ঝড় হয়। যাকে বলে সাইক্লোন। সেইজন্যেই এই মরিশাসকে বলে 'এ কাণ্ট্রি অব সুগার-কেন আর হ্যারিকেন। মানে মরিশাস হলো আখের দেশ আর ঝড়ের দেশ—

শিউপূজন সেই ঝড়ের গল্প বলতে লাগলো। কোথা থেকে কেমন করে যে সেদিন এখানে ঝড় উঠলো তা কেউ কল্পনা করতেও পারেনি। সে ১৯৬০ সালের কথা। হঠাৎ মাঝ রাত্রে একটা গোঁ-গোঁ শব্দ উঠতে লাগলো ইণ্ডিয়ান ওশ্যানের দিক থেকে। তার আগে দু'দিন বেশ গরম পড়েছিল। হাওয়া-বাওয়া সমস্ত বন্ধ। আর তারপরই সেই ঝড়। বাবা আর মা শুয়ে ছিল ভেতরের ঘরে। ঝড়-এর সংকেত পেতেই বাবা আমাকে ডেকে তুলে দিলো।

ডাকলে—খোকা ওঠ্ ওঠ্।—ঝড় উঠেছে—সাইক্লোন—

আমি তার আগেই উঠে পড়েছি। আমি তখনও ঝড়ের দাপটের গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। ঝড় উঠেছে, তা তাতে কী আর হয়েছে, ঝড় একসময়ে থেমে যাবেই। কিন্তু না, বাবা জানতো এ ঝড় সে-ঝড় নয়। পাড়ার লোকজন সবাই তখন চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। ঘর থেকে জিনিসপত্র বার করতে আরম্ভ করেছে সবাই। কারণ অনেকেরই তখন কাঁচা বাড়ি। আখের ক্ষেত তো যাবেই। বাবা মা'কে আর আমাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে বললে। বাবার অনেক সাধের বাড়ি। আখের ক্ষেতে মজুরি করে করে বাবা যা একটা-দুটো টাকা জমিয়েছিল, সেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা দিয়ে কিছু আখের ক্ষেতের জমি কিনেছিল আর এই ছোট জমিটা কিনে এখানে একটা কাঁচা বাড়ি বানিয়েছিল। ইঁটের দেওয়াল আর টিনের চাল। তার চেয়ে বেশি আর কিছু করার ক্ষমতা ছিল না বাবার।

বললাম—তারপর?

তারপরের কাহিনী জলের মত তরল আর সরল। তখন ব্রিটিশ আমল। দু'দিন ধরে সেই ঝড় চললো। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাবা একটা ট্রাঙ্ক ঘরের ভেতর থেকে ঘাড়ে করে বাইরের দাওয়ায় আসতেই বাড়ির টিনের চালটা হাওয়ার দাপটে কোথায় উড়ে চলে গেল তা অন্ধকারে ঠাহর করতে পারা গেল না। একেবারে ফাঁকা আকাশের তলায় আমরা সবাই থর-থর করে কাঁপতে লাগলাম। শেষে হাওয়ার দাপট এত বাড়তে লাগলো যে সোজা হয়ে যে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো তারও উপায় নেই। শেষকালে বাবা বললে বাড়ির উঠোনে একটা আম গাছ ছিল সেইটে জোরে জড়িয়ে ধরে থাকতে। আমরা তিনজনে তাই-ই করলাম। আম গাছের গুঁড়িটা আমরা তিনজনে এত জোরে জড়িয়ে ধরলাম যে হাওয়ার ঝাপটা আর আমাদের কাৎ করতে পারলে না। এমনি করে কত ঘণ্টা যে আমরা কাটালাম তার হিসেব নেই। রাত যখন শেষ হয়ে আসছে তখন বাবা বললে অন্য কোনও জায়গায় চলে যেতে। কারণ আমাদের কাছাকাছি যত বাড়ি ছিল সবগুলো তখন মাটিতে পড়ে গেছে, একেবারে যাকে বলে ভূমিসাৎ হওয়া। সে স্যার এক অভাবনীয় ঝড়। সে-সব বাড়ির লোকজনরা যে কোথায় গেছে তাও জানতে পারছি না। তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও দেখবার উপায় নেই। এ যে কনকনে ঠাণ্ডা, তার ওপর ঝম-ঝম করা বৃষ্টি, আর তার সঙ্গে লাগাতর ঝোড়ো-হাওয়া। এক-বার হাতটা ফসকালেই একেবারে কোথায় যে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

বাবা নিজে তো আমগাছটা জড়িয়ে ধরে আছেই, তার সঙ্গে চেঁচিয়ে আমাদের সাবধান করে দিচ্ছে—হাত ছেড়ো না কেউ, চোখ বন্ধ করে থাকো, নইলে চোখ কানা হয়ে যাবে—

কিন্তু গাছটা হঠাৎ মড়-মড় করে ভেঙে পড়লো। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়লুম কেউ জানি না। যখন ভোর হলো তখন যেন চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলাম। কিন্তু যেদিকেই চাই দেখি দেশটাকে যেন আর চিনতে পারি না। সমস্ত দেশটা যেন একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে। এর বাড়ির জানালা ওদের বাড়ির উঠোনে গিয়ে পড়েছে। আর অন্য বাড়ির গাছ উপড়ে এসে পড়েছে আমাদের বাড়িতে। একটা গরু ছিল আমাদের, দেখলুম সে গাছ পড়ে মারা গেছে। আখের ক্ষেতে সব আখ-গুলো উপুড় হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মরিশাসের যে-ক'টা বাড়ি পাকা ছিল তাতে আর থাকবার জায়গা নেই তখন। স্কুল বাড়ি কয়েকটা পড়ে গিয়েছিল, আর যে-ক'টা তখনও পড়ে যায়নি তাতেই আমরা গিয়ে ঢুকে পড়লাম। দু'দিন পরে ঝড়টা একটু কমতে তখন আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। আবার তখন নতুন করে বাড়িটা তৈরি করে সেখানে ঢুকলুম। বাবার মনে আছে অত পয়সা খরচ করে অত সাধের বাড়িটা ধ্বংসে যেতে দেখে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো।

বললাম—এই বুঝি সেই বাড়ি?

শিউপূজন বললে—না, এ সে-বাড়ি

হতে যাবে কেন স্যার। এ সে-বাড়ি নয়, সে-বাড়িটা পুরো ভেঙে ফেলে আমি এই নতুন পাকাবাড়ি তৈরি করেছি। এটা পুরো কনক্রিটের বাড়ি। বাবা এ-বাড়ি দেখে যেতে পারেননি—। তবু এ-বাড়িটা বাবার জন্যেই হয়েছে। বাবা যদি আমাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে ইণ্ডিয়াতে না পাঠাতো তো এ-বাড়ি হতো না।

সেই শিউপূজনের কাছেই আমি শুনেছিলাম যে, এক-একটা ঝড় এসেছে আর তখন তাদের সমস্ত দেশটা একেবারে ছারখার করে দিয়ে গিয়েছে। একবার প্লেগ হয়েও হাজার হাজার লোক মরে গিয়েছিল। এ শুধু মরিশাস বলেই নয়, মানুষের সমস্ত জীবনটাই হলো এই রকম সংগ্রাম। কখনও প্লেগ আসবে, আবার কখনও ঝড়। আবার কখনও রোদ, আবার কখনও বৃষ্টি। এরই সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয় মানুষকে। এই সংগ্রাম আছে বলেই মানুষ এমন করে শান্তির জন্যে কেবল আকুলি-বিকুলি করবে অথচ শান্তি পাবে না। কার্ল মার্কসকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—'সুখ কী?' তিনি জবাব দিয়েছিলেন—'স্ট্রাগল' অর্থাৎ সংগ্রাম। সেই আদিযুগে যারা অভাবের তাড়নায় এখানে এসেছিল, সেটাও ছিল তাদের সংগ্রাম। শিউপূজনের বাবাও এসেছিল সংগ্রামের তাড়নায়। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে, এখানে এসে বসতি করেছিল, বিয়ে করেছিল, সন্তান হয়েছিল। কিন্তু তা বলে ঝড়ের প্রকোপ কি সে ভদ্র-লোক এড়াতে পেরেছিল? আখের ক্ষেতে মজুরি করেছিল। সেই মজুরির পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে একটা মাথা গোঁজবার মত বাড়িও করেছিল। কিন্তু তবু দুর্যোগের হাত থেকে কি রেহাই পেয়েছিল বাবা?

তখন শিউপূজনের বাবার মাথার ওপর একটা ছাদ নেই, হাতে একটা টাকা নেই। সেই অবস্থাতেই একদিন বাবা বললে—তুমি ইণ্ডিয়ায় যাও, ইণ্ডিয়ায় গিয়ে বি-এ পাশ করে এসো—

আমি বললাম—কিন্তু টাকা? টাকা কোত্থেকে আসবে?

বাবা বললে—সে-কথা তোমায় ভাবতে হবে না—আমি টাকা ধার করে তোমাকে পাঠাবো—যা বলছি তুমি তাই শোন—

আমারও যাবার ইচ্ছে নেই, বাবাও আমাকে জোর করে ইণ্ডিয়াতে পাঠাবে। শেষকালে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো। বাবা আমাকে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তুলে দিয়ে এল। আমার কান্না পাচ্ছিল দেশ ছেড়ে চলে যেতে। বাবা বললে—কিছু ভয় নেই, যখনই তোমার কিছু কষ্ট হবে এখানে আমাকে চিঠি লিখবে, আমি টাকা পাঠিয়ে দেব—আর সময়ে সময়ে রাম নাম করবে। দেখবে তোমার সব বিপদ কেটে যাবে—

তারপর আমি সেই জাহাজে করে বোম্বাইতে গিয়ে নামলাম। সেখান থেকে দিল্লি গিয়ে সেখানকার কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়তে লাগলাম। বরাবর মরিশাসে কাটিয়েছি ছোটবেলা থেকে, হঠাৎ দিল্লি দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। সেই আমার প্রথম আর শেষ ইণ্ডিয়া দেখা। সে কত বড় শহর। কত লোকজন। আমার মন খারাপ হতো খুব। আমি একলা-একলা নিজের ঘরটায় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতুম। তারপর যখন বাবার চিঠি আসতো তখন খুব ভালো লাগতো। সেই তখনই আমার সঙ্গে আলাপ হলো রায়নার—

শিউপূজন বললে—সত্যিই খুব ভালো মেয়ে এই রায়না—আমার নিজের স্ত্রী বলে বলছি না,—

এমন সময় রায়নার নাম করতে-না-করতে সে এসে ঘরে ঢুকলো। দেখি হাতে খাবার।

আমি বললাম—এসব কী? এত খাবার কে খাবে?

শিউপূজনের বউ বললে—কেন আপনি—

এবার ভালো করে দেখলাম শিউ-পূজনের বউকে। মাজা-ঘষা রঙ। টিকোল নাক, ভাসা ভাসা চোখ আর মাথায় এক-রাশ চুল। আমার সামনের টিপয়টার ওপর প্লেটটা আর বাতাবি লেবুর সরবৎটা

রাখলে। আমি প্লেটের খাবারটা কী তা বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—এটা কী?

রায়না বললে—পেঁপের মোরব্বা দিয়ে পাঁউরুটির টোস্ট, খেলে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না, আর এটা বাতাবি লেবুর জুস—আমাদের নিজের বাগানের বাতাবি লেবু—

বললাম—তা এটা থাক, আমি শুধু লেবুর সরবৎটা খাচ্ছি—

বলে শুধু সরবতের গ্লাসটা তুলে নিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মহিলা বাধা দিলে। বললে—না, ও-গুলোও আপনাকে খেতেই হবে। আজকেই প্রথম এলেন, আর একটু কিছু মুখে দেবেন না, তা কি হয়?

শিউপুজন বললে—তুমি কেন অত পীড়াপীড়ি করছো বলো তো, ওঁর যেটা ইচ্ছে হচ্ছে সেইটেই উনি খান না—

রায়না বলে উঠলে—তুমি থামো তো, আমি ওঁ'র সঙ্গে কথা বলছি, তার মধ্যে তুমি কথা বলতে আসো কেন?

ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি সমস্তই খেতে রাজি হয়ে গেলাম। আমি খাচ্ছি দেখে মহিলাটি আমার সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লো। বসে আমার খাওয়ার তদারক করতে লাগলো।

খেতে খেতে বললাম—মজা দেখ শিউ-পুজন, ওদিকে প্যান্ডেলের ভেতর কত-ভালো-ভালো বক্তৃতা হচ্ছে, আর আমি কিনা তোমাদের বাড়িতে বসে আড্ডা দিচ্ছি—

শিউপুজন বললে—সাত্য আপনাকে এখানে টেনে এনে আমরা খুব অন্যায় করেছি স্যার—

শিউপুজনের স্ত্রীও স্বামীর কথায় সায় দিয়ে বললে—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তুমি, আমি খুবই অন্যায় করেছি। কিন্তু কী করবো বলুন, আমি বাধ্য হয়ে ওকে বলেছিলুম আপনাকে ডেকে আনতে—

শিউপুজন বললে—বলো না, তুমি কী জন্যে ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলে, বলো—

রায়নার বোধহয় নিজের কথাটা নিজের মুখে বলতে লজ্জা হলো। শিউপুজনের দিকে চেয়ে বললে—তুমি বলো—

শিউপুজন স্ত্রীর কাছ থেকে বকলমা পেয়ে বললে—তাহলে আপনাকে বলি, রায়নার খুব সিনেমায় নামবার ইচ্ছে। আপনি নিজে তো সিনেমা করেন, আপনি যদি একটু চান্স দেন ওকে তাহলে দেখবেন ও খুব নাম করবে, আপনাদেরও খুব টিকিট বিক্রী হবে, কোম্পানীরও খুব লাভ হবে—

শিউপুজনের কথার জবাব দিতে আমার একটু দেরি হতে লাগলো। শিউপুজনের আগের কথাগুলো আমার মনে পড়লো। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলাম। ঈশ্বর, তুমি আমাকে এ কী বিপদে ফেললে! জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাগুলো গড় গড় করে বলো যাবো, এ কী করে সম্ভব! যদি আমার ঠোঁট কাঁপে, যদি আমার ভ্রূ কুঁচকে যায়, যদি আমার জিভে কথা জড়িয়ে যায়? ঈশ্বর, মরিশাসে এসে তুমি আমায় এ কী ভীষণ পরীক্ষায় ফেললে?

আমি বললাম—কিন্তু তোমার সিনেমায় নামবার ইচ্ছে কেন হলো?

রায়না সে-কথার জবাবে উল্টো কথা বললে। বললে—কেন, আমায় কি সিনেমায় মানাবে না? আমাকে কি দেখতে খারাপ?

এর জবাবে আমি কী বলি? তাছাড়া কাকে সিনেমায় মানাবে আর কাকে সিনেমায় মানাবে না, তা আমি জানবো কেমন করে? আমি জীবনে কখনও সিনেমার স্টুডিওয় ঢুকিনি। আমার গল্প নিয়ে সিনেমা থিয়েটার হয় এই পর্যন্ত। আমি আমার সিনেমার মহরত-অনুষ্ঠানেও কখনও উপস্থিত থাকি না। আর আমাকে কিনা এরা সিনেমার পরিচালক বলে ধরে নিয়েছে! এ কী দুর্দৈব! আমি তো সিনেমা-শিল্পকে কখনই উঁচু দৃষ্টিতে দেখিনি। সিনেমা সৎ-সাহিত্যের ক্ষতিকারক বলেই আমি বরাবর জেনে এসেছি। সিনেমা যে মানুষকে চিন্তাশীল করে, এই কথাই বরাবর আমি বিশ্বাস করে এসেছি। তাহলে এই সুখী দম্পতির জীবনের মধ্যে এ-পাপ কেন ঢুকলো? তাহলে কি মানুষের সুখ-শান্তি-আস্থা বিশ্বাসকে ছারখার করে দেবার জন্যেই বর্তমান পৃথিবীতে সিনেমার আবির্ভাব হয়েছে? কে জানে!

আমার মুখ দিয়ে এবার কথা বেরোল। বললাম—কে বললে খারাপ? কিন্তু তুমি

(সি ৪৬৮১৫)

সিনেমায় নামতে চাইছ কেন? তুমি যদি সিনেমাতেই নামো তাহলে এই শিউপূজন এখানে কী করবে? এও কি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমার সঙ্গে বোম্বাইতে যাবে!

শিউপূজনের স্ত্রী বললে—কেন, আমার সঙ্গে বোম্বাইতে গেলে কী হয়েছে? সিনেমায় নামলে ও-ও আমার সঙ্গে বোম্বাইতে থাকবে! আমি তো লাখ-লাখ টাকা উপায় করবো, তাতে ওরও চলে যাবে। স্বামীর টাকায় যদি স্ত্রী খেতে পারে তাহলে স্ত্রীর উপায় করা টাকায় খেতে স্বামীর আপত্তির কী থাকতে পারে?

—কিন্তু সিনেমা-স্টারদের জীবন কি তুমি চাও?

—কেন চাইবো না। তারা কত সুখে থাকে। তাদের কত টাকা, কত তাদের নাম। সারা পৃথিবীর লোক তাদের নাম জানতে পারে। আর এখানে আমরা দিন কাটাই কী করে তা যদি আপনি জানতেন! ও তো সারাদিন কলেজ টিচারি করে। তারপর কবিতা লেখে! কবিতা লিখে কী হয়? এখানে ও কবিতা লেখে বলে কেউ কি কিছু খাতির করে ওকে। তবু কবিতা লেখে বলে ও না হয় নিজে আরাম পায়, নিজেকে প্রকাশ করে খুশী হয়, কিন্তু আমি কী নিয়ে থাকি বলুন তো?

—কিন্তু তাহলে তুমি মরিশাসে এলে কেন? তুমি তো শিউপূজনকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল!! তুমি যখন শিউপূজনকে বিয়ে করেছিলে তখনই তো জানতে যে বিয়ে করে শিউপূজনের সঙ্গে এই মরিশাসে এসেই তোমায় থাকতে হবে। তুমি কি জানতে না যে মরিশাস কী রকম দেশ!

রায়না বললে—জানতুম! ও আমায় বলেছিল এখানকার কী রকম ক্লাইমেট, এখানে কী চমৎকার সিনারি, এখানে ধুলো-ধোঁয়া-ময়লা কিছু নেই, এখানে চারিদিকে সমুদ্র। এখানে এলেই ও আড়াই হাজার টাকা মাইনের চাকরি পাবে—

—তাহলে তো তোমাকে সবই বলেছিল শিউপূজন!

রায়না বললে—হ্যাঁ, তা বলেছিল, কিন্তু এখন দেখছি সব বাজে কথা। সিনারি আর এই সমুদ্র নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাবো? এই খেয়েই কি আমার মন ভরবে? মনেরও তো একটা ক্ষিদে আছে—

বললাম—দেখ, আমাদের তুলসীদাসের কথাই বলি। তুলসীদাসজী বলেছেন "ধীরজ-ধর্ম মিত্র ঔর নারী, আপদকাল পরিখিঅহি' চারি"। তার মানে ধৈর্য, ধর্ম, বন্ধু, আর স্ত্রী, বিপদের সময়েই এই চারজনকে চেনা যায়! তুমি যদি এখন তোমার স্বামীর দিকটা না ভাবো তাহলে তুমি তখন কেন ওকে বিয়ে করেছিলে?

রায়না কিছুক্ষণ কোনও জবাব দিতে পারলে না। তারপর একবার শিউপূজনের দিকে চাইলে। তারপর মুখ নিচু করে বললে—আমি ভুল করেছিলুম—

হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আবহাওয়া যেন থমকে গেল। কী বলতে গিয়ে আমি কী বলে ফেললাম বুঝতে পারিনি। নিজের অজান্তেই কি আমি শিউপূজনের স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে ফেললাম? কিন্তু শিউপূজন তো আমাকে অন্য রকম কথা বলতে বলেছিল।

শিউপূজন এতক্ষণ পরে কথা বলে উঠলো। বললে—না স্যার, আমার কথা থাক, আপনি ওকে সিনেমায় চান্স দিন একবার। ও ঠিক সাইন করবে, দেখবেন। ওকে যদি আপনি সিনেমায় নামিয়ে দেন তো আমিও না-হয় ওর সঙ্গে ইন্ডিয়াতেই চলে যাবো, আমি না-হয় সেখনে গিয়েই থাকবো—

—কিন্তু তোমার চাকরি?

—চাকরি করে আর কী হবে? রায়না তো সিনেমায় অ্যাক্টিং করে অনেক টাকা উপায় করবে, তাতে আমারও বেশ আরামে চলে যাবে।

—কিন্তু তোমার এই বাড়ি, এই আখের ক্ষেত?

—বাড়িটা বিক্রি করে দেব। আমি না-হয় আবার অন্য বিষয় নিয়ে কবিতা লিখবো। রায়না যখন সিনেমার শুটিং করবে, আমি তখন বাড়িতে বসে বসে সমস্ত দিন না-হয় কবিতা লিখবো। আমার কোনও অসুবিধে হবে না—

আমি বললাম—কিন্তু সিনেমার গ্ল্যামার যে বড় খারাপ জিনিস শিউপূজন একবার সেই গ্ল্যামারের পাল্লায় পড়লে এই রায়না কি আর এরকম রায়না থাকবে?

রায়না এর জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল

কিন্তু তার আগেই বাড়ির বাইরে মটরের হর্ন বেজে উঠলো। আর তারপরেই জালিম এসে হাজির। বললে—চলুন স্যার, ওদিকে মীটিং শেষ হবো হবো, এবার ফ্লে-একজিবিশন উদ্বোধন করবেন আপনাদের মিনিস্টার কর্ন সিংহ—আর দেরি নেই—

আমি উঠলাম। উঠে শিউপূজনের স্ত্রীর দিকে চাইলাম। দেখলাম তার মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর। বুঝলাম আমার এই হঠাৎ কথার মাঝখানে চলে যাওয়াটা তার ভালো লাগেনি। শিউপূজনও উঠলো।

রায়না উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি চলে যাবেন?

বললাম—কী করবো, সভা থেকে পালিয়ে এসেছিলুম, এবার যেতেই হবে—

—আর আসবেন না?

বললাম—নিশ্চয়ই আসবো। কথা তো এখনও শেষ হয়নি। আজ হোক কাল হোক পরশু হোক, আমি আবার আসবো। তুমি কিছু ভেবো না—

শিউপূজনও আমার সঙ্গে বাইরের বাগান পেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ির দরজা পর্যন্ত এল। তারপর আমার মুখের কাছে মুখ এনে গলা নিচু ক'রে বললে—স্যার, আপনি খুব উপকার করলেন আমার—

বললাম—আমি যা বললাম তা কি তোমার বউ শুনবে?

—সে না শুনুক, যা বলে'ছেন মোক্ষম বলেছেন, আর একদিন এসে বলে দেবেন যে আপনি ওকে সিনেমায় নামিয়ে দেবেন, ব্যাস, তাতেই কাজ হয়ে যাবে। আপনার কথাগুলো ও খুব বিশ্বাস করে'ছে।

এর পর আর বেশি দেরি করা চলে না। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো। জালিম সামনে বসেছিল। বললাম—এ আমাকে তুমি কী বিপদে ফেললে বলো তো জালিম—

জালিম বললে—আমি কী করবো স্যার। শিউপূজন যে আমাকে খুব ধরেছিল! আপনার যে গল্পটা হিন্দী সিনেমায় হয়েছে, সেই বইটাও যে আমাদের এখানকার লাইব্রেরিতে আছে। সেই বইটাও এখানে সবাই পড়েছে যে! সেই বইটা পড়েই ভেবেছে আপনি বুঝি নিজেই সিনেমা ক'রেন। আসলে স্যার ইণ্ডিয়ান মেয়েকে বিয়ে করাটাই ভুল হয়েছিল শিউপূজনের। দিল্লির মেয়ের কি মরিশাসে এসে থাকতে ভালো লাগে কখনও? যাদের গ্ল্যামার ভালো লাগে তাদের তো এখানে ভালো লাগবে না—

তারপর একটু থেমে বললে—ওই রায়না স্যার সমস্ত সিনেমা-স্টারদের খুব ফ্যান্—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—সিনেমা-স্টার?

হ্যাঁ আপনি সিনেমা-স্টারদের চেনেন না? সে কি? তাদের ছবি এলেই শিউপূজনের বউ দেখতে যাবেই। যত টাকার টিকিটই কিনতে হোক। অত সিনেমা-পাগল বউ এখানে আর কারো নেই—একদিন শিউপূজনের খুব মরো-মরো অসুখ হয়েছিল তবু সেদিনও সিনেমা দেখতে গিয়েছিল রায়না—

আমি বললাম—দেখ, আমি তো আমার বাড়িতে বসে গল্প লিখি, সেই লেখা যদি সিনেমা হয় তো আমার কী দোষ?

মনে মনে নিজের কপালকেই নিঃশব্দে ধিক্কার দিলাম। গান্ধীজীরও একবার এই দশা হয়েছিল। গান্ধীজী তখন লণ্ডনে গেছেন রাউণ্ড-টেবল-কনফারেন্সে ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি হয়ে। তার সঙ্গে একটা ছাগল। তিনি সেই ছাগল-দুধ ছাড়া অন্য কোনও দুধ খান না। সেখানে যেতেই যত বিখ্যাত লোক লণ্ডনে ছিল তাঁরা সবাই দলে-দলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। যে গান্ধী ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত পর্যন্ত টলিয়ে দিয়েছেন সেই গান্ধীকে সশরীরে দেখবার লোভ সকলেরই। অথচ ওই লণ্ডনেই তিনি কতকাল ব্যারিস্টারি পড়বার সময়ে কাটিয়েছেন তখন কেউ তাঁকে দেখতে চায়নি। তখন তিনি কোট-প্যান্ট-টাই পরা সাহেব। আর এবার তাঁর পরনে আট হাতি ধুতি, আর গায়ে শুধু একটা পশমের চাদর, আর পায়ে চটি। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে হবে। পঞ্চম জর্জ তাঁকে দেখতে চান।

সম্রাটের প্রতিনিধি তাঁকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। তিনি বললে—চলুন, আপনার পোশাক বদলে নিন—

গান্ধীজী বললেন—পোশাক আর কী বদলাবো, আমি তো ফরসা কাপড়ই পরে আছি—
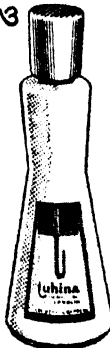
—তা হোক, আপনি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, সুতরাং কিছু বিশেষ পোশাক পরা নিয়ম—

গান্ধীজী বললেন—বিশেষ পোশাক তা আমার কিছু নেই, আর তাছাড়া আমার সমস্ত পোশাকই এই একই পোশাক—তবে আপনি যখন বলছেন তখন চাদরটা আমি উল্টো করে পরছি—

বলে চাদরের ভেতর দিকটা বাইরে করে গায়ে দিলেন আর বাইরের দিকটা ভেতরে। সেইভাবেই যখন তিনি সম্রাটের কাছে গেলেন তখন কথা-প্রসঙ্গে সম্রাট গান্ধীকে বললেন—দেখুন মিস্টার গান্ধী, আমার বড় ছেলে যখন ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিল তখন আপনি তাকে অপমান করেছিলেন কেন?

গান্ধীজী বললেন—আপনার ছেলেকে তো আমি অপমান করিনি সম্রাট—

—না, আপনি তাকে বয়কট করেছিলেন, আপনার কংগ্রেস তাকে কালো ফ্ল্যাগ দেখিয়েছিল—

গান্ধীজী বললেন—আপনার ছেলে বলে তাকে বয়কট করিনি সম্রাট, বয়কট করেছিলুম কারণ সে আপনার এই সিংহাসনের প্রতিনিধি ছিল বলে।

একজন সংবাদপত্র-সেবী তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি স্বাভাবিক জামা-কাপড় না পরে এই খাটো ধুতি আর উলঙ্গ গায়ে থাকেন কেন?

গান্ধী জবাব দিয়েছিলেন—
'You people in your country use plus-fours and we in our country use minus-fours'
আপনারা বড়লোক, তাই দরকারের বেশি জামা-কাপড় পরেন আপনারা, আমার ভারতবর্ষ গরীব, যতখানি জামা-কাপড় দরকার তাও আমরা কিনতে পারি না, তাই আমরা আধখানা শরীর ঢাকি, বাকি শরীরটা খালি থেকে যায়—আমি তো সেই গরীব ভারতবর্ষেরই প্রতিনিধি—

ঠিক সেই একই সময়ে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। চার্লি চ্যাপলিনের সে যুগে সারা পৃথিবীব্যাপী নাম। আমেরিকার এক পত্রিকার দ্বারা অনুষ্ঠিত জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন প্রথম, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন চার্লি চ্যাপলিন, আর তৃতীয় স্থানাধিকারী গান্ধীজী—

চার্লি চ্যাপলিন বললেন—আপনি আমায় চেনেন নিশ্চয়ই, আমার নাম চার্লি চ্যাপলিন—

গান্ধীজী বহু চিনতে পারলেন না। বললেন—আমি তো ঠিক চিনতে পারছি না—

—আপনার মনে নেই, একবার একটা পত্রিকায় ভোট নেওয়া হয়েছিল তাতে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে আমি হয়েছিলাম সেকেণ্ড আর আপনি হয়েছিলেন থার্ড—?

গান্ধীজী এ খবরও জানতেন না। বললেন—তা হবে, কিন্তু আপনি কী করেন?

চার্লি চ্যাপলিন বললেন—আমি একজন ফিলম-স্টার—

গান্ধী বললেন—ও, তা হবে, আমি তো সিনেমা দেখি না—

*

শিউপূজনের স্ত্রীর কথা ভেবে মনটা সারা রাস্তা খারাপ ছিল। কিন্তু গাড়িটা সেই গান্ধীর স্মৃতি-সৌধের কাছে থামতেই আবার প্রসন্ন হয়ে উঠলো। না, সবাই সস্তা চটকের মোহে আচ্ছন্ন নয়, সবাই যে চাপল্যের কাছে দাসত্ব করছে তাও নয়। সত্য আছে। এই মরিশাসের আকাশের নীলে, মরিশাসের সমুদ্রের হাওয়াতে আর মানুষের আখের মিষ্টতার মধ্যেই শাশ্বত সত্য প্রকাশমান আছে। সে বলছে আমরা দীন নই, আমরা দরিদ্র নই। আমরা ভিক্ষুকও নই। আমরা কেউ কেউ আজ যদি আমাদের মনকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করেই রাখি তাহলেও ক্ষতি নেই, কারণ আমাদের সকলের হয়ে যিনি বৃহত্তের সাধনা করে গেছেন, সমস্ত মানব-জাতির হয়ে ত্যাগের পৌরুষ দেখিয়ে গেছেন, তাঁরাও আজ এখানে সশরীরে উপস্থিত। চোখের সামনের এই স্মৃতি-সৌধটাই সেই সাধনা আর পৌরুষের প্রতীক। তাঁকেই আমরা প্রণাম করবো। তাঁকে প্রণিপাত করলেই আমরা মনে মনে উপলব্ধি করতে পারবো যে আমরাও বৃহত্তের উপাসক, আমরাও পৌরুষের উপাসক। তুলসীদাসজী আকবর বাদশার মনসবদারি আর জায়গীরদারির লোভ যেমন করে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন আমরাও এ যুগের সস্তা চটকের মোহ তেমনি করেই প্রত্যাখ্যান করতে পারবো।

তুলসীদাসজী সেদিন সেই আকবর বাদশার পত্রের জবাবে যে দু'ছত্র কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন আমরাও সেই কবিতার দুটি পঙক্তি ভক্তিভরে আবৃত্তি করবো—

হম্ চাকর রঘুনাথ কে পড়ো লিখো দরবার।
তুলসী অব কা হোহিগে নর কে মনসবদার॥

অর্থাৎ ঃ বাদশার দরবার লেখা-পড়া নিয়েই ব্যস্ত থাকুক, আমি অতি সামান্য লোক। আমি রঘুনাথজীর চাকর হয়েই খুশী। মানুষের মনসবদারির ওপর এখন তুলসীর আর কোনও লোভ নেই।

চেয়ে দেখি সম্মেলন কখন শেষ হয়ে গেছে। সবাই গান্ধী স্মৃতিসৌধ থেকে দলে দলে বেরিয়ে আসছে। ওখানেই গ্রন্থ-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবার কথা ছিল। হয়ত তাও তখন শেষ হয়ে গেল। সামনেই 'চিত্রলেখা'র লেখক ভগবতীবাবু একজন ভদ্রলোককে আমার কাছে নিয়ে এলেন, বললেন—বিমলবাবু, এই নাগরজী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান—ইনিই অমৃত লাল নাগর—

আমারও অনেকদিন থেকে 'অমৃত ঔর বিষে'র লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ ছিল। তাই আমরা দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরলাম।

জালিম পেঙ্কন থেকে বললে—স্যার এখন 'মহারাজা' হোটেলে যেতে হবে সেখানে লাঞ্চ-এর ব্যবস্থা হয়েছে, চলুন—

(ক্রমশ

দুচোখ কুঁচকে সে দূরে মাঠের দিকে তাকালো। এখন ভর দুপুর। সেই সকাল থেকে মাছ ধরার চেষ্টায় সময়টা গেছে ফালতু। শুধু চুনো পুঁটি আর পাথর ঠোকরা! কদিন থেকে তক্কে তক্কে ছিল সেই মোটকা বাণ মাছটাকে ধরবেই, হারামীটা আজও সটকে গেল। ওটা নিয়ে ধোউয়ালির হাটে গেলে এক কিলো চাল হয়ে যেত নিশ্চয়। গরম গরম কিলোটাক ভাতের সঙ্গে মাছ, আজ সকাল থেকে সে খুব খোঁজে ছিল। এখন এই খানিক আগে চুনোগুলোকে বাটিতে পুরে উনুনে চাপিয়ে দিয়েছে ও। নামাবার সময় একটু নুন আর তেলের ছিটে দিলেই হবে। মাছের এই হাল দেখে ভেবে রেখেছে রোদ একটু মিয়োলেই বেরিয়ে পড়বে। নিচে, খুঁটিমারির জঙ্গলের ধারটায় যে বাঁশঝাড়গুলো, শালা ঘুঘু পাখির বাগান হয়ে আছে। কালকে অবশ্য অদ্দুর যেতে হয়নি, মাথুরার রাস্তায় পেয়ে গিয়েছিল বাপধনকে। বুক চিতিয়ে দেখছিল শালা। গাঁই করে গুলতি ছুঁড়তেই কেলিয়ে গেল। উনুনে জ্বলতে তো তিন পাথরের বুকে গোঁজা জঙ্গুলে কাঠ। তাতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেঁকে নিয়েছিল পাখিটাকে। নুন মেখে এই দাওয়ায় বসে রাত্তির বেলা চাঁদ দেখতে দেখতে ফুটো খাওয়ার মত খেয়ে নিয়েছিল ও। মেয়েদের বলেছিল, বড় পাপ হে, বিচার করো। কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে আজকাল, কিছু একটা কাজ করলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঐ কথাগুলো।

নোনা রায় তো ওকে আজকাল সহ্য করতে পারে না। যখন ধান কাটাতে আর লাগাতে লোকজন নিয়ে এখানে আসে ওকে বলে সামনে না আসতে। কি মুশকিল। তা নোনা রায়কে তো বেশী আসতে হয় না এখানে। এক ফসলের জমি। ধানও তেমন হয় না। এবার নাকি মকাই লাগাবে ও। এই সব জোত জমি নোনার।

আবার ভাল করে নজর করল সে। কারা যেন আসছে। কে আসবে? এখন তো ধান কানের সময় নয়। মাথুরার রাস্তাটা আর ফাঁকা মাঠ। লোকজনের মুখ দেখতে হলে চলে যাও ধোউয়ালির হাট। পারত পক্ষে যেতে চায় না ও। খুব যদি দরকার হয়, এই তেলটা নুনটা কিংবা মোটকা কোন মাছ ফাছ যদি পেয়ে যায় সকাল সকাল। গেলেই লোকজন ওর দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকায়। প্রথম প্রথম কয়েকজন ভিড় করে আসতো। মেয়েছেলেগুলোর রস রস করে তাকাতো। সে তিন চার বছর আগের কথা। ধান কাটতে এসেছিল নোনা রায় ছয় সাত-জন মদেসিয়া নিয়ে। মেয়ে মদ্দ। তাদের কেউ কেউ দেখেছে মাঝ রাতে সে নাকি বলেছে, 'বড় পাপ হে, বিচার করো'। দলের একটা মেয়ে নাকি পনের বছরের বাঁজা ছিল। ফিরে গিয়েই সে পেটের বাঁধ আলগা করেছে। ব্যাস, রটে গেল চারধার। হাট থেকে ঘুরে এসে নোনা রায় কাতলা মাছের মুখ করে বলল, 'খবরদার, মেয়েছেলের দিকে নজর দিয়েছো কি মেরে ছাল ছাড়াবো হারাম-জাদা। তোর বাপের তো কুষ্ঠ ছিল, তোরও একদিন হবে। তা আমি অত দয়া করে থাকতে দিচ্ছি, চার মাস [illegible] করে টাকা দিই, হ্যাঁ। তারপর ফিকফিক করে হেসে বলেছিল, ভালো ভালো, কুষ্ঠ রোগের সঙ্গে কথা বলিস, লোকজন তোর কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।'

নোনা রায়ের বাড়ি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে কাঠভাঙায়। ঐ চার মাস আনা-গোনা করে। বাকী আট মাস ধু-ধু সব। এই চালা ঘরটায় থাকে ও। প্রথম প্রথম পাহারা দিত ও আবাদী জমি। এখন জানে তার দরকার নেই। লোকজন আসেই না ভয়ে! বাপটা অবশ্য সত্যি মরেছিল মাংস পচে খসে। সেই সময় গাঁয়ের লোক, নোনা রায়ের গাঁ, একঘরে করে দিয়েছিল ওদের। মরার আগে বাপ বলেছিল, 'মেয়েছেলের কাছে যাবি না—বড় পাপ নিয়েছি হে—বিচার করো।' তারপর থেকে কিছু করলেই ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে কথাগুলো। তা নোনা রায়ের কথা শুনে ও চমকে উঠেছিল প্রথমটা। আজ অবধি কোন মেয়েছেলে বলতে পারবে না যে নজর খারাপ করেছে। সেসব দিকে মন নেই। শুধু পরশু-দিন সকাল থেকে একটা অভ্যেস হয়ে গেল ওর। চালা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সূর্যের আলোয় হাত পা লক্ষ করে ও। টিপে টিপে কান নাক দেখে। বাপের শালা প্রথম কান নাক ফুলেছিল লাল হয়ে। বলতো সাড় নেই। ওর তো নিজের কানে চিমটি

ঝাটিতে জোর ব্যথা লাগে। তার মানে সেই-দিনটা ও বাপ হয়ে যায়নি। বড় পাপ হে বিচার করো।

এই জঙ্গলে জায়গাটায় ওর একরকম চলে যায়। মোটমাট একশ টাকা বছরে পায় ও সোনার কাছ থেকে। শর্ত, হাতি এলে তাড়াতে হবে। গত বছর কলাগাছ লাগিয়েছে সোনা। কোন খবরা খবর হলে ধোউরালির হয়েন মুদিকে খবর দিলেই সোনা পেয়ে যাবে। শালা ওকে একমুঠো ধানও দিয়ে যায় না। তা না দিক। পেট তো ওরই চাকর। আশুরাভাসায় মাছ আছে, আর ঘুঘু ডাহুক চখা এরা আছে। চলে যায় কোনরকম। এখন কলা পাকছে। চিনিকলা। সোনা ওকে অবশ্য খেতে বলেনি, মানাও করেনি। ভাল করে পাকলে খেয়ে দেখবে একদিন।

সত্যি লোক আসছে। ভাল করে ঠাওর করল ও। মাথার উপরে সূর্য, যারা আসছে তাদের ছায়া পায়ের তলায়। একটার হাতে লাঠি, অন্য দুজন হাত ধরাধরি করে আসছে। মেয়েছেলে। তিন পা হাঁটে তো হাঁ করে বাতাস নেয়। এ শালার বুড়িরা এখানে কি করতে এলো। থুঃ করে থুতু ফেললো ও। মানুষজন দেখলেই আজকাল গা শিরশির করে। তারপর এরা তো শালা বুড়ি। দুপুরবেলা ঘুঘুর মত গলা হেঁক-ড়েই চলবে। কিন্তু পাঠালো কে, কোন শত্রু। চট করে সামনে থেকে সরে এল ও। আড়াল থেকে লক্ষ করলে বোঝা যাবে মতলবটা কি।

॥ দুই ॥

তিন বুড়ি ঠুকুর ঠুকুর করে কোন-রকমে চালাঘরটার সামনে এসে দাঁড়াতেই একটা ডাহুক আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। মাথার ওপর করকরে রোদ, মুখ হাত কিন্তু ঘামেনি কারো। তিনজনের যে বড় তার গায়ের চামড়া মালার মত শরীরে জড়ানো। ময়লাটে শাড়ি তিনজনের অঙ্গে। যদিও দ্বিতীয়জন বাতগ্রস্ত তবু তার শাড়ি প্রথম-জনের মত অগোছালো নয়। হাঁটতে তার কষ্ট হয়েছে খুব। তৃতীয়জন বয়সে ওদের চেয়ে ছোট। কাঁচাপাকা চুল। অন্যদের মত খালি গা নয়। তবে জামাও ওকে বলা যায় না ঠিক, কারণ পিঠের দিকটা কোনরকমে গিঁট বাঁধা। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে অনেক-দিন তবু পাছাটাছাগুলো ভার ভার। মিলের মধ্যে তিনজনেরই গালের ওপর মেচেতার দাগ ঘন।

ধপাস করে ওরা চালাঘরটার দাওয়ায় বসে পড়ে নিঃশ্বাস সইয়ে নিচ্ছি ছোট-জন বলল, 'এলাম গো শেষ পর্য গলাটা এখনও মরেনি, ধাক্কা খায় কোথাও। দ্বিতীয়জন বলল, 'মানুষজন কাউকে দেখিনা কেন!' গলার স্বর খনখনে। প্রথম-জন দুই হাতের মুঠোয় লাঠি নিয়ে গাল চেপে বসেছিল, 'একটা লোক থাকে বললো যে, সে ব্যাটা কোথায়?'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর ওরা উঠল। তৃতীয়জন উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরের মধ্যে তাকালো। আগে শুধু দাওয়াটা আর মাথার ওপর চালা ছিল একটা। এখন চাটাই দিয়ে চারটে দেওয়াল দেওয়া হয়েছে। দরজাও আছে একটা। 'কেউ নেই মনে হয়।' বলে তৃতীয়জন ঘরে ঢুকে পড়ল। একটু বাদেই তার গলা শোনা গেল, 'অ দিদি' লোক আছে গো। উনুন জ্বলে তাতে গাদা খানেক মাছ সেদ্ধ হয় দেখি।'

দ্বিতীয় জন বলল, 'মাছ? আহা—কি মাছ রে!'

বড়জন চারপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'দুটো নিয়ে আয় দেখি।'

ছোটজন বেরিয়ে এল খালি হাতে। 'নিয়ে আসব যে, অন্য লোকের মাছ না?' বড়জন হিহি করে হাসল খানিক, 'তাতে কি, ব্যাটাছেলেরা তো আমাদের ছেলের মত।' আশেপাশে কেউ থাকলে শ্বনতে পাবে এমন জোরে বলল কথাগ্বলো। খিল খিল করে হাসতে চেষ্টা করল তৃতীয়জন, 'যে সে লোক নয় গো, ভূত নামায়। রাত বিরেতে কথা বল। তদের সঙ্গে, হ্যাঁ। দ্বিতীয়জন যোগান দিল, 'আবার বাঁজা মেয়ের সাধ খাওয়ার ব্যবস্থা জানে।'

তিনজনেই হো হো করে হাসল। বড়জন জোরে, দ্বিতীয় চেপে চেপে, ছোট্ট রসিয়ে রসিয়ে। ছোটর নজর পড়ল কলা গাছে কলা হয়েছে। একটা কাঁদিতে বস্তা জড়ানো। তার ফাঁক দিয়ে পেকে যাওয়া নাদ্বস ন্বদ্বস এক ছড়া বেরিয়ে এসেছে।

'বোতাম ছি'ড়েছে গো, আহা।' ঘাড় দোলালো সে। দ্বিতীয়জন ব্বঝতে পারেনি প্রথমটা। শেষ পর্যন্ত কলা লক্ষ করে থরথরে জিভটা জলে ধ্বয়ে নিল, 'যা না ভাই, হাত বাড়ালেই পাবি, যা না, পেট আমার অম্ব্ববাচী করা মেয়েছেলের মতন হয়ে আছে।'

বড়জন বলল, 'যা না মাগী, খিদে লাগেনি তোর?'

গড়িমসি করে ছোটজন উঠল। ওপাশে কুয়ো আছে একখান। তার গা দিয়েই কলাগাছের ঝাড়। শরীর এখন ভারী, মনের চাকর নয়। হাত বাড়ালেই নাগাল হয় না। লাফাবে এমন সাহস নেই। কোথায় কোন জন শত্রুতা করার জন্য বসে আছে বলা যায় না। লম্বা শরীরের আঁকশি পেলে হতো। একটা ছোট্ট কঞ্চি পড়ে আছে দেখে তুলতে যাচ্ছে এমন সময় একটা ধমক শ্বনতে পেল ছোটজন, 'কলা পাড়া নিষেধ আছে।'

দাওয়ায় বসে বড়জন বলল, 'কে রে?'

দ্বপদাপ পা ফেলে সে সামনে এসে দাঁড়াল। তিনজনই অবাক চোখে ওকে দেখছিল। ও বাবা, এ যে দেখছি বেশ মন্দ মান্বষ। দাঁড়ি গোঁফ গজিয়েছে এমন বয়স বোঝা ম্বশকিল। চুল বেশ বাবরি হয়ে আছে। হাঁটু অবধি ধ্বতি গোটানো, উদোম গা। হাত-পা ফাটা ফাটা। বেশ রেগে গেছে দেখলেই বোঝা যায়, 'কি মনে করে এখানে? কি চাই?'

'চাই?' না না কিছ্ব না, কিছ্ব চাই না। এই বয়সে আর চাইবো কি বাপ। তা তুমিই ব্বঝি সেই।' বড়জন মাথা দ্বলিয়ে বলল।

'সেই মানে?' লোকটা তিন ব্বড়িকে দেখে নিল।

'ঐ যে ভুতের সঙ্গে কথা বলে, মেয়েছেলের বাচ্চা করে দেয়। শ্বনলাম যে, ধোউয়ালির হাটুরেরা বলছিল।' ছোটজন সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে লোকটার শরীর খ্বটিয়ে খ্বটিয়ে দেখতে লাগল, 'নাঃ, অ দিদি, পাপটাপ তো ঢোকার জায়গা পায়নি মনে হয়। পেটটেট তো দেখি এখনো এয়ো হয়ে আছে।'

বড়জন বলল, 'তা পায়ের গোড়ালি দেখেছিস? কানের লতি নাকের পাটা? ঠিকটাক বলিস বাপ্ব, আমি আবার পানসে দেখি আজকাল।'

এতক্ষণ কথা বলল মেজো, 'না গো, ছোট ঠিকই বলেছে!' লোকটা একট্ব ঘাবড়ে গিয়েছিল গতিক দেখে, শেষ পর্যন্ত সামলে নিল, 'কে পাঠিয়েছে এখানে?'

'হাটের লোকজন।' ছোটজন বলল, 'থাকার জায়গা খ্ব'জছিলাম, তা বলল সবাই তোমার গ্বণের কথা, দেখতে এলাম।'

মেজো ধমকে উঠল এবার, 'আঃ কাজের কথাটা বলনা আগে। এই যে বাছা, খিদে লেগেছে বড়, মাছ রাঁধছ শ্বনলাম, দ্বটো ভাত চাপিয়ে দাও আমাদের জন্য।'

'ইস।' ভেংচে উঠল, লোকটা, 'আমার ভেরে! এক ফোঁটা চাল নেই ঘরে উনি খাবেন ভাত। এখানে থাকা-টাকা হবে না। একটাই ঘর।'

'তাতে কি! আমরা তো ঘাটের মড়া। ফেলিস না বাপ।' বড়জন বলল। 'ভূত দেখার বড় সাধ।' ছোটজন পিনিক কাটলো।

'নোনা রায় শ্বনলে ছাল ছাড়িয়ে নেবে আমার।' লোকটা চোখ বড় বড় করে ভয় দেখাতে গিয়ে দেখল ছোট হাসছে। 'কোন নোনা? কাঠডাঙ্গার সেই মিনসে! গোঁফ না উঠতেই আমার ঘরে এসেছিল গো। কি ছেলে, ব্বঝলে দিদি, সেদিনই আবার ওর বাপের আসার কথা! কোনরকমে সামলে স্বমলে ফেরৎ পাঠাই। বাপটা ছিল কষাই। ছিবড়ে করে ফেলতো যেন। হ্যাঁ সেই নোনা নাকি! বাঃ বাঃ!' লোকটা হাঁপিয়ে শ্বনে-

স্যাটিন ডল
শ্যাম্পু

আপনার চুল এমন করে তুলুন—লোকে যেন ফিরে ফিরে চায়। স্যাটিন ডল ব্যবহার করুন। এ এক কার্যকরী শ্যাম্পু—যা মৃদু অথচ পুরোপুরিভাবে কাজ করে।
সত্যিকারের পরিষ্কার চুলের জন্যে আর অযথা পরিশ্রম করবেন না—স্যাটিন ডলের সমৃদ্ধ ফেনা চুলের ময়লা আর অতিরিক্ত তেল চট করে পুরোপুরিভাবে নিংড়ে বার করে দেয়, চুলের একান্ত প্রয়োজনীয় সহজাত তেল বজায় রাখে। এর ঘনীভূত গুণ চুল পরিষ্কার ক'রে সুন্দর ক'রে তোলে। স্যাটিন ডলের যাদুস্পর্শে আপনার চুল দুলে ওঠে...ফুলে ওঠে... দেখায় বেশী। আপনি পান কোমল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুরভিত...অপূর্ব সুন্দর চুল। নিয়মিত স্যাটিন ডল ব্যবহার করুন—নিজেই দেখতে পাবেন অন্যের সঙ্গে এর পার্থক্য কত রমণীয়!

satin doll SHAMPOO FOR LOVELY HAIR

স্যাটিন ডল

চিকন নির্মল চুলের জন্যে বহুগুণের শ্যাম্পু!

everest/424/ACW-ba

ছিলো কথাগুলো, ছোট থাবড়েই মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'বড় পাপ হে, বিচার করো।'

মেজো যেন ভূত দেখলো সামনে, 'আঁ। বলে কি গো।'

ছোটজন চোখ ঠারলো, 'পাপ, পাপ করেছো গো, বিচার চায়!'

বড় মাথা দোলাল, 'শুনবো, সব শুনবো। আগে খেতেটেতে দাও। বুঝলে বাপ, পেট হল সবচেয়ে বড় পাপী। সেটা মিটালে পাপের কথায় জিভে স্বাদ লাগবে।'

'এথানে থাবার টাবার নেই। চাষ-বাস হয় যার থাবার তার কাছে। আমি মাছ মাংস ধরে খাই, তোমরা বিধবা মানুষ—।' লোকটা মিনমিনে গলায় বলতে চেষ্টা করল। ওদিকে উনুনে চাপানো বাটি থেকে গন্ধ উঠছে জোর। এবার নামানো দরকার।

বড়জন শিরাঝোলা হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে বলল, 'ও বাপ, বিধবা বলো না গো। হাজার হাজার ভাতার ছিল আমার, মরে হেজে গেলেও কেষ্ট কেউ তো এখনো দিব্যি ফুরফুরিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তা বিধবা হলাম কি করে!'

লোকটা টক করে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। হায় হায়, আর একটু দেরী হলেই হয়েছিল আর কি! জল শুকিয়ে তলা ধরবো ধরবো করছে। নুন তেল ছিটিয়ে নামাতে নামাতে ও বাইরের দিকে তাকাল। ছোটজনের ছেঁড়া জামার গিঁট দেখা যাচ্ছে: পেছন ফিরে আছে। আর দুজন চোখের আড়ালে। তাই নিজের মনেই যেন বলল ও, 'হাজার ভাতার তো বেবুশ্যেদের হয়।'

মেজোজন বলল, 'ছেলের দেখি বুদ্ধি আছে খুব। ঠিক ধরে ফেলেছে।'

কথাটা শুনেই লোকটা কাঠ হয়ে গেল। অ্যাঁ! এই তিন বুড়ি বেবুশ্যে। বোউয়ালির লোকজন এখানে পাঠিয়ে দিল কেন? ওকে পরীক্ষা করতে? মেয়েছেলের কাছে গেলে শরীর নষ্ট হয়, বাপ বলতো। বাপেরও শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই। তা এদের কি মেয়েছেলে বলা যায়? দুজন তো শুকিয়ে আমসি, হাড়গুলো পটাং পটাং করে। ছোটজন যার শরীর একটু ভারী সেও তো এখন আভাঙ্গা কুঁজোর মত, মুখটাই সরু তলায় মস্ত ফাঁক—জল ধরে না। তো এদের কি আর মেয়েছেলে বলা যায়? এর আগে মেলায় ও বেবুশ্যে দেখেছে। তা তাদের ঠাঠঠমক আলাদা, বাপের কথা মনে হলেই বুকের মধ্যে ভয়টা টনটনাতো। এরা কিন্তু সে জাতের নয়। এককালে হয়তো ছিল, লোকটা ভাবলো, এখন তো গায়ের পাঁচ পুরুষ দেখা হরিবালার মত চেহারা সব। মাসী বলে ডাকা যায়। পরক্ষণেই নিজেকে ধমকে উঠল সে, কোথাকার কে, আদিখ্যেতা দেখানো মানে নিজের বাঁশ নিজে নেওয়া। মেয়েছেলে হোক না হোক, তিনটে পেট তো! ওগুলো ভরাবে কে? ঘর থেকে হাঁক ছাড়ল ও, 'এখানে সুবিধে হবে না, চলে যাওয়া হোক।'

'তাই নাকি!' ছোটজন বলল।

রাত বিরেতে জায়গা ভাল নয়, আর কিছু না হোক, হাতি নামে জঙ্গল থেকে।' লোকটা যেন ভয় দেখাল।

'কত হাতি মোষ দেখলাম সারাজীবন।' ঠেস লাগলো গলায়।

'তারপর নোনা রায় আছে। বড় রাগী মানুষ।' লোকটা যেন অনুনয় করছিল এবার।

'নোনার তলপেটে একটা আধুলির মত জড়ুল আছে, ও কিছু বলবে না, কী ভীতুই ছিল না দিদি কি বলবো।' ছোটজনের উদাস গলা।

বাঃ শালা। লোকটা অসহায় চোখে বাটির দিকে তাকাল। নোনা রায়ের বেবুশ্যে এরা। আবার নোনার বাপেরও। অথচ এদের কথা কোনদিন শোনেনি ও। ওর বাপ কি এদের—। খুব কৌতূহল হত ওর, 'তা এ তল্লাটে আগে দেখিনি কেন?'

'দশ বছর ছিলাম না গো, তীর্থ মারাতে গিয়েছিলাম। তা দেখলাম সেখানেও এক ব্যাপার। প্রথম প্রথম ছোটটার দিকে লোকে তাকাতো। তারপর তো আমরা পুঁটলি। তাই ফিরে এলাম এখানে। জায়গাটা চিনি, মানুষজন জানি। তা বলো, এই কুড়ি ত্রিশ

[illegible] অথ বুড়োজোয়ানরাই আমাদের চেনে, [illegible]!' বড়জন গলা কাঁপিয়ে কথাগুলো [illegible]।

[illegible] ভয়ে যেন গোপন খবর নিচ্ছে [illegible] গলায় সে বলল, 'আচ্ছা, কাঠডাঙ্গার [illegible], লম্বা মতন বাবরি চুল, গলায় [illegible] ছিল—।'

মেজোজনের গলা শুনতে পেল সে, '[illegible]—ও দিদি সেই লোকটা গো, তোমার কাছে একরাত্ত বাকী রেখে গিয়েছিল, মনে পড়ছে, বাবরি চুল!'

চট করেই প্রথমজন যেন মনে করতে পারল, 'সেই কেষ্ট ঠাকুর! বাকী রেখেছে আর শোধ করেনি। তা আমাদের পয়সা মারলে নিস্তার আছে বাপ! শুনেছি কুষ্ঠ হয়ে মরেছে। চেন নাকি বাপ? কেউ হয়টয় নাকি?'

বাটি হাতে নিয়ে লোকটা কুঁকড়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল, 'আমার বাপ।'

॥ তিন ॥

সন্ধ্যে থেকেই খুঁটিমারি জঙ্গলের নিশ্বাসের মত একদল বাতাস আনাগোনা করছিল। এখন আকাশে মেঘ নেই। বুকে বাঁধিয়ে রাখার মত আকাশটার তলায় দাঁড়ালে শরীর শির শির করে। এ জায়গাটায় দিনে যতই গরম হোক রাত পড়লে কেমন শীত শীত ভাব। যেদিকে তাকাও আলোর দেখা পাওয়া যায় না। শুধু ফাঁকা মাঠের ওপর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা জোনাকিরা কিলবিল করে।

কলাগাছের ঝোপের ওপাশে একটা বড় পাথরে লোকটা বসেছিল। ওর ঠিক মাথার ওপর ছাতির মত চাঁদ ঝুলছে। লোকটা অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে আছে। ওপর পেছনে চালাঘরটায় তিনবুড়ি কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পড়ে আছে। তিন তিনটে পেটে আধচেবানো ঘুঘুর মাংস পড়েছে রাত হলেই। রোদ মরলে ও চলে গিয়েছিল সেই বাঁশঝাড়ে। ঘণ্টাখানেক লাগেনি গোটা চারেক ঘুঘু হাতে ঝুলিয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু আজ পোড়ানো হয়নি সেগুলো, ছোটজন ভাঙ্গা হাঁড়িতে সেগুলো সেদ্ধ করেছে। এ অন্যরকম স্বাদ। আজ সারাদিনটাই অন্যরকম গেল। চাঁদের দিকে তাকিয়ে লোকটা বাপের মুখ মনে করতে চাইল। তারই মত বাবরি চুল ছিল বাপের। লোকে বলতো বাপ বেটা দেখতে একরকম। বাপ, তুমি বাকী রেখেছিলে কেন হে বেবুশ্যের কাছে? আমার [illegible] পয়সা আছে খড়ের নিচে পোঁতা, তোমার ধার শোধ করে দেব! অভ্যেসে লোকটার একটা হাত চলে গেল কানের [illegible]। টেনেটুনে দেখল। প্রথমে ছিল অন্যমনস্ক, চট করে খেয়াল হতেই অন্য [illegible] হাত দিল। সাড়ু নেই নাকি! না, ঠিকই আছে, বেশ ব্যথা করে একটা। অন্যটার—মাথা ঝাঁকালো সে। চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'বড় পাপ হে, বিচার করো।' জল এসে গেল চোখে।

'আমরা এসেছি বাপ!'

চমকে ফিরে তাকালো সে। প্রথমটা ঝাপসা দেখল ও। তিনটে বাঁকা আধবাঁকা শরীর ওর ঠিক পেছনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। চাঁদের আলোয় তাদের সেই তেনাদের মত দেখাচ্ছে। হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল ও। দাঁড়িয়ে হাতজোড় করল। তারপর চোখ বড় বড় করে দেখল তিনবুড়ি ওর দিকে কেমন মোহিনী মুখে তাকিয়ে আছে।

'কথাবার্তায় বিঘ্ন করলাম না তো।' বড়জন ফিস ফিস করে বলল, 'উনারা রাগ করবেন না তো, ক্ষমা চেয়ে নাও বাপ। তুমি তো আমার ছেলে।'

মেজোজন বলল, 'এই শুনেই এসেছি

গো তোমার কাছে। হাটুরেরা বলেছে তোমার সঙ্গে ওঁদের যোগাযোগ আছে, স্বচক্ষে দেখলাম আজ।'

ছোটজন মাথা নিচু করে বলল, 'নইলে কেউ একা একা এই বাদাড়ে থাকতে পারে!'

ওরা তিনজনই পাশাপাশি মাটিতে উবু হয়ে বসল। ওদের সামনে লোকটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। কি করবে বুঝতে পারছিল না সে। বড়জন তেমনি ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমরা এখানে থাকতে আসিনি বাপ। কাল ভোর ভোর চলে যাব। তোমাকে একটা কাজ করে দিতেই হবে।'

খসখসে গলায় লোকটা বলল, 'কি?'

মেজোজন বলল, 'তুমি কোন মেয়ে-ছেলের সঙ্গে শুয়েছ গো?'

চমকে উঠল লোকটা, 'না, না। কক্ষনো না। মেয়েছেলে শরীর নষ্ট করে দেয়।'

ছোটজন বলল, 'মেয়েছেলে নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা—।'

প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ল লোকটা, 'না-না।'

মাথা দোলালো তিনজন। বড়জন বলল, 'অঙ্গ দেখেই বুঝেছিলাম। তাই তো উনারা তোমাকে বেছে নিয়েছেন। তা আমাদের অনুরোধ রাখ এবার।' আমরা তিনজন তো ঘাটের মড়া, পা বাড়িয়ে বসে আছি। সারা-জীবন বেবুশ্যে ছিলাম, মরতে গেলেও বেবুশ্যে। অনেক তীর্থ করলাম, লোকে যেই শোনে বেবুশ্যে, ভোজা চাহনি চালায়। ছোটর যৌবন গেলেও খোলসটা যে ছাই যায়নি। তা তোমার কথা শুনে এখানে এসে তোমাকে দেখলাম। তা বাপ, মরার পর সব তো যাবে আগুনে যদি শ্যাল কুকুরে না খায়, পাপগুলোর গতিটা কি হবে! তুমি বাপ আমাদের বিচার করো। না বলো না বাপ—পিতৃঋণ না হয় শোধ করো।'

তিনজন ভিখিরীর মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল এবার। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা বসে পড়ল পাথরটার ওপর। সামনে তিন বুড়ি মাটিতে বসে। চাঁদের আলোয় সব পড়েছে [illegible]। অজান্তে হাতের আঙুল চলে গেল [illegible]। কুঁকড়ে গেল ও, হায় বাপ, এটাতেও ব্যথা লাগে না কেন? ফিস ফিস করে সে বলল, 'বড্ড পাপ হে—।'

'তা হলে বাপ,' প্রথমজন বলল, 'বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলাম। শুধু মিছে কথা না, কেউ আমাকে বেবুশ্যে করে নি। স্বামী মারা যাবার আগে স্বাদ পেয়ে-ছিলাম মনে। তার টানে টানে চলে এলাম গো। না আফসোস করি না। তিরিশ বছর কাজ করেছি আমি। হাজারো হাজার মানুষ দেখলাম। সব এক রকম। ঘরে ঢোকার পর অন্য চেহারা থাকে আলাদা। এর জন্যে বিচার চাই না। আমি তো পাপ করিনি

কিছু। লোককে আনন্দ দেওয়া কি পাপ? কিন্তু আমরা কি বুঝতে জানো, সেই কোন স্বামীকে ধরে ভুলতাম ভাবতাম আমার স্বামী এসেছে। সেই স্বামী, যে বারো বছর আগে আমাকে ফেলে চলে গেছে। এখন মনে হয় বাপ, আমি অন্যায় করেছি। সেই লোকটার আত্মাটাকে, কষ্ট দিয়েছি। এটাই তো পাপ। তুমি বিচার করো বাপ, 'সে কি আমায় জিজ্ঞেস করো।'

বড়জন থামতেই অঝরধারে হঠাৎ নিজ'ন হয়ে গেল। লোকটার দুটো পা মাটিতে যেন আটকে গেছে। ও নড়তে পারছিল না। এই বুড়ি মেয়েছেলেটার সঙ্গে চুরি করে রাত কাটাতো ওর বাপ। এই বুড়ি ওর বাপের শরীর নষ্ট করেছে। কিন্তু বাপ কেন বাধা দেয়নি এর কাছে। ওর মা, যে নাকি ওকে জন্ম দিয়েই কার সঙ্গে কোথায় চলে গিয়েছে, সে কি বাপকে দুঃখ দেয়নি। ফিস ফিস করে ও বলল, 'মা, মা—।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রথমজন টলমল গলায় বলে উঠল, 'জোরে বল বাপ, আঃ, আঃ, কি শান্তি।' হু হু করে কেঁদে ফেলল বুড়ি।

নড়েচড়ে বসল দ্বিতীয়জন, 'আমার ঠাকুরপো আমাকে রাস্তায় এনেছিল। রাস্তা থেকে নিজেই ঘরে এলাম। তা দিদির মত আমার দুঃখ হয় না বলবো না, হয়। সংসারের জন্যে আগে কষ্ট হত। এই কুকুরের জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। কপাল এমন, তিন তিনবার ছেলে বিয়োবার চেষ্টা করেছি, জন্মাবার সময় কে যেন ফাঁস টেনে মেরে ফেলেছে তাদের। রাজপুত্র না হোক, আমার ছেলে হতো তো বেঁচে থাকলে। দিদি বলত, আগের জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল তারা তাই নাড়ি পৈতের মত গলায় আটকে যেত তাদের। তাতে আমি কি পেলাম বল। এ সব সুখ দুঃখ তো আছেই। একদিন দেখলাম শরীর জ্বলছে। কাউকে বললাম না। এক সন্ন্যাসীর কাছে পুজো দিতে গিয়েছিলাম, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাকে বোঝা সাধুর গল্প বললেন। মন সায় দিচ্ছিল না, তবু ভাবলাম হয়তো এটা পরীক্ষা। রাত্তিরবেলা শরীর দিয়ে তাঁর পুজো করলাম। বললেন, এবার ছেলে বাঁচবে। তা তোর রাতেই মনে হল অশান্তি হচ্ছে। সন্ন্যাসী চলে গেলে টের পেলাম পরে, বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। রাগ হয়ে গেল খুব। মায়া নেই মমতা নেই। ডাক্তার দেখালাম না, এক মাস ধরে মানুষের শরীরে সেই বিষ ছড়াতে লাগলাম। এখন মনে হয় কি পাপই করেছি আমি। কত মানুষ অন্ধ হলো, কত সংসার ভেঙে গেল, সব আমার হিংসের জন্য, পাপের জন্য। এখন আমি কি জবাব দেব?'

চার ধার আবার চুপচাপ। শুধু বড়জন এখনও ফুঁপিয়ে যাচ্ছে। একটা রাতের পাখি শব্দ করে ডেকে উঠল কোথাও। জোছনার সর ক্রমশ হলদে হয়ে আসছে। লোকটার মনে পড়ল বাপ বলেছিল, 'মেয়েছেলের কাছে যাবি না—বড় পাপ নিয়েছি হে।' যেন বাড়ীতেই জল ভরা আছে, লোকেরা এসে মগে করে তুলে তুলে নিয়ে যায়।

'কিছু বলো গো, আমার বুক জ্বলে যায় পাপে!' মেজোজন যেন থাকতে পারছিল না আর।

লোকটা বলল, 'আমি জানি না, কিছু জানি না।'

'তোমাকে বলতেই হবে বাপ। যা শান্তি হয়—। তোমার মায়ের দিব্যি।'

চমকে উঠল লোকটা। মায়ের দিব্যি। মা কেমন দেখতে? কোন ছবি নেই ওর মায়ের। বাপ বলতো কালোকেলে ছিল না। সামনে তাকালো ও। মেজোজনের মুখ দেখল। মাংস নেই একরত্তি। বুড়ো হলে কি কঙ্কাল শুকিয়ে যায়? সব মানুষের কঙ্কাল তো একই রকম দেখতে। মাংস আর চামড়ার হেরফেরে চেহারা আলাদা আলাদা হয়। মায়ের বয়স এখন কি এর মত হবে? মা এখন কোথায়? যার সঙ্গে চলে গেছে মা সে কি রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে? ফিস ফিস করে বলল সে, 'মা গো মা—!'

সঙ্গে সঙ্গে দুই বুড়ি দুজনকে আঁকড়ে ধরল। লোকটা দুজনের কান্না শুনতে পাচ্ছিল। ছোটজন মুখ নিচু করে বসে একধারে। বড় দুজন পরস্পরকে ধরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা কান্না নিয়ে মাথামাথি করতে করতে চালাঘরটার দিকে কেমন আবিষ্টের মত চলে গেল। লোকটা দেখল, বড়জন লাঠিটা মাটিতে ফেলে রেখে গিয়েছে। ফিস ফিস করে বলল সে, 'বড় পাপ হে, বিচার করো।'

খুব মৃদু কান্নার শব্দ আসছে ঘর থেকে। চাঁদ এখন ছায়া ফেলেছে লম্বা লম্বা। ঝাউগুলো এতো রাত্রে ক্লান্ত।

কেন? ছোটজন নড়েচড়ে বসল। তারপর সামনের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আমি কোন পাপ করিনি।'

কথাটা একদম আশা করেনি লোকটা। প্রতিদিন ও নিজে কত পাপ করে তার কি শেষ আছে। এই মাছগুলোকে যখন মারে তখন মনে হয় পাপ করলাম। ঘুঘু পাখি-গুলো যখন খাবি খায় তখন মনে হয় পাপ করলাম। তবে? ছোটজন বলল, 'আমার মা ছিল এই লাইনেই, আমিও তাই করেছি। লোকে বলতো আমি নাকি উর্বশীর চেয়ে সুন্দর, রম্ভার চেয়ে আমার যৌবন বেশী। লাইন পড়তো আমার ঘরের সামনে। সে সব যা দিন গেছে, আঃ। দু হাতে টাকা উড়িয়েছি, একদম আফসোস নেই এখন, কি দেখতে ছিলাম? তুমি এমন মেয়েছেলে দেখেছ যার গায়ের রঙ গমের মত, চুল খুললে শাড়ি পরতে হয় না, ভেতরের জামা পরেনি দেখে এই সেদিনও লোকে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকতো, হাঁটলে পরে ছেলেবুড়োর জিভ শুকিয়ে যেত, দেখেছ?' মুখ কাত করে প্রশ্ন করলো ছোটজন।

ঘাড় নাড়ল লোকটা। না, না।

'তাহলে আর কি দেখেছ? ভোর হবার আগে আকাশ দেখেছ কিংবা সন্ধ্যে হব হব আকাশ? দ্যাখোনি, তা হলে কি দেখেছ! আমি সেই রকম ছিলাম। কিন্তু আস্তে আস্তে যেমন রাত হয়ে যায়, এ আমার তেমন হল যে। সব যে চলে যায়, যৌবনটা চোখের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। অথচ মন আমার মানতে চায় না কেন? কেন ইচ্ছে করে একটা পুরুষমানুষ আমাকে দেখে ভিতরে ভিতরে কাঁপুক। কেন ইচ্ছে করে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি একটা সত্যিকারের পুরুষমানুষকে ধরে রেখে থর থর করে কাঁপি? কিন্তু আমার যে কিছুই নেই আর। শরীরের কোথাও সাড় পাই না আজকাল। মনে হয়, এটা আমার দেহ নয়। কেন যৌবন চলে গেল শরীর থেকে তো মন বয়স গেল না?' গোখরো সাপের মত ফণা তুলে ছোটজন ওর দিকে তাকাল।

'আমি জানি না।' অসহায়ের মত বলল লোকটা। বলতে বলতে আঙুলে দিয়ে দু কানের লতি স্পর্শ করল। ব্যথা লাগে না কেন? চট করে নাক ধরল ও। কি ঠাণ্ডা নাক!

'জানো না! তোমার মনের মধ্যে এমন হয় না? সত্যি বল? শরীরের সব কিছু তোমার বশ?' উঠে দাঁড়াল ছোটজন।

'জানি না।' দু হাতে মুখ ঢাকল লোকটা।

'জানো না! ছি ছি ছি। তুমি আবার পুরুষমানুষ নাকি! সাড় নেই যার শরীরে তার আবার যৌবন কিসের! আমার মনে সাড় আছে তোমার তো তাও নেই। হায় কপাল, কার কাছে বিচার চাইতে এল ওরা। তোমার সারা শরীরে কুষ্ঠ, দগদগে ঘা, বাইরে থেকে দেখা যায় না, তাই তোমার সাড় নেই শরীরে। ওয়াক, থু।' এক দলা থুতু মাটিতে ছিটিয়ে ছোটজন দুপ দাপ পা ফেলে ঘরের দিকে চলে গেল। ভয়ে কুঁকড়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে লোকটা দেখল হাঁটার তালে তালে ছোটজনের অহঙ্কারী শরীর কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে আবিষ্কার করল তার জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সারা শরীরে কোথাও যেন জল নেই, হাত পায়ে কানের লতিতে সাড় নেই একদম। বাপ বলেছিল কুষ্ঠ হলে সাড় চলে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে ও নিজের বাপকে হিংসে করতে শুরু করল। মিথ্যে কথা।

ছোটজনের শরীর এখনও দেখা যাচ্ছে। নেতানো জোৎস্না মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সেখানে।

হঠাৎ মুখের সামনে একটা হাত নেড়ে কিছু একটা সরিয়ে দেবার ভঙ্গী করে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'হটো বাপ।'

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

পৃথ্বীশ শিকদার

তরুণতম শিল্পীদের মধ্যে পৃথ্বীশ শিকদারের ছবি মোটের ওপর ভালই। ডিসেম্বর ৬--১১এর একক প্রদর্শনী হয়েছে ৩২ চৌরঙ্গীর ডেকর সার্ভিস গ্যালারীতে।

হঠাৎ দেখলে এ'র ছবি ইম্প্রেসানিজম পূর্ববর্তী 'ওলন্দাজ কলমের' কথাটা মনে করিয়ে দেয়। প্রধানত ত্রিমাত্রিক ছবি আঁকেন এবং আলোর চেয়ে ছায়া সম্বন্ধে এ'র আকর্ষণ বেশি। বাড়িঘর, অলিন্দ, থাম, জানালা, রঙচটা বিবর্ণ অদ্ভুত সব কোণ, দেওয়ালের শ্যাওলার দাগ, নোনা-ধরা ইঁট। পৃথ্বীশের জগৎ থেকে মানুষ নির্বাসিত কিন্তু মনটা তাঁর নাগরিক।

কল্পনা করুন, একটি কলতলার চারপাশে শান বাঁধানো চৌকো জায়গা। হলুদ বিবর্ণ একটা রঙ আর জল পড়ে পড়ে ক্ষয়ে যাওয়া সিমেন্টের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে নীচের ইঁট। এই দৃশ্যকে পৃথ্বীশ বিন্যস্ত করেছেন পটের ওপর লম্বালম্বি। ফলে ইউক্লিডের জ্যামিতির নানান প্রতিপাদ্য আমাদের সামনে চাক্ষুষ হয়ে উঠছে। কিংবা পুরনো ভিকটোরীয় বাড়ির দরজা। ওপরের দিকে আলো এসে পড়ে ঘিয়ে রঙের চটা ওঠা দিকটিকে উজ্জ্বল করেছে, নীচের দিকটা অন্ধকার মতো, ম্লান কালচে সবুজ। অর্ধেক আলো, অর্ধেক ছায়া—ক্ষয়িষ্ণু সব কিছু, হয়তো বিষাদের একটা সুর, অথচ তিক্ত নয়, ক্ষুব্ধ নয় পৃথ্বীশের স্বর। এইসব পুরানো বাড়ির কার্নিস, জীর্ণ খিলানের আকার, পলেস্তরার বলিরেখা—সভ্যতার জটিল ঘুণপোকা। ক্রমশ ক্ষীণ নিস্তেজ হয়ে যায় দিনের আলো। শহর কি ফেলবে শেষ নিঃশ্বাস?

পৃথ্বীশ কোথাও মোটা ক'রে রঙ চাপিয়েছেন, কোথাও চিক্কলেপ করেছেন এবং এসব বিষয় তাঁর মুনশীয়ানা আছে। এই বিবর্ণ পৃথিবীকে কিভাবে রাঙাতে হবে এসব বিষয় ভাবেন। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে ইউরোপীয় প্রথাগত বাস্তববাদের দিকেই ঝোঁক তাঁর। 'কোলাজে' যখন তিনি এই ঘোর কাটিয়ে আসতে চাইছেন তখন একইভাবে সফল হতে পারছেন না। চিত্রকল্প যেন অতিরিক্ত জবড়জঙ হয়ে যাচ্ছে। যথা 'ধর্মসিঁড়িতে'—দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বুদ্ধমন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে শ্রমণদের উঠে যেতে দেখি, তারপর নারীদেহের নানা প্রদর্শনী, যুদ্ধদৃশ্য—হয়তো মার্কিন কূটনীতি এবং প্রাচীন সভ্যতার দুর্গতি তাঁর বক্তব্য বিষয়। বা বড় পাথরের প্রাচীর তার ওপর জুলিয়াস সিজারের মুখ, যুদ্ধদৃশ্য, একটা খিলানসদৃশ ফাঁক—ফাঁকা মাঠে নীল আকাশের মধ্যে একটা শিশু, তার পায়ের তলায় গহ্বরে একটা রক্তরাঙা আগুন। এইসব মন্তাজ অতিরিক্ত বক্তব্যকে বহন ক'রে যেন ঈষৎ ন্যুব্জ—শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে।

পৃথ্বীশের মধ্যকার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু তাকে রূপারোপ, চিত্রমাত্রা ভারতীয় পরিবেশ এবং চিত্র ঐতিহ্য সম্বন্ধে আর একটু ভাবতে হবে। অধিগত বিদ্যা নয় বোধ হয়, আর একটু আত্মসমীক্ষা। ইদানীং ছবি দেখলে মনে হয় যেন তাড়াহুড়া করে কাজ করছেন।

মণিকাঞ্চন

সম্প্রতি গীতা ও বিশ্বপতি মাইতি, বিনোদ দাস, তিলক মণ্ডল এবং কাঞ্চন দাশগুপ্তর একটি প্রদর্শনী দেখে প্রাণ জুড়িয়ে গেল (বিড়লা আকাদমী ৯রা—১৪ই নভেম্বর)। এ'রা বয়সে তরুণ, পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ও উদ্‌ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী। প্রত্যেকেই আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গীতা ও বিশ্বপতি সম্প্রতি উদবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। দুজনে কিন্তু মনের সুখে কাজ ক'রে যাচ্ছেন। দুজনেই অস্বচ্ছ জলরঙে কাজ করেছেন, কিন্তু এ'দের কাজের ধরনটা সম্পূর্ণ আলাদা। গীতা শহর ও গ্রামের বাসস্থানের জ্যামিতিক নকশার মধ্যে অন্তর্নিহিত দৃশ্যময়তা ও বর্ণাঢ্য সুষমা ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচনা বেশ আঁটসাট ও রঙগুলো ঝকঝক। একটা আশ্চর্য হলুদ আভায় উদ্ভাসিত। কখনো 'মহানগর সকালের আলো'-য় স্নান করে হয় স্নিগ্ধ। কখনো পাহাড়ী পর্ণকুটির আবার কখনো 'সিঁড়ির' জ্যামিতিক কাব্য ও ছায়াচ্ছন্ন আলো অন্ধকার এবং নগরের বিস্তারের 'ভগ্ন রচনা' আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। রেশমের ওপর জলরঙের কাজ নিখুঁতভাবে জমিয়েছেন। বিশেষত বুনোটের ওপর তাঁর সূক্ষ্ম খেলা ভাল লাগে। বিশ্বপতির দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নেই, কিন্তু অশেষ মিত্রের সঙ্গে বছর কয়েক আগে প্রদর্শিত তেলরঙের কাজগুলো আমার চোখে লেগে আছে। বিশ্বপতি নিজেকে নষ্ট করছেন। অকারণে গণেশ পাইনের ছিটমহলে হামলা করছেন। এমনিতে বিশ্বপতির অঙ্কন রচনা ত্রুটিশূন্য। মুশকিল হলো তাঁর চিত্রকল্প ও রূপারোপের ধরনটা গণেশীয়। বিশ্বপতির রঙ চাপানোর কৌশল ও তুলির টানটোন অনবদ্য। তাঁর 'পুরোহিত', 'ক্লাউন' 'সাপুড়ে, 'বাঁশিয়ালা' ও 'সূর্যমুখী ও চাঁদের আলোয়' নারী যেন একটু বেশি বানিয়ে এবং ফেনিয়ে তোলা। বড় বেশি স্নিগ্ধ এবং মিষ্টি বলেই আতঙ্কের ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়।

তিলক মণ্ডলের মৌলিক ও শুদ্ধ রঙ চাপিয়ে দেবার ফরাসী মেজাজটা আমার ভাল লাগে ভীষণ। কখনো কালো সীমারেখার বন্ধনে তিনি মানুষ বা জন্তু বা জিনিসপত্রের আদলটাকে বেঁধে ফেলেন। রেখা এখানে গতিশীল এবং শিরা-উপশিরার মতো পরস্পরচ্ছেদী। যেন ভেতরের পেশী ও হাড়ের গঠনটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একাকীত্ব, হিংসা, স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতার বেড়াজালে মানুষ নিজেকে যেন বন্দী ক'রে ফেলেছে। 'বামন' হয়েও যে ভাঁড় আর কুকুর নিয়ে ব'সে থাকে বা যে বাবু ডেকচেয়ারে শুয়ে আরাম করে কিন্তু নতমুখী স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখে না, বা খেলা দেখানোর গতিশীলতার মধ্যে যে আনন্দটার মুক্তি দেখা যায় না, যে মেদবহুল বাবুটিকে রিকশায় ওঠার পর একটি রাস্তার কুকুর অবাক হয়ে দেখে বা পথের ধারে যে বাজীকর তার খেলা দেখায়—এরা অবিস্মরণীয় চরিত্র। পার্কে, রাস্তাঘাটে, বাড়ির মধ্যে মানুষজন যেন নিজের ভেতরে কেমন বাস ক'রে গুটিয়ে গিয়ে, তিলক তাই দেখিয়েছেন। হয়তো লালের পাশে বেগুনী বা গাঢ় নীল ক্রমশ ফিকে হয়ে নীলে মিশেছে বা লালের পাশে এসেছে

উজ্জ্বল বাসন্তী হলুদ। তুলির মধ্যে উদ্ভিন্ন আবেগ এবং কল্পনা। তিনি রঙে রূপান্তরিত করে পটে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু তিলক আগেরবারের তুলনায় তাড়াহুড়োয় কাজ করেছেন এবং সেইজন্যে কিছু মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে।

বিনোদ দাসের কাজ আমাকে এবারে কিঞ্চিত নিরাশ করেছে। তৈলচিত্র আঁকছেন অথচ রঙ সম্বন্ধে অদ্ভুত কৃপণ তিনি। ধূসর সাদা একটা রঙ বিরাট পটভূমির ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি বিস্তারের বিলম্বিত ক্ষেত্র তৈরী করেছেন। নীল বা লাল বা কালো কেমন স্তিমিত ও ফ্যাকাশে। হয়তো একটা হোর্ডিং-এর উদ্বন্ধনে একটা যুবকের মুখ—পাশে ঝুলছে ঘণ্টা। বা 'ক্ষমতা' দেখি একটা পাখির খাঁচায় মানুষের কাটা মুণ্ড, মুকুট মাথায় একটি লোক ডুগডুগি বাজাচ্ছে এবং জাদু দণ্ড নাড়ছে। বা ক্যামেরার সামনে গ্রাম্য দম্পতী—বিনোদের দৃষ্টিভঙ্গী কিঞ্চিত তির্যক এবং পরিহাস ও রহস্য করার প্রবণতা আছে। কিন্তু নিস্তরঙ্গ রঙহীন ছবি আমার ভাল লাগেনি যদিও তিনি ক্ষমতাবান একথা মানি।

এঁদের মধ্যে কাঞ্চন দাশগুপ্তের কাজ অন্য ধরনের। এঁর নানা নিপুণ কৌশল দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল বিদেশী কোনো শিল্পীর প্রদর্শনী দেখছি। বক্তব্য পরিষ্কার এবং রেখা, রঙ আর রচনা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা আছে। যা করবেন বলে স্থির করেছেন একেবারে যথাযথভাবে তাই করেছেন। পট বিরাট এবং তৈলচিত্র এঁকেছেন। 'ফোটো বাস্তববাদ' এবং ছদ্ম সদবাস্তববাদ (Surrealism) মিলিয়ে এঁর নিজস্ব শৈলী, যদিও দ্বিমাত্রিকতার দিকে এঁর ঝোঁক। আকাশস্পর্শী বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি ছাদ আর ছাদের ওপর অ্যাণ্টেনা আর অসংখ্য ক্লাউন অ্যাণ্টেনার ওপর তাদের খেলা দেখাচ্ছে। কেউ শূন্যে ডিগবাজী খাচ্ছে, কেউ শতরঞ্চি ধরে আছে। চৌকো জ্যামিতিক ভূমির মধ্যে খেলা চলেছে। নীলাভ অন্ধকার, ধূসর নীল, হয়তো একটু হলুদ—ছবিটার নাম 'দ্রৌপদীজের খেলা'। 'মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন' ছবিতে লালাভ কালোর মধ্যে চতুষ্কোণ গেরিমাটি রঙের পার্ক। এই পার্কের সবাই 'ক্লাউন', বৃদ্ধ, যুবক, শিশু এমন কী মূর্তি। সামনে একটা গাড়ির ওপর বসে, ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছু যুবক ক্লাউন। যেন পৃথিবীর কোথাও কোনো সমস্যা নেই, প্রতিবাদ নেই, প্রতিকার নেই। এবং এরা আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসন্তুষ্ট এবং স্বার্থপর। পটের ওপর কাগজে কুটকুচি সেঁটে মন্টাজ তৈরী করেছেন অভিনবীয় নৈপুণ্যে। 'জাদুকর' ছবিতে আনুভূমিক বিস্তৃত পটে চিত্রার্পিত দর্শক যেন পুতুল আর মঞ্চে জাদুকর একটি মেয়েকে দ্বিখণ্ডিত করছে এবং একটি সভাকক্ষের চেয়ার টেবিলের ওপর লাল চাদর বিছানা। হলের ছাদে নানা কারুকাজ। ছবিটা খুবই জমাট। 'প্রতিবিম্ব' ছবিতে পটের দুই ভাগ। উপরে ছবি তোলা হচ্ছে, পেছনে পর্দা টানিয়ে, নীচে একটা চতুষ্কোণ ফাঁকা জায়গা এবং তার তলায় চেয়ার খালি, মানুষগুলো সব ক্রমশ পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'পৌনঃপুনিক দর্শনিকে' রাস্তা আনুভূমিকভাবে চলে গেছে, একটা গাড়ি আছে। জেব্রা ক্রসিং আছে। একটা খুঁটির মধ্যে গ্রামের দৃশ্যের পোস্টার আর তার ওপর রাবণের দশটা মাথা টানানো। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অবাস্তব কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রতীক, চিত্রকল্প সবই সু-অঙ্কিত। একটি মাত্র দোষ, বড় ছবি কিন্তু কাছে এসে দেখতে হয় অনুচিত্রের মতো। তবুও কাঞ্চনের অসাধারণ নৈপুণ্যে অভিনন্দন। তোমার সোনার প্যালেট, সোনার তুলি হোক।

সন্দীপ সরকার

নীললোহিতের চোখের সামনে

এই ট্রামটিতে শুধু দুদিকের দেয়াল-ঘেঁষা লম্বা টানা সীট। গেট দিয়ে উঠেই সামনে খানিকটা জায়গা পেয়ে বসতে গেছি কণ্ডাক্টর চোখের ইসারায় নিষেধ করলেন। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি, কণ্ডাক্টর কাছে এসে বললেন, লেডিজ!

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালাম। সম্প্রতি মিনি বাসে চড়া অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে বলে আলাদা লেডিজ সীটের কথা ভুলে যেতে বসেছিলুম। মিনি বাস বা ডি-লাক্স বাসে ছেলেরা-মেয়েরা স্বচ্ছন্দে এখনো পাশাপাশি বসে। কিন্তু যেগুলি কুড়ি পয়সার গরীবদের ট্রাম বাস, সেখানে নারী-পুরুষের দ্বিজাতিতত্ত্ব এখনো অব্যাহত রয়ে গেছে।

আর তেমন জায়গা নেই তাই হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। কণ্ডাক্টর ভদ্রলোক আমার উপকারই করেছেন, হঠাৎ কোনো মেয়ে এসে ভুরু কুঁচকে আমাকে উঠতে বললে আমার খুবই খারাপ লাগতো। মেয়েদের ভ্রূ-কুঞ্চন দেখলে আমি মর্মাহত হই।

ওপাশের দুজন ভদ্রলোক একটু চেপে-চুপে বসে সহৃদয়ভাবে আমাকে বসবার জায়গা করে দিলেন। এরকম ভাবে বসাটা খুবই অস্বস্তিকর, তবু নিজের চেহারাটা যত দূর সম্ভব সংকুচিত করে বসে পড়লাম। পরের স্টপেই তিনটি মেয়ে উঠলো।

এর পর কাহিনীটি এইভাবে এগোতে পারতো। ওদের মধ্যে একটি মেয়েকে দেখে আমি চমকে উঠে বললাম, আরে, মুকুলিকা যে! মেয়েটিও চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললো, তুমি, তুমি নীলুদা না? কতদিন পর দেখা!

দুঃখের বিষয়, সে রকম কিছুই ঘটলো না। মেয়ে তিনটিকে আমি একদম চিনি না। তারা আমার দিকে একবারও চেয়ে দেখলো না। অবিলম্বে নিজেদের মধ্যে অফিস-বিষয়ক আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেল।

আমার পাশেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, আধময়লা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ট্রাম রাইটার্স বিল্ডিংস যাবে?

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

একটু পরে কণ্ডাক্টর আমার টিকিট কাটার পর সেই বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে টিকিট চাইলেন। তিনি প্রথমে বুক পকেট, তারপর পাশের দু পকেট, তারপর আবার বুক পকেট দেখে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে অনেক কাগজপত্র বার করে খুঁজলেন। টাকা পয়সার কোনো চিহ্ন নেই।

তখন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, যাঃ!

কণ্ডাক্টর হাত বাড়িয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে। মুখে চোখে কোনো রকম কৌতূহলের চিহ্ন নেই।

বৃদ্ধ আবার বললেন, গেছে! পকেট মার হয়ে গেছে। একটাও পয়সা রাখেনি!

পকেটমারির কথাটাও অনেক দিন শুনিনি। মিনি বাস বা ডি-লাক্স বাসে পকেটমারির সুযোগ নেই। সেখানে সবাই সীটে বসে যায়, না দাঁড়ালে পকেটমাররা হাত চালাবার সুবিধে পায় না। এই ট্রামটা কিন্তু সদ্য হাওড়া থেকে ছেড়েছে, এখনো তেমন ভিড় নেই।

বাসের সমস্ত যাত্রী নীরব। আমরা এক ধরনের ব্রিটিশ ভদ্রতায় রপ্ত হয়ে গেছি। অচেনা লোকের কোনো ব্যাপারে মুখ খুলি না। অনেক যাত্রীই আড়চোখে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে লক্ষ করছে, কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করছে না।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দাড়ি-না-কামানো মুখ, পোশাকও সম্ভ্রান্ত নয়। কেউ কেউ হয়তো ভাবছে, লোকটি ভাড়া ফাঁকি দেবার মতলব করছে। ট্রামে-বাসে তো এরকম কত রকম চরিত্রই ওঠে।

বৃদ্ধ লোকটি আবার পকেট উল্টে বললেন, সাড়ে তিনটে টাকা ছিল, কিছুই রাখেনি। তারপর কণ্ডাক্টরকে বললেন, পয়সা নেই বাবা! নেমে যাচ্ছি। হেঁটেই যাবো রাইটার্স বিল্ডিংস!

দুটি কারণে বৃদ্ধকে আমার প্রতারক

মনে হলো না। প্রথম ধাঃ বলে উনি হেসে উঠেছিলেন এবং ও'র মাত্র সাড়ে তিন টাকা চুরি গেছে। এটা কোনো পাকা অভিনেতার কাজ নয়।

আমি মৃদু স্বরে কন্ডাক্টরকে বললুম, ও'কে বসতে বলুন, ও'র টিকিটটা আমি কেটে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ আবার বসে পড়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমি দাদা আমার টিকিট কাটলে কেন?

এই সব ক্ষেত্রে লোকে যা করে আমিও সেইভাবে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার জন্য বললাম, ও কিছু না!

—বুঝলে দাদা, ব্যাটারা বড্ড চালাক। টাকাটা বুক পকেটে না রেখে মনের ভুলে পাশ পকেটে রেখেছি, অমনি ঠিক তুলে নিয়েছে। ট্রেনেই নিয়েছে।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—আসছি তো চন্দননগর থেকে। রাইটার্স বিল্ডিংসে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে একখানা দরখাস্ত দেবো—তা ফেরার ট্রেন ভাড়া, আর দুপুরে যদি কিছু খেতে হয় এই বাবদ সাড়ে তিন টাকা এনেছিলাম হিসেব করে...

বৃদ্ধ বেশ জোরে জোরে কথা বলেন। কাছাকাছির যাত্রীরা সবাই শুনছেন। এবার আর একজন যাত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আবার চন্দননগরে ফিরবেন কি করে?

বৃদ্ধ বললেন, সে একটা কিছু হয়ে যাবে। ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই তো হবে।

—রাইটার্স বিল্ডিংসে কেউ চেনা নেই?

—না। এখন আর কাউকে চিনি না। এককালে চিনতাম। এক সময় আমি জেল খেটেছি, সুভাষ বোস, গান্ধীজীর কাছে কাছে ঘুরেছি, ও'দের ফাই ফরমাস খেটেছি, এই দেখো না দাদারা, একটা দরখাস্ত নিয়ে যাচ্ছি।

উনি বুক পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। কয়েকজন ঝুঁকে দেখলো। কথাটা মিথ্যে নয়। বৃদ্ধটি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, সেই মর্মে একজন এম এল এ-র সার্টিফিকেটও আছে, উনি দুশো টাকা সরকারী বৃত্তিও পান, এখন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোর জন্য কিছু সাহায্যের আবেদন করতে যাচ্ছেন। এইকম সাহায্য দেওয়া হবে বলে লোকমুখে শুনেছেন।

বৃদ্ধদের একটু বেশী কথা বলা অভ্যেস থাকে সাধারণত। উনি অনেক কথা বলতে লাগলেন। তার মধ্যেই অন্য পাশের সহযাত্রীটি একটি দু টাকার নোট বার করে খুব বিনীতভাবে বললেন, যদি কিছু মনে না করেন তো এটা আপনি রাখুন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। টাকাটার দিকে চেয়ে বললেন, কেন দাদা, এটা আমাকে দিচ্ছো কেন?

ভদ্রলোক আরও নীচু গলায় বললেন, এতো কিছু না সামান্য, আপনার কাছে রাখুন, আপনারটা চুরি গেছে, ট্রেন ভাড়া লাগবে—

বৃদ্ধ বিড় বিড় করে বললেন, টাকাটা হয়তো তোমার কাজে লাগতো, আমি হাত পেতে তোমার কাছ থেকে পয়সা নেবো—বরং আমার কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত, মাথার ওপরে ভগবান আছেন যখন—

পাশের যাত্রীটি সেই দু টাকার নোটটি তাঁর বুক পকেটে গুঁজে দিলেন।

এবার লেডিজ সীট থেকে একটি মেয়ে উঠে এসে তার হাতব্যাগ খুলে একটি এক টাকার নোট নিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, দাদু এটা আপনি রাখুন।

বৃদ্ধটি এবার প্রবল আপত্তি তুললেন। না না মা, তোমার টাকা আমি কিছুতেই নেবো না। তোমার কত কাজে লাগবে, আমার এইতে হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েটি বেশ সপ্রতিভ। সে বিনয় না করে বেশ জোর দিয়ে বললো, এটা আপনাকে নিতেই হবে। আমার দিতে ইচ্ছে করছে আপনাকে, আপনি কেন নেবেন না?

একটি মেয়ে উঠে এসে তার হাতব্যাগ থেকে একটি এক টাকার নোট নিয়ে......দাদু এটা আপনি রাখুন

খানিকক্ষণ বাদ-প্রতিবাদ হলো, শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধটিই হেরে গেলেন। টাকাটা নিতেই হলো তাঁকে। তিনি সেটা কপালে ছুঁইয়ে বললেন, তুমি আমার মেয়ের মতন মা, তোমার কাছ থেকে নিলে এমন কিছু দোষ নেই।

সেই মেয়েটি ফিরে গিয়ে সীটে বসার পর তার পাশের মেয়েটি ভাবলো, তারও কিছু একটা করা দরকার। অনেক মেয়ে আছে যারা নিজের থেকে কিছু করার উৎসাহ পায় না, অন্যের দেখাদেখি অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু এ মেয়েটি তেমন সপ্রতিভ নয়, তাছাড়া বৃদ্ধটি একেবারে চ্যাঁচামেচি শুরু করে বললেন, আর একটা পয়সাও আমার দরকার নেই, আর কিছু আমি নেবো না, আর কেউ কিছু দিতে চাইলে আমি ট্রাম থেকে নেবে যাবো—।

ব্যাপারটা এখানে শেষ হলে বেশ মধুর হতো। কিন্তু বৃদ্ধ এর পরে অন্তহীন কথা শুরু করলেন। প্রথমে তো সকলকে ধন্যবাদ জানালেন প্রায় পনেরো-কুড়ি বার করে। তারপর শুরু করলেন নিজের দুঃখের কাহিনী। চন্দননগরে এক ভাড়া বাড়িতে থাকেন, বাড়িওয়ালা বেশী ভাড়ার লোভে তুলে দিতে চায়, বর্ষাকালে ছাদ দিয়ে জল পড়ে, ছোট ছেলেটা স্কুল ফাইনালে ফেল করেছে, টাকার অভাবে আর এক বছর পড়ানো যাচ্ছে না—গান্ধীজীর কথায় ইয়ে মরেল্লো ডাক শুনে বেয়াল্লিশ সালে জেলে গেছি, কত কষ্ট সহ্য করেছি, এখন একটা যদি নিজের বাড়ি থাকতো—হ্যাঁ সদাশয় সরকার দুশো টাকা করে দিচ্ছেন তাতে অনেকখানি সাহায্য হয়, তবু আবার গিয়ে বলবো, আর একটু দয়া করুন। আপনারা দয়া না করলে...

আমার প্রথমে লজ্জা, তারপর অসম্ভব রাগ হতে লাগলো। এক একবার ইচ্ছে হলো, বৃদ্ধের মুখ চেপে ধরে কথা বন্ধ করে দিই। এসব কথা ও'কে একদম মানায় না। গ্রামে তরুণ বয়েসী ছেলেমেয়ে অনেক আছে, তারা ও'র কথা শুনলে ভাববে, দেশের কাজ করতে গেলে বুঝি শেষ বয়েসে এই পরিণতি হয়! না না, এসব মোটেই তাদের শোনা উচিত নয়। এই বৃদ্ধরা তরুণ বয়েসে যখন দেশের কাজে নেমেছিলেন, তখন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন না যে নিঃস্বার্থভাবে এই কাজ করবেন? কোনোরকম প্রতিদানের আশা করবেন না! আজকের এই দীনতা যেন সেদিনের সেই ত্যাগকে ম্লান করে দিচ্ছে!

নজরুল-রবীন্দ্রনাথ

গত ২০ নভেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় 'আলোচনা'য় তরুণকুমার মুখার্জি একটি চিঠিতে আমার "নজরুল-রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের দুটি তারিখের ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন।

আমি লিখেছিলাম "১৯২২-এর ১১ আগস্ট মহাসমারোহে প্রকাশিত হ'ল নজরুলের 'ধূমকেতু'।" যদিও অনেক স্থানে 'ধূমকেতু'র প্রথম প্রকাশকাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯২২-এর ১২ আগস্ট। পত্রলেখকও 'ধূমকেতু'র প্রথম প্রকাশের এই তারিখটি সঠিক বলে মনে করেন।

কিন্তু জনাব খান মঈনুদ্দিন তাঁর 'যুগস্রষ্টা নজরুল' (পৃঃ ২৯) গ্রন্থে 'ধূমকেতু'র প্রথম প্রকাশকাল হিসেবে ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট তারিখের উল্লেখ করেছেন। জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেনঃ "১২ আগস্ট (১৯২২) তারিখে 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা বার হলো।" (কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৯৯)। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও তাঁর 'জৈষ্ঠের ঝড়' গ্রন্থে (পৃঃ ১৩৯) লিখেছেনঃ উনিশ শো বাইশের বারোই আগস্ট 'ধূমকেতু' দেখা দিল কলকাতায়।" আজহার উদ্দিন খান এবং আরও অনেকে বারই আগস্টের কথা উল্লেখ করেছেন। জনাব আবদুল কাদির দু জায়গায় দুটি ভিন্ন তারিখের উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ "১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১১ আগস্ট (১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৫ শ্রাবণ) ৩২নং কলেজ স্ট্রীট থেকে নজরুল অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন। (নজরুল-পরিচিতি ঃ ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২২)। আবার অন্যত্র (নজরুল রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ৭৪০ পৃষ্ঠায়) পুনরায় তিনি লিখেছেন ঃ "১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৩ শ্রাবণ মুতাবিক ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১২ আগস্ট 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা বাহির হয়।"

এইসব পরস্পর-বিরোধী তারিখ হতে 'ধূমকেতু'র প্রথম প্রকাশকাল সম্পর্কে পাঠক-সমাজে স্বভাবতই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে ১৯২২-এর ১১ আগস্ট তারিখে যে 'ধূমকেতু' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আবদুল আজীজ-আল-আমান গবেষণার সাহায্যে তা প্রমাণ করেছেন। 'নজরুল রচনাসম্ভার (৩য় খণ্ড)-এর 'ধূমকেতুর নজরুল' অধ্যায় (পৃঃ ৩৫) এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি লিখছেন ঃ "এইসব পরস্পরবিরোধী তারিখ হতেই আমার মনে 'ধূমকেতু'র প্রথম প্রকাশকাল সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্তু 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় না। পরের যে সংখ্যা-গুলি পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যাচ্ছে 'ধূমকেতু' মঙ্গলবার ও শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে। এই হিসেবে 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' (এদের অফিসে এক শ' বছরের পঞ্জিকা আছে) থেকে দেখতে পাচ্ছি শুক্রবার ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১১ আগস্ট (১২ আগস্ট নয়) হয় এবং বাংলা তারিখ হয় ১৩২৯ সালের ২৬ শ্রাবণ (কোনক্রমেই ২৩ বা ২৫ শ্রাবণ নয়)। সুতরাং 'ধূম-কেতু'র প্রথম প্রকাশকাল নিঃসন্দেহে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ১১ আগস্ট (শুক্রবার) মোতাবেক ১৩২৯ সালের ২৬ শ্রাবণ।"

এই হিসেবে আবদুল আজীজ-আল-আমানের নির্ণীত তারিখটি আমার কাছে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত আমি লিখেছি "এই সময়ে ধূমকেতুর পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত হয় (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯২২) নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে'।" অথচ পত্রলেখক 'হাতের কাছের বইটি'তে "উক্ত কবিতাটির প্রকাশ তারিখ হিসেবে পাচ্ছেন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনা-সম্ভার, (১ম মুদ্রণ, ১৯৬৫)-এর 'নজরুল-জীবন ও সাহিত্য' (পৃঃ ১১২) অধ্যায়ে পাওয়া যায় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর 'ধূমকেতু'তে 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক কবিতা প্রকাশের দরুন পত্রিকাখানি রাজরোষে পতিত হয়।" এই বক্তব্যের সমর্থন পাই ডঃ সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল চরিতমানস' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৬)। তিনি লিখেছেন ঃ "...কেতুতে প্রকাশিত অনেক অগ্নি-ক... প্রবন্ধ ও কবিতা নিয়ে নজরুলের বিরুদ্ধে মকদ্দমা হতে পারত, কিন্তু মোকদ্দমা করা হল 'ধূমকেতু'র পূজা-সংখ্যায় (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক কবিতাটি নিয়ে।"

তবে এই তারিখ নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে।

বিশ্বনাথ রায়
শান্তিনিকেতন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু প্রসঙ্গে

২৭ নভেম্বরের দেশ-এ শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের লেখাটি পড়ে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম। গজেন্দ্রবাবু লিখেছেন,—"আর একটি কথা, অরুণবাবু লিখেছেন 'সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের আত্মীয় ও আবাল্যসুহৃদ', কথাটা অনেকখানিই সত্য, তবে সবটা নয়। বাল্য-সুহৃদ কেন 'তারুণ্য-সুহৃদ' বলাই সঙ্গত। শুনেছি শেষের দিকে কোন একটা কারণে ও'দের বন্ধুত্বে প্রবল চিড় খেয়েছিল, যদিচ উপেন-দার সঙ্গে শেষ পর্যন্তও অন্তরঙ্গতা ও স্নেহসম্পর্ক অটুট ছিল।"

ভাগলপুরের গাঙ্গুলি পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রামধন গাঙ্গুলি। রামধনের পাঁচ ছেলে—কেদারনাথ, দীননাথ, মহেন্দ্রনাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথ। কেদারনাথের কন্যা ভুবনমোহিনী দেবী ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতা। মহেন্দ্রনাথের পুত্র উপেন্দ্রনাথ ও অঘোরনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ। বয়সে সুরেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথের বড় ছিলেন। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত গাঙ্গুলি পরিবার একান্নবর্তী ছিল। শরৎচন্দ্রের জন্ম দেবানন্দ-

পরে হলেও ভাগলপুরে মাতুলালয়ে তাঁর বাল্য এবং যৌবনের প্রথম দিকটা কাটে। তাঁর মাতুলদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও একসংগে তাঁদের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। মাতুলদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথই শরৎচন্দ্রের অধিকতর প্রিয় ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ যে 'তারুণ্য-সুহৃদ' ছিলেন, গজেন্দ্রবাবুর এ উক্তিটি ঠিক নয়। গজেন্দ্রবাবু পুনরায় বলেছেন, তিনি শুনেছেন, শেষেরদিকে শরৎচন্দ্রের সংগে সুরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্বে প্রবল চিড় খেয়েছিল যদিচ উপেনবাবুর সংগে শেষ পর্যন্ত অন্তরংগতা ও স্নেহসম্পর্ক অটুট ছিল। গজেন্দ্রবাবুর এ উক্তিটিও ভ্রান্তিপূর্ণ। ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে শরৎচন্দ্রের অসুখ বেড়ে যায়। তখন উপেনবাবু কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরৎবাবু ভাগলপুর থেকে সুরেনবাবুকে ডেকে পাঠান এবং সুরেনবাবু শরৎবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত (২ মাঘ ১৩৪৪) তাঁর সংগী ছিলেন। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, তাঁদের বন্ধুত্বে চিড় খায় নি। তারপরে গজেন্দ্রবাবু কার কাছ থেকে, কবে এবং কোন উপলক্ষ্যে এই তথ্যটি সংগ্রহ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। সবই তাঁর অনুমান।

ভাগলপুরের গাংগুলিদের পারিবারিক ইতিহাসের সংগে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। কারণ, উক্ত অঘোরনাথ আমার পিতামহ এবং আমি নাবালিকা নই, বন্ধো।

কমলা মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

মফস্বলের সাহিত্যসভা

'সাহিত্য প্রসঙ্গ'য় অভিনন্দ সম্প্রতি দুটি ভাল ভাবনা আমাদের উপহার দিলেন। এজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। মফস্বলে সাহিত্য-সভার প্রয়োজন আছে কি নেই, তা নিয়ে অভিনন্দকে একটু গভীরভাবে ভাবতে অনুরোধ করি।

তবে, 'পাঠাগারের দৌলতে' এবং 'কলকাতার এক শ্রেণীর ধূর্ত প্রকাশকের হাত দিয়ে' বাংলা সাহিত্যের যে কি ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি প্রতিনিয়ত। পাঠাগার কেলেংকারিকেও কিন্তু প্রশ্রয় দিচ্ছেন এই শ্রেণীর ধূর্ত প্রকাশকরাই। যে ধরনের বইয়ের কথা অভিনন্দ বলেছেন, খবর নিয়ে একবার জেনেছিলাম, সেই শ্রেণীর বইয়ের প্রকাশকরা মোটা টাকা কমিশন দেয়, দামও তুলনায় কম, তাই বিয়ের উপহারের জন্যে যাঁরা বই কিনতে যান, বিক্রেতারা এই শ্রেণীর বই-ই তাঁদের বেশী গছান। আর পাঠাগারে যেহেতু সকলে (সরকারী কর্তারাও) বইয়ের সংখ্যাধিক্য চান, সেহেতু উদ্যোক্তারাও এইসব বই-এর শরণাপন্ন হন। আর, এইসব বই-ই মফস্বলের পাঠকদের হাতে হাতে ঘোরে। ফলে তাদের সাহিত্যপাঠের রুচিও সেই-ভাবে গড়ে ওঠে। অথচ, একটু চেষ্টাতেই যে রুচি বদলানো যায়, তার নজিরও পাচ্ছি। আমরা মফস্বলে থাকি, গ্রামে গজে ঘুরি। পাঠক হিসাবে কিছু বইপত্রও কিনি, যা অনেক সময় সংগে সংগেই থাকে। অনেক 'তরলমতি' পাঠক এসব বই পড়ে এবং স্বীকার করে, 'এসব বই পড়লে আর ওসব সস্তা বই পড়তে ইচ্ছা হয় না।' স্বল্প প্রচেষ্টায় পাঠকের রুচির এ রূপান্তরে সত্যিই আনন্দ বোধ হয়। কিন্তু এ তো নিতান্তই সামান্য প্রচেষ্টা। সব দিকগুলো খতিয়ে দেখে আমাদের এখন সচেতনভাবে ভাবার সময় এসেছে যে, এই গভীর সমস্যা থেকে মুক্তির পথ কি?

সমস্যাটা আরও গভীর এই কারণে যে, আমাদের সাহিত্যের প্রাথমিক মান নির্ণয় করেন কলকাতার পুস্তক প্রকাশকরা। তাঁরা অদ্যাবধি যতটা ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, ততটা সাহিত্য-রসিকের নয়। নুন-তেল বিক্রেতার সঙ্গে পুস্তক প্রকাশকের যে একটা দুস্তর ফারাক আছে, তা সম্ভবত এঁরা মনে রাখেন না।

আর প্রতিষ্ঠিত লেখকরাও কি সকলে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন? অভিনন্দ কাকে ছেড়ে কাকে ধরবেন! দেখেশুনে বড় দুঃখ হয়।

সুনীলেন্দু কোনার
ঝাড়গ্রাম
মেদিনীপুর

॥ ২ ॥

'সাহিত্য প্রসঙ্গ' শিরোনামে 'মফস্বলের সাহিত্যসভা' (দেশ—২৭শে নভেম্বর) শীর্ষক আলোচনার জন্য অভিনন্দকে অভিনন্দন। গ্রামেগঞ্জে সাহিত্যের পাঠক সৃষ্টির এ ধরনের আলোচনা আরও খোলাখুলি এবং ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। এক শ্রেণীর ধূর্ত প্রকাশকের শঠতায় বাজারে নামী লেখকদের দুই নম্বর তিন নম্বরের অভাব নেই। যদিও অনেক লেখক নিজের মনোগ্রাম করা সই-এ তাদের বই প্রকাশ করেন কিন্তু এখনও গ্রামেগঞ্জে বইয়ের ক্রেতা সাধারণ বিশেষ করে লাইব্রেরীর পরিচালকবর্গ অনেকেই উক্ত শঠ প্রকাশকদের অপকৌশলের শিকার হন। এছাড়া মফস্বলের সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহে যারা কিনা বাংলা সাহিত্যের এক বড় ক্রেতা ও প্রচারক, তাদেরও অনেক সময় বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির তাগিদে ঐ সমস্ত 'বউ কথা কও', 'প্রেমের সংসার'এর মত অপাঠ্য কুপাঠ্য বই বেশী কমিশনের জন্য কিনতে হয়। আমার মনে হয় গ্রামের সেই বিশেষ লাইব্রেরীতে অভিনন্দ ঐ ধরনেরই কিছু বই দেখে থাকবেন। এটা তো সমাজকে এক বিরাট প্রতারণা। এর কুফল থেকে গ্রামগঞ্জের নব-জাগরিত পাঠকসমাজকে বাঁচাবার জন্য সরকার কি কোনও ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারেন না? আজ বিশ পঁচিশ বছর ধরে কিছু কিছু লেখাপড়া শেখার জন্য মফস্বলে যে নতুন পাঠকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তাদের স্বার্থের কথা তথা বৃহত্তর জনসমাজের কথা চিন্তা করে অভিনন্দ আমাদের সাহিত্যিকদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন আশা করি সাহিত্যিকবৃন্দ সেটা বিবেচনা করবেন।

অনঙ্গ ভট্টাচার্য
গ্রন্থাগারিক পাণ্ডুয়া ইউ বি লাইব্রেরী
পাণ্ডুয়া : হুগলী

কবিতার জন্ম

গত ২০শে নভেম্বরের দেশ-এ প্রকাশিত শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'কবিতার জন্ম' পড়ে আনন্দ লাভ করলুম। কিন্তু লেখাটি যে অপব্যাখ্যা ও অপ-উদ্ধৃতি দোষে দুষ্ট, তা না বলে পারা যায় না। প্রথমত, সুনীলবাবু লিখেছেন, "হরিণ তাড়া করে আসা রাজা দুষ্মন্তকেও কণ্বমুনির আশ্রম-বাসীরা শিকার করতে নিষেধ করেননি, শুধু বলেছিলেন আশ্রমের মধ্যে জীবহত্যা করবেন না।" কথাগুলি ঠিক নয়। রাজা দুষ্মন্ত যখন হরিণটিকে তাড়া করে আসছিলেন, তখন বৈখানস ঋষি হাত তুলে তাঁকে নিষেধ করে বলেন—"রাজন, আশ্রমমৃগোয়ং ন হন্তব্যো, ন হন্তব্যঃ।" অর্থাৎ এটি আশ্রমপালিত মৃগ, অতএব আশ্রমের সম্পত্তি। একে বধ করবেন না। বধ করবেন না। এ থেকে বোঝা যায় না যে, বৈখানস দুষ্মন্তকে আশ্রমের মধ্যে জীবহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

প্রতিষ্ঠা শব্দটি নিয়েও কম জল ঘোলা হয়নি। সুনীলবাবু লিখেছেন, "রাজশেখর বসু ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতিষ্ঠা না পাওয়া অর্থ চিরকাল পতিত থাকা।" এ ব্যাখ্যাটি ঠিক নয় বলে সুনীলবাবু তা নেন নি। শব্দটির অর্থ দেখলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। বামন শিবরাম আপ্তে তাঁর সংস্কৃত অভিধানে 'প্রতিষ্ঠা' শব্দটির অর্থ ইংরেজীতে যা বলেছেন, তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, গৃহ, বাসস্থান, গৌরব, সুকীর্তি; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলেছেন, প্রশংসা, সুকীর্তি, গৌরব, পদমর্যাদা; রাজশেখর বসু তাঁর চলন্তিকায় বলেছেন, 'প্রতিষ্ঠা' মানে অবস্থান, আবার অবস্থান মানে বাস, বাসস্থান। বাল্মীকি বলতে চেয়েছিলেন যে, পাখিটিকে হত্যা করবার পাপে নিষাদ কোন দিনই স্থায়ী বাসস্থান পাবে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও ভাববার আছে। 'নিষাদ' বলতে আমরা ব্যাধকে বুঝি। ইংরেজীতে এদের জিপসী বলা যেতে পারে। দেশী ভাষায় আবার এদের যাযাবর বা বেদে বলা হয়। এরা এক জায়গায় থাকে না, যাযাবরের জীবনযাপন করে। এরা একসময়ে মিশরে বাস করত। অনেকে অনুমান করেন, মিশর থেকে এরা ভারতে এসেছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বাল্মীকি সেই নিষাদটিকে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন তার সরলার্থ এই যে, সে বা তার বংশধরেরা কখনো এক জায়গায় স্থিতিশীল হয়ে থাকতে পারবে না।

সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কলি-২৯

মহিলা সাহিত্যিক

৩০ অক্টোবরের 'দেশ'-এ 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' শ্রীঅভিনন্দের রচনাটি পড়ে জানতে ইচ্ছা হয় মেয়েদের প্রতিভা পুরুষশাসিত সমাজে কতটা আন্তরিক সমর্থন পায়, কতটা গুরুত্ব পায়।

আজকের যুগে মেয়েরা অপেক্ষাকৃত সরব হবার সুযোগ পাচ্ছেন বটে, কিন্তু শ্রীঅভিনন্দ যেভাবে Communicate করার কথা বলেছেন তার যথার্থ সুযোগ অনেক মহিলা রচয়িতাই পাচ্ছেন না। যাঁরা কিছু বলতে চান, মনের ভাব লেখায় প্রকাশ করেন, সেই ভাব তাঁরা বহুসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে।

পরিবেশে বলি, বাঙালী তথা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের মানসিকতা আজও বোধ হয় এতটা বহির্মুখী এবং আত্মসুখপরায়ণ হয়নি যাতে তাঁরা পাশ্চাত্য নারী সমাজের সগোত্র হতে পারেন। মূলত ভারতীয় নারীর ধ্যানধারণায় আজও ত্যাগ সহিষ্ণুতা নিষ্ঠা ইত্যাদিই সোচ্চার—যদিও আজকের ভারতীয় নারীর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও রুচি-আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডল স্বাভাবিক কারণেই ভিন্ন হয়ে পড়েছে।

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়
মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

রম্যাঁ রলাঁর ডায়েরী : ভারতবর্ষ

যে কয়েকজন বিদেশীকে আমরা যথার্থ ভারত-বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি মনীষী রম্যাঁ রলাঁ তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম কিনা সে-কথা আমি জানি না, এইমাত্র জানি এই সহৃদয় মানুষটি ভারতবর্ষকে শুধু নয় ভারতের প্রাচীন ও নবীন মর্মটিকে সাধ্যমত অনুভব করার চেষ্টা করেছিলেন। যিনি ভারতীয় নন, এই দুর্ভাগা দেশের সমস্ত কিছু তাঁর নজরে আসবে, বা আপন-অভিজ্ঞতায় সমস্ত কিছু বিচার করবেন এমন হয়ত হয় না। কিন্তু অনেক সময় এটাই দেখা যায়, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখলে অনেক কিছু আরও স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন করে চোখে পড়ে। রলাঁ ভারত-বন্ধু ছিলেন, তবু তিনি যে ব্যবধান রেখে আমাদের দেখতে পেরেছেন তার বিশেষ মূল্য রয়েছে।

রলাঁ মারা যান ১৯৪৪ সালে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তিন বছর পরে। রলাঁর মৃতুর সাত বছর পরে ১৯৫১ সালে ফরাসী ভাষায় একটি বই প্রকাশ পায় যার নাম ছিল 'ভারতবর্ষ'। এটি তাঁর দিনপঞ্জী। দিনপঞ্জীটির অশেষ মূল্য, কেননা ১৯১৫ থেকে ১৯৪৩—অর্থাৎ প্রায় সাতাশ আঠাশ বছরের ভারত বৃত্তান্ত এর মধ্যে রয়েছে। রলাঁ ভারতবর্ষ সম্পর্কে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, পড়াশোনা করেই হোক বা চিঠিপত্র লেখালেখির মাধ্যমে, ব্যক্তিগত মেলামেশায়—সমস্ত কিছুই এই ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। এর মধ্যে রলাঁর নিজস্ব মতামত রয়েছে, রয়েছে বিশ্লেষণ, ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা, ভারতীয় মনীষীদের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং কদাচিত মনোক্লেশ। এমন একটি গ্রন্থ যে সমস্ত দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ ও মূল্যবান হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষাতেও অনূদিত হয় নি, হলে হয়ত আমাদের দেশে অনেকেই তাঁর খোঁজ রাখতেন। এ-দেশের ফরাসী-জানা পণ্ডিতদের মধ্যেও গ্রন্থটি সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা ওঠে নি, হয়ত নজরে পড়ে নি। সম্প্রতি শ্রীঅবন্তীকুমার সান্যাল—একদা যিনি কবি হিসেবে খ্যাত ছিলেন—এখন গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত—তিনি রম্যাঁ রলাঁর এই গ্রন্থটি মূল ফরাসী থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। ছশো পাতার এই বিশাল গ্রন্থটি দেখলেই বোঝা যায়, কী পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

এই পরিশ্রম কেন? অবন্তী মনে করেন, রলাঁর এই ডায়েরিতে এ-দেশের এমন একটি যুগের পরিচয় রয়েছে যাকে 'আধুনিক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক অপরিহার্য মূল্যবান দলিল' বলা যায়। কোনো সন্দেহ নেই, রলাঁর 'ভারতবর্ষ' আমাদের কাছে নানা অর্থেই দলিল বলে মনে হবে। বিশেষত এই কারণে যে, তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে—নির্মোহ দৃষ্টিতে তিনি ভারতের এই দীর্ঘ পর্বের প্রায় সমস্ত কিছু দেখেছেন।

রলাঁর এই ডায়েরির প্রথম দিকে ১৯২৫-২৬ পর্যন্ত আমরা যাঁদের উল্লেখ দেখি তাঁরা অনেকেই বিখ্যাত ভারতীয়—যেমন ডঃ আনন্দকুমার স্বামী, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাও হয়েছে তাঁর ১৯২১ সালে ; আলাপ-আলোচনাও চলেছে। গান্ধীজী সম্পর্কে রলাঁর আগ্রহ, কৌতূহল, গান্ধীজীর রাজনৈতিক ভূমিকা বিষয়ে রলাঁর মনোভাব এই সময়ে এতই তীব্র যে—গান্ধীজী সম্পর্কে দু মাস ধরে পরিশ্রম করে তিনি এক দীর্ঘ প্রবন্ধও রচনা করেন। ১৯২৩ সালে সি এফ এনড্রুজের সঙ্গে রলাঁর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা। এনড্রুজের কাছ থেকে তিনি ভারত এবং ভারতের দুই মহান ব্যক্তিত্বকে যেন আরও গভীর করে চিনতে চাইলেন। এইভাবেই একে একে লালা লাজপত রায় ও অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ।

১৯২৬ সাল থেকে, অর্থাৎ দ্বিতীয়-বার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রলাঁর সাক্ষাতের সময় থেকেই প্রায় এই ডায়েরির গুরুত্ব যেন আরও বেড়ে গেছে। বলতে কি—'২৫-'২৬ সাল থেকে দিনপঞ্জীর মধ্যে আমরা যত বেশি চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি, রলাঁর মন্তব্য ও ধারণা, তাঁর উদ্বেগ ও চিন্তা দেখি প্রথম দিকে তা অতটা ছিল না। মনে করা যেতে পারে, এই সময় থেকেই তিনি আরও ভারত-মুখী হয়ে ওঠেন, কেননা একাধিক যোগাযোগ ঘটে যেতে থাকে।

অনুবাদক অবন্তী সান্যাল লিখেছেন, '১৯২৬ সালে মুসোলিনির আবির্ভাবের মুহূর্তেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ফ্যাসিবাদের চরিত্রটি। রলাঁ তখনই বললেন : ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধ সহোদর।' সম্ভবত এই সময় য়ুরোপ রলাঁকে যত উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত করেছে তিনি ততই ভারতের মর্ম উপলব্ধির জন্য ব্যগ্র, ততই গান্ধী রবীন্দ্র-নাথের প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে চেয়েছেন। তবু এই শ্রদ্ধা কোনো বিচারবিবেচনাহীন ভক্তি নয়। তিনি মোহমুক্ত হয়ে এঁদের দেখতে চেয়েছেন। সমস্ত কিছুই নির্বিচারে গ্রহণ করতে চান নি। যদিও প্রধানত ডায়েরিটি ভারত সম্পর্কে তবু এর মধ্যে রলাঁর ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা, তাঁর আত্মিক জিজ্ঞাসা, সাহিত্য শিল্প আরও বহু প্রসঙ্গ এসেছে। পড়তে পড়তে এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে আমরা অনুভব করতে পারি। এবং এ-যাবৎ যা জানা যায় নি—এমন প্রসঙ্গও জানতে পারি।

অভিনন্দ

ভারতবর্ষ। রম্যাঁ রলাঁ। অনুবাদ : অবন্তীকুমার সান্যাল। র‍্যাডিকাল বুক ক্লাব। কলকাতা-১২। দাম ৩৫ টাকা।

DCM রিটেল স্টোর
শৃংখলা যৌবনেরই সৌন্দর্য্য।'
একে নিজের করে নিন।
আজকের যুবকরা অত্যন্ত রুচিবান তা তাঁর পোশাক পরিচ্ছদেই স্পষ্ট।
ঠিক যেমন ডি সি এম এর চেকস, ষ্ট্রাইপস, সেডস বুনন: বিশেষ 'টেরিন' এবং আকর্ষনীয় শীতকালীন পলিয়েষ্টার-ক্যাশমিলন মেশানো নূতন স্যুটিং।
ডি সি এম আজকের তরুন যুবককে সপ্রতিভ করে তোলার পরামর্শ দেয়।
সারা দেশ জুড়ে ডি সি এম এর ৫৮০টি রিটেল ষ্টোর আছে। আপনার নিকটেই একটি অবশ্য পাবেন।
বিশেষ
'টেরিন' স্যুটিং
DCM
এবার!
সবার সেরা
শীতের পোষাক
পলিয়েস্টার—
ক্যাশমিলন স্যুটিং
DCMT-4434A Ben

॥ ২৮ ॥

সুলেখা সেন ভাবতেই পারছেন না, দীর্ঘ রেলযাত্রার শেষে খোদ ম্যানেজার মশায়ের ঘরে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে আসবার অনুমতি আমি তাঁকে দিতে পারি।

"আপনার ঘরে?" সুলেখা একটু অবাক হয়েই জিগ্যেস করলো। সুলেখার বোধ হয় ধারণা আমি তাকে পছন্দ করি না।

বহু মানুষের এই বিচিত্র মেলায় বেশ মুশকিলে পড়েছি আমি। এখানে এমনই পরিস্থিতি যে এগোলেও বিপদ, পিছুলেও বিপদ। সুলেখা সেনকে পছন্দ করবার মতো কোনো কারণ এখনও পর্যন্ত আমার জীবনে ঘটেনি। কিন্তু তাঁকে অপছন্দ করবারই বা আমি কে? এই বিশাল পৃথিবীতে কত মানুষ কতভাবে বেঁচে রয়েছে—ভাল-মন্দর রবার স্ট্যাম্প বসিয়ে তাদের চিহ্নিত করবার অপ্রিয় দায়িত্ব বিধাতাপুরুষ তো আমার ওপর অর্পণ করেননি।

সুলেখা সেনকে এই মুহূর্তে সত্যিই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। মেয়েটির বিষন্ন মুখের দিকে তাকালাম। সুলেখা সেন আমারই সমবয়সী হবেন। একটা সহজ অন্তরঙ্গতার স্নিগ্ধ ভাব ওঁর মুখেচোখে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আমারই এই বয়সে, সুলেখা সেনের চোখে-মুখে যেন সায়াহ্নের ক্লান্ত ছায়া নেমে এসেছে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সৃষ্টিকর্তা বিধাতা যে পুরুষ সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ তাঁর সৃষ্টির প্রতি পদক্ষেপে নারীর প্রতি অবহেলা ও অবিচারের প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। নইলে, আমার সমবয়সিনী হয়েও সুলেখা সেনের চোখ দুটো কেন দলিত মর্দিত ফুলের মতো এমন রিক্ত হয়ে উঠবে?

সুলেখার ইচ্ছা এখনই সে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে চলে গিয়ে আমাকে অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি দেয়। কিন্তু আমি অপারগ। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই আমার পক্ষে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। যথাসময়ে জেঠমালানি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্মুখসমরে নামবার জন্যেও সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করছি।

সুলেখা সেন এই মুহূর্তে সত্যিই ক্লান্ত। না-হলে কিছুতেই তিনি আমার ঘরে যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না।

আকাশপাতাল ভেবে খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে সুলেখা শেষ পর্যন্ত বললেন, "দিন আপনার চাবিটা।"

পকেট থেকে গম্ভীরমুখে চাবিটা বার করে ওঁর হাতে দিতে গিয়ে মনে হলো সুলেখার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছে। আমি যে নিতান্ত করুণাবশত একজন অসহায়া রমণীর প্রতি মানবিক দায়িত্ববোধে নিজের চাবিটা এগিয়ে দিচ্ছি তা যেন সুলেখার কাছে বড়ই প্রকট হয়ে উঠেছে।

চোখের জল কোনোরকমে চেপে রেখে সুলেখা বললেন, "কলকাতা শহরের কোথাও কয়েক ঘণ্টা মাথা গুঁজবার মতো জায়গাও এখন নেই আমার।"

সুলেখা সেনকে এইভাবে নিজের ঘরের চাবিটা দেওয়া বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হলো না। থ্যাকারে ম্যানসনে কোনো ঘটনাই আধডজন অনুসন্ধিৎসু কর্মচারির অগোচরে থাকে না। হয়তো এই অকারণ দাক্ষিণ্যের জন্য আমাকেও কিছু মূল্য দিতে হবে। কিন্তু সুলেখা সেনের শ্রাবণমেঘের মতো সজল চোখদুটো আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দুর্বল করে তুলেছে। চার্নক সায়েবের এই অভিশপ্ত শহরে নিরাশ্রয় হবার যে কি বিড়ম্বনা তা আমার অজানা নয়। সুলেখাকে নিষ্ঠুরভাবে বিদায় করে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। মন যা চেয়েছে তাই করেছি —এখন আমি বদনামের ভয় করি না।

সুলেখা সেন চলে গিয়েছেন. কিন্তু তাঁর লগেজ এখনও আমার সামনে পড়ে রয়েছে। সুলেখা না-ফেরা পর্যন্ত আমাকেই ওগুলো পাহারা দিতে হবে।

একটু পরেই সুলেখা ফিরে এলেন। এখন তাঁকে বেশ ফ্রেশ মনে হচ্ছে। মুখে-চোখে জল এবং প্রসাধনের সামান্য স্পর্শে মেয়েদের মুখটা কত সহজেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুলেখা আমার হাতে চাবিটা ফিরিয়ে দিলেন। মুখ ফুটে কিছু বললেন না তিনি, কিন্তু তাঁর চোখে যে গভীর কৃতজ্ঞতার স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে তাতেই আমার মন নতুন এক অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। কৃতজ্ঞচিত্তে আমি একবার সনাতনকেও স্মরণ করলাম।

সুলেখা সেন এরপর কী করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। আপিস ঘরের এককোণে যে পাবলিক টেলিফোন আছে কয়েকটা পয়সা ফেলে সেখান থেকে একটা টেলিফোন করলেন। নিচু গলায় কী কথা বললেন তা আমার কানে পৌঁছল না।

পাড়ের টেলিফোনে আড়িপাতার কুরুচি দুশমন আমাকে দেয় নি।

সুলেখা আমার টেবিলে ফিরে এসে বললেন, "আরও পনেরো মিনিট আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আপনার খুব অসুবিধে হবে?"

অসুবিধে বইকি! কিন্তু সেকথা তো মুখের ওপর বলা যায় না। সুতরাং সুলেখাকে বসতে বললাম। টেলিফোনে সুলেখা সেন কী ব্যবস্থা করলেন বুঝতে পারছি না। মিনিট পনেরো পরেই এই নাটকের শেষ হবে। সুলেখা সেন কি অন্য কোথাও চলে যাবার ব্যবস্থা করলেন। এই মুহূর্তে সেই চট্টরাজমশায়ের কথা আমার মনে পড়ছে যাঁর সঙ্গে সুলেখা সেন ধানবাদে রওনা হয়েছিলেন। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের সেই অস্বস্তিকর প্রথম অভিজ্ঞতার কথা এখনও ভুলতে পারিনি।

যতদূর মনে পড়ছে, ধানবাদে সুলেখার বেশ কিছুদিন থাকবার কথা ছিল। হঠাৎ এইভাবে ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন কেন তাও মাথায় ঢুকছে না।

পনেরো মিনিটের প্রতীক্ষায় নিঃশব্দ না থেকে সুলেখা নিজেই এবার মুখ খুললেন। জেঠমালানিদের ওপর তিনি একটু রেগে আছেন বলেই হয়তো কথাগুলো হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল।

"নাক কান মলেছি, কলকাতার বাইরে আর যাবো না।" সুলেখার কথাগুলো স্বগতোক্তির মতো শোনালো। কারণ তিনি কী করবেন, কোথায় থাকবেন, সে-বিষয়ে আলোচনা করবার মতো সম্পর্ক বা অন্তরঙ্গতা তাঁর সঙ্গে আমার নেই।

আন্দাজ করছি, সৌম্যদর্শন ও সুপুরুষ চট্টরাজমশায়, যাঁকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় দেখেছিলাম, তাঁর সঙ্গেই সুলেখার কিছু অপ্রত্যাশিত মনোমালিন্য হয়েছে।

সুলেখা এবার কেমন উদাসীন হয়ে উঠলেন। বললেন, "কিছুদিন আগে এই কলকাতা শহর আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে উঠেছিল। কলকাতা বললেই আমার চোখের সামনে কেবল আপনাদের এই ম্যানসন বাড়িটা ভেসে উঠতো। পুরনো ইঁটকাঠের এই জেলখানা থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে আমার মন ছটফট করতো। তাই যখন মিস্টার জেঠমালানি ধানবাদের কথা তুললেন তখন আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম।"

নিজের মনেই হেসে উঠলেন সুলেখা সেন। বললেন, "মিস্টার জেঠমালানির ভয় ছিল আমি হয়তো কলকাতা শহর ছেড়ে মফস্বলে যেতে রাজীই হবো না। আমাদের লাইনের অনেক মেয়েই বাইরে যেতে চায় না। কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা তারা ভাবতেই পারে না।"

আমি একটু অবাক হয়েই সুলেখা সেনের কথা শুনছি। সুলেখা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বুঝতে পারছেন?"

সত্যি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। শুধু, সুলেখা সেনকে কলকাতা ছেড়ে মফস্বলে পাঠাবার জন্যে জেঠমালানি যে বেশি টাকার লোভ দেখিয়েছেন তা জানতে পেরেছি।

সুলেখা বললেন, "আপনার কাছে কিছুই চেপে রাখবো না। এত বড় বাড়ির ম্যানেজারি করছেন, আপনার তো কোনো কিছুই অজানা থাকবার কথা নয়।"

সুলেখা বললেন, "এমন এক সময় ছিল যখন কলকাতা শহরই সব। তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা বলতে শুধু কলকাতাকেই বোঝাতো। দুনিয়ার সব লোককেই তখন পয়সার ধান্ধায় কলকাতাতেই ছুটে আসতে হতো। জেঠমালানিরা সেই সময়েই আপনাদের এই ম্যানসনের ফ্ল্যাটবাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর ক্রমশ অবস্থা পাল্টাচ্ছে। এখন কলকাতার বাইরে কত জায়গায় কলকারখানা তৈরি হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়ছে। বিহার, ওড়িশা, আসাম, মধ্যপ্রদেশে রাতারাতি কত ছোটখাট শহর গজিয়ে উঠছে।"

সুলেখার ব্যবসাসংক্রান্ত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আমি এবার বিস্মিত হচ্ছি। আমার ধারণা ছিল, সুলেখার মতো মেয়েদের মাথায় বাড়তি কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি অথবা কৌতূহল থাকে না। সুলেখা বললেন, "এই সব ছোটখাট শহরের কর্তাব্যক্তিরা এখনও কাজের টানে এবং নিজের টানে কলকাতায় চলে আসেন। সুযোগ পেলেই তাঁরা একবার কলকাতা ঘুরে যেতে আগ্রহী—কিন্তু আজকাল সবসময় সুযোগ আসে না। এঁদের সঙ্গে কাজকারবার চালাবার জন্যে জেঠ-

মালানিদেরও আজকাল তাই আসানসোল, অণ্ডাল, পাটনা, গয়া, রাঁচি, ভুবনেশ্বর, ভাইজাগ ছুটতে হচ্ছে। কলকাতা শহর তার পুরনো ইজ্জত হারিয়ে ফেলেছে, বুঝলেন শংকরবাবু।"

"ইজ্জত থাকলো আর না-থাকলো! আমাদের কী এসে যায় বলুন?" আমি এবার উত্তর না-দিয়ে পারলাম না। এই শহরের মান-ইজ্জত সুখসুবিধে সবই তো চিরদিন কয়েক হাজার ভাগ্যবানদের জন্যে সংরক্ষিত আছে—সাধারণ মানুষের তাতে কোনো অধিকার নেই।

সুলেখা গম্ভীর হয়ে বললেন, "অনেকের এসে যায়, শংকরবাবু। কলকাতা ছেড়ে আমাদের অনেককে এখন ছড়িয়ে পড়তে হ'চ্ছে। অণিমা হাজরা গিয়েছে রায়পুরে, লীলা জোসেফ রয়েছে ভাইজাগে।"

সুলেখা বললেন, "আমি নিজেও অতশত কলকাতার ব্যাপার জানতাম না। আমি শুধু এখানকার জীবন সম্বন্ধে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কোনো সময়ে মিস্টার চট্টরাজকেও হয়তো এসব কথা বলেছিলাম। ধানবাদের কথা উঠতেই, আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা রেল স্টেশনের ধারে আমাদের ছোটবেলা কেটেছে। বাবা পোস্টাপিসে কাজ করতেন—কাছাকাছি অনেকগুলো আপিসে বদলি হয়েছেন পরের পর। হাওয়ায় যে এত ধোঁয়া থাকে, সূর্যের আলো যে এত দুর্মূল্য তা কলকাতায় আসবার আগে আমি জানতাম না।"

"আমার অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো, সুলেখা দেবী। হাওড়ার এক অন্ধকার কানাগলিতে সেই ছোটবেলায় এসে উঠেছিলাম। ঘরের মধ্যেও যে বাতাস বইতে পারে, ভোরবেলায় সূর্য যে বিছানায় এসে কারও ঘুম ভাঙাতে পারে, রাতের জানালা দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে চাঁদ দেখা যায় এসব আমাদের অজ্ঞাত ছিল। বৃষ্টির ওপর আমার খুব রাগ ছিল, সুলেখা দেবী—বর্ষাকে বোধ হয় আজও আমি পুরোপুরি ক্ষমা করতে পারি নি।" হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, সুলেখার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি বোধ হয় একটু বেশিদূর এগিয়ে এসেছি।

[illegible] এই মুহূর্তেই নিরাপদ সীমা[illegible]ধ্যে ফিরে আসা সম্ভব হ'লো না। বিহারের পল্লীপ্রকৃতিতে প্রতিপালিতা সুলেখা আমার কথায় কৌতুক বোধ করছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, "বর্ষার ওপর রাগ? ওমা! আমি তো এমন লোক দেখিনি! বর্ষার ওপর বিরক্তি কেন?"

সুলেখার কৌতূহল নিবৃত্ত না করে পারলাম না। বললাম, "বৃষ্টি মানেই তো কাঁচা নর্দমা ছাপিয়ে হাওড়ার সরু সরু রাস্তাগুলো নরককুণ্ড হয়ে উঠবে। বর্ষা মানেই খাড়ুয় ফুটো ছাদ থেকে টপটপ করে ঝরচে পড়া 'টি আয়রন' ধোওয়া জল বিছানা ভিজিয়ে দেবে। ঘরের বিভিন্ন জায়গায় ঘটি, বাটি, বালতি বসিয়ে দিতে হবে—টপটপ করে জল পড়বে। বৃষ্টি থেমে যাবার পরেও তো অনেকক্ষণ ধরে এই জল পড়তে থাকবে এবং মনে করিয়ে দেবে যে বৃষ্টি এসেছিল।"

সুলেখা চোখদুটো বড় বড় ক'রে বললেন, "আপনি তাহলে রবি ঠাকুরের ওপরেও চটা! কলকাতার লোক হয়েও তো উনি বর্ষার কত গুণগান করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আমি সযত্নে এড়িয়ে গেলাম। ডরোথি ওয়াটের মুখখানা আমার চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। এই পৃথিবীতে তো রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও আর কত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। চিৎপুর রোডের হে মহামানব, আপনি কেন বারবার থ্যাকারে ম্যানসনের সামান্য কর্মচারির জীবনে সময়ে-অসময়ে কারণে-অকারণে এইভাবে উপস্থিত হবার চেষ্টা করছেন?

সুলেখা সেন কিন্তু থামলেন না। কত সহজে রবীন্দ্রনাথ, জেঠমালানি ও ধানবাদের সেই চট্টরাজমশায়কে একাকার করে ফেললেন। কৈশোরস্মৃতি মন্থন করে তিনি ডাকগাড়িতে চড়ে রবীন্দ্রসংগীত শেখবার জন্যে ধানবাদের গণেশ মাস্টারের কাছে আসবার গল্প বললেন। পরের মিনিটেই সুলেখা কেমন অবলীলাক্রমে নির্মল চট্টরাজ ও মিস্টার জেঠমালানির ব্যবসায়িক সম্পর্ক বর্ণনা শুরু করলেন।

সুলেখা বলছিলেন, "আমাদের পোস্টাপিসের সামনে একবার দলবেঁধে আমরা বর্ষার গান গেয়েছিলাম। আমার বাবার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমি রবীন্দ্রসংগীতের বড় শিল্পী হই।"

পরমুহূর্তেই সুলেখা বললেন, "জানেন শংকরবাবু, সেবার যে মুহূর্তে মিস্টার জেঠমালানি বললেন, সুলেখা, মিস্টার চট্টরাজ সম্পর্কে তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে, তখনই আমার মনের মধ্যে কীরকম করে উঠলো।"

এরপর কোনোরকম দ্বিধা না-করে

অনেক কথা বলে গেলেন সুলেখা। জেঠ-মালানি এবং চট্টরাজ—এ'দের দুজনের কী সম্পর্ক, কী কাজকারবার, কিছুই জানতেন না সুলেখা সেন।

"নামটাও আসলে চট্টরাজ কিনা, সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল, শংকরবাবু। খুব কম লোকেই আসল নাম নিয়ে আমাদের কাছে আসে। আমাদের পাশে বসে মিত্তির হয়ে যায় মুখুজ্যে, মুখুজ্যে হয়ে যায় গুহ। তা আমি তাতে কিছু মনে করি না। এই যে আমি, সবার কাছে সুলেখা সেন বলে পরিচয় দিই—তাতে কী সীমা চ্যাটার্জি'র কিছু ক্ষতি হয়েছে? কত আশা করে বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন সীমা। সে-নামটাকে কেন অপরিস্কার হতে দিই? সুলেখা সেনকে লোকে যত ইচ্ছে নোংড়া করুক, সীমা চ্যাটার্জি'কে ওরা স্পর্শ করতে পারবে না।"

বিস্মিত আমি সুলেখার মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু সুলেখা তা নজর করলো না। সুলেখা সোজা বললো, "যারাই এখানে আসে, তাদের বাবা-মা জন্মের পরে কত আশা করে, কত স্বপ্ন দেখে ভাল ভাল নাম দিয়েছিলেন। সেসব নামকে অকারণে এই থ্যাকারে ম্যানসনে ময়লা করার তো কোনো দরকার নেই, শংকরবাবু। আসল নাম না-বললে, কোনো কোনো মেয়ে

তিনটি গল্প

গল্প কেন বলছি, সেটা একদম শেষে বলব।

আমাদের ধারণা যে কলকাতার লোকের দুঃখ কেউ বোঝে না। অর্থাৎ রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি করে রাখলে, আবর্জনা জমালে, পথঘাট হকাররা অবরোধ করে রাখলে গ্রীষ্মের সময় জল না পেলে বা ভিড়ের বাসে ট্রামে উঠতে না পারলে যে কি কষ্ট তা কেউ বোঝে না।

সি এম ডি, এ তো নয়ই। অথচ সি এম ডি এ-র মানুষগুলি কিন্তু কলকাতারই মানুষ। এখানেই তাঁদের জন্ম কর্ম এবং মৃত্যু। এখানকার ট্রাম বাসই তাঁদের একমাত্র ভরসা, যেমন ভরসা কলের জল, স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি। কাজেই আপনার যেখানে দুঃখ আমাদের দুঃখও সেখানেই। তবে তফাৎটা হ'ল আপনি যখন নাজেহাল হয়ে শহরটার নিন্দে করলেন তখন আমরা তার দ্বিগুণ নিন্দে আর কটূক্তি করলাম। আমাদের গায়েই তো ফোস্কা বেশী পড়ে। এক তো সি এম ডি এ কোটি কোটি টাকা জলে ঢালছে শুনছি, আর ভাবছি, সত্যই যদি জলের জন্য কোটি কোটি টাকা পাওয়া যেত.....

যখন বিজ্ঞাপন পড়ি যে কলকাতার উন্নতি হচ্ছে—২০টা রাস্তা চওড়া হয়েছে, তিনটে ব্রীজ হয়েছে, একটা সাবওয়ে, অথবা জল সরবরাহ বেড়েছে কিংবা জল জমা কমেছে, তখন আমাদেরও মনে হয় আরও হচ্ছে না কেন? আমার পাড়ায় হচ্ছে না কেন? ঐ রাস্তায় জোরালো বাতি হয়েছে, আমার রাস্তায় নেই কেন? এর জবাব দেবে কে? সি এম ডি এ-র কাছে জবাব নেই। (কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলেন সি এম ডি এ-র জবাব নেই) জবাব কলকাতার মানুষের কাছে। যা পেয়েছি তা ছিল না। কিছু পেয়েছি আরও পাব। কলকাতা কিছু ভাল হয়েছে আরও কিছু ভাল হবে। আমরা যদি ভাল জিনিসগুলি দেখতে না পাই, তাহলে দোষটা কলকাতার নয় হয়তো বা কলকাতার কপালের বা কারও চোখের।

• • •

এবার দু'নম্বর গল্প। দারুণ আড্ডা চলছে। বিষয় সি এম ডি এ কিভাবে কলকাতাটাকে শেষ করে দিল। শ-কার ব-কার মিলিয়ে গালাগালি আছে, বোম্বাই দিল্লী লণ্ডনের তুলনা আছে, দু চারটে খিস্তিরও অভাব নেই। শেষ সিদ্ধান্ত হল যে ঠাণ্ডা ঘরে বসে কি আর কাজ হয়?

দিনটা রবিবার। সময় রাত ১০টা এবার আড্ডা ভেঙে খাওয়ার সময়। আর ঠিক সেই সময় খিদিরপুরের একটা বস্তীতে একজন মানুষকে ঘিরে অনেকগুলি মুখ। রাস্তার আলো সামান্য, অন্ধকার বেশী। আলোচনা হচ্ছে কি করে বস্তীর লোকদের আর একটু ভাল করা যায়। বস্তীতে রাস্তা হয়েছে, আলো হয়েছে, জলের পাইপ গেছে, স্যানিটারী পায়খানাও তৈরী। কিন্তু বস্তীর লোকগুলি তো জল খেয়ে বাঁচবে না। এমনিতে ওরা কাজ করে দর্জি'র চামড়ার, খেলনা তৈরীর এমনি আরও অনেক কিছুর। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রোজগার করে মাথাপিছু দু টাকা থেকে আড়াই টাকা। আলোচনা হচ্ছিল কি করে এদের একটু সংগঠিত করা যায় যাতে শোষণের কবলে না পড়ে এরা, একটু পয়সার মুখ দেখে। যে শার্ট-প্যান্ট ২৫।৩০ টাকায় বিক্রি হয় তার জন্য সেলাইয়ের মজুরী যেন ৫০ পয়সা না হয়। যে ভদ্রলোক'কে ঘিরে আলোচনা তিনি রাত ১২ টায় বাড়ি ফিরে টেলিফোন তুললেন, 'মৈত্র, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি.....' বা, 'মিঃ মুখার্জি' তিলজলার জমিটা কি হ'ল?'

অর্থাৎ যে সি এম ডি এ-র বা যে ভোলানাথ সেনের শ্রাদ্ধ হচ্ছিল, তাঁরা কিন্তু শুধু বেঁচেই নয়, কাজের কথা ভাবছেন। কলকাতা উন্নয়নের কাজ কলকাতার মানুষের যাতে ভাল হয় তার ভাবনা।

• • •

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার শুনলেন যে একজন তাঁর নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কই আমি এ'র উপকার করেছি বলে তো মনে পড়ছে না।' অর্থাৎ কারো উপকার করলে সে নিন্দে করবেই। সি এম ডি এ-রও তাই ভরসা। বোধ হয় কিছু লোকের উপকার হচ্ছে, না হলে এত নিন্দে শোনা যাবে কেন? আর কিছু না হোক চেতলা, বেহালা, টালিগঞ্জ যাদবপুর এমন কি উল্টোডাঙায় জমির দর তো বেড়ে গেছে। কাজেই জমির মালিকরা সি এম ডি এ-র উপর একটু বাক্যবর্ষণ তো করবেনই। কিন্তু বিশ্বাস করুন এমন লোকও আছেন যাঁরা উপকার পেয়েও নিন্দে করছেন না। বেহালার চওড়া ডায়মণ্ড হারবার রাস্তা আজ অনেকের সমৃদ্ধির পথ দেখাচ্ছে; সেখানকার বিদ্যাসাগর হাস-পাতাল (সি এম ডি এ-র তৈরী) বহু লোকের সেবায় লাগছে। জানেন কি যে ৬ রকম ডজন দু-এক হাসপাতালের তিন হাজার শয্যা, বহু যন্ত্রপাতি, এমন কি এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীও সি এম ডি এ-র দেওয়া? বলতে পারেন কি যে হাওড়ার লোক, সাবওয়ে, ব্রীজ, পাকা ড্রেন কলের জল পাচ্ছেন বা পাবেন বলে অখুশি; হাওড়ার বস্তীগুলির বা জগাছা ধারসার উদ্বাস্তুদের কাছে সি এম ডি এ-র নিন্দে করে দেখুন। সেই একই কথা খাটে বিস্তীর্ণ মহানগরীর প্রতিটি মিউনিসি প্যালিটিতে অঞ্চলে অঞ্চলে। কেবল উ'চু তলার নাক উ'চু কয়েকজন লোক, যাঁরা বোম্বাই, লণ্ডন, নিউইয়র্ক ঘুরে এসেছেন তাঁরা সরব। এ'দের সম্বন্ধেই কি রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'এরা কিছু করবেও না, করতেও দেবে না?'

সম্প্রতি খবরের কাগজগুলি দেখছেন কি? সত্যজিৎ রায় থেকে তরুণ গাঙ্গুলী সকলেই কলকাতা সম্বন্ধে কত মায়া, কত আকর্ষণ আর নিবিড় বন্ধনের কথা বলেছেন; পড়তে পড়তে চোখে তিনবার জল আসে সেই কলকাতা নিয়ে আমাদের সবার বার বার—মাথা ব্যাথা। শ্লোগান তুলুন, কলকাতা জিন্দাবাদ সি এম ডি এ, জাহান্নমে যাক। শুধু শ্লোগান নয়—একটু কাজও সঙ্গে সঙ্গে। এতদিন ধরে যা বলে আসছি, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখুন, যখন তখন রাস্তায় আবর্জনা ফেলবেন না, জলের অপচয় বন্ধ করুন, গাছ পালার যত্ন করুন ইত্যাদি।

• • •

একজন পাঠকের মন্তব্য : সি এম ডি এ-র বিজ্ঞাপন হল গল্প। তিনটে গল্প উপহার দিলাম। খারাপ লাগলে সি এম ডি এ-কে জানান, ভাল লাগলে অন্যকে। কলকাতা সম্বন্ধেও একই কথা!

কলকাতাকে সাজাবার জন্য না হলেও, ভাস্কর্যের একটা প্রদর্শনী হচ্ছে বিধানসভা সচিবালয়, সি এম ডি এ এবং পুষ্পবাগিচাকারীদের সহযোগিতায় ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ সপ্তাহে বিধানসভা প্রাঙ্গণে।

আপনারা আসুন, দেখুন, শিল্পীদের প্রেরণা দিন। কলকাতাকে সাজাবার জন্য কিছু ভাস্কর্য সংগ্রহ করুন।

এ-লাইনে ভীষণ রেগে যায়—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কখনও বিরক্ত হই না। বরং আমি বুঝি, লোকটার পৈতৃক নামের এখনও কিছু দাম আছে—লোকটা এখনও পুরোপুরি দেউলে হয়ে যায় নি।"

"চট্টরাজ নামটা কীরকম অদ্ভুত না?" বড় বড় চোখ তুলে সীমা অথবা সুলেখা আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

না, আমিও বা শুধু-শুধু কেন কিষাণপুর পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টারের সাধের কন্যা সীমাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনের অস্বস্তিকর পরিবেশে টেনে আনছি? সুলেখা সেনকে আমি এ-বাড়িতেই আবিষ্কার করেছি, তার সঙ্গেই আমার যোগাযোগ থাক। সীমা, তুমি এখানে এসো না—আমি কলগার্ল সুলেখা সেনের সঙ্গেই এখন কথা বলতে চাই।

সুতরাং আমি সুলেখাকে বললাম, "চট্টরাজ উপাধিটা বোস ঘোষ মিত্তির মুখুজ্যেদের মতো সাধারণ নয়। তবে কয়েকজন চট্টরাজকে আমি চিনি। —তাঁরা প্রথম শ্রেণীর ভদ্রলোক।" কথাটা শুনে সুলেখা কেমন ভাবে যেন আমার দিকে তাকালো। পুরুষমানুষ যে ভদ্রলোক হয় এ-কথাটা সে যেন এই প্রথম শুনছে!

মনের এই ভাব সুলেখা অবশ্য মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিল। তারপর নিজের কাহিনীতে ফিরে গেল।

সুলেখা বললো, "প্রথম দিনেই চট্টরাজমশাই যখন মানিব্যাগ বার করে নিজের ভিজিটিং কার্ড আমাকে দিলেন, তখনই জানলাম ছদ্মনাম নয়। ছদ্মনামের ভিজিটিং কার্ড পুলিস ছাড়া আর কেউ ছাপিয়ে রাখে না।"

"চট্টরাজ লোকটি সভ্য। আচারে, ব্যবহারে, কথাবার্তায় লোকটা এখনও পুরোপুরি উচ্ছন্নে যায়নি, বুঝলেন শংকরবাবু!"

উচ্ছন্ন জায়গাটি সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা থাকলেও এ-ব্যাপারে আমার বিস্তারিত জ্ঞান নেই। সুতরাং চট্টরাজ সত্যিই ওই বিশিষ্ট স্থানে গিয়েছেন কিনা তা আমার পক্ষে বোঝা শক্ত।

জেঠমালানি যে এর পরেই সুলেখার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন তাও শুনলাম। তিনি বলেছিলেন, "তোমার কাজেকর্মে আমি খুব সন্তুষ্ট, সুলেখা। মিস্টার চট্টরাজ খুব কড়া অফিসার বলে বিখ্যাত। বিজনেসের কয়েকটা ব্যাপারে আমাদের লাইফ উনি মিজারেবল করে তুলেছিলেন। আমি তো ধানবাদের গভর্নমেণ্ট বিজনেসের আশা ছেড়ে দিচ্ছিলাম—তখন কানহাইয়াবাবু বললেন, লাস্ট অ্যাটেম্পট নিয়ে দেখো—চট্টরাজ কী একটা সেমিনারে তিন-চার দিনের জন্য কলকাতায় আসছেন।"

বহু সাধ্যসাধনায় জেঠমালানির ভাগ্য সেদিন সুপ্রসন্ন হয়েছিল এবং কানহাইয়াবাবুর নির্দেশিত পথে চট্টরাজকে তিনি চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে কিছুক্ষণের জন্যে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সুলেখাকে তিনি আগে থাকতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "একেবারে ভি-ভি-আই-পি। যেন কোনোরকম আদরযত্নের ত্রুটি না হয়।"

এই ভি-ভি-আই-পি শুনলেই সুলেখাদের বুক ভয়ে ধুকপুক করে। কিছুতেই তারা সহজ হতে পারে না—অথচ সহজ না হতে পারলে ভি-ভি-আই-পিদের মন জয় করা সম্ভব হয় না। চট্টরাজ যে সকালেই চৌত্রিশ নম্বরে প্রথম এসেছিলেন তা আমার অজানা নয়।

জেঠমালানি দুপুরবেলাতেই সুলেখাকে কংগ্রাচুলেশন জানিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতেই অপ্রত্যাশিত ফল হয়েছে, মিস্টার চট্টরাজ রীতিমত নরম হয়েছেন। অপরাহ্ণের সেমিনারে সেদিন গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে আলোচনা ছিল। কিন্তু লাঞ্চের আসরে চট্টরাজ তরুণ জেঠমালানিকে বলেছেন, তিনি ক্লান্ত বোধ করছেন।

জেঠমালানি সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে নিবেদন করেছেন, "আপনাদের মতো ব্রেনি লোক কেন স্যর এইসব মিটিঙে বসে থেকে সময় নষ্ট করছেন? এই সব লেকচারে আপনাদের কী শেখবার আছে? এই সব সাবজেক্টে আপনি যা ভুলে গেছেন তা শিখতেই এখানকার লোকদের হোল লাইফ কেটে যাবে।"

দুর্ধর্ষ অফিসার চট্টরাজ অন্য সময়ে আপিসে জেঠমালানির সঙ্গে কথাই বলতেন না। কিন্তু চৌত্রিশ নম্বর ঘরে প্রভাতী পদক্ষেপের পরে তিনি যেন অন্যরকম হয়ে গিয়েছেন। তিনি রহস্যময়ভাবে হেসেছিলেন, যার অর্থ 'হ্যাঁ' অথবা 'না' দুই হতে পারে।

সকালেই অতিথি আপ্যায়নের কাজ শেষ হওয়ায় সুলেখা সেদিন অন্যরকম প্রোগ্রাম করে ফেলেছিল। মদনাকে পাঠিয়ে সুলেখা সিনেমার টিকিট কাটিয়ে এনেছিল। জামাকাপড় পরে টিকিটখানা ব্যাগে পুরে সুলেখা দরজায় চাবি লাগাতে যাচ্ছে এমনসময় ফোনটা তারস্বরে বেজে উঠলো। আর এক মিনিট দেরি হলেই কেলেংকারি হতো। মিস্টার জেঠমালানি ব্যস্ত হয়ে সুলেখাকে ডাকছেন। [ক্রমশ]

কেয়ারফ্রী* সুরক্ষা
এখন
৫ টি ন্যাপকিনের
এক সুবিধাজনক
প্যাকে
FREE BELT INSIDE
Carefree*
SANITARY NAPKINS
EASILY DISPOSABLE
৫ টাকা
ট্যাক্স আলাদা
পাঁচটি কেয়ারফ্রী ন্যাপকিন, প্রত্যেকটিই
আপনাকে যোগাবে সম্পূর্ণ সুরক্ষা আর নিরাপত্তা।
আপনি দেখবেন অন্যান্য সাধারণ ন্যাপকিনগুলোর পুরো
প্যাকের চেয়ে ৫ টির নতুন সুবিধাজনক
প্যাকই যথেষ্ট—কারণ কেয়ারফ্রী ব্যবহার করলে বার
বার বদলাবার দরকার হবে না।
OBM-7253-BEN
কেয়ারফ্রী: আপনি এর জন্যে যে মূল্য দেবেন উপকৃত হবেন তারচেয়েও অনেকগুণ বেশী
• স্যানিটারী ন্যাপকিনের ব্রাণ্ড। কেয়ারফ্রী এবং জনসন এণ্ড
জনসন হ'ল ইউ. এস.এ-র জনসন এণ্ড জনসন-এর ট্রেডমার্ক।
Johnson & Johnson*

বিশ্ববিজ্ঞান

সন্তানসম্ভবা মায়েদের ক্ষেত্রে

বেশি ছেলেমেয়ে হোক, অনেক মা-ই এটা এখন আর চান না। তাঁদের স্বপ্ন, সংসারে একটি অথবা দুটি সন্তান থাকবে। এমন সন্তান যারা মনের দিক দিয়ে হবে সতেজ, দেহের দিক দিয়ে সুঠাম। তবেই তো সম্ভব তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করে গড়ে তুলে একটি সুখী পরিবার গড়ে তোলা।

কোন কোন সময় সমস্যা যে দেখা দেয় না, তা বলব না। ধরুন, কোন মেয়ে সন্তান সম্ভবা হলেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন পর্যন্ত কত স্বপ্নই না দেখেন তিনি। কখনও কখনও স্বপ্ন ভংগও ঘটে।

গোলমাল ঘটতে পারে নানা ভাবে তবে সবচেয়ে মারাত্মক হয় তখন, যখন পেটের মধ্যে যে সন্তানটি ধিকি ধিকি বেড়ে উঠতে থাকে যদি তার মধ্যে প্রজননগত কোন ত্রুটি থেকে যায়। মা নানা রকম রোগ অথবা অপুষ্টিতে ভুগলে, তাঁর সন্তানের মানসিক বা দৈহিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। কোন কোন সময় তেমন ক্ষতি উপযুক্ত পরিচর্যায় মিটিয়েও নেয়া যায়। কিন্তু মা বা বাবার প্রজননগত ত্রুটি নিয়ে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে বেশির ভাগ সময় সে শিশু সংসারের পক্ষে একটা বড় রকমের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ত্রুটির ফলে কোন কোন শিশু বিকলাংগ হয়ে জন্মাতে পারে। কেউ জন্মাতে পারে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন নিয়ে। যার ফলে জন্ম থেকেই সে রক্তাল্পতা রোগের শিকার হয়। কেউ বা জন্মায় জবুথবু, মনের দিক দিয়ে জড়পিণ্ডের মত। কেউ বা বিকৃতদেহী। প্রকৃতির নিয়মে গর্ভপাতের মাধ্যমে এসব শিশু অনেক সময় মারা যায়। অনেক সময় দেখেও থাকবেন হয়ত, কারোর কারোর একের পর এক সন্তান পেটে আসছে এবং গর্ভপাত ঘটছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এ ধরনের গর্ভপাত কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মেই হয়ে থাকে। এটা মায়ের দিক দিয়ে কোন রকম যোগ্যতার অভাব নয়। আসলে প্রকৃতিই চান না, ওই সব সন্তান বেঁচে থাকুক। কারণ ওরা বেঁচে থাকলে অনেকেই হয়ত স্বাভাবিক দেহ এবং মন নিয়ে চলাফেরা করতে পারত না। বলা বাহুল্য, গর্ভ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়, চিন্তার কারণ থাকে না। কিন্তু সমস্যা

বাঁ পাশে : ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতার দরুন অস্বাভাবিক সন্তান জন্মাতে পারে কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্যে জনৈক চিকিৎসক একজন সন্তানসম্ভবা মায়ের পেট থেকে ভ্রূণের পাশের অ্যামনিওটিক রস সংগ্রহ করছেন। ডান পাশে : জনৈকা বিশেষজ্ঞা ওই রসে ভাসমান ভ্রূণের কোষের ক্রোমোজোমের ছবি পরীক্ষা করে দেখছেন। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য, পৃথিবীতে প্রতি বছর শুধু অস্বাভাবিক সন্তানই জন্মায় প্রায় ৭০০,০০০। তারা যে অস্বাভাবিকরূপে জন্মাবে গর্ভ অবস্থায় পরীক্ষা করেই হয়ত তা বলে দেয়া যেত।

দেখা দেয় তখন যখন পেটের সন্তান বেঁচেও থাকে, আর যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে অস্বাভাবিক।

ইদানীং এ ধরনের সমস্যার সমাধানের কিছু কিছু চেষ্টাও করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

যেমন ধরুন, 'জেনেটিক কাউন্সেলিং' বা প্রজননগত আলোচনা। এ ধরনের আলোচনা দুই পর্যায়ে হতে পারে। বিয়ের আগে এবং পরে। বিয়ের আগে ছেলে এবং মেয়েদের ক্রোমোজোম পরীক্ষা করে বলে দেয়া যায় তাঁদের ক্রোমোজোমে এমন কোন ত্রুটি আছে কিনা, যা তাদের সন্তান-সন্ততিদের অস্বাভাবিক করে তুলতে পারে। যদি সত্যিই তেমন কোন সম্ভাবনা থাকে, সেক্ষেত্রে বিয়ের আগে ওই ছেলেমেয়েদের ভেবে দেখা দরকার। আদৌ তারা বিয়ে করবে কিনা। পরস্পর বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে যদি তাদের পরিণয় ঘটে, তাহলে এমন সিদ্ধান্তও হয়ত তাঁদের নিতে হতে পারে, কোনদিন তারা বাবা-মা হবে না।

পরস্পরের ক্রোমোজোম সংক্রান্ত তথ্য না জেনে বিয়ে করলে অন্য পথও আছে। সেক্ষেত্রে পেটে সন্তান আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করান যেতে পারে। এর জন্যে মায়ের গর্ভাশয় থেকে বের করে নিতে হয় এক ধরনের রস। যার নাম অ্যামনিওটিক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের

যাবজ্জীবন আয় পরিকল্পনা–

—আপনার 'জীবন সাথী' জীবনভোর মাসিক আয়ের উৎস!

৭ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে সারাজীবনের জন্যে মাসিক আয়ের ব্যবস্থা করে রাখুন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা খুব সত্যি। আপনি যদি এখন থেকে ৭ বছরেরও কম সময়ের (অর্থাৎ ৮৩ মাসের) জন্যে মাসে মাসে ৫০ টাকা বা ১০০ টাকা (বা ১০ টাকার গুণিতকে টাকা) জমা রাখতে থাকেন, তাহলে ৮৪ তম মাস থেকে সারাজীবন সমান পরিমাণ টাকার আয়ের সংস্থান করে রাখবেন।

আরও আছে…

দ্বিগুণ খরচ না ক'রে দ্বিগুণ আয়ের ব্যবস্থা:
১৩২ মাসের জন্যে, অর্থাৎ ঠিক ৪৯ মাস বেশী সময়ের জন্যে আপনি যদি টাকা জমা রাখেন, তাহলে প্রতি মাসে আপনার দ্বিগুণ আয় হবে—সারাজীবন।

সারাজীবন অর্থ যোগায়, আপনার পরিবারের সহায় হয়:
এছাড়া আপনার জীবন অবসানের পরে এই যাবজ্জীবন আয় পরিকল্পনা থেকে আপনার পরিবারের লোকেরা বেশ মোটা টাকা হাতে পাবেন।
অথবা, আপনি চাইলে সুদসমেত পুরো আসলই ফেরৎ দেওয়া হবে। তবে যে গাছে সোনা ফলে সে গাছের গোড়া কে কাটে, বলুন?

অবিলম্বে আয়ের জন্যে এখুনি ব্যবস্থা করুন:
আজই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের নতুন পরিকল্পনায় যোগ দিন। যত তাড়াতাড়ি টাকা জমা করবেন তত তাড়াতাড়ি আয়ও হতে থাকবে…মাসের পর মাস…জীবনভোর! নীচের ঠিকানায় কুপনটি ডাকে পাঠিয়ে দিন কিম্বা বিশদ বিবরণের জন্যে আপনার নিকটতম ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক শাখায় চলে আসুন।

LL/D

অ্যাসিস্টাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার
বিজনেস ডেভেলাপমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,
২৩৯, ব্যাকবে রিক্লামেশন, বম্বে ৪০০০২১

নাম:________ বয়স:______

ঠিকানা:________

________ বৃত্তি:________

ছোট পরিবার সুখী পরিবার

Interpub/UBI/16/76 BN

ফ্লুইড। এই রসের মধ্যে থাকে ভ্রূণের দেহ-কোষ এবং আরও নানারকম জৈবিক পদার্থ। এই কোষের ক্রোমোজোম পরীক্ষা করে বলে দেওয়া যেতে পারে যে শিশু মাতৃগর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে স্বাভাবিক জীবন ধারণে কতটা সক্ষম। যদি দেখা যায় অস্বাভাবিক-রূপে জন্মাবে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাহায্যে গর্ভপাত করান যেতে পারে।

বলা সহজ। তবু বিশেষজ্ঞরা সবাই স্বীকার করবেন, গর্ভ ধারনের পর গোড়ার দিকে গর্ভ ধারণ সত্যিই বিপজ্জনক হল কিনা অনেক সময় তা ধরা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে ধরা সম্ভবও নয়।

যেমন ধরুন, প্রত্যেক সন্তানসম্ভবা মায়ের রক্তে এক ধরনের হরমোন থাকে। যার নাম হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন। গর্ভ অবস্থা স্বাভাবিক থাকলে এবং গর্ভ-সঞ্চারের পর কোন অস্বাভাবিকতার লক্ষণ যদি না থাকে তাহলে মায়ের রক্তে ওই হরমোনটির মাত্রা গোড়ায় কয়েক সপ্তাহ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কিন্তু গোলমাল বাঁধে, যখন ভ্রূণের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে অস্বাভাবিকতা। অথবা ভ্রূণের শ্বাস-কষ্ট বা ভবিষ্যতে গর্ভপাতের কোন সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে মায়ের রক্তে বা সিরামে ইউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন নামক হরমোনটির মাত্রা অনেক কম থাকে। সাধারণ পদ্ধতিতে এ ধরণের গর্ভকালীন ত্রুটি আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদ্ধতির সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে মায়ের শরীর থেকে যৎসামান্য রক্ত বের করে নেয়া হয়। ওই রক্ত থেকে তারপর পৃথক করে নেয়া হয় সিরাম। এবার ওই সিরামের মধ্যে পর্যায়-ক্রমে মেশান হয় হিউম্যান প্লাসেন্টাল হরমোনের অ্যান্টিবডি এবং আইওডিন-১২৫ যুক্ত বিশুদ্ধ হিউম্যান প্লাসেন্টাল হরমোন। অ্যান্টিবডি এবং ওই হরমোন পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার পর কতটা হরমোন অবশিষ্ট রইল অথবা রইল না সেটা দেখে বলে দেয়া যায় মায়ের সিরামে ওই হরমোন কি পরিমাণ রয়েছে। বহুমূত্র রোগের দরুন গর্ভাবস্থায় কোন জটিলতা দেখা দেয়ার সম্ভাবনাও এই পদ্ধতিতে জানা যেতে পারে। উল্লেখ্য, আইওডিন—১২৫ তেজস্ক্রিয় পদার্থ। তবে তার জন্যে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। সম্প্রতি ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র এবং বোম্বাই-এর ইনস্টিটিউট অভ রিসার্চ ইন রিপ্রোডাকশন যুগ্মভাবে এই পদ্ধতিতে রক্তে হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন মাপার একটি যন্ত্র তৈরি করেছে। ভারতে এ ধরনের আধুনিকতম যন্ত্র এই প্রথম তৈরি হল।

সমরজিৎ কর

গ্রাম বাংলার কথা

দর্পণে বাংলা। শান্তিকুমার মিত্র। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা-৯। ৫.০০

বহু ক্রোশ দূরে বহু দেশ হয়ত ঘুরে দেখা হয়। কিন্তু ঘর থেকে শুধু দুই পা দূরে ঘাসের শিসের উপর একটি শিশির-বিন্দুর সৌন্দর্য দেখার সুযোগ আমাদের হয় না। এ কি ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য? না কি অবজ্ঞাবসিদ্ধ অনামনস্কতা? 'দর্পণে বাংলা' বইটি কবি-কথিত এই উক্তিরই বিপরীত তাৎপর্যে গ্রথিত সুখপাঠ্য একটি বিবরণ। লেখক বহুদূরের চেয়ে দুয়ার হতে অদূরের প্রতিই মন দিয়েছেন বেশি। মাত্র দুই পা দূরের গ্রাম-বাংলার নিবিড় মোটামুটি পরিসংখ্যানযুক্ত রেখা চিত্র ফুটিয়েছেন গভীর মমতায়। সাংবাদিকের চোখের সঙ্গে মিশিয়েছেন সাবলীল বাচনভঙ্গীর কুশলী চাতুর্য। আমরা বাংলাদেশের জল হাওয়ায় সরস মস্তিষ্কায় নানা সমস্যা সংকট বেড়ে ওঠা মানুষজন। বলতে কি, গ্রাম-বাংলা সম্পর্কে যোরতর বাঙালী হয়েও আমাদের জ্ঞানগম্যি সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। মুখে আমাদের 'আহা মরি' দরদ, আবেগ আতিশয্য যতই থাক গ্রামের নির্ভুল এবং আসল স্বরূপটি আমাদের কাছে অনুদ্ঘাটিত। অথচ গ্রামই যে শহরের প্রাণশক্তি, শুধু শহরেরই বা কেন, সমগ্র জাতির এবং দেশের এ-কথা কার না জানা। এই বইটিতে লেখক বাংলাদেশের কোনো রাজনীতিক বা ভৌগোলিক পটভূমি টেনে আনেন নি। নিজের দুরুপনের কৌতূহল এবং আগ্রহ নিয়ে ঘুরে ঘুরে গ্রামের পর গ্রাম দেখে বেড়িয়েছেন। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের সফল বিফল আশা-স্বপ্নের খোঁজ খবর নিয়েছেন—আর একটি অনাস্বাদিত বই লেখবার জন্য খুঁটিনাটি ফর্দ তৈরি করেছেন। আজ দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের প্রকৃত চেহারাটি লোকচক্ষে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা বিফল হয় নি। গ্রামের মানুষের রুজি-রোজগার, মেহনতী মানুষের উন্নতি-অবনতি, ক্ষেতমজুরের আয়-ব্যয় ভরণপোষণ, জমিদার শ্রেণীর অবলুপ্তির পরে বড় মহাজনদের কারবার, তাদের মেজাজমর্জি, অর্থাৎ এই সূত্রে সামগ্রিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোটির খসড়া শান্তিবাবু তাঁর বইয়ে পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর দীর্ঘ আটাশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। সেকালের সেই বিভীষিকাময় জরাজীর্ণ পঙ্গু ক্ষুধাতুর চেহারা বাংলার গ্রামের অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার বা এপার বাংলার এখন আর নেই। চোখ ফিরে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যায় কৃষির সবুজ গালিচা। যেখানে ছিল কয়েকখানি কেরোসিন ডিবে জ্বালানো ঝুঁকে-পড়া চালা, এখন দিনমানে সেখানেই মানুষ দেখতে পাবে ছোটোখাটো কুটির-শিল্পের যৌথ প্রচেষ্টা। যেখানে ছিল বর্ষায় কর্দমাক্ত পথের ভয়াবহতা সেখানে এখন পিচ-মোড়া পাকাপোক্ত রাস্তা, শুধু তাই নয় গরুরগাড়ির চাকার সঙ্গে চলেছে সেখানে বাস-সার্ভিস। সেচ প্রকল্পের সুযোগে এখন আকাশ-বর্ষণের অপেক্ষায় সারা বছর হা-পিত্যেশ করে মরতে হয় না। লক্ষীর জলকুণ্ড বসিয়ে বারোমাসই জমি খাটছে, যোগান দিচ্ছে একাধিক ফসলের। আজ আর কি বাংলার মাটিতেও গমের চোখ-জুড়ানো অঢেল ফসল। নিশুতি রাতের অন্ধকারেও পথ হাতড়ে মরতে হয় না—বিদ্যুতও গ্রামে গ্রামে আজ তার বিজলী বাতিতে রাতকে দিন বানিয়ে ফেলছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গ্রামের যে আমূল রূপান্তর, কি সেখানকার মানুষের কি তাদের পারিপার্শ্বিকের—লেখক আশাবাদী আবেগোচ্ছল আগ্রহ নিয়ে তা লক্ষ্য করেছেন। সে অভিজ্ঞতাই এই বইটির পাতায় পাতায়। আমূল এক পরিবর্তনের ছবি। তবে সবই যে ভাল এমন কথা তিনি বলেন নি। এখনও অনেক অন্ধকার, অনেক জঞ্জাল হতভাগ্য গ্রামের নিত্য সাথী।

'দর্পণে বাংলা' এমন একটি বই, বাংলাদেশ সম্পর্কে, বলাই বাহুল্য এ-পার বাংলা সম্পর্কে, যা প্রতিটি বাঙালীরই আজকের মধ্যে পূর্ণ, সম্যক জ্ঞান অর্জনের পক্ষে অল্পের মধ্যে যথেষ্ট।

সুনীল বসু

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আজ থেকে তেইশ বছর আগের কথা। দু-চাকার দুটি সাইকেল নিয়ে দুজন সাহসী অ্যাডভেঞ্চার-উন্মুখ যুবা সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। সংবাদপত্রের শিরোনামে তাঁদের এই জয়যাত্রার খবর তখন বেশ বড় করে বেরিয়েছিল। শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের সর্বত্র তাঁদের যাত্রা-বিবরণী ও ভ্রমণের সংবাদ পাঠকদের উপহার দেওয়া হয়েছিল। প্রথমে দক্ষিণ ভারত, অতঃপর পশ্চিম ও মধ্য ভারত হয়ে উত্তর ভারত। ছ মাসেরও বেশী লেগেছিল এই পুরো অভিযান শেষ করতে। অভিযানই বলা যায়। কেননা, শুনতে সহজ লাগলেও শুধু মাত্র সাইকেল সম্বল করে ভারত দর্শনের তৃষ্ণা মেটানো খুব অনায়াস-সাধ্য কাজ নয়। বহু পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা পার হয়ে এই অভিযাত্রিদ্বয়—সন্তু ঘোষ ও নিরাপদ নিয়োগী—ফের এই কলকাতায় কীভাবে ফিরে এলেন সেই কাহিনী শুনিয়েছেন ভারততীর্থে (প্রাপ্তিস্থান : কর্নওয়ালিস বুক স্টল, কলকাতা-৫, বোল

টাকা) গ্রন্থে। গ্রন্থটি অবশ্য সন্তু ঘোষ একাই লিখেছেন।

এই ধরনের ভ্রমণ-কাহিনীতে সাহিত্য-রস মেশাবার সুযোগ তেমন নেই। শ্রীঘোষও সে চেষ্টা করেননি। অতি সহজ ও সরল ভাষায় তিনি পুরো ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি বলে গিয়েছেন। অপূর্ব সত্যজিতের এই ভ্রমণের বহু অভিজ্ঞতা, বৈচিত্র্যময় স্বাদের জন্য, শুনতে কৌতূহলের লাগে।

*

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আমার [illegible]-গুলি-র (কল্পক প্রকাশনী, কলকাতা-৪, চার টাকা) ভূমিকায় কণাদ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের কাব্য-বিশ্বাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। বলেছেন, "অজ্ঞাত কিন্তু অনুভূত এক শুদ্ধতার আদর্শকে শব্দের বন্ধনে ধরবার চেষ্টাই আমার কবিতা, সুতরাং তার নিয়ন্ত্রণ আমার জীবন-যাপনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।" কথাটা বেশ ধাঁধায় ফেলে। শুধু অজ্ঞাত আদর্শ হলে কিছু বলার ছিল না, কিন্তু 'অনুভূত' যে-আদর্শ তা যত শুদ্ধতারই হোক জীবনযাপনের সঙ্গে অসম্পর্কিত হয় কি করে? বস্তুত, বাহজীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক নাও থাকতে পারে, কিন্তু অন্ত-জীবনের সঙ্গে? কথাটা নিশ্চয়ই কণাদ একবার ভেবে দেখবেন। জীবন-যাপনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পর্কিত কবিতা তিনি কি লিখেছেন? অন্তত এই বইতে সে-রকম কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

আরও দু-একটা ছোটখাট প্রশ্ন থেকে যায়। 'স্বপ্ন' কবিতার শেষ পঙক্তির ছন্দ কানের সায় পায়নি। স্বরবৃত্তের চাল হোঁচট খেয়েছে। 'অর্জুনের অন্ধকার' চল্লিশ দশকের এক অগ্রণী কবির কবিতাকে (অকালসন্ধ্যা) আলতোভাবে স্মৃতি-জাগরিত করে তোলে, তাও, বলা ভালো, কোনো দৃষ্টিকটু মাদুলো নেই। তৎসম শব্দের প্রতি যাঁর অনুরাগ তাঁর বলে খাড়, তাঁর কবিতায় 'কন্যা' 'দুর্বিসহ' কিংবা 'প্রজ্বলিত', 'নূপুর' প্রভৃতির ব্যবহার চোখে লাগে।

তবে কণাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের আমার তরঙ্গের কয়েকটি পাঠক-হৃদয়ের খেলা-ভূমিতে নিশ্চিত ছাপ রেখে যায়। 'আয়াম, স্বপ্ন', 'অস্বীকার' সে আসে গভীরে' প্রমুখ তার অন্যতম।

*

কবিতায় নিজয় বল এখনো দিক্-সন্ধানী, উন্মুখ, অস্থির। আমাকে জেগেই হবে (প্রকাশক : শ্রীদাস সাহা, কলকাতা-৯, তিন টাকা) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'গ্রীষ্ম' এবং 'কর্ণিক' কবিতায় তাঁর শরসন্ধান ব্যর্থ নয়।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পত্রিকা

মুভি মনতাজ। সম্পাদক : প্রণয় শূর।

ক্যালকাটা সিনে ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে প্রকাশিত এই পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায় গত পাঁচ বছরে লোকান্তরিত ১১ জন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকারের (ফ্রিৎস ল্যাঙ্, জন ফোর্ড, জন গ্রিয়ারসন, ভিত্তোরিও ডি-সিকা, রম্, কালাটোজভ, কোজিনৎসেভ, ভিসকন্তি, মেলভিল, পাসোলিনী ও ঋত্বিক ঘটক) জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকগোষ্ঠীতে রয়েছেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, ল্যাংডন ডেওয়ে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন ঘোষ, নির্মাল্য বসু, প্রণয় শূর এবং ঋত্বিককুমার ঘটক স্বয়ং। আলোচনাগুলি স্বল্প পরিসরেও মনোজ্ঞ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং তথ্যসমৃদ্ধ।

খেলার মাঠে

মাদ্রাজে তৃতীয় ও শেষ টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ২১৬ রানে জয় এবং ২—০ জয়ে 'রাবার' লাভ ইংলন্ডের সঙ্গে আসন্ন সিরিজ খেলার পক্ষে ভারতীয় খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণার খোরাক। বিশেষ করে ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—সব বিভাগেই ভারত যেভাবে নিউজিল্যান্ডের উপর টেক্কা দিয়েছে তাতে মনে হয় ইংলন্ডের সঙ্গে সিরিজ ভালই জমবে। আপাতদৃষ্টিতে ইংলন্ড দলকে দুর্বল বলে মনে হলেও ভারতের উইকেট, ব্যাটিং ও বোলিং শক্তি, পরিবেশ—সব কিছু খতিয়ে দেখেই এম সি সি ভারতে দল পাঠিয়েছে।

এম সি সি দলের সূচনাও শুভ। সফরের প্রথম দুটি ম্যাচের মধ্যেই পাঁচজন সেঞ্চুরি করেছে। তার মধ্যে আবার একটি আছে ডাবল সেঞ্চুরি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পুনেতে পশ্চিমাঞ্চল দলের বিরুদ্ধে সহ-অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ার্লির ২০২ রান সরকারীভাবে ভারত সফরকারী ইংলন্ডের খেলোয়াড়ের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি। ইংলন্ডের আর যে দুজন খেলোয়াড় ভারতের মাঠে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন তাঁরা হচ্ছেন জো হার্ডস্টাফ এবং ডেনিস কম্পটন। কিন্তু তাদের কেউই এম সি সি দলের হয়ে ভারত সফরে আসেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দুজনই ভারতে ছিলেন। তখনই তাঁরা করেন ডাবল সেঞ্চুরি। ইডেনে হার্ডস্টাফের চটকদার ডাবল সেঞ্চুরিটি এখনো যেন আমার চোখে ভাসছে।

পুনেতে কিথ ফ্লেচারের ১১৮ এবং অধিনায়ক টনি গ্রীগের ১৬২ রানও উল্লেখ করার মত। যদিও ওই খেলার সময় মাদ্রাজের টেস্ট চলতে থাকায় পশ্চিমাঞ্চলের বহু নামী খেলোয়াড় খেলাটিতে অংশ নিতে পারেননি। তবু বোলার হিসাবে পদ্মাকর শিভলকর, উদয় যোশী এবং ধীরাজ পারসনার তো নাম আছে। তাদের বলেই ব্যাটের ব্রিংসাকিগ দেখিয়েছেন এম সি সি-র খেলোয়াড়রা। গ্রীগ তো কম করে ৭টি ছক্কা হাঁকড়িয়েছেন। জয়পুরে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধেও সেঞ্চুরি করেছেন গ্রাহাম বার্লো (১১৩) ১৬টি বাউন্ডারি সহ এবং অ্যালান নট (১০৮)। পুনেতে পেস বোলার বব উইলিসের এক সময় মাত্র ২৪ রানে ৫টি উইকেট দখলও উল্লেখের দাবি রাখে। অবশ্য আঞ্চলিক দলের সঙ্গে খেলা আর টেস্ট খেলায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তবু বলব এম সি সি-র সূচনা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

এক সিরিজ শেষ অন্য সিরিজ শুরু

আমাদের প্রধান ভরসা স্পিন বোলিং এবং প্রধানত স্পিন বোলারদের কৃতিত্বেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে আমাদের রাবার লাভ। আমাদের টেস্ট পীচও স্পিনারদের উপযোগী করে তৈরী করা। তবু স্মরণ রাখতে হবে আন্ডারউড স্পিনার্স উইকেটে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারেন। মিলার এবং কোপও সমীহ আদায়কারী অফ ব্রেক বোলার। এবং অধিনায়ক টনি গ্রীগের মিডিয়াম পেস থেকে মন্থর বল অধিক কার্যকরী। ফাস্ট বোলিংয়ে ইংলন্ড নিঃসন্দেহে ভারতের চেয়ে শক্তিশালী। ব্যাটিংয়ে মনে হয় দুই দলের শক্তি উনিশ-বিশ। সুতরাং সিরিজ উপভোগ্য এবং উত্তেজনাপূর্ণ হবার সম্ভাবনা বেশি।

মাদ্রাজে ভারত-নিউজিল্যান্ড শেষ টেস্টের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। জয়-পরাজয় ফয়সালার জন্যই এ টেস্ট ছয়দিন চলার কথা ছিল। কিন্তু প্রবল বৃষ্টির জন্য প্রথম দিনের খেলা একেবারেই হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যায় এক ঘণ্টা দশ মিনিট আগে। তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হয় এক ঘণ্টা পরে এবং চতুর্থ দিনের খেলা হয় মাত্র দু ঘণ্টা। মোট ১১ ঘণ্টার বেশি সময় নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভারত জিতেছে খেলার আরো দেড় ঘণ্টা সময় বাকি থাকতে। বলা বাহুল্য, ভারতীয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা মোটেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে পারেনি। পাকিস্তানে তিনটি টেস্টে টসে হেরে তারা

কোন টেস্টে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেল না। একই কারণে ভারতেও প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেল না। তা ছাড়া নামী ও জন খেলোয়াড়ের অভাবে এই নিউজিল্যান্ড দল যে এক বছর আগের নিউজিল্যান্ড দলের চেয়ে অনেক দুর্বল সে কথা আগেই বলেছি। মাদ্রাজ টেস্ট নিয়ে দুই দেশের মধ্যে মোট ২২টি টেস্ট খেলার মধ্যে ভারত জিতেছে ১০টিতে এবং সব দেশের সঙ্গে টেস্ট খেলার হিসাবে ১৪৭টি টেস্টের মধ্যে ২৫টিতে। ভারতের মোট পরাজয় ৫৯টি টেস্টে। বাকি ৬৩টি টেস্টের ফল অমীমাংসিত।

ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের কতকগুলি ঘটনার কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যেমন সুনীল গাভাসকারের দেশের মাঠে প্রথম সেঞ্চুরি। বিদেশে যার টেস্ট সেঞ্চুরি ৮টি সে নবম সেঞ্চুরি করল দেশের মাঠে। এই সিরিজেই গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের আড়াই হাজার রান পূর্ণ হয়েছে; বেংকটরাঘবনের পূর্ণ হয়েছে শত উইকেট। তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা অধিনায়ক এবং মুখ্য বোলার বেদীর চমকপ্রদ ব্যাটিং। ফলে তার ব্যাটিং গড় দাঁড়িয়েছে নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক গ্লেন টার্নারের উপরে এবং ভারতের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কিরমানি ও বিশ্বনাথের পরে তৃতীয়। তিনটি টেস্টে ১৩·১৮ গড়ে তার ২২টি উইকেট দখলও অসাধারণ কৃতিত্ব। উইকেট কিপার কিরমানি আগের ১০টি টেস্ট ইনিংসে করেছিল ১২৭ রান। এ সিরিজে তিন ইনিংসেই করেছে ১৯৬ রান। কিরমানি (৮৮), বেদী (নট আউট ৫০), বেংকট (৬৪), চন্দ্র (নং আঃ ২০)—সবাই জীবনের বড় রান করেছে এই সিরিজে। আর একটি মজার ঘটনা—চন্দ্রশেখর তিনটি ইনিংসে ব্যাট করে তিন ইনিংসেই নট আউট থেকে গেছে।

মাদ্রাজ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর ঃ

ভারত—প্রথম ইনিংস ২৯৮ (বিশ্বনাথ ৮৭, বেংকটরাঘবন ৬৪, কিরমানি ৫৪, ব্রিজেশ প্যাটেল ৩৩; কেয়ারনস ৫—৫৫, হ্যাডলি ৩—৩৭)

নিউজিল্যান্ড—প্রথম ইনিংস ১৪০ (বার্জেস ৪০, টার্নার ৩৭, হ্যাডলি ২১; বেদী ৫—৪৮, চন্দ্রশেখর ৩—২৮, ঘাউড়ি ২—৫২)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস—৫ উইঃ ডিক্লেঃ ২০১ (মহীন্দার অমরনাথ ৫৫, গাভাসকার ৪৩, ব্রিজেশ প্যাটেল নট আউট ৪০; হ্যাডলি ২—৫২, ওসুলিভান ২—৭০)

নিউজিল্যান্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৩ (পার্কার ৩৮, লীস ২১, ওসুলিভান ২১; বেদী ৪—২২, চন্দ্রশেখর ৩—৫৪।

একলব্য

জন্ম ভারতে, বাসভূমি ইংলণ্ডে, শ্বশুর-বাড়ি দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাই বব উলমারের উপর দাবি তিন দেশের। দক্ষিণ আফ্রিকা জামাইকে ক্রিকেটের জন্য ধরে রাখতে চেয়েছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে এম সি সি দলের খেলোয়াড়দের আপ্যায়ন অনুষ্ঠানে ভারতের হাই কমিশনার তো দাবিই করেছিলেন, যেহেতু উলমারের জন্ম কানপুরে, শৈশবও কেটেছে ভারতে, সেহেতু উলমার ভারতের খেলোয়াড়। আর উলমার যে দেশের নাগরিক সেই ইংলণ্ডের তো এখন অপরিহার্য খেলোয়াড়।

তবে আগে কোনবার এম সি সি দলের সঙ্গে বিদেশ সফর করেননি। টেস্ট খেলার সুযোগও পেয়েছেন বেশী বয়সে। মাত্র গত বছর হোম সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তারপর এ বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। এখন বয়স ২৮ বছর।

ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কলিন কাউড্রেও ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাউড্রে যে কাউণ্টির খেলোয়াড় উলমারও সেই কেণ্ট কাউণ্টিতে খেলেন। এবং কাউড্রের কাছ থেকেই ক্রিকেটের উন্নত পাঠ গ্রহণ করেছেন। তাই অনেকের কাছে উলমার দ্বিতীয় কাউড্রে। উলমার নিজেও স্বীকার করেন ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁর যতটুকু পরিমার্জন তার মূলে কাউড্রে। নানাভাবে, নানা উপায়ে তিনি ক্রিকেটে উলমারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপদেশ ও তালিম দিয়েছেন কিভাবে ফাস্ট বোলারের বল খেলতে হয়, কিভাবে বাম্পারকে পাঠাতে হয় বাউণ্ডারির বাইরে।

ইংলণ্ডের আর এক অধিনায়ক টনি লুইস, যিনি ১৯৭২-৭৩ মরসুমে ভারত সফরে দলনেতা ছিলেন, তিনি এক প্রবন্ধে উলমারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত ভারতে তোমার জীবনের প্রথম সফর সাফল্যমণ্ডিত হোক, এটা সবারই কাম্য। কিন্তু সাবধান, ভারতে স্পিন বোলিং-এর ভয়ংকর রকমের মায়াজাল ও মৃত্যুফাঁদ। লোভে পড়ে বাঁধা পড়ো না। ফরোয়ার্ড বা ব্যাকোয়ার্ড খেলার তোমার এখনকার টেকনিক ফাস্ট বলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ভাল। কিন্তু বেদী-চন্দ্র-বেংকট-প্রসন্নর বল খেলার জন্য প্রয়োজন আরও কিছু সূক্ষ্ম কৌশল।"

উলমার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুটি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্ট খেলেছেন। ৭টি টেস্টের ১৩ ইনিংসে মোট রান ৪৬৩। গড় ৩৫·৬১। কোনো ইনিংসে নট আউট না থাকায় গড় ভাল হয়নি। কিন্তু ১৯৭৫-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাটিং অ্যাভারেজে ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে,

শীতের ক্রিকেট অতিথি (৮)

মাত্র দুটি টেস্ট খেলার সুবাদে। এ বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে রান-সংখ্যায় ডেভিড স্টিল ও অ্যালান নটের পরেই ওঁর স্থান। কিন্তু আগেই বলেছি, নট আউট না থাকায় ব্যাটিং অ্যাভারেজে নবম স্থানে নেমে গেছেন।

টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয় ক্রিকেটের স্বর্গভূমিতে। অর্থাৎ লর্ডসে। একই টেস্টে ডেভিড স্টিলের সঙ্গে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার

বব উলমার

লিলি, টমসন, ওয়াকারের বলের বিরুদ্ধে স্টিল করলেন ৫০ ও ৪৫ রান, উলমার ৩ ও ৩১ রান করে পরের টেস্টে বাদ পড়লেন। ওভালের শেষ টেস্টে আবার উলমারকে দলভুক্ত করা হল এবং ওঁরই জন্য ইংলণ্ড বাঁচল ভরাডুবি থেকে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৫৩২ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ) রানের উত্তরে মাত্র ১৯২ রানে যখন ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল এবং ফলো-অন করতে হল, তখন ইনিংস পরাজয় এড়াবার জন্য দরকার ছিল ৩৪১ রান। ওই ম্যাচটি ড্র হয়ে যায় মুখ্যত উলমারের অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্যে। লিলি, টমসন, ওয়াকারের গোলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা ১৯ মিনিট উইকেটে থেকে করেছিলেন ১৪৯ রান। উল্লেখ্য, এটিই জীবনের বড় ইনিংস। আগের বড় ইনিংস ছিল কাউণ্টি ক্রিকেটে ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ১২৫। অ্যাণ্ডি রবার্টস, হোল্ডিং, হোল্ডার, জুলিয়েনের বলের বিরুদ্ধে এ বছর পাঁচটি টেস্টের রান ৮২ ঃ ×; ৩৮ ঃ ২৯; ৩ ঃ ০; ১৮ ঃ ৩৭ এবং ৮ ঃ ৩০।

বব উলমারের বিশেষত্ব যে-কোন নম্বরে ব্যাট করতে পারেন। টেস্ট অভিষেকে পাঠানো হয়েছিল ৮ নম্বরে। দ্বিতীয় টেস্টে ৫ নম্বরে উঠে এলেন। আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ দুটি টেস্টে এক নম্বর হিসাবে ইনিংসের সূচনা করেছেন। ব্রায়ান লাকহার্স্টের চোট লাগায় কেণ্ট কাউণ্টির ওপেনার হিসাবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। আবার প্রয়োজনে ভাঁজভেঙার মত চেঞ্জ বোলার। ৩টি টেস্ট উইকেটও দখলে আছে।

ক্রিকেটের পরিচিত মহল বব উলমারের নাম প্রথম জেনেছিল বোলার হিসাবে। অফ স্পিনার ছিলেন। পরে পদ্ধতিটা বদলে হন মিডিয়াম ফাস্ট সীমার। দু-দিকেই বল বাঁক নেওয়াতে পারেন। আউট সুইং-এ দক্ষতা কিছু বেশী।

ক্রিকেট শুরু হয়েছিল টনব্রিজের ইয়ার্ডলি কোর্টে। পরে কেণ্টের স্কিনার্স স্কুলে। কেণ্টের কোচ কলিন পেজ ওকে আবিষ্কার করেন পনেরো বছর বয়সে। কেণ্ট দলে প্রথম দিকে সুবিধা করতে পারেননি। না বলে, না ব্যাটে। ব্যাটিং-এ যখন মোটা-মুটি ভাল রান করতে থাকেন তখন—বিশেষজ্ঞদের ধারণা—ওঁর অগ্রগতির পথ আটকে রাখে আসিফ ইকবাল, জন শেফার্ড ও বার্নার্ড জুলিয়েন। ১৯৭০-৭১ মরসুম থেকে টেস্ট সম্ভাবনা শুরু। দক্ষিণ আফ্রিকার এক সুন্দরীকে বিয়ে করার পর শীত মরসুমে চলে যান শ্বশুরবাড়ি। সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেট প্র্যাকটিস করেছেন। ম্যাচে খেলেছেন। সেখানকার শক্ত উইকেটে চেষ্টা করছেন স্ট্রেট ব্যাটে বল খেলাতে। ব্যাটের হাতল ধরার ভঙ্গিটাও বদলে নিয়েছেন।

স্ট্রেট ব্যাটের খেলোয়াড়ের কথাগুলিও স্ট্রেট। কোন ভণিতা নেই। নিজের সম্বন্ধে নেই অহং ভাব। ওভাল টেস্টে ১৪৯ রান করার ব্যাপারে নিজেই বলেছেন, "অস্ট্রেলিয়ানদের ধারণা, আউট হবার আগে আমি চারবার আউট হয়েছিলাম। হতেও পারি। ক্রিকেটে তো একটু ভাগ্য অবশ্যই দরকার।"

ক্রিকেটের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ উলমারের। এই ২৮ বছর বয়সেই নিজের ইনডোর ক্রিকেট স্কুল পরিচালনা করেন। স্কুল চালনা সম্পর্কে ওঁর বক্তব্য : ক্রিকেট থেকে যেমন কিছু নিতে হবে তেমন কিছু তো ফিরিয়েও দিতে হবে। তা ছাড়া কেণ্টের জন্য প্রতিশ্রুতিবানদের বের করাও আমার অন্যতম উদ্দেশ্য।

মুকুল

অরণ্যদেব ☆ লী ফক

ঐ ধ্বস্ত নগরীর নাম ছিল নয়াপুরা।

'দারুণ সুন্দরী নগরী। আমোদপ্রমোদ লেগেই থাকত...'

'সম্রাট জুনকরের রাজ্যের সীমানা ছিল সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত...
'জুনকর ছিলেন সৎ কিন্তু শক্ত মানুষ।

'বহু ছোটখাটো রাজা তাঁর জন্য উপঢৌকন নিয়ে আসতেন।

'চমৎকার কুস্তি জানতেন...

'তীরধনুক নিয়ে শিকারে বেরোতে

'হঠাৎ একদিন একটা সিংহের সামনে পড়ে যান...

মুখোশ-পরা একটি মানুষ গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে তাঁকে বাঁচান। তিনিই ৭ম অরণ্যদেব।

রঞ্জিত মল্লিক, অপর্ণা সেন/প্রকাশিত/ পরিচালনা ঃ দীনেন গুপ্ত

রঙ্গজগৎ

নাচ উঠেছে সংসার/রিগ্যাল থিয়েটার্স

হিন্দি ছবিতে এনটারটেনমেনট-এর নামে, কিংবা দর্শকদের খুশি করার অজুহাতে গল্পের গরু শুধু গাছে কেন, এভারেস্ট-এ উঠলেও তাতে কোনো মহাভারত অশুদ্ধির ভয় থাকে না। এবং এ-ধরনের সিনেমায় নায়ক-নায়িকারা গো-জাতির অন্তর্ভুক্ত না-হয়েও গল্পের গরুর মতোই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। অবিশ্যি তাঁদের এই অসম্ভবের লীলায় আমার মতো ছা-পোষা বাঙালীর আপত্তি করার কোনো কারণ ঘটতো না, যদি না সিনেমা-শিল্পকে কোনো কুক্ষণে ভালোবেসে ফেলতাম, এবং কিছু ভালো ছবি দেখে এই বিষয়ে নিশ্চিত না হতাম যে মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলে অন্ধকার ঘরে পর্দায় প্রোজেক্ট করলেই সিনেমা হয় না। ধানাইপানাই না করে মোদ্দা কথাটা প্রথমেই বলে ফেললে আমার কাজটা কিন্তু সহজ হয়ে যায়। কথাটা হলো ঃ অধিকাংশ হিন্দি ছবিই—ধরুন শতকরা ৯৮টা ছবি—'সিনেমা' নয়। সে-অর্থে বেশির ভাগ-বাংলা ছবিতেও বিশুদ্ধ সিনেমা-শিল্পের বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু হিন্দি ছবির ব্যাপারে বিপদটা আরো অনেক ব্যাপক, কেননা এ-সব ছবি ভারতের বাইরে যায়, এবং তার ফলে বিদেশে ভারতীয় ছবির যে ইমেজ গড়ে উঠেছে তা তো পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের গালে-জিভ-দেয়া বিদ্রূপাত্মক লেখা থেকেই বুঝতে পারি। তবু নাচ-উঠেছে-সংসার-এর মতো সিনেম্যাটিক প্রসটি-টিউশন-এর বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত সোচ্চার কোনো প্রতিবাদ এ-দেশে শোনা যায়নি, কেননা অনেকের ধারণা এ-সব ছবিতে এক জাতীয় মজা আছে যার আবেদন অনস্বীকার্য। অন্তত নাচ-উঠেছে সংসার-এর মজাটা কোথায় গল্পটা একটু ধৈর্য ধরে শুনলেই বুঝবেন। অবিশ্যি এ-ছবিতে 'সিনেমাটা' কোথায় বুঝতে গেলে ডুমস্-ডে পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

এ-গল্পের নায়ক যে-কোনো হিন্দি ছবির গল্পের নায়কের মতোই, জনৈক হয়েও 'জনৈক' নয়। নাম করমু। দেখতে শশি কাপুর অ্যাট হিজ বেস্ট। গান গায় একেবারে মহম্মদ রফির গলায়। করমু গ্রাম্য হিন্দি বললেও কোনোভাবেই প্রাদেশিক নয়। সাজে-পোশাকে সে একেবারে বোম্বাইয়ের স্টুডিও পাড়ার, হেমা-মালিনীর যোগ্য নায়ক। কাহিনীর মূল বিষয় করমু আর নানকির (হেমা) প্রেম। (ইতিমধ্যেই 'নানকি' নামে নতুন শাড়ি বেরিয়েছে বাজারে।) ছবির প্রথমেই করমুর প্রথম প্রেমিকার ভূমিকায় সিমির বিশেষ কিছু করণীয় নেই। এবং কিছু পরেই হেমার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে সেই যে তিনি মেঠো পথে অদৃশ্য হলেন ব্যাস, ত্রি-কোণ সমস্যার নোটে গাছটি আর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। পরিচালক রিজভি সায়েব চালাক লোক, মূল্যবান ইস্টম্যান

কাজার-এর সমস্যাদীর্ণ, বস্তুবক্লিষ্ট অপচয় তিনি স্বভাবতই পছন্দ করেন না। সিমিকে গল্পে রাখলে কাহিনীটা এমন একটা মোড় নিতো যা রেজভি সায়েব সামলাতে পারতেন না। অতএব সিমিকে সামলাতেই স্ক্রিপ্ট থেকে ছেঁটে দিয়েছেন বোঝা যায়। বদলে এমন একটা সমস্যা নিয়ে এসেছেন যেটাকে তিনি আজগুবী মাপে কাটছাঁট করে শেষ পর্যন্ত সমাধানে পৌঁছে দিতে পারবেন, তাঁর নিজের মস্তিষ্কের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি না-করেও। অর্থাৎ নানকির বাবা নানকি-করমুর প্রেমলীলার একান্ত বিরোধী এবং করমুকে সে একাধিকবার প্রহার করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু নানকি শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে করমুর সঙ্গে মেশে এবং গান গেয়ে-গেয়ে দেদার টাকা রোজগার করে। সরকারের পক্ষ থেকে করমু-প্রতিভার স্বীকৃতি আসে। কিন্তু নানকির বাবা মেয়েকে পুনরায় করমুর কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এরপর ছবির অন্তিম দৃশ্যাবলী : ঘোড়ার ওপর করমু, ঘোড়ার সামনে পায়ে হেঁটে করমুর বৃদ্ধা মা। সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথ! এবং গ্রামবাসীরা লাঠি নিয়ে। করমুর মুখে যুদ্ধের গান। সবাই নাচতে-নাচতে এবং গাইতে-গাইতে নানকি উদ্ধারে! পথে পড়লো সরু নদী। ওপারে গ্রামবাসীদের নিয়ে নানকির বাবা রণহুঙ্কার দিতে দিতে, সে দাঁড়ালো। ধুমধাড়াক্কা মারপিঠ। ওদিকে নানকি ঘরে বন্দী। খড়ের চালে লাগলো আগুন। এবং কে যে তাকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলো এবং তারপর যে কি হলো সে-কথা বলার প্রয়োজন নেই। তবে শেষ করার আগে দুটো কথা বলার আছে। এক, অন্তত একটি গান একেবারে টপ হিট হবে সন্দেহ নেই এবং সরস্বতী পুজোয় প্যাণ্ডেলে-প্যাণ্ডেলে শোনা যাবে। দুই, বিক্ষিপ্তভাবে কিছু-উঁচু-পর্যায়ের ক্যামেরার কাজ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে চূড়ান্ত প্রশ্নটি আমরা কোনোক্রমেই এড়িয়ে যেতে পারি না তা হলো, যে-এনটারটেনমেন্ট-এর ঢালাও ব্যবস্থায় সমস্ত সংসার মেতে ওঠে তার সঙ্গে সত্যিই কি আমাদের সৌন্দর্যবোধের কোনো যোগসূত্র নেই এবং সত্যিই কি কিছু-কিছু মানুষকে খুশি করার তাগিদ সমস্ত নৈতিকতার ঊর্ধ্বে স্থান পেতে পারে?

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটক

সওদাগরের নৌকা/নান্দীকার

গদ্যময় জীবন কখনও কখনও কবিতা হয়ে যায়, সেই কাব্যকে যিনি নাটকে আবিষ্কার করেন, তিনি শুধু নাট্যকার নন, তিনি জীবনপটুয়া—তাঁর নাম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ষাট-এর দশকের গোড়ায় যখন বিদেশী নাটক চর্চার প্রাদুর্ভাব, ঠিক তখন, 'বহুরূপী' ও 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় পর পর কয়েকটি মৌলিক নাটক আমাদের চমকিত করেছিল। বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কয়েকজন সাহিত্যিকের লেখা নাটক প্রায় একই সময় প্রকাশিত হল। বহু দিন বাদে আবার প্রমাণিত হল, বাংলা নাটক শুধু মঞ্চে দেখার জন্য নয়, নাটক পাঠ করেও আমরা রসস্নিগ্ধ হতে পারি। 'সওদাগরের নৌকা' সেই মাহেন্দ্রক্ষণের ফসল।

নাটক ও কবিতার আত্মীয়তা সাম্প্রতিক কালে এত উজ্জ্বলভাবে আর অনুভূত হয়েছে কি? সম্পূর্ণ নাটক কবিতার মেজাজে এগিয়ে যায় সেই মানুষকে নিয়ে, যে মোম বাতির মত আলো দেয়, জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়, শেষ হতে হতেও হাসে। কারণ, আনন্দদান তাঁদের পবিত্র কর্তব্য। সংসারে সবাই গৃহপালিত জীব নয়। অন্য পাঁচজনের মতো যদি তাস খেলে, পুজো উপোস করে কাটিয়ে দেওয়া যেত তবে কিছুই হত না; কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে বর্শার ফলার মত সজীব স্বপ্ন বারবার বিদ্ধ করে —যন্ত্রণায়, অশ্রুতে, রক্তে মাখামাখি হয়ে যায়। সময়কে লক্ষ্মণের গণ্ডী দিয়ে আটকানো যায় না, ভগবান বড় সেয়ানা,

সাজমাস্টার, কখন যে কালো তুলির আঁচড়ে ঠিক বয়েসটা এঁকে যাচ্ছে, সেটা বোঝাই যায় না, অথচ মন সয়ে না, জীবনের এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

এই নাটকের নায়ক প্রসন্ন একটা ঘর চেয়েছিলো, 'তিন দেওয়ালওয়ালা একটা ঘর, আশা ছিল চতুর্থ দেওয়াল আমি নিজে হব। সে একটা সাজঘর। সেখানে ক্রেপ, স্পিরিট-গাম, জিঙ্কের মদির গন্ধে আমি সাজবো।' অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একালের অনেক সার্থক চরিত্রের স্রষ্টা হিসাবে আলোচিত। এই নটনায়কের ভূমিকায় তাঁর অসামান্য সংযম আরও একবার উদাহরণ হয়ে রইল। আমাদের দুর্ভাগ্য চাঁদ বণিকের অপার মহিমা নিয়েও, ফিল্মি দুনিয়ায় তাঁকে শুধুই কাজের জন্য গোদা মালোর ভূমিকায় বারবার অভিনয় করে যেতে হয়। সতী চরিত্রে লতিকা বসু আমাদের পরিচিত বয়স্কা গৃহলক্ষ্মী। কোন সময়েই তিনি স্বভাবকে অতিক্রম করেন নি। মনের ক্ষোভে অথচ উৎকণ্ঠায় তাঁর তীক্ষ্ণতা আবার স্মৃতিচারণায় ("আকাশের কড়াইয়ে যখন সময়ের তাপে চাঁদটা গলে গলে ছোট ফ্যাকাশে হয়ে আসছিল") তাঁর কমনীয়তা সব কিছুই স্বাভাবিক। আর একটি অনবদ্য চরিত্রায়ণ অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের হরিসাধন। যাত্রাদলে তাঁর ছিল বেহুলার ভূমিকা। প্রথম দিকে তাঁর মেয়েলি গলা শুনে দর্শক হেসেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে প্রসন্ন যখন কালোকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমি মরে গেলে তুই কাঁদবি তো?' তখন নদী পাড়ের কোন বেহাগী হাওয়ায় দর্শকের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। অভিনয়ে কালোর ভূমিকায় রাধারমণ তপাদার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। অন্য সকলে যেখানে স্বাভাবিক অভিনয় করে গেছেন, একমাত্র তিনিই সেখানে 'থিয়েটার'কে প্রশ্রয় দিয়েছেন। অথচ তাঁর বেদনাও অবরুদ্ধ ছিল মনের গহনে ('সব ভাঙাচোরা দেবতার মূর্তির মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে আছি আমি')। এই নাটকের বাকি তিনটি চরিত্র আশা, মাধব গড়াই ও কালীকৃষ্ণ বস্তুজগতের লোক, ভাবজগতের নয়। এই বৈপরীত্য প্রকাশে ছায়া ঘোষ, অসিত কুণ্ডু ও দুর্গাজিত চক্রবর্তী সার্থক।

মঞ্চসজ্জায় খালেদ চৌধুরী আবারও অনেককে অনুপ্রাণিত করবেন। ঘরের সেটের একটি অংশ একটু বাঁকানো, সামনে বাঁশের মাথায় একটি কালিপড়া লণ্ঠন, কাগজের শিকলের মালা, এককোণে সোলার চালচিত্র, এক সময় প্রসন্নের দড়ি টাঙানোর পরে একই সংগে একটি নৌকায় আভাসিত এবং প্রাক্তন বর্ণাঢ্যতা প্রকাশিত। এই নাটকে আলোর কাজ সম্পূর্ণ মেজাজ এনে দিয়েছে। কোন জায়গায় নাটককে অতিক্রম করেনি কিংবা ব্যাহত করে নি। ব্যতিক্রম শুধু

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, লতিকা বসু/সওদাগরের নৌকা

অন্তিম দৃশ্য। এই আদ্যন্ত স্বাভাবিক নাটকে ওই দৃশ্য বাহুল্য, 'ইংরাজীতে ইহাকে স্টান্ট বলা হইয়া থাকে'। (আলো : অমল রায়)। ভি বালসারার আবহ সব জায়গায় নাটককে সাহায্য করেনি। প্রসন্ন এবং হরিসাধনের স্বপ্ন অথবা স্বপ্নভঙ্গে যাত্রার মেজাজ অভিপ্রেত কিন্তু কালোর ভাবনার অন্তরে আবহ অথবা শব্দকল্প ব্যবহৃত হওয়া উচিত ছিল। সাপুড়ে বাঁশী প্রয়োগে যেমন অভিনবত্ব, বেহালার করুণ সুরে ঠিক তেমনই প্রথানুগত্য। নাটকের শেষ পর্বে আবহ ঈপ্সিত মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারেনি।

নির্দেশক রাধারমণ তপাদার সম্পূর্ণভাবেই নাটকের কাছে সমর্পিত। নাটকে যতটুকু সংলাপ, প্রয়োগ নির্দেশ আছে, বশংবদভাবে তিনি সবটাই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পাঠ্য নাটক ও অভিনেয় নাটকে প্রভেদ অনেক। নাটকীয়তার জন্য নয়, নাটকের মধ্যে নিশ্চিতভাবে কতকগুলি বাঁক আছে, সেই পর্বগুলি সব সময় নাড়া দিতে পারেনি। এই নাটকের কাব্যিক সংলাপ শ্রোতাকে যেমন আচ্ছন্ন করে, দর্শককে তেমন অনেক সময় ক্লান্ত করে তোলে। শুধুই কাব্যময়তা, আবৃত্তি শোনার শিহরণ আনলেও, বহু ক্ষেত্রে নাটকীয় তাৎপর্য প্রকাশে অক্ষম,--ব্যাখ্যার অভাবে। ব্যাখ্যা মানে আরও কথা নয়, আরও নাট্য-ক্রিয়া, সময়বিশেষে ইঙ্গিতগর্ভ মুহূর্ত। অজিতেশবাবুর অসামান্যতা সত্ত্বেও, সবিনয়ে বলি, তিনি সব সময় একই সুরে কথা বলেছেন, তাঁর দীর্ঘ স্বগতোক্তির সামান্যই দর্শককে ভাবাতে পেরেছে। আমি কখনই আশা করি না, জনমনের খাটো দরজা দিয়ে চাঁদবণিক মাথা নীচু করে ঢুকুক, তবুও সম্ভবত এই প্রথম নান্দীকার কিছু দর্শককে উদাসীন থাকার সুযোগ দিলেন। ডিটেলস-এর কাজ প্রায়শই অবহেলিত, যেটা নান্দীকার চরিত্রে কখনই ছিল না।

সব কিছু মেনে নিয়েও এ কথা অনস্বীকার্য, নান্দীকার আমাদের একাদেমি মঞ্চে সুখ থেকে আনন্দে নিয়ে গেছেন। সুখকে শরীরে অনুভব করি, আনন্দকে বোধ করি চৈতন্যে।

পুনশ্চ—এই সমালোচনায় অনেক শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত, যা সম্পূর্ণভাবেই নাট্যকারের। যদিও জানি 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লওয়া অপরাধ'। মুনিদেরও মতিভ্রম হয়। ভাল জিনিস দেখলেই লোভ হয়, অগত্যা...। সব জেনেও বার বার কেন যে মানুষ একই পৌরাণিক ভুল করে।

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

নাটের গুরু/শৌভনিক

"নাটের গুরু"-কে নিয়ে শৌভনিক গোষ্ঠী গুরুগম্ভীর কিছু সৃষ্টি করতে চাননি। সমরেশ বসুর কাহিনীর মধ্যেও গুরুতর কোন সমস্যা ছিল না। ছিল অফুরন্ত মজার উপকরণ। অসিত ঘোষের নাট্যরূপে সেইসব মজা দর্শককে প্রচুর হাসির উপকরণ যুগিয়েছে। নির্দেশক অমল মুখোপাধ্যায় শিল্পীদের দিয়ে সেটা বেশ মানানসই করে পরিবেশন করেছেন। অবশ্যই হাসির নাটক, কিন্তু এমন বাহুল্য-বর্জিত রসসিক্ত হাসির নাটকের প্রযোজনা ইদানীং খুব কমই দেখা যায়। দক্ষিণ কলকাতার মুক্ত অঙ্গনের নিকট থেকে উত্তর কলকাতার কতিপয় রঙ্গশালা—যেখানে নিয়ত হাসির কামান দাগা হচ্ছে—অনায়াসে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

হাসির নাটক পরিবেশনে শৌভনিকের পূর্বখ্যাতি আছে। সমরেশ বসুর "ছুটির ফাঁদে"-র প্রযোজনায় ইতিপূর্বে এঁরা যে

দশকরা দেখিয়েছিলেন, "নাটের গুরু" সেই খ্যাতিকে আরও কিছুটা জমজমাট করে তুলবে সন্দেহ নেই। ঘটনা সামান্য। কিন্তু প্রয়োগের সরলতা ও সরসতায় তা অসামান্য হয়ে উপস্থিত হয়েছে দর্শকের কাছে। নাটকের কাহিনীতে মানবতার বেশ কিছু উপাদান আছে, সুর বদলে তা হঠাৎ সিরিয়স হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু সুখের বিষয় নাটক সরসতার গণ্ডী অতিক্রম করেনি। ফলে কিছু করুণ মুহূর্তে হাসির আড়ালে থেকে দর্শককে অন্য রসের সন্ধান দিয়েছে।

নায়কের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন নিমু ভৌমিক। ভয়ানক স্টেজ ফ্রি তিনি। উপরন্তু সংলাপগুলিকে নিয়ে এমন অনায়াসে লোফালুফি করেছেন তিনি যা দর্শককে অনায়াসে অভিভূত করে ফেলতে পারে। নায়িকার চরিত্রে বুলবুল চৌধুরী কৃত্রিম রাগ এবং মিষ্টি হাসি মিলিয়ে অন্য ধরনের রোমাণ্টিকতা উপহার দিয়েছেন। তবে প্রথম প্রেমিক সম্পর্কে ওঁর মত পরিবর্তন বড় তাড়াহুড়ো করেই ঘটেছে। একটু আগে দু-একটা টুকরো কাজের মধ্যে দিয়ে নায়ক সম্পর্কে ওঁকে সামান্য কৌতূহলী করে তুলতে পারতেন নির্দেশক। নায়িকার মায়ের চরিত্রে কাজল মুখোপাধ্যায় প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্যের মধ্যেও যেমন হাসির উপাদান যুগিয়েছেন তেমনি একটি মুহূর্তে নিজের রিক্ত-হৃদয়ের হাহাকারকেও প্রকাশ করে দিয়েছেন। ওঁর স্বামীর চরিত্রে অমল মুখোপাধ্যায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তাঁর কপট রাগ এবং অকপট ভালবাসা প্রকাশের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ডাক্তারের চরিত্রটি পুরোপুরি কমিক। প্রদীপ ভট্টাচার্য হাসিয়েছেন প্রচুর। এ নাটকের নায়ক একজন ভালো গায়ক। সংগীত পরিচালক ভাস্কর মিত্র তাঁর মুখে আধুনিক গান তুলে দিয়েছেন। নেপথ্য থেকে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান বেশ কায়দা করে শোনানো হয়েছে। গানের সুর বেশ ভালই। আবহের মধ্যেও কিছু বৈচিত্র্য

নিমু ভৌমিক, বুলবুল চৌধুরী/নাটের গুরু

আছে। যেহেতু হাসির নাটক, অতএব কিছু প্রচলিত হাস্যরসাত্মক আবহ যে ব্যবহার করা হয়নি এটা খুবই সুখের কথা। তড়িৎ চৌধুরীর মঞ্চ পরিকল্পনা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত। স্বরূপ মুখোপাধ্যায়ের আলোর কাজও ভালো।

—রবি বসু

খোসগাল্প থেকে

ছবির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কোন কোন প্রযোজক বোনাস কিংবা পুরস্কার ঘোষণা করেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সে-ব্যাপারটি যে বেমালুম ভুলেও যান এমন দু-একটি ঘটনা এর আগেও আপনাদের জানিয়েছি। সম্প্রতি সেইরকম মজার (!) ঘটনা আরও একটি ঘটেছে।

বছরখানেক আগে একটি হিট ছবির প্রযোজক ঘোষণা করেন যে তাঁরা ছবির সব শিল্পীকে একটি করে হীরের নেকলেস এবং অন্যান্য কর্মীদের একটি করে রুপোর নেকলেস উপহার দেবেন যার ওজন এক-একটি চল্লিশ তোলার মত। খবরটি ফলাও করে স্থানীয় চলচ্চিত্র পত্রিকাগুলিতে ছাপা হয়ে প্রযোজকপক্ষকে পুলকিত করে। যথাসময়ে উপহারসামগ্রীগুলি তৈরী হয়েও আসে। ওই প্রযোজকের অফিসে যাঁরা যাওয়া-আসা করেন তাঁদের সেইসব জিনিস প্রযোজকরা সগর্বে দেখাতে থাকেন, এবং যাঁদের দেখানো হয় তাঁরা ধন্য ধন্য করতে থাকেন।

তারপর কি এক অজ্ঞাত কারণে উপহার প্রদানের দিন একের পর এক পিছিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে আর এক অজ্ঞাত কারণে রুপোর দরও আকাশ ছুঁতে থাকে। অবশেষে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে রুপোর দাম প্রায় দ্বিগুণ। মজার ব্যাপার, সেই সময় যাঁরা উক্ত প্রযোজকের অফিসে যাওয়া-আসা করতেন তাঁদের কেউ কিন্তু আর রুপোর নেকলেসগুলি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কর্মীরা তাঁদের নিকট প্রতিশ্রুত রুপোর নেকলেসের কথা প্রায় ভুলেই গেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন সেইসব নেকলেসগুলি গেল কোথায়? যেখান থেকে সেগুলি এসেছিল সেইখানেই কি?

—সুরঞ্জন

সংগীত

অন্য যৌবনের গান

ক্যালকাটা হুইল অফ মিউজিক একটি সদ্যোজাত প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের মত এর শিল্পীরাও সদ্যোতরুণ এবং সংখ্যায় স্বল্প। সম্প্রতি বিড়লা আকাদেমির প্রেক্ষাগৃহে তাঁরা বিভিন্ন দেশী-বিদেশী গানের অনুষ্ঠান করেছিলেন। অনুষ্ঠানটি অবশ্য দীর্ঘ এবং আয়াসবিলাস। যন্ত্রানুষঙ্গ ছিল মাত্র তিনটে; অবশ্যই বলা যেতে পারে, অনুষ্ঠানে পরিচ্ছন্ন প্রয়াসের কিছু স্বাদ ছিল।

এই ধরনের অনুষ্ঠানে পাঁচমিশেলী ব্যাপার রাখলেই তার সামগ্রিকতায় চিড় ধরে। সেই কারণে গানের অনুষ্ঠানের ফাঁকে হঠাৎ একটা কথক নাচের প্রোগ্রাম নেহাৎ বেমানান। তারপর সাতটি পুরুষকণ্ঠ আর চারটি মহিলাকণ্ঠে এঁরা দ্বৈত একক ও সম্মেলক লোক ও গণসংগীত পরিবেশন করলেন। বলে রাখি, মহিলাকণ্ঠই বেশি জোরালো মনে হয়েছে—হয়ত একটা কারণ তার, গানের সেকশনটি স্ত্রী-কণ্ঠোপযোগী ছিল। লোকসংগীতগুলি জমেছিল, তবে যেখানে তার সংগী নৃত্য অনুপস্থিত সেখানে লয়ের ঝোঁক রাখা দরকার। দ্বৈত-কণ্ঠে বিহারের গানটি বেশ লাগে। শম্ভু সুবর্ণার্জির কণ্ঠটি মোলায়েম, সুরেলাও।

দারীগানে ধন্দোর অতিমাত্রিক ব্যবহারে গানটি ব্যঙ্গাত্মক হয়ে উঠেছিল।

বিদেশী গানের পরিবেশনে এদের ভাব বা ভাষা অন্তরায় ছিল, সেই কারণে লয়ই ছিল একমাত্র আশ্রয়। তাতে এই হল যে ইরানের করুণ সুরের গান পোলিশ-ওয়ালজের লয়ে চলে গেল। স্প্যানিশ আর জাপানীও একাকার। সব কটি গানের লয় প্রায় একইরকম হওয়াতে মজাটা বাকী থাকে শুধু ভিনদেশী ভাষা-শ্রবণে। সুরের বৈচিত্র্য বিলুপ্ত হয়, গানের প্রাপ্য গাম্ভীর্য মেলে না।

অনুষ্ঠান-পরিচালিকা মালশ্রী চক্রবর্তীর গলায় রেনজ আছে নিঃসন্দেহে; ধ্রুপদী গানে প্রয়োজনীয় ফলস ভয়েসও আনতে পারেন। তবে আর-একটি দরকার, কণ্ঠ-স্বরকে ব্রেক করা এবং শ্বাসক্ষেপের ট্রেনিং। প্রতিটি গানই ছিল বেশ তালিমবন্ধ। কিন্তু পরিচালিকা মাঝখানে বসে বা দাঁড়িয়ে তুমুলভাবে মস্তক হাত পা নাড়িয়ে যখন কনডাকট করতে থাকেন তখন উত্তম অনুষ্ঠানেরও রসহানি ঘটে, দৃশ্যটি কটু এবং হাস্যকরও বটে।

—অপ্রতিম বসু

সুন্দর হৃদিরঞ্জন

প্রথমার্ধে যিনি মহাপ্রবল বলী, দ্বিতীয়ার্ধে তিনি সুন্দর হৃদিরঞ্জন। সেদিন, ১ ডিসেম্বর, রবীন্দ্রসদনে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা নিশ্চিত এই উপলব্ধি নিয়ে ফিরে এসেছেন। গান্ধর্বী প্রযোজিত এক একক গানের আসরে পরিবেশিত হল রবীন্দ্রনাথের রাগাশ্রয়ী ধর্মসংগীত ও প্রেম-সঙ্গীতের এক বৈচিত্রময় রূপ। প্রবীণ বরেণ্য শিল্পী সুবিনয় রায় ছিলেন অনন্য রূপকারের ভূমিকায়। সোয়া দু ঘণ্টার অনুষ্ঠান। মধ্যে পনেরো মিনিটের বিরতি।

হিন্দুস্থানী সংগীতের পূর্ণ প্রভাবে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সুবিনয় রায়েরই একটি চমৎকার উক্তি একদা পড়েছিলাম। তিনি লিখেছিলেন, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আমরা গায়ককে বলি, 'অমুক রাগে একটি খেয়াল শোনান তো।' সেখানে গায়ক কোন গানটি গাইবেন সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বেলায় আমরা বলি—'মহারাজ এ কি সাজে এলে' গানটি গাও তো। একথা বলি না—বেহাগে একটা সদরা গাও তো। কারণ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিচারে 'মহারাজ' গানটির সামগ্রিক সংগীতরূপটি বা সত্তাটি 'বেহাগ-সদরা' আখ্যার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই সামগ্রিক রূপ ও সত্তার প্রতি মনোযোগই একজন শিল্পীর

সুবিনয় রায়: গান্ধর্বীর অনুষ্ঠানে
ফটো: সুবীর চাটার্জী

থেকে অন্যজনকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। এ কথা বলা বাহুল্য, তবু না বললেও চলে না যে, এই একটি ক্ষেত্রে গত চার দশক ধরে সুবিনয় রায় একটি প্রবল, প্রধান, অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম। জনরুচির দায়ে নেমে আসা নয়, জনরুচিকেই উন্নীত করে তোলার দিকে অক্লান্ত প্রয়াস তাঁর। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবমূর্তিটি যেমন অম্লান, অবিকৃত, নিষ্কলুষ, তেমন উদাহরণ খুব বেশী মেলে না। এই পরিণত বয়সে তাঁর কণ্ঠে ঐন্দ্রজালিক মহিমা যেন পূর্ণতর, সুরের সম্মোহনজালে যেন আরও অনায়াসে আবদ্ধ করে তোলেন তিনি। অলংকার ব্যবহারে তাঁর সংযম ও সিদ্ধি, উচ্চারণ ভঙ্গিমায় সুস্পষ্টতা, শ্রুতি ও স্বরস্থান-চেতনা—বিস্মিত, আপ্লুত, অভিভূত করে তোলে।

সেদিন প্রথমার্ধের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল তিলোক কামোদ-আশ্রয়ী 'মহানন্দে হেরো সবে' গানটি দিয়ে। 'সংসারে কোনো ভয় নাহি' (ইমনকল্যাণ) ছিল দ্বিতীয়। শুরুর এই গানগুলি নিঃসন্দেহে সংগীত, তবু কোথাও যেন একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, সুবিনয়বাবু নিজেও যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল, কণ্ঠ ঈষৎ শ্লেষ্মাক্রান্ত। কিন্তু মধ্যবর্তী দুখানা গানে তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্তি সাময়িকভাবে যেন ফিরে এসেছিল। দুরূহ চোদ্দমাত্রার যৎ-তালে যখন সুবিনয়-বাবু শোনালেন, 'কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ' (বেহাগ) সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের যাবতীয় উৎকণ্ঠার হল অবসান। স্বস্তি-ভরে শ্রোতারা নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে দিলেন নরম আসনে। এই পর্যায়ের পরবর্তী গানেও (রোখো রাখো রে—'শ্যাম') এই স্ফূর্তিময় স্বাচ্ছন্দ্য বজায় ছিল।

বিরতির পর রাগাশ্রয়ী প্রেমসঙ্গীত পর্যায়ে যেন অকৃত্রিম সুবিনয় রায়কে পূর্ণ রূপে পাওয়া গেল। 'দিন শেষের রাঙা মুকুল' (পূরবী) দিয়ে শুরু, শেষ গান বিলম্বিত একতালে 'ও গান আর গাস নে' (খাম্বাজ)। তাঁর অনন্য অননুকরণীয় ভঙ্গিমাতে সুবিনয়বাবু শোনালেন, সুন্দর হৃদিরঞ্জন (ইমনকল্যাণ), আজি সাঁঝের যমুনায় (পিলু), ওই আঁখি রে (খাম্বাজ) কাছে থেকে দূর রচিল (পিলু), 'এখনো কেন সময় নাহি' (আশাবরী), 'কী রাগিনী বাজালে' (মিশ্র কানাড়া) এবং ওগো স্বপ্ন-স্বরূপিনী' (পরজবসন্ত)। প্রথমার্ধের কঠিন তাল-লয়ের গানে যিনি ছিলেন মহাপ্রবল বলী, দ্বিতীয়ার্ধের সামগ্রিক রূপে, সত্তায় এবং লাবণ্যে তিনি হয়ে উঠলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুন্দর হৃদিরঞ্জন।

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

নতুন খেয়ালী

অ্যাকাডেমী হলে এক নাচ-গানের অনুষ্ঠানে একজন নতুন খেয়ালীর সন্ধান পেলাম। রাকা মুখোপাধ্যায়। রাকার বয়স কম, কিন্তু চমৎকার তৈরী ওঁর খেয়াল। সবচেয়ে বড় কথা ওঁর গলা বেশ ভারী, যেটা অধিকাংশ তরুণী যাঁরা খেয়াল গান তাঁদের নেই। উপরন্তু রাকার গলা খুব মিঠে, সবক্ষণ সুরে চলে। ওঁর বেশ বড় করে গাওয়া ইমনকল্যাণ খেয়াল আমার ভাল লেগেছে। বড়খেয়ের সমস্ত গুণ তাতে হাজির ছিল। বিস্তার চয়েছে বেশ লয়ের বাঁধ নিতে। বেশ কিছু অলংকারও মনে দাগ রেখেছে। মনে পড়ে রাকার মিঠে, দরদী সরগম। সরগমে স্বরের ওজন ছিল। সে তুলনায় ওঁর কিছু তান যেন কমজোর। রাকার খাম্বাজ ঠুংরী অবশ্য আমার ভাল লাগেনি।

রাকা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওস্তাদ কেরামতুল্লার তবলা সঙ্গত স্মরণীয়।

অলকানন্দা রায়, যিনি এককালে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে নাচতেন, সেদিন ভরত-নাট্যম নাচলেন। বেশ ভাল লাগল। অলকা-নন্দা স্টেজ ফ্রী, কিছু কিছু অভিনয় ভাল করলেন। তবে ওঁর লয়ে আরও শক্ত হতে হবে। আরও দুরূহ চালের কাজ ওঁর করে দেখানো প্রয়োজন।

কিছুটা হতাশ করলেন সেদিন কালিদাস নাগ। ওঁর "অরূপকান্তি কে গো যোগী ভিখারী" ছাড়া অন্যান্য নজরুল-গীতিগুলো ঠিক জমলো না। আশা রাখি কোন একদিন ওঁর আরও ভাল গান শুনব।

—শংকরলাল ভট্টাচার্য

'পায়েলে'র গানের আসর

'পায়েল' গোষ্ঠী আয়োজিত রবীন্দ্র-সংগীতের আসর (রবীন্দ্রসদনে: ৬ নভেম্বর, সকাল) আলাদা করে চেনা যেত না, যদি শুধু খ্যাতিমান শিল্পীদের হাজির করিয়েই তাঁরা কর্তব্য সমাধা করতেন। না, তা তাঁরা করেননি। নিজস্ব গোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতি-উজ্জ্বল দুজন শিল্পীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। প্রথম শিল্পী রমা সিংহের কণ্ঠ পরিচ্ছন্ন, সুরেলা। কিন্তু গানের নির্বাচনে ও পরিবেশনে এক জনপ্রিয় গায়িকার প্রভাব বড় প্রকট। তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিটি ব্যক্ত হলে, উচ্চারণের সামান্য ত্রুটি (যেমন, 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে'—উচ্চারণে 'তার দুয়ারে' শোনালো) শুধরে নিলে ও দম-নেবার সময় জিহ্বা-প্রদর্শন শাসিত হলে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎসাহিত হওয়া যায়। বীরেন ঘোষ-এর ভঙ্গি পরিণত, কিন্তু একটু নিষ্প্রাণ, শীতল তাঁর পরিবেশন। পাঁচখানি গানই ভালো গেয়েছেন, কিন্তু গান শুধুই নির্ভুল পরিবেশন নয়, যথোচিত নিয়ন্ত্রিত আবেগও সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। 'তুমি তো সেই যাবেই চলে' ছাড়া অন্যত্র সে-আবেগ ফুটে ওঠেনি।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সেদিন অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর বদলে এলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। গীতবিতান হাতে ছিল না তাঁর, ছিল না ছোটখাট খাতাও। তবু শ্রোতাদের যাবতীয় অনুরোধ মান্য করে দারুণ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে তিনি একটির পর একটি গানে তৃপ্ত করলেন তাঁদের। বাণী ঠাকুরও সেদিন স্বাচ্ছন্দ্যস্ফূর্ত কণ্ঠে পরিবেশন করেছেন তাঁর প্রিয় ও পরিচিত গানগুলি। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কণ্ঠ খুব স্বাভাবিক ছিল না। তবু তিনি অসামান্য নৈপুণ্যে ঢেকে দিলেন সেই দুর্বলতা, স্কেল নিয়ন্ত্রণ করলেন কণ্ঠের সীমাবদ্ধতা অনুসারে। দৈবী মাধুর্য ফুটিয়ে তুললেন তাঁর একক কণ্ঠের পাঁচখানি গানে। শেষ গানটিতে (আনন্দধারা)

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সর্বেন্দ্র / **ফুলশয্যা** / পরিচালনা: সারথী

গোরা সর্বাধিকারী কণ্ঠ মেলালেন তাঁর সঙ্গে। এই নির্বাচনের গোড়ার গলদ তখনই ধরা পড়ল, শেষরক্ষা হল না।

গোরা সর্বাধিকারী ছাড়াও আরেকজন শিল্পী গেয়েছিলেন সেদিন। বিভা সেনগুপ্ত। প্রতিটি গানের প্রথম কলিটিকে স্তোত্র-পাঠের ভঙ্গিতে টিমে লয়ে গেয়ে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু উপরি-পাওনা বলে মনে হল না। গানের মধ্য পথেও হঠাৎ হঠাৎ নাটকীয়তা আনতে চেয়েছেন তিনি কণ্ঠকে রহস্যময়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু সে প্রয়াসও রহস্যময়ই মনে হয়েছে।

মহাজাতি সদনে সুবীর সরকার

তরুণতর জাদুকরদের জন্য হুডিনি যে-মূল্যবান উপদেশগুলি দিয়ে গিয়েছিলেন তার একটি ছিল ক্ষিপ্রতা-বিষয়ে। একটি লাতিন প্রবাদ মনে রাখতে বলেছিলেন তিনি। 'মেক হেস্ট স্লোলি'—ক্ষিপ্রতা সম্পর্কে এই ছিল তাঁর শেষ কথা। বছর কয়েক আগে সুবীর সরকারের খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁদের নিশ্চিত মনে পড়বে, ক্ষিপ্রতা বিষয়ে ভুল অহংকার সুবীরের বহু খেলার চমক কীভাবে অল্পায়ু করে তুলেছিল। কিন্তু এবারের মহাজাতি সদনে টানা ন' দিনের শো যাঁরা দেখেছেন তাঁরা মানবেন যে, হুডিনি-কথিত উপদেশটি সুবীর মনে রেখেছেন। তিনি এখনও দ্রুত খেলা দেখান ঠিকই, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে বিস্ময়ের অভিঘাত নষ্ট হতে দেন না। শুধু তাই নয়, নিজেকে নানাদিক থেকে আরও আঁট-সাঁট করে নিয়ে খেলা দেখিয়েছেন তিনি। পাকা আড়াই ঘণ্টার সাড়ম্বর বাণিজ্যিক শো দেখে সুবীর যে ক্রমশ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছেন বুঝতে দেরী হয় না। বুঝতে দেরী হয় না, সাফল্যের জন্য প্রচণ্ড মূল্য দিতে সুবীর প্রস্তুত। তাঁর প্রদর্শন-ভঙ্গির বহু ত্রুটি তিনি সম্পূর্ণ শুধরে নিয়েছেন, বাকি[illegible] প্রতিরোধী মুদ্রা-দোষ বর্জন করেছেন, নতুন-নতুন খেলা সংযোজিত করেছেন, পাল্টেছেন বিভ্রান্তিকর তথ্য-সম্বলিত 'প্যাটার'।

তাঁর খেলা এখন আদ্যন্ত একটি ছন্দে গ্রথিত। ছোট খেলায় সুবীরের পরিশীলিত হাতের দক্ষতা চিরকালই নয়নলোভন, বড়ো খেলাতেও তিনি সামর্থ্যের সীমায় নৈপুণ্য আনতে প্রয়াসী। নতুন খেলার মধ্যে 'পারপেনডিকুলার সুয়িং', 'বাবডস ফ্রম নো হোয়ার', 'একস-রে আইজ' (পি সি সরকারী ঘরানায় অবশ্যই নয়) প্রভৃতি যুক্ত হয়েছে। পুরনো খেলার মধ্যে বিখ্যাত 'আসরা', 'বেড অফ অ্যারোজ', 'নাইট ইন লনডন', 'সিলক মিস্ট্রি' প্রভৃতি তো ছিলই।

'প্যাটার' সম্পর্কে আরেকটু যত্ন, 'স্কোয়ার অ্যানড সার্কেল'-র আরও প্রোডাকশন, পারপেনডিকুলার সুয়িংয়ের খেলায় সহকারিণীর পাজামার বদলে জীনস—এই ধরনের কিছু সংযোজন-সংশোধন এবার সুবীর সরকারকে ভেবে দেখতে বলি।

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা

বিমান মাশুল: ত্রিপুরায় ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে বাদল বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৪৯

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লন্ডন অফিস মারফৎ	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

(লন্ডন পর্যন্ত বিমানে)

কতশত রঙ
কতশত ডিজাইন
অপূর্ব মদুরার কাপড়
এ পর্যন্ত কোথাও কেউ এত রকমের কাপড় দিতে পারে নি।
নীল, সবুজ, ধূসর, কালো আর বীজ - ২৬০টি আভায় আর ডিজাইনে
পলিয়েস্টার রেঞ্জে কাপড়ের অপূর্ব সম্ভার।
মদুরার কাপড় তৈরী করেন
মদুরা কোট্‌স

দেশ

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

তামাক ও ফিলটারের অপূর্ব সমন্বয়
উৎকৃষ্ট সিগারেটের প্রথম পরিচয়

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

সূচীপত্র

বিলাসময় ফেনা
সুরুচিপূর্ণ সুরভি
দামেই শুধু কম
মাত্র
১.০০ টাকা
(ট্যাক্স আলাদা)
Godrej
Turkish Bath
Luxury Soap
টার্কিশ বাথ
সাবান — দাম কত কম...
চলে কত বেশী।
গোদরেজ
-এর তৈরী
Interpub/GST/3/76 Ben

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অতুল বসু

প্রচ্ছদ পরিচিতি : "প্রতিকৃতি" (১৪"×১১" তৈলচিত্র) — প্রথাসিদ্ধ অঙ্কন, রচনা ও বর্ণ লেপনে অতুল বসু সিদ্ধহস্ত। মুখের ডৌল, গলার আকার, চোখ, ভুরু, ঠোঁট, চোখের পাতা, দাঁতের গড়ন—এইসব মিলিয়ে প্রতিকৃতি আঁকায় আজও তাঁর জুড়ি নেই। মুখের ভিন্ন অংশে আলোর তারতম্য বোঝাবার জন্যে রঙ চাপানো, ত্বকের ওপরের নরম পেলব ভাব—এসব বিষয়ে তাঁর নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

নতুন কবিতার বই

আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ তন্তুজাল

দাম ৫·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায় এমন একজন কবি, যাঁকে আমরা তুলনা করতে পারি শুধুমাত্র প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতি স্থির হতে জানে না। নিজেকে বারেবারে নতুন পোশাকে সাজানোই প্রকৃতির সবচেয়ে প্রিয় খেলা। কখনও তার চড়াইয়ে সবুজ, উৎরাইয়ে খরা ; কখনও সে

প্রকাশিত হল

স্থাবরে কর্কশ গদ্য, জঙ্গমে উজ্জ্বল কবিতা। এই হয়তো ওড়ায়লো নির্মম ঝড়, এই হয়তো চাঁদের হাসিকে ডেকে এনে বসালো মানুষের মাটির উঠোনে। এইভাবে নিরন্ত সে নিরত নিজের নিত্যনতুন সত্তা এবং সৌন্দর্য আবিষ্কারে তাই মায়াহীন ; তাই কালকের সাজ আজকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে সহজে। কাল যা ছিল গলায় সাতনরী হার, আজ তা ছেঁড়া লতার মত পথের ধারে। এইরকমই হলো শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা। প্রতিদিন অদলবদল ; প্রতিদিন ছন্দ ভেঙে নতুন ছন্দ। এই প্রখর ; এই প্রশান্ত। এই মাটির প্রতি, মানুষের প্রতি মমতায় আচ্ছন্ন ; পরমুহূর্তেই শোনা গেল তাঁর তীব্র অভিমান, তীক্ষ্ন অভিযোগ। কখনও জড়িয়ে নেই এক ছন্দা তন্তুজালে—নানা ছন্দ বাজিয়ে চলেছেন ক্রমাগত, নিজের তারে। আর সেই ফাঁকে আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনে নিই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যাবতীয় গোপন কথোপকথন। এই সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থটিতে আমরা সহজেই খুঁজে পাবো তাঁর মনের আর এক ভুবন॥

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উপন্যাস

পিতৃপুরুষ ৫·০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

বিবর ৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ-কাহিনী

বেণীসংহার ৫·০০

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাস

সেতুবন্ধন ৭·০০

বিমল করের উপন্যাস

সান্নিধ্য ৫·০০

সুশীল রায়ের উপন্যাস

অদ্বিতীয়া ৪·০০

সুব্রত চক্রবর্তীর

কবিতা-সংকলন

বালক জানে না

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

বিমল করের আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস | ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হল

অসময় ১২.০০

প্র কা শি ত হ ল

ভালোবাসা আর সেবার মূর্তিময়ী প্রতিমা মা টেরেসা। যেখানেই—পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তেই—আর্ত অসহায় মানুষের চোখের জলে ধরণী সিক্ত হচ্ছে, সেখানেই—তা সে ভিয়েতনামই হোক, হোক আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভেনিজুয়েলা, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, ইতালি, মাল্টা, ভারতবর্ষ, অথবা পৃথিবীর যে-কোনও দেশ—ছেষট্টি বছরের লোলচর্মা এই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী জগন্মাতার মতো দু' চোখে অপার মমতা আর বুকে অসীম ভালোবাসা নিয়ে সেবার হাত দুটি বাড়িয়ে তাঁর স্নেহময় কোলে আশ্রয় দিয়ে চলেছেন জাত ধর্ম সম্প্রদায় নির্বি-শেষে সেইসব পীড়িত নিরাশ্রয় লক্ষ লক্ষ দুঃখী মানুষকে। যীশুর পায়ে নিবেদিতপ্রাণা এই করুণাময়ীর কাছে তাঁর পরমারাধ্য যীশু আর পরিত্যক্ত অনাথ শিশু, নিরন্ন কুষ্ঠরোগী, মুমূর্ষু নিরাশ্রয় মানুষ, পঙ্গু অক্ষম অসহায় মানবাত্মা এক হয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর যীশুকে। তাঁর মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ সেই নিরন্ন দুঃখার্ত যীশুদেরই ভালোবেসে সেবা করে চলেছে আজ পৃথিবীর প্রায় সকল প্রান্তে—সকল দেশে।

গ্রন্থপ্রকাশ এবং প্রায় ত্রিশটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মাধ্যমে বিশ্বের বহু ... এই মমতাময়ী লোকমাতাকে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধন্য হয়েছে। এখন বাংলা ভাষায় এবং সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষায়ও, এই সঙ্গে তাঁর লীলাপ্রসঙ্গ এবং 'কথামৃত'—না, তাঁর জীবনচরিত নয়,—প্রকাশ করে ধন্য হলাম আমরা—বাংলা দেশের মানুষেরা॥ দাম ১০·০০॥

সুদেব রায়চৌধুরীর

মা টেরেসা সম্পর্কিত

ভারতীয় ভাষায় সর্বপ্রথম গ্রন্থ

মা টেরেসা

আ ন ন্দ পা ব লি শা র্স প্রা ই ভে ট লি মি টে ড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪০৬২

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৯
শনিবার ১০ পৌষ ১৩৮৩

'নবীন মেধাবী'

বিজ্ঞানের তরুণ ছাত্র এবং গবেষক, যাঁর চিন্তা ও কৃতিত্বের প্রথম উন্মেষের মধ্যে প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাঁকে সম্মানিত করবার যে প্রথা প্রচলিত হয়েছে, সেটা দৃশ্যত পুরস্কৃত করবার অনুরূপ একটি প্রথা। কোন সন্দেহ নেই যে, বিশেষ অঙ্কের একটি আর্থিক সাহায্য, কিংবা বাৎসরিক বৃত্তি প্রতিভাবান ছাত্র ও গবেষকের পক্ষে সবচেয়ে বড় এবং সার্থক সহায়তা। প্রতি বৎসর সরকারী উদ্যোগে ও উৎসাহে নবীন মেধাবীকে বৃত্তি অথবা এককালীন আর্থিক সাহায্য হিসাবে দুই-চার পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। বিশদ বিবরণ প্রকাশিত না হলেও অনুমান করা চলে যে, ভারতের সব রাজ্যে এইরকম বিশেষ বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে নবীন মেধাবীকে উৎসাহিত ও সম্মানিত করা হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা যায়, নবীনের উন্মেষ ও আবির্ভাব আলো বাতাসের সহজ অভ্যর্থনা পেয়েছে। ফুলের কুঁড়ি এবং নবোদ্গত কিশলয় দেখা দিতেই প্রজাপতি ও মধুপের দল যেন সহজ আবেগে উড়ে এসে তাদের সংবর্ধনা জানায়। এই উপমা মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্কেও প্রযুক্ত হতে পারে। এবং এমন ধারণাও যুক্তির পথে এসে পড়ে যে, নবীন প্রতিভা কোন রূপে যদি সামাজিক অভ্যর্থনা না পায়, তবে বুঝতে হবে যে, প্রতিভার নির্বাসন অথবা অন্তর্ধান আসন্ন হয়েছে।

এই পর্যন্ত এসে কোন সংশয়ী সমালোচক যদি তর্ক তুলে বসে যে, নবীন মেধাবী বলে মনে করে নবীন অযোগ্যকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হলে, কী হবে পরিণাম? প্রশ্নটি রূঢ় বটে, এবং অনেকে মনে করতে পারেন, এটা অবান্তর সংশয়বাদিতা ছাড়া আর কিছু নয়। অকৃতী ও অযোগ্য যদি কৃতী এবং যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে জাতীয় বিচারের কাছ থেকে সম্মানের উষ্ণীষটা মাথায় পরবার ভাগ্য লাভ করে, তবে সেটা জাতির পক্ষে [illegible] হিসাবে নিতান্ত অসৌভাগ্যজনক পরিণাম সৃষ্টি না করে পারবে না।

যাঁরা নবীন মেধাবী বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন, তাঁদের সংখ্যার হিসাব দেখে প্রথমেই একটু বিস্মিত হয়ে যেতে হয়, এত বড় দেশের জনজীবনে নবীন মেধাবীর সংখ্যা এতই সামান্য! তা ছাড়া ভবিষ্যদ্দৃষ্টির এমন কোন নিখুঁত পদ্ধতি নেই, যার সাহায্যে পরিণামের ছবি নির্ভুলরূপে এখনই দেখে নিয়ে কেউ বলে দিতে পারবে যে, এঁরা সত্যই ভবিষ্যতের জ্ঞান-কর্মের জীবনে এক-একজন বড় কৃতিত্বের অধিকারী হবেন? এবং ভবিষ্যৎটা যেদিন কালপথ অতিক্রম করে বর্তমান হয়ে যাবে, সেদিন হয়তো দেখা যাবে যে, জাতীয় মেধা ও প্রতিভার বৃহত্তম গৌরবের আসরে যাঁদের ভিড় দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে অতীতের সম্মানিত ও পুরস্কৃত বৃত্তিধারীদের অতিরিক্ত আরও অনেকজনকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যাঁরা দশ-বিশ-ত্রিশ বৎসর কালের অখ্যাতি ও অসহায়তার শুষ্ক-কঠোর অন্তরাল থেকে বিমুক্ত নতুন কৃতীর দল। অর্থাৎ এঁদের চিনতে পারেননি, প্রথাসম্মত বিচার ও পুরস্কারের কর্তাগণ।

শিক্ষাপদ্ধতির ভুল থাকলে জাতীয় মেধার পরিণাম বিকৃত হতে বাধ্য। শিক্ষা-বিজ্ঞানীর অভিমত ও অভিজ্ঞতার কথা এক্ষেত্রে খুবই অর্থপূর্ণ। তাঁরা বলেন, শিক্ষার চেয়ে শিক্ষার পদ্ধতি হলো শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রতিভার যথার্থ নির্মাতা। পদ্ধতির মধ্যে ভুল থাকলে শিক্ষার্থীর প্রতিভা উন্মেষিত না হয়ে বরং বিকৃত বিভ্রান্ত ও রিক্ত হয়ে যাবে। ঐতিহাসিকেরা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের 'এক হাজার বৎসরের বন্ধ্যা অবস্থার' দৃষ্টান্ত দিয়ে ভুল পদ্ধতির শিক্ষার ভয়াবহ পরিণামের আলোচনা করেছেন। গ্রীক মনস্বী আরিস্ততল্ বিজ্ঞানবিষয়ে যা বলেছেন তাই চরম সত্য, তার মধ্যে কোন ভুল নেই, এই নিরেট বিশ্বাসের শিক্ষায় বশীভূত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের এক হাজার বৎসরের চিন্তার শক্তি প্রচণ্ড এক অবরোধের মধ্যে পড়ে জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যেদিন থেকে শিক্ষার নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী এই সত্যের প্রচার শুরু হলো যে, না, আরিস্ততল্ যা বলেছেন, সেটাই চরম সত্য নয়, সেদিন থেকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানে নতুন সাড়া ও নবীন মেধাবীর আবির্ভাব শুরু হলো। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রস্তর-শৃঙ্খলোন্মুক্ত প্রাণের প্রবাহ সঞ্চারিত হলো।

নবীন মেধাবীর অর্থাৎ সার্থক শিক্ষাপন্ন যোগ্যতা ব্যক্তির পক্ষে সহজে অর্জনীয় হয়, যদি শিক্ষা ব্যাপারটা সাধারণের পক্ষে অসাধ্যকর একটি দুর্মূল্যতার সাধ্য বিষয় না হয়। ব্যয়বহুল শিক্ষা, অর্থাৎ শিক্ষালাভ করবার খরচ যে-ক্ষেত্রে শতকরা নব্বই জন দেশবাসীর আর্থিক ক্ষমতার অধিগম্য নয়, সে-ক্ষেত্রে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত জন-জীবনের মধ্যে নিশ্চয়ই শত-শত কিংবা হাজার-হাজার সম্ভাব্য 'নবীন মেধাবী'র মৃতকলেবরের দগ্ধাস্থি ছড়িয়ে পড়ে আছে বলে বুঝতে হবে। জাতীয় প্রতিভার কী ভয়ানক বিনাশ ঘটিয়ে থাকে শিক্ষা-ব্যবস্থার অভাব, সেটা বুঝবার জন্য খুব বেশী অনুমানের দরকার হয় না। যেখানে নিরক্ষরতাই জাতীয় সাংস্কৃতিক যোগ্যতার একটি শৃঙ্খল, সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, জাতীয় প্রতিভার দশা নিদারুণ এক পতিত অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, যার আবাদ আজও হলো না, এবং সোনাও ফললো না। প্রশ্ন করা চলে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন যে রীতি-নীতি নিয়ে চলছে, তার মধ্যে কি কোন অতিগরীব বাঙালী ঘরের দ্বিতীয় কোন ভূদেব ও গুরুদাসের পক্ষে প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়ে দেখা দেওয়া সম্ভব? সম্ভব নয় বলেই অনেকে মনে করছেন। প্রতিভার উদ্ভাস, এবং প্রতিভার বিচার স্বীকৃতি পুরস্কার ও সম্মান সবই যেন সামাজিক ঘটনার বনিয়াদ না হয়ে আর্থিক ঘটনার বনিয়াদ লাভ করেছে। অন্যদিকে পরিণত কৃতীর মর্যাদা সম্পর্কে সুবিচার যেন বিচলিত না হয়। অকৃতীর এবং অ-প্রতিভার বৃহত্তম রাজকীয় অনুমোদন ও সম্মান জাতির সাংস্কৃতিক ক্ষতি সাধিত করেছে, কোন নতুন প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারেনি। চতুর্থ শ্রেণীর কবি স্যার আলফ্রেড অস্টিন বহু-বহু বৎসর ইংলণ্ডীয় রাজকবি তথা পোয়েট লরিয়েট হয়ে জীবনাতিপাত করেছিলেন বটে, কিন্তু দেশের সাংস্কৃতিক জন-জীবনে তিনি ধন্যবাদবিহীন কঠোর বিদ্রূপের আসন ছাড়া সামান্য সম্মানেরও অন্য কোন আসন পাননি।

বৈদেশিকী

রাগী জাপানীরা

জাপানী নির্বাচনে এবার কী যে হবে তা নিয়ে দুটো মত ছিল। এক দল ধরে নিয়েছিলেন ৫ ডিসেম্বরের ভোটাভুটিতে কচুকাটা হবে লিবারাল-ডেমোক্র্যাট দল যারা একটানা একুশ বছর জাপানে রাজত্ব করছে। ঠিক উলটো কথাই বলেছিলেন আর এক দল। তাঁদের মতে, জাপানীরা হচ্ছে রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী—তাদের রাজনৈতিক খেয়ার কাণ্ডারী হিসেবে লিবারাল-ডেমোক্র্যাট ছাড়া অন্য কোনো দলকে বরদাস্ত করতে তারা রাজী নয়। কাজেই যাই করুক না কেন লিবারাল-ডেমোক্র্যাট সরকার হেসে খেলে সরকারী দল তরে যাবে নির্বাচনী লড়াইয়ে। দেখা যাচ্ছে, কারুর কথাই ফলেনি, আবার সকলের কথাই ফলেছে। গদিয়ান দল হারেওনি আবার জেতেওনি। গদি তাদের যায়নি। কিন্তু রাখা শক্ত। জাপানী সংসদের প্রতিনিধি সভায় আসন ৪৯১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫১১। কিন্তু তার অর্ধেক আসনও লিবারাল-ডেমোক্র্যাটরা কব্জা করতে পারে নি। তারা পেয়েছে ২৪৯টা। আর সাতটা পেলেই তারা একেশ্বর হতে পারতো।

অবিশ্যি সে ফারাক নির্বাচনের ফল বেরুতে না বেরুতেই পুরে গেছে। নজন নির্দল সদস্য গদিয়ান দলে ভিড়ে গেছেন। সত্যিকারের দলছুট তাঁরা নন। এই সেদিনও তাঁরা ছিলেন লিবারাল-ডেমোক্র্যাট দলের সামিল। বেকায়দায় পড়ে দল ছেড়ে নির্দল বনেছিলেন নির্বাচনের আগে। দল কিন্তু তাঁদের পুরোপুরি ছাড়েনি। তাঁদের অনেককেই মদত দিয়েছে নির্বাচনী লড়াইয়ে, রাহাখরচও কিছু যুগিয়েছে। তাঁরা বেইমানিও করেননি। নির্বাচনী দরিয়া পার হয়েই সাবেক নৌকোতে চেপে বসেছেন। পুরোনো ঝগড়া বেমালুম ভুলে গিয়ে দলও তাঁদের ঠাঁই দিয়েছে। তাঁদের দৌলতেই দল হারানো গরিষ্ঠতা ফিরে পেয়েছে। তাতে কিন্তু ষোলো আনা সুসার হয়নি লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের। নির্বিবাদে পুরো চার বছর রাজত্ব করতে গেলে দরকার দলে অন্তত ২৭১ জন লোক। তা তো আর দলে নেই। লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের অবস্থা এখন সসেমিরে গোছের।

লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের ভরসা কোনো বিরোধী দলের এমন জোর নেই যে, তাদের খাপছাড়া করে। ওরা সবাই এককাট্টা হলেও নয়। জন নয়েক নির্দলকে সঙ্গে সঙ্গে দলে ভিড়িয়ে সে পথ তারা মেরে দিয়েছে। তা ছাড়া, বিরোধীদের নিজেদের মধ্যে সমঝোতা হওয়াও অসম্ভব। প্রতিনিধি সভায় ঠাঁই পেয়েছে ছটা দল—লিবারাল-ডেমোক্র্যাট, সোস্যালিস্ট, কোমাইতো, ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিস্ট আর নিউ লিবারাল ক্লাব। এ ছাড়া আছেন কিছু নির্দল সদস্য। নিউ লিবারাল ক্লাব বাদে আর সবই পুরোনো। ভোট কিন্তু শতকরা হিসেবে সকলেরই কমেছে, কমেনি কেবল কোমাইতোর। তবে আসন বেড়েছে এক কম্যুনিস্ট দল ছাড়া আর প্রত্যেকটা বিরোধী দলের। নিউ লিবারাল ক্লাব এই প্রথম নির্বাচনে লড়লেও পুরোনো সংসদেই পাঁচজন দলছাড়া লিবারাল-ডেমোক্র্যাট দলটা গড়েছিল। তাদের আসনও পাঁচ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৭। নির্দল সদস্যর সংখ্যাও আগের থেকে বেড়েছে। বিরোধীদের মধ্যে কমেছে কেবল কম্যুনিস্টদের হিস্যা। ৩৯ থেকে হয়েছে ১৭।

ভোট তাদের কিন্তু নামমাত্তর কমেছে ১০·৫ শতক থেকে হয়েছে ১০·৪। কিন্তু তাতে কী? তাদের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে। তারা যে সোস্যালিস্টদের সঙ্গে জুটে একটা বিকল্প সরকার খাড়া করবে সে গুড়ে বালি। দু দল মিলে পেয়েছে মোটে ১৪০টা আসন। সে সম্বল নিয়ে তো আর গদি দখল করার স্বপ্ন দেখা চলে না। তার ওপর বাকী সব দলই তো দক্ষিণপন্থী না হয় মধ্যপন্থী। তারা মরে গেলেও কম্যুনিস্টদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বামপন্থীদের হাতে দেশের প্রশাসন তুলে দেবে না। দক্ষিণী বিরোধী দলগুলো লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের বেগ দেবে তাদের সকলকে অগ্রাহ্য করে যা খুশী করার মতো কব্জির জোর তো আর লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের নেই। তার মানে কিন্তু বামপন্থীদের নাভিশ্বাস। একা হলে যেটুকু খাতির তাদের শাসক দল করতো সেটুকুও করবে না অন্য দক্ষিণপন্থী বিরোধী দলের চাপে। সরকার যেভাবেই গড়া হোক না কেন বামপন্থীদের কোনো সুবিধে হবে না জাপানে।

সরকারী দলের কাণ্ডকারখানা দেখে জাপানী ভোটাররা রেগেছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ-মধ্যপন্থীদের তালাক দেয়নি। লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের কপাল-ভাঙার কারণ অনেকগুলো। তার মধ্যে বামপন্থীদের পেয়ার একটা নয়। দক্ষিণ-মধ্যপন্থা বরবাদ করে বামপন্থাকে আদর করে ডেকে আনবার কোনো ইচ্ছে রাগী জাপানীরা দেখায় নি। আসলে তারা এত রেগেছে যে, কী করবে তা ভেবে পায়নি। যে দল একনাগাড়ে অনেক বছর গদিয়ান থাকে তার বিরুদ্ধে অনেক নালিশই লোকের মনে জমে ওঠে। ভোটের পাল্লা তার ক্রমেই হালকা হতে থাকে। লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদেরও তাই হয়েছে। তবে দলে ভাঙন না ধরলে অবস্থাটা তাদের এত মন্দ হতো না। ধরতে গেলে এই ভাঙা হাটেও তারা পেয়েছে ২৮৭টা আসন—আসন—নিজেদের ২৪৯টা, নিউ লিবারাল ক্লাবের ১৭টা আর নির্দলদের ২১টা। এরা সবাই তো প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ—আলাদা তকমা পরলে কী হয় তারা মনে-প্রাণে লিবারাল-ডেমোক্র্যাটই। তাদের আর লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের মত আর পথ একই।

গদিয়ান দলের প্রায় বারোটা বাজিয়েছে দলাদলি আর লকহীড কেলেঙ্কারি। লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি চিরকালই আছে। দলের সংহতি নষ্ট করেছে উপদলীয় কোঁদল। সে কোঁদল এদ্দিন ছিল নেতাগিরি নিয়ে, এবার তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বেআইনী টাকা লোটার ধান্দা। মার্কিনী উড়োজাহাজ কোম্পানি লকহীড ব্যবসা ফলাও করার জন্যে দুহাতে দুনিয়াতে টাকা ছড়িয়েছে। জাপানে বেশ কিছু নেতারও পকেট ভারী হয়েছে। দুর্নীতির দায়ে দু বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কাকুই তানাকা। মাস কয়েক আগে তাঁকে গারদে পোরা হয়েছিল ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে। সে অভিযোগ এখনও প্রমাণ হয়নি। মামলা চলছে। তিনি এখন জামিনে খালাস। তাতে কিন্তু নির্বাচনে জিততে তাঁর আটকায়নি। তবে তিনি পার পেলেও অনেককে হারতে হয়েছে লকহীড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে। কিন্তু ভোটারদের রায় দেখে মনে হয় লকহীড কেলেঙ্কারিতে তারা ততটা ঘাবড়ায় নি যতটা ঘাবড়েছে জিনিসপত্তরের দাম হুহু করে চড়ছে দেখে। সৎ প্রশাসন তারা চায় তবে আরও বেশী চায় ফাঁপাই টাকার চাপ থেকে বাঁচতে। তবুও দলের নেতা দুই বাঘা ভালুকো নেতা—তাকেও মিকি আর তাকেও ফুকুদা—এক হয়ে যদি নির্বাচনী প্রচার চালাতেন তা হলে হয়তো বিরোধীরা পাত্তাই পেতো না।

দেবরাজ

'দুঃখকে পাত সব ঝর গয়ে'

অরুণ বাগচী

হেমন্তে পাতারা ঝরবেই
বহু দূর থেকে বয়ে আনা
মৃৎপাত্রে জল বাতাসে
খানিক খরচা হবে

এক মাঠ রোদ্দুরের ঝাঁক
চড়ুই শালিখ নির্নিমেষ
ঘাসের গলির মুখে
অসতর্ক পোকা যদি নড়ে প্রাণধর্মে
একলা গাছের নিচে স্থির বসে থাকি

হলে ভালো হত বয়সী নদীর ঘাট
সাষ্টাঙ্গ প্রণামে গুঁড়ি মেরে
জলের দাক্ষিণ্যে মাথা রাখা
উঠে যাও নদী বর্ষায় যত পার
এর পর প্রতিদিন দু একটা সিঁড়ি শ্যাওলাধরা
হাওয়ায় উন্মুক্ত হবে
নেমে যাও স্নানার্থীরা
পদচিহ্নে এঁকে দিয়ে যাও নামাবলী
পায়ে পায়ে ক্ষয়ে যাই
পায়ে পায়ে আমার বয়েস
তোমাদের ঘরে চলে যাক

ক্ষোভ না রাখাই ভালো
সব কিছু একবারই
দ্বিধা প্রেম আশা অভিপ্রায়
অমৃতআস্বাদলগ্ন অতর্কিত
এই আসে এই চলে যায়

যার আলো

দিব্যেন্দু পালিত

যার অন্ধকার তার কিছু নয়;
যার আলো তার।

চিবুকের পাশে এসে নক্তমুখ দেখায় উদ্ভাস,
রাত্রিহীন কোনো দিকে স্থানান্তরিত হয় স্তন—
আর শোনা যায় শব্দ, আকস্মিক,
বাঁচিয়ে মণ্ডের আল তুলসীর পতন—
অপথ্যালমিক ডিজর্ডার!

যার আলো তার;
যার অন্ধকার তার কিছু নয়।

একান্ত রাত্রিতে শুধু দূরে সামুদ্রিক
ঝড়ে স্বপ্নময় হয় অর্ধেক আপ্লুত পাটাতন;
নারীর মুখের হাড়ে ছোঁয়া যায় ভ্রান্ত বারো মাস—
হাড় আর হাড়ের সদৃশ রূপ; ত্রিমাত্রিক,
সমস্ত সময়।

ক্ষুধার আমিষে

মানস রায়চৌধুরী

একই গলা দুরকম অভিভাবনায় বেজে ওঠে
"আমি খুব ভালবাসি, আমি খুব ঘৃণা করি তাকে"
বিছানায় নুয়ে পড়ে উন্মাদ শরীর
রোমকূপে খত্তোর মতো জেগে ওঠে ক্রোধ
স্বপ্ন তবু স্বপ্ন নয় জীবনের মসৃণ নখর
আপেলের বুক থেকে পোকা বেছে ফেলে,
তারপর সমুদ্রজলের মতো দুকূলে ভাসিয়ে ঢালে নুন।
এই নুন চুম্বনে আকীর্ণ হয়েছিলো
এই নুন হননের রক্তে চিরন্তন
তুমি কোনদিন একে ক্ষুধার আমিষে পেয়েছিলে?

ঘর

কেতকী কুশারী ডাইসন

দুর্গাপুরের গান্ধীমোড়ে পর পর দু' দিন এক যুবতী
ভিখারিনীকে
দেখেছিলাম। বিড়ি খেতে খেতে গভীরভাবে কোনো বিষয়ে
চিন্তা
করছিলো। তার চোখের চাহনি দেখে মনে হয়েছিলো যে
সে কোনো একটা জরুরী প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে।

আচ্ছা, আমার কি কোনো কালে কোনো ঘর ছিলো
সদরে বা অন্দরে?
রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, শোবার ঘর,
বা কুমড়োর লতা, দিঘির ধার, বাতাবি লেবুর গাছ,
ঐ ধরনের কিছু?

পথে পথেই এত দিন কেটেছে
যে আমার ধারণা পথই আমার ঘর,
কিন্তু অনোরা বলে আমার মাথায় নাকি গণ্ডগোল হয়ে গেছে,
আমার মনে না পড়লেও
'আমি নাকি এক দিন ঘর থেকেই বেরিয়েছিলাম'

আমার নাকি দুটো ছেলে ছিলো,
তাদের হাত ধ'রে আমি নাকি হাঁটতাম,
তারা গান গাইতো আর ভিক্ষা চাইতো।
তারা হারিয়ে যাবার পর থেকেই নাকি আমার মাথা খারাপ।
এ-ও কি সত্যি হ'তে পারে?

আচ্ছা, এমনও তো হ'তে পারে
যে সকলেই ঘর থেকে বেরোয় না,
কেউ কেউ গোড়া থেকেই বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে?

ও নাইলনের শাড়ি পরা দিদি,
টেরিকটের শার্ট পরা দাদা,
আমি কি কখনও বাসিন্দা ছিলাম
তোমাদের ঘরে?
দ্যাখো না মনে ক'রে।

এক নজরে

হরের্নামৈব কেবলম

সন্ধ্যা বেলাটা এখন যেন আর কাটতে চায় না। যেদিন মন-মেজাজ ঠিক থাকে, সেদিন বসে বসে লিখি পড়ি, তা না হলে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে কাৎ হয়ে নিঃশব্দে ঝিমুই। রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ তারপর উঠে মুখহাত ধুই, খাই এবং এক চামচ টনিক গলাধঃকরণ করেই শুয়ে পড়ি। সন্ধ্যা নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন, হতে হয় না দশটা-পাঁচটার চাকরেদের। তাঁরা দিনান্তে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন এবং পরটা ও আলু ছেঁচকি সহ এক পেয়ালা চা উদরস্থ করেই হয় পাড়ার কোন তাসের আখড়ায় গিয়ে ওঠেন, নয় যান কোন হরিসভায়। যাঁরা খেলাধুলোয় নিস্পৃহ, আবার ধর্ম ব্যাপারেও অনাগ্রহী, তাঁরা ঘরেই থাকেন এবং শুয়ে শুয়ে হয় গোয়েন্দা নভেল খোলেন, নয় স্ত্রীর সঙ্গে অফিসের গল্প ফাঁদেন। কিন্তু আমি ত কোনদিনই দশটা পাঁচটার কাজ করিনি, আমার অভ্যাস তাই অন্যভাবে তৈরি হয়েছে। খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করে বেলা আড়াইটে নাগাদ আমি অফিস বেরতাম। ফিরতাম রাত্রি দশটা পার করে। এর মধ্যে সন্ধ্যেবেলাটাই ছিল আমার আড্ডার পরম মুহূর্ত। মৌচাকের মত টেবিল ঘিরে জড়ো হতেন নানা বিভাগের গুণীজন। মুড়ি চিনেবাদাম, কচুরি সিঙাড়া ও চা সিগারেট আসত, সেই সঙ্গেই চলত হাসিমস্করা, তর্ক ও গাল-গল্পের মহোৎসব। সেই সন্ধ্যা বিদায় নিয়েছে অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। অনিবার্য ভাবেই এখনকার সন্ধ্যাগুলো আমার চোখে কেমন যেন বিষণ্ণ চেহারায় দেখা দেয়।

প্রতিবেশী রামগোপালবাবু একদিন বললেন, সন্ধেবেলা অমন ঘরে বন্দী হয়ে থাকবেন না সুদর্শনদা। শরীর মাটি হবে। ট্রামের মান্থলিটা পকেটে ফেলে বেরিয়ে পড়ুন, ময়দানে ঘণ্টাখানেক চক্কর দিয়ে ঘুরে আসুন, দেখবেন দেহমন খাসা চনমনে হয়ে উঠবে। বললাম, ভীড়ের ভয়ে বেরুতে ভাল লাগে না। তাছাড়া খোঁড়া-খুঁড়ির ধাক্কায় ময়দানেও ত পা বাড়াবার জায়গা ক্রমেই কমে আসছে। তবু যেটুকু আছে, তাও কম নয়। আর অফিসের ভীড় তো দক্ষিণ মুখে। উত্তরের ট্রামে ওঠা তো যায়ই, বসাও যায় বললেন ভদ্রলোক। তিনি একটি সরকারী কলেজের অধ্যাপক, আমার শুভানুধ্যায়ীও। পরামর্শটা তাই অগ্রাহ্য না করে পরের দিন থেকেই বেরুতে লাগলাম। দিন পনের পরে ভিক্টোরিয়া উদ্যানের সম্মুখবর্তী ফুটপাথে একটা বেঞ্চে বসে আছি, রাত তখন সাতটা, একটি ফুটফুটে বিদেশী যুবক পাশে এসে বসল। পরনে গেরুয়া কাপড়, গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, পায়ে খাকি রঙের কেডস, ন্যাড়া মাথা, গলায় দুকণ্ঠী তুলসী কাঠের মালা, কপালে তিলক। পুরোদস্তুর একজন বৈষ্ণব আর কি! নিওনের আলোয় বেশ করে দেখলাম ছেলেটিকে। বলা বাহুল্য কৌতুকের সঙ্গেই কৌতূহল জাগছিল খানিকটা। কিন্তু নিজে থেকে ত আর কিছু বলা যায় না! হঠাৎ ছেলেটিই সুযোগ করে দিল, আগে কথা কয়ে। সে বলল, মাপ করবেন, আপনি একটু অবাক হয়েছেন আমাকে দেখে, তাই না? বললাম, ঠিক বলেছ। তোমার পরিচয় জানার জন্যে আগ্রহ হচ্ছে। এপথে কেমন করে এলে, কেন এলে, জানতে পারলে খুশী হব।

ছেলেটি বলল, আমার নাম ম্যানুলো। মার্কিন মুলুকের বোস্টনে আমার বাড়ি। বাবার ওষুধ ও রাসায়নিক সার তৈরির কারখানা আছে। ফলিত রসায়নের গ্র্যাজুয়েট হয়ে আমি ঐ কারবারেই যোগ দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে শ্রীহরির আহ্বান কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে গেল ভোজবাজির মত সব কিছু ওলট-পালট হয়ে। যে দেশে জন্মেছি, যে ধর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে মানুষ হয়েছি, যে পরিবার পরিজনকে আপন বলে জেনেছি, সব আমার কাছে অর্থহীন মোহের আবরণ বলে মনে হল। অন্তরে জাগল এক পরম তৃষ্ণা এবং তার তাড়নাতেই একদিন সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে পথে পা বাড়ালাম। সেই পথই নিয়ে এল আমাকে আপনাদের দেশে। বেশ আবেগের সঙ্গেই কথাগুলো বলল সে। আঘাত না করে যথাসম্ভব স্নেহের সুরেই বললাম, শ্রীহরির আহ্বানটা শুনলে কি ভাবে? কোন প্রচারকের কাছে পেলে, না কোন বই থেকে সংগ্রহ করলে? সে বলল, পরপর কতকগুলি ঘটনায় আমার মন বিষম উত্যক্ত হয়েছিল। আমি দেখলাম, দীর্ঘ পঁচিশ বছর সংসার করার পর বাবা মা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে আবার বিয়ে করলেন। বাবা ও তাঁর অংশীদারের মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে তীব্র বিবাদ বাধল এবং সে ভদ্রলোক রহস্যজনকভাবে হঠাৎ একদিন নিহত হলেন। যে মেয়েটির সঙ্গে আমার প্রণয় ছিল, আমাকে ছেড়ে বিনা কারণেই সে এক চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়কে ভালবাসল। সর্বশেষে একটি নিগ্রো বালিকার লাঞ্ছনায় ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করায় ঘনিষ্ঠতম এক বন্ধু আমাকে খুন করার জন্যে পিস্তল উঁচিয়ে তেড়ে এল একদিন। তখন বুঝলাম, না, এ-সংসার, এ-সমাজ ছাড়তেই হবে। নূতন পথ চাই।

এই পর্যন্ত বলেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কাকে জানি না উদ্দেশে প্রণতি জানাল। তারপর বলল, এই মানসিক সংকটের মুখে হঠাৎ এক ভারতীয় অধ্যাপকের কাছে আমি পেলাম শ্রীচৈতন্যামৃত (চরিতামৃত) এবং বৈষ্ণব পদাবলীর অনুবাদ গ্রন্থ একখানা। তা থেকেই জাগল সেই পরম তৃষ্ণা, যা অবহিত করল আমাকে ভোগসুখের অসারতা সম্বন্ধে এবং কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট করল। তখনই আমি গেলাম গুরুজীর কাছে এবং বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নিলাম। আমার ভাগ্যে তিনি ঠিক সে সময়ই এসেছিলেন আমেরিকায়। তারপর থেকে আমার নাম হল নিত্যানন্দ। আজ আমি সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, সেই পুরান ম্যানুলোর অনুবৃত্তি নই আর। তার কাহিনী শেষ হতে বললুম, আচ্ছা নিত্যানন্দ, তুমি যে বস্তু খুঁজছিলে, তা কি পেয়েছ? কি সেই বস্তু, তা পেলে কি হয়, তাও কি পরিষ্কার বুঝেছ? সে একটু ভাবল, তারপর বলল, ধ্রুব কোন জিনিসকে যে সত্যিই ধরেছি, তা বলতে পারব না। তবে সে রকম একটা কিছু আছে, তা জেনেছি এবং জেনেছি যে তা পেলে আর কিছুই পাবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আমাদের বস্তুমুখী সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে তার আবাদই হয় না, তা হাজারো আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা ও অশান্তিকে নিত্য নূতন ইন্ধন দিয়ে ওস্কায় এবং তার পরিণতিই হল জুয়া, ক্যাবারে, মদ ও নিদ্রাকর্ষক বড়ির ছড়াছড়ি এবং সারা মুলুককে প্রেম, প্রত্যয় ও মানবতার অপমৃত্যু! দ্য নেম অব হরি ইজ এ সিওর প্যানেশিয়া টু অল দীজ ডিজইজেস। অর্থাৎ হরিনাম হল এই সর্ববিধ ভবব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ। অ্যাম আই ক্লীয়ার টু ইউ নাও, অর্থাৎ আমার কথাটা এবার বেশ বুঝেছেন ত আপনি?

আমায় হাসতে দেখে সে বলল, বুঝেছি, আপনার কিছু বিশ্বাস হয়নি। আমাকে

হয় বেকুব, নয় প্রতারক ভেবেছেন। আমি বললাম, না, না নিত্যানন্দ, তোমার বক্তব্যের আন্তরিকতায় তিলমাত্র অবিশ্বাস করিনি। আমি হাসছি এই মনে করে যে তোমরা যে সময় বিজ্ঞান-নির্ভর, রাজনীতি ও অর্থনীতি সর্বস্ব, পারমিসিভ বা সর্বংসহ সমাজে ক্লান্ত হয়ে ভারতীয় সন্ন্যাস এবং ভক্তি দর্শনের দিকে ঝুঁকছ, ঠিক সেই সময় আমরা মেতেছি তোমাদের ছকে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে আমূল ঢেলে সাজানোর জন্যে। অর্থাৎ দুই প্রান্তেই অতৃপ্ত, মানুষ খালি দৌড়াচ্ছে। সত্যবস্তু কোথায়, কি পেলে সে শান্ত হবে, তাই বোধ হয় মানব জীবনের বৃহত্তম জিজ্ঞাসা। নিত্যানন্দ বলল, আমি যে মাটিতে উঠে দাঁড়িয়েছি, তা থেকে আমায় আর জলে ফেলবেন না। আমি বললাম, ভয় নেই, তা করব না। তবে আমি কিন্তু অগাধ জলেই আজীবন হাবুডুবু খাচ্ছি, মাটি কোথায় জানি না। মাটি হারিয়েছে, এই কথা বলেই সে উঠে ট্রাম লাইনের দিকে পা বাড়াল। ঘড়িতে ততক্ষণে রাত প্রায় ন'টা হয়ে গেছে। এবার উঠতে হবে আমাকেও।

সুদর্শন গুপ্ত

॥ ৯ ॥

কিন্তু অমৃতলাল নাগরজীর সঙ্গে সেদিন আমার প্রথম পরিচয় হলেও মনে মনে আমাদের বহুদিনের পরিচয় ছিলই। তিনি লখ্‌নৌয়ের লোক আর আমি কলকাতায়। তিনি হিন্দি ভাষার লেখক, আমি বাঙলা ভাষার। তবু লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা বহুদিন পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। চাক্ষুষ দেখা হলো প্রথম সেইদিনই।

লেখকদের সঙ্গে লেখকদের দেখা হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। এই ধরনের সম্মেলনের গৌণ উদ্দেশ্য হলো পরস্পরের মানসিকতার আদান-প্রদানের সুযোগ পাওয়া। কিন্তু সেটা কি খুবই অবশ্য প্রয়োজনীয়?

আমার মতে প্রয়োজনীয় নয়। লেখার মাধ্যমে যদি পরস্পরের পরিচয় না হয়, তাহলে হাজার মেলা-মেশাতেও পরিচয় হবে না। ডিকেন্স বা ব্যালজাকের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি বা হবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু তা বলে তাঁদের কি আমি কম চিনি?

যাঁরা বর্ষীয়ান সাহিত্যিক তাঁরা কি কখনও অপেক্ষাকৃত নবীন সাহিত্যিকদের ঔদার্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন? অন্তত বাঙালী লেখক হিসেবে অগ্রজদের কাছ থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে তা কখনও পাইনি। পাইনি বলে আমার কোনও বেদনা নেই। আমার পক্ষে বরং সেটা প্রকারান্তরে সৌভাগ্য-সূচকই হয়েছে। কারণ এ এমন এক কাজ যা একলা ঘরে বসে করবার জিনিস, দল বেঁধে করবার কাজ নয়। দল বাঁধে দুর্বলরা, তাই আজকাল দেশে কবি-সম্মেলন আর লেখক-সম্মেলনের এত ঘটা, এত হৈ-চৈ, এত বাড়াবাড়ি।

এ-বিষয়ে বার্নার্ড শ'র একটা উক্তি এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে। উক্তিটা বড় কড়া শোনাবে। তবু শুনে রাখা ভালো। শুনে রাখলে কাজে আসতে পারে।

বার্নার্ড-শ বলেছিলেন লেখকদের কখনও লেখকদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়। তাতে লেখা নষ্ট হয়ে যায়। তার পুরো উক্তিটা এখানে তুলে দিচ্ছি। ইংরেজ লেখক গলস্‌ওয়ার্দিকে তিনি বলেছিলেন—

"Literary people should never associate with one another, not only because of their cliques and hatreds and envies but because their minds inbreed and produce abortions."

কথাগুলো বাঙলায় ভাবানুবাদ করলে এই দাঁড়ায়: 'সাহিত্যিকদের পারস্পরিক মেলামেশা অনুচিত। অনুচিত এই জন্যে নয় যে তার ফলে দলবাজি বা ঘৃণা বা হিংসের সৃষ্টি হয়। অনুচিত এই জন্যে যে তার ফলে তাদের মনের ভেতরে যা উৎপাদন হয় তা তাদের মনের ভেতরেই বেড়ে ওঠে, আর তার ফলে যা তারা সৃষ্টি করে তা তাড়াহুড়োর দরুণ অপরিণত কাজের মত অপদার্থ জিনিসে পরিণত হয়।'

আসলে ভেবে দেখেছি আমরা সবাই সেই বিখ্যাত গোপাল ভাঁড়ের কাকার মত। গোপাল ভাঁড়ের কাকা গোপাল ভাঁড়ের বাড়ির পাশেই থাকতো, বলতে গেলে একই চৌহদ্দির মধ্যে। সেই কাকা একদিন নিজের এলাকার মধ্যে একটা দোতলা বাড়ি করে ফেললে। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের তখনও সেই কুঁড়ে ঘর। তার এমন পয়সা নেই যে কাকার মত সে দোতলা বাড়ি হাঁকায়।

দোতলা বাড়ি শেষ হবার পরেই কাকা দোতলা থেকে গোপালকে বাড়ি দেখাবার জন্যে চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—গোপাল, ও গোপাল, বাড়ি আছো নাকি?

গোপাল ভাঁড়ের কোনও জবাব নেই। গোপাল ভাঁড় বুঝতে পেরেছিল যে কাকা ভাইপোকে তার ঐশ্বর্য দেখাতে চায়। তাই কাকার ডাক শুনতে পেয়েও সে চুপ করে রইল। তারপর থেকে গোপাল বড় মন-মরা হয়ে দিন কাটায়। শেষকালে অনেক খোসামোদ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছ থেকে কিছু টাকা জোগাড় করলে। আর বছর

থানেকের মধ্যে নিজেও একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করে ফেললে। তারপর যেদিন বাড়ি শেষ হলো সেইদিন দোতলার জানালা থেকে কাকাকে উদ্দেশ করে ডাকতে লাগলো—কাকা, ও কাকা, বাড়ি আছো নাকি?

কাকা গোপাল ভাঁড়ের চাতুর্য ধরতে পারেনি।

জিজ্ঞেস করলে—কী রে গোপাল, কী বলছিস?

গোপাল বললে—গেল বছরে তুমি আমাকে ডাকছিলে কেন গো?

*

'মহারাজ' হোটেলটার ভেতরে যখন মানুষের ভিড়ে গম-গম করছে তখন দেখি এক পাশে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে ফাদার কামিল বুল্কে একা-একা হাতে প্লেট নিয়ে জলযোগ করে চলেছেন।

বললাম—খাবার পছন্দ হয়েছে তো ফাদার?

ফাদার আমাকে দেখে বললেন—তুমি কোথায় ছিলে বিমল? আসবার সময় এক-সঙ্গে এলুম আর এখানে এসে তুমি কোথায় চলে গেলে? তোমাকে তো আর দেখতে পাইনি! কনফারেন্সের সময় তুমি কোথায় ছিলে? আমি তোমায় অনেক খুঁজলুম।

বললাম—আমি তো কনফারেন্সে থাকিনি?

—থাকোনি? বই-এর প্রদর্শনী হলো, কর্ণ সিংজী উদ্বোধন করলেন, সেখানেও তো তোমাকে দেখতে পেলুম না।

বললুম—আমি অন্য জায়গায় গিয়েছিলুম ফাদার—

ফাদার বললেন—আমার হোটেলে তোমার জন্যে ঘর রিজার্ভ করা রয়েছে দেখলাম, তোমার নাম লেখা রয়েছে দরজার ওপর—

বললাম—কিন্তু এখন তো আর সেখানে যাওয়া যায় না ফাদার, আমার হোটেলে যাদের সঙ্গে আছি তাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, সে-হোটেল ছেড়ে গেলে তারা মনে কষ্ট পাবে। তার চেয়ে যেখানে আছি সেখানেই থাকি, সেখানে খাওয়া-থাকবার বন্দোবস্তে কোনও ত্রুটি নেই—

আমি একটু থেমে আবার সেই পুরোন প্রসঙ্গ তুললাম। বললাম—ফাদার আপনি যে মিশনারি হয়ে গেলেন তাতে আপনার ফ্যামিলি থেকে কোনও আপত্তি ওঠেনি? প্লেনে সব কথা জিজ্ঞেস করা হয়নি—

ফাদার বললেন—আপত্তি তো উঠবেই। কিন্তু আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ছি। আর ওদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে চার্চে গিয়ে সেখানকার ফাদারদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলছি। কেউ বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারেনি সে-সম্বন্ধে। তারপর যেই ডাক্তারি পড়া শেষ হলো, আমি ডাক্তারি পাশ করে গেলুম, সেই দিনই বাড়ির ফ্যামিলির সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে মিশনারিদের দলে চলে গেলাম—

—তারপর এত জায়গা থাকতে ইণ্ডিয়ায় এলেন কেন? আরো তো অনেক জায়গা ছিল যাবার?

ফাদার বললেন—আমার চার্চ যে আমাকে ইণ্ডিয়াতেই পাঠিয়ে দিলে। আর আমারও ইণ্ডিয়া জায়গাটা খুব ভালো লেগে গেল। আমি যখন হিন্দি ভাষাটাও শিখে নিলুম, তখন 'রাম-চরিতমানস' পড়লুম। পড়ে দেখলুম আমার ধর্মের সঙ্গে তুলসীদাসজীর ধর্মের কোনও তফাত নেই। তাই আমি এখন হিন্দি-ইংরিজী ডিক্সনারি লিখছি।—

মনে পড়ছে জীবনে যত মুষ্টিমেয় সৎ ধার্মিক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে ফাদার কামিল বুল্কেও সেই বিরল মানুষের সংখ্যার মধ্যে একজন। এই সব মানুষই আজকের যুগে হয়ত জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতির সেতু রচনা করে চলেছেন।
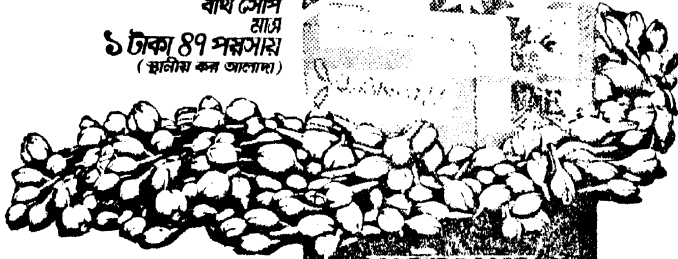
এই মরিশাসের কথাই ধরা যাক। এই মরিশাস একদিন কত অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছে তার কি ঠিক আছে? আর তুলসীদাসজী তো ছিলেনই, কিন্তু তিনি ছাড়াও আরো যে-সব মহাপুরুষ এখানকার মানুষদের প্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁদের সংখ্যাও কি কিছু কম? তাঁদের আত্মত্যাগই কি সামান্য? ১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দ 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু মরিশাসবাসীরা তার নাম-গন্ধ পর্যন্ত তখনও জানতো না। তার আট বছর পরে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো শহরে পৌঁছেছিলেন। তার নামও মরিশাসের কেউই শোনবার অবকাশ পায় নি। কিন্তু ইণ্ডিয়াতে আর্যসমাজ ততদিনে বেশ নাম করে ফেলেছে। হাবিলদার তেওয়ারি নামে এক ভদ্রলোক ১৮৯৭ সালে এই মরিশাসে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল 'আর্যসমাজে'র কিছু পুঁথিপত্র। এর ছ বছর পরে ১৯০৩ সালে পণ্ডিত রামফল শর্মা বলে একজন আর্য-সমাজী মরিশাসে এসে হাজির হলেন।

একটা মানুষের জীবনে যেমন ইতিহাস ভূগোল সবকিছু জড়িয়ে একাকার হয়ে যায়, একটি দেশের বা একটা জাতির জীবনেও তাই। মানুষ উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তুচ্ছ বৃহৎ সব ব্যাপারেই যেমন নিজেকে সম্প্রসারিত করবার সাধনা করে যায়, একটা জাতিও তেমনি। মরিশাস ছিল তখন অন্ধকারের আবর্তে আবদ্ধ। কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করবার আপ্রাণ প্রয়াসেই সে নিজের শক্তির ক্ষয় করে চলছিল। সে জানতো না কেন সে নিরক্ষর, আর কেনই বা সে তার মাতৃভূমি থেকে চিরবিচ্ছিন্ন। ১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধটা বাধলো তখন দেখলে হঠাৎ চিনির দাম বেড়ে তার প্রচুর অর্থাগম হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু কেন যে চিনির দাম বাড়লো তার ঐতিহাসিক কারণটা সে হৃদয়ঙ্গম করতেও পারলে না।

তখন মনে পড়লো গান্ধীজীর কথা। তিনিই তো একদিন এসে বলে গিয়েছিলেন তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে। তিনিই বলে গিয়েছিলেন মরিশাসে যে-কেউই বাস করুক তারা সবাই-ই এক জাতি। তারা ভারতীয় নয়, আফ্রিকান নয়, চাইনীজ নয়, মুসলমান নয়, বৌদ্ধ নয়, আর্যসমাজী নয়। তাদের একমাত্র পরিচয় তারা মানুষ এবং মরিশীয়। মরিশাসের ভাগ্যের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িত। সুতরাং সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মরিশাসের কল্যাণের জন্যে কাজ করুন।

তখন চেষ্টা হতে লাগলো কেমন করে তারা ঐক্যবদ্ধ হবে। চিনির দাম বাড়ার ফলে তখন হাতেও তাদের বেশ মোটা টাকা আসতে আরম্ভ করেছে। তাই গান্ধীজীর কথামত তারা স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে, কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করলে। ফরাসী ভাষায় ইংরেজি ভাষায় যত বই বেরোচ্ছে তারা তার আমদানি করতে লাগলো।

সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয়ে এল। অনুবাদক স্বয়ং ফরাসী ভাষার বিখ্যাত লেখক আন্দ্রে জিদ্। সেই বই পড়েই মরিশাসের লোকরা বুঝতে পারলে বেদ আর উপনিষদের আসল তাৎপর্য। বুঝতে পারলে মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা ভোগে নয় ত্যাগে। ত্যাগ দিয়ে ভোগ করলে তবেই ভোগের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। আরো বুঝতে পারলে যে কিছু পেতে গেলে কিছু দিতেও হয়। কিন্তু সবচেয়ে যা বড় তাকে যদি পেতে চাও তাহলে নিজেকে দাও। নিজেকে দিলেই তবে তুমি সকলকে পাবে।

এ-সব বড় বড় কথা। জিদ্ সাহেব রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদের ভূমিকায় এই সব কথা লিখেছিলেন। মরিশাসবাসীর কাছে এসব কথা এক নতুন উপলব্ধি এনে দিলে। এক নতুন অভিজ্ঞতা। তারা বরাবর জেনে এসেছিল যে টাকা দিলেই নাকি সব কিছু কিনতে পাওয়া যায়, কিন্তু এবার জানতে পারলে যে টাকা নয়, দিতে হয় নিজেকে। নিজেকে দিলেই সকলকে কিনতে পারা যায়, সকলকে নিজের করা যায়।

অর্থাৎ এক-কথায় প্রথমে এলেন গান্ধী। তারপরে এবারে এলেন রবীন্দ্রনাথ।

আর তারপর এক-একে এলেন বাবু রামানন্দ চ্যাটার্জি, শ্রীযুক্ত নটেশন, আর ডাঃ সিংহ।

মরিশাসে গিয়ে আমি সকলের কাছে একটা কথাই শুনেছি যে তাঁরা তাঁদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে এই কজনের কাছে ঋণী। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন দ্য মডার্ন 'রিভিউ'-এর সম্পাদক। তাতে ধারাবাহিক বেরোত জে-টি-সাণ্ডারল্যাণ্ডের লেখা "India In Bondage". আর ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ ছিলেন 'দ্য ইণ্ডিয়ান রিভিউ'-এর সম্পাদক। তাতে ধারাবাহিক বেরোতো মহাত্মা গান্ধীর 'Story of My Experiments With Truth'.

আর তখনকার দিনে মরিশাসবাসী ছেলেদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস যেটা ছিল সেটা হলো মাদ্রাজের নটেশন্ কোম্পানীর বই। তখন দামী দামী বই ছাপিয়ে সস্তায় প্রকাশ করতেন মাদ্রাজের নটেশন্ কোম্পানী। অ্যানী বেশান্তের 'গীতা', ডঃ শিবপাল্লী রাধাকৃষ্ণণের লেখা 'দ্য হার্ট অব্ হিন্দুস্থান' আর 'ফ্রিডম অ্যান্ড কালচার'। এই ধরনের সব বই যদি নটেশন কোম্পানী তখন সস্তায় প্রকাশ না করতেন

তাহলে কি কেউ জানতো যে 'ইণ্ডিয়া' বলে একটা দেশ আছে! আর এও কি জানতে পারতো যে ইণ্ডিয়া এমন এক দেশ যেখান থেকে মরিশাসবাসীর পূর্ব-পুরুষেরা একদিন পেটের জ্বালায় আখের ক্ষেতে কুলি-মজুরের কাজ করতে 'গিরিমিটি-লেবার' হয়ে এখানে এসেছিল?

মরিশাসে এখনও এমন বৃদ্ধ লোক সশরীরে বেঁচে আছেন যাঁরা সেইসব দিনের কথা মনে রেখেছেন। এই রকম একজন লোকের সঙ্গে আমার একদিন দেখা করার সৌভাগ্য হলো। প্রায় পঁচাশি বছর বয়েস তাঁর। প্রচুর সম্পত্তি তাঁর। ছেলেরা বড় বড় ব্যবসা করে। জালিমকে ধরে একদিন গেলাম তাঁর কাছে। কোথা দিয়ে কোথা দিয়ে যে সে আমাকে কোথায় নিয়ে গেল তা বুঝতে পারলাম না। একটা জায়গায় পৌঁছিয়ে সে বললে—এই দেখুন স্যার, এই হলো পোর্ট লুইস্, মরিশাসের রাজধানী—

দেখলাম চেয়ে চেয়ে। দেখে বোঝা গেল না আমি মরিশাসে এসেছি না ইণ্ডিয়ার কোনও ছোট-খাটো শহরে এসেছি। এক-পাশে চৌরঙ্গীর মত বড়-বড় দোকান সার বেঁধে সাজানো। অন্যদিকে একটা রেলিং-ঘেরা বাগান। মধ্যিখানে বিরাট চওড়া রাস্তা। তফাতের মধ্যে শুধু এই যে, রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়াও কম, আর ভিড়ও এখানকার চেয়ে অনেক পাতলা। তারপর একটা গলির ভেতরে ঢুকে একটা পুরোন বাড়ির সামনে জালিম গাড়ি থেকে নামলো। ড্রাইভার বসে রইল গাড়িতে। আমি আর সে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। একটা বড় ঘরে মেঝের ওপর মোটা উঁচু ফরাস পাতা। তার ওপরে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ। আমি যেতেই পরিচয় করে দিলে জালিম। ভদ্রলোকের নাম যশোবন্ত নাথমল রায়।

চোখে ভালো দেখতে পান না তিনি। কোনও রকমে অতি কষ্টে মানুষ চিনতে পারেন। তাঁর আর কোনও কাজ নেই। কারবার থেকেও অবসর নিয়েছেন। ছেলেরাই সব দেখাশোনা করে। আমায় দেখে যশোবন্তজী বললেন—আপনি ধুতি পরেছেন দেখছি, কোন্ জেলার লোক আপনি?

বললাম—আমি বাঙালী। কলকাতা থেকে এসেছি—

যশোবন্তজী বললেন—কলকাতা? তাই তো ভাবছি আপনি ধুতি পরেছেন কেন? এই দেখুন আমিও ধুতি পরেছি, কতদিন পরে ধুতি পরা লোক দেখলুম, চোখ জুড়িয়ে গেল। আজকালকার কেউ এখানে ধুতি পরে না—।

আমি বললাম—কোট-প্যাণ্ট পরলে কাজের সুবিধে অনেক, নড়তে চড়তেও সুবিধে—

বৃদ্ধ বললেন—ছাই, ছাই সুবিধে। আমরা কি আর কাজ করিনি কখনও? আজ না-হয় বুড়ো হয়েছি, কিন্তু আমরা কি চিরকালই বুড়ো ছিলুম? আমার ছেলেরা মনে করে আমি বুঝি মা'র পেট থেকেই বুড়ো হয়ে এই পাকা চুল নিয়েই জন্মেছি। আগে এখানে যত লোক দেখতুম সবাই ছিল ধুতি পরা। বাঙালীতে ভর্তি ছিল এই মরিশাস, তা জানেন? তখন সবাই ছিল শুধু বাঙালী আর তামিলী, সবাই তখন ধুতি পরতো। তারপর আস্তে আস্তে চোখের সামনে তার জায়গায় সব প্যাণ্ট শার্ট হয়ে গেল—

—আগে কি বাঙালী ছিল নাকি এখানে? তা তো কই কখনও শুনিনি?

বৃদ্ধ বললেন—বাঙালী না থাকলে আমার পদবী 'রায়' হলো কী করে? এখানকার যিনি মন্ত্রী, দয়ানন্দ বসন্ত রায়, তার পদবীও 'রায়' কেন? খুঁজলে দেখা যাবে তাঁর পূর্বপুরুষেরাও ছিলেন বাঙালী। এখানকার অনেক লোকের পদবী আছে 'দাশ' 'সেতো' 'রায়' এই সব। এগুলো বাঙালীদের পদবী। তবে এখানে থাকতে থাকতে সবাই বাঙলা কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছে। তখনকার দিনে আমাদের আখের ক্ষেতের মালিক সাহেবরা পর্যন্ত বাঙলায় কথা বলতে পারতো, তামিলও বুঝতো। কিন্তু যখন ইণ্ডিয়ায় সিপাই-মিউটিনি হলো তখন বেহার গোরখপুর আর বড় বড় জেলা থেকে দলে দলে গাদা গাদা হিন্দি-ওয়ালারা এলো। তখন তারা গুণতিতে আমাদের হারিয়ে দিলে। ওই মিউটিনি না হলে আমরা বাঙালীরাই থাকতুম গুণতিতে বেশি—

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—জানেন, ব্যাটারা কেউ আমার কথা শোনে না! আরে, আমার জন্যেই তো তোরা লপচপানি করছিস, এটা বুঝিস না? এই যে বাড়িটা, এটা কে করেছে? এই যে গাড়িটাতে চড়ছিস, ওটা
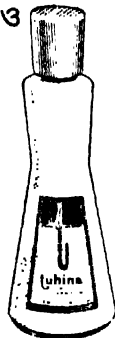
কেনবার টাকা তোরা কার কাছ থেকে পেয়েছিস? আমি না থাকলে তোরা জন্মাতিস কী করে শুনি? জানেন, ব্যাটারা আবার টেরিলিনের কোট-প্যাণ্ট পরে, তা তার কত দাম জানেন?

আমি থামিয়ে দিলাম বৃদ্ধকে। বললাম—আপনি চুপ করুন। আপনি যা বলছেন, আমাদের ইণ্ডিয়াতেও তাই। বুড়ো হলে সেখানেও এই দশা হয় সকলের—

—কেন, আমি বুড়ো হয়েছি বলে আমি কী এমন পাপ করেছি? আর আমি কি একলাই বুড়ো হয়েছি, আর কেউ কোনও-দিন বুড়ো হবে না? আর আমার আগেও কি আর কেউ বুড়ো ছিল না? তা আমি বুড়ো হয়েছি বেশ করেছি, আমি হাজার বার বুড়ো হবো, বেশ করবো। আমি কি সাধে বুড়ো হয়েছি? আমি যে ইংরেজ আমলে কী জ্বালায় জ্বলেছি তা কি ওরা জানে?

বললাম—ইংরেজ আমলে আপনার ওপরে কি খুব জুলুম হয়েছে?

—জুলুম হয়নি? ইংরেজ আমলে আমি কতবার জেল খেটেছি তা জানেন?

—তা আপনাদের এখানেও কি বিলিতি-কাপড় পোড়ানো-টোড়ানো ছিল নাকি?

কী বলছেন আপনি? পুলিশ-কমিশনার এসে আমাদের বাড়িতে বাড়িতে কত সার্চ করতো তা জানেন? আমরা সব মহাত্মা গান্ধীর ছবি রাখতুম দেয়ালে, সে-সব পুলিশ খুলে নিয়ে যেত। আর পুলিশের সবচেয়ে রাগ ছিল মশাই ইণ্ডিয়ায় ছাপানো নটেশন কোম্পানীর স্বদেশী বই-গুলোর ওপর। সেই সব বই কারোর বাড়িতে দেখলেই পুলিশ তাকে থানায় ধরে নিয়ে যেত। আমরা তখন লুকিয়ে লুকিয়ে এই সব বই খুব পড়তুম। আর পুলিশ আসতে দেখলেই সমস্ত বই, সমস্ত ছবি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলতুম আর বাইরে সাধু সাজতুম—

বললাম—আমাদের ইণ্ডিয়াতেও যে তখন তাই হয়েছে—আমাদের পুলিশ-কমিশনার টেগার্ট সাহেব ধুতি-পাঞ্জাবি পরে ছদ্মবেশে বাড়ির ছেলেদের ধরে জেলে পুরেছে।

—আরে আপনাদের ইণ্ডিয়ার কথা ছেড়ে দিন, ইণ্ডিয়া তো আপনাদের বড় কান্ট্রি। আমাদের মরিশাস কি তেমনি বড়? এখানকার জেলখানাও আবার ছিল তেমনি নোংরা। দলে দলে আমরা সবাই সেই জেল-খানায় ঢুকেছি। আমি নিজেই দু'বছর জেল খেটেছি। কিন্তু তা বলে এখন আমি বুড়ো হয়েছি দেখে ছেলেরা আমাকে অপাঙক্তেয় করবে? আমাকে ছেলেরা কী বলে জানেন?

বলে আমার নাকি ভীমরতি হয়েছে। তা আমি বলি বাবা আমার যদি ভীমরতিই হয়েছে তো তাহলে আমার টাকা কেন ভোগ করছো তোমরা? এই যে ছেলেরা আমাকে এখনও খেতে পরতে দিচ্ছে, এ সব কিছু তো আমার টাকার জন্যে! আমার যদি টাকা না থাকতো তো দেখতেন তারা কবে আমায় জুতো মারতে মারতে বাড়ি থেকে রাস্তায় বার করে দিত, তা জানেন? টাকা এমনই জিনিস মশাই! ছেলে বলুন, মেয়ে বলুন, বউ বলুন, নাতি বলুন, জামাই বলুন সমস্ত দুনিয়ার লোক আজকাল কেবল টাকা টাকা করে হন্যে হয়ে দৌড়চ্ছে—

হঠাৎ কে একজন শার্ট প্যাণ্ট পরা লোক ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই যশোবন্ত রায়জীকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো—বাবা, আবার তুমি চেঁচাচ্ছ?

আমাদের কথার মধ্যে বাধা পড়ে গেল হঠাৎ। মনে হলো যেন আমরা কোনও অপরাধ করে ফেলেছি। আমি হতবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগলাম। দেখলাম জালিম অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। অসহায় অবস্থায় নিজের অপরাধের ভারে বিব্রত হয়ে সে কী করবে বুঝতে পারছে না।

যশোবন্তজী বললেন—আমি তো চুপ করে সারাদিন শুয়েই থাকি। আমি তো কোনও ব্যাপারে কোনও কথা বলি না। তোমাদের ইনকাম ট্যাক্সের যে এত ঝামেলা চলেছে, তাতে কি আমি কখনও নাক গলিয়েছি না তোমরা আমাকে নাক গলাতে দিয়েছ?

বাপের কথার দিকে ছেলে কোনও কান না দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—আপনারা দয়া করে এখন উঠুন তো, উঠুন এখন—

যশোবন্তজী বললেন—কেন, ও'রা চলে যাবেন কেন? ও'রা ইণ্ডিয়া থেকে এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে, আর তুই কিনা

ও'দের তাড়িয়ে দিচ্ছিস? না, ও'রা যাবেন না—

ছেলে বললে—হ্যাঁ ও'রা যাবেন। আগে তোমার শরীর, না আগে তোমার কথা?

যশোবন্তজী বললেন—হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি, আমার শরীরের কথা ভাবতে তোদের বয়ে গেছে, তোরা তো কেবল আমার টাকাটাই চিনেছিস। আর আমার যে ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে কোমরে ব্যথা হয়ে গেল তার দিকে তো তোদের নজর নেই? তোমরা যা-ই বলো আর তা-ই বলো টাকা আমি তোমাদের আর দেব না, এই বলে রাখলুম—

ছেলে বলে উঠলো—রাখো তোমার বাজে কথা, কে তোমার টাকা চেয়েছে? আমরা চাই না তোমার টাকা—

যশোবন্তজী বলে উঠলেন—ওরে, মুখে অমন সবাই বলে রে, সবাই বলে টাকা চাই না। আমার টাকায় তোরা লপ্‌চপানি করছিস না বলতে চাস? এ বাড়িটা কার? যে-গাড়িটায় চড়ছিস, সেটা কার টাকায় কেনা শুনি? বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে, বেরিয়ে যা বলছি—বেরিয়ে যা—

ছেলে বাপকে বললে—আবার চেঁচাচ্ছ তুমি?

—বেশ করবো চেঁচাবো, হাজার বার চেঁচাবো, লক্ষ বার চেঁচাবো, কোটি বার চেঁচাবো। তোরা মনে করেছিস আমি টপ্‌ করে একদিন মরে যাবো আর তোরা আমার টাকাগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলবি, না? তা হতে দেব না। আমি আগে যে-টাকা দিয়েছি তা দিয়েছি, টাকা দিয়ে আগে অনেক ভুল করেছি আমি, আর টাকা দেব না। আমি মরে যাওয়ার আগে আমি সব টাকা এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে যাবো, এখানকার গীর্জায় দিয়ে যাবো, আমি ইণ্ডিয়ান ওশ্যানের জলে টাকা ফেলে দিয়ে যাবো, তবু তোদের দেব না—

যশোবন্তজীর ছেলে এবার বোধহয় আর সহ্য করতে পারলে না। আমার দিকে এগিয়ে এল। বললে—আপনাদের কাছে হাত জোড় করছি আপনারা এবার আসুন, বাবার শরীর সত্যিই খারাপ, দু'বার স্ট্রোক হয়ে গেছে বাবার, আর তার ফলে বাবার মাথাটাও খারাপ হয়ে গেছে, বাবার কেবল ধারণা যে টাকা নেবার জন্যে সবাই ষড়যন্ত্র করছে—

তারপর জালিমের দিকে চেয়ে বললে—তুমি তো এখানকার লোক, তুমি কেন বাবার কাছে ও'কে নিয়ে এলে?

যশোবন্তজীও বোধহয় আর সহ্য করতে পারলেন না। গদি ছেড়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তারপর ছেলে আর আমার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে বলতে লাগলেন—ও'দের যেতে বলবার কে রে? বললে আমি বলবো। আমার বাড়ি, আমি ইচ্ছে হলে ওদের থাকতে বলবো,—আবার ইচ্ছে হলে আমিই ওদের তাড়িয়ে দেব, তুই কে?

বলে টপ্‌ করে আমাদের দিকে ফিরে বললেন—আপনারা কেন আসেন আমার বাড়িতে শুনি? আমি বললুম তো আমার পঁচাশি বছর বয়েস হয়েছে, আমার দু'টো স্ট্রোক হয়ে গেছে ডাক্তার আমাকে চুপ করে শুধু শুয়ে থাকতে বলেছে তবু আপনারা কেন আসেন আমার কাছে বলুন তো? আপনারা বেরিয়ে যান এখান থেকে, বেরিয়ে যান বলছি, আমার টাকা দেখছেন আপনারা, না? টাকা আমি দেব না, এই আমি বলে রাখলুম, আমার টাকা নেই—যান—

বলে অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। জালিম এই সুযোগে আমার দিকে চেয়ে আমাকে
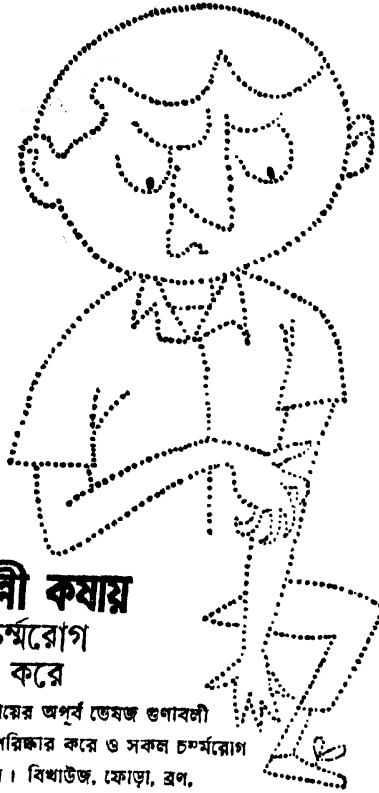
চলে যেতে ইঙ্গিত করলে। আমিও জালিমের পেছন-পেছন সিঁড়ি দিয়ে নিচের রাস্তায় নেমে এলাম। তারপর আর কোনও দিকে না চেয়ে সোজা গাড়ির মধ্যে উঠে বসলাম। তারপর গাড়িটা চলতে আরম্ভ করবার পর যেন মুখ দিয়ে কথা বলবার শক্তি ফিরে পেলাম। জালিম বোধহয় এই দুর্ঘটনায় একটু লজ্জায় পড়েছিল। বললে—আমি বুঝতে পারিনি স্যার, আপনার খুব অসুবিধে হলো—

আমি বললাম—তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে কেন জালিম? ভদ্রলোক তো পাগল—

জালিম বললে—আগে এ-রকম ছিলেন না স্যার যশোবন্তজী, এখন দেখছি মাথাটাও গেছে—।

বললাম—ছেলেরা বুঝি এখন আর দেখে না বাবাকে?

—খুব দেখে স্যার। কিন্তু বাপের ধারণা হয়েছে সবাই তার টাকাই চায়, সবাই যে তাঁকে খাতির-তোশামোদ করে তা বুঝি তাঁর টাকার জন্যে। অথচ স্যার, ওই যশোবন্তজী এককালে বহু টাকা বহু লোককে দান করেছে। ছোটবেলায় স্বদেশী করে ইংরেজদের জেল খেটেছে। তারপর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা করেছে। সেই টাকায় এখানে স্কুল করে দিয়েছে হাসপাতাল করে দিয়েছে, তারপর যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হলো তখন দাঙ্গার স্ট্রোক হয়েছে, এখন আর বাড়ি থেকে বেরোয় না, ডাক্তার ওঁকে শুধু শুয়ে থাকতে বলেছে—

গাড়িতে বসে বসে এই যশোবন্ত নাথমল রায়জীর কথাই ভাবছিলাম। এই জগৎ-সংসারে কত রকম মানুষই না আছে। যত রকম মানুষ, তত তার রকম ফের, তত রকম তার বৈচিত্র্য। ভারতবর্ষের মত এই মরিশাসও যেন আমাদের ভারতবর্ষের একটা ছোট সংস্করণ। এখানেও ইন্ডিয়ার মত সুখ আছে, দুঃখ আছে, বিরোধ বিচ্ছেদ বিদ্রোহ আছে, দয়া প্রেম আনন্দ আছে। এখানেও শান্তি অশান্তি সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিচ্ছেদ, বিদ্রোহ শান্তি পাশাপাশি আছে। মনে হলো এখানেই যেন ভুর্ভুবঃস্বঃ নিবিড় হয়ে বিরাজ করছে।

*

—তারপর?

অমৃতলাল নাগরজী খেতে খেতে আমার কথাগুলো সব শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তারপর?

মহারাজা হোটেলে ফাদার কামিল বুলকের সঙ্গে যেমন দেখা হয়েছিল, তেমনি অমৃতলাল নাগরজীর সঙ্গেও খেতে খেতে দেখা হয়ে গিয়েছিল। অমৃতলাল নাগরজীর লেখার আমি ভক্ত। কিন্তু আমি সেই মানুষটিরও আরো বেশি ভক্ত হয়ে গেলাম।

তাঁর সঙ্গে সেই দিন সকালেই গান্ধী-স্মৃতি-সৌধের কাছে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সে-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তখন বেশি কথা বলবার সময় ছিল না। মহারাজা হোটেলে যাবার তাড়া ছিল তখন সকলেরই। তাই খেতে খেতে যখন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হলো তখন তিনি বললেন—আমি আজ তিন দিন আপনাকে খুঁজেছি, তা জানেন? দিল্লিতে খুঁজেছি পাইনি, ভেবেছিলাম প্লেনে দেখা হবে, তাও হলো না, শেষকালে ভাবলাম বোম্বাই এয়ারপোর্টে দেখা হবে, তা তাও হলো না। মরিশাসে এসে যে দেখা হবে তাও না-হওয়াতে তখন আমি ভগবতীবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম আপনার কথা। সকালবেলা মীটিং-এর সময়েও তো আপনি ছিলেন না—

আমি বললাম—কিছু মনে করবেন না নাগরজী, আমি ধরমবীর ভারতীজীকে বলে একটু বাইরে চলে গিয়েছিলাম—

নাগরজী বললেন—বাইরে? বাইরে কোথায়?

আমি শিউপূজনের কথা বললাম, যশোমতীর কথা বললাম। যে-যে জায়গায় গিয়েছি সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বলে গেলাম। শিউপূজন বলে একজন কবির স্ত্রীকে নিয়ে স্বামীর কী-রকম দুর্দশা হচ্ছে তাও বললাম।

নাগরজী বললেন—সত্যি, সিনেমা আমাদের সাংসারিক জীবনকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়ে তবে ছাড়বে, পশ্চিমের মানুষকে যেমন করেছে, আমাদের ভারতীয় সমাজকেও তাই করে ছাড়বে। এই যে, আমাদের দেশে স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে এত বিবাহ-বিচ্ছেদ, ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এত পাপ-তাপ, এর জন্যে দায়ী কিন্তু ওই একমাত্র সিনেমা, সিনেমাই এ-যুগের সব সর্বনাশের মূল—

আমি বললাম—জানেন নাগরজী, আমাকে কয়েক বছর বোম্বাইতে একটা সিনেমার ব্যাপারে জড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, সেখানে দেখেছি লেখকরা সবাই সিনেমাওয়ালাদের কাছে নিজেদের বই পোস্ট করে পাঠিয়ে দিত—।

নাগরজী বললেন—মূলে উদ্দেশ্য টাকা—

বললাম—তারপর জানিস আমাকে

যেখানে গিয়ে গিয়েছিলাম সেখানেও ওই একই জিনিস দেখলুম। টিকো। আমাদের কলকাতায় একজন মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছেন আপনি?

—খুব শুনেছি। বিদ্যাসাগরের নাম কে শোনেনি?

বললাম—না নাগরজী, আজকের যুগের ছেলেরা তাঁর নামটাই শুধু জানে, তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই জানে না। তাদের বলুন সিনেমা-স্টারদের কথা, তা তাদের নাড়ি-নক্ষত্র মুখস্থ। কোন ফিলম-স্টার কার বউ-এর সঙ্গে প্রণয় করছে সে-জ্ঞান তাদের টন-টনে, কোন্ ক্রিকেট-স্টার কী দিয়ে ভাত খায় তাও তারা জানে, কিন্তু তুলসীদাসের জীবনী কী জিজ্ঞেস করুন, তা তারা বলতে পারবে না—তুলসীদাসের দোঁহা কাকে বলে তাও তারা বলতে পারবে না—তা হলে বিদ্যাসাগরের জীবনের একটা গল্প বলি আপনাকে, শুনুন—

বিদ্যাসাগর মশাই রোজ সকালবেলায় যখন নিজের বৈঠকখানায় বসতেন তখন তাঁর ছোট সাত বছরের নাতি তাঁর কোলে বসে থাকতো। আর পাশে বিদ্যাসাগর মশাই চার-পাঁচ টাকার খুচরো তামার পয়সা থাক থাক করে সাজিয়ে রাখতেন। কোনও ভিখিরি এলেই তিনি একটা করে পয়সা দান করতেন প্রত্যেককে। ভিখিরিদের মাথা-পিছু একটা পয়সা ছিল দৈনিক বরাদ্দ। ভিখিরিরা সবাই জানতো ওখানে গেলেই রোজ একটা করে পয়সা পাওয়া যাবে। এমনি রোজ।

একদিন তাঁর নাতি বলে উঠলো—দাদু, আমাকে একটা পয়সা দাও—

বিদ্যাসাগর বললেন—পয়সা? পয়সা নিয়ে তুই কি করবি?

নাতি বললে—পয়সা দিয়ে আমি ফুলুরি কিনে খাবো—

বিদ্যাসাগর বললেন—দূর, ওগুলো কি খেতে আছে রে বোকা? ও খেলে পেট খারাপ হয়—

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—আচ্ছা, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করি, বল্ তো? তুই কাকে বেশি ভালোবাসিস বল্ তো? আমাকে না আমার পয়সাকে?

নাতি টপ্ করে উত্তর দিলে—পয়সাকে! তোমার চেয়ে তোমার পয়সাকেই আমি বেশি ভালোবাসি দাদু—

বিদ্যাসাগর মশাই নাতির মুখ থেকে সত্যি জবাবটা পেয়ে খুশী হয়ে নাতিকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলেন। বললেন—ওরে, তোর বয়েস কম কিনা তাই সত্যি কথাটা বলে ফেললি, আসলে কেউই আমাকে ভালোবাসে না রে। আমার চেয়ে আমার টাকাকেই সবাই ভালবাসে—

তুলসীদাস নাগর লখনৌ-এর খানদানি

লোক। মেজাজটাও খানদানি। গল্পটা শুনে এত খুশী হলেন যে, কৌটো থেকে একটা পানের খিলি বার করে আমাকে দিয়ে দিলেন। বললেন—আপনি একটা পান খান বিমলবাবু, নিন—

আমি বললাম—আমি পান খাই না নাগরজী, আর আপনার পান কম পড়ে যাবে—

নাগরজী কিছুতেই শুনলেন না। বললেন—আমার সঙ্গে সব সময় পান থাকে। আমি ইণ্ডিয়া থেকে অনেক পান সঙ্গে করে এনেছি, একেবারে এক মাস চলবার মত—আপনি এমন একটা গল্প শোনালেন এর পর পান না খাইয়ে কি আর থাকতে পারি?

আমি পানটা মুখে পুরে বললাম—তাহলে আপনাকে একটা গল্প শোনাই, গোপাল ভাঁড়ের গল্প—

—গোপাল ভাঁড়?

—হ্যাঁ, গোপাল ভাঁড় ছিল আমাদের বাংলাদেশের এক জমিদারের মোসায়েব। সে হাসির গল্প বলে রোজ তার মনিবকে আনন্দ দিত। সেইটেই ছিল তার চাকরি। একবার তার কাকা একটা দোতলা বাড়ি করে দোতলা বাড়ির জানালা দিয়ে গোপালকে ডাকলে—গোপাল বাড়ি আছো নাকি? ও গোপাল—

নাগরজী বললেন—তারপর।

—তারপর গোপাল তো কাকার ডাকে কোনও জবাব দিলে না। কাকার ঐশ্বর্যে তার মন তখন পুড়ছে। তার এক বছর পরে গোপাল ভিক্ষে-সিক্ষে করে নিজেও ঠিক কাকার মত একটা দোতলা বাড়ি করলে। তারপর সেই দোতলা জানালা দিয়ে কাকাকে ডাকতে লাগলো—কাকা, ও কাকা—

কাকা গোপালের চ শি বুঝতে পারে নি। জিজ্ঞেস করলে রে গোপাল, কী বলছিস?

গোপাল বললে— বছরে আমাকে ডাকছিলে কেন গো কাকা?

*

বিকেল তিনটের সময় আবার সম্মেলন বসলো। আবার সেই বক্তৃতা। সম্মেলনের মধ্যে সকলের সঙ্গে বসেও আমার মনের ভেতরে সব সময় কিন্তু সেই শিউপুজনের স্ত্রীর কথাগুলোই প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। টাকা চাই, খ্যাতি চাই, ভোগ চাই, সব কিছু আমরা চাই, তা সে যেমন করেই হোক। সংসার ছেড়ে বাইরের জগতের সস্তা চটকের মধ্যে দিয়েও যদি ইন্দ্রিয়-ভোগের চরিতার্থতা লাভ করা যায় তো তাই আমাদের কাম্য। যশোবন্ত নাথমল রায়জীরও সেই একই ভীতি। সেই মস্তিষ্ক বিকৃতির মধ্যে দিয়েও সেই টাকার দুশ্চিন্তার আর্তনাদ। এর থেকে কি

কেউই পরিত্রাণ পাবে না! এ-যুগে আমরা কি শুধু সম্মেলনই করবো, আমরা কি শুধু বক্তৃতাই শুনব। তার বেশি কেন আমরা কিছু জানি না। কিন্তু তুলসীদাসজী তো কোনও সভায় যান নি, কোনও সম্মেলনেও যান নি। আকবর বাদশার দরবার থেকেও তো তিনি নিজেকে দূরে রেখেছিলেন। তিনি তো কখনও কোনও দিন গলা উঁচু করে প্রচারের দুন্দুভি বাজিয়ে নিজের কবিতার বই বিক্রি করবার অপচেষ্টা করেন নি। তিনি তো নিজে ধনী হয়ে, নিজে প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সকলের চেয়ে উঁচুতে উঠিয়ে বড় হতে চান নি। সেটাকে তিনি তো গৌরবের বিষয় বলেও মনে করেন নি। বরং তিনি তো উল্টো কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> জাঁহি রাগ ন লোভ ন মান মদা।
> তিহ কে সম বৈভব বা বিপদা॥

অর্থাৎ—যে মানুষের আসক্তি নেই, অভিমান নেই, দম্ভ নেই, তার কাছে সুখ আর দুঃখ দুই-ই সমান। তিনি সমস্ত সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে।

কিন্তু আশ্চর্য! আমরা তুলসীদাস পড়ি, প্রতি বছর সাড়ম্বরে তুলসী-জয়ন্তীও পালন করি। কিন্তু নিজেকে তো কই তেমন আচরণে ভূষিত করতে চেষ্টা করি না। আমরা তো মুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মনাঃ হয়ে থাকতে পারি না! আমাদের তো ষোল আনা আসক্তি আছে। আমাদের তো ষোল আনা লোভ আছে। আমাদের তো ষোল আনার বেশি আঠারো আনা অভিমান আর দম্ভ আছে। আমরা তো আমাদের ষোল আনা প্রাপ্য না পেলে পরের সর্বনাশের কামনাই করি! গোপাল ভাঁড় আর গোপাল ভাঁড়ের খুল্লতাতের মত কেবল পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতাতেই নামি।

সেই সম্মেলনের মঞ্চের ওপর বসে যখন সবাই হিন্দি-ভাষার জয়-জয়কার ঘোষণা করছিলেন আমি তখন ভাবছিলাম মানুষের বা দেশের মুক্তি লাভ কাদের জন্যে সম্ভব হয়েছে? সে কি জুলিয়াস সিজার, না চেঙ্গিস খাঁ, না মোহম্মদ তুঘলক, না হিটলার, না লেনিন, না মাও সে-তুং? সত্যিই আসলে কাদের জন্য তা সম্ভব হয়েছে? না, তা নয়। মনুষ্যত্ব বা স্বদেশ-মুক্তি সম্ভব হয়েছে তুলসীদাস, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রুশো, কাফকা প্রভৃতি মহাপুরুষদের জন্যেই। আর কারো জন্যে নয়। এমনকি বোমা-বারুদ-গুলি-কামানের জন্যেও নয়। তুলসীদাস 'রামচরিত মানস' লিখে মীরদাসকে যেমন স্বাধীন করেছেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত লিখেই স্বাধীন করেছেন ইণ্ডিয়াকে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' সঙ্গীতের জন্যেই তো স্বাধীন হয়েছে 'বাংলাদেশ', রুশোর 'সোশ্যাল কনট্র্যাক্ট' বইটার জন্যেই তো আরবন-আধিপত্য থেকে মুক্তি পেয়েছিল ফ্রান্সের মানুষ, আরব কাফকার লেটার টু হিজ ফাদার' বইটার জন্যেই তো কাইজারের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল জার্মানী।

মানুষ নয়, শিক্ষক নয়, অধ্যাপক নয়, ধর্মগুরুও নয়। ইতিহাস-বিধাতার জন্যেই ইতিহাস তৈরি হয় আর ইতিহাস-বিধাতা তার নিজের প্রয়োজনেই যুগে যুগে সৃষ্টি করে একজন তুলসীদাস, একজন বঙ্কিমচন্দ্র, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন রুশো আর একজন কাফকাদের।

সন্ধ্যেবেলা হোটেলে ফিরে এসে দেখি খুব ভিড়। অন্য হোটেল থেকে আরো অনেক ডেলিগেট আমাদের হোটেলে এসে উঠেছেন। সামনেই দেখা হলো হিন্দি সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ আশকের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো? আপনারা এখানে?

আশক্‌জী বললেন—আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেখানকার খাওয়াটা খুব খারাপ মশাই। সেখানে আমাদের ভালো লাগলো না, তাই আমরা সবাই দল বেঁধে এই বেল-ভিউতে চলে এলাম—

হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং হলে ঢুকতেই নতুন অতিথিদের সকলের সঙ্গে দেখা হলো। আমাদের দল ভারি হলো আরো। হঠাৎ নজরে পড়লো সেই একক মানুষটির দিকে। সেই এস রামকৃষ্ণ। তিনি প্রতিদিনের মত সেদিনও একান্ত-চিত্তে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে মোজা উঁচু করে বসেই সুরা পান করে চলেছেন। বোধ করি লক্ষ-ভেদ করবার সময় অর্জুনের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনেরও এত একাগ্র-চিত্ত ছিল না, এত নিষ্ঠা ছিল না।

আর সেই দিনেই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। এবার সেই কথা বলি।

(ক্রমশ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

মৈত্রেয়ী দেবী আকাদমি পুরস্কারে সম্মানিত

সাহিত্য আকাদমি ১৯৭৬ সালের জন্য আকাদমি পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই পুরস্কারের সম্মান অর্জন করেছেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর 'ন হন্যতে' উপন্যাসটির জন্য। উপন্যাসটি ইতিমধ্যেই বাঙালী পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছে, সমালোচকরাও প্রশংসা করেছেন মুক্তকণ্ঠে। এমন একটি উপন্যাস যে পুরস্কার লাভ করতে পেরেছে তার জন্য আমরা আনন্দিত। মৈত্রেয়ী দেবীকে অভিনন্দন জানাই।

বাংলা সাহিত্যে মৈত্রেয়ী দেবী নবীনা নন। তাঁর রচনার সঙ্গে পাঠক সমাজের পরিচয় নতুন নয়। বিশেষত লেখিকার একটি গ্রন্থ—যা বহুকাল পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল—'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' আমাদের অনেকেরই অতিপরিচিত। মৈত্রেয়ী দেবীকে আমরা প্রধানত রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যের অন্যতম ভাণ্ডারী বলেই জানি, কিন্তু তিনি শুধু রবীন্দ্র সাহিত্যের চর্চাই করেন নি, সৃষ্টিশীল লেখিকা হিসেবেও প্রশংসা অর্জন করেছেন।

এবার সাহিত্য আকাদমি ছোট গল্প রচনার জন্যও সাহিত্য পুরস্কার দিয়েছেন। যেমন অসমীয়া লেখক শ্রীভবেন্দ্রনাথ সাইকিয়া এবং ওড়িয়া লেখক শ্রীকিশোরী-চরণ দাসকে আমরা যতদূর জানি, ছোট গল্প রচনার জন্য আকাদমি পুরস্কার ইতিপূর্বে দেওয়া হয়নি। তবশ্য এ-ধারণা ভুলও হতে পারে, কেননা প্রায় আঠারোটি ভাষায় যতগুলি পুরস্কার দেওয়া হয় তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে পাওয়া যায় না। ছোট গল্পের এই দুর্দিনে দুটি গ্রন্থ—অসমিয়া ও ওড়িয়া ভাষার—যে সম্মান অর্জন করল তার জন্য আমরা আনন্দিত। লেখকদের অভিনন্দন জানাই।

হিন্দী সাহিত্যের জন্যে পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীযশপাল। তিনি হিন্দী সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক; দীর্ঘদিন সাহিত্যের সেবা করছেন। উপন্যাস রচনার জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করে আকাদমি শ্রীযশপালকে যথার্থ সম্মানই দিয়েছেন।

ইংরেজী ভাষায় এবার যে গ্রন্থটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে সেই গ্রন্থটির কথা অনেকেই জানেন। শ্রীসর্বপল্লী গোপালের জওহরলাল নেহেরু—এই জীবনচরিতটি পুরস্কৃত হয়েছে।

সংস্কৃত, তামিল ও তেলেগু ভাষায় এবারে কোনো পুরস্কার দেওয়া হয়নি। আকাদমি পুরস্কারের যোগ্য গ্রন্থ ওই ভাষাগুলিতে এবারে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

বইয়ের কালোবাজার

কোনো কোনো বই, বিশেষ বিশেষ কারণে, সাধারণত নিষিদ্ধ হলেই তার বেচাকেনা চলে লুকিয়ে। দামও বাড়ে; খদ্দের বুঝে গলা কাটা হয়। কিন্তু যে সব বই নিষিদ্ধ হবার কোনো কারণ নেই—সেই সব বইয়েরও কালোবাজারী কেন হয়? সম্প্রতি এখানকার একটি ইংরেজী দৈনিকে এক খবর বেরিয়েছে। খবরটি মস্কোর। ওই খবরটি পড়লে বোঝা যায় মস্কোতে ডেকারঝিনিস্কি স্কোয়ারে এই রকম এক কালোবাজারী বই-বাজার আছে। মজার বিষয়, রুশ সিকিউরিটি পুলিশ—বহুখ্যাত কে জি বি'র সদর দপ্তরের ঠিক উলটো দিকেই এই বাজার। সেখানে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, দর্শনের এবং অন্যান্য নানা ধরনের বই কিনতে রবিবার সকালে বহু বই-প্রেমিক এসে হাজির হয়। বই-প্রেমিকদের এই ভিড় রীতিমত দেখার মতন। এখানে এলে যে নতুন বই পাওয়া যাবে তা নয়, সঠিক দামেও বই পাবার সম্ভাবনা নেই, হেমিংওয়ের কোনো একটি উপন্যাসের দাম হয়ত হবে ২০ রুবেল মানে আড়াই শ' টাকা। হাত ফেরতা কোনো বই—তাও যদি উপন্যাস হয়—আড়াশ শো টাকা দিয়ে কেনার মতন মানুষ ক'জন আছে? আশ্চর্য কথা, রাশিয়ার আছে। দুশো আড়াই শোতেও যেন তাদের আপত্তি নেই।

রাশিয়ায় কী বইয়ের দুর্ভিক্ষ লেগেছে? এক অর্থে লেগেছে। যেসব বই সাধারণত দুনিয়ার দেশে পাওয়া যায় তার পনেরো আনাই গণ-সাহিত্য, মার্কসীয় বই, পার্টির কর্মকর্তাদের বক্তৃতা কিংবা টেকনিক্যাল বই। এ-সব বই পড়ার আগ্রহ পাঠকের কম। বাইরের বইও পাবার মত উপায় নেই, কেননা সেখানে রাষ্ট্র রয়েছে। আবার রাষ্ট্রের মারফতই ওখানে বই ব্যবসা চলে প্রধানত। কাজেই অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যা জোটে তাই দিয়ে পাঠকদের প্রয়োজন মেটাতে হয়। কথাটা এই যে, চাহিদা বেশী, আমদানি খুব কম—কাজেই বইয়ের বাজার সেখানে এত চড়া। কে জি বি-র লোকেরাও নাকি এসব বইয়ের খদ্দের। একটা কথা অবশ্য ঠিক, বেআইনী বই কদাচিত দেখা গেলেও এই বই-বাজারে যা বিক্রি হয় তা কিন্তু আইনসঙ্গত বই—অর্থাৎ যা বিক্রি করা নিষিদ্ধ নয়।

আমরা, বাংলা বইয়ের পাঠকরা এমন একটি বাজার কল্পনাও করতে পারি না। বরং আমরা জানি, প্রকাশক বই বেচার জন্যে শতকরা তিরিশ চল্লিশ টাকা কমিশন দিতেও রাজী—তবু পাঠক নেই।

অভিনন্দ

(ক্রম ৩৬১১৩)

এমনিতে এ পোষাক আপনি রোজ পরতে পারেন কিন্তু তবুও এ পোষাক সবচেয়ে চমৎকার। নতুন দশকের গোড়ার দিকের পোষাকের চেয়ে এখন অনেক হাল্কা রঙের পাওয়া যায়। এর স্টাইল ও লোভনীয় আর সেলাই ও চমৎকার নতুন ঢঙের।

যেখানে পুরুষের পোষাকের কথা আসে, সেখানে রঙ আর বুনোটের পথ এর ছিটের কাপড় ও আপনার পছন্দ হবে মিল মিলে, হাল্কা হাল্কা ··একের সঙ্গে অন্যের ম্যাচ করা রঙ।

মেয়েদের জন্যে বড় ছড়ানো কলার এবং লম্বা হাতার ব্লাউজ-যাতে ওঁদের গলা আর ঘাড় আরও আকর্ষক দেখায়।
পলিয়েস্টার কটনের তৈরী প্রীট দেওয়া মিডি স্কার্ট যাতে লাগানো আছে ফ্ল্যাপ দেওয়া পকেট আর এই কাপড়ের তৈরী বেল্ট।
পুরুষদের পোষাকে লাইন বিহীন সার্ট-জ্যাকেট স্যুট···ফ্রেঞ্চ স্টাইলে, ডাবল বুতাম আর সুন্দর সুন্দর অপরূপ পকেট।

Interpub/BB/2/76 Ben

বিশ্ববিজ্ঞান

সৌর শক্তির জন্যে চাষ

হিসেবটা সংক্ষেপে এই রকম : এক পাউণ্ড শুকনো গাছপালা নিয়ে আপনি যদি খোলা বাতাসে পোড়ান, তা হলে পাবেন ৭৫০০ ব্রিটিশ থার্মাল একক পরিমাণ উত্তাপ শক্তি। উল্লেখ্য, এক পাউণ্ড জলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বাড়াতে যতটা উত্তাপের প্রয়োজন, তাকেই বলা হয় এক ব্রিটিশ থার্মাল একক উত্তাপ। বায়ুবন্ধ আধারে এক টন শুকনো গাছপালা উত্তপ্ত করলে পাওয়া যায় ১·২৫ ব্যারেল জ্বালানি তেল, ১২০০ ঘনফুট জ্বালানি গ্যাস এবং ৭৫০ পাউণ্ড উচ্চমানের কাঠ-কয়লা। জ্বালানি হিসেবে যা সমপরিমাণ সাধারণ কয়লার সমান।

এ সব দেখে পৃথিবীর কোন কোন দেশের বিজ্ঞানীরা মানব কল্যাণে কম খরচে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানর ব্যাপারে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখন ভাবতে শুরু করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, পৃথিবীর তাবৎ শক্তির মূল উৎস তো সূর্য! উদ্ভিদ অথবা প্রাণী, সৌরশক্তি ছাড়া এদের কারোরই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। উদ্ভিদের কথাই ধরুন। গাছের পাতায় (কোন কোন গাছের কাণ্ড এবং শাখা প্রশাখাতেও অবশ্য) থাকে ক্লোরোফিল নামে এক ধরনের সবুজ কণা। পাতায় সূর্যের আলো এসে পড়লে ক্লোরোফিল উদ্দীপ্ত হয়। সৌরশক্তির সাহায্যে ক্লোরোফিল তখন পাতার কোষের মধ্যে বাতাস থেকে সংগৃহীত কার্বন ডাই-অকসাইডকে জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করে—ধাপে ধাপে—কার্বহাইড্রেট বা শর্করা। বিভিন্ন রকমের শর্করা যাদের বেশির ভাগ সেলুলোজ। উদ্ভিদ এই শর্করা থেকে তার জৈবিক কাজকর্ম চালানর জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন সেটা সংগ্রহ করে নেয়। এই শর্করা বেশির ভাগই সেলুলোজ, লিগনিন প্রভৃতি হিসেবে উদ্ভিদ দেহে জমতে থাকে। জমে তাদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটায়।

যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলো কার্বন ডাই-অকসাইড এবং জলের পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে শর্করা তৈরি করে তার নাম ফটোসিনথেসিস বা সালোক সংশ্লেষণ। এই বিক্রিয়ায় সৌরশক্তির খুব বড় রকমের অংশ কাজে লাগান যায়, তা বলব না। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন অনুকূল পরিবেশে গাছের বৃদ্ধির হার যখন সব চাইতে বেশি, তখনও সৌরশক্তির মাত্র এক শতাংশ এই কাজে খরচ হয়ে থাকে। অর্থাৎ গাছের পাতায় যে পরিমাণ সৌর-শক্তি এসে পড়ে, তার এক শতাংশ মাত্র সঞ্চিত হয় লিগনিন এবং সেলুলোজের মধ্যে। কাঠ বা গাছের শুকনো অবশেষ পুড়িয়ে যে উত্তাপ পাওয়া যায় তার উৎস এই সৌরশক্তি।

এই শক্তি থেকে যদি আমাদের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করতে হয় তা হলে হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে কি রকম?

সম্প্রতি 'এনার্জি অলটারনেটিভস : এ কমপারেটিভ স্টাডি' নামে একটি বই চোখে পড়ল। বইটির সংকলক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'দ্য সায়ান্স অ্যাণ্ড পাবলিক পলিসি প্রোগ্রাম, ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়'। কতটা বিদ্যুৎ-শক্তি তৈরি করতে কি পরিমাণ শুকনো গাছপালা দরকার এই বই-এ তার আভাস দিয়েছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। তাঁদের মূল বক্তব্য, ধরা যাক বছরে প্রতি একর থেকে শুকনো গাছপালা পাওয়া গেল ১০ থেকে

বছরের পর বছর এইভাবে কৃত্রিম বন তৈরি করে সর্বসাধারণের প্রয়োজনে সৌর-শক্তিকে কাজে লাগানর কথা ভাবছেন দেশ বিদেশের বিজ্ঞানীরা।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩০ টন। সে ক্ষেত্রে সারা বছর ধরে নাগাড়ে ১০০ মেগাওয়াটের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখতে যে পরিমাণ গাছপালা দরকার তার উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন হবে ২৫ থেকে ৫০ বর্গমাইল জমি।

শুনতে সহজ হলেও, এর ভালমন্দ সব দিকটাই বিশেষজ্ঞরা এখন খতিয়ে দেখছেন। জমির কথাই ধরা যাক। সমালোচকরা বলছেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়াতে হচ্ছে খাদ্যের উৎপাদন। ফলে চাষের জমির পরিমাণ বাড়াতে হচ্ছে দিন দিন। এর পর আছে পশুখাদ্য। গরু, ভেড়া, ছাগল এদের খাবার উৎপাদনের জন্যেও দরকার প্রচুর জমি। প্রয়োজনীয় কাঠের জন্যে বড় বড় বন জিইয়ে রাখতে হয়। তার জন্যেও জমির প্রয়োজন। এর পর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালাতে গিয়ে যদি বাৎসরিক চাষ করতে হয়, অত জমি পাওয়া যাবে কোথায়?

সমালোচকদের উত্তরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঠিক কথা। তবে একথাও তো ঠিক, পৃথিবীতে এমন এমন অঞ্চলও আছে, যেখানে না জন্মায় খাদ্যশস্য, না জন্মায় বন সম্পদ গড়ে তোলার মত গাছপালা। ঊষর জমি। বৃষ্টিপাত কম। পতিত হিসেবে তারা পড়ে রয়েছে বছরের পর বছর। পশুখাদ্যও সেখানে জন্মায় না। এ ধরনের জমিও তো চেষ্টা করলে কাজে লাগানো যায়। এই সব জমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর গাছের চাষ করা যেতে পারে। যাদের পেছনে সারের খরচ নেই। কৃত্রিম সেচেরও দরকার হয় না। তবে হ্যাঁ, এ সব ব্যাপারে এমন ধরনের গাছ নির্বাচিত করতে হবে যাদের বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ওই গাছপালা দিয়ে তৈরি করতে হবে এক একটি বন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক একটি বন থেকে সংগ্রহ করা হবে কাঠ এবং গাছপালার অবশেষ। তারপর সেখানে আবার নতুন করে গাছের চারা বোনার কাজ চলবে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে সাধারণ চাষবাসেরই মত। বছরের এক-একটি সময়ে যেমন ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি বোনা হয় খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে, ঠিক তেমনি শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনে নিয়মিত সময় অন্তর রোপণ করা হবে এক এক ধরনের গাছ।

কি কি ধরনের গাছপালা শক্তি উৎপাদনের জন্যে কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে 'এনার্জি অলটারনেটিভস: এ কমপ্যারিটিভ স্টাডি' নামক ওই বইটিতে। যেমন ধরুন, ইউক্যালিপটাস। এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০ রকম ইউক্যালিপটাস গাছের সন্ধান দিয়েছেন উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা। এ সব গাছ পৃথিবীর গরম আবহাওয়া অঞ্চলে জন্মায়। আবহাওয়া শুকনো থাকলে ক্ষতি নেই। এমন কি যে সব অঞ্চলে বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০ ইঞ্চি বা তারও কম সেখানেও ইউক্যালিপটাসের বন থেকে বছরে একর প্রতি ৮ থেকে ২৫ টনের মত কাঠ এবং পাতা ডালপালা পাওয়া যেতে পারে। এক কথায় যাদের বলা হয়ে থাকে বাইওমাস বা জৈবিক বস্তু। এ ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যে নাম করতে হয় আখের। হিসেব, আখের ক্ষেত থেকে বছরে একর প্রতি জৈবিক বস্তু পাওয়া যেতে পারে ১২ থেকে ৫০ টনের মত। রস বের করার পর ছিবড়ে মিলিয়ে যা পড়ে থাকে জৈবিক বস্তু বলতে এখানে তার কথাই বলা হচ্ছে। বজরার জমি থেকে বছরে একর প্রতি জৈবিক বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব ৮ থেকে ৩০ টন। সূর্যমুখী ফুলের জমি থেকে একর প্রতি উৎপাদন ১০ থেকে ২০ টন। আর অ্যালজী বা সমুদ্র-শৈবালের ক্ষেত্রে প্রতি একরে এই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ১৫ থেকে ৩০ টনে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সূর্যের আলো বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চলে অ্যালজীর উৎপাদনের হার আরও বাড়িয়ে তোলা অসম্ভব হবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও এ সব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা চলছে। এতদিন চাষবাস বলতে আমরা প্রধানত খাদ্যশস্যের কথাই ভেবে এসেছি। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষকে মাথা ঘামাতে হবে আর এক ধরনের চাষের কথা ভেবে। যাকে আমরা হয়ত নাম দিতে পারি 'শক্তির জন্যে চাষ' বা 'এগ্রিকালচার ফর এনার্জি'।

বলা বাহুল্য, শক্তির বিকল্প উৎস হিসেবে সূর্যকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে

গত এক দশকে পৃথিবীর সর্বত্রই নানা-ভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। এখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে, শুধু চেষ্টা নয়, যেভাবেই হোক শক্তির এই আদি উৎসটির সাহায্যে সাধারণ মানুষও যাতে উপকৃত হতে পারে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন। এমন ধরনের উদ্ভাবন, যাতে খরচ পড়বে কম এবং যা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যও বটে।

এখন মূল লক্ষ্য দুটি। এক, সূর্যের উত্তাপকে সরাসরি কাজে লাগানো অথবা সেই উত্তাপের সাহায্যে জলীয় বাষ্প তৈরি করে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করা। দুই, সরাসরি সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগানো।

মুশকিল হয়েছে এই শেষোক্ত ব্যাপারটি নিয়ে। সূর্যের আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্যে সিলিকন সৌর তড়িৎ কোষের মত নানারকম পদ্ধতি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এতে খরচ পড়ে অনেক বেশি। প্রতি ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্যে প্রাথমিক ব্যয় ২৭০ টাকার মত। যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। বরং সূর্যের উত্তাপকে সরাসরি ব্যবহার করার অথবা সেই শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহ করার ব্যাপারটাকেই এখন অনেকে বাস্তবসম্মত এবং লাভজনক বলে মনে করছেন।

সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা একটি অভিনব পদ্ধতি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। পদ্ধতিটি এই রকম। সূর্যের উত্তাপ সমুদ্রে এসে পড়ে। সেই উত্তাপের বেশ কিছু অংশ সমুদ্রের জলে জমাও হয়। এক-এক অঞ্চলে সূর্যের কিরণ এক-এক পরিমাণ হওয়ার দরুন, সমুদ্রের জলের উষ্ণতা কোথাও বেশি, কোথাও কম। দেখা গেছে, পৃথিবীর কর্কট এবং মকর ক্রান্তি অঞ্চলের মধ্যে সাগর এবং মহাসাগরের ওপরের অংশের জলস্তরের গড় তাপমাত্রা ৭৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এবং ৩২৮০ ফুট গভীর স্তরের তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এ কথা ভেবে মার্কিন বিজ্ঞানীরা বিশেষ এক ধরনের বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। এই যন্ত্রে থাকবে এক-একটি বড় বড় আধার। পাম্পের সাহায্যে সেই আধারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হবে এমন ধরনের তরল পদার্থ যা খুব কম তাপমাত্রাতেই বাষ্পে পরিণত হয়। আধারগুলির চারপাশে প্রবাহিত করা হবে সমুদ্রের উপরের স্তরের জল। যার তাপমাত্রা ৭৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ওই উষ্ণতায় আধারগুলির মধ্যে প্রবাহিত তরল পদার্থ রূপান্তরিত হবে বাষ্পে। আপাতত এর জন্যে ওঁরা 'ফ্রেয়ন' নামক রাসায়নিক যৌগকে কাজে লাগাতে চান। যা ৭৭ ডিগ্রির অনেক নিচের তাপমাত্রাতেই বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্পের সাহায্যে ঘোরানো হবে টারবাইন। কয়লার উত্তাপের সাহায্যে জলীয় বাষ্প তৈরি করে যে পদ্ধতিতে এখনকার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে টারবাইন চালানো হয়, ঠিক সেই ভাবে। টারবাইনের সঙ্গে লাগানো জেনারেটর থেকে উৎপাদিত হবে বিদ্যুৎশক্তি। টারবাইন ঘুরিয়ে উচ্চ চাপের ফ্রেয়ন গ্যাস টারবাইন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলে তাকে পাম্পের সাহায্যে সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হবে নলের মধ্যে দিয়ে, যেখানে তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রির মত। এই তাপমাত্রাই ফ্রেয়ন তরলে রূপান্তরিত হবে। সেই তরল ফ্রেয়নকে আবার বাষ্পে রূপান্তরিত করে চালানো হবে টারবাইন। আর এ কাজ চলবে চক্রবৎ। মার্কিন বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ১৯৮৫ সালে এই পদ্ধতির সাহায্যে তাঁরা মোট ৪০টি উৎপাদক কেন্দ্র চালাতে পারবেন। যাদের এক-একটির বিদ্যুৎশক্তি

উৎপাদনের ক্ষমতা ২৫ মেগাওয়াট। এবং উৎপাদনের পরিমাণ মোট গিয়ে দাঁড়াবে ১০০০ মেগাওয়াটের মত।

*

সুখের কথা, সূর্যকে বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে কৃত্রিম উপায়ে মানবকল্যাণে কার্যকর করে তোলার জন্যে ভারতেও জোড়-জোড় চলছে যথেষ্ট। ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরি দপ্তর এ ব্যাপারে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজেও হাত দিয়েছে। গত ২৯, ৩০ নভেম্বর, ১ ডিসেম্বর কলকাতায় সৌরশক্তি বিষয়ক গবেষণা এবং তার নানারকম সমস্যার দিক নিয়ে আলোচনা করার জন্যে 'সোলার এনার্জি সোসাইটি অব ইনডিয়া'র উদ্যোগে সর্ব-ভারতীয় কনভেনশন হয়ে গেল। কনভেনশনের প্রাক মুহূর্তে সোসাইটির সম্পাদক ডঃ এস দেব-এর সঙ্গে আমাদের সৌরশক্তি বিষয়ক গবেষণা সম্পর্কে কিছু আলোচনাও করেছিলাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ দেবের পরিচালনায় সৌরশক্তি নিয়ে গবেষণায় কাজ চলছে। কয়েকজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ বিজ্ঞানীও এ কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন দেখলাম। সৌরশক্তি থেকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্যে আধুনিকতম পদ্ধতিতে তাঁরা গবেষণা চালাচ্ছেন। যা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক।

কনভেনশনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ। এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে শ্রীপন্থ বললেন, সৌরশক্তিকে মানবকল্যাণে কাজে লাগানোর জন্যে যতরকম বাস্তবসম্মত পদ্ধতি এ পর্যন্ত জানা গেছে, তার সব কিছুই খতিয়ে দেখছেন আমাদের বিজ্ঞানীরা। আমরা বিশেষ করে ভাবছি সেই সব দুর্গম অঞ্চলের কথা যেখানে লাইন টেনে তাপবিদ্যুৎ বা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে বিদ্যুৎশক্তি পেঁছে দেয়া সম্ভব নয়। চাষের জন্যে সারা ভারতে এখন পাম্প চালানো হচ্ছে ৫০ লক্ষের মত। আগামী দশ পনের বছরে এই সংখ্যা আরও কয়েক লক্ষ বেড়ে যাবে। এখন পাম্প চালানো হয় ডিজেল এবং প্রচলিত শক্তিকেন্দ্রের বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে। আমরা চেষ্টা করছি, সৌরশক্তির সাহায্যে আগামী দিনের পাম্পগুলি চালানোর। পাঁচ অশ্বক্ষমতার পাম্প তৈরির কাজ শুরুও হয়েছে। সৌরশক্তির সাহায্যে এ সব পাম্প চালানো যাবে। অন্তত আমাদের বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল দেখে এই আশা এখন উড়িয়ে দেয়া যায় না।

শ্রীপন্থ বললেন, মাদ্রাজের ইনডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনলজি এবং ভারত ইলেকট্রনিকস ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৭-এর শেষে প্ল্যান্টটি চালু হওয়ার কথা আছে।

প্রশ্নঃ ইতিমধ্যে ভবনগরের একটি গবেষণাগার সোলার কুকার তৈরির ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। এই কুকারে বিনে খরচে, মানে শক্তির জন্যে কোনরকম খরচ না করে দৈনন্দিন রান্নাবান্না চালানো যায়। সাধারণ মানুষের কাছে এ ধরনের কুকার পেঁছোচ্ছে না কেন?

শ্রীপন্থঃ অজ্ঞতাই এর কারণ। যে কোন নতুন জিনিস সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা না গেলে তাঁদের তরফ থেকে কখনই আগ্রহ দেখা যাবে না। এর জন্যে দরকার প্রচার। এ দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার এবং প্রচার মাধ্যমের। কেন, গুজরাট মহারাষ্ট্রে তো সোলার কুকারের চল বাড়ছে দিন দিন। জনসাধারণ আগ্রহী হলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও সোলার কুকার উৎপাদনে এগিয়ে আসবে।

কথা বলেছিলাম ভারত সরকারের বিজ্ঞান এবং কারিগরি দপ্তরের সেক্রেটারি এবং বিজ্ঞানী ডঃ এ রামচন্দ্রনের সঙ্গে। তিনি বললেন, ভারতে পরিষ্কার আকাশ থাকে গড়ে বছরে ৩০০ দিন। আর ওই সময় প্রতি বর্গমিটার জায়গায় সূর্যের উত্তাপ এসে পড়ে ৬৫০ ক্যালোরির মত। এই উত্তাপকে যাতে শস্য শুকিয়ে নেয়ার কাজে লাগানো যায় তার জন্যে আমরা চেষ্টা করছি। এ বছর জানুয়ারি মাসে দৈনিক ৫০০ কিলোগ্রাম শস্য শুকানোর মত একটি সৌর-তাপ যন্ত্র চালুও হয়েছে। মাদ্রাজের আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছেন দৈনিক এক টন শস্য শুকানোর যন্ত্র। দেখা গেছে, সৌরশক্তির সাহায্যে এই ভাবে শস্য শুকানোর কাজটি অনেক লাভজনক হয়। এতে অপচয়ও হয় কম।

বন তৈরি করে শক্তি উৎপাদন করার ব্যাপারে আমরা কতটা চেষ্টা করছি? পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু করে দেশে তো এখনও প্রচুর জমি পতিত রয়েছে। ওই সব জমিতে বন তৈরি করে শক্তি উৎপাদন করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তরে ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, এ নিয়েও গবেষণা চলছে। দেখা দরকার কোন কোন গাছের বন লাভজনক। শেষ পর্যন্ত ওইভাবে শক্তি উৎপাদন করতে গিয়ে চাষবাস উঠে গেল এমন তো হতে দেয়া যায় না!

কনভেনশনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞানীরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের কথা শুনে মনে হল, অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সৌরশক্তির চল এদেশেও হতে চলেছে। তবে একথাও মনে হল এ ব্যাপারে জনসাধারণেরও আগ্রহ দরকার। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করার মত সৌর-বিজ্ঞানীরা যে সব জিনিস তৈরি করেছেন তাঁরা এখনও এগিয়ে আসছেন না কেন— অন্তত সে সব পরখ করে দেখতে? হলফ করে বলা যায়, এতে তাঁরা উপকৃতই হবেন।

সমরজিৎ কর

আলোচনা

চলতে চলতে

দিল্লী থেকে বোম্বাই যাবার পথে একটি ভারতীয় ছেলের যে কাহিনী বিমল মিত্র লিখেছেন (অর্থাৎ ছেলেটি তাঁকে যা বলেছে) সে সম্বন্ধে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই। ছেলেটির বয়স কুড়ি, পড়াশুনা কিছুই করেনি, তারপর আবার বিনা পাসপোর্ট ও ভিসায় কোয়েতে পালিয়ে যায়, সেখানে চায়ের দোকানে কাজ, পিয়ন, মিস্ত্রী, হেড মিস্ত্রী ও শেষ পর্যন্ত স্পেশালিস্টও হয়ে প্রতিদিন ১৮০০ টাকা (প্রায় ২০০ ডলার প্রতিদিন) রোজগার করে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে কোনরকম পড়াশুনা না করে, কোনও ট্রেনিং না নিয়ে ১০।১২ বছর থেকে ২০ বছরের মধ্যে। পাঠককে অনুরোধ, ছেলেটির বিবৃত ঘটনাটি আবার পড়ে দেখুন। বিনা পাসপোর্ট বা ভিসায় বিদেশে পালিয়ে হয়তো কিছু দিন পুলিসের চোখ এড়িয়ে চায়ের দোকানে কাজ করা যায়। কিন্তু একটা বিদেশী কোম্পানী এসব ছাড়া তাকে কি ভাবে কাজ দিল বা কোয়েত গভর্নমেন্টও শেষ পর্যন্ত একজন illegal immigrant কি করে ভিসা দিল এবং ভারত গভর্নমেন্টও কি করে পাসপোর্ট দিল সেটা খুবই আশ্চর্য লাগছে। এ অবস্থায় যে-কোন বিদেশী গভর্নমেন্ট তাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবেই।

কিছু দিন আগে কলকাতা থেকে একটি ছেলে সুইডেনের গোথেনবার্গে কাজের সন্ধানে এসেছিল। ছেলেটি কলকাতায় একটি বিখ্যাত জুতা কোম্পানীতে কাজ করে এবং বাড়ির অবস্থাও বেশ ভাল। ছেলেটি ১০ হাজার টাকা ব্যয় করে রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল—পরে 'রিটার্ন' ফেয়ার' ফেরত নেবে। ছেলেটির বৈধ পাসপোর্টও ছিল ও সুইডেনে তার বোন তাকে স্পনসরও করেছিল। সুইডেনে ঢুকতে তিন মাস কোনও ভিসা লাগে না এবং 'ওয়ার্ক পারমিট' ছাড়া কোনও কাজ করা যায় না।

সুইডেনে তার বোন স্পনসর করা সত্ত্বেও পুলিস ছেলেটিকে অত্যন্ত অপমান করে একদিন হাজতে রেখে সুইডেন থেকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। কারণ, ছেলেটির কাছে সুইডেনে থাকার মতন যথেষ্ট টাকা ছিল না। এইরকম ঘটনা শুধু সুইডেনে নয়, অন্য দেশ থেকেও শোনা যাচ্ছে প্রায়ই। বিদেশ সম্বন্ধে এইরকম ভুল ধারণার পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন মনে করি।

সমীরকুমার মিত্র
গোথেনবার্গ,
সুইডেন।

॥ ২ ॥

শ্রীবিমল মিত্র "চলতে চলতে" এই পর্যায়ে লিখেছেন, "আমরা তখন চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে বেড়াতে পারতাম না, ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে পারতাম না" ইত্যাদি। ভারতবর্ষে কখনও এমন অবস্থা ইংরেজ রাজত্বে ছিল না। যদিচ্ছ বিচরণ করার নিষেধ কোথাও ছিল না। পয়সা দিলে ফার্স্ট ক্লাসে অবাধে চড়া যেত। আমরা অন্ত্যজ ছিলাম না—ছিল প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক।

গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ বইটিতে কোথাও মরিসাস দ্বীপে ২১ দিন থাকবার কথা নাই। এবং ১৯০১ সনে তিনি সাউথ আফ্রিকায় ব্যারিস্টারি করতেন। "সত্যাগ্রহের" অবস্থা তখনও সঠিক দানা বাধে নি। মরিসাস তখন সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ অর্থাৎ কোথাও কোন প্রতিবাদ বা অসন্তুষ্টির ঢেউ ওঠে নি। সেখানে গান্ধীজী কখনও স্কুল কলেজ তৈরি করার কথা বলতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে শেষ কথাটি "অত তাড়া কেন?" শুনতে ভাল কিন্তু সত্য নয়।

ফরাসীদের বিদ্রোহ আর নেপোলিয়নের যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজরা কেপ অব গুড্ হোপ, সিলোন, গায়ানা ইত্যাদি রাজ্য কিনেছে—এই তথ্য বিমলবাবু কোথায় পেলেন জানি না। সিলোন তো ভারতবর্ষের অঙ্গ। ভারত সাম্রাজ্য হাতে পেলে সিলোনও তাদের হাতে আসে। অন্য রাজ্যগুলি ইংরেজরা Colonial expansion হিসাবে বসবাস ও উন্নতির মাধ্যমে আয়ত্তে আনে। কেনবার কথা ওঠে কেন জানি না।

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
কলিকাতা-২৬

॥ ৩ ॥

শ্রীবিমল মিত্রের ভ্রমণোপন্যাস 'চলতে চলতে' দেশ-এর প্রতিটি সংখ্যায় বেশ কৌতূহল নিয়ে পড়ছি। কিন্তু পাঠক

হিসেবে গ্রুটি কয় বক্তব্য নিবেদন না করলে কর্তব্যের ত্রুটি থেকে যায়। লেখকের মরিশাসের সঙ্গে ভারতের তুলনামূলক আলোচনা বেশ কিছুটা একপেশে। খুব ভালো কথা যে, লেখক মরিশাসের ভৌগোলিক অবস্থিতি ও বিবরণের কোথাও ফাঁক রাখেননি এবং বর্ণকিঞ্চিৎ ইতিহাসও দিয়েছেন। অর্থনৈতিক ইতিহাসের টানাপোড়েন সম্বন্ধে শ্রীমিত্র তেমন কোনো উচ্চবাচ্য না করলেও আমরা রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হইনি। কিন্তু তিনি যখন লেখেন যে, মরিশাসের মানুষ জানে না ভিখিরি কাকে বলে তখন বড়ই অস্বস্তিতে পড়ে যাই। লেখকের বক্তব্যের চুলচেরা বিচারের বিড়ম্বনায় আমার মতন ক্ষুদ্র মানুষের না যাওয়াই ভালো। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার যখন তিনি বলে ওঠেন যে, ম্যাট্রিক পাস করার পর ও-দেশের মানুষেরা দু-আড়াই হাজার টাকার চাকরি সহজেই পেয়ে যায় তখন একটি বিভ্রান্তির গোলকধাঁধায় বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু জিজ্ঞাসা থেকে যায়। মেনে নিলাম, সে-দেশের চোরেরা চুরি করে না বা তাদের নাগরিক অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু সে-দেশের ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটই কি উচ্চস্তরীয় চাকরির একমাত্র ছাড়পত্র? কিংবা কোনো কল-কারখানায় যদি ঠিক ওই অঙ্কের চাকরি চাইমাত্র পাওয়া যায় তা হলে সে-দেশের মুদ্রানীতি (monetary policy) কোনমুখী? আমার ধারণা, সর্বাংশে ভুল প্রমাণিত হোক যে, মরিশাস এক চরম সর্বনাশা মুদ্রাস্ফীতির কবলে ধুঁকছে! আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মাপদণ্ডের নিরিখে মরিশাস একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অর্ধবিকশিত (under developed) রাষ্ট্র। অর্ধবিকশিত রাষ্ট্রে বিদেশী পুঁজি কারণ-বিশেষে সক্রিয় থাকে। অনেক সময় প্রশাসনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু বেহিসেবী পুঁজির কল্যাণে মুদ্রাস্ফীতি হওয়াও বিচিত্র নয়।

মধু দে

দুমকা।

॥ ৪ ॥

শ্রীবিমল মিত্র রচিত ধারাবাহিক ভ্রমণ-কাহিনী 'চলতে চলতে' আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছি। গত ৪ঠা ডিসেম্বরের দেশ-এ প্রকাশিত তাঁর রচনায় তথ্যগত কয়েকটি ভুল চোখে পড়ল। এস ওয়াজেদ আলির বহুপঠিত 'ভারতবর্ষ' রচনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য পরিবেশন করেছেন। বাল্যকালে এস্ ওয়াজেদ আলি যখন কলকাতায় পড়াশুনা করতেন, বন্ধ মুদীর রামায়ণ পাঠের দৃশ্য তখন তাঁর চোখে পড়ত। বহুকাল পরে তিনি যখন আবার কলকাতায় ফিরে আসেন তখন সেই একই দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছিল। মুদী ও তার পুত্রের নামও বিমল মিত্র মহাশয়ের সম্পূর্ণ কল্পিত। 'বাবুর্চি' চরিত্রটিও তাঁর নিজস্ব আমদানী। হয়তো অতি ব্যস্ততার জন্য এইসব ছোটোখাটো ভুল তাঁর ঘটেছে। আশা করি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় এইসব ভুল শোধরানো হবে।

নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়

চিন্ময় বসু

কলিকাতা-৩৭।

সাংস্কৃতিক জীবনের বিপদ

বারোয়ারী পুজোর আসরে নতুন দেবতার আবির্ভাবে 'সাংস্কৃতিক জীবনের বিপদ' (সম্পাদকীয়—২৭-১১-৭৬) দেশ-সম্পাদকের সঙ্গে এই পত্রলেখককেও উদ্বিগ্ন করেছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে—পৌত্তলিকতা ও বহুদেবতাবাদ সমাজে সসম্মানে প্রচলিত থাকলে নিত্যনূতন দেবতার উদ্ভবকে রোধ করা যাবে কিভাবে? দুর্গা, কালী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, কার্তিক বিশ্বকর্মা ইত্যাদির পাশে শনি, ঘেঁটু বা ওলাইচণ্ডীর প্রতিষ্ঠা পেতেই বা বাধা কোথায়? গুরুবাদ আর অবতারবাদের অবাধ চর্চার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিত্যনূতন প্রত্যাদেশ আর স্বপ্নাদেশও চলতেই থাকবে। জন্ম-দ্বিশতবার্ষিকীর শব্দাড়ম্বর সত্ত্বেও এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, রাজা রামমোহনের পৌত্তলিকতা-বিরোধী একেশ্বরবাদকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। যে দেশের জন/সাংস্কৃতিক নেতারা দ্বারোদ্ঘাটনের দ্বারা বারোয়ারী পুজোকে উৎসাহ দেন, যে দেশের ধর্মাচরণে এখনও পশুবলির প্রচলন আছে, যে দেশের নাস্তিক কমিউনিস্ট পার্টিদের পর্যন্ত পূজামণ্ডপে মার্কসীয় পুস্তক প্রদর্শনী খুলতে রুচিতে বাধে না, সে দেশের গণ-সংস্কৃতিতে ঘেঁটু পুজোর প্রতিষ্ঠা হয়তো খুবই স্বাভাবিক।

কান্তি গুপ্ত
কলকাতা-৪৮

নীললোহিতের চোখের সামনে

২৫-এ সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'নীললোহিতের চোখের সামনে' লেখাটার সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রথমত, 'নিগ্রো' কথাটি আজকাল একদম অচল, সভ্য সংস্কৃত সমাজে এর আর কোন স্থান নেই। ঘৃণা, অত্যাচার ও কলঙ্কের স্বাক্ষর এই কথাটির বদলে 'কৃষ্ণকায় আমেরিকান' বা 'আফ্রো-আমেরিকান' আখ্যাটি বহুদিন চালু হয়ে গেছে। তাই আমাদের দেশের বহু প্রচলিত ও জনপ্রিয় পত্রিকায় 'নিগ্রো' কথাটির ব্যবহার কানকে ও মনকে খুবই পীড়িত করেছে।

একটি গল্পের প্রসঙ্গে বলা হলেও, ৩৯৫ পাতায় 'বিশেষত সাদা মেয়েদের প্রতি ওদের অসম্ভব লোভ ও ক্রোধ আছে' এই অসত্যটির মধ্য দিয়ে একটি সমগ্র জাতির প্রতি যে অন্যায় ও অবিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এই কথাগুলি যে বর্ণবিদ্বেষ-প্রসূত এবং এর যে কোনও তথ্যগত ভিত্তি নেই তাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ, Frederic Storaska, যিনি এ-দেশের সমগ্র নারীজাতির লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরে নারীদের রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন তাঁর বক্তৃতা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর How to Say, 'No' to a Rapist and Survive বইটিতে পরিষ্কার দেখিয়েছেন যে নারীর ওপর এদেশে যে বলাৎকার ঘটে থাকে, তার শতকরা ৮০ ভাগই স্ববর্ণ বা স্বজাতির দ্বারা। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত বাগ্মী বার্কের বাণী স্মরণীয় : You cannot indict a whole nation. সব দেশ ও জাতির মধ্যে ভাল ও মন্দ মেশানো আছে। কাজেই এদেশের কালো মানুষকে আলাদা করে নিয়ে তার ওপর মনগড়া অসত্য চাপিয়ে দেওয়াটা অযৌক্তিক ও অন্যায়।

পার্বতীকুমার সরকার
নিউ ইয়র্ক স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ পলজ

ইতালীয় ভাষায় 'শ্রীকান্ত'

২৩ অকটোবর প্রকাশিত দেশ পত্রিকায় শরৎ সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে শ্রীঅনিল রায়চৌধুরী 'শ্রীকান্ত'র ১ম পর্ব ইতালীয় ভাষায় কে অনুবাদ করেছিলেন জানতে চেয়েছেন। অনুবাদকের নাম না জানাতে পারলেও এ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ তথ্য রম্যাঁ রলাঁ তাঁর দিনপঞ্জীতে (সম্প্রতি মূল ফরাসী থেকে সর্বপ্রথম অন্য ভাষায় অনূদিত) 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থে লিখছেনঃ

'আগস্ট, ১৯২৬।

...গুয়ানিজেলের সঙ্গে একসঙ্গে পড়লাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' (ইতালীয় তর্জমায়)। কিছু কিছু ঘটনায় মুগ্ধ হলাম (গঙ্গার উপর রাত্রিগুলো এবং শ্মশানে দুই রাত্রি)......'

গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-১৯

গানের আসর

সঙ্গীতের শিক্ষা পরিকল্পনা

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি উপন্যাসে বলেছিলেন, যারা উচ্চশ্রেণীর ডিগ্রীতে উঁচু মার্ক পেয়ে পাস করে তাদের পড়তে হয় বিস্তর এবং বুঝতে হয় অল্প। কথাটি অত্যন্ত সত্য। আসল বিদ্যার চেয়ে বিদ্যার গম্ভামারটা শুধু চোখই ধাঁধিয়ে দেয় না, মনটাকেও যথেষ্ট আত্মপ্রসাদে ভরে তোলে। এই ব্যাপারটা সাম্প্রতিককালে সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রেও ঘটছে, ফলে আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ের ভারে সঙ্গীতের বি-এ এম-এর ডিগ্রীও যথেষ্ট ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই বিষয়গুলির আশিভাগ সঙ্গীতের সঙ্গে সোজাসুজি সংশ্লিষ্ট নয় এবং এগুলির অনেকখানি আবার লুপ্ত সঙ্গীতের নিদর্শন, যা পুঁথিপত্রের অন্তর্গত হলেও গেয়ে বাজিয়ে দেখাবার মত পর্যাপ্ত নয়। কথা হচ্ছে, এইগুলির কতখানি শিক্ষার্থীদের শেখা আবশ্যক যা ওদের গান বাজনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগবে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সমস্তটাই পুরোপুরি পড়ে জানবার বস্তু, কিন্তু সঙ্গীত সেই পর্যায়ের নয়—তার গোটাটাই গেয়ে বাজিয়ে দেখাবার বস্তু। অতএব সঙ্গীতের থিওরি কতটা কীভাবে থাকা দরকার সেটা আমাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। যে ডাক্তারি পড়ে তাকে যদি একগাদা বই পড়তে দেওয়া হয় যা পরোক্ষভাবে তার কৌতূহল নিবৃত্তি করবে অথচ প্রযুক্তবিদ্যায় কাজে লাগবে না, তাহলে সেই উপপত্তি তার পক্ষে বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেসব জ্ঞানগর্ভ বস্তু তার ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত যখন সে ডাক্তারি ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে নানা বিষয় পড়বার যথেষ্ট অবকাশ পাবে। এই ক'বছর ধরে একাধিক ইউনিভার্সিটিতে সঙ্গীতের শিক্ষাক্রম যেভাবে নির্ধারিত হয়েছে তার সঙ্গে এই লেখক একেবারে অপরিচিত নন। বহু ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করে এবং বেশ কয়েকজন আচার্যস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার পর এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হয়েছে যে, এই রকম বইঘেঁষা থিওরির ভার থেকে ছাত্র সম্প্রদায়কে বহুল পরিমাণে মুক্তি দেওয়া দরকার। বর্তমানে এও দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিভার্সিটির পাসকরা ছেলেমেয়েরা উত্তম পর্যায়ের শিল্পী হতে পারছে না। তাদের চেয়ে সার্থকতর শিল্পীরা সম্পূর্ণ অন্য নিয়মে গুরুর অধীনে থেকে গানবাজনা শিখে এসেছে। পরীক্ষার খাতায় তারা চমকপ্রদ সাঙ্গীতিক খবরাখবর লিখতে সক্ষম নয় বটে কিন্তু হাতে-কলমে অনেক তৃপ্তিকর সঙ্গীত তারা শ্রোতাদের গোচর করে প্রচুর সাধুবাদ অর্জন করে। প্রশ্ন ওঠে কী হবে এত পড়াশোনা করে যদি যে জন্য তাদের শিক্ষা সেটাতেই তারা পৌঁছিয়ে থেকে গেল? আর এই পড়াশোনার ফলাই বা কি? এম-এ পাস করবার পর কিছু কিছু রিসার্চের ছাত্রছাত্রীকে জানবার সুযোগও এই লেখকের হয়েছে। তাদের অনেককে দেখা গেছে তারা এখান থেকে ওখান থেকে টুকে একটা নিবন্ধ খাড়া করেছে যার অনেক অংশ তারা নিজেও বোঝে না। সমগ্র রচনাই বহুক্ষেত্রে কাঁচা, পারম্পর্যবিহীন, যা এসব ক্ষেত্রে হতে বাধ্য। অথচ তারা ডক্টরেট অর্জন করছে এবং সেটা তাদের চাকরি এবং খ্যাতি দুটোই হাতের মুঠোয় এনে দিচ্ছে; কিন্তু শিক্ষাজগতে তাদের আধিপত্য সমগ্র সঙ্গীতবিদ্যার মানকে নিম্নাভিমুখী করে তুলবে না কি? অপটু শিক্ষক-শিক্ষিকার চেয়ে ক্ষতিকর উপাদান শিক্ষাজগতে আর কিছুই হতে পারে না। সঙ্গীতশিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে এখন থেকেই এই বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার যাতে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট প্রয়োজনকে সার্থক করে তুলতে পারে। সঙ্গীতের সিলেবাসে আজকাল মিউজিকলজি বলে একটা সাবজেক্টের খুব প্রভাব। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সব আধুনিক বিষয়গুলি নিরতিশয় বিভ্রান্তিকর—কেননা এগুলির কোনও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। একে এক হিসেবে অনেকটা ওমনিবাস এডুকেশন বলা যেতে পারে, কেননা বিভিন্ন বিষয়গুলোকে এলোমেলোভাবে এর অন্তর্গত করা হয়েছে। এস্থেটিকস নামক আর একটি বিষয়ও এই-রকম অনির্দিষ্ট পরিকল্পনার সংযোজন—যা শিক্ষার্থীদের সমূহ জটিল দার্শনিক তত্ত্বে নিয়োজিত করছে অথচ সেগুলি তাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক ছিল না। প্রাজ্ঞ সঙ্গীতবিদ পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এইসব ভেবেই তাঁর শিক্ষাক্রমকে থিওরির দিক দিয়ে খুব সরল রেখেছিলেন। তাই তাঁর আমলে যারা শিক্ষা পেয়ে বেরিয়েছিল তারা সঙ্গীতকলায় যথার্থ পারদর্শিতা অর্জন করতে পেরেছিল।

বর্তমান সঙ্গীতশিক্ষায় নাট্যশাস্ত্র,

সঙ্গীতরত্নাকর প্রভৃতি ভারি ভারি বই পড়ানো হয়। এর অধিকাংশই শিক্ষার্থীদের কাছে দুর্বোধ্য। রস, ধ্রুবা, জাতিগান, মার্গতাল, প্রবন্ধসঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে জানতে গেলে যে পরিমাণ অর্জিত বিদ্যা থাকা দরকার তা তাদের না থাকারই কথা। রস অলংকারশাস্ত্রের বিষয়-বস্তু; ধ্রুবা, জাতি, মার্গতাল বা প্রবন্ধ-সঙ্গীতের কোনটাই আজকাল আর আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানবার অবকাশ পাই না। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা হিসাবেই এগুলি আমাদের সঞ্চিত থাকে। এসব ব্যাপার খুব ভাল করে উপলব্ধি করতে গেলে সংস্কৃত কাব্য, অলঙ্কার, বিশেষ করে ছন্দশাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান থাকা দরকার। সেটা আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে কি করে আশা করতে পারি? অতএব যারা গাইয়ে বাজিয়ে হবে তাদের শাস্ত্রের এত গহনে প্রবেশ করবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না। এই সব বিষয় বা প্রাচীন ইতি-বৃত্ত বা মিউজিকলজির অন্তর্গত তাকে বরঞ্চ সম্পূর্ণ একটি আলাদা বিষয় করে যারা কেবলমাত্র থিওরির আলোচনায় যেতে চায় তাদের পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করা উচিত। এই বিভাগে যারা ভর্তি হবে তারা অবশ্যই সংস্কৃত নিয়ে গ্রাজুয়েট হবে নইলে কোনকিছুই উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। যারা গান গাইবে, বাজনা বাজাবে তাদের কোর্সে প্রয়োগবিদ্যাকে প্রধানতম স্থান দিতেই হবে এবং এ সম্পর্কে যেটুকু তত্ত্ব তাদের কাজে লাগবে কেবল সেটুকুই তাদের পাঠ্যের অন্তর্গত থাকা উচিত। তাহলেই তারা সার্থক আর্টিস্ট হয়ে উঠবে। বাংলা গান যারা শিখবে, তাদের ক্ষেত্রেও ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতি-হাস প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলেই মনে হয়, বরঞ্চ প্রাচীন বাংলা গানের কিছু নির্ভর-যোগ্য নমুনা বা উদাহরণ হিসাবে যেসব কম্পোজিশন এখনও পাওয়া যায়, সেগুলি তাদের শেখানো উচিত। তাহলে তারা নিজেরাই জানতে পারবে কিভাবে আমাদের সঙ্গীতের ক্রমোন্নতি ঘটেছে।

অর্থাৎ প্রয়োগ এবং তত্ত্ব—দুটিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া দরকার। প্রয়োগের সিলেবাস হবে একরকম এবং তত্ত্বের অন্যরকম যেটা প্রায় সবটাই থিওরে-টিক্যাল বলা চলে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী হবে তারাই যারা ভাল গাইতে বা বাজাতে পারে কিম্বা যাদের মধ্যে যথার্থ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। তত্ত্বের দিকে আসবে তারা যারা গান বাজনা বোঝে অথচ চিন্তা বা আলোচনার দিকেই বিশেষ-ভাবে আগ্রহী। পূর্বেই বলেছি এদের ক্ষেত্রে সংস্কৃত জানাটা একান্ত আবশ্যক। কারণ সঙ্গীতশাস্ত্র এমনভাবেই রচিত হয়েছে যে মোটামুটি ভাল সংস্কৃত না জানলে তাতে প্রবেশ করা আদৌ সম্ভব নয়। এস্থেটিকসের জন্যও সংস্কৃত জানা দরকার কারণ আমাদের রসতত্ত্বের বিচার সম্পূর্ণ অলংকারশাস্ত্রের অন্তর্গত। কেউ কেউ সঙ্গীতের সৌন্দর্যতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে পাশ্চাত্য সৌন্দর্যদর্শনকে শিক্ষার বস্তু করে তুলেছেন। আমাদের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত সঙ্গীত বা নাট্যের সঙ্গে যুক্ত সৌন্দর্যতত্ত্ব হচ্ছে আমাদের এস্থেটিকস। আমাদের চিন্তাটা আরম্ভ হয়েছে এখান থেকেই।

প্রয়োগের দিক থেকে ভাল গুরুর অধীনে শিক্ষার সুযোগ শিক্ষার্থীকে অবশ্যই দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এদিকে সর্বাগ্রে নজর দেওয়া দরকার। খুব বেশী রাগরাগিণী বা গান যে তাদের শেখা অত্যাবশ্যক তা নয়, কিন্তু যেটুকু তারা শিখবে তা উত্তমভাবে শিক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষাটা ইউনিভারসিটির ক্লাসে হলেও বিদ্যাটা বহুল পরিমাণে গুরুমুখী হবে। শিক্ষার্থীরা কিন্তু অবশ্যই একান্ত-ভাবে গুরুর অনুকরণকেই আদর্শ বলে গণ্য করবে না, তারা তাদের বিচারশক্তিও নিয়োগ করবে যাতে তাদের স্বকীয় ধ্যানধারণাও গড়ে উঠতে পারে। এটা পরীক্ষিত সত্য যে ভাল গুরু শিষ্যকে স্রষ্টা সঙ্গীতজ্ঞ করে তুলতে চান, তারা তাঁর প্রতিচ্ছবি হবে, এটা তাঁরা কাম্য বলে মনে করেন না। এর একটা সুফল হচ্ছে এই যে, এতে আমাদের সঙ্গী-তের একটা ট্রাডিশন বজায় থাকবে এবং সঙ্গীতশৈলী কিরকম হওয়া আবশ্যক সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা গড়ে উঠবে—এই-ভাবে সঙ্গীতের শিক্ষা ও প্রয়োগ কতক-গুলি সিসটেমে বিধিবদ্ধ হয়ে আপনা থেকেই একটি সুপরিকল্পিত ধারার প্রবর্তন করবে। ক্রমে এ সম্পর্কে আমাদের আরো কি কি দরকার সেটা উপলব্ধিগোচর হবে এবং সেইভাবে সিলেবাস সংশোধিতও হতে থাকবে।

শিক্ষার্থীদের উপর কতকগুলি বস্তু চাপিয়ে দিয়ে সিলেবাসের আড়ম্বর দেখানো যেতে পারে বটে, কিন্তু ইউনি-ভারসিটির গৌরব বাড়াবার পক্ষে এটি প্রশংসনীয় উদ্যম নয়। এর ফলে, কোনও শিক্ষাই পর্যাপ্ত হবে না এবং এরা না হবে গায়ক, না হবে পণ্ডিত। পরিণামে এম-এ ডিগ্রী সত্ত্বেও এরা কোথাও মর্যাদার আসন লাভ করতে পারবে না। এর চেয়ে প্রয়ো-জনীয় বিদ্যাটুকুই যাতে এদের অধিগত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য, যাতে তারা পাস করে বেরিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব হাতে-কলমে প্রমাণ করতে পারে। আশা করি সঙ্গীতশিক্ষাজগতের কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন।

শার্ঙ্গদেব

এই কলকাতায়

আলিপুর চিড়িয়াখানায় বিদেশী টিল পাখির ঝাঁক

ফটো : দেবীপ্রসাদ সিংহ

শীতের অতিথি পাখি

নানা রঙের ম্যাকাও, সাদা কাকাতুয়া ও মুনিয়া পাখির খাঁচার বাইরে কলকাতার চিড়িয়াখানায় আছে এক সর্পিল লেক বা জলাশয়, যার মুক্ত পরিবেশ পাখিদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষে অঙ্গুলিগ্রাহ্য যে কজন পক্ষীতত্ত্ববিদ আছেন তাঁরা জানেন সুদূর সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসা টিল বা বাঙালীর বহু পরিচিত 'বালিহাঁস' কয়েক মাসের জন্যে এই শীতে বাসা বাঁধে এখানে, এমনকি এখানেই কখনো কালেভদ্রে দেখা যায় সুদূর বৈকাল হ্রদের দুর্লভ টিল, ভারতবর্ষের উষ্ণ প্রদেশে যাদের দেখা পাওয়া বিরল সৌভাগ্যের বিষয় ছাড়া কিছু নয়। শীতে কলকাতার সম্ভ্রান্ত অতিথিদের মধ্যে আলিপুরের চিড়িয়াখানার এই পাখিদেরও আমি গণ্য করতে চাই। ঝাঁক বেঁধে হিমালয়ের ওপার থেকে ওরা ইতিমধ্যেই উড়ে আসতে শুরু করেছে, আসবে আরো আসবে, ডিসেম্বরের শেষে ভরে যাবে জলাশয়, তখন আগন্তুক পাখিরাই হবে চিড়িয়াখানার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। তার মানে এই নয় যে পিঁপড়েভুক আর্মাডিলো, টেপির কিংবা বাঘ-সিংহের প্রতি লোকের মনোযোগ থাকবে না; কিন্তু একথাও ঠিক যে বেশ কিছু পক্ষীগবেষককে বাইনোকুলার ও নোটবুক নিয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাবে লোকের আনাচে-কানাচে, যাঁরা স্নান-খাওয়া ভুলে সামনের কয়েক মাস শুধু কয়েকটি পাখির বিচিত্র আচার-আচরণকে তাঁদের ধ্যানজ্ঞান করে তুলবেন। জাগতিক অন্যান্য বিষয় তখন তাঁদের কাছে এতটা মূল্যবান মনে হবে না। বিচিত্র মহানগর এই কলকাতা, আর বিচিত্রতর তার মানুষ। টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে পাগল হয়ে উঠবে এখানে আবালবৃদ্ধবণিতা আর কয়েকদিন পরেই, কেউ বা মজবেন গলদা চিংড়ি, ফুলকপি আর নলেনগুড়ের খাদ্যসুখে, কেউ যাবেন দেশভ্রমণে, গ্রামবাংলার নানা মেলার আকর্ষণে বন্দ হবেন কেউ কেউ, আর তারই মাঝখানে নিরালা নিঃসঙ্গ কিছু মানুষ শুধু গগনবিহারী পাখির পিছু ধাওয়া করবেন নেশাগ্রস্তের মতো তুরীয় আনন্দে!

বেশ সকালের দিকেই খোলে যায় চিড়িয়াখানার দরজা। সন্ধ্যের আগেই বলাকার দল খাবারের সন্ধানে অবলীলাক্রমে উড়ে যায় সুন্দরবনের নানা খাঁড়ি ও ধান-কাটা মাঠের দিকে। সূর্যের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই তারা আবার ফিরে আসে চিড়িয়াখনার 'বার্ড সাংচুয়ারিতে'। কুয়াশা-জড়ানো সকালে তাই চিড়িয়াখানার চেহারা হয় দেখবার মতো। ডানায় সঙ্গীত তুলে একের পর এক পাখিরা ফিরে আসে। জন্তুজানোয়ারের খাঁচায় নতুন আলোর সোনার কাঠির ছোঁয়া জাগিয়ে তোলে প্রাণের অভিরাম ফোয়ারা। যে ফুল অন্ধ-কারে কারো চোখে পড়ে না তারা মানুষের আদর পেতে চায় নতুন দিনে। ডালিয়ার ব্যাস ছুঁয়ে উড়ে যায় ভ্রমর। গুটি গুটি মানুষের পায়ের শব্দ শোনা যায়। ভালুক বা গণ্ডার দেখেই কারো দৃষ্টি থেমে থাকে

নয়। পাখির হ্রদে সকলকে আসতেই হয়। এখানে জেল আর ছোলা বা অন্য কোনো সস্তা খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে পাখিদের সঙ্গ পাওয়া যাবে না। দূরে থেকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে ওদের। ওরা মুক্ত, স্বাধীন, বাধাবন্ধনহীন। পরিব্রাজকের মতো এসেছে বরফের দেশ থেকে আমাদের সবুজ বাংলায়। সময় হলেই আবার ফিরে যাবে। একটু একটু তখন গরম পড়বে এখানে। ক্যালেন্ডারের পাতায় আমরা মার্চ মাস নেমে আসতে দেখবো। হ্রদে পড়ে থাকবে পোষা, উড্ডয়ন ক্ষমতা কেড়ে-নেওয়া কিছু বিমর্ষ টিল, যাদের সারা বছরই ওখানে দেখা যাবে 'একজিবিট' হিসেবে।

'অরনিথলজি' বা পক্ষীবিদ্যা থেকে আমরা জানতে পারি পাখিদের হালচাল। মানুষ যুগ যুগ ধরে পাখি ও পাখির ডিম খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে, শিকারের সুবিধার জন্যে পুষেছে ফ্যালকন, যোগাযোগে বাহন হিসেবে কবুতর বা পায়রা, এমন কি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে সমুদ্রপাখি গুয়ানোরও উপযোগিতা সর্বজন স্বীকৃত। পাখির পালক দিয়ে নির্মিত ব্যাগ, টুপি, টিউনিক ও নানা বিলাসবহুল পোশাকের কথা আমরা জানি বা ছবিতে দেখেছি। আমাদের এই উপমহাদেশের পাখির বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসম্বলিত গ্রন্থ লিখেছেন সালেম আলী। জগদানন্দ রায়ের 'বাংলার পাখি' জানিয়ে দেয় পথ চলতে নানা সময় আমরা চোখে দেখি যেসব পাখি তাদের বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা। জগদানন্দ রায়ের 'দিকহাঁসই' টিল—সারা শীতের কামড় এড়াতে উড়ে আসে এই দেশে, বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে যায় স্বদেশে। এই পাখিরা কী নিপুণভাবে ঋতুচক্রের আবর্তন বুঝতে পারে, কী নিখুঁত তাদের দিকজ্ঞান! পরিব্রাজক গতিশীল পাখিগুলোর কয়েকটির পায়ে গত বছর লোহার আংটায় 'কলকাতা '৭৫' লিখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই ছিয়াত্তরে ওরা, মানে বিশেষ ওই কয়েকটি পাখি কলকাতায় ফিরে আসে কিনা দেখার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন কয়েকজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। অবশ্য ওরা না এলে খেয়ালী পাখিরা যে আদৌ পুরনো জায়গায় ফিরে আসে না—একথা বলা যাবে না। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ পেয়েছেন শারীরিকভাবে মৃত বা নিহত না হলে পাখিরা পুরনো জায়গায় ফিরে আসতে পারে, বা আসে।

গত কয়েক বছর উড়ন্ত পাখিগুলোকে ধরার জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত বঁড়শি আঁটা ঘুড়ি ওড়ানোর প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছিলো। সরল পাখিগুলো আপন মনে উড়তে উড়তে বঁড়শিতে জড়িয়ে ফেলতো ডানা বা শরীরের কোনো নরম অংশ। ওই পাখিগুলোকে তখন বিক্রী করা হতো নিউ মার্কেটে বা অন্য কোথাও। এখন পাখিরা সবে আসা শুরু করেছে। আশা করবো তাদের ওড়ার পথে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্যে যেন কোনো বঁড়শির প্রাদুর্ভাব না ঘটে! দিকহাঁসের মাংস সুস্বাদু বটে, ওই মাংসের লোভে শীতের ঠান্ডা সাদা সন্ধ্যায় আমাদের রসনা হয়ত মুহূর্তের জন্যেও সিক্ত হতে পারে, কিন্তু যেন ভুলে না যাই যে নিছক লোভের শিকার হয়েই পৃথিবীতে কম করে অন্তত আশিটি পক্ষীপ্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রজন্মের চাষ : বিধান শিশু উদ্যান

বলা হয়ে থাকে যে যদি পেটপুরে খেতে চাও নিজের বাগানে কিছু সব্জির চাষ করো। বেশ কয়েক বছর যদি ফল পেতে চাও নিজের হাতে লাগাও কিছু আমগাছ। কিন্তু যদি পাকাপাকিভাবে সুন্দর সোনার ভবিষ্যতের কথা ভাবে প্রজন্মের চাষ করো। অর্থাৎ শিশুদের প্রতি মন দাও। বড় হয়ে তারাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাদের প্রাণপ্রাচুর্য আর অঢেল কর্মধারার মধ্যে। বিধান শিশু উদ্যান কর্তৃপক্ষ তাই সঙ্গত কারণেই শিশুদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রতি লক্ষ রেখে গড়ে তুলেছেন এমন এক 'স্বর্গের উদ্যান' যেখানে স্বার্থপর দৈত্য কেউ নেই সারাদিন ধরে বসে শিশুদের মেলা, সেখানে নানা রঙের ফুল আর শিশুদের মধ্যে কোনো পার্থক্যই করা যায় না আদর আর ভালবাসার চোখে। বলা বাহুল্য চাচা নেহরুর জন্মদিন যা 'বিশ্ব শিশু দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে, শিশুদের মধ্যে তুলেছিলো অনাবিল এমন এক আনন্দের সাড়া যার পরিপ্রেক্ষিতে বিধান শিশু উদ্যানকে মনে হয়েছিল রূপকথার জগৎ ; দুঃখ নেই, নেই কান্না, শুধু হাসি হাসি আর গান, খেলা—তারা আকাশ-বাতাসকে মুখরিত রেখেছিলো।

আমাদের এই পৃথিবী অন্তত এক দিক থেকে সর্বদাই উর্বর যে এখানে বছর বছর নিত্য নতুন রাজনৈতিক নেতা জন্মান, গোকুলে লালিত পালিত হন এবং পরিশেষে অন্তর্ধানের আগে হাউইয়ের মতো ক্ষণিক বিচ্ছুরণ সৃষ্টি করে, অন্ধকারকে কয়েকগুণ বর্ধিত হতে সাহায্য করেন। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কোনো চটকদার নিয়মকানুনই বিশ্বের নেতাপরিবারে কাজে লাগে না। মহামানবরা আসেন, এবং বড় কালো ছায়া ফেলে এক সময় নিষ্ক্রান্ত হন। তাঁদের জন্যে ফাউন্ড্রিতে তৈরী হয় কয়েক কোঁজ বোল্ড টাইপ যা তাঁদের কিংবদন্তী-তুল্য মাহাত্ম্য প্রকাশ করে বিভিন্ন নিউজ পেপারে। মার্বেল পাথর, ব্রঞ্জ অথবা কুমোরটুলির মাটি সর্বদাই মজুত রাখতে হয় শিল্পীদের। এই বুঝি ডাক এল কারো সমাধিসৌধ অথবা মূর্তি নির্মাণের! তাজ্জব এই দুনিয়ায় চাচা নেহরু কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম! কোটের লাল গোলাপের মতো তাজা ছিলো তাঁর মন, শিশুদের যে তিনি শুধুই হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন তা নয়, তাদের জন্যে সর্বদাই খোলা ছিলো তাঁর সিকিউরিটি গার্ড ও সেন্ট্রি পরিবেষ্টিত প্রাসাদের সিংহদরজা। শিশুর হাত ধরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন বাগানে, খেলতেন তাদের সঙ্গে, আর সেভাবেই ভুলে থাকতেন কাজের জগতের নানা ঝামেলা ও দুশ্চিন্তা। শিশুদের সঙ্গে তাঁর এই অকৃত্রিম মেলামেশায় বয়স কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারেনি কখনোই। বিধান শিশু উদ্যানের কর্ণধার শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় নেহরুর জীবন থেকে গ্রহণ করেছেন শিশুপ্রেমের এই বাণী, নবীন বাঙলার রূপকার বিধান রায়ের কর্মময় জীবনও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে নানাভাবে। বিধানবাবুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় নি। অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে নিয়েছেন অতুল্যবাবু স্বয়ং, ইঁট-কাঠ-পাথরের শহরে ভবিষ্যতের নাগরিকদের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশাল এক সবুজের শান্তি, যা তাদের মন ও স্বাস্থ্যকে চাঙ্গা করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে গত কয়েক বছর। এবার ১৪ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবসে সব বয়সের শিশুদের জন্যে ছিল এই উদ্যানে ঢালাও নিমন্ত্রণ, হাটপাট করে খুলে দেওয়া হয়েছিল দরজা, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো খেলার নানাবিধ উপকরণ ; পিকনিকের আসর জমানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিলো তাদের। ফুলের সৌন্দর্য যেমন ডেকে আনে প্রজাপতিদের, তেমনিই উদ্যানের উদ্যোগ-আয়োজনে আকৃষ্ট হয়েছিলো শিশুরা।

বিধান শিশু উদ্যানে শিশু উৎসব

ফটো : সত্যেন সেন

দমদম থেকে মায়ের হাত ধরে এসেছিলো ছোট্ট সাত বছরের সুনির্মল। মায়ের আঁচল ধরে তাকে ঘুরতে দেখা যায় নি। দৌড়ে বেড়াচ্ছিল এখান থেকে ওখানে। মা হিমসিম খাচ্ছিলেন তাকে সামলাতে। অন্য শিশুরা ওকে চেনে না। কিন্তু অচেনার বাধা কোনো দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারেনি। গড়পারের ক্লাস সেভেনের ছাত্র সুবীর ক্যারামের স্ট্রাইকার সুনির্মলের হাতে তুলে দিয়ে বলল—নাও, মারো। একটু সংকোচ, একটু কুণ্ঠা সুনির্মলের। তারপরেই মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসি। ঘাসে বসে পড়ে হিট করল উনিশটি গুটির সাজানো নকশায়। সুবীর সে তার বন্ধুর মতো পোক্ত খেলোয়াড় নয়। কিন্তু কি এসে যায় তা'তে? টগবগে উৎসাহের জ্যান্ত প্রতিমূর্তি সুবীর তাকে খেলা শেখাতে বসে গেলো আমার সামনে।

সুনির্মলের মতোই এসেছিলো মানিকতলার রূপলেখা। এখনো পা টালমাটাল হয়ে যায় হাঁটতে। অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা মেয়েদের দিকে। কিছু কিছু স্কুলের মাস্টারমশাই ও দিদিমণিরা তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের বিধান শিশু উদ্যানে নিয়ে এসেছিলেন সেদিন। রূপলেখাও হয়ত একদিন আর একটু বড় হয়ে স্কুলের ইউনিফর্ম পরে আসবে এখানে। রৌদ্রে-রাঙা ঝলমলে শিশু উদ্যানে তার মনের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেলো ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের এক অমোঘ বীজ। তার নিভৃত দীক্ষার সাক্ষী থাকল বিধান শিশু উদ্যান।

এই শিশু উদ্যানেই সেদিন বসেছিলো শিশুদের আবৃত্তি ও গানের আসর। অংশগ্রহণে ছিলেন শিশুশিল্পীরা। কচি গলায় রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ'-এর আবৃত্তি শুনে শিশুরা সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলল সা—বাস। সা—বাস!! সুরের পাখি যেন

জানা মেলল তাদের গলায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চটচটে হাততালি শুনে কান যখন পচে ওঠার উপক্রম, তখনই এমন এক সুন্দর সুখকর অভিজ্ঞতা হলো আমার। মনে দাগ কাটল শিশুদের আন্তরিকতা ও আগ্রহ। সন্ধ্যে হয়ে এলেও বাড়ি ফিরতে মন চাইছিলো না। আমার অবস্থাটাও হয়ে গেলো ওই শিশুদের মতো, মা বাবারা যাদের বারবার বলছিলেন 'চলো রাত হয়ে যাবে—এবার বাড়ি ফিরি।' কিন্তু ওরা কিছুতেই কোনো নিষেধ শুনছিলো না।

অবশেষে যেন্নার পথে আবিষ্কার করলাম অনেক শিশুর মাঝখানে আমি পথ হাঁটছি। ওরা বাড়ি ফিরছে ঠিকই, কিন্তু ওদের মন তখনো পড়ে আছে উদ্যানের আঙিনায়। আমি জানি সুযোগ পেলেই ওরা চলে আসবে এখানে—এই বিধান শিশু উদ্যানে; কালক্রমে বয়স্ক হবে, তারপর একদিন ওরা ওদের শিশুদের হাত ধরে নিয়ে আসবে এখানে, সেদিন হয়ত আমি থাকবো না, কিন্তু জানি, নিশ্চিতভাবে জানি রূপকথার জগতের পথ চেনাতে আজকের শিশুদের সেদিন পিতা ও উপযুক্ত শিক্ষকের ভূমিকা নিতে দেখা যাবে।

ইদ্‌জ্জোহা

ভারতবর্ষ যে মনেপ্রাণে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বোঝা যায় কলকাতায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সাবলীল সহাবস্থান দেখে। হিন্দুরা এখানে সংখ্যায় অধিক হলেও জৈন, বৌদ্ধ, পার্সী মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ নেই ; হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগের মূল সূত্রটিই রচনা করেছে সাংস্কৃতিক ঐক্য। বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার মাঝখানে ঐক্যের বন্ধন যে কী দৃঢ় ও অবিচ্ছেদ্য আমরা বুঝতে পারি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান এলে। এবার ঈদ্‌জ্জোহায় তাই গোটা কলকাতাই হয়ে পড়েছিলো উৎসবমুখর। সরকারী ছুটির দিন বলে অফিসের বাবু থেকে শুরু করে পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসারগণ অনেকেই শুয়ে বসে সময় অতিবাহিত করেন নি—তাঁরা দলে দলে বেরিয়ে পড়েছিলেন বাইরে, মুসলমান ভাইদের পরবের আনন্দের হয়েছিলেন অংশীদার। পথে পথে আমি দেখেছি কোলাকুলি ও 'ঈদ মুবারক' বিনিময়। পিয়ানোর রিড টিপলে যেমন সুমধুর শব্দ নির্গত হয়, সেরকমই বেজেছে 'সালাম' 'সালাম' শব্দ। মন ভরে উঠেছিলো দেখে।

দিনটি ছিলো বৃহস্পতিবার। সাধারণত এই দিন খাসী-পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় না। বিশেষ উৎসব বলে অবশ্য দিনটিকে ব্যতিক্রম হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছিল। খাসী-পাঁঠার দোকানে ঝুলন্ত জন্তুর সিনা বা রাং দেখে বাজার থেকে অনেকেই আমিষ খাদ্য কিনে বাড়ি ফিরেছিলেন। বৃহস্পতিবারে সৃষ্টি হয়েছিলো রবিবারের আমেজ। আসলে ঈদ্‌জ্জোহা মানেই ত্যাগের উৎসব। পশুবলির গূঢ় প্রতীকী অর্থ থাকে এই উৎসবে। মনের যাবতীয় হিংসা দ্বেষ ও পশুত্বকে কোরবানি দেওয়াই এই উৎসবের লক্ষ্য। আমিষ ভোজনে পরিতৃপ্ত মানুষ কি এই তাৎপর্যের বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন? বোঝা না গেলেও এটুকু জানি যে উৎসবের মূল তাৎপর্যটুকু সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল বিভিন্ন মসজিদের নামাজে, মানুষের জন্যে মানুষের শুভকামনায়, দরিদ্রদের দানখয়রাতির মধ্যে। কলকাতা ময়দানে খিলাফৎ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত নামাজের বিশাল সমাবেশ ছিল দেখবার মতো। সেদিন সমবেত মানুষের শৃঙ্খলাবোধ ও রুচির প্রশংসা করতেই হয়।

ঈদের আগেই বাজারে পড়ে গিয়েছিলো কেনাকাটার ধুম। প্রভূত পরিমাণে বিক্রী হয়েছে সেমাই মিষ্টি, আতর ও টুপী। পোশাকের বাজারও ছিল জমজমাট। কিন্তু উৎসবের সামাজিকতার দিকটিই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। আমাদের গ্রামের ওসমান কাজ করে কলকাতার কাছেই এক পাটকলে। বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু সেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ ওকে আসতে দেখে অবাক হই। ভাবলাম এমন কি দরকার পড়েছে যে ও ভরদুপুরে ছুটে এসেছে এত দূরে! আমাকে ভাবনাচিন্তার বিশেষ সময় দিলো না ওসমান। জড়িয়ে ধরলো বুকে। নতুন পাঞ্জাবিতে আতরের গন্ধ। হাতের প্যাকেটে সেমাই। সেদিন আমার আর বুঝতে দেরি হয়নি যে আজ ঈদ। কলকাতায় ওসমানের আত্মীয়কুটুম কেউ নেই। আমাকেই ও নিকট আত্মীয় বলে জানে। তাই ছুটে এসেছে আমার কাছে। আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলি—প্রতি বছর যেন তোকে এমনিভাবে পাই।
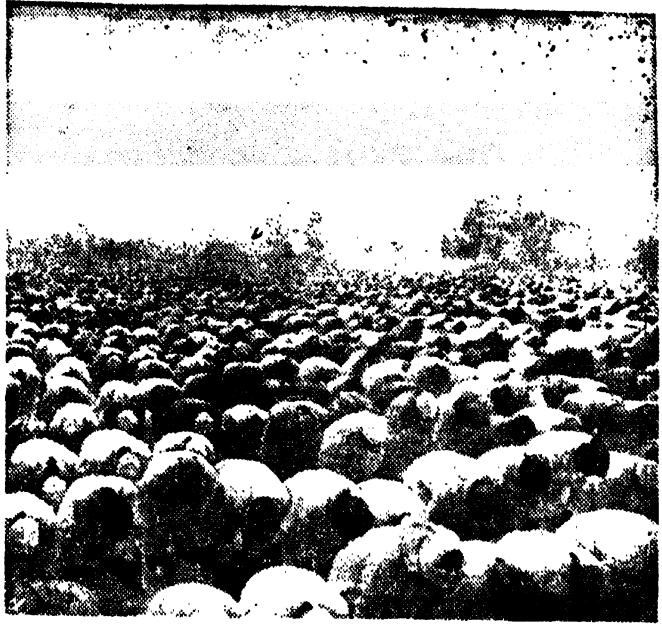
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈদ্‌জ্জোহা নামাজ — ফটো : গুরুচরণ সাহু

॥ ২৯ ॥

"হ্যালো, হ্যালো, সুলেখা—ঘরে ছিলে না? টেলিফোন ধরতে এতো দেরি হলো কেন?" জগদীশ জেঠমালানির গলা শুনতে পাচ্ছে সুলেখা।

"সিনেমায় যাচ্ছি", সুলেখা উত্তর দিল।

গলা শুনেই সুলেখা বুঝতে পেরেছিল, টেলিফোনের অপর প্রান্তে জগদীশবাবু আঁতকে উঠলেন। "সিনেমা! বি এ গুড্ গার্ল, সুলেখা। সিনেমা দেখবার অনেক সময় পাবে, প্লিজ আজকে যেও না।"

"অনেক কষ্টে সিনেমার টিকিট কাটিয়েছি—টিকিট পাওয়া যায় না," সুলেখা এই মুহূর্তে সিনেমায় যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে।

কিন্তু জগদীশ জেঠমালানি ওস্তাদ লোক। মিষ্টি করে তিনি বললেন, "সুলেখা তোমার মতো মেয়ে হয় না। তুমি অন্য যে কোনোদিন যেতে চাইবে, আমি বেস্ট টিকিট কিনে দেবো। তোমার কোনো চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আজ কিন্তু একটু জরুরি কাজ পড়ে গেছে।"

সুলেখা আমাকে বললো, "আমি ভাবলাম, বুঝি নতুন কোনো হাঙ্গামা। কোথায় ঠাকুর-দেবতার ছবিটা দেখে মনটা একটু হাল্কা করবো, তা না ভরদুপুর-বেলায় আবার ঝুটঝামেলা!"

কিন্তু জেঠমালানির পরের কথায় সুলেখা নিজেও একটু অবাক হলো। "মিস্টার চট্টরাজ তোমার ওখানে যেতে পারেন।"

"উনি তো সকালে এসেছিলেন! এই তো ঘণ্টাকয়েক আগে", সুলেখা অবাক হয়ে যায়। ভাবে জগদীশ জেঠমালানি বোধহয় ভুল করছেন।

জগদীশ জেঠমালানি জীবনে এই প্রথম সুলেখার সঙ্গে রসিকতা করলেন। বললেন, "ভাল সিনেমা হলে কেউ কেউ ডবল্ শো দেখে!"

রসিকতা বন্ধ করে জেঠমালানি অভিনন্দন জানালেন সুলেখাকে। "অতি কঠিন লোক এই চট্টরাজ। ও'কে যে সন্তুষ্ট করতে পেরেছো, এতে আমরা খুব খুশী হয়েছি, সুলেখা। এই লোকটার ওপর আমাদের ফিউচার অনেকখানি নির্ভর করছে।"

সুলেখা শান্তভাবে উত্তর দিল, "বলুন।"

জগদীশ ওদিক থেকে জানালেন, "শোনো, সুলেখা, খুব মানী লোক এই মিঃ চট্টরাজ। প্রথমে রাজীই হচ্ছিলেন না। কিন্তু ও'র মনের ভাব বুঝতে পেরে আমিই ও'কে এনকারেজ করেছি চৌত্রিশ নম্বরে রিটার্ন ভিজিট দিতে।"

সুলেখা ফোন রাখতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওদিক থেকে আওয়াজ এলো, "হ্যালো, হ্যালো। সুলেখা, শোনো। মিস্টার চট্টরাজ খুব টায়ার্ড ফিল করছেন। একটু মাথাও ধরেছে। তুমি দু'একটা মাথা ধরার ট্যাবলেট আনিয়ে রেখো।"

"ওসব ট্যাবলেট আমার ব্যাগে সারাক্ষণ থাকে, আপনাকে চিন্তা করতে হবে না," সুলেখা জানিয়ে দিল।

"ভেরি গুড, সুলেখা। সাধে কি আর তোমার কাছে মিস্টার চট্টরাজকে পাঠাচ্ছি।"

জেঠমালানি এখনও কথা শেষ করছেন না। সামান্য কেশে গলা সাফ করে নিয়ে তিনি বললেন, "খুব ইমপর্টান্ট পার্টি, মনে রেখো সুলেখা। কোনোরকম আদর-যত্নের ত্রুটি না হয় যেন। দরকার হলে চৌত্রিশ নম্বরেই ডিনারের ব্যবস্থা করবে। কাউকে পাঠিয়ে মোকাম্বো অথবা ব্লু ফক্স থেকে পছন্দমতো খাবার আনিয়ে নিও। তোমার কাছে টাকা আছে তো?"

স্পেশাল খাবারের টাকা নেই জেনে জগদীশ এবার নিজের ভাগ্নের ওপর বিরক্ত হলেন। বললেন, "কেন? রাজু তোমার কাছে কিছু টাকা রেখে দেয় নি? কতবার

মনোহারী মসৃণি
ম্যাক্সি, মিডি, মিনি। ঠাকরসীর ফ্যাশানের অপূর্ব
সম্ভার থেকে বেছে নিয়ে নতুন রেওয়াজের
পোশাকে নিজেকে প্রকাশ করুন। সবসময়
সবজায়গায় ঠাকরসীর ড্রেস মেটিরিয়াল
আপনাকে অসাধারণ ক'রে তোলে।
ঠাকরসী ফ্যাব্রিক্স
TF
হিন্দুস্তান স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলস লিঃ
১১, বম্বে সমাচার মার্গ, বম্বে ৪০০০২৩
everfresh®
67% 'Terene,' 33% Cotton
DOUBLE EDGE
'Terene' Suitings
easycare®
67% 'Terene,' 33% Cotton
easylene®
80% Polyester, 20% Cotton
Tonlene®
Polyester/Cotton
Tonester®
Polyester/Cotton

বলেছি ওকে, ফ্ল্যাটে সবসময় কিছু কাঁচা টাকা রাখা দরকার।"

জেঠমালানি বললেন, "ফিকর মাত কীজিয়ে! আমি এখনই ড্রাইভারের হাতে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শুধু রু ফক্স-এর রসিদগুলো রেখে দিও—ওগুলো কোম্পানির খরচ দেখিয়ে দেওয়া' যাবে।"

"সব রেখে দেবো, আপনি চিন্তা করবেন না।" সুলেখা জানতো না এইসব খরচখরচা আবার হিসেবের খাতায় দেখানো যায়। সুলেখার মনে পড়ছে বটে, জগদীশ-বাবুর আদরের ভাগ্নে রাজাবাবু, সুলেখাকে দিয়েও মাঝে-মাঝে ভাউচার সই করিয়ে নেয়।

জেঠমালানি বললেন, "তা হলে ছাড়ছি। আমি মতিবাবুর বাড়িতে গীতা ক্লাসে থাকবো। কোনো অসুবিধে হলে ওখানেই ফোন করে দিও," এই বলে শ্রদ্ধেয় মতি-বাবুর টেলিফোন নম্বর দিলেন জগদীশ জেঠমালানি।

এবং টেলিফোন নামাবার আগে আবার সুলেখাকে সাবধান করে দিলেন, "কোনোরকম অসুবিধে যেন না হয়। কোনো বিজনেসের কথা তোমাকে ও'র পেট থেকে টেনে বার করতে হবে না। স্রেফ, মিস্টার চট্টরাজ যেন আমাদের ওপর একটু সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলেই হবে।"

মিস্টার চট্টরাজ যথাসময়ে পদধূলি দিয়েছিলেন চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে। সুলেখার সেবাযত্নে বিশিষ্ট অতিথির ক্লান্তি কিছু-ক্ষণের মধ্যেই কেটে গিয়েছিল।

সিনেমা না-যাওয়ার ব্যাপারে সুলেখা নিজে থেকে কিছুই বলেনি। কিন্তু তার অসাবধানতায় ব্যাপারটা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মিস্টার চট্টরাজের কাছে ধরা পড়ে গেল। সোফার একধারে টেবলটপের ওপরেই ম্যাটিনী শোয়ের গোলাপী রঙের অব্যবহৃত টিকিটখানা পড়েছিল। সুলেখা তখন ভিতরে প্যানট্রিতে মিস্টার চট্টরাজের জন্যে একটু চা তৈরি করছিল। প্যানট্রিতে ঢালাও ব্যবস্থা। গ্যাস ছাড়াও ইলেকট্রিক স্টোভ আছে ওখানে। ছোট্ট একটা ফ্রিজে নানাবিধ সুখাদ্য ঠাসা। রান্নার জিনিসপত্রেরও অভাব নেই। সুলেখা নিজেও সুগৃহিণী। রান্নাটা ভালই জানে। মাঝে মাঝে দু'একটা ছোটখাট পদ রান্না করে অতিথিদের মনোহরণ করেছে।

কেউ কেউ পরে জগদীশ জেঠমালানির কাছে অজস্র প্রশংসা করেছে। বলেছেন, "আপনার ফ্ল্যাটে গেলে মনটা অন্যরকম হয়ে যায়, মিস্টার জেঠমালানি। মনেই হয় না বাইরে এসেছি। বাড়িতে বসে-বসেই যেন উপভোগ করছি সেইসব আনন্দ যা বাড়িতে পাওয়া যায় না।"

বিশিষ্ট অতিথির চা ও জলখাবার নিয়ে সুলেখা যখন টেবিলে ফিরে এল, তখন মিস্টার চট্টরাজ বললেন, "আপনার যে সিনেমা যাওয়ার কথা ছিল তা মিস্টার জেঠমালানি আমাকে বললেন না কেন?"

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলো সুলেখা, কিন্তু ফল হলো না। টিকিটখানা তুলে দেখালেন চট্টরাজ।

আমতা-আমতা করতে লাগলো সুলেখা। চট্টরাজ যে এই ধরনের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যে সত্যিই দুঃখিত তা ও'র মুখ-চোখ দেখেই বুঝতে পারছে সুলেখা।

কিন্তু রাগটা যেন শেষপর্যন্ত জেঠ-মালানির ওপর গিয়ে না পড়ে। সুলেখা এবার তাই শান্ত স্নিগ্ধভাবে বললো, "সিনেমা তো রোজই আছে—আপনি তো কলকাতায় রোজ আসবেন না, মিস্টার চট্টরাজ। না-হয় একদিন সিনেমা দেখা হলো না।"

মিস্টার চট্টরাজ এই পরিবেশে যেন কেমন হয়ে গেলেন। নিজের সব কথা বলতে আরম্ভ করলেন। নির্মল চট্টরাজের স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ। অনেকদিন তিনি যে রাঁচিতে আছেন—সংসারে যে চট্টরাজের তেমন টান নেই—আফিসের কাজের মধ্যেই যে তিনি মুক্তি খুঁজছেন, এসব কথা চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে এসে সহজে কেউ প্রকাশ করে না। এসব শুনতেও সুলেখার তেমন ভাল লাগে না—কারণ বিশিষ্ট অতিথি বিদায়ের পর জগদীশবাবু নিজে এসে অনেক সময় বহুক্ষণ ধরে সুলেখাকে জেরা করেন। অতিথির সঙ্গে আলোচনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানতে চান। এসব খবর এইভাবে সংগ্রহ করে ও'দের নিশ্চয় কিছু লাভ হয়, কিন্তু কী লাভ হয় সুলেখা তা বুঝতে পারে না।

চট্টরাজ লোকটি যে এখনও পুরো-পুরি অমানুষ হননি তার প্রমাণ সুলেখা একটু পরেই পেয়েছিল। সুলেখার দেওয়া মাথাধরার ট্যাবলেট খেয়ে একটু সুস্থ হবার পরেই চট্টরাজ ঘড়ির দিকে তাকালেন। সুলেখা ভাবলো, অতিথি এবার এখানে একঘেয়ে বোধ করছেন; অথবা অন্য কোথাও জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এতোসব অ্যাপয়েন্টমেন্ট হাতে নিয়ে লোকগুলো কীভাবে তারই মধ্যে টুক করে আনন্দবাজারে চলে আসেন সুলেখা বুঝতে পারে না।

কিন্তু সুলেখা ভুল বুঝেছিল। ঘড়ির দিকে তাকিয়েই মিস্টার চট্টরাজ বললেন, "আজই ক্ষতিপূরণ করতে চাই।" চট্টরাজের

ব্যাপারে মিস্টার চট্টরাজের বোধ হয় বিশেষ কিছু করবার আছে।

সুলেখা একবার ভেবেছে, রাজাবাবুকে জিজ্ঞেস করে, বড় বড় কলকারখানায় ভাল জিনিস পাঠালেই হয়—তাহলে তো এইসব হাঙ্গামা থাকে না। রাজু ছেলেটি এখনও মামার মতো সেণ্ট-পার-সেণ্ট শেয়ানা হয়ে ওঠেনি ; মাঝে-মাঝে সে সত্যি কথা বলে ফেলে। রাজুর সেদিন মুড ভাল ছিল, বিজনেসের অনেক কিছু সে নতুন শিখছে। সেণ্ট জেভিয়ারের ফাদারদের পদতলে জীবনের প্রথম শিক্ষালাভ করে, মামার কাছে রাজুর শিক্ষার চরমপর্ব চলেছে। রাজু বলেছে, "বিজনেস ইজ বিজনেস, সুলেখা। কমদামে গরমেণ্টকে সবচেয়ে ভাল জিনিস সাপ্লাই করলে প্রফিট আসবে কোত্থেকে?" সুলেখার মাথায় কথাগুলো ঠিক ঢুকছে না। অন্য কোনো মালিক হলে, এতোক্ষণে সুলেখার সাহস দেখে অবাক হয়ে যেতেন, হয়তো কথার উত্তরই দিতেন না। কিন্তু রাজা মালানি সুলেখাকে সন্তুষ্ট রাখতে উৎসুক নিজের এক বন্ধুকে নিয়ে সে একদিন নিঃশব্দে এই চৌত্রিশ নম্বরে আসতে চায়—কিন্তু মামা যেন ঘুণাক্ষরে
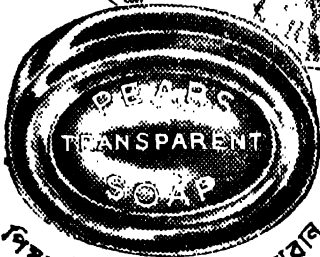
জানতে না পারেন।

রাজা বলেছে, "আপনি এসব প্রফিট-লসের অঙ্ক বুঝতে পারবেন না, মিস সেন। অনেক টাকা খরচ করে, অনেক পরিশ্রমে এম-কম সি-এ, এম-বি-এ পড়ে অনেক মাথা খাটিয়ে এসব আমাদের শিখতে হয়।" কথাবার্তায় রাজাবাবু যে সার সত্যটি বুঝিয়ে দিলেন, তা হলো, ন্যায্যদামে সরকারকে ভাল মাল সাপ্লাই করলে, লালবাতি জ্বালাতে জেঠমালানি কোম্পানির মাত্র কয়েক মাস লাগবে।

ভাগ্যে সুলেখা বড় বড় পরীক্ষায় বসে নি। রাজাবাবুর কথাগুলোর ভিতরে ঢুকবার সে কোনো চেষ্টা করলো না।

যথাসময়ে জগদীশ জেঠমালানি নিজে এসেছেন চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে। মিস্টার চট্টরাজের আসন্ন আবির্ভাব দিবসে যাতে কোনোরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় তার ব্যবস্থা পাকা করতে চান তিনি। সুলেখাকে পার্ক স্ট্রীট পাড়ার বিখ্যাত রেস্তোরাঁর কয়েকখানা ব্ল্যাংক স্লিপ দিয়েছেন তিনি। ওই স্লিপে কারুর হাতে লিখে পাঠালেই খাবার আসবে—কোনো ক্যাশ টাকা দেবার দরকার হবে না। স্লিপের ব্যাপারটা সুলেখার জানা ছিল না—জগদীশ জেঠমালানি ইচ্ছে করেই যেন এতোদিন ব্যাপারটা তার কাছে চেপে রেখেছিলেন।

নির্ধারিত দিনে চট্টরাজ কিন্তু এলেন না। সেই বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত সুলেখা অপেক্ষা করেছে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে। দশটার সময় জগদীশবাবু নিজে ফোন করেছিলেন। অতিথি তখনও এসে পৌঁছননি শুনে তিনি নিজেও বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সুলেখা একটু বিরক্ত হলেও, নিজেকে শান্ত করে নিয়েছে। চট্টরাজ যদি আসবেন বলে না আসেন তো কী করা যাবে? আসা না আসাটা তাঁর ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে। ভোর বেলায় জগদীশবাবু আবার ফোন করেছিলেন। "সুলেখা, কাল তোমার নিশ্চয় দুশ্চিন্তায় কেটেছে।" সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিয়েছে, "মোটেই না। উনি তো আমার স্বামী নন, যে বাড়ি না ফিরলে পা-ছড়িয়ে কাঁদতে বসবো।"

সুলেখা সাধারণত এই ধরনের কথা বলে না, কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। জগদীশবাবু কিন্তু চিন্তা ত্যাগ করতে পারছেন না। তাঁর হিসেবের খাতায় চট্টরাজ এই মুহূর্তে স্বামীর চেয়েও বড়!

সেই সকালেই জগদীশ জেঠমালানি যে অনুপস্থিত অতিথির খবরাখবর নিতে ধানবাদে ছুটবেন তা সুলেখা কল্পনা করে নি। কাজ হাসিল করবার জন্যে এঁরা পারেন না এমন কিছু কাজ নেই। অন্য সময় হলে হয়তো সোজাসুজি চট্টরাজের কাছে টেলিফোন বুক করতেন। কিন্তু এ-ব্যাপারে টেলিফোনে কথা বলাটা বোধ হয় সমীচীন মনে করলেন না জগদীশবাবু।

এতোক্ষণ হুড় হুড় করে নিজের জীবনের সব কথা অকপটে বলে যাচ্ছিল সুলেখা সেন। আমিও অবাক হয়ে তার প্রতিটা শব্দ গিলে খাচ্ছিলাম। চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের অজানা রহস্যের পর্দা যেন কোনো যাদুমন্ত্রবলে আমার চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছে; আমি যেন সব কিছু জানবার দৈবশক্তি অর্জন করেছি।

সুলেখা সেন একটু চুপ করলেন। ওঁর সামনে চায়ের কাপ প্রায় বোঝাই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিজের কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ চায়ে চুমুক দেবার সময় পায়নি সুলেখা—ম্যানেজারবাবুর জন্যে পাঠানো স্পেশাল চা ঠাণ্ডা হতে-হতে পুরু সরের আচ্ছাদনে বন্দী হয়েছে। হাত দিয়ে কাপের উষ্ণতা অনুভব করলো সুলেখা। আমি বললাম, "কোনো অসুবিধে নেই, আর এক-কাপ চায়ের অর্ডার দিচ্ছি।"

সুলেখা নিজের মণিবন্ধে আঁটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আমাকে কেউ খোঁজ করতে আসে নি?"

বললাম, "দাঁড়ান আমি দেখে আসছি।"

সুলেখা বললো, "নতুন একটা গাড়ি আসবে।"

সুলেখা যে চঞ্চল হয়ে উঠছে তা বেশ বুঝতে পারছি।

[ক্রমশ]

সব কুমকুম টিপ এক জাতের নয় !

শিঙ্গার অনেক উঁচুজাতের • মসৃণ সমান করে লাগানো যায় • অনেক বেশী সুন্দর • ছড়িয়ে পড়ে না চিড় খায় না • কোনও দাগ পড়ে না • বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী

সুতরাং সবসময়ে লাগান

শিঙ্গার
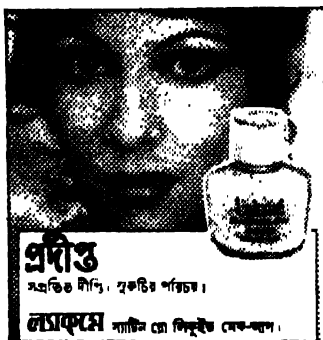
ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রীর মনলোভা কুমকুম টিপ

প্যারামাউন্ট প্রোডাক্টস,
৮০৯, প্রসাদ চেম্বার্স, বম্বে ৪০০ ০০৪

সিঁদুর

everest/638/SH Beng

নীললোহিতের চোখের সামনে

ঘাটাল শহরের একটা চায়ের দোকানে বসে ছিলাম। এখান থেকে বাস ধরবো, কিন্তু একটু আগেই একটা বাস ছেড়ে গেছে, পরবর্তী বাস এক ঘণ্টা বাদে। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর, বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, তাই চায়ের দোকানটাই আশ্রয়।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওরা আমাকে এক ঘণ্টাই এখানে বসে থাকতে দেবে কিনা। চায়ের দোকানে বেশীক্ষণ বসতে গেলে বেশী খেতে হয়। কিন্তু আপাতত আমার খিদে নেই এবং ঠাণ্ডা নিমকি সিঙাড়া এবং চিনির্ভতি দানাদার খাবার ইচ্ছেও নেই। একটি ওমলেট ও চা পনেরো মিনিটেই শেষ হয়ে গেল, তারপর আর দু'বার দু কাপ চায়ের অর্ডার দিলুম।

চা কিংবা খাবার টেবিলে দিয়ে যাচ্ছে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে, বেশ ছিপছিপে চেহারা, পাঞ্জাবীদের অনুকরণে সে ডান হাতে একটি স্টিলের বালা পরেছে। ক্যাশ কাউন্টার থেকে মালিক তাকে গোরা গোরা বলে ডাকছে। খালি কাপ তোলা কিংবা টেবিল মোছার ভার আর একটি বাচ্চা ছেলের ওপর, এর বয়েস দশ এগারোর বেশী না। কালো তেল চকচকে মুখ দেখলেই বোঝা যায় ছেলেটি বেশ দুষ্টু। এর নাম পচা। কেন যে এমন একটা সুন্দর ছেলের নাম পচা রাখা হয়েছে কে জানে!

বহু চায়ের দোকানেই এইটুকু বয়েসের ছেলেদের কাজ করতে দেখি, কখনো আমরা আশ্চর্য হই না। শিশু শ্রমিক বিষয়ে কি যেন একটা আইন আছে শুনেছি, কিন্তু সে কথা ভেবেও লাভ নেই। সে সব আইন মানাতে গেলে এইটুকু একটা ছেলেকে চাকরি দেওয়া যায় না, আর চাকরি না করলে এ ছেলেটি খেতেও পাবে না, বিশেষত বাপ মা যার নাম রেখেছে পচা।

পচা কিন্তু মোটেই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে না। এক টেবিলে তিনখানাটি কাপ থাকলে সে কিছুতেই সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে নিয়ে যাবে না। কাপগুলোকে খাড়াভাবে পর পর সাজাবে, তারপর এক হাতে দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাবে। যেন একটা খেলা। অবশ্য পচার বয়েসী অন্য ছেলেরা ঠিক এই সময়টায় ইস্কুলের টিফিন পিরিয়ডে লুটোপুটি করে খেলা করে। অনেকক্ষণ ধরেই আমি পচাকে লক্ষ করছি। আর আমার একটু ভয় ভয় করছে। হঠাৎ হাত ফস্কে কাপ-টাপগুলো

তারপর এক হাতে দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাবে

ভেঙে ফেলবে না তো!

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। আমার জন্য তৃতীয় কাপ চা নিয়ে আসছিল গোরা। সে সব সময় দৌড়োদৌড়ি করে আসে, তার স্বভাবটাই ছটফটে। দোকানের পাকঘর থেকে বেরিয়ে গোরা এদিকে যখন আসছে, সেই সময়েই পচা এক হাতে তিনটে খালি কাপ ব্যালান্স করে নিয়ে যাচ্ছিল, দুজনের ধাক্কা লাগলো। তিনটে কাপই পড়ে গেল পচার হাত থেকে, সৌভাগ্যবশত দুটো ভাঙলো না, একটা একেবারে টুকরো টুকরো।

পাছে এই ব্যাপারে গোরার কোনো দোষ ধরা হয়, তাই সে আগেই চেঁচিয়ে উঠলো, ভাঙলি তো? কতবার বলেছি—? তারপরই সে এক চড় কষালো পচার গালে।

গোরার হাতের চায়ের কাপে একটুও চা চলকায়নি, সেটা সে আমার টেবিলে রেখে আবার ফিরে গিয়ে পচাকে মারতে লাগলো। দোকানের মালিক কাউন্টার থেকে স্থিরভাবে চেয়ে আছে, মুখে কোনো কথা নেই। মার খেয়েও কাঁদছে না পচা, দাঁড়িয়ে আছে গোঁজ হয়ে।

আর তিন চারজন লোক রয়েছে দোকানে। তাদের মধ্যে একজন ভালোমানুষ চেহারার লোক বললেন, ওরে হয়েছে হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে! আর মারিস না! কাপ তো আর লোহা দিয়ে তৈরি নয়, এক-

দিন না একদিন ভাঙবেই।

তারপর তিনি ওপরের দিকে মুখ তুলে উদাস গলায় বললেন, কোনো কিছুই চিরকাল থাকে না। মানুষের জীবনই হঠাৎ কখন চলে যায়...

মফঃস্বলের অনেক চায়ের দোকানেই এরকম এক-একজন দার্শনিক থাকে।

গোরা মার থামিয়ে ভেতরে চলে গেল। দোকানের মালিক এবার হুঙ্কার দিয়ে পচাকে বললো, সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছিস কি? ভাঙা টুকরোগুলো সাফ কর্। দেখবো এখন আজ খাওয়ার সময়। দুটো বাজতে না বাজতেই খাওয়ার জন্য ছোঁক ছোঁক, এত নোলা...

বুঝলাম, পচার কপালে আজ আরও দুঃখ আছে। দুপুরে খেতেও পাবে না বোধ হয়। এ ব্যাপারে আমার কি কিছু করণীয় আছে? দোকানের মালিককে একটা কাপের দাম দিয়ে অনুরোধ করতে পারি, ছেলেটাকে আজ উপোস করাবেন না। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ এরকম উদার সাজতে আমার লজ্জা লাগে। তাছাড়া, পচার জন্য আজকে এইটুকু শুধু আমি করতে পারি। কিন্তু আগামীকাল বা তারপরের কোনো-দিন পচার দুর্ভোগের ব্যাপারে কোনো সাহায্য করার সামর্থ্য আমার নেই।

পচার সঙ্গে দু'একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু সে আর এদিকে এলো না। রান্নাঘরে গিয়ে বসে আছে। কি জানি কাঁদছে কিনা। দোকান ফাঁকা হয়ে এসেছে আমি ছাড়া আর কেউ বসে নেই। মালিকও উঠে বাইরে গেছে।

একটু বাদে গোরা এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। বোধ হয় খদ্দের খুঁজছে। কিন্তু খাঁ খাঁ রোদ্দুরে রাস্তাঘাট ফাঁকা।

গোরা আমার দিকে ফিরে বললো, বাবু বুঝি বাস ধরবেন? কোথাকার, ঝাড়-গ্রামের?

ছেলেটির বুদ্ধি আছে। কিন্তু আগে থেকেই আমি ওকে অপছন্দ করে ফেলেছি। আমি একটু কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঐটুকু ছেলেকে অত জোরে মারলে কেন?

গোরা বললো, আপনি জানেন না বাবু, ও বড় তেঁদড়েটে ছেলে! না মারলে কোনো কথা শোনে না। ওর জন্য আমি মালিকের কাছে বকুনি খাই। এরকম করলে চাকরি থাকে?

আমি বললাম, ও কি তোমার ভাই-টাই হয়? মুখের মিল আছে যেন খানিকটা।

গোরা হেসে বললো, না বাবু, ভাই কি করে হবে? আমি এখানকার লোকই না।

—ছেলেটা দুপুরে খেতে পাবে তো?

—কেন পাবে না? আমাদের মালিক

লোক খারাপ নয়। মুখে বকুনি দেয়, কিন্তু পেটে মারে না।

একটা টাকা দিয়ে গোরাকে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বললুম। সিগারেট নিয়ে ফিরে এসে ও বললো, আজ ঝাড়গ্রামের বাস বোধ হয় একটু লেট করবে। আগে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে! আমার বাড়িও ঝাড়গ্রামের কাছেই। আমাদের গাঁয়ের নাম বীজপোতা।

আমি বললাম, অত দূর থেকে তুমি এখানে চাকরি করতে এসেছো? ওদিকে কিছু কাজ পেলে না?

—ও তল্লাটেই আমি থাকতে চাই না।

—কেন?

—আমি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এসেছি। আর কোনোদিন যাবো না।

বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, অর্থাৎ ভাগ্যান্বেষী। হয়তো দেখা যাবে এই গোরাই একদিন বিরাট একজন শিল্পপতি কিংবা মন্ত্রী হয়ে যাবে। অন্ততঃ একটা চায়ের দোকানের মালিক হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার নাম কি ভাই?

—গোরাচাঁদ দলুই। পিতার নাম নিবারণচন্দ্র দলুই।

—কিন্তু গোরাচাঁদ, তুমি যে বাড়ি থেকে পালিয়ে এলে, তোমার বাবা-মা দুঃখ পাবেন না?

—বাবা পাবে না, মা একটু পেতে পারে। মার কষ্ট পাওয়াই ভালো।

কেন, তোমার মা এমন কী দোষ করলেন যাতে তাঁর কষ্ট পাওয়া দরকার।

—মা-ই তো জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে!

কথাটা এমন আকস্মিক যে আমার বুকে প্রায় দামামা বাজাতে লাগলো। আমি ছেলেটির সর্বাঙ্গে আবার চোখ বোলালাম। এবং আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার বয়েস কত?

—এই শ্রাবণে ষোলোয় পা দিয়েছি।

আরও কথায় কথায় জানা গেল যে, আমাদের এই শ্রীমান গোরাচাঁদের বিয়ে হয়েছে দেড় বছর আগে, তার বউয়ের বয়েস এখন এগারো। মা তাঁর ছেলের বউকে বড্ড বেশী ভালোবেসে ফেলেছেন, বউকে একদম বকেন না। গোরাচাঁদ বউকে অনেকবার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেছে। কিন্তু মা রাজি হননি।

আমি বললুম, কেন, তুমি তোমার বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইতে কেন? তুমি কি ইস্কুলে পড়তে?

এবার আর একটি অপ্রত্যাশিত উত্তর এলো। গোরাচাঁদ রীতিমতন রাগের সঙ্গে বললো, দেবো না? ঐ মেয়ের বাপ আমাকে

বিয়ের সময় একটা সাইকেল দেবে বলেছিল, সেটা দেয়নি! ঐ মেয়ে নিয়ে কেউ ঘর করে?

একটু দম নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, বউয়ের চেয়ে সাইকেল তোমার কাছে বড় হলো?

সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন আমি একটা অদ্ভুত কথা বলছি। বউ তো ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়। কিন্তু একটা সাইকেল জোটানো কি অত সহজ?

—সাইকেল নিয়ে কি করতে তুমি?

—ঝাড়গ্রামে সাতদিনব্যাপী সাইকেল প্রতিযোগিতায় নাম দিতাম।

অন্য খদ্দের এসেছে, গোরাচাঁদ তাই চলে গেল। আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। কিন্তু এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে আমি একা একা হাসতে লাগলাম। মফঃস্বলের চায়ের দোকানে মাত্র এক ঘণ্টা বসে একটি বেশ সামাজিক চিত্র পাওয়া গেল। শিশু-শ্রম, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা—সব কিছুই বেশ হাসি-খুশী ভাবে চলছে। শুধু বাঁশ-পেতা গ্রামে একটি এগারো বছরের মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছে কিনা কে জানে।

আমার মনে হলো, একটা কোনো শিকড় দরকার। যে শিকড়টা হাতের মুঠোয় এলেই আমার ইচ্ছাশক্তি এসে যাবে। সেটা নিয়ে আমি বলবো, এক্ষুণি বৃষ্টি পড়ুক, অমনি সারা দেশ জুড়ে বৃষ্টি পড়বে। আমি বলবো, দেশের সমস্ত মাঠ ফসলে ভরে যাক, প্রত্যেকটি শিশুর জন্য স্কুল, প্রত্যেকের জন্য খেলার মাঠ, গ্রাম এবং শহরের লোক ঠিক এক রকম খাবার খাবে।

ছোট ছেলেরা বাথরুমে বসে যে-রকম স্বপ্ন দেখে আমি সেই রকম স্বপ্নে মশগুল হয়েছিলাম, এমন সময় গোরাচাঁদ এসে বললো, স্যার, আপনার ঝাড়গ্রামের বাস এসে গেছে।

ওঠবার সময় আমি হেসে বললাম, গোরাচাঁদ, আমি তোমাদের গ্রামে গিয়ে তোমার খবর জানিয়ে দেবো কিন্তু!

গোরাচাঁদ বিশেষ ভড়কালো না। বললো, তাড়াতাড়ি যান। এক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে।

বাসটায় প্রচণ্ড ভিড়। সারা গায়ে আবের মতন বাইরেও অনেক লোক ঝুলছে। তবু সেই ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো।

পুনশ্চ! ছোটমাসীর বাড়িতে বেড়াতে যেতেই উনি আমাকে প্রায় মারতে এলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, তুই আমাদের নামে কী সব আজেবাজে কথা লিখেছিস, তোর এত সাহস! আমি নিরীহভাবে উত্তর দিলাম, যা দেখেছি, তাই তো লিখেছি। কিছু তো বানাইনি! শুধু নামগুলো বদলে দিয়েছি। কেউ চিনতে পারবে না!

আমার বন্ধুর সম্পর্কে তুই যা-তা লিখেছিস। তোর সঙ্গে দেখা হলে দেখাবি ও কি করে!

—কি লিখেছি ঝর্নাদি সম্পর্কে? খারাপ তো কিছু নেই!

—খারাপ নেই! তুই লিখেছিস, ও তার মাসতুতো ভাইকে বিয়ে করেছে। ছিঃ, ছিঃ।

—মাসতুতো ভাই? তা কখন লিখলাম!

—তুই লিখেছিস ঝর্নাদির বউদির মাসতুতো দাওরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে! তার মানে কি হয়? বউদির মাসতুতো দেওর মানে মাসতুতো ভাই হয় না?

—এই রে! আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখতে গিয়েছিলাম—এসব সম্পর্ক-টম্পর্ক আমার মাথায় ঢোকে না একদম! আসলে ওটা বউদির মাসতুতো দাওর নয়, বউদির মাসতুতো ভাই হবে, তাই না? ঝর্নাদির সঙ্গে দেখা হলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে তো!

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

সমরনায়ক শিল্পী

লেফটেন্যান্ট জেনারেল বেদ প্রকাশের জন্ম পাঞ্জাবে। ডাক্তার হিসাবে তাঁকে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পরবর্তীকালে মিশর, লিবিয়া, গ্রীস, মধ্য-প্রাচ্য ও ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল ঘুরতে হয়। যুদ্ধ ও শান্তি, আহত, নিহত এবং জীবিত দেশ-দেশান্তরের মানুষ এবং নিসর্গদৃশ্য দেখার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন। অবসর-জীবনে তিনি পুরোপুরি ভাস্কর। জন্ম অবিভক্ত পাঞ্জাবের এমন এক পাড়া-গাঁয়ে যেখান থেকে নিকটতম রেল স্টেশন ষোল মাইল দূরে। হৃদয়ে ঘুমিয়ে ছিল একটি শিশু, যে স্বপ্ন দেখতো শিল্পী হবার।

অরণ্যময় ভারতবর্ষ। গাছপালা, বন্য পরিবেশ ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কে আসতে হয়েছিল তাঁকে পথে-প্রান্তরে যেখানে সামরিক ছাউনি পড়েছে। অন্য আরেকটা দিক আছে। কয়লার চেয়ে কাঠ সম্ভবত জ্বালানি হিসাবে এ-দেশে অধিক ব্যবহৃত হয়। গাছের টুকরোর মধ্যে নানা আকার দেখতে পেয়েছেন বেদ প্রকাশ। কোনো সুন্দর কাঠ বা গাছের গুঁড়ি তাঁর নজরে পড়লে তিনি নিজ অর্থব্যয়ে বা চেয়ে-চিন্তে যোগাড় করেছেন। কখনো কোনো গাছের গায়ে কুড়ুলের আঘাত করেননি। কিন্তু গাছ যখন শুধুমাত্র কাঠ তখনই তিনি কেবল অনুপ্রাণিত বোধ করেছেন। আম, জাম, জারুল, দেবদারু, শাল, সেগুন—নানা কাঠ তিনি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পোক্ত করেছেন। এমন কি আণবিক প্রক্রিয়ার radiation polymerisation ক'রে ছত্রক ও ক্ষতিকর প্রক্রিয়ার হাত থেকে কাঠকে বাঁচিয়েছেন অন্তত একটি ক্ষেত্রে। এর জন্যে ভাবা ইনস্টিটিউটে রেডিও আইসোটোপ বিভাগে ছুটিছেন।

গাছের মধ্যে ধ্যানে পেয়েছেন মৌল জ্যামিতিক রূপবন্ধ। (আকাদমী অব ফাইন আর্টস—৮-১৪ নভেম্বর) মায়ের কোলে বাচ্চা, তিব্বতী নর্তকী, চুম্বন, পার্বত্য ছাগল, উপজাতি নারীর ছন্দিত দেহ, গণেশ, গণ্ডার, পা ফাঁক করে বসে থাকা নারী-দেহের আকার, ছেনী, বাটালি, হাতুড়ী রেঁদা ও করাত চালিয়ে বের করে এনেছেন। তারপর ঘিয়ে রঙের চিক্কণ প্রলেপ চাপিয়েছেন নিপুণভাবে। কোথাও ব্যবহার করেছেন নরুন, কোথাও শিরীষ কাগজ ঘষেছেন। চুম্বনরত মিথুনমূর্তি দেখে রদাঁর কথা হয়তো মনে পড়ে, ছাগলের নাক দেখে মনে হয় এখুনি ঘোঁত ঘোঁত ক'রে উঠবে। বাকলের স্বাভাবিক এবড়োখেবড়ো ভাঁজ, টোল, ফোকরের সঙ্গে তাল মিলিয়েও সামঞ্জস্যের জন্যে নতুন কিছু যোগ করেছেন বা ছেঁটেছেন। এইভাবে ভাস্কর্যের গূঢ়, গম্ভীর, ছন্দোময় রূপারোপে দক্ষতা দেখিয়ে আবেগ এবং স্পর্শনেচ্ছাকে উত্তেজিত করেছেন। হুবহু সাদৃশ্য নয় কিন্তু সৃজনধর্মী রূপের ব্যঞ্জনা। বস্তুর আয়তন ও ভার বিভাজন, বস্তুপুঞ্জের সংস্থানের জমাটবাঁধা ঐকতান রচনা করেছেন আশ্চর্য ক্ষমতায়।

পাঠক, তুমি যদি কান পেতে শুনতে, তাহলে এইসব বড় বড় মূর্তির ভেতর থেকে ভারতবর্ষের প্রকৃতির বৈচিত্র্য, তার উদাত্ত সমুদ্রের গর্জন, বনমর্মর, মেঘের গুরুগুরু ধ্বনি, নদীর জলজ লাস্য, কলহাস্য এবং রুদ্রভয়ংকর রূপ বিশাল অরণ্য, হিমগম্ভীর পর্বতমালা আর বিচিত্র জনপদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের আওয়াজ শুনতে পেতে। কী আশ্চর্য প্রাজ্ঞ সেই মহাভারতী ধ্বনিতরঙ্গ—শুনতে শুনতে তুমি স্তব্ধ হতে, মুগ্ধ হতে। আর তখন করজোড়ে শিল্পীকে বলতে, নমস্কার। আজ আমার চোখ দুটি ধন্য হলো। কীর্তিশ্রেষ্ঠ আমার হৃদয়ের রণভূমে উড়ুক আপনার বিজয় বৈজয়ন্তী। আমি পরাভূত, কিন্তু সুখী।

দলীয় প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতার কতিপয় শিল্পীর একটি প্রদর্শনী দেখলাম। আয়োজন করেছিল শহরের জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (ম্যাকসমুলার ভবন ২-১৪ নভেম্বর)। শুধু কীভাবে শিল্পী নির্বাচন হলো বোঝা গেল না। কেননা সুনীলমাধব সেন থেকে বিকাশ ভট্টাচার্য পর্যন্ত নানা শিল্পী যেমন ছিলেন তেমনি কেন যেন এই বয়োক্রমের বহু শিল্পী বাদ পড়েছেন যাঁদের অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের কর্মরত শ্রেষ্ঠ চিত্রভাস্কর। নির্বাচিতদের মধ্যে গুটিকয়েক অতি সাধারণ মানের শিল্পীও নজরে পড়ল।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীদের কারো কারো কাজ দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন ভীষণ ক্লান্ত। আসলে যেন পুনরাবৃত্তিতে ভারী। যেন নেহাত অভ্যাসবশে কাজ করেছেন।

ভাস্কর্য বিভাগে মাধব ভট্টাচার্যের কাজ দেখে তবু মনে হয় বিমূর্ত নির্মিতির রূপবন্ধ সম্বন্ধে হয়তো তিনি কিছু খুঁজছেন। কিন্তু সদ্য জার্মানী প্রত্যাগত রণেন দত্তের কাজগুলো সত্যিই দুর্বল।

সুনীলমাধব সেন নিজের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সুনীল দাসের দুটি বড় বড় কাজ ছিল। তার মধ্যে করাল বৃহৎ দংষ্ট্রারেখা ও এক পাশে পেশীবহুল ভাঙা হাতের সহাবস্থানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বর্তমান সমালোচক ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না। আমি উভয় ছবিতে রঙ চাপানো ও সুনীলের নানাবিধ যাদুকৌশলে মুগ্ধ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন ভরল না। বিকাশ ভট্টাচার্যের একটি কাঠ-কয়লায় আঁকা আর অন্যটি কাঠকয়লা এবং জলরঙের কাজ ছিল—রেখাচিত্র-জাতীয় কাজ। তাঁর ত্রিমাত্রিক সদ্বাস্তব ছবি অনেক সময় গোইয়ার ডাইনী ভূতপ্রেতের এচিং-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবির মধ্যে অবশ্য সাহিত্যগুণের প্রাধান্য। রাস্তায় কাটামুণ্ডু, ভাঙা মূর্তি এসব চিত্রকল্প তাঁর হাতেই অতিপ্রসবে রক্তহীন। তাঁর ছবি আগের মতো আর নাড়া দেয় না। কিন্তু তাঁর আঁকার ক্ষমতা আছে এটা

অনস্বীকার্য। একটি ছবিতে তিনটে ভাসমান ঠোঁট অবশ্য ম্যাক্সফ্যাক্টারের বিজ্ঞাপনের কথা মনে করিয়ে দিল।

শ্যামল দত্তরায়ের জলরঙে আঁকা পাখির ঝাঁক একটু স্নিগ্ধ। গণেশ হালুই অত্যন্ত ধরে ধরে যত্ন সহকারে ছবি আঁকেন। সাধারণ আটপৌরে জীবন তাঁর হাতে কাব্যময় হয়ে ওঠে। অবশ্য সিঁড়ির এমন জায়গায় তাঁর ছবি টানানো হয়েছিল যে, ছবিটা চকচক করছিল। সবুজ প্রান্তরের প্রতিবেশে নৌকা থেকে ঘাটে নামার দৃশ্য এঁকেছেন তিনি।

বীণা ভার্গবের শুয়ে থাকা নগ্ন দেহের রেখা ও অঙ্কন যেমন জোরালো তেমনি রঙ চাপানো এবং দ্রুত তুলি চালানো উপভোগ্য। শুধু পটের প্রায় মধ্যস্থলে একটি অনুভূমিক রেখাকে ডান পাশে একটি তেরছা রেখা ছেদ করেছে কেন ঠিক বোঝা গেল না। গণেশ পাইনের চিত্রকল্পটি তৎপর্যপূর্ণ—গাছের ডালে বাসার সামনে বসে ভয়ার্ত পাখি চীৎকার করছে। এর মধ্যে তাঁর বুনোটের কারিকুরী আছে, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি রঙের ক্রমোজ্জ্বলতা ও স্নিগ্ধ দ্যুতির মরমী মায়া নেই। ছবিতে একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মণ্ডনের জন্যে এক ধরনের লতাপাতা শিকড়-সুদ্ধ আঁকতেন তিনি (এবং অন্যরা, এমন কী তাঁর চেয়ে বয়সে বড় কিছু শিল্পী তাঁকে নকল করতেন) যা তাঁর ছবির ভয়ংকর বক্তব্যের কাছ থেকে অসতর্ক দর্শকের চোখ ঘুরিয়ে দিত অন্যদিকে। তাঁর ছবিতে পুরাকল্পের অস্পষ্ট আভাস থাকে কখনো, কিন্তু প্রায়ই, বা হয়তো সবসময় মগ্ন চৈতন্যের প্রতীক ও প্রতিমা থাকে। হয়তো তাঁর ছবির অন্তর্নিহিত চিত্রল ভয়াবহতার বাইরের স্নিগ্ধ মোড়কটুকু তিনি যেন খুলে ফেলতে চাইছেন। কিন্তু তাঁর চিত্র-রূপময় রচনার দৃঢ় নির্মিতি এবং অংকনের সৌন্দর্য পূর্ববৎ। তাঁর মধ্যে নতুন কোনো পরিবর্তন সাগ্রহে লক্ষ করার জন্যে আমরা প্রস্তুত।

বি আর পানেসারের পুরোচিত্রের কোলাজের বিরাটত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চারিদিকের ফাঁকা মাঠের মধ্যে শহরটা কেমন যেন মৃত—অবাস্তব। আর রবীন মণ্ডলের চারটে কোলাজ দেখে ইয়েটসের 'ভয়ংকর সৌন্দর্যের' জন্মের কথা মনে হয়। রবীনের কোলাজের নির্মাণের দৃঢ়তা এবং সামগ্রিক রচনার সাদাসামা তেলরঙ ও কাটা কাগজের রঙের ওজনের মিল, আর বিচিত্র উপজাতীয় ও লোকায়ত প্রতীক ও চিত্র-কল্পের ব্যবহার তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে। বিচিত্র টোটেম, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীস্ট—সব মিলিয়ে রূপারোপের জটিল সারল্যের অভিঘাত আমাদের ভেতরের বোধকে মথিত করে।

কোলাজের পর ভাল হয়েছে ছাপা ছবির কাজ। অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালুপ্রসাদ সাহু বেশ জমাটি রঙীন কাজ করেছেন। যদিও সম্প্রতি আকাদমী অব ফাইন আর্টসে যুগোস্লাভিয়ার এমন সুন্দর গ্রাফিক দেখেছি যে, এ বিষয়ে আলাদা করে আলোচনার কারণ দেখি না।

টাইপরাইটারের ছবি

জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী পেন্সিলে স্কেচ করে নিয়ে তারপর টাইপরাইটারে ছবি আঁকেন। এর জন্যে আবার তিনি অন্য বর্ণের রিবন করেছেন। জীবনকৃষ্ণবাবুর অভিনবত্বকে আমরা সাধুবাদ জানাই কিন্তু ছবির নান্দনিক একটা দিক আছে—চিত্রাতিরিক্ত কিন্তু খুবই সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা, এইখানেই তাঁর ঘাটতি আছে। তাঁর ছবিগুলো খুবই কমার্সিয়াল—তা ছাড়া আর কি বলা যায়? তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি প্রতিভাবান শিল্পীর হাতে ভিন্নতর স্বাদ নিয়ে আসতে পারে।

সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ : সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক

পরিপ্রশ্ন। জ্যোতি ভট্টাচার্য। সুপথা, ৪১বি কালী দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৫। মূল্য- পনের টাকা।

বাংলা সাহিত্যে নিছক প্রবন্ধের গ্রন্থ প্রকাশিত হলেই দুর্জনেরা তিনটি খবরের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এক, লেখক কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কিনা। দুই, সামনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা আছে কিনা এবং প্রবন্ধের বিষয়গুলি সেই বিশেষ পরীক্ষাটির পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত কিনা। তৃতীয়, চাকুরির উন্নতিসূচক ডিফিল বা পিএইচডি ডিগ্রির উপজাত কোন গ্রন্থ কিনা। সৌভাগ্যবশত শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সম্পর্কে প্রথম খবরটি সত্য হলেও তাঁর 'পরিপ্রশ্ন' গ্রন্থটি সম্পর্কে শেষ দুটি একেবারেই প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন সময়ে চিন্তিত লিখিত এবং সংশোধিত পরস্পরের সঙ্গে অ-যুক্ত তিনটি প্রবন্ধের সমাহার এই পরপ্রশ্ন গ্রন্থটি। এক নম্বর প্রবন্ধ হল বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্যকার বানভট্টের রাজা হর্ষবর্ধনের উপর লেখা কাব্যে সমাজচিত্রের অনুসন্ধান। দ্বিতীয়টিতে আলোচিত হয়েছে 'কালচার' ও 'সংস্কৃতি'র বহু আলোচিত ও বহু বিতর্কিত বিষয়টি। তৃতীয় প্রবন্ধটি হল রাজনীতি-বিষয়ক লেখার ভাষা ও অনুবাদ সম্পর্কিত সমস্যা- বলীর আলোচনা।

বিনয়ী ও বুদ্ধিমান লেখক গ্রন্থের নামকরণ ও মুখবন্ধের চতুর ভাষণে সমালোচকের উদ্যত ফণার সামনে দুধ- কলার বাটি রেখে দিয়েছেন। বলেছেন, তিনি নিজে কিছুই বলতে চাইছেন না। তাঁর অনেক প্রশ্ন আছে। আছে বহু জিজ্ঞাসা। এই পরিব্যাপ্ত প্রশ্নই 'পরিপ্রশ্নে'র মধ্যে বিধৃত হয়েছে। যদিও লেখার ধরনটি সব- সময় জিজ্ঞাসার আকারে রাখা হয়নি, আলোচনার শরীরে শরীরে লেখকের জিজ্ঞাসাই ধ্বনিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞানেরই জন্ম জিজ্ঞাসা থেকে। তবু যে লেখক 'জিজ্ঞাসা' কথাটিকে সাইনবোর্ডের মত বড় করে ঝুলিয়ে দিয়েছেন সেটা একটা টেকনিক। চতুর লেখক চমৎকার একটি আড়াল নিয়ে নিজের বক্তব্যটি নিঃশেষে প্রকাশ করেছেন। লেখায় ঢংটি লে ম্যানের অথবা আমি সামান্য জানি—এই ধরনের। আসলে কিন্তু তিনি বিষয়গুলি বেশ ভাল- ভাবেই জানেন এবং কিভাবে অপরকে জানাতে হয় সেই বিদ্যাটাও তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। আর এটাই বোধ করি প্রাবন্ধিকের সবচেয়ে বড় গুণ।

বাণভট্ট সংস্কৃত সাহিত্যের এক অসাধারণ শিল্পী। দুটি কারণে ইনি ওঁর প্রতিভার অনুপাতে কোনদিনই জনপ্রিয় হতে পারেননি। প্রথমত, কি সেকালে কি একালে সংস্কৃত কখনই জনতার ভাষা নয়। দ্বিতীয়ত তাঁর অতিশয়োক্তি, অতি- কথন, অলঙ্কার বহুলতা, দীর্ঘ সমাসবন্ধ পদে ও সন্ধিকৃত রাশি রাশি শব্দের কারণে এমনকি মোটামুটি শিক্ষিত লোকের কাছেও বাণভট্ট চিরকাল দুর্ভেদ্য। এতৎ সত্ত্বেও ঐসব বেড়া ডিঙিয়ে যদি কোন রসিক- পণ্ডিত বাণভট্টে অনুপ্রবেশ করতে পারেন তাহলে যে আশ্চর্য রত্নের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে তারই পরিচয় দিয়েছেন লেখক প্রথম প্রবন্ধটিতে। এবং সম্ভবত বাণভট্টের রচনা- শৈলীর সর্বজনবিদিত দোষগুলি যে তাঁর

সচেতন শিল্পপ্রকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এমন একটি ব্যাখ্যা এই প্রথম করা হল। তাছাড়া আধুনিক বিচার ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে লেখক রাজ দরবারের এই কবির সচেতন বর্ণনাগুলি অপেক্ষা অসচেতন বা ক্যাসুয়েল বর্ণনা ও শব্দ থেকে সুদূর সপ্তম শতাব্দীর সাধারণ মানুষের জীবনের পরিচয় নিষ্কাষিত করার চেষ্টা করেছেন। এবং এই ব্যাপারে তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'কালচার ও সংস্কৃতি'। ইংরেজী 'কালচার' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি কতখানি গ্রহণযোগ্য এই আলোচনা দিয়ে প্রবন্ধ শুরু হয়েছে। এবং কালচার ব্যাপারটা সভ্যতার বিবর্তিত পরিস্থিতিতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতায় যে এক সুবিশাল ব্যাপার—তা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। তিনি প্রথমেই ল্যাটিন কালচার, ইংরেজী এগ্রিকালচার, ল্যাটিন পিসিকালচার, প্রতিষেধক তৈরিতে জীবাণুর কালচার, রক্তের গভীরে লুকানো রোগ-জীবাণু আবিষ্কার রক্তের কালচার ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন কালচার শব্দটির মধ্যে কর্ষণ বা অনুশীলনের দ্বারা নূতন বস্তু বা নূতন গুণ সৃষ্টির ইঙ্গিত রয়েছে। এর ঝোঁক উৎপাদনমুখী। কোনো না কোনো রকম বৃদ্ধি এর ফল। কিন্তু সংস্কৃতি শব্দটির লক্ষ্য যা আছে তাকেই একটা পরিশীলিত সংযত ও সুকুমার রূপ দান করা। নূতন বস্তু সৃষ্টি, নূতন গুণ উৎপাদন বা সংখ্যা বৃদ্ধি সংস্কৃতির লক্ষ্য নয়। এইভাবে সংস্কৃতি কথাটা কালচার শব্দের সঙ্কুচিত অর্থ বহন করে। এর সঙ্গে জুটেছে আমাদের দেশের এমন-কি শিক্ষিত লোকেদের বিস্ময়কর ধারণা—নাচ-গান অভিনয় ললিতকলার চর্চা, ভদ্রলোকের মত চলাবলা শিষ্টাচার সহবৎ-ই হল সংস্কৃতি। পার্টকে হোল বললে যে ভুল হয় এক্ষেত্রে সেই ভুলই হয়ে চলেছে। ঐগুলো সংস্কৃতির অঙ্গ হতে পারে কিন্তু শুধু ঐগুলোই সংস্কৃতি নয়।

লেখকের মতে সংস্কৃতি জীবনযাপনের শিক্ষা, জীবনধারণের শিক্ষা। বহু বিচিত্র দক্ষতা ও কর্মনিপুণতার [illegible]। উৎপাদন। উদ্ভাবনা। নির্মাণ। [illegible]নের বাস্তব ও ইহলৌকিক প্রতিভা [illegible] কথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে লেখক বহুবিচিত্র প্রসঙ্গ ও কথার অবতারণা করেছেন। এনেছেন মার্কসের উক্তি। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য। সোজাপথে এসেছে কিংলীয়ার তথা সেকস্‌পীয়রের কথা। এসেছে বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্য, বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর ধ্যান-ধারণা—লেনিন, মাও-সেতুং ও কালচারাল রিভোলিউশনের কথা। বেদ উপনিষদ ও যীশুখৃষ্টের বাণী লেখকের স্বচ্ছ চিন্তার স্রোতে এক মোহনায় এসে মিশেছে। সেখানে কালচার তথা সংস্কৃতির ব্যাপকতা মানবসভ্যতার বিকাশের মহাগুণাবলীর অনন্ত আকাশে বিলীন হয়ে গেছে।

তৃতীয় প্রবন্ধটির বক্তব্য অন্য দুটি প্রবন্ধের তুলনায় সঙ্কীর্ণ হলেও জীবন সচেতন তথা রাজনীতি সচেতন মানুষের পক্ষে বিশেষভাবে ভাববার বিষয়। ভারত-বর্ষের মত বহুভাষী দেশে 'ভাষা' ব্যাপারটা যে রাজনীতির বড় হাতিয়ার তা স্বাধীনতার প্রায় ত্রিশ বছর পরে আজো স্পষ্ট। দেশের আপামর জনসাধারণ ভাষা পায়নি। কিন্তু তাদের বোকা বানাবার ভাষা তৈরি হয়েছে। যেমন 'দেশমাতৃকা', 'প্রেম', 'অহিংসা', 'ভারতাত্মা', 'রামরাজ্য' 'এশিয়ার সূর্য' 'জাতির জনক', 'জাতীয় ঐতিহ্য' (লেখকের উল্লেখিত) 'কমরেড' 'লালসেলাম' 'শ্রেণী-শত্রু' 'বুর্জোয়া' 'বিপ্লব' ইত্যাদি (লেখকের অনুল্লেখিত)। এসব দিয়ে একশ্রেণীর নেতারা করে খাচ্ছেন, খাবেন‌ও বটে। কিন্তু যারা সত্যি মানুষের জন্য রাজনীতি করেন

তাঁরা কখনোই মানুষের কাছে দুর্বোধ্য হতে পারেন না। অথচ রাজনীতির ভাষা কিভাবে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে তার চমৎকার নিদর্শন লেখক পরিবেশন করেছেন 'মস্কোর বাংলা' ও 'অধ্যাপক মহাশয়ের কাণ্ড' উপ-প্রবন্ধে। জাঁকিয়ে অধ্যাপনা, লেখায় কথায় অহরহ পাণ্ডিত্যের বারিসিঞ্চনের প্রবণতার সঙ্গে পল্লবগ্রাহিতার ভয়াবহ সহাবস্থানের চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখেছেন লেখক জ্যোতি ভট্টাচার্য 'অধ্যাপক মহাশয়ের কাণ্ড' শীর্ষক অংশে।

তিনটি প্রবন্ধই লিখিত হয়েছে অতি প্রাঞ্জল ভাষায়। বিষয়কে সাবলীল করে তোলার টানেই ভাষা এসেছে। পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা নেই। কিন্তু পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয়েছে। বিষয় লেখকের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। প্রবন্ধগুলি দীর্ঘ। কিন্তু স্বতঃউৎসারণের গুণে দীর্ঘ মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যে 'টানা-গদ্যের' যখন রমরমা তখন এমন বুদ্ধিগ্রাহ্য ও যুক্তি পরিবেশিত গ্রন্থের খুব বেশি পাঠক পাওয়া যাবে এমন মনে হয় না। হলে আনন্দিত হওয়ার মত ঘটনা ঘটবে। মুদ্রণপ্রমাদ আছে। সংশোধন তালিকাটি চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক।

অমল মুখোপাধ্যায়

মাদলের মাদকতা এক ধরনের মুখ-বদলের সুযোগ দেয়।

*

গল্পের মধ্যে বর্ণনা নিশ্চিত প্রয়োজনীয় অংশ, কিন্তু বর্ণনাই গল্প নয়। প্রদোষ দত্ত-র **ভালবাসা এবং অপর্ণা** (গ্রন্থমিত্র, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা) নামের গল্পসংগ্রহে মোট ছটি রচনা। অথচ নিটোল একটি গল্পের পরোপুরি স্বাদ অধিকাংশ লেখাতেই পাওয়া গেল না।

প্রদোষবাবুর ভাষায় জড়তা নেই, বর্ণনার বাঁধুনিও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু গল্প যে শুধুই ঝরঝরে ভাষায় বর্ণনা নয়, এ-কথা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মনে রাখেননি। ব্যতিক্রম শুধু 'জনক'। বর্ণনার অতিরিক্ত একটি অভিঘাত শেষ পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়ে যায় পাঠকের মনে। এই ধাক্কাটুকুই গল্প।

গল্পের নামকরণের ব্যাপারে তিনি একেবারেই কল্পনাহীন। কেঁদুলির মেলা থেকে পালিয়ে এসেছে নায়ক দীপেন। সুতরাং গল্পের নাম 'নায়কের পলায়ন'। অপর্ণার গোপন ভালবাসার হদিশ পেল নায়ক প্রশান্ত। সেই নিয়ে 'ভালবাসা এবং অপর্ণা'। শেকসপীয়র যাই বলুন, নামেও এসে যায়।

*

রবীন আদক-এর প্রথম কাব্যগ্রন্থটি চোখে পড়েনি। **আদিগন্ত প্রবাস** (বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯, চার টাকা) তাঁর দ্বিতীয় কাব্য-সংকলন। দুটি পর্বে কবিতাগুলি সাজিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় পর্বের নাম—'কিংবদন্তীর রাজবাড়ি'। এই পর্ববিভাগের যৌক্তিকতা, সত্যি বলতে কি কবিতা পড়ে অনুধাবন করা যায়নি।

রবীন আদকের হাতে ছন্দ প্রায় নির্ভুল। প্রায় বলতে হল, 'এ নৈরাজ্যে রাজা' কবিতার কথা মনে রেখে। কবিতাটির পঞ্চম পংক্তির ('তোমার ধ্বজায় রক্ত লেগে গেল, হিংস্র অঙ্গুলি') 'হিংস্র অঙ্গুলি'তে কানের ও চোখের সায় পাওয়া গেল না। এছাড়া অন্যত্র ছন্দ ঠিকঠাক। ছন্দের খাতিরে দু-একটি প্রাচীন শব্দ—'কোথা', 'সেথা' জাতীয়—ব্যবহারেও তিনি অকুণ্ঠিত। দু-এক ক্ষেত্রে অগ্রজ কবির ঋণ উদ্ধৃতি-কমা ছাড়াই ব্যবহৃত। যেমন, 'প্রীতি ফুলে কেবা মনে রাখে?' 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে'—জাতীয় অবিকল পংক্তি।

সব মিলিয়ে রবীন আদক ছাপ রেখে যান। তাঁর বিষয়-নির্বাচন, সময় মনস্কতা ও শব্দ-ব্যবহার প্রশংসনীয়। প্রশংসনীয় 'লোকটা', 'আমার যা কিছু ছিল 'ফুলেও বারুদগন্ধ' কিংবা 'মুকুটমণিপুরে বৃষ্টি' জাতীয় কবিতা রচনায় নৈপুণ্য।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'দিদি যি উছুরছে
থাইলে দিদির আমার আরুচ্‌ করেছে
ঢেক্‌ মানত করেছি—উ-ঠিক পাঁতি ব্যাটে
পাঁতি মানুষের বড় আঁশ পাত্‌লা হয়—'

না, শহুরে মার্জিত ভাষায় বর্ণিত কবিতা নয়, কবিতার মধ্য দিয়ে একটি আঞ্চলিক জনপদ, বাক্‌ভঙ্গি ও শব্দ-ব্যবহারের বিশিষ্টতা ফুটে উঠেছে। শুধু শব্দ নয়, শব্দের নেপথ্যে যেন মাদলের দ্রিমিদ্রিমি আওয়াজও এসে কানে পৌঁছোয়।

এই মাদল এনেছেন তরুণ কবি সুভাষ দত্ত। বাংলা কবিতায় নতুন স্বাদের সংযোজন করলেন তিনি। তাঁর কবিতার বই **আমি মাদল লি-আইছি** (লেখক কর্তৃক বীরভূম থেকে প্রকাশিত, তিন টাকা) আদ্যন্ত বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। তাঁর নিজের দাবি, 'যথার্থ স্বাদ পেতে হলে সশ্রদ্ধ পরিশ্রমে জেনে নিতে হবে যথাযথ উচ্চারণ, শব্দার্থ ও উপমার অন্তর্নিহিত অমোঘ শরক্ষেপটি।'

খুবই সঙ্গত দাবি সন্দেহ নেই। শুধু সন্দেহ এই যে, এহেন সশ্রদ্ধ পরিশ্রমী পাঠক আদৌ পাওয়া যাবে তো!

সাধারণভাবে পড়ে গেলেও অবশ্য

'ওগো
নিরুপমা'
আজি হও মনোরমা,
NIVEA
creme
রোদ, বৃষ্টি, ঝড় কে পরোয়া না করে নিজেকে এমনি
করেই সুন্দর রাখুন।

খেলার মাঠে

দিল্লিতে ভারত ও ইংলন্ডের এই সিরিজের প্রথম টেস্টটি দুই দেশের মধ্যে ৪১তম টেস্ট এবং সব দেশের সঙ্গে খেলার হিসাবে ভারতের ১৪৮তম টেস্ট খেলা। এই সিরিজের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খেলোয়াড়দের টেস্ট খতিয়ান নীচে দেওয়া হল।

গাভাসকর—টেস্ট ২৭; ইনিংস ৫২; নঃ আঃ ৫; রান ২৩৮২; সর্বোচ্চ রান ২২০; সেঞ্চুরি ৯; গড় ৫০·৬৮।

বিশ্বনাথ—টেস্ট ৩৩; ইনিংস ৬৩; নঃ আঃ ৬; রান ২৫০৬; সর্বোচ্চ রান ১৩৯; সেঞ্চুরি ৫; গড় ৪৩·৯৬।

অংশুমান—টেস্ট ৯; ইনিংস ১৬; নঃ আঃ ২; রান ৫৩৮; সর্বোচ্চ রান নট আউট ৮১; গড় ৩৮·৪২।

মহীন্দার অমরনাথ—টেস্ট ১১; ইনিংস ২০; নঃ আঃ ১; রান ৭০১; সর্বোচ্চ রান ৮৫; গড় ৩৬·৮৯। বোলিং—বল ১০৬১; মেডেন ৩০; রান ৪৪২; উইকেট ১০; গড় ৪৪·২০।

ব্রিজেশ প্যাটেল—টেস্ট ১৯; ইনিংস ২৪; নঃ আঃ ৫; রান ৬৪০; সর্বোচ্চ রান নট আউট ১১৫, গড় ৩৩.৬৮।

কিরমানি—টেস্ট ১০; ইনিংস ১৩; নঃ আঃ ৩; রান ৩২৩; সর্বোচ্চ রান ৮৮; গড় ৩২·৩০।

অশোক মানকড়—টেস্ট ১৮; ইনিংস ৩৫; নঃ আঃ ৩; রান ৮৬৮; সর্বোচ্চ রান ৯৭; গড় ২৭·০৬।

মদনলাল—টেস্ট ১২; ইনিংস ২২; নঃ আঃ ৬; রান ৩২৫; সর্বোচ্চ রান নট আউট ৫৫; গড় ২০·৩১। বোলিং—বল ১৭২৯; মেডেন ৫৪; রান ৬৯৪; উইকেট ১৭; গড় ৪০·৮৮।

কারসন ঘাউড়ি—টেস্ট ৫; ইনিংস ৮; নঃ আঃ ১; রান ১৩২; সর্বোচ্চ রান ৩৭; গড় ১৮·৮৫। বোলিং—বল ৬৭৮; মেডেন ২২; রান ৪১৩; উইকেট ১৩; গড় ৩১·৭৬।

বেংকটরাঘবন—টেস্ট ৩৫; ইনিংস ৫১; নঃ আঃ ৮; রান ৬০৫; সর্বোচ্চ রান ৬৪; গড় ১৪·০৬। বোলিং—বল ৯৫১৫; মেডেন ৪৮৪; রান ৩৫৬১; উইকেট ১০৯; গড় ৩২·৬৬। ইনিংসে ৫ উইকেট পাঁচবার। শ্রেষ্ঠ অ্যাভারেজ ৮—৭২।

বেদী—টেস্ট ৪৮; ইনিংস ৭২; নঃ আঃ ১৭; রান ৪৭২; সর্বোচ্চ রান নট আউট ৫০; গড় ৮·৫৮। বোলিং—বল ১৫৬১৬; মেডেন ৮৫৩; রান ৫৩০১; উইকেট ১৯০; গড় ২৭·৯০। ইনিংসে ৫ উইকেট নয়বার; শ্রেষ্ঠ অ্যাভারেজ ৭—৯৮।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের খতিয়ান

চন্দ্রশেখর—টেস্ট ৪০; ইনিংস ৫৪; নঃ আঃ ৩০; রান ১৩৮; সর্বোচ্চ রান ২২; গড় ৫·৭৫। বোলিং—বল ১১৫১৮; মেডেন ৪৭৩; রান ৫০২৯; উইকেট ১৭৫; গড় ২৮·৭৩; ইনিংসে ৫ উইকেট ১০ বার; শ্রেষ্ঠ অ্যাভারেজ ৮—৭৯।

প্রসন্ন—টেস্ট ৩৯; ইনিংস ৬৬; নঃ আঃ ১৪; রান ৫৭৯; সর্বোচ্চ রান ৩৭; গড় ১১·০১। বোলিং—বল ১১৫০৫; মেডেন ৪৭১; রান ৪৮২৩; উইকেট ১৬৩; গড় ২৯·৫৮; ইনিংসে পাঁচ উইকেট পাঁচবার; ম্যাচে দশ উইকেট দুইবার; শ্রেষ্ঠ অ্যাভারেজ ৮—৭৬।

পার্থসারথি শর্মা—টেস্ট ৩; ইনিংস ৬; নঃ আঃ ০; রান ১২৫; সর্বোচ্চ রান ৫৪; গড় ২০·৮৩।

বেণুসরকার—টেস্ট ৫; ইনিংস ৯; নঃ আঃ ০; রান ১৪৪; সর্বোচ্চ রান ৩৯; গড় ১৬·০০।

সুরেন্দ্র অমরনাথ—টেস্ট ৫; ইনিংস ৯; নঃ আঃ ০; রান ২২৩; সর্বোচ্চ রান ১২৪; সেঞ্চুরি ১; গড় ২৪·৭৭।

এ বছরের ডুরান্ড

এ বছর পূর্ণ শক্তি নিয়েই মোহনবাগান ডুরান্ডে গিয়েছিল। ইস্ট বেংগল গিয়েছিল ছিন্ন দল নিয়ে। আথেলে য়াড়সুলভ আচরণের জন্য নামী চারজন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ক্লাব কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তারা ডুরান্ডে যেতে পারেনি। এই চারজন হচ্ছে গোলকিপার তরুণ বসু, ব্যাক সুধীর কর্মকার, স্টপার অশোকলাল ব্যানার্জি এবং হাফ ব্যাক গৌতম সরকার। শেষ পর্যন্ত ক্লাব এদের সাসপেন্ডও করেছে। এই নামী চার খেলোয়াড় ছাড়া ইস্টবেংগল ডুরান্ডে সাধারণ ভাল খেলেছে। কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে ব্যাঙ্গালোরের সি আই এলকে ১—০ গোলে, মহমেডান স্পোর্টিংকে ২—০ গোলে এবং গতবারের বিজয়ী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে ১—০ গোলে হারিয়ে ইস্ট বেংগল সেমিফাইনালে ওঠে। সেমিফাইনালে গতবারের রানার্স জে সি টি মিলস দলের বিরুদ্ধে নির্ধারিত ৯০ মিনিটের মধ্যে ৮৯ মিনিট পর্যন্ত ২—১ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত টাই ব্রেকারে ৫—৭ গোলে হেরে যায়।

অপর দিকে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে মোহনবাগান ৩—১ গোলে লীডার্স ক্লাবকে এবং ১—০ গোলে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবকে পরাজিত করলেও জে সি টি মিলসের কাছে হেরে যায় ০—২ গোলে। তবু মোহনবাগানের সেমিফাইনালে যাবার সম্ভাবনা ছিল লীডার্স ও জে সি টি সমান পয়েন্ট সংগ্রহ করায়। কিন্তু জে সি টি ও লীডার্সের শেষ খেলায় এমন ফল হল যে, প্রতিযোগিতার নিয়মে মোহনবাগান সেমিফাইনালে উঠতে পারল না, গোল অ্যাভারেজ ভাল থাকা সত্ত্বেও। লীডার্স ও জে সি টি-র খেলায় যে ফল (২—৪) হয়েছে তাতে সন্দেহের কারণ আছে; খুব হিসাবনিকাশ ছাড়া ওই ফল হতে পারে না। মোহনবাগানকে সেমিফাইনালে উঠতে না দেবার জন্যই ফল গড়াপেটা করা হয়।

শেষ পর্যন্ত গতবারের বিজয়ী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং রানার্স জে সি টি মিলস ফাইনাল খেলে এবং দু দিনের খেলায় ফল না হওয়ায় দুই দলকে যুগ্ম জয়ী ঘোষণা করা হয়।

ডেভিস কাপ

ডেভিস কাপে ভারতের কাছে জাপান আবার হারল। বহু আগে একবার ১৯২১ সালে শিকাগোয় আর একবার ১৯৩০ সালে লন্ডনে ভারতকে পরাজিত করা ছাড়া ডেভিস কাপের খেলায় জাপান কোনবারই ভারতের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি। এবারও দিল্লিতে পূর্বাঞ্চলীয় কোয়ার্টার ফাইনালে হারল ২—৩ ম্যাচে।

ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ ব্যাঙ্গালোর প্রাঁ প্রীতে খেলেনি পিঠের পেশীতে টান ধরায়। ওই কারণে নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন রামনাথন কৃষ্ণন ডেভিস কাপেও তার বদলে প্রাঁ প্রী বানস শশী মেননকে দলভুক্ত করেন। কিন্তু প্রথম দিনের সিঙ্গলসে জাপানের ২৯ বছর বয়সী খেলোয়াড় জুন কামাওয়াজুমি শশীকে পরাজিত করায় ডাবলসে আনন্দ অমৃতরাজের জুড়ি হিসাবে বিজয়কেই খেলতে হয়। এবং বলা বাহুল্য, অমৃতরাজ ভ্রাতৃদ্বয়ই ভারতকে জয়ের সম্মান এনে দেয়। আনন্দ দুটি সিঙ্গলসেই কোনিচি হিরাই ও জুন কামাওয়াজুমিকে পরাজিত করে। শশী দুটি সিঙ্গলসেই হেরে যায়। পূর্বাঞ্চলীয় সেমি-ফাইনালে ভারতকে এখন খেলতে হবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

একলব্য

শীতের ক্রিকেট অতিথি (৯)

নাম ওল্ড হলেও বয়সটা বেশি নয়। ২৭ বছর। এম সি সি দলে ওর চেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় আছেন তিনজন। সর্ব-কনিষ্ঠ জিওফ মিলার। বয়স ২৪। তার পর ডেরেক র‍্যানডল (২৫) ও গ্রাহাম বার্লো (২৬)। চার বছর আগে টনি লুইসের এম সি সি দলের সঙ্গে যখন ভারত সফরে এসেছিলেন তখন ওল্ডই ছিলেন দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়।

ওই বছর হোম সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে দ্বাদশ খেলোয়াড় ছিলেন। সম্ভাবনাময় বোলার হিসাবেই ভারতে পাঠানো হয়েছিল এবং কলকাতার ইডেনে হয়েছিল টেস্ট অভিষেক। তার আগে অবশ্য বেসরকারী টেস্ট খেলেছিলেন ১৯৭০ সালে বিশ্ব একাদশের বিরুদ্ধে।

পুরো নাম ক্রিস্টফার মিডলটন ওল্ড। জন্ম মিডলসবরোতে, ১৯৪৮ সালের ২২ ডিসেম্বর। ১৭ বছর বয়সে ইয়র্কশায়ার কাউন্টির প্রথম দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। কিন্তু প্রথম পাঁচ বছর বিশেষ উল্লেখ করার মত কিছুই করতে পারেননি। ৬৯-এ বিশেষজ্ঞদের নজরে আসেন কাউন্টি ক্রিকেটে ভাল ভাল ব্যাটসম্যানকে ঘায়েল করে। উইকেটের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। ওই বছর বহু বোলারই ওর চেয়ে অনেক বেশি উইকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু ৫৭টি উইকেট ওল্ডের অ্যাভারেজ ছিল ১৮·৬১। আর আগেই বলেছি, বেশির ভাগ শিকার ছিল নামী ব্যাটসম্যানরা।

পরের মরসুমে, অর্থাৎ ১৯৭০-এ দেখা গেল ওল্ডের উইকেটের সংখ্যাই শুধু বাড়েনি, ব্যাটেও বেশ কিছু রান এসেছে। এবং বলার কথা উইকেট ৭৪ এবং রান ৫০০ হলেও আবার ইংলন্ডের প্রতিষ্ঠিত ব্যাটস-ম্যানদেরই বেগ দিয়েছেন, আর রানও করে-ছেন নামী বোলারদের বলে। এটাই ক্রিকেটারের গুণ বিচারের নিরিখ। কী ধরনের ব্যাটসম্যানকে বোলার বেগ দিচ্ছে এবং কোন ধরনের বোলারের বিরুদ্ধে ব্যাটসম্যান রান করছে তার ভিত্তিতেই খেলোয়াড়ের যোগ্যতা বিচার করা হয়। সম্ভবত ওই কারণে ক্রিস ওল্ড ওই বছর ক্রিকেট-লিখিয়েদের ভোটে 'বেস্ট ইয়ং ক্রিকেটার অব দি ইয়ার'-এর সম্মান পান।

কিন্তু স্বর্ণ-সম্ভাবনার শুরুতেই শল্য-চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয় ডান হাঁটুতে গোলমাল দেখা দেওয়ায়। রান-আপের সময় হাঁটুতে ব্যথা বোধ করেন। ১৯৭১ মরসুমে ডান হাঁটুতে অপারেশন করা হল। ফলে সারা মরসুমটাই প্রায় বরবাদ হয়ে গেল। মাঝেসাঝে অপরূপ খেলা ছাড়া নিয়মিত খেলতে পারেননি। ডান হাঁটুর ব্যথা কমল তো ১৯৭২ মরসুমের প্রথম দিকেই বাঁ হাঁটু গোলমাল করতে আরম্ভ করল। ফলে বাঁ হাঁটুর উপরও ছুরি চালাতে হল। তবু মাঠের ডাকে ক্রিস ওল্ড ঘরে শুয়ে থাকতে পারেননি। বেশ কয়েকটি ম্যাচ বাদ গেলেও ১৭·২৪ গড়ে ৫৪টি উইকেট পেয়েছিলেন।

এ বছরও ওল্ড হাঁটুর ব্যথা অনুভব করেছিলেন। এম সি সি দলে নির্বাচিত হবার পরও প্রশ্ন উঠেছিল ভারতে আসতে

ক্রিস্টফার মিডলটন ওল্ড

পারবেন কিনা। তাঁর দুই জখমী হাঁটু পাঁচদিনের টেস্টের ধকল সইতে পারবে কিনা। ডাক্তারের ছাড়পত্র পেয়েই ভারতে এসেছেন।

১৯৭২-৭৩-এ কলকাতায় যাঁর টেস্ট অভিষেক হয়েছিল এই চার বছরে সেই ওল্ড সব দেশের বিরুদ্ধেই টেস্ট খেলেছেন। এখন মোট ২৬টি টেস্টের ৩৮ ইনিংসে ওঁর রান ৫২৫। গড় ১৬·৪০। ২৮·৭০ গড়ে উইকেটের সংখ্যা ৮৬।

এই হিসাব নিশ্চয়ই বড় ক্রিকেটারের পরিচয় নয়। কিন্তু যেটা ওল্ডের বিশেষত্ব সে কথা আগেই বলা হয়েছে। কলকাতায় জীবনের প্রথম টেস্টটির কথা ধরা যাক। সে টেস্টে পরাজিত ইংলন্ড দলের অপরাজিত খেলোয়াড় ছিলেন ওল্ড। দুই ইনিংসের কোন ইনিংসেই আউট হননি। বেদী-চন্দ্র-প্রসন্নর ঘূর্ণি বল খেলেছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে। ৩৩ এবং ১৭ রানে অপরাজিত ছিলেন। দুই ইনিংসে ৬টি উইকেট পেয়েছিলেন ১১৫ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে ও'র শিকার ছিল গাভাসকার (২), পার্কার (১৫), বিশ্বনাথ (৩৪) এবং আবিদ আলী (৩)।

ক্রিস ওল্ড ডান হাতের সূচনাকারী ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। বল বেশ ফাস্ট। সাধারণত আউটসুইংগার। তবে ইনসুংও করাতে পারেন। দ্রুত গতির বল সুইং করে একটু দেরীতে। ক্রিকেটের পরিভাষায় যাকে বলে লেট আউটসুইংগার। পৃথিবীর যে-কোন বড় ব্যাটসম্যান ওই বলে বিভ্রান্ত হতে পারে। বিপদেও পড়তে পারে। আমাদের অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকরই তো বিপদে পড়েছিলেন। আমার বেশ মনে আছে প্রথম দিন ওল্ডের বল যখন ওয়াদেকরের পাঁজরে লাগল এবং ওয়াদেকর ভূমিশয্যা নিলেন তখন আমরা শিউরে উঠেছিলাম ওয়েস্ট ইন্ডিজে নরী কন্ট্রাকটরের দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে।

অস্ট্রেলিয়ার চ্যাপেল ভ্রাতৃদ্বয়ও কি ওল্ডের বল খেলতে কম বেগ পেয়েছেন? ইংলন্ডে ৭৫ সিরিজের অধিনায়ক ইয়ান চ্যাপেলই ছিলেন সবচেয়ে সফল ব্যাটসম্যান। সব চেয়ে বেশি ৪২৯ রান ক[illegible]লেন ৪টি টেস্টের ৬ ইনিংসে। কিন্[illegible] ইনিংসের মধ্যে ২ ইনিংসেই ০ এবং [illegible] রানে ফিরে গিয়েছিলেন ওল্ডের বলে। [illegible]ম টেস্টে গ্রেগ চ্যাপেলকেও শূন্য [illegible]নে ফিরে যেতে হয়েছিল। ওল্ডের বলে বড় ব্যাটসম্যানের বিভ্রান্ত হওয়ার আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। তবে ও[illegible]র জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ ভারতের বিরুদ্ধেই ১৯৭৪ এর হোম সিরিজে। মাত্র তিনটি টেস্টে ১৮টি উইকেট পেয়েছিলেন, প্রতি উইকেটের জন্য ১৩·৮৩ রান দিয়ে। যে ইনিংসে ভারত মাত্র ৪২ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল সে ইনিংসে পেয়েছিলেন ২১ রানে ৫টি উইকেট এবং খেলায় ৮৮ রানে ৯টি। আবার ওই ৭৪ মরসুমেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট-জীবনের বড় রান (৬৫) করেছেন ৮ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলতে নেমে। সাধারণত ৮ কিংবা ৯ নম্বরে ব্যাট করতে যান। ব্যাট করেন বাঁ হাতে। এবার জলন্ধরে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ১০৯ রান করেছেন ১০৯ মিনিটে।

মুকুল
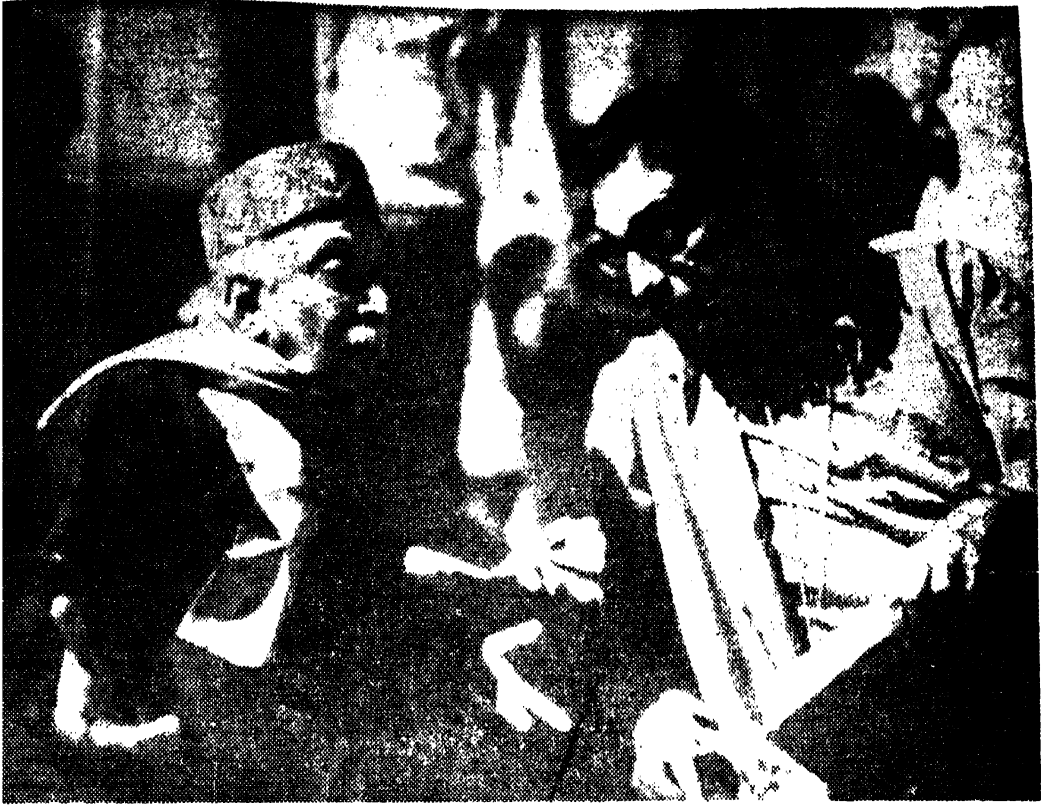
শতরঞ্জ কে খিলাড়ী/পরিচালনায় সত্যজিৎ রায়/শিল্পী ডেভিড — ফটো : নেমাই ঘোষ

রঙ্গজগৎ

দম্পতি/পিয়ালী পিকচারস

ছবিটা লেগে যেতে পারে। সেটা কিন্তু নির্ভর করছে মধ্যবিত্ত বাঙালী কতটা সেকসস্টারভড ও সিনেমা ঠিক কতোটা কম বোঝে তার ওপর। সেকস-এর মধ্যবিত্ত-মূল্যবোধ-বাঁচানো আপাত-নিরীহ সুড়সুড়ি ছাড়াও এ-ছবিতে অবশ্য চাঁদি-রোজগারের প্রয়োজনে (সিনেমাকে সর্বপ্রকারে নস্যাৎ করে) আরো কিছু মালমশলা মেশানো হয়েছে যেগুলি অধিকাংশ বাঙালীর পক্ষে আজও উপাদেয়। যেমন কিছু সিনেমার মাপে কাটা খাঁটি

চলচ্চিত্র

অথচ বেশ 'গেরস্তপোষ' প্রেমের দৃশ্য: বাৎসল্য যা সেন্টিমেন্টালিটির পর্যায়ে চলে গেছে; একটি সর্বদা ভুরু-আঁকা, দেহ-সর্বস্ব, আঢাকা-পিঠ বাড়ির আয়া। যে ছাদের ওপর বাড়ির চাকরের সঙ্গে দিন-দুপুরে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে নাচে; এবং একজন অতি-সুন্দরী নায়িকা সারারাত ঘুমোবার পরেও যার নাক চকচক করে না এবং কপালের টিপ নষ্ট হয় না। এ-সব দুর্লভ জিনিসের জন্যে বাঙালীর তৃষ্ণা কতদূর তার ওপর নির্ভর করবে এ-ছবির সাফল্য। আর যাঁরা শুধু সুন্দরী নায়িকা দেখবার জন্যে ছবি দেখতে চান তাঁদের প্রথমেই জানাচ্ছি মালা সিনহা আজও দুর্বারভাবে সুন্দরী এবং এ-ছবিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে কোনো বিউটি-কনটেস্ট-এর মডেল বলে মনে হয়। পরিচালক অনিল ঘোষকে ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে এই জন্যে যে মালার মুখ থেকে তাঁরা সাদা ফ্যাটফেটে আলো মুহূর্তের জন্যেও সরিয়ে নেননি। বিশেষ করে বৃষ্টির দৃশ্যটি স্মর্তব্য। বাইরে দুর্দান্ত মেঘ ডাকছে। জানলার বাইরে ছড়ছড় করে জল ঢালা হচ্ছে। ঘরের মধ্যে রোদ ভেসে যাচ্ছে। এবং সুন্দরী মালা সিনহা খোলা জানলার পাশে ডাগর-ডাগর চোখ-চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মালার কেশরচনা করেছেন যিনি তাঁর ওপর কড়া হুকুম ছিলো ঝড়ের দাপটে যেন নায়িকার একটি চুলও না ঘাঁটে। ঘাঁটা তো দূরের কথা, নড়ে পর্যন্ত নি।

এবার আসুন ছবিটির কয়েকটি দৃশ্য একটু বেছে বেছে দেখা যাক। টাইটেলস-এর আগে একেবারে প্রথম দৃশ্যে দূরে (লং শট) একটি ট্রেন যেতে দেখি। দৃশ্যের আলোর টেকসচার থেকে মনে হয় সকাল ৯-১০টা হবে। তারপরেই দেখি রবি ঘোষ (বাড়ির চাকর) রান্নাঘরে চা করছেন, বোঝাই যায় প্রভাতী পেয়ালা, কেননা ব্রেকফাস্ট ছিলো না। একটু পরেই সকালের কাগজ ও দুধ আসে—অর্থাৎ সময়টা সকাল ৬টার কাছাকাছি। অথচ রান্নাঘর আলোয় ভেসে যাচ্ছে। শুধুমাত্র আলোর সাহায্যে—ওয়াশ-এর ব্যবহারে—ভোরবেলার মেজাজটা কি দারুণ ধরা যেত,

অথচ অনিল ঘোষ ও কৃষ্ণ চক্রবর্তী সে ব্যাপারে চেষ্টা পর্যন্ত করেন নি। যাই হোক, আমরা সেই কচি লেবুপাতার মতো নয়। চুনের মতো সাদা ভোরবেলায় দেখতে পাই নিউ আলিপুরের একটি বিলাসবহুল বাড়ির রান্নাঘরে তোলা উনুনে চায়ের জল ফুটছে—সেদিন নিশ্চয় গ্যাস ফুরিয়ে

দম্পতি/মালা সিনহা ও রঞ্জিত মল্লিক

গিয়েছিল। এরপর রবি ঘোষ খানিকক্ষণ স্বল্পবাস আয়ার সঙ্গে প্রেমপ্রেম করার পর (আয়ার ভূমিকায় সুলতা) দাদাবাবু-বৌদির জন্যে ট্রেতে করে চা নিয়ে ওপরে গেলেন —ট্রেতে আছে দুধের পাত্র, চিনির পাত্র, চায়ের পাত্র ইত্যাদি। বোঝা গেল দাদাবাবু-বৌদির চা খাবার জন্যে কাপের প্রয়োজন হয় না, তাঁরা কেটলি থেকে সরাসরি চা খান। পরে যখন অবশ্য ট্রেটি ফিরে এলো সুলতার হাতে তাতে চায়ের কাপ দেখা দিল অচমকা। এরপর আমরা দাদাবাবু-বৌদির শোবার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করছি। তাঁদের বছর সাতেক বিয়ে হয়েছে। এবং তা সত্ত্বেও প্রচুর বাঙালী দর্শকের কাঙাল দৃষ্টির সামনে ওঁরা নানারকম অসহ্য ন্যাকামি করে যাচ্ছেন ড্রেসিং আয়নার সামনে। দাদাবাবু : রঞ্জিত মল্লিক। বৌদি : মালা সিনহা। ছবিতে সরোজ আর চারু। সরোজ ডাক্তার। সে সকালের ডিউটিতে হসপিটাল যাবে। যাবার আগে স্ত্রীর কাছ থেকে অবাস্তব লিভ-টেকিং-এর দীর্ঘ পালা, যার ফলে আমাদের চোখের সামনে সরোজের ডান হাতের ঘড়িটি বেঁকে বাঁ হাতের কব্জিতে উড়ে এসে বসে! এবং এই যে এলোমেলো করে দেখার শুরু হল, তার আর শেষ নেই। চিন্ময়ের মেয়ে সেজে নাচ, সুলতা-রবি ঘোষের ডুয়েট, স্বপ্নে মহাদেবের আবির্ভাব, চটপটি বাবার ভাং খাওয়া ইত্যাদি। গল্পের বিষয়ও মহৎ—সন্তানহীন চারুর মহাদেবের বরে সন্তান লাভ। এছাড়া আছে 'বম্, বম্, বম্ ভোলে শিবশংকর দোলে', 'নিজের বেলায় আঁটিসুঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি' প্রভৃতি এমন কয়েকটি গান যার সংগে চটি চটপট না করে অনেক দর্শক থাকতে পারেন না দেখলাম। 'দম্পতি'র মতো 'নির্মল' আনন্দের ছবির জন্যে পরিচালককে ধন্যবাদ। এর পরে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগমানব কবীর/টেকঃ স্টুডিও

বিষয়বস্তু ভক্তিমূলক। কিন্তু এই ভক্ত-জীবনের প্রধান বক্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর শান্তিতে সহাবস্থানের বাণী। কবীরের জীবনের জানা ঘটনা এত অপ্রতুল যে তা নিয়ে একখানি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি সম্ভব নয়। স্বভাবতই তাই অনেকাংশে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনায় (দেবনারায়ণ গুপ্ত ও প্রণব রায়) কবীরের জীবন ও বাণীর মধ্যে একটা সঙ্গতি রক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছেন।

পদ্ম বন থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু প্রতিপালিত হয় মুসলমান জোলার ঘরে। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই কবীর 'রাম নামে' পাগল। মুসলমান সন্তানরূপে পরিচিত কবীরের এই 'মতিভ্রম' ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রথমে বিভ্রান্তি এবং ক্রমে তা বিরোধে পরিণত হল। রামানন্দ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর বিরোধের ঝড় আরো ঘনীভূত হল। যাকে নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এত বিরোধ তাঁর মুখের কথা হচ্ছে: "দুই জগদীশ নেই দুনিয়ায়/মিছেই মরিস খুঁজে।/আল্লা কৃষ্ণ করিম/একই নে না বুঝে।" কবীরের এই মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এমন সব ঘটনা পরিকল্পিত হয়েছে যার কয়েকটি অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পড়ে।

ছবির প্রথমাংশ চলচ্চিত্রানুগ বিন্যাসে

পরিচালক দীপংকর বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শেষাংশে গতিশীল ঘটনাপ্রবাহ থাকলেও কয়েক স্থলে দীর্ঘসূত্রতা একটু যেন তাল কেটে দেয়। তবে পরিচালক ছবির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত আবেগ-ময়তার একটা রেশ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন যা দর্শকমনকে সর্বক্ষণ আপ্লুত রাখে। এ বিষয়ে মুখ্যত সহায়ক হয়েছে কবীরের দোঁহা ও ভক্তিমূলক একুশটি গান যার গায়ক-গায়িকা মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও আরতি মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনায় বিজন ঘোষ দস্তিদার ও কালীপদ সেন এজন্য প্রশংসা লাভ করবেন।

নাম ভূমিকায় অসীমকুমার এক মহা ভক্তের ব্যক্তিত্ব চরিত্রটিতে আরোপ করতে সক্ষম হয়েছেন। কবীরের মায়ের চরিত্রে কণিকা মজুমদার আবেগোচ্ছল মুহূর্ত সৃষ্টিতে সফল। ধনীয়া বাইজীর চরিত্রে মাধবী চক্রবর্তী তাঁর অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় অক্ষুণ্ন রেখেছেন। আরো বহু চরিত্রের মধ্যে যাঁরা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁদের মধ্যে আছেন মহেন্দ্র গুপ্ত, উৎপল দত্ত, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষাল, সুব্রত সেন, প্রমুখ বর্তমান ও অতীতের বহু নামকরা অভিনয় শিল্পী।

রামানন্দ সেনগুপ্তর আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ বহু দৃশ্যে শিল্পীমনের পরিচয় দেয়। শব্দগ্রহণ করেছেন অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জী। সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের সংগীতগ্রহণ গানগুলির মনোময়তার সহায়ক হয়েছে।

যুগোপযোগী বাণী সমন্বিত, অভিজ্ঞ ও খ্যাতিমান শিল্পীদের দ্বারা অভিনয়ে ও কলাকৌশলে সমৃদ্ধ এবং সর্বোপরি ভাবাপ্লুত গানে প্রোজ্জ্বল এমন একটি ছবির ভাগ্যে কোন প্রথম শ্রেণীর 'চেইন'-এ মুক্তি লাভ সম্ভব হতে পারেনি—এটা বিশেষ অনুতাপের বিষয়। দীর্ঘকাল পর এই একটি ছবি যার প্রযোজক একটি স্টুডিও—যে স্টুডিওটির পরিচালক একটি কলা-কুশলী গোষ্ঠী। প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহে মুক্তিলাভের সুযোগ ঘটল না এবং তাও দীর্ঘ কয়েক বৎসর অপেক্ষা করা সত্ত্বেও। চলচ্চিত্রশিল্পের ভাগ্যটা কি প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের মর্জিমতই চলতে থাকবে?

শৌভিক

শতরঞ্জ কে খিলাড়ী/সঞ্জীবকুমার ও সাঈদ জেফরে ফটো : রঞ্জন ব্যানার্জী

প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্র

প্রেমচাঁদের 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' গল্পের একটি ইংরেজি অনুবাদ আগেই পড়েছিলাম। যখন শুনলাম সত্যজিৎ রায় ঐ গল্প নিয়ে ছবি করছেন, একটি ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদে গল্পটি আবার পড়লাম। উভয় অনুবাদেই ইংরেজি ভাষা অনভ্যস্ত মোড় নিয়ে-নিয়ে এতোটাই ক্লিষ্ট যে গল্পের অনেকটাই আমার কাছে পৌঁছয় নি। কিন্তু কাহিনীর অভিনবত্ব আমাকে চমকে দিয়েছিলো। এবং সেই সঙ্গে এমন সন্দেহও আমাকে ছুঁয়েছিলো যে এ-গল্প থেকে কি সত্যিই পূর্ণাঙ্গ ছবি হতে পারে? কিংবা বলা উচিত—মনে-মনে যেসব প্রশ্ন আমায় ক্রমাগত পেয়ে বসতে লাগলো তা হলো: এক) কেমনভাবে, মাত্র এই ক-পাতা গল্প থেকে, মালমশলা সংগৃহীত হবে একটি দীর্ঘ ঘনবদ্ধ চিত্রনাট্যের পূর্ণাঙ্গ পুষ্টির জন্যে? দুই) গল্পতে বলা হয়েছে যতটুকু, বলা হয়নি তার চেয়ে অনেক বেশি। বাতাসের মত স্বচ্ছ পাতলা আভাসে ছড়িয়ে আছে এই সব কাহিনীপরপ্রান্তের অনুক্ত গূঢ়তা। কৌতূহলী হচ্ছিলাম এই ভেবে যে এ-কাহিনীর আত্ম-অচেতন নেপথ্যচারী ইতিহাস থেকে কোন পর্যায়ের শিল্প-চেতন চমৎকারিত্ব আর হৃদয়গ্রাহীতা দিয়ে সত্যজিৎ তুলে আনবেন কয়েকটি রক্তমাংসের স্বপ্নময়, সংশয়ী, বেদনাবাঙ্ক্ষিত ঘটনাস্রোতে অনিরুদ্ধভাবে প্লাবিত নর-

নারীকে, আর কিছু সম্পৃক্ত প্রবল মুহূর্ত, কিছু ওজস্বী মহান নির্ঘোষ যা তাঁর সব ছবির নির্ভুল অভিজ্ঞান, এবং উদ্ঘাটিত করবেন এমন এক কাহিনী যার মানুষী উপাদান ও আবেদন বহু বছরের এপারে আজো অনিঃশেষ? কিন্তু মাত্র কয়েকটি ইঙ্গিত থেকে ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে গেলে প্রয়োজন কি বিপুল মনীষিতা ও কল্পনা-দ্যুতি, প্রয়োজন কত শিল্পীত সংযোজন আর সন্ধানী পরি-বর্ধনের, প্রয়োজন এক বিশাল তরঙ্গোচ্ছল শতাব্দী-অতিক্রান্ত অতীতের স্রোতে কি গভীর সাহসী অবগাহন! তিন) এবং ভেবে পাচ্ছিলাম না মূল কাহিনীর এই সব দূরপ্রসারী ইঙ্গিতগুলিকে এবং ইতিহাসে আমাদের শিথিলীকৃত অভি-নিবেশকে গুছিয়ে কয়েকটি নাটকীয় তীব্র বিন্দুতে সংহত করে নিতে তাঁর নিজস্ব চলচ্চিতভঙ্গিতে তিনি নিয়ে আসবেন কি অভিনব চাতুরী, আরো কত সূক্ষ্ম উদ্ভাস, তাঁর স্ব-অর্জিত শৈলীতে সংযুক্ত হবে আরো কত সংশয়াতীত স্বতঃস্ফূর্ত উন্মোচন, চিত্রায়িত দ্যোতনা। এক সময়ে কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁরই উদ্দেশে রচিত একটি খোলা চিঠিতে লিখেছিলাম: "মনে কি হয় না আপনার যে সত্যিই আপনি একদিন একটি ঐতিহাসিক ছবিতে হাত দেবেন, ইতিহাসের কোনো-কোনো অংশ বেছে নেবেন এক রঙীন ছবির কাহিনী হিসেবে আর আমরা দেখতে পাব সেই সব প্রাচীন অভিজ্ঞতার আশ্চর্য আধুনিক রূপায়ণ আর ব্যাখ্যা? সত্যি যদি এমন হয় যে ইতিহাস-ভাবনার সব ব্যঞ্জনা আর বিভঙ্গগুলি *ধরে ফেলার* মতো সিনেমার অবিকল ভাষা আপনার আয়ত্তে *এসে গেলো কোনোদিন?" এই লেখার ঠিক* তিন বছর পরে তৈরি হচ্ছে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ঐতিহাসিক ছবি। চার) সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে এ-ছবি এক নতুন দিগন্তের দি উন্মীলিত হলো : এক অপ্রত্যাশিত ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষমান এর অন্তরের বীজ। আমরা তো অনেকেই দেখেছি কি দীর্ঘ-দীর্ঘ পরি-কল্পনা তাবি প্রস্তুতিপর্বের মধ্যে দিয়ে ছবিটির বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের ভাবনা হয়ে উঠেছে আরো বেশি অপরিহার্য, নির্ভুল, সগর্ভ সুন্দর। ইতিহাসের সব অসংগতি আর প্রতারক স্রোত থেকে ধীরে-ধীরে শিল্পীর চৈতন্য দিয়ে ছেঁকে তুলেছেন তিনি এ-কাহিনীর উপাদান। তাঁর একাধিক খাতায় শুধু লেখা রয়েছে এই প্রাথমিক পর্বে অর্জিত উপলব্ধি ও ভাবনাগুলি। আলাদা-আলাদা ভাবে ভাবমূর্তিগুলি ; যখন যেমন তারা এসেছে তাঁর ভাবনায়, এঁকে রেখেছেন টুকরো কাগজে, খাতায়—কোনো দৃশ্য, কোনো

চরিত্রের মুখ, কেমন হবে তার সিংহাসনের গঠন, পরনের পোশাক। সংগৃহীত হয়েছে পুরোনো গজল, ঠুংরী, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর ভাবনা থেকে রূপ দিয়েছেন কাহিনীর সবকটি চরিত্রকে—এমন কি তাদের নমাজ পড়ার বিভঙ্গ থেকে পানের পিচ ফেলার ভঙ্গি, কোনো কিছুই যেন মনে না-হয় অভিনীত, বাস্তববিরোধী, সময়ের পক্ষে অনুপযোগী। আর সেই সঙ্গে একাধিক মানুষের দীর্ঘ পঠন আর পরিশ্রমে এ-ছবির জন্যে অর্জন করে আনা হয়েছে এমন এক ভাষা যা সব অনুচিন্তন, দূর-কল্পনা ও ক্ষীণতম মূর্ছনার পক্ষে বিস্ময়করভাবে উপযুক্ত। শুটিং চলছে কলকাতায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। প্রথম কদিন রূপায়ণে ছিলেন সঞ্জীবকুমার, ডেভিড আর সাগরপারের দুর্ধর্ষ অভিনেতা সাঈদ জেফরে উর্দুভাষা যাঁর মুখে খুঁজে পায় তার হারানো ব্যঞ্জনা। ডেভিড প্রথম কদিনের কাজ সেরে যাবার সময় বলে গেলেন, ইট হ্যাজ বিন বোথ এ প্লেজার অ্যান্ড অ্যান এক্সপিরিয়ানস। এ-লেখা যখন বেরোবে তখন হয়তো শাবানাও শীতের কলকাতায় আসবে শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর বহুমুখী প্রয়োজনের কিছুটা মেটাতে। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত

প্রান্তরের গান

শিল্পবিশেষজ্ঞ ও শিল্পীর মধ্যে সাধারণত একটা অশুভ অহিনকুল সম্পর্ক থাকে। ব্যতিক্রম যখন উদাহরণ হয়, তখনই সংবাদের জন্ম। লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ কালী দাশগুপ্ত সেই ব্যতিক্রম এবং উদাহরণ।

কালী দাশগুপ্ত বিশেষজ্ঞ, কিন্তু সেই 'ছায়াপিণ্ড' নন, যে "চোখে অক্ষম পিঁচুটি" নিয়ে ক্ষান্ত হবেন। পরিশ্রমী সংগ্রাহক কালী দাশগুপ্ত তাঁর সচেতন শিল্পনৈপুণ্যে সংবিদ্ধ করতে পারেন স্বদেশ ও দেশান্তরের শ্রোতাকে। শুধু পরিশীলিত উদাত্ত কণ্ঠ নয়, কণ্ঠের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও তাঁর অধিগত। একই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের লোকসংগীতের গায়কীতে তাঁর আধিপত্য, এবং ভিন্ন প্রান্তের গানের তথ্য ও তত্ত্বের প্রতি তাঁর নিবিড় আনুগত্য তাঁকে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে।

শতকের প্রতিষ্ঠিত অনেক শিল্পী একদা পরিশ্রমী ছিলেন সংগ্রহে, এখন সযত্ন আধুনিকীকরণে। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের গানে তথাকথিত নাগরিক ছোঁয়া লাগেনি অথচ গ্রাম্যতার একঘেয়েমি থেকেও মুক্ত। বিভিন্ন দেশের লোকসংগীত সংগ্রহ নিয়ে সলিল চৌধুরী যে 'কয়ার' বিচিত্র সম্ভাবনা নিয়ে প্রবর্তন করেছিলেন, আজ সেই 'কয়ার' শুধুই বর্ণাঢ্য জলসা। এই শহরে অনেক 'কয়ার' প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু গান সর্বক্ষেত্রেই এক। যা কিছু এক্সপেরিমেন্ট শুধু যন্ত্রানুষঙ্গেই সীমায়িত। গ্রামের গানে গ্রামীণ যন্ত্রের প্রয়োগ কতটুকু? এতদিনে গবেষণা কেন্দ্র, সংগ্রহের বিস্তৃতি, যথার্থ প্রকাশনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সমস্ত উদ্যোগ জলসা সংগঠনেই অবসিত। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিপদ চিরন্তন। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত এইজন্যই উদাহরণ।

কালী দাশগুপ্ত শুধুই দোতারা সহযোগে এবং মাঝে মাঝে ভাওয়াইয়া এবং করুণ কিছু সুর শুধুগলায় আমাদের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে একাত্ম করেছিলেন। পশুপতি মাহাতো সহযোগে, পুরুলিয়ার গানটিতে আমরা যেমন ক্ষেত-মজুরের অসহায়তা উপলব্ধি করি। আসামের গানটিতে চা-বাগানের সাহেবের উৎপীড়ন, ব্রজরমের দালালির বর্ণনা আমরা বুঝি মাটির রং বদলালেও মানুষের ব্যথার রং বদলায় না। জলপাইগুড়ির সেই কন্যাহরণের গান 'হাতে গামছা ত্যালের বাটিয়ে, স্নান করিতে গেল কন্যা' আমাদের এক লহমায় নদীপাড়ে নিয়ে যায়। মৃত্যু-চিন্তা নিয়ে আর একটি গানে যেরকম বিচিত্র পর্দা ব্যবহৃত সেরকম লোকগীতি খুব বেশি শোনা যায় নি। অনুষ্ঠানে একমাত্র ছন্দপতন ঘটিয়েছে, উদ্যোক্তাদের ইংরেজিয়ানা। যদিও শ্রীদাশগুপ্ত লণ্ডনের বিখ্যাত সমাবেশে গান গেয়ে এসেছেন এবং গুণীজনের সান্নিধ্য পেয়েছেন, তবুও স্বদেশে উদ্যোক্তাদের অশোভন ইংরেজি প্রীতি, (যখন শ্রোতারা প্রায় সবাই বাংলা বুঝতে পারেন) যেন সব প্রচেষ্টাকে ফ্যাশান না করে তোলে—এই একান্ত অনুরোধ।

মিউজিয়মের আশুতোষ হলের সংলগ্ন চত্বর সেদিন নিষ্প্রদীপ ছিল। এই প্রথম কাউকে বৈদ্যুতিক গোলযোগ নিয়ে অভিযোগ করতে শুনলাম না। অন্ধকার চত্বরের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে প্রান্তরের গান যেন আরও গভীরভাবে আমাদের ছুঁয়ে গেল, নতুন ভাবনা, নতুন সম্ভাবনা নাড়া দিয়ে গেল—চমক ভাঙাতে দেখি আলোকিত সদর স্ট্রীট।

দেবাশিস গুপ্ত

বোম্বাই থেকে

উত্তমকুমারের বিপরীতে অভিনয় করতে যে হেমামালিনী একদা অরাজী হয়েছিলেন—এমনি মজার ব্যাপার—সেই হেমা মালিনীই তাঁর নিজের প্রযোজিত ছবিতে নায়কের চরিত্রে উত্তমকুমারকে অভিনয় করতে রাজী করবার জন্য কলকাতায় এক বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন। উত্তমকুমার অবশ্য রাজী হয়েছেন। ছবিখানির পরিচালক গুলজার এবং সঙ্গীত পরিচালক রাহুল দেববর্মণ।

* * *

পিকক ফিল্মসের "লাল কোঠি"র (বাংলা সংস্করণ 'লাল কুটির') গান রেকর্ড করতে বোমবাইয়ে এসেছিলেন প্রযোজক আশিস রায়। এই দ্বি-ভাষী ছবির পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় এক দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার দরুন তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। ছবির সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন স্বপন-জগমোহন। প্লে-ব্যাকে গেয়েছেন আশা ভোঁসলে (দুখানি একক ও একটি দ্বৈত কণ্ঠে) এবং কিশোরকুমার (একটি একক ও একটি দ্বৈত কণ্ঠে)। এই রঙীন ছবির উভয় সংস্করণের মুখ্য চরিত্রের অভিনয়শিল্পী হলেন তনুজা, ড্যানী ও রঞ্জিত মল্লিক।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদল বসু
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮০৪৯

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১১·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

দেশ

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

সপ্তম অরণ্যদেবের সঙ্গে জুনকরের প্রথম সাক্ষাৎ...

মুখোশ-পরা মানুষ, গাছের উপরে বসে তুমি কী করছিলে?
চারদিকে নজর রাখছিলাম। সেটাই আমার কাজ।

জুনকর আর সপ্তম অরণ্যদেব পরস্পরের দারুণ বন্ধু হয়ে গেলেন।
সপ্তদশ শতাব্দীর কাহিনী...

'একসঙ্গে কুস্তি লড়েন...
লাগেনি তো?
মোটেই না।
5/9

'একসঙ্গে শিকারে যান..
পারব তো?

'একসঙ্গে দাবা খেলেন..'
কিস্তিমাত!
তা বটে।

আরব দেশের এক রাজার কথা পড়েছি। প্রজাদের অবস্থা দেখবার জন্য তিনি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। আমিও বেরিয়ে পড়ব।

'কয়েক মাস বাদে..'
সম্রাট নিরুদ্দেশ। তিনি কোথায়, তা কেউ জানে না।
যে-কথা সেই কাজ!
৪

প্রোটিন চুলের অপরিহার্য্য খোরাক।

বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন, প্রোটিনই মানুষের চুলের অতি প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক উপাদান। দুর্ভাগ্যবশতঃ রোদ-বাতাস, কোনও কোনও সাবান, রং বা কলপ এমন কি শরীরের ঘাম সকলে মিলে চক্রান্ত করে চুলের বলকারক প্রোটিন কেড়ে নিতে। এর পরিণাম? আপনার চুল নিস্তেজ, শুকনো আর কর্কশ হয়ে যায়। প্রোটিনের নিঃশরণে চুলের ডগা চিরে যেতে সুরু করে। চুল এত কম জোর হয়ে পড়ে যে যতবার চুল আঁচড়াবেন, চুল উঠতে সুরু করবে। চুল কে আগের স্বাভাবিক সতেজ ও সজীব অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে, কেবল প্রোটিন-পুষ্ট টিয়ারা এগ শ্যাম্পু।

টিয়ারা এগ শ্যাম্পুই চুলের খোরাক জোগায় স্বাভাবিক এগ প্রোটিন দিয়ে।

ইহা সর্বজনবিদিত যে ডিম স্বাভাবিক প্রোটিনের একটি অত্যুৎকৃষ্ট উৎস। বৈজ্ঞানিক মতে তাজা ডিমের সংমিশ্রণে প্রস্তুত, টিয়ারা এগ শ্যাম্পু, অ্যালবুমেন, অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ভিটামিন ‘এ’ ও ‘ডি’ এবং প্রকৃতিদত্ত চুলের পুষ্টিকারক উপাদানে ভরপুর। চুলে নতুন প্রাণ আনতে, চুল ওঠা বা ডগায় ভাঙ্গন রোধ করতে, সুস্থতা, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শক্ত এবং আগাগোড়া কালো ও চকচকে করতে নিয়মিত টিয়ারা এগ শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

প্রোটিনহীন চুলের ডগা চিরে যায়। চুল নিস্তেজ ও কর্কশ হযে যায়।

প্রোটিনপুষ্ট চুল ওঠে না, বরং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে, চুল সুস্থ ও সজীব হয়।

টিয়ারা

এগ শ্যাম্পু

চুলের স্বাভাবিক ভাবে বাড়া সতেজ ও চকচকে রাখার জন্য প্রোটিন যোগায়।

ভারতে প্রস্তুতকারক:
জে. কে হেলীন কার্টিস লি.
বোম্বাই ৪০০০৩৮

Interpub/JK/T/1/75 Ben

ওই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন: জি. এথারটন এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, পাটনা, গৌহাটী, কটক ও ভিলাই।

আপনার ভাগ্য ভবিষ্যতে সুপ্রসন্ন হবে তো?

জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করতে যাবেন না।
জিজ্ঞেস করুন আই-ও-বি'কে। প্রতি মাসে আপনি পাঁচ টাকা বা পাঁচশো টাকা যা-ই জমান না কেন, আমাদের প্রকল্পগুলিতে আপনার সঞ্চয় বেড়ে অনেক গুণ হয়ে যাবে।

আই-ও-বি'র প্রকল্পগুলি এমনভাবেই তৈরী যে, এগুলি যে-কোনো উপলক্ষের জন্যই আপনাআপনি টাকা জমতে সাহায্য করে। এর কয়েকটি হ'ল :

রি-ইনভেস্টমেন্ট ডিপোজিট প্ল্যান
এতে একটি সময়সীমায় আপনার জমা টাকা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

অটোম্যাটিক কিউম্যুলেটিভ ওয়েডিং ডিপোজিট
আপনার সন্তানের বিয়ের জন্যে সঞ্চয়ের এটি একটি সুবিধাজনক উপায়।

রেকারিং ডিপোজিট
মাসে মাসে অল্প স্বল্প সঞ্চয়ে সাহায্য করে। মেয়াদ পূর্তির পর হাতে আসে বেশ কিছু টাকা।

লং টার্ম বেনিফিট ডিপোজিট
এতে আপনি যে-টাকা জমা দেন (এবং এর চেয়ে বেশি) আপনি ফেরত পাবেন এবং সেই সঙ্গে আপনার সঞ্চয় ও সুদের টাকা যেমনটি ঠিক তেমনটিই ধরা থাকে।

এগুলো এবং অন্যান্য আকর্ষণীয় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনার কাছাকাছি আই-ও-বি ব্রাঞ্চে আসুন অথবা আমাদের **'এই ১৪ উপায় আপনার টাকা বাড়ান'** পুস্তিকার জন্য লিখুন।

আজ যা খরচ করতেই হবে সেটুকু করুন, বাকিটা ভবিষ্যতের জন্যে জমিয়ে রাখুন।
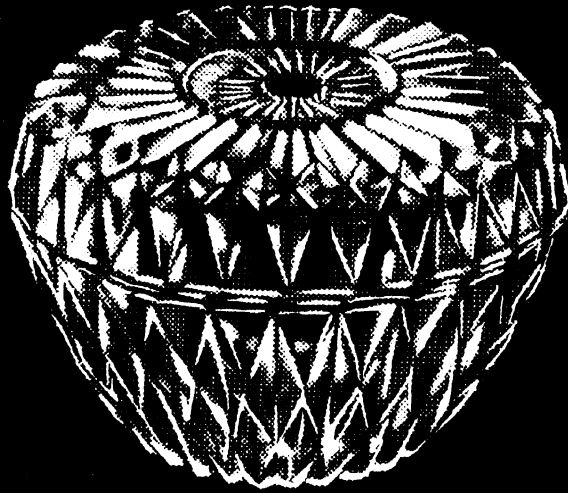
॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে ॥

প্রমথনাথ বিশীর

কালজয়ী রাজনৈতিক উপন্যাস

বঙ্গ ভঙ্গ

ধনঞ্জয় বৈরাগীর

নতুন উপন্যাস

রেসকোর্স ৯৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

রঙিন সাঁকো ১০৲

বাণী রায়ের

জনারণ্যে একমুখ ১২৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

মনে মনে খেলা ৬॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুই বাড়ী ৭৲

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

হরি যাকে রাখেন ৬৲

নারায়ণ সান্যালের

বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা

নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা ১৪৲

(নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ)

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

কাবেরী কাহিনী ১০৲

সদ্য প্রকাশিত

নতুন কবিতার বই

প্রমথনাথ বিশীর কাব্য গ্রন্থাবলী

তৃতীয় খণ্ড—১৮৲

১ম খণ্ড—৭৲ ২য় খণ্ড—১০৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্য সাধারণ উপন্যাস

কীর্তিহাটের কড়চা

কীর্তিহাটের কড়চা লেখকের বৃহত্তম রচনা শুধু নয়—তাঁর অন্যতম মহত্তম রচনা। এপিক উপন্যাস বলতে যা বোঝায়—তার সমস্ত শর্তই এতে পালিত হয়েছে। বিত্তহীন জমিদারদের ঐতিহ্যসর্বস্ব জীবনের পুরাতন মহিমাকে আঁকড়ে ধরে থাকার সকরুণ প্রয়াস এত স্পষ্ট ভাবে কেউ আঁকেননি। জমিদারী প্রথার কুফল প্রসঙ্গে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে ভাল কথাও কিছু বলবার আছে। লেখকের একাধিক বিখ্যাত রচনায় তার পরিচয় আছে। কিন্তু সবই প্রায় খণ্ড পরিচয়। বোধকরি সর্বশেষ প্রয়াস হিসাবে এই বিপুলাকার গ্রন্থটিতে তিনি একটি বংশের উত্থান-পতনের সামগ্রিক ইতিহাসে তাঁর একটা সর্বাঙ্গীণ সার্থক চিত্র উপহার দিয়েছেন।

(১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) ৩০৲

সৈয়দ মুজতবা আলীর

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ৯৲ শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা ১০৲

[illegible] গুপ্তের

অশান্ত ঘূর্ণি

১ম খণ্ড—১০৲ ২য় খণ্ড—১২৲ ৩য় খণ্ড—৯৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

শতরূপে দেখা ২০৲ সাত পাকে বাঁধা ১০৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

পরমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১০৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, [illegible] ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, [illegible] ৩৩-৮৭১১

এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জিনিষপত্র তৈরীর কাজে অগ্রগণ্য—ফ্যাশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রবর্তী দেশ ফ্রান্সই নিয়ে এসেছে আধুনিক স্টাইলে স্বাস্থ্যপ্রদ উপায়ে জিনিষপত্র তৈরী করার প্রথা। ইয়োরোপের ফ্রান্স দেশের স্যানিটারী ওয়্যার নির্ম্মাণ ক্ষেত্রের স্তম্ভ স্বরূপ নির্মাতারা যাঁরা মার্জিত ডিজাইন এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে স্যানিটারী ওয়্যার নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত, তাঁরা খোদিয়ার স্যানিটারী ওয়্যারকেই শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছেন। খোদিয়ার এর গুণের কথা বিদেশের বাজারেও খ্যাতিলাভ করেছে কেমি-ক্যালস্ অ্যালায়েড প্রোডাক্টস্ এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল এটির পরীক্ষাকার্য্য চালিয়ে এটিকে ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য রপ্তানী বাজ পুরস্কার প্রদান করেছেন। খোদিয়ার স্যানিটারী ওয়্যার টেকসই, কোনোরকম ছিদ্রবিহীন, দাগ পড়ে যায় না, চীনেমাটির তৈরী। এটি আপনার পছন্দমত সবরকম স্টাইল ও রঙে পাওয়া যায় যা আপনার গৃহসজ্জার সৌন্দর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে। আজই আপনার খোদিয়ার বিক্রেতার সঙ্গে দেখা করুন।

খোডিয়ার পটারী ওয়ার্কস লিমিটেড সিহোর (গুজরাট) ইণ্ডিয়া পিনকোড নং ৩৬৪২৪০ • ফোনঃ ৩ টেলিগ্রামঃ পটারী
KHODIYAR POTTERY WORKS LTD. SIHOR (GUJARAT), INDIA PIN CODE NO: 364 240 • TELEPHONE: 3 • TELEGRAM: POTTERY

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ অশেষ মিত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ "আলো হাতে নারী" (২২"×২০" ক্যানভাসের ওপর তৈলচিত্র)—পটের একপাশটা খালি রেখে, অন্যপাশে এ'কেছেন হ্যারিকেন হাতে দীর্ঘাঙ্গী এক সুন্দরী। হয়তো হাত তুলে ধরার জন্যেই তাকে বেশী লম্বা মনে হচ্ছে। পটে কালচে সবুজ আর হলদে রঙের প্রাধান্য থাকলেও, দেওয়ালে আলো আর ছায়ার জন্যে একটা ত্রিমাত্রিক মায়া তৈরী হয়েছে। হ্যারিকেনের আকার আর সুন্দরীর রূপের সঙ্গে অন্তচিত্রের রূপারোপের ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে। মুখের ডিম্বাকৃতি ছাঁদ ওপরে আলোর বলয় এবং মাথার কাপড়ের লাল—একটা রহস্যময় কাব্যিক মায়া তৈরী করেছে।

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১০

শনিবার ১৭ পৌষ ১৩৮৩

জাতীয় চেষ্টার মহান্ সাফল্য

অনেকের কাছে ঘটনার পূর্ণ সার্থকতার সত্যটি আশাতিরিক্ত বলে মনে হবে। ভারতের পরিবার পরিকল্পনার কাজ যে এতটা সাফল্য লাভ করে ফেলবে, এটা অনেকের কল্পনার এবং হিসেবের বাইরে ছিল। কিন্তু সাফল্যের আঙ্কিক হিসাবটা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীরই বিবৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বৎসরের মধ্যে ভারতের অন্তত তেতাল্লিশ লক্ষ ব্যক্তিকে নির্বীজ করতে হবে, এই ছিল ঘোষিত লক্ষ্য। কার্যত দেখা গেল যে, বৎসর অতিক্রান্ত হবার আগেই ষাট লক্ষ ব্যক্তিকে নির্বীজ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকরণ সিং বলেছেন, আগামী মার্চ মাসের মধ্যে মোট আশি লক্ষ ব্যক্তির নির্বীজকরণ সম্পূর্ণ হবে। এটা এক বৎসরের কৃতিত্বের হিসাব। সুতরাং, প্রসন্ন মনে ভবিষ্যতের সেই ভারতীয় জনজীবনের একটি সুস্থতার ছবি আজই অঙ্কিত করে নিতে পারা যায়। জনসংখ্যার বলে আজকের তুলনায় ক্ষীণতর হয়েও সেই ভারত হবে সামাজিক শান্তি এবং কায়িক সুস্থতার একটি আদর্শোচিত দেশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্যকে ভবিষ্যদ্‌বাণী বলে অভিহিত করা যায়। তিনি বলছেন : ২০০০ খৃঃ অব্দ দেখা দেবার আগেই ভারতের জনসংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার তুলনায় দশ কোটি কম হয়ে যাবে। তাঁর আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী : একুশ শতকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে শূন্য। অর্থাৎ কোন বৃদ্ধিই হবে না। আশার ও সফলতার আর-একটি অঙ্গীকারের সঙ্কেত এই যে, ভারতের গ্রামীণ জীবনে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আগ্রহের সাড়া জেগেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'নগরলক্ষ্মী' কবিতার ঘটনা অনুযায়ী দুর্ভিক্ষপীড়িত শ্রাবস্তিপুরের জনৈক ভূস্বামী ধর্মপাল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আক্ষেপ করেছিলেন—'আমার সোনার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা প্রেত...।' অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যায় প্রপীড়িত ভারতের বর্তমান জীবনদশার সব চেয়ে বড় ও করুণ ক্লেশ সৃষ্টি করেছে যে ঘটনা, তাকে কবির উক্তির অনুকরণ করে বলতে পারা যায়—শুষিছে অতিজন্মা প্রেত। দেশের অদৃষ্টের একধরণের দুর্ভিক্ষাবস্থার কারণ হিসাবে বলা যায়, মানুষের জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি তথা অতিজন্মা প্রেতই জাতির ও দেশের সকল শ্রম এবং অধ্যবসায়ের মাঙ্গলিক সৃষ্টির উপচার শুষে খেয়ে ফেলছে। অমোঘ বাস্তব সত্যের বাণী এই যে, শিল্পসম্ভার ও শস্যসম্ভারের উৎপাদন যতই বিপুলতর আকারে ও প্রকারে বৃদ্ধিলাভ করুক না কেন, জনসংখ্যার মোট পরিমাণ বর্তমানের তুলনায় প্রায় অর্ধেক না হয়ে গেলে, এবং বৃদ্ধির হার শূন্য না হয়ে গেলে, ভারতের জনজীবনে আদর্শোচিত সুস্থতা যোগ্যতা ও আনন্দের, এবং সামাজিক-পারিবারিক শান্তির সমারোহ কখনই সুলভ হবে না। সোসালিজম হোক বা অন্য কোন ইজম্ হোক, সামাজিক অথবা রাজনীতিক মতাদর্শের পদ্ধতি ও লক্ষ্য যা-ই হোক না কেন, অতিজন্মা প্রেত যদি স্বাচ্ছন্দে স্ফীতকায় হতে থাকে, তবে কোন মতাদর্শ জাতির জীবনে কার্যত সফল হতে পারবে না।

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বাধ্যতার বিধি প্রযুক্ত করবার ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। কিন্তু রাজ্যক্ষেত্রে বাধ্যতার বিধিকে সমর্থিত করবার অনিচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। অবস্থাটা অর্থাৎ নীতির অবস্থাটা খুব সুষ্ঠু নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ অবস্থায় বাধ্যতার বিধি প্রযুক্ত করবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। অবশ্য এই বাধ্যতার বিধি কারও নিপীড়ক হবে না, এটা বলাই বাহুল্য। পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সংস্কার উত্তেজিত করে তোলবার কয়েকটি ঘটনা দেখে সরকারের পক্ষে বাধ্যা নির্বীজকরণের প্রয়োজন সম্বন্ধে যৌক্তিকতার সুর একেবারে নরম করে দিয়ে কৈফিয়ৎ-প্রবণ স্বরে কিছু বলবার দরকার নেই।

গ্রামাঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার প্রতি জনসাধারণের সাগ্রহ ও কৌতূহলের সাড়া জেগেছে, ঘটনা বস্তুত ভারতীয় সাধারণ মানুষের চিন্তায় উদ্বোধিত এক নতুন চেতনার আভাস। ভারতীয় জীবনে বিপুলসংখ্যক সন্তান নিয়ে পারিবারিক জীবনযাত্রার দৃশ্য বিরল নয়। এই দৃশ্যটা শিক্ষিত পরিবারের জীবনেও একেবারে বিরল নয়। লক্ষ্য করতে হয়, বহুসন্তান কোন পিতা-মাতার জীবনের একটি মহৎ কৃতিত্ব হিসাবে কখনও কোন সামাজিক প্রশস্তি পায়নি। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত শ্রীইয়ুনুসের ভাই-বোনের মোট সংখ্যা ছেচল্লিশ। বলা বাহুল্য, এটা অতীতের সামাজিক রীতির ঐতিহ্যের প্রতি প্রশ্নহীন সরল আনুগত্যের পরিণাম। ভারতীয় পুরাণে সগর রাজার সন্তান সংখ্যা ষাট লক্ষ ছিল বলে সগর রাজার বিশেষ কোন প্রশস্তি কীর্তিত হয়নি। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসংখ্যা একশত ছিল বলে, তিনিও সেজন্য এবং সেই কারণে কারও প্রশস্তির আস্পদ হননি। অপরদিকে দেখা যায়, এবং বিদেশের সমাজবিজ্ঞানীদেরও অনেকে বাল্মীকির রামায়ণ এবং তুলসীদাসের রামচরিতের সুস্পষ্ট প্রশস্তি করেছেন। রামচন্দ্রের পারিবারিক জীবন 'মনোগেমি'র তথা 'একনারীব্রত' স্বামিত্বের আদর্শোচিত উদাহরণ বলে আখ্যাত করা হয়েছে। তেমনই অন্য একটি প্রশস্তি আখ্যাত হয়েছে যে, লব ও কুশ, মাত্র দুই সন্তানের পিতা-মাতা হয়ে রাম-সীতার দাম্পত্যের আদর্শে পরিবার পরিকল্পনারই একটি আদর্শ বাস্তবায়িত হয়েছিল।

বৈদেশিকী

নিঃশব্দ বিপ্লব

জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে স্পেনের লোকেরা বিদেয় দিয়েছে পনেরোই ডিসেম্বর তাঁর সাধের আদর্শকে গোর দিয়ে। স্পেনের রাজনৈতিক কাঠামো বদলের যে আইন দেশের আইনসভা পাস করেছে ২০ নভেম্বর তাতে তারা সায় দিয়েছে গণভোট মারফত। তার মানে প্রায় চল্লিশ বছর পরে স্পেন থেকে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ হলো, দেশটা সামিল হলো গণতন্ত্রী পশ্চিম ইউরোপের। ফ্যাসিবাদের বাঁধন আগেই ছিঁড়েছে একই পথের পথিক পাশের দেশ পর্তুগাল। এবার কাটালো স্পেন। ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব বলতে ইউরোপে আর কিছু রইলো না। পশ্চিমী ধাঁচে গণতন্ত্র আর পূবালী ঢঙে সমাজতন্ত্র ছাড়া গোটা ইউরোপে আর কোনো ধরনের শাসনতন্ত্র চালু নেই। স্পেনে অবিশ্যি পুরোনো কালের জের এখনও রয়েছে। যাঁরা দেশ শাসন করছেন তাঁরা কেউ নির্বাচনী ধকল কখনও পোয়াননি। তাঁরা গদিতে বসেছেন ফ্রাঙ্কোর দৌলতে—ফ্রাঙ্কোপন্থী বলেই তাঁদের হাতে ধরে গদিতে বসানো হয়েছিল।

দেয়ালের লিখন পড়তে তাঁদের কিন্তু ভুল হয়নি—সবায়ের হয়তো নয়। তবে বেশির ভাগেরই। তাই ফ্রাঙ্কো মারা যাবার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই স্পেনে বদলের জোয়ার এসেছে, তাতে ভেসে গেছে ফ্রাঙ্কোর গড়া দম্ভের ইমারত। বোঝা যাচ্ছে চল্লিশ বছর তার ভিতটা ভেতরে ভেতরে ফোঁপরা হয়েছে। তাই একটু ঠেলাতেই তা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। তার ভাঙাচোরা ইঁটপাথর সাফ করে তার ওপর নতুন ইমারত গড়া এমন কিছু শক্ত কাজ হয়নি। আমূল পালটে গেছে স্পেনের শাসনতন্ত্রের কাঠামো। খুনখারাপি কিছুই দরকার হয়নি। বলতে গেলে ভেলকি দেখিয়ে দিয়েছে ফ্রাঙ্কোর বেঁচে থাকা চাকরেরা। তিনি বেঁচে থাকতে তারা কেউ টুঁ শব্দটি করেনি তাঁর টুঁটি চেপে ধরে দম বন্ধ করে মারেনি। অথচ তিনি যেতে-না-যেতেই পুরোনো পাট চুকিয়ে দিয়ে নতুন সাজে দেশকে সাজাবার উদ্যোগ করছে। সে উদ্যোগে বিশেষ বাধাও তারা পায়নি কারুর কাছ থেকে। নিঃশব্দ বিপ্লব আর কাকে বলে।

ফ্রাঙ্কোর আমলে সব ক্ষমতা ছিল তাঁর হাতে—তিনি ছিলেন একেশ্বর। তাঁর অন্ধ-ভক্তদের নিয়ে যে সংগঠন তিনি গড়ে ছিলেন তাই ছিল দেশের একমাত্র বৈধ দল। অবৈধ দল অবিশ্যি ছিল। তারা কাজ করতো চোরাগোপ্তা। তবে তারা ছিল ফ্রাঙ্কোর ফালাঞ্জিস্ট হাতীর কাছে পিঁপড়ের মতো। তারা কামড়াতো বটে তাতে একটু জ্বালা করা ছাড়া আর কিছু হতো না। ফৌজ ছিল ফ্রাঙ্কোর হাতের মুঠোয়। পুলিশও তাই। রাজনীতি যারা করতো তারা ছিল তাঁর বশংবদ। আমলারা তাঁরই বাছাই করা লোক। আইনসভাও একটা তাঁর আমলে ছিল। তবে তার সভ্যরা সবাই নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। শ' খানেক ডেপুটি অর্থাৎ প্রতিনিধি নির্বাচিত হতেন—তাঁদের নির্বাচন করতেন প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তা কিংবা গিন্নী ভোট দিয়ে। তবে স্বাধীন মতামত তাঁদের কারু ছিল না। বাকীরা তো ছিলেন ফ্রাঙ্কোর হাত ধরা। সে আইনসভার কাছে বেদবাক্য ছিল 'কোদিলো' অর্থাৎ প্রভুর আদেশ। মুখ বুজে তা তামিল করে এসেছে সংসদ তিনি বেঁচে থাকতে।

ওই জো-হুকুমের দল নিয়ে গড়া 'কর্টেজ'ই কিন্তু নয়া জমানা পত্তনের ফতোয়া দিয়েছে। তাকে ধাপ্পাবাজি বলাও যায় না। স্পেন আগেও ছিল রাজতন্ত্র, এখনও তাই। ফ্রাঙ্কোর আমলে তা উঠে গেলেও তাকে নতুন করে তিনিই কায়েম করেছিলেন ১৯৪৭-এর মার্চে। ১৯৬৯ সনে জানুয়ারিতে ডন জুয়ান কার্লস শপথ নিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কোর উত্তরাধিকারী হিসেবে। এখন তিনিই স্পেনের রাজা। কিন্তু অবাধ ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি পশ্চিম ইউরোপের আরও পাঁচটা দেশে যেমন সংবিধানের বাঁধনে বাঁধা রাজা রাণী, আছেন তেমনই প্রশাসনের শোভা। স্পেনে এখনও আছে মন্ত্রিসভা। আছেন প্রধান মন্ত্রী। ক্ষমতা তাঁদেরই হাতে। অবিশ্যি গণতন্ত্রী রেওয়াজ স্পেনে এখনও গড়ে ওঠেনি। পুতুল রাজা হয়ে থাকতে ডন জুয়ান কার্লস নারাজ। তবে পুরোনো কালের মতো সর্বেসর্বা হয়ে যা খুশী করবেন সে যে আর একালে হতে পারে না তা তিনিও বুঝেছেন। পরামর্শ তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দেন। কিন্তু কর্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টা করেন না। নতুন সংবিধান চালু করার পর তো তাঁকে নেহাতই সাক্ষীগোপালটি হতে হবে।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী আডোলফো সুয়ারেজ গনজালেজ। ফ্রাঙ্কো যখন মারা যান তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কার্লস আরিয়াস নাভারো। তিনি ছিয়াত্তরের জুলাইয়ে ইস্তফা দিলে প্রধানমন্ত্রী হন সুয়ারেজ। নাভারো যতটা দক্ষিণপন্থী ছিলেন ততটা সুয়ারেজ নন। তাঁকে বরঞ্চ মধ্যপন্থী বলাই ঠিক। তাঁর সঙ্গে রাজার বনেও ভালো। তাঁরই চেষ্টায় আর কৌশ পুরোনো আইনসভা নিজেদের ফাঁ পরোয়ানা জারী করেছে। বিদে পণ্ডিতেরা জোর গলায় মাথা নে বলেছিলেন, ও কাজ শিবের অসাধ কিন্তু সেই অসাধ্য সাধনই করেছ সুয়ারেজ আর তাঁর বন্ধুরা দক্ষিণপন্থীদে ঘাঁটি কর্টেজ অর্থাৎ আইনসভাকে দি শাসন সংস্কার বিল পাস করিয়ে নিয়ে সে আইনসভায় বামপন্থীদের ঠাঁই ছি না—কিন্তু খসড়া আইনের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার চালিয়েছিলেন বাইরে থেকে। ভেত থেকে বাধা দিয়েছিলেন দক্ষিণপন্থীরা। আইনটা পাস করার জন্যে তাঁদের সঙ্গে একটা আপস অবিশ্যি করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বড়রকমের রদবদল কিছু খসড়া আইনে করতে হয়নি। আগে ঠিক ছিল নির্বাচন হবে আনুপাতিক ভিত্তিতে। তাতে সুবিধে হতো ছোটখাটো দলগুলোর যারা প্রায় সবাই বামপন্থী। এখন ঠিক হয়েছে কমপক্ষে কিছু আসন না পেলে কোনো দলের সংসদে ঠাঁই হবে না। প্রত্যেক প্রদেশ থেকেও কিছু প্রতিনিধি থাকতে হবে। এতে সুবিধে দক্ষিণপন্থী বড় দলগুলোর।

নতুন শাসনতন্ত্রে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে স্পেনে সংসদের থাকবে দুটো সভা। নির্বাচন হবে দু সভাতেই। তবে লোকসভার ৩৫০ জন সভ্যই নির্বাচিত হলেও সেনেটের ২০৭ জন সদস্য হবেন নির্বাচিত আর ৪১ জনকে বহাল করবেন রাজা। আইনটা পাস করার সময় যে ভোটাভুটি হয়েছিল কর্টেজে তাতে পক্ষে ভোট পড়েছিল ৪২৫ বিপক্ষে মোট ৫৯। এটা কিন্তু ও ব্যাপারে শেষ কথা নয়। গণভোট নেওয়া হয়েছে ১৫ ডিসেম্বর। তাতে ৯০ শতকের ওপর লোক ভোট দিয়েছে সংস্কারের পক্ষে। বামপন্থীদের নতুন সংবিধান পছন্দ নয়—নতুন বিধানে তাদের বিশেষ সুবিধে হবে না। তার ওপর কমুনিস্ট সমেত বামপন্থী দলগুলো এখনও স্পেনে বেআইনী। তবে তারা গণভোট ভণ্ডুল করতে চায়নি। যেমন করেছিল কট্টর দক্ষিণপন্থীরা। যদিও তারা পাত্তা পায়নি। এখন আর খোলাখুলি নির্বাচনে বাধা নেই স্পেনে। সংবিধানে বলা হয়েছে তা মঞ্জুর হবার পর ছ মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হবে দেশে।। মনে হচ্ছে আসছে জুন নাগাদ স্পেন ভিড়ে যাবে পশ্চিমী গণতন্ত্রীদের আসরে, সঙ্গে সঙ্গে পথ পরিষ্কার হবে তার নাটো আর ইউরোপের বারোয়ারী বাজারে ঢোকবার।

দেবরাজ

এক নজরে

পরোপকারের প্যাঁচে

পাঁচ পাঁচ দশ টাকার দুখানা টিকেট কিনতেই হল শেষ পর্যন্ত। জানুয়ারির ঐ সময়টায় আমি থাকব না, সুতরাং তাঁদের প্রদর্শনী, জলসা ও নাট্যোৎসবে যাওয়ার সুযোগ হবে না, একথা পরিষ্কার করে বোঝালাম। কিন্তু নাছোড়বান্দা মহিলা! তিনি বলতে লাগলেন যে, মেয়েদের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাগুলোকে দেশে এখনো অনেকেই ভাল চোখে দেখেন না। এমন দিনে যদি আমার মত লোকও মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাঁরা যাবেন কোথায়? আমি যে একজন প্রগতিশীল মানুষ, এটা জানেন বলেই তো তাঁরা আমার দ্বারস্থ হয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বাক্য ব্যয় বৃথা বুঝে দুখানি টিকেট নিতে হল। টাকা কটা ব্যাগে পুরে তিনি [illegible] করে চৌকাঠের বাইরে পা দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে [illegible] এসে ঢুকলেন অখিলবন্ধু [illegible]। [illegible] একটি স্কুলে মাস্টারি করেন তিনি। [illegible] এই পাড়ায় থাকেন এবং আমার [illegible] গৃহশিক্ষকতাও করেছিলেন। [illegible] মাঝে মাঝে আসেন। [illegible] এমনিই গল্পগুজব করে যান। [illegible] সুরে বললেন অখিলবন্ধু, ঐ [illegible] মেয়েটা এসেছিল কেন বলুন তো? [illegible] তাকালাম তাঁর দিকে, [illegible] বললাম [illegible] সম্বন্ধে ঐ রকম [illegible] অখিলবন্ধু? [illegible]!

অখিলবন্ধু বললেন, [illegible] বাকি সুদর্শনদা। [illegible] কোন দিন [illegible] বলিও না। কিন্তু ঐ মেয়েটির জন্যে প্রায় জান যাবার অবস্থা হয়েছিল আমার। [illegible] কোনোরকমেই বেঁচে গেছি। সবিস্ময়ে বললাম, কি রকম? আমার কাছে তো এসেছিলেন ল্যান্সডাউনের এক মহিলা সমিতির [illegible] টিকেট বিক্রি করতে। মুখ বিকৃত করে অখিলবন্ধু বললেন, মহিলা সমিতি না ওর মাথা। আসল ব্যাপার ওটা! শুনুন বলছি কি হয়েছিল। জানেন বোধ হয় যে সন্ধ্যার দিকে আমি একটু হোমিওপ্যাথি করি, কালী টেম্পল রোডে ছোট একটা চেম্বারও আছে। সেদিন রুগীদের দেখে উঠতে উঠতে প্রায় দশটা হয়ে গেল। প্রতাপাদিত্য রোডে বাসা। ওটুকু পথ রোজ হেঁটেই যাই। কিন্তু শরীরটা সর্দি-কাশিতে একটু ম্যাজম্যাজে হয়েছিল তাই একটা রিকশা নিলাম। রিকশা শা-নগরের কাছাকাছি এসেছে, এমন সময় টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। রাতে ঐ পথে লোকজন বেশী থাকে না কোনদিনই। এদিন একেবারেই কেউ ছিল না। হঠাৎ একটি মেয়ে সামনে এসে দুহাত তুলে রিকশা থামাল। থামিয়েই বলল, আমাকে একটু দয়া করে উঠিয়ে নেবেন? দুটো লোক আমার পিছু নিয়েছে। গাড়িটা দেখে গলির ভেতর লুকিয়েছে। আপনি চলে গেলেই আবার বেরুবে। আমি গিয়েছিলাম চেতলায় মেয়ে পড়াতে। বাস [illegible] পেলাম না। এক নিঃশ্বাসে এতটা বলেই হাঁপাতে লাগল। কিছু না ভেবেচিন্তেই গাড়িতে তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দুদিক থেকে দুটো গুণ্ডা এসে ঘিরে ধরল।

হতভম্ব হয়ে বললাম, বল কি হে? [illegible] জমজমাট পাড়ায় রাত দশটায় এই কাণ্ড! অখিলবন্ধু বলল, লোক দুটো জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগল, কিল চড় ও [illegible] চালালো সেই সঙ্গে। শালা হারামি, [illegible] থেকে মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া! পিটিয়ে [illegible] ছুটিয়ে দেব! [illegible] আশপাশ থেকে বেশ কিছু লোক জুটে গেল। মেয়েটি তাদের দেখেই [illegible] কান্না জুড়ে দিল। রাত হয়ে গেছে, আমি মেয়ে পড়িয়ে ফিরছি। আমাকে জোর করে টেনে রিকশায় তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। সমবেত জনতা [illegible] এই বয়সে কি এই মারে। হ্যাঁ মশাই কি বলব [illegible], ভগবানই মুখ তুলে চাইলেন। [illegible] থানার ইনচার্জ পরমেশ্বরবাবু [illegible] ফিরছিলেন ডিউটি শেষ করে। তাঁর [illegible] তো আমাদের পাড়ায়। জিপ থামিয়ে তিনি নেমে এলেন। [illegible]। পরমেশ্বরবাবুর ছোট [illegible] আমার সঙ্গে পড়ত, আমাকে [illegible] চেনেন। [illegible] পেয়ে [illegible] বল [illegible]। ব্যাপারটা কি হয়েছিল বললাম। তিনি টর্চ ফেলে লোক দুটোর মুখ দেখে বললেন সুন্দর সিং, পাকড়ো দো আদমিকো। আউর এহি লড়কীকো ভী লে চল থানামে। লোক দুটো পালানোর চেষ্টা করেছিল, কান্না [illegible] আরম্ভ করেছিল মেয়েটিও। কিন্তু ফল হল না, ওদের দুজনকে ও শ্রীমতীকে জিপে উঠিয়ে সিপাই [illegible] গেলেন। পরমেশ্বরদা আমার সঙ্গে রিকশায় চেপে বসে বললেন আর কখনো বোকার মত পরোপকার করতে যেয়ো না। বুঝেছ!

ইনিই হলেন সেই মেয়ে। পরে জেনেছি এর নাম প্রীতিকণা। ভদ্র ফ্যামিলিরই মেয়ে, কলেজেও পড়ত। তারপর গুণ্ডা গুণ্ডাদের খপ্পরে পড়েছে। এখন নাকি এলগিন রোড থেকে টালিগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত এই এলাকাটুকুর মধ্যে সেজেগুজে রোজ রাতে পাক দিয়ে বেড়ায়, আর আজেবাজে সঙ্গী জোটায়। আর সঙ্গের ঐ যে দুষমন দুটো, ওর একটা হল নামকরা গুণ্ডা লালী, অন্যটাও বারকয়েক জেল খাটা দাগী আসামী। নাম সোনা। ওদেরই টোপ হয়েছিল আর কি প্রীতিকণা। ওকে তাই আপনার ঘরে দেখেই দপ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল আমার। ওরকম বিশ্রী কথা বলে ফেলেছিলাম তাইতেই। বুঝতে পারলাম অখিলবন্ধুর মত নির্বিরোধ মাস্টারও যে অতখানি উত্তেজিত হয়েছিল, মোটেই তা বিনা কারণে নয়। বললাম, পিছনের ব্যাপার তো জানতাম না ভাই। আরে একরম ফ্যাসাদে পড়লে তো রাগ হয় সবারই। কিন্তু ওদের সাজা হল না এখনো? অখিলবন্ধু বললেন, বলবেন না, দুটোকে পুলিস ধরেছিলই, ওরা শ্রীঘরে গেছে। আর এটা মেয়ে তো, একে এক বছর সদাচারে থাকার এবং প্রতি সপ্তাহে থানায় হাজিরা দেবার শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দেখে হয় এক-জন কেউ জামিনও হয়েছেন ওর হয়ে। একটু দম নিয়ে বললেন, তা কত টাকা ঘাড় ভেঙে আদায় করল ফাংশানের নামে? দশটা, এই বলে টিকেট দুখানা দেখালাম তাঁকে। উল্টে-পাল্টে দেখে অখিলবন্ধু বললেন, বিলকুল জোচ্চুরি। মিথ্যা করে টিকেট ছাপিয়ে লোক ঠকাচ্ছে! আপনি খোঁজ নেবেন, দেখবেন আমার কথা সত্যি কিনা।

অখিলবন্ধু চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ব্যাপারটা, মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে লাগল। জাল জোচ্চুরি দুর্নীতি ও প্রতারণার ঘটনা অনেকই দেখেছি। ঠকেছিও দু-চারবার সরল বিশ্বাসে খলকে পাত্তা দিয়ে। কিন্তু মেয়েদের হাতে সিঁধকাঠি তো উঠতে দেখিনি কোনদিন এর আগে। মনে আছে একবার হরতালের সময় প্রেস [illegible] গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে বৌবাজারের সেন্ট্রাল অ্যাভেনুর সংযোগ থেকে সম্পূর্ণ অচেনা এক তরুণীকে রাত দশটায় উঠিয়ে নিয়ে জগুবাজারে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তিনিও দুহাত তুলেই গাড়ি থামিয়ে একটু তুলে নেবার জন্য অনুনয় করেছিলেন। বাড়ির দরজায় নামিয়ে দেবার পর তিনিও তাঁর মা-বাবা কি গভীর আন্তরিকতায় কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন এখনো তা ভুলিনি! সে মেয়েরা কোথায় হারিয়ে গেলেন আজ? কেন এমন হল? দারিদ্র্য? অশিক্ষা, মূল্যবোধের অপচয় কোনটা? এর পর তো বিপন্নকে সাহায্য করতেও ভরসা পাব না চট করে। কারণ সব সময় সকলের ভাগ্যে তো চলতি পথে পরমেশ্বরবাবুর আকস্মিক আবির্ভাব ঘটবে না!

— সুদর্শন গুপ্ত

এখানে বেড়াতে এসো

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নারকোল ভেঙে রাখা হয়েছে বসতির চারদিকে, চারদিকেই পাহাড়
ওই ভাঙা নারকোলের মতন—কোমরের কাছ থেকে হিম শ্যাওলা
তারপর পপলার গাছের ছবি আর ছায়া, নিচে ফার্নারি, তলপেটের মুখোমুখি
আগুন, শিখার দাগে চামড়া কালো হয়ে গেছে, বর্ণগন্ধময় সুষমায় ওই
মর্মান্তিক কালো দাগ বিদেশীর ভালো লাগে।
এমনটা তার দেশঘরে পাবার নয়, খাবারদাবার
সস্তা, সবচেয়ে সস্তা মাংস। মনে হিংসা থাকলে এখানে বেড়াতে এসো
অক্টোবর ভালো সময়, নীল আকাশ নীল জল রকমারি পাথর কুড়োবে ছড়াবে
এ-জিনিস ফুরিয়ে যাবার নয় যৌবন এখানে দীর্ঘজীবী, পলতের দুমুখেই
আগুন দিতে হবে শুধু। একটু মধু পেলে হতো—মধু এবং হুল
ফিতেয় বাঁধা চুল বাতাসে দুলছে ফুল ফুটে ঝরে গেছে, ফল থইথই বাগান
মনে মেঘ জমলে এখানে বেড়াতে এসো। অক্টোবর ভালো সময়, গুজ্জররা
নিচে নামছে ঝাপসা ছাগল-ভেড়ার পিঠে হাঁড়িকুড়ি থালা বাসন, একমুখ
রাঙা চুলদাড়ি নিয়ে কোথায় কোন সমতলের প্রয়াসে চলেছে সারবন্দী গুজ্জর
পাথরের গা ঘেঁষে, একপাশে হাঁ করা খাদ অগাধ বিশ্রাম, খেলনা ঘরবাড়ি
সংসার ঝকমকে পাপোশ আর কম্বল দাড়ি দেওয়া দাঁতের হাড়গোড়
ভাঙতে-ভাঙতে ভাঙতে-ভাঙতে ছত্রাখান, ছড়িয়ে ছিটিয়ে
চিলচক্ষু জলে মুখ দেখছে এখন।

মনে মেঘ জমলে এখানে বেড়াতে এসো
অক্টোবর ভালো সময় নীল আকাশ নীল জল রকমারি পাথর
কুড়োবে ছড়াবে। এ-জিনিস ফুরিয়ে যাবার নয়!

বেঁচে থাকে একা

শান্ত রায়

ঘরে থাকলে বই পড়ে, একা-একা চ'লে যায় অন্য মহাদেশে
কবিতার ঘ্রাণে তার বুক ওঠে নামে

কেউ নেই, এভাবেই বেঁচে থাকা তার সারাবেলা
সাড়ে তিন মাইল পথ নিজেই নিজের সঙ্গে গল্প ক...
পার হয়ে যায়

জ্বর হ'লে পথ্য দেয় নিজেকে সে, দুর্বল আঙুল দাগ মাপে
ওষুধের, অনিদ্রায় কপালে ও চোখের পাতায়
আদরের স্পর্শ রাখে।
কোনদিন মাঝ-রাতে মচ্‌ড়ে ওঠে বুক
যেরকম ভূ-কম্পন, ধ্বংসের আভাস...দুটি হাত সে মুহূর্তে তাকে
আলিঙ্গন দেয়
সেই হাত তারি :
যেন এক শব্দশীল ক্ষেপে-ওঠা স্বেদময় তরুণের মুখোমুখি
একজন অপরকে বুঝে দিয়ে নিয়ে যায় অন্ধকারে, ছাদের হাওয়ায়
যেখানে আকাশ থেকে নক্ষত্রের কথা ঝরে ...একা বেঁচে থাকে
সারারাত

ছায়ার সমীপে

আরতি দাস

এবং বিচিত্র ভয়ে ফিরে আসি, কনকচাঁপার
তরুমূলে, অদৃশ্য বিবরে :
পল্লবে ধ্বনিত, মৃদু, পত্রের মর্মরে
শুনি এক মাঙ্গলিক মন্ত্র-উচ্চারণ
অন্ধকারে মন্থর, বাতাসে।

সমস্ত রোদের দিন যুদ্ধ চায়, নিঃশর্ত
বিরতি মানে না,
তৃষার্ত শরীর, ত্রস্ত
আশ্চর্য প্রাণের মায়ায়
কোনমতে বুকে হেঁটে, তাপদগ্ধ
পলাতক সাপ
ফিরে আসি তোর কাছে, ভয়ার্ত, ব্যাকুল।

স্নিগ্ধ ছায়া,
ভালবাসা কনকচাঁপার,
আমাকে লুকিয়ে রাখ্
শিকড়সংলগ্ন, তোর অদৃশ্য বিবরে।

'হেল্যো মিস্টার ফাঁদ্‌রাফাই!'

'ওটা তো তোর ডেড ফাদারের নাম লে জানতাম।'

'হিঃ হিঃ হিঃ।'

'শালা খচ্চর!'

'হিঃ হিঃ হিঃ! এক এক সময় তোকে : ব্যাটলশিপ পোটেমকিন বলে ডাকতে চ্ছে করে কেন বল তো?'

'কারণ তুই গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ল।'

'হিঃ হিঃ হিঃ! গাড়োয়ান, তাও বার গরুর গাড়ির। ওয়েল সেড বয়। ন্তু আমার চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল, তখন কে একটাও রিঙ পাকাতে পারছি না। টা পুরো সিগারেট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। টু হাওয়াটা আটকে রাখ না।

'গঙ্গার চৈতি হাওয়া তো আমার পর চাকর না, যে আটকে রাখবো? তার য় বাড়ি থেকে তোর বউকে ডেকে নিয়ে স, শাড়ির আঁচল মেলে দাঁড়াবে।'

'চৈতি হাওয়া? পোয়েট্রি! চৈতি যেন ন্‌ একটা মেয়ের নাম শুনেছি? তোদের পার্টমেনটের ওভারশিয়ারের মেয়ের, না?'

'কে বললে? তোদের বাড়িতে যে বাসন ম, তার মেয়ের নাম চৈতি।'

'হিঃ হিঃ হিঃ। শুনলেও ভালো লাগে। সুষমার মেয়ের নামও দারুণ! স্বপ্না। আমার নিজের মেয়েটার নাম পুলি, ওর মায়ের নাম কণা। কিন্তু তোর রর নামও দারুণ। লোলি। একে- লেটেস্ট স্টাইলের নাম। জিনা লার মতো। নাম শুনলেই মনে হয় লে করছে।...উহ্‌। ওরকম লাতাথি স না পোটো, দ্যাখ কতোখানি মাল াস থেকে চলকে পড়ে গেল।'

'পড়ুক। খচ্চরামি করলে আবার বো। আমি কি ওর নাম রেখেছি? শালা, শুনলেই যখন লে লে করছে মনে হয় গিয়ে নিলেই পারিস?'

'লোলিকে? মিসেস লোল মুকোজকে? শুনেই আমার বুক ধড়াস করছে।'

'খিক খিক খিক!...কেন, খুব তো নাম শুনলে লে লে মনে হয়, নিতে পারবি না কেন?'

'ওহ্‌, ইংরেজির দিদিমণিটি যখন ইস্কুলে যায়, তখন ওকে আমার মা বলে ডাকতে ইচ্ছা করে। ছ ফুট লম্বা পোটো মুখুজ্জেকে যে উনোনের জ্বলন্ত কয়লা হাতে তুলে ছুঁড়ে মারে। কী করে মারে বল্‌ তো—মানে, জ্বলন্ত কয়লা হাতে তোলে কী করে? হাত জ্বলে যায় না?'

'না। থিওরি অব রিলেটিভিটি জানিস না? কণা দত্ত যখন তার স্বামী ভুন্ডুল দত্তর লেপ ঢাকা গায়ে ঠান্ডা কনকনে জল ঢেলে দেয়, এটাও সেইরকম ব্যাপার।'

'হিঃ হিঃ হিঃ। ঠিক বলেছিস পোটে। সত্যি, ওদের জন্য খুব কষ্ট হয়।'

'কাদের জন্য?'

'এই লোলি কণাদের জন্য। বেচারাদের কী দুর্ভাগ্য! তোর আর আমার মতো লোক তা না হলে ওদের স্বামী হয়? লোলির ইংরেজিতে অনার্স ছিল, কণার বাঙলায়। অভাবের জন্য দুজনকেই ইস্কুলে চাকরি করতে হয়। আর আমরা?'

'একজন চটকলের কেরাণী, আর এক-জন জুনিয়র সুপারভাইজার। অবিশ্যি আমাদেরও অনার্স ছিল বোধ হয়, তাই না? তোর যেন কিসে?'

'কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশপাশে।'

'শালা!'

'কিন্তু আমাদের বাকিগুলো বললি না? মাতাল হারামজাদা ফিচেল খচ্চর দুশ্চরিত্র?

'হিঃ হিঃ হিঃ।'

'খিক খিক খিক! কিন্তু এখন এই ভ্যানতাড়া ছাড় ভুন্ডুল। মনে রাখিস এটা মাসের প্রথম রবিবারের সকাল। মেজাজ খারাপ করে দিস না। একটু প্রাণ ভরে মাল খেতে দে।'

'কিন্তু তোর দুঃখু হয় না নিজেদের কথা ভেবে? আমরা কেন এরকম নষ্ট হয়ে গেলাম?'

'আমরা নষ্ট কে বললে? আমরা হেলপ্‌লেস। আমরা তো শালা নাইনটিথ সেঞ্চুরির রেনেসাঁসে বিশ্বাস করি না।'

'লোলি কণারা করে?'

'করে বলেই তো ওরা মিলের ম্যানে-জারের বউয়ের মতো খুব টিপটপ্‌ গোছ-গাছ করে সুন্দর করে সব কিছু সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে। অবিশ্যি সাবকনসাশ মাইণ্ডে, সব মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সেই ট্র্যাডিশন চালু রয়েছে। ভদ্দরলোক যাদের বলে। নীতিবাগীশ—একটাও খারাপ কথা সইতে পারে না, ওদের হচ্ছে ওটা মূল্য-বোধ।'

'আর আমাদের কোনো মূল্যবোধ নেই?'

'ছিল, নাইনটিনথ্‌ সেঞ্চুরি থেকে—না না, এইট্টিনথ সেঞ্চুরি থেকে আমরা হয়ে হয়ে গেছি।'

'কীয়ে হয়ে গেছি?'

'ওই যে রে—কী বলে কথাটা? শালা বল্ না। ওই যে—হ্যাঁ বিপথগামী।'

'শালা চটকলের কেরাণী। রেনেশাঁস, নাইনটিথ সেঞ্চুরি, বিপথগামী কপচানো হচ্ছে? শুনলে কুকুরেও হিসি করে দেবে তোর মুখে।'

'কুকুরে না করুক তুই কি ভাবছিস আমাদের মুখগুলো সোনার জলে ধোয়া? কেউ হিসি করছে না?'

'কে হিসি করছে?'

'ভূতেরা।'

'তুই শালা রিয়্যাল মিঃ ফান্দাফাই। একদম ছিঁড়ে ফেড়ে গেছিস।'

'আর এখন তোকে আমার ব্যাটলশিপশ পোটেমকিন বলতে ইচ্ছে করছে। খিক খিক খিক —উহ্ শালা রন্দা ঝাড়ছিস?'

'হ্যাঁ, মাসের প্রথম রবিবার এখন কে নষ্ট করছে? শালা রেনেশাঁস? ঠাট্টার সময় ইয়ারকি? দে, মাল দে।'

'খিক খিক খিক্।'...

'হিঃ হিঃ হিঃ।'...

যার নাম পোটো, সে দেশী মদের বোতলটা নিজের দুই ঠ্যাঙের মাঝখান থেকে তুলে নিল। বোতলটার তিন ভাগই প্রায় শেষ। ভুণ্ডুল যার নাম, তার এবং পোটোর, দুজনের গেলাসই এখন খালি। চৈত্রের দক্ষিণা বাতাসে মাঝে মাঝেই এক একটা ঝোড়ো ঝাপটায় প্রায় ভাঙা ঝোপড়িটার খোড়ো চালা সুদ্ধ থরথর করে কেঁপে উঠছে। মড়মড় মচমচ শব্দ করছে। পোটো আর ভুণ্ডুল ঘরটার এলোমেলো ইঁট বিছানো মেঝেয় গঙ্গার দিকে মুখ করে আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। ট্রাউজার পরা পা ছড়িয়ে কাত হয়ে কনুয়ে হেলান দিয়ে।

কলকারখানা তল্লাটের থেকে কিছু বাইরে, বা হাতায় বলা যায়, জায়গাটা ব ব্যস্ত একটা খেয়াঘাট। পোটো আর ভুণ্ডু যে-ঘরটায় রয়েছে এটা বর্ষাকালের খে পারানির ঘর। এখন এ ঘরটা পরিত আর পাড়ের অনেকটা উঁচুতে। বর্ষাকা জোয়ারের সময়, প্রায় এই ঝোপড়িটার কা জল আসে। অবিশ্যি তখন এই ঝোপড়িট দরজার বাইরে একটা বাঁশের তৈরি বে থাকে, যার ওপরে ঘাটদার তার কা বাক্স নিয়ে বসে, এবং যাত্রীদের কা থেকে পয়সা নেয়। এখন বেঞ্চটা তু নিচে নামিয়ে নিয়েছে, যেখানে আর এক ঝোপড়ি রয়েছে। নৌকা এখন পাড় অনেকটা নিচের সেই ঝোপড়ির সাম নোঙর করে, ঘাটদারও সেখানেই বসে।

হেমন্তের মাঝামাঝি, গঙ্গা যখ শুকোতে থাকে তখন থেকেই ঘাটদার নিচে পাড়ে ঝোপড়ি বানিয়ে নেমে যায়। জ্যৈষ্ঠে শেষাশেষি আবার এইখানে উঠে আে বাকি সময়টা উঁচু পাড়ের ঝোপড়িটা খা পড়ে থাকে। এই সময়ে আশেপাশের আশ্র হীন কুকুর, ভিখিরি, পেতি জুয়াড়ি ও মাতালেরা বিভিন্ন সময়ে দখল করে। যে এখন দখল করে আছে পোটো মুখু আর ভুণ্ডুল দত্ত। পঞ্চাশ হাত দ দিয়েই, যাত্রীরা ওঠানামা করছে। রাস্ত ওপারে কিছু সাইকেল রিকশা আে অবকাশ পেলে ওরাই এ ঝোপড়িতে জ খেলতে আসে। যে-সব ভিখিরি বাস করে তারাও কেউ কে ওপার আছে। পোটো আর কে লক্ষ আছে, তারা কে খন আসবে ন কেবল দাতো নেড়ি ঝাপ খোলা ঝোপ সামনে বাইরে আছে।

নেড়ি দুটোর বসে থাকার কারণ পো আর ভুণ্ডুলের অভুক্ত অবশিষ্ট মুড়ি ও তেলেভাজার ঠোঙা। ঠোঙার তলানি অ অভুক্ত থাকবে কী না, কেউ বলতে পারে ন দুজনে আরাম করে বসবে বলে একটা প রবিবারের খবরের কাগজ পেতে নিয়েছি এবড়ো খেবড়ো ইঁট ছাড়াও বিছানো ইঁ গুলোর ফাঁকে মাঝে মধ্যে বিছে দেখা যা খড়ের চালায় সাপ খোপ থাকতে পারে। তিনটে ব্যাঙ তো এ কোণে ও কোণে লেপ রয়েছে, দেখাই যাচ্ছে। মাদুরের মতো ক খবরের কাগজ পাতার সঙ্গে এ-সবের কো সম্পর্কই হয় তো নেই। নিজের মাপা একটা সান্ত্বনা। কিন্তু এখন সেটা অ জায়গায় ফেটে ছিঁড়ে গিয়েছে। সান্ নিশ্চয়ই ছিল। বেলা এগারোটার ম বোতলের তিন ভাগ শেষ হয়ে যাওয়ার প এখন ওসব প্রশ্ন অবান্তর।

পোটো লম্বা রোগা মাথায় ঝাক চুল। কপালের অনেকখানি ফাঁকা, ট পড়ছে। গায়ের রঙ কালো, কালো

দুটোও বড়, খাঁড়ার মতো নাক। গায়ের কালো হাওয়াই সার্ট আধময়লা। খয়েরি ট্রাউজারটা বেশ খাটো। পায়ের পাতার কনুইয়ের কাছ থেকে অনেকখানি উঠে আছে। ও ছ ফুটের ওপর লম্বা। আর ভুন্ডুল পাঁচ ফুট দু তিন ইঞ্চি হতে পারে। কিছুটা গোলগাল, লাল রঙের ন্যাস্ত-গেঞ্জিটার ওপরে বেশ একটি নেয়াপাতি ভুঁড়ি ফুটে উঠেছে। গেঞ্জি খানিকটা পেটের ওপর উঠে পড়েছে, আর আধ ময়লা দাগ ধরা সাদা ট্রাউজারটা কোমরের বেশ খানিকটা নিচে নেমে গিয়েছে। পেটের খানিকটা অংশ খোলা। ওর গায়ের রঙ ফরসা। দুজনের চোখই কিছুটা লাল, গায়ের জামা প্যান্টও ময়লা, কিন্তু সকালে স্নান করে আঁচড়ানো চুলের পাট এখন বেশ বিন্যস্ত। ভুন্ডুলের কপালের আর জুলফির কাছে চুলে কিছু পাক ধরেছে কিন্তু গোটা মাথায় ঠাস বুনোট চুল। পোটোর ফাঁকা কপাল চুল একটিও পাক ধরেনি। দুজনেরই বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই।

সামনেই পড়ে রয়েছে একটা পেন্সিল কাটা খোলা ছুরি। ছড়িয়ে রয়েছে নিঙড়ে নেওয়া পাতি লেবুর কতগুলো টুকরো। এখনো একটা আস্ত লেবু রয়েছে আর দুটো পেঁয়াজ, এক খণ্ড আদা। মুড়ি কিছু ছড়িয়ে গিয়েছে খবরের কাগজের ওপরে, ছড়ানো ইঁদুর ভাজে। দেখেই বোঝা যায় মাসের প্রথম রবিবারে দুজনে মোটামুটি তৈরি হয়েই বসেছে। কাঁচের গেলাস দুটো দেখলেই বোঝা যায়, ওগুলো আনা হয়েছে রাস্তার ধারের চায়ের দোকান থেকে। গেলাস দুটোর ভাঁজে ভাঁজে খয়েরি দাগ পড়ে গিয়েছে। ওরা এখানে আসবার সময় বোতল কিনে গেলাস দুটোও নিয়ে এসেছিল। মাসের প্রথম রবিবারটা শুরু হয়েছে মাত্র ঘণ্টাখানেক।

ভুন্ডুল দুটো সিগারেট এক সঙ্গে ঠোঁটে চেপে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললো। পোটো দুটো গেলাসে বর্ণহীন টলটলে মদ ঢাললো। যতোটা সম্ভব সমান মাপে ঢালবার চেষ্টা করে বারে বারেই বোতলটা দেখতে লাগলো। বাতাসের ঝাপটায় ভুন্ডুলের দুটো কাঠি পর পর নিবে গেল। মুখটা বিকৃত করে বললো, 'শালা, ওভার-সিয়ারের মেয়ে হাওয়ার নিকুচি করেছে।'

পোটো অতিরিক্ত মনযোগ সহকারে, সমান মাপে বোতলটা শূন্য করে দু গেলাসে ঢালতে ঢালতে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বললো, 'ওভারসিয়ারের মেয়ে হাওয়া মানে?'

'তোর চৈতি হাওয়া।' বলেই তৃতীয়-বারের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট দুটো ধরাতে পারলো। এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, চৈতি কেন, চোত বাতাস বলা

পোটো আর ভুন্ডুলকে নেড়িদুটোর লক্ষ আছে

যায় না?' একটা সিগারেট পোটোর দিকে বাড়িয়ে দিল।

পোটো শূন্য বোতলটা রেখে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে চাপলো। হাত বাড়িয়ে ছুরি আর একটা লেবু তুলে নিয়ে চোয়াল-উঁচু মুখে হেসে বললো, 'চোত্ বাতাস বললে একটা কাঠিতেই সিগারেট ধরাতে পারতিস।'

'হ্যাঁ, পারতুম।' ভুন্ডুল খানিকটা যেন খেঁজে বললো, 'তোর না শালা বাঙলায় অনার্স ছিল? তায় আবার রেনেসাঁস মারছিস। সিনেমার গানের বাণী ঝাড়া হচ্ছে?'

পোটো লেবুর মাঝখানে ছুরি ঢুকিয়ে মুখের হাসিটা আরো ছড়িয়ে বললো, 'তিন কাটির জ্বালা। সেই লাইনটা যেন কী? বন চোত্ মুকুলের গন্ধে আকুল...।'

'বন কথাটা আবার ও লাইনের সঙ্গে কী করে এলো?' পোটোর দাঁতগুলো পাশবিকভাবে ঝকঝকিয়ে উঠলো।

পোটো লেবু চার ফালা করে ফেললো, 'ওটা আলাদা জুড়ে দিয়েছি। বন মন, বান্ চোত মুকুলের...খিক খিক খিক... উহ! মাজায় ঘুষি মারছিস? এমনিতেই মিউকাসে কষ্ট পাই।'

'হিঃ হিঃ হিঃ। নে, মালে লেবু নিঙড়ে দে।'

ওরা নির্জলাতেই অভ্যস্ত। লেবুর রস মেশাবার পরে ভুন্ডুল গেলাস তুলে ধললো, 'চিয়ার্স ফর, তোর না-হওয়া রেনেসাঁস।'

'ভুল বললি। চিয়ার্স ফর দ্য অনাগত রেনেসাঁস।'

দুজনেই চুমুক দিল। ভুন্ডুল বললো, 'ওই হলো। একই কথা।'

'আজ্ঞে না। না-হওয়া আর অনাগত,

এক কথা না। তার জন্য বাঙলা শিখতে হয়।'

'হিঃ হিঃ হিঃ। ...ওরে শূর্নোর শালা বাঙলা? লোলি লোলি লো—লি! গিলতে চললেম চোলি।'

'অশিক্ষিত। চোলি মানে জানিস? ওটা গিলে খাওয়া যায় না, চিবিয়ে খেতে হয়।'

'মানে, এ জিনিস চিবিয়ে খেতে হয়?' ভুণ্ডুল গেলাসটা তুলে ধরলো।

'না। এটা যদি চোলাই মাল হতো, তা হলে চুলি বলা যেতো। শনিসনি, সাটটা খেলো, চুলি পিও, ভুণ্ডুল দত্ত যুগ যুগ জীও। খিক্ খিক্ খিক্...।'

'চোপ।' ভুণ্ডুল এতো জোরে খাঁক করে উঠলো, বাইরের নেড়ি দুটো চমকিয়ে উঠলো। 'ওসব জ্ঞান তোকে দিতে হবে না। চোলি মানে কী, বল্।'

'চোলি তো মেয়েরা গায়ে পরে। কিছুই জানিস না—এই দ্যাখ্, ভুণ্ডুল মারবি না।'

ভুণ্ডুল উদ্যত পা নামিয়ে হাসলো, 'হিঃ হিঃ হিঃ। শালা লিঙুয়িস্টিক।'

'আয় তবে কবির লড়াই হয়ে যাক। শোন্, কণা কণা ক—ণা/গিলতে চললেম গরুর চোনা।'

'হিঃ হিঃ হিঃ...কণা গরুর চোনাও বলে না, তার চেয়ে খারাপ কথা বলে। পরশু মাইনের টাকাটা যখন দিতে গেলাম...।'

'জানি রে শালা জানি, কোন্ দুঃখে তোর লোল্লির নামটা মনে পড়েছে, জানি। পরশু দিন আমিও মাইনের টাকা দিতে গিয়ে বাড়তি সতরোটা টাকা বেশি সরিয়েছিলাম। উহ্, এমন ফ্রেয়ার করলো আর খিস্তি দিল...।'

'খিস্তি?'

'হ্যাঁ, মেয়ে দুটোর সামনেই চোর চোট্টা...।'

'সত্যি, চোরদের ওপর ওদের একটু মায়া দয়া নেই।' বলে ভুণ্ডুল হাসতে গেল কিন্তু না হেসে একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, 'অবিশ্যি বুঝি—ওদের দায়। কিন্তু ওরা—।' কথাটা শেষ করলো না।

পোটো শব্দ করলো, 'হুম্!'

'কেন যে ভালো হতে পারলাম না আমরা ভালো হলে ওরাও নিশ্চয়—।'

'ভালো হতো।' পোটো বাধা দিয়ে বললো, 'মানে ভালবাসতো? কিন্তু আসল গল্পটা তো অনাখানে। ওরা রেনেসাঁস-এ—

'শালা ন্যাকার করবো, চুপ!'

পোটো চুপ করলো। দুজনেই চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঢেউয়ের মতো পর পর কয়েকটা ঝড়ো ঝাপটায় ঝোপড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠলো। মড়মড় মচমচ শব্দ হলো। নেড়ি দুটো নড়ে চড়ে বসলো। এই মুহূর্তে পোটো আর ভুণ্ডুল কেমন আবিষ্ট আর অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে। ওরা যেন কয়েক মুহূর্ত আগের সেই মানুষ আর নেই। একটা কুকুর কাতর স্বরে একবার একটু গোঙানো শব্দ করলো। অন্যটা নাক তুলে বাতাস শুঁকলো।

ভুণ্ডুল মুড়ি তেলেভাজার অবশিষ্ট ঠোঙাটা হাতে তুলে জিভ দিয়ে তু তু শব্দ করলো। ডাকলো, 'এই, আয়।'

নেড়ি দুটো ল্যাজ নাড়াতে কয়েক পা এগিয়ে এলো। কিন্তু বেশি সামনে আসতে ভরসা পেলো না।

ভুণ্ডুল বললো, 'ব্যাটাদের লোভ আছে সাহস নেই।'

'সেই নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরির নব জাগরণের—।'

'প্যাঁদাবো।' ঠোঙাটা বাইরের দিকে ছুঁড়ে দিল।

নেড়ি দুটো ছুটে গিয়ে ঠোঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর দুজনে মারমুখো হয়ে খেঁকিয়ে উঠলো। পোটো বললো, 'এটা আর একটা—।'

'ঝাড় খাবি।'

নেড়ি দুটো ঠোঙা কাড়াকাড়ি করতে করতে নিচের দিকে নেমে গেল। চোখের আড়ালে চলে গেল। ভুণ্ডুল শেষ চুমুক দিয়ে শূন্য গেলাসটা আস্তে গড়িয়ে দিল। আধ আস্ত টুকরোটা নিয়ে ট্রাউজারের কোমরে ঘষলো, খানিকটা কামড় বসালো। ভুণ্ডুল হঠাৎ যেন চমকিয়ে উঠে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'এহ্, শালা ভুলে যাচ্ছি আজ মাসের প্রথম রবিবার। খালি বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে?' বলেই স্যান্ডেল না পরে এলোমেলো পা ফেলে ঝোপড়ির বাইরে গেল। রাস্তার দিকে মুখ করে দু হাত ঠোঁটের পাশে রেখে চিৎকার করে ডাকলো, 'অনন্ত—অন-অ-অ-ন্ত-অ—ন্ত।'

দূরের উঁচু থেকে জবাব এলো, 'যাই-ই-ই-ই।'

পোটো শেষ চুমুক দিয়ে গেলাস রেখে এক পাশ ফিরে কাত হলো। একটা ব্যাঙ এক কোণ্ থেকে লাফিয়ে আর এক কোণে যাচ্ছে। ভুণ্ডুল ট্রাউজারের বোতাম খুলতে খুলতে ঝোপড়ির পিছন দিকে গেল। পিছনের উঁচুতে আঢ্যদের পুরনো বাগান। বাগানে এক সঙ্গে কয়েকটা চৈত্র মাসের পাখি ডাকছে। ভুণ্ডুল প্রাকৃতিক কাজ সারতে সারতেই পাখিগুলোর সঙ্গে শিস দিতে লাগলো। ঝোপড়ির মধ্যে কাত হয়ে এলানো পোটো হাসলো। স্বর চড়িয়ে বললো, 'আর একটু, মিষ্টি করে ডাকরে পাখি, ছোলা দেবো।'

পোটোর কথা শেষ হতে না হতেই ভুণ্ডুল বাঘের মতো ঝোপড়ির মধ্যে এসে ঢুকলো। পোটো লাফ দিয়ে উঠে বসে আক্রমণ সামলাবার জন্য দু হাত তুলে রইলো। ভুণ্ডুলের এক পা পদাঘাতে উদ্যত, ঝকঝকে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে। 'শালা, ছোলা খাওয়াবে? আমার নবজাগরণ দেখাচ্ছিস?'

'মারিস না মাইরি।' পোটো দু হাত জোড় করে অমায়িক হেসে বললো, 'তোকে আমি কখনো রেনেসাঁস-এর লোক ভাবতে পারি?'

এই সময়ে ময়লা হাফ প্যান্ট পরা, হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে কুড়ি বাইশ বছরের একটা ছেলে এসে ঝোপড়ির সামনে দাঁড়ালো। তা দেখে ভুণ্ডুল পিছন ফিরলো। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলেটার হাত পা ময়লা, উসকো-খুসকো চুল, কিন্তু তলোয়ারের মতো চোখা গোঁফ। ভুণ্ডুল বললো, 'অনন্ত এসে গেছিস? একটা বোতল আনতে হবে। প্যাসেঞ্জার ছেড়ে আসতে হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করে হিপ পকেটে হাত ঢোকালো।

অনন্ত রাস্তার ওপর সাইকেল রিকশা চালায়। বললো, 'না, প্যাসেঞ্জার ছিল না। কিন্তু বোতল না পাঁট চাই? একটা আস্ত বোতল তো সাবড়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাঁট আনবি একটা, এখন আর বোতল না।' পোটো বলে উঠলো।

ভুণ্ডুল বললো, 'ঠিক আছে, পাঁট-ই একটা নিয়ে আয়। আবার আধ ঘণ্টা বাদেই ডাকাডাকি করতে হবে।'

অনন্ত পেট কোমরের কাছ থেকে গেঞ্জিটা সরিয়ে হাফ প্যান্টের ভিতর থেকে একটা পাঁট মাপের নতুন বোতল বের করে সবগুলো দাঁত মেলে হাসলো, 'দু নম্বর।'

ভুণ্ডুলের ভুরু আর চোখের পাতা কুঁচকে উঠলো, বললো, 'ওহ্, পাঁট নিয়েই এসেছিস? সেইজন্যই ব্যাটা তোমার এত সুমতি।'

অনন্ত হাসলো পোটোর দিকে তাকিয়ে। পোটো জিজ্ঞেস করলো, 'এরকম কটা পাঁট কিনে রেখেছিস রে?'

অনন্ত বললো, 'একটাই রেখেছিলাম। জানতাম, আপনাদের লাগবেই।'

'তুমি ব্যাটা খুব ঘুঘু।' ভুণ্ডুল টাকা বের করে হিসাব করে দিয়ে বললো, 'এক টাকা তোর। বারে বারে পাবি না কিন্তু।'

অনন্ত হেসে টাকা নিল, বললো, 'মন্তাজাবাবুর দোকান থেকে ডিম ভেজে নিয়ে আসবো নাকি?'

ভুণ্ডুল পিছন ফিরে পোটোর দিকে তাকালো। পোটো বললো, 'মাসের প্রথম রোববার তো, নিয়ে আয়। ভালো করে কাঁচা লংকা আর পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে দিতে বলিস।'

অনন্ত চলে গেল। ভুণ্ডুল বিছানো ইঁট, ছেঁড়া খবরের কাগজের ওপর বসে বোতলের মুখ খুলতে খুলতে বললো, 'নোলা বেড়ে গেছে।'

'মাসের প্রথম রোববার তো।' পোটো সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বললো, 'একটা দিনই যা একটু শাঁসে জলে, তারপরে তো সারা মাসে কবে কী জুটবে, তুইও জানিস না।' ও দুটো সিগারেট এক সঙ্গে ধরালো আর তা একটা কাঠি জেলেই।

ভুণ্ডুল দুটো গেলাসে মদ ঢাললো। পাঁটের অর্ধেকই শেষ। পোটো একটা সিগারেট ভুণ্ডুলের ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে গেলাসে লেবুর রস নিঙড়ে মেশালো। দুজনেই গেলাস তুলে নিল। পোটো বললো 'অনন্তর প্রাণে কেমন মায়া মমতা দেখলি? দু পাঁট হয়ে যাচ্ছে দেখে খাবারের কথা বললো। এরাই হলো আসলে আমাদের লোক। চিয়ার্স ফর অনন্ত।' ও গেলাস তুলে ধরলো।

ভুণ্ডুল চিয়ার্স না করে গেলাসে চুমুক

দিয়ে বললো, 'মানে তোর সেই জনগণ তো, যারা রেনেসাঁসের ধারে কাছে ছিল না।'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এরাই না নাইনটিন্থ সেঞ্চুরিতে সেই বাচ্চা মেয়েটাকে স্বামীর চিতায় তুলবে বলে কলকাতার রাস্তায় তাড়া করেছিল। আর মেয়েটা কোন্ সাহেবের বাড়িতে যেন ঢুকে পড়েছিল? ডিরোজিও বোধহয়?'

'খচড়ামি হচ্ছে? দীনবন্ধু মিত্রের বোনের কথা বলছিস বুঝি? কিন্তু—।'

'না, তোর অনন্তদের কথা বলছি।'

'মারবো লাথ্থি। রেনেসাঁসওয়ালারা এদের ধরেই এখন জল খায়। তোর ইংরেজরা এদেশে না এলে কি আমরা নবাবী আমলেই পড়ে থাকতাম? শালা, এলিটি বাত মারছো? ম্যানেজারি?'

'আমার ইংরেজ! হিঃ হিঃ হিঃ!' ভুন্ডুল এক চুমুকে ওর গেলাস শূন্য করে দিয়ে ঠক করে নামিয়ে রাখলো। চোখে যেন রক্ত উপচে এলো। বললো, 'মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

পোটো কিছু না বলে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো। ওর খাঁড়া নাকের পাটা ফুলে উঠেছে। ভুন্ডুল বাইরের দিকে তাকিয়ে মোটা প্রায় গোঙানো স্বরে বললো, 'তখন যদি আমার মাথায় আসতো, তা হলে চীনের লঙ্ডরুট মার্চটা শুরু করে দিতাম।'

'খিক খিক খিক। কেন, তার চেয়ে জারের আমলের রুশ বিপ্লবটাও যদি তখন ঘটিয়ে দিতে পারতিস? সেটাও বল। তারপরে বোধহয় বিদ্যাসাগরের মুন্ডু কাটতে যেতিস?'

ভুন্ডুল জিভ কেটে লাফ দিয়ে উঠে বললো, 'ওরে বাবা, বেঁচে থাকুন বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে! তা নইলে মাকখ হয়ে থাকতাম।' বলে নাচের ভঙ্গি করে আবার বললো, 'বেঁচে থাকুন বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে। বেঁচে থাকুন—।' হঠাৎ থেমে গিয়ে ভুরু কুঁচকে ক্ষ্যাপা চোখে পোটোর দিকে তাকালো। বললো, 'তুই-ই তো আমার সব এলোমেলো করে দিচ্ছিস। শালা ফাদ্রা-ফাই।' বলেই পিন্ট তুলে ঢকঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল। 'শোন্ শালা, তোর ওসব রেনেসাঁস টেনেসাঁস আমি জানি না। আমি জানি ইংরেজরা এসেছিল বলেই, এসব ফুটানির বুকনি মারতে শিখেছিস।'

'হ্যাঁ, তোর তো আবার ইংরেজিতেই অনার্স ছিল। খিক্ খিক্ খিক্।'

'ছিলই তো।' ভুন্ডুলের দাঁতগুলো পাশবিক রকম ঝলকিয়ে উঠলো, 'ইংরেজি না জানলে তো তোরা কালিদাসকেও তালপাতাতেই রেখে দিতিস। অজন্তা ইলোরার গুহা তোদের কে চিনিয়েছে রে শালা? কারা তোদের ইতিহাস লিখতে শিখিয়েছে? কে এনেছে তোদের সোত্রাইটি, খালি পটপটানি।'

'ভাগ্যিস বলিস নি কালিদাস ইংরেজ ছিল। অজন্তা ইলোরার আর্টিস্ট ওদেরই সৃষ্টি—এই দ্যাখ ভুন্ডুল, প্যাঁদাবি না।'

ভুন্ডুল উদ্যত পা নামিয়ে বললো, 'খচড়ামি করবি না। আমরা বলি, পেঁদিয়ে বাপের নাম ভোলায়। ইংরেজরা পেঁদিয়ে তোদের বাপের নাম মনে করিয়ে দিয়েছিল, বুঝলি?'

পোটো হাত তালি দিয়ে বলে উঠলো, 'বাহ্! বাহ্! মাঠে গিয়ে লেকচার দিবি নাকি?'

'হ্যাঁ, তা না হলে আমাকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখাবার সুবিধে হবে কেন? তোমরা শালা গাছেরও পাড়বে, তলারও কুড়োবে। কাদের কাছ থেকে তোরা সেন্স অব সুভেনির পেয়েছিলি? সিরাজদ্দৌলা? হিঃ হিঃ হিঃ!...তবে হ্যাঁ, লঙ্ডরুট মার্চটা যদি তখন করে ফেলতে পারতাম...।'

'ইতিহাসের দোষ—তোর যে তখন জন্ম হয়নি। খিক্ খিক্ খিক্।'

'রেনেসাঁসওয়ালারা ওখানেই দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। হিঃ হিঃ হিঃ।' ভুন্ডুল হাসতে হাসতে পিন্টের দিক হাত বাড়ালো।

'দাঁড়া, এটুকু আমার, তোকে একটু খানি দেবো।' বলেই পোটো পিন্টে চুমুক দিয়ে মুখটা একটু বিকৃত করলো। সামান্য তলানিসহ পিন্টটা ভুন্ডুলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'যাক, তবু একটা কথা মেনেছিস।'

ভুন্ডুল বোতলের শেষ তলানি গলায় ঢেলে, সেটা ঝোপড়ির এক কোণে ছুঁড়ে মারলো। একটা ব্যাঙ একবার লাফিয়ে উঠে, কোণের মধ্যে নিজেকে আরো গুঁজড়ে দিল। ভুন্ডুল বললো, 'দ্যাখ পোটো, ঠাট্টার সময় আর ইয়ার্কি করবি না, এটা মাসের প্রথম রোববার! নির্বিবাদ বউদের খ্যাকানির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে, ওসব রেনেসাঁস টেনেসাঁস গুলি মারো।' বলে দু হাত তুলে নেচে নেচে বলতে লাগলো, বেঁচে থাকুন বিদ্যেসাগর চিরজীবী হয়ে...বেঁচে থাকুন বিদ্যেসাগর...।

'তা হলে লঙ্ডরুট মার্চের আর দরকার নেই বলছিস?' পোটো বলতে বলতে, লম্বা ঠ্যাঙ ছড়িয়ে কাত হয়ে পড়লো।

ভুন্ডুল দু হাত তুলে নাচতে নাচতেই বললো, 'নো রিপিটেশন। এখন চাই আর একটা রেনেসাঁস, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির রেনেসাঁস ভারত জুড়ে।'

পোটো গোঙানো সানুনাসিক স্বরে বললো, 'নবজাগরণ, না বিপ্লব?'

'ওসব কথার মারপ্যাঁচ জানি না।' ভুন্ডুল বললো, 'তবে এবার আর অনন্তদের বাদ দিয়ে না, ওরেব—।'

'এসে গেছি ভুন্ডুলদা।' ঝোপড়ির ঝাঁপহীন খোলা মুখের কাছে অনন্ত এসে দাঁড়ালো, সবগুলো দাঁত দেখানো গালে ভাঙা পাতা হাসি ওর মুখে। পাকানো রুক্ষ চুল উড়ছে। হাতে খবরের কাগজে মোড়া প্যাকেট। বললো, 'তোমাদের তো মন্ডলদের দোকানে এখনো মেলাই ভিড়। আমি ইচ্ছা করে দেরি করিনি।'

পোটো গোঙানো স্বরে বলে উঠলো, 'দারুণ টাইমলি এসেছিস অনন্ত। এখন আর দেরি নয়, তোরা হাতে হাত ধর গো। ...এই ভুন্ডুল মারবি না।' বলেই প্রায় ডিগবাজি খেয়ে দূরে সরে গেল।

ভুন্ডুল পা তুলেছিল, নামিয়ে নিল। হাত বাড়িয়ে অনন্তর হাত থেকে কাগজের মোড়কটা নিল, 'আহ্, এখনো বেশ গরম।'

অনন্ত চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখতে দেখতে ঘরের কোণে শূন্য পিন্টটা দেখতে পেয়ে সরে গিয়ে হাতে তুলে নিল। কোণে মুখ গোঁজানো ব্যাঙটা একটু নড়েচড়ে উঠলো। অনন্ত অবাক স্বরে বললো, 'খতম?'

'বললামই তো তখন, আবার তোকে একটু বাদেই যেতে হবে।' ভুন্ডুল পা ছড়িয়ে বসে কাগজের মোড়ক খুলতে খুলতে বললো, 'যা, আবার একটা নিয়ে

আয়।' পোটোর দিকে তাকিয়ে ডাকলো, 'এসো বাব্, ফাদরাফাই, ডিম ভাজা খাবে।'

পোটো আধশোয়া অবস্থায় কাত হয়ে ফিরতে গিয়ে অবাক লাল চোখে অনন্তর দিকে তাকালো। অনন্ত পেট কোমরের গেঞ্জি সরিয়ে ইতিমধ্যে আর একটা পিণ্ট বের করেছে। হাসির ভাঁজে ওর চোখ দ্'টোই প্রায় ব্জে গিয়েছে। বললো, 'আমি ঠিক এইটেই ভেবেছিলাম, তাই আগে থেকেই তোয়ের হয়ে এসেছি।'

পোটো আর ভুণ্ডুল দ্'জনের চোখই এখন কোকিলের মতো। ওদের বিনাস্ত চুল শ্'কিয়ে যাওয়ায় বাতাসের ঝাপটায় এখন কিছ্'টা অবিনাস্ত। দ্'জনে দ্'জনের দিকে তাকিয়ে ঝোপড়ি কাঁপিয়ে হেসে উঠলো। ভুণ্ডুল বললো, 'একেবারে ট্'দি পয়েণ্ট। আমার কথা খেলাপ হবার না। অনন্ত, আয়, তুইও আমাদের সঙ্গে বসে যা।'

'উরে বাব্বা, এখন পারব না দাদা।' অনন্ত পিণ্টটা নামিয়ে দিল দ্'জনের সামনে। ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

পোটো ডাকলো, 'এই, টাকা নিয়ে যা।'

অনন্ত দাঁড়ালো। পোটো আর ভুণ্ডুল দ্'জনে এক সঙ্গে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢোকালো। পোটো বললো, 'তুই এর পরে দিবি, এটা আমি দিচ্ছি।' হিসাব করে অনন্তকে টাকা দিয়ে বললো, 'এক টাকা তোর।'

'আবার দিচ্ছেন?' অনন্ত যেন লজ্জা পেয়ে মাথা চুলকিয়ে বললো।

ভুণ্ডুল মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে বললো, 'নিয়ে যা। মাসের এটা প্রথম রোব্বার তো।'

অনন্ত আপ্লুত হেসে বেরিয়ে চলে গেল। ভুণ্ডুল কাগজের মোড়ক খ্'ললো। তেললাগা কাগজে দ্'-টুকরো ডিম ভাজা। বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। পোটো এক টুকরো ডিমভাজা মুখে দিয়ে বোতলের ছিপি খ্'লতে লাগলো। নেড়ি দ্'টো আবার ঝোপড়ির খোলা মুখের কাছে এসে বসেছে। ভুণ্ডুল এক সঙ্গে প্রায় অর্ধেকটা ভাজা মুখে প্'রে দিল। গাল ফুলিয়ে গাঁউ গাঁউ স্বরে বললো, 'ছেলে দ্'টো—।' ডিমভাজা গলায় গিয়ে কথা আটকিয়ে গেল।

পোটো ছিপি খ্'লে পিণ্টে মুখ লাগিয়ে ঢ'ক দিয়ে চোখের পাতা টান করে জিজ্ঞেস করলো, 'ছেলে দ্'টো?'

'হ্যাঁ।' ভুণ্ডুল মাথা ঝাঁকালো।

'কার ছেলে?'

'আমার, আবার কার।' ভুণ্ডুল বললো প্রায় একই রকম স্বরে, 'শালা, জানো না?'

'জানবো না কেন আমারো তো দ্'টো মেয়ে আছে।'

ভুণ্ডুল পিণ্টে চুমুক দিয়ে বললো, 'ছেলে দ্'টো কেমন যেন টাট্'ট্' হয়ে যাচ্ছে।'

'আর আমার মেয়ে দ্'টো একদম পরী হয়ে যাচ্ছে।'

'পরী? হিঃ হিঃ হিঃ! দ্'টো টাট্'ট্' আর দ্'টো পরী।'

'কী রকম সিগ্'নিফিকেণ্ট বল দেখি? টাট্'ট্' দ্'টোর ওপর পরী দ্'টো চেপে বেড়াবে।'

'শালা।' ভুণ্ডুলের দাঁত ঝলকিয়ে উঠলো, 'তারপরে টাট্'ট্'দের বাপের ঘাড়ে পরীদের মাকে চাপিয়ে দেবে না?'

পোটো গান গেয়ে উঠলো, 'আহা, এমন দিন কি হবে মা তারা!'...

'হবে'। ভুণ্ডুল এবার খ্'ব দ্রুত পোটোর হাঁট্'তে লাথি মারলো।

পোটোও চকিতেই ভুণ্ডুলের পা চেপে ধরলো। ফলে ভুণ্ডুল ভারসাম্য হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে যেতে উদ্যত হলো, বললো, 'পড়ে যাবো, ছাড়।'

'খিক্ খিক্ খিক্।'...পোটো ভুণ্ডুলের পা ছেড়ে দিল। পিণ্টে চুমুক দিল।

ভুণ্ডুল পিণ্ট নিয়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে মোটা গোঙানো স্বরে বললো, 'কণা আজ মাকে খ্'ব শোনাচ্ছে। আমি যে মায়ের কতো খারাপ ছেলে...।' কথা থামিয়ে ও কয়েক মুহূর্ত যেন অবাক আর অন্যমনস্ক চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো। বাতাসের একটা ঝোড়ো ঝাপটা ঝোপড়ির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওর চুলগ্'লো অনেকখানি অবিনাস্ত হয়ে গেল, কপালের ওপর এসে পড়লো।

পোটো উড়ে যাওয়া ডিম ভাজার কাগজটা হুমড়ি খেয়ে চেপে ধরলো। ভুণ্ডুল আবার কথা বললো, 'আর মা অন্য-দিকে তাকিয়ে থাকবে। কণা আসলে বলতে চায়, মা কেন আমার দাদার কাছে চলে যায় না। যে-দাদা ধার্মিক, সন্ধে আহ্নিক জপতপ করে, নেশাভাঙ করে না...আর আমার ছেলেদ্'টো আমার দিকে এক এক সময় এমন করে তাকিয়ে থাকে, যেন আমি একটা অচেনা লোক...।' ওর কথাগ্'লো একঘেয়ে গোঙানোর মতো বেজে আস্তে আস্তে জড়িয়ে গেল।

'আমার বাবা ওসব নেই। মাও নেই, বাবাও নেই।' ভুণ্ডুলের শিথিল হাত

থেকে পিণ্ট নিয়ে চুমুক দিল, 'ভাইগুলো সব যে যার মতো গুছিয়ে নিয়েছে, বম্বে জামশেদপুরে ভালো চাকরি করে। আমার মতো চটকলের কেরানীকে...লোলি খুব শোনায় (হেঁচকি)—ওদের তো জাগরণ হয়ে গেছে—(হেঁচকি) মানে রেনেসাঁস, কিন্তু আমার পরী দুটোর আজ কপাল খারাপ।'

'কপাল খারাপ ?'

'হ্যাঁ, আজ যে রোববার। আজ ললিতা দিদিমণির ছুটি, মেয়েদের সারাদিন পড়াবে না ? আর মাঝে মাঝে ঝাড় (হেঁচকি)—পাঞ্জী বাপের মেয়ে (হেঁচকি)—অবিশ্যি যদি লোলির বড়দি—মানে, আমার বড় (হেঁচকি) শালী—নিপীড়িতা নারী—(হেঁচকি) অধিকার সংরক্ষণ সমিতির (হেঁচকি) ইয়ে, এসে যান, তাহলে আমার ছেরাদ্দ...কিন্তু আমার পরী দুটো—(হেঁচকি হেঁচকি হেঁচকি...)'—পোটো পিণ্টে মুখ চেপে ধরলো। গাল দুটো ফুলে উঠলো। রক্ত বর্ণ চোখ দুটো চিক্ চিক্ করছে।

'খারাপ।'

'কী ?'

'আমরা। কেন যে—।'

'আসলে আমরা যে—।'

'খ্যাপ্।' ভুন্ডুল কথাটা ভারভাবে বাধা দিতে চাইলো, শোনালো একটা বিকৃত শব্দ, 'জজব।'

পোটোর হাত থেকে পিণ্টটা নিয়ে একটা চুমুক দিল, 'ব্যাটলশিপ পোটে, তুই না শালা লোলির সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করেছিলি ?'

'তেরও তো ভালবাসার বিয়ে—।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভালবাসা পুরনো হলেই একটা ভালবাসার কালচারাল রেভুলিউশন দরকার, বুঝলি ? সেটা তো হয়নি। তাই ইভলস্—মানে ভালোবাসার শত্রুগুলো—।'

'মাথা (হেঁচকি) চাড়া দিয়ে উঠেছে। খিক খিক খিক...(হেঁচকি হেঁচকি হেঁচকি)।' পোটোর রক্তবর্ণ চোখে জল উপছিয়ে এলো, 'শালা।' ভুন্ডুলের হাত থেকে পিণ্টটা টেনে নিয়ে চুমুক দিল। দু একটা ফোঁটা পড়লো মাত্র। পিণ্ট শূন্য। মুখটা বিকৃত করে বললো, 'তুই একদম মাতাল হয়ে গেছিস। এখন আর একটা পাঁট না হলে (হেঁচকি হেঁচকি) ভালবাসার সংস্কৃতিক—(হেঁচকি...)।'

'লোলিকে বোঝাতে হবে—।'

'আঁ ?' পোটো যেন আঁতকিয়ে উঠলো।

'হিঃ হিঃ হিঃ।'

'ছুঁচো।' পোটো শিশিটা এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো।

ভুন্ডুল বললো, 'এই, শুচ্ছিস কী ? চল্ এবার বেরেই।'

'কোথায় ? বাড়ি ?'

'আজ মাসের প্রথম রোববার, এখন

বাড়ি? এখন তো সকাল। ওঠ্।' ভুন্ডুল পোটোর কামড়ানো পেঁয়াজটা পুরো মুখে পুরে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

পোটো হেঁচকি তুলতে তুলতে এঁকে-বেঁকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে 'চল্। ছুরিটা?' জিজ্ঞেস করে আবার নিচু হয়ে সেটা তুলে নিল। মুখটা ভাজ বন্ধ করে পকেটে রাখলো।

নেড়ি দুটো ল্যাজ নেড়ে ঝোপড়ির মুখ থেকে অনেকটা সসম্মানে সরে দাঁড়ালো, কিন্তু লুব্ধ ক্ষুধার্ত নজর কাগজের, পড়ে থাকা, এখনো খানিকটা ডিম ভাজার ওপর। পোটো আর ভুন্ডুল দুজনেই কিছু টলছে। ঝোপড়ির বাইরে যেতেই বাতাসের ঝাপটায় দুজনের চুল এলোমেলো হয়ে গেল। নেড়ি দুটো লাফিয়ে ভিতরে ঢুকলো। বাইরের রোদে পোটো আর ভুন্ডুলের চোখ ঝলসিয়ে গেল। ভারি হয়ে আসা চোখের পাতা কুঁচকে গেল। দুজনেই উঁচু পাড়ের দিকে উঠতে লাগলো।

'কেন?'

'রেনেশাঁস কপচাও আর জানো না, এ সব কথা মনে মনে বলতে হয়?'

'ওইজন্যেই তো সত্যি কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।'

রিকশা চলেছে কারখানার পাশ দিয়ে। এলাকটা ঘিঞ্জি। বাজার ছাড়ালেই দু পাশে দোকানের ভিড়। সামনে আরো কয়েকটা কারখানা। সব কটাই চটকল। পোটো মোটামুটি গলা ছেড়েই একটা গানের সুর ভাজছিল। সুরটা আসলে বেসুরো। ও নিজেও জানে না কেন গানের সুর ভাজছে। গানের দিকে ভুন্ডুলের এক সময়ে ঝোঁক ছিল। 'গতজন্মে' কিছু রেওয়াজ টেওয়াজও করেছে। ও পোটোর দিকে চোখের ভারি পাতা মেলে, মুখে তাকিয়েছিল। রিকশাটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। দাঁতে চিবনো স্বর শোনা গেল, 'মাল টেনে খুব ফূর্তি করা হচ্ছে, অ্যাঁ?'

'কে রে?' পোটো সুর ভাজা থামিয়ে তাকালো।

রিকশার সামনের চাকার গতি রোধ করে একজন দাঁড়িয়ে। পায়জামা পাঞ্জাবী পরা, গাটটা গোটটা চেহারার সরষের তেল রঙ নিম্ন চল্লিশের এক যুবক। মুখ আর চোখের দৃষ্টি শক্ত। ভুন্ডুল ঘাড় কাত করে হেসে বললো, 'কে, শংকর নাকি?'

'চিনতে পারলে? চোখের মণি তো সীসের গুলি হয়ে গেছে।' শংকরের শক্ত মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। সে রাস্তার ধারে একবার ফিরে তাকালো।

রাস্তার ধারে দু তিনজন দাঁড়িয়েছিল, শংকরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সবাই হাসলো। ইতিমধ্যে পোটো আর ভুন্ডুলও একবার ওদের লাল চোখে দৃষ্টি বিনিময় করলো। অনন্তও পিছনে, সামনে ধারে সন্দিগ্ধ চোখে দেখলো। পোটো বললো, 'ফূর্তি? তা বলতে পারো। একটাই তো দিন, আজ মাসের প্রথম রোববার তো! তা তুমি অমন পথ আগলে

অনন্ত অবাক হয়ে বললো 'বেলা একটা তো বেজে গেছে, বাড়ি যাবেন না?'

রাস্তার ধারে রোদের ওপর কয়েকটা সাইকেল রিকশা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনন্তর রিকশাটা চিনতে পোটো আর ভুন্ডুলের অসুবিধা হয়নি। দুজনে উঠে বসতেই অনন্ত এগিয়ে এলো। পোটো বললো, 'রোববারের বেলা একটা তো সকাল।'

'কেন, তুই এখন বাড়িতে খেতে যাবি?' ভুন্ডুলের ঠোঁট বেঁকে উঠলো।

পাশের অন্য এক রিকশাওয়ালা বলে উঠলো, 'আমি নিয়ে যাচ্ছি, আসুন বাবু। কোথায় যাবেন?'

'তোর বাড়ি যাবেন।' অনন্ত দাঁত মুখ খিঁচিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললো, নিয়ে যাবি?' পোটো আর ভুন্ডুলের দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'যা খাবার তা সকাল-বেলাই খেয়ে নিয়েছি।'

অন্যান্য রিকশাওয়ালারাও হাসলো। অনন্ত নিজের আসনে বসে জিজ্ঞেস করলো 'কোন দিকে যাবো?'

'বাড়ির দিক ছাড়া যে-কোনো দিকে।' পোটো বললো।

অনন্ত ডান দিকে ফিরে চালাতে আরম্ভ করে, পিছনে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'রোদটা চড়া আছে, মাথার ঢাকনাটা টেনে দিই।'

ভুন্ডুল বলে উঠলো, 'না না রোদ থাক, হাওয়াটা ভালো লাগছে।'

'তা ছাড়া এটা তো সবে মাস কাবার হয়েছে।' পোটো বললো, 'মাসকাবারে মনে পাওয়ান ফিনিশ। এখন কয়েকদিন তা গা ঢাকা দিয়ে বেড়াবার দরকার নেই।'

'বুদ্ধু।' ভুন্ডুল সিগারেট ধরালো।

দাঁড়ালে কেন?'

'হানা কেটে যাচ্ছে রে শংকর, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে।' রাস্তার ধার থেকে একজন বললো। বাকিরা হাসলো।

শংকর হাসলো না। শক্ত মুখে চোখ কুঁচকে বললো, 'পরশুদিন মাইনে নিয়ে দিব্যি কেটে পড়লে, আর এখন মাল খেয়ে মজা মারছো ইউনিয়নের চাঁদাটা কে দেবে, শুনি?'

পোটো বললো, 'ওহ্, এই কথা! মনেই ছিল না। কাল মিলে গিয়ে নিয়ে নিও।'

'মাল খেতে মনে থাকে, ইউনিয়নের চাঁদার কথা মনে থাকে না, না?' শংকরের মোটা নাক আরো মোটা হলো।

পোটো কি বলতে যাচ্ছিল। ভুন্ডুল ওর গায়ে কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরে বললো, 'ঠিক বলেছ শংকর। এরকম ভুলে যাওয়া খুব অন্যায়।'

'তা হলে চাঁদাটা এখন দিয়ে যাও, কাল মিলে বিল পেয়ে যাবে।' শংকর শক্ত গলায় বললো। সে মিলের ডিপার্টমেন্টের কেরানী। নির্বাচিত ওয়াকার্স কমিটির সেক্রেটারি, ইউনিয়নের লিডার। পোটো বললো, 'এখন? এখন কি—!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ এখনই।' ভুন্ডুল পা ছড়িয়ে দিয়ে হিপ পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো, 'ওসব হকের ধন কখনো বাকি রাখতে নেই।' দুটো দশ টাকার নোট শংকরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'কাল বিল দুটো দিয়ে দিও।'

শংকর মাথা ঈষৎ ঝুঁকিয়ে রিকশার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো। অনন্ত রিকশা চালিয়ে দিল। ওর মুখটা প্রায় শংকরের মতোই শক্ত দেখাচ্ছে। পোটো বললো, 'শংকর বললো, আর—।'

'চোপ শালা।' ভুন্ডুল ধমকিয়ে দাঁত ভেংচিয়ে বললো, 'খুব তো বলছিলি, মসকাবারির দেনা পাওনা সব ফিনিশ, এখন গা ঢাকা দিয়ে চলবার দরকার নেই। আমাদের দেনা কখনো মেটে?'

পোটো যেন ক্ষীণজীবীর মতো বললো, 'চাঁদার কথাও যে মনে রাখতে হবে—।'

'হ্যাঁ, জানো না শালা, এ লড়াই বাঁচার লড়াই। লড়তে হলে চাঁদা চাই।'

'তা বলে তুই এটাকে হকের ধন বললি?' পোটো প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো।

'বলবো না? আমাদের জীবনটাই তো হকের ধন।'

'জীবনটাই হকের ধন?'

'নিশ্চয়। আমরা তো নয়া রেনেশাঁস চাই।'

'ওহ্, কিন্তু মাসের প্রথম রোববারেই কুড়িটা টাকা—।'

'আরে সে তো আজ হোক, কাল, দিতেই হতো। নে, তখন কী সুরে ভাজছিলি, তাই ভজ। হিঃ হিঃ হি।'

পোটো গোঙাতে শুরু করলো, সুরে ভাজার চেষ্টায়।

কলকারখানার ঘিঞ্জি অঞ্চল পেরিয়ে আসার পরে এক জায়গায় গংগা আকাশ আর বাতাস হঠাৎ যেন রিকশার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাতাস এখন অনেকটা পড়ন্ত। লোকালয় কমে এসেছে। চৈত্রের রোদ পিচের রাস্তাটা যেমন গলে চকচক করছে, অনন্তর হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে শরীরটাও সেইরকম গলানো চকচকে।

'কিন্তু একটু মাল না হ'লে তো আর চলছে না।' নদীর ধারের খোলা হাওয়ায় এসে পোটোর যেন হঠাৎ চমক ভাঙলো।

ভুন্ডুল বললো, 'সে গুড়ে এখন বালি, সামনে দু মাইলের মধ্যে কোনো দোকান নেই।'

অনন্ত একটা গাছতলায় রিকশাটা দাঁড় করিয়ে বললো, 'দেখি, একটু নামুন তো আপনারা।'

পেটো আর ভুন্ডুল দুজনেই অবাক হলো। কোঁচকানো চোখের ভারি পাতা মেলে ভুন্ডুল জিজ্ঞেস করলো 'কী করবি?'

'নামুন না বলছি।' অনন্ত অনেকক্ষণ পরে শুকনো একটু হাসলো।

দুজনেই থামলো। এই ভাদ্রের ঠাঠা মারা দুপুরে এমন কি রবিবারের রাস্তাটাও প্রায় খা খা করছে। অনন্ত রিকশার সীটটা তুলে ভিতর থেকে একটা আনকোরা দু নম্বর পাঁইট বের করলো। পেটো ঝাঁপিয়ে পড়ে অনন্তকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো, 'ওরে আমার অনন্ত, খাঁচার প্রাণ জামিয়ে দিলি। এর জন্য দু টাকা বেশি পাবি।' বলে পকেটে হাত দিল।

অনন্ত বললো, 'এখন টাকা রাখুন, পরে দেবেন।'

'তা কুড়ি টাকা গন উইথ দা ক্যাশমেন্ট।' বললো, 'মনে হচ্ছে অনন্ত তোর কাছেও দেনা থাকবে।'

অনন্ত হাসলো প্রায় সবগুলো দাঁত দেখিয়ে 'কী যে বলেন ভুন্ডুলদা। আমাদের কাছে আবার বাবুদের দেনা হয় নাকি? পরে দিয়ে দেবেন। আপনাদের জন্যই কিনে রেখেছিলাম।'

'ওর শালা খেও দেখাসনে। কেমন বুক চিনচিন করে।' ভুন্ডুল বলতে বলতে রিকশায় উঠলো।

পেটো পিপেটের ছিপি খুলতে খুলতে রিকশায় উঠে নতুন উৎসাহে বললো, 'এবার আমি যেদিকে বলছি সেদিকে চল তো। সামনে এগিয়ে ডান দিকের রাস্তায় মোড় নে।'

অনন্ত নিজের জায়গায় উঠে নির্দিষ্ট পথে রিকশা চালালো। পেটো প্রথম চুমুক দিয়েই গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলো, 'সাহতে দাহতে জনম—।'

'চোপ।' ভুন্ডুল পিপেটা ছিনিয়ে নিল, 'ষাঁড়ের মতো চেঁচাবি না।'

'ষাঁড়? তবে তুমিই শালা তরলাবালার মতো গাও না।'

'তরলাবালা?'

'হুঁ হুঁ, নাম শুনিস নি তো? এখানে দাঁত ফোটাতে হবে না, পেটো মুখুজ্জের কাছে তরলাবালার ছবি আছে। প্রায় আমাদের বাপের জন্মের আগে, বুঝলি? একটা গোটা অ্যালবামে শুধু নায়িকাদের ছবি আর গান।' পিপেট নিয়ে চুমুক দিল।

'তানসেনের বংশধর দবীরখানের ছবি নেই তো?'

'নবীসুন্দরীর আছে।'

'হিঃ হিঃ হিঃ। ওসব তোর বালা সুন্দরীদের ব্যাপার নয়, বুঝলি। বেগম টেগম দরকার।' ভুন্ডুল পিপেট নিয়ে চুমুক দিয়ে খুব দ্রুত একটা ঠুংরির সুর ভেঁজে হাঁটুতে তাল দিল।

পেটো বললো, 'চালিয়ে যা।' অনন্তকে বললো, 'অনন্ত এবার সামনে বাঁ দিকে মোড় ফিরবি।'

'কোথায় যাচ্ছিস বল দিকিন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না, আন্দাজি চালাতে বলছি।'

অনন্ত বললো, 'এক জায়গায় গিয়ে ঠিক পৌঁছুবো।'

'বাঃ, বেশ বলেছিস অনন্ত।' ভুন্ডুল বললো, 'এক জায়গায় গিয়ে ঠিক পৌঁছুবো। রিটার্ন টিকেট হাতে নিয়েই জন্মেছি।'

পেটো বললো, 'হরিবোল হরিবোল।'

রাস্তাটা ছোট, দু পাশে গাছপালার ঘন ছায়া, নিঝুম। রিকশা দাঁড়িয়ে পড়লো। সামনে একটা ভাঙা পুরনো সিংহ দরজা। গেট বললে ঠিক বোঝায়। গেটের কোনো পাল্লা নেই। দু পাশের থাম পড়ো পড়ো, মাথার ওপরে, দুটো সিংহের একটোরও আস্ত নেই। দু পাশের লম্বা পাঁচিল জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। ভিতরে পোড়ো জমির আশেপাশে কয়েকটা গাছ। দু-একটা ভাঙাচোরা একতলা ইমারত। গেটের কাছ থেকে একটা পায়ে চলা রাস্তার দাগ ভিতরের দিকে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

'থামলি কেন অনন্ত, ভেতরে চল।' পেটোর স্বর জড়িয়ে আসছে, চোখের পাতা ভারি হয়ে ঝুলে পড়ছে।

ভুন্ডুলের অবস্থাও সেইরকম। ওর নাভি গেঞ্জিটা এখন নাভির উপরে উঠে পড়েছে। ট্রাউজারের ফাঁক দিয়ে জাঙিয়া উঁকি দিচ্ছে। বললো, 'চল, থামিস না।'

অনন্ত প্যাডেলে জোরে চাপ দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। পোড়ো জমিটা বেধড়ক

একদা বাগান ছিল। লম্বায় চওড়ায় কয়েক বিঘা পোড়ো জমি। এখনো দু-তিনটে অর্জুন আর দেবদারু গাছ রয়েছে। বাঁদিকে আর একটা পাঁচিল ঘেরা বিরাট একটা দোতলা বাড়ি। তার দরজা জানালা সবই বন্ধ। পাঁচিলের গায়ে দেউড়িটার দুটো পাল্লাই খোলা।

অনন্তকে একবার থামতেই হলো। সামনেই একটা পুরনো শিবমন্দির, অশত্থের শিকড়ের অসংখ্য বাহু যার আপাদমস্তক অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছে। আর এগোবার রাস্তা নেই।

'হুঁ, অয় ভুন্ডুল, নামি।' পোটো আগে নেমে, হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে টাল সামলালো।

ভুন্ডুল উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়লো। তারপরে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল অনন্তর দিকে। অনন্ত ওর হাত ধরলো। ভুন্ডুল নেমে মুখ তুলে, অশত্থের ঝাড়ে জড়ানো মন্দিরটার দিকে তাকালো। পোটোর হাতে পাঁইট তখনো কিছুটা মদ অবশিষ্ট রয়েছে। নিজে একটা চুমুক দিয়ে বললো, 'নে, এটা শেষ করে দে।'

ভুন্ডুল পাঁইটটা উঁচু করে চুমুক দিতে গিয়ে টলে পড়ে যাচ্ছিল। অনন্ত ধরে ফেললো। ভুন্ডুল পাঁইট শূন্য করে সেটা ছুঁড়তে উদ্যত হলো। অনন্ত হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে বললো, 'আমাকে দিন।'

পোটো ভুন্ডুলের হাত ধরে বললো, 'চল'।

দুজনেই হাত ধরাধরি করে, টলতে টলতে মন্দিরের ভাঙা দাওয়ায় উঠলো। ভুন্ডুল বললো, 'এটা তো সেই কীর্তি-নগরের—'

'হ্যাঁ।' পোটো বললো।

'এখানে কেন এলি? সাপের ছোবল খেতে?'

'এখনকার সাপ ছোবল মারে না।'

মন্দিরের এক পাশ দিয়ে, দুজনেই পিছনে গেল। পিছনের দৃশ্য অনেকটাই আলাদা। পিছনে চাতালের প্রান্তে আর একটি মন্দির, কয়েকটি চূড়াবিশিষ্ট। শিব-মন্দিরের মতো পুরনো না। বাঁ দিকে আর একটা চারচালা মন্দির, যার সর্বাঙ্গে পোড়া ইঁটের কাজ। কেবল জীর্ণতা না, কোনো কোনো জায়গা থেকে পোড়া ইঁটের টুকরো নিরঙ্কুশ তুলে নিয়েছে। তবু অধিকাংশই এখনো বেঁচে আছে। এমন কি, বৃষ্টি ধোয়া আর ধুলোর আক্রমণেও, ওপরের দিকে বহুকালের পুরনো রঙ উজ্জ্বল রয়ে গিয়েছে। পোটো আর ভুন্ডুল হাত ধরাধরি করে টলতে টলতে চারচালা মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

মন্দিরের একপাশে ছায়া, অন্যদিকে বাঁকা রোদ। বেলা পাশ ফিরতে চলেছে পশ্চিমে। সকালের মতো, বাতাসে ঝোড়ো ঝাপটা নেই। বাতাসেরও লয় আছে, এখন তা বিলম্বিত। এই গাছপালা মন্দিরের পরিবেশে তা দীর্ঘশ্বাসের মতো বইছে। শুকনো পাতা উড়ছে। মন্দিরের দাওয়ায় ছায়ায় কুণ্ডলী পাকানো একটা কুকুর, দুটো মানুষকে দেখে হঠাৎ চমকিয়ে উঠলো ভীরু সন্দিগ্ধ চোখে একবার তাকিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ছুটে পালালো। ভুন্ডুল দু হাত দিয়ে মন্দিরের গা স্পর্শ করলো। ওর রক্ত চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো যেন শোঁকবার জন্যই নাক স্পর্শ করালো পোড়া ইঁটের মূর্তির গায়ে। তারপর মুখটা সরিয়ে নিয়ে এসে, বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে একটি ইঁটের গায়ে ঠেকিয়ে গোঙানো নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'এরা কারা, এই পাল-তোলা জাহাজে?'

'ফিরিঙ্গি।' পোটোর গলাও প্রায় একরকমই শোনালো, 'কতোবার তো দেখেছিস।'

ভুন্ডুল বললো, 'মনে থাকে না। আর—এরা? বন্দুক হাতে?'

'ওরাও ফিরিঙ্গি।'

'আর এই মেয়েরা—এদের কী করছে?

'ফিরিঙ্গিরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

'আর এই যে তলোয়ার হাতে, এগুলো আমরা, না?'

'আমরা—হেরে যাচ্ছি।'

'তাই আমাদের দড়ি বেঁধে ওরা টানছে, অ্যাঁ? হাতী মুখ থুবড়ে পড়েছে—বোধহয় কামানের গোলা লেগেছিল, না?'

পোটো কোনো জবাব না দিয়ে, পোড়া ইঁটের গায়ে হাতড়ে হাতড়ে, [illegible] বিশেষ কিছু খুঁজতে খুঁজতে অন্য [illegible] এগিয়ে গেল। ভুন্ডুল গেল বিপরীত [illegible]কে। এক একটা ইঁটের গায়ে তর্জনী [illegible] করে, এক-রকম ভাবেই বলে যেতে [illegible] গেলো, 'এ মেয়েটা কে? ও কার চুল বেঁধে দিচ্ছে!' ওর নিচু গোঙানো স্বর [illegible] ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'আর এই পুরুষ, ঘোড়ায় চড়া—এ কে?...গাছতলায় মেয়েপুরুষটি কী করছে [illegible] রে পোটো ...ধনুকের লক্ষ্যভেদ ওপরে [illegible] কারা [illegible] যুদ্ধ করছে? ভাইয়েরা? ...আর [illegible] হরিণকে কী পাতা খাওয়াচ্ছো? ...যারা এসব বানাচ্ছে...আচ্ছা এই মেয়েটি কি আমাকে একটু...।' ভুন্ডুল মন্দিরের ধারে এসে, ভাঙা গর্তে পা দিল, আর তৎক্ষণাৎ মন্দিরের গায়ে প্রথম মুখ থুবড়ে পড়লো। ঠোঁট কেটে, রক্ত চুঁইয়ে এলো। আস্তে আস্তে মন্দিরের গা থেকে নিচে গড়িয়ে পড়লো, মুখটা পাশ ফিরিয়ে বিড়-বিড় করতে লাগলো। শুকনো পাতা এসে পড়লো গায়ের ওপর। ভুন্ডুল এখন নিশ্চল, চোখ বোজা।

পোটো মন্দিরের গা হাতড়ে হাতড়ে প্রদক্ষিণ করে এসে, ভুন্ডুলের পায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'শুয়ে পড়েছিস? তাহলে আমিও একটু বসি।' ও মন্দিরের গায়ে হেলান দিয়ে, ভুন্ডুলের কোমরের ওপর দু পা ছড়িয়ে দিল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

কয়েকটি একক ও যৌথ প্রদর্শনী

দ্য হিউজ

নভেম্বরের শেষে পর পর কয়েকটি প্রদর্শনী হলো আকাদমী অব ফাইন আর্টসে। 'দ্য হিউজের' প্রদর্শনী হলো ঠিক এক বছর পরে। এবার মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডলের বিরাট একরঙা কাগজে আঁকা ছবির অভাব বোধ করা গেল। প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবি নিম্নস্তরের। মনে হয় এ'রা প্রদর্শনীর আগেই শুধু ছবি আঁকেন। স্বপ্না রায়-চৌধুরী এখন বেশ কিছুকাল প্রদর্শনী না ক'রে আঁকাজোকা শিখুন। প্রতীপ মান্নার ফণিমনসার মধ্যে মেয়েদের কাজ দেখলে কেকের আইসিং মার্কা ক্যালেণ্ডারের কথা মনে হয়। অজয় দাস নার্সিসাসের মতো নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে ভালবাসেন। নিজের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ আঁকেন—বেশ বোঝা যায় নিজেকে করুণা এবং হয়তো ঘৃণা করেন। কোলাজ জাতীয় স্বপ্রতিকৃতি ও অন্যান্য দৃশ্যের ছবিতে কোনো কেন্দ্রস্থল নেই। একদিকে যৌবনে অজয়, অন্যপাশে বার্ধক্যে অজয়—কিন্তু মাঝ বরাবর খাড়াভাবে রচনা ভেঙে দু-টুকরো। যে-ছবিতে একাধিক স্বপ্রতিকৃতি এঁকেছেন সেটাও এতো ব্যক্তিগত যে টানে না। কিন্তু একটি ছবিতেই শুধু ডিগবাজী খাওয়া কিছু বিচিত্র মানুষ ও রূপারোপিত কাতর মুখ এবং দগদগে প্রাথমিক রঙ মন্দ লাগে না। তপন চন্দ্রের অঙ্কন দুর্বল সুতরাং রঙের বিষয় তাঁর মুনশীয়ানা প্রবলভাবে মার খেয়েছে। চাপ চাপ ঘন রঙের বুনোট, চিকণলেপ ইত্যাদি মন্দ নয় এবং রচনা সম্বন্ধে একটা জ্ঞান আছে। সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় সুকৌশলে প্যাস্টেল ব্যবহার করে বিকৃত বাঁদুরে মুখ এঁকেছেন। কখনো কখনো কালো রঙ চাপানো দেখে ভুল হয় বুঝি 'আইভরী ব্ল্যাক' তেল রঙ—কিন্তু আসলে প্যাস্টেল। তাঁর ছবিতে কিন্তু একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সদবাস্তব ছবির ছায়া পড়েছে। গতবারের তপন মণ্ডলের কাজ ছিল তন্ত্রাভিলাষী আঁকিয়ে-দের কাছাকাছি। এব রকার জলরঙে স্বচ্ছা-স্বচ্ছ চারটে ছবি এঁকেছেন। এর মধ্যে ধনুর্ধর ও পাখিওয়ালী খুবই সুন্দর। মটা তেলরঙের তুলিতে জলরঙ টেনে ভূমির মধ্যে বুনোটের মজাদার নকশা করে-ছেন। এর ওপর কখনো সাদ রঙ বা কালি-কলম দিয়ে অবয়ব এঁকেছেন সূক্ষ্ম টানে। রচনা, রেখা ও রঙের ভারসাম্য দেখতে ভালই লাগল।

একটি মেয়ে — বিবেক সাহা

তুলির বিকল্প

বিবেক সাহা আঙুল দিয়ে জলরঙে ছবি আঁকেন। কালি দিয়ে অনেকগুলো বলিষ্ঠ রেখাচিত্র জাতীয় ছবি ছিল। এঁর জলরঙের ছবির মধ্যে বেশ প্রাণচঞ্চল একটা ব্যাপার আছে। নিসর্গের তাৎক্ষণিক চাঞ্চল্য তিনি ধরতে চেয়েছেন এবং দৃশ্যাদি সন্দর্শনে তাঁর হৃদয়ের জাগরণের কথা বলতে চেয়েছেন, সৃষ্টির উত্তেজনা এবং আনন্দ অনুভব করতে চেয়েছেন আঙুলের ডগায়, হাতের তালুতে। ছবি কখনো ধেবড়ে গেছে। কিন্তু খরস্রোতা নদী, আকাশের স্বচ্ছ নীল মুকুর, বিস্তৃত তেপা-ন্তর, পাহাড়, বাঁশঝাড় এসব বেশ ধরে-ছেন। তিন দিকে উড়ন্ত তিনটে পাখির কাজ খুবই সুন্দর। জলরঙের দ্যুতি ও স্বচ্ছতা ছিল। অবশ্য আঙুলে যা করেছেন তা অভিনব হলেও (প্রথীন মৈত্রের কাছে শুনেছি কিশোরী রায় এইভাবে ছবি আঁকতেন), তুলিতে এসবই করা যায় জানি।

দুজন তরুণ চিত্রী

কাজল দাশগুপ্ত এবং পৃথ্বীশ শিক-দারের প্রদর্শনী কিন্তু তেমন জমেনি। পৃথ্বীশের একক প্রদর্শনীতে তাঁর এখানকার সব ছবি ছিল বলেই নতুন করে আলোচনার দরকার দেখি না। কাজলের ছবির দোষ হলো তা ইদানীং ভীষণ এক-ঘেয়ে। পোস্টার রঙ এবং কালি মিশিয়ে তিনি ছবি আঁকেন। হয়তো কখনো রঙ ছিটিয়ে এক ধরনের মজা তৈরী করেন, আবার কখনো সমতল উষ্ণ ও ঈষদুষ্ণ রঙ চাপিয়ে কাঁচিচিত্রের ছবির ব্যাপারটা ঘটান। আসলে ছবির পেছনে নেই কোনো অন্বে-

অন্নাকুলেবী কাজল দাশগুপ্ত

রূপ। তাঁর মানুষগুলো রক্তমাংসের বলেই মনে হয়, কিন্তু যেন অন্য গ্রহের জীব, নিগ্রহ ও যন্ত্রণার কোনো চিহ্ন নেই মুখে, নয় আছে সুখ বা আনন্দের—একরকম নির্বিকার ও নির্বোধ মুখ। অথচ তাঁর কাজ দেখলে বোঝা যায় একটু চেষ্টা করলে তিনি মন্দ ছবি আঁকবেন না। কারণ তাঁর শৈলী তাঁর নিজস্ব।

ত্রয়ী তীরন্দাজ

তিনজন তরুণ ভাস্কর আবার একই বছরে প্রদর্শনী করলেন। এবারে অবশ্য সরল ঘোষ যোগদান করতে পারেননি। দলের নতুন তারকা তারক পাল। প্রত্যেকেই কাজ করে চলেছেন নিয়মিত। ভাস্করদের বিষয়ে আমি ভীষণ দুর্বল—উৎসাহ নিয়ে এঁরা তরুণ বয়সে কাজ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতির অভাবে ও একশ্রেণীর আমলাদের কুম্ভকার প্রীতির জন্যে, জন্মগত প্রতিভা ও অর্জিত দক্ষতা সত্ত্বেও প্রায়শ, মধ্য যৌবনেই বিরক্ত হয়ে বহু প্রশিক্ষিত ভাস্কর কাজ ছেড়ে দেন। জিতেন রায় খাড়া দীঘল মূর্তিগুলি জিয়াকোমিত্তিরের অনন্য ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়, কিন্তু বস্তুপুঞ্জের ব্যবহারের ধরনটা তাঁর নিজস্ব কখনো অবয়বের আভাসটুকু দিয়ে নারীদেহের নিটোল স্তন, কটিতটতলের ভাজের রক্তমাংসময় সংস্থানকে দেখিয়েছেন। “দণ্ডায়মান নারীতে” কাঠিন্য হয়তো একটু বেশি। কিন্তু একটি শাল জড়িয়ে ‘দুই বন্ধুর” মাথা ঝুঁকিয়ে চলাটা ধরেছেন অদ্ভুত নৈপুণ্যে। এই কাজটির সংযম আমাকে টেনেছে। তাঁর ‘শরীর চর্চা’ বরং আমার কাছে কোনো আবেদন করেনি, কারণ এটা ঠাণ্ডা এবং বানিয়ে তোলা। অগ্র সাগরতলে ‘দুটি মাছের’ দেখা হওয়া যেন কাগজকাটা কাজ, এতে ভাস্কর্যের গাম্ভীর্য নেই।

ভাস্কর সুনীল দাসের কাঠে-করা শুয়ে থাকা কুকুরটা রূপবন্ধের শুদ্ধ ও সংযত প্রয়োগে নিখুঁত। আর ডাইভ মেরেছে এমন গোলকিপারের ভঙ্গীটা তিনি মোটামুটি ধরেছেন সুন্দর। যদিও মা ও বাচ্চার পাশাপাশি শুয়ে থাকার দৃশ্যটি উৎরোয়নি। আর পাখির ডানা মেলে উড়ে যাবার কাজটি সরলীকরণের দিক দিয়ে দৃষ্টি কাড়লেও, ঝাল দেওয়া জায়গা আর একটু ঘষে ঘষে পরিস্কার করা উচিত ছিল। তারক পালের দুটি প্রতিকৃতিতে একটু কলেজী গন্ধ আছে। তবু তাঁর হাতটা ভাল। কিন্তু দুটি লোকের মাথায় মাফলার জড়ানো—কাজগুলো শীতকালে করেছিলেন? তাঁর ‘বাজনদার’ তাম্বুরিন বাজিয়ে নাচের ছন্দে তন্ময়, কিন্তু তার মাথাটা বাড়ির মতো কেন? এঁরা তিনজনই প্রথাসিদ্ধ ভাস্কর্য জগৎ, আরোপিত রূপ এবং মৌল জ্যামিতিক রূপবন্ধ—এসবের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। নিজেকে আবিষ্কার করতে চান প্রত্যেকেই এঁরা। কিন্তু সমাজ যদি এঁদের আবিষ্কার না করে, বাঙালী পৃষ্ঠপোষক যদি এগিয়ে না আসেন, তাহলে অন্তর্জাত বপে এঁরা সৃজনশীলতার এঞ্জিনকে কতটা টানবেন?

শবরীনাথ

শবরীনাথ একসময় চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হবেন স্থির করেছিলেন। তারপর এসব ছেড়ে চিত্রকর হয়ে গেলেন। পড়াশুনো করেছেন কলকাতায়। কিন্তু থাকেন কোচিনে। গৃহাভ্যন্তর সজ্জা ও ফলিত চিত্রকলা চর্চায় তাঁর পেট চলে যায়।

শবরীনাথের প্রদর্শনী-কক্ষে ঢুকতে এমন দুটি কাজ ছিল যা দেখে মনটা কুঁকড়ে গেছিল। কিন্তু তুলনামূলকভাবে অন্য কাজগুলি মোটের ওপর ভালই। তাঁর তৈলচিত্রের মধ্যে তেলের ভাগটাই বেশি, রঙের ভাগটা কম। তবু কী ভাগ্যিস পটগুলো তেল চুকচুকে নয়!

তাঁর চিত্রকল্প, রূপারোপ আর হয়তো দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্ত্য ঘেঁষা। আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতি এবং আমাদের চিন্তাভাবনার অনেকখানি পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে পীড়িত, তাই সৃজনক্ষেত্রে যে তার ছায়া পড়বে এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তিনি পটের ভেতর এমনভাবে মানুষ বা বর্ণমালা ব্যবহার করেছেন যে মনে হয় বিরাট এক ফাঁকা জায়গার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একটা নিঃসীম শূন্যতা যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। রঙ যেন [illegible] অংশটিকে একটা আবছা [illegible] শান্ত স্নান করিয়েছে। হয়তো একটা স্মৃতির রেশ বা সুরের স্রোতে আমাদের নিমজ্জিত করতে চেয়েছেন। হালকা অনুদ্ভাসিত রঙের মধ্যে হয়তো যোনিদেশ, বা ঘোড়ার কাটা মাথা, বা একটা শায়িত দেহ। কিংবা একটা ফাঁকা ঘরের ভেতরটায়, পেছনে, একটা লোক শুয়ে আছে। সামনে একটা খয়েরী টেবিলে একটা খালি কলাই করা বাটির চারপাশে রক্তের বলয়। মনে হয় ছাদটা নীচু হয়ে নেমে আসছে। বা স্তনের বোঁটার একটু ওপরে পাশ থেকে করা শিল্পীর প্রতিকৃতি, নীচের দিকে অন্যপাশ থেকে করা আর একটি স্বপ্রতিকৃতি। বা ওপরে ঈগলের ধারালো নখ আর পটের একেবারে নীচে একটা শবদেহ, মাঝখানে বিরাট শূন্যতা। বা দুটি বাড়ির দেওয়ালে ফাঁক দিয়ে একটু কুঁড়েঘর একটা মানুষের ওপর চেপে বসেছে। হাঁটু থেকে তার পা বেরিয়ে এসেছে। বা লাল রঙে স্নাত আবছা পটভূমিতে ছিন্নমস্তা নারীদেহ। আবার সাদা ভুঁইয়ের ওপর মাঝখানে বর্ণমালার সমাবেশ, ওপরে মেঘের আদলে আর কিছু লেখা। মণ্ডনধর্মী কাজ, কিন্তু ছাঁকাত ভাবনা আছে।

হয়তো আর্তি, আতঙ্ক আর মনের বিচিত্র ও বিপরীত ভাবাবেগ ও আবেশ তিনি ছবিতে এনেছেন। কিন্তু অনেক সময় বড় ব্যক্তিগত তাঁর চিত্রকল্প ও পুরাণকল্প। যেখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক হতে পেরেছেন, সেখান কিছুটা সার্থক। যদিও বিচ্ছিন্নতার দুঃখভোগ একরকম সুখভোগের নামান্তর। নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের একরকম বিলাস, গাড়ি, ফ্রিজ, ফোন, টি ভি-র মতো সামাজিক মর্যাদাসূচক। এবং তা সত্ত্বেও শবরীনাথের কাজ ভালোই লাগে।

সন্দীপ সরকার

॥ ১০ ॥

আমরা তখন সবাই মিলে খেতে বসেছিলাম। টেবিলে বসে খাওয়া মানেই অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া। অন্য সকলের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসাটা হলো বিলিতি প্রথা। আমার বাড়িতে নিজের খাওয়ার সময় আমি কখনও কথা বলতাম না। স্বল্পবাক স্বভাব বলে আমার অভিভাবকদের কাছ থেকে আমি বরাবর ভর্ৎসনা পেয়েছি। শুধু স্বল্পবাক নয়, খেতে খেতে মন দিয়ে বই পড়াও ছিল আমার স্বভাব। আমার অভিভাবকরা অনুযোগ করে বলতেন—খাবার সময় বই-এর দিকে মন থাকে বলে তোমার খাবার হজম হয় না, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাবে—

তারপর কর্মক্ষেত্রে নেমে কত রকম অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে যে খাওয়াটা সেরে নিতে হয়েছে তার গোনাগুন্তি নেই। কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বিছানায় শুয়ে শুয়ে, কখনও প্লেট হাতে নিয়ে, আবার কখনও বা এক রাশ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। একলা খাওয়া এখন অচল। আগে স্বামীর সামনে স্ত্রীর খাওয়া ধর্মমতে নিষিদ্ধ ছিল। স্বামীর উচ্ছিষ্ট থালায় খাওয়া স্ত্রীর পক্ষে ছিল ধর্মসাধন। আগে খাওয়াটা ছিল লক্ষ্য, এখন সেটা দাঁড়িয়েছে উপলক্ষ্যতে।

আমাদের ভারতীয় রীতি কিন্তু দশজনের সেবা-যত্নে পরিবৃত হয়ে একলা একলা মেঝের ওপর বসে খাওয়া।

আমাদের কলেজের এক বন্ধুর দাদামশাই ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার কাছে শুনেছি অবনীন্দ্রনাথের খাওয়ার বিশদ বিবরণ। তিনি যখন খেতে বসবেন তখন তাঁর থালার চারপাশে সাজানো হবে নানান ব্যঞ্জনের বাটি। বাড়ির রান্নাঘরে যত রকমের ব্যঞ্জন রাঁধা হবে সমস্তগুলো থালার চারদিকে গোল করে সাজিয়ে দেওয়া হবে। আর খাবারের থালার ওপর দেওয়া গরম গরম লুচি কিংবা গরম ঘি-ভাত।

অবনীন্দ্রনাথ আসনে বসে সব খাদ্যগুলো দেখবেন আর মন্তব্য করবেন—এই মাংসের কালিয়াটা কে রান্না করেছে রে?

যে মাংসের কালিয়া রান্না করেছে তার নামটা তিনি শুনবেন। শুনে বলবেন—বাঃ, বেশ, বেশ রেঁধেছে। আর এই কপির ডালনাটা?

কপির ডালনা যে-ই রাঁধুক তার নামটা শুনেই তাঁকে বাহবা দেবেন। অথচ খাবারের একটা টুকরোও হাতে বা মুখে স্পর্শ করবেন না। তারপর বলবেন—আমি ঠিক ধরেছি—

তারপর সমস্ত রান্নাগুলো আর তার রাঁধুনির নাম জেনে তিনি তাদের প্রশংসা করবেন। প্রশংসা করবার পর সবাই বুঝবে তাঁর খাওয়া শেষ হয়েছে। তখন থালা বাসন বাটি যেমন দেওয়া হয়েছিল তেমনি তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। তার পরিবর্তে তার জায়গায় দেওয়া হবে একটা জামবাটি ভর্তি বার্লি। তিনি সেই বার্লিটা এক চুমুকে শেষ করেই উঠে পড়ে সোজা চলে যাবেন বাথরুমে।

এ-সব সেকেলে প্রথা। আজকাল অন্য রকম। আজকাল রান্নার পদ্ধতি যেমন বদলেছে, ব্যঞ্জনের রকমফেরও হয়েছে তেমনি।

আব্রাহাম লিংকন আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রেসিডেনটদের মধ্যে একজন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হামেশা লেগেই থাকত। তা যতই মতবিরোধ থাক ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ বা ডিনার খাবার সময়ে প্রথা অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীকে এক টেবলে মুখোমুখি বসে খেতে হত। এ যুগের তাই-ই নিয়ম। কী একটা কথা-কাটাকাটির ফলে একদিন শ্রীমতী লিংকন ব্রেকফাস্টের টেবল থেকে ডিমের প্লেটটা নিয়ে সোজা ছুঁড়ে মারলেন প্রেসিডেনটের মুখ লক্ষ্য করে, আর প্রেসিডেণ্ট লিংকনের মুখখানা ডিমে ডিমময় হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রেসিডেনট কোনও প্রতিবাদ না করে বাথরুমে গিয়ে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। তারপর সেদিন আমেরিকার প্রতিনিধিসভায় গিয়ে যে বক্তৃতা দিলেন তা আজও এক স্মরণীয় বক্তৃতা হয়ে আছে।

সেদিন সেই হোটেল বেল্-ভিউতে

...তে খেতে খাওয়া শেষ করে অনেকে উঠে গেছেন। রাত নটার পর 'ভারত-কলা-কেন্দ্রে'র 'রামলীলা' অভিনয়ের জন্যে নির্দিষ্ট আছে। আমার সে অনুষ্ঠান আগে দেখা আছে সুতরাং আমি যাবো না। যারা অভিনয় অনুষ্ঠান দেখবেন তাঁরা চলে যাবার পর আর একদল খেতে ঢুকলেন। এঁরা আমাদের হোটেলে নতুন এসেছেন। ... আর বি যোশী। ইনি জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান। আর 'রাজকমলে'র মোহন গুপ্ত। আর পেছন পেছন এলাহাবাদের ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ আশক্‌জী। আশক্‌জী ঘরে ঢুকলেন যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী হলো আশক্‌জী? আপনার শরীর খারাপ নাকি?

আশক্‌জী তখনও কথা বলতে কষ্ট পাচ্ছেন। কোনও রকমে খাবার টেবিলের পাশের একটা চেয়ারে বসলেন আর যন্ত্রণায় মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলেন। আমার ভয় হতে লাগলো। এই বিদেশে এসে যদি হঠাৎ কারো স্বাস্থ্য খারাপ হয় তাহলে সে এক ভয়ের কথা।

অন্য দু'জন খাবার আনবার হুকুম দিলেন, কিন্তু আশক্‌জী বললেন তাঁর শরীর খারাপ তিনি কিছু খাবেন না।

জিজ্ঞেস করলুম—আপনার কষ্টটা কী হচ্ছে?

যন্ত্রণায় আশক্‌জীর তখন ভালো করে কথা বলবারই ক্ষমতা নেই। তিনি কোনও রকমে বললেন যে তাঁর বুকে একটা অসহ্য ব্যথা হচ্ছে।

আমি বললাম—আপনি উপোস করবেন না। পেট খালি থাকলে ব্যথাটা আরো বাড়বে, আপনি খান—

আশক্‌জী কিছুতেই খাবেন না। শুধু বললেন—খেলে ব্যথাটা আরো বাড়বে—এ আমার পুরোন রোগ, আগেও আমার এমন হয়েছে অনেকবার—

—তা সে-ওষুধ সঙ্গে করে আনেন নি কেন?

আশক্‌জী বললেন—এনেছি। দুটো বড়ি খেয়েও নিয়েছি, কিন্তু কোনও ফল ফলছে না। আজ রাত্তিরে আমার ভীষণ কষ্ট আছে কপালে, রাত্রে আমার ঘুমই আসবে না আজ, আমি কালই ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাবার ব্যবস্থা করবো—

বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে প্রায় জল আসবার জোগাড়।

আমি বললাম—আমার কাছে ঘুমের বড়ি আছে, আমি এনেছি সঙ্গে করে, সেটা নেবেন?

আশক্‌জী আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন—দেখি?

আমার হঠাৎ ভয় করতে লাগলো। আমি তাঁকে আমার ওষুধ দেব। আর তারপর সেই ওষুধ খেয়ে যদি তাঁর কিছু বিপদ হয়, তখন? তখন তো আমাকে সবাই দায়ী করবে!

আমি বললাম—ডাক্তারকে না দেখিয়ে আমি সে ওষুধ আপনাকে দেব না—

আশক্‌জী বললেন—দিন না ওষুধটা, যদি ঘুম আসে তাহলে ভালোই তো! এখন এত রাত্রে ডাক্তার কোথায়ই বা পাবো! কোনও ডাক্তারকে তো আমি চিনি না এখানে—

হোটেলের যে ছোকরা আমাদের খাবার পরিবেশন করছিল, তার কানে বোধ হয় কথাটা গিয়েছিল।

সে হঠাৎ বলে উঠলো—ডাক্তার ডাকবো স্যার?

বললাম—ডাক্তার তুমি এত রাত্তিরে কোথায় পাবে?

—ডাক্তার এই এখানেই হাজির।

বলেই যে-ভদ্রলোক একা-একা বসে একাগ্র-চিত্তে সুরা পান করছিল তাকেই ডেকে নিয়ে এল। আর সে-ভদ্রলোকও এক-কথায় হাসতে হাসতে আমাদের টেবিলে এসে যোগ দিলে।

জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে আপনাদের? কার অসুখ?

আমাদের সকলের চক্ষু তখন স্থির। উনি যে ডাক্তার-মানুষ তা কী করে কল্পনা করতে পারবো? ডাক্তারদের সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা এই যে তাঁরা রোগী দেখতে দেখতে নাইবার-খাবার সময় পান না। আর মরিশাসের এ কী ডাক্তার

যে এই বেল্-ভিউ হোটেলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মদ্য পান করেন।

আমাদের যখন বিস্ময়ের ঘোর কাটল তখন লক্ষ্য করলাম ডাক্তারটি বেশ হাসি-খুশী লোক। অপরিচিত লোকদের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। সমস্ত মুখখানা স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে একেবারে লাল টক্-টক্ করছে।

আমার কেমন ভয় করতে লাগলো। ভুতুড়ে ডাক্তার, কি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, কি কবিরাজী ডাক্তার কিছুই বুঝতে পারছি না, অথচ সে-কথা জিজ্ঞেসও করতে পারছি না।

শেষকালে লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেললাম—আপনি কীসের ডাক্তার?

—অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। আমি লন্ডন থেকে ডাক্তারি ডিগ্রী নিয়ে এসেছি।

বিলিতি জিনিসের ওপর আমাদের মত সাধারণ মানুষের এত লোভ যে সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের সামনে আমরা ভক্তিতে গদ-গদ হয়ে উঠলাম। আমাদের সামনে জলজ্যান্ত এমন একজন বিলিতি ডিগ্রীধারী ডাক্তার থাকতে আমরা কিনা তাকে মাতাল বলে হীন দৃষ্টিতে দেখেছিলাম।

বললাম—আপনাকে কী বলে ডাকবো ডাক্তার? আপনার নামটা কী জানতে পারি?

ভদ্রলোক বললে—আমার নাম ডাক্তার সুরেশ রামফল—

আমি তখন বললাম—ডক্টর রামফল...

ভদ্রলোক বললে—নো নো! নো ডাক্তার, নো রামফল। শুধু সুরেশ বলে ডাকবেন আমাকে—ওন্লি সুরেশ—

এক মিনিটের মধ্যে একেবারে একাকার হয়ে গেলাম আমার সবাই। জিজ্ঞেস করলাম—আপনি একা-একা বসে এখানে মদ খান কেন? বাড়িতে বুঝি আপনার স্ত্রী মদ খেতে দেয় না?

রামফল বললে—আমার স্ত্রীও মদ খায় যে। সে তো আইরিশ গার্ল, আমি আইরিশ মেয়ে বিয়ে করেছি—আমার চারটে ছেলে-মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স সাত। তারপর এক বছর দু বছর পর পর সবাই জন্মেছে—উই আর এ ফ্যামিলি অব্ সিক্স—

—তুমি যদি সমস্ত সন্ধেটা এখানে বসে ড্রিংকই করো তাহলে ডাক্তারি করো কখন?

রামফল বললে—ডাক্তারি তো করি না আমি।

—ডাক্তারি করো না?

—ডাক্তারি করবো কাকে? এখানে তো রোগী নেই কেউ। এখানে পপুলেশন মাত্র আট লক্ষ, এখানে তো রোগটোগ কারো হয় না। তাই ডাক্তারি করি না। আমার ডাক্তারি ডিগ্রী নিয়ে এসে কোনও লাভ হলো না মিস্টার, শুধু আমার বাবার কয়েক হাজার টাকা নষ্ট হলো।

আমাদের দলের সবাই তখন রামফলের কথা এক মনে অবাক হয়ে শুনছে। মরিশাসে এসে এ-চরিত্রটা যেন একটা দ্রষ্টব্য বস্তুর মতন।

বললাম—আচ্ছা সুরেশ, এই আশকজী একজন হিন্দী ভাষার নভেলিস্ট, এঁর বুকে ব্যথা হচ্ছে, কী ওষুধ খেলে এঁর ব্যথা কমবে বলতে পারেন?

রামফল গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে বলে উঠলো—পারি—, কিন্তু এখানে বলবো না। আমার বাড়িতে যেতে হবে আপনাদের সকলকে—ইউ মাস্ট হ্যাভ টু গো উইথ মি—

এ কী কাণ্ড! বললাম—এই রাত্তিরে তোমার বাড়িতে যাবো? এখনও যে এদের তিনজনের খাওয়াও হয়নি!

রামফল বললে—সো হোয়াট? আমার বাড়িতে ভাবছো খাবার নেই? আমার বাড়িতে ভেজ্-নন-ভেজ আমিষ নিরামিষ যে খাবার চাইবে সব আছে। আমার বউ আর ছেলে-মেয়েরা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে নো-ডাউট্, কিন্তু আমার নিজের সব খাবার ফ্রিজের মধ্যে রাখা আছে, গরম করে খেয়ে নেব। এই হোটেলের খাবার সব রাবিশ। চলো চলো, ইট্ টজ্ ওনলি ইলেভেন, নাইট ইজ্ স্টিল্ ইয়াং, এখন সবে সন্ধ্যে—

ততক্ষণে আমার দলের লোকদের খাবার পরিবেশন করা হয়ে গিয়েছে। তাঁরা খেতে আরম্ভ করেছেন। সুরেশ রামফল বললে—উঠুন উঠুন, এখানে আপনাদের কাউকে খেতে হবে না, আমার বাড়িতে গিয়ে খাবেন—

বলে নিজেও দাঁড়িয়ে উঠলো, আর আমাদেরও ওঠবার জন্যে তাগিদ দিতে লাগলো—

তার কথা মত আমরা সবাই উঠলাম। এ রকম করে এমন অসময়ে এত গভীর রাত্রে যে কেউ এত খাতির করে আমাদের মত অজ্ঞাত-কুলশীল লোকদের নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে পারে তা আমাদের কল্পনারও অতীত ছিল।

আমি একটু দ্বিধা করতে লাগলাম। আশকজীকে আড়ালে ডেকে বললাম—ভদ্রলোকের সঙ্গে চেনা-শোনা নেই, তা ছাড়া বিদেশ-বিভুঁই, আর তার ওপর এত রাতে কি ওঁর বাড়িতে যাওয়া উচিত আশকজী?

আশকজী বললেন উনি যে বলছেন ওঁর বাড়িতে ওষুধ আছে—

যোশীজী বললে চলুন, চলুন, আমাদের তো ভদ্রলোক খেতেই দিলে না এখানে। দেখি ওখানে আমাদের কী খেতে দেয়—

মোহন গুপ্তজীও বললে—হ্যাঁ চলুন, আমারও খুব খিদে পেয়েছে—

আমার ঘড়িতে দেখলাম তখন ইণ্ডিয়ান টাইম প্রায় এগারোটা বাজে। সুরেশ রামফল তখন বাইরে গিয়ে গাড়িটা পোর্টিকোর তলায় এনে দরজা খুলে দিয়ে আমাদের ডাকলে—আসুন, চলে আসুন আপনারা—

আমরা সবাই গিয়ে তার গাড়িতে উঠতেই রামফল গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিলে।

⁂

রাত এগারোটার সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি. অথচ মনে হচ্ছে রাত বুঝি তিনটে। রাস্তা এত নির্জন যে একলা পায়ে হেঁটে চলতে আতঙ্ক হয়। সে যুগে কলকাতা বা ইণ্ডিয়ায় রাত দুটো তিনটের সময়ও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে ভয় করত না। আমি নিজে তো সে যুগে ছাত্রজীবনে গ্রে স্ট্রীট থেকে সোজা হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ কলকাতায় এসে পৌঁছেছি. কোথাও এতটুকুও কোনও উপদ্রবের আশঙ্কা হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিদ্যাসাগর মশাই রাত্রে হেঁটে নিমতলায় কারো সঙ্গে দেখা করতে গেছেন. তখন রাস্তায় আরো অন্ধকার থাকত। তেলের আলো জ্বলত রাস্তায়। তা তাও সে আলো অনেক দূরে দূরে লাগানো, রাস্তাও খোয়া ঢালা। যারা শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই-এর 'আত্মচরিত' বা 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বই দুটো পড়েছেন তারা সে যুগের কলকাতার রাস্তাঘাটের অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ জানতে পারবেন। আর তার চেয়েও যদি আরো বেশি কিছু জানতে চান তো তাঁদের পড়া উচিত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কলিকাতায় চলাফেরা' বইটা। আমাদের জন্মের আগে যখন কলকাতায় কোথাও ইলেকট্রিক আলো ছিল না, ট্রাম-বাস ছিল না, তখন রাত্রে কী আলোতে লোকে লেখা-পড়া-কাজ-কর্ম করত, কোন যানবাহন চড়ে লোকে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়াতে বা বাড়ি থেকে কোর্টকাছারিতে যেত. রাস্তাঘাটের অবস্থা কী রকম ছিল সব কিছু সে বইতে লেখা আছে। তখন ফুটপাথের পুরোন বই-এর দোকান থেকে চার আনা দিয়ে বইটা কিনে বড় উপকার পেয়েছিলাম। আমি নিজের বই লেখবার সময় বইটা থেকে যে কত অমূল্য উপাদান পেয়েছিলাম তা এক মুখে বলে শেষ করা যায় না।

নবাবি আমল শেষ হয়ে যখন ইংরেজদের রাজত্ব শুরু হলো, তার পর থেকে অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে, যে অরাজকতা, যে গুণ্ডামি, যে রাহাজানি মানুষকে সহ্য করতে হত তা বর্ণনাতীত। কিন্তু তার পর থেকে ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত একেবারে পুরো-পুরি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। দুপুর বারোটাও না, বরং লুঠতরাজও তাই। লোকে বেশ তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একমাত্র ভৌতিক আতঙ্ক ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক আতঙ্ক তাদের বিব্রত করে নি। আগে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে যেতে গেলে পথে একলা হাঁটা নিরাপদ ছিল না. তাই দল বেঁধে হাঁটতে হত। তাই সে যুগে সকলের হাতে একটা করে লাঠি শোভা পেত। সেই লাঠি শেষকালে শৌখিনতার নিদর্শন হয়ে বিরাজ করতে লাগলো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বাবু-সমাজে। তখন লাঠি আর লাঠি রইল না, তার রূপান্তরিত নাম হয়ে গেল 'ছড়ি'। তখন কলকাতার বাবুদের বর্ণনা দিতে গেলেই ছুঁচলো গোঁফ, চুনোট করা শান্তিপুরের জলচুড়ি দেওয়া ধুতি, গিলে করা চুড়িদার মখমলের পাঞ্জাবি আর হাতে রূপোর বাঘ-মুখ বাঁধানো আখরোট কাঠের ছড়ি আর পায়ে বো-লাগানো চীনেম্যানের দোকানের পাম্পশুর উল্লেখ করতে হত। সে যুগে লাঠির ক্রমবিবর্তনে ছড়িতে রূপান্তরিত হওয়ায় তার উপকারিতা চলে গেল বটে, কিন্তু বিলাসিতার দিক দিয়ে তার পদোন্নতি হলো।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত খেদোক্তি—'হয়ে লাঠি তুমি বাঙ্গালায় অভ্র, পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে। ডাকাইত তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল।'

দেশে অরাজকতার সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন লাঠির প্রচলন বেড়েছিল তেমনি আভ্যন্তরীণ শান্তির যুগে আবার একই লাঠির ইজ্জতের ব্যারোমিটারের পারা নিচেয় নেমে গেল। এককালের প্রয়োজনের জিনিস পরবর্তীকালে বিলাসিতার পর্যায়ে নেমে এল। তারপর অনেকবার লা-

প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ উঠেছে, কিন্তু হায়, তখন তো পৃথিবীতে আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার হয়ে গেছে। আগ্নেয়াস্ত্রের যুগে কে আর লাঠির কথা স্মরণ করবে? কোট-প্যান্ট-বুশ শার্টের আবির্ভাবের পর যেমন ধুতি-পাঞ্জাবির অন্তর্ধান হতে চলেছে, তেমনি আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাবের পর লাঠির অস্তিত্বও অনাবশ্যক হয়ে গেছে।

মাঝখানে কলকাতায় যুক্ত ফ্রন্টের আমলে লাঠির কথা কারো কারো মনে উদয় হয়েছিল, কিন্তু তখন কোন্ বাজারে বা কোন্ দোকানে লাঠি বিক্রি হয় তার হদিশ পর্যন্ত কারো জানা না থাকায় তা সহজলভ্য হয়নি।

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় যখন বোমা-বারুদ-গোলা-গুলির প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠলো, তখন নেতাদের মধ্যে আবার লাঠির পুনরুজ্জীবনের কথা চিন্তা করা হয়েছিল, কিন্তু ততদিনে ইংরেজ সরকার এক আইন পাস করে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, চার ফুটের বেশি লম্বা লাঠি বাড়িতে রাখা বেআইনী কাজ বলে বিবেচিত হবে।

তখন থেকে লাঠির জাতও গেল, মানও গেল।

তবু সেই অবক্ষয়ের সময়েও একজনই মাত্র লাঠির ইজ্জত বুঝতেন। তিনি হলেন ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। দেওঘরে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে যাঁরা যেতেন ঠাকুর তাঁদের প্রসাদ-টসাদ কিছু দিতেন না। দিতেন কেবল একটি মাত্র লাঠি। আমিও একবার তাঁর আশ্রমে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ওমনি একটা লাঠি উপহার পেয়েছিলাম, মনে আছে। এখনও সেটি আমার বাড়িতে রক্ষিত আছে। বেড়াল-কুকুর-ইঁদুরের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এখনও সেটি ব্যবহৃত হতে দেখেছি।

রামফল সেই নির্জন রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে আর আমরা তার সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছি। একে নির্জনতা এবং কনকনে শীত তার ওপর গভীর রাত। তা ছাড়া, গাড়ির চালকের পানোন্মত্ত অবস্থা। আমাদের আতঙ্ক হওয়া স্বাভাবিক। কেন যে হোটেলের খাওয়া আর প্রহরীবেষ্টিত সরকারী নিরাপত্তা ছেড়ে তার সঙ্গে তার বাড়িতে যেতে রাজি হলাম তা ভেবে মনে একটু অনুতাপ হলো।

কিন্তু ওই যে আগেই বলেছিলাম—'সরকারী আতিথ্যে'র এলাকা ডিঙিয়ে বেসরকারী এলাকায় যাবার সঙ্কল্পে আমি অটল থাকবো, এও তাই। আমার পরে হয়ত আরো অনেক অতিথি মরিশাসে আসবে। মরিশাস সরকার তাদের যা দেখাবে তারা

তাই-ই দেখবে। মরিশাস সম্বন্ধে তাহলে কেউই আসল তথ্য জানতে পারবে না। আমি তো সেই জাতীয় অতিথি হতে চাই না।

পেছনে আশকজী তখন বুকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁর জরুরী দরকার ওষুধের। তিনি এই আশায় আমাদের সঙ্গ নিয়েছেন যে ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ খেয়ে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তিনি পেছনের বসবার জায়গা থেকে তাগিদ দিচ্ছেন—কই, আর কত দেরি? আর কত দূরে তোমার বাড়ি মিস্টার রামফল—

রামফল তখন একমনে গাড়ি চালাচ্ছে আর নেশায় মত্ত হয়ে আছে।

চলতে চলতে আমি একবার রামফলকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, ডাক্তার রামফল...

রামফল বললে—নো ডাক্তার, নো রামফল, ওনলি সুরেশ—

আমি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বললাম—আচ্ছা সুরেশ, এই যে এত রাত্তিরে আমরা গাড়িতে চলেছি, রাস্তায় তো কাউকে দেখছি না, এদেশে কি গুন্ডা-টুন্ডা কিছু নেই?

রামফল বললে—গুন্ডা? গুন্ডা কী করবে?

বললাম—কী আর করবে, আমাদের গাড়ি থামিয়ে সঙ্গে যা-কিছু টাকা-কড়ি আছে সব রিভলবার দেখিয়ে কেড়ে নেবে। আমাদের ইন্ডিয়ায় তো তাই হয়। আমাদের ইন্ডিয়াতে এত রাত্তিরে কেউ টাকা-কড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরোয় না। আর মহিলারা তো এত রাত্রে পথেই বেরোবে না—সঙ্গে কিছু থাক আর না থাক. হাতের রিস্টওয়াচ বা ফাউন্টেন পেনটা থাকলেও তা কেড়ে নেবে—

রামফল বললে—কিন্তু আমাদের এখানে তো ও-সব কিছু নেই। আমি তো রাত বারোটা একটার আগে কোনও দিন বাড়িই ফিরি না, তবু কোনও দিন তো কিছু হয়নি। আমার দুখানা মার্সেডিজ-বেঞ্জ গাড়ি তো বাড়ির সামনের বাগানে খোলা আকাশের তলাতেই পড়ে থাকে, কোনও দিন তো কিছু চুরি যায়নি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেন চুরি যায়নি বলো তো?

রামফল বললে—এখানে তো কারো কিছু অভাব নেই যে সে চুরি করবে?

বললাম—কিন্তু অভাব তো অনেক সময় মানুষের স্বভাবও বটে। অভাব না থাকলেও তো মানুষ চুরি ডাকাতি করে। আমেরিকায়ও তো কারো কোনও অভাব নেই. অন্তত খাওয়া পরার অভাবটা আমাদের দেশের অভাবের মত নয়, কিন্তু সেখানে তাহলে অত খুন-জখম রাহাজানি চুরি ডাকাতি হয় কেন?

রামফল এর জবাবে হাজার মাতাল হয়েও একটা খাঁটি কথা বললে—আমেরিকার লোকদের কি 'রামচরিত মানস' পড়া আছে যে তারা চুরি করবে না! আর আমাদের এখানে যে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যুগ থেকে 'রাম-চরিত মানস' আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। আমাদের এখানে শিবরাত্রির সময় যদি কখনও আপনারা আসেন তো দেখবেন গঙ্গার কাছে মরিশাসের সমস্ত হিন্দুরা জমা হয়েছে।

আমি তো অবাক। জিজ্ঞেস করলাম—গঙ্গা? গঙ্গা এখানে কী করে এল? এর চারদিকে তো ইন্ডিয়ান ওশ্যান—

রামফল বললে—এখানকার আমরা হাজার মদ খাই, মদ খেয়ে হাজার বেহুঁশ হয়ে যাই, আমরা তালে ঠিক আছি আমরা এখানে সমুদ্রের একটা খাড়িকে 'গঙ্গা-তালাও' নাম দিয়েছি—সেখ 'মকর সংক্রান্তি'র দিন আমরা গঙ্গা পুজো করি। আমরা মরিশাসের যে যেখানে থাকি সবাই পায়ে হেঁটে 'গঙ্গা-তালাও'তে যাই, সেখানে গিয়ে সীতা-রামের ভজন গাই, 'রামচরিত মানস' পড়ি, আর সারা দিন সারা রাত উপোস করি—

রামফলের কথা শুনে মনে হলো ধর্মবোধ থেকেই বোধহয় তাহলে মানুষের নৈতিক বল জন্মায়। আর যদি তাই-ই হয় তাহলে ইন্ডিয়ার এত নৈতিক অধঃপতন কেন? তবে কি টেকনোলজি বা প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে নৈতিক অধঃপতনের যোগসূত্র আছে?

আসলে পৃথিবীর সব দেশেই মোটা-মুটিভাবে দু'জাতের মানুষ আছে। এক জাতের মানুষ হচ্ছে কাত্যায়নীর মত, আর এক জাতের মানুষ হচ্ছে মৈত্রেয়ীর মত। কাত্যায়নীরা বলছে—'আমি নেব', আর মৈত্রেয়ীরা বলছে—'আমি দেব—'

নইলে আমাদের উপনিষদকার কেন যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনীটা লিখে গেছেন?
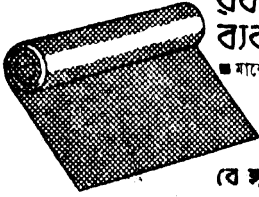
যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একদিন তাঁর দুই পত্নীকে কাছে ডাকলেন। বললেন—দেখ, এবার আমার সংসার ত্যাগের সময় এসেছে। আমি চাই যে যাবার আগে আমি আমার যাবতীয় সম্পত্তি তোমাদের দুজনের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিই। এখন তোমাদের দুজনের মধ্যে কার কী প্রয়োজন, আমাকে বলো, আমি সেইভাবে আমার সম্পত্তি ভাগ করে দেব—

কাত্যায়নী প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি বললেন—আমার চারটে গরু চাই, একশো বিঘে ধান-জমি চাই, দুটো পুকুর চাই, কারণ তা নাহলে আমি আশ্রম চালাতে পারবো না—

এবার যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি চাইলেন দ্বিতীয় পত্নী মৈত্রেয়ীর দিকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—এবার তুমি কী চাও বলো মৈত্রেয়ী?

মৈত্রেয়ী একটা শ্লোকে তাঁর বক্তব্যটা সংক্ষেপে বললেন।

তিনি বললেন—

যে নাহং নামৃতা স্যাম্,
কিমহম্ তেন কুর্য্যাম ॥

অর্থাৎ যা নিয়ে আমি অমর হবো না তা নিয়ে আমি কী করবো?

এর চেয়ে সত্য কথা বোধকরি আর দুটি নেই। রবীন্দ্রনাথের বাণীর মধ্যেই এর ব্যাখ্যা আছে। তিনি বলেছেন 'যে লোক সংসারের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে সে-ই যে আসল সংসারী তা নয়; যে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে সে-ই সংসারী। কারণ সে তখন সংসারে থাকে না, সংসার তারই হয়। সে-ই সত্য করে বলতে পারে 'আমার সংসার'।

দেখা গেছে সংসারে সবাই বলে—'আমি কিছু-না-কিছু হবো'। কেউ বলে 'আমি ডাক্তার হবো', কেউ বলে 'আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো', কেউ বলে 'আমি চার্টার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট হবো।' অর্থাৎ যে-পেশাতে বেশি টাকা আমদানি হয় সেই পেশার দিকেই সকলের আসক্তি। তাই কেউ বলে না 'আমি কেরানী হবো।' কেউ বলে না 'আমি চাপরাশি হবো', কেউ বলে না 'আমি আর কিছু হবো না, শুধু লেখক হবো।' অর্থাৎ এক কথায় সবাই কাত্যায়নী জাতীয় মানুষ। সবাই চায় পঞ্চাশ বিঘে ধান-জমি, সবাই চায় চারটে মোষ, দুটো পুকুর ইত্যাদি ইত্যাদি। জগৎ-সংসারে বেশি না হলে কারো চলবে না। বেশি চাই, আরো বেশি চাই, এবং শুধু তাই-ই নয়, সকলের চেয়ে আমার বেশি চাই।

কিন্তু মানুষ? কেউ কি মানুষ হতে চাই আমরা?

বোধ করি ১৯৭০ সালের ঘটনা। ডবলিউ-এইচ-অডেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। দু-তিন বছর আগে তিনি মাত্র পরলোকগমন করেছেন। কিন্তু তার পাঁচ বছর আগে সেই ১৯৭০ সালে হঠাৎ তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি আমেরিকা ত্যাগ করে ইংলণ্ডে এসে বসবাস করবার মনস্থ করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। কবি অডেন তখন থাকতেন আমেরিকার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত সবচেয়ে অভিজাত অঞ্চল 'ম্যানহ্যাটেন'-এ।

তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন—আপনি তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে ইংলণ্ড ছেড়ে আমেরিকায় এসেছিলেন, হঠাৎ এখন আবার এমন কী ঘটলো যাতে আমেরিকা ছেড়ে ইংলণ্ড চলে যাচ্ছেন?

কবি অডেন বললেন—দেখুন, আমি অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম, আমার ধারণা ছিল যে আমেরিকা খুব সভ্য দেশ। অন্তত ইংলণ্ডের চেয়েও সভ্য। কিন্তু সে ধারণা আমার নির্মূল হয়েছে। আমার ভুল ভেঙেছে—

—কেন ভুল ভাঙলো?

অডেন বললেন—দেখুন, সে বড় মর্মান্তিক ঘটনা। আমার বয়েস হয়েছে।

আমার ডাক্তারের নির্দেশে আমাকে প্রতি-দিন কিছুক্ষণ পায়ে হেঁটে বেড়াতে হবে। তাতে আমার এই বয়েসে স্বাস্থ্য ভালো হবে—

সাংবাদিকরা বললেন—তা আপনি পায়ে হেঁটে বেড়ালেই পারেন। কে আপনাকে বারণ করছে?

—বারণ কেউ করেনি, বাধা দিচ্ছে—

—কে বাধা দিচ্ছে?

অডেন বললেন— ম্যানহ্যাটেনের গুন্ডারা।

সাংবাদিকরা অবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। জিজ্ঞেস করলেন—গুন্ডারা কেন আপনাকে বেড়াতে বাধা দিচ্ছে?

অডেন বললেন—সেই কথাটাই আমি আপনাদের বলছি, প্রতিদিন সন্ধেয় যখন আমি বাড়ির নিচের রাস্তায় বেড়াতে বেরোই, গুন্ডারা আমার কাছে এসে আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা দাবী করে। আমার কাছে টাকা না থাকলে তারা আমাকে অত্যাচার করে। আমাকে কটু কথা বলে গাল-মন্দ দেয়। টাকা না পেলে তারা আমার হাত-ঘড়ি কলম সব ছিনিয়ে নেয়।

সাংবাদিকরা সব কথাগুলো লিখে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তারপর? তার-পর তারা আর কী করে?

অডেন বললেন—এখন তারা আর কিছু কেড়ে নেয় না। আমাকে গাল-মন্দও করে না আর। কারণ এখন আমি যখনই রাস্তায় বেড়াতে বেরোই তখন সব সময়ে পকেটে পাঁচ ডলারের একটা নোট সঙ্গে নিয়ে বেরোই। তারা আমার কাছে এলেই নোটটা তাদের দিয়ে দিই, নোটটা পেয়ে তারা আমার ওপর আর কোনও উপদ্রব করে না, নিঃশব্দে নোটটা নিয়ে চলে যায়—

এইজন্যেই কাত্যায়নীদের হাতে মৈত্রেয়ীরা চিরকাল অত্যাচারিত হয়ে আসছে। সেইজন্যেই এদেশের আকবর বাদশার দরবারে যেমন তুলসীদাসরা অব-হেলিত হয়েছেন বিদেশের রাজ-দরবারেও তেমনি সক্রেটিসদের আত্মবলি দিতে হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে বাংলা-দেশের মুজিবর রহমান পর্যন্ত সেই একই ইতিহাস।

হঠাৎ রামফলের গলার শব্দে আমার ভাবনার জাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। দেখি একটা বাগান-ঘেরা বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গাড়িটা। গাড়ি থেকে নেমে রামফল সকলকে উদ্দেশ করে বললে—নেমে আসুন স্যার, আমরা এসে গিয়েছি, এই আমার বাড়ি—

চেয়ে দেখলাম। আগে শিউপুজনের বাড়ি দেখেছি, তারপর দেখেছি যশোবন্ত নাথমল রায়জীর বাড়ি, এবার দেখছি ডাক্তার সুরেশ রামফলের বাড়ি—

(ক্রমশঃ)

আমার না-বলা বাণী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ফরাসী সাহিত্যিক জাঁ পল সার্ত্র সাহিত্যকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, কিছুকাল আগে সংবাদপত্রে এরূপ একটি সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। সংবাদ মাত্রই অবিসংবাদিত সত্য নয়। তাহলেও দেখা যাচ্ছে নব নব সৃষ্টির প্রেরণায় যিনি নিরন্তর পাঠক সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে আসছিলেন তিনি অকস্মাৎ তাঁর লেখনী সম্বরণ করেছেন। নীরবতাভঙ্গের কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না; ইদানীং তাঁর নতুন কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে শুনিনি। হঠাৎ এই মৌনাবলম্বনের কারণ কি? গুণগ্রাহীরা স্বভাবতই বিস্মিত। তাঁদের উৎকণ্ঠিত প্রশ্নের জবাবে সার্ত্র যা বলেছেন তাতে সকলে আরোই বিভ্রান্ত। সার্ত্র বলেছেন, আমার যা বলবার ছিল সবই বলে নিয়েছি, আর কিছু বলবার নেই।

তাঁর সাহিত্যকর্মে তিনি নিত্য যে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন, কর্ম থেকে নিবৃত্তির মধ্যেও সেই অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এমন কথা সাহিত্যিকের মুখে বড় একটা শোনা যায় না। একমাত্র রূপকথা রচয়িতার মুখেই শুনেছি—আমার কথাটি ফুরোল। সেটা মিথ্যে নয়। রূপকথার রাজ্যে কোন সমস্যা নেই; সম্ভব অসম্ভব যে কোন উপায়ে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়, কাজেই কথাও ফুরিয়ে যায়। কিন্তু আজকের সাহিত্যিক তো রূপকথার রচয়িতা নন; তাঁরা সমস্যা-জর্জরিত জীবন-নাট্যের নাট্যকার। সেখানে সমস্যারও শেষ নেই, কথারও শেষ নেই। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?'

সার্ত্রের ন্যায় দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক যখন নিজ মুখেই বলেন, ঢের বলেছি, আর বলব না—তখন সত্যি খুব অবাক হতে হয়। কারণ এটা ঠিক সাহিত্যিকের স্বভাব নয়, এমন কি সাহিত্যেরও নয়। সত্যি বলতে কি, সাহিত্য আপন স্বভাবেই একটু মুখর, কারণ কথা নিয়েই তার কারবার। রবীন্দ্রনাথ কথাকে বলেছেন মুখরা; মুখরার মন রাখবার জন্যে সাহিত্যিককেও একটু মুখর হতে হয়। যে মানুষ মুখচোরা, নিজের মুখে কথা যোগায় না তিনিও কলমের মুখে খই ফোটাতে পারেন। সাহিত্যিক মাত্রই কথার বাহাদুর। তাঁকে থামায় কে, আর তিনি থামতে যাবেনই বা কেন? রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছিলেন—এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে। দেখা যাচ্ছে কবির নিজের অভিপ্রায় যাই থাক, তাঁর জীবন দেবতার অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। তিনি তাঁকে মৌনাবলম্বন করতে দেননি বরং মুখরতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন। ভালোই করেছেন, আমরা তার সুফলটুকু লাভ করেছি। আশা করি সার্ত্রও অবিলম্বে তাঁর মৌন ভঙ্গ করে পুনরায় সাহিত্যকর্মে প্রবৃত্ত হবেন।

আমার নিশ্চিত ধারণা, কবি সাহিত্যিক মাত্রেরই মনে একটিমাত্র আফসোস—কত কথা বলা হল না। প্রেমিকের মনে যে অতৃপ্তি, সাহিত্যিকের মনেও তাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে প্রেমিকের মুখ দিয়ে যে কথাটি বলেছেন—'কত কথা তারে ছিল বলিতে'—যে কথাটি বললে প্রেমিকার মন পাওয়া যেত সে কথাটি মুখ ফুটে কোন মতেই বলতে পারেনি। 'বসে বসে দিবা রাতি বিজনে সে কথা গাঁথি' কিন্তু যাকে বলার তাকে বলা হয়ে ওঠে না। সাহিত্যিকের ঠিক সেই দশা। মনে মনে সারাক্ষণ কথার মালা গাঁথছে কিন্তু সে মালা সব সময় বাগ্দেবীর গলায় গিয়ে পৌঁছয় না। এদিক থেকে দেখতে গেলে কবি সাহিত্যিকরা সুখী মানুষ নন। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই অনেককে বিদায় নিতে হয়। কত বলার কথা না-বলা থেকে যায়। দেখা যাচ্ছে জাঁ পল সার্ত্র এ নিয়মের ব্যতিক্রম। যিনি বলেন, যা বলার ছিল সবই বলে নিয়েছি, লেখক হিসাবে কোন আকাঙ্ক্ষাই আর অপূরণ নেই—লেখকের জীবন বলতে একেই আদর্শ জীবন বলা চলে।

এ বিষয়ে সার্ত্রের সমগোত্রীয় একমাত্র সাহিত্যিক বলা যেতে পারে স্বয়ং শেক্সপীয়ার। নাটক লিখলেন পর পর ছত্রিশখানা, কিছু লিখলেন কাহিনী-কাব্য কিছু সনেট। লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে তাঁর জয়জয়কার, একের পর এক নাটকের কত কদর, কত সমাদর। কিন্তু হঠাৎ একদিন লণ্ডনের সেই জীবন, খ্যাতি প্রতিপত্তি সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের ছেলে স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে ফিরে গেলেন। পিছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখলেন না। স্বর্ণপ্রসূ লেখনীটা সেই যে নামিয়ে রেখেছিলেন আর হাতে তুলে নেননি। ঢের হয়েছে, আর নয়। প্রস্পেরো তাঁর নভোচারী আজ্ঞাবহ এরিয়েলকে দিয়ে কত অসম্ভব সম্ভব করালেন। অবশেষে তাকে মুক্তি দিয়ে বললেন—তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নেই, এখন তুমি মুক্ত, যেখানে খুশি যেতে পার। তেমনি শেক্সপীয়ার যে ঐশী শক্তির অধিকারী ছিলেন বোধ করি তাকে সম্বোধন করে তিনিও সবিনয়ে বলেছিলেন—তুমি অনেক দিয়েছ, আর কিছু চাইনে। যা দিয়েছ তাতেই আমি কৃতকৃতার্থ। এবার আমাকে তুমি মুক্তি দাও। ভাবলে অবাক লাগে, তখন কী বা তাঁর বয়স (মাত্র বাহান্ন বৎসর বয়সে তো তাঁর মৃত্যু)। দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশোর্ধ্বে বাণপ্রস্থ শেক্সপীয়ার যেভাবে পালন করেছেন এমন আমাদের দেশের লোকেরাও করে না। এমন নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত, নির্মোহ কবি সাহিত্যিক কে কবে দেখেছে?

এঁরা সর্বপ্রকারেই নিয়মের ব্যতিক্রম। অপর দিকে পরম ভাগ্যবানও বলতে হবে। যা দেবার ছিল সবটুকুই দিতে পেরেছি—এ তৃপ্তি বোধ, কবি সাহিত্যিকের পক্ষে এক বিরল অভিজ্ঞতা। শিল্পীমাত্রই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মানুষ। এঁরা সব সময়েই

আরো ভালো, আরো বেশীর প্রত্যাশী। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন—"আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব/ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব।" শিল্প-সাহিত্যের এ-ই লীলা। এক মুঠো দিতে না দিতে মুঠো আবার ভরে ওঠে। এর শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথ তো কত বিপুল পরিমাণে লিখেছেন, তাই বলে কি তাঁর বলার কথা সব ফুরিয়েছিল? তাঁরও বলা শেষ হয়নি, আমাদেরও এত শুনেও আশা মেটেনি। এত যে লিখেছেন তাও না-বলা বাণীর কথা বলেছেন। যতক্ষণ প্রকাশ করতে না পারছেন ততক্ষণই না-বলা কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে থাকে। বলেছেন—না-বলা বাণীর অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে। কস্তুরী মৃগ যেমন আপন গন্ধে মত্ত হয়ে চমকে চমকে ওঠে, সৃজনশীল মনও তেমনি সারাক্ষণ চকিত, চমকিত। কত কথা মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মেরেই মুখ লুকোয়—অধরাকে ধরা তো বড় সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখছেন—সারা বেলা বসে গুন্ গুন্ করে গান করছি।...আমার এই গুন-গুন গুঞ্জরিত সুরের সংগে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার সংখ্যা নেই। এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে, কত বিসর্জন যাচ্ছে। আরেক চিঠিতে লিখেছেন, দুটো তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। অর্থাৎ তখন কবিতা ঘর জুড়ে বসে আছে, নাটক সেখানে ঠাঁই পাচ্ছে না। অপরের বেলায় উমেদাররা (নাটকের theme) নিশ্চয় দোরের বাইরে থেকেই অন্তর্ধান করত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান, উমেদাররা বোধ করি দোরগোড়ায় ধর্না দিয়ে পড়ে থাকত। কবিতা, নাটক, গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ—কোন উমেদারকেই তিনি পারৎপক্ষে বিমুখ করেননি। বলা বাহুল্য এতখানি সকলের কাছে আশা করা যায় না। সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে না; আবার সাধ এবং সাধ্য থেকেও অনেকের আয়ুতে কুলোয় না। শরৎচন্দ্রের কথাই ধরুন—কোনটারই তাঁর কমতি ছিল না। শেষ দিন অবধি মস্তিষ্কের ক্ষমতা ছিল অক্ষুণ্ণ কিন্তু দেহ অশক্ত হয়ে পড়েছিল। মৃত্যুর বছর দেড়েক আগে বলেছিলেন—অনেক কিছুই লিখবার ইচ্ছা ছিল, মনে মনে কত যে প্লট তৈরি হয়ে আছে তা আর কি বলব! কিন্তু মনে ইচ্ছা থাকলে কি হবে, শরীর আর বইছে না। যদিচ বলেছেন—যথেষ্ট লিখেছি, আর না লিখলেও দেশ আমাকে ক্ষমা করবে—তাহলেও বলব দেশ কতখানি বঞ্চিত হয়েছে তা দেশই জানে। আর শরৎচন্দ্র নিজেও বঞ্চিত হয়েছেন কারণ যেসব গল্পের প্লট মনে মনে লালন করেছেন তাদের তিনি প্রত্যক্ষ রূপ দিয়ে যেতে পারেননি। কত কায়া-হীন মায়া তাঁকে প্রলুব্ধ করে ছায়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। আভাসে যা পেয়েছেন, ভাষার বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারেননি। সৃজনী প্রতিভার পক্ষে এ এক নিষ্ঠুর কৌতুক। একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বুঝবেন এ কৌতুক কত মর্মান্তিক।

এই না-বলা বাণীর বেদনা কীট্স যেভাবে বলেছেন এমন আর কেউ নন। তাঁর সেই সুবিখ্যাত সনেট সকলেরই জানা—

When I have fears that I may cease to be
Before my pen has glean'd my teeming brain,
Before high-piled books, in charact'ry
Hold like rich garners the full-ripen'd grain,
..

—আমার মনের সোনার ফসল গোলায় তোলবার আগেই যদি আমাকে চলে যেতে হয় তাহলে? তাহলে দুর্দিনের এই জীবন আর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ সমস্ত যে নিষ্ফল হবে। আসন্ন মৃত্যুর কথা তাঁর অজানা ছিল না। কীট্স-অনুরাগীরা জানেন যে সনেটটিতে একটি শিরোনাম যুক্ত হয়েছে—The Terror of Death. উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কবিতাটি কীট্স এর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। নামটি কবি নিজে দেন নি, অপর কেউ দিয়েছেন। নামের কোন প্রয়োজন ছিল না। কবিতার নামকরণ করতে যাওয়া এক বিড়ম্বনা; অনেক সময় নামটা বদনাম হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। শিরোনাম দিতে গিয়ে কবিতাটির শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। বোঝা উচিত ছিল যে ভয়টা মৃত্যুর নয়, ভয় অসমাপ্ত সাধনার, অসমাপ্ত বাণীর।

যাহোক এসব তো গেল রথী-মহারথীদের কথা? আমাদের মতো অকৃতী অধম লেখকরাও তো আছেন, তাঁদের দশা কি? আমি নিজে এক অতি খুদে লেখক।

আয়ু পেয়েছি বলতে গেলে কীট্স এর তিন গুণো। কিন্তু লিখতে পারিনি তার তিন ভাগের এক ভাগ। কেউ আবার ভুল বুঝবেন না, নিজেকে কীট্স এর সঙ্গে তুলনা করছি না। কেবলমাত্র পরিমাণটুকুর কথাই বলছিলাম, গুণপনার কথা নয়।

দীর্ঘদিন ধরে বহু কসরৎ করে এত সামান্যটুকু লিখেছি যে জীবনের প্রান্ত-সীমায় পৌঁছে আজ মনে হচ্ছে বলার কথা সমস্তই বাকী থেকে গিয়েছে। কারণ লেখার পরিমাণ যৎসামান্য হলে কি হবে, আমার মনে যে কথার ভান্ডার জমে আছে তার পরিমাণ বড কম নয়। মনের কথা মনে বিরাট বোঝা হয়ে চেপে থাকে। সে যে কী বিষম অস্বস্তি আমার মতো অক্ষম লেখকরাই তা বুঝতে পারবেন। লেখকরা বেশির ভাগই বড খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ। বলবার কথা আছে ঢের কিন্তু ঠিক কি ভাবে বললে কথাটা মনোমত হবে তা ভেবে পান না। কোন কিছুতেই সহজে তাদের মন ওঠে না। সেজন্যে কতশত বলার কথা না-বলাই থেকে যায়। নিজের বেলায় দেখেছি যেটুকু বা লিখেছি তাও ঠিক যেন মনোমত হয়নি। কেবলি মনে হয় কথাটা এভাবে না লিখে ওভাবে লিখলে আরেকটু ভালো হত। এমনও দেখেছি, কোন কথা আমি যে অর্থে বলেছি পাঠকেরা ঠিক সে অর্থে নেন নি। সেটাও আমারই ত্রুটি, পাঠকদের নয়। আমি নিশ্চয় কথাটা খুব স্পষ্ট করে বলতে পারি নি। আসল কথা, আমার মতো অকৃতার্থ লেখকেরা লেখক হিসাবে শিশুর মতো। শিশু যেমন অস্ফুট ভাষায় কথা বলে, অর্ধেক বোঝা যায় তো অর্ধেক বোঝা যায় না, আমাদেরও সেই দশা। যেটুকু ভাবি সেটুকুও গুছিয়ে বলতে পারিনে।

আমি শুধু যে খুঁতখুঁতে স্বভাবের লেখক এমন নয়, একটু ভীরু প্রকৃতিরও বলতে পারেন। সেই যে ভারতচন্দ্র বলে গিয়েছেন—সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর—তাতেই মনে এমন এক খটকা বিঁধে আছে যে মন খুলে আর কথা বলতে পারিনে। সারাক্ষণ যদি ভাবতে হয় ঠিক বলছি কি বেঠিক বলছি তাহলে আর কথা বলা হয় না। আমাদের শাস্ত্রেও বলেছে শত কথা মুখে বোলো, লেখায় লিখো না; কখন কি বেফাঁস কথা বলে ফেলবে। আমি সেজন্যে শত কথা মনে মনে ভেবেছি কিন্তু লেখায় লিখিনি। তার উপরে আবার ইন্দ্রজিৎ নামে এক ছদ্মনামা লেখক আছেন; তিনি ভারতচন্দ্রের ধুয়া ধরে বলেছেন—সে লেখে বিস্তর ওঁচা, যে লেখে বিস্তর। যা বা লিখবার একটু আধটু শখ ছিল, উনি তাতে বাদ সেধেছেন। নাক উঁচিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে খোঁচা দিয়ে কথা বলা ওঁর স্বভাব। ওঁর লেখা পড়লে সব সময়ে মনে হয় বিদ্রূপটা যেন আমাকে উদ্দেশ করেই নিক্ষেপ করছেন। উনি আরো কি বলেছেন জানেন? বলেছেন, ব্যবসার বাজারে যেমন ডিমান্ড আর সাপ্লাই এর প্রশ্ন আছে লেখার বাজারেও তাই। সাপ্লাই বেড়ে গেলে ডিমান্ড কমে যাবে। অর্থাৎ কিনা যত কম লেখা যাবে লেখার কদর তত বাড়বে। আমি তো তাই শুনে যত পেরেছি কম লিখে দর বাড়াবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাতে দর এবং কদর যা বেড়েছে সে আর বলে কাজ নেই।

লাভের মধ্যে তো এই হয়েছে, হাত গুটিয়ে বসে জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। সহজ কথাটা ভেবে দেখিনি যে হাত না বাড়ালে কিছু দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না। আর হাত গোটাতে গেলে মনটাও গুটিয়ে আসে। এখন সত্যি সত্যি মনটা আর সারাক্ষণ কথা কইছে না। মন যদি বোবা হয়ে যায় তাহলে কলমের মুখে কি আর কথা ফুটবে? এই যে নবীনেরা কত কি লিখছেন—সব কথা কি আর আমি বুঝি—তাও বেশ লাগে। কলমটাকে এঁরা মনের আজ্ঞাবহ করে নিয়েছেন। কলমের মুখে এই যে অনর্গল বাক্যস্রোত এও মস্ত বড কথা—এটা জীবন্ত মনের লক্ষণ। সত্যি বলতে কি, মনে মনে এঁদের আমি ঈর্ষা করি, আবার ভয়ও করি। ভয় করি কেন জানেন? এঁরা আমাকে সেই ভয়ংকর দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যখন 'অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।'

সাহিত্যের সংসারে যে মানুষ বাক্য-হারা সে প্রকৃতপক্ষে সর্বহারা। সেখানে তার কোন ঠাঁই নেই। নিজেকে তাই নিতান্ত নিঃস্ব নিঃসম্বল মনে হচ্ছে। অথচ এমনটি হবার কথা ছিল না; কারণ এক সময়ে পুঁজিপাটি আমারও কিছু কম ছিল না। যখের ধনের মতো শুধু আগলে বসে-ছিলাম; যথা সময়ে যথাযথ ভাবে তার ব্যবহার করিনি। এখন তার শোধ তুলছে; আমার প্রতি তারা এখন বিমুখ। কত কথা যে মনের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে, এখন তার জট ছাড়ানো দায়। আমার এই না-বলা বাণীর কথা যখন ভাবি তখন ল্যাম-এর Dream Children-এর কথা আমার মনে পড়ে যায়। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার এ অতি করুণ কাহিনী। অকৃতদার মানুষ, ঘরে স্ত্রী আসে নি, সন্তানও নয়। অথচ ঘর সংসার আর সন্তানের স্বপ্ন দেখেছেন জীবনভর। মন-গড়া স্বপ্ন-লালিত সন্তানদের নিয়ে খেলা করেছেন, হেসেছেন, গল্প করেছেন। সে স্বপ্নের শেষ হয়েছে নিষ্ঠুর কৌতুকে। হঠাৎ মনে হয়েছে খেলার আসর ভেঙে শিশুরা চলে যাচ্ছে দূরে—দূরে—বহু দূরে। কোন্ সুদূর এক ছায়াচ্ছন্ন জগৎ থেকে হাত নেড়ে নেড়ে বলছে—মিথ্যা মিথ্যা, তুমি মিছিমিছি নিজেকে ভোলাচ্ছ; আমরা তোমার সন্তান

নই, আমরা কেউ নই, কিছু নই। আমরা তোমারই হতে পারতাম কিন্তু তুমি তো তেমন করে আমাদের চাওনি। এই অন্ধকার অজ্ঞাত রাজ্যেই আমাদের থেকে যেতে হল। ধরাধামে তুমি আমাদের নিয়ে যাওনি, তোমাদের পৃথিবীতে আমাদের জন্মই হয়নি, সেখানে আমাদের কোন অস্তিত্বই নেই—'We are only what might have been' আমার সব না-বলা বাণীও ল্যাম-এর স্বপ্নে দেখা সন্তানদের মতো আমার অজ্ঞাত-সন্তান। কত কথা, কত চিন্তা মনের কোণে চাপা পড়ে আছে তাদের দিকে ফিরে তাকাইনি, অনাদরে অবহেলায় ফেলে রেখেছি। সাজিয়ে গুছিয়ে লোকসমক্ষে হাজির করতে পারলে তারা আমারই মানস-সন্তান রূপে পরিচিত হতে পারত। সে সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছি, নিজেও বঞ্চিত হয়েছি। ল্যাম-এর স্বপ্ন-জাত শিশুরা আরেকটি অতি মর্মান্তিক বাক্য উচ্চারণ করেছিল। বলেছিল—The Children of Alice Call Bertram their father। ল্যাম যে রমণীটিকে ভালো-বাসতেন, যাকে নিয়ে ঘর বাঁধবেন ভেবে-ছিলেন, সাংসারিক বিড়ম্বনায় সে-ঘর বাঁধা আর হয়ে ওঠেনি, বিবাহের পরিকল্পনাই তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। যে মানুষ হতে পারত তাঁর নিজের ঘরণী সে হয়েছে অপরের ঘরণী। তার ভাবী সন্তানেরা অপরের ঘর আলো করেছে, এখন তারা বার্ট্রামের সন্তান বলে পরিচিত। এর চাইতে বড় দুর্দৈব আর কি হতে পারে! এক সময়ে আমার মনে যে সব চিন্তার উদয় হয়েছিল, যে সব কথা আপনি এসে আমার মনে ধরা দিয়েছিল, একদিন সে সব কথাই অপরের ভাষায়, অপরের লেখায় প্রকাশ পাবে। তখন তার উপরে আমার কোন দাবিই আর থাকবে না। আমি কি পেয়ে-ছিলাম আর কি হারিয়েছি সে কথা কেউ জানতেও পারবে না। শুধু তাদের সহাস্য শ্লেষ-বাক্য অন্তরে শেল বিঁধবে—এদিকে একবার চেয়ে দেখ, আমাদের চিনতে পারছ? —আমরা তোমারই হাতে পারতাম। কিন্তু তুমি তো হাত বাড়িয়ে আমাদের নাওনি। অক্ষরের বাঁধনে বাঁধনি বলে আমাদের চাক্ষুষ মূর্তি তুমি তখন দেখতে পাওনি।
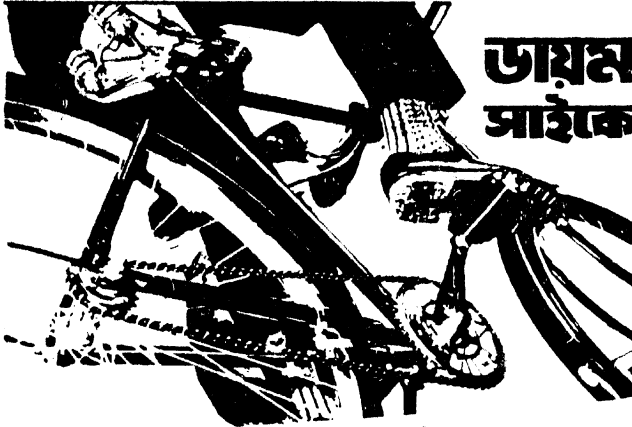
রোজই রাত্তিরবেলা খুটখাট শব্দ শুনতে পাই। আমার ঘুম খুব পাতলা, একটু আধটু শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়, খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকি। আর কিছু শোনা যায় না, আমার চোখের পাতা বুজলেই আর একবার শব্দ।

আমার ধারণা, রাত্রিবেলার একটা আলাদা জগত আছে। সে জগতের সবটুকু আমরা চিনি না। জীবনে বহুবার চেষ্টা করেও আমি ভূত দেখতে পাইনি, সুতরাং ভূত সম্পর্কে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবু কিছু রহস্যময় ব্যাপার ঘটেই যায়। একদিন মাঝরাত্রে খুব বৃষ্টি, আমি বৃষ্টি দেখার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। সামনের রাস্তায় কোনো লোকজন নেই, গাড়ি নেই, রাত প্রায় দুটো, শুধু অবিরাম বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে, কালো রঙের বৃষ্টি, আমার মনে হয় আকাশের সঙ্গে বুঝি এই পথটার একটা চুক্তি ছিল এই সময় বৃষ্টি হবার। তারপর আরও একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। সেই শুনশান রাত্তিরে, সেই বৃষ্টির মধ্যে, একজন লোক রাস্তাটার ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। লোকটির গতিতে কোনো ব্যস্ততা নেই, বৃষ্টির জন্য ভ্রূক্ষেপ নেই, খুব প্রশান্ত তার ভঙ্গি। এই বৃষ্টির মধ্যে একটি লোক কেন ওরকমভাবে মধ্যরাত্রে হেঁটে যায়? লোকটিকে পাগল মনে হয় না। সে এমনভাবে হাঁটে যেন সমস্ত রাস্তাটাই তার। আমি মনে মনে লোকটির নাম দিয়েছিলাম পথের রাজা। এরপর আমার কখনো বৃষ্টি হলেই আমি তাড়াতাড়ি বারান্দায় দেখতে আসি। এ পর্যন্ত আর দেখিনি বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক আবার কোনোদিন ঐ লোকটিকে আমি মধ্যরাত্রির বৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাবো অবিকল ওই রকমভাবে হাঁটতে।

কিন্তু মাঝরাত্রে আমার ঘরে খুটখাট আওয়াজ হবে কেন? এটা তো কোনো অলৌকিক ব্যাপার হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনো ইঁদুর। অনেক দিন আগে আমি একবার আমার মাথার কাছে জানলায় ঠকঠক আওয়াজ শুনেছিলাম গভীর রাত্রে। ঠিক যেন কেউ আমায় ডাকছে। প্রথমটায় বেশ চমকে উঠেছিলাম। তিনতলায় বাইরের দিকে জানালায় কে টোকা দেবে? কোন চোর যাচাই করে দেখছে আমি ঘুমিয়ে আছি কিনা? কিন্তু দেয়াল বেয়ে উঠবে কি করে? বিছানা ছেড়ে নেমে দেখেছিলাম, বাইরে কেউ নেই। অথচ টকটক শব্দ শুনেছিলাম ঠিকই। ব্যাপারটা সেই অবস্থায় ছেড়ে দিলে একটা রহস্যই থেকে যেত। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। আবার শব্দ। এবার বোঝা গেল। একটা টিকটিকি, তার মুখে একটা জ্যান্ত আরশোলা। সেই আরশোলাটাকে মেরে ফেলার জন্য সে বারবার জানলার গায়ে ঝাপটা মারছে।

আজও খুটখাট শব্দ হবার পর বিছানা থেকে নামলাম। শীতের রাত্তিরে বিছানা ছেড়ে ওঠা কি সোজা কথা! কিন্তু শব্দ হতে থাকলে ঘুমও আসবে না। অন্ধকারে হাঁটতে একটু ভয় ভয় করে। হঠাৎ ইঁদুরটার গায়ে পা পড়লেই সাংঘাতিক কান্ড হবে। ইঁদুরে কামড়ালে নাকি প্লেগ হয়। তা প্লেগ হোক না হোক, ইঁদুরে কামড়ানো আমি মোটেই পছন্দ করবো না। কোনোরকমে গিয়ে আলো জ্বাললাম।

কিন্তু আলোর মধ্যে কে কবে ইঁদুর দেখতে পায়? তবু এখানে ওখানে উঁকি দিয়ে দেখলাম। হুস হাস শব্দ করলাম কয়েকবার। ইঁদুরটা যেখানেই থাক, তাকে অন্তত বোঝান গেল যে আমি জেগে উঠেছি, সে যেন আর আমাকে বিরক্ত না করে। আবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

দু মিনিট বাদে দরজার বাইরে জুতোর র‍্যাকে ঘটাঘট শব্দ হলো। এই রে, পরশুদিনই নতুন চটি কিনেছি। ইঁদুরে যদি সেটা কেটে দিয়ে যায়? এবার দৌড়ে গিয়ে আলো জেলে দরজা খুললাম। হ্যাঁ, জুতোগুলো একটু এলোমেলো হয়ে আছে, মূষিক প্রবর নিশ্চয়ই এখানে এসেছিল। অন্তত নতুন চটি জোড়া এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। কোথায় রাখবো? ঘরের মধ্যে এনে দরজা বন্ধ করে রাখা যায়। কিন্তু আমার ঘরের মধ্যেও খুটখাট শব্দ পাওয়া গেছে। ইঁদুরটা আমার ঘরের মধ্যে ঢোকে কি করে? মনে পড়লো ঘরের মধ্যে একটা নর্দমার মুখে ঝাঁঝরি নেই। ঐ নর্দমার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। নর্দমার মুখটা ঢেকে রাখা দরকার।

সে জায়গাটায় ঢাকা দেবার মতন উপযুক্ত কোনো জিনিস হাতের কাছে নেই। প্রথমেই মনে পড়লো একটা ইঁটের কথা। কিন্তু এত রাত্রে ইঁট পাবো কোথায়? বই দিয়ে চাপা দেওয়া যায়। নর্দমার মুখে বই রাখবো? সেরকম বাজে বই আমার শয়ন কক্ষে থাকে না। আর আছে রেডিওটা। হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। ইঁদুরটা খুব জ্বালাচ্ছে। একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা করা দরকার।

ড্রয়ার থেকে টর্চটা বার করে সমস্ত ফ্ল্যাটটা খুঁজে দেখলাম। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। আলো নিবিয়ে টর্চ

হাতে করে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শীতে দাঁত ঠকঠক করছে। পাতলা জামা পরে বিছানা থেকে নেমে এসেছি।

একটু পরে রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দে একটা কৌটো পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে টর্চের আলো। এবার মহারাজের সাক্ষাৎ পেলাম। ছোটখাটো ইঁদুর নয়। প্রায় একটা শুয়োরের বাচ্চার সাইজ। ধূসর রঙ, ধূর্তের মতন চোখ। টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইঁদুরটা পালালো না। মুখ ঘুরিয়ে আমাকে ভালো করে দেখে নিল, চোখাচোখি হলো দুজনের। সেই মুহূর্তে ও আমাকে বেশী ভয় পাচ্ছিল, না আমি ওকে বেশী ভয় পাচ্ছিলাম, তা বলা শক্ত। পরের মুহূর্তে ডান দিকে একটা লাফ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এটা বাড়ির ইঁদুর নয়, রাস্তার ইঁদুর। বাড়িতে এত বড় ইঁদুর থাকে না। রাস্তার নোংরা থেকে একটা এত বড় ধেড়ে ইঁদুর তিনতলা বাড়ির ওপর উঠে এসেছে দেখে প্রথমে আমার বিস্ময়, তারপর ঘেন্নায় গা শিরশির করে। এটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। মাঝরাতে এ পাড়া বেড়াতে বেরোয়। সুতরাং শুধু আজকের মতন তাড়ানোই যথেষ্ট নয়, ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এ বাড়িতে ওর প্রবেশ নিষেধ। কিংবা ওকে মেরে ফেললেই বা কী ক্ষতি? ও আমার কথা শুনবে না, মাঝে মাঝেই মাঝরাত্তিরে এসে আমার ঘুম ভাঙাবে।

ঝুল-ঝাড়াটাকে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম

যে দিকটায় বাইরের নর্দমা, সেদিকে টর্চের আলো ফেলে রেখে আমি এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গেলাম। তারপর আলনা থেকে একটা গরম জামা টেনে এনে পরে নিলাম তাড়াতাড়ি। এবার দরকার একটা লাঠি জোগাড় করা। লাঠিই বা কোথায় পাই? বাড়িতে কোনোরকম অস্ত্র-শস্ত্র রাখার অভ্যেসই করিনি। লাঠি ধরনের একমাত্র জিনিস আছে ঝুল-ঝাড়া। সেটা মোটামুটি শক্ত কাজ চালানো যাবে। একটু বেশী লম্বা, তা হোক, যত দূর থেকে ইঁদুর নিধন করা যায় ততই ভালো।

ঝুল-ঝাড়াটা আছে বাইরের বারান্দায়। সেটা আনতে গেলে এই ফাঁকে যদি ইঁদুরটা পালিয়ে যায়। কিন্তু ঝুঁকি [illegible]তেই হবে। টর্চটা জেলে মাটিতে শুইয়ে রেখে আমি ছুটে বারান্দা থেকে ঝুল-ঝাড়াটা আনতে গেলাম, তার ফলে অন্ধকারের মধ্যে আলমারির গায়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো খেলাম। ব্যথায় মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। সমস্ত রাগটা পড়লো ইঁদুরটার ওপর। জিঘাংসা বৃত্তি জেগে উঠলো আমার মধ্যে। ইঁদুরটাকে আজ খুন করবোই!

ঝুল-ঝাড়াটা নিয়ে এসে জুতোর র‍্যাকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে খুটখাট শব্দ হচ্ছে, অর্থাৎ ইঁদুর মহারাজ এখনো সরে পড়েননি। কিন্তু আওয়াজ শুনে সেদিকে টর্চ ফেলি, কিছুই দেখতে পাই না। ইঁদুররা কি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হতে পারে? দিনের-বেলা পারে না নিশ্চয়ই, কিন্তু রাত্তিরবেলা

সবই সম্ভব। বলেছি না, রাত্তিরের জগৎটাই আলাদা।

তখন আমার মনে হলো মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালানোই আমার অনুচিত হচ্ছে। আমার অবস্থান আমি শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার ভুল স্ট্র্যাটেজি। টর্চটা নিবিয়ে আমি একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক হাতে ঝুল-ঝাড়াটা উঁচু করে ধরা। ইঁদুরটাকে নর্দমার দিক দিয়ে পালাতে হলে জুতোর র‍্যাকের পাশ দিয়ে যেতেই হবে। ওখানে কয়েকটা ছড়িয়ে রেখেছি, শব্দ হতে বাধ্য।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুটখাট শব্দ থেমে রইল। ইঁদুরটা কি দূরে থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে? ইঁদুর নিশ্চয়ই অন্ধকারে দেখতে পায়। আমি ওকে দেখছি না, ও আমাকে সরু চোখে দেখে যাচ্ছে—ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। শীতটা ক্রমশ জাঁকিয়ে আসছে, এ সময় একটা সিগারেট ধরালে বেশ হতো। কিন্তু সিগারেট জ্বাললেই ব্যাটা সাবধান হয়ে যাবে। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

একটু পরে হঠাৎ আমার হাসি পেয়ে গেল। একলা একলা হাসা একটা বোকা কিংবা পাগলের মতন ব্যাপার—কিন্তু আমি ঐ দুটোই? শীতের রাতে আমি ঘরের বাইরে একটা ঝুল-ঝাড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই দৃশ্যের মজা আমি নিজেই উপভোগ করলুম।

আমার মনে হলো, আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছি, এটা আমার বাড়ি নয়, একটা গুহা। ঠিক সেকালের মতনই আমি গুহার বাইরে পাথরের মুগুর হাতে আমার শত্রুর সঙ্গে লড়বার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। হাজার হাজার বছরেও এই লড়াইয়ের ধরনটা একটুও বদলায় নি। বন্দুক, বোমা, কামান এমন কি অ্যাটম বোম দিয়েও এই ইঁদুরটাকে মারা সম্ভব নয়। একে মারতে হবে পিটিয়ে কিংবা বিষ খাইয়ে। তাও দিনের পর দিনের চেষ্টায়। একে মারলে আবার একটা আসবে। নর্দমার ঝাঁঝরি বন্ধ করলেও আবার অন্য কোনো রাস্তা খুঁজে নেবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার কত গুণ বেশী এখন ইঁদুরের সংখ্যা? লক্ষ লক্ষ টন ফসল ইঁদুরেই খেয়ে নষ্ট করে গুদামে। এত বড় দলের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ইঁদুর পুজো হয়।

অন্ধকারের মধ্যেই শপাং শপাং করে কয়েকবার ঝুল-ঝাড়াটাকে পেটালাম মাটিতে। ছোটছেলেরা যেমনভাবে খেলা করে। এসব ব্যাপারকে খেলা হিসেবে নেওয়াই ভালো।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

মহাভারত। বর্ধমান রাজবাটী সংস্করণ

আমাদের ছেলেবেলায় কাশীরাম দাসের মহাভারতই ছিল অন্দরমহলের নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ। বালক বয়েসে আমরাও ছিলাম তার অনুরাগী পাঠক। বয়স্কদের কেউ কেউ কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকেই মান্য করতেন। পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ যে অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন তার সমাদর ছিল পণ্ডিতমহলে। এই তিনের মধ্যে আরও একটি মহাভারত ছিল যার কথা আমাদের কানে যেত না। খুব অল্প লোকই তার কথা শুনেছিলেন, বা চোখে দেখেছিলেন। এই মহাভারতটিকে বর্ধমান সংস্করণ বলা হত, অর্থাৎ বর্ধমানের মহারাজার উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় যে মহাভারত ছাপা হয়—চলতি কথায় সেটিই ছিল বর্ধমান সংস্করণ। আমি কখনও এটি চোখে দেখিনি, নামে শুনেছিলাম। সম্প্রতি সেই মহাভারতটি দেখার সৌভাগ্য হল, অবশ্য পুনর্মুদ্রিত চেহারায়, শোভনরূপে।

বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দ্র কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়ে তৃপ্ত হননি। নিজের সভাসদ পণ্ডিত তারকনাথ-তত্ত্বরত্ন মশাইকে তিনি মহাভারত অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনাটি ঘটে আজ থেকে প্রায় একশো কুড়ি বছর আগে, যথার্থ হিসেবে বোধ হয় একশো আঠারো বছর আগে। বাংলা ১২৬৫ সালে এই গদ্য অনুবাদের কাজ শুরু হয়, এবং সংস্কৃতজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ একাধিক পণ্ডিত অতিশয় যত্নের সঙ্গে অনুবাদ কর্মে হাত দেন। প্রথম দিকে অনুবাদ ছিল এশিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত মহাভারত-নির্ভর। পরে সেটির পরিবর্তন করা হয়, প্রাচীন পাঁচটি এদেশীয় পুঁথির সাহায্যও পণ্ডিতরা গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল অধিকাংশের পাঠ থেকে যেটি প্রামাণিক মনে হবে সেটি গ্রহণ করা। এ-কথা হয়ত বলা যায়, বর্ধমান সংস্করণের লক্ষ্য ছিল যথাসম্ভব মহাভারতের মূলটিকে অনুসন্ধান করা এবং তার বাংলা অনুবাদ করা। ১২৬৫ সালে যে-কাজ শুরু হয়েছিল ১২৯১ সালে তা শেষ হয়। গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় ১২৯৬ সালে। বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচন্দ্র তখন পরলোকে, একাধিক পণ্ডিত যাঁরা এই দুরূহ কর্মে হাত দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেও তখন আর ইহলোকে ছিলেন না।

কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৩ সালে। বর্ধমান সংস্করণের কাজ যদিও ১২৬৫ সালে শুরু হয় তা শেষ হয়েছে ১২৯১ সালে। এ-কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কালীপ্রসন্ন এদিক থেকে প্রাচীন। কিন্তু প্রাচীনত্বই সব নয়, বর্ধমান সংস্করণে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং মূল্যও। আগেই বলেছি মহাভারতের পাঠ সর্বত্র এক রকম নয়, এশিয়াটিক সোসাইটির মহাভারতকে আমরা গ্রহণ করতে পারি বটে তবে তাও যে প্রামাণ্য এমন কথাও সকল পণ্ডিতরা মানতে রাজী নন। বর্ধমান সংস্করণে আরও পাঁচটি প্রাচীন পুঁথির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কাজেই পণ্ডিত ও গবেষকদের কাছে বর্ধমান সংস্করণের মূল্য আলাদা।

আগেকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের বাংলা পড়তে আজকাল আমরা অনেকেই কাতর হয়ে পড়ি। দোষ তাঁদের নয়, আমাদের। একালের বাংলা ভাষা অনেক স্ব[illegible] হয়েছে, সংস্কৃত ভাষার বাক্যবন্ধনে [illegible] আর ততটা আড়ষ্ট নয়। বর্ধমান [illegible]ণে যে-ধরনের অনুবাদ চোখে পড়ে আমি তাকে কঠিন কিংবা শ্রুতিকটু বলব না; বরং অক্লেশেই পড়া চলে। যেমন "দুষ্মন্ত এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য কহিলে তপস্বিনী বরারোহা শকুন্তলা লজ্জায় অভিভূতা ও অচৈতন্যার ন্যায় হইয়া দুঃখ ভরে স্থাণুর ন্যায় নিস্তব্ধা রহিলেন, অভিমান ও অমর্য ভরে তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইল এবং ওষ্ঠপুট কম্পমান হইতে লাগিল।" মোটামুটি এই ধরনের বাংলা অনুবাদকে কোনোভাবেই কঠিন বলা চলে না।

আলোচ্য সংস্করণটির ভূমিকা লিখেছেন শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য। মহাভারতের এমন একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা ইদানীংকালে বড় একটা চোখে পড়ে না। তিনি মহাভারতের নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং তার সঙ্গত ব্যাখ্যা করেছেন। এবং বলেছেন "যত বড় বিদ্বান ব্যক্তিই হউন, আর এই মহাগ্রন্থ-খানিকে যতই মন্থন করুন...ইহার শ্বাশত অফুরন্ত অমৃতরস কেহই নিঃশেষে পান করিতে পারিবেন না।"

আর-একটি কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতন। শিল্পী শ্রীপরিতোষ সেন কয়েকটি ছবি এঁকেছেন এই গ্রন্থটির জন্যে। এতে গ্রন্থটির সৌন্দর্য ও মূল্য যেন আরও বেড়ে গেছে।

বর্ধমান রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত এই মহাভারতটিকে এতকাল পরে পুনঃ প্রকাশ করে প্রকাশক বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার যে করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

মহাভারত। আদিপর্ব। বর্ধমান রাজবাটী-বঙ্গানুবাদ। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলকাতা-১২। প্রথম খণ্ড পঁচিশ টাকা।

[অভিনন্দ

সমন্বয়-সন্ধানী ব্রাকুঁসি

অজিতকুমার দত্ত

বার্ধক্যে শিল্পী ব্রাকুঁসি

জনাকীর্ণ শহরের মাঝখানেই যেন একটা নিরালার ইশারা। হাল ফ্যাসানের দালানকোঠার ঠাসাঠাসির মধ্যেই কি রকম একটা ভিন্নতার ছাপ। বাড়ির দরজায়-খিলানে লোকায়ত শিল্পের নকশা নমুনা। অন্দরের আসবাবপত্রও সমভাবেই বিশিষ্ট। বাইরেকার ছাপেই নয়, চলনে-বলনেও গৃহস্বামীটি ভিন্নগোত্রের। কোথায় যেন দৃশ্যমান আর দৃশ্যাতীতকে কাছাকাছি আনার একটা অহরহ চেষ্টা। সে হিসাবে তিনি নিতান্তই একক। নিঃসঙ্গ পথিক।

কর্মে ও পরিচয়ে কনস্তানস্তিন ব্রাকুঁসি (১৮৭৬-১৯৫৭) ছিলেন যথার্থই অনন্য। খুবই অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে কয়েক বছর ভবঘুরে জীবন-যাপনের পর আসবাব তৈরীর শিক্ষানবিসী আরম্ভ করেন। পরে শিল্পশিক্ষার পাঠ নিতে চলে আসেন বুখারেস্টের একাডেমী অব ফাইন আর্টসে। স্নাতক হওয়ার পর সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তাঁর স্বদেশ রোমানিয়া ত্যাগ করে তিনি এসে প্যারীতে বসবাস শুরু করেন। ১৯০৪ নাগাদ চলে আসার পর বার তিনেক বাইরে যাওয়া ছাড়া, বলতে গেলে আমৃত্যু সে শহরেই তিনি কাটান। হয়ত অনেকেরই জানা নেই যে একবার এসে ভারতবর্ষেও তিনি ঘুরে যেতে পেরেছিলেন।

পরিবেশ অজানা-অচেনা হলেও, খাপ খাইয়ে নিতে বা পরিচিত হয়ে উঠতে ব্রাকুঁসির বিলম্ব হয়নি। সহজাত ক্ষমতার ফলে অচিরেই শিল্পরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। তখন খ্যাতির শিখরে রদাঁ, তিনিও ক্ষমতাসম্পন্ন এই তরুণ ভাস্করটিকে স্নেহ করতে শুরু করেন, আমন্ত্রণ জানান তাঁর স্টুডিওতে এসে কাজ করার জন্য। অবশ্য কারুর সহকারী হওয়ার চেয়ে একা নিজের মতো চলাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল ব্রাকুঁসির কাছে। তবে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কারণে দুজনের মধ্যে স্নেহসূত্রটি ছিন্ন হয়নি। আর সম্ভবত রদাঁর সংগ্রহেই শিল্পী প্রথম কালিঘাটের কিছু পটচিত্র দেখার সুযোগ পান। নতুন একটা দিগন্ত যেন সেদিন তাঁর সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু রদাঁ নয়, আরও অনেক শিল্পী সাহিত্যিক ও গুণিজনের সঙ্গে সৌহার্দ্যসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ব্রাকুঁসির। তাঁদের মধ্যে আঁরি রুশো, মোদিল্লিয়ানি, অ্যাপোলিনেয়ার বা জেমস জয়েসের মতো বহুজনেরই নাম করা যেতে পারে। নানা সংসর্গ, নানা উপলব্ধির কারণেই বোধহয়, কোনও বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত বা মতাবলম্বী না হয়েও ব্রাকুঁসি নিজের পথ নিজেই স্থির করে নিতে বা চলতে পেরেছিলেন। বহুর মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন এবং কাজে একটা বিশিষ্ট ছাপ আনতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কারুর সহকারী না হওয়া বা নিজের রাস্তা নিজে খুঁজে নেবার সিদ্ধান্তের ফলে শুরু হল ব্রাকুঁসির চিন্তা ও কাজে নানা পরিবর্তনের সূচনা। গতানুগতিকভাবে মডেল নিয়ে কাজ না করে, স্বীয় চিন্তা বা ভাবনার আদলে মূর্তির রূপদানে তিনি অগ্রসর হলেন। সচেষ্ট হলেন বাহুল্যবর্জনে, রূপের সরলীকরণে। ফর্মের ভাঙাচোরার সঙ্গে বাইরের পালিশ বা ঘষামাজায়ও সেই সারল্যের প্রতিফলনের চেষ্টা দেখা গেল। কাঠ, মর্মর এবং ব্রোঞ্জ বা ধাতু-মাধ্যমেও শিল্পীর কাজে ক্রমে একটা ইনার ওরিয়েন্টেশন বা অন্তর-সৌষ্ঠবের আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। কখনও পূর্ণদৈর্ঘ্য বা ছোট মনুষ্যমূর্তি, কখনও বা মুখাবয়ব করেছেন। আবার টরসো বা শরীরাংশ এবং ফেটিশ বা প্রশ্বাসূচক মূর্তি নিয়েও মেতেছেন। আর বোধহয় তার হাতে উল্লেখনীয় শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে পাখী বা প্রায় উড্ডীয়মান অসংখ্য ফর্ম। হয়ত বলগা-ছাড়া মনের কল্পনা ও খোলা আকাশের পাখী শিল্পীর কাছে অন্তত একই গোত্রভুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। সেই পাখী কখনও তাঁর দেশীয় রূপকথার "মাইয়াস্ত্রা" (আমাদের ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী অথব শুকসারীর মতো) কাল্পনিক খবর-দার চরিত্র আবার কখনও বা নিছক আকাশমুখী। সরলীকরণের আর এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, অণ্ড-জাতীয় কাজগুলো। চিন্তার মৌলসূত্র তথা ফলশ্রুতি যেন এসবে একত্র নিহিত। ভারতীয় ভাবনার "প্রাণের" সঙ্গে এ জাতীয় কাজের কোথায় একটা যোগসূত্রও মেলে। সন্দেহ নেই, কাজের ধরনে বা চিন্তায় ব্রাকুঁসি ছিলেন যথার্থই একক।

একদা ঘাট-আঘাটায় দিন কাটলেও এবং স্কুল-কলেজের মামুলী শিক্ষার সুযোগ তাঁর না হলেও, কৃষক পরিবারের সন্তান হিসাবে এক সাবলীল বলিষ্ঠতা ও দার্ঢ্যের সহজ উত্তরাধিকার তিনি জন্মগতভাবে লাভ করেছিলেন। তাই কর্মজীবনে পৌঁছে

চেনা-জানা গতানুগতিক পথ ছেড়ে অজানা-অনিশ্চিত পথে পাড়ি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা তিনি বোধ করেননি। কোন কষ্ট কোন পরিশ্রমই তাঁকে দমাতে পারেনি। একটা সরল অনাড়ম্বর জীবনদর্শনই যেন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এগিয়ে নিয়ে চলেছিল তাঁকে তাঁর স্বনির্বাচিত পথে। এই সহজিয়া পথ বা সাধারণ জীবনধারাকে ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা প্রসঙ্গে আমরা আমাদের একান্ত আপন শিল্পী যামিনী রায় মশাইকে সুনিশ্চিতভাবে স্মরণ করতে পারি।

ব্রাকুঁসির এই বিশেষ বোধ বা চিন্তার পেছনে প্রাচ্যের কিছু ভাবনা বা তত্ত্বদর্শন যে বহুলাংশে কার্যকর ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক দূরপ্রাচ্যের জেন-তত্ত্ব নয়, বৌদ্ধমতবাদের বিশেষ একটা চিন্তা-ধারাই তাঁকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল বেশ বোঝা যায়। একাদশ শতকের বৌদ্ধ ভাষ্যকার তিব্বতীয় মিলারেপার সব লেখা ছিল তাঁর কাছে অন্যতম "গ্রন্থ" বা পথনির্দেশিকা। ব্রাকুঁসির আদি নিবাস কার্পেথিয়ানের পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপিত তাঁর এন্ডলেস কলাম বা অসীম আকাশ-স্তম্ভ যেন রৌদ্রকিরণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং মিলারেপারই প্রার্থনারই অনুরণন তোলে—

"দৃষ্টি গেল ঊর্ধ্বপানে
আকাশের নিঃসীমে
অপার মহাকাশ-যাত্রা তার
শেষ হল মুক্তির দেশে।"

কালিঘাটের পটের প্রতি আকর্ষণ বা আর কারু কারু যেমন চীনা-জাপানী প্রিন্ট বা প্রাচ্য খণ্ডের মিনিয়েচারের প্রতি ঝোঁক, সেটা হয়ত বা পাশ্চাত্ত্য অনেক শিল্পীর মধ্যে আগেও ছিল। (বা এখনও যেমন কাছাকাছি সময়ে গীতা-অনুবাদক ভাস্কর জ আর্পের মধ্যে দেখা গেছে)। কিন্তু ব্রা[illegible] যথার্থ তত্ত্বানুরাগ বা বই ঘাঁটাঘাটি [illegible]চয়ই ভিন্ন ব্যাপার। ভারতবর্ষকে শিল্পী দূর থেকে জেনেছিলেন, শ্রদ্ধা পোষণ করেছিলেন। তাই সুযোগ হতে একবার এসে ঘুরেও গিয়েছিলেন তিনি এদেশ, যদিও সে-মেয়াদ ছিল মাত্র কয়েক মাস।

শিল্পীর একজন অন্যতম গুণমুগ্ধ ও কাজের সংগ্রাহক ছিলেন ইন্দোরের হোলকার। মহারাজা ১৯৩৩ সালে প্রথম তাঁর তিনটি ভাস্কর্য—যথাক্রমে কালো ও সাদা মর্মর এবং ব্রোঞ্জ নির্মিত 'পাখি' ক্রয় করেন বলে জানা যায়। তারপর মহারাজা একটি মন্দির পরিকল্পনা ব্যাপারে শিল্পীকে কমিশন করেন। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তার মডেল তৈরী হয়। সরেজমিনে সব দেখা ও ব্যবস্থা পাকা করার উদ্দেশ্যে শিল্পীকে ইন্দোরে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে
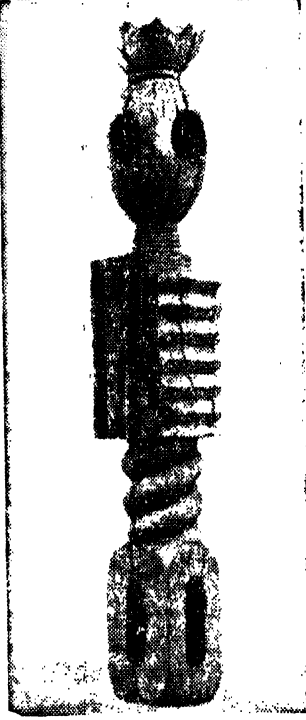
বুদ্ধ-আত্মা (কাঠ)
[বর্তমানে ন্যুঅর্ক সংগ্রহশালায়]

কয়েক মাস এদেশে কাটিয়ে যান ব্রাকুসি। অধিকাংশ সময়ই তাঁর ইন্দোরে অতিবাহিত হয়। পুরাকীর্তির নিদর্শন দেখার জন্য কাছেই মান্ডুতেও একবার তখন তিনি গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। দুর্ভাগ্যবশত স্থানীয় কিছু অসুবিধা বিশেষত মহারাজা অসুস্থ হয়ে পড়ায় পরিকল্পিত মন্দির শেষ অবধি আর তৈরী হয়নি।

কিন্তু তৈরী নকশা ও মডেল থেকে "টেম্পেল অব ডেলিভারেন্স"-এর বিন্যাস-নৈপুণ্য ও পরিকল্পনার অভিনবত্ব সহজেই বোঝা যায়। মুখ্যত ধর্মচর্চার স্থান হিসাবে কীর্তিটি ভূগর্ভস্থ চেহারায় পরিকল্পিত হয়েছিল। দুপাশে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ ব্যবস্থা। প্রবেশপথের পাশের প্রাচীরগাত্রে ত্রিকোণাকার সাদা পাখি চিত্রিত। কেবল কেন্দ্রস্থিত ত্রিমাত্রিক স্বর্ণাভ পাখিটির মাথায় সূর্যালোকের জন্য অবারিত খোলা আকাশ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য মিলিয়ে ব্যাপারটির সামগ্রিক বিন্যাস। এক হিসাবে শিল্পীর নিজ গ্রামাঞ্চলে টির্গু জীউতে স্মারক উদ্যানের ('কিস গেট' ও 'এন্ডলেস কলাম'খ্যাত) সঙ্গেই এই মন্দির তুলনীয়।

মন্দির-প্রকল্প শেষ অবধি বাতিল হলেও, শিল্পী নতুন প্রেরণা ও উপলব্ধি নিয়েই ভারত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কারণ, সে সময়ই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় নতুন কাজ 'স্পিরিট অব বুদ্ধ' বা বুদ্ধ-আত্মা। কাঠের এই কাজটিতে উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি ও গঠনরীতির এক অদ্ভুত সমাবেশ। চার থাকে বিন্যস্ত ফেটিশ বা শ্রদ্ধাব্যঞ্জক কাজটির উপরিভাগে ডিম্বাকৃতি মাথা। তার ওপর পানপাত্র চেহারার একটি মুকুট। একটি ভাষ্যানুযায়ী কাজটির মূলে বক্তব্য এই যে, প্রভুর আত্মা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। হয়তো বা সেই মন্দির খাড়া হলে কিংবা এ মূর্তি সেখানে স্থান পেলে পরিচায়িকা এর ভিন্ন রকম হত।

সহজ আপসের পথে চলেননি ব্রাকুসি। তাই সুলভ-সম্মান, আবেদন-নিবেদন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। দার্শনিক নিস্পৃহতায় বহু কিছুই উপেক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। কাজ করেছেন স্বীয় অন্তরের তাগিদে। সংখ্যা তাই যতই হোক বিস্তৃত আকারে তা ছড়িয়ে পড়েনি। স্বদেশ রোমানিয়াতে তাঁর সামান্য সংখ্যক কাজই বর্তমান। মার্কিন মুলুকে, বিশেষত নিউ ইঅর্কের গগেনহাইম মিউজিয়ামে আছে কতগুলো কাজ। আর যা আছে য়ুরোপে। নিজ স্টুডিও চত্বরে আর ভাস্কর্য-পরিবৃত হয়েই বলা যায়, নিজস্ব এক বিশেষ পরিমণ্ডলেই শিল্পীর দিন অতিবাহিত হয়েছে। সমগ্র বসুধাই তাঁর কুটুম্ব, কোনও বিশেষ দেশ বা কালের গণ্ডীতে তখন আর তিনি আবদ্ধ নন।

কাছে, দূরের, জানা-অজানার ও স্বজন-বিশ্বজনের মধ্যে একাত্ম হওয়াই ছিল ব্রাকুসির পরম অভিলাষ। শিল্পীর দ্বৈত সত্তার এই প্রকাশ নানাভাবে পেয়েছে। শেষ বয়সে তাঁর হাতের নাগালে থাকত একটি ভূগোলক। ঘরে বসেই বিশ্বের সান্নিধ্য যেন তিনি অনুভব করতেন। আবার সেই লোকেই নিজের দেশের বাড়ির মতো আসবাবে ঘর সাজাতেন, স্বদেশীয় আহার্যে-পানীয়ে অতিথিদের পরিতৃপ্ত করতেন, দেশজ ভঙ্গিতে ভাষায় শোনাতেন শিশু বয়সের শোনা সব রূপকথা। হয়তো শিল্পী স্মরণ করতেন তাঁর আশৈশব পরিচিত জীবনধারা। আবার কখনও বা আগুম্ফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ জুড়ে হাসি, চোখের কোণে কৌতুকরেখা। বাস্তবিক জীবনের এই সহজ সরলতা কোনও দিনই বোধ হয় শিল্পী হারাতে চাননি। তাই বলতেন, মানুষের ভেতরকার শিশু যতদিন রয়েছে, ততদিনই সৃষ্টি বা শিল্পকর্ম সম্ভব। সে সারল্য গেলে, শিল্পকর্মও গত। কথাটা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। আর ব্রাকুসির চরিত্র বা চিন্তার মূলসূত্রটিও বোধ হয় এতেই নিহিত।

সব মিলিয়ে বলা চলে যে, জন্মসূত্রে পশ্চিমী হলেও, চিন্তায়-ভাবনায় বহুলাংশে প্রাচ্যধর্মী হয়ে উঠেছিলেন ব্রাকুসি। কিংবা বলা যেতে পারে, এক পশ্চিম দেশীয় নাবিক পূর্ব সাগরে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তবে বাইজানটাইন ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত তাঁর পরিচয় আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের সেই সংস্কৃতি-সঙ্গমে সমাবেশ ঘটেছিল বহু ধারার। কাছাকাছি হয়েছিল প্রাচ্য আর প্রতীচ্য। এক হিসাবে ব্রাকুসি সেই সমন্বিত ভাবনারই উত্তরসাধক। ম্যাক্স-মুলার বা রোমাঁ রোলাঁর মতোই তবে সাহিত্য-দর্শনের মাধ্যমে নয়, শিল্পী হিসাবে সেই সহযাত্রায় অনুগামী হয়েছেন ব্রাকুসি। স্থপতি আলবার আলটোর কথায়, পূর্ব-পশ্চিমের মিলনবিন্দু অভিমুখে শিল্পকে তিনি এগিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ভিন্ন ব্যঞ্জনাময় ব্রাকুসির শিল্পকর্ম নতুনেরই নিশানা। বিংশশতকীয় ভাস্কর্য ইতিহাসে ব্রাকুসি একজন যথার্থই সমন্বয়-সন্ধানী এবং নব দিক্‌দর্শন।

আলোচনা

রবীন্দ্র বীক্ষা

'দেশ' পত্রিকার (৯ অক্টোবর '৭৬) বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন প্রকাশিত "রবীন্দ্র-বীক্ষা"র সমালোচনা পড়ে কয়েকটি কথা মনে হল—লিপিবদ্ধ করে আপনার নিকট পাঠালাম।

সমালোচক লিখেছেন, 'তালিকায় পান্ডুলিপি বা খাতার বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে, কিন্তু প্রেসকপি, পান্ডুলিপি বা ফটোকপির বিভাগ করা হয়নি।'

আমরা কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে উক্ত তালিকার দশটি বিভাগ দেখতে পেয়েছি। উক্ত দশ দফার মধ্যেই প্রেসকপি, পান্ডুলিপি, ফটোকপি আছে।

যথা—১। মূল পান্ডুলিপি। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা প্রাথমিক খসড়া, পুনর্লিখন, প্রেসকপি।

২। মিশ্রিত পান্ডুলিপি। মূল পান্ডুলিপি সহ অপরের প্রতিলিপি, টাইপকপি, প্রেসকপি, মুদ্রিত কপি যা কবির স্বহস্তের সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন বা মন্তব্যযুক্ত।

(উক্ত ১ ও ২ সংখ্যক বর্ণনার মধ্যে প্রথমোক্ত স্থলে প্রেসকপি কবির স্বহস্তকৃত বলে মূল পান্ডুলিপিরূপে এবং দ্বিতীয় স্থলে প্রেসকপি অপরের হস্তকৃত এবং কবি কর্তৃক সংশোধিত বলে মিশ্রিত পান্ডুলিপি রূপে চিহ্নিত হয়েছে।)

৭। ফোটোকপি। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ বহির্ভূত রবীন্দ্র পান্ডুলিপির মাইক্রোফিলম বা ফটোকপি। (যে রবীন্দ্র পান্ডুলিপি মূল পান্ডুলিপির আকারে রবীন্দ্রভবনে নেই সেই পান্ডুলিপির ফটোকপি রবীন্দ্র পান্ডুলিপিরূপে গৃহীত হয়েছে।) রবীন্দ্র বীক্ষা থেকে উদ্ধৃত বিবরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে প্রেসকপি, পান্ডুলিপি ও ফোটোকপির বিভাগ তালিকায় করা হয়েছে।

তা ছাড়া সংকলক ... রবীন্দ্র গ্রন্থের (বাংলা ও ইংরেজী) তালিকা দিয়েছেন। রবীন্দ্র পান্ডুলিপি লেখার উপাদান সম্পর্কে বলেছেন, রবীন্দ্র পান্ডুলিপির কালক্রম ও নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্র পান্ডুলিপির মোট সংখ্যা এবং রবীন্দ্র পান্ডুলিপির পরিমাণ সম্পর্কেও কিছু সংবাদ আমাদের গোচর করেছেন। কেবল গ্রন্থানুসারে পান্ডুলিপির তালিকাটি বারান্তরে প্রকাশের আশ্বাস দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস, উক্ত তালিকায় শেষের কবিতা ও গীতবিতান-এর পান্ডুলিপি সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যাবে।

সমালোচক লিখেছেন, "কুরুপান্ডব খুব সম্ভব সুরেন্দ্রনাথের রচনা......রবীন্দ্র পান্ডুলিপির মধ্যে পড়ে?"

আমরা বলি যে 'কুরুপান্ডব' বইখানি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংকলিত এবং সত্য সত্যই এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামেই প্রকাশিত এবং প্রচলিত। কাজেই কুরুপান্ডবের পান্ডুলিপি রবীন্দ্র পান্ডুলিপির মধ্যেই পড়ে।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত একটি মহাভারত থেকে যদিও রবীন্দ্রনাথ কুরুপান্ডবের উপাদান সংগ্রহ করেছেন, 'কুরুপান্ডব' বই সুরেন্দ্রনাথের নামে প্রকাশিত বা প্রচারিত নয়। কুরুপান্ডব গ্রন্থের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি মুদ্রিত আছে।

একই ভাবে সমালোচকের অন্য কয়েকটি আপত্তিও খন্ডন করা যায়।

সমালোচক মিউজিয়মকে ভবন বা রক্ষণ গৃহ বলার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু মিউজিয়মে সংগৃহীত পান্ডুলিপি জাতীয় সামগ্রীকে যে aohieves বলা হয় সেটি কি তিনি জানেন না। aohieves-এর বাংলা ও সর্বভারতীয় হিন্দি প্রতিশব্দ 'অভিলেখাগার' বর্তমানে খুবই প্রচলিত। কাজেই 'অভিলেখাগার' শব্দের ব্যবহারে সমালোচকের আপত্তি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। বিশ্বভারতীতে 'ভবন' বলতে সাধারণত 'কলেজ' বা অনুরূপ বিভাগ (depart-

ment) বোঝায়। 'মিউজিয়ামের' প্রতিশব্দরূপে সমালোচকের প্রস্তাবিত 'ভবন' শব্দ চলেই না।

অবনী হালদার
শান্তিনিকেতন

চলতে চলতে

'চলতে চলতে' শীর্ষক ভ্রমণকাহিনীতে (দেশ, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬) রোনাল্ড রস-পাট্রিক ম্যানসন সম্পর্কিত বর্ণনায় দুঃখজনক প্রমাদ প্রকাশ পেয়েছে। জীবাণুর আবিষ্কারের জন্য নয়, ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে মশকবাহিত হয়ে থাকে এই তথ্য উদ্ঘাটনে কৃতিত্বের জন্যই স্যার রোনাল্ড রস খ্যাতিমান হয়েছেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সার্জেন ল্যাভেরান ম্যালেরিয়া জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের প্রায় ৮।৯ বছর পরে, ভারতে জন্মগ্রহণকারী এবং ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে কর্মরত, রোনাল্ড রস ব্রতী হয়েছিলেন ঐ জীবাণুর অনুসন্ধানে। তাঁর ধারণা জন্মে ম্যালেরিয়া জীবাণু বলে কিছু নেই, ম্যালেরিয়া রোগ ঘটে আন্ত্রিক গোলযোগ থেকে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে লণ্ডনে গেলে সেখানে রসের সাক্ষাৎকার ঘটে সাংহাই প্রত্যাগত ইংরেজ চিকিৎসক পাট্রিক ম্যানসনের সঙ্গে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ল্যাভেরান আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়া জীবাণু দেখিয়ে ম্যানসন রসের ভুল ধারণা ভেঙে দেন এবং মশা ম্যালেরিয়া বহন করে বেড়ায়, তাঁর এই নিজস্ব ধারণার কথাও রসকে জানান।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রস ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং অনুমান করা যেতে পারে, ম্যানসনের প্রেরণায় প্রবৃত্ত হন ম্যালেরিয়া সংক্রমণের রহস্য উন্মোচনে। দীর্ঘকাল ধরে নানারকম পরীক্ষা করতে করতে অবশেষে চড়ুই পাখির উপর পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, রস নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে মশার কামড় থেকেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। ঐ সময় রসের কর্মস্থল ছিল কলকাতা এবং সেকথা স্মরণ করেই তাঁর কীর্তির সম্মাননায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমান শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল এলাকায় এক প্রান্তে অবস্থিত স্মারকপীঠ।

ভারতবর্ষে রস যখন তাঁর পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত তখন ঐ কথা সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত থেকেও ঐ একই বিষয় নিয়ে সুদূর ইটালিতে মাথা ঘামাচ্ছিলেন আরেকজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী, গিওভ্যানী বাটিস্টা গ্র্যাসি। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গ্র্যাসি ঘোষণা করেছিলেন, অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া বহন করে বেড়ায়। এরপর আরও অনেক পরীক্ষা করে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে গ্র্যাসি

চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে তাঁর ঘোষিত ধারণা অভ্রান্ত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে স্যার রোনাল্ড রস তাঁর আবিষ্কার করেছিলেন পাখির উপর পরীক্ষা করে এবং তাঁর আবিষ্কারের ফল মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা সেটা তিনি যাচাই করে দেখেননি। কোন শ্রেণীর মশা ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করে সেটাও ছিল রসের কাছে অজানা। অপরদিকে গ্র্যাসি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন মানুষের উপর পর্যবেক্ষণ করে এবং তিনি ম্যালেরিয়ার বাহক হিসেবে অ্যানোফিলিস মশাকেই সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। এইসব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, যে আবিষ্কারের জন্য রস পুরস্কৃত ও বরেণ্য হয়েছেন তার তুলনায় অধিকতর কৃতিত্বসূচক আবিষ্কারের জন্য প্রাপ্য সম্মান থেকে গ্র্যাসি হয়েছেন বঞ্চিত এবং তাঁর নাম আজ বিস্মৃতপ্রায়।

দিলীপকুমার দাস
সোদপুর

॥ ৩০ ॥

সুলেখা চঞ্চল, কিন্তু আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলাম। বললাম, "এই তো ফোন করলেন। সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি।"

বাইরে একবার নজরও দিয়ে এলাম। থ্যাকারে ম্যানসনের কমপাউন্ডে কোনো গাড়িই অপেক্ষা করছে না।

সুলেখা কার জন্যে অপেক্ষা করছে কে জানে। আমার সান্ত্বনাবাক্যে তেমন ফল হলো না, কারও আসন্ন আগমনের প্রতীক্ষায় সে সত্যিই অধীর হয়ে উঠছে।

এসব ক্ষেত্রে আরও বেশী আশা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। হেসে বললাম, "আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার মন বলছে, মিনিট পনেরোর মধ্যেই আপনি যার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি সশরীরে হাজির হবেন।"

আমার আশ্বাসবাণীতে সুলেখার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আরও নিশ্চিত হবার জন্যে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "সত্যি? আপনার মন বলছে।"

মনে মনে আমি তখন অন্তত প্রার্থনা করছি, সুলেখার মনস্কামনা পূর্ণ হোক—সুতরাং 'আমার মন বলছে', কথাটা দ্বিতীয়বার শুনিয়ে দিতে সঙ্কোচ বোধ করলাম না।

দ্বিতীয় কাপ চায়ে সুলেখা এতোক্ষণে নিশ্চিন্তে চুমুক দিল। এবং আমার ক্ষমা প্রার্থনা করে বললো, "কার মুখ দেখে উঠেছিলেন আজ? আপনার অনেক সময় নষ্ট হলো।"

কার মুখ প্রথম দেখেছিলাম, মনে করতে পারছি না। তবে সুলেখার সৌজন্য আমাকে হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর সত্য কথা আবার মনে করিয়ে দিল। সুলেখা আমার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "একখানা ভাঙা বাড়ির টেমপোরারি ম্যানেজারের জীবনে সময়ের মূল্য কী বলুন?"

"আপনি টেমপোরারি?" সুলেখা একটু অবাক হলো।

সুলেখাকে কী করে বোঝাই, আমি মুখের কথায় চাকরির অ্যাপয়েনটমেনট পেয়েছি। আমার পকেটে কোনো অ্যাপয়েনটমেনট লেটার নেই—আর মাইনে, তার পুরিমাণ বলে ভদ্রসমাজে নিজের লজ্জার বোঝা কেন আরও ভারি করি?

সুলেখাকে বললাম, চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে, কিছু না-পেয়ে আমাকে এখানেই আশ্রয় নিতে হয়েছে। চাকরির দেবতা আমাকে নিয়ে বারবার খেয়ালী খেলায় মত্ত হচ্ছেন, এবং অসহায় আমি এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়া অসহায়ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছি।

সুলেখা তবু আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করলো না। তার ধারণা আমি থ্যাকারে ম্যানসনের মালিকদের আপনজন। আমাকে হঠাৎ এই ম্যানসনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে এখানে পাঠাবার পিছনেও গভীর কোনো অভিসন্ধি আছে।

সুলেখার কথা শুনে আমি অবাক। সুলেখাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এসব কী বলছেন, আপনি?"

সুলেখা হেসে উত্তর দিল, "চোখ আর কান দুই সজাগ রেখেছি। এখন মুখ খুলবো না, তবে যথাসময়ে আপনার কানে কিছু খবর পৌঁছে দেবো। সেই প্রথম দিনের আচমকা ঘটনা থেকে আমি আপনার কাছে অপরাধী হয়ে আছি।"

সুলেখা এবার পুরনো কথায় ফিরে গেল। চায়ের কাপে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে সুলেখা বললো, "আপনি চাইনীজ জেসমিন গ্রীন টি পছন্দ করেন?"

চায়ের রঙ কালো বলেই জানি—সবুজ চায়ের বিলাসিতা এখনও আমার অজ্ঞাত। সুলেখা বললো, 'আমার ব্যাগে অনেকখানি জেসমিন চা আছে—একটু গুছিয়ে বসতে পারলেই, আপনাকে খাওয়াবো। মিস্টার চট্টরাজ খুব পছন্দ করতেন, তাই মিস্টার জেঠমালানি হংকং থেকে স্পেসালি আনিয়েছিলেন।"

ভি-আই-পিদের জন্যে বিশেষভাবে আনানো উপহার আমাদের সহ্য হবে কিনা ভাবছি। ঠিক সেই সময় সুলেখা আবার শুরু করলো চট্টরাজের গল্প। এর আগে শুনেছিলাম, নির্দিষ্ট দিনে মিস্টার চট্টরাজ আমাদের এই থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে না আসায় খোঁজখবর নেবার জন্যে জগদীশ জেঠমালানি স্বয়ং ছুটেছিলেন ধানবাদে।

ধানবাদ থেকেই জগদীশবাবু ট্রাংক টেলিফোনে সুলেখার সঙ্গে যোগাযোগ করে-

[illegible] এবং এস সি চট্টরাজের খবরাখবর নিয়েছিলেন। কেন ভদ্রলোকের খবর না-পাওয়া পর্যন্ত সুলেখার ঘুম হচ্ছে না। জগদীশবাবু বলেছিলেন, "সুলেখা, কোনো চিন্তার কারণ নেই—মিস্টার চট্টরাজ ভালোই আছেন। আপিসের কাজের প্রেসারে ওঁর পক্ষে সেদিন কলকাতায় যাওয়া সম্ভব হয়নি।"

টেলিফোন নামিয়ে রাখবার আগে জগদীশবাবু বলেছিলেন, "সুলেখা, তোমার সামনে মস্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কাল আপিসে ফিরে তোমাকে সব কথা বলবো।"

'চ্যালেঞ্জ-ট্যালেঞ্জ আবার কী?' ওসব কথা শুনলে সুলেখার চিন্তা বেড়ে যায়। জগদীশবাবু হেসে বললেন, "সমস্তই সুখবর, সুলেখা!" তারপর সেই বিখ্যাত জেঠমালানির মন্তব্য: 'ফিকার মত কাঁজিয়ে।'

পরের দিন জেঠমালানি নির্দিষ্ট সময়ে চৌত্রিশ নম্বরে সুলেখার কাছে চলে এসেছিলেন। চট্টরাজের পাঠানো একটা উপহারের প্যাকেট জগদীশবাবু নিজের হাতে বয়ে এনেছেন। জগদীশবাবুর অতিথিরা সাধারণত এখানে এসেই ধন্য করে দিয়ে থাকেন। এঁদের কেউ যে সুলেখার জন্যে কিছু উপহার পাঠাতে পারেন, তা সুলেখা নিজেও কোনোদিন ভাবেনি।

বিজয় উল্লাসে মুখ উজ্জ্বল করে জগদীশবাবু জানালেন, "মিস্টার চট্টরাজ নিজেই এই উপহার নিয়ে তোমার কাছে আসছিলেন। কিন্তু আপিসের নতুন বড় সায়েব বাদ সাধলেন, তিনি লাস্ট মোমেণ্টে ওঁর কলকাতায় আসা ক্যানসেল করে দিলেন।"

প্যাকেটের মধ্যে কী আছে তা জগদীশবাবুর জানবার কথা নয়। কিন্তু চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করে নিজের হোটেলে ফিরে এসেই তিনি সুলেখার প্যাকেটটা খুলে ফেলেছেন। কাজটা যতই অশোভন হোক জগদীশবাবু দায়িত্ব অস্বীকার করলেন না। সুলেখাকে বললেন, "আপনজন ছাড়া আর কারুর প্যাকেট ক্যারি করা আমার চাচার বারণ। এইভাবে অনেক সময় বেআইনী মাল চালান হয়।"

সুলেখা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে জগদীশবাবুর ওপর। কিন্তু জগদীশবাবু সোজাসুজি বললেন, "গোরমেণ্ট অফিসারই বলুন, আর বিজনেস আদমী বলুন—কাউকে 'পুরা বিশোয়াস' করা ঠিক নয়। যদি এই প্যাকেটে সোনা বা ফরেন কারেন্সি থাকতো, এবং রাস্তায় পুলিস আমাকে সার্চ করতো, তাহলে কী হতো?"

জগদীশবাবু অবশ্য খুলে দেখেছেন প্যাকেটের মধ্যে একটা সুন্দর শাড়ি আছে। সেই সঙ্গে একটা কার্ড, যার ওপর মিস্টার চট্টরাজের নিজের হাতে নাম লেখা। জগদীশবাবু ভেবেছিলেন, সঙ্গে হয়তো কোনো চিঠিও থাকবে।

চিঠি না থাকায় সুলেখা আশ্বস্ত হলো। কিছু লেখা থাকলে এখনই তা জগদীশবাবুকে পড়ে শোনাতে হতো। মেয়েদের লাজ-লজ্জার কোনো মূল্য এদের কাছে নেই।

জগদীশবাবু এবার কাজের কথা তুললেন। গলার স্বর একটু নিচু করে তিনি বললেন, "মিস্টার চট্টরাজের এখন কাজ-কর্মের যা অবস্থা তাতে ওঁর পক্ষে ধানবাদের বাইরে আসা-যাওয়া করা খুব শক্ত ব্যাপার হয়ে উঠলো। সপ্তাহে একদিন ছুটি আছে, কিন্তু ভদ্রলোকের যা স্বভাব বেশী ছুটোছুটি পছন্দ করেন না। ছুটির দিনে কষ্ট করে উনি যে কলকাতায় এসে হাজির হবেন, তা মনেই হয় না। অথচ ওঁর সঙ্গে

আমাদের যে রিলেশন গড়ে উঠছে তা নষ্ট হতে দেওয়া চলে না।"

জগদীশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল সুলেখা। ভদ্রলোক জানালেন, "খারাপ মাল সাপ্লাই করার কেসটা এখনও কিছুদিন ঝুলে থাকবে মনে হয়।"

এর পরেই প্রস্তাবটা করলেন জগদীশবাবু। বললেন, "মিস সেন, আমরা কলকাতায় ক্রমশ সেকেলে হয়ে যাচ্ছি—সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চেষ্টা করছি না আমরা। অথচ বম্বে, দিল্লী, ম্যাড্রাস আমাদের পিছনে ফেলে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে।"

জগদীশবাবুর কথা কোন দিকে মোড় নিচ্ছে সুলেখা তা বুঝতে পারছে না। জগদীশ জেঠমালানি এবার সোজাসুজি বললেন, "আমার বম্বে কাজিন সুন্দর জুড়েমালানি রায়পুরে রোরিং বিজনেস করছে। বোম্বাই থেকে দুজন স্পেশালি চাটার্ড লেডি পাঠিয়েছে রায়পুরে। আমরা কলকাতার বিজনেসমেনেরা এসব বোম্বাই ট্রিকস জানিই না। নো ওয়াণ্ডার আমরা ক্রমশ বম্বের কাছে হেরে যাচ্ছি।"

জগদীশবাবু বললেন, "তোমাকে এই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করতে হবে সুলেখা। আমি ধানবাদে একটা ছোট্ট বাড়ির ব্যবস্থা করে এসেছি। ওখানেই তুমি উঠতে পারবে—কোনো অসুবিধা হবে না। স্পেশাল টাকা দিয়ে ওখানে ফোনও আনিয়ে দেবো—যাতে মিস্টার চট্টরাজের সঙ্গে যোগাযোগের তোমার কোনো অসুবিধে না হয়।"

জগদীশ জেঠমালানি বললেন, "বাড়িটা সবদিক থেকে আইডিয়াল। মিস্টার চট্টরাজের স্টাফ কোয়ার্টারগুলো যেদিকে এই বাড়িটা তার থেকে কিছুটা দূরে।"

ওইখানে গিয়ে বসবাসের হুকুম পেয়ে গেল সুলেখা। "যতদিন খুশী ওখানে গিয়ে থাকো সুলেখা। একটা কাজের পুরো দায়িত্ব তোমার ওপর চাপিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে চাই।"

সলেখা বুঝতে পারছিল না, ওখানে নিজের পরিচয় কী দেবে? ছোট জায়গায় লোকের কৌতূহল অনেক বেশী। হাঁড়ির খবর না-জানা পর্যন্ত তাদের তৃপ্তি হয় না।

জগদীশ জেঠমালানি সগর্বে বললেন, "সেইজন্যেই তো স্পেশাল বাড়ির ব্যবস্থা করলাম সুলেখা। বাড়ির চারদিকে পাঁচিল, গেট খুললেই সামনে বাগান এবং বাড়ির পিছনেও বাগান। বাইরে থেকে তাকিয়ে ভিতরে কী হচ্ছে বোঝা অসম্ভব।"

সুলেখার চোখের সামনে তখন ছোটবেলার স্মৃতি ভেসে উঠছে। সে একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

জগদীশবাবু বললেন, "কোনো চিন্তা নেই সুলেখা। তোমার যখন খুশী কলকাতায় বেড়াতে চলে আসবে। মাঝে মাঝে যাতে কয়েকটা ক্যাজুয়াল লীভ পাও, তার জন্যে আমি চট্টরাজকে বলে দেবো।"

ক্যাজুয়াল লীভ কথাটা ব্যবহার করে নিজের রসিকতায় নিজেই আনন্দ উপভোগ করলেন জগদীশ জেঠমালানি। মুখ টিপে হেসে তিনি বললেন, "বাড়িটা দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে, সুলেখা। এখন কিচেন গার্ডেন আছে—ওখানে জাঁকিয়ে বসে, তুমি ইচ্ছে করলে ফুলের বাগান কোরো, আমি অ্যাজ এ স্পেশাল কেস পুরো খরচ দেবো। শুধু মিস্টার চট্টরাজকে জিজ্ঞেস করে নিও উনি কী ফুলগাছ পছন্দ করেন।"

কলকাতার এই বদ্ধ পরিবেশ থেকে দূরে ছোটবেলার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ধানবাদের একটা আস্ত বাড়ির শান্ত জীবন সুলেখাকে হাতছানি দিচ্ছে। জগদীশবাবু নির্লজ্জের মতো বলছেন, "তুমি ওখানে খুব সুখে থাকবে। একজন মাত্র মনিব তোমার।"

কিন্তু কী পরিচয় দেবে সুলেখা? সেই কথাটা জগদীশবাবু খুলে বলছেন না।

সুলেখার প্রশ্নে জগদীশবাবু এবার মাথা চুলকালেন। বললেন, "জেঠমালানি কোম্পানির নাম যেন ঘুণাক্ষরে কেউ জানতে না পারে।"

সুলেখা সেন এবার আমার সামনে হেসে ফেললো। বললো, "ধানবাদে আমার পরিচয় কী জানেন? থ্যাকারে অ্যাণ্ড কোম্পানির অফিসার। আমাদের হেড আপিসের ঠিকানা: ৩৪ নম্বর থ্যাকারে ম্যানসন! জগদীশবাবুই বুদ্ধিটা বাতলে দিলেন, কিছু প্যাডও ছাপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"

জগদীশবাবু বলেছিলেন, "থ্যাকারে অ্যান্ড কোম্পানির পরিচয় দিয়ে তুমি যেখানে খুশী যেতে পারবে। তেমন দরকার হলে, মাঝে মাঝে দু'একটা বিজনেস কোটেশন পাঠাবে—আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর চড়াবার বুদ্ধিটাও জগদীশবাবুর। জোর করে সেদিনই আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। যাবার আগে কী রকম ভয় ভয় করতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলাম, "মিস্টার চট্টরাজ আমাকে এক্সপেক্ট করছেন তো?"

জগদীশবাবু হা-হা করে হাসলেন। "উনি এখনও কিছু জানেন না। আমি চাই তুমি ও'কে একটা প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ দেবে।"

এ লাইনে কাজকর্ম করেও সুলেখা যে এখনও পাকাপোক্ত হয়নি তা তার কথাবার্তায় বোঝা যায়। সুলেখা বললো, "আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগলো, শংকরবাবু। আমি জগদীশবাবুকে বললাম, আমি যাচ্ছি বটে। কিন্তু মিস্টার চট্টরাজের সঙ্গে যেচে দেখা করতে পারবো না।"

সুলেখা বললো, "কাজ হয়েছিল আমার কথায়। জগদীশবাবু আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েই বোধ হয় ট্রাঙ্কে কথা বলছিলেন। স্টেশনে নেমেই প্ল্যাটফরমে খোদ মিস্টার চট্টরাজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।"

লোকলজ্জার ভয় উপেক্ষা করে মিস্টার চট্টরাজ যে সুলেখাকে অজানা জায়গায় নিতে এসেছেন, এতেই সুলেখার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। সুলেখা বললো, "আমার সিঁথির সিঁদুরটা যে ও'কে অনেক অস্বস্তি থেকে রক্ষে করছে তা বুঝতে পারলাম। দু-একজন পরিচিত লোকের সঙ্গেও ও'র দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছে। আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়ে ও'র সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললাম। আমি যেন ও'র কোনো আত্মীয়া। বিদেশে চাকরির ব্যাপারে এসেছি—তাই 'নির্মলদা' নিজে স্টেশনে এসেছেন আমাকে রিসিভ করতে।"

'অবস্থার চাপে পড়ে দুজনে চুপি-চুপি নিজেদের ভূমিকা স্থির করে ফেললাম। আমি মিসেস সুলেখা সেন। আমার 'স্বামী' শুভ্র সেন এখনও ফরেনে ট্রেনিং-এ রয়েছেন —কিছুদিন পরেই বম্বেতে পোস্টিং পাবেন। তখন হয়তো থ্যাকারে ট্রেডিং কোম্পানির চাকরি ছেড়ে আমি বম্বেতে চলে যাবো।" এ যুগের মডার্ন মেয়ে—বিয়ের পরেও কিছুদিন চাকরি-বাকরি করে নিচ্ছেন।"

সুলেখা বললো, 'আমার স্বামীর নামকরণটা মিস্টার চট্টরাযই করে দিয়েছিলেন। আমার খু-উ-ব ভালো লেগে গিয়েছিল, শংকরবাবু। আপনার কীরকম মনে হয়, নামটা?"

আমি সুলেখার সরল মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ওর ভাবভঙ্গীর আড়ালে যে নিষ্পাপ বালিকাটি লুকিয়ে রয়েছে তাকে ঘৃণা করবার মতো শক্তি আমার নেই।

"সুলেখা ও শুভ্রা। রাজযোটক বলা যায়। নামে সুন্দর মিল রয়েছে।" আমি উত্তর দিতে প্রায় বাধ্য হই।

সুলেখা বললো, "সে-রাত্রে হঠাৎ যেন ব্যাপারটা আমার কাছে সত্যি-সত্যি মনে হয়েছিল, শংকরবাবু।"

আমি সুলেখার থমথমে মুখের দিকে তাকালাম। সুলেখা বললো, "অনেক রাত্রে ধানবাদের সেই বাড়িটার বিছানায় একা-একা শুয়ে মনে হলো, সত্যিই আমি মিসেস সীমা সেন। আমার স্বামী শুভ্রর ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা যেন আমার মাথার কাছে টেবিলে সাজানো রয়েছে। শুভ্র মিথ্যে নয়—সে যেন সত্যিই ট্রেনিং-এ গিয়েছে, ট্রেনিং থেকে সে আমায় গতকালও চিঠি লিখেছে। শুভ্র, আমার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী, ফিরবো বলে। বম্বে দিল্লী কলকাতা নয়—এই ধানবাদেই সে ফিরে আসবে, এখানেই তার পোস্টিং হবে—এবং সেই জন্যই আমি বিনিদ্র রজনী যাপন করছি।"

সুলেখা সম্বন্ধে আমার মনে যত ঘৃণা ও বিরক্তি জমা হয়েছিল, তা হঠাৎ কেটে যাচ্ছে। সন্দেহের কুয়াশা কাটিয়ে সুলেখাকে আমি আরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওর ধানবাদের জীবন সম্বন্ধেও এক বিচিত্র কৌতূহল আমাকে গ্রাস করছে। আমি জানতে চাই, ছোটবেলার সেই পরিবেশে সুলেখা অবশেষে সুখী হলো কিনা। আমি মনে মনে প্রার্থনা করছি, হে ঈশ্বর ঐ চট্টরাজের সঙ্গেই সুলেখার কিছু একটা স্থিতি করিয়ে দাও। নির্মল ও শুভ্র-এর মধ্যে তো তফাৎ নেই বললেই হয়।

'হে ঈশ্বর', আমি তখন প্রার্থনা করছি, 'সুলেখার চঞ্চল নিরাশ্রয় জীবনে এবার তুমি স্থিতির আশীর্বাদ এঁকে দাও।' সুলেখা যদি চট্টরাজের সঙ্গে মিলনের জন্যেই, জেঠমালানির সঙ্গে সম্পর্ক চুকোতে কলকাতায় ফিরে এসে থাকে, তাহলে আমি তাকে কোনো সাহায্য দিতে কার্পণ্য করবো না। প্রয়োজন হলে সুলেখা আজ আমার ঘরেও রাত্রি যাপন করতে পারে। আমাদের এই অফিস ঘরটা মন্দ নয়। এখানকার টেবিলে অনায়াসে একটা-দুটো রাত্রি আমি কাটিয়ে দিতে পারবো।

সুলেখা তৎক্ষণাৎ বলতে শুরু করেছে, "কী আশ্চর্য! যে-বাড়িটা আমার জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে, সেটা আমার খুবই চেনা। ছোটবেলায়, ওখানে দিনের পর দিন খেলা করেছি। যে পেয়ারা গাছটায় উঠে পেয়ারা পেড়েছি সেটাও ঠিক রয়েছে। বাবার অফিসার ওই বাড়িতে থাকতেন। আমার সমবয়সী একটি মেয়ে থাকতো ওই বাড়িতে —শ্যামলী। শ্যামলীর খুব ভাল বিয়ে হয়েছে। ওর স্বামী বার্কলেতে থাকে। মস্ত কী এক রিসার্চ করে। শুনেছি, সুলেখাও ওখানে চলে গিয়েছে—ওরা সুখে-শান্তিতে ঘর করছে।"

সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। নীরবে ওনাকে জিজ্ঞেস করছি, 'সুলেখা তুমি এবার শেষের কথা কিছু বলো। তুমি বলো, সীমা অবশেষে তার শান্তি খুঁজে পেয়েছে। মিলনান্ত নাটকের প্রারম্ভের দুঃস্বপ্ন অতিক্রম করে সীমা অবশেষে সুখী হতে চলেছে, এবং অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে তুমি শেষবারের মতো জগদীশ জেঠমালানির চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে বিনা নোটিশে হাজির হয়েছো।'

সুলেখাকে প্রশ্ন করা হলো না। হঠাৎ বাইরে ম্যানসনের কম্পাউন্ডে একটা অ্যামবাসাডর গাড়ির অস্থির হর্ন বিরক্তভাবে বেজে উঠলো।

হর্ন শুনেই সুলেখা চমকে উঠলো। এই সুর যেন তার চেনা। সুলেখা মুহূর্ত সময় নষ্ট না-করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং আমি আবার সুলেখার মাল-পত্তরের জিম্মাদার হয়ে অধীর প্রতীক্ষায় চেয়ারে বসে রইলাম।

এই অ্যামবাসাডর গাড়ি চড়ে সুলেখা এখনই অন্য কোথাও অদৃশ্য হবে নাকি? এই গাড়িতে কে এলেন? এসব প্রশ্ন মনের মধ্যে উঠছে। আমি নিজের অজ্ঞাতেই ক্রমশ সুলেখার সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছি।

একটু পরেই সুলেখা ফিরে এল। এখন তার মুখে-চোখে ভরসার ভাব ফুটে উঠেছে। সুলেখার মুখ উজ্জ্বল করে বললো, "সমস্যা মিটেছে—এতোক্ষণে জগদীশবাবুর অফিস থেকে ফ্ল্যাটের চাবি এল। যা ভেবেছি তাই। অফিসের লোকদের কোনো দোষ নেই। মিস্টার জেঠমালানি যথাসময়ে ভাগ্নে রাজাবাবুকে টেলিফোনে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন চাবি পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু রাজা-

বাবু সেসব কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।"

হাতের চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে সুলেখা বললো, "মাঝখান থেকে আমার পোড়া কপালের জন্যে আপনাকে ভোগান্তি সইতে হলো।"

সুলেখা আরও জানিয়ে দিল, ব্যাপারটা সে অত সহজে ছাড়বে না। জগদীশবাবু কলকাতায় ফেরা মাত্র এর একটা বিহিত করবে। "রাজাবাবু যদি আপিস থেকে ফিরতে আরও দেরি করতেন, তা হলে কী হতো বলুন তো?"

যেসব মেয়েদের কোনো ঠিকানা নেই, তারা কলকাতার এই জনজঙ্গলে কী অবস্থায় পড়তে পারে ভেবে ভুক্তভোগী আমি সমব্যথায় আঁতকে উঠলাম।

সুলেখা আর কথা বাড়ালো না। বললো, "ড্রাইভারটা যখন রয়েছে তখন ওকে দিয়ে একটু কাজ করিয়ে নিই।" এই বলে সারথীর স্কন্ধে সর্বস্ব চাপিয়ে সুলেখা যেন দ্রুতবেগে থ্যাকারে ম্যানসনের মূল বাড়িটার দিকে দ্রুত পদক্ষেপে অদৃশ্য হয়ে গেল।

[ক্রমশ]

বিশ্ববিজ্ঞান

ধূলিকণা এবং খনি শ্রমিক

খনির কথা উঠলেই এক সময় মানুষের মনে যে ধরনের ছবি ফুটে উঠত তার বর্ণনা কতকটা এই রকম:—

কোথাও ছোট বড় পাহাড়। কালো অথবা ঈষৎ বাদামী রঙের পাথর। গাঁইতি অথবা শাবলের ওপর নির্ভর করে হাজার হাজার শ্রমিক সেই পাহাড়ের স্তূপ থেকে পাথর কেটে কখনও নিজেরা, কখনও খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আসছে কারখানা এলাকায়। এই পাথরের মধ্যেই রয়েছে লোহা, হয়তো তামা, নিকেল প্রভৃতি। দিনের পর দিন এই পাথর বওয়ার কাজ করতে করতে কুড়ি বছরের যুবক কখনও পঁচিশ বছরের মধ্যেই বাড়িয়ে যেত। তার সেই শক্ত সমর্থ পেশী কখন যে কুঁচকে গিয়ে তার চোখ মুখ সারা দেহে আশি বছর বুড়োর জরা নেমে আসত সে নিজেই বুঝতে পারত না।

ব্যাভেরিয়ার ইউরেনিয়াম খনির বর্ণনা আরও ভয়ঙ্কর। আসলে সেটা যে ইউরেনিয়ামের খনি, গোড়ায় এ কথা কেউ জানত না। তখনও ইউরেনিয়ামের আবিষ্কার হয়নি বলে ওটা ছিল সিসের খনি। দেখা গেল সিসের আকরিক কাটার কাজ করতে গিয়ে শত শত শ্রমিক অল্পদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বেশির ভাগ রোগই ফুসফুসের। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। একটুতেই হাঁফ ধরে। কারোর কারোর গায়ের চামড়ায় যন্ত্রণা। দগদগে ঘা। কেউ অচিরেই
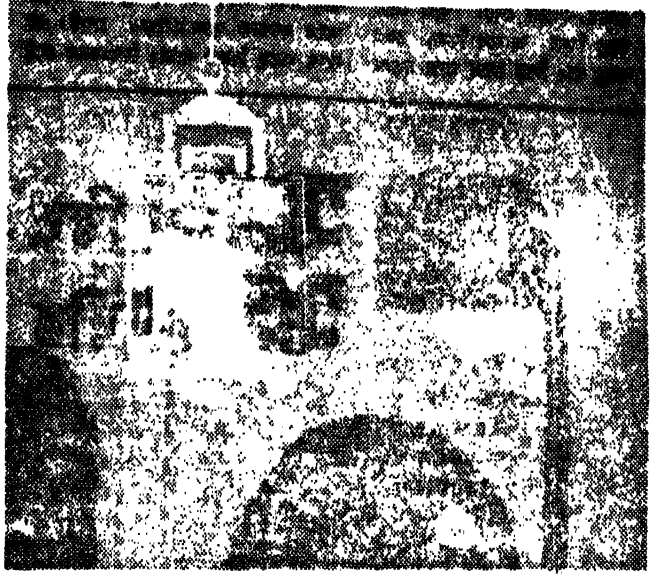
খনির মধ্যে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা জানার জন্যে এই যন্ত্রটি তৈরি করেছেন ধানবাদের কেন্দ্রীয় খনি গবেষণাগারের কুশলীরা। অধঃক্ষেপক পদ্ধতিতে ধূলিকণা সংগ্রহ করে যন্ত্রটি জানাতে পারবে বাতাসে কি পরিমাণ ধূলিকণা ভাসমান অবস্থায় থাকলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব।

রক্তাল্পতা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করল।

এইভাবেই চলছিল দীর্ঘকাল। পরে দেখা গেল সিসের ওই খনিতে অদ্ভুত এক ধরনের পদার্থ ছড়িয়ে রয়েছে। অবশ্যই আকরিক হিসেবে। ইউরেনিয়াম। এই ইউরেনিয়াম থেকে অদৃশ্য তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে। এই রশ্মির স্পর্শ পেয়ে—ওই রশ্মিময় পরিবেশে দিনের পর দিন কাজ করতে গিয়ে—বেশির ভাগ শ্রমিকই তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়। ফলে কেউ আক্রান্ত হয় ফুসফুসের ক্যান্সারে। কারোর রক্তে হয় ক্যান্সার। কারোর বা চামড়ায়।

অভ্র খুবই মূল্যবান বস্তু। কিন্তু এই অভ্রের খনিতে কাজ করতে গিয়ে কত শ্রমিক যে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হন এ খবর রাখেন কজন? অথবা অ্যাসবেসটাসের কথাই ধরুন। অদ্ভুত এই বস্তুটির ব্যবহার এখন দারুণভাবে বেড়ে গেছে। কারণ অ্যাসবেসটাস আগুনে পোড়ে না। [illegible] আবহাওয়ায় সচরাচর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নষ্ট হয় না। যেমন নষ্ট হয় লোহা মরচে পড়ে। বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে নানারকম তাপবিষয়ক যন্ত্রপাতি এমন অনেক কিছুতেই এ বস্তুটির চাহিদা বেড়েছে। টিনের বদলে অ্যাসবেসটাসের চাল তৈরি করার কাজেও এর চল বাড়ছে দিন দিন। অথচ খনি থেকে সংগ্রহ করার সময় অ্যাসবেসটাসের সূক্ষ্ম ধূলিকণাময় পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে কত শ্রমিক যে অ্যাসবেসটোসিস নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েন তার সঠিক হিসেব দেয়া শক্ত।

আর কয়লাখনি? আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও এক-একটি কয়লাখনির অবস্থা ছিল এক-একটি জ্যান্ত নরকের মত। কালো ধূলিকণায় চারদিক অন্ধকার। ভূগর্ভে নড়বড়ে লিফটে চেপে শত শত শ্রমিক নামছে—দিনের শেষে কাজ সেরে আবার তারা ফিরে আসবে কিনা, কেউ বলতে পারে না। নিচে নেমে তারা কয়লা কাটে। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ। কখনও বা কয়লার ফাটল বেয়ে নামে জলের ঢল। ওরা গাঁইতি চালায়। স্তর থেকে চাঁই চাঁই কয়লা ভেঙে পড়ে। আর সেই সঙ্গে কয়লার সূক্ষ্ম ধূলিকণায় চোখে আঁধার দেখে। ওরা যখন কাশে কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসে থকথকে কয়লাগুঁড়োর পেস্ট। এই সঙ্গে আছে বিষাক্ত গ্যাস। বিপজ্জনক সেই গ্যাসের উপস্থিতি জানার জন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেফটি ল্যাম্প। সেই ল্যাম্পের আলোয় তারা পথ চিনে চলে, কয়লা কাটে। আলোর জোর কমতে শুরু করলে তারা শঙ্কিত হয়। কারণ খনির মধ্যে বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা জানার ওটাই একমাত্র সংকেত। আলো নিবু নিবু হলেই বুঝতে হবে গ্যাস বাড়ছে। শুধু শ্বাসকষ্টই নয়, ওই গ্যাস

বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সবাইকে মৃত্যুর দিকেও ঠেলে দেয় কখনও কখনও।

কাজের শেষে একে একে যখন তারা বেরিয়ে আসে, চেনা শক্ত। ওরা মানুষ, না প্রেতাত্মা! চোখ মুখ, সারা শরীর কালো কয়লার ধুলোয় ধূসরিত। ক্লান্ত। শির-দাঁড়া বেঁকে গেছে। নিষ্প্রাণ প্রতিটি পদক্ষেপ।

সব রকম খনিতেই কর্মীদের কাজ করতে হয় নানারকম ঝুঁকি নিয়ে। কখনও দুর্গম বনজঙ্গল সমাকীর্ণ পাহাড়ে পথ ধরে চলাফেরা করতে হয় মাইলের পর মাইল। কখনও ডিনামাইট বিস্ফোরণ করে আকরিক পাথর ফাটানোর কাজ চলে। ওই সময় আকরিকের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা বাতাসে ভেসে থাকে দিনের পর দিন। ওই সব কণা শ্রমিকের নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গিয়ে জমে শ্বাস কষ্ট ঘটাতে পারে। কখনও বা পানীয় জলের মধ্যে দিয়েও নানারকম ধাতব কণা শরীরে প্রবেশ করে জনস্বাস্থ্যে বিঘ্ন ঘটায়। ওই সব ধাতুর কোনটি ক্যান্সার রোগের কারণ হতে পারে। কোন ধাতু সৃষ্টি করে মানসিক রোগ। নানারকম আন্ত্রিক রোগেরও কারণ হয় কোন কোন ধাতু।

গত কয়েক বছর ধরে এসব সমস্যা নিয়ে গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পন্থা বের করেছেন। আগে যেখানে কয়লার খনির মধ্যে ছিল স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এখন শক্তি-শালী পাম্পের সাহায্যে নিয়মিত বাতাস প্রবাহিত করে শুকনো অবস্থায় রাখার চেষ্টা চলছে। ইলেকট্রিক আলো বসিয়ে গ্যাস-বিস্ফোরণ প্রতিরোধ করা হচ্ছে। বিভিন্ন খনি এলাকার শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, কোন কোন বস্তু কি কি ধরনের রোগ সৃষ্টি করতে পারে সেসব নিয়ে নিয়মিত গবেষণা চালানো, ওই সব রোগের কবলে পড়ে শ্রমিকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন তার ব্যবস্থা করা—এমন অনেক কিছুই করছেন খনি-বিজ্ঞানীরা। এর ফলে খনির দুর্ঘটনা যেমন অনেকটা কমছে, সেই সঙ্গে শ্রমিকদের নিজস্ব স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিপদ-আপদও এখন অনেক কমে গেছে।

এ প্রসঙ্গে ধানবাদের কেন্দ্রীয় খনি গবেষণাগারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রতি এখানকার বিজ্ঞানীরা ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে অনু-সন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, ওই সব খনির শতকরা আটজন শ্রমিক এক ধরনের ফুস-ফুস রোগে ভুগে থাকেন। রোগটির নাম নিউমোকোনিওসিস। রোগটি অত্যন্ত জটিল এবং দুরারোগ্য। দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত খনি অঞ্চলের ধূলিকণা নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢোকার ফলেই এ রোগটি হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ধূলিকণার ব্যাস এক থেকে পাঁচ মাইক্রন। উল্লেখ্য, এক মাইক্রোন সমান এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। এই রোগ শরীর পঙ্গু করে এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়।

ধানবাদের এই গবেষণাগার কয়েকটি লোহার খনিতেও অনুসন্ধান চালিয়েছিল। লোহার আকরিক কাটার সময় প্রচুর ধুলো সৃষ্টি হয়। এই সব ধূলিকণা নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকে সৃষ্টি করে আর এক ধরনের রোগ। নাম সিলিকোসিস। এ রোগটিও খুবই মারাত্মক। গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, আমাদের লোহার খনিতে কর্মরত শতকরা ২৩ জন শ্রমিক সিলিকোসিস রোগের শিকার। সোনা, দস্তা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ এবং সিসে খনি শ্রমিকদের মধ্যেও এই রোগটির প্রাদুর্ভাব লক্ষ করেছেন আরও কয়েকটি গবেষণা-গারের বিজ্ঞানীরা।

ধানবাদের খনি গবেষণাগার খনির মধ্যে যাতে বস্তুকণা না জমতে পারে, তার জন্যে নানাভাবে চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। বদ্ধ কয়লাখনির মধ্যে জোরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করে অনেকটা সুফলও পেয়েছেন এখন বিজ্ঞানীরা। ওঁরা দেখেছেন জোরে বাতাস চালালে ধূলিকণা জমে কম। তবে এটাও দেখা গেছে বাতাসের বেগ মিনিটে ৪০০ ফুটের বেশি হলে আবার সুফলের চেয়ে কুফলই হয় বেশি। ওই বাতাস তখন মাটিতে জমে থাকা ধূলিকণাকে ঘেঁটিয়ে সারা এলাকায় ধূলি ঝড়ের সৃষ্টি করে। তখন ভাসমান ধূলিকণা সহজে নিশ্বাসের সঙ্গে শ্রমিকদের ফুসফুসে গিয়ে হাজির হয়। আর একবার যদি ধূলিকণা বাতাসের কাঁধে চড়ে ভাসতে থাকে তাকে থিতিয়ে ফেলা খুবই কঠিন কাজ।

ধূলিকণা যাতে না ছড়ায় তার জন্যে বিভিন্ন খনিতে জল, নুন-জল, ক্যালসোলেন তেল স্প্রে করার ব্যবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি ধানবাদের গবেষণাগার বিশেষ পদ্ধতিতে কয়লার স্তর বিস্ফোরণ করে ফাটানোর পর যে ধূলিকণার উদ্ভব হয় তাকে অপসারিত করার জন্যে নতুন একটি পদ্ধতি বের করেছে। এতে জলের স্প্রে কাজে লাগান

হয়। যা বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার ২০ শতাংশ অপসারণ করতে পারে। এসব প্রচেষ্টা খনি-শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বজায় রাখতে যে যথেষ্ট সাহায্য করবে, বলাই বাহুল্য।

পুরুষত্বের উৎস

বিশেষ এক ধরনের ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালানর পর প্রশ্নটি তুলেছেন কয়েকজন প্রজননবিদ এবং রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিজ্ঞানী। সংকরজাত এই ইঁদুর-গুলিকে টি এফ এম বা টেস্টিকুলার ফিমেনাইজেশন বলা হয়। প্রশ্নটি এই, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে কে পুরুষ হবে, অথবা নারী, সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্বটি কার ওপর ন্যস্ত?

টি এফ এম ইঁদুরের ওপর গবেষণা চালিয়ে সম্প্রতি এ প্রশ্নের উত্তর জুগিয়েছেন মেমোরিয়াল স্লোয়ান-কেটেরিং ক্যানসার সেণ্টারের স্টিফেন ওয়াচটেল এবং তাঁর সতীর্থ গ্লোরিয়া কুও এবং এডোয়ার্ড বয়েস, আর সেই সঙ্গে সিটি অব হোপ ন্যাশনাল মেডিকেল সেণ্টারের সুসুমু ওহ্‌নো। এঁদের বক্তব্য, একটিমাত্র সামগ্রী, নাম এইচ-ওয়াই (H-Y) অ্যাণ্টিজেন। প্রাণীদের মধ্যে পুরুষত্ব বিকাশের মূল ভূমিকা এই বস্তুটির ওপরই ন্যস্ত। এই বস্তুটিই সন্তানের সৃষ্টিমুহূর্তে ঠিক করে দেয়, কে পুরুষকারের অধিকারী হবে, কে হবে না। উল্লেখ্য, অ্যাণ্টিজেন বিশেষ ধরনের প্রোটিন অথবা কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ। এদের মধ্যে কেউ কেউ শরীরে বিষক্রিয়া ঘটায়। কেউ কেউ এনজাইম বা উৎসেচক রস হিসেবে কাজ করে।

অনেকেই হয়ত জানেন, পুরুষ এবং নারীর মধ্যে মূল পার্থক্য, স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের দেহকোষের মধ্যে থাকে একটি এক্স এবং একটি ওয়াই ক্রোমোজোম; আর নারীদের দেহকোষে থাকে দুটি এক্স ক্রোমোজোম। ওই সব গবেষকরা বলছেন, ভ্রূণ সৃষ্টির গোড়ার দিকে ওয়াই ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত এক ধরনের জিন এইচ-ওয়াই অ্যাণ্টিজেনের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই অ্যাণ্টিজেনটিই ঠিক করে দেয় শুক্রাশয় তৈরি হোক, ডিম্বাশয় নয়। আর যে মুহূর্তে শুক্রাশয়টি তৈরি হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় এক ধরনের হরমোন তৈরির কাজ। যার নাম টেসটোস্টারোন। শেষোক্ত এই বস্তুটিই প্রাণীদেহে পুরুষত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। জৈবিক অথবা শারীরবৃত্তীয় দৃষ্টি-কোণ থেকে ক্রমে সে পুরুষ হিসেবে বিকশিত হতে থাকে। অবশ্য এসব কাজ শুধু টেসটোস্টারোনের একক সামর্থ্যেই সম্পন্ন হয় তা নয়। টেসটোস্টারোনকে সক্রিয় করার জন্যে দরকার আর এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। নাম [illegible] রিসেপটার বা টেসটোস্টারোন গ্রাহক। এক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত এক ধরনের জিনএ বস্তুটি তৈরি করে।

সাপে কাটার চিকিৎসা

ট্রাইপসিন (trypsin) এক ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক রস। প্রোটিন খাদ্য হজমে এই রস সাহায্য করে। চীনের বিজ্ঞানপত্র সায়াণ্টিয়া সিনিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে কয়েকজন চৈনিক বিজ্ঞানী হিয়াং উ-লিয়াং, সাও হু-চিন, হাও ই-সি, লিউ সু চুয়াং, চু সিং-লিয়াং এবং লি চিয়াং ইয়েন সম্প্রতি লিখেছেন, গোখুরো, মিনবাস প্রভৃতি বিষাক্ত সর্প শরীরের যে জায়গায় দংশন করে ঠিক তার পাশে গায়ের পাতলা চামড়ার নীচে ট্রাইপসিন ইনজেকশন করলে অভূতপূর্ব ফল পাওয়া যায়। ব্যাপারটা কয়েকটি ইঁদুরের ওপর তাঁরা পরীক্ষা করেও দেখেছেন। ওঁদের বক্তব্য, দংশনের পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইনজেকশন করে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে সবকটি ইঁদুরকেই বাঁচান সম্ভব হয়েছে। দংশনের ৫০ মিনিট পর ইনজেকশন করায় অবশ্য বেঁচেছে শতকরা ৫০টি ইঁদুর।

সমরজিৎ কর

পুস্তক পরিচয়

সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত লিপি

HE MESSAGE OF INDUS SCRIPT by Professor Bankabehari Chakravorty. Indian Publications, Calcutta-700 069. Price Rs. 48.

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন ভারতের বিস্মৃত সভ্যতার স্বাক্ষর বহন করে অজ্ঞাতলিপি সমন্বিত মুদ্রা বা সীল-মোহর পাঞ্জাবের হরপ্পায় আত্মপ্রকাশ করে, তখন থেকেই বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমহল ওই লিপির পাঠ উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেন। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে মহেঞ্জোদারো এবং তৎপরে হরপ্পা, লোথাল প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে অনুরূপ লিপিযুক্ত প্রায় আড়াই হাজার সীলমোহরের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাদের পাঠোদ্ধার প্রসঙ্গে ওয়াডেল, প্রাণনাথ, সি জে গাড, ল্যাংডন, কে এন দীক্ষিত, ডঃ হানটার, মহেন্দ্র কাব্যতীর্থ, হ্রোজনী, স্বামী শঙ্করানন্দ, রেভারেণ্ড হেরাস, আস্কো পারপোলা এবং এস আর রাও প্রভৃতি মনীষী তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতি ও পঠন বিদ্বৎসমাজে উপস্থাপিত করেছেন। তৎসত্ত্বেও সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত লিপি রহস্যঘন ইঙ্গিত নিয়ে নীরব হয়ে আছে। বর্তমান গ্রন্থটি শ্রীচক্রবর্তীর সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুস্তক। পুস্তকের প্রারম্ভে তিনি আলোচনা করেছেন আর্যদের ভারতে আগমন সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের যার একটিতে বলা হয় যে আর্যরা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে বিজেতারূপে ভারতে আসেন এবং অপরটিতে বলা হয় যে ভারতে আর্যসভ্যতার শুরু খৃষ্টপূর্ব অন্ততঃ সপ্তম সহস্রকে। পঠন প্রসঙ্গে লেখক দুটি ধ্রুবক গ্রহণ করেছেন—একটি হল সীলের উপর অঙ্কিত চিহ্নের যে ধ্বনিমূল্য তা, এবং অন্যটি হল সীলে উৎকীর্ণ শব্দগুলি ব্যক্তিবাচক নাম। এই দুইটি ধ্রুবক এবং তিনটি যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের উপরে নির্ভর করে তিনি বর্তমান গ্রন্থে ৪২৫টি সীলের পাঠোদ্ধার করেছেন এবং বলেছেন তাঁর পূর্বগ্রন্থের ৮৬টি সীলপঠন একত্র করলে মোট সীল পাঠের সংখ্যা হয় ৫১১। যুক্তিবিদ্যাসম্মত বস্তুভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে এত অধিক সংখ্যক সীলের পাঠ পৃথিবীর আর কোন মনীষীর গ্রন্থে দেখা যায় না। তা ছাড়া, এই পদ্ধতির সার্থকতা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তিবাচক নামগুলির পাঠোদ্ধার হয়েছে তা প্রাচীন ভারতের প্রচলিত নাম। অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা সীলে উৎকীর্ণ শব্দগুলিকে ব্যক্তিবাচক বলেই মনে করেছেন, তাঁদের দেওয়া নামগুলি কৃত্রিম এবং দুর্বোধ্য। পাঁচ শতাধিক সীলপাঠের ফলশ্রুতিস্বরূপ শ্রী চক্রবর্তী দেখাতে চেয়েছেন যে সিন্ধুসভ্যতা আর্যভাষাভাষীদেরই সভ্যতা এবং খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে বিজেতারূপে আর্যদের ভারতে আগমন তথা আর্য-দ্রাবিড় সংঘর্ষের যে ইতিহাস বিদেশী শাসকদের পক্ষচ্ছায়ায় রচিত হয়েছিল, তা রাজনৈতিক অভিসন্ধিপ্রসূত এবং যাঁরা সিন্ধু সভ্যতার দ্রাবিড়ীয় উৎপত্তিতে বিশ্বাস করে লিপির পাঠোদ্ধার শুরু করেছিলেন তাঁরা শুধু বিমূর্ত কয়েকটি মত এবং কয়েকটি সীলের কৃত্রিম অর্থের অধিক অগ্রসর হতে পারেননি। বিশেষজ্ঞদের অভিমত-সাপেক্ষে একথা নিঃসংশয়ে বলা অত্যুক্তি নয় যে শ্রীচক্রবর্তীর পাঠোদ্ধারের সুধীবর্গ কর্তৃক স্বীকৃতিলাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। প্রত্নবিদ্যা, লিপিবিদ্যা এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি পাঠে আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

অতুলকুমার সুর

প্রবন্ধ ঃ অর্থনীতি

গান্ধী বনাম মাও এবং অন্যান্য প্রবন্ধ। নিরঞ্জন হালদার। সংস্কৃতি পরিক্রমা, ৭, নন্দী স্ট্রীট, কলকাতা-২৯, দশ টাকা।

বইটির মোট সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে গান্ধী এবং মাও সম্পর্কে দুইটি মননশীল প্রবন্ধ আছে; তাছাড়া আলাদাভাবে "গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ভাবনা" সম্পর্কে আছে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। বইটির প্রথম প্রবন্ধ "উন্নয়নের পদ্ধতি ঃ গান্ধী বনাম মাও?"

গান্ধী এবং মাও—দুজনেই এশিয়ান নেতা; ইউরোপীয় ও মার্কিন চিন্তাধারা থেকে তাঁদের অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা একে-

বারেই পৃথক ও বৈশিষ্টপূর্ণ। দুই নেতাই এশিয়ার দুটি জনবহুল দেশের রাজনৈতিক মুক্তি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করেছেন। ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার পর মাও দেশ-গঠনের কাজে নিজের চিন্তাধারার চূড়ান্ত রূপ দিয়েছেন ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দিন পর্যন্ত; অপরদিকে গান্ধীজী স্বাধীনতা সংগ্রামে দীর্ঘকাল নেতৃত্ব দিলেও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র সাড়ে পাঁচ মাস বেঁচেছিলেন। স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে গান্ধীজীর নেতৃত্ব আমরা পাইনি। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার প্রথম পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতি, খাদি-শিল্প ও অন্যান্য কুটিরশিল্পের উন্নয়ন, এবং শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে দেশের অর্থনীতি পরিচালিত হোক, গান্ধীজী তাই চেয়েছিলেন। এজন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও গান্ধীজীর মতভেদ হয়। তবে চল্লিশের দশকে গান্ধীজী বৃহৎ শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা স্বীকার করলেও তাঁর আগের চিন্তাধারাকে নতুন করে সাজিয়ে যেতে পারেন নি। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু হবার পর গান্ধীজীর অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা থেকে দেশ অনেক সরে এসেছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ভারী শিল্পের উপর [illegible] গুরুত্ব আরোপ করা হলেও মাও-এর নেতৃত্বে চীন পুরোপুরি সে-পথ অনুসরণ করেনি; অবশ্য মাও ভারী শিল্পকে "মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্র" বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে মাও রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে অনুসৃত ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়ার নীতি থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ইউনিটের ধারণা মাও-এর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, এবং তা হতেও পারে না। অথচ লক্ষ্য করার বিষয় চীন তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল আঞ্চলিক ইউনিট গঠনে উদ্যোগী হয়েছে এবং মাও-প্রভাবিত চীনা পদ্ধতি অনেকটা গান্ধী-প্রভাবিত পদ্ধতির কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু শ্রীহালদার বিশ্বাস করেন, "ভারতেও চীনের মতো কৃষি ও হালকা শিল্পের উপর গুরুত্ব এবং কৃষিপণ্যের উপযুক্ত দাম (পাট ও ধান-চাষীর মতো ঠকানো নয়) দিলে এবং গান্ধীজীর গ্রাম ইউনিটের ধারণাকে আঞ্চলিক ইউনিটে সম্প্রসারিত করলেই" ভারতের অবস্থা চীনের সঙ্গে তুলনীয় হত না। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী এবং মাও-এর মধ্যে তুলনা করা সম্ভব নয়। একজন

অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী; অপরজন সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী। এই দুই-জনের জীবন-দর্শন ও রাষ্ট্র-দর্শন আলাদা। তবুও একটি ক্ষেত্রে এই দুই নেতার মধ্যে মিল আছে,—তা হল দুই নেতাই অর্থ-নৈতিক উন্নতির ইউরোপীয় পদ্ধতি পরিহার করে নিজস্ব চিন্তাধারা অনুসারে নিজ নিজ দেশের সমাজ ও অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন; এক্ষেত্রে মাও-সে-তুং সফল হয়েছেন, গান্ধীজী সফল হতে পারেননি। 'গান্ধীজীর অর্থনৈতিক ভাবনা' প্রবন্ধে শ্রীহালদার গান্ধীজীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে পশ্চিমী অর্থনৈতিক চিন্তার মধ্যে গড়ে ওঠা ব্যক্তিদের ভুল ধারণা নিরসন করার চেষ্টা করেছেন। শ্রীহালদার অনেকের মতো গান্ধীজীকে একজন বিশিষ্ট অর্থনৈতিক চিন্তানায়ক হিসাবে অভিহিত করতে চান।

বইটিতে 'বৈদেশিক ঋণের সমস্যা' 'টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস', 'ডলারের পতন', 'রুপি-রুবল-স্টার্লিং' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি একটু ভিন্ন স্বাদের, প্রথম দুইটি প্রবন্ধ ১৯৬৬ সালে লেখা হয়েছিল। দশ বছর পর এই প্রবন্ধ দুইটির কিছু পরিবর্তন হওয়া উচিত বললে অন্যায় হবে না।

সুব্রত গুপ্ত

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ছোট্ট দশ বছরের মেয়েটি ছিল হিমালয়ের কোলে, মুসৌরী শহরে, বাবা থাকতেন সমতলভূমিতে, এলাহাবাদে। দু-জনে যখন একসঙ্গে, নানান বিষয়ে হাজারো প্রশ্ন ফুটতো মেয়েটির মুখে। বাবা মেটাতেন সেই কৌতূহল। মেয়ে যখন দূরে চলে গেল, বাবা তখনও মেয়ের সেই সব জিজ্ঞাসার কথা ভুলে যাননি। কিন্তু কেমন করে আলোচনা করবেন মেয়েটির সঙ্গে! তাই তিনি বেছে নিলেন পত্র মাধ্যম। চিঠির পর চিঠি লিখলেন দূরবর্তিনী শিশুকন্যার উদ্দেশে। আর সেই সব চিঠির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন এক আশ্চর্য গল্প। 'আমাদের এই পৃথিবীর পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত গল্প, তার ছোটবড় নানান দেশের কথা।' জন্মের উষালগ্ন থেকে শুরু করে বুড়ো পৃথিবীর জীবনপ্রবাহের বিচিত্র সুন্দর উপাখ্যান তিনি যে-ভাষায় লিখে শুনিয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে, চিরকালের শিশুদের জন্য তা হয়ে রইল এক মহা সম্পদ। সেই চিঠিগুলি একত্র সংকলিত হয়ে যখন বেরুল, তার রম্য উপভোগ্য স্বাদ তখন আর একলা মেয়েটির ব্যক্তিগত

লঙ্ঘন হয়ে রইল না। অনাগত দিনের জন্য খুলে গেল তার অবাধ দরোজা।

সম্পূর্ণ অবাধ অবশ্য বলা চলে না। এই পত্রগুচ্ছের মুখবন্ধে সেই সংশয়টুকু ব্যক্ত হয়েছিল স্নেহশীল বাবার উক্তিতে—'আমি বুঝতে পারছি চিঠিগুলো ইংরেজীতে হওয়ায় এর আবেদনের ব্যাপ্তি সীমিত হয়ে রইল।...আমার সে-ত্রুটি স্খালনের একটি মাত্র উপায়ই আছে, তা হলো—এগুলোর অনুবাদ করা।'

সেই কথা মনে রেখেই বাঁঝ মেয়ে 'ইন্দু'কে লেখা জওহরলাল নেহরুর পত্র-গুচ্ছের বাংলা অনুবাদ উপহার দিলেন হেনা চৌধুরী। সন্দেহ নেই, আ-ত্মজাকে—বাবা (পরিবেশক: কথা ও কাহিনী, কলকাতা ১২, পাঁচ টাকা) অনুবাদ-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন। সহজ, সুন্দর, ঝরঝরে ভাষান্তর।

*

"মুখোশ হল ফুটো/বোঝা গেল, চেহারা তোর/একটা তো নয়, দুটো।/ধরা যখন পড়েই গেলি, / এবারে জাল গুটো।" কিংবা "তুমি যখন / কর যপন / আকাশে ফুল / জান না কি / সব ফাঁকি / সবটা ভুল—" এই ধরনের রচনায় ছড়ার চাল রয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরো-পুরি ছড়া বলা যায় কি? আপাত-অসংলগ্ন, কিন্তু অন্তর্নিহিত সত্যের উদ্ভাসনে ছড়ার একটা দ্বিমাত্রিক স্তর ফুটে ওঠে। এই লেখায় তা অনুপস্থিত। কিন্তু ত্রিপুরার কবি অপরাজিতা রায় এর জবাবও রেখেছেন তাঁর একটি রচনায়। তিনি লিখেছেন—'ত্রিপুরায় অপু রায় / ছড়া লেখে, কবি নয়। / তবু তার কবি-তায় / কভু-কভু হবি হয়।' অন্যত্র বলেছেন—'ছড়া বই, / ছড়াবই / ছড়া বৈ / লিখি না।' এই প্রতিজ্ঞারই ফলশ্রুতি তাঁর ছড়ার সংকলন— **বাইরে বাউল** (প্রতীক প্রকাশন, ত্রিপুরা, পাঁচ টাকা)।

ছড়াগুলি যে 'সম্প্রতি মুহূর্তের ব্যঞ্জনা', 'তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সীমা ছাড়িয়ে এর বিস্তৃতি ঘটলে' সেটা যে উপরি পাওনা বলে গণ্য—ভূমিকায় তাঁর এই স্বীকারোক্তি দেখে ভাল লাগল। বেশ কয়েকটি মিলের চমকে, ছন্দের ঠমকে এবং সুরের গমকে মোড়া স্বাদু ছড়া তিনি এই বইয়ের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন—এ-কথা স্বীকার করতে হবে। এমন দু-একটির উদাহরণ—"এক যে আছে হুলো বেড়াল / বেড়াল মানে মেকুর / মাছ খেয়ে সে দিব্যি তোলে / তুলসী-পাতার ঢেঁকুর" অথবা "ছুটির সময় কোথায় যাব / আসাম থেকে পাঞ্জাবে, / সবাই এমন রণং দেহি, / পাঞ্জা লড়ে জান যাবে।'

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পত্রিকা

শব্দমন্ত্র (বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা)। সম্পাদক: আনন্দ রায়, অতীন্দ্র রায়। ২৮, রামকানাই অধিকারী লেন। কলকাতা-১২। চার টাকা।

শব্দমন্ত্র তাঁদের এই বিশেষ সংখ্যাটি বুদ্ধদেব বসু সংক্রান্ত বহুবিধ রচনায় সমৃদ্ধ করেছেন। মলাটে বুদ্ধদেবের একটি স্কেচ। এবং ভিতরে যাঁরা তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাঁরা সকলেই বাংলা সাহিত্যের এই স্মরণীয় প্রতিভা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। লেখকদের মধ্যে আছেন নরেশ গুহ, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন হালদার প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসুর প্রতি আগ্রহী পাঠক মাত্রেই এই সংখ্যাটির প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং সেই সঙ্গে লাভবানও।

টেস্ট ও টিকিট

ঘাটে মাঠে বাটে তো বটেই, এখন আকাশে বাতাসেও ক্রিকেট। এমন কি ক্রিকেট রান্নাঘরেও। টেস্ট টিকিটের চাহিদা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

একখানা টেস্ট ক্রিকেটের টিকিট যে সাত রাজার ধন সেটা বোঝাতে একবার চমৎকার একটি গল্প লিখেছিলেন রসিক শচীন কর। গল্পের বিষয়বস্তু ছিল—একটি কলেজে পড়া সুন্দরী মেয়ের প্রেমপ্রার্থী পাঁচ-সাতটি ছেলে। সবাই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়। মেয়েটি জানাল, যে তাকে টেস্ট খেলা দেখাতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এক সময় মনে হয়েছিল ওই পাঁচ-সাতজনই তাকে বিয়ে করতে পারবে। টেস্ট খেলার দিন যত এগোতে লাগল ছেলেদের আনাগোনাও তত কমতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল কেউই মেয়েটিকে বিয়ে করতে পারল না একখানা (নাকি দুখানা?) টিকিট সংগ্রহ করতে না পারায়।

দিন দুই আগে কলেজ জীবনের এক সহপাঠী সহসা বাড়িতে এসে উপস্থিত। প্রায় পনেরো ষোলো বছর পরে দেখা। হাবভাবে তার কিছু পরিবর্তন লক্ষ করলাম। কিন্তু কথায় বুঝলাম আগের রসজ্ঞান টনটনে রয়েছে। কোন রকম ভনিতা না করে সরাসরি বলল, ক্রিকেটের একখানা টিকিটের জন্য এসেছি, দিতেই হবে। আমি গিন্নির সহোদরের জন্য চাইছি না, গিন্নির উদর থেকে যারা আবির্ভূত হয়েছে তাদের জন্যও না, এমন কি পরের যে ছেলে সবচেয়ে পরমাত্মীয় সেই জামাইয়ের জন্যও চাইছি না। বললাম, তবে কার জন্য? বন্ধুবর যুক্তকরে কার উদ্দেশে যেন প্রণাম জানিয়ে বলল, ঠাকুরের জন্য।

বলা বাহুল্য, আমার অক্ষমতা জানিয়ে বন্ধুকে বিমুখ করে মনে দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু একটা নতুন অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি। এতকাল জানতাম ক্রিকেট সম্পর্কে যাদের কোন আগ্রহ নেই এবং ক্রিকেট বোঝেন না তাঁরাও টিকিটের জন্য হন্যে হয়ে বেড়ান হয় চাকরি প্রাপ্তি, না হয় চাকরির উন্নতি কিংবা স্টেটাস সিম্বল অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। কালোবাজারে টাকা কামাবার জন্যও বটে। বন্ধুর কথায় এখন বুঝলাম ধর্মগুরুরাও ক্রিকেট মার্গে বিচরণ করতে শুরু করেছেন।

কেন এই আকাশ-ছোঁয়া আগ্রহ?

টেস্ট ক্রিকেট আগেও ছিল। কিন্তু এত রমরমা ছিল না। ক্রিকেট এবং খেলাধুলায় যাঁরা উৎসাহী সাধারণত তাঁরাই টেস্ট দেখতে যেতেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগে থেকে টেস্ট ক্রিকেট সংস্কৃতি এবং সামাজিক কৌলীন্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। টেস্ট খেলা দেখতে না গেলে সামাজিক মর্যাদা কমে যাবে উঁচু মহলে এমন একটা মানসিকতাও দানা বেঁধে উঠেছে। তার ফলে বছর বছর যেমন বাড়ছে টিকিটের চাহিদা, তেমন বাড়ছে টিকিটের দামও। গত বছরও সিজন টিকিটের দাম ছিল ২০ টাকা, ৫৫ টাকা, ৭০ টাকা এবং ৯০ টাকা। এবার ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ২০ টাকার সিজন টিকিটের দাম অবশ্য বাড়ানো হয়নি। ২৫ টাকার টিকিটের দাম বেড়ে হয়েছে ৩০ টাকা, ৫৫ টাকার ৭০ টাকা এবং ৯০ টাকার ১২৫ টাকা। এ তো শুধু টিকিটের দাম, এর উপর দর্শকদের খাবার খরচ আছে, যাতায়াতের খরচ আছে। টেস্ট খেলা দেখা এখন বিলাসব্যসনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু একখানা টেস্ট টিকিট হাতে পাওয়া অনেকের কাছেই সৌভাগ্যের ব্যাপার, যেন সাত রাজার ধন। ইডেনের ৬৪ হাজার দর্শক আসনের স্টেডিয়ামও যেন ঠাঁইহীন ছোট তরীর মত।

শুধু কলকাতা কেন, বোম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ সর্বত্রই টেস্ট আসরে উপস্থিত থাকার জন্য মানুষের সীমাহীন আগ্রহ। অথচ ক্রিকেটের যারা স্রষ্টা, যারা ক্রিকেটকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে এবং যাদের মুখের কথা—যে ক্রিকেট খেলে না সে ইংরেজ নয়—তাদের দেশে কিন্তু টেস্ট খেলা দেখার এমন কাঙ্গালপনা নেই। কত দর্শক হয় ইংলন্ডের মাঠে? পাঁচ-সাত, বড় জোর দশ-বিশ হাজার। অস্ট্রেলিয়া বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলা হলে অবশ্য দর্শক সংখ্যা ত্রিশ-বত্রিশ পর্যন্ত ওঠে। তাও সব টেস্টে নয়।

ইংলন্ডের ঘরে ঘরে টেলিভিসনই কি এর কারণ? আংশিক কারণ হতে পারে। মূল কারণ নয়। আসলে টেস্ট ক্রিকেটকে ওরা বিশেষ অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রহণ করে না। আমাদের দেশে টেস্ট খেলা বিশেষ অনুষ্ঠান তো বটেই। এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে আভিজাত্য ও কৌলীন্যের মর্যাদা।

বেরীদার বিয়োগ ব্যথা

বেরী সর্বাধিকারীর (৬৬) আকস্মিক বিয়োগে ক্রীড়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান শূন্য হয়ে গেল। অধুনা অবশ্য তিনি লিখতেন কম, বেতার ভাষ্যকার হিসাবেও ধারাবিবরণী দেওয়া বন্ধ

হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক সময় বেরী সর্বাধিকারীর সারগর্ভ লেখা এবং বেতারে তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্রীড়ামোদীরা উৎসুক হয়ে থাকত। সর্ব খেলাতেই অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বিশেষ করে ক্রিকেটে ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। বলতে গেলে জীবনটাকে ক্রিকেটের সঙ্গেই বেঁধে ফেলেছিলেন। এই বাঙালী ক্রীড়া-সাংবাদিক পৃথিবীর আঙ্গুলে গোনা কতিপয় ক্রিকেট ক্রিটিকের অন্যতম যিনি ১৪০টি টেস্ট খেলার সমীক্ষা করেছেন বা রিপোর্ট লিখেছেন। ক্রীড়া-সাংবাদিক হিসাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর মত শ্রদ্ধা এবং প্রতিষ্ঠাও অর্জন করতে পারেননি কোন ভারতীয়। সবাই একডাকে চিনত বেরী সর্বাধিকারীকে, কেউ জানত না বিজয় সর্বাধিকারী তাঁর পোশাকী নাম।

বেরী সর্বাধিকারী

যে বংশে তাঁর জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা, ক্রীড়া, বিত্ত, বৈভব এবং মর্যাদায় সেই সর্বাধিকারী বংশের ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। ভারতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর অনেকখানি প্রভাব পড়েছিল বেরী সর্বাধিকারীর উপর। আবার মাতা-মহ ডাক্তার স্যার কেদারনাথ দাসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন শৈশবের শিক্ষা। অসাধারণ অমায়িক, ভদ্র এবং বন্ধুবৎ ছিলেন। কোনদিন উঁচু গলায় তাঁকে বলতে শুনিনি। মিষ্টি কথায় এবং হাসিতে সবাইকে জয় করে নিতেন। নিজের মুখেও শুনেছি ছোটবেলায় ক গরদ ছাড়া কোনদিন সুতির জা ট পরেননি। সাংবাদিক জীবনে নিজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। কিন্তু খরচও করেছেন দু-হাতে। জীবনভোর এই অপরিণামদর্শিতার দেনা মেটাতে শেষ পর্যন্ত জীবনটাই শেষ করে দিলেন। দীর্ঘ-দিন যাঁর সাহচর্য পেয়েছি, উপদেশ পেয়েছি, একসঙ্গে কাজ করেছি, একসঙ্গে খেলেছিও কয়েকটি ক্রিকেট ম্যাচ—তাঁর এইভাবে চলে যাওয়া বড় করুণ ও বেদনাময়।

'দেশ' বিনোদনে লেখার ব্যাপারে সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকখানি চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হয়। বোম্বাই থেকে কয়েকদিন আগে তিনি তাঁর শেষ চিঠিতে অসুস্থতা ও অসহায়তার যে আভাস দিয়েছিলেন তা পড়েও কম ব্যথা অনুভব করিনি। তারপর ক'দিনের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন, কঠিন পৃথিবীর উপর যেন অভিমান করে। দেশ বিনোদনে ইডেনে টেস্ট খেলার স্মৃতি' শিরোনামে তাঁর যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে এইটিই তাঁর শেষ বাংলা রচনা।

একলব্য

শীতের ক্রিকেট অতিথি (১০)

রজার টলচার্ড

এম সি সি দলের ১৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে যে ৫ জনের মাথায় আগে টেস্টের টুপি ওঠেনি তাঁদের দুজনের টেস্ট অভিষেক হয়ে গেল ভারতের রাজধানীতে। এ দুজন হচ্ছেন গ্রাহাম বার্লো ও জন লিভার। বাকি ৩ জনের মধ্যে দুই জিওফ—জিওফ কোপ এবং জিওফ মিলারও হয়তো ভারতেই স্টেট খেলার সুযোগ পেতে পারেন। কিন্তু রজার টলচার্ডের সম্ভাবনা নেই, অ্যালান নট অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে খেলতে অস্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত।

কারণ টলচার্ড এম সি সি দলের দুই নম্বর উইকেট কিপার। এক নম্বর অ্যালান নট।

ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল ১৯৭২-৭৩ সিরিজে। টলচার্ডকে একটি টেস্টও খেলানো হয়নি। তারপর এই চার
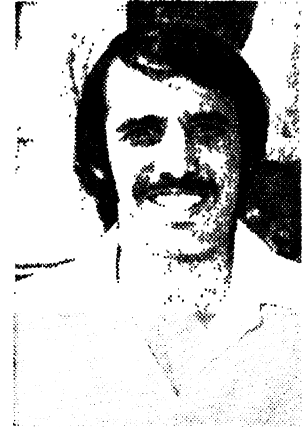
বছর ধরেও টেস্ট খেলার সুযোগ পাননি, নটই নির্বাচকদের মনে নট আউট আছেন বলে। তবু টলচার্ড যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে ভারত সফরে এসেছেন। এ দেশের মানুষ এবং ক্রিকেট সম্পর্কে ওর ধারণা উঁচু। এবার নিয়ে তিনবার এলেন। প্রথম এসেছিলেন ১৯৬৮ সালে মিকি স্টুয়ার্টের আন্তর্জাতিক দলের সঙ্গে।

৭২-৭৩-এ টলচার্ডকে ভারতে পাঠানো নিয়ে ইংলন্ডের নির্বাচকদের যথেষ্ট গবেষণা করতে হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল অ্যালান নটের পরে উইকেটকিপার হিসাবে কার যোগ্যতা বেশী? ডার্বিশায়ারের বব টেলরের না লিস্টার শায়ারের রজার টলচার্ডের? কেউ কেউ রায় দিলেন—বয়কট, ডলিভেরা, এডরিচ, লাকহার্স্ট প্রভৃতি নামী ব্যাটসম্যানরা যখন ভারতে যাচ্ছে না তখন ব্যাটিং শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজনে টলচার্ডকে পাঠানোই উচিত। কেননা টেলরের চেয়ে টলচার্ডের ব্যাটের হাত অনেক ভাল। স্পিনারদের মোকাবিলা করতেও বেশি দক্ষ। কেউ কেউ প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, উইকেট কিপিংয়ের যোগ্যতাই উইকেট কিপার নির্বাচনের প্রধান এবং প্রথম বিবেচ্য। একজন উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশটি রান দিতে পারে, কিন্তু একজন দক্ষ উইকেটকিপার বিপক্ষের একশো দেড়শো রান কমিয়ে দিতে পারে একজন নামী ব্যাটসম্যানকে স্টাম্প করে বা উইকেটের পেছনে ক্যাচ ধরে।

এবার কিন্তু টলচার্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সেটা কি তাঁর ভারত সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ফল? নাকি অন্য কারণ আছে? নিশ্চয়ই আছে! সেবার লিস্টারশায়ারের উইকেট কিপারকে মাত্র ৫টি আঞ্চলিক ম্যাচ খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ৫টি ম্যাচে ব্যাট করেছিলেন ছয় ইনিংসে। তার মধ্যে চারটি ইনিংসেই ছিলেন নট আউট। ফলে অ্যাভারেজও হয়েছিল দেখার মত। ১০১·৫০। টলচার্ড মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান। হাতে চমৎকার মার আছে। স্পিনের বিরুদ্ধে ব্যাট করার ওস্তাদীও।

৩০ বছর বয়সী রজার উইলিয়াম টলচার্ডের জন্ম টোরকোতে, ১৯৪৬ সালের ১৫ জুনে। দাদার সঙ্গে ডেভন-এর মাইনর কাউন্টিতে ক্রিকেট শুরু হয়েছিল। দাদা জেফ টলচার্ডও এখন লিস্টারশয়ার কাউন্টির খেলোয়াড়। ডেভন থেকে হ্যাম্পশায়ারে এবং হ্যাম্পশায়ার থেকে ১৯৬৫তে লিস্টারশায়ারে আসেন। উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রতিষ্ঠা ১৯৭০ থেকে। ওই মরসুমে দুটি সেঞ্চুরি সমেত করেন ৯৯৮ রান, যার গড় ছিল ৩০·২৪। উইকেটের পেছনে ক্যাচ ধরে ও স্টাম্প করে আউট করেছিলেন ৬১ জনকে। ১৯৭০ মরসুমেই রে ইলিংওয়ার্থের অনুপস্থিতিতে টলচার্ডের উপর কাউন্টি নেতৃত্বের ভার পড়েছিল। সে দায়িত্ব পালনেও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ফুটবলেও টলচার্ডের যথেষ্ট নাম ছিল। প্রথম ডিভিসনে খেলতেন লিস্টার সিটির হয়ে।

জিওফ কোপ

ইয়র্কশায়ার কাউন্টির অফ স্পিনার

জিওফ কোপ ভারত সফরে নির্বাচিত হয়েছেন—এই খবরে উৎফুল্ল হয়ে উঠে ঠিক করলেন আনন্দ সংবাদটি প্রিয়জনকে জানাতে হবে। কাকে আগে জানাবেন? প্রথমে সহধর্মিণীকে, পরে বাবাকে, তারপর জনি ওয়ার্ডলকে।

সাহেবদের কাছে সহধর্মিণীর স্থান বাবার উপরে। তাই বলে পিতার প্রতি সম্মান এবং ভালবাসার কোন ঘাটতি নেই। ভারতে আসার পর খবর পেলেন বাবা মারা গিয়েছেন। পুনে থেকে বিলেতে উড়ে গেলেন। আবার দিল্লিতে ফিরেও এলেন প্রথম টেস্ট শুরুর আগের দিন।

বিগত মরসুমে সবচেয়ে বেশী ৯৫টি উইকেট সংগ্রহকারী জিওফ কোপ বছর তিনেক আগে একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে-

ছিলেন ক্রিকেট জীবনে ইতি ঘটার আশংকায়। অথচ ক্রিকেটের উপর জিওফের অন্তহীন ভালবাসা। অতীত দিনের খ্যাতিকীর্তি স্পিনার জনি ওয়ার্ডল ওই দুঃসময়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তুমি ক্রিকেটকে ভালবাস, তোমার মধ্যে প্রতিভা রয়েছে তবু তুমি মুষড়ে পড়ছ কেন? কোপের বোলিং অ্যাকশান ছিল সন্দেহজনক। অনেক আম্পায়ারই মনে করতেন বল ছোঁড়া হচ্ছে। ওয়ার্ডল সেই ত্রুটি সংশোধন করে কোপকে পূর্ণ মর্যাদায় ফিরিয়ে এনেছেন।

কোপকে ভারতে পাঠাবার আগে এ বছরও পরীক্ষা করা হয়েছে বল করার মধ্যে বল ছোঁড়ার প্রবণতা আছে কিনা। ক্যামেরার প্রচুর ছবি তোলা হয়েছে বোলিং পদ্ধতির। না, ত্রুটি ধরা পড়েনি।

ধৈর্যশীল এবং আত্মবিশ্বাসী অফ স্পিনার কোপের লেংথ এবং নিশানা নিখুঁৎ। কাউন্টি ক্রিকেটের বহু খেলার ম্যাচ জয়ের নায়ক হয়ে উঠেছেন।

মুকুল

অরণ্যদেব ... লী ফক

সম্রাট জুনকরের কী হল? ভিখিরী সেজে পথে বেরুলেন?
দাঁড়াও পাতা উলটে দেখি।

'হুম, একদিন রাতে চুপিচুপি তিনি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন...'
এর নাম পাহারা? ফিরে এসে শাস্তি দেব!

সিংহাসন ছেড়ে সম্রাট জুনকর পথে বেরিয়েছেন...
সপ্তদশ শতাব্দীর কাহিনী...

মুকুট আর রাজপোশাক নেই বলে কেউ আমাকে চিনতে পারছেনা...
5/16

'কাজ করছেন সকলের সঙ্গে।
বাঃ, বেশ চটপট কাজ শিখেছ...
ধন্যবাদ!

'সকলের সঙ্গে হাসছেন..
আরেব্বাস, পিপে যে সাবাড় করে দিল!
এ আর এমন শক্ত কী!

'...সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খেলছেন...
আবার জিতেছ!
আমার ভাগ্য ভাল যে!

'রাত কাটাচ্ছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে...'
ঐ ব্যাটাকে কাজে লাগালে কেমন হয়?
বিপজ্জনক হবে না তো?
৫
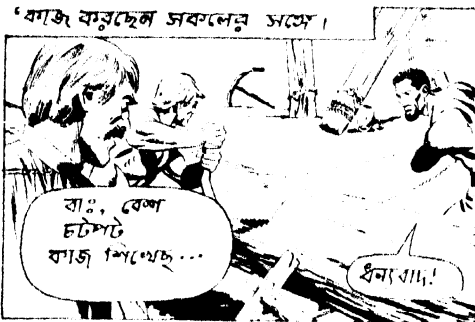
পণ্ডিত রবিশংকর

রঙ্গজগৎ

নেতাজী স্টেডিয়ামে রবিশংকর

শঙ্কর ফাউন্ডেশন ফর ক্রিয়েটিভ আর্টস আয়োজিত পন্ডিত রবিশঙ্করের সেতারের অনুষ্ঠান (১৮ই ডিসেম্বর) বিশাল নেতাজী স্টেডিয়ামে উচ্চাংগ সংগীতের প্রথম পদক্ষেপ। কাজেই কলকাতার শ্রোতাদের কাছে এটি ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এবং এই বারো হাজার শ্রোতা যে তিন ঘণ্টা ধরে শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চাংগ সংগীত শুনেছেন এটাও একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার।

সংগীত

কিন্তু সংগীত পরিবেশনা কি এই ঐতিহাসিক পরিবেশকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পেরেছিল? আমার তো তা মনে হয় না।

রবিশঙ্কর অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন পূরিয়া-কল্যাণ রাগে আলাপ ও জোড় দিয়ে। মোটে ১৬ মিনিটব্যাপী। এই আলাপে পান্ডিত্য (যেমন খরজ্ন প ঋ প স দিয়ে অন্তরার সা তে যাওয়ার কায়দা) ও সুসম্বন্ধতা ছিল, কিন্তু গভীরতা বা শ্রোতার অন্তরকে নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। মনে হলো পন্ডিতজী ইচ্ছে করেই বিস্তৃত আলাপের দিকে গেলেন না। কাজেই রাগের কাঠামোটুকুই ফুটে উঠলো, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো না। সেতারে আলাপের সম্রাট রবিশঙ্করের পক্ষে এটা অপ্রত্যাশিত। কি দাপট মারোয়া আলাপই না শুনেছিলাম পন্ডিতজীর হাতে গত মাসের এক ঘরোয়া বৈঠকে! জোড়ে ঝোঁক ছিল মধ্যলয়ে তান-তোড়া ও তারপরণের ওপর এবং এই অংশের ক্ষেত্রেও আগের মন্তব্য প্রযোজ্য।

রূপক তালে নিবদ্ধ গতে অবশ্য রবিশঙ্করের লয়কারির ওপর অতুলনীয় দখল ও যেখান-সেখান থেকে ইচ্ছেমতো তেহাই তোলার অসাধারণ ক্ষমতা বেশ কিছু মনোহর মুহূর্ত সৃষ্টি করে। তবলীয়া ওস্তাদ আল্লারাখাও রীতিমতো ভালো বাজিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, আল্লারাখাকে মাঝে মধ্যে পন্ডিতজীর মোহোড়া-চক্রধরের যথাযথ জবাব দিতে শোনা গেল- যা তিনি সাধারণত করেন না। তবুও এই গৎকারী পন্ডিতজীর শ্রেষ্ঠ বাদনের তুলনায় ম্লান লেগেছে।

এরপরে রবিশঙ্কর বাজান খাম্বাজ রাগে বিলম্বিত তিন তাল গৎ। এই গতের বিস্তারপর্ব আমাকে সত্যই হতাশ করেছে। রবিশঙ্করকে এক কথায় খাম্বাজসিদ্ধ বলা যায়। বহু অনুষ্ঠানে

তাঁর হাতে খাম্বাজ এমন রূপ ধারণ করেছে যার ধারে কাছে আর কারুর যাওয়ার কথা ভবাই অসম্ভব। সেই রবিশংকর এমন খাপছাড়া, বেপরোয়া ও অসমত্যপূর্ণে খাম্বাজ পেশ করলেন যে প্রায়ই মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছি না তো? ইনি সত্যিই রবিশংকর? আর সব কিছু ছেড়ে দিলেও কোমল নিখাদ বর্জিত ন ধ প অবরোহণ কি খাম্বাজে একান্তই প্রযোজ্য? ঠুমরী অঙ্গে না হয় খাম্বাজ নিয়ে যা খুশী তাই করা হয়, কিন্তু রবিশংকর তো ঠুমরী ঢঙে বাজাচ্ছিলেন না। ছন্দের কাজ, বোলকারি ও তানকারি বিস্তারের চেয়ে খানিকটা ভালো হয়েছিল কিন্তু রবিশংকরের পক্ষে যথেষ্ট ভালো হয় নি। আল্লারাখা অবশ্য সত্যিই ভালো সঙ্গত করেছিলেন। পরের নিবেদন দ্রুত একতাল গতের ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। আভোগী রাগে ছোট্ট আওচার ও ঝাঁপতাল গৎ তুলনায় অনেক ভালো লেগেছে। শেষের মিশ্র গারা ধুনটি তেমন ভালো হয় নি।

অনুষ্ঠানের আরম্ভে ভূপকল্যাণ রাগে সানাই পরিবেশন করেন আলি আহমেদ হোসেন এবং উদয়শংকর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সদস্যারা রবিশংকরকে বরণ করেন।

নীলাক্ষ গুপ্ত

কলিকাতায় ক্লিফ রিচার্ড

এই কয়েকদিন আগে কলামন্দিরে গান গাইলেন ক্লিফ রিচার্ড। হ্যাঁ, সেই জগদ্বিখ্যাত ক্লিফ রিচার্ড, পঞ্চাশ দশকের শেষাশেষি এবং ষাটের দশকের প্রথম পর্বে যাঁর নাম ইংরেজি গানের জগতে মুখে মুখে ঘুরত। যে নামের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরও কয়েকটা নাম শুনে থাকতাম —জিম রীভজ, ফ্রাংক সিনাত্রা, এলভিস প্রেসলি। বেশ কিছু গাইয়ের অন্তর্ধান, বীটলদের আবির্ভাবের পরে পরেই ঘটেছে, আমরা জানি। সেই দলেই ক্লিফ রিচার্ড। রক-এন-রোলের ধারায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বরাবরের চেষ্টা ওঁর। সে কথা গাইবার ফাঁকে ফাঁকে বললেন ক্লিফ। ওঁর সংগীতজীবনের ধ্রুবতারাও তাই রকের প্রাণ পুরুষ এলভিস। "কিন্তু আমার জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে সাড়ে এগারো বছর আগে, যখন এক দ্বিধাদ্বন্দ্ব জর্জরিত রাতে একটা সূক্ষ্ম আনন্দের মত আমার জীবনে প্রবেশ করলেন একজন। যীশু।"

ক্লিফ সেই থেকে ওঁর নিজস্ব ধারার সংগীতের সঙ্গে গাইতে শুরু করেছেন অধ্যাত্মবাদের গান, স্পিরিচুয়ালস। সেদিনের অনুষ্ঠানের অনেকখানি তাই জুড়ে ছিল স্পিরিচুয়ালস যার আঙ্গিক কখন ফোক, কখন রক, কখন পপ ...।

কলামন্দিরে ক্লিফ রিচার্ড

সেই অদ্বিতীয়া মাহালিয়া জ্যাকসনের স্টাইলে (আসলে মাহালিয়া নিজেই একটা গোটা স্টাইল কিংবা সমস্ত স্টাইলের ঊর্ধ্বে একটা স্টাইলহীন ধারা) প্রভাবিত। এই অনুষ্ঠানের অর্থও উৎসর্গীকৃত, ক্যালকাটা সামারিটান্স সংস্থার উদ্দেশে।

হয়ত মাহালিয়া জ্যাকসনের নাম উল্লেখ করে একটু ভুলই করলাম। কারণ, ও'র ধারায় গান গাইবার মত কণ্ঠসম্পদ ক্লিফের নেই। উপরন্তু সেদিন ক্লিফের গলা অনেক ধরা-ধরা শোনাল, আগের সেই চটুল রসের প্রবাহও অনেক ধীর সয়ে বাঁধা। সম্ভবত ভক্তিমূলক গান গাওয়ার জন্যেই এই পরিবর্তন একটা প্রস্তুতি বিশেষ। স্পষ্ট বুঝলাম, সংগীত-জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণে উপনীত ক্লিফ, যে সন্ধিক্ষণ থেকেই শুরু হয় একজন জনপ্রিয় শিল্পীর মহৎ জীবনের প্রতি অভিযান। শুনতে শুনতে কখন কখন তাই মুগ্ধ হয়েছি। না হয়ে পারিনি।

ক্লিফ আসর কিন্তু শুরু করেছিলেন বিগত দিনের সেইসব অবিস্মরণীয় গান-গুলি দিয়ে। প্রথমে "ওয়াকিং-টকিং লিভিং ডল," তারপর ও'র নিজের অভিনীত ছবি "সামার হলিডে"র "উই আর গোয়িং অন এ সামার হলিডে", এবং আরও পরে 'দি ইয়ং ওয়ানজ" ছবি থেকে "উই আর দি ইয়ং ওয়ানজ"। এরই এক ফাঁকে ক্লিফ গাইলেন "কনগ্র্যাচুলেসন্স।" পঞ্চাশের শেষে কিংবা ষাটের প্রথমে যাঁরা ছেলেমানুষ ছিলেন তাঁদের জীবনের গান এইগুলি। হাল্কা চালে, প্রচুর ইনোভেসন্স করে ক্লিফ জমিয়ে দিয়েছিলেন। দেখলাম রিদম, অর্থাৎ ছন্দের ব্যাপারে এখনও ক্লিফ সেই অসামান্য ক্লিফ। যে কোন সুরের মধ্যে অভাবনীয় ছন্দের ঝুঁকি উনি এখনও নিতে পারেন। যে কোন গানকে পরিবেষণার সৌকর্যে মুগ্ধকর করে তুলতে পারেন।

কিন্তু নতুন ক্লিফ রিচার্ডকে পেলাম স্পিরিচুয়ালসে। কখন বন্ধু ল্যারি নর্মানের কথায় গাইলেন "সাম সেড হি ওয়াজ দি সন অফ গড", কখন নিজের কথায় "যীশাস ইজ মাই কাইণ্ড অফ পিপল" বা "লাভ অন"। সমস্ত গান-গুলির মধ্যে একটা পল্লী সংগীতের বিষন্নতা, একটা প্রার্থনা, মানুষের নির্জীব অস্তিত্ব থেকে একটা সম্পূর্ণতার দিকে এগোবার প্রচেষ্টা। এ গানে হয়ত মাহালিয়ার গানের নিশ্ছিদ্র বৈরাগ্য কিংবা অসীম করুণা নেই, কিন্তু এতে সাধারণ, বিহ্বল মানুষের প্রাণের আর্তি আছে। অনেক খোলামেলা এ গানের চলন, কথায় কিংবা সুরে। এবং 'লাভ অন' গাইবার আগে ক্লিফের যে বক্তব্য, 'লাভ' কথাটা বহু-ব্যবহারে তার অর্থ হারিয়ে ফেলেছে—সেটা জেনে নিয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে গায়ক ঐ রিক্ত শব্দটিতে কিছু দ্যোতনা, দুটো-একটা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেন ও'র স্পিরিচুয়ালস নিবেদনে। যেভাবে আমাদের ঠুংরী-ভজন-গীতি একই শব্দ বারংবার ফিরে আসে নতুন, নতুনতর রূপে। এবং সেটা পারেন বলেই ক্লিফ রিচার্ড ক্লিফ রিচার্ড।

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

সুরের গুরু

রবীন্দ্রসংগীতগুরু শৈলজারঞ্জন মজুম-দারকে গত ১১ ডিসেম্বর 'গান্ধার' প্রতিষ্ঠান তাঁদের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন ডঃ রমা চৌধুরী। সংবর্ধনা-ভাষণ দিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি একটি বিষাদের কথা তুলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের গান আর রচিত হবে না: সেই সঙ্গে গভীরতর আশঙ্কার কথা বললেন যে, ৯১ সালে কপিরাইটের কবলমুক্ত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের গানের কি অবস্থা হবে! তবু তো এই সময়ে আমরা পেয়েছি এমন বেশ কয়েকজনকে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছেই গান শিখেছেন: এই বড় মানি। রবীন্দ্র-নাথের গানের আলোচনায় সন্তোষকুমার তার স্বভাবসুন্দর উপমা দিতে পারেন : হাতের পাঁচটি আঙুলই আমার কাছে অনিবার্য তবু তো কথা বলার সময় একটির, শুধু তর্জনীর ব্যবহার করি। রবীন্দ্রনাথের গানও তাঁর কাছে তেমনি ছিল; সেই বিচিত্রকীর্তির প্রকাশ বহুধা, অথচ কবির দাবি অনুসারে বলতে গেলে—গান যেন তাঁর তর্জনীসংকেত। সন্তোষ-কুমার অত্যন্ত সংগতভাবে একটি প্রসঙ্গ তুললেন—এটি তাঁর প্রিয় আর্ত প্রশ্ন বরাবর—রবীন্দ্রনাথের সুর আর স্বরলিপি নিয়ে কত কথা হয় কিন্তু তাঁর গানের কথা বা ভাব নিয়ে কতটুকু আলোচনা হয়েছে? অভ্যর্থনার প্রতিভাষণে শৈলজা-রঞ্জন কবির স্থির দীপ্ত দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেন। প্রথমেই বললেন, আমার জীবনে দুটি অধ্যায়—একটি রসায়নশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার, আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে আমার দ্বিতীয় জন্ম। কবিই তুলে দিলেন গানকে; তাঁর কাছেই শিখেছি গান। শৈলজারঞ্জন বললেন যে, তাঁর সঙ্গে একটা ভাবের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন, আমাকে, আমার গানকে ছড়িয়ে দাও। গান তো আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু শিক্ষক দুর্লভ। সেই শিক্ষকতা করতে গিয়েই নিজের গানের দিকটা বাদ পড়ে গেল। আজ বেঁচে থাকলে বলতে পারতাম তাঁর গান প্রত্যেক ঘরে ছড়িয়ে গেছে। তা তিনি তো নেই তবু তাঁর সৃষ্টিতে তিনি রয়ে গেছেন।

শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সম্বর্ধনা

ভাষণ বলার পরে শৈলজারঞ্জনকে অর্ঘ্য দিলেন দীপ্তি দত্ত। তারপর, বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস নরোত্তমদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী পর্যন্ত একটি রাধাকৃষ্ণগাথা উপস্থিত করা হল। পরিকল্পনা সাধু কিন্তু তালিম বা যথার্থ গীত ও নৃত্য শিল্পীর অভাবে কোথাও দাঁড়াল না। নাট্যের গান বা নাচে যে এক্সপ্রেশনের আকাঙ্ক্ষা থাকে সেটা পূর্ণ করা হয়নি। তবু একক কণ্ঠের শিল্পীদের মধ্যে বুলবুল ভট্টাচার্যর 'বাজাও রে মোহন' গানটি কিছু শ্রুতিগ্রাহী।

পরবর্তী অনুষ্ঠান 'মহুয়া' নৃত্যনাট্য বরং অনেক পরিণত প্রযোজনা ছিল। ভাবতে অবাক লাগে, দুটোরই পরিচালক ছিলেন জয়ন্ত ব্যানার্জি আর নৃত্যে সুনীত বসু: অথচ দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছিল, কারণ গানে এবং নৃত্যে শক্তিমান স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠে-ছিলেন 'মহুয়া'র শিল্পীরা।

নৃত্যনাট্যের অগস্ত্য-যাত্রা

আগেকার কালে বাংলা থিয়েটারে শোনা যেত, পরীরা কাপকলে ঝুলে উড়তেন, ঘোড়া চলে যেত মঞ্চের উপর দিয়ে। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। আকাদেমি-প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় কলামন্দিরের 'অগস্ত্য-

লোপামুদ্রা নৃত্যনাট্যে দুই বাহুতে গাছের পাতা বেঁধে রমণীরা বৃক্ষের দৃশ্য দেখিয়েছেন, দুটি বালিকা সাপের খোলস পরে বুক ঘষটে মঞ্চে দাপাদাপি করেছেন। অর্থাৎ ভারতীয় কলায় নৃত্য এখনও আঁকাবাঁকা।

অথচ কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা যথেষ্ট ছিল। কিঞ্চিৎ সাসপেন্সও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু নৃত্যাংশ অনেক অংশে

১৯৭৬ সালে চেতনার অভিনয় হয়েছে মোট ৯৯ বার।

'মারীচ সংবাদ' ৬৫ বার, 'রামযাত্রা' ৩৩ বার এবং 'স্পার্টাকাস' অভিনীত হয়েছে ১ বার।

একাডেমি ও রঙ্গনায় নিয়মিত অভিনয় ছাড়াও কলকাতার মঞ্চগুলির মধ্যে কলামন্দির, রবীন্দ্রসদন, মুক্তঅঙ্গন, রবীন্দ্র সরোবর, স্টার, বিশ্বরূপা, ত্যাগরাজ, মহাজাতি সদন এবং সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে চেতনা অভিনয় করেছে।

কলকাতা ও কলকাতার কাছাকাছি চেতলা, তালতলা, বেলেঘাটা, যাদবপুর, দমদম, ও পূর্ব পুটিয়ারীতে অভিনয় করেছে চেতনা। এছাড়া কাছের ও দূরের মধ্যে বসিরহাট, কোন্নগর, ব্যাণ্ডেল, হুগলী, হাওড়া, বাগনান, খড়দহ, ইছাপুর সালকিয়া, নিউ ব্যারাকপুর, বেলঘরিয়া, চাঁপাডাঙা, কাঁচরাপাড়া, হলদিয়া, বর্ধমান, দুর্গাপুর, বহরমপুর ও কুলটিতেও অভিনয় করেছে চেতনা। মে মাসে বোম্বাই-এর 'রবীন্দ্র নাট্য-মন্দির'-এ চেতনার 'মারীচ সংবাদ' ও 'রামযাত্রা'র অভিনয় হয়েছে।

চেতনার আগামী প্রযোজনা ব্রেখটের একাঙ্ক নাটকের অনুবাদ 'উক্তি'। লু শুনে অনুপ্রাণিত পূর্ণাঙ্গ নাটক 'জগন্নাথ'-এর জোর প্রস্তুতি চলছে।

থিয়েটার কমিউন 'দানসাগর' নামিয়েছে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ নামিয়েছে 'নরক গুলজার'।

পি এল টি-র 'এবার রাজার পালা' নামলো বলে। আরও সব ছোট বড় দল নতুন নাটক নামাচ্ছে, নামাবে। নতুন নতুন দলও এগিয়ে আসছে। মফস্বলের দলগুলিও পিছিয়ে নেই। ১৯৭৭ সাল গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনকে নতুন প্রেরণা যোগাক। গ্রুপ থিয়েটারের ঐক্য সুদৃঢ় হোক।

ছিল অবান্তর, দীর্ঘায়ত এবং কমপোজিশন না ধ্রুপদী, না লোকায়ত। অভিনেত্রীরা, আমাদের দুর্ভাগ্য, অধিকাংশই ছিলেন স্থূলদেহী; ভাগ্যক্রমে আবার লোপামুদ্রা (নমিতা চ্যাটার্জি) ছিলেন ক্ষীণমধ্যা। আর, এমনতর দুর্বল কোরিওগ্রাফি সচরাচর এখন চোখে পড়ে না। এসব ত্রুটি আরও ধরা পড়ল কারণ আয়োজনে কার্পণ্য ছিল না; পশ্চাৎপটে আলোছায়ার বিচিত্র দৃশ্য ছিল, বসন্ত-সমাগমে উচ্চধ্বনিবহতে পাখির অবিশ্রান্ত ডাক ছিল, প্রয়োজনে সাপের ক্রুর নিশ্বাসও শোনা গিয়েছিল। এত পরিশ্রম না করে যদি নৃত্যশৈলীতে আর একটু মনোযোগ দেওয়া যেত!

অগস্ত্যের (পরিচালক গোপাল রায়) ব্যক্তিত্ব আছে কিন্তু তাঁর মুদ্রাভঙ্গী অন্তত ঋষিসুলভ নয়। শম্ভু ভট্টাচার্য একাধিক ভূমিকায় নেমেছেন তবে তাঁর বিস্ফারিত দৃষ্টি ছাড়া নৃত্যাভিনয়ে আর কিছুই উপহার দেবার নেই। ব্রাহ্মণের ভূমিকায় একটি পরিপূর্ণ ভাঁড় তিনি। একমাত্র ইল্বলের (শিবশঙ্করণ) ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় দৃষ্টিনন্দন; আশংকা করি, অভিনেতার নিজস্ব সৃষ্টি সেটাই। সংগীতানুষঙ্গ অত্যন্ত একঘেয়ে।

মাঝে মাঝে সুবোধ ঘোষের 'অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা' রচনা থেকে অংশবিশেষ পাঠ করা হয়েছে। দুটি ঘটনাংশের মাঝখানে সেতু রচনার জনাই প্রয়োজন ছিল তার। কালো মেঘে সেটুকু রোপ্যরেখা। সেই ভাষাতে আমরা শুনেছিলাম সংগীতের স্বর, নূপুরের নিক্বণ। **অপ্রতিম বসু**

প্রসঙ্গ: চলচ্চিত্র

এই মুহূর্তে আমরা যদি আমাদের হাতের চড়া রঙের তাসগুলি সব নামিয়ে রাখি, আলগা করি দি কলার আর বুকের বোতাম, হাত-পা ছড়ানো আরামে একটু সহজ হতে পারি এবং সেই সাবলীল অবসরে গোদার-ত্রুফো-বার্গম্যান-পাসোলিনি বর্জিত উচ্চারণে কথা বলতে যদি কুঁচকে না যাই, তাহলে আমাদের মধ্যে অনেকেই এ-কথাটা অন্তত ঢোক গিলেও স্বীকার করবেন যে হলিউড থেকে সাম্প্রতিককালে যে-সব 'রূপকথা' বিচিত্র স্তরের বাঙালীকে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ছুঁয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জেমস বণ্ড বিষয়ক সাতটি ছবি যা আমরা ১৯৬২ থেকে ১৯৭৬-এর মধ্যে কলকাতায় দেখেছি। অথচ কি কফি-হাউসে, কি পত্রপত্রিকায়—কোনো জায়গাতেই কিন্তু আমরা এ-ছবিগুলি নিয়ে এতটুকুও ভাবনা খরচ করি না, কেননা সত্যি কথা বলতে কি এদেশ ব্যাপারে কোথায় যেন প্রায় সব বুদ্ধিজীবী বাঙালীরই একটা ইনটেলেকচুয়াল খটকা আছে। এ-ছবিগুলি দেখতে হয়তো আমাদের ভালো লাগে, কিন্তু ভালোটা যে ঠিক কি-কি কারণে লাগে সেটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করাও যা, আর কোনো অধ্যাপকের পক্ষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঘুগনি খাওয়াও তাই—প্রায় সমপর্যায়ের স্ল্যাকরিলেজ। এই কারণেই বাংলায় উঁচুভুরু সিনেমা পত্রিকাগুলোর কথা ছেড়েই দিন, এমন কি কমার্শিয়াল পত্রিকাগুলোতেও আমি এ পর্যন্ত জেমস বণ্ড-এর ছবিগুলো নিয়ে কোনো ভাবনাচিন্তা, আলোচনা দেখিনি। আপনারা দেখেছেন? অবিশ্যি যে-যে কারণে আমাদের চিত্রসমালোচকেরা এ-ছবিগুলির প্রসঙ্গ একেবারে এড়িয়ে গেছেন তাদের দু-একটিকে ছিপে গাঁথা যেতে পারে। যেমন, প্রথম কারণ, এ-সব ছবিতে সোসিও-পলিটিকাল কমিটমেনট বলতে কিছু নেই। দ্বিতীয় কারণ, কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ছবিগুলি রিঅ্যাকশনারি এবং বর্জনীয়। তৃতীয় কারণ, এদের আবেদন যেহেতু মূলত ইনটেলেকচুয়াল বা এসথেটিক নয়, 'গোল্ড ফিংগার' বা 'ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস'-এর মতো ছবি ভালো লাগলে নিঃসন্দেহে নিম্নমানের শিল্প-চেতনার পরিচয় দেয়া হয়। এবার দেখা যাক এই তিনটি মূল কারণের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগী তর্ককে খাড়া করা যায় কিনা। প্রথমত, আধুনিক অর্থে কমিটমেনট ছাড়াও একেবারে প্রথম শ্রেণীর চলচ্চিত্র সম্ভব। তা না হলে আমাদের প্রায় সমগ্র হলিউডকে অস্বীকার করতে হয়! হিচকক-এর ছবিগুলির মূল্যায়নে রাজনৈতিক সামাজিক কমিটমেনট-এর প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। অথচ দি বার্ডস বা সাইকোর মতো ছবি যে খুব উঁচু-পর্যায়ের শিল্প সে-কথাটি তো সহজে উড়িয়ে দেয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দে... জেমস বণ্ড-এর জীবনবোধকে রিঅ্যাকশনারি মনে হতে পারে সেটিই যে একমাত্র নির্ভুল দৃষ্টিকোণ এবং এক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রযোজ্য সে বিষয়েই বা এতোটা নিশ্চিত হব কি করে? তাছাড়া, ফ্লেমিং-সৃষ্ট বণ্ড এক বিশেষ ধরনের জীবনবোধের, রীতিনীতির, ভাবভঙ্গির ক্যারিকেচার মাত্র। বণ্ডকে নিয়ে যে-কটি ছবি হয়েছে সেখানেও ফ্লেমিং-এর ঐ হালকা ক্যারিকেচার-এর মেজাজটা কিন্তু আছেই। সুতরাং বণ্ডকে রিঅ্যাকশনারি বলে বর্জন করাও ঠিক ততটাই হাস্যকর যতটা হাস্যকর হবে ওডহাউস-এর চরিত্রগুলিকে বুর্জোয়া বলে নির্বাসন দেয়া। তৃতীয়ত, গোল্ডফিংগার বা ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস-এর মতো ছবির আবেদন কতদূর ইনটেলেকচুয়াল কিংবা এসথেটিক সে বিচার ছবিগুলির বিশুদ্ধ মূল্যায়নে খুব যে জরুরী তা মনে হয় না। সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা হলো ছবিগুলি

সন কনারি

সিনেম্যাটিক কি না? এ-বিষয়ে জন রসন্যান-এর বক্তব্য উল্লেখ্য : "ওয়ান অফ দি মেন রিজিনস হোয়াই দি বণ্ড ফিলমস হ্যাভ এনজয়েড এ ওয়ার্লড-ওয়াইড পপ্যুলারিটি ইজ দ্যাট দে আর পিওর সিনেমা ইন দি সেনস দ্যাট দে আর হাইলি ভিশ্যুয়াল ফিলমস।"

আমি জানি এ-তর্কের জন্যে আরো ব্যাপ্তি কিংবা খনন প্রয়োজন। কিন্তু এই স্বল্প-পরিসরে সেই লোভনীয় বিলাসিতা থেকে সরে এসে সরাসরি ছবিগুলির প্রসঙ্গে চলে আসছি। আমরা জানি, যে সাতটি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে জেমস বণ্ড এ যুগের সবচেয়ে প্রবল রূপকথার নায়ক তারা হল : ডক্টর নো, ফ্রম রাশা উইথ লাভ, গোল্ডফিংগার, থানডারবল, ইউ ওনলি লিভ টোয়াইস, অন হার ম্যাজেসটিস সিকরেট সারভিস, এবং ডায়মনডস ফরএভার। একমাত্র "অন হার ম্যাজেসটিস সিকরেট সারভিস'-এ ছাড়া—যেখানে জেমস বণ্ড-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জর্জ-লেজেনবি—আর সব কটি ছবিতে বণ্ড চরিত্রে আছেন সন কনারি। যেমন শেষ পর্যন্ত টারজান বলতে আমরা বুঝি জানি ওয়েজমুলারকে, তেমনি জেমস বণ্ড বলতে সন কনারি ছাড়া অন্য কাউকে ভাবা যায় না। সন কনারি বণ্ড-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে আর রাজি নন বলে ১৯৭১-এর ডায়মণ্ডস ফরএভার-এর ঘরে নতুন কোনো বিশ্বাস্য যুগ এখনো খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। ভাবতে তাই মজা লাগে যে এক সময়ে স্বয়ং ফ্লেমিং ডেভিড নিভেনকে বণ্ড চরিত্রে অভিনয়ের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী ভেবেছিলেন! আর সেই সঙ্গে হিচকককে তাঁর মনে হয়েছিলো বণ্ডকে নিয়ে সম্ভাব্য ছবিগুলির সবচেয়ে উপযোগী পরিচালক। ফ্লেমিং আর হিচকক-এর ঐতিহাসিক সংযোগ কিন্তু কোনোদিনই ঘটেনি। কিন্তু সেই অলৌকিক সংযোগে কি ঘটতে পারতো তা আজও যে কোনো চলচ্চিত্র-প্রেমিকের দিবাস্বপ্নের অফুরন্ত খোরাক। কিন্তু হিচকক-ফ্লেমিং সহযোগিতার মহৎ সম্ভাবনার বাইরেও বণ্ড-কে নিয়ে তৈরি ছবিগুলিতে চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে এমনি সার্থক পরীক্ষানিরীক্ষা ও শিল্প-সৃষ্টি চোখে পড়ে যে আমাদের বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। যেমন, ১৯৬২-তে তৈরি ডক্টর নো ছবিতে আমরা দ্রুত-কাটিং (দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চলে যাওয়া) ও বিরামহীন গতির মধ্যে টিভিতে বিজ্ঞাপন ছবির বিশেষ ভঙ্গিটিকে নতুনভাবে কাজে লাগতে দেখি। ডক্টর নোর আগে এ জিনিস হলিউড-এর ছবিতে বড় একটা দেখা যায় নি। 'ডক্টর নোর' টাইটেল শটগুলিও রঙ ও সিল্যুয়েট-এর ব্যবহারে চমকপ্রদ। প্রথম দিকে রঙের ব্যবহার সুররিয়েলিসটিক। ঠিক তেমনি চমকপ্রদ গোল্ডফিংগার ছবিতে ইলেকট্রিক কারেন্টে একটি মৃত্যুদৃশ্য। কিন্তু জেমস বণ্ড ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বণ্ড-এর ভূমিকায় সন কনারি। ভালো লাগে তাঁর চোখে অবিরাম কৌতূহলের ঝিলিক। সম্ভাব্য মৃত্যু থেকে মাত্র ছ-ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে তিনি চুমু খেতে পারেন তাঁর দু-মিনিট আগের পরিচিতা কোনো বান্ধবীকে। শত্রুপুরী থেকে বেরিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসতে পারেন অর্ধভুক্ত আপেলটিকে শেষ করার জন্যে। প্রেমিকার চোখের তারায় পিছন থেকে ওঁতপাতা শত্রুর প্রতিবিম্ব দেখে গুলি ছুঁড়তে পারেন। কিম্বা একই সঙ্গে পেয়ে যান স্বর্ণমুদ্রা, পরীর প্রণয় এবং শত্রুর বশ্যতা। অর্থাৎ জেমস বণ্ড-এর জীবনে যা যা ঘটে তা আমেরিকান জীবনের ক্যারিকেচার এবং একান্ত নিরীহ বাঙালীর পক্ষে স্বপ্নবিলাস। সুতরাং মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে জেমস বণ্ড-এর কাহিনী ও ছবিগুলি স্যাটায়ার, অথচ বাঙালীর কাছে সেগুলির আবেদন রূপকথার। ঘটনাটিকে অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। বরঞ্চ মেনে নিলে প্রসঙ্গটির অনেক সম্ভাবনা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। এবং এক সুদীর্ঘ আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে নিঃসন্দেহে।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র

আরম্ভ/প্রেরণা পিকচার্স

সেক্স নেই, শস্তা বা অশালীন ভাঁড়ামী নেই, মারদাঙ্গার লেশও নেই, অথচ হিন্দী ছবি—এমনি একটি অপ্রত্যাশিত ব্যতিক্রম,

আরম্ভ/রমা ভিজ

'আরম্ভ'। কলকাতায় তোলা ইস্ট-ম্যানকালারে রঙীন ছবিখানির ক্ষেত্রে প্রযোজক (এম এল দাগা ও কমল গান্ধী) আর এক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, একমাত্র রাকেশ পাণ্ডে এবং বিপিন গুপ্ত ছাড়া কাহিনীর সবকটি চরিত্রে আনকোরা নতুনদের অবতরণ ঘটিয়ে।

কমল গান্ধী রচিত এর কাহিনীটি প্রতিভা নামক একটি মেয়েকে নিয়ে যার জীবনের আদর্শ হল মহিলাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তার জীবনে বারবার ট্রাজেডি ঘনিয়ে আসে। কলেজের সহপাঠি সুনীলকে ভালবেসেই সে বিয়ে করে এবং তাদের একটি পুত্র সন্তানও জন্মায়। কিন্তু সুনীল ব্যবসার প্রয়োজনে জামসেদপুরে যাবার পর দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু সংবাদ আসে। দাদা অজয়ের বন্ধু রাজেন্দ্র প্রতিভার জীবনকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করে এবং পরিশেষে প্রতিভাকে পুনর্বিবাহে সম্মত করে। কিন্তু এবারেও এক দুর্ঘটনায় রাজেন্দ্র পঙ্গু হয়ে যায়। প্রতিভা এ জীবন মানিয়ে চলছিল কিন্তু আকস্মিকভাবে সুনীলের পুনরাবির্ভাব এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্যার মানসিক নিপীড়ন থেকে প্রতিভাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রাজেন্দ্র আত্মহত্যা করে। তার আগেই সুনীল প্রতিভার বর্তমান জীবনধারা অক্ষুণ্ণ রাখায় কোন ব্যাঘাত না ঘটানোর জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়। স্বাধীনচেতা প্রতিভার জীবন সংগ্রামের এই হল আরম্ভ।

ঘটনার পরিকল্পনায় কিছুটা কষ্ট-কল্পনার আভাস থাকলেও পরিচালক (জ্ঞান কুমার) বিন্যাসে ভরা বাংলা ছবির মেজাজ এনে দিয়েছেন। প্রতিভার প্রথম প্রেমিকের চরিত্রে কল্যাণ চ্যাটার্জী, প্রথম ও দ্বিতীয় স্বামীর চরিত্রে রাকেশ পাণ্ডে ও কিশোর কাপুরের অভিনয় চরিত্রানুগ। প্রতিভার চরিত্রে নবাগতা রমা ভিজ সর্বক্ষণ দৃষ্টি ধরে রাখেন। কাহিনীর

পরিবেশনকে [illegible] করে ফুটিয়ে তুলতে আনন্দ শংকরের সংগীত পরিচালনা সহায়ক হয়েছে। মুকেশ ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের গানও ছবির আকর্ষণ।

সৌভিক

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি

সোমবার, ১৩ই ডিসেম্বর, রবীন্দ্র সদনে ভরতনাট্যম এবং কুচিপুড়ি পেশ করলেন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি। সিলভারস্টার সংস্থার আয়োজনে, শ্যামশ্রী ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে এই নাচ বিশেষ বিশেষ জায়গায়, বিশেষ বিশেষ কারণে আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভরতনাট্যমের একই অঙ্গে কত রূপ তা ভেবেও অবাক বোধ করলাম।

যামিনী কৃষ্ণমূর্তি

যামিনীর তৈরী কাজ দেখে দেখেও ভারি অবাক মেনেছি।

সেদিনের নাচের প্রথম পর্বে ছিল ভরতনাট্যম, যার প্রথম পর্বে যামিনীকে ছন্দ-লয়ের গড়ন দেখাতেই ব্যস্ত দেখলাম। ভয় হচ্ছিল বুঝি বা প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতির দুরারোগ্য ব্যাধি ও'কে ধরে বসেছে! তাছাড়া আগের সে যামিনীকে শরীরের দিকেও কিছুটা স্থূল বোধ হচ্ছিল। রস-চেতনা-ঈশ্বর আহ্বায়ক নাচে তাই খালি খালি রইল মনটা। প্রথম দিকেই ঐ দ্রুত লয়ের চটক, বন্দীশের বাহার এবং অভিনয়ের চেয়ে পেশকারির ঢঙই মন কেড়ে নিচ্ছিল বেশি। আসল যামিনীকে তাই পেলাম খাম্বাজে বহমান, রূপক তালে ছন্দিত বর্ণম নিবেদনে। তিরুকয়ুর স্থল পুরাণের ভিত্তিতে গড়া এই বর্ণম যামিনীর যে কোন সময়ের শ্রেষ্ঠ নাচের সঙ্গে তুলনীয়। একটা চমৎকার, গম্ভীর, পরিণত হিসেব সমস্ত নাচটায় উপস্থিত ছিল। বড় আকারের এই নাচে সুব্বারামা দীক্ষিতারের পদবর্ণকে যে ডিটেলে যামিনী বর্ণে বর্ণে মেলে ধরেছেন তা বর্ণনার বাইরে। বর্ণের সূক্ষ্ম চরিত্র এবং তাদের যৌথ সৌন্দর্য দুই-ই এই নাচে ভাস্বর ছিল। এই নাচের সময় গায়কের কণ্ঠমাধুর্য এবং গায়কভঙ্গী আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

বর্ণমে পৌঁছানোর আগে কিন্তু যামিনী ও'র অভিনয়ের মেজাজ ধরে নিয়েছিলেন ও'র নবরসের পরিবেষণায়। প্রত্যেকটি রসের চিকণতা এবং বিশেষত্ব দর্শককে মুগ্ধ করেছিল। যামিনী যখন বিস্ময়বোধের ভাবরস ফুটিয়ে তুলছিলেন তখন আমাদেরও বিস্ময় বাধ মানেনি।

বিরতির পর কুচিপুড়ির অঙ্গে কৃষ্ণশব্দমে যামিনী ও'র আসল বাণটি নিক্ষেপ করলেন। যে অভিনয়, ভাব এবং ধরন ও'র প্রথমার্ধের শ্লোক নিবেদনে খুঁজে পাইনি তার অসামান্য উত্তরণ দেখলাম এই কৃষ্ণশব্দমে। মোহন রাগ এবং আদি তালে নিবদ্ধ ও'র এই নাচ আমায় প্রথম বশ করেছিল তিন বছর আগে, ওস্তাদ হাফিজ আলি স্মরণ সম্মেলনে। "যদুবংশ চূড়ামণি চন্দ্রা" এই শব্দ সূচনার থেকে এই নাচ আমাকে নৃত্যের সম্মোহনের সেই স্থির বিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছিল সেবার। এবার তারই পুনরাবৃত্তি। মোহন সুরে এবং মোহনীয় নৃত্য শ্রবণ এবং দর্শনকে শান্তি দিল। বালিকা গোপিনীর বালক কৃষ্ণকে আহ্বান এই কৃষ্ণশব্দমে এত মধুর শুনিয়েছে যে নাচের ঐ বিশেষ সময়টুকু আমরা যামিনীকে দ্বাপর যুগেরই এক কন্যা বলে ধরে নিয়েছিলাম। ভাল নাচের সেটাই লক্ষ্য; স্থানকালের ছোট্ট ছোট্ট গণ্ডী থেকে আমাদের মনকে সাময়িক নিষ্কৃতি দেওয়া। নিজেদের সময়ে ফিরে এসেও ঐ সুখস্মৃতিকে আমরা পাথেয় করি।

যামিনীর শেষ পরিবেষণা—খালি নাচ—আমার গতানুগতিক লেগেছে। কারু-কাজ অনেক, ভাব কম।

শংকরলাল ভট্টাচার্য

বোম্বাই থেকে

বৃদ্ধার চরিত্রে অভিনয়ে নায়িকাদের সাধারণত অনীহা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে 'আরাধনা'-য় শর্মিলা ঠাকুরের ক[illegible] কিংবা 'মমতা'-য় সুচিত্রা সেনের অভিন[illegible] করা যেতে পারে। তবে এ'রা দুজ[illegible] যুবতী থেকে বৃদ্ধাতে রূপান্তরিত হয়ে[illegible]। আমার বক্তব্য হচ্ছে নায়িকাদের আগাগোড়া বৃদ্ধার চরিত্রে অভিনয় সম্পর্কে। প্রসঙ্গত এন সি সিপ্পী ও হৃষিকেশ মুখার্জির 'জিন্দগী' ছবিতে মালা সিনহার ঠাকুমার ভূমিকা গ্রহণের কথা উল্লেখ করতে হয়। মালা দীর্ঘকাল নায়িকার চরিত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে আসছেন এবং অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন এইজন্য যে, আজ হোক কাল হোক তাঁকে বয়স্কতার চরিত্রে অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ওয়াহিদা রেহমান, নূতন, আশা পারেখ এবং সাধনাও ওই একই বয়সের কিন্তু তাঁরা তাঁদের অতীতকেই এখনও আঁকড়ে আছেন। 'জিন্দগী'-তে মালার অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ স্বামীর চরিত্রে ছিলেন সঞ্জীবকুমার। এই একজন কৃতী শিল্পী যিনি 'ইমেজ' নষ্ট হবার ভয়ে ভীত নন। ইতিপূর্বে সিপ্পীর

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার/প্রতিমা/পরিচালনা : পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

'কৌশিকী' এও তিনি মধ্যবয়স্কের চরিত্রে অভিনয় করেন।

মালা সিনহা তাঁর অভিনেয় চরিত্র সম্পর্কে বেশ স্পষ্টবাদী। মোহন স্টুডিওতে ওঁর সঙ্গে দেখা হতে ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বৃদ্ধার চরিত্রে অভিনয়ের সপক্ষে তাঁর মত কী। উত্তরে মালা বলেছিলেন অর্থের জন্য অভিনয়ের তাঁর দিন চলে গিয়েছে। বললেন, অভিনয়দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ আছে এমন চরিত্রের প্রতিই এখন আমার ঝোঁক—চরিত্রটি যুবতীর কি বৃদ্ধার সেটা বিচার করি না। অন্য ছবির প্রসঙ্গ তুলতে মালা সিনহা জানালেন যে, তিনি যে একখানি মাত্র ছবিতে চুক্তি করেছেন সেটি হলো রাম মাহেশ্বরীর পরবর্তী ছবি। তাঁকে প্রশ্ন করার আগেই জানিয়ে দিলেন যে তিনি 'টাইপ' হিসেবে পরিচিত হতে চান না। অর্থাৎ মাহেশ্বরীর ছবিতে তিনি বৃদ্ধার ভূমিকায় থাকছেন না।

নাটক

কাল্পনিক/একক

"অন্তরে অতৃপ্তি রবে/সাঙ্গ করি মনে হবে/শেষ হয়ে না হইল শেষ।" একই কথা যে বিপরীত অর্থেও মনে আসে, সেটা বোঝা গেল ম্যাক্সমুলার ভবনে ইন্দো-জার্মান অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় একক প্রযোজিত 'কাল্পনিক' দেখে। মনোজ বসুর 'ভেজালের উৎপত্তি' কাহিনী অবলম্বনে নির্দেশক বিপ্লব চ্যাটার্জি নাটক জমাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ফারাক অনেকখানি, তাই নাটক নয়, কিছু ডকুমেন্টেশনে তাঁর নাটক সীমাবদ্ধ রইল। নাটকে দুইটি বিরতি ছাড়াও একদম শেষে যখন পর্দা নেমে আসে, তখন অন্তরে অতৃপ্তি থেকেই যায়। আরও প্রাপ্তির আশায় নয়, একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যুতে।

একক সংস্থাটি নতুন, কিন্তু এই সংস্থায় এমন অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের ক্ষমতার উপরে গ্রুপ থিয়েটার দর্শকদের আস্থা আছে। এই শিল্পী তালিকায় আছেন, বিমল দেব, দিলীপ বসু, কাশীনাথ হালদার অর্জুন ভট্টাচার্য, অতনু রায়, তপন গাঙ্গুলী এবং নাট্যকার নির্দেশক বিপ্লব চ্যাটার্জী স্বয়ং। এঁদের নিয়ে বাজীমাৎ করা যেত, কিন্তু বাদ সাধল নাটক এবং প্রয়োগ চিন্তায় দৃঢ় উপলব্ধতার অভাব। কাঁচা সংলাপ, অপরিণত সিচুয়েশন, টেকনিক বাহুল্যের কাছে শিল্পীরা অসহায়। এরই মধ্যে স্বাভাবিকভাবে স্বকীয়তায় ভাস্বর বিমল দেব ও দিলীপ বসু। দুজনেই অনেক সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, একটি দুর্বল নাটকেও বিমল দেব তাঁর নিজস্ব টাইপ নিয়ে দর্শকের কাছে আলাদাভাবে চিহ্নিত হন। এইখানেই নাটকীয় ত্রুটির মূল সূত্র। কেউ অভিনয় করেন মোটা দাগে, কেউ বা সূক্ষ্মতায় বিশ্বাসী—ফলে নাটক কোথাও তুঙ্গে উঠতে পারে না। অর্জুন ভট্টাচার্য, তপন গাঙ্গুলী, বিপ্লব চ্যাটার্জী যথাক্রমে বিক্রম, বাপ্পা, অরুণ অংশে যত স্বাভাবিক অন্য চরিত্রে তা নয়। সংগীতা ব্যানার্জীর অভিনয় তাঁর পাশের দুজনের পাশে নিতান্তই বেমানান। অন্য দুজন যখন মোটা দাগে অভিনয় করছেন, তখন তিনি শুধুই সংলাপ মুখস্থ বলেছেন। এই নাটকে পোশাক ব্যবহারের পেছনে যে নিপুণ চিন্তা, নাট্য সম্পাদনায় সেটুকু করা হয়নি। অন্তরালেও একজন শিল্পী ছিলেন, শেষ দৃশ্যে তিনি উদ্ভাসিত হলেন—তাঁর নাম তাপস সেন। এই নাটক ব্রেখটীয় পদ্ধতির বলে দাবি করা হয়েছে। কয়েকটা পোস্টার ও ঢোল সহযোগে তরজা গানেই কি ব্রেখটের মহিমা? ব্রেখটের নাটকে গান কখনই অধিকন্তু নয়—নাটকের বোঝা কমিয়ে তরলিত করায়, ইঙ্গিতের প্রতীকতায় ব্যাখ্যানায় সেই গান একটি গুরুত্ব হাতিয়ার। আলোচ্য প্রযোজনায় গান বলতে শুধু ভূমিকার জন্য নয় সময়ে সময়ে মেক-আপ ও সামান্য সেট বদলের সুযোগ নিতে। কেবল গানের জন্য যমরাজের চাকরী বেঁচে যাওয়ার পর রামপ্রসাদী সুরের গান শুধুই বোঝা। বক্তব্যের ভারে নাটক ভারাক্রান্ত। যমদূতের চোখে মর্তের ঘটনাবলী—তার মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, পরীক্ষার অনিশ্চয়তা সব কিছুই আছে। মেয়াদ ছিল সাত দিন, এর মধ্যে পরিবর্তিত সুখী কলকাতা দেখান হল, যার ব্যবধান কমপক্ষে ৫/৬ বছর। কৃত্তিবাস রামায়ণে আছে 'ব্রহ্মার মুহূর্তে ষাট হাজার বৎসর'—যদি সেই হিসেব ধরা হয়ে থাকে, তবে অন্যকথা। দ্বিতীয় বিরতির আগে যম-দূতের পথ চলা শুধুই টেকনিকের (তাও নতুন নয়) মারীচ প্রলোভন। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ভূমিকায় মনোজিৎ লাহিড়ী ও বাণী ব্যানার্জীর সুঅভিনয় সত্ত্বেও রসিকতা

ছায়া দেবী/ব্যতিক্রম/পরিচালনা : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

আরোপিত, কণ্টকল্পিত। নাটক শেষ হলেও বলা ফুরোয়নি, তাই পুনশ্চর মত একটি নাচ জুড়ে দিতে হয়েছে। দেবতাদের মুখে ইংরেজি শব্দ—স্ল্যাং। ঢোল-কাঁসি নিয়ে অপটু তরজা, কাম সেপ্টেম্বরের মিউজিক, হিন্দী গানের যথেচ্ছ ব্যবহার কয়েক বছরের মধ্যেই ঘষা পয়সা হয়ে গেছে।

আবারও বলছি একক গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা নাট্য-চিন্তায় সমর্পিত—প্রয়োজন অব্যর্থ নাটকের যথার্থ প্রয়োজনা। কোন ভণিতা নয় কারণ ভণিতার উৎপত্তি ভেজাল থেকে—যার বিরুদ্ধে তাঁদের জেহাদ।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

চমকপ্রদ সার্কাস

আর যেখানেই আত্মীয়পোষণ চলুক, সার্কাসে চলে না, সত্যিকারের গুণী ছাড়া আর কারও সেখানে জায়গা নেই। টালা-পার্কে গ্রেট রেমন সার্কাসের খেলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক বাঙালী লেখকের এই মন্তব্য আমার মনে পড়েছিল। খেলা দেখা সাঙ্গ হবার পরে এখন কুণ্ঠাহীন বলতে পারি যে, গ্রেট রেমন এবারে একটি দুটি নয় বিস্তর গুণী জোগাড় করেছেন। উপরন্তু এঁদের বাঘ-সিংহগুলি রোগা টিংটিঙে নয়, এবং অন্তত একটি হাতিকে কলকাতার যে-কোনও ফুটবল-টিমে নামিয়ে দেওয়া যায়। যতবার তার দিকে ফুটবল ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল, ততবারই সে কড়া পায়ে কিক করেছে, একবারও ফসকায়নি।

জ্যান্ত মাছসুদ্ধ এক জার জল খেয়ে আবার উগরে দেওয়া, জিমন্যাস্টিকস, অ্যাক্রোবেটিকস, ব্যালান্সিং, বন্দুকবাজি—প্রতিটি খেলাই ছিল চমৎকার। তবু বিশেষ

রেমন সার্কাসে শিশু অ্যাক্রোব্যাটসদ্বয়

করে উল্লেখ করতে হয় দুধপোষা সেই দুটি শিশুর কথা, শারীরিক কসরতের তাক-লাগানো খেলা দেখিয়ে যারা মুহূর্তে সকলের চিত্ত জয় করেছিল। আর ট্রাপিজের উড়ন্ত পাখির মতো কয়েকটি যুবক-যুবতী যখন এক রিং ছেড়ে অবলীলাক্রমে শূন্যে সাঁতার কেটে অন্য রিংয়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তখন সেই খেলা দেখতে-দেখতে কার বুক দুরুদুরু করেনি? বুক দুরুদুরু করেছে, শরীর বারবার শিউরে উঠেছে, দুর্বলচিত্ত দর্শক তো চোখ খুলতেই সাহস পাচ্ছিলেন না।

শেষ বাহবা অবশ্য ক্লাউনদেরই প্রাপ্য। গ্রেট রেমনের ক্লাউনরা সারাক্ষণ ভাঁড়ামি করেও শেষ পর্যন্ত ঠিকই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের প্রত্যেকেই পাকা খেলোয়াড়।

চক্রবর্তী

জাদুকর করুণাশঙ্কর

হাওড়ার ছেলে করুণাশঙ্কর, কলকাতা থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক, দিল্লিতে এক বাণিজ্যিক সংস্থার উঁচু পোস্টে কাজ করেন, আর করেন ম্যাজিক। গত কুড়ি বছর ধরে ম্যাজিক করে চলেছেন একটানা। দিল্লিতে সব থেকে নামী ও দামী হোটেলে নিয়মিত ফ্লোর শো থাকে করুণাশঙ্করের। ফ্লোর শো মানেই পাকা হাতের খেলা, কারণ দর্শকদের একেবারে নাকের ডগায়—ইংরেজিতে যাকে বলে ক্লোজ টু নোজ—খেলা দেখিয়ে বাজিমাত করতে হয় প্রতিদিন। করুণাশঙ্করের হাত তাই দুঃসাহসিক, মুখে সর্বদা অনর্গল কৌতুকরসসিক্ত বুলি, চেহারা [illegible] আর সব থেকে চমকে [illegible] অনুশীলিত ছোট-ছোট খেলাগুলি। চোখের সামনে দাঁড় চার-টুকরো হচ্ছে, জুড়ছে; ছিপিখোলা কোকাকোলায় বোতল উপুড় করে ধরলেও জল গড়াচ্ছে না, ছটি আঁটসাঁট তক্কার সংখ্যা মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে অন্য সংখ্যায়, দর্শকের হাতের মধ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে তাস, টিনের ফাঁকা চোঙে আঁটা বেলুনের মধ্যে দিয়ে পুণ-ছুঁচ ঢুকিয়ে দিলেও ফাটছে না, হাতবন্দী ঘড়ির সময় গন্ধে বলে দিচ্ছেন জাদুকর—এমন অসংখ্য ছোট ছোট খেলা চোখ কচলে দেখতে হয়। বার বার দেখতে ইচ্ছে হয়।

কদিন আগে করুণাশঙ্কর এসেছিলেন কলকাতায়। এক ঘরোয়া সাংবাদিক সমাবেশে তিনি ঘণ্টা দুয়েক ধরে তাঁর হস্ত-নৈপুণ্য দেখিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে দেখিয়ে গেলেন একটি আমন্ত্রণ-পত্র। আগামী জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি-উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ। একমাসব্যাপী এই উৎসবে খেলা দেখাবার জন্য নিমন্ত্রিত করুণাশঙ্করের যাবতীয় ব্যয়ভার অস্ট্রেলিয়া-সরকার বহন করবেন। করুণাশঙ্কর শুধু বহন করে নিয়ে যাবেন ভারতীয় এক মহান শিল্পের কিছু চর্চিত দক্ষতা। তাঁর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

—প্রণব মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরায় ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাসুদেব রায়
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২০-২২৮০
২০-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষাণ্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

(লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)

আনন্দমুখর তরুণদের পোশাক
জিয়াজী সত্যিকারের আনন্দের উৎস। জিয়াজী কাপড় জীবনকে করে পুলকমধুর আর আনন্দমুখর। ঐতিহ্যদীপ্ত প্রিন্ট, আধুনিক ডিজাইন, উজ্জ্বল আভার শোভা আর অপূর্ব মনোহর রঙে—কটন স্যুটিং, শার্টিং আর ড্রেস মেটিরিয়াল—সংক্ষেপে বহু রকমের উৎকৃষ্ট কাপড় আপনার জন্যে তৈরী করে জিয়াজী।
জিয়াজী
J
আপনার মতই যাঁরা চান আনন্দ তাঁদের জন্যে
জিয়াজীরাও কটন মিলস লিঃ,
বিরলানগর, গোয়ালিয়র (ম.প্র.)
MAPP-JCP-7610 Ben

দেশ

কেয়ারফ্রী* সুরক্ষা
এখন
৫টি ন্যাপকিনের
এক সুবিধাজনক
প্যাকে
FREE BELT INSIDE
Carefree*
SANITARY NAPKINS
EASILY DISPOSABLE
৫ টাকা
ট্যাক্স আলাদা
পাঁচটি কেয়ারফ্রী ন্যাপকিন, প্রত্যেকটিই
আপনাকে যোগাবে সম্পূর্ণ সুরক্ষা আর নিরাপত্তা।
আপনি দেখবেন অন্যান্য সাধারণ ন্যাপকিনগুলোর পুরো
প্যাকের চেয়ে ৫ টির নতুন সুবিধাজনক
প্যাকই যথেষ্ট—কারণ কেয়ারফ্রী ব্যবহার করলে বার
বার বদলাবার দরকার হবে না।
OBM-7253-BEN

[সূ]চীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : প্রভাস সেন

প্রচ্ছদ পরিচিতি : "সূর্যের উদ্দেশে" (প্লাস্টার—৩০´×১২´)—মা সন্তানকে তুলে ধরেছে সূর্যের দিকে পরম আত্মনিবেদনের ভঙ্গীতে। তার সুখ, আশা, আহ্লাদ আর দীনতাকে সে যেন মর্তসীমায় বেঁধে রাখতে পারছে না। যেন এক ফলন্ত গাছ—শিকড় যেন পায়ের কাছটা, গা-টা কান্ড, হাত দুটি ডাল-পালা আর শিশু পত্রপুষ্পফল—উঠে গেছে আকাশের দিকে। মূর্তিটি খাড়া ও দীর্ঘায়িত। এতে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বিকৃতিকরণের। হাতে শিশুটিকে অনুভূমিকভাবে রাখার ফলে ভারসাম্য রয়েছে ও স্পষ্ট হয়েছে বিস্তৃত ব্যাপ্তির ভাব। উরু আর হাঁটুর কাছে সমতল জায়গা কেটে বার করে, সুন্দর স্তনের নীচে ত্বকের অমসৃণতা এনে এবং হাত দুটি ছন্দিত ভঙ্গীতে বেঁকিয়ে দিয়ে গাছের কথাই মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১১
শনিবার ২৪ পৌষ ১৩৮৩

একালের ইষ্টাপূর্ত

ভারতীয় ভূস্বামিসমাজের জীবন-চর্যার মেজাজটা সামন্তিক উত্তাপের কারণে যদিও বেশ কড়া রকমের একটি প্রকৃতি লাভ করেছিল, তবু ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী এমন ধারণা করবার যুক্তি আছে যে, সাধারণ জনহিতের বিশেষ একটি নীতির প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা ও আগ্রহের প্রকৃতিটা যথেষ্ট সুস্থ ছিল। ইষ্টাপূর্ত, অর্থাৎ জনসাধারণের হিতার্থে 'বাপী কূপ ও তড়াগ' খনন করা, ছায়া-তরু রোপণ করা এবং পথ বিন্যাস করা সামন্তিক ভূস্বামীদের দ্বারা একটি প্রিয়-কর্ম হিসাবে আচরিত হতে দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ একটি মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যেটা এক হিসাবে সামাজিক উন্নয়নের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্যের একটি নীতি দিয়ে নিয়মিত গঠনকর্মবিধির সূত্র বহন করে। জাতির আগ্রহ কয়েকটি গঠনকর্ম-বিধির অনুগত না হতে পারলে মহদ-ভীষ্ট কখনই কার্যতঃ সফল হতে পারে না। গঠনকর্মবিধির নৈতিক রূপের মধ্যেই বস্তুত জাতির এক আন্তরিক উন্নতির রূপ নিহিত রয়েছে। বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিকের উদ্ভাবিত পরিকল্পনা তথা যোজনার রূপ এবং রীতির সঙ্গে এই গঠনকর্ম-বিধির সার্থকতাগত কোন সাদৃশ্য নেই।

খুব দুঃখের বিষয়, দেশের এক-শ্রেণীর রাজনীতিক মনোবৃত্তির কাছে, গঠনকর্মবিধি চিরকালই উপহসিত হয়েছে। স্মরণ করা চলে, বিপ্লবের মহান সার্থকতার দোহাই দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর আঠার দফা গঠনকর্মবিধিকে একটা দীনহীন ও নিরর্থক কর্মাড়ম্বর বলে, কখনও বা 'প্রতিক্রিয়াশীল' অভি-সন্ধির একটা চমৎকার মুখোশ বলে আখ্যাত করে বিশেষ শ্রেণীর রাজনীতিক ব্যক্তি এবং জনের দ্বারা রূঢ় সমালোচনা প্রচারিত হয়েছিল, এবং এখনও হয়ে থাকে, যদিও একটু নিম্নস্বরে। প্ল্যানিং তথা যোজনা তথা পরিকল্পনা নামে অভিহিত উদ্যমের লক্ষ্য ও প্রকৃতি জাতির বৈষয়িক সমৃদ্ধির অঙ্গীকার বহন করে বটে, কিন্তু নৈতিক সমৃদ্ধির অথবা শক্তির কিংবা যোগ্যতার কোন অঙ্গীকার বহন করে কি না, সন্দেহ। কিন্তু এই সত্যের নীতিটিকে কোন যুক্তিতে মিথ্যে প্রতিপন্ন করা সম্ভব নয় যে, জাতিকে উন্নত করতে হলে তার অন্তরের নির্মাণও উন্নত করে নিতে হবে। সরল ভাষায় বলা যায়, ভিতর থেকে গড়ে ওঠা। এখানে গঠনকর্ম-বিধির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এবং সার্থকতা। মহাত্মা গান্ধী যে আঠার দফা গঠনকর্মবিধি নির্দেশিত করে-ছিলেন, সেটা ঠিক অর্থনীতিকের কিংবা সমাজ-সংস্কারকের 'প্ল্যানিং' নয়। সেটা জাতির পক্ষে নৈতিক আত্মসংগঠনের একটি প্রত্যক্ষ কর্মতন্ত্র বলে বিবেচিত হতে পারে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যে বিশ দফা কর্তব্যের নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে নৈতিক আত্মসংগঠনের অঙ্গীকার আছে বটে, কিন্তু বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে এই বিশ-দফা কর্মসূচীর প্রকৃতি কতটা লক্ষ্যমাত্রার দ্বারা সীমিত কর্মযোজনার অনুরূপ। সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে একটি হিতব্রতের লক্ষ্য উপলব্ধি হবে, কার্য-কারণের এইরকম একটি সম্বন্ধের সূত্রে বিশ-দফা কর্মসূচী গ্রথিত হয়েছে।

আর-একটি যে কর্মসূচীর কথা শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর উদ্ভাবিত নীতিব্রতের অনুষ্ঠানবিধি হিসাবে প্রচারিত হয়েছে, সেটা হলো পাঁচ-দফা কর্মসূচী। শ্রীসঞ্জয় গান্ধী সরকারী ব্যক্তি নন, তিনি যুব আন্দোলনের নেতা। তাঁর উদ্ভাবিত ও প্রচারিত যে পাঁচদফা কর্মসূচী সাধারণভাবে দেশের যুবসমাজ, এবং সঙ্ঘ হিসাবে বিশেষ করে যুব-কংগ্রেসের প্রতিপালনীয় বলে স্বীকৃত হতে দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে সরকারী যোজনাবাদ কিংবা রাজনীতিক কোন মতবাদিতার স্বার্থ আশ্রিত নয়। এই পাঁচদফা কর্মসূচী মহাত্মা গান্ধীর আঠার দফা গঠনকর্মবিধির অনুরূপ বিধি, যদিও উদ্দিষ্ট বিষয়গুলি ভিন্নতর। জন্মসংখ্যার হ্রাস, বৃক্ষরোপন, জাত-পাত বর্জন, পণ-প্রথার অবসান এবং পারিবেশিক সাফাই তথা পরিচ্ছন্নতা—পাঁচ কর্মব্রতের মধ্যে একটি নৈতিক জাগৃতির প্রতিশ্রুতি স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়, যদিও কর্মসূচীর বহিরঙ্গ সবটাই সামাজিক কর্তব্যের নির্দেশ এবং জাতির বৈষয়িক সুখের প্রতিশ্রুতি।

শেষ প্রশ্ন, এই পাঁচদফা গঠনকর্ম-বিধির সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব এবং রূঢ় সমালোচনা মুখরিত করবার কি কোন অর্থ হয় ? কোন অর্থ হয় না। তবু দেখা যাচ্ছে যে নিতান্ত রাজনীতিক দলীয়তার স্বার্থে প্ররোচিত হয়ে একটা যুক্তিহীন নিন্দাবাদ শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর প্রবর্তিত পাঁচদফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ও হয়ে চলেছে। আশা করা যায়, এই নিরর্থক নিন্দাবাদিতার ব্যস্ততা থামিয়ে দিয়ে আন্তরিক সমর্থন অভিব্যক্ত করতে এইসব সমালোচক আর দেরি করবেন না। প্রসঙ্গত আর-একটি অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে হয়। যাঁরা এই পাঁচদফা কর্মসূচী জনজীবনের সর্বত্র প্রচারিত ও সফলায়িত করবার আনু-ষ্ঠানিক অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে, তাঁরাই বা কী এবং কতটুকু উদ্যমের পথে অগ্রসর হয়েছেন ? ওদিকে সর্বসেবা সঙ্ঘ এবং সর্বোদয় কর্মীরা গান্ধীজীর গঠনকর্মবিধির প্রতি নিষ্ঠাশীল আনুগত্য রক্ষা করে এখন কী করছেন এবং কতখানি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, সে প্রশ্ন না করে এটাই জাতির কল্যাণের নিবেদন হিসাবে বলা যায়, এই দুই সংঘ যেন রাজ-নীতিক ইচ্ছার চাঞ্চল্য পরিহার করে একান্তভাবে গঠনকর্মবিধির পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর আঠার দফা গঠনকর্মবিধি, প্রধানমন্ত্রীর প্রচারিত সরকারী কর্তব্যের বিশদফা কর্মসূচী, এবং শ্রীসঞ্জয় গান্ধীর পাঁচদফা জাতীয় কর্মসূচী, সবই একই শুভ-পরিণামের পথে জাতিকে পরিচালিত করবার এক মহান ইষ্টাপূর্ত।

বৈদেশিকী

আসা-যাওয়া

জাপানে এবারের নির্বাচনে দল বদল না হলেও নেতা বদল হয়েছে। এক দানে প্রতিনিধি সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও মন্ত্রিসভা গড়বার দায় অর্শেছে অন্য বারের মতো দক্ষিণ পন্থী লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের ওপরই। কিন্তু সে ভার দল তাকেও মিকিকে দেয়নি। দিয়েছে ম্যানুনেতা তাকেও ফুকুদাকে। জাপানের তিনিই এখন প্রধানমন্ত্রী। মিকিকে তিনি মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেননি। কেবল মিকি কেন একজন বাদে পুরোনো মন্ত্রিসভার কারুরই জায়গা হয়নি ফুকুদার নতুন সরকারে। বলতে গেলে আনকোরা নতুন সরকার গড়েছেন তাকেও ফুকুদা। কাজটা তিনি করেছেন বোধ হয় এই ভেবে যে এরপর মিকি মন্ত্রিসভার দোষ তাঁর সরকারের ঘাড়ে কেউ চাপাবে না—নতুন সরকারের বিচার করবে তার কাজকর্ম দেখে। তাতে গোড়াতেই তাঁকে সমালোচনার ঝক্কি সামলাতে হবে না—হাঁপ ছাড়বার ফুরসুত তিনি পাবেন। তার ওপর দল চালাবার ঘাঁতঘোঁত তিনি সব জানেন যত মিকি জানতেন না—চট করে বেকায়দায় ফুকুদাকে ফেলা শক্ত।

মিকির দিন যে ঘনিয়ে আসছে সেটা নির্বাচনের আগেই বোঝা গিয়েছিল। দলে তাঁর প্রতিপত্তি খুব বেশী একটা ছিল না তাঁর অনুগতদের সংখ্যাও কম। তবুও যে তিনি দলের নেতা হতে পেরেছিলেন সে নেহাতই দৈবের খেলা। আগের বারে নির্বাচনে বাজীমাত করে লিবারাল-ডেমোক্র্যাটদের নেতা বাছাই হয়েছিল কাকুই তানাকাকে। তিনিই হয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। অবিশ্যি সেই তাঁর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়া নয়। বাহাত্তরের লড়াইতেই তিনি জবরদস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটিয়ে তিনি দলের নেতার পদ পান। তাঁর সঙ্গে সেবার লড়েছিলেন ফুকুদা আর মিকি দুজনেই কিন্তু পাত্তা পাননি। বাহাত্তরের অকাল নির্বাচনের পর দলে নিজের গদি বজায় রাখতে তানাকাকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। নির্বিবাদে তিনি বসে গেলেন আবার দলের নেতা, সেই সুবাদে প্রধানমন্ত্রীও। মিকিকে তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী আগেই করেছিলেন এবারও তাঁকে সে পদেই বহাল রাখলেন। কিন্তু বিধি বাম। পুরো চার বছর কামড়ে দেশ চালাতে তিনি পারলেন না। কর ফাঁকি আর ব্যবসায় কেলেঙ্কারির অভিযোগ তাঁকে যেতে হল দু বছর শেষ হতেই। আসরে নামলেন তাঁরই উপ-প্রধানমন্ত্রী তাকেও মিকি।

লিবারাল-ডেমোক্র্যাট দলে একতা বলতে কিছু নেই। আসলে ওটা পাঁচ মিশেলি দল—গোটা ছয়েক গোষ্ঠির জগাখিচুড়ি। এক এক গোষ্ঠির এক এক চাঁই। মিকিও অমনি একটা গোষ্ঠির সর্দার, তবে সে গোষ্ঠির জোর কম। সবচেয়ে জোরদার তাকেও ফুকুদার গোষ্ঠি। কাকুই তানাকার গোষ্ঠিও কিছু কম ছিল না। কিন্তু তা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে তাঁর গদি খোয়ানোর পর। যেটুকু ছিল তাও আর নেই লকহীড কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তার হওয়াতে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হয়নি। এখন তিনি জামিনে খালাস। তবে তিনি বাহাদুর পুরুষ বটে। তাঁর এত নিন্দে রটা সত্ত্বেও দিব্যি তিনি জিতেছেন এবারের নির্বাচনে। তবে ক্ষমতার লড়াই এখন তিনি দেখছেন বাইরে থেকে। লড়াই চালাচ্ছেন আর পাঁচ দিকপাল—তাকেও ফুকুদা, মাসাইয়োশি ওহিরা, তাকেও মিকি, ইয়াসুহিরো নাকাসোনে আর এতসুসাবুরো শাইনা। নির্বাচনে হেরে ক্ষমতার লড়াই থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে তাকেও মিকিকে। জাঁকিয়ে বসেছেন গদিতে তাকেও ফুকুদা। তাঁর অনেক দিনের সাধ এতদিনে মিটলো।

মিকির আমলে ফুকুদা ছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী। তাতে তিনি মোটেই খুশী ছিলেন না। কিন্তু তানাকাকে বিদেয় দেওয়ার পর দল ঝুঁকেছিল মিকির দিকে তাঁর গোষ্ঠি কমজোর হলেও তিনি সদাচারী দুর্নীতিবাজ টাকার বশ নন বলে। সে সুনাম ফুকুদারও ছিল না। তাই প্রধানমন্ত্রিত্বের দুধের বদলে উপ-প্রধানমন্ত্রীর ঘোল খেয়েই তাঁকে তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর নজর ছিল সিংহাসনের দিকে। চুপ করে তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন মিকিকে কাত করার। লিবারাল-ডেমোক্র্যাটরা বড়লোক ঘেঁষা—বড় বড় ব্যবসাদারদের সঙ্গে তাদের গাঁটছড়া বাঁধা। যেভাবে ঘুষ দেওয়া আর ঘুষ খাওয়া নিয়ে মিকি হৈ চৈ করছিলেন দলের চাঁইদের তা পছন্দ হয়নি। তাঁরা চাপ দিয়েছিলেন মিকির ওপর ইস্তফা দিতে। তিনি সে পথ দিয়ে যাননি—চেপে বসেছিলেন গদিতে নির্বাচন পর্যন্ত এই আশায় যে লোকে যখন দুর্নীতির উচ্ছেদ চায় তখন জিত তাঁরই হবে আর তখন প্রশাসন থেকে দুর্নীতি দূরে তিনি তো করবেনই—ঢেলে সাজাবেন দলকে যাতে নির্বাচন টাকার খেলা আর না হয়।

কিন্তু তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি। দল অতলে তলিয়ে যেতে যেতে কোনো মতে নাকানি চোবানি খেয়ে বেঁচে গেছে। এর পর মিকির আর দলের নেতা থাকা চলে না। চেষ্টার কসুর তিনি করেননি কিন্তু দলের চাঁইরা তাঁকে বিদেয় দিতে পারলে বাঁচেন। দলের নেতাগিরি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মিকি ২৩ ডিসেম্বর দলের নির্বাচনী ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব সব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে। এক দিন পরেই জাপানী ডায়েট অর্থাৎ সংসদ দলের নতুন নেতা তাকেও ফুকুদাকে বসিয়ে দিয়েছে তাঁরই শূন্য আসনে। উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মিকি আর মাঠের ভেতরে নেই তিনি এখন বাইরে। বেড়ার ওপার থেকে গ্যালারিতে বসে তিনি খেলা দেখবেন। বিস্তর বড় ঝড় বুলি গদিতে বসেই আওড়েছেন ফুকুদা। লকহীড কেলেঙ্কারি ধামা চাপা দেবার মতলব তাঁর নেই এ কথা তিনি জোর গলায় বলেছেন। আরও বলেছেন দলের সংস্কারের কথাও তিনি ভাবছেন—একটা কিছু হেস্তনেস্ত না করে তিনি ছাড়বেন না।

এসব কতটা তাঁর মনের কথা আর কতটা বাজার গরম রাখার জন্যে চাউর করছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। সত্যিই যদি তিনি দুর্নীতি নির্মূল করতে চান জাপানের রাজনীতি আর প্রশাসন থেকে তা হলে কেন তিনি নির্বাচনের সময় মিকির পাশে দাঁড়াননি এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি তাঁর কাছ থেকে। নির্বাচনযুদ্ধের আগেই তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বেকায়দায় ফেলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মিকিকে। নির্বাচনী প্রচারেও হাত মেলাননি তাঁর সঙ্গে—এমনভাবে চলেছিলেন যেন তাঁরা দু জন দু দলের লোক। নির্বাচনে হার হলে কিংবা ফল খারাপ হলে লোকে দোষ দেয় নেতাকে। নেতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব মিকি এড়াতে পারেন না। কিন্তু দোষ কি তাঁর একার? ফুকুদা কি তার জন্যে কম দায়ী? তিনি যদি মিকির সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়তেন তা হলে কি ফলটা অন্য রকম হতো না? দোষ যদি হয়ে থাকে তা হলে সে দোষ দুজনেরই সমান। কিন্তু এক যাত্রায় হলো পৃথক ফল—একজন হলেন উজীর, আর একজন হলেন ফকির।

দেবরাজ

এক নজরে

কিছুটা বোঝার ভাষা, কিছু বা বোঝার আশা

নদীর নাম শামশিরি, বোধ হয় শ্যামশ্রী থেকে জনরসনায় রূপান্তরিত হতে হতেই এই চেহারা হয়েছে তার। এই ক্ষীণস্রোতা নদীটি বেরিয়েছে কংসাবতী থেকে এবং অর্ধচন্দ্রাকারে দশবারখানি গ্রামকে স্পর্শ করে আবার গিয়ে কংসাবতীতেই পড়েছে। দুপারে আছে পীরপুর, হাসিগ্রাম, চাংড়া, ধানীপোতা ছোট ছোট গ্রাম এবং যেখানে একটার এলাকা শেষ হয়ে আরেকটা আরম্ভ হচ্ছে, সেখানেই আছে মহুয়া কাঁদা ড্যালা জারুল, রকমারি জাতের গাছগাছালি। নদী ও অরণ্যের পরিবেশে গ্রামগুলি দেখায় ছবির মত সুন্দর। মাসখানেক এই গ্রামে কাটাব মনে করে চলে এলাম একদিন, কলকাতার ধোঁয়াধুলো আর আওয়াজ এড়িয়ে। এলাম অবশ্য ডাক্তারের পরামর্শে, কারণ হাঁচি কাশি ও মাথা ব্যথা যখন কোন ওষুধেই জব্দ হল না, তখন ডাক্তার বললেন শহরের আবেষ্টনীর বাইরে, পারলে কোন গ্রামে গিয়ে থাকুন কিছুদিন। একসময়ের সহকর্মী মন্মথ তখনই দিলেন হাসিগ্রামের খবর। সেখানে তাঁর একটি বাগানবাড়ি আছে এবং তার দেখাশোনায় আছে একজন মাঝি। রাঁধাবাড়া তদারকি সব সে করবে। শুধু টিকেট কেটে গেলেই হল।

বয়ড়া স্টেশনে নেমে সাইকেল রিকশায় চেপে বসতেই চালক বলল, সাধুবাবার আশ্রমে ত? বললাম, না, মুরলীবাবুর বাগানে। আর কোন কথা না বলেই প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন টিপতে টিপতে পাকা সড়কে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর চলতে চলতেই বলল, বাইরে থেকে সায়েব-সুবো বাবুভায়া যাঁরা আসেন, সবাই ওখানেই যান কি না। তাইতেই জিগ্যেস করেছিলাম। আমি বললাম, বিখ্যাত একজন সাধুবাবা আছেন বুঝি এখানে? কি নাম তাঁর? নাম? জগানন্দ। বুঝলাম হয় যোগানন্দ, নয় জগদানন্দ। নিজে থেকেই বলল সে, তেনার বয়স বাবা দুশো বছর। দুনিয়ার যেখানে যা হয়েছে হচ্ছে, হবে, সব তিনি দেখতে পান। যার যা হয়েছে তা বলে দেন। বলে দেন যা হবে, তাও! পেরাই ভগমান বললেই হয়! আর মজা কি জানেন? কিচ্ছু খান না। রোজ বেশী রাত্রে খান শুধু এক ঘটি জল, আর একটি পাতা। কি পাতা জিজ্ঞাসা করতেই বলল, বেল আম জাম নিম যে কোন পাতা। আর কিছু বলা বা শোনার সুযোগ হল না, কারণ মাইল খানেকের পথ ইতিমধ্যেই শেষ হল। এসে হাজির হলাম মুরলীবাবুর বাগানে। ফটকের কাছে রিকশা থামতেই দেখি পায়ে সাদা কেডস, গায়ে ছিটের শার্ট এবং গলায় লাল কম্ফর্টার মাঝ-বয়সী এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। সসম্মানে অভ্যর্থনা করে সে বলল, দর্শনবাবু ত আপনি? আমার নাম কুঞ্জ।

হাসিগ্রামের জল হাওয়া এবং কুঞ্জ-বিহারীর সেবাশুশ্রূষায় তিন চার দিনেই তথাকথিত ন্যাজাল এলার্জি কোথায় ভেগে গেল। হঠাৎ একদিন কুঞ্জ বলল, কত দেশবিদেশ থেকে মানিষি আসেন ওনার কাছে। আর আপনি এতদিন এখানে থেকেও একটিবার যাবেন না? জগানন্দ বাবার দর্শনে সত্যিই পুণ্যি হয় দাদাবাবু। বললাম আচ্ছা কাল সকালে নিয়ে যেও আমাকে। কুঞ্জ বলল, না, সকালে বড্ড ভীড় হয়। ছটার গাড়িতে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসে। বিকেল পাঁচটা দশের গাড়িতে বেশীর ভাগই ফিরে যায়। রাত্রে থাকে বড়জোর দুতিনজন। সন্ধ্যের সময় তাই দেখা করাই সবচেয়ে ভাল। তখন নিরিবিলিতে বাবার সঙ্গে কথাটথা কইতে পারবেন। জিজ্ঞাসা করলাম, প্রণামী টনামী কিছু লাগে কিনা? সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে কুঞ্জ বলল, রাম রাম! টাকা আপনি আসে, উনি কিচ্ছু নেন না, দিলে হাহা করে হেসে ফেরৎ দেন। সেদিনই গেলাম সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। উঠান পার হতেই দেখি সুন্দর সাজান বৈঠকখানা। তার রোয়াকে ফরাস বিছিয়ে বসে আছেন বাবা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। মাথার চুল কাঁচাপাকায় মেশান। মুখে এক জোড়া গোঁফ, তাও কাঁচাপাকায় মেশান। পৌষের প্রখর শীতেও সম্পূর্ণ আদুল গায়ে বসে আছেন এবং সামনের চেয়ারে উপবিষ্টা এক বৃদ্ধাকে ঈষৎ কৌতুক মাখান মমতার সঙ্গে কি একটা ব্যাপারে যেন উপদেশ দিচ্ছেন।

আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন, আরে এস এস সুদর্শন। ফ্যাঁচর ফ্যাঁচর হাঁচিটা বন্ধ হয়েছে ত? ঘাড়ের ব্যথাটাও যাবে দেখ দু-একদিনের মধ্যেই। টনিকটা ফেলে এসেছ বলে ভাবছ ত? ভাবনা কর না, বিনা ওষুধেই ঠিক হয়ে যাবে। গুরুপদ মাস্টারের মৃত্যু নিয়ে কস্ত ধাঁধায় পড়েছ তোমরা, না? হত্যা নয়, হত্যা নয়, আত্মহত্যা করেছিল সে। অনেক বদভ্যাস ছিল তার ফলে দেনা করেছিল প্রচুর। পৈঠা থেকে রোয়াকে উঠে থ হয়ে রইলাম, বসার বা কথা বলার শক্তিই খুঁজে পেলাম না যেন। তিনিই বললেন, বস। তারপর বললেন, রিটায়ার করে ইস্তক মেয়ের বিয়ে আর স্ত্রী শরীর নিয়ে ভারী দুশ্চিন্তায় পড়েছ! তা ভেব না, সামনের মার্চেই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে, আর হবে ভাল পাত্রেই। স্ত্রী অবশ্য তোমার আগেই যাবেন, তবে বছর ছয়েক আগে নয়। তার অনর্গল ভাষণের মুখে আমি কিছু বলারই সুযোগ পাইনি। তিনি একটু থামতেই বললাম, বাবা, আমার দু-একটা জিজ্ঞাসা ছিল। হাত তুলে তিনি থামার নির্দেশ দিয়ে বললেন, আমি জানি কি সেই জিজ্ঞাসা। আমি কেমন করে এই সঠিক সমাচারগুলো বললাম, এই ত? এ হল তৃতীয় নেত্রের ব্যাপার, বুঝেছ? তপস্যায় এটা লাভ করা যায়। খাটো গলায় বললাম, ধরুন কেউ যদি তপস্যা টপস্যায় বিশ্বাস না করে! বাবা যেন একটু অপ্রসন্ন হলেন, তারপর বললেন, চোখের সামনে কার্য দেখেই কারণকে ধরতে হয়। তাছাড়া তপস্যা ভিন্ন কি হয়? ফ্রয়েড মানব মনের অন্তস্তলে তাকিয়েছেন, আইনস্টাইন সম্প্র-সারিত মহাবিশ্বের সন্ধান পেয়েছেন, মার্কস দারিদ্র্যের মূল খুঁজে পেয়েছেন, এ সবও কি তপস্যারই দান নয়?

বলা বাহুল্য একটু থমকে দাঁড়াতেই হল। দিব্যদৃষ্টি বলে কোন কিছু মানি আর না মানি, একটা কোন অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর আছেই, এ ত অস্বীকার করতে পারব না। তিনি একটু হেসে বললেন, বিশ্বাস করতে শেখ। বিশ্বাসই হল উপলব্ধির প্রথম সোপান। তারপর বললেন, এই যে আমাকে দেখছ, আমার বয়স কত জান? ১৭৮০ সালে আমার জন্ম। এখনো দেখ আমি যুবক বললেই হয়। অথচ আমি কিচ্ছু খাই না, একটি পাতা আর একটু জল ছাড়া। কিন্তু এর চেয়েও বড় খবর তোমাকে বলছি। রোজ রাত্রে আমি এই দেহে মরে যাই, আর আমার আত্মা তখন সূক্ষ্ম দেহ ধরে লোক লোকান্তর পরিভ্রমণ করে। ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমি ফিরে আসি এই দেহে। এ সবই তপস্যার ফল। এই পর্যন্ত বলেই বললেন, এবার তুমি উঠে পড়, কারণ আমার প্রাত্যহিক মৃত্যুর সময় আসন্ন। চলে এলাম, কিছু বিশ্বাস, কিছু অবিশ্বাস এবং পর্যাপ্ত ধোঁকা অন্তরে সঞ্চয় করে। শুনলাম জগানন্দবাবার ইংরেজ জার্মান মার্কিন ও ভারতীয় ভক্তের সংখ্যা কয়েক লক্ষ এবং তাঁদের অযাচিত দানের পরিমাণ নাকি কয়েক কোটি টাকা, যার এক কপর্দকও তিনি হাত পেতে নেননি।

— সুদর্শন গুপ্ত

জাদু প্রদর্শনী

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এক নিমেষেই তুমি সমস্ত জটিল টুকরো জুড়ে দিতে পারো!
বাঁ হাত তাকিয়ে থাকল
যখন অক্লেশে তুমি আমার ডানহাত গভীর আড়ালে রেখে এলে ;
তারপর বাঁ হাতও গেল
যাক না যাক না যাক, সবই তো প্রপঞ্চময় মায়া! শুধু কারো কারো
দৃশ্যে বিশ্বাস নেই, জানা নেই "সরকার পি. সি-র" মতো খুবই
অবহেলায়

তুমি কাটা ধড়ে মুণ্ডু ফেরাতে পারো তন্মাত্র ছোঁয়ায়!
পা দুটি নাওনি
তাই তারা ভারতীয় ধৈর্য নিয়ে
অপেক্ষায় আছে, এ ম্যাজিক শেষ হলেই
গঙ্গার তীর্থমাখানো জলে পা ডুবিয়ে
ধুয়ে আসবে ধুলো হে আমার প্রথম রমণী, এ সময়
তোমাকেও পাঠানোর মতো কোনো টেলিগ্রাম নেই
এখন অপেক্ষা করো কেবল অপেক্ষা করো অপেক্ষা অপেক্ষা...
একটু পরেই শরীরের ছিন্ন মাংস পুনর্বার জোড়া হবে, তোমার
নির্ভয়

নাভির উন্মুক্ত গন্ধে
অক্ষরক্ষরণে সিক্ত হবে এক অখণ্ড পুরুষ :
কিন্তু তার আগে দর্শকের অন্ধকারে বসে অনতিদূরের ঐ
মঞ্চের আলোয়
আমাকে নিয়ে এ খেলা স্থির লক্ষ্য করো
ম্যাজিক তো মূলত ফাঁকি, টুকরো টুকরো হাত পা বিচ্ছিন্ন ভয়
কিছু নয়, কিছু নয়, বুঝলে কিছুই নয়।

বাঘ

অরুণ বসু

কেমন নিশ্চিন্তে তুমি দুপুরে ঘুমিয়ে আছো, শীতে—
কি প্রসন্ন রৌদ্রে তুমি
চাপকান ছাড়াই
বেতবন আলো করে চুপ
শুয়ে আছো
যেমন গাঁয়ের বধূ অনামিকা ছুঁয়ে দ্যায় চোখ
প্রিয়তম পুরুষের বুকে
মাথায় আলপিন ফোটে, হুল ফোটে, ভ্রমর গুঞ্জন
যে রকম রাত্রে তুমি গভীর অরণ্য
ফুঁড়ে
বাইরে বেরিয়ে আসো
নারীর নাকের নথে
ব্যথা জাগে, একা
নিমগ্নতা দাবী করে, ভ্রূণ—
তুরপুন খেলা করে সংরক্ষিত সমীক্ষায় বাঘ
রাগে গরগর করে চক্ষু
শুক্রগ্রহ থেকে দুধ ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে
চাতালে শিশির
হিমযানে—একটি রমণী গাভি
ঘাট ডাকে
তুমি তাকে লুফে নাও
রক্ত পান করো
দূর থেকে তার দুঃখ কেউ কি বুঝেছে
রমণী লালন করে মাসিকের লালঝুরি আলো
জ্যোৎস্না কি নিথর—আমি
এতো ছোট বুনোফুল জীবনে দেখিনি

যৌবন

পরমানন্দ সরস্বতী

যৌবন হৃদয়ে জাগে একা
বহু ইচ্ছাময়,
লাজুক হাতের খোঁজে
আশ্রয় অভয়।
ঈশ্বর নিপুণ নট
করেন রচনা
রক্তের চক্রান্ত, বুকে
সুখের জল্পনা—
শৃঙ্গার শশাঙ্ক-মুখ
সে চায় অনল,
ভিখারী সংসার চায়
খনির নতুন মণি
—জরায়ুর ফল॥

প্রণাম

বাসুদেব দেব

পাহাড়তলীর গাঁয়ে কাঠকুটো ভালোবাসা দিয়ে
সে-ই জেলেছিল অগ্নি, শিখিয়েছে নাচ
সে-ই দিয়েছিল স্বাদ মহুয়ার, গড়েছে কুঠার
দেখিয়েছে টিলা থেকে হরিণের শিঙে গাঁথা
রক্তমাখা আদিবাসী চাঁদ

অনেক দিয়েছে সে তো, আজ তাকে কিছু দিতে হয়
একান্ত আপন মৃত্যুভয়, মাঝরাতে হঠাৎ পিপাসা
কিছু ভ্রম কিছু পদাবলী স্খলিত স্পর্শের কান্না
এই সব তাঁকেই প্রণাম

বিমল মিত্র

॥ ১১ ॥

মরিশাসের মূল রাজধানী ছাড়া আর জায়গায় যত বাড়িতে গিয়েছি সব ড়র সামনেই দেখেছি একটা করে বাগান গন থাকে। বড় বড় শহরে সাধারণত রেওয়াজ নেই। না থাকার অনেক ণ। প্রথমত বাগান সুরক্ষিত রাখা এক ন্যা বিশেষ। দ্বিতীয়ত এই বহুতল শণ্ট ফ্ল্যাট বাড়ির যুগে বাগানের জন্যে তি জমির অভাব। এলাহাবাদে গিয়ে থছি কবি সুমিত্রানন্দন পন্থের বাড়িটা ানবেষ্টিত। শ্রীমতী মহাদেবী বর্মার ড়ও তাই। শ্রীউপেন্দ্রনাথ আশকজীর ড়তেও তাই। শুনেছি এলাহাবাদের তৎ-ীন ব্রিটিশ পৌর কর্তৃপক্ষ বাড়ির নে এক টুকরো বাগান রাখা অবশ্য নীয় বলে আইন প্রণয়ন করে দিয়ে-লন। কিন্তু বর্তমানে সে আইনের ।দা রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না।

মরিশাসের লোকসংখ্যা শুনলাম এখন ি লক্ষের কিছু কম। দেশটা চওড়ায় ত্রিশ মাইল, আর মাত্র তিরিশ মাইল বায় দিকে। অর্থাৎ প্রায় কলকাতার তনের কাছাকাছি। লোকসংখ্যার তুলনায় তনটা বলতে হবে খুবই বিস্তৃত। এত ট দ্বীপ বলেই মরিশাস আরো প্রায় কচক্ষুর অগোচরেই থেকে গিয়েছিল। া যেমন জল বাঁধে, লোকেও তেমনি ক বাঁধে। হাটে-মাঠে বা রাস্তায় ানেই ভীড় দেখা যায় সেখানে গিয়েই ষ ভীড় বাড়ায়। মরিশাসে মানুষের ড কম বলেই বোধকরি মানুষের দৃষ্টি দিন সেখানে পড়েনি।

শুধু যে তাই তা নয়, পয়সাতেও সা বাঁধে। মানে পয়সাই পয়সাকে কর্ষণ করে।

যেমন শেয়ার মার্কেট। যাদের পকেটে শ পয়সা আছে, তারা আরো বেশি পয়সা ার্জন করার জন্যে শেয়ার-বাজারে গিয়ে ার বেচা-কেনা করে। কারণ ব্যাংকের া সুদের পয়সায় তাদের মন ভরে না। আরো আছে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। বিনা-পরিশ্রমে ধনী হবার লোভে অনেকে সামান্য পুঁজি ঢেলে বেশি পুঁজি বাড়াবার জন্যে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে গিয়ে বাজি খেলে। তাতে অবশ্য হারে বেশি লোক, কিন্তু জেতবার আশায় সে আরো বেশি পুঁজি ঢালে।

কলকাতার বাজারে গিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য অনেকেরই নজরে পড়েছে। বাজারের একটা জনবহুল জায়গায় কেন্দ্র-স্থলে শনি-ঠাকুরের একটি ছবি বা মূর্তি টুলের ওপর বসানো থাকে। তার সামনে একটা মস্ত বড় থালায় কিছু ফুল আর বেলপাতা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

এমনিতে যদি শনি ঠাকুরের ছবি আর থালায় ফুল বেল-পাতা রাখা থাকতো তাহলে কেউ পয়সা বা প্রণামী দিত না। কারণ ঠাকুর তো কথা বলতে পারে না। শুধু ঠাকুরের মাথার কাছে একটা প্ল্যাকার্ড থাকে। তাতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকে 'শনি ঠাকুরের পূজা হইবে।' তার পাশে কোথাও লেখা থাকে না যে 'পূজার খরচ বাবদ টাকা দিন'।

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে থালার ওপর প্রায় পাঁচ-ছ' টাকার খুচরো পয়সা দৃশ্যমান অবস্থায় ছড়ানো থাকে। সেই পয়সা ছড়ানোর ব্যাপারটা স্পষ্টত ইঙ্গিত-ধর্মী। মূক-ভাষায় সেই পয়সাগুলি পথিককে জানিয়ে দেয় আপনারাও অন্য দাতাদের মত এখানে পয়সা ফেলুন। সেই পয়সায় আপনাদের কল্যাণার্থে শনির পুজো অনুষ্ঠিত হবে।

যে মানুষটি এই সমস্ত কিছুর প্রযোজক তাকে কিন্তু ঠাকুরের ধারে-পাশে কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। সে যে কোথাও পাশেই আত্মগোপন করে আছে তা জানতে পারার কোনও উপায় সে রাখে না।

সব কিছু দেখে-শুনে আপনিও হয়ত টাকা পয়সা প্রণামী দিয়ে যাবেন, এবং তার ফলে টাকাতেই টাকা বাঁধবে।

মার্কিনী লেখক মার্ক টোয়েন একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি বই লিখে যা টাকা উপার্জন করতেন, তার উদ্বৃত্ত টাকা শেয়ার-বাজারে খাটিয়ে তা দ্বিগুণ-ত্রিগুণ-চতুর্গুণ লাভ করবার চেষ্টা করতেন।

একবার একজন শেয়ার ব্রোকার এসে তাঁকে টেলিফোন কোম্পানির শেয়ার কেনবার পরামর্শ দেন।

টেলিফোন জিনিসটা তখন পৃথিবীর নতুন আবিষ্কার।

মার্ক টোয়েন জিজ্ঞেস করলেন—টেলিফোন কী?

ব্রোকার ভদ্রলোক বললেন—টেলিফোন এমন এক যন্ত্র যাতে অনেক দূরের লোকের সঙ্গে আপনি ঘরে বসে মুখোমুখি কথা বলবার সুখ পাবেন। আপনার সময় বাঁচবে, যাতায়াতের খরচাও বাঁচবে—

সব শুনে মার্ক টোয়েন বললেন—না, ও কোম্পানি চলবে না—

পরে অবশ্য মার্ক টোয়েন টেলিফোনের শেয়ার না কেনবার জন্যে আফসোস করেছিলেন। আফসোস করতে হতো না, যদি টেলিফোন কোম্পানি প্রথমেই ভাবী গ্রাহকদের কিছু আগাম আর্থিক সুযোগ-সুবিধে দিতেন। তা হলেই টাকায় টাকা বাঁধতো।

আমরা একেবারে আগন্তুক। বিদেশে সম্পূর্ণ অপরিচিতের বাড়িতে অত্যন্ত অসময়ে যাচ্ছি। সুতরাং আমাদেরই সঙ্কোচটা বেশি। কিন্তু গৃহকর্তার তরফ থেকে বড় আন্তরিক এবং উদার আহ্বান।

রামফল আমাদের ভেতরে ঢুকে সদর-দরজা খুলে দিয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানালে। বললে—ভেতরে চলে আসুন—

একটা ভীষণ-দর্শন কুকুর আর্তনাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে এক ধমকে নিরস্ত করে দিয়ে বলে উঠলো—ও কিছু বলবে না, আপনারা নির্ভয়ে চলে আসুন—

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। বাড়ির অধিবাসী বা পরিচারকরাও বোধ হয় সবাই ঘুমে অচৈতন্য। ঘরে ঢুকে দেখি চারদিকের দেওয়ালে কচ্ছপের খোলা আর হরিণের সিংওয়ালা মুণ্ডু সাঁটা রয়েছে সার-সার। এত কচ্ছপ আর এত হরিণ কোথা থেকে এল?

রামফল বললে—ও-সব আমি শিকার করেছি—

বললাম—কিন্তু বাঘ বা ভাল্লুকের, কিম্বা সিংহের মুণ্ডু নেই কেন?

রামফল বললে—ও সব মরিশাসে পাওয়া যায় না—

আমরা ততক্ষণে সোফা-কোচের ওপর বসে পড়েছি। দেখলাম ঘরের মেঝের ওপর ছেলে-মেয়েদের খেলনা গড়াগড়ি যাচ্ছে। বোঝা গেল সন্ধ্যেবেলা এখানেই রামফলের বাচ্চারা খেলা করেছে।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে রামফল বললে—আপনারা কী খাবেন বলুন? হুইস্কি, না রাম, না ব্র্যান্ডি, না স্যাম্পেন? যার যা ইচ্ছে চেয়ে নিন—

বলে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর উঠে গিয়ে কোথা থেকে খেপে খেপে একগাদা বোতল এনে আমাদের সামনের টেবিলে পাশাপাশি রাখতে লাগলো। একটা দুটো তিনটে করতে করতে প্রায় কুড়িটা নানান মাপের বেঁটে, চ্যাপটা, লম্বা, পেট-মোটা বোতল হাজির করলে। তারপর বললে—সোডা নেবেন, না প্লেন ওয়াটার?

যোশীজী জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কী দিয়ে খান?

রামফল বললে—আমি নীট খাই, হুইস্কি রাম কখনও সোডা বা জল মিশিয়ে খেতে নেই—

আমি অবাক হয়ে সব দেখছিলাম আর শুনছিলাম। বাড়িতে ভাঁড়ারে এত মদ থাকতে কিনা রামফল হোটেলে গিয়ে রোজ মদ খায়?

রামফল একটা বোতলের গায়ে আঁটা লেবেল দেখিয়ে বললে—এই দেখুন, এটা আইরিশ হুইস্কি, এটাই আমার নিজের সবচেয়ে বেশি ফেভারিট। এতে কিকটা বেশি—

যোশীজী আর গুপ্তজীর চোখ দুটো এই সব দেখে তখন বিস্ময়ে আনন্দে গোলাকার হয়ে গেছে। আইরিশ হুইস্কির বোতলের লেবেলটা ভালো করে দু জনেই মন দিয়ে পড়তে লাগলো। বুঝতে চেষ্টা করলো জিনিসটা সত্যিই খাঁটি আয়র্ল্যাণ্ডে তৈরি কি না।

বললে—এসব কোত্থেকে আনো তুমি রামফল? এসব তো ইণ্ডিয়ায় চোখে দেখা যায় না—

রামফল কথাটা শুনে যেন একটু কৃতার্থ হলো মনে হলো। বললে—এই যে এটা স্প্যানিশ হুইস্কি, এটা হলো রাশিয়ান ভডকা, এটা হলো ফ্রেঞ্চ লিকর, আর এটা হলো জামাইকা রাম...

কত রকম যে নাম পর-পর বলে গেল রামফল তা এখন আর আমার মনে নেই। আগে যদি জানতাম যে এ-প্রসঙ্গ আমাকে আবার লিখতে হবে তাহলে নোট-বই খুলে তখনই নামগুলো সব লিখে রাখতাম। পৃথিবীতে যে এত রকমের মদ আছে, আর এত তার খাদক আছে তা কে জানতো! সুরাপায়ী লোক আমি অনেক দেখেছি জীবনে। আমি এমন অনেক মহৎ-প্রাণ লোক দেখেছি যিনি নিয়ম করে সুরা পান করে থাকেন, আবার এমন অনেক জঘন্য চরিত্রের মানুষ দেখেছি যাঁরা সুরা স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। সুরা পান করা বা না-

ওপর ভালো মন্দ সৎ অসৎ বিচার করা নয় তাও জানি।

গুপ্তজী জিজ্ঞেস করলে—এসব কোথা আনা?

রামফল যেন আরো কৃতার্থ হলো। ন কেন, সবাই এই মরিশাসে কিনতে রা যায়—

আমি বললাম—বাড়িতে যখন তোমার র এত স্টক তাহলে বেল-ভিউ হোটেলে র রোজ ড্রিঙ্ক করো কেন?

রামফল বললে—যাই তোমাদের তে। শুনেছিলাম ইণ্ডিয়া থেকে যারা নে কনফারেন্সের ডেলিগেট হয়ে ছে তারা হোটেল-বেল-ভিউতে এসেছে। দেখতে যেতাম। ভাবতাম তাদের সঙ্গে াপ করবো। কিন্তু আলাপ করবো কী? তোমরা তো কেউ ড্রিঙ্ক করতে না। মরা তো কেবল পারাটা আর জ খেতে। আলাপ তো ড্রিঙ্ক করতে তেই জমে—শেষকালে এই আশকজীর অসুখ না হতো তাহলে কি তোমাদের গে আমার পরিচয় হতো, না তোমরাই মার বাড়িতে আসতে—?

আশকজী তখন পাশেই একটা চানায় শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণা চাপতে চেষ্টা ছিলেন।

বললেন—কই, আমার ওষুধ কই ফলজী?

যেন এতক্ষণে ওষুধের কথাটা মনে ড় গেল রামফলের। বললে—ও, ঠিক া, আমি এখুনি ওষুধ নিয়ে আসছি—

বলে হাতের গেলাসটায় চুমুক দিয়ে ষ করে ঘর থেকে উঠে বাইরে কোথায় ল গেল।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি তে লাগলাম। ভাবখানা সকলেরই যেন যে এ আবার কেমন ধারা চরিত্র। ণ্ডিয়াতে এ ধরনের মানুষ অনেক দেখা ছে। তারাও ঠিক এই রামফলের মতই ছলতার মধ্যে মানুষ। তারাও সঙ্গীর ভাবে হোটেলে-হোটেলে ঢুঁ দিয়ে ড়ায়। তাহলে সমস্ত পৃথিবীর মানুষই আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে নাকি! হলে কোয়েতের সেই ছেলেটা, যে মাসে কার হাজার টাকা মাইনে পায়, যা লাছিল তাই-ই কি সত্যি? শিউপূজনের ী রান্না তাহলে কী দোষ করেছে?

সেই বিলাস-বহুল কনকটের বাড়ির িং-রুমের মধ্যে বসে বসে আমার মনে ত লাগলো এই রামফলও বোধ হয় াহলে ঘোষের-পোদের মত শুধু শিমু-লির টিকিট কেটেছে? শিমুরালি আড়ং-টা পায়রাডাঙা আর নৈহাটির টিকিটই সে টেছে? এর তো অভাব নেই, এ তো র্থের আর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে কী করে সময় কাটাবে ভেবে না পেয়ে কেবল হাজার-হাজার টাকার বিদেশী মদের ভাঁড়ার বাঁধি করে চলেছে। জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজন মিটিয়েও এর এত টাকা উদ্বৃত্ত থাকে যে মদের নেশা করা ছাড়া আর কোনও পথও এ জানে না।

কিন্তু যখন মরিশাস স্বাধীন হয়নি, যখন মরিশাসে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম ছিল, তখন কেন এই রামফলের পূর্বপুরুষেরা স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করেছিল? কেন যশোবন্ত নাথমল রায়জীরা ইংরেজদের অপশাসনে জেল খাটার শাস্তি মুখ গুঁজে সহ্য করেছিল?

যোশীজী আর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত নন। তিনি বললেন—আমি বোতলটা খুলে ফেলি—

বলে সত্যি সত্যিই বোতলটা খুলে নিজের আর গুপ্তজীর গেলাসে ঢালতে শুরু করে দিলেন।

*

সেই মধ্যরাত্রের মরিশাসে ডাঃ সুরেশ রামফলের বাইরের ঘরে বসে আমার মনে হলো বর্তমান কালটা যেন আমার চোখের সামনে থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। তার বদলে তিন শো বছর আগের আর এক মরিশাস চোখের ওপর ভেসে উঠলো। তখন এই মরিশাস এ-রকম ছিল না। শীতে হি-হি কাঁপতে কাঁপতে তখন দলে দলে লোক এখানে চলে আসছে, এসে পাল তোলা জাহাজ থেকে নামছে এখানে। সঙ্গের সাথী এক কাপড়, এক গামছা। আর হাতে রামচরিতমানসের একটা ছেঁড়া ময়লা পুঁথি।

সে সব কথা আগে বলেছি। কিন্তু তারও আগে?

তারপরের যেমন একটা তারপর থাকে, আগের আগেও তো একটা আদি থাকে। সেই অনাদি আদির কথা মনে পড়া কি অস্বাভাবিক? সারা পৃথিবীর তৈরি শ্রেষ্ঠ ব্র্যাণ্ডের মদ্য-সম্ভারের আসরে বসে আমার যেন তখন সেই অনাদি আদির কথা মনে পড়তে লাগলো।

এ আমার স্বভাব। যার বর্তমানটা দেখছি তার গোড়াটা কল্পনা করতে ইচ্ছে করে। আরম্ভটা জানতে ইচ্ছে করে।

এক একদিন এই কলকাতার চৌরঙ্গীর মোড়ের ফুটপাথ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতেও আমার যেমন মাঝে মাঝে পুরোন অতীতের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় বিশেষ করে ১৬৯০ সনের ২৪শে আগস্ট তারিখটার কথা। সেদিনই এক ইংরেজ সন্তান কলকাতার গঙ্গার এই এখনকার বাবুঘাটের কাছে এসে পাল-তোলা নৌকোর নোঙর ফেলে-

ছিল। তখন এই কলকাতাও জঙ্গলে আর জলা-জমিতে ভরতি ছিল। যিনি পাল-তোলা জাহাজ থেকে সেদিন প্রথম কলকাতার মাটিতে পা দিয়েছিলেন, তাঁরই নাম জোব চার্নক।

এই মরিশাসের ছিল তার চেয়েও করুণ অবস্থা। বলতে গেলে ভূগোলে এই মরিশাসের দ্বীপেরই নাকি তখন কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এই যে আমাদের এই হিমালয় পর্বত, এই হিমালয় পর্বতটার পর্যন্ত নাকি কোনও চিহ্ন ছিল না।

বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন এখন যেখানে হিমালয় পর্বতটা রয়েছে ওখানে নাকি ওটা ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল শুধু জল আর জল। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ওস্যানের বিস্তৃতি ছিল সেখান পর্যন্ত। আর আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এক বিরাট মহাদেশ বিরাজ করতো, যেখানে যাতায়াত করতো আদি মানবরা। অর্থাৎ আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে এখন যেমন নৌকো বা জাহাজের সাহায্য নিতে হয়, তা নিতে হতো না তখন। হাঁটতে হাঁটতে তোমার যতদূর ইচ্ছে চলে যাও, কেউ তোমায় বাধা দেবে না।

এই মহাদেশটার নাম ছিল 'লিমুরিয়া'।

হয়ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই কাহিনী অনেকেরই শুনতে ভালো লাগবে না। তা, ভালো না-লাগবারই তো কথা। কারণ, আমরা আমাদের নিজেদের বর্তমান নিয়ে এতই আবিষ্ট যে আমরা অতীতের কথা জানতে চাই না, এমন কি শুনতেও চাই না। আমরা শুধু এই এখনকার কথা শুনতে চাই।

কিন্তু এ সংসারে এমন মুষ্টিমেয় কিছু বেয়াড়া লোকও আছে যারা চোখে দেখা বইয়ে পড়ার বাইরেও আরো কিছু জানতে চায়, আরো কিছু শিখতে চায়। তাই রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়লো। তাঁর একটা চিঠিতে আছে—যারা বেশি দেখে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে হয় বৈজ্ঞানিক, যারা বেশি ভাবে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে হয় দার্শনিক। আর যারা দেখেও বেশি ভাবেও বেশি তারা ভবিষ্যতে হয় 'টোট্যাল ম্যান', অর্থাৎ লেখক।

সেই সব 'টোট্যাল ম্যান'দের জানা উচিত ভূগোলের এই ভাঙ্গা-গড়া ওঠা-নামার কথা। যে ভূগোলে অতীতে এক ভাঙা-গড়া ঘটেছে, ভবিষ্যতেও যে তেমনি ভাঙা-গড়া ঘটবে না তার কি নিশ্চয়তা আছে ? ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি না করলেও ভূগোল তো তার নিজের পুনরাবৃত্তি করতে পারে। তাই অতীতকে

নলে আমরা ভবিষ্যতের কিছু নিশানা তে পেয়ে যেতে পারি।

তাই বলছি অত বড় একটা মহাদেশ মুরিয়া', সেটা তাহলে গেল কোথায়?

অনুমান করা যেতে পারে মহেঞ্জো-রোর মত এই লিমুরিয়াতেও একদিন ড় এক ভূমিকম্প হলো। আর তার ফলে স্ত মহাদেশ জুড়ে শুরু হলো জলো াস। জলোচ্ছাসের ফলে কত লক্ষ লক্ষ াক যে প্রাণ হারালো তার কোনও হদিশ ই কোথাও। কত লোক আগুনে পুড়ে রলো তারও কোনও বিবরণ কোথাও খা নেই। লেখা নেই কত জনপদ, কত নুষ, কত শিশু, কত বৃদ্ধ সেদিন প্রাণ রালো বেঘোরে। যেখানে জমি ছিল সখানটা হলো জলময় আর যেখানে জল ল সেখানটায় হলো জনপদ। ভূগোল ধাতা সেদিন মানুষের জীবন নিয়ে যে লেয়ের মহালীলা করলেন তার রেকর্ড কাথাও কোনও ইতিহাসের ফাইলে আর লপিবদ্ধ রইল না।

নেহাৎ মরিশাসের ভাগ্য ভালো যে জায়গাটা ছিল পাহাড়। যতই সে জলের তলায় তলিয়ে যাক, চুড়োটা ঠিক জলের ওপর মাথা তুলে রইল। ভেসে রইল ওই তিরিশ মাইল লম্বা আর উনত্রিশ মাইল চওড়া চুড়োটা। এখনও যারা ওই মরি-শাসের চারপাশের সমুদ্রের জলে নৌকো চালিয়ে মাছ ধরে বেড়ায় তারা জানে সেখানে জল কত অগভীর। আরো জানে জলের তলায় যা পাওয়া গেছে তা মাটি নয়, কাদা নয়, পাথরও নয়, শুধু প্রবাল আর প্রবাল। মরিশাসের চার চৌহদ্দির জলের তলায় যারা গভীরে ডুব দিয়েছে তারা জানিয়েছে সেখানে প্রবাল ছাড়া নাকি আর কিছুই নেই। মরিশাসকে তাই প্রবালবেষ্টিত দ্বীপ বললে মিথ্যে বলা হয় না।

আর তাই যে-সব টুরিস্ট মরিশাসে বেড়াতে আসে তারা ওই সমুদ্রের তটে নির্ভয়ে সাঁতার কাটে, নৌকো-বিহার করে, তার সঙ্গী-সঙ্গিনী নিয়ে সুইমিং-কস্ট্যুম পরে অবলীলায় জলকেলি করে।

এই প্রবালবেষ্টিত দ্বীপটার সন্ধান যে কে প্রথম বিশ্ববাসীদের জানিয়েছিল সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। বলা হয় যিশু খৃষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে ফোনিসিয়ন জাতির লোকেরা নাকি এখানে প্রথমে আসে। কিন্তু তারা এলেও এই মরিশাসে তাদের কোনও রকম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মালয়বাসীরা যখন নিজেদের দেশ ছেড়ে মাদাগাসকার দ্বীপে বসতি করতে শুরু করে তখন তারা প্রথমে এই মরিশাসে এসে তারপরে এখান থেকে মাদাগাসকারের দিকে যায়। তবে এ ব্যাপারে কোনও প্রমাণ দিতে কেউ পারবে না।

কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা যে এখানে আসতো আর এখানে এই দ্বীপে নেমে কিছুদিনের বিশ্রাম নিয়ে আবার নৌকোর নোঙর তুলে দূরে সমুদ্রে পাড়ি দিত তার কিছু প্রমাণ মিললেও মিলতে পারে। সেই আরব দেশের লোকেরা যখন এখানকার মাটিতে নেমে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতো তখন দেখতে পেত লোক-জন কেউ কোথাও নেই। জন-মানবহীন মরিশাস, কোথাও চাষ-বাসেরও কোনও চিহ্ন নেই। তারা বুঝতে পারতো চাষ বাস যখন কোথাও নেই, তখন মানুষও কোথাও নেই। শুধু দেখতে পেত কেবল যত রাজ্যের কাক। কাকে কাকে বোঝাই ছিল তখন দেশটা। আর তার সঙ্গে ছিল আরো অন্য জাতের পাখিদের ভিড়। পাখিগুলো নির্ভয়ে কেবল এগাছ থেকে ওগাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে এক ধরনের পাখি ছিল যার নাম তারা দিয়েছিল ডো-ডো। সে পাখিদের এখন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। তারা অন্যান্য অনেক পশু-পাখির মতই একদিন পৃথিবী থেকে চিরকালের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এখনকার প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ প্রফে-সার বিষ্ণুদয়ালের মতে শব্দটার শুদ্ধ উচ্চারণ ডো-ডো নয়, দো-দো। সেই ডো-ডো পাখি যেমন করে একদিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তেমনি করে আরো অনেক কিছুই তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু দো-দো পাখির দোষ দিয়ে লাভ নেই। সেদিনকার সেই মানুষগুলোও তারাই বা কোথায় গেল? সেদিনকার সেই মানুষগুলোর মনটাও কি আর সে-রকম আছে? যে মন দিয়ে আগের যুগের মানুষ মন্দিরের

দেবতাকে গিয়ে প্রণাম করতো, যে প্রাণ টেনে মানুষ মানুষের বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াতো, মানুষের সুখ আনন্দের অংশ ভাগ করে ভোগ করতো, তারাই বা কোথায় হারিয়ে গেল ?

একদিন এই সম্বন্ধে জানবার জন্যে আমার খুব কৌতূহল হয়েছিল। জাতীয় গ্রন্থাগারে গিয়ে আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগেকার পুরোন খবরের কাগজ ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ একটা চিঠির ওপর নজর পড়লো। চিঠিটা জনৈক পাঠক সম্পাদকের ঠিকানায় লিখেছিলেন। পত্র-প্রেরক সম্পাদককে লিখেছিলেন—'বর্তমানে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন টাকায় মাত্র চোদ্দ সের দুধ পাওয়া যাইতেছে। দুধের এই অগ্নিমূল্য হইলে মানুষ কী খাইয়া বাঁচিবে?' ইত্যাদি ইত্যাদি—

'যুগান্তরে'র সহযোগী সম্পাদক স্বর্গীয় বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত একবার আমাকে বলেছিলেন—'জানেন, আমার যখন বারো বছর বয়েস তখন আমার ঠাকুরদাদা আমাকে বলতেন—'খুব সাবধান দাদা, দিনকাল খুব খারাপ পড়েছে।' তারপর আমার যখন কুড়ি বছর বয়েস তখন আমার বাবা বলেছিলেন—'খুব বুঝে শুনে চলবে বাবা, দিন-কাল খুব খারাপ পড়েছে।' তারপর আমার এখন আমি নিজে বাবা হয়েছি, এখন আমিও আমার ছেলেকে বলি—'খুব বুঝে শুনে চলবে বাবা, দিনকাল খুব খারাপ পড়েছে—'

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলতেন—দেখ, কোনও ঘড়ির সঙ্গে কোনও ঘড়ির সময়ের মিল নেই, কিন্তু তা বলে কি তাতে সময় বসে আছে ?

সময় বসে থাকে না। ইতিহাসও বসে থাকে না। চলে। আর চলে বলেই সে নিজের সত্তাকে আঁকড়ে ধরে স্থিতধী হয়ে থাকতে পারে। যার চলবার ক্ষমতা নেই তারই লাঠির সাহায্য দরকার হয়। লাঠির সাহায্য অপরিহার্য হয় দুর্বলের কাছে। ইতিহাসের যত মহাপুরুষ তাঁরা সবাই চলেছেন। তাঁদের লাঠির দরকার হয় নি। ইতিহাসেরই প্রয়োজন একজন তথাগত বুদ্ধদেব, একজন শংকরাচার্য, একজন যীশু খৃষ্ট, একজন চৈতন্যদেব একলা-একলা চলেই সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছেন অসকার ওয়াইল্ড বলে গেছেন—"He who has got mission must to it alone" [illegible] তাঁর 'সংগ্রাম ও শান্তি' নামে যান ইটের মত যে উপন্যাসটি লিখেছিলেন তাতে [illegible] পরিবারের গল্প উপাদেয় করে লিখে গেছেন। কিন্তু সে উপন্যাসের একটিই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। প্রতিপাদ্য ছিল এই যে নেপোলিয়ান ইতিহাসকে সৃষ্টি করেন নি। ইতিহাসই নিজের প্রয়োজনে নেপোলিয়ানকে সৃষ্টি করেছিল।

যে ইতিহাসের এক শক্তি যে মরিশাসের স্বাধীনতার সংগ্রামে কতখানি শক্তি যুগিয়েছিল সেই কথাই এখানে আসার পর থেকে ভেবে এসেছি। মরিশাস তো শুধুমাত্র একটা দেশই নয়, ছোট আকারে একটা বৃহৎ সংগ্রামেরই প্রতীক। সেই মরিশাসকে সত্য বিচার করতে গেলে যা করতে হয় তা-ই এতক্ষণ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের ওপরে শিক্ষিত মরিশাস-বাসীর যে এত ভালবাসা আর ভক্তি সে শুধু তাঁর কবিতাবলীর ফরাসী ভাষার অনুবাদ পড়ে নয়। তার আরো একটা কারণ আছে।

রবীন্দ্রনাথের তখন বয়েস অল্প। একদিন একটি সাময়িক বাংলা পত্রিকা তাঁর হাতে এসে উপস্থিত। নতুন বেরিয়েছে পত্রিকাটা। নাম 'অবোধ বন্ধু'। এই কলকাতা থেকেই প্রকাশিত।

তাতে ধারাবাহিক একটি উপন্যাসের প্রথম কিস্তি অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সেটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। লেখক কে? সেণ্ট বার্নাডিন। তিনি একজন মরিশাসবাসী ফরাসী ভদ্রলোক। উপন্যাসের কিস্তিতে যেখানে 'ক্রমশ' দেওয়া আছে, সেই পর্যন্ত পড়েই রবীন্দ্রনাথ ছটফট করতে লাগলেন পরবর্তী ঘটনা জানবার জন্যে। কোনও উপন্যাস যে মনকে এত নাড়া দিতে পারে তা তিনি তার আগে কল্পনাও করতে পারেন নি।

যতবার পত্রিকাটি হাতে আসে ততবারই সেটি খুলে প্রথমেই তিনি সেই উপন্যাসটির কিস্তি পড়েন আর মুগ্ধ হয়ে যান। উপন্যাসটির নাম 'পল ও বার্জিনি'। ইংরেজি নাম 'পল অ্যান্ড ভার্জিনিয়া'। উপন্যাসের পাত্রপাত্রী সবাই মরিশাসবাসী।

এই ঘটনা জানবার পর থেকেই মরিশিয়ানরা রবীন্দ্রনাথের আরো অনুরক্ত হয়ে উঠলো।

আর শুধু রবীন্দ্রনাথই বা কেন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিও অনুরক্ত তারা। [illegible] মরিশাসে আজ যে প্রথা [illegible] তিনিই প্রথম সে প্রথাটি চালু করেন।

একদিকে কেশবচন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ আর অন্য দিকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, অ্যানি বেসান্ট, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, আর মাদ্রাজের প্রকাশক [illegible] কোম্পানী এঁদের সকলের কাছে মরিশাসবাসীরা কৃতজ্ঞ। তাই মরিশাসের যে কোনও শিক্ষিত লোক এঁদের নাম শুনলেই আজ শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেন। তাঁরা বলেন—আমরা যে আজ স্বাধীন হয়েছি এ তো তাঁদের মতন সেইসব মহাপুরুষদের জন্যেই।

মরিশাসবাসীরা এঁদের কাছ থেকেই জেনেছে যে হিংসা দ্বারা হিংসার বিনাশ হয় না, তা বিনাশ হয় একমাত্র প্রেমের দ্বারা। পেয়ে নেবার প্রশ্ন নেই, আছে শুধু দেবার প্রশ্ন। অহং শুধু নিতে জানে। কিন্তু আমার ধর্ম দেওয়া। এই নেওয়া আর দেওয়ার সামঞ্জস্য করতে পারলে তবেই মানুষের কল্যাণ হবে, তবেই সমাজের মঙ্গল হবে, তবেই দেশের উন্নতি হবে, তবেই বিশ্বের পরস্পরের মধ্যে শান্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে।

—এ কি, তোমরা এখনও শুয়ে

রে নি যে? এখনও হাত গুটিয়ে বসে াছো? বোতল এখনও ভর্তি?

রামফলের গলার শব্দে আমার চিন্তা-ত্র হঠাৎ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ামি রামফলের দিকে চেয়ে দেখে অবাক য়ে গেলাম। রামফল আমাদের কে? য়ত আজ রাত্রের পর আর জীবনে তার ঙ্গে কখনও দেখাও হবে না। তবু কেন স আমাদের হোটেল থেকে নিজের াড়িতে তুলে এনেছে? আমাদের এত ক্ষবাস সে কেন করছে? তার সঙ্গে ামাদের কীসের সম্পর্ক? আমরা তার ক?

—আরে, তোমরা দেখছি কোনও াজের নও হে, খাবার-দাবার সব রয়েছে ামার 'মিট-সেফ'-এ, ফ্রিজের মধ্যে রয়েছে ুরগীর রোস্ট, সব বার করে নিতে ারো নি? এও তোমাদের বলতে হবে? াটা নিজের বাড়ি বলে মনে করে নিতে ারো না?

আমি বললাম—তুমি এতক্ষণ কোথায় গয়েছিলে?

রামফল বললে—আমি গিয়েছিলাম ামার স্ত্রীকে বলতে যে আমার কজন ফ্রেন্ড এসেছে বাড়িতে, আমরা নিচের ঘরে একটু ফূর্তি করছি—

—তা তোমার স্ত্রী কী বললে?

—সে বললে তোমরা ফূর্তি করো ার যা ইচ্ছে করো, দয়া করে মদ-টদ খেয়ে াতলামি কোর না, বেশি চেঁচামেচিও কার না, বাচ্চারা সবে একটু ঘুমিয়েছে, চেঁচামেচি শুনলে ওদের ঘুম ভেঙে াবে—

বললাম—তোমার স্ত্রী তো সত্যিই বে ভালো রামফল—

রামফল বললে—খুব ভালো। আমি খন লন্ডনে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলাম, খন ওকে বিয়ে করে এখানে নিয়ে েসেছিলাম—

বললাম—তোমরা মরিশাসের সবাই দেখছি বাইরে থেকে মেয়ে বিয়ে করে নয়ে আসো—

—কে বললে? আর কে বাইরে থেকে ময়ে বিয়ে করে এনেছে?

বললাম—এখানকার একজন টিচার ইন্ডিয়া থেকে একটা মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে, সে মেয়ে তো এখানে আর াকতেই চাইছে না।

—কেন?

—এখানকার লাইফ তার খুব স্লো াগছে। তার সময়ই কাটতে চায় না এখানে। এখন সে তার হাজব্যান্ডকে ছেড়ে ইন্ডিয়াতে চলে যেতে চাইছে। স ইন্ডিয়াতে গিয়ে সিনেমার হিরোইন বে—

রামফল বললে—নিশ্চয়ই তার ছেলে-ময়ে কিছু হয় নি তাই। আমি দশ বছর হলো বিয়ে করেছি, এর মধ্যেই চারটে ছেলে-মেয়ের বাপ হয়ে গিয়েছি—আমার আর সে ভয় নেই—

—তোমাদের এখানে ইন্ডিয়ার মত 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং' নেই?

রামফল বললে—ফ্যামিলি প্ল্যানিং? সেটা আবার কী?

জিনিসটা আমি বুঝিয়ে বলতেই রাম-ফল বললে—ভাগ্যিস নেই। নইলে অনেকেরই মুশকিল হতো।

—কেন?

রামফল বললে—আমি তো ডাক্তারি পাশ করেছি, পাশ করে এখানে এসে চাকরিতে ঢুকেছিলাম। কিন্তু রোগী হলো না মোটে। একে পপুলেশন কম তার ওপর এখানকার জল-হাওয়া ভালো। ফ্রেশ এয়ার, ফ্রেশ ফুড, রোগ হবে কোত্থেকে? এখানকার বাতাসে খুব অক্সি-জেন। তাই চাকরি ছেড়ে দিলুম—

—তাহলে তোমার চলে কী করে?

রামফল বললে—আখের খেত। আখের চাষ-বাস করবার লোকজন আছে, তারাই দেখে। আমি নিজে সারাদিন শুধু মাছ ধরি শিকার করি, আর সন্ধ্যে-বেলা ড্রিঙ্ক করি। আজ এ-হোটেলে, কাল ও-হোটেলে গিয়ে ড্রিঙ্ক করি রাত একটা দুটো পর্যন্ত। যখন বাড়ি ফিরি তখন সবাই ঘুমিয়ে, আমার খাবার ঢাকা থাকে, আমি খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ওই যে সব কচ্ছপ আর হরিণের মুন্ডু-গুলো দেখছো, ওগুলো সব আমার শিকার করা—

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো যে, কথা বলতে বলতে আসল খাওয়াটাই হয় নি।

বললে—এসো, তোমরা আমার সঙ্গে এসো, কে কী খাবার খাবে তুলে নাও—

বলে সকলকে ডেকে নিয়ে গেল মিট সেফের সামনে। মিট সেফের দরজাটাও খুলে দিলে আর ফ্রিজের দরজাটাও হাট করে খুলে দিলে রামফল, ভেতরে চেয়ে দেখি থরে থরে পরোটা সবজি আর মুরগী ভর্তি। অন্ততঃ তিন-চার জনের মত পুরো খাদ্য মজুত। গুপ্তজী,

জোলাজী, দু-জনেই তখনও অভুক্ত। দু' জনেই খাবার ভর্তি করে নিলে প্লেটে।

রামফল বললে—আগে বোতলগুলো খতম করো, তারপরে ফুড—

হঠাৎ ভেতর থেকে বোধ হয় কাঁসের একটা আওয়াজ আসতেই রামফল বলে উঠল—এক মিনিট প্লিজ, আমি একটু ওপর থেকে আসছি, আমার ওয়াইফ ডাকছে, আমি এখনি আসবো—

এতক্ষণে আশকরূজী বিছানার ওপর থেকে শুয়ে শুয়ে বলে উঠলো—আমার ওষুধ? আমার ওষুধ কই রামফল—

রাম বললে—ওষুধ? ওষুধ তো এখানেই রয়েছে—এই নাও, ওষুধ খাও—

বলে একটা গেলাসে হুইস্কি ঢেলে আশকরূজীর দিকে এগিয়ে দিলে। বললে—এই ওষুধটা এক্ষুণি ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নাও, সব যন্ত্রণা এখুনি জল হয়ে যাবে—

বলে গেলাসটা আশকরূজীর সামনে রেখে দিয়ে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সমস্ত দেখে-শুনে আমার তখন বাকরোধ হয়ে গেছে। আশ্চর্য, সামান্য আয় থেকে কিনা এত পয়সা?

ক্রমশঃ

য়েকদিন আগে একটি সেমিনারে ব্যক্তি প্রশ্ন তুলেছিলেন—চল্লিশ র শেষভাগ থেকে পঞ্চাশ দশকের ভাগ পর্যন্ত বাংলার লোকসংগীতে গ্রহ, যে চেষ্টা দেখা দিয়েছিল তা পূর্বে এবং অতুলনীয়। তার ফলে সংগীতকে যথার্থভাবে নানাদিক থেকে ব্ধি করবার আমাদের সুযোগ চল;—কিন্তু বর্তমানে সেই অনু-সা ও উদ্দীপনা একান্তভাবে গম্পিত, অথচ লোকসংগীত গাওয়া কম হচ্ছে না, যদিও তাতে লোক-তের বৈশিষ্ট্য অল্পই পরিলক্ষিত হয়ে। এর কি সংগত কারণ থাকতে এবং এই শৈথিল্যেরই বা হেতু কি? প্রশ্নটি সমীচীন। শুধু লোক-তের ক্ষেত্রেই নয়, আমার মনে হয় ক্ষেত্রেই জানবার আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা নের স্পৃহা বহুল পরিমাণে শিথিল এসেছে—অথচ গেয়ে প্রতিষ্ঠা নের ইচ্ছা কিছুমাত্র কম দেখা যায় না।

অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না তে যুগে এই অনুসন্ধিৎসার মূলে রাজনৈতিক চিন্তা কার্যকর ছল। সেই চিন্তাটি ছিল যে লোক-তের কাঠামোয় বিশেষ বিশেষ গান বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রচিন্তায় জনগণকে প্রাণিত করা। এর ফলও সুদূর-গী হয়েছে—যেটা আমরা দেখতে ছি। কিন্তু এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করলেও যাঁরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ন তাঁরা লোকসংগীতের যথার্থ রসের ন পেয়ে অভিভূত হয়েছিলেন এবং একটি অকৃত্রিম আর্টের দিকে তাঁদের কে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ফলে যাঁরা র সংসর্গে এসেছিলেন তাঁরা ংশে লাভবান হয়েছিলেন। একটি যুগ ধরেই এই কার্যধারা বিস্তৃত। ক্রম এঁদের অনেকেই খ্যাতি অর্জন তাঁদের পূর্বতন একাডেমিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন: কেউ খ্যাতি অর্জনে অসমর্থ একান্তে আত্মগোপন করলেন এবং জনেরা গতানুগতিক পন্থায় অবস্থান ত লাগলেন।

এঁদের শিষ্য প্রশিষ্য যাঁরা তাঁদের ধারা য় রেখে চলেছিলেন তাঁদের মধ্যে এমন টা ধারণা বিস্তৃত হয়েছিল যে তাঁদের নূতনতর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবার জন নেই, যা পাওয়া গেছে তার অধিক আর হয়তো কিছু পাবার মত নেই। এই ধারণা তাঁদের পক্ষে হিতকারী হয়নি, কারণ শুধু গানের সংগ্রহটাই লোকসংগীতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, আঞ্চলিক লোকজীবনকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে লোকসংগীতকে উপলব্ধি করা যায় না। লোকসংগীত সর্বাংশেই একটা লোকসমাজের প্রতিফলন। এর জন্য একটা পরিবেশ, একটা চলমান জীবনধারা, দিনানুদৈনিক গতিপ্রকৃতি—সবই সম্যকভাবে লক্ষ্য করা দরকার। তাছাড়া যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি অঞ্চলের বা কোনও পর্যায়ের লোকগীতি অবলুপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন ঘটে, কেননা লোকগীতি বহুল পরিমাণে পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে যোগসূত্র শিথিল হলে তার একটা পরিচয়ই আংশিকভাবে পাওয়া যাবে যা তার বিগতকালের পরিচয়।

আবার এরও আগের যুগের কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা লোকসংগীতের এস্থেটিক দিকটিকেই উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছিলেন। শচীন দেববর্মণ বা গিরীন চক্রবর্তী ছিলেন এই প্রকৃতির শিল্পী। এই সৌন্দর্যচেতনা শচীন দেব-বর্মণকে পরবর্তী জীবনে কয়েকটি অননুকরণীয় লৌকিক গীতি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বর্তমান যুগে আমরা কি দেখছি? যাঁরা তথাকথিত লোকসংগীতের শিল্পী তাঁদের একমাত্র প্রচার চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই। বেতারে বা আসরে গেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, বাস্তব

অভিজ্ঞতার যে একটা বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা তাঁদের মনে আদৌ উদয় হয় কিনা সন্দেহ। এর ফলে কি হচ্ছে? শহরের ছেলেমেয়েরাই শহরের সঙ্গীত-কেন্দ্রগুলি থেকে বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি শিখে সেগুলির প্রচারে আত্মনিয়োগ করছে। এই যে এত বড় পশ্চিম-বঙ্গ উত্তরবঙ্গ বিস্তৃত রয়েছে—এর কটা জায়গায় গিয়ে কতজন লোকগীতির উৎসস্থল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনে তৎপর হয়েছেন? আরও দুর্ভাগ্যের সূচনা করে যখন খাস কলকাতায় বাধা শিল্পীরা পূর্ববঙ্গের লোকগীতির প্রচারে উৎসাহী হন। গলার মাধুর্যে বা প্রদর্শনী ভঙ্গীতে তাঁদের অভিজ্ঞতার দৈন্যকে কোনক্রমেই ঢাকা যায় না। এই লোক-সঙ্গীতের কি তাৎপর্য তা যাঁরা তাঁদের উৎসাহ দেন তাঁরাই জানেন। এ বিষয় দু একবার লেখার ফলে কয়েকটি কটু চিঠি এই লেখককে পেতে হয়েছে যেগুলির বক্তব্য বিষয় হল তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক হয়ে পূর্ববঙ্গকে হেয় করতে উদ্যত হয়েছেন। কিন্তু যাঁরা এইরকম পত্রাঘাত করেন তাঁরা হয়তো জানেন না এই লেখক তাঁর জীবনের তেইশটি বৎসর প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবেই পূর্ববঙ্গে অতিবাহিত করেছেন এবং উক্ত প্রদেশের লোকসঙ্গীতে একটি বিশেষ সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় একান্তভাবে নিবিড় ছিল।

আজকে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে একটা অহেতুক আত্মতুষ্টি যাকে ইংরিজিতে বলে কমপ্লেসেনসি। এটা দূরে করা অত্যাবশ্যক। লোকসঙ্গীত যাঁদের আকর্ষণ করে তাঁদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সর্বতো-ভাবে সচেষ্ট হতে হবে। একথা বলা উচিত হবে না যে তাঁদের শিক্ষা নিরর্থক কেননা প্রতিটি শিক্ষারই একটি সুফল আছে. কিন্তু এটা আদৌ যথেষ্ট নয়, কারণ এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উপলব্ধি, তারপরে গাইবার প্রশ্ন আসে।

যা বলা হল সেটা কি শুধু লোক-সঙ্গীতের পক্ষেই প্রযোজ্য। বোধ করি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই উপলব্ধির প্রশ্নটি অত্যন্ত সত্য হয়ে দেখা দেয়। আজ রবীন্দ্র-নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ সব রচয়িতার গানই একভাবে প্রচারিত হয়ে চলেছে; কারুর সঙ্গে কারুর প্রভেদ বোঝবার উপায় নেই। এ যুগের রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর মূলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের [illegible] যথেষ্ট তফাৎ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জ[illegible]-কালে সাক্ষাৎ রবীন্দ্র উৎস থেকে [illegible] রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছেন এবং [illegible] রেকর্ড সঙ্গীতের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত আছেন তাঁরা বুঝতে পারেন তফাতটা কোথায় এবং কতখানি। অতুলপ্রসাদের গান যেরকম নিবীর্যকণ্ঠে গাওয়া হয় উদাত্তকণ্ঠে অতুলপ্রসাদ সেভাবে গাইতেন না; দ্বিজেন্দ্র-লালের বলিষ্ঠতাও অতি নমনীয় গায়ন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করছে। এককথায় কম্পোজারদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে চিনে নেবার যে আন্তরিক চেষ্টা আমাদের শিল্পীদের থাকা উচিত ছিল তা নেই। কোনও রচয়িতার গানের প্রয়োগে কোনটা "কমপ্যাটিবল" আর কোনটা "আনকমপ্যাটিবল" তা তাঁদের অনেকের কাছে কিছুমাত্র স্পষ্ট নয়। অনুসন্ধিৎসা আর মূল্যায়ন—দুটিই যদি তিরোহিত হয় তাহলে যে কোনও আর্টের যে অবস্থা হয় বর্তমানে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিন্তু সেটা আর কতদিন থাকবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

শার্ঙ্গদেব

ভ্রম সংশোধন

গত ১৮-১২-৭৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ণ প্রকাশনের বিজ্ঞাপনে শরৎচন্দ্রের নারী সমাজ ও সেকালের একালের বারবণিতা গ্রন্থের লেখকের নাম অমরেন্দ্র দাস পড়িতে হইবে।

॥ ২ ॥

বিকেলের ছায়া নিবিড় হয়ে এসেছে, সন্ধ্যা আসন্ন। অনন্ত চারচালা মন্দিরের সামনে এলো। ও আগেই দেখে গিয়েছিল দুজনে ঘুমোচ্ছে। রিকশা নিয়ে চলে গিয়েছিল। ছোট দুটো পেগ নিয়েছে। ছাড়া আর জিলিপি খেয়েছে একা একা বসে। এখন দেখলো, পোটো কাত হয়ে পড়েছে। ভুণ্ডুল বসে সিগারেট খাচ্ছে। অনন্ত এসে বললো, 'ভুণ্ডুলদা, চলুন এবার। রাত হয়ে আসছে।'

ভুণ্ডুল লাল চোখ মেলে অনন্তর দিকে তাকালো। একটু অন্যমনস্ক, বললো, 'কোথায় যাবো?'

অনন্ত ওর চোখা গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে বললো, 'বাড়ি যাবেন না?'

'বাড়ি?' ভুণ্ডুলের অবাক মুখে ভুরু কুঁচকে উঠলো, তারপরে কিছু ভেবে [illegible] করে বললো, 'পোটোটা কখন থেকে আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে নিজে ঘুমোচ্ছে, জানিই না।'

অনন্তর হাসিটা উধাও হলো, উদ্বিগ্ন চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'ঠোঁটটা কাটলেন কী করে?'

ভুণ্ডুল ঠোঁটে হাত দিল, বোধহয় জায়গাটা ঠিক ধরতে পারলো না। ঠোঁট উল্টিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে একবার হাত নাড়লো, 'কী জানি। আচ্ছা, আজ মাসের প্রথম রোববার না?'

'হ্যাঁ।'

'তাই তো বলছি, এখন আমার মনে পড়ছে।' ভুণ্ডুল বললো, 'পোটো শালা আমাকে এখানে নিয়ে এলো কখন?'

অনন্ত হেসে বললো, 'দুজনে একসঙ্গেই তো এলেন।'

'এখানে এলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়।' ভুণ্ডুল পোটোর গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা মারলো, 'এই ফাদরা, মাতাল কোথাকার। ওঠ।' বারে বারে ধাক্কা মারতে লাগলো।

পোটো উঠে বসলো, 'উহ্, শালা নিজে একটা ঘুম দিয়ে উঠে এখন আমাকে ঠেলছে। কী করতে হবে?'

'চলুন, অন্ধকার হয়ে আসছে।' অনন্ত বললো।

পোটো অনন্তর দিকে তাকালো। ভুণ্ডুলের ঘাড়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভুণ্ডুল হাত বাড়িয়ে দিল। পোটো ওর হাত ধরে তুলে দাঁড় করালো। এখন দুজনে চলছে। পোশাকে ধুলো তো বটেই, মুখে চুনেও লেগেছে। দুজনেই মন্দিরের দিকে তাকালো। ঘন ছায়ায় সবই এখন ঝাপসা। ভুণ্ডুল বললো, 'অন্ধকারে এরা বোধহয় জেগে ওঠে।'

'সেই শিল্পীরাও তখন আসে, যারা এসব বানিয়েছিল।'

'এরা বেশ আছে। রেনেশাঁসের ধার ধারে না।'

দুজনে হাত ধরাধরি করে অনন্তর পিছনে পিছনে এসে রিকশায় উঠলো। মোড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় রিকশা আসতেই রাস্তার টিমটিমে আলোগুলো জ্বলে উঠলো। একটা টিউবওয়েল দেখে ভুণ্ডুল বললো, 'অনন্ত দাঁড়া, বুকের ছাতি ফাটছে, একটু জল খাবো।'

রিকশা দাঁড়ালো, দুজনেই নামলো। প্রায়ান্ধকারে কয়েকজন মেয়ে পুরুষ টিউবওয়েল থেকে জল নিচ্ছিল। পোটো এগিয়ে গিয়ে বললো, 'একটু জল খেতে দেবে গো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।'

সবাই ওদের দিকে একবার দেখলো। একজন টিউবওয়েলের নিচে থেকে বালতি সরিয়ে নিয়ে, পাম্প করতে লাগলো। আগে পোটো, তারপরে ভুণ্ডুল, ছাতি ফাটানো তৃষ্ণা মেটালো। চোখে মুখে কিছু জল ছেটালো। স্বস্তি আর আরামের শব্দ করতে করতে রিকশায় উঠলো। দুপুরের ঝিমিয়ে পড়া চৈত্র বাতাসে এখন আবার ঝোড়ো বেগ লেগেছে। অনন্তকে এখন বাতাস ঠেলে রিকশা চালাতে হচ্ছে। ও বললো, 'সারাদিনে তো খেলেন না কিছুই।'

'না, খিদের থেকে তেষ্টাই বেশি।' পোটো বললো।

ভুণ্ডুল বললো, 'এখন বেশ ফ্রেশ লাগছে। তোর পকেটে মাল কড়ি কেমন আছে রে পোটো?' ও নিজের হিপ পকেটে হাত ঢোকালো।

পোটোও পকেটে হাত ঢোকালো। ভুণ্ডুল চোখের সামনে নোট তুলে দেখে বললো, 'আহ্, আমার কাছে এখনো একুশ টাকা আছে।'

'আর আমার কাছে চব্বিশ।'

'অনেক টাকা। অনন্তর রিকশা ভাড়া দশ—পাঁচের জন্য।'

অনন্ত বললো, 'আমার কথা পরে ভাববেন।'

ভুন্ডুল বললো, 'তা বললে হয় না। এই নে, দশটা টাকা এখন রেখে দে। নে নে ধর।'

অনন্তকে দশ টাকার নোটটা হাত বাড়িয়ে নিতেই হলো। পোটো বললো, 'ভুন্ডুল, তোর আর তেষ্টা পাচ্ছে না?'

'পাচ্ছে না আবার? একটা বোতল কিনতেই হবে। তারপরে খেয়াঘাটের ঝোপড়ির বাইরে গিয়ে বসবো।'

অনন্ত বললো, 'আরো খাবেন?'

খাবো না? পোটো দোমড়ানো প্যাকেট থেকে মোচড়ানো সিগারেট বের করলো, বঁড়শির মতো বেঁকে যাওয়া সিগারেট ধরালো, 'সামনের রোববার তেমনি আমড়া চুষবো, অবিশ্যি যদি কোনো পার্টি জুটে যায়—।'

'হাওয়াটা বেশ লাগছে. এখন একটু পেটে পড়া দরকার।' ভুন্ডুল পোটোর ঠোঁট থেকে সিগারেট নিয়ে টানলো।

অনন্ত রিকশাটা রাস্তার ধারে দাঁড় করালো। ব্রেকে তার জড়িয়ে নামতে নামতে বললো, 'দোখ নমুন তাহলে। আরো খাবেন যখন বলছেন।'

জায়গাটা বেশ অন্ধকার। পোটো আর ভুন্ডুল পরস্পরের দিকে বিভ্রান্ত চোখে দেখলো. তারপরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো নমস্কো। অনন্ত সীটের তলা থেকে একটা পিণ্ট বের করলো। অস্পষ্ট একটু ঝিলিক, চলকে ওঠা একটু শব্দ।

হাত বাড়িয়ে বললো, 'নিন।'

'কতো মজুদ রেখেছিস রে অনন্ত? সীটের তলায় দোকান সাজিয়ে রেখেছিস নাকি?' ভুন্ডুল খুশি উপচে-পড়া অবাক স্বরে বললো।

অনন্ত বললো, 'এটাই লাস্ট ভুন্ডুলদা।'

পোটো অনন্তর ঘাড়ে হাত দিয়ে বললো, 'লাস্ট বলতে নেই রে অনন্ত, বলবি বাড়ন্ত। দেশটা তোদের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে, আর তোদের বাদ দিয়ে বাবুরো রেনেশাঁস—।'

'ঠাট্টার সময় ইয়ারকি ছাড়।' ভুন্ডুল রিকশা উঠে বসলো, পিণ্টের ছিপি খুললো।

পোটো উঠে বসলো। অনন্ত রিকশা চালালো। দু-মিনিটের মধ্যেই দুজনে পিণ্টের অর্ধেক খালি করে ফেললো।

বাতাসের বেগ যেন ক্রমেই বাড়ছে। মদ আছে এই বাতাসেও। মাতালকে উতল করে। ভুন্ডুল হুকুমের স্বরে বললো, 'পোটো অনন্তকে দশটা টাকা দে।'

পোটো পকেট থেকে টাকা বের করে বললো, 'নে অনন্ত।'

'দেবেন'খন, থাক না।' অনন্তর স্বর বাতাসে ঝাপটা খেল।

ভুন্ডুল বললো, 'আরে তুই টাকাটা নিয়ে রাখ না। তোর আরো পাওনা থাকছে, পরে নিস।'

অনন্ত পিছনে হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে হাপ প্যাণ্টের পকেটে গুঁজে, রিকশা চালালো। পোটো সানুনাসিক জড়ানো স্বরে গেয়ে উঠলো, 'মন ভুলো না—আ-আ-আ—।'

ভুন্ডুল পিণ্টে চুমুক দিলো। পোটো পুরো বেসুরে গাইলো, 'কথার ছলে—এ-এ এ।'

'চোপ, শালা ব্যাণ্ড ...

পোটো পাশ ফিরে ... ঠাস করে একটা চড় মারলো ভুন্ডুলের গালে। 'শালা, খালি চোপ চোপ মারছো, অ্যাঁ? আমি তো তোকেই শোনাচ্ছি, কথার ছলে। বলবো না, বাবুদের রেনেশাঁসের কথা? জনতার কথা বললে খুব গায়ে লাগে।' ও রীতিমতো দাঁতালের গর্জনে চিৎকার করলো 'দীনবন্ধু মিত্তিরের বোনের পেছনে যে-জনতা তাড়া করেছিল—সব তোমার সেই

জনতা? শালা সকাল থেকে তুমি—জনতা, অ্যাঁ? এই জনতা ।'

ভুন্ডুল বলে উঠলো, 'কী হলো অনন্ত, তুই থামলি কেন? চল।'

অনন্ত একটা মারামারির আশংকায় থেমে গিয়েছিল। ভুন্ডুলের গোঙানো শান্ত স্বরের নির্দেশ পেয়ে আবার চলতে লাগলো। ভুন্ডুল পিন্টটা পোটোর দিকে বাড়িয়ে দিল, 'নে।'

পোটো পিন্টটা নিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা গলায় ঢেলে দিল, আবার তারস্বরে চিৎকার করলো, নয়া রেনেশাঁস অ্যাঁ? শালা তোমরা জনতার গায়ের এঁটুলি, রক্তচোষা...।' আবার পিন্টে চুমুক দিয়ে পুরোটাই শেষ করলো।

একটু দূরেই লোকালয়ের ভিড় আর দোকানপাটের আলো দেখা যাচ্ছে। সামনে যাচ্ছে একটা বাস। পিছনে একটা লরি। দুটোই দাঁড়িয়ে পড়ায় অনন্তকে থামতে হলো। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। এক পাশে গাছপালা ফাঁকে ফাঁকে দু একটা আলোর বিন্দু, আর একদিকে নদী। ভুন্ডুল রিকশা থেকে নেমে পড়লো। পোটো প্রথমে খেয়াল করে নি। অনন্ত আবার রিকশা চালাতে গিয়ে অবাক হয়ে ডাকলো, 'ভুন্ডুলদা, নেমে গেলেন যে?'

ভুন্ডুল কোনো জবাব না দিয়ে গাছপালার অন্ধকার ঘেঁষে হাঁটতে আরম্ভ করলো। পোটো চিৎকার করে উঠলো, 'শালা নেমে গেছে? যাক।' পিন্টের বোতলটা রাস্তায় ছুঁড়ে মারতেই সেটা ঝনঝনিয়ে ভেঙে গেল। আবার চিৎকার, 'চল, শালা যেখানে খুশি যাক।' গলার স্বরটা আরো চড়ে উঠলো, 'জনতার কাঁধে চেপেই একদিন যেতে হবে।'

অনন্ত অন্ধকারে ভুন্ডুলকে দেখতে পেল না। রিকশা চালাতে লাগলো।

ভুন্ডুল আবার উত্তর দিকেই হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। ও খানিকটা বিহ্বল আর স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবে এলোমেলো পা ফেলে চলছে। সারাদিনের মত্ততার মধ্যে এখন একটা গভীর বিষণ্ণতা বোধ জেগে উঠছে। একবার উচ্চারণ করলো, 'জনতা!'...

আরো কয়েক পা এগিয়ে আবার বললো, 'তো, আমি কে?...তুই—তোরা জনদরদী, আর আমি...।' নরম কিছুর ওপরে পা পড়তেই অনকখানি পিছলে গেল। কোনোরকমে টাল সামলালো। একটা টর্চের আলো এসে পড়লো প্রথমে গায়ে তারপরে মুখের ওপর। ভুন্ডুল চোখের সামনে হাত তুলে কিছু বলবার আগেই কানে এলো, 'আরে ভুন্ডুল মাস্টার! তুই এখানে একলা? কোথায় যাচ্ছিস?'

অনন্ত চারচালা মন্দিরের সামনে এল

টর্চের আলো নিবে গেল। কয়েকটি মূর্তির মাঝখান থেকে একটি মূর্তি ভুন্ডুলের দিকে এগিয়ে এল। ভুন্ডুল গলার স্বর শুনে কালীতোষকে চিনতে পারলো। ছেলেবেলায় এক সংগে ইস্কুলে পড়তো। কালীতোষ গাঙুলি-ইস্কুলে ক্লাস এইটে পড়তে পড়তেই চটকলে কাজে লেগেছিল। ডিপারটমেন্টের কেরাণী, কিন্তু একটা বাড়ি করেছে। ছোট ভাইকে দিয়ে একটা স্টেশনারি দোকান চালায়। কালী এখানে —মানে এটা কোন জায়গা? বালিপুকুর? বালিপুকুরের বটতলা বস্তি? ভুন্ডুল গোবরে হড়কানো পা স্যান্ডেল শুদ্ধ ঘষতে ঘষতে বললো, 'এমনি যাচ্ছিলাম এদিকে।'

'এদিকে? এদিকে কোথায়?' কালীতোষের স্বরে সন্দিগ্ধ বিস্ময়।

ভুন্ডুল বিরক্ত স্বরে বললো, 'সে খোঁজে তোর কী দরকার?' ও পা বাড়ালো।

'আরে শোন, এই ভুন্ডুল।'

'বল্।'

'চোখ তো বেশ লাল করেছিস দেখছি।'

'তাতে তোর কী?'

'না, আমার আর কী?' কালীতোষের স্বর মোলায়েম, 'খাবি নাকি আর একটু?'

ভুন্ডুল যেন বাতাসে দুলছে। থামলো। কালীতোষ ওর সামনে এসে বললো, 'আরে মুকখু হতে পারি, তা বলে—।'

ওসব বাজে কথা ছাড়। আছে?

কালীতোষ শব্দ করে একটু হাসলো। ভুন্ডুলের একটা হাত চেপে ধরে বললো, 'আয়।' অন্যদিকে মুখ করে, কয়েকটি মূর্তিকে বললো, 'আমি চললাম।' টর্চের আলো পড়লো গাছপালার মাঝখানের পথে।

ভুন্ডুল নেশা, বিহ্বল আচ্ছন্নতা আর বিষণ্ণতার মধ্যেও, অনুমান করলো, কালীতোষ কোথায় যাচ্ছে। কিন্তু ও এখন আকণ্ঠ খেতে চায়। যেখানেই হোক, আপত্তি নেই।

টর্চের আলো পড়লো একটা ভেজানো দরজার ওপরে। কালীতোষ ঠেলে খুলে, ভুন্ডুলকে নিয়ে ভিতরে পা দিয়ে ডাকলো, 'খুসী, এই খুসী।'

কোনো ঘর থেকে একটি মেয়ের গলা ভেসে এলে, 'এসো।'

ভুন্ডুল ঠিক বুঝেছিল, এটা বালিপুকুরের বটতলা বস্তি। তার মানেই বেশ্যালয়। অচেনা জায়গা না। এমন না যে, দু চার বার আসে নি। কেমন দুর্ভাগা আর হতদরিদ্র চেহারা এই সব বস্তির। বাজারের মুখ চেনা ফড়িয়া, মাছ বিক্রেতা, কারখানার শ্রমিক আর রিকশাওয়ালারাই প্রধান খরিদ্দার। কালীতোষের মতো লোকও আসে, একটু বাছাই করা বস্তিতে। কালীতোষ যে এখানে আসে, ভুন্ডুলের তাও অজানা নেই। কলকারখানা অঞ্চলের খানিকটা বাইরে, হৈ চৈ তেমন নেই। বালিপুকুরের তিন পাড় ঘিরে বস্তি, এক পাড়ে একটি আস্তানায় হিজড়েরা থাকে।

অন্ধকার উঠোনের এক কোণে একটা আলো জ্বলে উঠলো। কোনো ঘরে কথাবার্তা হাসাহাসি হচ্ছে। একটি স্ত্রীলোক এক ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, 'দাঁড়িয়ে কেন, এসো।' স্ত্রীলোকটি সামনে এলো। কালো। রঙ, খোঁপা বাঁধা, সিঁথের সিঁদুর, বেশবাস কালীঘাটের পটের মতো। বয়স তিরিশ বত্রিশের কম নয়। ভুন্ডুলের দিক অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালো।

কালীতোষ ভুন্ডুলের হাত ধরে টেনে বললো, 'আয়।' উঠোন পার হতে হতে

জিজ্ঞেস করলো, ঘরে কে রয়েছে? কথা শুনছিলাম?'

'জীবনি আর হাবি। গল্প করছিলাম।' স্ত্রীলোকটি, নিশ্চয় এর নামই খুসী, বললো। ভুন্ডুল আর কালীতোষকে পেরিয়ে, মাটির দেওয়াল টালির ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলো। বস্তি হলেও, বিজলী বাতি আছে।

কালীতোষ ভুন্ডুলের হাত ধরে, ঘরের

ভিতর পা দিয়ে বললো, 'গল্প করছিলি, না মাল গিলছিলি? ঘরে গন্ধ ম ম করছে।'

বোধহয় খুসী এবং আরো কেউ খিলখিল করে হেসে উঠলো। ভুন্ডুল তখনো দরজার বাইরে, দেখতে পেল না। কালীতোষ হাত ধরে টানলো, 'আয়।'

ভুন্ডুলের মনে এখনো বাধা একটাই, ঠিক এখানে আসার মতো কোনো প্রস্তুতি মনে ছিল না। আচমকাই ছিটকে এসে পড়েছে। ও ভিতরে ঢুকে দেখলো, তিনটি মেয়ে। খুসী ছাড়া আরো দুজন। জীবনি আর হাবি। জীবনি নাম ভুন্ডুল কখনো শোনে নি। হাবি নামের মানে জানে। এ ক্ষেত্রে মানেটা কী, বুঝতে পারছে না। একজন বেশ মোটা, গায়ের রঙটা মেটে, গালে টোপ ফেলে হাসছেই আর একজনেরও গায়ের রঙটা মাজা মাজা, একটু বেমানান কারণ মাথার চুল ছোট মেয়েদের মতোই ছোট করে কাটা। উলটে আঁচড়ানো, এক চিমটি সিঁথিতে, সিঁদুরের আবছা রেখা। নাভির নিচে কুচি দিয়ে পরা শাড়ি, কালীঘাটের পটের সঙ্গে একেবারে বেমানান। অথচ সবুজ পাড় শাড়িটা তমন পরিচ্ছন্ন না। কালো একটা জামা। গালে একটা কাটা দাগ, বাঁ ভুরুর মাঝখানেও কাটা দাগটা বেশ তীক্ষ্ণ। যেরকম হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে, বয়স বোঝাই যাচ্ছে না। ছেলেমানুষ না কি?

'বোস ভুন্ডুল।' কালীতোষ কাঁচা মাটির মেঝের ওপর তক্তপোষের সামান্য বিছানা দেখিয়ে বললো। খুসীর দিকে ফিরে বললো, 'বোতল টোতল আছে, না আনতে হবে? নিজেরা তো খুব সেঁটেছিস দেখছি। সেইজন্যই দুটোতে হাবির ঘরে এসে জুটেছিস।'

খুসী আর মোটা মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসি শুনলেই বোঝা যায়, পেটে দ্রব্য পড়েছে। গাল কাটা ছোট চুল মেয়েটা ভুরু কুঁচকে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে, মোটা মেয়েটির গায়ে খোঁচা দিল। তারপরে ভুন্ডুলকে একবার দেখে কালীতোষের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দাঁতে ঝিলিক দিয়ে হাসলো। কালীতোষ বোতলে চুমুক দেবার ভঙ্গি করে, দু হাতে কী ইশারা করলো। মেয়েটা গোঙানোর মতো একটা শব্দ করে, খুসীর দিকে আঙুল তুলে দেখালো। আর দেখা গেল, ওর দু আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট জ্বলছে। কিন্তু মেয়েটা কি সত্যি হাবি নাকি? বোবা?

'তোদের বোতল সব কোথায় গেল?' কালীতোষ খুসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। ওর কথাবার্তার ভঙ্গি সংকোচহীন, অনায়াস, কিন্তু তার মধ্যে একটি ভারিক্কি চালের ভাব আছে।

মোটা মেয়েটি, যার বয়স পঁচিশ তিরিশের মতো দেখাচ্ছে, হাতের ইশারায় তক্তপোশের নিচে দেখালো, 'আমরা তো মাটিতে বসেই গাঁজাচ্ছিলুম। উঠোনে তোমার ডাক শুনে খুসী বোতল গেলাস সব তক্তাপোষের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, ওই রে, গাঙুলি বোধ হয় মেজাজ গরমে এসেছে।'

'তা আমার কী দোষ বল্।' খুসী ওর ভুরে শাড়ির খসে পড়া আঁচল বুকে টেনে দিল, 'যার ঘরে এসে বসবার কথা, সে উঠোন থেকে ডাকলে ভয় লাগে না?'

কালীতোষ হেসে বললো, 'ন্যাকামো রাখ্। বালিগঞ্জের খুসীবালা কালীতোষ গাঙুলির ভয়ে জুজু।'

'যা বলেছো!' মোটা মেয়েটি শরীর দুলিয়ে হেসে উঠলো।

ভুন্ডুল ভাবছিল, খুসী কি কালীতোষের রক্ষিতা নাকি? কিন্তু ওর বিরক্তিও লাগছিল। গালে দাগ, ছোট চুল ছিপছিপে মেয়েটার ভুরু কুঁচকে, মাঝে মাঝে নাকের পাটা ফুলিয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার মধ্যে যা একটু মজা লুকিয়ে রয়েছে। ও বললো, 'কালী, তুই বোস্, আমি চলি।'

কালীতোষ ভুন্ডুলের হাত ধরে বললো, 'কেন মাস্টার (ও প্রায়ই মাস্টার বলে ডেকে থাকে) রাগ করছিস! বোস না, বোস তুই।' খুসীদের দিকে তাকিয়ে, একটু ঝেঁজে বললো, 'বলবি তো, কোথায় কোন ঘরে বসবো? হাবির ঘরেই বসবো না কী?'

খুসী আর মোটা মেয়েটি গাল কাটা ছোট চুল মেয়েটির দিকে তাকালো। সেও তাকালো ওদের দিকে, একটা গোঙানো শব্দ বেরোলো তার গলা দিয়ে। ঘাড় ঝাঁকিয়ে, বড় বড় চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালো। খুসী দু হাতের ইশারায় ঘরের মেঝে আর তক্তপোশের দিকে দেখালো, তারপরে আঙুল দিয়ে কালীতোষ আর ভুন্ডুলের দিকে ইঙ্গিত করলো। গাল আর ভুরু কাটা ছিপছিপে মেয়েটি কালীতোষ, তারপরে ভুন্ডুলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন লজ্জায় ব্রীড়াময়ী হয়ে উঠলো। খুসীর একেবারে বুকে খোঁচা মেরে, ককিয়ে ওঠার মতো দুবার শব্দ করে, মাথা নিচু করলো। খুসী হেসে উঠে, বুকে হাত চেপে বললো, 'আ মরণ ছুঁড়ি, আমাকে খোঁচাচ্ছিস কেন? এদিকে আবার লজ্জায় মরে যাচ্ছে! ঘরে কি দুটো ভাসুর দেখলি?'

মোটা মেয়েটি খিলখিলিয়ে উঠলো, হাবি তোর অনুমতি চাইছে লো।'

'মরণ, আমি কি ওর বড় ভাজ?' খুসীও খিলখিলিয়ে উঠলো।

কালীতোষ বিরক্ত স্বরে বললো, "ধরে তোর ভাসুর ভাজের নিকুচি করেছে। যা, বোতল গেলাস নিয়ে আয়, আমি আমার বন্ধুকে নিয়ে বসছি।' ভুন্ডুলের হাত ধরে

ক্তপোষের ওপর ওঠে বসলো, 'বোস ।'

সী হাবির গায়ে আঙুলের খোঁচা কিছু একটা ইশারা করলো। ঘরের যেতে যেতে ডাকলো, 'আয় জীবুনি।' নি কালীতোষ আর ভুন্ডুলের দিকে র দেখে বেরিয়ে গেল। ভুন্ডুল সকাল এ পর্যন্ত একটা পরিবেশ থেকে পরিবেশে ছিটকে এসে, ওর বিহ্বল ম্রত, বিষন্নতা বোধ আপাতত চাপা গেল। সারাদিনের নির্জলা মদের , মস্তিষ্কের অনেকখানি জুড়ে ছে। চোখ লাল, পাতা ভারি, কিন্তু থর তারা দুটো এখন মোটামুটি সচল। র দেওয়াল কাঁচা মাটির লেপা মেঝে । ও আগেই দেখে নিয়েছিল। মাথার রে টালির চাল থেকে প্লাস্টিকের তারে ছে একটা ষ.ট পাওয়ারের মতো লা। এক পাশে আলনায় ঝুলছে একটা শাড়ি আর জামা। এক কোণে পায়ার ওপরে একটা শস্তা দামের জিসটার। আর এক কোণে জলের কলসী একটা থালা বাসন, একটা আলগা উনোন। টের দেওয়ালে দেব দেবী, চিত্রতারকাদের নখানেক ক্যালেন্ডারওয়ালা ছবি, কিন্তু ওয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গির মধ্যে লীর পট। ঘরটির মধ্যে একটিই ঠের গরাদের ছোট জানলা। তার ল্লা দুটো খোলা। কুলুঙ্গির পাশে রেকে ঝুলছে একটা ছোট আয়না তার চেই একটা ঝোলানো তক্তা। তক্তার ওপরে নি হিমানী, পাউডার আর সিঁদুরের টো।

'ও কি সত্যি হাবি নাকি?' ভুন্ডুল জ্ঞেস করলো।

হাবি তখন হঠাৎ একটা ঝাঁটা নিয়ে ঘর ট দিতে আরম্ভ করেছে। কালীতোষ লো, 'ওই আর কী, হাবি মানে বোবা। ন্তু ছুঁড়ি হঠাৎ ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করলো কেন?' ও হাততালি দিয়ে ঠলো, 'এই—এই হাবি।'

হাবি ফিরেও তাকালো না। ওর চকানো সবুজ পাড়ের শাড়ি মাটিতে লুটোচ্ছে। ভুন্ডুল দেখলো, ওর ছোট কালো জামাটার বুকের বোতাম খোলা, ভিতরে কোনো অন্তর্বাস নেই।

'ছুঁড়ি আবার কানেও কালা।' কালীতোষের হাত নাড়াটা চোখে পড়েছে। কালীতোষ ঝাঁটা নাড়ার ভঙ্গি করে, ঘাড় নেড়ে ইশারায় বারণ করলো। হাবি ঝাঁটার দিকে দেখে, চোখের জিজ্ঞাসায় ঘাড় নাড়লো। তারপরে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে, ভুন্ডুলের দিকে দেখলো। ঠোঁটের কোণে মচকানো হাসি। মুখ ফেরাবার উদ্যোগ করতেই, কালীতোষ আবার হাত নেড়ে ইশারা করলো। ও ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো। কালীতোষ জানালাটা দেখিয়ে হাতের ইশারায় বন্ধ করে দিতে বললো। ও ঘাড় কাত করে আবার একবার ভুন্ডুলকে দেখে, ঝাঁটা রাখলো আলনার পিছনে। তারপরে জানালাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু বোবা কালা বলে কি মেয়েটা ওর হাঁসের মতো বুকের জামায় বোতাম লাগাবে না? আঁচল ঢাকবে না?

হাবি যেন ভুন্ডুলের এই নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই, বুকে আঁচল ঢেকে, জানালার দিক থেকে ফিরে তাকালো। কালীতোষের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দাঁতের ঝিলিক দিয়ে হাসলো। আবার মুখ ফিরিয়ে দেওয়ালের আয়নার কাছে গিয়ে, চিরুনি নিয়ে মাথা আঁচড়াতে লাগলো।

'পাগলি!' কালীতোষ বললো।

ভুন্ডুলেরও তাই মনে হলো। কেবল বোবা আর কালা না। ভাব ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, মাথায় ছিটও আছে। জিজ্ঞেস করলো, 'ওর চুলগুলো ও রকম ছোট কেন?'

কালীতোষের জবাবের আগেই খুসী আর জীবুনি ঘরে ঢুকলো। খুসীর হাতে দুটো দু নম্বরি বড় বোতল। জীবুনির এক হাতে দুটো কাঁচের গেলাস, অন্য হাতে শিশি ভরা চানাচুর। তক্তপোশের পাতলা বিছানার ওপরে ওরা সে-গুলো রাখলো। জীবুনি বললো, 'ও বাবা, হাবি এখন মাথা আঁচড়াচ্ছে? ছুঁড়ি এখন সাজগোজ করবে নাকি?'

খুসী তখন তক্তপোশের নিচে থেকে গেলাস বোতলে বের করে ওপরে রাখছে। এদের বোতলে এখনো কিছু মদ অবশিষ্ট রয়েছে। কালীতোষ বললো, 'হ্যাঁ কী বলছিলি ভুন্ডুল? হাবির চুল ও রকম ছোট করে কাটা কেন? ভাবিস না যেন, মেম-

সাহেবদের মতন ঘর ছেটেছে। কেউ হয়তো দিয়েছে, চুলের মুঠি ধরে কুচিয়ে কেটে।'

'এখন তো তবু চুল গজিয়েছে।' খুসী তক্তপোশের সামনে থেকে, কাঁথার মতো প্যাতলা তোষেকের খানিকটা সরিয়ে দিল, 'প্রথম যখন এল, তখন ছেলেদের মতন মাথার চুল, কাগের ঠ্যাঙ, বকের ঠ্যাঙ। তুমি তো ওর সে-চোহারা দেখনি।'

কালীতোষ সিগারেটের প্যাকেট বের করে ভুণ্ডুলকে একটা সিগারেট দিল, নিজে একটা ঠোঁটে গুঁজলো। লাইটার জেলে দুজনের সিগারেটে জ্বালিয়ে বললো, 'আমার বয়ে গেছে, হাবি কেমন ছিল তাই দেখতে।' ও ভুণ্ডুলের দিকে তাকালো, 'হ্যাঁরে ভুণ্ডুল মাস্টার মন খুলে বল দিকিনি ভাই, এরা সঙ্গে বসলে তোর আপত্তি নেই তো।

'আমার আর আপত্তি কিসের।' ভুণ্ডুল সিগারেটে লম্বা টান দিল, 'খানিকটা মাল খাবো, কেটে পড়বো।' খুসীর সঙ্গে ওর চোখাচোখি হলো।

খুসী ভুণ্ডুলের দিকে তাকিয়ে, একটা কলাইয়ের বাটিতে চানাচুর ঢালছিল। জীবুনি তখন হাবির সঙ্গে হাত নেড়ে, নিঃশব্দে ইশারায় কী সব বলাবলি করছে। হাবির গলা থেকে গোঙানো আর কর্কানির মতো অদ্ভুত এক একটা শব্দ উঠছে।

জীবুনিকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারছে। গায়ের কাপড় ধরে টেনে দিচ্ছে। পিছন ফেরা হাবির মুখ দেখা যাচ্ছে না। জীবুনি হেসে উঠে বললো, 'আ গেল যা, ছুঁড়ি আমাকে কেন মারছিস?'

'কী হলো?' খুসী গেলাসে মদ ঢালছে।

জীবুনি ভুণ্ডুলের দিকে দেখে বললো, 'গাঙুলির বন্ধুকে দেখে ছুঁড়ির কী মরণ ধরেছে, লজ্জায় আর বাঁচছেন না। এখন ওর সাজবার ইচ্ছে হয়েছে, অথচ তাও পারছে না।'

ভুণ্ডুল কৌতুক বোধ করলো, হাসলো। বোবা হোক, কালা হোক, মেয়েলিপনাটা ঠিক আছে। ওর মনে একটা কৌতূহলও জাগছে। এরকম একটা মেয়ে, এইখানে এই পেশায় এলো কী করে? মেয়েটার বয়সও অনেক কম মনে হচ্ছে। গোটা কি নিতান্ত ছিপছিপে শরীর, ছোট চুল, হাঁসের মতো বুকের জন্য। হাবির বুক দেখে, কেন যে হাঁসের গলার নিচে পালক ঢাকা বুকের ছবিই ভেসে উঠছে, ভুণ্ডুল জানে না। খুসী মুখ ঝামটা দিয়ে বললো, 'হাবির ন্যাকরা এখন রাখ, ওকে নিয়ে এসে বোস।'

ভুণ্ডুল দেখলো, জীবুনির দু হাত উঠে গেল হাবির বুকে। হাবি অক অক শব্দ করে, জীবুনির ঘাড়ে গলায় ঠাস ঠাস মারলো। জীবুনি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

'তোরা সব বড় নচ্ছার।' কালীতোষ তার গেলাস হাতে তুলে নিল, 'নে ভুণ্ডুল চুমুক দেব।'

খুসী ভুণ্ডুলের গেলাসে জল মিশিয়েছে। ও এক চুমুকেই প্রায় গেলাস শূন্য করে দিল। কিন্তু জীবুনির কাণ্ডটা ও স্পষ্ট বুঝেছে। জীবুনি হাসতে হাসতে ছুটে চলে এলো, তক্তপোশের ওপর খুসীর পাশে বসলো। হাবি তখনো গোঙাচ্ছে। ও এদিকে ফিরে কালীতোষের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে নিজের আঁচল ঢাকা বুকে দেখালো। নিজের দু হাতে বারে বারে মুঠি পাকিয়ে ভঙ্গি করলো। তারপরে যেন খুবই যন্ত্রণা হয়েছে, এমন-ভাবে গোটা শরীরটা বেঁকে চুরে তুললো।

কালীতোষ হেসে উঠতে গিয়ে কপট গাম্ভীর্যে জীবুনির দিকে তাকিয়ে ধমক দিল, 'কেন বেচারিকে কষ্ট দিলি? আবার হাসছিস?' হাত তুলে মারের ভঙ্গি করলো, তারপরে আদরের কোমল ভাব করে মাথা ঝাঁকিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকলো, 'আয়, এখানে আয়।'

হাবি তবু কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে জীবুনির দিকে তাকিয়ে রইলো। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা কৌতুক আর কষ্টে মেশামিশি। খুসী হাবির দিকে তাকালো। একটা কী, ইশারা করলো। হাবির মুখে একটু হাসি ফুটলো। ও এগিয়ে এসে জীবুনির বিপরীতে তক্ত-পোশের ওপর উঠে ভুণ্ডুলের হাতখানেক দূরে বসলো। খুসী নিজের হাতে ওকে গেলাস এগিয়ে দিল। হাবি গেলাস নিয়ে চুমুক দিল।

'ওমা, গাঙুলি তোমার বন্ধুর গেলাস ফাঁকা।' খুসী নিজের হাতে বোতল তুলে ভুণ্ডুলের গেলাসে ঢেলে দিল।

জীবুনি পেতলের জলের জাগ তুললো। ভুণ্ডুল গেলাস হাতে নিয়ে বললো, 'আমি নির্জলা পছন্দ করি।'

'তোর যেমন ভালো লাগে মাস্টার। বোতল তুলেই চুমুক দে না।' কালীতোষ বললো।

ভুণ্ডুল বললো, 'সকাল থেকেই হচ্ছে।' ও নির্জলা চুমুক দিল।

হাবির গলায় একটা গোঙানো শব্দ হলো। ভুণ্ডুলকে দেখে কালীতোষের দিকে তাকিয়ে দাঁতের ঝিলিক দিয়ে হাসলো। আবার গলায় শব্দ করলো, আর ভুরু কুঁচকে ভুণ্ডুলের দিকে তাকালো। ভুণ্ডুল দেখালো মেয়েটার গালে আর ভুরুতেই শুধু না, গোটা মুখেই যেন কাটাকুটির দাগ। গালের আর ভুরুর কাটাটা মোক্ষম। চিবুকের কাছে দাগটা পোড়া দাগের মতো দেখাচ্ছে। লম্বাটে মুখ, নাকটা প্রায় খাড়া, চোখ দুটো ভাসা আর কালো। কিন্তু মেয়েটা ওর দিকে এরকম ভুরু কুঁচকে কী দেখছে? ও আর এক চুমুকে গেলাস শূন্য করলো। হাবির গলায় আবার শব্দ হলো। খুসী আর জীবুনি হেসে উঠলো। ভুণ্ডুল তাকালো ওদের দিকে। কালীতোষ ভুণ্ডুলকে বললো, 'হাবি বলছে তুই এমন নির্জলা খাচ্ছিস কেন?'

'ও!' ভুণ্ডুল হাত বাড়িয়ে সত্যি একটা বোতল তুলে নিল, 'ওর নাম কি হাবিই নাকি? আর কোনো নাম নেই?'

কালীতোষ বললো, 'ওসব খুসীরা জানে। এটাকে আমি বছর এক দেড় দেখছি ঘর নিয়ে বসেছে।'

'বসেছে আবার কী, আমরাই বসিয়েছি।' খুসী বললো, 'এসেছিল তো একটা পোড়া কাঠ। কোলে আবার কয়েক মাসের ছেলে। ছেলেটা মরে বেঁচেছে। সবিতাদের বাড়িতে বাসনকোসন মাজতো। পেটে ভাত পড়তেই দেখা গেল ছুঁড়ির গতরে চেকনাই মারছে। সাত ভূতে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করেছিল। কী দরকার বাবা? নিজেদের মধ্যে ঠিকঠাক করে এই ঘরে এনে বসালাম, এখন দিব্যি করে খাচ্ছে।'

কালীতোষ হেসে বললো, 'দরদ খিয়ে বাড়িউলি হয়ে গেছি।'

'তা যাই বলো।' খসী হেসে ভুন্ডুলের কে তাকালো, 'কিন্তু ও কোথা থেকে সেছে, কী ওর নাম ধাম কে বলবে? কি ছাই কিছু বলতে পারে?'

ভুন্ডুল হাবির দিকে একবার দেখলো। াবি ওর আর খসীর দিকে ফিরে খছিল। ভুন্ডুলকে তাকাতে দেখে হঠাৎ যন লজ্জা পেয়ে হাসলো। খসীর দিকে তাকালো। খসী চোখের ইশারা করলো। ভুন্ডুল বোতল তুলে গলায় ঢাললো। হাবি অ'ক অ'ক শব্দ করে, ভুন্ডুলের হাঁটুর কাছে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল। ভুন্ডুলের চোখ টকটকে লাল, হাবির দিকে একবার দেখলো, 'কালী একটা সিগারেট দে।' কালীতোষের গায়ের কাছে ও প্রায় এলিয়ে পড়লো।

কালীতোষ প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নে না, খা।'

ভুন্ডুলের মনে হলো ওর গালটা এখন নতুন করে জ্বালা করছে। নাকের পাটা ফুলিয়ে চিবিয়ে বললো, 'শলা।'

'কে রে?' কালীতোষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

ভুন্ডুল একটু চমক ভাঙা ভঙ্গি করলো, 'আঁ? না তোরা না।' সিগারেট ঠোঁটে চাপলো।

সকলেরই গেলাসে নতুন করে ঢালাঢালি হচ্ছে, খাওয়া হচ্ছে। খসী আর জীবনে ভুন্ডুলকে দেখে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করলো। তারপরে কালীতোষের দিকে তাকালো। কালীতোষ লাইটার জেলে ভুন্ডুলের সিগারেট ধরিয়ে দিল। হাবি ঝুঁকে পড়ে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ভুন্ডুলের ঠোঁটের কাছে এগিয়ে এলো, শব্দ করলো। ভুন্ডুলের সিগারেটের আগুনে ওর সিগারেট ধরাতে চাইছে।

ভুন্ডুল ওর সিগারেটটা এগিয়ে দিল। হাবি সিগারেট ঠেকিয়ে টানছে। ভুন্ডুল দেখছে। ওর মনের বিষণ্ণতা আবার জাগছে, তার সঙ্গে একটা ক্ষোভের জ্বালা। অথচ একই সঙ্গে ওর মনের অবাক জিজ্ঞাসা জাগলো, এই মে যটার একটা ছেলেও হয়েছিল? কী করে?'... ও হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠলো। নিঃশব্দ কিন্তু অস্বাভাবিক হাসি। এক মুহূর্ত হাসি থামিয়ে বোতল থেকে ঢকঢক করে গলায় ঢাললো। হাবি উ' উ' শব্দ করে, ভুন্ডুলের বুকের জামা ধরে টানলো। ভুন্ডুল হাবির মুখের দিকে তাকালো। হাবির চোখে উদ্বেগের দৃষ্টি। ওর গলা দিয়ে একটা লম্বা শব্দ বেরোল।

ভুন্ডুল হাসলো, বললো, 'কী হলো?'

হাবির শরীর এখন ভুন্ডুলের কোলের কাছে লেপটানো। জীবনি গেয়ে উঠলো, 'আমার হু হু করে পরাণ জ্বলে—।'

'—মিনসে হরির নাম করে।' ভুন্ডুল সুর করে গাইলো, 'তাই তো না কী?'.

হাবি বাদে সবাই ঘর ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলো। হাবি অবুঝ মুখে ভুরু কুঁচকে ভুন্ডুলকেই দেখলো। ভুন্ডুল আবার গাইলো, 'এক ধুনুরিতে তুলা ধুনে ফেলে পেটায় মনের সুখে।'...

'ও দাদা, মরে যাবো।' জীবনি ভুন্ডুলের দিকে তাকিয়ে চোখ ঘোরালো, 'তারপরে?'

ভুন্ডুল গাইলো, 'আমার শক্ত গতর নরম করে/আরামে প্রাণ ওম করে।'...

'বাহ মাস্টার, চালিয়ে যা।' কালীতোষ হেঁকে উঠলো।

খুসী হেসে গড়ালো কালীতোষের গায়ের কাছে, 'তোমার বন্ধু অনেক জানে।'

হাবি বারে বারে ভুরু কোঁচকায়, মাঝে মাঝে অবুঝ হাসে, আর ভুন্ডুলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জীবনি হঠাৎ লাফিয়ে মেঝেয় নামলো। বুক চাপড়িয়ে কোমর দুলিয়ে গাইলো, 'হায় মিনসে বড় শীত কাতুরে/খুকুর খুকুর কেশে মরে।'

ভুন্ডুলের স্বর মিললো জীবনির সঙ্গে, 'আমার হু হু করে পরাণ জ্বলে/মিনসে হরির নাম করে।'...

হাবি জীবনির নাচ দেখে হাততালি দিল, গলা দিয়ে নানান শব্দ বেরোল। ওর খুশির হাসিটা দাঁতে চোখে ঝলক দিচ্ছে। ঢেউ খেলছে গালের কাটা দাগে। এখন কালীতোষ আর খুসীও হাততালি দিচ্ছে। জীবনি মেঝেতে আঁচল লুটিয়ে নেচে নেচে শেষের দু লাইন গাইতে লাগলো।

ভুন্ডুল বোতল তুলে নিল। আবার যেন ওর গালটা জ্বালা করে উঠলো। একটা দমকা নিঃশ্বাস ছাড়লো, আর গোঙানো স্বরে বলে উঠলো, 'জনগণ! শালা খালি বাতেলা।' বোতল তুলে গলায় ঢাললো।

হাবি অঁক অঁক শব্দ করে, বোতলটা এক হাতে চেপে ধরলো। ওর বুকের আঁচল এখন খসা। ভুরু কোঁচকানো চোখে উদ্বেগ। বারে বারে মাথা নাড়লো। জীবনির নাচ থেমেছে। কালীতোষ আর খুসী ভুন্ডুলকে দেখে নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করছে।

ভুন্ডুল হাবির মুখের দিকে তাকালো। ওর গালের কাটা দাগে হাত দিল, 'কী করে কাটলো?'

হাবি গুটিয়ে হাসলো। কালীতোষের দিকে তাকালো। খুসী চোখ টিপে হাবিকে ইশারা করলো। হাবি আবার ব্রীড়াময়ী হলো। ভুন্ডুলের দিকে তাকিয়ে ওর গালে রাখা হাতটা চেপে ধরলো। ভুন্ডুল হাবির অন্য হাত থেকে বোতল টেনে গলায় ঢালতে উদ্যত হলো। হাবি অাঁ অাঁ শব্দ করে জোরে ঘাড় নাড়লো। ওর ঘাড় অবধি অসমান চুল চোখ মুখে ছড়িয়ে পড়লো। চোখ বুজে জিভটা এলিয়ে দিয়ে দেখালো। কী বলতে চায়? মাতাল হয়ে যাবে ভুন্ডুল, না জিভ বের করে মরে যাবে? হাবি প্রায় ওর বুকের ওপর চেপে নিজে বোতল তুলে ধরলো মুখের আছে। ভুন্ডুল হা করলো, হাবি অল্প একটু মদ ঢেলে দিল।

ভুন্ডুল ঢোক গিলে হাসলো। ওর চোখের পাতা ভারি, তারা দুটো স্থির হাবির মুখের দিকে। আর কোনো দিকেই এখন ওর দৃষ্টি নেই। কালীতোষ খুসীর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করলে খুসী ইশারা করলো জীবনিকে। তিনজনেই ছায়ার মতো নিঃশব্দে তক্তপোশ থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ভুন্ডুল কিছুই টের পেল না। ও এখনও হাবির মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে, স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। হাবি ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তিনজনের চলে যাওয়া দেখলো। জীবনি দরজাটা টেনে দেওয়ার আগে হাতের ইশারায় একটা অশ্লীল ভঙ্গি করে গেল।

হাবি ভুন্ডুলের দিকে তাকালো। হাসলো, মাথা ঝাঁকালো জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে। ভুন্ডুল মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে এক পাশে ঝাঁকাতে গিয়ে এক পাশে নুয়ে পড়লো। 'খাবো বইকি।' বোতলের দিকে হাত বাড়ালো।

হাবি মাথা নেড়ে গুঙি[illegible]লো। বোতল সরিয়ে নিল। ভু[illegible] জড়িয়ে উচ্চারণ করলো, 'বোঝো।

হাবির বোতাম খোলা [illegible]র ফাঁকে হাঁসের মতো বুক ওঠান[illegible] করছে।

বার ভুন্ডুলের বুকের ওপর চেপে লা. ওর চিবুকে হাত দিয়ে; গোঙানো দ মাথা ঝাঁকালো। বড় বড় চোখে জ্ঞাসা। তারপরে বোতলটা তুলে ভুন্ডুলের খে একটুখানি ঢেলে দিল। বোতলটা রে সরিয়ে রাখলো। ঘন ঘন মাথা কিয়ে. অ'ক অ'ক শব্দে যেন কিছু জ্ঞাসা করতে লাগলো। ভুন্ডুল মাথা কিয়ে বললো, 'হ্যাঁ অনেক—সারা দিন—কাল থেকে।...আহ্, এর আবার কি মস্তান। কেন যে—।' বোতলের জন্য হাত াড়ালো।

হাবি ওর হাত টেনে নিল, গোঙা শব্দে মাথা নাড়ালো। আঙুলে দিয়ে ভুন্ডুলের চোখের পাতা ঘষে দিল, পেটে খোঁচা দিল। কী বলছে? ভুন্ডুল হাসলো, আবার ভুরু কোঁচকালো; 'বোবা কালা গাল কাটা বেশ্যা...মুখটা দেখ, যেন কাল জন্মেছে...কাঁচা...।' বোতলের জন্য হাত বাড়াতে গেল।

হাবি ওর হাত ছাড়লো না। আঁ আঁ শব্দে মাথা নাড়লো। ভুন্ডুল চোখের পাতা অনেকটা মেলে হাবির মুখের দিকে তাকালো। হাবির বড় বড় চোখে হাসির ঝিলিক। ভুন্ডুলের ঠোঁট নড়ছে, 'আশ্চর্য... মাইরি, কচি বাচ্চার দ্যায়লা নাকি রে!' হাসলো।

হাবি কী বুঝলো কে জানে। ওর গলার ভিতর থেকে অবিকল কুকুরের বাচ্চার সোহাগি কুঁই কুঁই শব্দ বেরোল। গালের কাটা দাগে ঢেউ লাগলো, চোখের পাতা নিবিড় হলো। ভুন্ডুলের গাল টিপে দিল। ভুন্ডুলের ঠোঁট নড়লো, 'উঁম্?...আদর করছে?...হাঁসের মতন এই বুক...এত ধকল ...এখানে...।'

হাবি ভুন্ডুলের বুকে আঙুলের খোঁচা দিয়ে হাসলো। গলা থেকে সেই অদ্ভুত কুঁই কুঁই শব্দ করে ঘাড় বাঁকিয়ে তারছা চোখে তাকালো। ওর শরীরের একটা পাশ ভুন্ডুলের শরীরে লেপটানো। ভুন্ডুল চোখের পাতা টান টান করে তাকালো। হাবির চুলে হাত দিল, 'চুল এত ছোট কেন? ঠোঁটি ঠোঁটি? অসুখ করেছিল?'

হাবির ভুরু কুঁচকে উঠলো। তারপরেই চোখ দুটো বড় হলো। মাথার চুল টেনে টেনে দেখালো, গলায় গোঙা শব্দ। ঘাড়ের ঝাঁকুনিতে জিজ্ঞাসা। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাবার ভঙ্গি করলো, চুলে ছোঁয়ালো। মাথা নিচু করে, ভুন্ডুলের বুকের কাছে ঠেলিয়ে ঘাড়ের চুল সরিয়ে দেখালো। পোড়া দাগ। তার মানে কী? ওর চুল কেউ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল?

হাবি মাথা তুললো, অ'ক অ'ক শব্দ করলো। হঠাৎ তক্তপোশ থেকে নেমে, এক কোণে রাখা তোলা উনোনটার কাছে গেল। মাথাটা উনোনের মধ্যে গুঁজে দেওয়ার ভঙ্গি করে দেখালো। মাথা তুলে নিজের গলা টিপে দেখালো। ছুরি মারার ভঙ্গি করলো, গালে আর বুকে দেখালো। উঁহু উঁহু শব্দে অনেক কিছু বলতে চাইলো।

কী এ-সবের মানে? হাবিকে কেউ পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল? ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করতে চেয়েছিল? ভুন্ডুল তক্তপোষ থেকে নামলো। কিন্তু ওর নেশার মাত্রাটা বুঝতে পারেনি। টাল সামলাতে না পেরে, মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। হাবি দীর্ঘ তীক্ষ্ন গোঙানো শব্দে ছুটে এসে ওকে তুলে বসালো। ভুন্ডুল বসলো মাথা নাড়লো হাসলো, 'কিছু হয়নি।'...

হাবি ওকে ঠেলে সরিয়ে, মাথাটা তক্তপোষের গায়ে ঠেকিয়ে দিল। হ্যাঁ, এই ঠিক আছে। কিন্তু একটা বোবা কালা মেয়েকে কে এমন করে মেরেছিল? কেন? ও হাবির গালে হাত ঠেকালো, চুলে স্পর্শ করলো; 'কে? কে এমন করে মেরেছে?'

হাবি ভুরু কুঁচকে ভুন্ডুলের কথা বোঝবার চেষ্টা করলো। কী বুঝলো, কে জানে? পা দুটো ছড়িয়ে, দুই উরুতের মাঝখানে এমনভাবে হাতের ভঙ্গি করে দেখালো যা খুব অশ্লীল মনে হয়। কিন্তু ওর মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত, হাঁস-বুক ওঠা নামা করছে। কী বলতে চাইলো ও? হাবি হঠাৎ ডান হাত তুলে, তর্জনী দিয়ে এক-দিকে দেখিয়ে, নিজের সিঁথিতে ছোঁয়ালো। আঙুল ঘষে সিঁদুর মেখে ভুন্ডুলকে দেখালো। গোঙা শব্দে আবার উরুতের মাঝখানে হাতে সেই অদ্ভুত ভঙ্গি করলো। ভুন্ডুল কিছুই বুঝতে পারলো না। হাবি হাঁটুর ওপরে শাড়ি তুলে দেখালো। লম্বা ফালা কাটা দাগ। ওর গোঙানো শব্দে যন্ত্রণা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভুন্ডুল বুঝতে পারছে না, কেবল অনুমান করতে পারছে গভীর পীড়নের ইঙ্গিত। হাবি প্রায় ওর সারা নিম্নাঙ্গটাই দেখালো। কাটা দাগে ভরা। কে মেরেছে? কেন?...

হাবি নিজেকে শাড়ি দিয়ে ঢাকলো। লুটানো আঁচলটা টেনে বুকে রাখলো। দু হাত দিয়ে ছোট মাপের কিছু ইঙ্গিত করলো, তারপরে জিভটা এলিয়ে দিয়ে ঘাড় কাত করে চোখ বুজিয়ে দেখালো। হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথা নাড়ল। বুকের কাছে হাত দিয়ে দেখালো। দু হাত দোলালো, আবার মাথা নাড়লো। নেই, কী যেন নেই।

তাই কি বলছে ও? ঘুমন্ত বাচ্চার দ্যায়লার মতোই. ঠোঁট ফোলানো কান্নার ভাব ওর মুখে। নেই, কী যেন নেই ওর। ওর সেই মরে যাওয়া ছেলেটার কথা বলছে নাকি? খুসী যার কথা বলছিল? জিভ এলিয়ে চোখ বুজে, মাথা নেড়ে নেড়ে তার কথাই কি বলছে?

ভুন্ডুল মাথাটা এলিয়ে দিল তক্তপোশের গায়ে। ওর চোখ বুজে আসছে। একটা বোবা মেয়ে কী বলছে, ও তা ঠিক বুঝতে পারছে না। অথচ কষ্ট হচ্ছে।

হাবি ভুন্ডুলের কাছে এগিয়ে এলো; ওর ঘাড়ে একটা হাত রাখলো। আর এক হাতে ওর চিবুক ধরে নাড়া দিল। অ'ক অ'ক শব্দ করলো। ভুন্ডুল মাথা তুলে তাকালো। হাবি হাসছে, দ্বিধা আর ভয় ওর চোখে। চোখ পাকিয়ে হাত দুটো বড় ছড়িয়ে দেখিয়ে মাথা ঝাঁকালো। চোখে জিজ্ঞাসা ফুটলো। ভুন্ডুল কিছু বুঝতে পারলো না। হাবি ওর গায়ের কাছে লেপটে এলো গেঙালো। ভুন্ডুলের কোলের ওপর নিজেকে চাপাবার চেষ্টা করলো। ভুন্ডুল সামলাতে পারলো না, একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল।

হাবি জোরে শব্দ করে ভুন্ডুলের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়লো। ওর ঘাড়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপরে মুখ হাঁ করে হাত দিয়ে খাওয়ার ভঙ্গি করলো। বাঁকানো ঘাড়ে জিজ্ঞাসা। হাঁ, খিদে পেয়েছে আর বিশ্বসংসারে এ ভঙ্গিটা [illegible] কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু [illegible] আছে হাবির? কী দেবে? চানাচুর? ভুন্ডুল হাসলো, চোখ বুজলো।

হাবি সরে গেল একটু ভুন্ডুলের মাথার কাছে। ভুন্ডুল ওকে দেখতে পাচ্ছে না। অস্পষ্ট কী শব্দ হচ্ছে; ঠুক ঠুক ঠং ঠাং ভুন্ডুলের চোখে ঘুম নেমে আসছে। হাবি ওর গায়ে ঠেলা দিল, আঁ উঁহু উঁহু শব্দ করলো। তারপরে ওর ঘাড়ের নিচে হাত দিয়ে মাথাটা তোলবার চেষ্টা করলো। ভুন্ডুল মাথা তুলল। হাবি বাঁ হাতে ওর একটা হাত ধরে টানলো। ও উঠে বসলো। হাবি ওর পাশে বসলো। সামনে থালায় জলে ভাতে মেশান, বসন্তকালের নতুন লেবুর গন্ধ। বাব্রে পান্তা? হাবি নিজের হাতে ভাতের গরাস তুলে ভুন্ডুলের মুখে গুঁজে দিল। ভুন্ডুল হাঁ না করে পারলো না। সরষের তেল আর কাঁচা লংকা মাথা? তবু যেন একটু টকো। হাবি আবার মুখে কী গুঁজে দিল। সোনা খড়কে মাছ—পেঁয়াজ দিয়ে বাটি চচ্চড়ি?

ভুন্ডুল চিবোতে চিবোতে চোখের ভারি পাতা মেলে হাবির মুখের দিকে তাকালো। হাবি বিব্রত হাসছে, চোখে কি ওর স্নেহ; অথচ সংকুচিত জিজ্ঞাসা? ভুন্ডুলের মুখের ভিতর খাদ্যের স্বাদে লালা উপচে এলো, আর চোখ দুটোও যেন জ্বালা করে; [illegible] হয়ে উঠলো। গোঙানো অস্পষ্ট [illegible] বিড়বিড় করে উঠলো, 'ও রে শালা [illegible] তোর রেনেশাঁসের মুখ দেখে যা। [illegible] বলতে পারে—কানে শুনতে পায় না—[illegible] ভাত পরকে দেয়—।' ওর হেঁচকি [illegible]

হাবি জল ভরা গেলাস মুখের [illegible] ধরলো। ভুন্ডুল চুমুক দিল। হাবি [illegible] গেলাস নামিয়ে আবার লেবু মাখা [illegible] ভাতের সঙ্গে সোনা খড়কেত টাকমা [illegible] মুখে তুলে দিল। ওর মুখে লালা [illegible] উঠছে. চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। [illegible] হাসছে. গালের কাটা দাগে ঢেউ [illegible]। ওর গলায় এখন কোনো শব্দ নেই।

—শেষ—

নীললোহিতের চোখের সামনে

কিছুদিন ধরেই মনটা পালাই পালাই করছে। মনে হচ্ছে, আমি একটা ভুল জায়গায় আছি, আমার অন্য কোথাও থাকার কথা ছিল।

এক-একদিন বন্ধুবান্ধব কেউ থাকে না। যারই বাড়িতে যাই, সে নেই। প্রত্যেকেরই সেদিন অন্য অন্য কাজ থাকে। আমার অভিমান হয়, কেউ একবার ভাবলো না, আমি কী করে সন্ধ্যেবেলা একা থাকবো? সেই অভিমান থেকে মন খারাপ, তারপর মনটা একটা গুরুতর বোঝা হয়ে মাথার ওপর চেপে বসে, ক্রমশ নুয়ে পড়ে আমার মাথা। হারাউদ্দেশ্যে ঘুরতে থাকি আর বারবার নিজেকে বলি, আমায় কেউ মনে রাখে নি, আমায় কেউ মনে রাখে নি। তারপর এক সময় পুরো ব্যাপারটাই যে একটা হাসাকর ছেলেমানুষী, তা বুঝতে পেরে বাড়িতে ফিরে ঘুমিয়ে পড়ি।

স্যার আশুতোষ মুখার্জি'র বাড়ির সামনে থেকে দুটি মেয়ে মন্থরভাবে রাস্তা পার হয়। শীতকালীন মসৃণ মাধুর্য লেগে আছে তাদের মুখে, সেই রূপের ঝাপটা এসে আমার গায়ে লাগে। আমি মনে মনে বলি, ওরা আমার কেউ নয়। ওরা আমাকে কোনোদিন চিনবে না।

একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে একটি ভিখিরি পরিবার ক'দিন ধরে বাসা বেঁধেছে। অন্যদিন লক্ষ করি না, হঠাৎ একদিন দেখলাম, ভিখিরি-মা ইঁটের তোলা উনুনে মাটির হাঁড়িতে খিচুড়ি চাপিয়েছে। অনেকখানি হলুদ মেশানো গাঢ় হলুদে রঙের খিচুড়িতে নানারকম ডাল। বাচ্চাগুলো উনুনের চারপাশে গোল হয়ে বসা—চকচক করছে তাদের চোখ। প্রত্যেকেই উদগ্রীব প্রতীক্ষার জ্যান্ত মূর্তি। ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে কোথাও যেন দুঃখ দারিদ্র্য নেই। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ঐ হলদে খিচুড়ি। আমার কষ্ট হয়। আমার মনে হয়, আমি কেন ওদের আত্মীয় হতে পারলুম না? কেন আ[illegible] পাশে ব[illegible]ম খিচুড়ি [illegible]

ট[illegible]

[illegible]

বই মুড়ে রেখে মেয়েটি ছাদে উঠে এল

তারপরই খেয়াল হলো। উঠে তাড়াতাড়ি দেখতে গেলাম। সর্বনাশ! পাশের বাড়ির ছাদে লেপ-তোষক রোদে দেওয়া হয়েছে, একটা লাল টুকটুকে লেপের ওপর পড়েছে আমার সিগারেটের টুকরোটা, এবং ধোঁয়াচ্ছে। তুলোর আগুন অত্যন্ত সাংঘাতিক, কখনো দাউ দাউ করে জ্বলে না, ভেতরে ভেতরে ছারখার হয়।

প্রথমেই ভাবলাম, আমি এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে কেটে পড়লে কে আর বুঝবে যে ঐ দুষ্কর্মটি আমার? অন্য যার ঘাড়ে দোষ পড়ে পড়ুক। পর মুহূর্তেই মনে হলো, এখনো চেষ্টা করলে লেপটাকে বাঁচানো যায়। ও-বাড়ির মেয়ে দোতলার জানলার কাছে রোদে বসে পার্ট টু পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল, আমি তাকে বললাম, এই শোনো শোনো!

সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো। কোনো দিন তার সঙ্গে ডেকে কথা বলিনি। আমি বললাম, শিগগির একবার ছাদে এসো তো, শিগগির! এক্ষুনি!

আমার ব্যগ্রতাকে মেয়েটি অগ্রাহ্য কর[illegible]লো না, বই মুড়ে রেখে মেয়েটি ও[illegible]লো। এর মধ্যেই সিগারেটের [illegible]র খসে পড়ে গেল নীচে. [illegible]তি হয়নি, শুধু একটা [illegible]ড়েছে, হয়তো কারুর [illegible] তাহলে আর শুধু [illegible]কার করি কেন? [illegible]লেই [illegible] হয়! [illegible]টি ছাদে উঠে

এসেছে। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, কি?

আমার আর একটা দোষ এই, আমি ঠিক দরকারের সময় মিথ্যে কথা বানাতে পারি না। আমি তো-তো করে বললাম, এই না, মানে, হঠাৎ মনে হলো......। মেয়েটি এমন ভাবে আমার দিকে তাকালো, যেন আমি মানুষ নয়, অন্য কোনো অদ্ভুত প্রাণী। পরীক্ষার পড়া থেকে তুলে একটি মেয়েকে ছাদে ডেকে এনে যে কোনো কথা বলতে পারে না, সে কি মানুষ হতে পারে? জানলার কাছ থেকে সরে এসে আমি নিজের কান মলে বললাম, স্টুপিড, জীবনে আর যদি কক্ষণো সিগারেট খেয়ে......।

কিছুদিন ধরেই এই রকম সব ভুল ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে পরপর। নানা লোক টুকটাক অপমান করে যাচ্ছে বিনা কারণে। এক-একটা সময় আসে এরকম, যখন দিনের পর দিন চলে গণ্ডগোলের মিছিল।

তারপর বাড়িতে শুরু হলো আর এক ঝামেলা। গৃহবাসের সবচেয়ে বিরক্তিকর সময় কোনটা? যখন ঘরবাড়ি চুনকাম হয়। সমস্ত ঘরের জিনিস লণ্ডভণ্ড করে ফেলা না হলে ঘর চুনকাম হয় না। আলমারি-ফালমারি গুলোকে ঢেকে ফেলতে হয় ময়লা কাপড় দিয়ে, বইপত্র পোঁটলা বেঁধে রাখতে হয়, বাক্স-প্যাটরা টেনে জড়ো করা হয় ঘরের মাঝখানে, কোথাও একটু বসবার জায়গা পর্যন্ত থাকে না।

আমার ঘরটা চুনকাম করা সদ্য শেষ হয়েছে, শুকোতে সময় লাগবে। ঘরের মাঝখানে খাটের ওপরে দু'তিনটে বাক্স আর সুটকেস। সেগুলোকেই সিংহাসনের মতন ব্যবহার করে, তার ওপর উঠে বসে একটা বই পড়ছিলাম, এমন সময় কয়েকটা কথা কানে গেল।

কে একজন বললো, এখান থেকে

যদি পড়ে যাই, তাহলে কী হবে?

আর একজন বললো, পড়ে গেলে মরে যাবি?

প্রথম জন আবার বললো, 'মরে গেলে কী হবে?'

দ্বিতীয় জন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'মরে গেলে ফুরিয়ে যাবি, আর কি হবে?'

প্রথমে আমি বুঝতেই পারলুম না, কারা এই সব কথা বলছে। যেন শূন্য থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো। তবে কি কোনো দার্শনিকের আত্মা?

একটু পরেই বোঝা গেল। কথাগুলো আসছে আমার ঘরের বাইরের দেয়াল থেকে। বাইরে ভারা বেঁধে দেয়াল রং করছে দু'জন মিস্ত্রি। এই সংলাপ তাদের। বই বন্ধ করে আমি মন দিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলুম।

একজন বললো, তোকে যদি কেউ পাঁচ হাজার টাকা দেয়, তুই এখান থেকে লাফিয়ে পড়তে পারবি?

আর একজন বললো, পাঁচ হাজার কেন, কেউ এক হাজার টাকা দিলে আমি এক্ষুনি এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে পারি।

—এক হাজার টাকার জন্য মরে যাবি? [illegible]বে সেই এক হাজার টাকা দিয়ে?

—যাদের জন্য খেটে খেটে মুখের রক্ত [illegible], সেই বিধবা মা, বৌ আর ছেলেপুলে-[illegible]নকে বলবো, এই নাও, তোমাদের নগদা-নগদি এক হাজার টাকা তুলে [illegible], এবার আমায় নিস্কৃতি দাও, আমি [illegible]তে চোখ বুজি।

—শালা, যতই খাটি, কিছুতেই শান্তি [illegible] বাড়িতে ঢুকলেই খ্যাচ খ্যাচ, তার [illegible] মরে যাওয়া অনেক ভালো।

—এই তো, এখান থেকে একটু পা [illegible]গা করলেই সব জ্বালা যন্তোন্না জুড়োয়।

একটুক্ষণ নীরবতা। দেয়ালের গায়ে দেবার ছপছপ শব্দ। আবার কথা শুরু [illegible]ল।

—তুই যদি রাস্তায় এক হাজার টাকা [illegible]ড়য়ে পাস, কি করবি?

—সাত দিন টেনে ঘুমোবো, শালা!

—শুধু ঘুমোবি?

—তবে নাতো কি? কতদিন রাত্তিরে [illegible]ম হয় না ভালো করে। রোজই একচিন্তা, [illegible]ল কাজ পাবো কি পাবো না। পেলেও, [illegible]ফ্ রোজ না ফুল রোজ? হাপ্ রোজ [illegible]দিন পাই সেদিন গা জ্বলে যায়। এদিক [illegible]নতে সেদিক কুলোয় না।

—রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পাওয়া কি [illegible]র আমাদের ভাগ্যে হবে কোনো দিন?

—দূর দূর, কোনো দিন না। কেউ [illegible]সে বলবেও না, এই নাও এক হাজার টাকা, [illegible]ফাও এখান থেকে! এমনিই পা পিছলে [illegible]রবো একদিন, যেমন শুকুর মিঞা গেল, [illegible]ড়ির লোকের যেমন অভাব, তেমনই [illegible]ভাব থাকবে।

পাছে কথাবার্তায় অন্যমনস্ক হয়ে ওদের কেউ তখনই বিনা টাকায় পা পিছলে পড়ে যায়, তাই আমি দু'বার গলা খাঁকারি দিলাম। জানলার কাছে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি মিস্তিরি, আর কতটা বাকি?

ওদের মুখ দেখে চমকে উঠলাম। আগে কখনো ভালো ভাবে নজর করে দেখিনি। কী অসম্ভব শুকনো দুটি মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ, থুতনিতে রুখু দাড়ি। যেন দুটি কঙ্কাল। সংসারে ওদের সুখ নেই, তবু সংসারের চাকায় বাঁধা।

ভয় পেয়ে গেলাম আমি। সংসারের চেহারা এরকম? ভাবলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। এখান থেকে পালানো যায় না?

গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে চির বিদায় নেবার সাহস আমার নেই, তবু মাঝে মাঝে ছুটি তো নিতে পারি। ঠিক করলাম, আজই বেরিয়ে পড়বো, এক্ষুনি! ব্যাগ গুছোতে বসে গেলাম। কোথায় যাবো জানি না, তবু কোথাও যেতে হবে।

এই সংখ্যা থেকে আমি পাঠক পাঠিকা-দের কাছ থেকেও বিদায় নিলাম।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

ভূতের গল্প ঃ লেখক ও লেখা

আমাদের এখানে এ-সব সম্ভব নয়, কিন্তু বিদেশে সম্ভব—সে আমেরিকার হোক কিংবা ইংলণ্ডে, এমন কি ফরাসীদের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান প্যারিতে। ইংরেজী ভাষার যেসব লেখকরা গোয়েন্দা উপন্যাস লেখেন, কিংবা থ্রিলার তাঁদের একটি বড় সম্মেলন লন্ডনে হয়েছিল এ-খবর কয়েক মাস আগে আমি লিখেছিলাম। লেখকরা কে কেমন করে তাঁদের কাহিনী গড়ে নেন, কেমন করে লেখেন, লেখার সময় কেমন মজা পান—এই সব অভিজ্ঞতার কথা সেখানে ব্যক্ত করেছিলেন। গল্প ফাঁদার ব্যাপারে তাঁদের অভিজ্ঞতা সত্যিই কৌতূহল জাগায়। আপাতত সেই পুরোনো কথায় যাব না। তবে একটা কথা বলা দরকার, থ্রিলার লেখকদের যেমন নিজেদের একটা সংস্থা আছে সেই রকম আজকাল কি আমেরিকায় কি ইংল্যাণ্ডে সাইন্স ফিকশান লেখকদেরও নিজস্ব সংস্থা আছে। সম্মেলন টম্মেলনও হয়। অবশ্য সাইন্স ফিকশান লেখকদের কদর আজকাল ও-দেশে খুব বেশী; কোনো কোনো সম্মেলনে যে বাক্-যুদ্ধ হয় তা প্রায় বিজ্ঞানসভার মতন। এই ধরনের খবর হঠাৎ হঠাৎ আমাদের চোখে পড়লেও এ-যাবৎ কোনোদিন আমি ভৌতিক গল্প-লেখকদের সম্মেলন হবার সংবাদ শুনি নি। সম্প্রতি একটা পুরোনো কাগজে সে-রকম এক সংবাদ দেখলাম। দেখে চমৎকৃত হয়েছি।

যাঁরা ভূতপ্রেত কিংবা 'হরার' শ্রেণীর গল্প লেখেন তাঁদের আজকাল তেমন কিছু খাতির নেই। গেরস্থ কাগজে কিংবা মেয়েলী কাগজে গল্প লিখে তাঁদের দিন চলে, একেবারে সাধারণ প্রকাশকরা তাঁদের বই ছাপেন, কখনো সখনো এক-আধজনের গল্প সিনেমা হয় এই মাত্র। এঁদের মধ্যে দু'-একজন হয়ত কল্কে খাচ্ছেন, বাকিরা ভাবছেন পেশা ছেড়ে দেব। অনেকেই মনে করছেন, সাইন্স ফিকশানের জনপ্রিয়তাই অ-প্রাকৃত ও রোমাঞ্চকর গল্পের বাজার শেষ ক'রে দিয়েছে। পাঠক সাইন্স ফিকশানে যে রোমাঞ্চ পান ভূতের গল্প তার চে'য় বেশী আর কি দেবে! তবে অ-প্রাকৃত গল্পের একটা ঐতিহ্য আছে। তার এমন পরিণতি কেন হবে?

স্কটল্যাণ্ডের কোনো এক জায়গায় এঁদের এক সভা হয়; সম্মেলনই বলা চলে। মানে যে বিশাল বাড়িতে সম্মেলন চলেছিল সেই সভার সমস্ত কিছুই ছিল ভৌতিক। সেটা একসময় ছিল দুর্গ, এখন ভাঙা-চোরা চেহারা, বাড়ির বাইরে অজস্র গাছ-পালা। দিনের বেলায় সম্মেলনের কোনো চিহ্ন কোথাও থাকত না, শুধু বাড়ির বাইরে মস্ত এক ফেস্টুন ঝুলত, তাতে আঁকা থাকত মড়ার মাথা আর সংক্ষেপে লেখা থাকতঃ 'দয়া করে রাত্রে আসবেন।'

রাত্রে সেই পুরোনো দুর্গের বিভিন্ন ঘরে ভূতের গল্পের লেখকরা ভৌতিক বেশবাস পরে শ্রোতাদের সামনে হাজির হতেন, ঘরে বাতিটাতি বড় একটা জ্বালানো হত না, রেকর্ডারে নানারকম শব্দ—ঝড় জল বজ্রপাত কান্না কুকুরের ডাক ইত্যাদি বাজিয়ে আবহাওয়াটা জমিয়ে নেওয়া হত। তারপর শুরু হত সম্মেলন। কেউ হয়ত দীর্ঘ আলোচনা করতেন—ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব সম্পর্কে, কেউ গুরুগম্ভীর কথায় আত্মা নিয়ে জটিল বক্তৃতা ফাঁদতেন, কেউ বা পড়তেন নিজের লেখা গল্প। ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ডও কোনো কোনো ঘরে দেখানো হত। আবার কারও কাছে শোনা যেত প্রাচীন সাহিত্য থেকে এ-যাবৎ কেমন ভাবে অ-প্রাকৃত একটি ধারা বয়ে এসেছে সাহিত্যে তার আলোচনা।

এ-ধরনের একটি সম্মেলন শেষ হবার পর ভূতের গল্পের কদর বেড়েছিল কিনা আমি জানি না। তবে অনুমান করতে পারি, ভৌতিক গল্পের লেখকরা একটু বাজার জমাবার চেষ্টা করেছিলেন।

আমাদের বাংলা ভাষায় ভূতের গল্প তেমন নেই। হাসি-ঠাট্টা মস্করা-করা ভূত অবশ্য আছে—কিন্তু যথার্থ ভূত (সিরিআস ভূত?) কোথায়? রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অতি-প্রাকৃত গল্প লিখেছিলেন সমসাময়িক আরও দু-একজন। পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্য থেকে ভূত [illegible]। শরদিন্দু কয়েকটি এ-জাতীয় চমৎ[illegible] গল্প লিখেছেন কিন্তু অন্যরা শখ করে এক আধবার ভূতের গল্প লেখবার চেষ্টা করলেও সেদিকে মোটেই নজর দেন নি। আমাদের বাংলা ভাষায় দু-একটি ভৌতিক গল্প সংকলন আছে বটে, রহস্য রোমাঞ্চ-জাতীয় পত্রিকাও আছে দু-তিনটি—কিন্তু তা নিয়ে পাঠকদের যে মাথাব্যথা আছে এমন মনে হয় না।

হালকা সাহিত্যও আনন্দের অংশ। ভূতের গল্প বলে নাক কুঁচকোবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। সাহিত্যের নাম করে অনেক অ-সাহিত্য আমাদের এখানে বেশ চলছে। গোয়েন্দা বা ভূতের গল্পের বেলায় ছি ছি করার কী কারণ রয়েছে আমি জানি না। ছোটদের পত্রিকায় আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের অনেকেই এক সময় অসাধারণ ভূতের গল্প লিখেছেন, যেমন হেমেন্দ্রকুমার রায়, শৈলজানন্দ। ছোট বড় সকলেই সেই গল্প পড়ে আনন্দ পেয়েছি। এখন যে কী কারণে তা লেখা হবে না—আমি বুঝি না।

কলকাতায় অনেক রকম সাহিত্য সম্মেলন হয়। কেউ যদি উদ্যোগী হয়ে কলকাতার আশপাশে কোনো ভাঙা পুরোনো জমিদার বাড়ি-টাড়িতে একবার ভূতের—মানে ভূতের গল্প লেখকদের আসর বসান মন্দ হয় না। লেখকদের অভাব নিশ্চয় ঘটবে, কিন্তু শুধু ভূতের গল্প লেখকদের না ডেকে থ্রিলার ও সাইন্স ফিকশান লেখক-দেরও এখানে ডাকা যেতে পারে। বেশ একটু নতুন ব্যাপার হয়।

অভিনন্দ,

ওদের নির্দেশমত পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। ভরাট লাল মদের পাত্র নিয়ে ওর ডানহাতের সঙ্গে আমার ডানহাতে পাঁচ কষে একপাক ঘুরে যেতে হল চোখে চোখে তাকিয়ে। তারপর সশব্দে তিনবার চুমু—ব্যাস ওরা ঘোষণা করল সেইক্ষণ থেকে আমি আর মার্গা ইয়ারের বন্ধু, মানে তুই তুকারির সম্পর্ক।

এই পৃথিবীতে অনেক নারী আছে যারা আমার বন্ধুত্ব চায় কিন্তু আমি তাদের বন্ধু হবার কারণ খুঁজে পাই না—মার্গা সেই গোত্রের।

রুডির বাড়ী প্রায়ই উইক-এন্ডে আসত এই উত্তর চল্লিশে হাসকুটি জার্মান মার্গা। চটপট অ্যাপ্রোন জড়িয়ে বাগান সাফ করতে শুরু করত, কাছে দাঁড়ালেই হেসে বলত "আমি বাগান সাফ করতে খুব ভালবাসি," তারপরই আস্তে করে বলত, কিন্তু অন্যের বাগান। আসলে মার্গার নিজস্ব বাগান ছিল না।

সহজ বন্ধুত্ব হবার পর কফির টেবিলে বরিসের কথা পেড়েছিল মার্গা খুব আলতোভাবে। ও বলেছিল আমি একজন সুইস পেইন্টারকে জানি সে খ্যাতিমান সুন্দর—কিন্তু সবকিছুই তোমার বিপরীত। আমার সম্মতি নিয়ে ও ঠিক করল একদিন বরিসের স্টুডিও যাবার। ইতিমধ্যে অনেক-দিন কেটে গেল, আমি জার্মানী থেকে ফিরে আসার পর জলির বাড়ীতে পা দিতেই প্রথম প্রসঙ্গ উঠল বরিস জ্যান-সিয়রের। সেদিনই ফোনে রাঁদেভুঁ হল বিকেলে বরিসের স্টুডিও যাবার। বুঝলাম, ইতিমধ্যে জলিও বরিসের পরিচিত হয়েছে। সময় মত যখন আমি আমার ঘর থেকে নামলাম, তখনও আমার কোন কৌতূহল

শিল্পী বরিসের জানলায় | শুভাপ্রসন্ন

মেশা উত্তেজনা ছিল না। কৌতূহল শুরু হল জলির সাজ দেখে—বহুবার নানান নিমন্ত্রণে আমি জলির সঙ্গী হয়েছি কিন্তু আজকের নিখুঁত সাজে অন্য জলিকে দেখলাম। তিন সন্তানের জননী জলিকে সহজ প্রেমিকার মত মনে হল।

আমার পরিচিত স্বর্গের বাইরের যা কিছু তার সব কিছুই আমাকে বোকা নির্বোধ করে তোলে, আমি সরল নাবা-লকের মত প্রশ্ন করে ফেলি যা মর্তের এ-খণ্ডে এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়।

তখনও আমার মনে কোন প্রশ্ন আসেনি। জলির ডান পাশে সিটবেল্টটা আটকে নিলাম, শহরের ওপারে গাড়ী থামল। জানলাম, মার্গা আমাদের সঙ্গী হবে। মার্গা এল—হাতে তার ছোট্ট উপহার, বরিসকে দেবে সে। প্রতিটি শব্দই এখন তার হাসির জোগানদার। মার্গার সঙ্গে পরিচয় আমার নতুন নয়, তাই সাধারণ গদ্যে সহজ ছিলাম, কিন্তু আজকের এই যাত্রায় দুটি অত্যন্ত পরিচিত নারীর সব কিছুই আমায় বিব্রত করল। মার্গার জীবনে যে কিছুটা সবুজ জমি আছে তা জানলাম। জেনেভের প্রায় শেষ সীমায় নিত্য যাবার পথ ধরে যেখানে এসে পৌঁছলাম, সেখানে শহরের কোন অস্তিত্ব ছিল না। একপাশে নিখুঁত গ্রাম আর অন্যপাশে অসংখ্য সুস্থ গাভীর চারণভূমি। এঁকে বেঁকে গ্রামের পথ ধরে এক বিশাল ক্যাসেলের কাছে গাড়ী দাঁড়াল। মার্গা ছুটে গিয়ে সেই ক্যাসেলের দরজায় ঝোলানো একটা চেন টানল, সঙ্গে সঙ্গে চার্চের ঘণ্টার মতো গুরুগম্ভীর আওয়াজ হল বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে। ওটাই বরিসের কলিং বেল। একটু পরেই দরজা খুলল। হালকা নীল রঙের সুট পরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বরিস মার্গা আর জলিকে সাপটে চুমু খেল। আমি একটু দূরে ছিলাম। সমস্ত কাণ্ড কারখানায় আমার

উপস্থিতি সত্যিই রোগা নিরীহ লাগল।

যে ভাষায় মানুষ অন্যকে বোঝে, তা সব সময় ধ্বনি আশ্রয়ী হয় না। সে মুহূর্তে আমি বা আমাকে বরিস বুঝেছিল কোন এক অজানা ভাষায় যার অর্থ আর যাই হোক, তাতে পারস্পরিক সংগতি ছিল। এই দুই নারী তাদের নারীত্বের যাবতীয় মূলধন নিয়ে সুন্দরদর্শন এক পুরুষ শিল্পীর কাছে পরিচয় করাতে এসেছে আর এক পুরুষের, যার বিশেষত্ব সে পেশায় চিত্রকর, জাতে ভারতীয়। এ পরিচয়ে বরিস আমাকে গ্রহণ করেছিল কিন্তু সে গ্রহণে তখনো কোন উষ্ণতা ছিল না। বরিস জাত শিল্পী, তাই ঈর্ষা ছিল তার সরলতা ভরা। আমার মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন অস্ত্র ছিল না—উপরন্তু আমি নিজেকে সমর্পিত করেছিলাম গুণমুগ্ধ হিসেবে।

বিশাল ক্যাসেল জোড়া স্টুডিও, মাঝখানে দুটো হলঘর। হলঘরে টাঙ্গানো নানা সময়ের আঁকা বরিসের ছবি। মানুষ হল ছবির মুখ্য বিষয়। জানালা আঁকতে ভালবাসে বরিস—তার অনেক ছবিতে জানলা দেখে প্রশ্ন করলাম, জানলার প্রতি তোমার এত দুর্বলতা কেন? বরিস উত্তরে বলল, এই জানলাই একমাত্র জিনিস যা খুললে যা দেখতে চাই তাই-ই দেখতে পাই—আমি প্রায়ই জানলা খুঁজি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চললাম ছবি, অফুরন্ত—যেন দীর্ঘ শিল্পীজীবনের কোন মুহূর্তও অপব্যবহার করেনি সে। মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি, বরিস দেখিয়ে চলে খুশী হয়ে, অতি উৎসাহে। ইতিমধ্যে মার্গার হাঁক শোনা গেল, কফি রেডি।

আমি আত্মমগ্ন ছিলাম বরিসের জগতে, যার প্রায় সমস্ত অংশ জুড়ে রয়েছে নারী, পুরুষের উপস্থিতি সেখানে বাড়ি।

কেবলমাত্র হলঘরের ওপাশ দেয়ালের ডান পাশে এক বিশাল ছবি, সেটা ছিল বরিসের প্রিয় বন্ধু কবি ও সমালোচক ব্রুনোর চেয়ারে বসে থাকা সুপুরুষ উলঙ্গ ছবি, যার একটিই সমস্ত নারীর সৌন্দর্যকে হার মানায়।

মার্গা জানত। আমার জন্যে বরাদ্দ রেখেছিল এক গ্লাস দুধ। যা আমার প্রতি বরিসের কৌতূহলের আর এক কারণ। বরিস আমাদের সামনের চেয়ারে। আমি মাঝখানে—ডান পাশে মার্গা, বাঁ পাশে জলি। মার্গা তার উপহারের ছোট্ট মোড়ক খুলল। সুনিপুণ হাতে সমস্ত মিষ্টতা উজাড় করে তৈরী করেছে নাট কেক। আমি মৌন ছিলাম। ওদের কথোপকথনও ঠিক কি চলছিল তাতে হুঁশ ছিল না। সামনে টাঙ্গানো ছবিটি কার আমি জানতে চাইলাম, ছবিটি কর্মঠ, উজ্জ্বল, অভিমানী একটি মেয়ের, তার আশেপাশে কখনও স্বচ্ছ কখনও অস্বচ্ছ তারই নানান মুখের ছবি। এটা বরিসের নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গী, সেলুলয়েডের মনতাজের সুযোগটা ব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত। ছবিতে নিজের চাহিদা মেটাবার জন্যে যা পেত জুড়ে দিত, অবশ্য পেশাগত দক্ষতা বজায় রেখে। বরিস থেমে উত্তর দিল, এটাই হল এ মুহূর্তের সবশেষ সুখ ও দুঃখ। মেয়েটি জীবিত কিন্তু আমার জীবনে সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত। তাকে কামনাও করি, ঘৃণাও করি। আমার তৃতীয় মহিলার সঙ্গ ত্যাগের পর এই দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দেই। কিছুদিন হল বিচ্ছেদ ঘটেছে—কিন্তু বিশ্বাস নেই, এখুনি হয়ত ফোনে বলবে আমি আসছি।

বরিসের পৃথিবীতে আপনার বলতে সারমেয়টি, অন্য কোন প্রজা নেই।

ওই বিশাল ক্যাসেলে সাজানো সহস্র ছবির স্রষ্টা সুন্দর সুপুরুষ বরিসের প্রতি
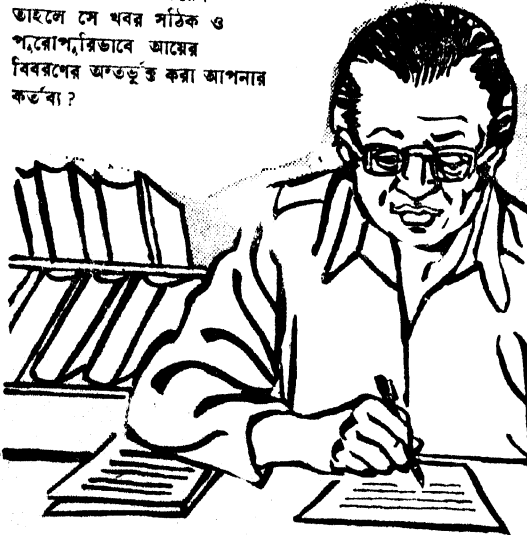
সহস্র কৌতূহল নিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি নিঃসংগ বোধ কর না বরিস? চট্ করে জবাব দিল, তখন দক্ষিণের জানলা খুলি।

যে যার পানীয় শেষ করে উঠে পড়লাম। বরিস আমাদের সংগে যাবে, আমার ছবি দেখতে। জলি এখন একা।

স্বামী কাজে পাড়ি দিয়েছেন আমেরিকা। আজকের পুরুষ সংগী হিসেবে হয়ত বরিস আমন্ত্রিত।

বরিসের পছন্দমত আমি ওর গাড়িতে উঠলাম। মার্গা জলির সংগী হল—ওদের পিছু চললাম আমরা। গাড়িতে আমরা ছাড়া বরিসের নিত্য সংগীনী ড্যাসহাউন্ড সারমেয়টি নিশ্চিন্ত ছিল।

এখন অন্য বরিসকে দেখলাম। অনেক বিনয়ী, অনেক সহজ, অনেক বিপন্ন মনে হল। ছোট ছোট নানা প্রশ্নে ওর জীবনের নানাম ঘটনা জানলাম। ওর জীবনের সবপ্রথম দেখা নিষ্পাপ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ব্যক্তিটি হলাম আমি।

জাতে বরিস ছিল ইহুদি। এক রাশিয়ান মহিলা গ্রহণ করেছিলেন তাকে পত্র হিসাবে। যে ভদ্রলোক পিতার ভূমিকায় ছিলেন তিনি জার্মান। প্যারীতে শিল্প শিক্ষা শেষ করে কানাডায় স্টুডিও করেছিল বরিস। এক প্যারিসিয়ান মহিলার সংগে কেটেছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর। তার গর্ভের দুই ছেলেই এখন ন্যুইয়র্কে হিন্দুধর্ম প্রচারক।

বরিস বিশ্বাস করে এ পৃথিবী স্ত্রীলোক শাসিত, পুরুষ তাদের ক্রীতদাস। বললে, দেখ কেমন আমরা চলেছি ওদের পিছু পিছু। আমার মা হতভাগীর ধারণ করার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু পুরুষ

দুরন্ত দাপটে। আমরা কেমন রানী করে রাখি তাদের। কোন সমাজসংস্কারক রাজনীতিজ্ঞ কেউই এর পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। আমার আত্মতৃপ্তি এইটুকুই যে, আমি ক্রীতদাস হইনি। তুমি বৃটিশদের সঙ্গে মিশেছ? প্রথম পরিচয়ে তাদের মত ভদ্র, নম্র, আকর্ষণীয়, আলাপী, বন্ধুবৎসল পাবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে থেকে তুমি তাদের পরিচিত হলে, তখন অন্য রূপ। চারদিক লক্ষ করলে দেখবে কাঁটাতারের বেড়া, যেখানে তোমার নরম মনের পর্দাল ক্ষত বিক্ষত হবে। রমণীরা বৃটিশদের মত।

গাড়ী থামল মার্গার বাড়ির কাছে। আমরা মার্গাকে বিদায় জানাতে নামলাম। বিদায় চুম্বনে ওরা কিছুটা সময় নিল। সেই ক্ষণে মার্গার পরিচিত হাসি দেখিনি। ওকে বিকেলের ফুলের মত মনে হল।

জলি বরিসকে ফলো করতে বলে গাড়ী এগিয়ে নিল কিছুটা। বরিস স্টার্ট দিয়েই আমায় বললো, প্যুয়োর মার্গা আমার কাছে আশা করে অনেক, কিন্তু আমি এ পর্যন্ত কোন প্রশংসাব ক্যই রচনা করতে পারিনি ওর জন্য। জানো এই জার্মান মেয়েগুলো জোক বোঝে না। হিটলার ওদের ওসব শেখায়নি। বিশ্বাস করো, হিটলার বিদায় নিলেও প্রতিটি জর্মন হিটলারের আইন মেনে চলে। মার্গা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে আমার প্রত্যহ ওর প্রতি ঠান্ডা আচরণের জন্য। কিন্তু জানো, আমার অল্প প্রশ্রয়ে আমি গোলাম হয়ে যাব ওর কাছে। গোপন সখ্যতাই স্ত্রী জাতির মূলধন। আমি তা প্রকাশ্যে চাই।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আমরা এসে পড়েছি জলির বাড়ি, আমি এখানেই থাকি। জলিরা আমার ছবি খুব ভালবাসে। জেনেভের দৈনন্দিন কোন খবরই বরিসকে উৎসাহিত করে না—ও জানে না আমার প্রদর্শনীর খবর।

বাড়ীতে ঢুকেই ছবি দেখতে চাইল। সামনে টাঙ্গানো আমার আঁকা একটা ছবির কাছে দাঁড়াল বরিস। সে ছবিতে সীমাহীন বৃদ্ধ পৃথিবীর দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে নারী, পুরুষ, শিশু—তারা তাদের নিস্তব্ধ ভাষায় ছুটি চাইছে। প্রচুর ফলনে মাটি ফলনের ক্ষমতা হারিয়েছে। প্রচুর ধারণে নারী হারিয়েছে ধারণের ক্ষমতা। ক্লান্ত পুরুষ অপুষ্ট শিশু একই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। যাতে কোন [illegible] শোষকের করুণা ছিল না।

আমার পুরোনো নতুন সব ছবি উজাড় করে বৈঠকখানায় বিছোতে লাগলাম। ইতি-মধ্যে জলি পানীয়ের ব্যবস্থা করে বরিসকে এনেছে সে ঘরে।

একজন চিত্রকরের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যে-কোন চিত্রকরকেই আত্মতৃপ্তি এনে দেয়। যা কোন রমণীর মুখে অন্য রমণীর প্রশংসার মত বিরল।

বরিস আন্তরিকতার সঙ্গে শ্রদ্ধা জানালো আমার ছবিকে। তার দীর্ঘ জীবনে কখনো ভারতীয় চিত্রশিল্প বা চিত্রশিল্পীর সাক্ষাৎ ঘটে নি। আমার ছবি চাইল বরিস নিজস্ব সংগ্রহশালায় রাখবে সে। কথা হল ছবি বিনিময়ের। ওর পছন্দমত আমার ছবি নেবে। আমি নেব আমার পছন্দমত ওর ছবি। ছবি দেখার পর গভীর রাত্রি

পর্যন্ত চলল নানান আলোচনা। জলির পাশে বরিস, অল্প আলো। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে জ্বলন্ত চুল্লিতে কাঠ পুরি। ঘরের সমস্ত উষ্ণতা মনে, শরীরে পরস্পরকে আরো কাছে এনে দিল।

ওরা পানাসক্ত হয়ে পড়ল কিছু পরেই। আমি শুভরাত্রি জানিয়ে ওদের সঙ্গ ত্যাগ করলাম।

সকালে জলির দেখা পেলাম একটু বেলায়। বরিসকে না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, বরিস কোথায়? মধ্যরাতে চলে গেছে বরিস, হয়ত দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, যা তার কোন অসম্পূর্ণ ক্যানভাস সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করবে।

আমার হাতে বেশী দিন ছিল না। দেশে ফেরার তোড়জোড় করছি। পরদিন ফোন এল বরিসের—

ছবি নিতে আমন্ত্রণ জানালো। আমি তার খোলা জানলার একটা ছবি নিলাম। সে জানলার দিকে তাকিয়ে বরিস শিশু উদ্যান দেখতে পেয়েছিল।

ও বলল তোমায় বিদায় জানাবো না। আমার কাছে চলে এসো, কিছু সৈনিক চাই। রমণীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবো আমরা সমস্ত পুরুষদের। পাগল বরিসকে বিদায় জানিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

* * *

পরদিন মোনিকের চিঠি পেলাম।

দক্ষিণ ফ্রান্সের পাহাড়ে ঘেরা শহর এক্স-এর মেয়ে মোনিক। চিঠির সঙ্গে একটা ছবি, পাহাড়ের কোলে গাছে ভরা তার ছোট বাড়ীর নীচে বসে আছে সে। ছবির পেছনে লেখা কয়েকটা লাইন : "প্রিয় শুভো, আমার এই ছোট নীল বাড়ীর কথা মনে রেখো। একদিন স্বচ্ছ নীল আকাশে রোদের আলোয় তোমার হাত ধরেছিলাম, কোন মেঘের আভাস ছিল না সে আকাশে। ভালবাসা জেনো, তোমার মোনিক।"

আলোচনা

বন্দেমাতরম্‌

কিছুকাল পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় বন্দেমাতরম্‌ সম্পর্কে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর বিভিন্ন সংখ্যায় বন্দেমাতরম্‌ গানের সুর তাল ইত্যাদি বিষয়ক অনেকগুলি মূল্যবান পত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোচনাগুলির মধ্য থেকে বেশ কিছু নূতন তথ্যেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

চিঠিপত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশ পাঠকেরই বিশেষ কৌতূহল লক্ষ করা গেল বন্দেমাতরম্‌ গানের পুরাতন সুর এবং তাল প্রসঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালের মধ্যে গৃহীত বন্দেমাতরম্‌ গানের কোনো রেকর্ড কি আমরা পেতে পারি? এর একমাত্র উত্তর হল—না। আমরা সুরযন্ত্রে গৃহীত বন্দেমাতরম্‌ গান প্রথম শুনি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। এইচ্‌ বসুর টকিং মেশিনে এই গান গৃহীত হয়েছিল বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে। এখন প্রশ্ন, বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে বন্দে-মাতরম্‌ গানটি কিরকম সুরে গাওয়া হত, তা কি জানবার কোনো উপায় আছে? ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দ রবীন্দ্রনাথ যে বন্দেমাতরম্‌ গেয়েছিলেন, সেই সুরেই কি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন? সেই সুরেই কি কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে কবি বন্দেমাতরম্‌ গান গেয়েছিলেন? জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রতিভাসুন্দরী দেবী কর্তৃক বন্দেমাতরম্‌ গানের প্রথম অংশের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। এছাড়া ওই সময়পর্বে উক্ত গানের অন্য কোনো স্বরলিপি কি পাওয়া যায়? 'বালক' ছাড়া ওই সময়-পর্বে বন্দেমাতরম্‌ গানের আর কোনো স্বরলিপি অন্য কোথাও মুদ্রিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এ-স্থলে 'বালক' পত্রিকার স্বরলিপিটিকে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে মুদ্রিত বন্দে-মাতরম্‌ গানের প্রাপ্ত প্রাচীনতম বা একমাত্র স্বরলিপি হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় ওই স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছিল, সেই হেতু এই স্বরলিপির সুর যে বঙ্কিম-কর্তৃক অনুমোদিত তা সহজেই অনুমান করা যায়। বন্দেমাতরম্‌ গানের প্রথম প্রকাশিত স্বরলিপিটি আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম মুদ্রিত স্বরলিপি হিসেবে অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধার সংগে সংরক্ষিত রাখা কর্তব্য বলে মনে করি। অথচ 'বালক' পত্রিকা অতিশয় দুর্লভ, তার পাতা জীর্ণ এবং অনেক পৃষ্ঠা বিনষ্ট ও বিলুপ্ত। আমরা শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-যাদুঘরের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ থেকে উক্ত স্বরলিপির প্রতিলিপি-চিত্র সংগ্রহ করেছি।

বর্তমান পত্রের দ্বিতীয় প্রসঙ্গ—বন্দেমাতরমের ইংরেজী অনুবাদ। বন্দে-মাতরমের বিশেষ সুর এবং ধ্বনি [illegible] ভারতবাসীর নিকট গানটিকে দ্রুত [illegible]প্রিয় করে তুলেছিল, সেইরূপ বন্দেমাতরম তথা আনন্দমঠ উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ গানটিকে সহজেই বিদেশীর নিকট পরিচিত করিয়ে দেয়। আমরা জানি শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম্‌ গানের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের পূর্বে আনন্দমঠের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেন সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। সেটা তখন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ। গ্রন্থের নাম 'Abbe of Bliss'। বইটি বর্তমানে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। শান্তি-নিকেতনে নরেশচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী পূর্ণিমা সিংহের কাছ থেকে জেনেছি ওই গ্রন্থের একখানি কপি কলকাতায় নরেশ-চন্দ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্বেতকেতু সেনগুপ্তের সংগ্রহে আছে। জাতীয়-সঙ্গীত বন্দে-মাতরমের প্রথম অনুবাদ হিসেবে 'Abbe

of Bliss' গ্রন্থটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় আনন্দমঠের অনুবাদ হয় পরবর্তী কালে।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
শান্তিনিকেতন

কীর্তন কলা

'দেশ' পত্রিকার ৭ম সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় শার্ঙ্গদেবের লেখা 'ক্ষয়িষ্ণু কীর্তন কলা' নামক মনোরম রচনাটি মুগ্ধচিত্তে পড়ে যে কথা মনে পড়ল, সেটি হল, চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে এমন একটি কীর্তন-সঙ্গীতের ধারা বহুকাল ধ'রে বয়ে চলেছে, যার খোঁজ বাইরের মানুষ প্রায় কেউই রাখেন না। এই কীর্তনটির নাম 'ডাক নম'। অনেকে বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডেকে গাওয়া হয় বলে এর নাম 'ডাক নাম'। কীর্তনের এই বিশেষ ধারাটি প্রবহমাণ হুগলী নদীর মোটামুটি পূর্ব তীরবর্তী এলাকায়। যাদবপুর থানা অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে গঙ্গাসাগর এবং পূর্বে বসিরহাট অঞ্চলের পশ্চিমাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার বাইরে এই প্রকার কীর্তন কোথাও শুনতে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণকীর্তনের যেসব গায়করীতির সঙ্গে আমরা সাধারণত পরিচিত (যেমন- পদ বা পদাবলী কীর্তন, পালা কীর্তন, ঢপ কীর্তন প্রভৃতি) তার সঙ্গে এই গায়ন রীতির কোনো মিল নেই বলে আমার মনে হয়। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এর অনুষ্ঠান। একজন মওড়া (অগ্রণী) গায়ক যথারীতি থাকেন এবং থাকেন একজন দোহার। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে একটি মৃদঙ্গ (খোল) ও এক জোড়া জুড়ী থাকে। জুড়ীকে আঞ্চলিক ভাষায়, বাটী, মন্দিরা বা খঞ্জনীও বলে। আর কোনো বাদ্যযন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয় না। তবে যেখানে প্রতিযোগিতামূলক আসর বসে মৃদঙ্গ বাদ্যকে লক্ষ করে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই একাধিক মৃদঙ্গ আসে। মাত্র এই চারজনে হরিবাসরে দাঁড়িয়ে কীর্তন করেন। পুণ্য মাস হিসেবে বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে বা কোনো বিশেষ পর্বাহে এই কীর্তনের আসর বসে গ্রামে, গ্রামান্তরে। আশ্চর্য এর ক্ষমতা। বহু কীর্তনবাসরে গিয়ে দেখেছি, ৩।৪ শত শ্রোতাকে এই কীর্তনীয়ারা চার বা অষ্টপ্রহর ঘন্টার পর ঘণ্টা অনায়াস প্রচেষ্টায় বসিয়ে রাখতে সক্ষম হন। অথচ ঐ সব প্রচলিত কীর্তনের মত আবেগময়তা এখানে অনুপস্থিত। বহুদিন ধরে বহুবার এই কীর্তন (ডাক নাম) আমি শুনেছি, খুব ভালোভাবে লক্ষ করেছি, সর্বসাধারণ্যে প্রচলিত পূর্বোক্ত কীর্তনের প্রভাব থেকে এই ধারা সম্পূর্ণ মুক্ত বলে আমার ধারণা হয়েছে। আমি সঙ্গীতজ্ঞ নই; তাই এর ব্যাকরণগত তাত্ত্বিক আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি এর স্বকীয়তা বা মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। সংশ্লিষ্ট কীর্তনীয়ারাও সে কথা স্বীকার করেন। কীর্তনের বিষয়বস্তু হচ্ছে : গীতা মাহাত্ম্য, পৌরাণিক কাহিনী, দেহতত্ত্ব, গুরুভক্তি প্রভৃতি। গোষ্ঠ, প্রার্থনা বা যুগল সঙ্গীতও যুক্ত হয় এবং সাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য ধূলোট, জোগাড়তি বা লুটের গানও গীত হয়। তবে শেষোক্ত সঙ্গীতগুলি যে 'ডাক নামে'র সঙ্গে সংগতিবিহীন এবং কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত একটু লক্ষ্যভাবে শুনলেই বুঝতে কষ্ট হয় না। এই কীর্তন কোনো রাগ রাগিণীকে আশ্রয় করে গীত হয় না।

তেওট, আর্ধা, রেনেটি, দুঠুকি, ধসা, সমতাল বা ছোটো, মিল-ধামার তালে অধিকাংশ গান হয়। কার্ফাও আছে (অবশ্য প্রচলিত কীর্তনেও এই সব তাল ব্যবহৃত হয়)।

এই কীর্তনের প্রচলন ঠিক কবে থেকে বা কার হাতে, তা সঠিকভাবে জানতে পারিনি। তবে দীর্ঘ দিন অনুসন্ধানের ফলে যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেটুকু জানাচ্ছি। শোনা যায়, এই গায়নরীতির প্রথম স্রষ্টা নাকি জনৈক রাখাল ওস্তাদ, তাঁর শিষ্য ও প্রশিষ্যরা। তন্মধ্যে পতিত পাবন ও কেশব পাগলার নাম জানে না, এমন কীর্তন-পাগল গ্রাম এই দক্ষিণাঞ্চলে বিরল। আশংকার কথা, সম্ভবত এই কীর্তনের বিষয়বস্তু, সুর ও তালের কাঠিন্য হেতু এই ধারাটি আজ সত্বর লুপ্ত হতে চলেছে এবং তার স্থান দখল করছে প্রচলিত পদ কীর্তন (এটিও আজ অত্যন্ত sophisticated হয়ে যাচ্ছে)।

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী
সাউথ রামনগর, ২৪ পরগনা

গ্রামাঞ্চলের পাঠকের রুচি

অভিনন্দ মফস্বলের সাহিত্যসভা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রামাঞ্চলের পাঠকরুচির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। তার প্রত্যুত্তরে কোনও পত্রলেখক দায়ী করেছেন অসাধু প্রকাশকদের যারা 'বউ কথা কও'এর কারবারী। ধনেখালি ব্লকের এক বিরাট গ্রামীণ গ্রন্থাগারের এক বছরের ইসু রেজিস্টার খুঁজে গ্রামের পাঠকরুচির যা বাস্তব পরিচয় পেয়েছি সংক্ষেপে তা জানাচ্ছি। যদিও এটা হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক সমীক্ষা নয়। অন্যান্য গরীব গ্রাম্য পাঠাগারের [illegible] যে-কোন বই দিয়ে সংখ্যা-বৃদ্ধির [illegible] কর্তৃপক্ষের আছে, আবার রামমোহন ফাউন্ডেশনের মত নামী প্রতিষ্ঠান 'ব্যাংক কিভাবে টাকা দেয়', 'ভাল কৃষক হতে হলে' জাতীয় পুস্তক দান (?) করে বইয়ের যোগানও বাড়িয়েছে। অন্য দিকে 'বিবেকানন্দ রচনাবলী', 'রবিরশ্মি', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র', 'বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র', 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', 'বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাস' , 'টেক্স বুক অব অবস্টেট্রিক অ্যান্ড গাইনোকলজি', 'ইনডিয়া উইনস ফ্রিডম' প্রভৃতি বহু গুরু-গম্ভীর বই ও তার পাঠকও বিদ্যমান। সুতরাং দোষটা নিছক লেখক পাঠক, বা প্রকাশক বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উপর একতরফা চালানো যায় না। শহরের প্রভাব ও মিশ্র সমাজের প্রভাবে গ্রামের পাঠকরুচির মানসিকতা হয়েছে এক অদ্ভুত। গত এক বছরে 'শরৎসাহিত্য সংগ্রহ'র স্থান জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। জানি

না হুজুগ এর মধ্যে কত। নমুনা সমীক্ষার ফল নৈরাশ্যজনক। অনেক কালজয়ী বই কলকে পায় নি। বছরে একবার মাত্র ইস্যু হবার তালিকায় 'হুতোম পেঁচার নক্সা', 'রক্তকরবী', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'আধুনিক বাংলা কবিতা', 'মরুতীর্থ হিংলাজ' প্রভৃতি। পাঠকসাধারণের (গ্রামাঞ্চলের) সাধারণ ঝোঁক উপন্যাসের দিকে তা যে-কোন লেখকেরই হোক। বই কিনতে যে সাজেশন পাঠকরা পেশ করেন তাতেও এই মনের দীনতা প্রকাশ পায়। গল্প-কবিতা মুছে যাবার মত অবস্থা, অনুবাদ-সাহিত্য বলতে জেমস বন্ড, হেডলী চেজ, আগাথা ক্রিস্টির দাবি বইঠাকুরানীর হাটে উঠত। এই লাইব্রেরীতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বড় একটা কেউ পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম এখানকার পাঠকদের কাছে প্রায় বাতিলের দলে। যে বইগুলির নামডাক বেশী, বেশির ভাগ পাঠক তার ধারেকাছেও যায় নি। যে 'সমগ্র শিশুসাহিত্য' (সুকুমার রায়) বইটি প্রকাশের দু ঘণ্টায় ১৮০০ কপি বিক্রি হয়েছে সেটির জনপ্রিয়তার কোনও চিহ্নই দেখা যায় নি এখানে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' বইটির ২য় খণ্ড প্রকাশের এক ঘণ্টায় ২০০০ কপি ক্রেতাদের কাছে চলে যায়। এখানে বছরে মাত্র একবার ইস্যু হয়েছে। সমস্ত দেখেশুনে বনফুলের সেই কথাটাই মনে হয়েছে যে, সাধারণ বাংলা সাহিত্যের পাঠক ফুচকা খেতেই অভ্যস্ত, ক্ষীর হজম করার শক্তি তারা হারিয়ে ফেলেছে। এর জন্য এই নিম্নমানের পাঠকরুচি তৈরিতে সাহায্য করেছে বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা।

ডাঃ স্বপনকুমার গোস্বামী
বাগনান।

দাম দিয়ে কেনার মত ছবি

জনৈক পত্রলেখক ভদ্রলোক শিল্পীদের আঁকা ছবি একশ' টাকায় পনা না বলে একদা 'শিল্পকলা প্রসঙ্গে'র লেখক সন্দীপ

সরকারের "ওপর চটে গিয়ে দেশে চিঠি লিখেছিলেন"। শ্রীসরকার সেই পত্রলেখককে জানিয়ে দিয়েছেন (১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ সংখ্যা) "সঞ্জয়ের প্রতিটি ছবির দাম একশ' টাকা—খুবই ভলো ছবি।" —অবশ্য তিনি জানাতে ভোলেন নি ঐ টাকায় "নীরদ মজুমদার বা প্রকাশ কর্মকার বা গণেশ পাইনের ছবি কেনার আশা বাতুলতা।" এবং অবশ্যই "পত্রলেখকের কথার যদি কোনো দাম থাকে" তবে তাঁর উচিত কর্তব্য হবে আকাদমী থেকে সঞ্জয়ের ঠিকানা যোগাড় করা এবং তাঁর ছবি কেনা, এছাড়া ছবি 'অর্থলগ্নীর সামগ্রী হিসেবে' দেখলে কী করতে হবে তিনি তারও উপযুক্ত নির্দেশ বাতলে দিয়েছেন। সুতরাং বলতে পারি তিনি ধন্যবাদার্হ হয়েছেন ঐ পত্রলেখক ভদ্রলোকের এবং আমাদের অর্থাৎ যাঁদের অর্থ সামর্থ্য অল্প অথচ বোকা লোকদের নাগালে রাখতে চান বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা শিল্পকর্ম। কিন্তু শ্রীসরকার যেসব শিল্পীদের আঁকা ছবি একশ' টাকায় কেনার বাসনা শুধুই 'বাতুলতা' মনে করেছেন তা তিনি কোন্ মাপকাঠিতে করলেন? বিরাট ক্যানভাস, তৈলচিত্র বা টেম্পারা বলে, তাঁদের প্রসারিত প্রতিভার মূল্য [illegible] জানি না সঠিক কোনটি। এঁদের [illegible]মের অংশ কোনো শিল্প আন্দোলনের গৌরবময় মুক্তি ঘটিয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। এঁদের ছবি আঁকার ক্ষমতা প্রদক্ষিণ করে চলেছে পিকাসো, মাতিস, ডালি প্রভৃতির উদ্ভাবিত পথে। সৃষ্টির সেই রূপান্তরটি এঁদের প্রতিভায় রঙীন হয়ে উঠলো না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি প্রাপ্তি উপেক্ষা করে গেলেন কৃত্রিমভাবে বাস করে যুগের দুঃখের গোধূলিতে, ধ্বংসস্তূপের পাশে বসে আছেন অনন্তকাল এমনি কল্পনায় সময় কাটিয়ে দিয়ে ক্যানভাসে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ধূসরতা, বিমূর্ত শিল্পরচনার নাম করে কৌশলে চাপা দিচ্ছেন অক্ষমতা। নারীর নগ্ন শরীর বিভিন্নভাবে দেখিয়ে বলছেন "নগ্নতাই জীবন"। ছবিতে যেসব প্রতীক থাকে সেগুলো নিতান্তই নকল যেমন আধুনিক কবিতা, গল্প, উপন্যাসে একটু ইতর বিশেষ হয়ে উঠে আসছে অনবরত। মনে আছে গত ২২ মে, দেশ ১৯৭৬ সংখ্যায় সন্দীপবাবু "কলকাতার সেরা শিল্পী" হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন প্রদীপ বসু, শ্যামল দত্তরায়, অশোক বিশ্বাস, শুভাপ্রসন্ন সমেত আরো অনেককে এবং জানিয়েছিলেন "সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এঁদের গৌরবে গৌরবান্বিত হই আমরা।" তাঁর বলা উচিত ছিল, একমাত্র তিনিই ঐ সব শিল্পীদের দ্বারা গৌরবান্বিত হতে পেরেছেন, নচেৎ মাঝে মাঝে আমাদেরও ওঁদের ছবি দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়।

প্রসঙ্গত বলি, তিনিই রোয়েরিকের ছবির আলোচনায় (দেশ, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬) বলেছিলেন, 'রোরিকের কাজ যেন বইয়ের পৃষ্ঠার ফাঁকে রাখা পাতা বা পাপড়ি। তার মধ্যে প্রাণ বা গন্ধ কোনোটাই নেই।" তাঁর সম্পর্কে এই অতি শীতল মন্তব্য সত্ত্বেও ভালো ছবি ভালোবাসেন এমন যে কেউ রোয়েরিক প্রতিভায় মুগ্ধ

হবেন। শুধু ক্যানভাস বড়ো হলেই ছবির দাম বেশী হয় না, তা তিনি যেই হোন না কেন। দাম দিয়ে কেনার মতম দামী ছবি আমাদের দেশে এখন আঁকা হয় না।

গায়ত্রী চক্রবর্তী

হুগলী

ডাকঘরের রচনাকাল

গত ৬ নবেম্বর সংখ্যায় আলোচনা বিভাগে প্রবীরকুমার দেবনাথ ডাকঘর নাটকের রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন, "১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে শান্তিনিকেতনে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম ডাকঘর খোলা হয়।" কথাটা ঠিক নয়। ডাকঘর খোলা হয় ১৯১০ সালে। সেবারই প্রথম ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু হয়। তার আগে ছিল এনট্রান্স। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় থেকে প্রথম ম্যাট্রিক দেন গৌরগোপাল ঘোষ ও নারায়ণ কাশীনাথ দেবল। শ্রী দেবল পরীক্ষা দেওয়ার পর সাময়িকভাবে ডাকঘরে কাজ করতেন।

এই ডাকঘরে ডাক আনা-নেওয়া নিয়েই নাকি ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ ডাকঘর লেখেন। প্রবীরবাবু বলছেন, 'অন্যতম প্রধান প্রেরণা হিসেবে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করতে পারি।' তিনি এত 'নিঃসন্দেহ' হলেন কোন প্রমাণের ভিত্তিতে? রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে কোথাও লিখেছেন বা বলেছেন কি? আমার তো জানা নেই। অনুমানকে সন্দেহাতীত প্রমাণ হিসাবে হাজির করার নজির বোধ হয় এই প্রথম।

আর একটি কথা বলার আছে। প্রবীরবাবু ঠিকানা দিয়েছেন—রবীন্দ্রসদন, শান্তিনিকেতন। তাতে সাধারণের কাছে বক্তব্যের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। প্রবীরবাবু কি রবীন্দ্রসদনের মুখপাত্র? আমি তো তা শুনিনি।

অজীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলকাতা-৪১

চলতে চলতে

এ সংখ্যায় দেশ-এ (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৬) বিমল মিত্রের ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী 'চলতে চলতে' নবম কিস্তি পড়তে শুরু করে প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে এসেই হোঁচট খেলাম। লেখক বার্নার্ড শ-র ইংরেজী উদ্ধৃতিটুকুর যে বাংলা ভাবানুবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে ভ্রূ কুঞ্চিত না হয়ে যায় না।

বার্নার্ড শ লিখেছেন: "Literary people should never associate with one another, not only because of their cliques and hatreds and envies but because of their minds inbreed and produce abortions."

এর বাংলা অর্থ : "সাহিত্যিকদের পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করা কখনো উচিত নয়। কারণ, দলবাজি, ঘৃণা এবং ঈর্ষা ছাড়াও এর ফলে মনের 'inbreeding' হয় এবং 'গর্ভপাত' ঘটে।"

'inbreeding'-এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ জানা নেই। Inbreed শব্দের অর্থ—নিজেদের জাতের মধ্যে প্রজননকার্য সীমাবদ্ধ রাখা। এখানে মনের প্রসার ব্যাহত হওয়া অর্থেই inbreed শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

লক্ষনীয় এই যে, 'inbreed' ও 'abortion' শব্দ দুটি সমগোত্রীয় এবং লেখকের বক্তব্য পরিস্ফুটনের জন্য অত্যন্ত কার্যকরীভাবে নিয়োজিত। কিন্তু বিমল মিত্র এর কি অনুবাদ করলেন?

জিতেন্দ্রিয় দাশগুপ্ত

কলিকাতা-৪৭

জলের নিচে

সুচেতা মিত্র

জলের নিচে ঘুমিয়ে আছি
এখন অতলান্ত
ক্লান্ত আমি ক্লান্ত।
যেখানে নীল নীরব অবরোধ
বিলীন হয় চূর্ণ সব ক্রোধ
প্রগাঢ় কোন অস্তিহীন আমি
কান্ড শুধু ক্লান্ত !

জলের নিচে ঘুমিয়ে আছি
গভীরে অতলান্ত।

শেষের সে দিন

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

ব্যাঙ হয়ে উঠছে ব্যাঙাচি,
ছোট মাছ গিলে ফেলছে বড় মাছ,
মানুষের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে
ছাগল, একাই পাগল
উঠে যাচ্ছে লিফটে,
খট খট করে
টাইপ-রাইটারে লিখে রাখছে
রিপোর্ট, আর পৃথিবী
ছোট হতে হতে, হয়ে উঠছে
চামড়ার বল,
সোঁ-সোঁ করে
এগিয়ে যাচ্ছে
ফাঁকা একটা গোলপোস্টের দিকে।

বিকেলবেলা

সুব্রত চক্রবর্তী

অনেক দিনের ভালবাসার কাছে আমি বিকেলবেলা
আপন মনে একটু বসি—হাত ধরি না, পা ধরি না—
মেঘচ্ছায়ায় নদীতীরে যেমন দাঁড়ায় স্বপ্নে-মানুষ,
তেমনি—কিংবা তেমনও নয়, একটুখানি অন্যরকম।

সেই কবেকার থমথমে মুখ জলের টানে যাচ্ছে ভেসে……
মুখের চলচ্ছবি আমায় একলা করে। স্পর্শকাতর
অঞ্জলিতে জল থাকে না ; ভেজা হাতে মুখ মুছেছি—

জলের নোনতা ডাকলে, আমি অনেক দিনের ভালবাসার
পাশে চুপটি ক'রে বসি—প্রত্যাশাহীন, মিনতিহীন……
সকলখোয়া বৃদ্ধ যেমন নিজের চিমসে হাতের দিকে
চেয়ে থাকে, তেমনি—কিংবা আরেকরকম—চমকে উঠে
গুলিবিদ্ধ পাখি যেমন কামড়ে ধরে শূন্যতাকে ॥

আলোকস্তম্ভ

পরেশ মণ্ডল

মহাদেবের ত্রিশূলে জেগে উঠল
দূরের আলোকস্তম্ভে স্ফুলিঙ্গ
জাহাজের পাটাতনে তুমি
তোমার হাতে বিদায়ের রুমাল
চারদিকে তখন সমুদ্রের কালো জল
আকাশে তারা
পৃথিবীতে আশ্চর্য মানুষের আত্মীয় [illegible]
ভালোবাসার একগুচ্ছ র[illegible]ধা
সাইরেনে অভয়
ছাদের কার্ণিশে চড়ুই
নিমজ্জিত কৌতূহল
তিথি দ্বাদশী
পান্থশালায় অকৃপণ ভিড় কৌতুক নাটকের
মহাদেবের ত্রিশূল
দূরের আলোকস্তম্ভ
জাহাজের পাটাতন

শব্দযান

রথীন্দ্র মজুমদার

রাত হলেই আমি শুনতে পাই
আকাশ চিরে তোমার প্লেনের আওয়াজ
এক দেশ থেকে আরেক দেশ
দূরে দূরান্তর দীর্ঘ পথ
তুমি ছুটে বেড়াও
মাটিতে কি তোমার পায়ের ছাপ পড়ে
বালির বুকে স্রোত আসে আর ফিরে যায়
সূর্যাস্ত সূর্যোদয়
আমার রক্তের ভিতর এই শরীর
দুই হাত, কে জেগে উঠতে চায়
ধুলোয় ধুলোময় শহরতলী
তুমি কি দেখতে পাও
রাস্তা জুড়ে লাইন পাতা হয়
ওড়ে ফ্ল্যাগ, জ্বলে লাল আলো একের পর এক
আমার অতন্দ্র যোগাযোগ
খুঁড়ে খুঁড়ে বিদ্যুতের তার
কাঁপে রাত
ঊর্ধে, বহুদূরে মহাশূন্যের ধ্বনি
আমি শুনতে পাই
পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি শব্দযান ছুটে যায় !

॥ ৩১ ॥

সুলেখার বিলীয়মান সুশাসিত তনু-দেহের দিকে তাকিয়ে আমি তখনও আকাশ-পাতাল ভাবছি।

যে-প্রশ্নটা জানবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছি, তা হলো কী জন্য সুলেখা আবার এই থ্যাকারে ম্যানসনে ফিরে এল? সুলেখার সঙ্গে জেঠমালানিদের ব্যবসায়িক সম্পর্কের পালা কি চুকতে বসেছে? সুলেখা না থাকলে, অন্য কোনো তপতী অথবা কমলার সঙ্গে জেঠমালানিরা ব্যবসার জাল পেতে বসবেন—জেঠমালানিদের ব্যবসায়িক জীবনের ধারাবাহিকতায় ছেদ টানবার মতো ক্ষমতা কোনো সুলেখা, তপতী অথবা কমলা আজও আয়ত্ত করতে পারেনি। তবু এই মুহূর্তে আমি সুলেখার নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের কথাই ভাবছি। হাত জোড় করে কাতরভাবে অদৃশ্যলোকের সেই খেয়ালী পুরুষটিকে বললাম, হে সর্বশক্তিমান, সুলেখাকে এবার মুক্তি দাও। চট্টরাজের নিঃসঙ্গ জীবন কামনার ক্লেদ মুছে দিয়ে তুমি ভালবাসার অভিষেক-উৎসবের আদেশ দাও।

তেলকালিবাবু ঠিক সেই অবস্থায় আমার ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। আমাকে করজোড়ে প্রার্থনারত দেখে তিনি বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। "এ কি করলেন স্যার!" তেলকালিবাবুর গলায় রীতিমত বিস্ময়। "আমি ভেবেছিলুম, আপনি একটু আলাদা হবেন। কিন্তু, হা কপাল! আপনিও বরদাবাবুর মতো এই কর্তাভজা পার্টিতে জয়েন করেছেন!"

তেলকালিবাবুর মুখের দিকে আমি তাকিয়ে রইলাম।

তেলকালিবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, "হাঁটুগেড়ে, হাতজোড় করে, মাথা ঠুকে, আবেদন-নিবেদন জানিয়ে মানুষ কেন সময় নষ্ট করে?"

আমি স্বীকার করছি আমার বয়সের তুলনায় আমি একটু সেকেলে। তার ওপর পড়াশোনা করেছি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে—সময়ে-অসময়ে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করাটাই সঙ্গত বলে জেনে এসেছি শৈশব থেকে।

তেলকালিবাবু বললেন, "ওসবের চূড়ান্ত করে দেখেছি, স্যার। আমার ছেলেটা যখন টাইফয়েডে পড়লো, তখন তিনদিন তিনরাত আমি ঈশ্বরের চরণে মাথা ঠুকেছি। কিন্তু পরে বুঝেছি, এসবের কোনো মানে হয় না। ঈশ্বর থাকলেও, তাঁর যে চোখ নেই, কান নেই, হাত নেই তা আমি লিখে দিতে পারি। ভদ্রলোক বদ্ধ বোবা কালা এবং অন্ধ না হলে সেদিন আমার ছেলেটাকে অমনভাবে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতেন না।"

তেলকালিবাবুকে এমনভাবে এক'দিনে আমি আবিষ্কার করতে পারি নি। আজকের এই স্বল্পালোকিত সন্ধ্যায় উনি হঠাৎ আমার অনেক কাছের মানুষ হয়ে দাঁড়ালেন।

তেলকালিবাবুর মুখের দিকে শান্তভাবে তাকালেও আমি কোনো প্রতিবাদ জানাই নি। সংসারের এই কণ্টকাকীর্ণ যাত্রাপথে ঈশ্বরকে আমি সময়ে-অসময়ে স্মরণ করে চলেছি, কিন্তু আজও তিনি আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি, আমার কোনো প্রার্থনা গ্রহণ করেন নি।

তেলকালিবাবু এবার যেন সংবিত ফিরে পেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যার। ঠিক চার বছর আগে এই দিনে ছেলেটাকে মাটি দিয়ে এসেছিলাম। মেজাজটা এইদিনে কিছুতেই ঠিক রাখতে পারি না।"

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেও চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিলাম। ভোরবেলায় এই সময় কত চিন্তার মেঘ রঙীন চলচ্চিত্রের মতো মনের আকাশে ভেসে যায়। আমার কিছুই করবার মতো শক্তি নেই, তবু দর্শকের আসনে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। সহদেব সেই সময় ঘরে দু বার হাল্কা টোকা দিয়ে ঢুকে পড়লো।

"আমাকে সেলাম করে সহদেব বললো, "আপনি এখন চায়ের ব্যবস্থা করবেন না। চৌত্রিশ নম্বরের দিদিমণি আপনার জন্যে কেটলিতে চা ঢেলে দিয়েছেন। আমাকে বললেন, তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে আনতে, না-হলে চা কড়া হয়ে যাবে।"

বেশ বিপদে পড়া গেল। না যাবার স্বাধীনতাটুকুও এখানে মনে হচ্ছে নেই। ভেবে-চিন্তে দেখবারও সময় নেই, যে এই সময়ে চৌত্রিশ নম্বর ঘরে আমার একাকী যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত কি না। চতুর চূড়ামণি সহদেব ছটফট করছে, আমাকে সে মনে করিয়ে দিল, আর এক মিনিট দেরি করলেই চা কড়া হয়ে যাবে, এবং চৌত্রিশ নম্বরের এই দিদিমণি কড়া চা মুখে তুলতে পারেন না।

গেঞ্জির ওপর শার্টখানা চড়িয়ে এবং পায়ে চটি নামিয়ে অগত্যা সহদেবের পিছন-পিছন চৌত্রিশ নম্বরে ছুটতে হলো। "দাদাবাবুকে হাতে-হাতে নিয়ে এসেছি।" এই বলে সহদেব চৌত্রিশ নম্বরের দিদি-মণির কাছে স্পেশাল ক্রেডিট নিল এবং একটা হাল্কা সেলাম জানিয়ে গরম সিঙাড়া আনবার জন্যে অদৃশ্য হলো।

সুলেখাকে এখন অনেক শান্ত ও শ্রীময়ী দেখাচ্ছে। রাতের বিশ্রাম তার শরীর ও মনকে যে স্নিগ্ধ করে তুলেছে তা বোঝা যাচ্ছে। সুলেখা এখন একটা হাল্কা রঙের মিলের ছাপানো শাড়ি পরেছে। এই সকালেই যে স্নান সারা হয়েছে, তার প্রমাণ দেহের সর্বত্র জড়িয়ে রয়েছে।

যখন চৌত্রিশ নম্বরে এসেই পড়েছি, তখন পরিস্থিতি একটু হাল্কা করে ফেলা যাক। হেসে বললাম, "কই? চা ঢালুন। আপনি তো আবার কড়া চা পছন্দ করেন না।"

সুলেখা এতোক্ষণ চায়ের পাতা ভেজায়নি—আমার সামনে সে টী-পটে চায়ের পাতা ফেললো। তারপর বললো, "সহদেবকে বলেছিলুম বটে, আমি চায়ের পাতা ফেলেছি, তুই দাদাবাবুকে ডেকে আন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢালিনি—কেমন যেন ভয় হলো, আমি ডাকলেও আপনি চৌত্রিশ নম্বরে না আসতে পারেন।"

সুলেখার কথার মধ্যে এমন এক দুঃখের সুর ছড়িয়ে ছিল যে আমার মনটা অকারণে বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। সুলেখার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনার যখন প্রয়োজন হবে তখন ডেকে পাঠাবেন। আমি ঠিক আসবো।"

সুলেখা কৃতজ্ঞ চোখে আমার দিকে একবার তাকালো। তারপর চায়ের কাপডিশ সাজাতে সাজাতে বললো, "কালকে কোথায় গিয়েছিলেন?"

"বললাম, কবরখানায়।"

"ওমা, সন্ধ্যেবেলায় কেউ কবরখানায় যায়?" ভূত-পেত্নী না থাক, পোকামাকড়, বিছে, সাপ এসব তো আছে।"

আমি বললাম, "ছেলের কবরটা দেখতে তেলকালিবাবু একা-একা যাচ্ছিলেন। তাই ওঁকে সঙ্গ দিলাম। ভদ্রলোক বছরে ওই এক দিনই সিমেট্রিতে যান।"

"ফিরলেন কখন?" সুলেখা জিজ্ঞেস করলো।

ব্যাপারটা ওকে বললাম। তেলকালি-বাবুর খুব ইচ্ছে ছিল, কবরের জমিটা কিনে নিয়ে ওখানে একটা স্মৃতিফলক তৈরি করে দেন। কিন্তু এখনও টাকা পয়সার ব্যবস্থা করতে পারেন নি। কর্তাদের হাতে পায়ে ধরে জায়গাটা এখনও রিজার্ভ রেখেছেন। কিন্তু সেটা নিয়ম নয়। টাকা দিয়ে জমি না কিনলে ওখানেই মাটি খুঁড়ে অন্য কবর হবে। এবারে তেলকালিবাবুকে সোজাসুজি সে কথা বলে দিল। কর্তাদের সামলে আরও কিছু টাইম নিতে দেরি [illegible] গেল। তার পরেও তেলকালিবাবু [illegible]-ক্ষণ ছেলের কবরের কাছে চুপচাপ বসে রইলেন। বললেন, "একটু বসে নিই, স্যার। সামনের বার হয়তো ছেলের কবরটুকুও থাকবে না।"

ভোরবেলায় এইসব দুঃখের কথা বাড়িয়ে কী লাভ? আমি বললাম, "দুঃখের কথা আর ভাল লাগছে না, মিস সেন। ঠিকানা হারিয়ে-যাওয়া যত দুঃখ রিডাইরেকটেড হয়ে যেন আমার জীবনেই হাজির হয়।'

সুলেখা হাসলো, বোধ হয় নিজের দুঃখকে চাপা দেবার জন্যেই। বললো, "এই মুহূর্তে আপনার জন্যে কেবল মিষ্টি মিষ্টি আর মিষ্টি। ধানবাদ থেকে পয়লা নম্বর পেঁড়া এনেছি। এবং চায়ে ক চামচ চিনি দেবো বলুন।"

চিনির পরিমাণ শুনে সন্তুষ্ট হলো না

সুলেখা। বললো, "আপনি এখনও বেশ রোগা আছেন। মোটা হবার সহজতম উপায় হলো প্রতিকাপ চায়ে অন্তত দু' চামচ চিনি খাওয়া।"

তখন সত্যিই বেশ রোগা ছিলাম। ঝাঁটা-কাঠির মাথায় আলু দম চেহারা উন্নয়নের আশায় সুলেখার পরামর্শ গ্রহণের লোভ হলো। যতক্ষণ আমি এ-বাড়ির ম্যানেজার আছি ততক্ষণ স্থানীয় চা-ওয়ালা বাড়তি চিনি ঢালতে দ্বিধা করবে না।

সযত্নে চায়ের কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে সুলেখা বললো, "গত রাত্রেই আপনার খোঁজ করেছিলাম। যাঁর সঙ্গে আমার আর্জেন্ট কাজ তিনি তো শেষ পর্যন্ত এলেন না।"

কার জন্যে সুলেখার এই ব্যস্ততা তা আমি তখনও আন্দাজ করতে পারি নি। আমার মনে তখনও চট্টরাজের মুখটাই গেঁথে বসে আছে। আমি তখনও ভাবছি, চট্টরাজ নিজেও হয়তো কলকাতায় হাজির হয়েছেন, সুলেখা নাটকের শেষ পর্বে।

সুলেখা নিজেও আমার ভুল ভাঙাবার তেমন চেষ্টা করলো না। সে প্রথমে প্রসঙ্গান্তরে সরে গেল। সুলেখার তৈরি চা ভাল লেগেছে শুনে মৃদু হেসে বললো, "একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিন না—ছোট্ট চায়ের দোকান করে বসি।"

মেয়ে পরিচালিত চায়ের দোকান কখনও আমার নজরে পড়ে নি, যদিও দু-একটি দোকান লক্ষ্য করেছি যেখানে মেয়েরা ওয়েট্রেসের কাজ করে। সেসব দোকানের যে সব সময় সুনাম নেই সসঙ্কোচে এই কথাটা সুলেখাকে বলতে হলো।

"আমাদের দেশের মেয়েদের পোড়া কপাল," দুঃখ করলো সুলেখা। "দোকানে চা বিক্রি করতে গেলেও তাদের বদনাম হয়।"

কথাটা আমার মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধে রইলো। আমাদের এই শহরের কর্ম-জীবনে পুরুষ ও নারী দু জনেরই দুঃখ কষ্ট অনেক, বদনামের ভাগটা মেয়েদের বাড়তি।

পরিস্থিতি হাল্কা করবার জন্যে সুলেখা বললো, "চায়ের দোকান খুললে খুব তাড়াতাড়ি নাম করে ফেলবো। কারণ আমি আট বছর বয়স থেকে চা তৈরি করছি। আমার বাবা খুব ভোরবেলায় উঠতেন এবং তাঁকে চা তৈরি করে দেবার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি চা না করলে বাবার ভালই লাগতো না।"

বাবা এখন কোথায়? জিজ্ঞেস করতেই সুলেখা গম্ভীর হয়ে গেল। তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। আমি বেশ বিপদে পড়ে গেলাম—হয়তো সুলেখার বাবা আর ইহজগতে নেই। অজ্ঞাতে হৃদয়ের কোমল জায়গায় আমি হাত দিয়ে ফেলেছি।

সুলেখা প্রথমে আমাকে কী যেন বলতে গেল। তারপর থেমে গিয়ে বললো, "বাবা! বাবার জন্যেই তো বসে আছি। বাবার কথা একদিন বলবো আপনাকে।"

বাবার প্রসঙ্গটা সুলেখাকে বেশ কাতর করে তুলেছে। এখনই সে আমাকে সব কথা বলবে কিনা ভাবছে। কিন্তু আমি ওকে শান্ত করলাম। "সমস্ত কথা একদিনে শুনলে সবই তো ফুরিয়ে গেল।"

আমি অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বললাম, "ধানবাদ কীরকম লাগলো শেষ পর্যন্ত?"

সুলেখা বললো, "কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রথম যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। মিস্টার চট্টরাজের স্পেশাল চেষ্টায় কদিনের মধ্যে টেলিফোনও পেয়ে গেলাম। টেলিফোনটা না-থাকলে খুবই অসুবিধা। উনি আসবেন কি না-আসবেন কিছুই জানি না, শুধু হাঁ-করে বাড়ির মধ্যে বসে থাকা। দু একবার চুপচাপ বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে ও'র কাছে স্লিপ

পাঠিয়েছি। স্লিপ পেয়ে উনি কিছুক্ষণের জন্যে হাজির হয়েছেন—কিন্তু সারাক্ষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন, এই বুঝি ব্যাপারটা জানাজানি হয়। আমাকে বললেন, স্লিপ পাঠানো নিরাপদ নয়। মিস্টার চট্টরাজ হয়তো অফিসে থাকবেন না, আমার পাঠানো চিরকুট হয়তো অফিসের অন্য কারুর হাতে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল গবেষণা শুরু হয়ে যাবে।"

টেলিফোনটা আসায় মিস্টার চট্টরাজকেও আর লেখালিখির হাঙ্গামায় যেতে হয় না। মিস্টার জেঠমালানিও কলকাতা থেকে ফোন করে খবরাখবর নিয়েছেন। হেসে জিজ্ঞেস করেছেন থ্যাকারে কোম্পানির বিজনেস কীরকম চলছে?

মিস্টার জেঠমালানিই বলেছিলেন, বাড়িতে বসে বসে শুধু বিজ[illegible] হয় না। একদিন চট্টরাজের আপিসটা[illegible]জের ছুতো করে দেখে এসো।

কপালে সিঁদুরের রেখা স্পষ্ট করে সুলেখা সেন সত্যিই একদিন মিস্টার চট্টরাজের আপিস ঘুরে এসেছিল। সুলেখার বুকের ভিতরটা সেদিন অপরিচিত উত্তেজনায় বিব্রত হয়ে উঠেছিল। শুভ্র সেনের ওয়াইফ ও থ্যাকারে অ্যাণ্ড কোম্পানির ধানবাদ রিপ্রেজেনটেটিভ মিসেস সেনের দিকে সেদিন অনেকেই আড়চোখে তাকিয়েছিল। সুলেখা সেদিন একটু পরেই দ্বিগুণ উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। সুলেখার কেমন ভয় করছিল, হয়তো সে ধরা পড়ে যাবে।

সেই রাত্রে নির্মল চট্টরাজ কিছুক্ষণের জন্যে এসেছিলেন। সুলেখা সেনকে নিয়ে সেদিন অফিসার মহলে কিছু চাঞ্চল্য, কিছু রসাল আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চট্টরাজের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কারুর মাথায় আসেনি।

সুলেখার মনে পড়লো কিছুদিন আগে বাবার ব্যাপারেই সে পাটনতে হেড আপিসে গিয়েছিল। ডেপুটি পি-এম-জি বাগচী সায়েবের কাছে স্লিপ দিয়ে সাক্ষাতের আশায় সুলেখা চুপচাপ বসেছিল। বাগচী সায়েব দেখা করবেন কিনা তাও ঠিক নেই। বেয়ারাটা সুলেখাকে চিনতো, পোস্টমাস্টার সেনবাবুর মেয়েকে ছোট-বেলায় সে দেখেছে। কিন্তু সেও সায়েবের কাছে স্লিপ দিয়ে এসে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। মস্ত কি এক মিটিং চলেছে, সেখানে ঢুকবার হুকুম তার নাকি নেই। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে, সুলেখা ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুর কাছে গিয়েছিল। এই বড়বাবু একদিন বাবার সহকর্মী ছিলেন। তিনিও সুলেখার কথা শুনলেন, কিন্তু ডেপুটি পি-এম-জির ঘরে ঢুকতে সাহস করলেন না। বরং বললেন,

"আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট করে এলে পারতে মা।"

সুলেখা যখন সবে বুঝতে আরম্ভ করেছে যে বাগচী সায়েব স্পেশাল মিটিং-এ ভীষণ ব্যস্ত এবং তাঁর ঘরে কারুর ঢোকবার হুকুম নেই, ঠিক সেই সময় ডিপার্টমেণ্টে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল। মাথায় চওড়া সিঁদুর দেওয়া ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক মহিলাকে দেখে বড়বাবু চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বেয়ারাটা তড়াং করে সেলাম দিল। মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "সায়েব আছেন?" বিনয়ে বিগলিত বেয়ারা সঙ্গে সঙ্গে বললো, "ঘরেই আছেন, আপনি চলে যান।"

কোনো স্লিপের হাঙ্গামা নেই, সায়েব ব্যস্ত আছেন কিনা তা জানবার প্রশ্ন নেই ভদ্রমহিলা সোজা সায়েবের ঘরে ঢুকে পড়লেন। সায়েবের ঘরে মিটিঙের আগুনে জল পড়তে দু সেকেণ্ড লাগলো—খাতাপত্তর হাতে দুজন জুনিয়র অফিসার বিনয়ে বিগলিত অবস্থায় বাগচী সায়েবের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসতে পেরেই তারা যেন ধন্য হয়েছে।

আরও একজন মেয়ে যে স্লিপ পাঠিয়ে দু ঘণ্টা চুপচাপ বসে আছে সে কথা কেউ খেয়াল করলো না। বেয়ারা তাড়াতাড়ি কেটলি হাতে স্পেশাল চা আনতে ছুটলো। যাবার আগে ফিসফিস করে বললো, "মেম-সায়েব—মিসেস বাগচী!"

সুলেখা সেদিনই বুঝেছিল, আপিসে আদালতে সায়েবের বউদের অন্য প্রতিপত্তি। আপিসের কোনো আইনকানুনই তাদের জন্যে খাটে না। সায়েবের বউ হওয়ার ওইটাই মস্ত সুবিধা।

অনেকদিন পরে, চট্টরাজের অফিস থেকে ফিরে এসে সুলেখা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিল। ধানবাদের এই নতুন আপিসে ঢোকবার সময় সবরকম অস্বাস্থ্যকর কৌতূহলের অবসান ঘটেছে। আপিসের দ্বারপাল এবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে না তাকিয়ে একটা বিনম্র সেলাম ঠুকে দিল। বেয়ারা এবার স্লিপের কথাই তুললো না। আপিসের বড়বাবু এবং বেয়ারা দুজনেই লাল আলোর নিষেধ অমান্য করে চট্টরাজ সায়েবের ঘরে ঢুকে গিয়ে ঘোষণা করলো, মেমসায়েব। চট্টরাজও এক গাল হেসে বলছেন "তুমি এসেছো, কী ব্যাপার?" তারপর ঘরের মধ্যে উপস্থিত অন্য অফিসারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "মিট মাই ওয়াইফ।" তরুণ অফিসাররা করজোড়ে সীনিয়র অফিসারের গৃহিণীকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

এই স্বপ্নের কথাটা আমাকে বলে ফেলে সুলেখা একটু লজ্জা পেয়ে গেল। হঠাৎ আমার চোখ থেকে ও দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

সুলেখার স্বপ্ন আমার কাছে মোটেই অবাস্তব মনে হচ্ছে না। সুলেখা কিছু ঘর ভাঙছে না। চট্টরাজের প্রথমা স্ত্রী এক যুগের বেশী দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে বন্দী। চট্টরাজকে যদি সুলেখার ভাল লেগে থাকে তা হলে জীবিকা অর্জনের এই দুর্গম পথ পরিত্যাগ করে বিবাহের নিরাপত্তা গ্রহণ কর়াটাই তো বুদ্ধিমতীর কাজ।

আমি আর বিলম্ব না করে বলে ফেললাম, "কবে সেই শুভদিন আসছে? যেদিন সুলেখা সেন সীমা চট্টরাজে চেঞ্জড হবেন?"

সুলেখা যেমনি আমার দিকে সলজ্জ-ভাবে তাকিয়েছে, আমি অমনি আরও একটু এগিয়ে গিয়েছি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ঘটনার দুর্ঘটনাটি দেখে মনে হচ্ছে সেই শুভদিন আর সুদূরে নয়।"

সুলেখার মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল। ওর মুখের অবস্থা দেখে প্রথম মনে হলো, সুলেখা আমার ওপর খুবই বিরক্ত হয়েছে। সামান্যপরিচিতা সুন্দরীর সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে এই ভোরবেলায় তারই ঘরে বসে আমি তাকে অযথা অপমান করেছি। তারপর হঠাৎ মনে হলো, সুলেখা তার এই নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে অপরের কৌতূহলী অনুসন্ধান অপছন্দ করছে। মিস্টার চট্টরাজের সঙ্গে সে কী করবে সে নিজেই ঠিক করবে।

সুলেখার মুখের ভাব এবার কঠিন হয়ে উঠছে। মনে মনে আমি আফসোস করছি। নতুন চাকরিতে এসে এই সব সন্দেহজনক সুন্দরীর সান্নিধ্যে এমনভাবে কথাবার্তা বলা যুক্তিযুক্ত হয়নি।

সুলেখার কাছে ক্ষমা চাইবো কিনা ভাবছি। কিন্তু আমি মুখ খুলবার আগেই সুলেখা বললো, "সব জেনে-শুনেও আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?"

ওর কথা শুনে আমার ভয় হলো, হয়তো আঘাতটা মিস্টার চট্টরাজের দিক থেকেই এসেছে। হয়তো শেষ মুহূর্তে তিনি সুলেখাকে নিজের কক্ষপথ থেকে নির্মম-ভাবে সরিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু যাই হোক আমি আর এই সব গণ্ডগোলে বিষয়ে নাক গলাবো না, এই সব মেয়েদের জীবন নাটকে কোনো ছোটখাট অংশও গ্রহণ করবো না। আমি গম্ভীর হয়ে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, "মিস সেন, আমার গণ্ডী ছাড়িয়ে কোনো প্রশ্ন করে আপনাকে যদি কষ্ট দিয়ে থাকি, তা হলে ক্ষমা করবেন।"

এর উত্তরে সুলেখার চোখ দিয়ে জল গড়াতে শুরু করবে তা আমার প্রত্যাশিত ছিল না। সুলেখা কোনো কথা বলছে না—ছবির মতো স্তব্ধ হয়ে সে আমার দিকে অভিমানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সুলেখা এবার কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললো, "এ লাইনে আমি চিরদিন থাকবো না, শংকর-বাবু। কলকাতা শহরে যদি একটা মাথা গোঁজার জায়গা থাকতো তা হলে আজই আমি পালিয়ে যেতাম।"

এই মাথা গোঁজবার প্রসঙ্গটা আমাকে বড় বিব্রত করে। প্রাসাদপুরীর এই শহরে যার মাথা গুঁজবার স্থান নেই তার থেকে অভাগা কে?

সুলেখার চোখ দুটো একটু লাল হয়ে উঠছে। নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে বললো, "কেন যে আমি ধানবাদে যেতে রাজী হলাম। শুধু শুধু একটা লোকের জীবনে বিপদ ডেকে নিয়ে এলাম আমি।"

আমি এখন নীরব শ্রোতা। শুনলাম, সুলেখা কেমনভাবে নির্মল চট্টরাজের কাছে নিজেকে নিবেদন করেছিল। চট্টরাজও

কেমনভাবে ক্রমশ সুলেখার সেবা ও স্নেহে মুগ্ধ হয়ে অন্য মানুষে, রূপান্তরিত হচ্ছিলেন। সুলেখার সুখী গৃহকোণের স্বপ্ন এবার যেন সত্য হতে চলেছে। কিন্তু অন্য এক জায়গায় দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে উঠছে।

জগদীশ জেঠমালানির কেসটার কোনো গতি হয়নি। ওই ব্যাপারে চট্টরাজ পাহাড়ের মতো অটল হয়ে আছেন। জেঠমালানি নিজেও অবাক। সুলেখাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "আদর যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না তো? মিস্টার চট্টরাজ রেগুলার যাতায়াত করছেন তো?" সুলেখার উত্তর পেয়ে জেঠমালানি মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এরকম ডিফিকাল্ট পার্টি তিনি বেশী দেখেননি। সুলেখার সঙ্গে সম্পর্কটা পুরোপুরি রেখে যাচ্ছেন, অথচ জেঠমালানির বিরুদ্ধে সেই বাজে মেশিন সাপ্লাই দেবার কেসটা সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মিস্টার চট্টরাজ। জেঠমালানি প্রথমে নিশ্চিন্ত হয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। ভেবেছিলেন, চট্টরাজ যখন একবার সন্তুষ্ট হয়েছেন তখন নিশ্চয় যথাসময়ে কেসটা সামলে নেবেন। হয়তো ফাইলপত্তর পরিষ্কার রাখবার জন্যেই কেসটা আরও একটু পাকিয়ে নিচ্ছেন।

কিন্তু আর অপেক্ষা করা যায় না। কেসটা এবার বিপজ্জনক অবস্থায় এসে হাজির হয়েছে এবং জগদীশ জেঠমালানি অন্য সোর্স থেকে খবর নিয়ে জেনেছেন যে এই ব্যাপারে সমস্ত কলকাঠি নাড়ছেন নির্মল চট্টরাজ নিজেই।

চিন্তিত জগদীশ জেঠমালানি সুলেখার ধানবাদের বাড়িতে এসেছিলেন। দুঃখ করে সুলেখাকে বলেছেন, "অনেস্টির যুগ আর নেই। ইংরেজ আমলে honesty in dis-honesty ছিল। যে লোক ঘুষ নিতো, ফেভার নিত, সে কাজটাও করে দিত।" কিন্তু এখন এই চট্টরাজকে বোঝা দায়।

জগদীশবাবু গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, "আমি অনেক ধৈর্য ধরেছি, সুলেখা। আর চুপচাপ থাকলে এই কেসটায় আমার সর্বনাশ হবে।" কয়েক লাখ টাকার ব্যাপার—এবং অত সহজে টাকা হারাবার পাত্র জগদীশ জেঠমালানি নন।

জগদীশবাবু এর পর অন্য কিছুর সন্ধানে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আমরা বিজনেসম্যান—আমরা নরমে নরম, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডা। কিন্তু বিজনেসের আরও অনেক পথ আছে।"

সুলেখা এই সব ব্যাপারে মাথা ঘামায় নি। ওর শুধু মনে হয়েছে, 'কেন তোমরা সরকারী কারখানাতে বাজে যন্ত্রপাতি দাও? তখন ভাল জিনিস দিলে তো এসব হাঙ্গামায় পড়তে হয় না।' কিন্তু এসব প্রশ্ন জগদীশবাবুর সামনে তোলবার মতো সাহস তার হয়নি।

নাটকের নতুন অঙ্কে জগদীশ জেঠমালানি গোপনে গোপনে কয়েক দিন ছোটাছুটি করেছেন। নেপথ্যে কোথায় কি কলকাঠি টিপছেন তাও সুলেখা জানে না। তবে জগদীশবাবু সেদিন রাত্রে টেলিফোনে সুলেখাকে বলেছিলেন, কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকতে। তারপর জগদীশবাবু হঠাৎ বলেছিলেন, "সুলেখা, হঠাৎ যদি স্পেশাল কিছু ঘটে যায়। ফিকর মত কীজিয়ে।"

সুলেখা তখনও কিছু আন্দাজ করতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে বোমা ফাটলো। আগের দিন সন্ধ্যে বেলাতেও চট্টরাজ এসেছিলেন সুলেখার কাছে। বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন, "সুলেখা, মনের মধ্যে কিছু কথা জমে উঠছে। একদিন তোমার সঙ্গে সেসব আলোচনা করে নেবো ভাবছি।" এই লুকোচুরি খেলা যে মিস্টার চট্টরাজকে সুলেখার মতই অস্থির করে তুলছে তা আন্দাজ করে সুলেখার সর্বশরীর শিহরিত হয়েছিল। সুলেখা উত্তর দিয়েছিল, "আমি সব সময় আছি, আপনি যখন খুশী চলে আসবেন।" পরের দিন বিকেলে আবার আসবেন জানিয়ে চট্টরাজ বলেছিলেন, "আশা করি তুমি আমার অবাধ্য হবে না, সুলেখা।"

সুলেখা লজ্জা পেয়েছিল, সেই মুহূর্তে কোনো উত্তর দিতে পারেনি। চট্টরাজের সঙ্গে সুলেখার সেই শেষ দেখা। পরের দিন নির্ধারিত সময়ে চট্টরাজ আসেন নি। ততক্ষণে বোমা ফেটেছে। সুলেখা খবর পেয়েছে, নির্মল চট্টরাজের সমূহ বিপদ। সরকারী হুকুমে আচমকা তাঁর বাড়ি ও অপিস সার্চ হয়েছে। নির্মল চট্টরাজ যে হঠাৎ চাকরি থেকে সাসপেনডেড হয়েছেন সে-কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুলেখা এ সময় কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। টেলিফোনে চট্টরাজের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাড়িতে কেউ ফোন ধরালো না।

এরপর রাত্রে সুলেখার টেলিফোন বেজে উঠেছিল। চট্টরাজ নন, পাটনা থেকে জগদীশ জেঠমালানি ফোন করছেন। চট্টরাজের সমস্ত খবরাখবর যে জগদীশবাবুর জানা তা সুলেখার বুঝতে অসুবিধা হলো না। জেঠমালানি শান্তভাবে নির্দেশ দিলেন, একটুও সময় নষ্ট না করে সুলেখা যেন ভোরবেলাতেই ধানবাদ ছেড়ে চলে আসে। ধানবাদে থাকলে সুলেখার বাড়ি সার্চ হওয়াও আশ্চর্য নয়। উনি রাজুকে বলে দিচ্ছেন চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের চাবি পাঠিয়ে দিতে। কলকাতায় সুলেখার 'আর্জেন্ট কাজ' আছে।

চট্টরাজের কী হবে জানতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল সুলেখা। টেলিফোন নামিয়ে রাখবার আগে জগদীশবাবু হেসে বলেছিলেন, ও'র যা হবার তাই হবে! "ফিকর মত কীজিয়ে!"

(ক্রমশ)
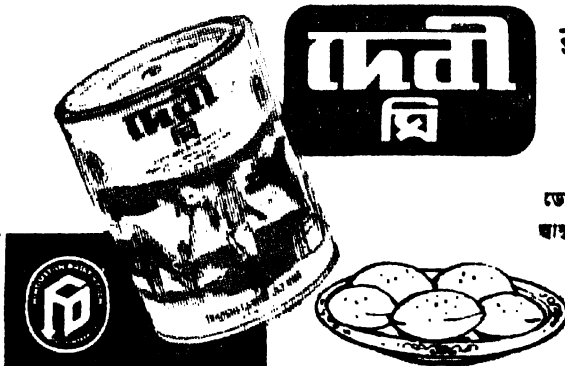
কলিঙ্গ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীর সঙ্গে

কয়েকদিন আগে মেকসিকোর বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ লুইস এসত্রাদা সস্ত্রীক কলকাতায় এসেছিলেন এখানকার বিজ্ঞানী এবং গবেষণাগারগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ওড়িশার কলিঙ্গ ফাউণ্ডেশন ট্রাস্ট এ বছর ডঃ এসত্রাদাকে আন্তর্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। উল্লেখ্য, এর আগে যাঁরা এই পুরস্কারটি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম স্যার জুলিয়ান হাক্সলে, বার্ট্রান্ড রাসেল, জগজিৎ সিং, কনরাড লোরেনজ এবং মার্গারেট মীড। প্রতি বছর কাকে এই পুরস্কার দেয়া হবে সেটা ঠিক করেন ইউনেসকোর নির্বাচকমণ্ডলী।

ডঃ এসত্রাদার শিক্ষা মেকসিকো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৭০ সালে তিনি মেকসিকোর ন্যাশনাল অটোনমাস ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতি বিষয়ক প্রচার বিভাগের বিজ্ঞান শাখার প্রধানের পদে বৃত হন। ওই সময় থেকেই বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য একটি ব্যাপক কার্যক্রম নিয়ে মেকসিকোর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কাজ শুরু করেন তিনি। মেকসিকো থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা 'নেচোবালেজা' এই উদ্দেশ্য নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে ১৯৬৮ থেকে। বস্তুত তাঁরই চেষ্টায় এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল।

ডঃ এসত্রাদার সঙ্গে পরিচয় হল বসু বিজ্ঞান মন্দিরের এক ঘরোয়া বৈঠকে। বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন ইনডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর এক্সট্রা-কারিকিউলার সায়ান্টিফিক অ্যাকটিভিটিজের পক্ষ থেকে অধ্যাপক আনন্দমোহন ঘোষ। ভারত এবং মেকসিকোর জনপ্রিয় বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম।

মেকসিকোর কথা উঠতেই ডঃ এসত্রাদা বললেন, যাকে বলা হচ্ছে ডেভলপিং কানট্রি, মেকসিকো হলো তাই। আমাদের অনেক সমস্যা। মেকসিকোর মানুষ নাচ গান আর ছবি আঁকা নিয়েই অবসর সময় কাটায় বেশি। বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের ধারণা খুবই কম। আগ্রহও নেই তেমন।

নিজের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বললেন, আমার কথাই ভাবুন না। যখন আমি পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম, আমার বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই তখন মন্তব্য করেছিলেন, পদার্থবিদ্যা আবার কি ধরনের বিষয়। পড়ছ তো, পড়ে জীবনে কি কোন লাভ হবে?

তারপর মন্তব্য করলেন, এটা অবশ্য কয়েক বছর আগের কথা। তবে বলতে পারি, অবস্থাটা খুব একটা পাল্টায় নি এখনও।

প্রশ্ন : জন-সংযোগের জন্যে তো এখন নানারকম মাধ্যম তৈরি হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, আরও কত সব। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে এই মাধ্যমগুলিকে আপনারা কতটা কাজে লাগাতে পেরেছেন?

এসত্রাদা : বলতে গেলে এখনও পর্যন্ত তেমন কিছুই হয় নি। টেলিভিশন

বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর লোকান্তর

বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী এবং পারমাণবিক ত্বরকযন্ত্র (নিউক্লিয়ার অ্যাকসেলারেটর) বিশেষজ্ঞ ডঃ দত্তাত্রয় যশোবন্ত ফাড়কে গত ২১ ডিসেম্বর বোম্বাই-এ পরলোকগমন করেছেন। তাঁর বয়েস হয়েছিল ৬৭ বছর। আর কয়েকদিন পর কলকাতার লবণ হ্রদে ভাবা পরমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে যে অতিকায় ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন যন্ত্রটি চালু হতে চলেছে, সেই প্রকল্পের প্রথম পরিচালক ছিলেন ডঃ ফাড়কে। দুর্ভাগ্য, গত কয়েক বছর ধরে যে যন্ত্রটির জন্যে তিনি স্বপ্ন দেখে আসছিলেন তার বাস্তব রূপায়ণ শেষ পর্যন্ত তাঁর আর দেখা হয়ে উঠল না।

জন্ম ৬ মার্চ, ১৯০৯। দেশে পদার্থ-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর তিনি ১৯৩৪ সালে বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বর্ণালী বিজ্ঞানে গবেষণার কৃতিত্ব স্বরূপ ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর দেশে এসে বোম্বাই-এর সেন্ট জেভিয়ারস টেকনিকাল স্কুলে যোগ দেন। এখানে কাজ করার সময় ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক পঠন পাঠনে তিনি একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। পরে ১৯৪৯ সালে স্বর্গত হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার আমন্ত্রণে তিনি টাটা ইনস্টিটিউট অব ফানডামেন্টাল রিসার্চের সঙ্গে জড়িত হন। পরবর্তীকালে তাঁরই চেষ্টায় ওই প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছিল বর্তমানের আধুনিক যন্ত্রগণক বিভাগটি। ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, কারিগরি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এবং প্লাজমা-পদার্থবিদ্যা শাখার অন্যতম প্রধান রূপকারও ছিলেন ডঃ ফাড়কে।

পদার্থবিজ্ঞানে ডঃ ফাড়কের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে তাঁর মত সূক্ষ্ম বিচারক্ষমতা যথেষ্ট অনুকরণীয় বললে হয়ত বেশি বলা হবে না। এ দেশে যন্ত্রগণক, পারমাণবিক ত্বরকযন্ত্র, মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর বায়ুশূন্যতা সৃষ্টির কৌশল, সেমিকনডাকটর প্রযুক্তি, পারমাণবিক কণা সংগ্রাহক যন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অন্যতম বিশিষ্ট অগ্রজ বিজ্ঞানী হিসেবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। কলকাতার লবণ হ্রদে প্রতিষ্ঠিত ভেরিএবল এনার্জি সাইক্লোট্রনের খুঁটিনাটি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উদ্ভাবনা এবং প্রশাসনে অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপে ১৯৭২ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।
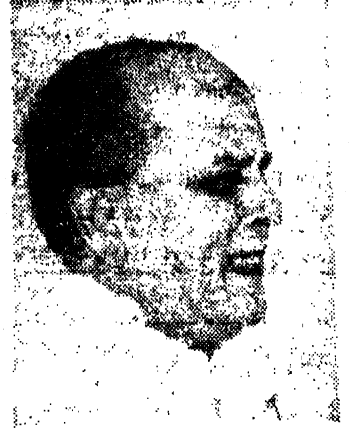
২১ ডিসেম্বর লবণ হ্রদে সাইক্লোট্রন প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত এক শোকসভায় শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সাহা ইনস্টিটিউট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিকসের পরিচালক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু বলেন, ডঃ ফাড়কের মত পারমাণবিক ত্বরক যন্ত্রবিদ খুবই বিরল। যন্ত্রের প্রতিটি স্পন্দন যেন তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। দেশকে ত্বরকযন্ত্র তৈরির ব্যাপারে আত্মনির্ভর করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি নিরলস চেষ্টা করে গেছেন।

আমাদের প্রায় সবার ঘরেই আছে। কেউ কেউ চার পাঁচটা টেলিভিশন সেটও কিনে ফেলেন নিজেদের স্ট্যাটাস দেখাতে। চার পাঁচটি চ্যানেলে প্রোগ্রাম চালান হয়। যাঁরা চালান তাঁরা সবই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। তাঁদের ওপর আমাদের কোন হাত নেই। নিজেদের প্রোগ্রামগুলি চটকদার করার জন্যে বেশির ভাগ প্রোগ্রামই তাঁরা করেন নাচ গান, মুভি, এই সবের ওপর। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার মত কোন পরিকল্পনা তাঁদের নেই। রেডিওর ক্ষেত্রেও একথা খাটে। খবরের কাগজ এবং সাময়িক পত্রিকাগুলিতেও পেশাগত বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান সাংবাদিক অথবা ভাষ্যকার বলতে যা বোঝায় তার কিছুই নেই।

'অসুবিধে অনেক', বললেন ডঃ এসত্রাদা। 'যেমন ধরুন, বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে যাঁরা বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন এবং গবেষণা নিয়ে কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ খুবই কম। স্কুল স্তরের বিজ্ঞান শিক্ষা নেহাতই পুঁথিগত। সাধারণ মানুষের মনেও বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রচণ্ড অনীহা।'

ফলে গোড়ার দিকে প্রচণ্ড অসুবিধে ভোগ করতে হয়েছিল ডঃ এসত্রাদাকে। পরে তিনি নিজের বিভাগ থেকে নতুন একটি পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করলেন। পরিকল্পনাটির নাম দেয়া হল 'কফি হাউস চ্যাটস'। লক্ষ্য, ধরাবাঁধা পুঁথিগত ভাবে নয়। এসো, এক কাপ কফি হাতে নিয়ে বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় নিয়ে আমরা কথা-বার্তা চালাই।

হ্যাঁ, এইভাবেই কাজ শুরু করলেন ডঃ এসত্রাদা। কফির আসরে জমা হতে লাগল স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে অধ্যাপক, এবং যাঁরা পড়ুয়া নয়, তাঁরাও। আলোচ্য বিষয় অনেক কিছুই হতে পারে। মহাকাশ বিজ্ঞান থেকে পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য থেকে কৃষিবিজ্ঞান। কফি-চক্র বসতে শুরু করল কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কখনও বিভিন্ন গ্যালারিতে।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে বৈঠকেরও ব্যবস্থা করা হল এই সঙ্গে। এই সব বৈঠকে যারা উপস্থিত হয় তাদের বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়। তারা মুখোমুখি বসে দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। কৃষিবিজ্ঞান, পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি। কখনও কখনও এ-সব ক্ষেত্রে স্লাইড, ফিল্ম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

না। কোন রকম ধাঁধা সৃষ্টি করা নয়। বিজ্ঞান যে দুর্ভেদ্য দুর্গ নয়, ইচ্ছে করলে যে কোন মানুষই যাতে করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হতে পারে—

এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে গত কয়েক বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন ডঃ মার্টিনেজ।

"আমরা নিয়মিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি ছেলেমেয়েদের নিয়ে। এই সব প্রদর্শনীতে সাধারণ রসায়নের নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা হাতে কলমে দেখান হয়। গত বছর গণিতের ওপর একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীতে বিন্দু কাকে বলে, সরলরেখা বলতে কি বোঝায়, ত্রিভুজের সঙ্গে চতুর্ভুজের পার্থক্য কি, জ্যামিতির এই সব খুঁটিনাটি দিক দেয়ালে ছক কেটে বোঝানর চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল সাধারণ গাণিতিক হিসেব নিকেশ সম্পর্কিত কিছু কিছু বিষয়। এমন সব বিষয় যা সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।"

প্রসঙ্গত প্রশ্ন করেছিলাম, ডঃ এসত্রাদা জনপ্রিয় বিজ্ঞান বলতে এখনও পর্যন্ত অনেকেই আমরা সেই ধরনের জনগণের কথাই ভাবি, যাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা কম, অথবা একেবারেই নেই এবং তাঁদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা সৃষ্টি করাই বুঝি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু আর একটি দিকের কথাও লক্ষ করুন। গত কয়েক বছরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতরকম নতুন আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনাই না ঘটে গেছে। অবস্থাটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রের বিজ্ঞানী অনেক সময় জানতেই পারেন না, আর সব ক্ষেত্রে কি কি ঘটছে। এ ছাড়াও সরকার বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান নানা রকম বৈজ্ঞানিক প্রকল্পে হাত দিচ্ছেন বা সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছেন। ওই সব প্রকল্প বা চিন্তাভাবনা কতটা বাস্তব-সম্মত, অদূর ভবিষ্যতে তাদের পরিণতিই বা কি হতে পারে, এসব ব্যাপার বিচার বিশ্লেষণ করে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-সংগঠকদের মনে একটা সুষ্ঠু ধারণা সৃষ্টি করা গেলে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। এসব অভাব পূরণ করার জন্যে আপনি নিশ্চয় কিছু ভাবছেন।

ডঃ এসত্রাদা আমার এই প্রশ্নে খানিকটা দ্বিধায় পড়লেন বলেই যেন মনে হলো। বললেন, এটা এখন একটি বড় সমস্যা। যে কোন দেশের পক্ষেই সমস্যা। ব্যক্তিগতভাবে এসব নিয়ে খুব বেশি কিছু আমি ভাবি নি। এ ব্যাপারে কিছু একটা করা খুবই দরকার। তবে তার আগে আমি মনে করি, বিজ্ঞানীরা মানব কল্যাণের জন্যে যা বলছেন সেটা সত্য হিসেবে আপাতত স্বীকার করে নেয়াই ভাল। আর এটুকু স্বীকার করে নিয়ে, মাটির কাছাকাছি যাঁরা

যান্ত্র করেছেন, এক কথায় যাঁদের আমরা বস্তুতই বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় অজ্ঞ, যাঁরা সামান্যতম বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা পেলে অন্তত নিজেদের বেঁচে থাকার ব্যাপারটাও সহজতর করে নিতে পারেন, উচিত সে ব্যাপারেই এখন তাঁদের সাহায্য করা। এ কাজের জন্যে দুটি দিকের ওপর লক্ষ রাখতে হবে। এক, সাধারণ মানুষের মধ্যে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং তথ্যাদির ঘাটতি কতটা সেটা জানা। দুই, কোন রকম জটিলতা সৃষ্টি না করে তাঁদের নিজের মত করে কিভাবে সেই ঘাটতি মেটান যায় সে দিকে নজর রাখা।

ডঃ এসব্রাদার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্যে শেষের দিকে যে দুটি মন্তব্য তিনি করলেন, বলা বাহুল্য, গ্রামীণ বিজ্ঞান-প্রকল্প নিয়ে এ-দেশে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁদের ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য।

সমরজিৎ কর

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

পেনটার্স অর্কেস্ট্রা

গত বছরের তুলনায় পেনটার্স অর্কেস্ট্রার দলীয় প্রদর্শনী অধিকতর উপভোগ্য হয়েছিল একথা প্রথমেই স্বীকার করা ভাল (আকাদমী অব ফাইন আর্টস, ১—৭ ডিসেম্বর)। এঁরা সকলে কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। এঁদের কাজে নন্দলাল থেকে বিনোদবিহারী পর্যন্ত যে-নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছিল তার চিহ্নমাত্র নেই। যা আছে তা ভীষণ মার্কিনী। অপ, পপ আর্ট এবং বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদের পরিচায়ক। শহুরে বুদ্ধিজীবি মন এসব দিয়ে আলোড়িত, কিন্তু এসবের সঙ্গে ভারতীয় চিত্র ঐতিহ্য সংস্কৃতি এবং সমকালীন জীবনের কী সম্পর্কে তা ঠাওর করা গেল না। পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বোধকে রাহুগ্রস্ত করেছে এমন একটা ধারণা বধামূলে হতে থাকে।

ছবি এবং গ্রাফিকস ছিল। প্রধানত ডেকরেটিভ বা মণ্ডনধর্মী কাজ। এর মধ্যে শুচিব্রত দেবের জলরঙের ছবিতে আঙ্গিকের দুর্বলতা সত্ত্বেও একটা প্রসাদগুণ ছিল। লৌকিক রূপারোপ প্রীতি গ্রহণ ক'রে তিনি কিছু যেন বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর অংকনে রেখার জোর তেমন নেই। একেবারে উপরে কালো রঙের চাপ রঙ, তারপরে হলুদ আর সবুজে পাড় একটা নীল রঙের সরোবরকে ঘিরে ঘুরছে। এই 'অভয়ারণ্যে' বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়, নিরীহ টিকটিকি ঘুরে বেড়ায় নির্ভয়ে। তাঁর 'পেকামাকড়' চিত্রমালায় বরং একটু আতংকের ভাব আছে। সরোবরের মাছ জলের ওপর মুখ তুলে হাঁ ক'রে থাকে পোকা ধরার জন্যে। এখানে পোকা এবং সূর্যের চিত্রলেখ যেন কিছুটা বাংলা সূচিত্রী করণের ধারা মেনে চল। পার্থপ্রতিম দেব মাঝারি ক্যানভাসের মাঝখানে একটা চৌকো জায়গা উঁচু ক'রে তার মধ্যে স্যুট কোট পরা সাহেবকে ছোট্ট ক'রে এঁকে, তার ছায়াকে বড় করেছেন। ক্রমশ বড় হয়ে ছায়াটা চৌকো জায়গায় প্রাচীর টপকে মূল ক্যানভাসে কোণাকুণি পড়েছে। ছায়ার মাথায় কখনো লোকটার নিজের মুখের ছায়ার বদলে মোনালিসা বা অপঘাতে মরা শবের মুখ। মূল পটে স্কয়াটে রঙের ঘন বুনোট। পার্থপ্রতিমের মাথা পরিষ্কার কিন্তু সে-তুলনায় কুশলী নন। চারপাশে জায়গা ছেড়ে বিস্তারের ভাব তৈরী করে যেভাবে দেখান যে মানুষ একক ও অসহায় তা প্রশংসনীয়। চিন্ময় রায়ের ছবিতে কচি

রচনা শান্তনু ভট্টাচার্য

কলাপাতা ও পাকা কাগজী লেবু রঙ ব্যবহার ক'রে একটা স্নিগ্ধ আমেজ তৈরী করেছেন। 'অশেষ সিঁড়ি'-তে সিঁড়ি এবং মানুষ উভয়ই একটা জিনিসই প্রমাণ করে— অংকন দুর্বল। তেমনি অমিত রায় মেসোনাইট বোর্ডের ওপর 'রীতিপদ্ধতি' চিত্রমালায় মণ্ডনধর্মী একাধিক চতুষ্কোণ করেছেন। মেসোনাইট বোর্ডের ওপর চৌকো ঘর কেটে তার ওপর কাঁচা ও বিভিন্ন মাত্রায় ভাজা বালি লাগিয়েছেন। কার্বোরানডাম দিয়ে চিকচিকে রুপোলি ভাব এনেছেন। এসব পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন নব্য ধনীদের গৃহসজ্জা হিসাবে চমৎকার। কিন্তু ছবি হিসাবে কিছু নয়। গতবারে জহর দাশগুপ্ত সমাজসচেতন বক্তব্য নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন। এবার পটে নানা রঙ ঢেলে দপ্তরীর বই বাঁধাবার মার্বেল কাগজের মতো বিচিত্র নকশা করেছেন— এসব কি ছবি?

এর মধ্যে শান্তনু ভট্টাচার্যের পাথরছাপ বা লিথোগ্রাফ ছবি বেশ ভাল। তাঁর শায়িত মেয়েদের বেশ একটা ভাস্কর্য গুণ আছে। তার রেখা বলিষ্ঠ, কালো ও সাদার ঘনত্ব এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নিশ্চিত আত্মবিশ্বাস মনকে টানে। তপন মিত্র সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্ট চতুষ্কোণের ভেতর চতুষ্কোণ এঁকে রঙের ক্রম ঘনত্ব নিয়ে কিছু খেলা খেলেছেন। এক ধরনের মুন্সীয়ানা তাঁর করায়ত্বে—তার বেশি কি বলা যেতে পারে?

ম্যাক্স ম্যুলার ভবনের প্রদর্শনী

এই প্রদর্শনীর নাম "কলকাতার নির্বাচিত শিল্পীদের দলীয় প্রদর্শনী—২" —এই শহরের জার্মানরা দলীয় প্রদর্শনী করলেন। কিন্তু 'নির্বাচিত' শিল্পী—যেন যাঁরা নির্বাচিত হননি তাঁদের অজ্ঞানত ব্যাক্রান্ত হয়েছে! এসব বিশ্রী এবং আপত্তিকর। কারণ, কলকাতার বহু ক্ষমতাবান শিল্পী এ'দের নির্বাচন থেকে বাদ পড়েছেন এবং নির্বাচিত শিল্পীদের মধ্যে বহু অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

কিন্তু 'প্রদর্শনী—১'-এর চেয়ে '২' অনেক ভাল। তরুণ শিল্পীরা নানারকম খেলা সাহসের সঙ্গে খেলেছেন। এ'দের অনেকেই প্রতিভাবান।

এই প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য, চিত্র ও ছাপা ছবি বা গ্রাফিক্স ছিল (ম্যাকস ম্যুলার চিত্রশালা··১-১৫ই ডিসেম্বর) প্রচুর। মোট আঠাশ জনের কাজ ছিল। আর একটু কড়াকড়ি করলে ব্যাপারটা জমতো ভাল। যেমন ধরা যাক রামলাল ধর কী এক ভুলচকে কালেজী ধরনের প্রতিকৃতি দিয়েছেন। মেয়েটির সবুজ শাড়ির ঔজ্জ্বল্য ছাড়া গলা থেকে পেট পর্যন্ত, বিশেষত হাত দুটোর অঙ্কন দুর্বল। ত্বকের বর্ণের ক্রমবিন্যাস ত্রুটিপূর্ণ। অশোক ভৌমিক কালো রঙ দিয়ে পটের মাঝখান পর্যন্ত বন্ধ ক'রে একটা নিঃসীম বিলম্বিত বিস্তারের ভাব তৈরী করেছেন, তারপর হয়তো পাহাড়ের আভাস, একটা কুকুর বা চক্রযানের ওপর একটা মানুষ—অদ্ভুতভাবে রূপারোপ ক'রে হাজির করেছেন। মেটে হলুদ, খয়েরী রঙ চাপিয়েছেন নিশ্চিন্তে। তিলক মণ্ডলের ছবির দগদগে কাঁচা রঙ চাপানোর মধ্যে মনশীয়ানা ও সাহস ভাল লাগে। যন্ত্রণায় কাতর মানুষগুলোর পাশে পশু ও প্রকৃতির নিষ্পাপ ভঙ্গী এঁকে থাকেন। পরিবেশের মধ্যেকার স্ববিরোধ তিনি দেখাতে চান।
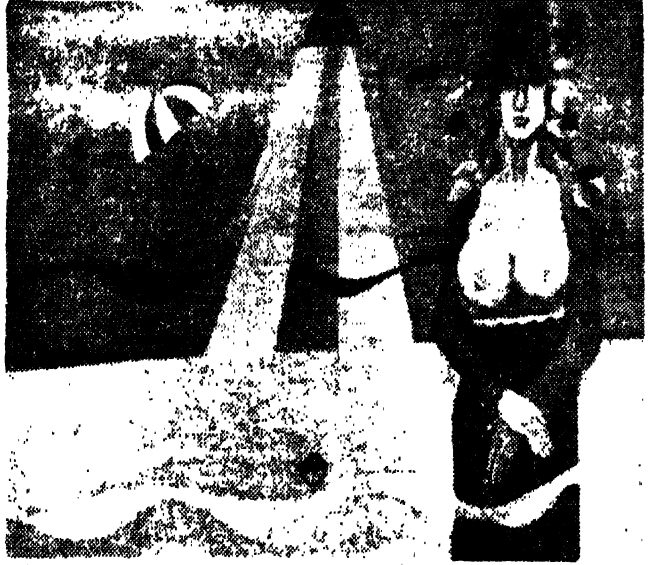
নামহীন ছবি   মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়

কিন্তু এবার অঙ্কন চর্চায় তাঁকে মন দিতে হবে, না হলে তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবেন। এ'দের তুলনায় মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়ের তৈলচিত্র আঁকার রীতিপ্রকরণ দুর্বল কিন্তু একটা স্বকীয়তা দেখলাম। পাতা মাথায় দেওয়া সেই মেমসাহেব···যার জামার ভেতর থেকে স্তন সুস্পষ্ট। হাওয়ায় ছাতা ওড়ে। শুধু মাটিতে লাট্টুটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। এ'র হলুদ, কমলা, লাল বড় সমতল—পটের ভেতর তেল রঙ নিয়ে কীভাবে খেলতে হয় তা তাঁর আয়ত্তে নেই। ছবির মেজাজটা ইউরোপীয়। এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে এবং শিল্পকলায় কঠোর পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। পৃথ্বীশ সেনের কাজ সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনার কিছু নেই। তেমনি বিশ্বপতি ও গীতা মাইতির কাজ সম্বন্ধেও নেই। গীতা ভট্টাচার্যের পুরাচিত্রকে জ্যামিতিকভাবে ভেঙ্গে নিয়ে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ বর্ণে সাজিয়ে তৈলচিত্ররূপে হাজির করা আমাকে আকর্ষণ করে। অলোক ভট্টাচার্যের জলাভূমির জংগলা পরিবেশে বাঁদু র মানুষটা ভীতি উদ্রেক করে এবং হয়[illegible] সেটা তাঁর অভিপ্রেত। শিবপ্রসাদ চৌধুরীর কাঠের ডামি মানুষ ঘোড়া [illegible] পড়ে যাবার মধ্যে একটা তির্যক [illegible] আছে। রুপোলি আকাশ এবং [illegible] পর্দা—ফলিত চিত্রকলার প্রভাব সুস্পষ্ট। অরুণ দত্ত প্রলয়ের পরে এক গাদা লোকের জড় হয়ে থাকার ভয়ার্তভাব ধরেছেন। লোকগুলো খাড়া আর ঘন সবুজ ও নীলের ঢেউ অনুভূমি বরাবর গেছে। রঙের স্নিগ্ধতা যেন ছবির বক্তব্যকে ব্যাহত করে। অশোক বিশ্বাস পুরনো ছবি দিয়েছেন।

মানিক তালুকদারের মতো ক্ষমতাবান ভাস্কর যখন মণ্ডনধর্মী আধা রিলিফ ভাস্কর্য নিয়ে খেলা করেন, তখন রাগ ও দুঃখ হয়। নিরঞ্জন প্রধান পরিশ্রম ক'রে রূপ ভেঙ্গে নতুন রূপ গড়েছেন। তেমনি দিলীপ সাহা রূপবন্ধের গহন সমুদ্রের রহস্য উদ্ধার ক'রে এই শরীরী অস্তিত্বের মাধুর্যটুকু দেখিয়েছেন।

ছাপা ছবির মধ্যে হরেকৃষ্ণ বাগের কাজই উল্লেখযোগ্য। বস্তুত আজকে অনেকেই যাঁরা ছবি আঁকতে পারেন না, তাঁরাই ছাপা ছবি করেন।

—সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়

বাংলা সাহিত্য ও মার্কসবাদ

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত। পরিবেশক প্রাইমা পাবলিকেশনস ও বুকমার্ক। ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। প্রথমখণ্ড ঃ সতেরো টাকা, দ্বিতীয়খণ্ড ঃ কুড়ি টাকা।

এই দুটি সংকলন গ্রন্থে ধনঞ্জয় দাশ প্রচুর পরিশ্রম ক'রে বাঙলাদেশে মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্কের ইতিহাসটি স্পষ্ট করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ১৯২৫ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা। ওই সময় থেকে বইটির প্রথমখণ্ড প্রকাশের সময়—১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ধরলে এদেশে মার্কসবাদী চিন্তা-চর্চার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। কিন্তু বই দুটিতে সংকলিত সাহিত্য-বিতর্ক মোটামুটি ১৯৫০ সাল পর্যন্তই আছে। অর্থাৎ প্রথম পঁচিশ বছরের ইতিহাস। এই পঁচিশ বছরের ইতিহাস ঘাটতে গিয়ে লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তাঁর ভূমিকায় ১৯২৫ সালের আগে থেকেই কীভাবে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ধীরে ধীরে আমাদের লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করেছিল এবং ঠিক কোন সময় থেকে সাহিত্যে মার্কসবাদী দর্শন-চিন্তার প্রয়োগ স্পষ্টভাবে শুরু হলো তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তারপর ধীরে ধীরে সাহিত্য-বিতর্কে জড়িয়ে-পড়া চিন্তাশীল মানুষগুলি কীভাবে অন্তর্দলীয় সংগ্রামেও জড়িয়ে পড়লেন তাঁদের দেশী-বিদেশী কলহলিপ্ত গুরুদের নির্দেশে তারও সুন্দর ইতিহাস সম্পাদক ভূমিকায় দিয়েছেন। দুখণ্ডের ভূমিকা মিলিয়ে পড়লে মনে হয়, বাঙলাসাহিত্যের সাম্প্রতিককালের ইতিহাস যা লেখা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ এবং নতুন ক'রে লিখিত হওয়া উচিত।

প্রথমখণ্ডে ভূমিকা ছাড়া ভবানী সেন, প্রদ্যোৎ গুহ, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিশেষ ক'রে এই তিনজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর পুরোনো আলোচনা স্থান পেয়েছে। নানা প্রসঙ্গসূত্রে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিষ্ণু দে, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সাহিত্য বিচার হয়েছে, এবং প্রকৃত মার্কসবাদী চিন্তায় যে কারোর সাহিত্যই তখনও পর্যন্ত (১৯৪৮) উত্তীর্ণ নয় এই সিদ্ধান্ত প্রায় সকলেরই। মার্কসবাদী সাহিত্যিকও যে ছদ্মবেশী প্রতিক্রিয়াশীল এই মনোভাবও সমালোচকদের মনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কিন্তু এই সব আলোচনার মধ্যে লেখকদের সমকালীন চালচিত্রে ফেলে বিচার করা হয়নি অনেক সময়েই, তথ্যগত ভুলও আছে, আকস্মিক সাধারণ মন্তব্যে অনেক সময়েই মাইকেল, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিকে নস্যাৎ করা হয়েছে। তবে এও ঠিক, সাহিত্যে মার্কসবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে মার্কসবাদের ধারণা সম্পর্কে আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করেছেন সকলেই। এবং নিজেদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে আলোচকদের কেউ কেউ বেশ সচেতনও। এই সংকলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লেখা বোধহয় নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনামের আড়ালে গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঊনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিম সাহিতের ভূমিকা।' পরিশিষ্টে মার্কসবাদী সংকলনের একটি সম্পাদকীয় ও একটি ঘোষণাপত্র দেওয়া হয়েছে, এবং ভবানী সেনের লেখা 'একজন মনস্বী ও একটি শতাব্দী' নামক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধটিও যুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয়খণ্ড আকারে একটু বৃহৎ। প্রথমখণ্ডের মতোই এক্ষেত্রেও দীর্ঘ ও বিস্তৃত ভূমিকায় সংকলিত রচনাগুলির প্রেক্ষাপট স্পষ্ট করেছেন সম্পাদক। বহু দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা ও বই এবং প্রগতি আন্দোলনের বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে সম্পাদক এই ভূমিকাটিও তৈরি করেছেন। এই খণ্ডের সংকলিত রচনাগুলির মধ্যে তর্ক-বিতর্কের উত্তাপ আরও বেশি। শান্তি বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতাংশু মৈত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, সনৎকুমার বসু, প্রদ্যোৎ গুহ এই কজনের লেখা দ্বিতীয় খণ্ডে স্থান পেয়েছে। প্রথম পরিশিষ্টে গণনাট্য-সংগঠনের ওপর দুটি আলোচনা, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবনাট্য-সংকট আলোচনা এবং গুরুদাস পালের একটি বিতর্কিত গান সংকলিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিশিষ্টে চিন্মোহন সেহানবীশের একটি লেখা, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের (১৯৪৯) ঘোষণাপত্র এবং সম্পাদকের নিজের লেখা বরাহনগরে অনুষ্ঠিত যুবসংস্কৃতিবিদদের সম্মেলনের রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। এই সংক[illegible] প্রবন্ধগুলির মধ্যে পারস্পরিক আ[illegible] সুর বেশ চড়া এবং অনেক [illegible]ই আগেকার সংকীর্ণ দৃষ্টি ও ম[illegible]নের অভাব লক্ষণীয়। ভালো লেখার মধ্যে বিশেষ ক'রে সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শান্তি বসু ও প্রদ্যোৎ গুহের আলোচনা এই সংকলনে খুবই আকর্ষণীয় বিষয়। দেশীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে গিয়ে সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিশ্লেষণভঙ্গি সত্যিই আকর্ষণীয়, আর শান্তি বসু ও প্রদ্যোৎ গুহের বিতর্ক থেকে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তেমনি সৃষ্টির স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক থীসিস দিয়ে জব্দ করবার উৎকট ভঙ্গিটিও কমে গেছে।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

শিল্প

বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া। দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। চার টাকা।

লোকসংস্কৃতির আলোচনায় প্রচলিত প্রবন্ধের বইগুলিতে যে জাতীয় নীরস বিবরণ-সর্বস্বতা লক্ষ করা যায় আলোচ্য বইখানি সেই পর্যায়ের নয়। শ্রমসাধ্য ব্যক্তিগত সমীক্ষা, মৌলিক ভাবনাচিন্তা এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রতি একান্ত অনুরাগ—এইসব গুণের যোগ-ফলে আকারে ছোট হলেও বিশেষত্বে বইটি এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করতে পারে।

গ্রন্থের বিষয়-স্তর মুখ্যত তিনটি।

প্রথম স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর পটের পরিচয়-বিবরণ, পট নির্মাণরীতি এবং পটুয়া-সংগীত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিষয় পটের প্রাচীনত্ব এবং পট তৈরির প্রেক্ষিত হিসেবে ধর্মচেতনার ভূমিকা এবং গুরুত্ব। তৃতীয় স্তরে তুলনামূলক বিচারে বীরভূমের যম-পটের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পরিশিষ্ট-অংশটির গুরুত্বও কম নয়। একালের দুজন বিখ্যাত পটুয়ার পরিচয় এবং বীরভূমের পটুয়া-সম্প্রদায়ের বসবাসের পঞ্জী সংযোজিত হয়েছে এই অংশে; যা লোকসংস্কৃতি-প্রেমীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বিষয় হিসেবে সাদরে গৃহীত হবে।

পট ও পটুয়া সম্পর্কিত লেখকের ধারণা এবং মতামত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ধৃত বলেই অংশটি পাঠকের মনে অনায়াস-কৌতূহলের সৃষ্টি করে। পট তৈরির উপকরণ এবং নির্মাণকৌশলের আলোচনায় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব শিল্প-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকখানি মূল্যবান পট ও পটুয়ার আলোকচিত্র বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। **প্রলয় সেন**

অনুবাদ

সত্যদ্রষ্টা : কাহ্‌লিল গিবরাণ : অনুবাদ : বীণা সেন, প্রকাশিকা দীপাবতী সেন, ১৬৬/৩০ লেক গার্ডেনস, কলকাতা-৪৫।

গিবরাণ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি 'খলিল জিব্রান'-এর মতো ভাবালুতাময় পদারচয়িতা' (রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালী)—বীণা সেনের অনুবাদ হাতে নিয়ে মনে হলো। এই এক ধরনের বই যা সাধুসন্ত, গৃহাজ্ঞানী এবং শৌখিন অধ্যাত্মবাদীদের ভাল লাগবে। আর কাব্য পাঠক?

গিবরাণ (মতান্তরে জিব্রান) কেমন কবি ছিলেন? বলা মুশকিল কারণ আরবী বা লেবাননী কী একটা পুরনো অথচ সচল ভাষায় তিনি লিখতেন। মধ্যপ্রাচ্যের সেমেতিক ভাষাগুলোর কাব্যরীতির বিশেষত্ব অন্য ভাষায় আনা শক্ত। যেমন বাইবেলের 'সামস'-এর আজ পর্যন্ত কোনো ভাল বাঙলা অনুবাদ হয়নি। কারণ মরুভূমি অঞ্চলের লোকের সমাজব্যবস্থা, ভঙ্গী, মানসিকতা এবং মেজাজের সঙ্গে আমাদের মিল নেই। আর তাছাড়া যেটা তার চেয়েও বড় কথা কবিতার অনুবাদ হয় না।

সেই হিসাবে বীণা সেনের কৃতিত্ব হলো তিনি স্বচ্ছভাবে অনুবাদ করেছেন। দু-এক জায়গায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। তাই হোঁচট খেতে হয়। যেমন 'প্রার্থিত হয়ে দেওয়া ভাল, তার চেয়ে ভাল/প্রার্থিত না হয় শুধু উপলব্ধির দ্বারা দান করা'। দ্বিতীয় মুদ্রণ হলে তিনি অবশ্যই এসব ত্রুটি সংশোধন করবেন।

দশ টাকা দাম বেশী মনে হলো। যদিও উর্দু ছাঁদে করা পরিতোষ সেনের কেলিগ্রাফিক প্রচ্ছদপট চমৎকার।

সন্দীপ সরকার

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

"দীর্ঘ সাঁকোয় হাঁটা ফুরবে না কখনও/পায়ের তলায় মচমচে নিরাপত্তা/এক অজগর, জোরে চেপে ধরি সাঁকোটা"—কিংবা "দু-পাশে সরিয়ে দিয়ে গুল্ম ঝোপ অন্তস্তল থেকে/দু-হাতের আঙুলের শীতোষ্ণ ফর্সেপে বের করে আনা বীজ/আলো দেখে, বাইবাতাসের শ্বাসে থরথর ধ্বনি শুনে কেঁদে ওঠে" অথবা "সুর্ব-আঁকা সিল্কের আকাশ খুঁজে পাওয়া গেছে—/পৃথিবীর সবাই চিনেছে ঠিক এ-রুমাল কার"—এই ধরনের চিত্রকল্পময় পংক্তিতে তরুণ কবি নিরঞ্জন ঘোষ-কে যেভাবে চেনা যায়, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ওখেলোর রুমাল (সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা ৬, চারটাকা)-এর সর্বত্র সেই চিহ্ন ছড়ানো নেই।

বিবাহিতা সুখের স্বরূপধারী "লবণতা স্বামী-জন্তু দু-দিনেই কেটে খায় আদেখলার মতো'—এখানে আদেখলা কিংবা স্বামী-জন্তু অত্যন্ত স্থূল ব্যবহার বলে মনে হতে বাধা। কিংবা কালীপুজো।

প্যাস্তেলে অনন্য "হাড়িকাঠে শোনা যায় ঢাপা আর্তনাদে—চাঁদা চাঁদা, অপমান, যায়, যায়, বা-, ...—" বড়ো সরাসরি, রম্যরচনার মতো প্রত্যক্ষ বলে মনে হয়। প্রত্যক্ষ রসিকতা নিয়েও বাংলা দেশে দু-একজন কবিতা যে লেখেন না অথবা সমাদৃত হন না এমন নয়, কিন্তু নিরঞ্জনের যথার্থ প্রবণতা ঠিক এদিকে মনে হল না। কবিতার আলো-আঁধারি রহস্য তাঁর হাতে বরং বেশী খুলেছে।

*

হাতে যদি থাকে অব্যর্থ ছন্দের তূণ ও মিলের অপ্রত্যাশিত সম্যকসৃষ্টির গুণ, তাহলে তুচ্ছ কথাকেও যে পুচ্ছ-দোলানো পাখির মতো নাচানো যায়, সাময়িক এক সম্মোহনজালে আবদ্ধ করা যায় পাঠককে—বাংলা কবিতায় এমন উদাহরণ সব যুগেই অল্প-বিস্তর ছিল এবং আছে। শিশির চক্রবর্তীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ **সোহাগ শীতলপাটি** (সম্প্রতি প্রকাশ, কাঁথি, মেদিনীপুর, চার টাকা) হাতে নিয়ে কথাটা নতুন করে মনে পড়ল।

চল্লিশোত্তীর্ণ এই কবির আগের দুটি বই বেরিয়েছিল অনেকদিন আগে। 'ছন্দোবন্ধ সোহাগ শীতলপাটি' উত্তরযৌবনে এসে বিছিয়েছেন তিনি। উত্তরযৌবনে কেন, এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েই এই বই শুরু—"আগে ছিলাম ভীষণ ভীতু/শরীর জড়ে বর্ষা ঋতু/কী দিলো ফসমন্তর।" এই 'ফুসমন্তর' বড়ো সামান্য নয়, এখন তিনি অক্লেশে অকুণ্ঠ প্রার্থনা জানাতে সাহসী—'দে অধিকার এখন থেকে/তোর শরীরের সারর ছেঁকে/তুলবো দুটি শালুক।' ভালবাসার সুপ্ত আগুন কী ভাবে ধিকিধিকি পুড়িয়েছে তাকে সেই স্বীকারোক্তি সপ্রতিভ ছন্দে-মিলে তুলে ধরেছেন এই পরিণত প্রেমিক—"কোথায় জীবন? সোনার জীবন! রকম দেখে/বিস্ময়ে নির্বাক হয়েছি। /কী লাভ হলো ভালোবাসার আগুন রেখে/ ওতেই পুড়ে খাক হয়েছি।" খুব সহজ অনুভূতিকেও কী ভাবে ছন্দোবদ্ধ করে তোলা যায় এই বইতে তার বিস্তর প্রমাণ। এমন একটি—"আসি নি দিতে মান্য কিছু/ অন্তত সামান্য কিছু/ঋণ তো আছে। /ফল নেবে না এমন অবুঝ! /পাপড়ি না থাক গাঢ় সবুজ/বৃন্ত আছে।"

সত্যিই তাই। পাপড়ি না থাকলেও গাঢ় সবুজ বৃন্তের নিকেতন হিসেবে বইটি বিশিষ্ট হয়ে থাকবে।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পত্রিকা পরিচয়

কবি পত্র ॥ ৩৪ ॥ বিশেষ শিল্প সংখ্যা। পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রভাত চৌধুরী সম্পাদিত। ২২বি প্রতাপাদিত্য রোড। কলকাতা-২৬। ২·০০ টাকা

ইদানীং বাঙালী শিল্পীদের চিত্র-ভাবনা সম্পর্কে মোটামুটি একটা আদল শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতি-মনা ব্যক্তিমাত্রেরই চেনাজানা উচিত। 'কবিপত্রে'র বর্তমান সংখ্যাটিতে সে বিষয়ে প্রচেষ্টার একটি আন্তরিক চেহারা দেখা গেল। দুরূহ অথচ জরুরী এই দায়িত্বটি পালন করেছেন শিল্পপ্রেমিক সন্দীপ সরকার। গত তিন দশকের শিল্পকলা, সেই সঙ্গে শিল্পীদের উপর আলোচনা এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ। আলোচিত হয়েছেন নিখিল বিশ্বাস, প্রকাশ কর্মকার, সুনীল দাস, গণেশ পাইন, বিজন চৌধুরী, রবীন মণ্ডল, বিকাশ ভট্টাচার্য, সজল রায়, শানু লাহিড়ী, গোপাল সান্যাল, যোগেন চৌধুরী, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত প্রমুখ। অশোক মিত্র, এবং পরিতোষ সেন-এর মতন বিদগ্ধ শিল্পসমালোচকরা তাঁদের বক্তব্যে এই সংখ্যার দাম বাড়িয়েছেন।

খেলার মাঠে

দিল্লি টেস্টে গরিমা অ্যামিস ও লিভারের

দেশের মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে পাঁচ টেস্ট সিরিজে ইংলণ্ড শোচনীয়ভাবে হেরে এসেছে। প্রথম দুটি টেস্ট ড্র হবার পর পরের তিনটি টেস্টে হেরেছে যথাক্রমে ৪২৫ রান, ৫৫ রান এবং ২৩১ রানে। অপরদিকে ভারত দেশের মাঠে নিউ-জিল্যাণ্ডকে হারিয়েছে তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটি টেস্টে। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যাটে-বলে ভারতের খেলোয়াড়রা এত আধিপত্য দেখিয়েছিল যে, ভাবাই যায়নি দিল্লির প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডের কাছে ইনিংসে হেরে যাবে। ব্যাপারটি কিন্তু সত্যিই ঘটে গেল। ফিরোজ শাহ কোটলা মাঠে ভারতকে ইনিংস ও ২৫ রানে হারিয়ে ইংলণ্ডের অধিনায়ক হিসাবে টনি গ্রিগ প্রথম জয়ের স্বাদ পেলেন। ইংলণ্ড পেল ভারতের সঙ্গে সংগ্রামের মনোবল।

আগে যে ৮টি টেস্টে গ্রিগ ইংলণ্ডের অধিনায়কত্ব করেন তার তিনটি টেস্টে হেরে যান, পাঁচটি টেস্ট ড্র হয়। এ জন্য স্বদেশের সমালোচকরা তাঁর নেতৃত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলা বাহুল্য ভারত সফরে আঞ্চলিক খেলাগুলিতে এম সি সি দল ভাল রান করায় এবং প্রথম টেস্ট জেতায় এম সি সি দলের ভাবমূর্তিও বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

শুধু আমার ধারণা এই ইংলণ্ড দল ভারতকে চারদিনের মধ্যে ইনিংসে হারাবার মত শক্তিশালী নয়। ৪ বছর আগে টনি লুইসের ইংলণ্ড দলও তো দিল্লির প্রথম টেস্টে ভারতকে ৬ উইকেটে পরাজিত করেছিল। শেষ পর্যন্ত সেই দলকেই ভারতের কাছে সিরিজ হারাতে হয়েছিল ১—২ ফলে। ক্লাইভ লয়েডের শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলও ৭৪-৭৫ সিরিজে প্রথম দুটি টেস্ট জয়ের পর ভারতের কাছে হেরেছিল দুটি টেস্টে। শেষ পর্যন্ত শেষ টেস্ট জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রাবার পায়। সুতরাং ফিরোজ শাহ কোটলায় বিপর্যয় ঘটে গেলেও ভারতের নৈরাশ্যের কারণ আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না।

আসলে দিল্লি টেস্টে ইংলণ্ড জেতেনি, জিতেছে ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা। না হলে মাত্র ৬৫ রানের মধ্যে যারা ৪টি উইকেট হারিয়েছিল, ব্রিয়ারলি, বার্লো, উলমার এবং ফ্লেচারের মত ৪জন নামী খেলোয়াড় মাত্র ১৭ রান যোগ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিল, তারা কি প্রথম ইনিংসে ৩৮১ রান করতে পারে? নাকি তিনটি চান্স দিয়ে

ওপেনার ডেনিস অ্যামিস ব্যাট করতে পারে ৫০০ মিনিট স্থায়ী ইনিংসে দীর্ঘ ৫০৮ মিনিট ধরে?

গৌরবের ব্যাপারে সাফল্যই শেষ কথা। কীভাবে রান করা হয়েছে সেটা কারো মনে থাকে না। নামের পাশের বড় রানটাই চোখের উপর বড় হয়ে ফুটে ওঠে। তাই অ্যামিসের নামের পাশের বড় রানটাই চোখের উপর বড় হয়ে ফুটে ওঠে। তাই অ্যামিসের নামের পাশের ১৭৯ সংখ্যাটা গৌরব তিলকের মত জাজ্জ্বল্যমান। ইংলণ্ডকে এক ইনিংসই খেলতে হয়েছে। সামগ্রিকভাবে তাদের ব্যাটসম্যানদের ভূমিকা কি গৌরবময়। নিশ্চয়ই নয়। আমরা দেখতে পাব ৩৮১ রানের ইনিংসে তিনজন—অ্যামিস, নট এবং লিভারই দিয়েছেন ৩০৭

দিল্লি টেস্টে ঘাউড়ির বল হুক করছেন ডেনিস অ্যামিস। —ফটোঃ অলক মিত্র

রান। বাকী ৮জন মিলে মাত্র ৭৪। মনে রাখতে হবে, মধ্যম পেস বোলার জন লিভারের জীবনের প্রথম টেস্টে ৫৩ রান আরও ক্রিকেটের অনিশ্চয়তা। তাঁর কৃতিত্বকে কিছুমাত্র খাটো না করে এবং সুইং বলে ভারতের দুর্বলতা স্বীকার করেও বলছি, তার বলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না। প্রথম চান্সে অ্যামিসের ক্যাচ ধরা হলে নিশ্চয়ই ইংলণ্ড বড় ইনিংস গড়তে পারত না। এমন কি দ্বিতীয় চান্সের সুযোগ যদি ভারতীয় ফিল্ডারেরা গ্রহণ করতে পারত তা হলেও এই অবস্থা হত না। যে ক্যাচ মিস করে সে ম্যাচও মিস করে—ক্রিকেটের এই প্রবাদ বাক্য অনেকখানিই দিল্লিতে মিলে গেছে। এবং মিলে গেছে ক্যাচ ধরে যে, ম্যাচ জেতে সে—এই কথাটিও।

যে দল প্রথম ইনিংসে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, ফলো-অন করে, বলতে গেলে চারদিনের মধ্যে ম্যাচ হেরেছে অপমানজনক ইনিংসে সে দলের কোন প্রশংসা কানে কটু লাগতে পারে। আমি ভারতীয় ব্যাটিংয়ের আদৌ প্রশংসা করছি না। বরং দায়িত্ব সচেতনতার অভাবের জন্য নিন্দাই তাদের প্রাপ্য। ঘটনাচক্রে যেটা ঘটে গেছে তাই বলছি। ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ের কথা আগেই বলেছি। জীবনের প্রথম টেস্টে জন লিভারের অপ্রত্যাশিত সাফল্য এবং বব উইলিসের অসাধারণ দুটি ক্যাচই ইংলণ্ডের অনুকূলে খেলাটি ঘুরিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, একটি অসাধারণ ক্যাচ কিংবা অদ্ভুত ধরনের স্টাম্পিং একটি ম্যাচের ভাগ্য তৈরী করে দিতে পারে।

আগেই বলেছি, মাত্র ৬৫ রানে ইংলণ্ড হারিয়েছিল ৪টি উইকেট, ১২৫ রানে হয়েছিল অর্ধমৃত। ভারতের চারটি উইকেট পড়ে ৪৯ রানে, পঞ্চম উইকেট ৯১তে। ইংলণ্ড শেষ ৫ উইকেটে যোগ করে ২৫৬, ভারতের শেষ ৫ উইকেট শেষ হয় মাত্র ৩১ রানে। ফলে ২৫ বছর আগে দেশের মাঠে (কানপুরে) ১২১ রানের নিকৃষ্ট ইনিংস গড়ার যে নজির আছে তার চেয়ে এক রান বেশী করে শেষ হয়ে যায়। এভাবে শেষ হওয়ার মূলে সুইং বল খেলার ব্যর্থতার সঙ্গে অবশ্যই দায়িত্ববোধের অভাব আছে। কিন্তু তার চেয়েও বোধ হয় বড় কার্যকারণ —আগেই বলেছি—উইলিসের দুটি অসাধারণ ক্যাচ।

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে টসে জয়ী বিষেণ সিং বেদী দিল্লিতে যখন টসে হারলেন তখন আন্দাজ করা গিয়েছিল ভারত অধিনায়কের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ থেকে ভাগ্য দেবী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তারপর ভারতের দুর্ভাগ্যের পরিচয় মিলল এবং ভারত ফলো অনের কবলে পড়ল ওই দুটি ক্যাচে গাভাসকার এবং শেষ প্রতিরোধ হিসাবে কথিত পার্থসারথি শর্মার বিদায়ে। লিভারের বাম্প করানো বল হুক করে গাভাসকার মাঠ পার করতেই চেয়েছিল। লং লেগের মারটিতে বেশ জোরও ছিল। কাছেও ছিল না কোন ফিল্ডার। কিন্তু প্রায় ২৫ গজ দূরে থেকে ছুটে এসে উইলিস অসম্ভব ক্যাচটি ধরে। পার্থসারথির পরের ক্যাচ ধরাও প্রায় বিরল দৃশ্যের মত। প্রচণ্ড জোরে কাট করা বলটির বাউণ্ডারী পার হবার কথা। কিন্তু বলের যাত্রাপথ গালিতেই সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় উইলিসের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ হয়ে। এই ধরনের ক্যাচের সদ্ব্যবহারেই জয় সহজ লভ্য হয়ে ওঠে।

প্রথম ইনিংসের ব্যাটিংয়ের ২৫৯ রানের ঘাটতি থাকায় ভারত ফলো অনে বাধ্য হয়ে যখন দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে তখন খেলার প্রায় আড়াইদিন বাকি। ওই অবস্থায় উইকেট আগলে রেখে হার বাঁচাবার প্রশ্নই বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু টার্নিং উইকেটে কি আড়াই দিন টিকে থাকা যায়?

তবু দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত প্রথম দিকে যথেষ্ট দৃঢ়তাই দেখিয়েছে। বিশেষ করে সুনীল গাভাসকর ও পার্থসারথি শর্মা। পার্থসারথি সওয়া তিন ঘণ্টা উইকেটে টিকে ছিল তার ২৯ রানের ইনিংসে। গাভাসকর টিকে ছিল সাড়ে চার ঘণ্টা। করে ৭১ রান। বাকিদের ব্যাটিং প্রায় প্রতিরোধহীন আত্মসমর্পণের পর্যায়ে পড়ে।

পঞ্চম ও শেষ দিন ৩৩ মিনিটের মধ্যে খেলার উপর যবনিকা পড়লেও আসলে খেলার ব্যাপ্তিকাল ৪ দিনেরও কম। কারণ চতুর্থ দিন ১০০ মিনিট খেলা হয়নি ঘন কুয়াশায় আকাশ ঢাকা থাকায়।

প্রথম টেস্টে ম্যান অফ দি ম্যাচ হয়েছেন জন লিভার ৫৩ রান এবং ১০টি উইকেট পেয়ে। ১৭৯ রানের অধিকারী ওপেনার ডেনিস অ্যামিসেরও ভূমিকা উল্লেখ্য। নটেরও (৭৫ রান) কম নয়। ভারতের গাভাসকারও দুই ইনিংসে সবার চেয়ে বেশী ৩৮ ও ৭১ রান করেছে এবং এই খেলাতেই পূর্ণ করেছে এক বছরে হাজার টেস্ট রান সংগ্রহের বিরল কৃতিত্ব। এক ক্যালেন্ডারইয়ার অর্থাৎ পয়লা জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বা ১২ মাসের ব্যাপ্তিকালে হাজার টেস্ট রান করার কৃতিত্ব আছে গাভাসকারকে নিয়ে পৃথিবীর মাত্র ১০ জন খেলোয়াড়ের। বাকি ৯ জন হলেন ইংলণ্ডের কেন ব্যারিংটন (দুবার), ডেনিস কম্পটন, টেড ডেক্সটার ও ডেনিস অ্যামিস, অস্ট্রেলিয়ার ক্লেম হিল, ডন ব্র্যাডম্যান ও ববি সিম্পসন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারি সোবার্স ও ভিভিয়ান রিচার্ডস।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৩৮১ (ডেনিস অ্যামিস ১৭৯, অ্যালান নট ৭৫, জন লিভার ৫৩, টনি গ্রিগ ২৫, বেদী ৪—৯২, চন্দ্রশেখর ৩—৯৭, বেঙ্কট-রাঘবন ১—৯৪)।

ভারত—প্রথম ইনিংস ১২২ (গাভাসকর ৩৮, ব্রিজেশ প্যাটেল ৩২, অংশুমান গায়কোয়াড় ২০ ; জন লিভার ৭—৪৬, ক্রিস ওল্ড ২—২৮, আণ্ডারউড ১—১৯)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৪ (গাভাসকর ৭১, কারসন ঘাউড়ি ৩৫, পার্থসারথি শর্মা ২৯, মহীন্দার অমরনাথ ২৪ ; জন লিভার ৩—২৪, আণ্ডারউড ৪—৭৮, টনি গ্রিগ ২—৮৪, বব উইলিস ১—২৪)।

(ভারত ইনিংস ও ২৫ রান [illegible]জিত)

২

মোহন বাগানের রোভারস জয়

যদিও ভারতের তিনটি বড় ফুটবল প্রতিযোগিতায়—আই এফ এ শীল্ড, ডুরাণ্ড কাপ ও রোভারস কাপ জয় অলিখিত ট্রিপল ক্রাউন-এর সম্মান তবু মোহনবাগান রোভারস কাপ জয়ী হয়ে এ বছর ট্রিপল ক্রাউন পেল বলা যেতে পারে। কারণ এর আগে মোহনবাগান কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং ইস্ট বেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্মভাবে আই এফ এ শীল্ড জয়ীরও সম্মান পেয়েছে। তাছাড়া দার্জিলিং গোল্ড কাপেরও এখন প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতার মর্যাদা। সে প্রতিযোগিতাও যুগ্মভাবে জয় করেছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। সুতরাং এক বছরে মোহনবাগানের চারটি বড় প্রতিযোগিতা জয়ের কৃতিত্ব।

রোভারসে মোহনবাগান সেমিফাইনাল থেকে খেলার সুযোগ পায়। ডাবল লেগের প্রথম খেলা বোম্বাইয়ের ওরকে মিলসের সঙ্গে গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হলেও দ্বিতীয় খেলায় ৪-০ গোলে জয়ী হয়ে ফাইনালে ওঠে। ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে হাবিবের একমাত্র গোলে পরাজিত করে মফতলাল মিলস দলকে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ছিল গোলশূন্য।

একলব্য

শীতের ক্রিকেট অতিথি (১১)

ভারতের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ইংলন্ডের অ্যালেক বেডসারের ৪৬ রানে ৭টি উইকেট দখলের কথাও স্মরণে আসছে। কিন্তু সত্যিই জীবনের প্রথম টেস্টে আর কেউই ব্যাটে-বলে লিভারের মত এমন দ্বৈত কীর্তি অর্জন করতে পারেন নি।

ভারত সফরে লিভার এম সি সি দলভুক্ত হয়েছেন মুখ্যত পেস বোলার হিসাবে। ব্যাটে যাদের নাম নেই এমন বোলাররা অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাল রান পেয়ে থাকেন। যেমন আগে পেয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়েস হল। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আমাদের বেদী'র ব্যাটিংও উল্লেখের দাবী রাখে। কিন্তু কোন্ বোলার জীবনের প্রথম টেস্টে ব্যাটিং-এ এমন পরিমার্জন দেখিয়েছেন? তাও বিশ্বখ্যাত বাঘা বাঘা স্পিনারের বিরুদ্ধে? পৌনে তিন ঘন্টা

জন লিভার ফটো: অলক মিত্র

এম সি সি-র দুই ফাস্ট মিডিয়াম বোলার জন লিভার ও ক্রিস ওল্ড-এর দৈহিক গঠন একই ধরনের। মাথায় প্রায় সমান উঁচু, দুজনেরই দোহারা গড়ন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। দুজনেই ওপেনিং বোলার। কিন্তু একদিক দিয়ে পার্থক্যটা সহজেই চোখে পড়ে। লিভার ডান হাতের ব্যাটসম্যান, বাঁ হাতের বোলার। ওল্ড বল করেন ডান হাতে, ব্যাট করেন বাঁ হাতে।

এসেক্সের খেলোয়াড় জন কেনেথ লিভার টেস্ট না খেলেই ভারতে এসেছিলেন। কাউন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান ছিল ১৯৭০ সালে গ্লামোরগানের বিরুদ্ধে ৯১। শ্রেষ্ঠ বোলিং অ্যাভারেজ ছিল ১৯৭১-এ সামারসেটের বিরুদ্ধে ৯০ রানে ৭ উইকেট। ১৯৭০ মরসুমেই এসেক্সের টুপি পাকাপাকিভাবে মাথায় উঠেছিল। তারপর ছয় মরসুমের সামগ্রিক ভূমিকাও চৌকস খেলোয়াড় হিসাবে চোখে পড়ার মত নয়। ভারতে আসার আগে এ বছর ইংলিশ মরসুমে করেছিলেন মাত্র ১৭৮ রান। গড় ১২·৭১। অবশ্য ২৭·২৭ গড়ে উইকেট পেয়েছিলেন ৭০টি। কিন্তু প্রতিনিধিমূলক খেলায় বিশেষ কিছু করতে পারেন নি।

আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার কথাই বলছি। টেস্ট খেলার জন্য কয়েকবার ও'র নাম উঠে চাপা পড়ার পর নির্বাচকরা একদিনের দুটি আন্তর্জাতিক খেলায় ও'কে চান্স দিলেন। কারবরোর ম্যাচে কিছুই করতে পারলেন না। তবে বার্মিংহামের ম্যাচে কিছুটা চমক সৃষ্টি করেছিলেন বইকি। খেলার দ্বিতীয় এবং নিজের প্রথম ওভারেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের রয় ফ্রেডারিকস ও ভিভিয়ান রিচার্ডসকে। সম্ভবত ওই সাময়িক চমকই ভারত সফরে ও'র অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে নির্বাচকদের কিছুটা প্রভাবিত করে থাকবে।

কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল জীবনের প্রথম টেস্টে জন লিভার ব্যাটে-বলে অসাধারণ দক্ষতার নজিরে "ম্যান অব দি ম্যাচ"-এর সম্মান পাবেন? দিল্লির প্রথম টেস্টে ও'র ৫৩ রান এবং ৭০ রানে ১০টি উইকেট দখল স্মরণীয় ঘটনা হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

কারো কারো অবশ্যই চোখ ধাঁধানো কৃতিত্বের নজির আছে। যেমন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার বব ম্যাসী জীবনের প্রথম টেস্টে পেয়েছিলেন ১৬টি উইকেট। প্রথম টেস্ট আবির্ভাবে সেঞ্চুরিকারীদের তালিকাটাও কম বড় নয়। কিন্তু প্রথম টেস্টে ব্যাটে-বলে এমন সাফল্যের নজির বোধ হয় আর নেই। মনে পড়ছে ১৯৬৫ সিরিজে ইডেন টেস্টে নিউজিল্যান্ডের ব্রুস টেলর সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং ৮৬ রানে নিয়েছিলেন ৫টি উইকেট। ১৯৪৬ সিরিজে

উইকেটে ছিলেন। তার মধ্যে একটিও চান্স দেননি।

অথচ এই এম সি সি দলের চারজন পেস বোলারের মধ্যে পর্যায়ক্রমে জন লিভারের স্থান ছিল চতুর্থ। অপর তিনজন ক্রিস ওল্ড, মাইক সেলভি এবং বব উইলিস আগেই টেস্ট খেলেছেন।

বাঁ হাতী সুইং বোলাররা এই কারণেই বেশী সফল হয় যে, ডানহাতী ব্যাটসম্যানের কাছে বল বাঁক নেয় উল্টোভাবে। আউট সুইং হয় ইনসুইং, ইনসুইং হয় আউট-সুইং। সম্ভবত এই কারণেই অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার অ্যালান ডেভিডসনের বলে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানরা বিপাকে পড়েছে। ন্যাটা পেসারের সুইং বলে তাক রেখে ব্যাট চালানো সত্যিই শক্ত। সুইং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা তো সর্বজনবিদিত। প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতের বিরুদ্ধে না হয়ে অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হলে লিভার কি এত সফল হতে পারতেন? ধরে নিচ্ছি পারতেন না। কিন্তু চোখের সামনে দেখছি যাঁদের বিরুদ্ধে পেরেছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁরা প্রথম সারির ব্যাটসম্যান। সকাই নয়। গাভাসকার এবং বিশ্বনাথ অবশ্যই। ১৬টি বলে মাত্র ৩ রান দিয়ে এক সময়ে ৪টি উইকেট লাভ এবং শেষ পর্যন্ত উইকেট পিছু ৭ রান দিয়ে ম্যাচে ১০টি উইকেট দখল অসাধারণ কৃতিত্ব।

লিভারের জন্ম ইলফোর্ডে, ১৯৪৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। এসেক্স কাউন্টিতে খেলতে শুরু করেন ১৯৬৭ থেকে। পাকাপাকিভাবে প্রথম একাদশে উঠে আসেন ৭০ সালে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড় কিথ বয়েসও খেলেন এসেক্সে। দুজনে আক্রমণের সূচনা করে থাকেন। ১৯৭৩ মরসুমে দুজনেরই চোট-আঘাত লাগায় কাউন্টি লীগে এসেক্সের স্থান চলে যায় নীচের দিকে এবং প্রতিশ্রুতিবান বোলার হিসাবে লিভারের ভাবমূর্তিও ছোট হয়ে যায়। ওই মরসুমে এসেক্সের মিডিয়াম ফাস্ট বোলার স্টুয়ার্ট টার্নার যেখানে পেয়েছিলেন ৬৮টি উইকেট সেখানে ফাস্ট মিডিয়াম লিভার পেয়েছিলেন মাত্র ২৯টি। কিন্তু পরের মরসুম থেকে আবার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে আরম্ভ করলেন।

ইংলন্ডের আর এক ফাস্ট মিডিয়াম বোলার, ১৭টি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ল্যাংকাশায়ারের পিটার লিভারের সঙ্গে জন লিভারের পার্থক্য প্রথম জনের রান আপ ছন্দহীন, দ্বিতীয় জনের রান আপে গতির ছন্দ। লেংথ, লক্ষ্য এবং নিশানাও প্রশংসা করার মত। জন ফিল্ডার হিসাবেও পোক্ত। বিশেষ করে আউটফিল্ডে

মুকুল

অরণ্যদেব লী ফক

সপ্তদশ শতাব্দীর অরণ্যদেব-কাহিনী।
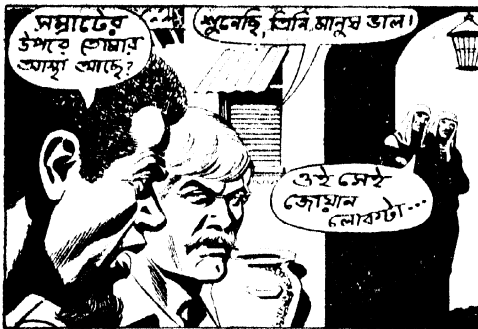
গৌতম মুখোপাধ্যায় তনুশ্রীশংকর/**স্বাতী**/ পরিচালনা ঃ অগ্রগামী

রঙ্গজগৎ

দো অনজানে/নবজীবন ফিল্মস

সেনসরের নতুন বিধি প্রয়োগের কিছুটা সুফল দেখা দিতে শুরু করেছে হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে। মাত্র কিছুদিন আগেও আমরা কমার্শিয়াল হিন্দী ছবি বলতে বুঝতাম একটি উদ্ভট কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত গোটাকয়েক ফাইট, একাধিক ধর্ষণ, দীর্ঘস্থায়ী চেজিং, কম-বেশি নৃত্যসহযোগে প্রায় ডজনখানেক গান, অসহ্য প্যাচপেচে আবেগ, এবং কিছু বীভৎস বিভীষিকা। সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ সেকসের সুড়সুড়ি। সুখের বিষয় এখন চাকা কিছুটা ঘুরতে

চলচ্চিত্র

শুরু করেছে। যদিও সত্যিকারের ফিলম বলেত যা বোঝায় সে জায়গায় পেঁছতে এই সব কমার্শিয়াল ছবির এখনো বেশ কয়েকশো মাইল বাকি।

চাকা যে কিছুটা ঘুরেছে তার প্রমাণ দুলাল গুহর সাম্প্রতিক ছবি "দো অনজানে"। কাহিনীটি যদিচ আবেগসম্পৃক্ত (রচনা ঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত) কিন্তু সে আবেগ বল্গাহীন নয়, বেশ সংযত এবং সুশৃঙ্খল। নবেন্দু ঘোষের চিত্রনাট্যে আবেগের অংশ যেমন সুনিয়ন্ত্রিত, তেমনি ঘটনার গতি দ্রুত, কিছু কিছু সংলাপ বেশ বুদ্ধিদীপ্ত, এবং স্বামী-স্ত্রী-পুত্রের সম্পর্কটি যেমন বাস্তবোচিত তেমনি মধুর রসে সমৃদ্ধ। তবে ছবির সব ঘটনাই বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। যেমন পথের উপর আহত অমিতাভ বচ্চনকে দেখেই এক সন্তানহারা দম্পতির (প্রদীপকুমার ও ঊর্মিলা ভাট) অপত্য-স্নেহে জরজর অবস্থা। ওদের সন্তান হিসেবে বসবাস করতে তাকে রাজী করানোর ঘটনাটি। ওদের সন্তান সেজেই অমিতাভ তার বন্ধুর (প্রেম চোপড়া) উপর প্রতিশোধ নিয়েছে— যে বন্ধু তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে তার স্ত্রীকে (রেখা) করে তুলেছে অভিনেত্রী এবং তার একমাত্র সন্তানকে দার্জিলিং-এর স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে প্রায়-নির্বাসনে পাঠিয়েছে। অমিতাভর ওই প্রতিশোধ গ্রহণে চিত্রনাট্য তাকে উদার হস্তে সহযোগিতা করেছে। যথা ঃ কোটিপতি প্রদীপকুমারের অর্থ সে যথেচ্ছভাবে ব্যয় করতে পেরেছে, সে যে মুহূর্তে যেমন যেমন ইচ্ছা করেছে ঠিক তেমন তেমনই ঘটেছে। এবং তাকে কদাচ তেমন বিপদের মুখে পড়তে হয়নি। এমন কি দার্জিলিং থেকে ছেলেকে নিয়ে যাবার জন্যও তাকে বিশেষ কোন কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। তার ইচ্ছাপূরণের ঘটনাগুলি অতি সহজেই ঘটে গেছে।

ছবির ওই সব অংশ রোমাঞ্চকর, চাতুর্যমণ্ডিত এবং হৃদয়স্পর্শী সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিচালকের ভাল কাজের নিদর্শণ আছে অমিতাভ ও রেখার দাম্পত্যজীবনের অংশে। অপেশাদার

শিল্পী রেখার নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে অমিতাভ তাকে বিয়ে করতে চায়নি, মুগ্ধ হয়েছিল তার সৌন্দর্যে। রেখা অতি সাধারণ মেয়ে। অর্থ, সুখ সমৃদ্ধির লালসা তার প্রবল। একজন সাধারণ কেরানী অমিতাভ তাকে সাধ্যমত সুখী করতে চেষ্টা করেছে। সংসারে পূর্ণ সচ্ছলতা ছিল না কিন্তু পরিপূর্ণ ভালবাসা ছিল। ওদের এই সাংসারিক জীবনের ভাল-মন্দ, ঝগড়া-বিবাদ, মান-অভিমান ইত্যাদি সব কিছুই পরিচালক দেখিয়েছেন জীবনেরই মত করে। ছোট্ট দু-চারটি সংলাপ, সামান্য কিছু অভিব্যক্তি, দু-একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস, কিংবা নিঃশব্দ কয়েকটি মুহূর্তের মধ্য দিয়ে জীবনের অনেক গভীর কথা দর্শকের গোচরীভূত করে দিয়েছেন তিনি। অমিতাভ যে একজন কত বড় অভিনেতা তার প্রমাণ আমরা আরও একবার পাই। শুধু ওখানেই কেন, সারা ছবি জুড়েই তো তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় ছড়িয়ে রয়েছে। আর আশ্চর্য, এ-ছবির রেখা যেন এক আলাদা অভিনেত্রী। কে বলবে ইনিই সেই হাস্য লাস্য এবং কটাক্ষময়ী দেহসর্বস্ব এক অভিনেত্রী। ভাবতে অবাক লাগে এতদিন এঁরা আবিষ্কৃত হননি। কেন? এই সব দেখে শুনে নতুন সেনসর ব্যবস্থাকে আরো বেশি করে স্বাগত জানাতে ইচ্ছে করে।

ছবি শেষ হয়েছে খলনায়ক প্রেম চোপড়াকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে এবং অমিতাভ, রেখা ও তাদের পুত্রকে একসাথে মিলিয়ে দিয়ে। ঘটনাস্থলে তখন প্রদীপকুমার এবং ঊর্মিলা ভাটও উপস্থিত। খুব মামুলি একটি সমাপ্তি সন্দেহ নেই। তবে তার আগে দার্জিলিংয়ে অমিতাভ এবং তার পুত্রের মধ্যে বোঝাপড়ার যে দৃশ্যপর্যায় সেটা ছবির একটি উজ্জ্বল অংশ। এস রাজ রামের ক্যামেরা, কল্যাণজী-আনন্দজীর আবহসংগীত এবং অমিতাভ ও শিশু শিল্পীটির (পার্থ গুহ কি?) আশ্চর্য অভিনয় যেসব মুহূর্তের সৃষ্টি করল তার যেন তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। বস্তুত কল্যাণজী-আনন্দজী রচিত এমন চমৎকার আবহ-সংগীত তাঁদের আর কোন ছবিতেই পাওয়া যায়নি। ছবির গা[illegible]ের সুরও বেশ ভাল এবং গাও[illegible] দার্জিলিংয়ের ওই অংশে স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে অভি ভট্টাচার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তিনি রীতিমত দরদ দিয়ে প্রকৃত দার্শনিকের মতই অভিনয় করে গেলেন। বাঙালী চিত্র-পরিচালকের এক সিরিও-কমিক চরিত্রে উৎপল দত্ত আবার একবার জানিয়ে দিলেন যে এই ধরনের ভূমিকায় তিনি এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বরং এই টিমের সঙ্গে প্রেম চোপড়াকেই একটু বেমানান লাগে। তিনি যেন ছকে ফেলা ভিলেনের মতই অভিনয় করে গেলেন। কিন্তু চরিত্রটি তো তা নয়।

ছবির শেষের দিকে কিছু কান্নাকাটি করা ছাড়া রেখার যেন আর কিছু করার ছিল না। চিত্রনাট্য তাঁকে এক বুক অভিমান

দিয়ে অভিমানী করে তুলতে পারত। তাহলে চরিত্রটির প্রতি সুবিচার করা হত। সে তো আর স্বেচ্ছায় অভিনেত্রীর জীবন বেছে নেয় নি। সে প্রেম চোপড়াকে চিনতে ভুল করেছে সেটা সত্যি, কিন্তু অমিতাভর প্রতি তার ভালবাসার অভাব ছিল কি? তবে চিত্রনাট্য যতই অকরুণ হোক, দর্শকের করুণা থেকে রেখা কিন্তু বঞ্চিত হন না। তার জন্য দুঃখ তাঁরা ঠিকই বোধ করেন।

—রবি বস

[illegible]

১৯৭৬ শেষ হতে চললো। এ-বছর আমাদের দুর্ভাগ্য সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে কোনো ছবি পাইনি। এবং মৃণাল সেন ছবি করেছেন হিন্দি ভাষায় (মৃগয়া)। মৃণাল সেনের ছবিটি যদি বাংলায় হতো, টালিগঞ্জের পান্তাভাতে অন্তত টাকনা দেয়ার মতোও কিছু জুটতো। সত্যজিতের অনুপস্থিতি ও মৃণাল সেনের হিন্দি ছবি, এই যুগ্ম ঘটনার ফলে আমরা টালিগঞ্জের কাছে এ-বছর যা পেলাম তাতে আর যাই করি না কেন বাংলা-ছবির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার ধৃষ্টতা যেন না দেখাই।

আমরা জানি, টালিগঞ্জের উঠোন সব সময়েই বাঁকা। সেখানে না আছে ভালো ক্যামেরা, না আছে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। কিন্তু আমরা যেটা জেনেও না-জানার ভান করি তা হলো, পরিচালনার সব মুদ্রাগুলিও আমাদের অধিকাংশ পরিচালকদের আয়ত্তে নেই। তাঁদের ছবিগুলো তাঁরা যা করতে চেয়েছিলেন সেটা শেষপর্যন্ত হয়ে উঠলো না এই কারণে যে টালিগঞ্জে তার সুযোগ ছিল না—এ-কথাটা ঘুরে ফিরে আমাদের জানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু যতটুকু সুযোগ ছিল তাতে পৃথিবীর সেরা ছবিদের একটি টালিগঞ্জে এখনো তৈরি হতে পারে, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যেহেতু প্রায় প্রতি বছরই অন্তত একটি করে চূড়ান্ত মাপের ছবি সেখানে তৈরি হচ্ছে।

সুতরাং ১৯৭৬-এর টালিগঞ্জীয় উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি তা হলো টালিগঞ্জে এই মুহূর্তে যে-জিনিসটির অভাব সেটি সেখানকার বাঁকা-উঠোনকে সোজা করে নেবার মতো প্রতিভা। এবং শুধু তাই নয়, টালিগঞ্জ এতদূর নতুন উদ্যম ও রীতির বিরোধী যে, সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রতিভার বিশালতা ছাড়া সেখানে চলতি-পথের বাইরে পা-ফেলে প্রায় টেঁকাই যায় না। পূর্ণেন্দু পত্রীর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা থেকে আমাদের এ-ধারণা আরও স্পষ্ট হয়।

এ-বছরের কয়েকটি বাংলা ছবিকে বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে যে টালিগঞ্জে বছরের পর বছর সিনেমার নামে যে-সব মাল তৈরি হচ্ছে তা আদৌ সিনেমা নয়। ছবি চললে এবং কথা বললেই সিনেমা হয় না। বাঙালী দর্শককে কিন্তু 'বিশুদ্ধ এনটারটেনমেনট'-এর নামে বছরের পর বছর দেখানো হচ্ছে এই অশুদ্ধ চলচ্চিত্র। এবং বোঝানো হচ্ছে, এরই নাম কমার্শিয়াল মুভি, এবং এর বাইরে যা-কিছুই তৈরি হয় সেগুলো নিতান্ত অ্যামেচারিশ, একেবারেই ধোপে টেঁকে না।

এবার দেখা যাক তথাকথিত কমার্শিয়াল ছবিগুলিই বা কোন ধোপে কেমন টেঁকে। প্রথমে নেয়া যাক 'অগ্নিশ্বর' ছবিটি। প্রথম ত্রুটি, স্ট্রাকচারাল দুর্বলতা। দৃশ্যের পর দৃশ্যে আমরা বুঝতে পারি—ছবিটিকে কোনো রকমে ঠেলে ঠেলে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবিটিতে সিকোয়েনস-এর সঙ্গে সিকোয়েনস-এর কোনো রিদমিক বা ছান্দিক আত্মীয়তা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক উগ্রভাবে নাটকীয় এবং পুরোনো-ফরমুলার শিকার। দ্বিতীয় ত্রুটি, উত্তম-কুমারের অভিনয়। ছবিটির প্রথমাংশে তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের অভিনয়ে একটা বড়-রকমের অসঙ্গতি পীড়াদায়কভাবে প্রকট হয়ে উঠে আমাদের বলে দেয় যে ছবিটিকে উত্তমকুমার নিজের খেয়াল মতো চালিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁর ওপর পরিচালকের কোনো প্রভাবই ছিল না। তৃতীয়ত. ছবির ফটোগ্রাফি এতো নীচু-পর্যায়ের যেখানে সিকোয়েনস-এর সঙ্গে সিকোয়েনস-এর কোনো রকম টোনাল পার্থক্য পর্যন্ত চোখে পড়ে না। বোঝা যায় পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ব্যস্ত মানুষ, কোনো দৃশ্যে আলোর নুয়ান্স বা সূক্ষ্মতা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাঁর নেই। চতুর্থত, ছবিটির দুর্বলতা ছবিটির কাহিনীর মধ্যে। এমনি অতি-নাটকীয় কাহিনী নিয়ে ছবি করলে সেটিকে ইনটেলেকচুয়ালি গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উত্তমকুমার এবং অন্যান্যরা/রজবুলি/পরিচালনা : পীযূষ বসু ফটো : দেশ

এর পর আসা যাক, হারমোনিয়াম-এ। এ-ছবিরও প্রধান দুর্বলতা ছবিটির গঠনে। একাধিক কাহিনীকে একটি হারমোনিয়ামকে ঘিরে চিত্রায়িত করা হয়েছে। কিন্তু এই হারমোনিয়াম-এর তথাকথিত সিমবলিক যোগসূত্রটি ক্রমেই আমাদের চোখে দুর্বল হয়ে ওঠে। এবং আমাদের ক্রমাগত মনে পড়তে থাকে, ঐ একই জ্যাঁ-এর ছবি ইয়েলো রোলস রয়েজ-এর কথা। ছবির দ্বিতীয় দুর্বলতা, ছবির চিত্রনাট্য। এটি এতদূর অপলকা এবং ফাঁপা যে এমন অনেক ঘটনা দিয়ে এবং দৃশ্যগুলিকে টেনে টেনে ছবিটিকে ভরানো হয়েছে (যাকে বলে প্যাডিং) যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয় দুর্বলতা, ছবিটিতে গানের ব্যবহার। বলা হয়েছে ছবিটি মিউজিক্যাল। ছবিতে গান বেশি থাকলেই মিউজিক্যাল হয় না। তাহলে সব হিন্দি ছবিই মিউজিক্যাল-এর পর্যায় পড়তো। 'মাই ফেয়ার লেডি' বা 'সাউন্ড অফ মিউজিক'-এর গঠন থেকে অন্তত এইটুকু আন্দাজ করা যায় যে একটি মিউজিক্যাল-এর গঠন ও পরিবেশ ঠিক কেমন হবে।

এর পর আর যে-সব ছবির নাম মনে আসছে সেগুলি হলো, দত্তা, হোটেল-স্নো-ফকস, বাঘবন্দি খেলা, বহ্নিশিখা, দম্পতি, আনন্দমেলা প্রভৃতি। ছবিগুলি প্রসঙ্গে একটিমাত্র বক্তব্য এই যে, এগুলি দেখে আমার যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল। এবং মনে মনে নিশ্চিত হয়েছি যে আরো অনেকদিন এমনি যন্ত্রণা আনন্দের নামে আমাদের পেতে হবে, যতদিন না টালিগঞ্জে একেবারে

ওলোট-পালোট করার মতো নতুন কিছু ঘটছে। মধ্যে মরীচিকার মতো চিকচিক করে উঠেছিল 'অসময়' এবং 'সংসার সীমান্তে' দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম। ১৯৭৭-এ টালিগঞ্জের কাছে আরো কত যন্ত্রণা প্রাপ্য আছে কে জানে। যে-হিমালয় থেকে প্রতি বছর আমাদের তৃষ্ণার জল এসে পৌঁছয় তাঁর বিপুল সম্ভাবনা তো আগামী বছরের জন্যে ভিন্ন ভাষায় প্রবাহিত। তরুণ মজুমদারের আগামী ছবি 'বালিকা বধূ'ও হিন্দিতে। আর মৃণাল সেন—তিনি কি নতুন বছরে বাংলা ছবি করবেন? তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের একমাত্র আর্তি—মৃণাল-বাবু, আমাদের অক্সিজেন-এর বড় দরকার।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবির শুটিং দেখা নিঃসন্দেহে বিরক্তিকর, কিন্তু সেটে যদি অশোককুমার থাকেন তবে সেটা অবশ্যই ব্যতিক্রম। গাম্ভীর্যের সঙ্গে রসিকতার সংমিশ্রণে একটা হাল্কা হাওয়ার লঘু পরিবেশ তিনি সৃষ্টি করে আসছেন সেই ১৯৩৬ সাল থেকে—যখন তিনি প্রথম অভিনয় করতে আসেন। এবারের ঘটনাস্থল নবরঙ স্টুডিওজ—যেখানে শক্তি সামন্ত শুটিং করছেন তাঁর দ্বিভাষী ছবি—বাংলা 'ডাক্তার' এবং হিন্দী 'আনন্দ আশ্রম'-এর। দ্বিভাষী ছবির চিত্রগ্রহণের নিয়ম হল সাধারণত একই সেটে একই কমপোজিশনে একটির পর একটি ভাষায় দৃশ্যগ্রহণ।

দৃশ্যগ্রহণের সময় বার বার সেটের দরজা খোলা-বন্ধ নিয়ে অশোককুমার মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করছিলেন। পরে দারোয়ানকে স্পষ্টই নির্দেশ দিলেন যেন কোনক্রমেই বাইরের কারুর জন্যে দরজা খোলা না হয়। কিন্তু তার এক মিনিট পরেই ব্যাপারটি ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ রাগত ভাবেই চিৎকার করে উঠলেন অশোককুমার। এবং অতঃপর সবিস্ময়ে অশোককুমার দেখলেন যে যাঁর জন্যে দরজা খোলা হয়েছে তিনি আর কেউ নন, তাঁরই সহধর্মিণী শ্রীমতী শোভা গাঙ্গুলি।

গীতা দে, তপন দত্ত, চিরঞ্জিৎ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়/সোনায় সোহাগা/পরিচালনা : রঞ্জন মজুমদার

সেদিনের দৃশ্যটি নেওয়া হচ্ছিল অশোককুমার এবং তাঁদের বাড়ির পুরনো চাকর রূপে অসিত সেনকে নিয়ে। অশোককুমার সেই দৃশ্যে মুশকিলে পড়লেন বাংলা 'জবদ' শব্দটির হিন্দী প্রতিশব্দ নিয়ে। অনেকগুলি মাথা অনেকক্ষণ খুঁজে পেতেও জব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ পেলেন না। তখন পুরো বাক্যটিকে হিন্দীতে অন্যভাবে সাজানো হল। অসিত সেনও মুশকিলে পড়েছিলেন যখন বাংলা 'বাবা বিশ্বনাথ' শব্দটিকে হিন্দীতে 'বাবা জগন্নাথ' করে দেওয়া হল। উনি হিন্দীতেও বাবা বিশ্বনাথ বলে ফেলছিলেন বার বার।

এরপর পরিচালক শক্তি সামন্ত এবং ফটোগ্রাফার অলোক দাশগুপ্ত যখন পরবর্তী দৃশ্য নেবার তোড়জোড় করছেন তখন অশোককুমার হঠাৎ মিস্টার প্যাটেলকে ডেকে পাঠালেন। যখন সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন মিস্টার প্যাটেলটি কে তাই নিয়ে, তখন মেক-আপম্যান আশুবাবু একটি থ্রোট-স্প্রে নিয়ে হাজির হলেন অশোককুমারের সামনে। ওই স্প্রেটির নামই মিস্টার প্যাটেল। অশোককুমার বললেন, প্রত্যেকটি জিনিসের একটি করে ডাকনাম থাকা উচিত। যেমন তাঁর পোষা কুকুরের ডাকনাম ব্রুটাস। পুরো নাম ব্রুটাস গাঙ্গুলি।

সেদিনের সেটে উত্তমকুমার ছিলেন না। জানা গেল তিনি দিন দুই বাদে বোম্বাই আসবেন। বোম্বাই আসা-যাওয়ার ব্যাপারে উত্তমকুমার প্লেনের থেকে ট্রেনই পছন্দ করেন বেশি। কিন্তু তাঁকে তো এখন ঘন ঘন বোম্বাই আসতে হবে। কারণ চারখানি ছবিতে তিনি সই করেছেন। ট্রেনে যাতায়াতে যে সময় নষ্ট হয় তেমন নষ্ট করার মত সময় কি তিনি হাতে পাবেন আর!

—সুরঞ্জন

নাটক

প্রতীকস্য রজনী কথা

কলিকাতার প্রতীক সম্প্রদায় এই অতি আধুনিকতার যুগে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' উপন্যাসের নাট্যিকৃত রূপ মঞ্চস্থ করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। হায়, যদি দুঃসাহসেই ভর করিলেন তবে পরিশ্রমী হইলেন না কেন? যদি পরিশ্রমই করিলেন তবে তাহার সহিত চিন্তা যুক্ত হইল না কেন? যদি চিন্তাই থাকে তবে তাহা বুদ্ধিরহিত হইল কেন? যদি বুদ্ধিই থাকে, তবে তাহা শিল্প-সৌকুমার্যে বায়িত হইল না কেন? কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা লইয়া পরিতাপ বৃথা। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই লওয়া যাইতে পারে যে, দুরূহ প্রয়াস মাত্রেই অভিনন্দনীয় নহে।

নাট্যরূপকার নির্দেশক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু আয়াসে কাহিনীকে নাট্যিক করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু 'মজাইলা স্বর্ণলঙ্কা, মজিলা আপনি'। প্রথমেই একটি পশ্চাৎ প্রেক্ষণ (প্রতীচ্যে যাহা 'ফ্ল্যাশব্যাক' নামে বিদিত) নাটকীয় উৎকণ্ঠার মূলে প্রারম্ভেই কুঠারাঘাত করিল। গোপালের সহিত রজনীর বিবাহ সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত বিবরণ গোপাল সহধর্মিণী চাঁপার মুখে সবিস্তারে ব্যক্ত, অপিচ গোপালের বাটির একটি দৃশ্য অবান্তর সংযোজনা। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে

প্রকাশিত 'রজনী'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন উপন্যাসে চরিত্রের মুখ দিয়া কথা বলানের সুবিধা অনেক। ইহা নতুন নহে। উইলকি কলিন্স-এর উওম্যান ইন হোয়াইট গ্রন্থে ইহা প্রথম করা হইয়াছে। এই সুপ্রাচীন রীতির কুশলী প্রয়োগ না হইলে নাটকের ক্ষতি ঘটে। যাহা ঘটিতেছে বহুবার তাহার প্রাক অভাস পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আলো হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেই আমরা আসন্ন ক্লান্তির জন্য আশঙ্কিত হইয়াছিলাম। স্বগত ভাষণ বাহুল্য এই নাটকে বোঝার পক্ষে শাকের আঁটির ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছে।

বঙ্গনা প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত এই নাটকে আলোক নিয়ন্ত্রণ বড়ই মনোরম হইয়াছিল বাবু কনিষ্ক সেনের দক্ষতায়। মঞ্চসজ্জাকর শ্রীযুক্ত সুরেন চক্রবর্তী প্রভৃত যত্নে বিগত শতাব্দীতে ফিরিতে সাহায্য করিয়াছেন। যদিও রামসদয়ের অন্তঃপুর মোগল হারেমের অনুরূপ, প্রভেদ শুধু কেদারা সংস্থাপনে। রজনীর কক্ষে লণ্ঠন ও হুঁকাটি শুধুই মঞ্চসামগ্রী। সন্ধ্যার দৃশ্যেও লণ্ঠন জ্বলে নাই। রজনীর পূজনীয় পিতৃদেব কখনই হুঁকায় তাম্বাকু সেবন করেন নাই। আবক্ষ বর্মায়িতা সর্বক্ষণই নানা রাগিণীর চর্চা করিয়াছেন, স্বল্পেই থামিয়াছেন (পূর্ণেন্দু রায়)।

এতদ্দেশে প্রাচীন চরিত্রের পরিচ্ছদ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অবলোকন করিয়াছি কিন্তু মদীয় পূর্বপুরুষে প্রাচীন যাত্রার ঢংয়ে কথা বলিতেন কিনা তাহার প্রমাণ অদ্যাবধি প্রাপ্ত হই নাই। হে দর্শক, কখনও কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে দারার মত আচরণ করিতে দেখিয়াছেন কি? সতীনের আশঙ্কায় ক্ষুব্ধা সতী বুত্রাপি ঘসেটির মত কথা বলে কি অথবা কোন জমিদার কি আলমগীর সদৃশ? অসামান্যা অভিনেত্রী দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সময় বিশেষে ভ্রম হয়—এ কি রামসদয় গৃহিণী 'লবঙ্গলতা' অথবা সাজাহান দুহিতা 'জাহানারা'? মহান ত্যাগী অমরনাথের ভূমিকায় সর্বেন্দু রজনীর কক্ষে চাদর পাতা বিছানার উপর সবুট পদস্থাপনা করিয়া নিজের সাহেবীআনা মাসিয়ে পালীর ন্যায় প্রকট করিলেন। আহা, মধুরে কঠোরে মিশে! রজনীর সর্বেন্দু সম্পর্কে ভাবনা। কখন কেহ শুনিয়াছে, যে কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়া উন্মাদিনী হইয়াছে? সেও কি সম্ভব! সেতার, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি সর্বেন্দু সুকণ্ঠ? শচীন্দ্রের ভূমিকায় মৃণাল মুখোপাধ্যায়ের কাংস বিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে দর্শক মাত্রেই বিরক্ত হইয়াছেন। এই সার্বজনীন অতি অভিনয়ের মধ্যে নাম ভূমিকাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় স্বকীয়তা অম্লান রাখিয়াছেন, ইহাকেই বোধহয় ব্যক্তিত্ব আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

মঞ্চ ব্যবস্থা বড়ই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। রজনী ও চাঁপার কথোপকথনের মাঝে একবার যবনিকা পতন হইল, তাঁহারা বাহিরেই কথা বলিতে লাগিলেন। বুঝিলাম না, ইহা কি ঘর? ইহা কি পথ? পৌষের শীত বড় বিশ্বাসঘাতক। প্রেক্ষাগৃহের সমবেত কাশি দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ে সংক্রামিত হইয়াছিল। তিনি একবার কাশিলেন, দুইবার কাশিলেন, তৎপরে তিনবার কাশিলেন। তৃতীয়বারে অনামনস্ক স্মারক সহায় হইলেন তবে সংলাপের মুখরক্ষা হইল।

প্রতীক সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ, তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফিরিতে প্রণোদিত হইলাম। কিবা অতুলন মহিমা!

—দেবাশিস দাশ শর্মণঃ

নৃত্য

বাঙালী কথকশিল্পী

মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়, ধরুন দেড় দশক আগে, কলকাতার নাচের মহলে খুবই পরিচিত, কিছুটা জনপ্রিয়ও ছিলেন ওঁর প্রথাসিদ্ধ কথক নাচের জন্য। শম্ভু মহারাজের এই গুণবতী শিষ্যা তারপর কলকাতার নাচের রসিকদের কাছে একটা অচেনা মানুষ হয়ে যান। তাঁর দোষ, তিনি এখন শিল্প এবং সাংসারিক কারণে বারাণসীতে বসবাস করেন। মঞ্জুশ্রী এখন মধ্যবয়স্কা, কিছুটা পৃথুলা, কিন্তু কথক নাচে সেই আগের মতই মগ্ন, সিদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত। ওঁর সবচেয়ে বড় অভিমান যে বাংলার সংগীতনৃত্যের আয়োজকরা যখন কথকের আসর বসান তখন ভারি ভারি অঙ্কের ফী দিয়ে ডেকে আনেন ভারতের উত্তরাঞ্চলের নামী নামী শিল্পীদের, কেবল ভুলে যান তাঁদের নিজেদের দেশের এই মেয়েটিকে যে সযত্নে এখনও তাঁর গুরুর শিক্ষার বিশুদ্ধ অনুসরণ করে চলেছেন সহস্র সমস্যার বিরুদ্ধে। "বাংলার বাইরে বহু জায়গায় নাচছি, শুধু বাংলাদেশে ফেরত আসতে পারছি না", বললেন মঞ্জুশ্রী ওঁর ২০ ডিসেম্বরের সাংবাদিক বৈঠকে। "অথচ দেখুন, কী ভাবে অনেক নামী শিল্পীরা কথক নাচটাকেই কমার্শিয়ালাইজ করে ফেলছেন। নাচের শুদ্ধ চরিত্রটা বদলে ফেলছেন খেয়াল খুশি মত!" —এই আফশোসও মঞ্জুশ্রীর।

নব ফাল্গুনী সংস্থার পরিবেশনায় গত ২২ ডিসেম্বরে কলামন্দির বেসমেন্ট হলে মঞ্জুশ্রী নাচলেন শংকর ঘোষের তবলার সঙ্গে। হিসেব এবং তৈরীর কাজে নিপুণ দেখলাম ওঁকে। তিন তালেই বাঁধা

কলামন্দিরে মঞ্জুশ্রী

ছিল ওঁর বেশির ভাগ নিবেদন—ঠাট, আমোদ, গত নিকাশ, গত ভাব, পরণ। কথাকের ভাওতেও ওঁর বিশুদ্ধ অ্যাপ্রোচ প্রশংসা কেড়ে নেয় মানুষের। ওঁর 'মাখন চুরি' ভাও একাধারে ঐতিহ্যবাহী এবং স্বতন্ত্র। এ সমস্ত নাচের প্রথম দিকটায় অবশ্য শিল্পীর কিছু কিছু বিষয়ে জড়তা দর্শকের চোখ এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে শংকরবাবুর তবলায় চমৎকার সংগতের সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নাচ খুলে যায়। শেষের দিকের দ্রুত তটকারে এবং সওয়াল-জবাবে সে নাচ তার চূড়ান্ত সৌকর্য এবং সাবলীলতায় পৌঁছয়।

—শংকরলাল ভট্টাচার্য

সংগীত

রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা

রবীন্দ্রসংগীত এবং নজরুলগীতির যুগ্ম অনুষ্ঠান, যেটি আজকাল "রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা" আখ্যায় ভূষিত হয়েছে এটি কাদের মস্তিষ্কপ্রসূত বা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত জানিনা, তবে এর চেয়ে অসম সংগীতানুষ্ঠান বা রবীন্দ্রসংগীতের অবমূল্যায়ণ আর কিছুতে ঘটাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কতিপয় বিশিষ্ট গানের ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্ট হবার পরমুহূর্তেই যদি "গুলবাগিচায় বুলবুলি আমি রঙীন প্রেমের গাই গজল" শোনা যায় তাহলে বিদগ্ধ শ্রোতার মনোভাব কিরকম হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। অথচ এই ধরনের আসরে এটাই ঘটছে এবং এর প্রশ্রয়ও দেওয়া হচ্ছে।

২২শে ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে ওয়ার্ডস সম্মিলনী পাঠাগারের উন্নতিকল্পে উত্তর সারথী নিবেদিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা এই কারণেই তেমন একটা সার্থকতায় পর্যবসিত হতে পারেনি। প্রেক্ষাগৃহে বিরল শ্রোতার সংখ্যা দেখে মনে হল এই পর্যায়ের অনুষ্ঠান বহু শ্রোতাই মেনে নিতে পারছেন না।

প্রথমে কাজী সব্যসাচী কয়েকটি নজরুলের কবিতা পড়ে শোনালেন। তিনি গলায় যে স্কেল বেছে নিয়েছিলেন তা আবৃত্তির উপযুক্ত নয়। তাঁর কণ্ঠের একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও লালিত্য না থাকলে এই তথাকথিত আবৃত্তি শ্রাব্যস্তরে পৌঁছতো না। তাঁর চাপা গলার উচ্ছ্বাসগুলি আরও বিসদৃশ লেগেছে। রবীন্দ্রনাথের একটি সম্পূর্ণ কবিতার আবৃত্তি করাটা বোধ করি বাহুল্য বোধেই বর্জিত হয়েছে। এর পরে সুমিত্রা সেন কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন। প্রত্যেকটি গানই সুগীত এবং এই আসরের তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিল্পী। তার পরে নজরুলের গান গাইলেন অজয় চক্রবর্তী। তাঁর গলা ভাল তবে কোনও প্রথম শ্রেণীর অনুষ্ঠানে গাইবার মত যোগ্যতায় তিনি উত্তীর্ণ কিনা বিবেচ্য। তথাপি তাঁর অনুষ্ঠান নেহাৎ মন্দ লাগেনি। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল সেটি অনেক পরিমাণে লঘুতর হয়ে গেল। অতঃপর গাইলেন অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। তিনিও নজরুলের গানই গাইলেন, কিন্তু অনুষ্ঠানকে প্রায় বাগানবাড়ির আসরে পরিণত করলেন। "কে বিদেশী" গানটি অনেক ভাল করে গাওয়া যেতে পারত। নজরুলের গানে পঞ্চাশ বৎসর আগেকার শিল্পীদের কণ্ঠে যে অশোভন ম্যানারিজম ফুটে উঠত সেগুলি তিনি বেশ চেষ্টা করে আয়ত্ত করেছেন দেখা গেল। কয়েক বৎসর আগেও এই শিল্পীর সুন্দর সুললিত কণ্ঠে যে বিনম্র পরিশীলিত গান শুনেছি তা একেবারেই তিরোহিত হয়েছে বলে মনে হল। যাই হোক, এই অবস্থা থেকে অনুষ্ঠানকে আবার মর্যাদায় উত্তীর্ণ করলেন শেষ শিল্পী সাগর সেন। তিনি গাইতেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। এই লেখক যতক্ষণ পর্যন্ত ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর গানগুলি মন্দ লাগেনি। তবে একটা কথা বলি, রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রধান গানগুলি পুরো পুরো ছন্দে রেখে গাওয়াই ভাল। শব্দগুলি ঈষৎ থেমে থেমে উচ্চারিত হলে যে আড়ির ভাব আসে তা রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিধিসম্মত নয়। আরও কয়েকটি কথা বলা যেতে পারত, কিন্তু শিল্পীর ক্ষমতা যেখানে সীমিত সেখানে সেটি মেনে নিয়ে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখাই ভাল।

—রাজেশ্বর মিত্র

সিন্ধুপারের পাখি

যুগোশ্লাভিয়ার বিখ্যাত আকাদেমিক চেম্বার কয়ার কোলেগিয়ুম মিউজিকুম রবীন্দ্রসদনে ডিসেম্বর ৬ ও ৭ তারিখে তাঁদের মনোরম আসর উপস্থিত করেছিলেন।

একটি গান ছিল শুধু বাঁশি ও পিয়ানো সহযোগে। বাকি খান কুড়ি গান এই কলেগিয়ুমের তরুণী শিল্পীবৃন্দ শোনালেন বিনা যন্ত্রানুষঙ্গে, এবং বিনা মাইকে। একজন মাত্র পুরুষ অতিথি ছিলেন দ্রামিত্রজে গোলেমোভিক—তাঁর কণ্ঠও ব্যারিটোন।

এই শিল্পীরা দাঁড়িয়েছিলেন দুটো ভাগে : একদিক সোপ্রানো, আর দিকে ভারি কণ্ঠ। অধিকাংশ গানেই ছিল স্বরসংগতি। যে-বিষয়টি আমাদের শ্রবণকে বিস্ফারিত করেছিল তা হচ্ছে যে, কোনো শিল্পীর স্বরক্ষেপে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটেনি। সম্মেলক গানের সঙ্গী হয়েও এই একটি দিকে প্রত্যেকে স্ব-মহিমায় মহীয়ান। এমনতর কঠিন স্বচ্ছ তালিমবদ্ধ সম্মেলক গানের অনুষ্ঠান এদেশে বিরল। লঘু চপল লয়ের সঙ্গে ধ্বনিপ্রধান সুর কিভাবে বিস্তৃত হয়ে যায়—বন্দগানে এই কোলেগিয়ুম তাই দেখাতে পেরেছেন।

এবং কুড়িখানি সম্মেলক গানের প্রতিটিই করতালিমুখর স্বীকৃতি পেয়েছে। কারণ গানের নির্বাচনে বৈচিত্র্য ছিল। লয়ের জন্য চমকপ্রদ ষোড়শ শতাব্দের ইতালিয় মনতিভারদির রচনা, শব্দোচ্চারণ বাদ দিয়ে ধ্বনিতে সুর রচনা ফায়ার ফায়ার, গির্জাগৃহের হিমের মত উনিশ শতকের সারবিয়ান মোকরানজাকের রচনা, আবার পঞ্চদশ শতাব্দের শিলালেখকে সুরে যখন রূপান্তরিত করা হল তখন পিছনে সম্মিলিত কণ্ঠে সরগমের আবহ-সঙ্গী একককণ্ঠে ভি মিলসিক। সামের ভিত্তিতে তৈরি সিং সিং গানটি দীর্ঘায়ত, সুরবৈচিত্র্যে রমণীয়।

দ্বিতীয়ার্ধে বিষয়েরও বৈচিত্র্য ছিল। আনতোলি ওক্ত গানের সঙ্গে ফুলের মত ঘোরা গানটিকে আলাদা একটা মাত্রা দিয়েছিল। লোকসংগীতের চলন টু দ্য স্প্রিং আর সঙস ফ্রম রেভোলুশন গান দুটিতে ; প্রথম গানটি প্রেমসংগীত, বিষাদ সেখানে সহযোগী। ভাল লাগেনি মুসানদ্রার দ্বিতীয় গানটি। বিষয় ছিল পুরনো বাড়ির পরিবেশ—বাণী ছিল না কিন্তু কণ্ঠের কসরতে প্রকৃতিকে নকল করার প্রতিভা অবান্তর মনে হয় ; তেমনি বাচকা প্রদেশের হাসির গানেও সেই স্বরের খেলা—কথায় হয়ত মজা ছিল কিন্তু সুর নিশ্চয়ই সেই মজাকে অনুবাদ করে দিতে পারে না। অতএব এই বিবাহসংগীতেও শুধু স্বরের খেলা দেখেই তুষ্ট থাকতে হল।

অথচ সুর যে কি বিশ্বজনীন সে তো বারেবারেই প্রমাণ হল। একক কণ্ঠে সোপ্রানো স্বেতলানা বোজসেভিকের গলায় কী বিপুল সুর করুণভাবে ঘোরাফেরা করে—উচ্চগ্রামের জন্য মুখবিকৃতি নেই অথচ স্বর স্ফটিকস্বচ্ছ ; সোপ্রানো ভি মিলসিকের কমনীয়তা কম কিন্তু শক্তিমান ; আর ব্যারিটোন গোলেমোভিকের কণ্ঠও গভীর, প্রসন্ন—বিশেষত সম্মিলিত মহিলাকণ্ঠকে প্রেক্ষাপটে রেখে তাঁর গান কী [illegible] পরিবেশ রচনা করেছে! আর আমরা [illegible] সমস্ত অনুষ্ঠানের পরিচালিকা দারিনকা মাতিক-মারোভিকের কাছে। তাঁর উপস্থিতি সুন্দর, তাঁর হাস্য সুন্দর, তাঁর পরিকল্পনা-পরিচালনা একটি সন্ধ্যাকে সুন্দর করে দিল।

—অপ্রতিম বসু

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরা ১০ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদল বসু
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২০-২২৮০
২০-৮৫৪১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	x
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

(লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)

ল্যাক্‌মে

সৌন্দর্যের স্রষ্টা

সৌন্দর্যের সাধনায় ল্যাক্‌মে

daCunha/L. Com/5 c BEN.REV.

দেশ

সূচীপত্র

কেয়ারফ্রী* সুরক্ষা
এখন
৫টি ন্যাপকিনের
এক সুবিধাজনক
প্যাকে
FREE BELT INSIDE
Carefree*
SANITARY NAPKINS
EASILY DISPOSABLE
৫ টাকা
ট্যাক্স আলাদা
পাঁচটি কেয়ারফ্রী ন্যাপকিন, প্রত্যেকটিই
আপনাকে যোগাবে সম্পূর্ণ সুরক্ষা আর নিরাপত্তা।
আপনি দেখবেন অন্যান্য সাধারণ ন্যাপকিনগুলোর পুরো
প্যাকের চেয়ে ৫ টির নতুন সুবিধাজনক
প্যাকই যথেষ্ট—কারণ কেয়ারফ্রী ব্যবহার করলে বার
বার বদলাবার দরকার হবে না।
OBM-7253-BEN
কেয়ারফ্রীঃ আপনি এর জন্য যে মূল্য দেবেন উপকৃত হবেন তারচেয়েও অনেকগুণ বেশী
*স্যানিটারী ন্যাপকিনের ব্র্যাণ্ড। কেয়ারফ্রী এবং জনসন এণ্ড
জনসন হ'ল ইউ. এস.এ-র জনসন এণ্ড জনসন-এর ট্রেডমার্ক.
Johnson & Johnson*

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ দুর্গাশংকর ভট্টাচার্য (১৮৯০—১৯৫৫)

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ 'ধর্মপ্রচার' (ওয়াস ও টেম্পারা—মিশ্র মাধ্যম, ১০২"× ১৪২")—দূরপ্রাচ্যের দ্বীপগুলিতে বুদ্ধের পটচিত্র প্রদর্শন করে শ্রমণ বৌদ্ধধর্ম প্রচার করছেন। উপরে নীল আকাশ আর নীচে সফেন সবুজের তরঙ্গের মাঝে সশস্ত্র উপজাতির আত্মসমর্পণ। বিক্ষোভ ও প্রশান্তির বৈপরীত্য রূপায়িত করেছেন দুর্গাশংকর।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী

শরদিন্দু অম্‌নিবাস

সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হল ॥ দাম ৩০·০০

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, গোয়েন্দা, প্রেম—নানা বিষয় নিয়ে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন। বিষয়বস্তু যেমনই হোক, ঘটনার বিন্যাসে এবং রচনার প্রসাদগুণে শরদিন্দুবাবুর গল্পগুলি সহজেই পাঠকের মন ভরিয়ে দেয়।

'শরদিন্দু অম্‌নিবাস' সপ্তম খণ্ডে তাঁর চুয়াত্তরটি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি প্রধানত দু' ধরনের—প্রেমের গল্প ও সামাজিক গল্প। প্রেমের কাহিনী কখনও রোমাণ্টিক স্বপ্নময় পরিবেশে স্নিগ্ধমধুর, কখনও বা তাতে তিক্ততার আভাস। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত একটি শহর, বন্ধকী দোকানের একটি ছুরি, দিল্লীর এক টাঙ্গাওয়ালা, বন্যাপীড়িত একটি কাঠবেরালি, বিলাসী ধনী যুবকের দামী আঙটি, একটি সর্দার বালকের অ্যাডভেঞ্চার, বড় ঘরের গোপন কথা—এমনি নানা বিচিত্র বিষয় তাঁর সামাজিক গল্পের উপকরণ।

শেষজীবনে লেখা কয়েকটি গল্পে শরদিন্দুবাবু স্মৃতিচারণ করেছেন। সেই কাহিনীগুলিও এই সংকলনে যুক্ত হয়েছে।

'জাতিস্মর' থেকে শুরু করে 'উত্তম মধ্যম' পর্যন্ত শরদিন্দুবাবুর জীবদ্দশায় প্রকাশিত কিশোর ও গোয়েন্দা গল্পগ্রন্থ বাদে অন্যান্য বাইশটি গল্পগ্রন্থের সমুদয় গল্প 'শরদিন্দু অম্‌নিবাস'-এর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে সংকলিত হল।

গ্রন্থশেষে গল্পগ্রন্থগুলির প্রত্যেকটির বিশদ পরিচয় দেওয়া আছে।

'শরদিন্দু অম্‌নিবাস'-এর পঞ্চম খণ্ডে লেখকের অলৌকিক ও হাস্য-কৌতুকরসের যাবতীয় গল্প এবং ষষ্ঠ খণ্ডে সমুদয় ঐতিহাসিক ও কয়েকটি সামাজিক গল্প সংগৃহীত হয়েছে।

॥ শরদিন্দু অম্‌নিবাস-এর অন্যান্য খণ্ড ॥

প্রথম খণ্ড ২৫.০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩০.০০ তৃতীয় খণ্ড ৩০.০০

চতুর্থ খণ্ড ২০.০০ পঞ্চম খণ্ড ২৫.০০ ষষ্ঠ খণ্ড ২৫.০০

বিমল করের উপন্যাস

একা একা ৫·০০

সমরেশ বসুর উপন্যাস

অশ্লীল ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

আত্মপ্রকাশ ১০·০০

সাধনা

মুখোপাধ্যায়ের

রান্নার বই

রান্না করে দেখুন

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্রকাশিত হল
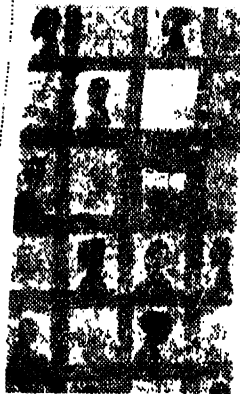
বিমল কর এমন একজন লেখক যাঁর লেখা পড়তে পড়তে প্রতিবারই আমাদের মনে পড়ে, লেখকের কাজ চাটুকারিতা নয়। একজন শিল্পী শুধু ঘটনার বর্ণনা দেন না; পাঠকের অগোচরে ধীরে ধীরে তিনি একটি জগৎ সৃষ্টি করেন। যেখানে কিছু চরিত্র এবং পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো বিহ্বল হয়ে পড়ি। কখনও চিৎকার করে উঠি না নিঃস্ব হয়ে পড়ি।

'দ্বীপ' উপন্যাসের ধ্রুবপদ মজুমদার সাংসারিক অর্থে অসুখী ছিল না, মানসিক অর্থে ছিল। একসময় সে মনে করেছিল সে তার পরিবারের অংশ হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমশ ... বোধ করতে লাগল যে সে আর তার ... দুটো আলাদা ভূখণ্ড। এইভাবে একা ... এবং বিরক্তিকর জীবনযাপন তাকে এ... সময় একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাল, কেন আমি বাঁচব? যে প্রশ্ন আমাদেরও ... করে তোলে—কেন বাঁচব?

বিমল করের লেখার গভীরতা এবং সংযম আলাদা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। চারপাশের নীচুমানের তরল সাহিত্যের থিকথিকে ভিড়ের মাঝে 'দ্বীপ' উপন্যাসটিকে মনে হবে সত্যিই যেন একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ এটি—যার সঙ্গে কোনওরকম সাযুজ্য নেই সমকালের অন্য সব উপন্যাসাবলীর ॥ দাম ৬·০০ ॥

বিমল করের

সৃজনধর্মী নতুন উপন্যাস

দ্বীপ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫ বেনিয়াটোলা লেন ॥ ৬৭এ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০০০৯ ॥ ফোন ৩৪-৪৩৬২

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১২
শনিবার ১ মাঘ ১৩৮৩

মৌলিক সততা

মনস্বী বার্টর‍্যান্ড রাসেলের ধারণা অথবা সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে অতীতের তুলনায় বর্তমানের একটি ক্ষুদ্রতার পরিচয় আবিষ্কার করা যেতে পারে। রাসেল বলেছেন যে, বর্তমান তথা আধুনিক বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রগতির মধ্যে এমন একটি ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়, যার অবস্থাটা অতীতের তুলনায় অনেক দীনতর। এটা হলো, স্থাপত্যের ক্ষেত্র। রাসেলের মতে, আধুনিক স্থাপত্যে অভিনবতার অনেক প্রকাশ থাকলেও, রম্যতার ও গরিমার দিক দিয়ে আধুনিক স্থাপত্য অতীতের তুলনায় খুবই অনুজ্জ্বল। বলা বাহুল্য, গুণী সমালোচক সকলেই রাসেলের এই অভিমতের উক্তিটিকে নিতান্ত নির্ভুল বলে মেনে নেবেন না। কিন্তু বর্তমান স্থাপত্যের ক্ষেত্র না হয় প্রসঙ্গের ও বিচারের বাইরে থাকলো, চারিত্রিক নীতির কোন ক্ষেত্রেই কি আধুনিক নিষ্ঠার মান অতীতের তুলনায় অবনত নয়? এক সংবাদে প্রচারিত বিশেষ একটি তথ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এমন একটি সিদ্ধান্ত করবার যুক্তি অবশ্যই পাওয়া যায় যে, অতীতের সততাই ছিল বেশি প্রশস্ত, বেশি সহজ এবং বেশি খাঁটি। সংবাদে প্রচারিত তথ্য এই যে, ভারতে প্রতি বৎসর অসাধু বিক্রেতারা পণ্যের ওজনে কারচুপি করে অর্থাৎ ন্যায্য ও পূর্ণ মূল্য নিয়েই ক্রেতাকে কম ওজনের পণ্য দিয়ে যে পরিমাণের অর্থ আত্মসাৎ করে, সেটা বিরাট এক প্রবঞ্চনার হিসাব। বলা হয়েছে, বাৎসরিক দেড় হাজার কোটি টাকা এভাবে অসাধু বিক্রেতারা আত্মসাৎ করে থাকে।

জাতির মৌলিক চরিত্রের উপাদান হিসাবে মৌলিক সততার আদর্শ এবং প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়। সামাজিক প্রগতি ও অবনতির তত্ত্ব বিচার করতে গিয়ে অনেক সমালোচকের চিন্তায় একটি ভুলের প্রকোপ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁরা আধুনিকের চিন্তায় ও আচরণে কোন কুসংস্কার কল্পনা করতে কিংবা বিচার করে বুঝতে পারেন না। অথবা এ বিষয়ে তাঁদের চিন্তাতে কোন প্রশ্নই থাকে না। কিন্তু সহজ ও সর্বকালের সর্বজনীন সত্যটি এই যে, যেমন অতীতের জনজীবনে নানা কুসংস্কারের প্রকোপ ছিল, তেমনই আধুনিক জনজীবনেও নানা নতুন কুসংস্কারের প্রকোপ আছে। আর্থিক বিষয়ে সততার ও নিষ্ঠার প্রসঙ্গ যদি উত্থাপিত করা হয়, তবে ধারণা করবার অনেক যুক্তি সহজেই এসে পড়ে যে, এক্ষেত্রে আধুনিক জনজীবনের চারিত্রিক মান অতীতের জনজীবনের চারিত্রিক মানের তুলনায় খুবই অবনত হয়ে গিয়েছে। কথিত আছে যে, শুধু সূর্যকে সাক্ষী মেনে নিয়ে ঋণ প্রদান করবার ও ঋণ নেবার প্রথা ভারতের অতীতে জনজীবনের অনেক অংশে প্রচলিত ছিল। এবং বিদেশী পর্যটক ও ঐতিহাসিকের স্বীকৃতির মধ্যে এই বিস্ময়ের উল্লেখও দেখা যায় যে, অধমর্ণ খাতক কখনও উত্তমর্ণ ঋণদাতার কাছ থেকে গৃহীত অর্থ শোধ করে দিতে ভুল যেতো না কিংবা অস্বীকার করতো না। বিনা দলিলে ঋণ প্রদান করবার প্রথা এখনও বোধহয় ভারতের কোন-কোন 'অতি অনগ্রসর' জনসমাজের ব্যবহারিক জীবনে প্রচলিত আছে। কুসীদজীবী মহাজনেরা গরীব খাতকের কাছ থেকে ঋণের অর্থ আদায় করবার চেষ্টায় অনেক নির্মমতা আচরিত করে, এই অভিযোগ অতীতকালে নিশ্চয়ই একেবারে নীরব ছিল না। কিন্তু সহজ সততার একটি ঐতিহ্যও প্রচলিত ছিল। 'অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি'—কবি ভারতচন্দ্রের সময়ে ভুরাকে চিনির দরে বেচবার কিংবা চিনির সঙ্গে ভুরা ভেজাল দেবার দুর্নীতি ছিল বলে বিশ্বাস করতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন, আর্থিক অসততা তথা দুর্নীতি কতটা ব্যাপক ছিল?

ভারতীয় ক্রেতার জীবনের একটি বড় অভিশাপ এই যে, এক সের অথবা এক কিঃ গ্রাম ওজনের পণ্যবস্তুর জন্য উচিত ও প্রচলিত মূল্য বিক্রেতাকে দিয়েও তাকে কয়েক ছটাক এবং অন্তত এক-দেড়শত গ্রাম কম ওজনের পণ্যবস্তু পেতে হয়। এই নিদারুণ অসততার ঘটনা ও দৃশ্য গোপন অন্ধকারের অলিগলিতে নয়, একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকের ও নৈশ আলোকের উজ্জ্বলতায় ঝলমল হাটবাজার ও বিপণির প্রকাশ্য সম্মুখে প্রতিদিন ঘটে চলেছে। কম ওজনের পণ্য দিলে, কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করলে বিক্রেতাকে শাস্তি দেবার আইন প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ বাস্তব সত্য হিসাবে বলা চলে, এটা 'অপ্রচলিত' আইন। ঠুঁটো আইন, অন্ধ আইন! যে শহরের লক্ষ ক্রেতা প্রতিদিন উচিত দামে কম ওজনের পণ্য পেয়ে থাকেন, অর্থাৎ নিরেট ও নির্মম এক আর্থিক প্রবঞ্চনার শাসন বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিয়ে থাকেন, সে শহরে শাস্তির তথাকথিত প্রচলিত আইনটিকে কি তৎপর হয়ে দিনে অন্তত একটি অসাধু বিক্রেতার বিরুদ্ধে কাজ করতে দেখা যায়? না, আইনের সক্রিয়তা এক্ষেত্রে যেন অদ্ভুত রকমের এক রহস্যের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রয়েছে। ধারণা করবার যুক্তি আছে যে, কম ওজনের পণ্য দেবার দুর্নীতিটা নিশ্চয় কোন সংশ্লিষ্ট পক্ষের দুর্নীতিগ্রস্ত স্বার্থের চাহিদাকে উৎকোচে পরিতুষ্ট করে, জাতীয় জীবনের মৌলিক সততার বনিয়াদ ক্ষত-বিক্ষত করবার পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। দেশহিতের জন্য সুচিন্তাশীল সংঘ ও সংহতির পক্ষে যে-সব মাঙ্গলিক গঠনকর্মবিধির পরিচর্যা দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কম-ওজনের পণ্য দেবার নিদারুণ এক অসততার প্রতিকার সাধিত করবার কোন অধ্যবসায় বিশেষ কোন গঠনকর্মবিধির পরিচর্যা হিসাবে জাগ্রত হতে দেখা যায় না। অনুমান করতে হয়, আর্থিক বিষয়ে চারিত্রিক সততার মান অতীতের তুলনায় আধুনিক কালের জনজীবনে সত্যই অনেক অবনত হয়েছে। উচিত মূল্য নিয়ে কম ওজনের পণ্য বিক্রয় করা ভারতীয় হাট-বাজারের জীবনে যে অসততার প্রতিষ্ঠা কায়েম করে রেখেছে, সেটা ভারতের জাতীয় জীবনের একটি গ্লানি বলে অভিহিত হতে পারে।

বৈদেশিকী

তরুণের বিদ্রোহ

ভারত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপ মরিশাস যখন স্বাধীন হয় ১৯৬৮ সনে তখন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সার শিউসাগর রামগুলোম। ন বছর পরে এখনও তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। তবে আরেকটু হলেই তাকে গদি ছেড়ে বনে যেতে হতো বিরোধীদের প্রধান।। ছিয়াত্তরের উনিশে ডিসেম্বর যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল মরিশাসে তাতে তাঁর ইন্ডিপেন্ডেন্স দল হেরেই গিয়েছিল। সংসদের মোট আসনের অর্ধেকের অনেক কমই শাসক দল পেয়েছিল। তবুও সার শিউসাগরকে ইস্তফা দিতে হয়নি নিরংকুশ গরিষ্ঠতা অন্য কোনও দল পায়নি বলে। অবিশ্যি দুটো বিরোধী দল যদি জোট বাঁধতো তা হলেও তাঁকে বিদেয় নিতে হতো—স্বাধীন মরিশাসে তা হলে এই প্রথম সার শিউসাগর ছাড়া অন্য কেউ প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসতেন। তাঁর জোর বরাত যে, ডিসেম্বরের নির্বাচনে যে দল সব চেয়ে বেশী আসন পেয়েছে তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে দু নম্বর বিরোধী দলটি রাজী হয়নি।

মরিশাস দ্বীপটা এককালে ছিল ফরাসীদের দখলে। তখন তার নামই ছিল আইল দ্য ফ্রাঁস অর্থাৎ ফরাসী দ্বীপ। পরে এটিকে দখল করে ইংরেজরা আর দ্বীপটার নাম পালটে সাবেক নাম মরিশাস বহাল রাখে। কিন্তু ফরাসী সংসর্গের স্বাক্ষর আজও তার বুকে। ভারতবর্ষের বাইরে এই একমাত্র দেশ যেখানে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বেশ কিছু মুসলমানেরও বাস ও দেশে। এরা সবাই প্রায় প্রবাসী ভারতীয়দের বংশধর। খৃীস্টান যারা আছে তাদের বেশীর ভাগই ফরাসী ফিরিঙ্গী তাদের বাপ ফরাসী মা ও দেশী কী ভারতীয় মেয়ে। মরিশাসের ফলাও চিনির কারবার। আখের ক্ষেতে খাটবার জন্যে বিদেশী মালিকরা ভারতবর্ষ থেকে লোক আমদানি করেছিল। তাদের ছেলেমেয়েরাই এখন দেশের বাসিন্দা। দেশ স্বাধীন হবার আন্দোলন তারাই চালিয়েছিল, স্বাধীনতা পাবার পর দেশ চালাবার ভার তাদের ওপরই বর্তেছে। যাদের বাপপিতেমো ভারতবাসী তারাই দেশে স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল। বিরোধিতা করেছিল কিন্তু ফরাসী ফিরিঙ্গীরা, তারা চেয়েছিল মরিশাস চিরদিনই ইংরেজদের উপনিবেশ থাকুক—স্বাধীন হবার দরকার নেই। তাদের কথায় অবিশ্যি ইংরেজরা কান দেয়নি।

পুরো স্বাধীনতা পাবার আগে মরিশাস পেয়েছিল স্বায়ত্তশাসন। সে আমলে সার শিউসাগর রামগুলোম গড়েছিলেন লেবার পার্টি অর্থাৎ শ্রমিক দল। সে দলের সামিল হয়েছিল মুসলিম অ্যাকসান কমিটী অর্থাৎ মুসলিম কর্মপরিষদ। এই দুই নিয়েই গড়ে উঠেছে মরিশাসের শাসক দল ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি অর্থাৎ স্বাধীনতা দল। স্বাধীনতা পাবার আগের বছর যে নির্বাচন হয় মরিশাসে তাতে জিতে মন্ত্রিসভা গড়েন ইন্ডিপেন্ডেন্স দলের নেতা হিসেবে সার শিউসাগর। দিনকতক মন্ত্রিসভায় বিরোধী সোসাল ডেমোক্র্যাট অর্থাৎ সমাজতন্ত্রী গণতান্ত্রিক দলের কিছু লোককেও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শাসক জোটের সঙ্গে তাদের বনিবনা হয়নি এই জন্যে যে তারা বড্ড বেশী ফরাসীঘেঁষা—তারা চেয়েছিল ফরাসীদের মরিশাসে ঘাঁটি বানাতে দেওয়া হোক। তাতে প্রধানমন্ত্রী কী তাঁর অনুগামীরা রাজী হননি। তাই সরকার চালাচ্ছিলেন সার শিউসাগর তাঁর দলবল নিয়ে। ক্ষমতার ভাগীদার তিনি আর কাউকে করেন নি। নির্বাচনও তিনি লড়েছিলেন অন্য কোনও দলকে শরিক না করেই।

দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই মরিশাসে নির্বাচন হয়নি। পুরোনো সংসদই বহাল ছিল তারপরও। তবুও মেয়াদ ফুরোবার কথা ছিল ১৯৭২ সনে। সে বছরও নির্বাচন মুলতুবি রেখে সাবেক সংসদ আর মন্ত্রিসভাই চালু রাখা হয়েছিল। তাদের ভেঙে দিয়ে নির্বাচন হয়েছে ১৯৭৬ সনের ১৯ ডিসেম্বরে। লোকে ভেবেছিল ওটা তো নিয়মরক্ষে মাত্র, ড্যাংড্যাং করে জিতবেন সার শিউসাগর আর দলবল। কিন্তু ভোটারদের মনের কথা কেউ যে আঁচ করতে পারেনি তা বোঝা গেল যখন তাদের রায় জানা গেল। মরিশাস সংসদে নির্বাচনের নিয়মকানুন একটু নতুন ধরনের। সংসদের আসন মোট ৭০ কিন্তু সরাসরি নির্বাচন হয় ৬২টা আসনে। বাকী আটটা পূরণ করেন নির্বাচন কমিশন। তারও নিয়ম আছে। পাঁচমিশেলী জাতের দেশ—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃীস্টান সব ধর্মের লোকেই ও দেশে বাস করে। তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে সংসদে সমতা আনার জন্যেই আটজনকে বাছাই করার ব্যবস্থা। নির্বাচনে যে যে সম্প্রদায় বাদ পড়ে কিংবা কম আসন পায় তাদের মধ্যেই ওই আটটা আসন ভাগ করে দেওয়া হয়।

যে ৬২টা আসনের জন্যে ভোটাভুটি হয় তাতে শ্রমিক দল আর মুসলিম কর্মপরিষদ নিয়ে গড়া শাসক জোট—যার পোশাকী নাম ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি—পেয়েছিল মোটে ২৪টা আসন। তাদের আগের প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী দল পেয়েছে কুল্লে ৮টা। আর বাকী ৩০টা কব্জা করেছিল আনকোরা নতুন একটা দল যার নাম মরিশাসী জঙ্গী আন্দোলন। বাড়তি ৮টা আসনের চারটে পেয়েছে শাসক দল আর চারটে নতুন বিরোধী দল। আর গোটা দুই আসন তারা পেলে গদিতে চেপে তারাই বসতো। অবিশ্যি সমাজতন্ত্রী গণতান্ত্রিক দল তাদের সঙ্গে হাত মেলালেও ক্ষমতা তাদের মুঠোয় আ[illegible]। সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী দল কিন্তু প[illegible] ঝগড়া ভুলে গিয়ে ভিড়ে গেছে শা[illegible] জোটে। নতুন যে মন্ত্রিসভা সার শি[illegible]গর গড়েছেন তাতে [illegible]াঁই পেয়েছেন ও দলের চারজন সদস্য। [illegible]র মানে সংসদে দলের সদস্যদের অর্ধেকই মন্ত্রী। ও না করে সার শিউসাগরের রক্ষে পাওয়ার উপ[illegible] ছিল না।

শাসক দল নির্বাচনে কেবল গরিষ্ঠতাই খোয়ায়নি তাদের দশজন মন্ত্রী হেরে গেছেন। সার শিউসাগর বলছেন, এ সব চক্রান্ত—লোককে ভাঁওতা দিয়ে শাসক দলকে প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কথাটা কি ঠিক? তাঁর ওপর অবিশ্যি ভোটারদের অগাধ বিশ্বাস—অত বেশী ভোট তাঁর মতো আর কেউ পায়নি। কিন্তু তাঁর দলের ওপর লোকের ভক্তি চটে গেছে বিশেষ করে ছেলে ছোকরাদের। ব্যাপারটা যা ঘটেছে তা হচ্ছে তরুণের বিদ্রোহ। মরিশাসী জঙ্গী আন্দোলন যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁরা সবাই তরুণ—তাঁরা চান, সব পালটাতে। বামপন্থী ঢঙে দেশকে পালটে ফেলতে। মরিশাসে যে সাড়ে আট লাখ লোকের বাস তাদের অর্ধেকের বয়েস ১৯ কী তারও নীচে। তারা যে দল বদল চাইবে তা আর আশ্চর্য কী? তারা চায় সব কারবার সরকারের তাঁবে আনতে, আর মরিশাসের ছেলেমেয়েদের কাজের খোঁজে বিদেশ যাওয়া বন্ধ করতে। দুটো ব্যাপারেই শাসক জোটের নীতি উলটো। কিন্তু তরুণদের সঙ্গে আপস না করলে কী সে জোট টিঁকতে পারবে?

দেবরাজ

এক নজরে

যন্ত্রাহার বিহারস্য

ঘটনাচক্র মানুষকে কত অদ্ভুত আবেষ্টনীর মধ্যেই না টেনে নিয়ে যায়! নইলে আমি খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে অনুষ্ঠিত ডাক্তারদের সম্মেলনে যাব কি জন্যে? প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গী কাশীপতিবাবু ধরে নিয়ে গেলেন জোর করে। গেলাম, কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বিদগ্ধ আলোচনায় বুদ্ধি প্রায় ঘুলিয়ে যাবার মত হল আমার। একজন বললেন, মানুষের দাঁতের গঠন দেখলে বোঝা যায়, প্রকৃতি তাকে মাংসাশী করেই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলে সে উদ্ভিজ্জ ও শস্যজাতীয় খাদ্যে অভ্যস্ত হয়েছে। অধিকাংশ রোগই তার মধ্যে এসেছে দানা ও তৃণ পর্যায়ের খাদ্য খাওয়ার বিপাকে। দৈহিক ও মানসিক শক্তি তার অনেক কমেছে আদি মানুষের তুলনায়। অর্থাৎ চাই উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের, তার মানে মাছ মাংস ও ডিমের ব্যাপক প্রচলন। আর একজন তাঁর পোষকতায় বললেন, জন্তুজগতেও দেখা যায় মাংসাশীরা তৃণভোজীদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। প্রথম বক্তা বাঙালী, দ্বিতীয় জন উত্তর প্রদেশী। তিনি থামামাত্র একজন দাক্ষিণী বিশেষজ্ঞ উঠলেন। তিনি বললেন, শুধু প্রোটিনেই পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় না, চাই ভাইটামিন, চাই ক্যালসিয়াম, কারবো হাইড্রেড, ম্যাগনেসিয়াম। অতএব খেতে হবে কাঁচকলা, কচু, কলমি ও পালং শাক। খেতে হবে ডাল, ফলমূল। এক চক্ষু হরিণের মত শুধু মাংসের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। তিনি বললেন, মানুষের শুধু শ্বদন্ত নেই, আছে গোদন্তও এবং তাতেই বোঝা যায় উদ্ভিজ্জ খাদ্যও প্রকৃতির অভিপ্রেত। তাঁর সমর্থক একজন বললেন, হাতী গণ্ডার উট ও মহিষ তৃণভোজী হলেও দুর্বল কি প্রাণী হিসাবে?

সাধারণ শ্রোতা আমরা ফাঁপরে পড়লাম এই দু তরফা পণ্ডিতী তর্কের ফলে। একজন বক্তা কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে জনগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি বললেন, ডাবের জল ও বেদানার ওপর থেরাপিউটিক ভ্যালু বা শরীর কল্যাণাত্মক গুণ আরোপ করা মূঢ়তা। প্রথমটি নিছক বিশুদ্ধ জল, তার বেশী কিছু নয়। দ্বিতীয়টি সুস্বাদু ফল মাত্র। পেঁয়াজ, রসুন, মুসুরির ডাল, পুঁই শাক তাঁর মতে কোন যুক্তিতেই আমিষ পর্যায়ে পড়ে না। তার চেয়ে ছোলা মটর বরং ঢের বেশী প্রোটিনসমৃদ্ধ। শোল গজাড় বোয়াল ঢাই ঘেড়ো প্রভৃতি মাছ এবং কাঁকড়া কচ্ছপ পাতাল ফোঁড় প্রভৃতি মাংসজাতীয় খাদ্যকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রাখার অযৌক্তিকতাও ব্যাখ্যা করলেন তিনি। অপর একজন খাদ্যে কতকগুলি অনিষ্টকর উপকরণ ব্যবহারের নিন্দা করলেন। তিনি বললেন, তেল ও বাটনাই হল যত নষ্টের গোড়া। যে-কোন খাদ্য হয় সিদ্ধ নয় ঝলসান খাওয়া উচিত। প্রয়োজনমত তাতে নুন ঝাল মিষ্টি বা ভিনিগার মিশিয়ে নিলেই হল। ঘটা করে মশলাযুক্ত দম ডালনা ঘণ্ট কালিয়া ইত্যাদি খাওয়ার ফলেই বদহজম ও নিম্ন রক্তচাপ দেশে এমন ব্যাপক হয়েছে। তেল ঘী ও মশলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জেহাদ হাঁকালেন তিনি। আর একজন ফুচকা দহিবড়া আলুকাবলি ভেলপুরী ইত্যাদিকে যুক্ত করলেন ঐ তালিকায়। কল্পলেন চপ কাটলেট ফ্রাই ও কষা মাংসকেও। এছাড়া ফ্রিজ বা ঠান্ডী গারদে রাখা খাবারের বিরুদ্ধেও তাঁর কণ্ঠে হুঙ্কার ধ্বনিত হল। তিনি বললেন, ল্যারিংস, ফ্যারিংস ও টনসিলের ব্যাধি ঘরে ঘরে এত ব্যাপ্ত হয়েছে ফ্রিজের ফ্যাশন থেকেই। ফ্রিজে রাখলে খাদ্য ডিকম্পোজড হয় না, অর্থাৎ পচে না ঠিকই, কিন্তু ডিসইনটিগ্রেটেড বা স্বধর্মভ্রষ্ট হয়। সে খাদ্য কোন মতেই সার্থক বা সম্পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য হতে পারে না।

শুনতে শুনতে খালি মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোকেরা নিষেধের তালিকা যেভাবে বাড়িয়ে যাচ্ছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত ডাল ভাত বা ডালরুটি এবং মাছ মাংস ও তরি-তরকারি সিদ্ধ ছাড়া আর তো কিছুই খাওয়ার থাকছে না। মশলা দেবেন না, ভাজবেন না, সাঁতলাবেন না, তাহলে খাবটা কি? উঠে আসব আসব করছি, ইতিমধ্যে দেখি স্বয়ং কাশীপতি গাঙ্গুলী গিয়ে হাজির হয়েছেন মাইকের সামনে। এতক্ষণে বুঝলাম সভায় ধরে আনার অর্থ। যাই হোক কাশীপতি কিন্তু মাৎ করে দিলেন বক্তৃতায়। তিনি বললেন, আমি ডাক্তার নই, কমপাউন্ডার, অর্থাৎ ব্যাঙ নই, বেঙাচী। তাই বিশেষজ্ঞদের মত জ্ঞানগর্ভ কোন কথা বলতে পারব না আমি। তবে জীবনের অভিজ্ঞতা কিছু আছে, তা থেকেই ডায়াটিক্স বা খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কি বুঝেছি বলছি এখানে। বাল্য বয়সে দুটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, যা আমাকে খাদ্য বিজ্ঞানের প্রথম ও শেষ কথা শিখতে সাহায্য করে। জঙ্গল মহালের এক রাজবাড়ীতে দেখেছিলাম বড় রাজকুমারের জন্মতিথি উপলক্ষে সীতারাম বলে একটি ছেলে বাজি রেখে এক বালতি মাংস ও দু হাঁড়ি পান্তুয়া খায়। কিন্তু খাদ্যের চাপে পঙক্তিতে বসে থাকতে থাকতেই অজ্ঞান হয়ে যায় সে। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী তাকে উঠিয়ে তখন উঠানে শুইয়ে দেওয়া হয় এবং দেওয়ান অবিরাম তার গায়ে জলের

ছিটে দিতে হুকুম করেন একটি বর-কন্দাজকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সিভিল সার্জেন বেন্টলী উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ীতে। তিনি খবর পেয়ে ছুটে আসেন এবং তক্ষুনি পাকস্থলী পাম্প করে সব খাদ্য তুলে ফেলে প্রাণটা বাঁচিয়ে দেন সীতারামের। তা না হলে ঐ রাত্রেই পঞ্চত্ব লাভ হত তার। পরের দিন সাহেব সীতারামকে বললেন, জেকো চিতারাম, কাডকুট্ অন্যের আছে, কিন্টু পেট তোমার আপনার আছে। উকে এটো বোজাই করিও না। এক ডিনে এটো না কাইলে অনেক ডিন কাইবে। এইখানেই প্রথম শিখি যে মানুষ শুধু না খেয়ে মরে না, মরে খেয়েও।

এতক্ষণের ঝিমিয়ে পড়া সভা উল্লসিত করতালিতে সরগরম হয়ে উঠল কাশীপতির এই ভাষণে। দক্ষ বক্তার মত চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই তিনি বললেন, এবার বলি আপনাদের দ্বিতীয় একটি ঘটনা, যা সমান শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল আমার জীবনে। গুমগড়ের সিংহী বাবুদের এক ছেলে পড়ত আমার সঙ্গে মেদিনীপুরে। তার বিয়ের বরযাত্রী হিসাবে গেছি বাংলা ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী রেল পাহাড়ীর এক জমিদার বাড়ীতে। সেখানে বিয়ের পরদিন সকালে শুনলাম, আমাদের আবাসস্থল থেকে মাইল খানেক দূরে বুদালাটা নামক বনে ছোট তরফের মহীন্দ্রবাবু একটি বাঘ মেরেছেন। জমিদারবাড়ীর গোয়াল থেকে একটা ষাঁড় টেনে নিয়ে গিয়ে তার প্রায় অর্ধেকটাই নাকি খেয়ে ফেলেছিল বাঘটা। সেখানে মাচা বেঁধে মহীন্দ্রবাবু সারা রাত একা ওৎ পেতে বসেছিলেন। ভোরবেলা বাঘ বাকীটা খেতে এসেছে যেই, আর পর পর দুই গুলিতে শেষ করেছেন তাকে। বলাবাহুল্য দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল আমাদের মধ্যে। সবাই দল বেঁধে দৌড়লাম বাঘ দেখতে। মৃত ষাঁড় ও মৃত বাঘ—দুটোকেই একটু পরে রথতলায় আনা হল। কাঁটায় ওজন করে দেখা গেল, ষাঁড়টা তিন মণ তেইশ সের, বাঘটা এক মণ বিশ সের। অনুমানে বুঝলাম, ষাঁড়ের যতটা খেয়েছে, তাও কোন্ বিশ বাইশ সের না হবে! তখনি বুঝতে পারি তৃণভোজীর তুলনায় মাংসাশীর জোরের পার্থক্যটা। চার মণ আন্দাজ ওজনের একটা ষাঁড়কে মেরে মাইলখানেক টেনে নিয়ে গেছে এবং প্রায় এক-চতুর্থাংশ খেয়ে শেষ করেছে দু মণেরও কম ওজনের একটা বাঘ, একি সোজা ব্যাপার? সেই থেকে দানা ও গুল্ম-গাছড়ার বদলে চাঁইচুই শোল বোয়াল যে কোন মাছ এবং হাঁস মুরগী দুম্বা পাঁঠা কাছিম কামঠ যে কোন মাংস উদরস্থ করতে অভ্যাস করেছি। ফলটা প্রত্যক্ষ করুন তার। ছুয়াত্তর ছাড়িয়ে পঁচাত্তরে পড়েছি, এখনো খাসা মাজা টান করে হাঁটি, দুবেলা পেট ভরে খাই, রাত্রে দিব্যি ঘুমুই। এর মূলে ঐ ছেলেবেলায় পাওয়া দুটি শিক্ষা।

এই বলেই বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে এলেন কাশীপতি এবং আমাকে বললেন, চলুন সুদর্শনবাবু, ওঠা যাক এবার। রাস্তায় বৈঠকখানা বাজার থেকে কিছু তরি-তরকারি মাছ-টাছ কিনতে হবে। কাল সকালে সময় পাব না। পথে নেমে আমি বললাম, আপনি ত মশাই ওস্তাদ বক্তা! এত বড় বড় ডাক্তার আর খাদ্য বিজ্ঞানীদের স্রেফ তাক লাগিয়ে দিলেন বক্তৃতার তোড়ে। কাশীপতি হেসে বললেন, ওসব থাক, কাজের কথা কিছু বলেছি কিনা তাই বলুন। তার পরে বল[illegible] সামনের শনিবারে নিয়ে যাব আ[illegible] বাগবাজার বলী সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে। সেখানে দেব ব্যায়াম সম্বন্ধে ভাষণ!

সুদর্শন গুপ্ত

তাপ

বিমল কর

স্নেহবিলাসের সাধ হয়েছিল নদীর ধারে ফাঁকায় বসবে। ছেলেমেয়েরা না না করে উঠল; বলল, 'তোমরা তিন বুড়োবুড়ি ফাঁকায় বসে কার্তিকের হিম খাও, তারপর আমরা মরি।'

বিলাস আপত্তি করতে গিয়েছিল, তর্কও তুলেছিল। কোনো ফল হয় নি। ছেলেমেয়েরা আমাদের হাত ধরে টেনে বিট্-বাংলোর বারান্দায় বসিয়ে রেখে চলে গেল। আমরা তিন বুড়োবুড়ি কাঠের নড়বড়ে বেঞ্চিতে বসে থাকলাম। নদী থেকে অল্প তফাতে এই বিট্-বাংলো, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের চৌকি-কুঠি আর কি, ছোট একটা কুঁড়েও বলা যায়, ইটের দেওয়াল, খড়ের চাল। এ-সময় পাহারাদারও থাকে না।

ঢাকা বারান্দায় বসে বরাকর নদী দেখা যাচ্ছিল। বর্ষার জল শুকিয়ে নদীতে চর পড়তে শুরু করেছে। ওপারে স্তব্ধ জঙ্গল, মাথায় চাঁদ; এপারে শালের বন; মাঝ মধ্যিখানে পাথর বালি আর কিছু জলের স্রোত নিয়ে বরাকর নদী পড়ে রয়েছে।

আমরা তিন বুড়োবুড়ি বলতে স্নেহ-বিলাস, কনকলতা আর আমি। বিলাসকে বুড়ো বলা চলে না। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট ও। আমি ষাটের কাছাকাছি এসে পড়েছি, বিলাস বোধ হয় ছাপান্ন হবে। তার স্বাস্থ্য তেমন কিছু ভেঙেও পড়ে নি, একটু আধটু ডায়েবেটিসের ধাত পেয়েছে, অন্য কোনো উপসর্গ নেই। কনক পঞ্চাশ পার করে দিয়েছে। ভারী শরীর, মাথার চুল বারো আনাই সাদা। তবু কনক এখনও সকাল বেলায় রান্নাঘরের সামনে সবজির ঝুড়ি টেনে পিঁড়ি পেতে বসতে পারে, সন্ধ্যেবেলায় নাকের ডগায় চশমা ঝুলিয়ে যায় 'আনন্দ আশ্রমে' গল্প গুজব করতে। সেদিক থেকে আমিই বুড়ো: চাকরি বাকরি থেকে ছাড়া পেয়েছি, বুকে দু বার ব্যথাও উঠেছিল: একবার দিন পনেরো শয্যাশায়ী ছিলাম। ছোটখাট অন্য উপসর্গও আছে।

ছেলেমেয়েদের জন্যেই আজ এখানে আসা। ওরাই ধরে করে হই-হল্লা তুলে নিয়ে এল। বলল, 'চলো—তোমাদের পুরোনো জায়গা দেখে আসবে চলো, আবার তো সবাই মিলে এখানে জুটব না।'

কথাটা ঠিকই। কতকাল পরে আবার আমরা একসঙ্গে জড় হয়েছি এখানে। দু তিন যুগ তো হবেই। আমি থাকি কলকাতার এক প্রান্তে, বিলাস থাকে টিটাগড়ের কাগজ কলে। কনক অবশ্য বেশীর ভাগটা এখানেই থাকে, মাঝে মাঝে যায় রাঁচিতে ছেলের কাছে। আমাদের সঙ্গে এই জায়গাটার যোগ ছিল নাড়ির। বাপ-কাকারা ঘরবাড়ি করেছিল। বাল্য কৈশোর এখানেই কেটেছে। এমন কি প্রথম যৌবনও। তারপর নাড়ি আলগা হয়ে গেছে, পেটের দায়ে কে কোথায় চলে গিয়েছি, বাপ-কাকারা ইহকালের দেনা মিটিয়ে চলে গেছেন, ঘরবাড়ি নষ্ট হয়েছে, কিংবা বেচে ফেলেছি জলের দরে। কনক এখানেই থাকে, তাদের বাড়িটা আছে। কনকের বাবা—ভূদেবকাকা মেয়েকে কাছেই রেখেছিলেন কনক বিধবা হবার পর, বাড়িটা তাকেই দিয়ে গেছেন। বিলাসদের ছিল শরিকী বাড়ি, ভাগের মা গঙ্গা পায় না যেমন—তাদের বাড়িটাও পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, কোনো গতি হচ্ছিল না। এতকাল পরে বিলাস এসেছিল গতি করতে, মানে বেচেটেচে একটা ব্যবস্থা করতে। আমাদের বাড়ি আর নেই, কবেই কাকা বেচে দিয়েছিলেন। আমি এসেছিলাম কপাল ফেরে। অনেক কাল কোথাও আসা-যাওয়া হয় না, চাকরি থেকে ছাড়া হবার পর ডাক্তার বদ্যিরা বললেন, কদিন কোথাও ঘুরে আসুন, পুজোয় মুখে, ভাল লাগবে, উপকার হবে শরীরের। দেওঘরে একটা বাড়ি জুটেছিল, শেষ সময় বাতিল হল। স্ত্রী বললেন, দরকার কি মাথা খারাপ করবার—তার চেয়ে চলো শ্বশুরবাড়ির দেশ ঘুরে আসি। আমি ওই ফাঁকে দিন দুই গয়ায় গিয়ে মেজদার বাড়িতে থেকে আসব। ছেলেমেয়েদেরও শখ হল, বাপ-ঠাকুরদার ভিটে দেখবে। এই ভাবেই আমার আসা। কনকই একটা বাড়ি জুটিয়ে রাখল শেষ সময়ে। এসে দেখি, বিলাসটাও এসেছে।

পুজোটা ভালই কাটল। আমাদের সময়কার সেই দুর্গা মণ্ডপ নেই, তেমন করে দলে দলে বাঙালীরাও আর আসে না পুজোর ছুটিতে হাওয়া বদলাতে। নিরিবিলি ফাঁকা ভাবটাও ঘুচে গিয়েছে।

দোকান পশার বাজার হাট সবই বদলে গেছে। মানুষজনও। মনটা খুঁতখুঁত করে; ছেলেমেয়েদের বলি—'এ যা দেখছিস এমন ছিল না রে! বড় চমৎকার ছিল সব। কত আনন্দ হইচই করেছি—তোরা বুঝতে পারবি না। বিশ্বাস না হয়, বিলাসকাকাকে জিজ্ঞেস কর, জিজ্ঞেস কর কনকপিসীকে, ওরা তো আর মিথ্যে বলবে না।'

সেই ছেলে-মেয়েরাই ধরল। বলল, 'বেশ তাহলে চলো. তোমাদের মতন আমরাও মুনলাইট পিকনিক করে আসি।'

সব বয়েসে সমস্ত রকম আনন্দ মানায় না। রাজী হতে ভয় হচ্ছিল। স্ত্রী গিয়েছেন গয়ায় স্বাদশীর দিন তাঁর দাদার কাছে। ফিরে এসে যখন শুনবেন এই বয়েসেও হুজুগে নেচেছি, রাগ করবেন। তাছাড়া বনবাদাড়ে ঘোরা আর কি বয়েস আছে আমার!

ছেলে মেয়েরা শুনল না। হল্লা করতে লাগল।

স্নেহবিলাস বলল, 'চলো ঘুরেই আসি মৃণালদা। আবার হয়ত কোনদিনই এভাবে একসঙ্গে হতে পারব না।'

কনকও না করতে পারল না। বরং ছেলে-মেয়েদের আরও উসকে দিয়ে বলল, 'যাবি আর আসবি তা হবে না; রাত করে ফিরতে হবে, নয়ত কিসের ছাই চাঁদের আলোয় বনের মধ্যে পিকনিক করা।'

ওরা বলল, 'নেভার মাইন্ড কনকপিসী, বলো তো হোল নাইট পারফরমেনস লাগিয়ে দিতে পারি। তবে তোমায় সেই গানটা গাইতে হবে—'আকাশের চাঁদ ঢালিয়া পড়িল কদমের আড়ালে......।'

কনক অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, এ গানের কথা তোরা কোথ্ থেকে শুনলি?'

আমার ছেলে খোকন বলল, 'ফ্রম ফাদারস মাউথ। তোমাদের অনেক কীর্তিই শুনেছি।'

হেসে মরল কনক, বলল, 'ও হারামজাদা, শুধু আমারটাই শুনেছিস! আর তোর বাবার গানটা শুনিস নি। তোর বাবা যে গাইত—'নয়নের বারি নয়নে রেখেছি হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা—' বলে কনক মুখভঙ্গি করে বুকে হাত রেখে আমার জ্বালাটা যেন দেখাল।

ছেলে-মেয়েগুলো হেসে কুটোকুটি।

হাসি থামলে বিলাসের মেয়ে সুমতি কনকের মাথার আঁচল ফেলে দিয়ে গলা জড়িয়ে আদুরে গলায় বলল, 'আর আমার বাবা কী গাইত কনকপিসী?'

কনক হাসিমুখে বলল 'তোর বাবা শুধু একটা গানই জানত, তাও ভাঙাকেত্তন। ও গাইত—'ওরে সরে যেতে বল সখি......সরে যেতে বল......।'

সুমতি হাসির দমক সামলাতে পারল না। পেটে হাত দিয়ে কনকের পায়ের কাছে ধুপ করে বসে পড়ল। অন্যরা হা হা হি হি করে হাসতে লাগল।

আমরা সেই তিনজন, তিন গাইয়ে আজ আবার বছর ত্রিশ-বত্রিশ পরে এখানে—এই বরাকর নদীর ধারে এসে বসেছি। কাল পূর্ণিমা গিয়েছে, কোজাগরী পূর্ণিমা। আজও অনেক জ্যোৎস্না। বিন্দুমাত্র কমতি নেই। অবিকল কালকের মতনই। জঙ্গল আর নদী যেন জ্যোৎস্নায় ডোবানো। তবু এ জ্যোৎস্নায় প্লাবন নেই। জঙ্গলের গাছপালা, নদীর জল বালি পাথর, কার্তিকের পাতলা কুয়াশা যেন আলো শুষে নিচ্ছে।

স্নেহবিলাস পকেট থেকে সিগারেটের

প্যাকেট বার করল। "মৃণালদা, খাও একটা।"

বুকের ব্যথাট্যাথার পর সিগারেট খাওয়া নিষেধ ছিল। একেবারে মোহমুক্ত হতে পারিনি। দু-চারটে খাই। বিলাসের হাত থেকে সিগারেট নিলাম।

বেঞ্চির একপাশে আমি, অন্য পাশে বিলাস; মাঝ-মধ্যিখানে কনক। আমি আগে, পরে বিলাস সিগারেট ধরাল।

ছেলে-মেয়েগুলো নদীর ধারে হুই-হুল্লোড় করছে। অনেকগুলো গলা, মোটা চঞ্চল সরু চিকন সব যেন মেলানো মেশানো।

ভালই লাগছিল। আমরা তিন জন তো এক সময়ে ছায়ায় ছায়ায় জোড়া ছিলাম, আনন্দ আহ্লাদ সুখদুঃখ একই সঙ্গে ভোগ করেছি, অথচ আমাদের ছেলে-মেয়েরা পরস্পরকে প্রায় চিনতই না। দু-চারবার হয়ত চোখে দেখেছে কি দেখে নি, নামটাম শুনেছে বড়জোর। এখানে এসে এই ক' দিনে একে অন্যকে জানল চিনল, মেলামেশা করল, ভাবসাব পাতিয়ে ফেলল। লক্ষ করে দেখলাম, দু-চার দিনেই ওরা কেমন একটা দল হয়ে গেল, বন্ধু বনে গেল পরস্পরের। হয়ত এখানে এ-রকম না হয়ে উপায় ছিল না, ওদের মেলা-মেশার গণ্ডিটাই তো এখানে ছোট হয়ে গিয়েছিল।

কনক বলল, "অমন করে ডাক ছেড়ে চেঁচাচ্ছে কে বলো তো?"

বিলাস বলল, "আমার গুণধর ছেলেটি ছাড়া ও-রকম মিলের ভোঁ-মার্কা গলা তো আর কারুর হবার কথা নয়।"

কনক হেসে ফেলল। বলল, "তোমার তো একটি ছেলে একটি মেয়ে; কোথায় আদর করে বলবে, তা না কী কথাই বললে!"

বিলাসও হেসে জবাব দিল, "ওই দুটিতেই আমি পাগল। মেয়েটা তবু কথা-বার্তা বললে কান দেয়, ছেলেটার কেমন ডোন্ট কেয়ার ভাব।"

কনক বলল, "আহা, মা-মরা ছেলে-মেয়ে; ওরা যদি তোমায় না পাগল করবে, তবে আর কাকে করবে বলো!"

বিলাস চুপ করে থাকল। হয়ত তার স্ত্রীর কথা ভাবছিল। বছর ছয় আগে বিলাসের স্ত্রী মারা গেছে। চমৎকার ছিল বিলাসের স্ত্রী। আমি তাকে বার দুই দেখেছি। বিলাসের মেয়ে সুমতির মতনই মুখশ্রী ছিল তার। রঙ অবশ্য তত উজ্জ্বল ছিল না। সুমতি অবশ্য তার বাবার গায়ের রঙ পেয়েছে—টকটকে ফরসা মেয়ে। বিলাসের ছেলে বাবলু অবিকল বিলাসের মতন। একই গড়ন।

কনক হঠাৎ সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে কী দেখাল। বলল, "ওই দেখো"।

তাকিয়ে দেখি খানিকটা দূরে কারা যেন ছুটছে। চোখে স্পষ্ট করে কাউকে দেখা না গেলেও বুঝতে পারলাম, নদীর বালি দিয়ে তিন মূর্তিমান ছুটছে। কোনো সন্দেহ নেই—আমার ছেলে খোকন রয়েছে দলে, নয়ত কে আর অতটা লম্বা মাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে ছুটবে।

বিলাস বলল, "খোকন আর টুনি। অন্যটাকে চিনতে পারছি না।"

টুনি কনকের ভাইঝি। কনকের বড় আদরের। কনকের ভাই প্রসাদ মুঙ্গেরে সরকারী চাকরি করে। পুজোর ছুটিতে পিসীর কাছে বেড়াতে এসেছে টুনি।

আমি হেসে বললাম, "বিলাস, এককালে আমরাও কত দৌড়োতাম!"

বিলাস বলল, "দৌড় বলে দৌড়, উট-পাখির মতন দৌড়োতাম। বালির মধ্যে পা ডুবে একবার তো আমার গোড়ালি এমন মচকে গেল মাসখানেক চুন-হলুদ লাগিয়েছি।" বলে বিলাস সিগারেটে ছোট করে টান দিল। আবার বলল, "তখন নদীটা আরও বড় ছিল।" এমন করে বলল যেন তখনকার নদীর মাপটা সে মনে রেখেছে।

কনক বলল, "তখন এ সময়ে মাঝ নদীতে জলও বেশী থাকত।"

আমার ঠিক মনে পড়ল না, হয়ত নদী আরও চওড়া ছিল, জলও বেশী থাকত। আমি বললাম, "কনক, এই কোজাগরী পূর্ণিমার সময় বরাকর নদীতে বেড়াতে

এসে সন্ধ্যেবেলায় মুনলাইট পিকনিক করা কার মাথায় প্রথম এসেছিল মনে আছে?”

ঘাড় হেলিয়ে কনক বলল, “মধুদা।”

বিলাস বলল, “মধুদার মাথায় কত যে বুদ্ধি খেলত।”

কনক বলল, “শুধু বুদ্ধি কেন, সাহসও ছিল। প্রথমবার আমরা যখন দশ-পনেরো জনের দল মিলে এই জঙ্গলে রাত্তিরে আসব বললাম বাড়িতে কী বকা-ঝকি। ভাল্লুকে কামড়াবে, শেয়ালে তাড়া করবে, বাঘে খাবে......কত কি বলছিল সবাই। মধুদা আর নিমাইদা কোথা থেকে দুটো বল্লম আর মরচে ধরা বন্দুক এনে গরুর গাড়িতে রাখল। মনে আছে?”

বিলাস হো হো করে হেসে বলল, “মনে থাকবে না, এখানে এসে মধুদা বলল—বন্দুক আছে টোটা নেই, তোরা বাঘ দেখলেই মাটিতে শুয়ে পড়বি, বাঘ বুঝতে পারবে না—ভাববে ম্যাড়ো।”

আমি আর কনক বুড়ো বয়েসেও দম ফাটা হাসি হাসলাম।

ছেলে-মেয়েগুলো যে কী করছে আমরা তেমন দেখতেই পারছিলাম না। নদীর পাড়ে আড়াল পড়ে যাচ্ছিল। ওদের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। চেঁচাচ্ছে। ডাকছে, বিকট গলায় গান গেয়ে উঠছে থেকে থেকে, মেয়েগুলো হাসছে, কখনো কখনো দূরে থেকে চেঁচিয়ে বলছে—'ও কনকাপিসী, আমার মাথায় বালি মাখিয়ে দিচ্ছে দেখো......।”

বিলাস বলল, “যাই বলো মৃণালদা, আমাদের সময় দলও ছিল ভারী—কত ছেলে-মেয়ে আসতাম বলো, মধুদাদের ব্যাচ, আমরা, কিশোরী পল্লী থেকে প্রভাতরা। মধুদারা যখন দল ছাড়ল, আমরা হলাম সিনিয়ার। তুমি লীডার হয়ে গেলে।”

কনক রঙ্গ ক'রে বলল, “লীডার হয়েই আমাদের গরুর গাড়ি উলটে দিলে। কী আমার লীডার!”

বিলাস হাসল। আমিও হাসলাম। কথাটা মিথ্যে নয়, গরুর গাড়ির গাড়োয়ান-গিরি করতে গিয়ে গাড়ি উল্টে দিয়েছিলাম, কনকের নাকে লেগেছিল, অনেকটা রক্ত পড়ে-ছিল, ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

বিলাস পরিহাস করে বলল, “সে তুমি যাই বলো কনক, তোমার নাকের রক্ত বন্ধ করতে মৃণালদা কিন্তু গায়ের নতুন জামাটাই ছিঁড়ে ফেলল।”

কনক তার গোলগাল মুখটি বিলাসের দিকে ফিরিয়ে বলল, “ও না হয় জামা ছিঁড়ল, তুমি কি বলে কাপড় খুলে নদীর দিকে ছুটতে লাগলে?”

আমি গলা ছেড়ে হেসে উঠলাম।

বিলাস হাসতে হাসতে বলল, “মিথ্যে কথা বলো না, মৃণালদা সাক্ষী। কাপড় খুলে আমি ছুটিনি, হাতে নিয়ে ছুটে-ছিলাম নদীর জলে ভিজিয়ে আনব বলে।”

কনক বলল, “তোমার কী বুদ্ধিই ছিল তখন! কোথায় চায়ের কেটলিটা নিয়ে জল আনতে ছুটবে না কাপড় খুলে ছুটলে।”

বিলাস হার স্বীকার করল। বলল, “তখন কি মাথার ঠিক ছিল! বিপদের সময় মানুষের অত খেয়াল থাকে না।”

ঠাট্টা করে আমি বললাম, “কনক, বিলাসকে তুমি দোষ দিতে পার না। তোমার কিছু হলে ও বরাবরই ছটফট করত।”

কনক এবার আমার দিকে মুখ ঘোরাল। মাথায় কাপড় নেই। কপালের দুপাশে এলোমেলো পাতলা পাকা চুল। নাকের ডগায় গোল চশমা। গাল-ভরা হাসি হেসে কনক বলল, “তা কেন করবে না বলো, তোমার জন্যে তো ও বেচারীর আর কিছু করার ছিল না।” কনক ওইটুকু বলে থেমে গেল।

আমি কনকের মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। ত্রিশ-বত্রিশটা বছর যেন ওর মুখের কোন আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে আমায় দেখছিল।

নদীর দিকে আচমকা সব কেমন স্তব্ধ শোনাল। ছেলে-মেয়েদের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল? অনেকটা দূরে পাথরের ওপর ছায়ার মতন কারা দু-জন যেন বসে আছে, বালি দিয়ে হেঁটে আসছে কারা! বড় নীরব, নিঝুম লাগছিল সব, ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জোনাকি উড়ছিল কাছাকাছি। জংগল আর নদী থেকে যেন হালকা কুয়াশা উঠে কার্তিকের ঠাণ্ডার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। আমরা তিন বুড়ো-বুড়ি চুপ করে বসে থাকলাম। তিন জনেই নদীর দিকে তাকিয়ে, যেন ত্রিশ-বত্রিশটা বছর সাঁতরে যাবার চেষ্টা করছি প্রাণপণে।

হঠাৎ বিচিত্র এক শব্দ ভেসে এল। বার দুই কান পেতে বুঝলাম কে যেন শিবাধ্বনি করছে। তাকে ব্যঙ্গ করে গর্দভের ডাক দিল অন্য কেউ। তারপর শানি সম্মতি আর টুনি দূরে থেকে ডাকছে খোকনদের।

বিলাস নড়েচড়ে বসল। কনকের গায়ে পাতলা চাদর ছিল, গুছিয়ে নিল আলতো করে।

বিলাস বলল, "ব্যাপারটা কী কনক? ওরা আমাদের খুব তো আদর করে ডেকে আনল, কিন্তু এখন পর্যন্ত এক কাপ চা দিল না। শুধু ছুটে বেড়াচ্ছে।"

কনক বলল, "দেবে। কতক্ষণ আর এসেছ! ওদের একটু হুল্লা করে নিতে দাও, এই প্রথম এসেছে।"

বিলাস বলল, "করুক না হুল্লা, তা বলে আমাদের শুকনো গলায় বসিয়ে রাখবে! আমাদের সময় এসব ছিল না। এসেই এক রাউণ্ড চা হয়ে যেত! কাঠকুটো জ্বালিয়ে পাতা ধরিয়ে দিতাম, চায়ের জল ফুটতে দশ মিনিট......।"

"আমাদের কথা বাদ দাও," কনক বলল, "আমরা ছিলাম এখানকার ছেলে-মেয়ে; গাঁইয়া। এই বনজংগল নদী কি কম দেখেছি! এসেই তাই চায়ের জন্যে কোথায় পাতা কোথায় কাঠ করে বেড়াতাম।"

"বাঃ, তা কেন হবে—? বিলাস বলল, "আমাদের যে গরুর গাড়ি করে আসতে হত! ফেরার তাড়া থাকত। এই বাবুদের কোনো তাড়াই নেই। মটরগাড়ি চেপে এসেছেন।"

বিলাস ঠিকই বলেছে। আমরা দশ-বারো জন ছেলেমেয়ে গরুর গাড়ি চেপেই আসতাম। পথ ছিল কাঁচা। আড়াই মাইলটাক রাস্তা। শেষ বিকেলে বেরিয়েও প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যেত নদীতে পৌঁছতে। অন্ধকার হয়ে আসত। যদিও কোনো ভয় ছিল না—তবু ফেরার তাড়া থাকত। আটটার মধ্যেই আবার চাপতাম গরুর গাড়িতে। আমাদের হাতে সময় কম থাকত—তবু সেই সময়ই তখন কিছু কম মনে হত না। কাঠকুটো শুকনো পাতা জড় করে আগুন ধরানো হত, চা তৈরী করতাম, কাঁচের গ্লাস ধুয়ে আনতাম নদীর জলে, কনকরা বসত ভাজাভুজি করতে, হয়ত পাঁপর হয়ত ফুলুরি; দু-একবার লুচি আলুরদম ওমলেট ভাজাও হয়েছে। কে যেন একবার বেগুনি ভাজতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছিল অনেকটা। কনকের শাড়ির আঁচল ধরে উঠেছিল একবার। আমি লাফ মেরে কনককে বালির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। শাড়িটাড়ি খুলে গিয়েছিল কনকের। রাগে লজ্জায় গরগর করেছিল সেদিন কনক। ফেরার সময় আমায় কনুই দিয়ে বুকের কাছে গুঁতো মেরেছিল প্রচণ্ড জোরে।

কে বলবে আমাদের সেই সব দিন এই নদীর ধারে এমন করেই কেটেছে। বালির ওপর ছোটাছুটি আমরাও কম করি নি। একলা একলা ছুটেছি, জোড়া বেঁধে ছুটেছি; পেচ্ছল পাথরে পা টিপে টিপে উঠেছি পা ডুবিয়ে বসে থেকেছি জলে, গান [illegible]ক কীর্তি জমা রয়েছে। [illegible] বলে দিয়ো তো—শুনে গেয়েছি আকা[illegible] ছেঁড়াছুঁড়ি করেছি যুদ্ধং দেহি ব[illegible]লে। সবের সাক্ষী ওই নদী, ওই বালি, জংগল। কিন্তু নদী তার জল ধরে রাখে? বালি ধুয়ে যায়, উড়ে যায় জলে বাতাসে; আর সেই জংগলও কি আছে নাকি? অজস্র গাছ কাটা পড়ে গেছে।

কনক বলল, "আমার একটা কথা মনে পড়ছে।"

"কী?" আমি বললাম।

"সেবন্তীর কথা মনে আছে! কালুদের বাড়িতে ওর এক মাসতুতো বোন এসেছিল, কোন কোলিয়ারী থেকে। কি যেন নাম ছিল ছাই..........মনে পড়ছে না। সব ব্যাপারেই নাক সিঁটকোচ্ছিল। সেই মেয়েটা হঠাৎ কেমন ভূতের ভয় পেয়ে ন্যাকামি করতে লাগল! মনে আছে?"

বিলাস যেন ভাবল। বলল, "কালুকে মনে আছে। তার বোনকে মনে নেই।"

"ওর সেই বোন কিন্তু ভূতের ভয়ে একজনের খুব ম্যাওটা হয়ে পড়ল—" বলে কনক আমার দিকে চেয়ে এই বয়েসেও চোখের ভঙ্গি করল হেসে।

আমি হেসে ফেলে বললাম, "কেন [illegible]? সেই টিকিংড়েটা! তুমি যাকে এক

পায়ে চটি পরিয়ে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়েছিলে?"

"ওমা এই দেখো, তোমার তো বেশ মনে আছে—" কনক হাসল, "উচ্চিংড়েই বটে।"

"একটু একটু মনে আছে। তুমি তার একটা চটি বালি চাপা দিয়ে রেখে-ছিলে। একবারও বললে না, কীর্তিটা তোমার।"

"তুমি বললেই পারতে, তোমার সঙ্গে তো খুব আদিখ্যেতা করছিল।"

"তোমার ভয়ে বলি নি। বললে কি তুমি আমায় ছেড়ে দিতে! নাকে কানে খত দেওয়াতে।"

বিলাস জোরে হেসে উঠল। কনকও হাসছিল।

এমন সময় খুব কাছেই বাবলুর গলা শোনা গেল। নদীর ভাঙা পাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাবলু। তার পেছনে টুনি।

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "তোমরা আছ তো?"

আমরা কোনো সাড়া শব্দ দিলাম না। বাবলু আর টুনিকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। বাবলুর পরনের প্যান্ট হাঁটুর কাছ পর্যন্ত গোটানো। গায়ের জামাটা স্পোর্টস গেঞ্জির মতন। টুনি যেন দু পাশে দুলতে দুলতে হাঁটছে। খুব ছোটাছুটি করেছে নিশ্চয়।

ওরা আরও কাছাকাছি এসে পড়ার পর খোকন, সুমিতা, কানুকেও দেখা গেল। খোকন নীচু হয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে আসছে, সুমিতা মাথার ওপর হাত তুলে কি যেন দেখাচ্ছিল কানুকে।

বাবলু আবার চেঁচিয়ে বলল, "হ্যালো ওল্ড ফোক, তোমরা ঠিক জায়গায় আছ তো?"

বিলাস বলল, "আমার ছেলেটা বাঁদর হয়ে যাচ্ছে মৃণালদা?"

কনক ফট্ করে বলল, "তুমি আরও বাঁদর ছিলে।"

বিলাস কেমন থতমত খেয়ে গেল। আমি হেসে ফেললাম। বিলাস যেন দু মুহূর্ত সময় নিল সামলাতে তারপর হেসে ফেলে বলল, "আমি কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সত্যি কনক, আজকাল আর নিজেকে বাঁদর হনুমান ভাবতে পারি না। কেউ আর বলেও না। যাক, তুমি অন্তত এতকাল পরে একবার বাঁদর বললে! বেশ লাগল।"

আমরা তিনজনেই অট্টহাস্য হাসলাম।

বাবলু আর টুনি বারান্দায় এসে উঠল। বাবলু বলল, "তোমাদের এত ডাকা-ডাকি করছি, আওয়াজ দিচ্ছ না কেন?"

কনক বলল, "কী করব আওয়াজ দিয়ে,

আমাদের কি তোদের মতন গলা আছে আর?"

বাবলু ফাজিলের মতন বলল, "আগে ছিল নাকি?"

"তোদের চেয়ে কম ছিল না।"

"বুড়ো হলে মানুষ সব সময় নিজেদের দিকে ঝোল টানে।"

"টানব না কেন! যা সত্যি তাই বলছি। তোরা আর কি গলার জোর দেখাচ্ছিস—আমাদের সময় আমরা দুজন দায়ের কাছে চলে যেতুম, আর দুজন থাকতাম এদিকে। মাঝখানে একজনকে দাঁড় করিয়ে দিতাম জজ করে। নামতা ধরার খেলা খেলতুম। তা জানিস?"

টুনি শুধোলো, "নামতা ধরার খেলা কী পিসী?"

"কি আবার! একদল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতুম বেয়াড়া নামতা, আর একদল তার জবাব দিত।"

বাবলু ইয়ার্কি করে বলল, "তোমাদের তো তাহলে ধারাপাত হাতে করে আসতে হত। এ-রকম জ্ঞানের খেলা আর কী কী খেলতে?"

বাবলুর কথায় হেসে উঠলাম আমরা। ততক্ষণে খোকনরা এসে গেছে।

সুমতি বলল, "এখানে মড়া পুড়োয় কনকপিসী?"

"কেন?"

"খোকনদা একটা পোড়া কাঠ আর ভাঙা কলসি দেখাল।"

খোকন বেশ দার্শনিকের মতন বলল, "মড়া সব জায়গাতেই পোড়ায়। স্পেশালি নদীর ধারে। নিমতলা কেওড়াতলার চেয়ে এ সব দিকে পুড়ে আরাম।"

আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ কেমন যেন করে উঠল। ছেলের দিকে তাকালাম। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, মাথা ভরতি চুল, কালো রঙ। জামার বোতাম খুলে রেখেছে। ঠাণ্ডা লাগতে পারে। আমার বাবাকে এই নদীর ধারেই পোড়ানো হয়েছিল। আজও মনে আছে। বাবা যখন পুড়ছিল আমি সামান্য তফাতে একটা ডুমুর গাছের তলায় হাঁটুতে মুখ দিয়ে বসে ছিলাম। তখন গনগনে দুপুর। জ্যৈষ্ঠ মাস। হা হা করে লু ছুটে যাচ্ছে।

বিলাস যেন কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই কনক বলল, "তুই কি কাঠকুটো কলসি ছুঁয়েছিস খোকন?"

"না।"

"ওসব ছুঁবি না। ছুঁতে নেই।"

বিলাসের কি মনে পড়ে গেল; বলল, "খোকন, তের বাবা কিন্তু একবার ওই কাঠ টেনে এনে হিসিফাই করেছিল। কনক তোর বাবাকে নদীতে চান করিয়ে ছেড়েছিল।"

ছেলেমেয়েরা প্রথমটায় বোঝে নি। দু মুহূর্ত পরে বুঝল। বাবলুই হা হা করে হেসে উঠল প্রথমে। ততক্ষণে হিসিফাই বুঝে গিয়ে সবাই মিলে ছিলে কাটা ধনুকের মতন আছড়ে পড়ে হাসতে লাগল হো হো করে।

কনক হাসি থামিয়ে দম নিয়ে বলল, "ঘেন্নাপিত্তি তোর বাবা কাকাদের কম ছিল। কী সব গুণধর ছিল তোরা তো জানিস না। আজ ওরা জবুথবু শান্ত মেরে গেছে। তখন এক একটা জ্যান্ত ডাকাত ছিল।"

সুমতি হেসে বলল, "তোমার কাছে বাবাদের অনেক কীর্তি জমা রয়েছে। আমাদের সব বলে দিয়ো তো—শুনে রাখব।"

কানু একটু শান্ত ধাতের ছেলে। খোকনের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। ও হল কনকের পাশের বাড়ির ছেলে। খোকনদের খুব বন্ধু হয়ে গেছে। এখানেই থাকে। ইলেকট্রিক অফিসে চাকরি করে। ছেলেটি বেশ। কনকের হাজার রকম ফাই ফরমাশ খেটে দেয়। বড় ভালবাসে কনককে।

কানু বলল, "গাড়িটা একবার দেখে আসি।"

খোকন বলল, "দাঁড়াও, আমিও যাব।... এবার চা-ফা খাওয়া যেতে পারে।"

বিলাস বলল, "যেতে পারে কিরে? আমার তো গলা শুকিয়ে গেছে।"

খোকন একবার সুমতির দিকে তাকিয়ে বলল, "হেজাক লট নিয়ে আসব নাকি?"

"আনো। আমার বাপু খিদে পেয়ে গিয়েছে।"

"মেয়েরা খিদে খিদে করেই গেল...! চলো, কানুদা!"

সুমতি যেন খোকনকে একটু মুখ বেঁকিয়ে ভেঙচাল। কনকও আমাদের এই-ভাবে মুখ ভেঙচাত। ওরা দুজন চলে গেল। বাবলু, টুনি, সুমতি দাঁড়িয়ে থাকল। বাবলু একটু সরে গেল, বারান্দায় বসল, পা ঝুলিয়ে। সুমতি কনকের গায়ের কাছে সরে এল। টুনি তাকিয়ে থাকল নদীর দিকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কথা বলছিল না। একটু পরে কনক সুমতিকে বলল, "তোরা কত আরাম করে এলি, আবার আরাম করেই ফিরে যাবি। আমরা আসতাম গরুর গাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে পায়েও হাঁটতাম। পাতাটাতা পুড়িয়ে চা করতাম, বেগুনি ফুলুরি পাঁপর ভাজতাম; হাত পুড়ত, পা পুড়ত। তবু কত আনন্দ ছিল! তোরা বাপু আজকালকার ছেলেমেয়ে—কষ্ট করতেও শিখিস নি, আনন্দ করতেও নয়।"...

বাবলু মাথা ঘোরাল, দেখল কনককে। তারপর মজার গলায় বলল, "তোমাদের চায়ের ফ্লেভার কেমন হত?"

আমরা কেউ তার কথা বুঝতে পারলাম না। কনক বলল, "কেন?"

"না, মানে হাত পা পুড়িয়ে চা টা করতে তো, গন্ধটা কেমন ছাড়ত তাই জিজ্ঞেস করছি..." কথা শেষ না করেই বাবলু নিজেই হেসে উঠল।

কনক এতোক্ষণে ধরতে পারল। ধমক দিয়ে হাসল, "মুখপোড়া কোথাকার। খালি কথাই শিখেছিস সব, বাক্যবাগীশ।"

সুমতি বলল, "তোমরা বাপু বড্ড ঝঞ্ঝাট করতে! দিনের বেলায় পিকনিক করলে তবু হাঁড়িকুড়ি চাল ডাল, উনুন নিয়ে যাওয়া যায়। এই রাত্তির বেলায় ঘণ্টা দুই বেড়াতে এসে কে ওইসব কষ্ট করে!"

কনক সুমতির হাতটা টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বলল, "কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়?"

বাবলু ফট করে বলল, "তুমি কোন কেষ্ট পেয়েছিলে কনকপিসী, একটু বলবে প্লীজ—?"

কনক চুপ। আমরাও চুপ। বাবলুর দিকেই তাকিয়ে থাকলাম আমরা। তার কথাটা যেন কানের কাছে ফিসফিস করতে লাগল। কখন যে আমি চোখ তুলে নদীর দিকে তাকিয়েছি বুঝি নি—হঠাৎ অনুভব করলাম অসাড় নদীতীর চাঁদের আলোয় বড় বেশী শূন্য ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

চা খাওয়া শেষ হল। ছেলেমেয়েরা ব্যবস্থা ভালই করেছিল। সবই তৈরী করে এনেছিল বাড়ি থেকে। স্যান্ডুইচ, সেউ-নিমকি, মনোহরের দোকানের মিষ্টি—অভাব কোথাও ছিল না। চায়ের জন্যে গোল মতন বড় একটা ফ্লাস্ক এনেছিল। গরমই ছিল চা। কেমন করে কিছু কাগজের গ্লাসও জুটিয়েছিল ওরা। হয়ত এখানেই পেয়েছে। আজকাল এখানে বিস্তর জিনিস পাওয়া যায়—আগে পাওয়া যেত না। দিনকাল পালটে গিয়েছে। তা ছাড়া কানু থাকতে ওদের ভাবনা কিসের। কানু বড় কাজের ছেলে। নয়ত একটা ভাঙা চোরা স্টেশন ওয়াগনই বা কে ওদের জুটিয়ে দিত। ওই গাড়ি চেপেই আমাদের আসা। কানুই ড্রাইভার। কোনো সন্দেহ নেই, গাড়িটা না পেলে এই বুড়ো বয়েসে আমাদের তিন-জনে আসা হত না। গরুর গাড়ির ধকল সইবার বয়েস আর আমাদের নেই।

চা খাওয়া শেষ হলে আবার ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ল। এবার বুঝি যাবে নদীর দয়ের দিকে। দ ঠিক নয়, আমরা বলতুম দ। দুটো বিশাল বিশাল পাথর পড়েছে নদীর একপাশে, স্রোত এসে ধাক্কা খেয়ে ঘূর্ণি তুলে বয়ে যায়। তাকেই আমরা, বলতুম দ। সে কি আছে না নেই তাও জানি না, কে জানে বালিতে পাথর ডুবে গেছে না আছে। কানু বলল, আছে।

যাবার সময় খোকন বলল, "তোমরা বসে থাকো, চাঁদের আলো খেতে বেরিও না। আমরা ঘুরে আসছি।"

কনক সাবধান করে দিল। "এখানে কিন্তু হিম পড়ছে, ঠাণ্ডা লাগাস না। কিছু একটা গায়ে জড়িয়ে যা।"

গায়ে জড়াবার মতন সামানাই ছিল। কনকের গায়ের পাতলা চাদর, বিলাসের একটা সুতীর চাদর, আমার গায়ে ছিল ভেস্ট। ওরা কেউ কিছু নিল না, কানেই তুলল না কথাটা।

যাবার সময় সুমিত কনককে বলল, "আমরা ফিরে এসে তোমার সেই গানটা শুনব।" বলে গানটা মনে করতে গেল, পারল না, খোকনের দিকে চেয়ে বলল, "গানটা যেন কী, খোকনদা?"

খোকন বলল, "টেরিফিক গান। 'আকাশের চাঁদ ঢলিয়া পড়িল কদমের আড়ালে'। ও গান শুনতে হলে ভোর পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে। এই চাঁদ কি এখন ঢলবে? শেষ রাতের আগে নয়। কী বলো কনকপিসী?"

বাবলু হাবাগোবার গলা করে বলল, "কিন্তু খোকনদা, হোয়ার ইজ কদম ট্রি?"

ওরা যেন সবাই এক সঙ্গে উদ্দাম গলায় হেসে উঠল।

আমরাও হাসলাম।

ছেলেমেয়েগুলো হাসতে হাসতে বারান্দা দিয়ে নেমে গেল। আগু পিছু করে হাঁটছে। কুলঝোপ পেরিয়ে গেল। ঝোপের জোনাকি মাথার ওপর ছিটকে উঠল যেন। যত এগুতে লাগল ওরা আড়াল এসে ওদের ঢেকে দিচ্ছিল, ছায়ার মতন হয়ে আসছিল। আচমকা কে মোটা গলায় গান গেয়ে উঠল—বেসুরো ভাবেই—আকাশের চাঁদ ঢলিয়া পড়িল কদমের আড়ালে। চিৎকারটা থামল। তারপর চুপচাপ। একটু পরেই সামান্য কলরব, তারপর শুনি প্রথমে ক্ষীণ একক গলায়—পরে সমবেত গলায় ছেলেমেয়েগুলো গাইছে: 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে...'

গাইতে গাইতে ওরা কখন পুরোপুরি আড়ালে পড়ে গেল। গলা শোনা যাচ্ছিল। গানের মধ্যে হঠাৎ জ্যোৎস্না রাতের গান থামিয়ে ভাঙা মোটা উঁচু গলায় কে যেন কী গাইতে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম বিপ্লবের গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সকলে মিলে তালি বাজাচ্ছে। ক্রমশ ওরা বালিতে উঠল। সেই মূর্তিগুলো পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। গলার স্বর দূরে হতে লাগল।

বিলাস সিগারেট ধরাল। "খাবে মৃণালদা?"

"না।"

কনক শুধু চা খেয়েছিল। চা খেয়ে পান মুখে দিয়েছিল। [illegible]। কনকের মুখ একটু একটু নড়[illegible]

আমরা তিন [illegible] অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম, যেন নিজেদের কথা ভাবছিলাম।

শেষে বিলাস বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ কনক, আমরা একেবারে গেঁয়ো ছিলাম। আমরা আনন্দ করেছি একভাবে, এরা করছে অন্যভাবে। শহুরে ছেলেমেয়ে, কোনো ঝঞ্ঝাট সামলাতে চায় না।"

কনক বলল, "যখনকার যা! তা ভালই করেছে ওরা। ওসব কাঠকুটো জ্বালাবার হাঙ্গামা করতে হলে কোথায় কে পুড়ত-ধুড়ত।"

আমি চুপ করেই থাকলাম। কেন যেন আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল—এখনকার ছেলেমেয়েগুলো যেন আনন্দ জানে না, জানে হললা। আজকের এই বন-ভ্রমণ ওদের কাছে একটা হুজুগ। আমাদের সময় হুজুগ ছিল না, আমরা এর সুখ, আনন্দ, কষ্ট ক্লেশ সবই যেন অনুভব করতে চাইতাম। ওরা ওসব চায় না।

কনকই কথা বলল, "চাঁদুদা একে কি বলত যেন?" বলে কনক আমার দিকে হেসে তাকাল।

চাঁদুদার কথা আমার মনে পড়ল। বড় রসিক মানুষ ছিল। কাজ করত রেলে। চাঁদুদা গোড়ায় গোড়ায় আসত, আমরা তখন ছোটদের দলে। চাঁদাদা বলত, 'চা-চন্দ্রিমা।' বোধ হয় 'মধুচন্দ্রিমা' থেকে কথাটা বানিয়ে ছিল।

বিলাস বলল, "আমাদের এই ব্যাপারটার হাজারটা নাম ছিল। 'চাঁদনি চা' 'চা চন্দ্রিমা' 'মুন লাইট টি' 'মুনলাইট পিকনিক' আরও কত কি! যে যা পারত বলত।"

কনকের কী মনে পড়ে গেল। "যা পারত বলত, যা খুশি করত।" হাসল কনক। "মৃণালদা, তুমি একবার বালিতে গর্ত খুঁড়ে মাথা ডুবিয়ে পা উঁচু করে দাঁড়াতে গিয়েছিলে মনে আছে?" বলে কনক এই বয়েসেও মোটা গলায় কেঁপে কেঁপে হেসে উঠল।

মনে পড়ল। বালি খুঁড়ে মাথা ডুবিয়ে পা তুলে এক কাণ্ড করতে গিয়েছিলাম, রাজ্যের বালি নাকে মুখে চোখে ঢুকে গিয়েছিল। মুখ ভর্তি বালি। আর-একটু হলে মরতাম।

বিলাস নরম গলায় বলল, "মৃণালদার তখন খুব শখ ছিল যোগী বাবাজী হবে।"

আমি হেসে বললাম, "তা ছিল। আর তোমার কী শখ ছিল, বিলাস?"

"রেলের গার্ড হবার। মালগাড়ির গার্ড নয়, বম্বে মেলের।"

"তা আর হওয়া গেল না?" আমি হাসলাম।

"কোথায় আর?" বলে বিলাস সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে হতাশার ভান করল। তারপর একবার কনককে দেখল। বলল, "আমাদের আরও শখসাধ ছিল। কি বলো কনক?"

কনক তাকাল। "কী?"

বিলাস চুপ। মুখে কেমন যেন চাপা হাসি।

কনক একটু তাকিয়ে থাকল। তারপর বুঝতে পারল। হেসেই বলল, সাধ না আহ্লাদ?"

"কেন আহ্লাদ কেন?" বলে বিলাস কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে সোজাসুজি তাকাল, নদীর দিকে। সে চুপ করে গেল। তার হাত পা নড়ছিল না। শান্ত। ডান হাতের আঙুলে সিগারেটটা ছাইয়ে ভরে গেছে। আগুনটা দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে বিলাস হঠাৎ বলল, "ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। সেই শখটা না মিটে ভালই হয়েছে। মিটলে আজ আমার কম আফসোস হত না।"

কনক বিলাসের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সব শুনছিল। বলল, "তা একা তোমারই বা আফসোস হবার কি আছে। সে আফসোস তো আমারও হতে পারত।"

"উঁহু," মাথা নাড়ল বিলাস, "আমার কপাল আরও খারাপ। তুমিই আগে পালাতে।"

"ভগবানের মতন কথা বলো না।... মেয়েরা বড় একটা আগে যায় না। আজ আমায় যা দেখছ, এই রকমই দেখতে। কপালটা আমার তোমার চেয়েও খারাপ। তার চেয়ে বাপু যা হয়েছে এই ভাল।"

বিলাস হাতের সিগারেটটা ফেলে দিল ছুঁড়ে। কনক মাথার কাপড় গুছিয়ে নিল। ঠাণ্ডা ভাবটা ক্রমশই বাড়ছে। বোধ হয় বাতাস দিচ্ছিল বলে। ছেলেমেয়েগুলোকে আর চোখে দেখা যাচ্ছে না, কদাচিৎ অনেক দূর থেকে ভাঙা শব্দ ভেসে আসছে বাতাসে, বোঝা যাচ্ছে মানুষের গলার স্বর, কার গলা বোঝা যাচ্ছে না।

হাই তুলল বিলাস। হাত পা নাড়ল।

তারপর সামান্য ঝুঁকে আমার দিকে তাকাল। হালকা ভাবেই বলল, "মৃণালদা, তুমিই বেস্ট ছিলে। তোমারই কপালটা দেখছি আমাদের তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। তোমার সঙ্গে কনকের বিয়ে হলে দু জনেই বেঁচেবর্তে সুখে থাকতে। খুবই সুখী হতে তোমরা।"

আমি বিলাসকে দেখলাম। তারপর কনককে। কনকের কপালের পাশে সাদা চুল এলোমেলো হয়ে আছে, নাকের ডগায় চশমা ঝুলছে, গোলগাল হাত দুটি কোলের ওপর। ভারী, ভাঙা ঘরোয়া গড়ন নিয়ে কনক বসে আছে।

হৃদয়ে না মনে, নাকি আমার চেতনায় কেমন যেন এক কষ্ট এল। চাপা ধরনের কষ্ট। এই বয়েসে সমস্ত কষ্টই এই শরীরের মতন জড়তা ভরা ও সংকোচন-শীল হয়ে উঠেছে।

কনক আমার চোখের দিকে তাকাল। ওর দু চোখ বোধ হয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে সামান্য উজ্জ্বল হয়েছিল, তারপর শূন্য দেখাল।

কনক নিজেকে গুছিয়ে নিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হাসি মুখে বলল, "সুখী হতাম, না দুঃখী হতাম কে বলতে পারে, কী বলো গো! আমায় বিয়ে করলে তোমার হয়ত এতদিনে কোন অমঙ্গল হত। তার চেয়ে তুমি তোমার ভাগ্যে ভাল আছ, বউদির ভাগ্যও তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে।"

কথাটা কনক জোরে জোরেই বলেছিল, আমি অন্যমনস্ক থাকায় অন্য রকম শুনলাম, যেন কনক আমার কানের কাছে ফিসফিস করেই কথাটা বললে। নিজের ভাগ্যের ওপর অতিপ্রসন্ন হবার কোনো কারণ আমার ছিল না। সাংসারিক অর্থে আমি হয়ত সুখী। স্ত্রী বর্তমান রয়েছেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, তারা আপনমতে স-সন্তান জয়পুরে রয়েছে, জামাইটি চাকরি বাকরি ভালই করে, আমার ছেলেকে আমি অবাধ্য, মূর্খ, দায়িত্বহীন মনে করি না। সে এখনও ছেলেমানুষ। তার সামনে ভবিষ্যৎ রয়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-দের মতন তার জীবন সুখে দুঃখে কেটে যাবে—তাতেও আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি একেবারে নিঃস্ব নই। চাকরির জীবনও শেষ করে ফেলেছি। এখন এই অবসরের জীবনও মন্দ লাগে না। তবু আমি জানি, আমার ভাগ্যের প্রতি অতি-প্রসন্ন হবার কোনো কারণ আমার নেই। অন্তত যদি কনকের কথা ওঠে। কখনও কখনও আমার মনে হয়, জীবনে অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। কনকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যা হতে পারত তা হয়নি। বিলাসের সঙ্গেও কনকের চমৎকার সম্পর্ক হতে বাধা ছিল না। তাও হয়নি। কেন হয়নি তা নিয়ে আজ মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। হয়নি যে, এটাই সত্য।

বিলাসই আবার কথা বলল, "যে যার ভাগ্য নিয়ে আসে, ভাগ্য নিয়েই যায়—এটাই ঠিক কি বলো মৃণালদা?"

কনক বলল, "তা ছাড়া আর কি?"

আমি নিজেকে সামলে নিতে নিতে বললাম, "তুমি যেন বড় ভাগ্যবিশ্বাসী হয়ে উঠেছ বিলাস।"

"তা উঠেছি।"

"কোষ্ঠী করাও নাকি?"

"কে না করায়—" বিলাস হেসেই বলল। তারপর কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "আমাকে বোঝাতে পার কনক, একজন সেজেগুজে হাসি খুশী মুখ নিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে গেল। ফিরে এসে শাড়িটা সবে পাল্টেছে হঠাৎ তার সমস্ত মুখ নীলচে হয়ে গেল। বাতাসের জন্যে খাবি খেতে লাগল। ডাঙায় তোলা মাছের মতন হাঁ। একেবারে ময়লা ছাইয়ের মতন চেহারা হয়ে গেল মুখের। দু তিন ঘণ্টার মধ্যে শেষ। ...এটা কেমন করে হয় ভাগ্য ছাড়া!"

বিলাস একবার কনক অন্যবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর আবার কনকের দিকে। সে যেন বিচিত্র কোনো রহস্য আমাদের সামনে ফেলে রেখে দেখছিল—আমরা কোনো কথা বলি কিনা!

আমরা নীরব থাকলাম। বিলাসের মুখের দিকেও চোখ রাখা গেল না। সামনে তাকিয়ে থাকলাম। ঝোপ ঝাড়, নদী, জঙ্গল একাকার করে জ্যোৎস্না বইছে, তবু সবই যেন অসাড়, শূন্য, বেদনাময়।

বসে থাকতে থাকতে কনক বলল, "তুমি তবু চোখে দেখেছে তোমার বউ চলে যাচ্ছে। আমার বরাতে তাও হয়নি, চোখেও দেখিনি। কোথায় গিয়ে রেলের ব্রিজ তৈরীর কাজ করছিল। দশতলা সমান উঁচু থেকে একেবারে নীচে। লোকে বলে, চেনার মতন কিছুই ছিল না। আমার ভাশুরমশাই একবার না গেলে নয় বলে গিয়েছিলেন, আর কেউ নয়।" বলে কনক একটু থামল, শ্বাস টানল। বলল, "এই রকমই হয়, জীবন বড় নিষ্ঠুর, ওই যে নদী দেখছ, ওর কোথায় কখন পাড় ভেঙে যাবে কেউ জানে না।"

বিলাস চুপ করেই বসে থাকল। কনকও নীরব।

নিজেকে আমার কেমন যেন অপরাধী মনে হল। আমার দুই বাল্যসঙ্গীর যা গেছে আমার যায়নি। ওদের দুঃখ আমার নেই। ওরা যেখানে ফাঁকা, শূন্য আমার সেখনে কোনো শূন্যতা নই। আমি যেন সত্যিই ভাগ্যবান।

যদি ভাগ্যবানই হলাম, ঈশ্বর যদি আমায় এই সৌভাগ্য দিয়েই থাকেন তবে কেন কনক আমার সংসারের মানুষ হল না? কেন?

আমরা তিন বুড়োবুড়ি অনেকক্ষণ যে যার ভাবনা, দুঃখ, হতাশা নিয়ে চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকলাম।

বিলাসই হঠাৎ যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, বলল, "যাক গে, ওসব কথা এখন আর ভেবে কি হবে? মন খারাপ করার জন্যে তো এখানে আসিনি। কি বলো মৃণালদা?" বলে বিলাস আবার নড়েচড়ে বসে সিগারেট ধরাল। গলার সুর পালটে বলল, "এখানে আমরা অনেক সুখ আনন্দ করে গিয়েছি। নদী বেটা ভাবছে—আমাদের এই বয়েসে বেশ জব্দ করেছে। বেটার কাছে আমরা জব্দ হব না।" বলতে বলতে বিলাস এমন করে হাসল যেন হয় ও ছেলেমানুষ না হয় খেপা।

আমার মনে হল, বিলাস গা ঝাড়া দিয়ে দুঃখ ব্যথা থেকে উঠে দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এখনও স্বাভাবিক হতে পারছে না।

আমিও কথা ঘোরালাম, "ছেলেমেয়ে-গুলোর আর তো কোনো সাড়া পাচ্ছি না!"

"ও ঠিকই আছে", বিলাস বলল, "ওদের জন্যে ভেবো না।"

কনক হঠাৎ বিলাসের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার মেয়েটি বেশ। এবার বিয়েথা দেবার চেষ্টা করো।"

"করা তো উচিত", বিলাস বলল, "একটা ভাল ছেলেটেলে খুঁজে দাও না!"

"আমি কোথা থেকে দেব! তোমরা কলকাতার লোক কোন বেমক্কা জায়গায় পড়ে আছি আমি। ...বরং তোমরাই টুনির জন্যে একটা ছেলেটেলে দিও।"

"টুনির বিয়ে কি তোমায় দিতে হবে?"

"অনেকটা তাই। প্রসাদ বেচারা পারে না। বিয়ের খোঁজ খবরটা করে দিতে পারলেও কাজ হয়।"

একটু চুপ করে থেকে বিলাস বলল, "কানু ছেলেটি তো ভালই।"

কনক মাথা নাড়ল। বলল, "না, ওখানে হবে না। অনেক অসুবিধে আছে।"

আমি প্রায় কিছু না ভেবেই বললাম, "বিয়ের বেলায় এত অসুবিধে কেন হয়, কনক? আমি বরাবর এটা দেখে আসছি!"

বিলাস ফট করে বলল, "মৃণালদা, তুমি বাপু তোমার ঘা ভুলতে পারছ না।" বলে জোরে হেসে উঠল।

আমিও হাসলাম। কনকও।

আরও একটু বসে থেকে বিলাস বলল, "মৃণালদা, তোমরা একটু বসো, আমি একবার ঘুরে আসি সামনে থেকে। ছেলে-মেয়েরা তো আসছে না। এলাম যখন একবার নদীর ওপর একটু বেড়িয়ে আসি।"

কনক বলল, "সর্বনাশ! তুমি ঘুরতে যাও তারপর কোন ফাঁক দিয়ে ওরা দেখুক —ফিরে এসে আমাদের হেনস্তা করবে।"

"দেখতে পাবে না।"

"পাবে। ওদের চোখ তোমার আমার নয়। জোয়ান ছেলেমেয়ের চোখ।"

"পাবে পাক। ওদের ভয়ে বসে থাকব নাকি! এসেছি যখন একটু ঘুরে আসি!"

বিলাস উঠছে দেখে আমিও বললাম, "চলো, আমিও যাই। বসে থেকে থেকে পা ধরে গেল। সামনের দিকে একটু পায়চারি করে আসি।"

কনকই বা কেন একলা বসে থাকবে! আমরা তিন বুড়োবুড়ি ছেলেমেয়েদের অসাক্ষাতে বিট-বাংলোর বারান্দা দিয়ে নীচে নেমে এলাম।

সামনের দিকটায় পাতলা ঝোপ জঙ্গল, কোথাও শালের চারা, কোথাও আমলকী ঝোপ, বুনো কুলের গাছ। অল্প এগিয়ে নদীর পাড়, মাঝখানে ঢালু পথ, এবড়ো খেবড়ো, বোধ হয় এখনও নদীতে গরুর গাড়ি আসে। ওপার থেকে গ্রামের ব্যাপারীরা শাক সবজি, কুমড়ো, তিসি, সরষে নিয়ে হাটে যায় গরুর গাড়ি চেপে।

কনকের হাত ধরে বিলাস পথটুকু পার করে দিল।

নদীর চরে এসে আমরা দাঁড়ালাম। এবার আর ডাইনে বাঁয়ে কোনো আড়াল নেই। অনেকটা দেখা যাচ্ছিল। দূরে দূর। ছেলেমেয়েগুলোকে বাস্তবিক দেখা যাচ্ছে না, তবে ওরা আছে বোঝা যাচ্ছিল। বাতাসে গলার স্বর ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে।

আমরা তিন জনে বালির ওপর হাঁটতে লাগলাম। কনক অসুবিধে বোধ করছিল। পা ডুবে যাচ্ছিল। এখানে বালি একেবারে শুকনো।

বিলাস বলল, "মৃণালদা, কটা পাতা কুড়িয়ে আনব নাকি?"

"কেন?"

"জ্বালিয়ে দি। ওরা দেখতে পাবে। ঘাবড়ে যাবে খুব।"

"না না," মাথা নাড়ল কনক, "বুড়ো বয়েসে আর ছেলেমানুষী করতে হবে না।"

"বুড়োরাই ছেলেমানুষী করে।" বিলাস যেন ছেলেমানুষীই করছিল।

আমি বললাম, "পাতা পাবে কোথায়? জ্বালাবেই বা কেমন করে?"

"দেশলাই আছে।"

"শুধু দেশলাইয়ে হবে না। কেরাসিন তেল চাই।"

"হবে," বিলাস বলল, "একটু নিশ্চয় জ্বলবে।"

পাতা জ্বালাবার এই শখ বিলাসের কেন হল জানি না, সে শুকনো পাতার খোঁজে কাছাকাছি চলে গেল।

আমি আর কনক দাঁড়িয়ে থাকলাম বালির ওপর। চারদিক শূন্য। ঝিঁঝির ডাক। মাথার ওপর কতকালের সেই চাঁদ যেন আমাদের এই দশা দেখছিল। ঠান্ডা পড়েছে এখানে। বাতাস বয়েছে নদীর। হেমন্তের হিম। জঙ্গলের গন্ধ। নদীর জল বয়ে যাবার মৃদু এক শব্দ আসছিল।

কনক বলল, "বসবে?"

"বসো।"

কনক বসল, তার পাশে আমি।

বসেই থাকলাম। বিলাস আসছে না। ছেলেমেয়েগুলো বুঝি ফিরতে শুরু করেছে।

হঠাৎ কনক বলল, "আমরা মরে গেলেও কেউই জানবে না—কি বলো?"

"কী?"

"কী আর! এই যে এখানে কত বার এসেছিলাম, কত আনন্দ করেছিলাম, কত কী ভেবেছিলাম...।" বলতে বলতে কনক থেমে গেল, থেমে গিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল।

কনক যা বলল না, আমি তা বুঝতে পারলাম। অনুভবও করতে পারলাম। মানুষ বুড়ো হয়, তবু তো তার অনুভব যায় না। আমরা কী ভেবেছিলাম, কী ভাবিনি, কী ঘটা উচিত ছিল কী ঘটল না —সব যেন একাকার করে এক বিচিত্র বেদনা বুকের মধ্যে চাপ হয়ে জমতে লাগল। চোখ ফেরাতেই হল। আকাশের ওপর আমাদের সেই পুরোনো চাঁদ, যার তলায় দাঁড়িয়ে এই নদীতীরে একদিন আমি কনকের জ্বলন্ত আঁচল নিবিয়ে দিয়েছি, যার মুখ থেকে মাথা থেকে বালির রাশ মুছিয়ে দিয়েছি, একদিন এখানে যার পাশা-পাশি আড় হয়ে শুয়ে বলেছি—কেউ কাউকে

ছেড়ে বাঁচব না—মরার সময় সহমরণে যাব। আমাদের এত কথার—এত ঘটনার সাক্ষী সেই চাঁদ তো আজও আছে। অথচ আমরা আর নেই। কেন এই আকাশ থাকে, নদী থাকে, জঙ্গল থাকে—অথচ আমরা থাকি না?

সামান্য দূরে বিলাসের গলা পাওয়া গেল। আসছে বিলাস।

তাকিয়ে দেখি বিলাস একটা শুকনো পাতলা ডাল টানতে টানতে নিয়ে আসছে। সত্যিই ওকে ছেলেমানুষীতে পেয়েছে।

বিলাস সামনে এসে বলল, "এই ডালটায় কিছু শুকনো পাতা আছে। জ্বালিয়ে দি।"

কনক বলল, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, এই ডাল কী জ্বলে!"

"লেট্ আস ট্রাই।"

শুকনো শীর্ণ ডালটাকে বালিতে রেখে বিলাস দেশলাই জ্বালাতে বসল। ওর কাণ্ড দেখে হাসাই উচিত। অথচ আমরা তেমন করে কেউই হাসছিলাম না। দেখছিলাম বিলাসকে। উবু হয়ে বসে পর পর দেশলাই জ্বালাচ্ছে, কাঠি নিবে যাচ্ছিল বাতাসে।

বিলাস বলল, "তোমরা একটু আড়াল করো তো। দেখি বেটা জ্বলে কি না।"

আমি আর কনক আড়াল করলাম। তিন দিক ঘিরে তিনজন, মাঝখানে সেই শীর্ণ মরা ডাল, সামান্য কিছু পাতা লেগে আছে।

বিলাস বার বার চেষ্টা করতে লাগল। পাতা জ্বলছিল না। হিমে ঠাণ্ডা হয়ে আছে বলেই বোধ হয়।

দেশলাইয়ের বাক্স প্রায় ফুরিয়ে ফেলল বিলাস। তার যেন জেদ চড়ে উঠেছে। আমরা ডালটা ঘিরে বসে আছি। হঠাৎ বাতাস এল। কনক দেখি বাতাস ঠেকাতে তার আঁচল আড়াল করল। আর তখনই আমার মনে হল, আমরা তিন বুড়োবুড়ি একটা ঠাণ্ডা, ভেজা, মরা, শীর্ণ ভাঙা গাছের ডাল জ্বালাবার এই যে চেষ্টা করছি এ যেন আমাদেরই অস্তিত্বের কিছু। যদি না জ্বলে তবে বুঝি সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হঠাৎ আমি পকেট থেকে রুমালটা বার করে ফেলে দিলাম। বললাম, "বিলাস, আগে ওটা জ্বালিয়ে নাও। নিয়ে পাতাগুলোর তলায় দিয়ে দাও।"

বিলাস একটু ইতস্তত করল। তারপর রুমালটা জ্বালিয়ে নিল।

কনক জ্বলন্ত রুমালটা পাতাগুলোর তলায় কোনো রকমে ঢুকিয়ে দিল।

কাপড় পোড়া গন্ধ নাকে লাগছিল। রুমালটা জ্বলছে।

দেখতে দেখতে হিমে ভেজা ঠাণ্ডা পাতায় ধোঁয়া উঠতে লাগল, তারপর কখন সেই পাতাগুলো জ্বলে উঠল দপ করে। জ্বলে যাবার পর বিলাস মহা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'জ্বলেছে।'

আমি আর কনক দেখছিলাম, জ্বলেছে বটে কিন্তু পাতা কটা জ্বলেই আবার নিবে যাবে, ডালটা আর জ্বলবে না।

আমরা পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম।

পাতা পোড়ার গন্ধ আমায় যেন ক্রমশ সেই অতীতের মধ্যে ধরে ফেলতে চাইছিল। কনকের দিকে তাকালাম। তার চোখে বয়েস হারিয়ে গেছে। বিলাসের দিকে চোখ ফেরালাম. বিলাস কেমন স্নিগ্ধ চোখে আগুন দেখছে।

হঠাৎ শুনি দূরে থেকে ছেলেমেয়েরা হাঁক দিচ্ছে : "তোমরা কী করছ? কী করছ ওখানে আগুন জ্বালিয়ে?"

ধরা পড়ে আমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করলাম।

বিলাস উঠে দাঁড়াল। ...ওয়ে মুখের সামনে দু হাতের চোঙা পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল. "আমরা আগুন জ্বেলেছি।"

দেখলাম দূরে থেকে ছেলেমেয়েগুলো জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। ছুটে আসতে আসতে ওদের মধ্যে কে যেন বলল, "আগুন জ্বেলেছ কেন?"

বিলাস বলল, "আগুন পোয়াচ্ছি। তাতিয়ে নিচ্ছি।"

আমরা আর কেউ কিছু বললাম না। তিনজনে তিনজনের দিকে তাকালাম। কনকের চোখে জল এসেছিল। বিলাসেরও চোখ ছলছল করে উঠল। অতি সৌভাগ্যবান আমি মুখ নীচু করে দেখলাম। আগুনটা এবার নিবে যাবার মতন হয়ে এসেছে। সবই বড় অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

ছেলেমেয়েরা ছুটেই আসছে চেঁচাতে চেঁচাতে। ভয় পেয়েছে বোধ হয়।

॥ ১২ ॥
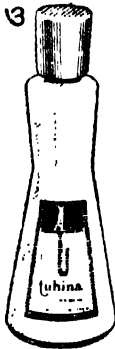
ডঃ যোশীর তখন জঠর-জ্বালা মিটেছে। গুপ্তজীরও খানিকটা তাই। ও'রা দুজনেই অভুক্ত ছিলেন অনেকক্ষণ। ও'রা কী-কী খাচ্ছেন তা তখন দেখিনি। শুধু দেখেছিলাম আশকজী তখন বিছানা থেকে উঠে বসেছেন। সামনে তাঁর গেলাস ভরতি ওষুধ। সেটা তিনি তখন খাবো-কি খাবো-না করছেন।

যোশীজী বললেন—ওষুধটা খেয়ে নিন না আশকজী! অত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন?

আশকজী বললেন—আরে, এটা কি ওষুধ? এটা তো দেখছি হুইস্কি। হুইস্কি খাওয়াতেই আমাকে এখানে নিয়ে এলে নাকি ডাক্তার—

গুপ্তজী বললেন—হুইস্কিও তো এক-রকম ওষুধ আশকজী। দেখেননি, প্রত্যেক ওষুধে কত অ্যালকোহল থাকে। এক-একটা ওষুধে তো থার্টি-পার্সেণ্ট পর্যন্ত অ্যালকোহলও থাকতে দেখেছি—

আশকজী বললেন—কিন্তু হুইস্কি যে জীবনে কখনও খাইনি আমি।

যোশীজী বললে—কখনও খাননি বলে এখন খাবেন না, এটা কি কোনও যুক্তি হলো। আপনার উপন্যাসের চরিত্ররা তো দেখেছি খুব হুইস্কি খায়—

আশকজী বললেন—আরে, উপন্যাসের চরিত্রের লিভার আর আমার লিভার কি এক হলো? বর্নার্ড শ' নিজে তো নিরামিষ খেতেন তা বলে তাঁর নাটকের পাত্র-পাত্রীরাও কি নিরামিশাষী বলতে চাও?

যোশীজী বললেন—কে বললে বার্নার্ড শ' নিরামিষ খেতেন?

আশকজী বললেন—আমি বলছি তিনি ছিলেন খাঁটি ভেজিটেরিয়ান—

যোশীজী বললেন—কখখনো না, এক-বার এই নিয়ে তর্ক হয়েছিল, তা জানেন?

—তর্ক?

তর্কটা পুরোন। ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক এইচ জি ওয়েলস খুব মদ-মাছ-মাংস খেতেন। খুব ভাল স্বাস্থ্য। ইয় দশাসই চেহারা। অনেকগুলো রক্ষিতা রেখেছিলেন। ওটা ছিল তখনকার দিনে লেখকদের প্রতিষ্ঠার লক্ষণ। যেমন খেতে পারতেন গোগ্রাসে তেমনি আবার নানা-ধরনের বই লিখতেও পারতেন। আর কিব-জোড়া নাম ছিল তাঁর তখন।

একজন একদিন তাঁকে বললেন—আপনার চেয়ে বার্নার্ড শ'র নাম বেশি কেন বলুন তো মিস্টার ওয়েলস্?

ওয়েলস্ তো রেগেমেগে অস্থির। বললেন—কে বললে আমার চেয়ে বার্নার্ড শ'র নাম বেশি? শ'তো শুধু নাটক লেখে, আর উল্টো-পাল্টা কথা বলে। উল্টো-পাল্টা কথা বলে বলেই শ' হাওয়া-গরম করে। কিন্তু সেটা তো গরম তেলেভাজার মত। তেলে-ভাজা খেলে তো মানুষের পেটই গরম হয়। শ'র লেখাগুলো তাই। ও তো বেশি দিন টি'কবে না। শ' মারা যাবার পর দেখবে ওর বই বিক্রিও একেবারে কমে যাবে—আর আমার নাম চিরকাল থাকবে—দেখে নিও—

বন্ধু বললেন—কে টি'কবে আর কে টি'কবে না তা কি আর কেউ আগে থেকে বলতে পারে?

ওয়েলস্ বললেন আলবাৎ বলতে পারে। আর কেউ বলতে পারুক না-পারুক, আমি বলতে পারি।

বন্ধু বললেন—সে যদি আপনি বলতে পারেন তো ভালোই, কিন্তু আসলে শ' নিরামিষ খাবার খান বলেই ও'র লেখা অত ভালো হয়, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়—

খবরটা শুনে ওয়েলস্ আরো রেগে গেলেন। বললেন—শ' নিরামিষ খায়? কে বললে তোমাকে শুনি?

বন্ধু বললেন—আমি নিজের চোখে ও'কে নিরামিষ খাবার খেতে দেখেছি—

ওয়েলস্ বললেন—ও-সব ভড়ং। বাইরে ওই লোক-দেখানো নিরামিষ খাওয়া, ভেতরে বাড়ির মধ্যে আলমারি খুললে দেখবে কত রকম 'লিভার-এক্সট্র্যাক্ট' সেখানে আছে। প্রোটিন না খেলে কি লেখক হওয়া যায় হে? প্রোটিনও খেতে হয় আবার তার সঙ্গে হুইস্কিও খেতে হয়—

বলে গেলাস থেকে ঢক্ ঢক্ করে হুইস্কি ঢালতেন মুখে।

কথাগুলো বলে যোগীজী চেয়ার থেকে উঠে আবার ভেতরে চলে গেলেন। তারপর বোধ হয় মিট্-সেফ থেকে মুরগীর রোস্ট নিয়ে এসে চিবোতে লাগলেন। আমি অবাক। বললাম—একি, আপনি কি মুরগী খান নাকি?

যোগীজী বললে—এখানে এসে পর্যন্ত তো কেবল অনিয়মই করছি, এই নিয়মটাই বা আর কেন মানি—! আমি ওয়েলস্ সাহেবের ফলোয়ার, হুইস্কি খাবো অথচ প্রোটিন খাবো না—তা কি হয়?

সত্যিই যে কদিন আমাদের সবাই মরিশাসে ছিলাম, সে-কদিন কেউই জীবন-যাপনের প্রাত্যহিক নিয়ম-কানুন মানেনি।

ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম। দেখি তখন রাত সাড়ে তিনটে। তার ওপর আবার শীতের রাত। শুনেছি মানুষের জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ নাকি ঘুমিয়েই কেটে যায়। বাকি এক ভাগের মধ্যে সমাজ আছে, সংসার আছে, জীবিকা-নির্বাহ আছে, স্বাস্থ্যও আছে। সে-সব কিছুর জন্যে সময় ব্যয় করে যেটুকু সময় কাজের জন্যে বাঁচে তা নিতান্তই নগণ্য।

এই কথা ভেবে ছোটবেলাতেই ঠিক করে নিয়েছিলাম যে রাতটা নষ্ট করলে চলবে না।

ফ্রান্সের লেখক ফ্লবেয়ার রাত জেগে লেখার জন্যে জগতে সুবিখ্যাত। নদীর ধারে ছিল তাঁর বাড়ি। তখনকার দিনে ইলেকট্রিক আলো ছিল না। অনুজ্জ্বল মোমবাতির আলোয় তিনি সমস্ত রাত জেগে জেগে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ম্যাডাম বোভারি' লিখেছিলেন। এক-একটা শব্দ, এক-একটা দৃশ্য কেমন করে লিখবেন তা ভাবতে ভাবতে কখন রাত কাবার হয়ে যেত তিনি তা টের পেতেন না। গভীর রাতে নদীর ওপর দিয়ে যখন নৌকোগুলো ভাসতে ভাসতে যেত মাঝি-মাল্লারা সেই অন্ধকারে দিকনির্দেশ করতে পারতো না। তখন হঠাৎ কোথাও আলো দেখতে পেলেই বুঝতো যে ওটা ফ্লবেয়ারের বাড়ি। তখন আর তাদের দিক নির্ণয়ে কোনও অসুবিধে হতো না।

কিন্তু সব চেয়ে বেশি রাত যিনি নিয়ম করে জাগতেন তিনি হলেন আর একজন ফরাসী লেখক—বালজাক। বালজাকের জীবনীকার বলেছেন—'Balzac was the watch-dog of Paris' অর্থাৎ বালজাক ছিলেন প্যারিস শহরের পাহারাদার কুকুর। তিনি একটা তিন-চার-তলা উঁচু বাড়ির চিলেকোঠার ভেতরে রাত জেগে জেগে লিখতেন। যেখান থেকে সমস্ত শহরটা সরাসরি দেখতে পাওয়া যেত।

তাঁর লেখবার পদ্ধতিটা ছিল বিচিত্র। সন্ধ্যে সাতটা আটটার মধ্যে রাতের খাওয়াটা তিনি খেয়ে নিতেন। বাড়ির পরিচারককে বলা থাকতো সে তাঁকে রাত বারোটার সময় ডেকে জাগিয়ে দেবে আর আলো জেলে দেবে। তিনি সেই রাত বারোটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত একনাগাড়ে লিখে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। আর সেই সকাল ছটার সময় ছাপাখানা থেকে লোক এসে লেখা পাতা-গুলো ঘর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে ছাপাতে চলে যেত। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় "He was the greatest creator of human characters next to God."

চার্লস ডিকেন্স ইংরেজ লেখক। তিনি বালজাকের মত লেখার জন্যে রাত জাগতেন না। কিন্তু রাত্রে তিনি লনডনের রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বেড়াতেন। মাঝরাত

পর্যন্ত এই ছিল তাঁর কাজ। ফুটপাথে যারা শোয়, রাস্তায় যারা সংসার-ধর্ম করে তাদের অবস্থা তিনি নিজের চোখে দেখতেন। তারপর তিনি নিজের বাড়িতে এসে অনেক রাত্রে বিছানায় শুয়ে পড়তেন।

এবার আমাদের দেশের লেখক শরৎচন্দ্রের কথা বলি।

জলধর সেন ছিলেন 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক। 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ধারাবাহিক বেরোত। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে লেখার কিস্তি আদায় করাই ছিল এক মহা সমস্যা। ঠিক সময়ে কিছুতেই লেখা পাওয়া যেত না তাঁর কাছ থেকে। কলকাতা থেকে জলধর সেন মশাই সে গ্রামের মধ্যে গিয়ে প্রায়ই হাজির হতেন। জলধর সেন মশাইকে দেখে বড় বিব্রত হতেন শরৎচন্দ্র। একে তো মাথায় লেখা নেই, তার ওপর সম্পাদকমশাই নিজে এত কষ্ট করে এত টাকা খরচ করে সশরীরে এসে হাজির, এতে বিব্রত হওয়ারই কথা।

তাঁকে দেখেই শরৎচন্দ্র সংগে সংগে বাড়ির ভেতরে খবর পাঠাতেন জলধর সেনের খাওয়ার আয়োজন করতে।

কিন্তু জলধর সেনের পণ তিনি লেখা না পাওয়া পর্যন্ত জল-স্পর্শ করবেন না। বলতেন—আমি এই এখানে সত্যাগ্রহ শুরু করতে বসলুম লেখা না পেলে আমি এখানেই আত্মাহুতি দেব—

জলধর সেন মশাই ছিলেন ভোজন-বিলাসী মানুষ। খানিক পীড়াপীড়ি করতেই খেতে রাজি হয়ে যেতেন। তবে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিতেন যে এক-দিনের মধ্যেই তাঁর হাতে লেখাটি লিখে দেবেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের কলম ধরতেই যত আলস্য। সমস্ত দিন একসংগে খেয়ে, গল্প করেই কেটে যেত। একটা লাইনও জলধর সেন তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারতেন না। জলধর সেন বলতেন কই, কলম ধরুন, আমি আর কতদিন এখানে পড়ে থাকবো?

শরৎচন্দ্র বলতেন—হবে, হবে। আপনি রাত্রিটাও এখানে থেকে যান না। রাত্রে আপনার জন্যে মাংস করতে বলেছি—

মাংসের সংবাদটা শুনে সেনমশাই একটু নরম হতেন। বলতেন—ঠিক আছে, রাতটা না-হয় থাকলুম, কিন্তু কাল সকাল-বেলাই আমি চলে যাবো, তার মধ্যে আমার লেখা চাই, আপনি আর সময় নষ্ট করবেন না। কলম ধরুন—

সে-রাত্রিটা জলধর সেন শরৎচন্দ্রের গৃহেই কাটালেন। হঠাৎ মাঝরাত্রে জলধর সেন মশাই-এর ঘুম ভেঙে গেছে। চারদিক নিঝুম, বাড়ির পাশেই রূপনারায়ণের জলের ছল্-ছলাৎ শব্দ কানে আসছে। এক গ্লাস জল খেয়ে আবার তিনি বিছানায় শুতে যাচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়লো নদীর দিকের বারান্দায় কে যেন অন্ধকারে পায়চারি করছে। এই মাঝরাত্রে কে ওখানে পায়চারি করে? ভালো করে ঠাহর করে দেখতে চেষ্টা করতেই সেনমশাই বুঝতে পারলেন ও আর কেউ নয় স্বয়ং শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের তখন মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে। সম্পাদক স্বয়ং বাড়িতে এসে হাজির, পাঠকরাও অধীর হয়ে পরের সংখ্যা পড়বার জন্যে ছটফট করছে, এ বিপদের কথা বাইরের কাউকে জানবার কথা নয়, না জানবে সম্পাদক, না পাঠককুল। একা লেখক রাতের পর রাত, দিনের পর দিন জেগে মানুষের সেবা করে চলেছেন।

জলধর সেন সেই দৃশ্য দেখে আর কিছু বললেন না। সেই দিকে চেয়ে বুঝতে

পারলেন কেন শরৎচন্দ্রের লেখা দিতে অত দেরি হয়। কেন শরৎচন্দ্রের অসুখ হয়, কেন কলম ধরতে তাঁর অত আলস্য হয়।

প্রথম জীবনে লেখক লেখে নিজের তাগিদে, পরে পাঠককুল তাগিদ দিয়ে তাকে লেখায়। তখন লেখককে রাত জাগতেই হয়। কিন্তু বালজাকের মতন এমন লেখকও আছে যারা বরাবরই নিজের তাগিদে লেখে। এদের নিয়েই হয় বিপদ। এরা সমস্ত জীবনই রাত জেগে লেখে এবং বালজাকের মতোই শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

রাত-জাগা নিয়ে যোশীজী আর গুপ্তজীর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ আলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল যে তার মধ্যে আশকজীর কথা আর আমাদের মনে ছিল না। যোশীজী হচ্ছেন জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা-মূলক সাহিত্যের অধ্যাপক, গুপ্তজী হচ্ছেন দিল্লির এক সুবিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশনা সংস্থার অন্যতম ডাইরেক্টর। সুতরাং বলতে গেলে আমরা তিনজনেই একই ভাবনা দ্বারা পরিপুষ্ট। অর্থাৎ প্রকাশক সমালোচক ও লেখকের চূড়ামণি যোগ। দিল্লি-কলকাতা-জব্বলপুরের সমন্বয়। আর যিনি অসুস্থ সেই আশকজী হচ্ছেন এলাহাবাদবাসী। হিন্দী সাহিত্যের সে-ও এক পীঠস্থান বটে।

হঠাৎ নজরে পড়লো আশকজী কখন উঠে বসেছেন তা আমরা টের পাইনি।

জিজ্ঞেস করলাম—এখন কেমন আছেন আশকজী?

আশকজী বললেন—একটু ভালো বোধ করছি—

যোশীজী বললেন—তাহলে ডাক্তার রামফল ঠিক ওষুধই দিয়েছিল বলুন। আপনি আর এক পেগ নিন—

বলে একটা গেলাসে এক পেগ হুইস্কি ঢেলে আশকজীর দিকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু আশকজী সেটা নিলেন না। বললেন—আগে ডাক্তার আসুক, তারপর নেব। কিন্তু ডাক্তার গেল কোথায় বলো তো? এদিকে ঘড়িতে যে ভোর চারটে বেজে গেল, কখন ঘুমোব—

*

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, এক-একজন মানুষের সঙ্গে ট্রেনে, ধর্মশালায়, হোটেলে, বা কোনও তীর্থস্থানে এমন ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে যায় যে মনে হয় আমরা বুঝি জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধু। পরস্পরের ঠিকানা বিনিময় হয়ে যায়। কথা দেওয়া হয়ে যায় যে বাড়িতে ফিরে গিয়েই পরস্পরকে পরস্পরে চিঠি দেব। কিন্তু কোথায় কী! আবার অচেনা মানুষ চিরকালের মত অচেনাই থেকে যায়।

মনে আছে রাত চারটে পর্যন্ত জাগবার পরে ভাবছিলাম হোটেলে গিয়ে হয়ত আর ঘুমই আসবে না। শীতের রাতের ভোর-বেলার দিকটাতেই যা কিছু মজা। কিন্তু আমার জীবনে সেই মজাটা উপভোগ কর-বার সৌভাগ্য কোনওদিনই হলো না। রামফল যখন সেই ভোরবেলা সেই অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে আবার সকলকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল তখন মুশকিল হলো আমাকে নিয়ে। আমার ঘরের চাবি রেখে দিয়ে গিয়েছিলাম হোটেলের কাউন্টারে। কিন্তু কাউন্টারের সদর দরজায় তখন তালা বন্ধ। সব অন্ধকার। এখন কী হবে? যোশীজী বললেন—আপনি আমার ঘরে শোবেন আসুন দাদা, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না—

ডঃ যোশী ভারি উদারনৈতিক মানুষ। নিজের বিদ্যায় তিনি যেমন পারদর্শী, তেমনি আবার মানসিকতার দিক দিয়েও দিলখোলা। আমার বিছানাটা তিনি নিজের হাতেই শয়নোপযোগী করে দিলেন। আমার পানীয় জল প্রয়োজন হবে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বললেন—আপনি আগে শুয়ে পড়ুন দাদা, তারপর আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে শোব—

আমি আত্মনিন্দা করছি না কিন্তু আমি এও অকপটে আজ স্বীকার করছি হিন্দি মালয়ালাম গুজরাটি বা মারাঠি প্রভৃতি ভাষা-

ভাষী পাঠকদের কাছ থেকে এ-যাবৎ যে প্রীতি-ভালবাসা পেয়েছি তা এখানে পাইনি। নইলে যোশীজী আমার কে? তিনি তো আমার একজন পাঠক ভিন্ন আর কেউই নন্। সেই অপরিচিত অজ্ঞাত বিদেশে যোশীজীর মত মানুষরা আমাকে যে প্রীতি দিয়ে নিজের হাতে আমার শয্যা রচনা করে দিলেন তা কে করে? অথচ আমি তো জানি আমি একজন অভাজন ছাড়া আর কিছুই নই। যে ভাষায় আমাদের অগ্রজ মহৎ মনীষীরা লিখে গেছেন আমি সেই বাংলা ভাষাতেই লিখি এই পর্যন্ত। আমার কাছ থেকে তো কোনও প্রত্যুপকারের প্রত্যাশাও তার নেই। দু'দিন পরে যে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে সে-আশাও তো নেই।

তা অমন রাত্রি-জাগরণে আমি অভ্যস্ত। ওটা আমার গা-সওয়া জিনিস। কোনও-রকমে চোখ বুজিয়ে আবার ঘণ্টা দুয়েক পরে শয্যা-ত্যাগ করে নিজের ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নিতে বেশি সময় লাগলো না। তারপরে যথারীতি জালিম এসে যথা-সময়ে আমাকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিলে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী খবর তোমার জালিম? মুখটা গম্ভীর-গম্ভীর কেন?

জালিম হাসলো। বুঝলাম চেষ্টাকৃত হাসিটা। বললে—না, গম্ভীর তো নয়, এই তো হাসছি—

সত্যিই জালিমকে হাসলে খুব ভালো দেখায়।

বললাম—আমাদের নিয়ে তোমার খুব খাটুনি চলছে, না জালিম? আমরা তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি!

জালিম বললে—আপনি কী বলছেন স্যার? আপনাদের সেবা করতে পারছি বলে তো আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি—

বললাম—তুমি অমন করে বোল না জালিম। যে তোমার জালিম নাম রেখেছিল তার অনেক দূরদৃষ্টি ছিল, তা জানো?

—কেন স্যার?

বললাম—হ্যাঁ, আমাদের ইণ্ডিয়াতে জালিম মানে কী জানো? জালিম মানে প্রিয়। যে আমাদের খুব প্রিয় তাকেই আমরা জালিম বলি। তুমিও আমাদের কাছে তাই।

জালিম বোধহয় আমার কথায় একটু লজ্জা পেলে। কিন্তু কিছু কথা বললে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম—তোমার বন্ধুর খবর কী? সেই শিউপুজন? সে কেমন আছে?

জালিম প্রথমে কিছু বলতে চাইলে না। একটু মাথা নিচু করে রইল। তারপর আবার মুখ তুললে। বললে—শিউপুজনের সঙ্গে রায়নার খুব ঝগড়া হয়ে গেছে স্যার কালকে—

—সে কী? কেন?

—আপনি কাল চলে যাবার পর থেকে শিউপুজন খুব কাঁদছে। আমি যখন কাল 'রামলীলা' দেখে বাড়ি ফিরেছি, তখন রাত দুটো। তখন দেখি শিউপুজন আমার বাড়িতে বসে আছে আমার জন্যে। সে নাকি সারাদিন কিছু খায়নি।

—কেন?

—আপনি চলে আসার পরই ওদের স্বামী-স্ত্রীতে খুব ঝগড়া হয়েছে। স্ত্রীও খায়নি, স্বামীও খায়নি।

বললাম—ঝগড়াটা কী নিয়ে?

জালিম বললে—যা নিয়ে চিরকাল ওদের ঝগড়া হয় তাই নিয়ে—।

আমি আরো স্পষ্ট করে জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম—সেই ইণ্ডিয়ায় গিয়ে সিনেমায় নামবার জন্যে?

জালিম বললে—তা ছাড়া আর কী!

জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, জালিম, তোমার বন্ধুর ছেলে-মেয়ে কিছু হয় না কেন? বাচ্চা-টাচ্চা কিছু হলে হয়ত এরকম হতো না। অন্তত আমার তাই মনে হয়—

জালিম বললে—সে-কথা তো আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম শিউপুজনকে। শিউপুজন বলেছিল রায়না ও-সব চায় না।

—কেন, চায় না কেন?

—রায়না বলে ওতে নাকি মেয়েদের ফিগার খারাপ হয়ে যায়। একবার ফিগার খারাপ হয়ে গেলে আর সে সিনেমায় চান্স পাবে না।

বুঝলাম ইণ্ডিয়ার সিনেমা-পত্রিকাগুলোই এই সর্বনাশ করেছে রায়নার। সিনেমা ছেলেমেয়ে-বউদের যত না সর্বনাশ করে তার হাজার গুণ বেশি সর্বনাশ করে ওই সিনেমা-পত্রিকাগুলো। কিন্তু কে এসব বোঝাবে রায়নাকে? দিল্লিতে যখন শিউ-পুজন কলেজে পড়তো, তখন সে হোস্টেলে থেকে পড়তো। মাথার ওপর তার অভি-ভাবক বলতে তখন কেউ ছিল না। মরিশাস থেকে বাবা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যে-টাকা পাঠাতো তার অর্ধেক টাকাতেই তার চলে যেত। বরাবর লাজুক-স্বভাবের ছেলে ছিল সে। না যেত কোনও সিনেমায়, না কোনও পার্টিতে। বলতে গেলে মরিশাসের মত শান্ত আবহাওয়া থেকে একেবারে ইণ্ডিয়ার সব চেয়ে সরগরম শহরে এসে আরো লাজুক আরো আড়ষ্ট হয়ে গেল। যখনই নিঃসঙ্গ লাগতো তখনই নিজের ঘরের

মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিত আর 'রাম-চরিত' মানস থেকে চুপি চুপি আবৃত্তি করতো—

মো সব দীন ন দীন হিত তুম্ সমান রঘুবীর।
অস্ বিচারি রঘুবংশমণি হরহু বিষম ভবভীর॥

অর্থাৎ—হে রঘুবীর আমার মত দীন-হীনও কেউ নেই আর তোমার মত দীন-বন্ধুও কেউ নেই। এই পরিস্থিতি বিচার করে হে রঘুবংশমণি তুমি আমাকে আমার ভব-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করো।

তখনই প্রথম কবিতা লেখবার ইচ্ছে হলো শিউপূজনের। সে নোটবুকের পাতায় কবিতা লিখতে লাগলো। তখনকার প্রায় সব কবিতাগুলোই জালিমের মুখস্থ ছিল। একটা কবিতা আমার খুব ভালো লেগেছিল। একটা কবিতা এখানে অনুবাদ করে দিই—

প্রভু, যুগে যুগে তুমি দূত হয়ে এসেছ
কখনও বেথলিহেমে, কখনও গ্রীসে, আবার
কখনও বা ইণ্ডিয়ায়।
তোমাকে কখনও ক্রুশে বিঁধে মেরেছি
আমরা
কখনও বিষ খাইয়ে, আবার কখনও বা
গুলি করে।
তুমি আমাদের ক্ষমা করেছ বার-বার
কিন্তু আমরা?

আবার পাছে কখনও দূত হয়ে এখানে
আসো

তাই আমাদের এত সতর্ক পাহারা।
তোমার বড় হওয়ার অপরাধ আমরা কখনও
ক্ষমা করিনি, করবোও না—
যদি পারো তো একবার ছোট হয়ে এসো,
আমাদের মত ছোট মাপের—
আমরা তখন তোমাকে নিজের মানুষ বলে
গলা জড়িয়ে ধরে আদর করবো, দেখে
নিও—

প্রভু তুমি আসছো না বলে আমাদের
কিন্তু ক্ষোভ নেই।
আমাদের অভ্যাস তা বলে আমরা ছাড়িনি।
তাই নিজেদেরই খুন করে
আমাদের হাতের টিপ্ আমরা ঠিক রাখছি।
আর
মিলিয়ে দেখছি কার রক্ত বেশি লাল
তোমার না আমাদের
বড়'র না ছোটর॥

একদিন হঠাৎ হাতের খাতাটা কী-রকম ভাবে রায়নার হাতে পড়ে গিয়েছিল। খুলে দেখে সেখানা কবিতায় ভর্তি। ভেতরে কবিতা দেখেই সে চমকে উঠেছিল।

—আরে, ইউ আর এ পোয়েট? তুমি কবিতা লেখো?

কবিতা লেখা জিনিসটা যে লজ্জার তা শিউপূজন জানতো। খাতাটা সে তাড়াতাড়ি কেড়ে নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু রায়না তখন খাতাটা নিয়ে কমন-রুমের মধ্যে দৌড়ে পালিয়েছে। সেখানে একপাল ছেলের মধ্যে গিয়ে খাতাটা নিয়ে হাত উঁচু করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করেছে—হিয়ার ইজ এ তুলসীদাস, হিয়ার ইজ এ তুলসীদাস। আর একজন তুলসীদাস এসে গেছে, আর একজন তুলসীদাস—

শিউপূজন যত রায়নার পেছন-পেছন ছোটে, রায়নাও তত তাকে এড়িয়ে ঘরটার এধার থেকে ওধারে পালিয়ে যায়। ঘরের চেয়ার-টেবিল আর ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় এড়িয়ে কোথায় কোন্ দিক দিয়ে সে শিউপূজনকে এড়িয়ে যায় তার ঠিক নেই। শেষকালে হিস্ট্রির ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে যেতেই আবার সমস্ত চুপ। কিন্তু খাতাটা রায়নার কাছে থেকেই গেল। ক্লাসের শেষে শিউপূজন রায়নার পেছন-পেছন গিয়ে খাতাটা চাইলে—আমার খাতাটা দিন না মিস-ভাটনগর—

রায়না তখন একেবারে অন্য মানুষ। যেন সে চেনেই না শিউপূজনকে। যেন সে আগে কখনও দেখেইনি শিউপূজনকে এমনি ভাবখানা তার। বাসটা আসতেই রায়না গম্ভীর হয়ে তাতে উঠে গেল, আর সেটা ছেড়ে দিলো।

—মিস্ ভাটনগর, মিস ভাটনগর...

আর মিস ভাটনগর। ততক্ষণে বাসটা শিউপূজনের চোখে-মুখে-নাকে ধোঁয়া উড়িয়ে মিস ভাটনগরকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেছে।

তারপর দিন শিউপূজন কলেজে গেছে অধীর এক আগ্রহ নিয়ে। খাতাটার জন্যে সারারাত ঘুমই হয়নি তার। যদি খাতাটা মিস ভাটনগর হারিয়ে ফেলে। কিন্তু মিস্ ভাটনগরের দেখা নেই। প্রফেসার যখন রোল-নাম্বার ধরে ডাকছে—রোল নাম্বার টেন্-রোল নাম্বার টেন্...

কারও সাড়া নেই। মিস ভাটনগর অ্যাবসেণ্ট। অনুপস্থিত। তারপরের দিনও মিস্ ভাটনগরের আশায় শিউপূজন চার-দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। সেদিনও রোল নাম্বার টেন অ্যাবসেণ্ট। তারপরের দিনও অ্যাবসেণ্ট। তারপরের দিনও।

*

সম্মেলনের ভেতরে মঞ্চের ওপরে বসে জালিমের মুখ থেকে শোনা শিউপূজনের প্রাক্-বিবাহ দিনের কাহিনীটাই মনে পড়-ছিল। আগের রাত্রের সেই রামফলের জীবনের কাহিনীটাও মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল পোর্ট লুইসের সেই পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ যশোবন্ত নাথ্মল রায়ের কাহিনী। একটা দিনের মধ্যে যে কত মানুষের সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে গেলাম তাই ভাবছিলাম।

বক্তৃতা হচ্ছিল একের পর এক। মরি-শাসের কবি শ্রী সোমদত্ত বখোরী বক্তৃতা দিলেন। বড় অপূর্ব লাগলো সে বক্তৃতা। সেই আগের দিনের মতই ফুল দিয়ে সাজানো মঞ্চ। সেই আখের তৈরি 'সুস্বাগতম' লেখা গেট। সবই ভালো লাগছিল। কিন্তু আমার মন ছটফট করছিল বাইরে যাবার জন্যে। বাইরে জালিম গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে গিয়ে শুনবো শিউ-পূজনের প্রাক্-বিবাহিত জীবনের কাহিনীটা। শুনবো কেনই বা রাত দুটোর সময় শিউপূজন জালিমের বাড়ি গিয়ে-ছিল। কেন, কী ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর অত ঝগড়া হয়েছিল।

শেষকালে আর থাকতে পারলাম না। এক ফাঁকে বাইরের রোদে বেরিয়ে এলাম। দেখি জালিম তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাছে গিয়ে বললাম—তারপর? তারপর কী হলো জালিম?

জালিম বললে—আপনি লেকচার শুনবেন না?

আমি বললাম—ও লেকচার থাক, তুমি আমাকে শিউপূজনের কথা বলো। কাল রাত দুটোর সময় শিউপূজন তোমার বাড়িতে এসেছিল কী বলতে?

জালিম বললে—এসেছিল আমার বাড়িতে শুতে—

—কেন? নিজের বাড়ি কী হলো? নিজের বাড়িতে শোবার জায়গা নেই?

জালিম বললে—শোবার জায়গা থাকবে না কেন? বউ-এর সঙ্গে যে ঝগড়া হয়েছিল। তা আমি সেই অত রাত্রে তাকে আবার খেতে দিলুম, খেয়ে-দেয়ে সে আমার বাড়িতেই শুলো। আমি তাকে অনেক করে বোঝালুম বাড়ি যেতে, কিন্তু কিছুতেই সে তা শুনলে না।

সব শুনে বললাম—আমি এখন তার বাড়িতে একবার যাবো?

জালিম বললে—এখন গেলে তো শিউপুজনকে পাবেন না স্যার আপনি—

—কেন?

—সে রাত্তিরে আমার ঘরে শুয়েছিল বটে, কিন্তু আজ ভোর বেলা আমাকে না বলে কোথায় যে চলে গেল তা টের পাইনি।

বললাম—সকালে উঠে সে হয়ত আবার নিজের বাড়ি চলে গেছে—

—না স্যার, বাড়িতে যদি যেত তাহলে ওর বউ কেন ভোরবেলাই আবার আমার বাড়িতে আসবে? ওর বউ আমার বাড়ি এসে শিউপুজনের খোঁজই তো করছিল।

বললাম—তাহলে কোথায় যেতে পারে শিউপুজন? এরকম কি আগে কখনও বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে তোমার বাড়িতে রাত কাটিয়েছে?

জালিম বললে—না স্যার, আগে এরকম কখনও হয়নি স্যার। বউ-এর সঙ্গে ঝগড়া করে আগে কখনও রাত দুটোর সময় না-খেয়ে দেয়ে আমার বাড়িতে এসে ওঠেনি। আগে ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু আবার তা মিটেও গেছে।

—ওর বউ কিছু বললে না?

—না স্যার, ওর বউও কিছু ভাঙলে না। দেখলুম তারও চোখ দুটো ফোলা। সেও বোধহয় কিছু খায়নি। সারা রাত জেগে জেগে চোখ দুটো একেবারে রাঙা হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে এসেছিল আর তার-পরে ভোরবেলাই উঠে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে শুনে নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল। আমি অনেকবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে, কিন্তু সে-কথার কিছু জবাব না দিয়ে বাড়ি চলে গেল। আর আমারও তখন সময় ছিল না কথা বলবার, আমারও তখন ডিউটির সময় হয়ে যাচ্ছিল—

পাশেই কনফারেন্সের প্যান্ডেল। হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দ্বারা স্বীকৃতি পাওয়ানোর ব্যাপারে বক্তারা অনেক নজির তুলে ধরছেন তাঁদের বক্তৃতায়। বচ্চুপ্রসাদ সিং-এর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে ইন্ডিয়ার বাইরে পঁচানব্বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ হিন্দি ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। সেই কতকাল আগে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইংরেজ আর ওলন্দাজদের মধ্যে হিন্দি শেখার আগ্রহ প্রথম জেগে ওঠে যাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ভাষায় বইও লেখা হয় তাদের দুই ভাষার মাধ্যমে। রাশিয়াতে ১৮০১ সালেই ছাপানো হিন্দি ভাষার একটা ব্যাকরণ ছিল, আর ১৯১৮ সালে সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতীয় ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা হয়। তখনই রুশ ভাষায় রামচরিত-মানস অনুবাদ করা হয়ে যায়। আর আজ আমেরিকার তেত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি পড়ানো চলছে। ওখানকার বার্কলে, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি-শিক্ষার ক্লাশ আছে। ইংলণ্ডেও তাই। লণ্ডন আর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিন্দি। এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকে জার্মানীর মিউনিকেও পড়ানো শুরু হয়েছে হিন্দি সাহিত্য। ভারত-সরকারও এ ব্যাপারে তত সহযোগিতা করছেন না। একটি বৃহদাকারের জার্মান হিন্দি অভিধান বা কোষ-গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলছে। চেকোস্লোভাকিয়ার হিন্দি-প্রেমী শ্রীযুক্ত ওডোলন স্মেকেলের নাম প্রত্যেক হিন্দি-প্রাণদের কাছে সুপরিচিত। শুধু তাই নয়। অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, কানাডা, চীন, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, হাঙ্গারী, ইটালি, জাপান মেক্সিকো, নেপাল, নেদারল্যান্ড, ন্যুজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও আজ হিন্দি ভাষা পাঠ্যবস্তু বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। শ্রীলঙ্কায় বি-এ শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দি পড়ানো হচ্ছে। খোদ মরিশাসে সমস্ত কাজকর্ম ফরাসী আর ইংরিজী ভাষায় চালু থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত হিন্দি অবশ্য পাঠ্য হয়েছে।

বচ্চুপ্রসাদজীর সঙ্গে কথার মাঝখানেই মরিশাসের রামকৃষ্ণ মিশনের দুই স্বামীজী একটা গেরুয়া রং-এর গাড়িতে

এসে হাজির হলেন। স্বামী পুরুষোত্তমজী আর অপরানন্দজী। দু জনেরই পরিধানে গেরুয়া পোশাক, আর গাড়ির রংও গেরুয়া।

বললেন—কই, চলুন, আমাদের মন্দিরটা একদিন দেখবেন বলেছিলেন—

মনে ছিল না কখন তাঁদের কথা দিয়েছিলাম আমি। তা হোক, মরিশাসে এসে এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দির দেখবো না এ হতে পারে না। আজকের পৃথিবীর চারদিকের এই অবিশ্বাস, অধর্ম, অনাচার আর অধোগতির যুগে এখনও বিশ্বাস, ধর্ম, সুবিচার আর অগ্রগতির প্রতীক যদি কিছু থাকে তা হলো এই শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠান। এই স্বামীজীরা কোনও প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে এখনও যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর বাস্তব-রূপায়ণ করে চলেছেন তার পরিচয় আমার জানা ছিল। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে নানারূপে উপকৃত। কলকাতায় এ'দের সেবা-প্রতিষ্ঠানের স্বামী নরেশ মহারাজ আর সুজিত মহারাজের কাছ থেকে এ'দের নামে একটা পরিচয়-পত্র আনবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তার জন্যে অবসর হয়ে ওঠেনি।

জালিমকে বললাম—তুমি এখানে থেকো জালিম, আমি ঠিক সময়ে চলে আসবো—

জালিম বললে—আজ কিন্তু 'কনটিনেণ্টাল হোটেলে' খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, মনে রাখবেন—

বচ্চুপ্রসাদ সিংজীর কাছ থেকেও বিদায় নিলাম। স্বামী পুরুষোত্তমজী নিজেই গাড়ি চালাতে লাগলেন। 'মোকা' ছাড়িয়ে গাড়ি হু-হু করে আ[illegible]র ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো। [illegible]কে শুধু আখ আর আখ। এই [illegible] গাছে যখন ফুল ফোটবার মৌসুম [illegible] তখন নাকি মনে হয় সমস্ত মরিশাসটা নীলে নীল হয়ে গেছে। মনে হয় যেন সমস্ত মরিশাস দ্বীপটা কেউ নীল পান্নায় ঢেকে দিয়েছে।

অপরানন্দজী বললেন—সেই সময়ে এলে মরিশাসের আসল সৌন্দর্যটা দেখতে পেতেন—

তারপর বললেন—মরিশাসের নামটা কোথা থেকে এল জানেন?

বললাম—না—

—আমাদের রামায়ণের একটা কাহিনী থেকে। সে এক অদ্ভুত কাহিনী। এখানকার প্রত্যেক হিন্দু সে কাহিনীটা জানে—

জিজ্ঞেস করলাম—রামায়ণের কোন কাহিনীটা বলুন তো—

—তবে শুনুন—

কিন্তু অপরানন্দজী কিছু বলবার আগেই আমি চমকে উঠেছি। দেখি আখের ক্ষেতের মধ্যে কে একজন উল্টো দিকে মুখ করে চলেছে। এ কি, শিউপুজন না।

পুরুষোত্তমজীকে বললাম স্বামীজী, গাড়িটা একটু রাখুন তো, রাখুন তো এখেনে—

—কেন, কী হয়েছে?

বললাম—একটু দাঁড়ান, আমি একটু নামবো এখানে—

গাড়িটা থামতেই আমি নেমে পড়লাম। নেমে আখের ক্ষেতের ভেতরে ছুটতে লাগলাম। আর চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম—শিউপুজন, শিউপুজন—

(ক্রমশ)

বিশ্ববিজ্ঞান

সুপার হেভি

গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল, মার্চ ১৯৭৬-এর মাঝামাঝি এক সময়ে। তখন যতটা সম্ভব খবরটি চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন গবেষকরা। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তাঁরা সাবধান হয়েছিলেন। কৌতূহলীদের নিবৃত্ত করার জন্যে বলেছিলেন, সবুর করুন আর একটু। কারণ, স্পষ্ট করে কিছু বলার আগে আমাদের এখনও দেখা দরকার, সত্যিই এটা সাফল্য, না সাফল্যরূপ ধাঁধা বই আর কিছুই নয়।

এপ্রিল এবং মে, এই দুই মাস ধরে চলল যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখার পালা। আর তারপর জুন মাসের গোড়ায় কানাডায় অনুষ্ঠিত এক বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্রে সংবাদটি প্রথম প্রকাশ করলেন নোবেল-বিজ্ঞানী পল ডিরাক। ডিরাক জানালেন, প্রকৃতিতে এই প্রথম তিনটি 'সুপার হেভি' বা অতি ভারি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের পারমাণবিক সংখ্যা বা আটমিক নাম্বার যথাক্রমে ১১৬, ১২৪ এবং ১২৬। আবিষ্কারক ওক রিজ ন্যাশনাল ল্যাবোরেটারির ডঃ রবার্ট ভি জেনট্রি এবং ডেভিস-এ অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ টমাস এ কাহিল। শুধু ওই তিনটি মৌলিক পদার্থই নয়, আরও কিছু কিছু প্রাথমিক তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন জেনট্রি এবং কাহিল। তথ্যগুলি দেখে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা হয়তো আরও তিনটি নতুন অতি ভারি মৌলিক পদার্থের সন্ধান দিতে পারবেন। যাদের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ১১৪, ১২৫ এবং ১২৭।

প্রাকৃতিক উৎস থেকে সব শেষে যে মৌলিক পদার্থটি আবিষ্কৃত হয়েছিল তার নাম রেহ্নিয়াম (rhenium)। সেটা ১৯২৫ সাল। বস্তুটির সন্ধান মিলেছিল প্ল্যাটিনাম আকরিকের মধ্যে। এই আবিষ্কারের দীর্ঘ একান্ন বছর পর প্রকৃতিতে সন্ধান পাওয়া গেল, এই প্রথম, তিনটি নতুন মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব। এবং প্রত্যেকটিই বিতর্কিত। বলা বাহুল্য, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অন্যতম দিকপাল ডিরাক নিজের মুখে এই আবিষ্কারের কথা না বললে কথাটা অনেকে হয়তো বিশ্বাসই করতেন না। যদিও, দ্বিধা যে একেবারে এখনও কেটে উঠেছে, তাও হলফ করে বলা শক্ত।
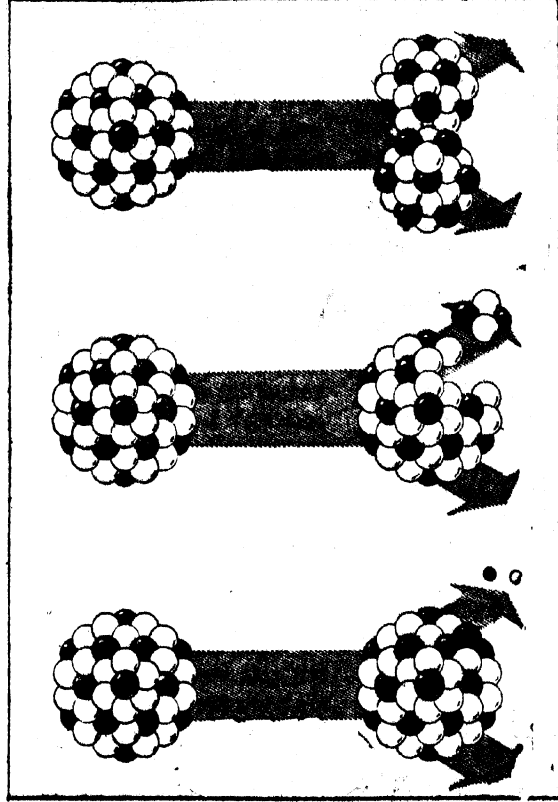
পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন (যথাক্রমে বড় কালো এবং সাদা গোলক)। নিউক্লিয়াসের অবক্ষয় বা ডিকে তিনভাবে ঘটতে পারে। উপরে : বাঁ পাশে নিউক্লিয়াস। বিভাজনের পর তৈরি হল দুটি ভিন্ন ধরনের মৌলিক পদার্থের পরমাণু কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস। মাঝে : বাঁ পাশের নিউক্লিয়াস একটি আলফা কণা (এর মধ্যে থাকে দুটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন) হারিয়ে ভিন্নতর নিউক্লিয়াসে পরিণত হল। নিচে বাঁ পাশের নিউক্লিয়াস বিটা রশ্মি ক্ষরণের মাধ্যমে একটি ইলেকট্রন এবং একটি নিউট্রিনো ত্যাগ করে ভিন্নতর নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হচ্ছে। বেশীর ভাগ ভারি-নিউক্লিয়াসেই এইভাবে অবক্ষয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন আসে। একমাত্র যাদের মধ্যে থাকে ম্যাজিক সংখ্যক প্রোটন অথবা নিউট্রন এ ধরনের পরিবর্তন তাদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। ছবিতে ছোট কালো গোলক চিহ্নের সাহায্যে নিউট্রিনোকে দেখানো হোল। এবং ছোট সাদা গোলক ইলেকট্রনের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির সাহায্যে ওই তিন মৌলিক পদার্থের অনুসন্ধানে বেশ কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, তিনি ওই ধরনের কোন বস্তুর সন্ধান এখনও পান নি।

ঘটনা যাই হোক না কেন, জেনট্রি এবং কাহিল নিজেদের আবিষ্কার প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যে ধরনের তথ্য দাঁড় করিয়েছেন, তাদের এখনও পর্যন্ত কেউ উড়িয়েও দেন নি।

*

কেন এই বিতর্ক?

কারণ, এ পর্যন্ত অনেকেই বিশ্বাস করে এসেছেন, প্রকৃতিতে নানা রকম মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেলেও, তাদের মধ্যে ইউরেনিয়ামই একমাত্র মৌলিক পদার্থ, যা

সব চেয়ে ভারি। তাঁদের ধারণা, ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশী ভারী পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া সম্ভব নয়। ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ৯২। যার অর্থ, এই মৌলিক পদার্থটির নিউক্লিয়াসে বা কেন্দ্রীণে থাকে ৯২টি প্রোটন, যারা ধনাত্মক তড়িৎ-ধর্মী। এবং স্বভাবতই এই নিউক্লিয়াসের চার পাশে বিভিন্ন কক্ষপথে পরিক্রমণ করে ৯২টি ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎ-ধর্মী কণা। এই সব কণার ভর প্রোটনের ভরের তুলনায় খুবই নগণ্য। তাই কোন পরমাণুর ভর মাপতে গিয়ে ইলেকট্রনের ভরকে উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। তবে হাইড্রোজেন ছাড়া সমস্ত মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে আরও এক ধরনের কণা থাকে। যার নাম নিউট্রন। নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণা। এই কণার ভর প্রোটন কণার ভরের প্রায় সমান। কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মধ্যে মোট যে কয়টি প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে সেই সংখ্যাকেই বলা হয় ওই পরমাণুর ভর সংখ্যা বা 'মাস নাম্বার'। এই ভর-সংখ্যাটি জানা গেলে বলা সম্ভব বস্তুটির পরমাণু কতটা ভারী।

উদাহরণ হিসেবে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কথাই ধরা যাক। এর নিউক্লিয়াসে কোন নিউট্রন নেই, আছে একটি মাত্র প্রোটন। অতএব হাইড্রোজেন পরমাণুর পরমাণু-ভর বা মাস নাম্বার দাঁড়াল ১। অকসিজেন পরমাণুর মাস নাম্বার ১৬ এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৮। অতএব, অকসিজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে ৮টি প্রোটন এবং ১৬−৮=৮টি নিউট্রন। নিকেলের মাস নাম্বার ৫৬। এক্ষেত্রে নিকেলের নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন মিলিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৫৬। এই পদার্থটির পারমাণবিক সংখ্যা ২৮। যার অর্থ, এর নিউক্লিয়াসে রয়েছে ২৮টি প্রোটন। অতএব নিকেলের নিউক্লিয়াসে মোট নিউট্রন থাকে ৫৬−২৮= ২৮টি প্রভৃতি।

দেখা যায়, কোন কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে যতগুলি প্রোটন থাকে, নিউট্রনও থাকে ঠিক ততগুলিই। এ সব পদার্থ ওজনে অপেক্ষাকৃত অনেক হালকা। আবার এমন পদার্থও অনেক আছে, যাদের নিউক্লিয়াসে সমান সংখ্যক প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে না। প্রোটনের চেয়ে নিউট্রনের সংখ্যা থাকে অনেক বেশী। কখনও কখনও দেড় গুণের মত।

যেমন, ইউরেনিয়াম—২৩৮। এই মৌলিক পদার্থটির মাস নাম্বার ২৩৮ এবং অ্যাটমিক নাম্বার ৯২। অতএব দেখা যাচ্ছে, এক একটি নিউক্লিয়াসে এখানে থাকে ২৩৮−৯২=১৪৬টি নিউট্রন। এক্ষেত্রে নিউট্রনের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে প্রোটন সংখ্যার প্রায় দেড় গুণ। যে সব মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউট্রন এই হারে থাকে তাদের ভারী পদার্থের পর্যায়ে ফেলা হয়।

বলা বাহুল্য, কয়েক দশক আগেও প্রকৃতিতে যে সব মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তাদের মধ্যে ইউরেনিয়াম—২৩৮কেই ধরে নেওয়া হয়েছিল সব চাইতে বেশী ভারী হিসেবে। অর্থাৎ প্রকৃতিতে যত রকম মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ইউরেনিয়াম—২৩৮ই সব চেয়ে বেশী ভারী।

তখন প্রশ্ন তুলেছিলেন কেউ কেউ, প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে ইউরেনিয়ামের চেয়ে আর কোনও ভারী পদার্থের সন্ধান পাওয়া কি সম্ভব নয়?

'সম্ভব', বললেন কেউ কেউ। আবার কেউ কেউ বললেন, এক সময়ে হয়তো সত্যিই তারা ছিল। পৃথিবীর সৃষ্টিমুহূর্তে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের মত তারাও হয়ত সৃষ্ট হয়েছিল। সৃষ্টির পর তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ক্ষরণ করে হয়তো ক্রমে ওই সব মৌলিক পদার্থের নিউক্লিও শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। অতঃপর ভিন্নতর মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাজটি মহাজাগতিক পরিমণ্ডল থেকে আসা শক্তিশালী কোন বিকিরণের আঘাতেও ঘটা সম্ভব। পৃথিবীর জন্মের পর অন্তত কয়েক কোটি বছর হয়তো তার পরিমণ্ডলে এখনকার ভ্যান-অ্যালেন বেল্টের মত তখন কোন চৌম্বক-আচ্ছাদন ছিল না। ফলে মহাজাগতিক পরিমণ্ডল থেকে প্রচুর শক্তি-সম্পন্ন তেজস্ক্রিয় কণা তখন অবাধে এসে পৃথিবীর বুকে আঘাত করতে পারত। অথবা এখনকার মত তখন কোন ওজন-স্তরও হয়তো ঊর্ধ্বাকাশে দানা বেঁধে ওঠে নি। এক্ষেত্রেও দূর মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে মহাজাগতিক রশ্মির অবাধ বর্ষণ অস্বাভাবিক নয়। শক্তিশালী এই সব রশ্মি অথবা তেজস্ক্রিয় কণাই ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী পদার্থগুলিকে বিভাজিত করে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ঘটনা যাই হোক, বলা নিষ্প্রয়োজন, দীর্ঘকাল ধরে বহু অনুসন্ধান করেও প্রকৃতিতে ইউরেনিয়ামের চেয়ে আর কোন ভারী পদার্থের সন্ধান কেউই দিতে পারেন নি।

*

ইতিমধ্যে আরও একটি ব্যাপার লক্ষ করলেন তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখলেন কোন কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয় কণার আঘাতে সহজেই বিভাজিত অথবা ভিন্নতর নিউক্লিও অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায়। আবার কোন কোন পদার্থের পরমাণুকেন্দ্রকে ওইভাবে সহজে বিভাজিত করা সম্ভব হয় না। শেষোক্ত পদার্থগুলির নিউক্লিয়াসের গঠনে অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। দেখা গেল, যে সব মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা ২, ৮, ২০, ২৮, ৪০, ৫০, ৮২, ১২৬ ১৮৪ প্রভৃতি তাদের অস্তিত্ব অনেক বেশী স্থায়ী। এদের বলা হয় ম্যাজিক সংখ্যা আবার ওই একই ভাবে যে সব মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সংখ্যা ২, ৮, ২০, ২৮, ৪০ ৫০ ৮২, ১১৪ প্রভৃতি তাদেরও অস্তিত্ব যথেষ্ট স্থায়ী। এদেরও ম্যাজিক সংখ্যা বলে। উল্লেখ্য, যে সব মৌলিক পদার্থের নিউ-ক্লিয়াসের প্রোটনের সংখ্যা এবং নিউট্রনের সংখ্যা ম্যাজিক সংখ্যা তাদের স্থায়িত্ব আরও বেশী। যেমন, অকসিজেন। অকসিজেনের নিউক্লিয়াসে প্রোটন এবং নিউক্লিয়াসের সংখ্যা যথাক্রমে ৮। প্রোটন এবং নিউট্রন ম্যাজিক সংখ্যায় থাকলে কোন পদার্থ কেন বেশী স্থায়ী হয়, অর্থাৎ সহজে বিভাজিত হয় না, এ উত্তর এখনও অস্পষ্ট।

যাই হোক, বাস্তবে ইউরেনিয়ামের চেয়ে বেশী ভারী মৌলিক পদার্থ পাওয়া না গেলেও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা কিন্তু বললেন, ইউরেনিয়ামের পরও আরও অনেক মৌলিক পদার্থ থাকা সম্ভব। আর ওই সব পদার্থের মধ্যে যাদের নিউক্লিয়াসে ম্যাজিক সংখ্যক নিউট্রন বা প্রোটন থাকে তাদের জীবনকাল অনেক দীর্ঘ।

সংবাদে দেখা যাচ্ছে, জেনট্রি এবং কাহিল যে তিনটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, বলা হচ্ছে, তাদের আয়ু একশ' কোটি বছর।

*

প্রকৃতিতে পাওয়া না গেলেও, বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত শক্তিশালী নিউট্রন, প্রোটন প্রভৃতি পারমাণবিক কণার দ্বারা ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর নিউক্লিয়াসে প্রচণ্ড আঘাত হেনে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করলেন ইউরেনিয়াম-উত্তর কয়েকটি মৌলিক পদার্থ। যেমন, প্লুটোনিয়াম, ক্যালিফোর্নিয়াম, ফের্মিয়াম প্রভৃতি। বছর তিন আগে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করেন নতুন একটি মৌলিক পদার্থ। যার

পারমাণবিক সংখ্যা ১০৩। সম্প্রতি তাঁরা ওই একই ভাবে ১০৭ পরমাণবিক সংখ্যা সম্পন্ন মৌলিক পদার্থ তৈরি করেছেন বলে দাবী করেছেন। এ সব ক্ষেত্রে সাইক্লট্রন, বিভাট্রন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, নিউট্রন অথবা কোন বস্তুর নিউক্লিয়াসকে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ক'রে বুলেটের মত আঘাত করা হয় ইউরেনিয়াম বা অনুরূপ অন্য কোন পদার্থের নিউক্লিয়াসের বুকে। ওই আঘাতের ফলেই শেষোক্ত নিউক্লিয়াসটি ভিন্নতর মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য, এইভাবে তৈরি মৌলিক পদার্থের অনেকেই স্বল্পায়ু। নিজস্ব শক্তিক্ষরণের পর তারা ভিন্নতর মৌলিক পদার্থে পরিণত হয় অনেক কম সময়ে। আবার কোন কোন কৃত্রিম উপায়ে তৈরি মৌলিক পদার্থ দীর্ঘায়ুও হতে পারে।

যা বলছিলাম। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী, যাদের বলা হচ্ছে অতি ভারী বা 'সুপার হেভি' পদার্থ, তাদের কৃত্রিম উপায়েই তৈরি করতে হবে। প্রকৃতিতে তাদের পাওয়া সম্ভব নয়।

✻

কিন্তু হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল জেনট্রির মাথায়। গত কয়েক বছর তিনি বায়ু-দূষণের ওপর পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন। প্রধান লক্ষ, বাতাসে কি পরিমাণ সিসের কণা ভেসে থাকে তার হিসেব করা। তাঁর চোখ পড়ল মাদাগাস্কান অভ্রের ওপর। ১৮৮০র দশকে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ মহাদেবন অভ্রের মধ্যে এক ধরনের বলয় আবিষ্কার করেন। শুভ্র অভ্রর মধ্যে মাঝে মাঝে কেন এ ধরনের বলয় দেখা যায় বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে আসছেন। অনেকের ধারণা, এক সময় কোন কোন অভ্রর মধ্যে কোন কোন পদার্থ আটকে পড়ে। অবশ্যই নগণ্য পরিমাণে। পরে ওই সব পদার্থ থেকে বিকীর্ণ হতে থাকে আলফা কণা বা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। তেজস্ক্রিয় এই সব কণা মূল উৎস থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় চলার পথে অভ্রর অণুর সামনে বাধা পায়। এবং কিছু দূর এগিয়ে থেমে পড়ে। উৎসবিন্দু থেকে চারদিকেই চলে আলফা কণার বিচ্ছুরণ। ফলে উৎসের চারপাশে সৃষ্ট হয় একটি বলয়। ইংরেজীতে এই বলয়কে বলা হয় 'হ্যালো' (Halo)। বলয়ের ব্যাস যত বেশী হয়, বুঝতে হবে উৎস বিন্দুতে যে বস্তুটি ছিল তার তেজস্ক্রিয়তা তত বেশী। দেখা গেছে, প্রায় ১০০০টি বলয়ের মধ্যে কম করেও দুটি বলয়ের ব্যাস স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশী।

জেনট্রির মনে খটকা লাগল এখানেই। তিনি ধরে নিলেন, যে সব বলয়ের ব্যাস স্বাভাবিকের চেয়ে বড়, সুদূর অতীতে তাদের কেন্দ্রে হয়তো এমন কোন পদার্থ ছিল যাদের থেকে বিকীর্ণ আলফা কণার শক্তি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। তাই তারা অভ্রের অণু-স্তরের বাধা অনেকটা দূর পর্যন্ত অতিক্রম করতে পেরেছে। আর এর জন্যেই বলয়গুলি আকারে হয়েছে অত বড়।

এখন সমস্যা দাঁড়াল, তেজস্ক্রিয় অবক্ষয় বা 'রেডিও-অ্যাকটিভ' ডিকের পর ওই বলয়ের কেন্দ্রস্থলে যদি কোন বস্তুকণা অবশেষ হিসেবে থেকে থাকে, তা হলে তার স্বরূপটি জানা যাবে কিভাবে?

কাহিল ওই একই সময়ে ওই সমস্যাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন।

জেনট্রি এবং কাহিল পৃথক পৃথকভাবে মাদাগাস্কান অভ্রের বলয়ের মধ্যে থেকে অতিকায় মাস স্পেকট্রোগ্রাফ ক্যালুট্রনের সাহায্যে সংগ্রহ করলেন নমুনা। তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। তারপর ওই সব নমুনার ওপর পর্যায়ক্রমে নিক্ষেপ করা হল শক্তিশালী প্রোটন রশ্মি। নমুনার ওপর প্রোটন কণা আঘাত করায় সৃষ্ট হল একস-রশ্মি। এই একস-রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য মেপে তাঁরা আবিষ্কার করলেন বিভিন্ন নমুনার মধ্যে অন্তত তিন রকমের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। যাদের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ১১৬, ১২৪ এবং ১২৬। উল্লেখ্য, কোন মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে শক্তিশালী প্রোটন আঘাত করলে একস-রে উৎপন্ন হয় এবং সেই একস-রের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ওই মৌলিক পদার্থের আণবিক সংখ্যার আনুপাতিক। এই হিসেব ধরেই ওই তিনটি বস্তুর অস্তিত্ব জানা সম্ভব হয়েছে।

এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, যে তিনটি নতুন মৌলিক পদার্থের তাঁরা সন্ধান দিলেন, তাদের পারমাণবিক ভর কত?

সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত। তবে তাত্ত্বিক দিক থেকে অনুমান করা হচ্ছে, যে বস্তুটির পারমাণবিক সংখ্যা ১২৬, তার নিউক্লিয়াসে আছে ১২৬টি প্রোটন এবং ২০৫ অথবা ২০৬টি নিউট্রন। অতএব বস্তুটির পারমাণবিক ভর দাঁড়াচ্ছে ৩৩১ অথবা ৩৩২। ১২৪ পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট নিউক্লিয়াসেরও ভর তিনশ'র অনেক বেশী।

আরও একটি প্রশ্ন, ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা ৯২। তারপরই প্রকৃতিতে সন্ধান পাওয়া গেল এমন সব মৌলিক পদার্থ যাদের পারমাণবিক সংখ্যা ১১৬, ১২৪ এবং ১২৬। ৯২ এবং ১১৬-র মধ্যে পড়ে, এমন কোন মৌলিক পদার্থ প্রকৃতিতে পাওয়া গেল না কেন?

এর উত্তর, হয়তো সে সব পদার্থের আয়ু যাদের পাওয়া গেছে তাদের চেয়ে হয়তো কম। তেজস্ক্রিয় বিভাজনের মাধ্যমে হয়তো তারা বহুদিন আগেই বিলীন হয়ে গেছে। অথবা প্রকৃতিতে তাদের পরিমাণ এত নগণ্য যে, প্রচলিত পদ্ধতিতে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করা শক্ত।

যাই হোক, জেনট্রি এবং কাহিলের আবিষ্কার পরমাণু বিজ্ঞানীদের কাছে যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমরজিৎ কর

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

মঞ্জরী বসু

প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মঞ্জরী বসুর জন্ম সাল দেওয়া নেই। লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন ইস্কুলে তাঁর শিল্প শিক্ষা এবং কোনো এক অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্যের স্টুডিওতে তিনি কাজ শিখেছিলেন। ইতি-পূর্বে নতুন দিল্লি, মাদ্রাজ ও কলকাতায় তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে। ছটা একক প্রদর্শনীর মধ্যে দুটোর ব্যবস্থা ম্যাকস-মুলার ভবন করেছে। আমি অবশ্য তাঁর প্রদর্শনী আগে দেখিনি। এবার যা দেখলাম তা মোটেই সুবিধার নয়। (ডেকর সার্ভিস গ্যালারী ৪—১১ ডিসেম্বর '৭৬)।

তাঁর ক্যাম্বিসের পটে না আছে শ্রী, না ছন্দ। রঙ তাঁর উজ্জ্বল, শুদ্ধ—সবুজ, কচিকলাপাতা, বেগুনী, লাল, নীল—যখনই যা লাগিয়েছেন তার জৌলুস আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রচনা এমনই দুর্বল, এমনই টলে পড়া টাল খাওয়া নির্মিতি যে বনোটের গণ্ডগোলে রং ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া হয়ে গেছে, দুধ কেটে গেলে যেমন হয়। কতগুলো নৌকার ছবিতে (রচনা ১) রাম-ধনুর সব রঙ এনে পটে পাশাপাশি লেপে দিয়েও কিছু সুবিধা করতে পেরেছেন ব'লে মনে হয় না।

মোটামুটি আধা বিমূর্ত ছবি এবং কখনোই কিছু যেন দানা বেঁধে ওঠেনি। আসলে তাঁর অঙ্কন দুর্বল ব'লে তিনি বিমূর্ত ধরনের ছবি এঁকেছেন। একথা যে কতো সত্যি তা তাঁর মায়ের কোলে ছেলের ছবিটা যিনি দেখেছেন তিনিই স্বীকার করবেন। বা একসঙ্গে তাঁর অনেকগুলো ঘোড়া দেখলেই বোঝা যায়—রেখাগুলো নিশ্চিত নয়, নড়বড়ে, রুগ্ন।

এর মধ্যে একটি স্থির বস্তু-চিত্র (স্টীল লাইফ) একটু ভাল। পটের ওপরের দিকটা সবুজ। একটা সাদা বেতের চেয়ারের সামনে একটা নীচু টেবিল। টেবিলের লাল ঢাকনির ওপরে নীল জগ। এগারোটার মধ্যে মাত্র একটি ছবিতে রচনাচাতুর্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া খুব উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়।

চিত্র সংরক্ষণ

সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থা ক্রমে কলকাতায় এসেছিলেন অধ্যাপক স্টীফেন রিস জোনস। তিনি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্টোল্ড ইনস্টিটিউটে চিত্র সংরক্ষণ সম্বন্ধে অধ্যাপনা করেন। রয়াল আকাদমীতে রসায়ন পড়ান। তিনি যেমন এক্স-রে ডিফ্রেকসেন সম্বন্ধে স্নাতকোত্তর গবেষণা করেছেন তেমনি ছবির রাসায়নিক ও পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত দিক নিয়ে পর-বর্তী জীবনে প্রচুর লিখেছেন।

শিল্প সংরক্ষণের মধ্যে চিত্র সংরক্ষণ একেবারে আলাদা। একটা মূর্তি বা কারু-কার্য করা চীনামাটি, সোনা, রুপোর বাসন জিনিসপত্র সযত্নে রাখলে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু ছবির ওপর কালের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। আসলে কিন্তু রঙ যতোটা চটে যায়, তারচেয়েও

বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পট—ক্যাম্বিস, কাঠ, দেওয়াল বা পলেস্তরা করা গুহা, কাগজ—কাল তার ওপর কাজ শুরু করে আঁকা শেষ হবার মুহূর্ত থেকেই। পটের ওপর ঢেউ খেলে যায়। বা পোকা বা ছত্রাক লাগে। বিশেষত পটের পেছনে যা মূল পটকে পোক্ত করার জন্যে লাগানো হয়—যার পারিভাষিক নাম Support তা পটকে শেষ পর্যন্ত কমজোরী করে দেয়। অধ্যাপক জোনসের মুখেই প্রথম 'স্বাস্থ্য-বান' ও 'রুগ্ন' পট কথাটা শুনলাম। ছবিকে হাতের তেলোয় অতি যত্নে রাখতে হয়। পুতু পুতু করে না রাখলে পট পটল তুলতে পারে। পটের রঙ চটে গেলে দশ-গুণ বড় করতে পারে এমন অনুবীক্ষণের তলায় ফেলে দেখা হয়। তার এক্সরে নেওয়া হয়। তারপর ছত্রাক তুলে ফেলা হয়। কাঠ হলে চেপে রঙটা তার আগের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ক্যাম্বিসের পট পেছনের থেকে খুলে তার ওপর মোম লাগিয়ে বাহ্যাসশুন্য করে ছবির ভাঁজ ঠিক করার পদ্ধতি দেখলাম একটি নাতিদীর্ঘ তথ্যচিত্রে।

চিত্রাদি সংরক্ষণ কার্টোল্ডে যাঁরা পড়তে আসেন তাঁরা বিজ্ঞানের অথবা শিল্পকলার ছাত্র। শিল্পকলার ছাত্র হলে তাকে প্রথমে বিজ্ঞান পড়তে হয়। বিজ্ঞানের ছাত্র হলে তাঁকে শিল্পকলা পড়তে হয়।

ছবির সরঞ্জামের দাম

অনেকেই আছেন যাঁরা ছবি কিনতে পারেন। যাঁরা ফ্রিজ রেডিওগ্রাম, টি ভি এবং বউয়ের জন্যে দামী শাড়ি গয়না কেনেন, কিন্তু ছবি কেনেন না। দিল্লি বোম্বাইয়ের স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত এবং ধনীদের সঙ্গে কলকাতার ইন্টালেকচুয়াল বাঙালী-দের এইটাই তফাৎ। সাহিত্যিক কবিরা প্রদর্শনী দেখতে আসেন না। কলকাতায় আমার জানা ব্যতিক্রমদের একজন হলেন —কবি প্রণবেন্দু ও মেরী অ্যান দাশগুপ্ত। এঁরা সাধারণ মধ্যবিত্ত হয়েও নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যভাবে বঞ্চিত করে ছবি কিনেছেন। গগন ঠাকুর, যামিনী রায়, অরুণ বসু, বিজন চৌধুরী, সুনীল দাস, সুনীলমাধব সেন প্রমুখের ছবির সংগ্রহ করেছেন। ছবি কেনার প্রসঙ্গ উঠলেই দামের কথা ওঠে। মোটামুটি ছবি তিন শ থেকে হাজার টাকার মধ্যে থাকে। দাম বাড়ার কারণ সর-ঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধি। এই প্রসঙ্গে শিল্পীদের সবচেয়ে বড় রঙ বিক্রেতা জি সি লাহা কোম্পানীর শ্রীপশুপতি লাহার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। জিনিসপত্রের দাম কীরকম বেড়েছে তা নীচে দেওয়া হলো।

রচনা-২ মঞ্জরী বসু

	১৯৭২ ডজন	১৯৭৩ ডজন	১৯৭৪ ডজন	৫-৭৬ ডজন
১) ছাত্রদের ব্যবহার্য এক সেট টিউব তেলরঙ	৩৪.৮০	৩৪.০০	৪৯.[illegible]	৫৩.০০
২) জল প্রতিরোধক আঁকার কালি ৩০ মিলি লিটার	৮.৪০	৯.০০	১১.৫০	১৩.৫০
৩) পোস্টার রঙ ৩০ মিলি লিটার	১৯.০০	১৯.৬০	২৪.০০	২৯.০০
৪) (ক) শিল্পীদের ব্যবহার্য তেলরঙ ৯ মিলি লিটার (সিরিজ ১, ২, ৩)	১০.০০	১০.০০	১২.৫০	১৬.৫০
(খ) দামী রঙ (সিরিজ ৩, ৪)	২৪.০০	২৪.০০	৩০.০০	৩৯.০০

ক্যানভাস

ক্যানভাস থান ৫ মিটার	১৯৭৪	১৯৭৫-৭৬
৭২"×৭৪" বহর	২৮০.০০	৩৬২.০০
৪০"×৪৭" বহর	১৮৫.০০	২৪০.০০
৩৬"×৩৭" বহর	১৪০.০০	১৮২.০০

অর্থাৎ একটা ৩০"×২০" ছোট ছবি যদি আঁকতে হয় তাহলে কী রকম খরচ হয় দেখা যাক।

ফ্রেমে আঁটা ৩০"×২০" ক্যানভাস	৩৭.০০
সাদা রঙ ও অন্যান্য রঙ	২০.০০
৩টি তুলি	৫.২৫
১টা প্যালেট	৫.৭৫
লিনসিড ও তার্পিন তেল ইত্যাদি	৩.৭৫
১টা প্যালেট ছুরি	৫.০০
	৭৬.৭৫

সুতরাং তেল রঙের একটা ছোট ছবি এক শ' টাকায় দেবার কথা অবান্তর।

—সন্দীপ সরকার

আলোচনা

বিশ্ববিজ্ঞান

সমরজিৎ কর "ভারতীয় ভূ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে : ১২৫ বছর" শীর্ষক যে সন্দর্ভটি লিখেছেন তা বহু তথ্যপূর্ণ যা এখনকার জনসাধারণ মোটেই জানেন না। লেখক অনেক কিছু সংবাদ পরিবেশন করেছেন কিছু অনুক্তও রয়ে গেছে। তারই কিছু কিছু উল্লেখ করছি।

কয়লাখনির সন্ধান পাওয়া গেছে বলে রানীগঞ্জ প্রভৃতি অনেক অঞ্চলের নাম করেছেন কিন্তু অন্যতম বিশাল কয়লাখনি যে আবিষ্কৃত হয়েছিল বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলে তার কথা লেখেন নি। বিহারে বোকারোতেও প্রচুর কয়লা পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে রানীগঞ্জ ছাড়া করনপুরাতেও কয়লার খোঁজ পাওয়া গেছে।

এইচ সি জোনস, প্রমথনাথ বসু প্রভৃতি আকরিক লোহার খনি (লোহার খনি নয়) আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু কোথায় কোথায় তা বলেন নি। আকরিক লোহার খনি ভারতের এক অমূল্য সম্পদ। ভারতের অন্যতম বৃহত্তম আকরিক লোহার খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল বিহারের সিংভূম জেলায় ওড়িশার কেঁওঝোর ও বোনাই জেলায়, ময়ূরভঞ্জের গরু-মহিষাণী, বাদাম পাহাড় ও সুলাইপাত অঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের ধুলি-রাজহাড়া অঞ্চলে (ভিলাই ইস্পাত কারখানা যেখান থেকে আকরিক লৌহ সংগ্রহ করে)। তাছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু (সালেমের কথা সমরজিৎবাবু বলেছেন) মহারাষ্ট্র, গোয়া, মহারাষ্ট্র ও মহীশূরে (যার বর্তমান নাম কর্ণাটক)।

কর মহাশয় লিখেছেন সম্প্রতি সিংভূমে কোন কোন তামার খনিতে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে। আসলে তামার খনিতে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় নি, তামার Tailings-এ ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। তামার কারখানা ঘাটশিলাতে চালু আছে অনেক দিন ধরে কিন্তু Tailings-এ যে ইউরেনিয়াম আছে এটি সাম্প্রতিক আবিষ্কার। সিংভূমে যদুগোদা অঞ্চলে (জামসেদপুর থেকে কয়েক মাইল দূরে) ইউরেনিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সে খনিতে কাজ চলছে আজ কয়েক বছর ধরে, তারও কোন উল্লেখ সমরজিৎবাবু করেন নি।

ম্যাংগানিজ সংবলিত অঞ্চলের মানচিত্র তৈরী করেছেন এমন কয়েকজন ভারতীয় [illegible] নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু সে অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ করেন নি। বিহারের সিংভূমে ওড়িশার কেঁওঝোর ও বোনাইতে, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, রামটেক, টিরোডি অঞ্চলে, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও গোয়ায় বিস্তীর্ণ ম্যাংগানিজ খনির সন্ধান পাওয়া গেছে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কর্ণধারদের নাম করতে গিয়ে স্যার লুইস ও স্যার সিরিল ফক্সের নাম করেছেন। স্যার লুইস বলে ত কেউ ছিলেন না। একজন ছিলেন তাঁর নাম স্যার লুইস ফারমোর (সংক্ষেপে স্যার এল, এল, ফারমোর)। টি এইচ হল্যাণ্ডেরও নাম করেছেন। তিনিও তখনকার খুব নামজাদা ভূতাত্ত্বিক এবং জি এস আই-এর কর্ণধার ছিলেন। তিনি স্যার টমাস হল্যান্ড নামে বিশেষ পরিচিত। ইনি অবসর নেবার পর লণ্ডন ইউনিভার্সিটির পরীক্ষক ছিলেন।

সুখিন্দায় (ওড়িশা) নিকেল যেমন পাওয়া গেছে, ক্রোমাইটও পাওয়া গেছে। বিহার, মহীশূর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রেও ক্রোমাইট পাওয়া গেছে। পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম ক্রোমাইট উৎসের মধ্যে ওড়িশা অন্যতম।

লেখক দক্ষিণ ভারতে পৃথিবীর বৃহত্তম থোরিয়াম সঞ্চয়ের কথা লিখেছেন, শুধু থোরিয়াম নয়, ইলমেনাইটও পাওয়া গেছে এবং দুইটিই আছে সমুদ্র উপকূলবর্তী বালিতে।

সমরজিৎবাবু G S I-এর একটি বিশেষ কীর্তির কথা উল্লেখ করেন নি। সেটি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ আমলে কোন ভাল খনিজ (যেমন কয়লা, চুনাপাথর, ম্যাংগানিজ ইত্যাদি) আবিষ্কৃত হলেই G S I গোপনে ক্লাইভ স্ট্রীটের ইংরাজ বণিকদের সেই সব তথ্য জানিয়ে দিতেন। সেসব রিপোর্ট G S I-এর Records-এ ছাপা হবার আগেই ওই বণিকরা ইচ্ছামত লিজ নিয়ে নিতেন। এই রূপেই তখনকার কালে বহু কয়লাখনির চুণাপাথরের, ম্যাংগানিজের, ফায়ারক্লের মালিক ইংরাজ বণিক।

অনিল সোম
জামসেদপুর-৯

চলতে চলতে

সতেরই পৌষের (১৩৮৩) দেশ পত্রিকায় বিমল মিত্র মহাশয়ের বর্ষীয়সী লেখনী কিছু শিথিল মন্তব্য বর্ষণ করেছে, তৎসহ কিছু অনৃত ভাষণ।

এক জায়গায় ('চলতে চলতে' ৬৯৭ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের মধ্যাংশে) শ্রীমিত্র লিখছেন : "...দেওঘরে অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমে যাঁরা যেতেন, ঠাকুর তাঁদের প্রসাদ-টসাদ কিছু দিতেন না। দিতেন কেবল একটি মাত্র লাঠি...।"

দেওঘরের সৎসঙ্গ আশ্রমে শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্রের দর্শন পেয়েছেন এমন যে কোন মানুষই সম্ভবত এই ভ্রান্ত উক্তির প্রতিবাদ করবেন। আশ্রমের আওতায় একটি প্রাণীও অভুক্ত থাকলে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে খেতে পারতেন না। সদ্য আগত অতি নগণ্য দর্শনার্থীকেও ঠাকুর অন্তত একটি প্রশ্ন করতেন : 'তুমি খেয়েছ? তোমার খাওয়া হয়েছে?' তাঁর বিদ্যমানতায় আশ্রমে শ্রীমিত্রের মতন একজন বিশিষ্ট অভ্যাগতের আপ্যায়নের ত্রুটি হয়েছে, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে তাঁর স্মৃতিশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো? আমরা অবশ্য এখানে 'প্রসাদ' শব্দটিতে প্রচলিত স্থূল অর্থেই নিচ্ছি। বিদগ্ধমনা মিত্র মহাশয় প্রসাদ শব্দের যদি ব্যাপকতর অর্থ ধরতে চান, সেক্ষেত্রে আমরা সবিনয়ে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ ক্ষমতার দৈন্যের প্রতি সহৃদয় সমবেদনা জ্ঞাপন করব। সে প্রসাদ দিলেও কি সবাই নিতে পারে? এর পরবর্তী অংশে বিমলবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত থেকে তাঁর লাঠি উপহার পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এবং উত্তরকালে সেই সস্নেহ উপহারের তিনি যে বিচিত্রপন্থায় মর্যাদা দিয়েছেন, তারই সকৌতুক বর্ণনা দিয়েছেন। একজন পিতৃস্থানীয় মানুষ ভালবেসে একগাছি কুটো হাতে তুলে দিলেও তা আমি মাথায় করে রাখব—আমার ঐতিহ্য এই শিক্ষাই তো দেয়। একজনের স্নেহের দানকে আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছি, তা দিয়ে ইঁদুর বেড়াল তাড়াচ্ছি—এটা কি খুব গৌরবের ব্যাপার? ঐ যষ্ঠির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ওটি ন্যায় ও প্রেমের প্রতীক দণ্ডী।

প্রসূন মিত্র
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
কল্যাণ চক্রবর্তী
কলকাতা

॥ ২ ॥

গত নবম সংখ্যা দেশ পত্রিকাতে সাহিত্যিক বিমল মিত্র লিখছেন যে ১৮৭৫ সালের আট বৎসর পর স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো শহরে পৌঁছেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে অর্থাৎ ১৮৭৫ সালের আঠারো বৎসর পর চিকাগো পৌঁছেছিলেন।

মানিক চক্রবর্তী
কলকাতা-৩৫

তোমাকে মানায়

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি এত অহঙ্কারী কেন?
কিছুটা মিথ্যের মায়া বরং মানাত ওই মুখে
চক্ষুর পল্লবে নম্র কাজল যেভাবে
ফোটায় প্রচ্ছায়,
নখের আরক্ত আভা হয়ে ওঠে চিক্কণ-রক্তিম
যেমন সহজে,
শিল্পের স্বচ্ছন্দ টানে জেগে ওঠে নিহিত শৃঙ্খলা,
গোপন অথচ অনায়াস সেই চতুরালি
মানায় তোমাকে।

মনে হয়, এ তোমার ভান,
এই সরলতা, এই সত্যসন্ধ তীব্র অহঙ্কার
সমস্ত সাজানো।
তুমিও নিশ্চিত জানো, সব সত্য উচ্চার্য ছিল না।
জানো যে, অপ্রসাধিত যে-সত্য প্রখর সূর্যালোক
তার দিকে যায় না তাকানো।
জানো না? জানো না?

তবে এত অহঙ্কার কেন?

তুমি তো গান্ধারী নও
আজীবন বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে রাখবে তোমার দু-চোখ।

কবিতা অসুখ

ব্রততী বিশ্বাস

কবিতা ভীষণ অসুখে
বিস্বাদ ঠোঁটে আরো বিষ নীলাভ রং
বর্ণ পরিচয় গাঢ় হয়নি যখন
নীলপদ্ম চিনেছি কোন্ সকালে
দার্জিলিং-এর কমলালেবু, ভালোবাসার জলপটি, শীতের রঙীন
সোয়েটার

পারবে না আমাকে বাঁচাতে
হিল স্টেশনে গাঢ় কুয়াশার মতো ঘুম
ঘড়ির কাঁটায় আচ্ছন্ন জপমালা একে একে ঘর বদলায়
মোমবাতির নরম চোখ, পোষা বেড়ালের মতো শয্যা
ডেকে আনে কবন্ধ ছায়া
সশব্দ হাততালি পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে
আমার হৃদস্পন্দন চুরি হয়ে যাবে
ফুলদানি, গোলাপী বাল্ব, বিদেশী রুমাল
অর্থাৎ যাবতীয় উচ্চাশা, গাঢ় কোলাহল
একে একে ডেকে নেবে স্বপ্নের দালাল

পা বাড়ালে থেমে যায় হাতের মুদ্রা
হাত বাড়ালে পা ডুবে যায় কালীদহের জলে

নীলপদ্ম চিনেছিলাম সে কোন্ ভোরের বাতাসে
বাতাসহীন ঘর আজ তুলেছে শোধ
ওষ্ঠে গাঢ় নীল রং
কবিতা আমার ভীষণ অসুখে।

নিরর্থক

দেবাঞ্জলি মিত্র

যতদূর টানা যায় গলানো সবুজ সূক্ষ্ম রোদ
এখন দুপুর
ঝিকঝিক শব্দহীন ট্রেন নামে
দূরে দূরে সূর্যের কুণ্ডন
ডিমের পুরোনো বহু কুসুমের জড়তায়
ভিজে আছে গ্রীষ্মকাল
মাঝে মাঝে রোদে শ্বাসকষ্ট
ঝিকঝিক সূর্যের আওয়াজ!

কামলা রোগীর হলুদ চোখের মত
নির্জন আগুনে স্থূলে পাতা ফিসফিস করে
এরকম একদিন পুরোনো কুসুম-ভেজা গ্রীষ্মকালে
তুমিও এসেছো
মুঠের বিবর ভরে ডান হাত তখনো তো
কুণ্ডলী পাকায় নি
পাঁচটি আঙুল সুদ্ধ হাতখানি
সবুজ পাতার ভঙ্গী পেতে দিয়েছিল!
কাঁকড়া-রং চুম্বকও আনো নি
দুপুরের ভিজে রোদে
শামুকে প্রাণীর মত গানহীন
তুমি এসেছিলে
তখনো চোখের সামনে
যতদূর টানা যায় গলানো সবুজ সূক্ষ্ম রোদ
তখনো দুপুর
আজ অকস্মাৎ
রোদের নির্জন তোড়ে তুমি ভেসে গেছো!

হয়তো এই-ই পাওয়া

সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ জানলা খোলার শব্দ, বুকের মধ্যে ঝড়...
গৈরিক প্রান্তর!
হঠাৎ যেমন এগিয়ে আসে পাতা-ওড়ানো হাওয়া—
একেই বোধহয় পাওয়া
বলে সবাই—যখন এমনি বাতাস ওড়ায় ছাই!

যাই......
যাবো কোথায়? বাইরে এখন প্রচণ্ড রোদ্দুর
জনপ্রাণীর টিকিটুকুও নেই,
একলা হৃদয় বিষণ্ণ বেশ—জৌনপুরীর সুর
কার রেডিওয় বাজছে বাড়ির পাশে,
আটটা-দশটা কাকের মিটিং লনের সবুজ ঘাসে
মানাচ্ছে বেশ—দীপ্ত দুপুর এবং প্রকারেই

নিত্য কাটে। হঠাৎ যখন হাওয়ায় ওড়ে ছাই—
ঝনাৎ শব্দে জানলা খোলে—দমকা হাওয়ায় ঘর
ভরাট হয়ে যায়—হৃদয় বলতে থাকে,—'যাই......'!
বুকের মধ্যে চিত্রিত হয় গৈরিক প্রান্তর!

শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ১ ॥

শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছিল ভাগলপুরে মামার বাড়িতে। সেখানে মামাদের প্রতিবেশী রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার বা রাজু ছিলেন শরৎচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। রাজু বয়সে শরৎচন্দ্র অপেক্ষা দু-এক বছরের বড় ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এই বন্ধু রাজুকেই ইন্দ্রনাথ রূপে চিত্রিত করে গেছেন।

রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বেশী ঘনিষ্ঠতা হয় এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার পর। শরৎচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষা দেন ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। তখন ভাগলপুরেরও এনট্রান্স পরীক্ষা হত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। শরৎচন্দ্র ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের অন্যতম মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে রাজু এবং রাজুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে লিখেছেন—'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর ফল বার হওয়ার মধ্যে একটি দীর্ঘ কালের ব্যবধান পড়ে।...এই সময়ে রাজেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে উঠেছিল। রাজেন্দ্রের ওরফে রাজু এবং শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত বই-এর ইন্দ্রনাথ—সেই সময়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তাঁদের কাঠের কারখানায় ছুতোর মিস্ত্রির কাজে মন দিয়েছিলেন।...শরৎ অবসর বিনোদনের জন্য রাজুদের কারখানায় ঘন ঘন যেতে লাগলেন।'

সুরেনবাবু রাজুদের প্রতিবেশী ত ছিলেনই, তা ছাড়া তিনি রাজুকে ভালভাবে চিনতেনও। সুরেনবাবুকে একাধিকবার বলতে শুনেছি, শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসে রাজুকে ইন্দ্রনাথরূপে চিত্রিত করতে গিয়ে কোথাও এতটুকুও অতিরঞ্জিত করেননি। বাস্তবে রাজু ঐ প্রকৃতিরই মানুষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর 'ছেলেবেলার গল্প' গ্রন্থে 'লালু' নামে যে তিনটি মজার গল্প লিখেছেন, সেগুলোও রাজুরই কাহিনী নিয়ে লেখা বলে সুরেনবাবু লিখেছেন—'ইন্দ্রনাথের (রাজুর) কাহিনী ফলিয়ে সাহিত্য করে লেখা।'—শরৎ-পরিচয়

শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ 'ছেলেবেলার গল্প' বই-এর ভূমিকায় নিজেও লিখেছেন—'মনে পড়লো এক বাল্যবন্ধুর কথা। ভাবলাম, আজ তারই দু-একটা গল্প বলি।' শরৎচন্দ্র এখানে বাল্যবন্ধুর নাম উল্লেখ না করলেও ঐ বাল্যবন্ধুই ছিলেন রাজু।

রাজুর অনেক আশ্চর্য ও বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর মধ্যে মাত্র কয়েকটিরই শরৎচন্দ্র তাঁর ঐ দুটি গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন। অবশ্য সুরেনবাবুও তাঁর বইয়ে দু-একটা কাহিনী বলেছেন।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আলোচনায় লিপ্ত থাকায় রাজুর সম্বন্ধেও আমি বহু অনুসন্ধান করেছি। ফলে এই অসাধারণ মানুষটির অনেক অজ্ঞাত রোমাঞ্চকর কাহিনীও সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। সম্প্রতি রাজুর সম্পর্কে আরও কয়েকটা কাহিনী আবিষ্কার করেছি। এই আবিষ্কৃত কাহিনীগুলিরই কয়েকটি এখন এখানে বলছি। তার আগে রাজুদের একটু বংশ পরিচয় দিচ্ছি। সেটারও প্রয়োজন আছে।

রাজুর বাবা রামরতন মজুমদার ছিলেন শিবপুর বি-ই কলেজের প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় ব্যাচের বি-ই পাশ ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর বাড়ি ছিল পাবনা জেলায়। ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের সরকারী চাকরি নিয়ে ভাগলপুরে গিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন বলে সরকারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে স্বাধীনভাবে ঐ ভাগলপুরেই ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ব্যবসায় প্রভূত অর্থ উপার্জন করে ভাগলপুরের আদমপুর অঞ্চলে গঙ্গাতীরে এক নীলকর সাহেবের অনেকটা জায়গা ক্রয় করেন। সেখানে তিনি তাঁর সাত ছেলের জন্য সাতটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন।

রাজুরা সাত ভাই ছিলেন, যথাক্রমে—সুরেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ। যতীন্দ্রনাথের ডাক নাম ছিল বোতল।

রাজুর বড়দা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন এবং রায়

ইন্দ্রনাথ (রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার বা রাজু)

বাহাদুর সরকারী খেতাবও লাভ করেছিলেন। তিনি সেকালের একজন নামকরা লেখক এবং বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানের প্রশংসা করতেন। তাঁর এক গানের আসর সম্বন্ধে নলিনীকান্ত সরকার তাঁর 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' গ্রন্থে লিখেছেন—কবি যতীন বাগচীর আরপুলি লেনের বাড়িতে সুরেনবাবুর গানের আসরে সেদিন রবীন্দ্রনাথও এসেছেন। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে গান শুনলেন। গান শেষ হলে একজন শ্রোতা সুরেনবাবুকে বললেন—কেদারের গানটা একবার গাইবেন?

শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন—কেদারা রাগিণীর গান গাইতে বলছেন?

—আজ্ঞে, কেদারা রাগিণী নয়। কেদার নামে একটি লোকের গান। সে গান শুনলে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—তাহলে গানটা তো শুনতেই হ'ল।

সুরেনবাবু বললেন—সেটা গানই নয়, একটা ক্যারিকেচার মাত্র। আপনার ভাল লাগবে না।

রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই ছাড়লেন না। তখন সুরেনবাবু গাইলেন। সুরেনবাবু তাঁর অমন সুরেলা কণ্ঠে সমস্ত গানটা বেসুরো করে গাইলেন। সমস্ত গানেরই প্রত্যেকটি পর্দা বেসুরো। গান শুনে রবীন্দ্রনাথের সে কী হাসি!

রাজুর মেজদা কলকাতা মেডিকেল কলেজের গ্র্যাজুয়েট বৃত্তিপ্রাপ্ত এম বি ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু তিনি এলোপ্যাথী ছেড়ে বরাবর হোমিওপ্যাথীই চিকিৎসা করতেন। তিনি ডাক্তারী করতেন কলকাতায়। তাঁর ভাগলপুরের বাড়িটা ভগ্নীপতি হরেন্দ্রলাল রায়কে দিয়ে এসেছিলেন। এই হরেন্দ্রলাল রায় হলেন কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এক দাদা। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায়ই ভাগলপুরে দাদার কাছে যেতেন। তাঁর বিখ্যাত গান 'পতিত উদ্ধারিণী গঙ্গে' ভাগলপুরে গঙ্গাতীরে এই দাদার বাড়িতে বসেই লেখা।

আমি একবার ভাগলপুরে গেলে নগেনবাবুর বিশেষ পরিচিত ও প্রতিবেশী বন্ধু চণ্ডীচরণ ঘোষ আমাকে বলেছিলেন—আমাদের পাড়ায় ক্ষুদু লাহিড়ী নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সেকেলে মহিলা, লেখাপড়া আদৌ জানতেন না। কিন্তু ভদ্রমহিলা যেমন ছিলেন মোটা তেমনি ছিলেন ডাহাবাজ। একবার তাঁর কি একটা সামান্য অসুখ করায় ক্ষুদুবাবু নগেন মজুমদারকে ডেকে আনেন। নগেনবাবু তখন বাড়িতেই ছিলেন।

ক্ষুদুবাবুর স্ত্রী যে ডাহাবাজ এবং পাড়ার একটি ঝগড়াটে মেয়ে, একথা নগেনবাবুও জানতেন। তিনি এসে রোগিণীকে দেখে গম্ভীর হয়ে বললেন—বৌদি, আপনার রক্ত সব ব্লাড হয়ে গেছে। রোগটা খুবই কঠিন।

ক্ষুদুবাবু তখন কাছেই ছিলেন। তিনি নগেনবাবুর কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসছেন দেখে, তাঁর স্ত্রী বললেন—হাসছো কি গো! ডাক্তার ঠাকুরপো কি বলছে শুনলে!

নগেনবাবু তেমনি গম্ভীর হয়েই বললেন—ক্ষুদুদার হাত দিয়ে আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভয় নেই, সেরে যাবেন। তবে একটা কথা, চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি বা রাগারাগি আর আদৌ করবেন না। তাহলে আবার পড়লে তখন কিন্তু আর সারানো যাবে না।

ভদ্রমহিলা ডাক্তারের নির্দেশ পালন করতে রাজি হলেন। এইভাবে নগেনবাবু ঐ মহিলার ডাহাবাজগিরি ছাড়িয়ে পাড়ার শান্তি এনেছিলেন।

রাজুর তৃতীয় ভ্রাতা যাঁকে রাজু ছোটদা বলতেন, সেই শরৎ মজুমদার ছিলেন ভাগলপুরের উকিল। কিন্তু তিনি শেষ দিকে ওকালতি ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করতেন। তিনি ক্রীতা নামে একটা উপন্যাস এবং 'মেয়েলী চিকিৎসা' নামে একটা হোমিওপ্যাথী বইও লিখেছিলেন। শরৎবাবু রাজুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই রাজু পড়া ছেড়ে দিলে বাড়ির পাশেই তাঁর জন্য একটা কাঠের কারখানা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজু কারখানা দেখাশোনার চেয়ে গান-বাজনা—বিশেষ করে বাঁশি বাজানো, গঙ্গায় নিজের ডিঙি নিয়ে ঘোরা, বন্ধুদের নিয়ে খেলা[illegible] অভিনয়, দুষ্টুমি, পরোপকারমূলক[illegible] নানা রকমের কাজ করা প্রভৃতি নিয়েই মেতে থাকতেন।

রাজুর পরের ভাই মণি মজুমদার কিছুদিন বনেলী এস্টেটে চাকরি করেছিলেন। তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে গান-বাজনা ও ছবি আঁকা নিয়ে থাকতেন। তিনি ভাল তৈলচিত্র আঁকতে পারতেন। তাঁর আঁকা 'শ্রীরাধার মুরলী শিক্ষা' নামে একটা তৈলচিত্র কলকাতার রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বহু টাকা দিয়ে কিনেছিলেন।

মণিবাবুর পরের ভাই কেষ্টও একজন ভাল গায়ক ছিলেন। তিনি ভাগলপুরের পি ডব্লিউ ডি-তে চাকরি করতেন। ছোট ভাই যতীন বা বোতল তাঁর উপরের দু' দাদার মত বি-এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি পাগল হয়ে যান। তাঁকে রাঁচীর পাগলাগারদে রাখা হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিও ভাল গান জানতেন

এইভাবে রাজু এবং তাঁর ভাইরা সকলেই বিভিন্ন গুণের অধিকারী হলেও তাঁদের সকলের মধ্যেই বেশ একটু করে খামখেয়ালীভাব বা পাগলামী ছিলই। তাই রাজুর ছোট মণি মজুমদার প্রায়ই বলতেন—আমাদের ভাইদের সকলের মধ্যেই একটু আধটু পাগলামী থাকলেও লোকে সহজে সেটা ধরতে পারত না। কিন্তু বোতলটা পাগল হয়ে গিয়ে নিজেই ধরা দিলে।

রাজুর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁদের বংশের অনেকের সঙ্গেই আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। সম্প্রতি আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। এই আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয়টা কিভাবে হ'ল, তার একটু ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসটা এই—'দেশ' পত্রিকার শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যায় বারিদবরণ ঘোষ 'ইন্দ্রনাথ এবং একটি দলিল' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে কয়েকটা ভুল এবং গোলমেলে কথা থাকায় আমি এর একটা প্রতিবাদ লিখে 'দেশ' পত্রিকায় দিতে যাই। গেলে সম্পাদক সাগরময় ঘোষ মহাশয় আমাকে বললেন—বারিদবাবুর লেখাটার উপরেই রাজাদের বংশের শেলী সান্যাল নামে কে এক ভদ্রমহিলা একটা চিঠি পাঠিয়ে

ছিলেন, সেই চিঠিটা আমি পিওন দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। পেয়েছেন কি? যদি আপনার কোন কাজে লাগে এই ভেবেই চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছি।

বললাম—এখনও পাই নি। পিওন হয়তো যেতে পারে নি, তবে পাঠিয়েছেন যখন তখন নিশ্চয়ই পাব।

পরের দিন সাগরময়বাবুর প্রেরিত শেলী সান্যালের চিঠিটা পেলাম। চিঠিটা 'দেশ' সম্পাদককে সম্বোধন করেই লেখা। চিঠির বিষয়বস্তু এই শেলী দেবী রাজুর মেজদার কন্যা। তিনি কলকাতায় শিল্পী সতীশ সিংহের বাড়িতে শরৎচন্দ্রকে দেখেন। তখন শরৎচন্দ্র তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁর কাছে রাজুর অনেক প্রশংসা করেছিলেন। শেলী দেবী তাঁর মা'র কাছে শুনেছেন—মা'র অনুমতি ছাড়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না বলে রাজু রোজ তাঁর মা'র পা টিপতেন। রাজুর মা এই পা টেপা বন্ধ করবার জন্য একদিন রাগ করে রাজুকে বলেছিলেন—যা, দূর হ। সব সময় পা টিপিস্ কেন? সেইদিনই রাজু বিল্বমঙ্গল অভিনয়ের রাত্রে উধাও হয়েছিলেন।

এই চিঠি পেয়েই আমি পরদিন সকালে শেলী দেবীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি কলকাতাতেই থাকেন। গেলে শেলী দেবী কথায় কথায় বললেন—আমার এক দাদা, যখন তার বয়স দু বছর, রাজুকাকা তাকে নিয়ে তাঁর ডিঙি-বাঁধা অশত্থ গাছের ডগায় উঠে যেতেন। মা দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকতেন। মার কাছে শুনেছি, রাজুকাকা ঠাকুরমাকে ব্যথা দেবার জন্যই জোরে জোরে পা টিপতেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—ঠাকুরমার মুখ থেকে সরে যা, চলে যা বা দূর হ—এই ধরনের একটা কথা আদায় করে নেওয়া। কারণ, মার অনুমতি না পেলে নাকি সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কিন্তু অনুমতি তো দেবেন না, তাই ঐ ধরনের একটা কথা মার মুখ থেকে বার করে নেওয়া।

পরে শেলী দেবী বললেন—আমার এক খুড়তুতো দিদি তরুলতা দেবী রাজুকাকা এবং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন। তিনি আমার মণিকাকার মেয়ে। তাঁর ঠিকানা আমার মনে নেই। আপনি আমার জ্যাঠামশায়ের পৌত্র ভানুর কাছ থেকে তাঁর ঠিকানাটা জেনে নেবেন। তাঁর ঠিকানাটা আপনাকে দিচ্ছি।

সেইদিন ভানুবাবুর কাছ থেকে তরুলতা দেবীর ঠিকানা সংগ্রহ করে পরদিন তরুলতা দেবীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমার লেখার সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিতা ছিলেন বলে রাজু এবং শরৎচন্দ্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা খুবই সহজ হ'ল। শেষে তিনি বললেন—আমার বাবা, রাজুজ্যাঠার ঠিক পরের ভাই ছিলেন। রাজুজ্যাঠা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। বাবা তাঁর চেয়ে বয়সে ৩।৪ বছরের ছোট ছিলেন বলে তিনি অনেক সময়ই রাজুজ্যাঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। বাবা রাজুজ্যাঠার কিছু কাহিনী একটা খাতায় লিখে রেখে গেছেন। সেই খাতাটা আপনাকে দিচ্ছি। ঐ লেখায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম না থাকলেও তিনিও আমার বাবার মতই সব সময় রাজুজ্যাঠার দলে থাকতেন।—এই বলে তরুলতা দেবী তাঁর বাবার লেখা খাতাখানা আমাকে দিলেন।

খাতায় মণিবাবুর লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কারণ, সেই আশ্চর্য মানুষ রাজু যাকে শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্ত উপন্যাসে ইন্দ্রনাথরূপে অমর করে রেখে গেছেন, তাঁর বীরত্বের, দুঃসাহসের ও মজার আরও অনেক কাহিনী জানতে পারলাম। সেই কাহিনীগুলোরই কয়েকটা এখন এখানে বলছি।

মণিবাবু লিখেছেন—একদিন রাজুদার দলের কয়েকজন তাঁকে বললে—রাজুভাই, আজ কিছু খাওয়া।

তিনি পয়সা পাবেন কোথায়? কাজেই

এক খাবারের দোকানে চুরি করা মনস্থ করলেন। তবে সাধারণ চোরের মত চুরি করায় ত আর বাহাদুরি নেই, তাই এক উদ্ভট উপায় বার করলেন। আমরা দূরে থেকে ব্যাপার দেখতে লাগলাম।

এদেশে (ভাগলপুরের) বড় দোকানে প্রায়ই তক্তা থেকে চাদর ঝোলান থাকত। আর তার ওপরে খাবার সাজান থাকত। রাজুদা চক্ষের নিমেষে জনাকীর্ণ রাস্তার মাঝেই দোকানীর সেই চাদরের তলায় ঢুকে পড়লেন। এবং বেমালুম একরাশ পানতুয়া কোঁচড়ে পুরলেন।—এবার কি করে পালাবেন ভাবছেন!

তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। দোকানদার একটা খাটিয়া বার করে সেই চাদরের সামনেই বসে তামাক খেতে লাগল। রাজুদা দেখলেন—পালাবার পথ বন্ধ।

এমন সময় দোকানদার হঠাৎ তার পিঠের দিকে কোঁচ্ কোঁচ্ শব্দ শুনে পিছু ফিরে দেখে—দুটি তারাহীন সাদা চোখ।

দোকানদার ভয় পেয়ে চীৎকার করবার আগেই রাজুদা তার কলকেয় এক থাবা মারলেন।

বেচারী আগুনে সামলা না চোর ধরবে! তবে সে চোর চোর চীৎকার করায় লোকজন দৌড়ে এ রাজুদাকে তাড়া করল। রাজুদা ত গঙ্গাতীরের দিকে জোরে ছুটেছেন। দিন কয়েক আগেই তিনি লং জাম্পে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। এদের কোন রকমে এড়ালেও, কিছুটা গিয়ে দেখলেন—এক ভীমকায় কৃষ্ণবর্ণ কোচম্যান দুই হাত ছড়িয়ে তাঁর পথ আটকেছে। আমাদের তো তখন ভয়ে বুক কেঁপে উঠলো। কিন্তু দেখলাম, লোকটা পেটে হাত দিয়ে শুয়ে পড়লো। আর রাজুদা এক লাফে প্রকাণ্ড একটা নালা ডিঙিয়ে অপর পাড়ে গিয়ে পড়লেন। কিন্তু এত বড় অসম্ভব লাফ দিয়েও তাঁর কার্যসিদ্ধি হল না—পাড় ভেঙে পড়ে গেলেন। পানতুয়াগুলো চ্যাপটা ও কাদামাখা হয়ে গেল। লোকেরা কিন্তু বুঝল, কে অত বড় লাফ দিল। তাই আর গোলমাল না করে চলে গেল।

বাগানে এসে রাজুদা যখন আমাদের সেই পানতুয়া খেতে দিলেন, তখন আর কি করি, বললাম—খাসা পানতুয়া।

একজনের নেহাতই দুরদৃষ্ট ছিল, তাই সে বলল—এ কি করে খাব ভাই, কাদামাখা যে!

রাজুদা বললেন—আমি অত বিপদে পড়ে পা মচকে পানতুয়া আনলাম, আর তুই আরামে বসে খেতে পারবিনে, এত নবাবী!—এই বলেই তার হাতটা মুচড়ে দিলেন।

যন্ত্রণায় বেচারা খায় আর কি!

রাজুর এই দোকানীর চাদরের তলায়

ঢ্যকে পড়ার কথায়, তাঁর একবার এক লেপের তলায় ঢ্যকে থাকার কথাও মনে পড়ে। সেই ঘটনাটি সম্বন্ধে স্যরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন—এক শীতের রাতে রাজ্য সদলে মড়া পোড়াতে যায়। কিন্তু পথে প্রবল বৃষ্টি নামায় সকলেই মড়া ফেলে পালাল, কেবল রাজ্য একা মড়া আগলে সেই গভীর রাত্রে নির্জন পথে মড়ার পাশে লেপের তলায় শ্যয়ে রইল।—কী দ্যঃসাহসিক কাণ্ড!

শরৎচন্দ্র তাঁর 'ছেলেবেলার গল্প' গ্রন্থের একটি লাল্য গল্পে স্যরেনবাবুর বর্ণিত এই কাহিনীটিই রাজ্যর নাম না বলে লাল্য বলে লিখে গেছেন।

ভাগলপ্যরের বিখ্যাত 'আদমপ্যর ক্লাবে'র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র প্যত্র কুমার সতীশ। তিনিই প্রধানত ক্লাবের সমস্ত ব্যয় বহন করতেন। রাজ্যর ছোটদা শরৎ মজ্যমদার ছিলেন ক্লাবের অন্যতম প্রধান। রাজ্য, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন ক্লাবের বিশিষ্ট সদস্য। থিয়েটার করা ছাড়াও ক্রিকেট, ফ্যট-বল, দাবা, তাস পাশা ও বিলিয়ার্ড খেলার এবং শিকারেরও ব্যবস্থা ছিল ক্লাবে। রাজ্য কয়েকটা বিভাগেই বিশেষ করে ফ্যটবলে ছিলেন নেতৃস্থানীয়।

এই ফ্যটবল বিভাগ সম্বন্ধে স্যরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—'রাজ্যর ভারি ইচ্ছা ছিল যে এমন দল হয়, যাহারা এই খেলাটিকে চ্যড়ান্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারে। কয়েকদিনের জন্য আমি এই দলে ভর্তি হইয়াছিলাম।'—'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিন'।

ঐ ফ্যটবল দলে শরৎচন্দ্রও যে ছিলেন তা বলাই বাহ্যল্য। তখন এ'দের ফ্যটবল খেলা হত ভাগলপ্যরের বিখ্যাত স্যান্ডিস গ্রাউন্ডের দক্ষিণ-প্যর্ব কোণের খেলার মাঠে।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথমেই আমরা যে ফ্যটবল খেলার মাঠে মারামারির বর্ণনা পাই, সেটি একটি সত্য ঘটনা। সেদিনকার ঘটনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী স্যরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—'শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের আরম্ভেই আমরা দেখি যে, একটি ফ্যটবল ম্যাচের পরি-সমাপ্তির পর মারামারি এবং বিপন্ন শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ আততায়ীর হাত থেকে উদ্ধার করছে।

এই মারামারির সময় সেখানে বর্তমান লেখকের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য ঘটে-ছিল। ভাগলপ্যরে 'টয়েন বি স্পোর্টে'র' একটি খেলার শেষে এ ব্যাপারটি ঘটে এবং ইন্দ্র-নাথের (রাজ্যর) দল লাঠির জোরে বিপক্ষ পক্ষকে তাড়িয়ে দেয়।

শ্রীকান্তের (শরতের) সঙ্গে ইন্দ্রনাথের
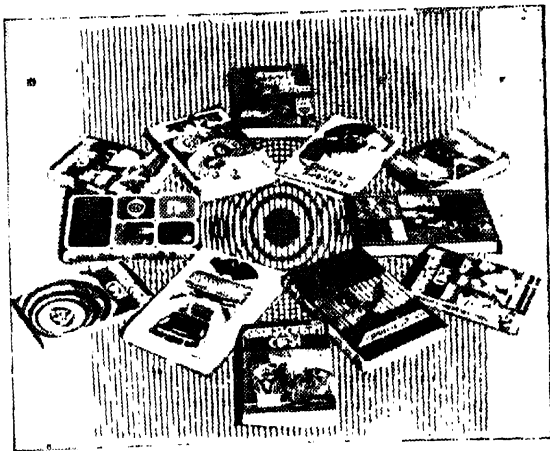
(রাজুর) এটি প্রথম দেখা নয়। কারণ, এই ঘটনা ১৮৯৩-৯৪ সালে ঘটে। এই সময়ে শরতের বয়স সতের বৎসর, রাজুর আঠার-উনিশ হবে।

এখানে রাজুর বর্ণনাটি একটুও কাল্পনিক কি অতিরঞ্জিত নয়। কিন্তু শ্রীকান্তকে একেবারে অন্য ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। ...জানি যে শ্রীকান্তের সহকারিতা নৈলে সেদিনের জয় ইন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।' —শরৎ-পরিচয়

এইরূপ একদিনের খেলা শেষে সদলে বাড়ি ফেরার পথে রাজু যে কাণ্ড করেছিলেন, সে সম্বন্ধে মণিবাবু তাঁর খাতায় যা লিখে গেছেন, তা এই—

একদিন আমরা সবাই ফুটবল খেলে বাড়ি আসছি—রাস্তার মাঝে হঠাৎ কথা উঠল—দাঁড়িয়ে কে কতখানি উঁচুতে পা তুলতে পারে।

আমরা সবাই যতখানি পারি তুললাম, রাজুদা কিন্তু তুললেন না। বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি সোজাই চললেন।

এক জায়গায় রাস্তার ধারে একটি বেজায় লম্বা রিজার্ভ পুলিসের লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তার লম্বায়মান টিকিটি রাজুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এবার আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে তিনি পা তুলে বেমালুম সেই বেচারীর টিকিতে ঠেকিয়ে দিয়ে দেখালেন, কত উঁচু পর্যন্ত পা তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব।

কিন্তু এর পরিণাম যা হল, সেটা আরও অদ্ভুত। লোকটি ভীষণ রেগে গিয়ে তাঁকে মারতে উঠলো দেখে রাজুদা যা করলেন, তা কেউ ভাবেনি। তিনি সেইখানেই সোজা দাঁড়িয়ে, চোখ দুটো সাদা, মানে তারাহীন করে ফেললেন, আর মুখে বাঁদরের মত কিচি কিচি কিচি কিচি শব্দ করতে করতে তার মুখটা খপ্ করে ধরে ফেললেন, যেন সেটা ক্রিকেট বল!

লোকটি একেবারে স্তম্ভিত, হতভম্ব। তার পরই সে রাজুদাকে পা[illegible] মনে করে ভীষণ দৌড় দিল। রাজু[illegible] কিচি কিচি কিচি কিচি করতে [illegible] তার পিছু নিলেন।। প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে সে এক কেলেঙ্কারী ব্যাপার! (ক্রমশ)

চেয়ারে উপবিষ্ট : বাঁদিক থেকে—কুমার সতীশ (প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা অশোককুমারের মাতামহ) সুরেন্দ্রনাথ বসু (পরবর্তী জীবনে ভাগলপুর কোর্টের খ্যাতনামা অ্যাডভোকেট ও রায় বাহাদুর), রাজুর ছোটদা শরৎচন্দ্র মজুমদার, সতীশচন্দ্র বসু। সামনের সারিতে বাঁ দিকে কোণে উপবিষ্ট শরৎচন্দ্র, শরৎ মজুমদারের সামনে বসে রাজু (* চিহ্নিত)। শরৎ মজুমদারের পিছনে দাঁড়িয়ে রাজুদের প্রতিবেশী ধরণীধর লাহিড়ী (মুখে দাড়ি)।

আদমপুর ক্লাবের এই গ্রুপ ফটোটি সংগ্রহ কালে, এর মধ্যে কেবল শরৎচন্দ্রকেই যা জানতে পেরেছিলাম। তখন আর কাকেও জানতে পারি নি। এমন কি, এও ভেবেছিলাম, হয়ত এই ফটোটি রাজুর নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে তোলা। কিন্তু পরে এই ফটোটি নিয়ে একাধিকবার ভাগলপুরে গিয়ে এবং অন্যান্য সূত্রেও এই কয়েকজনেরই মাত্র পরিচয় পাই। কুমার সতীশ প্রভৃতি সকলেরই বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের বাড়িতে রক্ষিত তাঁদের ফটোর সঙ্গে মিলিয়েও নিয়েছি। কেবল রাজুদের বাড়ীতে তাঁরই কোন ফটো পাই নি। রাজুদের বাড়ীর অনেকে গ্রুপ ফটোতে রাজুকে চিনিয়ে দেন। রাজুর বড়দা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের পৌত্র সুধীন্দ্রবাবু বলেছিলেন—আমাদের বাড়ীর এবং আত্মীয়রাও যাঁরা রাজুদাদুকে দেখেছিলেন তাঁরা বলেন—রাজুর মুখটা দেখতে প্রায় তোর মুখের মতই ছিল। সুধীন্দ্রবাবুর কথা মত তাঁদের চিহ্নিত রাজুর সঙ্গে সুধীন্দ্রবাবুর মুখ মিলিয়ে দেখেছি কথাটা সত্য। রাজু নিরুদ্দেশ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তোলা এই ছবি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন নিরুদ্দেশ হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২৭।২৮। রাজুদের বাড়ীতে শুনেছি, তাঁর গায়ের রং ছিল কালো, কিন্তু শরীর ছিল অসাধারণ বলিষ্ঠ এবং গায়ে ছিল অপরিসীম বল।

॥ ৩২ ॥

ধানবাদ থেকে কলকাতা তো অনেক দূরে। কিন্তু সুলেখা এখনও চট্টরাজের জন্য দুশ্চিন্তা করছে। কর্মক্ষেত্রে যে-মানুষকে খ্যাতি ও শক্তির তুঙ্গে দেখেছে তিনিই আজ চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন ভাবতে সুলেখা কেমন মুষড়ে পড়ছে।

গত রাত্রে রাজাবাবু এসেছিলেন। যে-চট্টরাজের কথা তুলতে এঁরা বিনয়ে গদ গদ হয়ে উঠতেন, আজকে তাঁর সম্বন্ধে রাজাবাবুর তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কিছুই নেই। চট্টরাজের পতনে উল্লসিত রাজাবাবু বললেন, "চট্টরাজ খুব বাজে লোক ছিলেন। আপনার ওপরেও নানা অত্যাচার করেছেন, নিশ্চয়।"

সুলেখা চুপ করে রইল। এই অবস্থায় চট্টরাজ সম্পর্কে কোনো রকম সহানুভূতি দেখালে জেঠমালানি এবং তাঁর গুণধর ভাগ্নে ভুল বুঝে বসবেন এবং সুলেখাকেও কোনো একটা গোলমালে জড়িয়ে ফেলতে দ্বিধা করবেন না।

রাজাবাবু উল্লাস প্রকাশ করে বলেছিলেন, "লাস্ট মোমেন্টে ভগবান আমাদের ওপর সদয় হলেন। আর দু দিন সাসপেন্ড হতে দেরি হলে, মেশিন সাপ্লায়ের কেসটা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যেতো।"

সুলেখা নীরবে তাকিয়েছিল রাজাবাবুর দিকে। রাজাবাবু বললেন, "মামা যখন পাটনা থেকে ট্রাংক কল করলেন যে চট্টরাজের উইকেট পড়ে গিয়েছে এবং আপনি এখানে ফিরে আসছেন তখন বিশ্বাসই হয় না। আমাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা করলে এমনিই হয়।" সগর্বে ঘোষণা করলেন রাজাবাবু। তারপর আরও বললেন, "সুখবরটা পেয়ে এমন আনন্দ হলো যে তখনই সেলিব্রেট করতে বেরিয়ে গিয়েছি এবং মনের আনন্দে আপনার কথা বেমালুম ভুল গিয়েছি।"

রাজাবাবু আরও রিকোয়েস্ট করেছিলেন, "মামাকে বলবেন না যেন আপনাকে চাবির জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। তা হলে আমার ওপর খুব চটে যাবেন—একে মামা আমার ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন না। ওঁর ধারণা, ——— ——— ——— ———।"

চট্টরাজের আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয় সম্বন্ধে সুলেখার মনে যতখানি সন্দেহ ছিল রাজাবাবুর কথায় একেবারে দূরে হলো—চট্টরাজের পতনের সমস্ত কলকাঠি জগদীশবাবুই নেড়েছেন। রাজাবাবু ভারিক্কী চালে সুলেখাকে শুনিয়ে দিলেন, "সাসপেনশন তো সামান্য কথা, মামা আশা করছেন দু-একদিনের মধ্যে চট্টরাজ অ্যারেস্টেড হতে পারেন।"

এই অ্যারেস্ট হবার কথা আমাকে বলতে গিয়ে সুলেখা যেন কেমন হয়ে গেল। কোথাকার কোন বাবু নিজের কুকর্মের জন্যে হাজতে যেতে পারেন, তার জন্যে সুন্দরী কলগার্লের বিচলিত হবার কী আছে? আমি নিজেও এ ব্যাপারে বেশী মাথা ঘামাতে উৎসাহী নই।

কিন্তু সুলেখার ভেঙে পড়বার মতন অবস্থা। উত্তেজনায় নরম হাত দুটো দিয়ে নিজের চোখদুটো ঢেকে ফেললো সুলেখা। সুলেখা হাঁপাচ্ছে। "অ্যারেস্টের কথা আমি ভাবতে পারছি না, শংকরবাবু।" মিস্টার চট্টরাজ কেন শুধু শুধু অ্যারেস্ট হতে যাবেন?

এ ব্যাপারে আমি একেবারে নিস্পৃহ। নির্মল চট্টরাজের জন্য আমি কোনোরকম উদ্বেগ অনুভব করতে পারছি না।

সুলেখা এই ভোরবেলার শান্ত সমাহিত পরিবেশে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে দিল। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "কিছু বলুন।"

আমি নির্দ্বিধায় বলে ফেললাম, "কোথাকার কে অ্যারেস্টেড হলো তাতে আপনার বা আমার কী এসে যায়, সুলেখা দেবী?"

সুলেখা এবার ভেঙে পড়লো। চোখের জল চাপতে চাপতে বললো, "মিস্টার চট্টরাজ অ্যারেস্টেড হতে পারেন জানলে আমি কিছুতেই ধানবাদ ছেড়ে আসতাম না।"

আমি নিরুত্তর। কী উত্তর আমি দিতে পারি?

সুলেখা সজল চোখে এবার যা বললো, তাতে আমার দিব্যচক্ষু হঠাৎ যেন উন্মীলিত হলো। আমি বুঝতে পারলাম সুলেখা এই অ্যারেস্ট হবার কথাটা শুনে কেন এমন মুষড়ে পড়লো।

"অ্যারেস্ট কথাটা শুনলেই আমার শরীরের ভিতরটা কেমন করতে শুরু করে, শংকরবাবু। তিন বছর আগের কথা মনে পড়ে যায়। বাবার কাছে কেমন সুখে, নিশ্চিন্তে দিন কাটতো। ছোট্ট পোস্টাপিসের মাস্টারমশায়ের ছোট সংসার। আমি এবং বাবা। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। মা অনেক দিন আগেই গত হয়েছেন। বাবার সংসার আমিই দেখি। বাবা আমার বিয়ের জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। ভাল পাত্রের হাতে আমাকে সম্প্রদান করবার জন্যে বাবা উঠে পড়ে লেগে ছন।"

সুলেখা এবার ঢোক গিললো। তারপর আবার শুরু করলো: "বাবার সাধ, ইঞ্জিনীয়র ডাক্তার অথবা সি-এ পাত্রর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে হয়। আমারও ব্যাপারটা মন্দ লাগতো না। বাবা বলতেন, মা আমার বাপের ঘরে কষ্ট পেয়েছে, স্বামীর ঘরে যাতে লক্ষ্মীর মতো বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করবোই।"

"কিন্তু সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাবা হঠাৎ একদিন সকালে অ্যারেস্টেড হলেন।" বলতে বলতে সুলেখার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। "পোস্টমাস্টারের জীবন জানেন তো—ছোট্ট চাকরি হলেও এতো দায়িত্ব খুব কম লোকের কাঁধে থাকে। টাকা কড়ি, হিসেব-পত্তর, মানি অর্ডার, রেজিস্ট্রি, ইনসিওর, সেভিংস ব্যাঙ্ক, এন এস সি, সি টি ডি, পি এল আই—অজস্র গোলকধাঁধা যে কোনো মুহূর্তে বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে প্রস্তুত।"

সেদিনই শুরু হলো সুলেখার সর্বনাশের ইতিহাস। নিজের হাতের চুড়ি এবং হার বিসর্জন দিয়ে সেদিন কোনক্রমে বাবাকে জামিনে খালাস করে নিয়ে এসেছিল সুলেখা। তারপর একটানা দশ মাস লড়াই করেছিল সুলেখা। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। আদালতের বিচারে বাবার যখন জেল হলো, তখন সুলেখা সর্বস্বান্ত। অর্থ, আশ্রয় আর অভিভাবক হারিয়ে নিষ্ঠুর এই বিশ্বে একলা এসে দাঁড়াল সীমা। বাবার আদুরে দুলালী সীমা সেনকে গোগ্রাসে গিলে ফেললো প্লেজার গার্ল সুলেখা সেন। পিতার আদরিণী কেমনভাবে জনতার বিনোদিনীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠলো তা মনসনের কল্পনা করে আমি নিজেও শিউরে উঠলাম।

সুলেখা সেন, তুমি আমায় ক্ষমা করো। 'অ্যারেস্ট' কথাটা আজও তোমার সমস্ত সত্তাকে কেন নাড়া দিয়ে ওঠে, কেন তুমি মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হও, তা এবার আমি আন্দাজ করতে পারছি।

সুলেখা সেন হয়তো আমার চোখে সহানুভূতির ছায়া আবিষ্কার করে দু দণ্ডের শান্তি প্রার্থনা করলো, দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো, "কেন এমন হয় বলুন তো? যাঁরা আমাকে ভালবাসতে এগিয়ে আসেন তাঁরাই বিপদে পড়ে যান?"

"বিপদ আপদের কি কোনো নিয়ম-কানুন আছে?" আমি সুলেখাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

কিন্তু সুলেখা যে বুঝছে না তা আমার কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ওর মনের ভাবনা মুখের মুকুরে আমারই মতো প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হয়।

রাগের চাপা আগুনে জ্বলছে সুলেখা। চট্টরাজের ভাগ্যবিপর্যয় নাটকে জেঠমালানিরাই যে সমস্ত কলকাঠি নেড়েছে তা সুলেখা আন্দাজ করে নিয়েছে। জগদীশবাবুর সঙ্গে ট্রাঙ্ক কলে কথা বলবার পরেও যেটুকু সন্দেহ ছিল তা রাজাবাবুর সঙ্গে গত রাত্রে আলাপ-আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। জগদীশবাবু ঝানু বিজনেসম্যান—মাস মাইনের বিনোদিনীর সঙ্গেও একটা অদৃশ্য দূরত্ব রক্ষা করে চলেন, কুকাজের নির্দেশগুলো ব্যক্তিগতভাবে দিলেও, ওঁকে সব কথা খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞেস করবার সাহস থাকে না সুলেখার। রাজাবাবুর কথা আলাদা, সে অনেক ফ্রি—তা ছাড়া মামার অজান্তে মাঝে মাঝে সুলেখার অনুগ্রহপ্রার্থী। সুযোগ পেলেই সে কলেজের এক সহপাঠী বন্ধুকে একদিন সুলেখা সান্নিধ্যে উপস্থিত করতে চায়—কিন্তু খুবই গোপনে। মামাজী ঘুণাক্ষরে জানতে পারলেও রাজাবাবুর সমূহ বিপদ।

রাজাবাবুকে তাই প্রাণখুলে প্রশ্ন করতে সংকোচ হয় না সুলেখার। রাজাবাবুই বললেন, "চট্টরাজকে চ্যাপ্টা করতে মামার অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। এর জন্যে দিল্লী পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে হয়েছে মামাজীকে।"

রাজাবাবুই একগাল হেসে বললেন "কোনো খুঁত নেই এমন মানুষ ইণ্ডিয়াতে এখনও জন্মায় নি। মামা বলেন, ফুটো ছাড়া ফাউনটেন পেন হয় না! এই খুঁতগুলো সময় থাকতে খোঁজ করে —পার্টি যদি সোজা আঙুলে উঠে আসে, তা হলে এই ফুটোগুলোই বাঁকা আঙুলকে হেল্প করবে।"

সুলেখা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল রাজাবাবুর দিকে। "বিজনেস চালাবার জন্যে আপনারা এতো চিন্তা করেন?" সে অবাক হয়ে যায়।

রাজাবাবু হেসে বললেন, "আরও কত কি কাণ্ড আছে। মাথা না-ঘামালে চলবে কী করে? মামার এক-একটা কাণ্ডকারখানা দেখে আমি নিজেই তাজ্জব বনে যাই। অথচ রোজগারের পরে ভোগে কোনো আগ্রহ নেই মামাজীর। নিজেও এনজয় করেন না, অপরকেও ভোগ করতে দিতে চান না তিনি।" রাজুর ওপর অ্যালসেসিয়ানের মতো কড়া নজর রেখেছেন মামাজী। তিনি কলকাতায় নেই বলেই রাজাবাবু এতোক্ষণ ধরে এমন খোস মেজাজে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটে বসে সুলেখা

সেনের সান্নিধ্য উপভোগের দুঃসাহস দেখাচ্ছেন।

রাজাবাবুর প্রসঙ্গ থেকে সুলেখা এবার নিজের কথায় ফিরে এল। চট্টরাজের সান্নিধ্য থেকে এইভাবে আচমকা সরে আসতে ওর যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি। সুলেখা আমাকে জিজ্ঞেস করলে, ধানবাদে আপনার কেউ জানা-শোনা আছেন? আমার একটু উপকার করবেন? মিস্টার চট্টরাজকে সত্যিই অ্যারেস্ট করলো কিনা আমায় জানাবেন? জগদীশবাবুরা যা লোক মিস্টার চট্টরাজ সম্বন্ধে বেশী জিজ্ঞাসা করবার সাহস নেই আমার—এখনই কিছু সন্দেহ করে বসবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দূরে করে দিয়ে অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন আপনাদের এই চৌত্রিশ নম্বরে।"

ধানবাদে আমার কোনো পরিচিত-জনকে স্মরণ করতে পারলাম না। চেনা-শোনা কেউ থাকলেও বিপদে পড়ে যেতাম —কারণ সুলেখা সেনের এই রহস্যময় ও বিপজ্জনক জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার জড়িয়ে পড়ার কোনো প্রকার যৌক্তিকতা নেই। খবর পেলে বরদাপ্রসন্ন ও গণপতি-

বাবুও নিশ্চয় একই মত পোষণ করতেন এবং এই সন্দেহজনক সান্নিধ্য থেকে আমাকে শত হস্ত দূরে থাকবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু সব বুঝেও এই মুহূর্তে সুলেখার জন্য আমি কাতর হয়ে উঠেছি, বিপদের সময় ওর সাহায্যে আসবার জন্যে আমার মনটাও ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সুলেখাকে চিন্তা করতে বারণ করলাম। বিষণ্ণ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললো সুলেখা।

আমার কাপে আরও একটু চা ঢালতে ঢালতে সুলেখা বললো, "আমাদের এই জীবনে চিন্তা করবার মতো অবসর কোথায়?"

সুলেখার প্রতিটা কথার মধ্যে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা জড়িয়ে আছে তা আমি সহজে বুঝতে পারছি।

সুলেখা এবার এঁটো চায়ের কাপ দুটো টেবিল থেকে সরাতে সরাতে পরম দুঃখে ও অভিমানে বললো, "পিছনের দিকে তাকানোর বিলাসিতা তো আমাদের মতো মেয়েদের জন্যে নয়, শংকরবাবু। আজকের মাথাব্যথায় যারা পাগল গতকালের স্মৃতি তাদের কাছে নিরর্থক।"

আমি পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে সুলেখার বিনম্র অপাপবিদ্ধ করুণ মুখ-খানির দিকে তাকিয়ে আছি।

অকস্মাৎ কোনো ইন্দ্রজালে সুলেখা সেনের মুখমণ্ডলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলো। কল গার্ল সুলেখা সেন এবার আসরে উপস্থিত হলেন। রহস্যময়ীর নিপুণ লাস্যে সুলেখা সেন অকস্মাৎ পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ভ্রূধনু ভঙ্গ করে, মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করে সুলেখা বললো, "আমার সময় কই? জেঠমালানিরা যে 'আর্জেন্ট' কাজ দিয়েছেন আমাকে। ভীষণ 'আর্জেন্ট' কাজ। আপনি শুনলে বুঝতে পারবেন! কিন্তু এখন বলবো না", এই বলে হা-হা করে হাসতে লাগলো চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের রহস্যময়ী রমণী সুলেখা সেন।

জেঠমালানি সম্পর্কে বিচিত্র এক ঘৃণা নিয়ে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসেছি। সাধুতার নামাবলী গায়ে জড়িয়ে যেসব দুষ্কৃতকারীরা সমাজের অলিতে গলিতে তাদের নির্লজ্জ শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে, হে ঈশ্বর তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছ ভাল?

ঊর্ধ্ব আকাশ থেকে কোনোদিন এ-প্রশ্নের উত্তর ফিরে আসে না। তবু অসহায় মানুষ বারবার ঊর্ধ্বলোকেই তার কাতর প্রশ্নমালা ছুড়ে দেয়। ঘৃণায় বিরক্তিতে আমার সর্বশরীর জ্বলছে—ক্ষমতা থাকলে এই মুহূর্তে আমি ওদের এই থ্যাকারে ম্যানসন থেকে বিতাড়িত করতাম।

আপিস ঘরে এসে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে জগদীশবাবুদের মুখগুলো ভুলে থাকার চেষ্টা করছি, সেই সময় রামসিংহাসন একখানা সীলকরা খাম আমার সামনে রেখে গেল। কাঁপা কাঁপা হস্তাক্ষর চিনতে আমার এক মুহূর্ত সময় লাগলো না।

সেদিনের সেই ঘটনার পরে ডরোথি ওয়াটের সঙ্গে আমি একবারও দেখা করিনি। চক্ষুলজ্জার হাত থেকে ডরোথি ওয়াটকে মুক্তি দিতে চেয়েছি আমি।

ডরোথি আমাদের এক মাসের নোটিশ দিয়েছেন। নিষ্প্রাণ ওকালতি ইংরিজীতে ডরোথি আগাম খবর দিয়েছেনঃ 'ডিয়ার সার, আগামী মাসের পয়লা তারিখ থেকে আমি থ্যাকারে ম্যানসনের ১১ নম্বর ফ্ল্যাট ত্যাগ করতে চাই। এই ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়া এবং আমার বোন কুমারী বারবারা উড বিদেশে থাকায় তিনি নিজে এই চিঠি লিখতে পারলেন না—তবে আমি তাঁর পক্ষ থেকেই আপনাকে এই আগাম নোটিশ দিচ্ছি। ইতি আপনাদের বিশ্বস্ত ডরোথি ওয়াট।'

সরকারি চিঠির সঙ্গে ছোট্ট একটা ব্যক্তিগত চিরকুটও রয়েছে আমার নামে। "প্রিয় শংকর, তোমাকে ডেকে পাঠাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চিঠি লিখতে মনস্থ করলাম। আর্নল্ডের জন্যে আমার প্রতীক্ষার অবসান হলো—সে আর ফিরবে না এই বিশ্বাস নিয়েই আমি বিদেশে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক প্রকারের স্বেচ্ছা-নির্বাসন বলতে পারো। মনের এই অবস্থা সম্পর্কে টেগোরের কয়েকটা লাইন খুঁজে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি, এখনও সফল হই নি। যদি শেষ পর্যন্ত তিনি দয়া করেন তবে যাবার আগে তোমাকে লাইন কয়েকটা লিখে পাঠাবো। যা-কিছু ঘটেছে তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমার বৃহত্তর জীবন কামনা করি, ইতি ডরোথি ওয়াট।"

ক'দিনেরই বা পরিচয়? কিন্তু ডরোথি ওয়াট এই থ্যাকারে ম্যানসনে নেই ভাবতে মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। ঠান্ডা [illegible] বরফ যেন আমার সমস্ত শরীরটা ক্রমশ ঘিরে ধরছে, আমি বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

রামসিংহাসন আজকে আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করছে। অকারণে আর একখানা সেলাম ঠুকে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তামিল করবার মতো কোনো হুকুম আছে কিনা। রামসিংহাসন বিনয়ে বিগলিত হলেই আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়—সন্দেহ হয়, কোনো মতলব আঁটছে। তার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললাম, এই মুহূর্তে আমার কোনো অনুরোধ নেই। তবে একটা প্রশ্ন আছে।

গভীর রাত্রে সেদিন উঠে দেখি থ্যাকারে ম্যানসনের প্রাইভেট প্যাসেজে কয়েকটা রিকশা সারি সারি দাঁড় করানো রয়েছে।
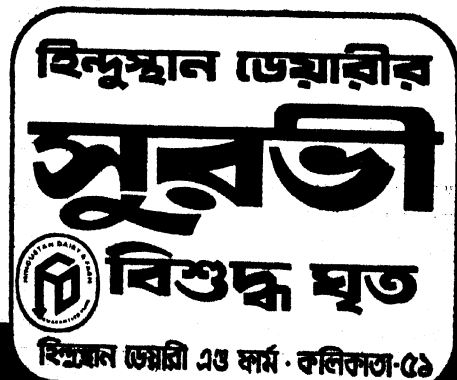
ম্যানসনের মধ্যে এমন রিকশ স্ট্যাণ্ড কেমনভাবে গজিয়ে উঠলো? তেলকালি-বাবু বলেছিলেন, "ওসবের মধ্যে নাক গলাতে যাবেন না স্যর—ওটা রামসিংহাসনের জমিদারী।"

তেলকালিবাবুর উপদেশে কান না দিয়েই রামসিংহাসনের কাছে প্রশ্নটি ফেঁদে বসলাম। রামসিংহাসন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। "তাই নাকি? রাত্রে ওখানে লাইন দিচ্ছে বুঝি? গরীব আদমি সব। রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ওপর রিকশায় ঘুমোতে সাহস পায় না। সেদিন একটা মাতাল লরি এসে দুটোকে সাবাড় করে দিয়ে চলে গিয়েছে। তাছাড়া চোর-পকেটমারও আছে। ওই যে ব্যাটা মদনা, ওরই ল্যাঙগোটিয়া কিষ্টো।" "ল্যাঙগোটিয়া শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল না। রামসিংহাসনই ব্যাখ্যা করলো ছোটবেলার ফিরেন্ড।

"কিষ্টো এতদিন 'ব্যাক চোর' ছিল। এখন সে লাইন পাল্টেছে। পুলিশের কোঁতকা খেয়ে কিষ্টো আর গাড়ির ব্যাক লাইট চুরি করছে না। তার বদলে ঘুমন্ত রিকশওয়ালাদের গাঁট কাটে। রাত্রে কেউ সাহস করে সদর স্ট্রীটে রিকশর ওপর ঘুমোতে পারে না।"

গড় গড় করে রামসিংহাসন বলে যাচ্ছে। দারোয়ান না হয়ে হাইকোর্টের উকিল হলে রামসিংহাসন অনেক টাকা কমাতে পারতো।

রামসিংহাসন এবার গম্ভীরভাবে বললো, "আপনি যদি চান, তাহলে আজই ওদের থ্যাকারে ম্যানসনে রাত কাটানো বন্ধ করে দেবো!" মেনজার সায়ব যা পছন্দ না করেন তা এ-বাড়িতে রামসিংহাসন যে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না তা সে আর একবার জানিয়ে দিয়ে আমার পরবর্তী নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা না করেই সুড় সুড় করে কেটে পড়লো।

ভাগ্যচক্রে একটু পরেই মদনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মদনা সাত সকালেই সিনেমা আর্টিস্টদের মতো ড্রেস করেছে। মাথায় একটা সুদৃশ্য কাউবয় টুপি চড়িয়েছে সে, আর শ্রীঅঙ্গে একটি নীল রঙের স্পেশাল কলার-ওয়ালা গেঞ্জি। এই গেঞ্জির বুকের কাছে একটি তীরবিদ্ধ হৃদয়ের ছবি। রক্তেরাঙা এই হৃদয়টির দিকে পথচারীদের নজর পড়তে বাধ্য।

আমাকে সেলাম করে মদনা থ্যাকারে ম্যানসনের প্রাইভেট প্যাসেজে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি যে আড়চোখে তার গেঞ্জির দিকে তাকিয়ে আছি তা মদনা সগর্বে লক্ষ্য করলো। এবং দ্বিতীয়বার সেলাম জানিয়ে বললো, "আমেরিকান জামা। আপনার দরকার হলে বলবেন, সার। হরবকত আমেরিকান পার্টি আসছে—আপনাকে জলের দামে কিনিয়ে দেবো।"

আমেরিকান জামা কাপড়ে আমার কণামাত্র আগ্রহ নেই। একটু অস্বস্তিতে পড়ে মদনা বললো, "বাবার মতো আপনিও হয়তো ভাবছেন স্যর যে আমি টাকা ওড়াচ্ছি। কিন্তু মা কালীর দিব্যি বলছি গাঁটের কড়ি খরচা করে আমি এই টুপি এবং জামা কিনিনি। কালকে স্যর ডানলপের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন কিছু রাতও হয় নি—এই সাড়ে আটটা। একজন সায়েব ও-পাড়ায় এলেন। আমি স্রেফ একটা ছেঁড়া গেঞ্জি আর নোংরা চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সায়েবের সঙ্গে বিজনেস নয়, স্রেফ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গপ্পো হতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সায়েবের মাথায় কী ভূত চাপলো, বললো, "আমার সঙ্গে জামাকাপড় পাল্টাপাল্টি করবে?" তারপর ঝটপট সায়েব নিজের টুপি আর এই গেঞ্জি খুলে দিল। আর আমি তো তাজ্জব, আমার ওই ছেঁড়া গেঞ্জি আর চাদর জড়িয়ে সায়েবের কী আনন্দ।"

আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "খুব কাজে নাকি, কোথায় চলেছো?"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে মদনা উত্তর দিল, "আপনাকে মিথ্যে কথা বলবো না, স্যর। মহাপাপ হবে। এই একটু ।"

"একটু কী?" আমি গম্ভীরভাবেই জানতে চাই।

"সিনেমা লাইনে একটু কাজ পেয়ে গিয়েছি, আপনাদের আশীর্বাদে।"

মদনার কথায় আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। এতদিনে মদনার তা হলে সুমতি হয়েছে। মদনার বাপ এবার ত হলে একটু শান্তি পাবে।

"যাক্, ভালই করেছ। কোন্ সিনেমা?" মদনাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েই ভুল ভাঙলো। বেশ লজ্জা পেয়ে সে বললো, "সিনেমাতে চাকরি নয়, সার। টিকিট ব্ল্যাকের কাজ। কোন্ সিনেমাতে কখন দরকার হয় ঠিক নেই। এখন চলেছি ধর্মতলায়।"

কিন্তু আমার ওপর অকারণে মদনার প্রবল ভক্তি। মদনা বললো, "আপনি ডাকলে আমি একটুও ব্যস্ত নই।"

"তা হলে দু মিনিটের জন্যে এসো," আমি মদনাকে আপিস ঘরের দিকে ডেকে নিয়ে চললাম।

আপিস ঘরে ঢুকেই বললাম, "তাহলে শ্রীমান মদন।"

মদনার বোধ হয় পুরনো পর্বটি সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললো, "মা কালীর দিব্যি বলছি, দুপুর বেলায় ঘর ভাড়া দেবার বিজনেস আমি বন্ধ করে দিয়েছি। বাবা সেদিন আমাকে সারে আড়ং ধোলাই দিয়েছিল। আমি বাপের নামে দিব্যি করেছি, এই থ্যাকারে ম্যানসনে কখনও ঘর ভাড়ার ব্যবসা করবো না। বাবা সেদিন তো আমাকে মেরেই ফেলেছিল—বার অন্ন খেয়ে বড় হয়েছি তার নেমকহারামি বাবা সহ্য করবে না।"

'সেদিন' বলতে মদনা যে এগারো নম্বর ঘরে ডরোথি ওয়াটের মৃত্যুদিবসে অপরিচিত অতিথি আবিষ্কারের ঘটনা উল্লেখ করছে তা আন্দাজ করা আমার পক্ষে শক্ত হলো না।

মদনা আমার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। "আপনি আমার ওপর খুব রেগে গিয়েছেন স্যার?" মদনার করুণ প্রশ্ন।

আমি গম্ভীর ও নিরুত্তর। নোংরা ওই ব্যাপারে আমি যে রীতিমত বিরক্ত তা মদনা ভালভাবেই বুঝতে পারছে।

মদনা এবার মাথা নিচু করে বললো, "মেমসায়েবের কোনো দোষ নেই, স্যার। আপনি আমাকে যত পারেন শাস্তি দিন, দরকার হলে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিন।"

"শ্বশুরবাড়িটা আবার কোথায়?"

"হাজতে"—শ্বশুরবাড়ি শব্দের টেকনিক্যাল অর্থ ব্যাখ্যা করলো মদনা।

একটু থেমে মদনা বললো, "পয়সার অভাবে মেমসায়েব বড় কষ্ট পাচ্ছেন চোখের সামনে দেখছিলাম। ভাড়া দিতে না পারায় ও'র মনের অবস্থা খুব খারাপ। দেখে মায়া হলো। আমিই তখন মেমসায়েবকে দুপুর-বেলায় ঘর ভাড়া দেবার মতলব দিয়েছিলাম। মেমসায়েব কিছুই জানতেন না। আমিও বুড়ীর মুখের ওপর সব কথা খুলে বলিনি, বলেছিলুম, দুপুরের দিকে আমার জানা-শোনা পার্টি টেমপোরারি আপিস ঘরের মতো ব্যবহার করবে। বাইরের পার্টি—কলকাতায় তাদের বসবার জায়গা নেই।"

মদনার কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। মদনা বললো, "মেমসায়েব আপনাকে খুব ভালবাসেন। আপনি ও'কে কীসব পেসট্রি শুনিয়েছেন।"

"পেসট্রি?"

জিভ কেটে মদনা বললো, "ভুল হয়ে গিয়েছে, স্যার। পোলট্রি।"

"পোলট্রি নয়, পোয়েট্রি", আমি মদনাকে সংশোধন করে দিলাম।

মদনা গম্ভীর হয়ে বললো, "মেমসায়েব আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার কথা শুনে চলতে। একদিন আপনি নাকি মস্ত আদমী হবেন। তামাম ক্যালকাটার লোক হয়তো আপনার নাম জানবে।"

অকারণে ডরোথি ওয়াটের ওপর অবিচার করবার জন্যে বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো। গভীর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠলো। মস্ত আদমী হবার কোনো সম্ভাবনা আমার সামনে নেই, কিন্তু ডরোথি ওয়াট, তোমাকে আমি চিরদিন মনে রাখবো।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

ধর্মগ্রন্থের জনপ্রিয়তা

লণ্ডনের একটি খবরে দেখলাম, এখনও বাইবেল ইংরেজী ভাষায় সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ। অবশ্য কথাটা এভাবে বললে ঠিক বলা হয় না। ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ১৯৭৬ সালে কোন কোন বই সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছে তার খোঁজ করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন বাইবেলের একটি নতুন সংস্করণ প্রায় দশ লক্ষের মতন বিক্রি হয়েছে এই বছরটিতে।

বাইবেলের জনপ্রিয়তার পর আরও যে দু তিনটি বইয়ের কথা রয়েছে তার মধ্যে স্থান পেয়েছে কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশেনারি।

মনে রাখতে হবে এটা বিলেত দেশের কথা, অর্থাৎ হিসেবটা ইংলণ্ডের। আমেরিকা বা অন্যান্য ইংরেজীভাষী দেশের কথা এখানে ধরা হচ্ছে না। আমি ইতিপূর্বেও আমেরিকার একাধিক পত্রিকায় লক্ষ করেছি, বাইবেলের বিক্রি সেখানেও সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। যদিও সব সময় নয়।

বাইবেল কিংবা অভিধানের এই বিক্রি থেকে দুটো জিনিস আমরা অনুমান করতে পারি। এক, ধর্মীয় গ্রন্থ এখনও মানুষ সমাদরে গ্রহণ করে; দুই—প্রয়োজনের গ্রন্থও মানুষকে কাছে রাখতে হয়।

বিদেশের এই প্রসঙ্গটি আমি তুললাম অন্য কারণে। অনেক দিন থেকেই আমার ধারণা, আমরা যদি বাংলা বইয়ের কোনো বার্ষিক হিসেব নেই দেখব, গীতা ও বটতলার রামায়ণ মহাভারতের বিক্রি এখনও সবচেয়ে বেশী। অবশ্য গীতার বিভিন্ন সংস্করণ আছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থকেই হয়তো তেমনভাবে সর্বাধিক বিক্রীত গ্রন্থ বলা যাবে না, কিন্তু এটা নিশ্চয় বলা যাবে যে এখনও বাংলা ভাষায় ধর্মমূলক গ্রন্থই সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়। তার থেকে নিশ্চয় প্রমাণ করা যাবে না যে আমরা সকলেই ধার্মিক; তবে অনুমান করা চলতে পারে—সাধারণ বাঙালীর কাছে গীতা রামায়ণ মহাভারত এখনও সমাদরের এবং প্রয়োজনের বস্তু।

সম্ভবত আমাদের এখানেও অভিধানের বিক্রি বেশী। কী ধরনের অভিধান—বাংলা অভিধান, না ইংরেজী অভিধান, অথবা ইংরেজী থেকে বাংলা অভিধান তা বলা মুশকিল। তবে মিলিয়ে মিশিয়ে ধরলে অভিধান যে সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থের মধ্যে পড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

ধর্মগ্রন্থের কথাই বলি। বাঙালী অতি ধার্মিক এমন আমি মনে করি না। কিন্তু লক্ষ করেছি প্রতি বছর যত গ্রন্থ বাংলায় ছাপা হয় তার অন্তত শতকরা চল্লিশ পঞ্চাশ ভাগ ধর্মসংক্রান্ত। গীতা, রামায়ণ মহাভারত কিংবা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে গ্রন্থই শুধু নয়, আরও নানা রকম গ্রন্থ, তার মধ্যে ছোটখাট গুরুদের সম্পর্কে শিষ্যদের অগাধ ভক্তি এবং উচ্ছ্বাসের পরিচয়ও থাকে।

আমরা যথার্থভাবে কোনো দিন কোনো হিসেব করে দেখিনি বাঙালী এখনও কোন গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য বা ঘরের সামগ্রী করে রাখতে চান। হিসেব করলে হয়তো জানতে পারতাম ধর্মগ্রন্থই আমাদের সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের মধ্যে পড়ে। এদিক থেকে অন্তত আমরা বিদেশীদের চেয়ে কম নই।

রুশ মহিলা কবির নির্বাসন দণ্ড

মস্কোর একটি খবরে দেখলুম, একজন মহিলা কবিকে পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছে। কবির নাম য়ুলিয়া ভজনেসেনসকায়া। এঁর বয়েস মাত্র ছত্রিশ। দুটি সন্তান রয়েছে ষোলো আর বারো বছর বয়েসের। কোন্ অপরাধে এঁর নির্বাসন হল তা অবশ্য বিস্তৃতভাবে বলা হয় নি। কিন্তু এঁর বিরুদ্ধে আদালতে সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থার নিন্দা ও অপযশ রটাচ্ছিলেন।

আদালতে য়ুলিয়া তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। বিচারের সময় মনে হয়েছিল তাঁকে হয়তো তিন বছরের জন্যে শ্রমিক শিবিরে পাঠানো হবে। শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষের পাঁচ বছরের নির্বাসনের দাবীই আদালত মেনে নেন।

য়ুলিয়ার স্বামী বেঁচে আছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর স্ত্রী এই দণ্ড বিধানের বিরুদ্ধে আবেদন জানাবেন।

সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে য়ুলিয়া কী বলেছিলেন, কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু লেখক, কবি, শিল্পীদের যে মাঝে মাঝেই সরকারী নিগ্রহ সহ্য করতে হয় সোভিয়েট দেশে—আমরা তা দেখেছি।

অভিনন্দ

সুপুরুষের সম্মান!
আপনার অপূর্ব ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরার জন্যে উপযুক্ত
ঠাকরসীর রকমারি টেরীন ব্লেন্ড স্যুটিং-এর সম্ভার
থেকে আপনার পছন্দমত কাপড় বেছে নিন।
সবসময় সবজায়গায় ঠাকরসীর কাপড়
আপনাকে সুন্দর মানায়।
ঠাকরসী ফ্যাব্রিক্স
TF
নতুন যুগের দিশারী
ঠাকরসী গ্রুপ
হিন্দুস্তান স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং মিলস লিঃ
১৬, বম্বে সমাচার মার্গ, বম্বে ৪০০ ০২৩
everfresh® 67% 'Terene,' 33% Cotton
DOUBLE EDGE 'Terene' Suitings
easycare® 67% 'Terene,' 33% Cotton
easylene® 80% Polyester, 20% Cotton
Fronlene® Polyester/Cotton
Fronester® Polyester/Cotton

পুস্তক পরিচয়

প্রবন্ধ সংকলন ॥ বাংলা কবিতা

বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ। সুশীল রায় সম্পাদিত। নাভানা। কলকাতা তেরো। চল্লিশ টাকা।

'বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+৩৮৮। ষোলজন লেখকের ষোলটি কবিতা-বিষয়ক আলোচনা পুস্তকে সংগৃহীত। তা ছাড়া আছে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কবিতা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকার দুটি দীর্ঘ তালিকা, আর আছে প্রায় পঁচিশ পৃষ্ঠা জুড়ে ভারতচন্দ্র থেকে একাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচিতি। এতদব্যতীত নির্দেশিকা অংশে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে নামসূচী, গ্রন্থসূচী ও পত্রিকাসূচী সঙ্কলিত হয়েছে।

গ্রন্থে যে ষোলটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তার অধিকাংশ প্রবন্ধই তথ্যনির্ভর এবং গবেষণাধর্মী; প্রায় প্রতিটি রচনাই অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে রচিত। প্রবোধচন্দ্র সেন এই বয়সেও একটি বিষয়ে নিবন্ধ লিখতে গিয়ে যে কি পরিমাণ অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন তা লক্ষ্য করলে আশ্চর্য হতে হয়।

বিষ্ণু দে তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন—

রেখো না বিলাসী কোনো আশা
নববাবু-ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতালী-ধনুকের টানে ঝনন্-রণনে
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা।

এই কবিতার ভাষার যথার্থ স্বরূপটা কি এই বিষয়ে অতি মূল্যবান মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন সৌরীন্দ্র মিত্র। কবিতার ভাষা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় এমন সমৃদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনা খুবই দুর্লভ। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পল্লব সেনগুপ্তের নিবন্ধ তথ্যে পরিপূর্ণ। বহু সংবাদ প্রবন্ধ দুটি থেকে জানা যায়। পারিভাষিক শব্দ বিষয়ক প্রবন্ধটি এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান সংযোজন। প্রবন্ধটি সুপরিকল্পিত, তবে পারিভাষিক শব্দ আরও কিছু সংগ্রহ করতে পারলে ভাল হত।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা লিখেছেন, বিজিতকুমার দত্ত ও উজ্জ্বলকুমার মজুমদার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং ভবতোষ দত্ত উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-কবিতার কথা লিখেছেন। এতদব্যতীত অপর সকল লেখক বিশ শতকের বাংলা কবিতার আলোচনা করেছেন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের প্রবন্ধটি সুলিখিত, তবে বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে সুপ্রযুক্ত নয়। 'কবি কাহিনী' থেকে 'শেষ লেখা'র মধ্যে হঠাৎ গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ কেন? কবি জগন্নাথ চক্রবর্তীর রচনায় অনুরাগী বর্তমান সমালোচক, কিন্তু এই সংগ্রহে তাঁর নিবন্ধটি অত্যন্ত অনাদরে রচিত।

সতীন্দ্র ভৌমিক উনিশ শতকের বাংলা কবিতা সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকার সংকলন করেছেন কালানুক্রমিক রীতিতে; নচিকেতা ভরদ্বাজ বিশ শতকের পত্র-পত্রিকা সংকলন করেছেন বর্ণানুক্রমিকভাবে। দুটি তালিকা দুই পদ্ধতিতে কেন? আমাদের মনে হয় এই শ্রেণীর তালিকা কালানুসারে বিন্যস্ত হলেই ভাল।

'বাংলা কবিতা প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে সম্পাদক চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। গ্রন্থের প্রায় সর্বত্র সম্পাদকের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু ছাপাই সুন্দর নয়, ছাপার ভুলও প্রায় নেই বললেই চলে। এমন একটি মূল্যবান সংগ্রহ উপহার দিয়ে সম্পাদক সুশীল রায় কাব্য-অনুরাগী বাঙালী পাঠকমাত্রেরই সাধুবাদ অর্জন করলেন।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সঙ্গীত

গীতনির্ঝর। সুনীল দত্ত। ফ্ল্যাট ২৪৭ ব্লক ২৩। লেকভিউ রোড, কলকাতা-২৯। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

'সন্ধ্যা সমাগতা ঈশ্বরং ভজ। নর্ত্তসি দীপাবলী প্রজ্জ্বলিতং শান্তিপ্রদীপম্। আত্মানং সমর্পয়।' —প্রভু যিশু খৃস্টকে স্মরণ করে প্রার্থনা সঙ্গীত রচনা করেছেন শ্রীসুনীল দত্ত। খৃস্টসঙ্গীত আমাদের সঙ্গীতে একটি স্থান করে নিয়েছে। এই গানের সংকলনটি দেখে মনে হল এই পরিবারের সঙ্গীত ক্রমেই কত সুন্দর কাব্যে, সুরে মহিমান্বিত হয়ে উঠছে। বাঙালী খৃস্টান সম্প্রদায় মনে প্রাণেই বাঙালী, তার পরিচয় এই সঙ্গীত সৃষ্টিতে। এই ক্ষুদ্র স্বরলিপি গ্রন্থে ষোলটি খৃস্ট ভজন সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি গান সুসাহিত্যে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং সুরস্রষ্টা সুরে প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। শ্রীসুনীল দত্ত সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে এরই মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর এই সংকলনটি ক্ষুদ্র হলেও যথার্থ সাঙ্গীতিক সুষমায় রসসমৃদ্ধ। স্বরলিপিগুলি প্রস্তুত করেছেন গীতা [illegible]।

উত্তর বাংলার পল্লীগীতি (চটকা খণ্ড)। হরিশ্চন্দ্র পাল সম্পাদিত। সান্যাল অ্যান্ড কোম্পানী, ১-১এ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২। সাতাশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

উত্তর বাংলার পল্লীগীতিতে, বিশেষত দোতারা গানের মধ্যে দুটি রূপ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে, তার মধ্যে একটি ভাওয়াইয়া অপরটি চটকা। এই গ্রন্থে কেবলমাত্র চটকা গানই সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থকার বলছেন, শ্রেণী বিভাগে চটকা আদি রসাত্মক প্রেমগীতি, সমাজনীতির প্রতি কটাক্ষে যতই শ্লেষাত্মক, লোককথা বা রসকথার মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গাত্মক নিঃসন্দেহে। হাস্যরস, শান্তরস ছাড়াও করুণ রসে অভিষিক্ত এই গান সাধারণত দাদরা ও

ছন্দের তালে গাওয়া হয়। গ্রন্থকার কুচবিহারের অধিবাসী। তিনি নানা সূত্রে গানগুলি সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে সংযোজিত করেছেন। গানগুলির সবই ইতিপূর্বে রেকর্ড হয়েছে। তিরাশিটি সুনির্বাচিত গান রেকর্ড থেকে স্বরলিপি করে দিয়েছেন শ্রীবংশীধর রায়। প্রত্যেকটি স্বরলিপির সঙ্গে সংগ্রহের সূত্র, শিল্পী এবং আবশ্যকীয় তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া, বহু শব্দের অর্থও প্রদান করা হয়েছে। যাঁরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন এই গ্রন্থ থেকে তাঁরা উত্তরবঙ্গের বহু শব্দের পরিচয় গ্রহণ করতে পারবেন। বহু শিল্পীর ছবি এবং জীবনী সংযোগ করে গ্রন্থকার অনেক চিত্তাকর্ষক উপাদান পাঠকদের গোচর করেছেন। সচরাচর যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এটি তার ব্যতিক্রম। এতে লোকসংগীতের একটি দিককে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থের কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই পরিচ্ছন্ন ও মনোরম। লোকসংগীতের এই উৎকৃষ্ট সংকলনটি বিশেষভাবে সমাদরলাভের যোগ্য।

লোকগীতিমঞ্জরী—বুদ্ধদেব রায়। লোক সংস্কৃতি পরিষদ। ১০৭।৪ উল্টোডাঙ্গা মেইন রোড, এল আই জি ৯।৩০, কলকাতা ৬৭। ছয় টাকা।

গ্রন্থকার শ্রীবুদ্ধদেব রায় লোকসংগীত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক গান টেপ করে রেখেছেন। এই সংগ্রহের কাজে তিনি বহু দিন ধরে লিপ্ত আছেন। বর্তমান সংকলনে তিনি বাইশটি গানের স্বরলিপি প্রদান করেছেন। এই সংগ্রহের মধ্যে আছে দেহতত্ত্ব, মুর্শিদা, গম্ভীরা, নীল গাজন জারী, ভাওয়াইয়া, ব্রত, ভাদু, টুসু, সারি ভাটিয়ালী, বাউল প্রভৃতি নানা বিষয়ের গান। গ্রন্থারম্ভে তিনি এই সব গানের পরিচিতি প্রদান করেছেন। গ্রন্থকার নিজে একজন সুপরিচিত নিষ্ঠাবান গায়ক। বইটি ক্ষুদ্র হলেও মূল্যবান এবং শিক্ষার্থীরা সহজেই স্বরলিপিগুলি অনুসরণ করতে পারবেন।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

সমাজতত্ত্ব

স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা। গোপীনাথ সেন। আদিবাসী কল্যাণ সমিতি। ৩৩বি, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা ১। সাত টাকা।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে আদিবাসীদের উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকলে পঞ্চাশ দশকে উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং ষাটের দশকে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসীদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দেখা যায়। এই বিক্ষোভের একটা কারণ নতুন শিক্ষিত আদিবাসীরা দেখতে পেল তথাকথিত ভারতীয় সংস্কৃতিতে আদিবাসীদের অবদান স্বীকৃত নয়, এমন কি বিভিন্ন সময়ে আদিবাসীরা বিভিন্ন এলাকায় যেসব বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তা স্থান পায় নি। শ্রীগোপীনাথ সেনের বইটি এই দিক থেকে মূল্যবান। তাঁর বইতে সাঁওতাল বিদ্রোহ, চুয়ার বিদ্রোহ, মুণ্ডা বিদ্রোহ, বিরসা বিদ্রোহ কোল বিদ্রোহ, ভীল বিদ্রোহ, বাস্তার বিদ্রোহ, ওয়ারলি বিদ্রোহ, ওড়িশা ও দাক্ষিণাত্যে আদিবাসী বিদ্রোহ, স্যাওড়া বিদ্রোহ ছাড়া ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের মধ্যে টানা ভগত আন্দোলনও স্থান পেয়েছে। এইসব বিদ্রোহ অবশ্য স্থানীয় এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং এইসব বিদ্রোহের মাধ্যমে বিদেশী শাসক বা দেশী শোষক শ্রেণীর অবসান সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও এইসব বিদ্রোহ যে ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্তর্গত, সে কথা মনে রেখে শ্রীগোপীনাথ সেনের এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

নিরঞ্জন হালদার

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শুধু ধাঁধা নিয়ে একটি মাসিক পত্রিকা আকারে যত ছোটই হোক—চার-পাঁচ বছর ধরে দিব্য টিঁকে আছে। ধাঁধা-চর্চা যে আসলে বুদ্ধিচর্চা এবং বুদ্ধির ব্যায়ামে উৎসাহীর সংখ্যা খুব ভীতিপ্রদ-রকমের কম নয়—এ তারই প্রমাণ। 'ধাঁধা' পত্রিকার প্রথম বছরের বারো সংখ্যার কিছু বাছাই ধাঁধা নিয়ে বেরিয়েছে বিশ্বনাথ বসু সম্পাদিত **ধাঁধার বই** (পরিবেশক : আশা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, পাঁচ টাকা)।

ধাঁধার বই, কিন্তু সমস্ত লেখাই ধাঁধা নয়। যেমন, 'বুদ্ধির ধাঁধা' পর্বের প্রথম খেলাটি এটিকে খেলার পর্যায়ে স্থান দেওয়াই বোধ করি সঙ্গত হত। ৪৪নং টোপোলজির খেলাটি ম্যাজিকের জগতে 'আফগান ব্যান্ডক' নামে সুপরিচিত একটি প্রাচীন চমক। 'তাসের দেশ'ও মুখ্যত জাদুধর্মী। 'ঘনরাম দাসের দিনপঞ্জি থেকে' কিংবা 'প্রচ্ছন্ন পাটিগণিত' 'অংক-র ধাঁধা' পর্যায়ে না থেকে বুদ্ধির ধাঁধা পর্যায়ে কেন এল—তাও ভাবলে ধাঁধারই মতন রহস্যময়। আসলে পর্ব-বিভাগ কিছুটা অস্থির।

তবু বইটি সব-মিলিয়ে চমৎকার। বেশীর ভাগ বুদ্ধির ধাঁধা, বেশ কিছু অঙ্কের ধাঁধা, কয়েকটি খেলা এবং কিছু-কিছু ধাঁধালি অতি উপভোগ্য। বিশ্বনাথ বসুর বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করে বলি—"এ বইয়ের কিছু ধাঁধা হয়তো সব লোক জানে, সব ধাঁধাই হয়তো কিছু লোক জানে, কিন্তু সব ধাঁধাই সব লোকের জানা নয়।"

*

অরুণকুমার দত্ত-র গল্প বলে যাই (আলফা-বিটা, কলকাতা ৭৩, সাত টাকা) গ্রন্থে মোট সতেরটি গল্প। দু-একটি ব্যতিক্রম মনে রেখে বলা যায়, প্রত্যেকটি গল্প একটি মূল সূত্রে গাঁথা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নায়ক প্রেমে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতাই মূল সূত্র। তবে শেষ কথা নয়। পরবর্তীকালে দেখা হয়েছে, জীবন থেমে থাকে নি। গল্প যেখানে মিলনান্তক—যেমন, আবর্ত — সেখানে উচ্ছ্বাস তুলনামূলকভাবে প্রবলতার।

এর বাইরে যে দু-একটি গল্প, তার মধ্যে বরং চরিত্র চিত্রণ ও বর্ণনার গুণে 'মাতিয়া' নামের গল্পটি মনে দাগ কাটে।

*

প্রজ্বলিত অগ্নি (আলফা-বিটা, কলকাতা ৭৩, পাঁচ টাকা) ভক্তিরসে আপ্লুত কিছু গীতিধর্মী কবিতার সংকলন। লিখেছেন অঞ্জনকুমার রায়। স্বল্প দু-একটি কথায় অঞ্জনবাবু এই গ্রন্থ-রচনায় উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। তাঁর গুরুদেবের নির্দেশে এই কবিতাগুলির সৃষ্টি এবং গ্রন্থকারে প্রকাশ।

'আরো আঘাত, দাও মোরে আরো', 'অসীম তোমায় সীমার মাঝে নাই যে হেরি শেষ', 'কি খেলা খেললে ওগো আমায় নিয়ে' কিংবা 'যে ফুল ফুটিতে ওগো শ্রবণীতে পড়ে ঝরে'—ধ্বনের পংক্তিতে এই নতুন গীতাঞ্জলি প্রতিধ্বনিত।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পত্রিকা

মাসিক আয়ন। শিবেন্দ্রলাল মাইতি। সম্পাদক। ৯ আর এন টি পি রোড। শ্যামনগর। ২৪ পরগণা।

অমিতাভ চৌধুরীর ছড়া। কেশবচন্দ্রের সম্পর্কে বিশু মুখোপাধ্যায়ের রচনা। এর সঙ্গে কিছু গল্প এবং প্রবন্ধ এবং কবিতা। প্রথম সংখ্যা হিসাবে প্রশংসার্হ।

শারদীয়া দূর্বা (১৩৮৩)। সম্পাদিকা : নীলা কর।

হাতে নিলেই মন খুশি। পড়তে ইচ্ছে করে এমন কাগজ। গল্প কবিতা প্রবন্ধে ঠাসা। লেখকরা আশাপূর্ণা দেবী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মৈত্রেয়ী দেবী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, তৃপ্তি মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী প্রভৃতি। সাহিত্য-পাঠকের কাছে সংখ্যাটি সমাদৃত হবে বলেই বিশ্বাস।

মাতাল করা টেস্ট ঘুমপাড়ানি ক্রিকেট

ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে কলম নিয়ে বসেছি। খেলার দুদিন বাকি। ইতিমধ্যে ফলটা পুরো না জানলেও আংশিক জেনে ফেলেছি। এবং মহা অনিশ্চয়তা ক্রিকেটের বৈশিষ্ট্য একথা মনে রেখেই বলছি; ভারতের জয়ের কোনো আশা নেই। পরাজয় সম্ভাবনা ষোলো আনা। তবে পরাজয় বাঁচালেও বাঁচাতে পারে, যদি অসাধারণ ধৈর্য ও স্থৈর্য নিয়ে চোয়াল শক্ত ব্যাটিংয়ে দীর্ঘ সময় কাটাতে সক্ষম হয়। ফল এবং খেলার কথা আগামী সংখ্যার জন্য মুলতুবী রেখে আজ একথাই ভাবছি এই টেস্ট খেলা দেখে আমরা কতখানি আনন্দ পেলাম।

যে টেস্ট মানুষকে মাতাল করে তুলেছিল—যে টেস্ট দেখার জন্য একখানি টিকিটের আশায় মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরেছে—যে টেস্টের জন্য নতুন করে কালোবাজারের সৃষ্টি হয়েছে—যার জন্য এত শ্রম, এত অর্থ ব্যয়, এত সময় নষ্ট—সে টেস্ট কি আমাদের আনন্দ দিতে পেরেছে? মেলার আনন্দের কথা বলছি না। খেলার আনন্দের কথাই বলছি। স্মরণকালের মধ্যে এমন নেতিমূলক ক্রিকেট বোধহয় ইডেনে আর হয়নি।

বিপদে পড়লে মানুষ অবশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। খেলোয়াড়রাও কোণঠাসা হয়ে পরাজয়ের মুখে পড়লে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের ইনিংস অল্প রানে শেষ করার পর ইংল্যান্ড দলের তো আত্মরক্ষার প্রশ্ন ছিল না। বরং দাপটে খেলারই কথা ছিল। সাগরপারের শীতের অতিথিদের প্রতিশ্রুতিও ছিল তারা প্রাণবন্ত এবং উপভোগ্য ক্রিকেট খেলবে। এই কি প্রাণবন্ত ক্রিকেটের নমুনা? কত রান হয়েছে তিন দিনের খেলায়? মাত্র ৪৪০। অথচ মেলবোর্নে ওই তিন দিনে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টে সংগৃহীত হয়েছে ৯৭২ রান। দ্বিগুণের চেয়েও বেশী।

একই দিনে অর্থাৎ ইংরেজি নববর্ষের প্রথমদিনে দুটি টেস্টই শুরু হয়। মেলবোর্নে প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়া করে ৪ উইকেটে ৩২২ রান, কলকাতায় ভারত করে ৭ উইকেটে ১৪৬ রান। দ্বিতীয়দিন মেলবোর্নে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার মিলিত রানের সংখ্যা ৩৮১, কলকাতায় ভারত ও ইংল্যান্ডের মিলিত রান সংখ্যা ১৪৫। তৃতীয় দিন মেলবোর্নে সংগৃহীত হয় ৩২৯ রান, কলকাতায় ইংল্যান্ড সংগ্রহ করে মাত্র ১৪৯ রান।

মনে রাখতে হবে ভারতের প্রথম ইনিংসের ১৫৫ রান পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর ৬টি উইকেট অটুট থাকা সত্ত্বেও ইংল্যান্ড দলের রান করার এই হাল। এই কী ক্রিকেট খেলা—দর্শকদের আনন্দ দেওয়া এবং নিজেদের আনন্দ পাওয়া যে খেলার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সত্যিই ক্রিকেট চোখজুড়োনো আনন্দদায়ক খেলা, যার বিভিন্ন মারের মধ্যে বিজ্ঞানের দুরূহ নিয়মের মূর্ত প্রকাশ, যার মধ্যে ফুটে ওঠে লাবণ্য ও সৌন্দর্য। বলা হয়ে থাকে বলকে প্রহার করার জন্যই ব্যাটসম্যানের হাতের ব্যাট। বলা হয়—ব্যাট-বলের মধুস্পর্শে শিল্পের শিহরণ। প্রথম দিনের কথাই বলছি। তেমন কটা মার দেখেছি আমরা ইডেনে? বোধহয় আঙুলে গোনা চার-

[illegible] ব্যাটসম্যানের একটি আসছে টনি গ্রেগের ব্যাট থেকে —চিত্র বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

পাঁচটির বেশী নয়। তার জন্য মাঠে কাটাতে হয়েছে পুরো তিন দিন। একে টেস্ট খেলা না বলে ঘুমপাড়ানি ক্রিকেট বললেই বোধহয় সংগত হয়। খেলায় না ছিল উন্মাদনা, না উত্তেজনা, না নাটকীয়তা।

তবে নাটক কিছু দেখেছি বইকি। দর্শকদের হাততালির তালে তালে ইংল্যান্ড অধিনায়ককে মাঠের মধ্যে নাচতে দেখেছি। ক্র্যাকার ফাটানোর শব্দ শুনে তাকে আহত হবার বা মরে যাবার ভান করে ক্রিজের উপর পড়ে যেতে দেখেছি. বিনা প্রয়োজনে ভাঁড়ামি করতে দেখেছি, আর দেখেছি দেশ থেকে আনা মিনি ব্যাটে অটোগ্রাফ করে ক্রিকেট মেলায় ঘুরে ঘুরে ইংল্যান্ড খেলোয়াড়দের সেই ব্যাট হকারি করতে। বিক্রি বা নীলাম করতে। ক্রিকেটের চরিত্রের যেমন বদল দেখলাম, তেমন দেখলাম ক্রিকেটারদের চরিত্র। গেস্ট কার্ড বিক্রির অভিযোগও আছে। ভারতের যেখানে যাচ্ছে সেখানে আছে পয়সা রোজগারের ফিকির। এতদিনে বোঝা গেল ভারতই ব্যবসায়ের উপযুক্ত স্থান যে ভারতে বণিকের মানদণ্ড একদিন রাজদণ্ড-রূপে দেখা গিয়েছিল।

খেলার মধ্যে হাল্কা ধরনের রসিকতা অবশ্যই উপভোগ্য হয়। বিশেষ করে যে খেলায় দর্শকদের পাঁচ-ছয় ঘণ্টা আটক থাকতে হয়। কিন্তু তার মাত্রাধিক্য হলে সেটা পরিণত হয় ভাঁড়ামিতে। বিখ্যাত ক্রিকেট লেখক বেরী সর্বাধিকারী আজ স্বর্গে। 'দেশ বিনোদনে' তার শেষ লেখায় মন্তব্য করেছেনঃ ক্রিকেটের আর সে ঐতিহ্য নেই। ক্রিকেট খেলা আজ পয়সার খেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ক্রিকেট দর্শন কথাটি আছে কেতাবের পাতায় না হলে টোনি গ্রেগের মত একটি "ভাঁড়" আজ ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন!

ক্রিকেট ছাড়া এখন অন্য খেলাও অবশ্য পয়সার খেলায় পরিণত হয়েছে। ফুটবল টেনিস কি কম পয়সার খেলা? কিন্তু ক্রিকেট শুধু পয়সার খেলা নয়, ব্যবসায়ের খেলায় পরিণত হয়েছে, একদিন যে 'ক্রিকেট' কথাটি ছিল ন্যায় নীতি ও শালীনতার প্রতীক নাম। দুঃখের কথা তারাই ক্রিকেটের জাত মারছে যারা একদিন ক্রিকেট সৃষ্টি করেছে এবং যেখানেই গেছে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ব্যাট বল, সেখানেই পুঁতেছে ক্রিকেট স্ট্যাম্প।

আজ ক্রিকেটের হাল দেখে আমাদের দেশের কিছু কিছু চিন্তাশীলের মনে প্রশ্ন জেগেছে—যে খেলায় এত বিলাসিতা এবং এত সময় নষ্ট সে খেলা চালু রাখা উচিত কিনা। স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি যতই থাক তবু ক্রিকেটকে প্রবহমান রাখার পক্ষে রায় দেওয়া যায়, যদি খেলাটা বিরক্তিকর এবং ঘুমপাড়ানি খেলা না হয়ে প্রকৃত আনন্দদায়ক খেলা হয়ে ওঠে। যেমন খেলছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া।

ক্রিকেট উঠবে না জানি। তবু বাংলার দুই তরুণ মন্ত্রী সুব্রত মুখারজি ও প্রদীপ ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ বিরক্তিকর ব্যবসায়িক খেলার কুফলের চিন্তা তাদের মাথায় এসেছে বলে।

মনজিত দুয়ার তিন খেতাব

এলাহাবাদে জাতীয় টেবল টেনিসের ৩৮তম অনুষ্ঠানে তিনটি খেতাব পেয়েছে প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন রেলওয়েজের মনজিৎ দুয়া। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে সে হারিয়েছে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন কর্নাটকের কাবার্ড জয়ন্তকে, নীরজ বাজাজকে জুড়ি নিয়ে ডাবলস ফাইনালে পেয়েছেন ওয়াক ওভার। কেননা, প্রতিপক্ষ জুড়ি রেলওয়েজের ভি ভিবু ও বিলাস মেনন খেলেনি, মেনন হঠাৎ বুকের ব্যথা অনুভব করায়। মনজিতের তৃতীয় খেতাব মিক্সড ডাবলস ফাইনালে, রেলওয়েজেরই নন্দিনী কুলকার্নীর সঙ্গে। ফাইনালে হারায় সি রমেশ এবং লক্ষ্মীকে। স্ট্রেট গেমেই।

মেয়েদের চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কারও গিয়েছে রেলওয়েজের ভাণ্ডারে। স্ট্রেট গেমেই শৈলজা সালোখের বিজয়িনীর সম্মান ফাইনালে কর্নাটকের উষা সুন্দর-রাজের বিরুদ্ধে। কিশোরদের সিঙ্গলস জিতেছে দিল্লির মানজিৎ সিং। কিশোরীদের সিঙ্গলস দিল্লির গীতা আডানি। এবারকার জাতীয় আসরে বাংলার খেলোয়াড়দের ব্যর্থতার পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। শুধু কিশোর বিভাগে রানারস হয়েছে সোমেন গাঙ্গুলী।

সামগ্রিক প্রতিযোগিতার মানও উঁচুতে ছিল না। বেশী খেলাই স্ট্রেট গেমে মীমাংসা হয়। তবে অপ্রত্যাশিত ফল ছিল। যেমন পুরুষ, মেয়ে দুই বিভাগেই শীর্ষ বাছাই নীরজ বাজাজ এবং ইন্দু পুরী ফাইনালে উঠতে পারেনি।

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট

পাকিস্তানে নতুন নতুন প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের আবির্ভাব দেখে আর গত বছর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এবং এ বছর নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলার পরি-প্রেক্ষিতে আগেই আশা করা গিয়েছিল পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সংগ্রাম হবে খুবই আকর্ষণীয়। হয়েছেও। তিনটি টেস্টের মধ্যে অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্ট অমীমাংসিত থেকে গেছে। মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্ট এই লেখার সময় পর্যন্ত আকর্ষণীয় পর্যায়। অস্ট্রেলিয়ার বড় ইনিংসের জবাব দিচ্ছে পাকিস্তান যোগ্য-তার সঙ্গে।

যেভাবে পাকিস্তান অ্যাডিলেড টেস্ট ড্র করেছে তাতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য ফুটে ওঠেনি যদিও জয়ের মুখে এসে পৌঁছে-ছিল। এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে স্বীকৃত অস্ট্রেলিয়া যদি ৩২০ মিনিট সময় পেয়েও জয়ের প্রয়োজনীয় ২৮৫ রান সংগ্রহ করতে না পারে তবে কৃতিত্ব তাদের প্রতিপক্ষেরই প্রাপ্য।

মাঝারি গোছের ২৭২ রানে পাকি-স্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেলেও অস্ট্রেলিয়ার ৪৫৪ রানের উত্তর দিয়েছে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৬৬ রান করে। শেষে অস্ট্রেলিয়াকে আটকে রেখেছে জয়ের প্রয়োজনীয় রান করা থেকে। রানের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়। আর ২৪ রান করলেই অস্ট্রেলিয়া জিততে পারত। কিন্তু ওই ২৪ রান করতে না দেওয়াই তো সংগ্রামী শক্তির পরিচয়। অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান ডেভিস ও ডাগ ওরাল্টার্সের দুটি সেঞ্চুরির জবাব দিয়েছেন পাকিস্তানের জাহির আব্বাস এবং আসিফ ইকবাল। সাঁত্য কথা, এখন পৃথিবীর পয়লা নম্বর পেস বোলার জেফ টমসন পাকি-স্তানের প্রথম ইনিংসে আহত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার পেস আক্রমণের শক্তি কমে গেছে। কিন্তু আর তিনজন পেস বোলার লিলি ওয়াকার এবং গিলমারও তো কম খ্যাতিমান বোলার নয়। তাছাড়া টমসন যেমন প্রথম টেস্টে ৮ ওভারের বেশী বল করতে পারে নি, তেমন পাকিস্তানের নির্ভরযোগ্য ওপেনার সাদিক মহম্মদের পায়ে চোট থাকায় প্রথম টেস্ট খেলতেই পারে নি।

টমসনের আঘাত লাগা অবশ্য ভয়েরই কথা। জাহির আব্বাসের ব্যাট থেকে ওঠা ক্যাচ ধরতে গিয়ে নিজ দলের অ্যালান টার্নারের সঙ্গে সংঘর্ষে টমসনের কাঁধে ভীষণ আঘাত লাগে। পরে পরীক্ষা করে দেখা যায় কাঁধের অস্থি স্থানচ্যুত হয়েছে এবং লিগামেন্টও ছিঁড়ে গেছে। ওইদিনই অস্ত্রোপচার করে স্থানচ্যুত অস্থি স্ক্রু লাগিয়ে কলার বোনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কতদিনে টমসন সেরে উঠবেন আন্দাজ করা শক্ত। আশঙ্কা করার কারণ আছে টমসন আর আগের মত বল করতে পারবেন কিনা। কারণ ফাস্ট বোলারের কাঁধের চোট বড় সাংঘাতিক ব্যাপার। যদি আর আগের মত বল করতে না পারেন বিশ্ব বিখ্যাত এক ফাস্ট বোলারের ক্রিকেট জীবনে অসময়ে ইতি পড়বে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বার্থে সেটা কারোই অভিপ্রেত নয়।

প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ২৭২ (জাহির আব্বাস ৮৫, ইমরান খাঁ ৪৮, সরফরাজ ২৯, ও'কিফি ৩-৫৩, টমসন ২-৩৪, গ্রেগ চ্যাপেল ২-১৪)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ৪৫৪ (ইয়ান ডেভিস ১০৫, ডাগ ওয়াল্টার্স ১০৭, ম্যাককসকর ৬৫, গ্রেগ চ্যাপেল ৫২, মার্স ৩৬, টার্নার ৩৩, কোসিয়ার ৩৩; মুস্তাক মহম্মদ ৪-৫৮, জাভেদ মিঁয়াদাদ ৩-৩৮)

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস ৪৬৬ (আসিফ ইকবাল নট আউট ১৫২, জাহির আব্বাস ১০১, জাভেদ মিঁয়াদাদ ৫৪, মজিদ খাঁ ৪৭, মুস্তাক মহম্মদ ৩৭; লিলি ৫-১৬৩, ওকিফি ৩-১৬৬, গিলমোর ১-৬৭)

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস (৬ উইঃ) ২৬১ গ্রেগ চ্যাপেল ৭০, ডাগ ওয়াল্টার্স ৫১, টার্নার ৪৮, ম্যাককসকর ৪২; ইকবাল কাশিম ৪-৮৪)

(খেলা অমীমাংসিত)

একলব্য

শীতের ক্রিকেট অতিথি (১২)

বব উইলিস

গত জুলাই মাসে হোম সিরিজে ইংলন্ড যে টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করার সম্ভাবনা জাগিয়েও হেরে গিয়েছিল সে টেস্টে ফাস্ট বোলার বব উইলিসের ছিল বড় ভূমিকা। আমি লীডসের চতুর্থ টেস্টের কথাই বলছি। উইলিস প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন ৭১ রানে ৩ উইকেট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২ রানে ৫টি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'রান-যন্ত্র' ভিভ রিচার্ডসকে দুই ইনিংসেই ওর বলে উইকেট খোয়াতে হয়েছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয় দফায় মাত্র ৬ রানে রিচার্ডসের স্টাম্প ছিটকে যাওয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছিল মাত্র ১৯৬তে।

বিগত সিরিজে শেষ দুটি টেস্ট ছাড়া প্রথম তিনটি টেস্টে উইলিসকে খেলানো হয়নি। ভারতে আসার আগে পর্যন্ত ১৮টি টেস্টে পেয়েছিলেন ৫৬টি উইকেট, করে-

ছিলেন ১৮৩ রান। দিল্লি টেস্টের পর একটি রান ও একটি উইকেট যোগ হয়েছে। কাউন্টি ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠ অ্যাভারেজ ১৯৭২এ ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক সহ ৪৪ রানে ৮ উইকেট।

কাউন্টি ক্যাপ পাবার আগে যারা টেস্ট খেলেছেন সেই বিরল কতিপয়ের মধ্যে বব উইলিস অন্যতম। ১৯৬৯ থেকে ৭১ পর্যন্ত খেলেছেন সারে কাউন্টিতে। কিন্তু সেখানে ক্যাপ পাননি। ক্যাপ পান ৭২এ ওয়ারউইকশায়ার কাউন্টিতে এসে। তার আগেই মাথায় ওঠে টেস্ট ক্যাপ, ১৯৭০-৭১এ অ্যালান ওয়ার্ড আহত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে।

এবছর কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে অনেক ম্যাচই খেলতে পারেননি পায়ে চোট থাকায়। ২৩·৬৫ গড়ে উইকেটের সংখ্যা ৩২।

পুরো নাম রবার্ট জর্জ ডাইলান উইলিস। জন্ম ১৯৪৯ সালের ৩০ মে সান্ডারল্যান্ডে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দীর্ঘদেহী ফাস্ট বোলার। উচ্চতায় অধিনায়ক গ্রেগের পরেই ওর স্থান। ৬ ফুট ৪½ ইঞ্চি মাথায় উঁচু।

সম্ভবত এই দৈহিক গঠনের ফলেই উইলিসকে শীত-গ্রীষ্ম সারা বছর মাঠে কাটাতে হয়েছে। শীতে খেলেছেন ফুটবল, গ্রীষ্মে ক্রিকেট। কোন্ খেলাকে বেশী করে আঁকড়ে ধরবেন তা নিয়ে দ্বিধায়ও পড়েছেন। ফুটবল খেলেন গিলফোর্ড সিটি ক্লাবে। এবং বোধহয় মাথায় অত উঁচু বলেই গোলকিপার হিসাবে। তবে যে খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেটের স্বাদ পায় সে কি ফুটবলের মধ্যে তেমনভাবে মন বসাতে পারে। সুবিখ্যাত ডেনিস কম্পটনকেও তো ফুটবল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আমাদের পংকজ রায়কেও।

এখন ইংলন্ডে ফাস্ট বোলার হিসাবে যারা চিহ্নিত বব উইলিস তাদেরই একজন। আগে অনেকখানি দৌড়ে এসে বল করতেন। এখন রান আপ অনেক ছোট করেছেন। কিন্তু তাতে বলের গতি বা কার্যকারিতা কমেনি। কিন্তু সুইং কম, ইন সুইং আউট সুইং কোনটাই ব্যাটসম্যানের পক্ষে খুব মারাত্মক নয়। তবে যেদিন হাত খোলে সেদিন ব্যাটসম্যানের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়ান। অসহায়ক উইকেট থেকেও বল লিফট করাতে পারেন। ফিল্ডার হিসাবে খ্যাতি আছে। ব্যাটের হাত উল্লেখ করার মত নয়।

গ্রাহাম বার্লো

ইডেনে নেট প্র্যাক্টিসের ফাঁকে ক্রিকেট জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় ঘটনার উল্লেখ করতেই গ্রাহাম বার্লো বললেন, "হ্যাঁ জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে অনেক বড় খেলোয়াড়ও শূন্য করেছে, আবার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ভাল রানও করেছে। আমি সে সুযোগ পেলাম না। শূন্যটাই কলঙ্ক-চিহ্নের মত চিরদিন নামের পাশে লেখা থাকবে।"

এরপর একটু থেমে এবং মুখে হাসি নিয়ে বললেন, "কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে ভাগ্যবান বলবে। দিল্লি টেস্টে আমাদের দল তো জিতেছে এবং ইনিংসেই জিতেছে। বললাম, নিশ্চয়ই। তার আগেও তো তুমি পর পর দুটি সেঞ্চুরি করেছ মধ্যাঞ্চল ও বোর্ড সভাপতির দলের বিরুদ্ধে। জয়পুরে ১১৩ এবং ১০২ রান করার পর দিল্লির প্রথম টেস্টে এবং নিজের জীবনের প্রথম টেস্টে শূন্য করার কথা বার্লোকে মনে করিয়ে তার ব্যথার যায়গায় ঘা দিয়েছি বলে যখন একটা অপরাধবোধের মানসিকতায় ভুগছি তখন বোধ হয় অবস্থাটা বুঝতে পেরে ২৬ বছর বয়সী বার্লো নিজেই বললেন, দিস ইজ ক্রিকেট, দুঃখ করার কিছু নেই।

শুভ সূচনার পর অমর্যাদার হাততালি বোধ হয় বার্লোর জীবনের বিশেষত্ব। স্বদেশে এই মরসুমেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের আন্তর্জাতিক খেলায় প্রথম ম্যাচে করেছেন নট আউট ৮০, পরের দুটি ম্যাচেই গোল্লা। কাউন্টি ক্রিকেটের শুরুতেও চমক জাগানোর পর কয়েকটি ম্যাচে ব্যর্থতা। তবু বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান গ্রাহাম ডেরেক বার্লো মিডলসেক্স কাউন্টির নির্ভরযোগ্য

খেলোয়াড়। এ মরসুমে মিডলসেক্সের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের মূলেও অনেক অবদান। ৪৫·২৬ গড়ে রান করেছেন ১৪৭৮। দুটি সেঞ্চুরির মধ্যে ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে নট আউট ১৬০ রানের ইনিংসটি নাকি মনে রাখার মত।

ইনিংসের সূচনাকারী হিসাবে যেমন, আবার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসাবেও তেমন নির্ভরযোগ্য। বল করেন মিডিয়াম পেসে এবং ডান হাতে। চমৎকার কভার ফিল্ড।

জন্ম ফোকস্টোনে ১৯৫০ সালের ২৬ মার্চ তারিখে। স্কুল জীবন থেকেই ক্রিকেট শুরু। মিডলসেক্স কাউন্টিতে আসার পর তিন বছর ক্রিকেটে ছেদ পড়ে লোবরো কলেজে পড়ার চাপে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ওই তিন বছর নিয়মিত খেলতে পারলে অনেক আগেই বার্লো টেস্ট খেলার সুযোগ পেতেন।

মুকুল

মহুয়া রায়চৌধুরী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়/ শেষরক্ষা/পরিচালনা ঃ শংকর ভট্টাচার্য

রঙ্গজগৎ

থিয়েটার ১৯৭৬

আপনি যখন অফিস থেকে ফিরে গৃহস্থ হন, অথবা বন্ধুর সংগে বাজারদর নিয়ে আলোচনা করেন, হয়ত মন্দিরে গিয়ে শান্তি খোঁজেন, ঠিক তখনই এক বিরাট কারখানা চালু হয়। এখানকার শ্রমিক আপনারই মত বেতনভুক কর্মচারী, কিংবা ছাত্র অথবা নিতান্তই বেকার, সারাদিন বাড়ির তাচ্ছিল্য এড়িয়ে সন্ধ্যেবেলায় নিজেকে খুঁজে পায়। এই কারখানার আয়তন দশ ফুট বাই পাঁচ ফুট থেকে মাঝে মাঝে টেস্ট ক্রিকেটের টিকিট

নাটক

পাওয়ার মত সৌভাগ্যে ত্রিশ ফুট বাই কুড়ি ফুট জায়গা পেলে, শ্রমিকরা বোনাস চায় না—হয়ত উল্লাসে দু ভাঁড় চা বেশি খেয়ে অমিতব্যয়ী হয়। অনেক কষ্টে, বহু বেদনায়, বিপুল হতাশায় এরাই কলকাতাকে তিনশ পয়ষট্টি দিন কর্মব্যস্ত রাখে। এই কারখানার আর্থিক লাভ প্রায়শই শূন্য, অথচ সবসময়েই এরা কর্জ করে চলেন। মাথা যে শুধু চুল রাখবার জন্য নয়, একথা প্রমাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থিয়েটারের শ্রমিক। এই কলকাতা অনিবার্য-[illegible] থিয়েটারের।

সারা বছর ধরে কত থিয়েটার হয়, কত রিহার্সাল চলছে তার হিসেব রাখতে গণেশের মত লিপিকার দরকার। পশ্চিমবঙ্গে এখন কত থিয়েটার গ্রুপ সক্রিয়? সঠিক হিসেব পাওয়া খুব দুরূহ। খুব সামান্য একটা হিসেব দিচ্ছি। ১৯৬১ থেকে আইন হয়, রেজিস্ট্রিকৃত সোসাইটি রবীন্দ্রভারতীর অনুমোদনক্রমে প্রমোদকর মকুব পেতে পারেন। এরপর থেকে রবীন্দ্রভারতী অনুমোদন প্রাপ্ত থিয়েটার গ্রুপের সংখ্যা ১৯৬২—৫৮, ১৯৬৩—৬১, ১৯৬৪—৪৯, ১৯৬৫—৫০, ১৯৬৬—৪৯, ১৯৬৭—৫০ ১৯৬৮—৪৫, ১৯৬৯—৬৩, ১৯৭০—৬০ ১৯৭১—৫৩ ১৯৭২—১০৮, ১৯৭৩—১৩৫, ১৯৭৪—১৭৭, ১৯৭৫—১০৩, মোট ১০৬১। ১৯৭৫ সেপ্টেম্বর থেকে সব প্রমোদকর তুলে দেও[illegible] হয়। মনে রাখতে হবে রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা মাত্রেই এই প্র[illegible] কর মকুবের আওতায় নন, এবং আরও বহু সংস্থা আছে [illegible] রেজিস্টার্ড নন। বহু দল নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে, নতুন কাজ [illegible] সময় হয়েছে চতুর্গুণ, সুতরাং সঠিক হিসেব পাওয়া অ[illegible] সাপেক্ষ।

এই নাট্য প্রাচুর্যের জন্য কলকাতায় নিয়মিত [illegible] অভিনয়ের মঞ্চ আছে মাত্র ষোলটি। এই ষোলটির মধ্যে হাজা[illegible] আসন সংখ্যার হল যেমন আছে, একশ থেকে চারশ আসন স[illegible]খ্যার হলও তেমনি আছে। কিন্তু এই হলগুলি একান্তভাবেই থিয়েটারের। ১৯৭৫

সালের [illegible] মঞ্চ, অনুপকুমারের নেতৃত্বে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চ এবং নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট, যা রবি ঘোষের নেতৃত্বে চালু হয়েছিল, দুটিই বন্ধ আছে। মুসলিম ইনস্টিটিউট, গালিব মঞ্চ নামে কিছুদিন চালানোর চেষ্টা হয়েছিল, এবং অবনমহলে বহুবার নিয়মিত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, আবারও হচ্ছে। ১৯৭৬ সালে নতুন নিয়মিত মঞ্চ তিনটি যুক্ত হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় তপন থিয়েটার,

সুজাতা সদন ও উত্তর কলকাতায় সারকারিনা একটি নতুন রীতির মঞ্চ, এই টেকনিকে অভ্যস্থ হলে হয়ত অনেক ভিন্ন স্বাদী প্রযোজনা গড়ে উঠবে। এছাড়া অনিয়মিত অভিনয়ের সংখ্যা কম নয়। রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির, কলামন্দির (বেসমেন্ট,) অবনমহল, বিদ্যামন্দির, শ্রী শিক্ষায়তন, ত্যাগরাজ হল প্রভৃতি মঞ্চের হিসেব আমরা ধরিনি। রবীন্দ্রসদনের হিসেবটাই নেওয়া যাক, কারণ এই মঞ্চে অভিনয় করার জন্য সকলেই উদগ্রীব, এবং চাহিদাও সবচেয়ে বেশি। (ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) সকাল সন্ধ্যা মিলিয়ে বিভিন্ন গ্রুপের অথবা বিভিন্ন গ্রুপকে দিয়ে অভিনয় প্রযোজনার সংখ্যা—৩৯, অফিস ক্লাব—৩০ ভিন্ন ভাষায় নাট্য-প্রযোজনার সংখ্যা—১০। রবীন্দ্রসদন দুইটি নাট্যোৎসব করেছেন। শরৎচন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁদের ১৯৭৬ সালে বার দিনের একটি নাট্যোৎসব এবং অন্য একটি আট দিনের নাট্যোৎসব। এছাড়া রবীন্দ্রপক্ষ, শিশু উৎসব এবং প্রতিযোগিতার নাটকের সংখ্যাও কম নয়। সকলের অবগতির জন্য কোন মানসিকই পর্যাপ্ত নয়। ধরা যাক 'ক' দলের খুব ভাল পত্রিকায় সমালোচনা বেরোল, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা দিন পেলে বাজার গরম রাখা যেত। কিন্তু হাঃ হতোস্মি! যখন ডেট্ পাওয়া গেল তখন সমালোচনা বাসি হয়ে গেছে। হয়ত খবর পাওয়া গেল 'খ' দলের মহিলা শিল্পীর অসুস্থতা অথবা ধারকর্জের অসুবিধার (যা প্রতি শোএর আগে অনিবার্য প্রস্তুতি) জন্য একটি শো করায় অসুবিধা আছে, তখন 'ক' দল তাঁদের সংগে যোগাযোগ করে পরিত্যক্ত দিনটি পেয়ে মেয়ের বিয়ের একটা হিল্লে করলেন। যাঁরা ছাড়লেন তাঁদের অবস্থা অনেকটা বিয়ের আঙটি বাঁধা দেওয়ার মত, এইভাবেই একের সর্বনাশ অন্যের পৌষ পার্বণের ত্বরান্বিত ক'র। তবু এ'রা সতীর্থ, সহযোদ্ধা, সহযোগী।

গত কয়েক বছর ধরে বিদেশী নাটকের ভাষান্তর বা ভাবান্তরের একটা জোয়ার এসেছিল, সেই স্রোত অনেক স্তিমিত। ১৯৭৬ সালে প্রযোজিত বিদেশী নাটকের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার মধ্যে নাম করা যায়—পি এল টির ম্যাকবেথ (শেকসপীয়র) থিয়েটার ইউনিটের অতিথি (ডুরেন মার্ট) অংগীকার-এর নীল শুধু নীল (টেরেন্স র‍্যাটিগান) আই টি এ প্রযোজিত ৪ মে (ব্রেখট) অভিনেত্রী সংঘ অভিনীত বিশ জুন (রোজনবার্গ) মাস থিয়েটার্স-এর কালবৈশাখী (আর্থার মিলার) এবং সুজাতা সদনে ছায়ায় আলোয় (ওকেসী)। বাইরের থেকে জামশেদপুরের 'বর্তিক গোষ্ঠী করেছেন 'উইল শেকসপীয়ার' (ক্লিমেন্স ডেইন) ও বাংলাদেশ থেকে মহীদুল আলম করেছেন 'জুলেখা' (আলবী)। প্রদেশান্তরের নাটকের মধ্যে গিরিধারী পুণ্ডরীক অবলম্বনে নান্দীকার করেছেন 'চক্র' এবং অমৃত রায়ের মূল হিন্দী নাটক 'চিন্দোয়া কী এক ঝালর' করেছেন জোছন দস্তিদার প্রবর্তিত 'চার্বাক' সম্প্রদায়।

কয়েক বছর আগে পর্যন্ত গল্প বা উপন্যাসের নাট্যরূপে উপস্থিত হত এবং সেটা পেশাদারী মঞ্চের ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবেই ধরা হত। এখন বোধহয় সবাই বুঝেছেন দর্শকের কাছাকাছি থাকতে হলে একটা গল্প দরকার। এ বছর নাট্যরূপায়িত কাহিনীকারদের নাম করে সেই বৈচিত্র্য বোঝা যাবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেম চন্দ, সতীনাথ ভাদুড়ী, বনফুল, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল প্রভৃতি। যে যেভাবে ব্রহ্মদর্শন চেয়েছেন, তাই হয়েছে। কেউ কাহিনী

রসে মজাতে চেয়েছেন, কারও বা আসক্তি অপরাধজগতের বিভীষিকায়, কেউ বা রিপুতৃপ্ত দর্শক সমর্থনকেই মোক্ষ ভেবেছেন। অনেকে কাহিনী অবলম্বন করে অন্য দর্শন প্রতিষ্ঠা করে স্বতন্ত্র সৃষ্টিতে মহিমান্বিত হলেন যেমন থিয়েটার কমিউনের দানসাগর (প্রেম চন্দ) গন্ধর্বের বদনাম (রবীন্দ্রনাথ) নাট্যায়নের মানুষ রতন (সমরেশ বসু)। পেশাদারী মঞ্চে মৌলিক রচনা দুটি নহবৎ (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) ও তুষার যুগ আসছে (অমর ঘোষ)। সুজাতা সদনের ছায়ায় আলোয় (রূপান্তরিত বিদেশী নাটকটি বহুদিন আগে থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজিত)। 'নহবৎ' নাটকটিও নতুন নয়।

মৌলিক নাটকের মধ্যে বাদল সরকারের তিনটি পুরোন নাটক এবারের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা—সলিউশন এক্স (প্রয়াসী), প্রলাপ (অযান্ত্রিক) ও সারা রাত্তির (সর্জনা)। বাদল সরকারের এ বছরের নাটক 'যদি আর একবার' বছরের প্রথম থেকেই বহুরূপী নিয়মিত অভিনয় করে চলেছেন। আর শতাব্দী প্রযোজনা করেছেন 'ভোমা' এবং 'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিকথা'। মনোজ মিত্রের এ বছরের নাটক নরক গুলজার (থিয়েটার ওয়ার্কশপ) ও কেনারাম বেচরাম (প্রতিকৃতি)। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'আলিবাবা' অনেকদিন থেকে থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনাধীন। নাটকটির হিন্দী অনুবাদ দিল্লীতে চলছে অনেকদিন। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একেবারে অনাজাতের নাটক 'সওদাগরের নৌকা' প্রযোজনা করেছেন নান্দীকার। নান্দীকার প্রযোজিত আর একটি মৌলিক নাটক জ্যোতির্ময় দত্তের 'সবাই যাবো কুল পাড়তে'। শৌভনিক মঞ্চস্থ করেছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'থাকে শুধু' এবং শরৎচন্দ্রের জীবনের একটি অধ্যায় নিয়ে সন্তোষ সেনের 'ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র' নটনাট্যম করেছেন 'আমরা গফুর'।

১৯৭৬ সালে নজরে পড়ার মত কোন আবসার্ড নাটক হয়নি। হয়ত ঝুঁকি নেওয়ার মত লোকের অভাব। অনেক সফল প্রযোজনা যে অন্য থিয়েটারের দর্শক গড়ে তুলছিল, সেই ধারাটা বন্ধ হয়ে যাওয়াও দুঃখজনক। উনিশ শতকের নাটক নিয়ে আসর জমানোর যে চেষ্টা আগে হামেশাই হত, সেই প্রবণতাও এবার খুব কম। গিরিশচন্দ্রের দুটি নাটক 'আবু-হোসেন' (থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ), যায়সা কা ত্যায়সা' (পদাতিক), জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবু (থিয়েটার সেন্টার) দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (নব মঞ্চ) এবারের সংযুক্তি। এর মধ্যে 'আবুহোসেন' বহুদিন বাদে একটি সার্থক অপেরা।

যে থিয়েটার সংগ্রামী মানুষের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে নিবেদিত ও সংগ্রামী মানুষ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত সেই সব নাটকের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য নাম বিজন ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্য এবারে প্রযোজনা করেছেন 'চলো সাগরে' (কবচ-কুণ্ডল)। অন্য কয়েকটি নাম এই প্রসঙ্গে মনে আসছে যেমন 'একটি দল' প্রযোজিত 'বিদ্রোহী চার্বাক' বাটানগর থিয়েটার ইউনিটের 'বাবাব্বাস', কার্টুন থিয়েটারের 'কাঠঠোকরা', থিয়েটার ক্যাম্পের 'রাজ-কাহিনী', অন্বেষক-এর 'বিদ্রোহ ১৭৮২', সায়ক প্রযোজিত 'ভ্যামপায়ার', থিয়েটার জাভেনিস-এর 'রণযাত্রা', অবেক্ষণ-এর 'সওয়াল' এবং চারণ দলের 'এই দশকের অভিমন্যু', থিয়েটার স্টাডির 'স্বাধীনতা'। বহু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হয়ত বাদ পড়ে গেছে, সেটা আমারই অনবধানতা। অনেকের সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই যে সবগুলিই ১৯৭৬ সালের প্রযোজনা কিনা? দুটি প্রথম সারির দল দ্বিধাবিভক্ত। রূপান্তরী গোষ্ঠী এবার করেছেন দুটি একাঙ্ক। ইন্দ্রসভার ব্যানারে বরুণ দাশগুপ্ত এবার দুটি শরৎচন্দ্রের নাটক করেছেন, আর চতুরঙ্গ করেছেন সুজন সেনগুপ্তের পরিচালনায় 'অতলান্তিক'। শরৎচন্দ্রের প্রায় সব কাহিনীর একাধিক রূপ এবার মঞ্চস্থ। তার মধ্যে মাস থিয়েটার্স-এর প্রযোজনায় 'বামুনের মেয়ে' এবং রূপদক্ষ প্রযোজিত 'অভাগীর স্বর্গ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইসকা যাত্রা আকারে পরিবেশন করেছেন 'বিলাসী'। ১৯৭৬ সালে বেশি অভিনীত আর একটি শরৎচন্দ্রের নাটক প্রশান্ত চক্রবর্তীর নির্দেশনায় চারানিক-এর 'পথের দাবী'। শ্যামল ঘোষ, অসিত বসু, শ্যামল সেন এই বছর থিয়েটার জগতে অনুপস্থিত এবং নক্ষত্র' 'সি পি এ টি' ও থিয়েটার গিল্ড দলের নিষ্ক্রিয়তা আমাদের হতাশ

চন্দ্রকলা, অভি ভট্টাচার্য/বেহুলা লখীন্দর/ পরিচালনা : অমল দত্ত ফটো : দেশ

করলেও থিয়েটার ওয়ার্কশপ তথা বিভাস চক্রবর্তী এবং দেবকুমার ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গন্ধর্বের প্রত্যাবর্তন আমাদের আশাবাদী করে তোলে। এই বছরে নিয়মিত মঞ্চে একটি শিশু নাটক 'পরিবর্তন' এবং দুটি হিন্দি নাটক 'ভক্ত মোরধ্বজ' ও 'যৌবন' অভিনীত হয়েছে। চেতনার 'রামযাত্রা' ৭৫ সালের প্রযোজনা হলেও বোধহয় ১৯৭৬ সালেই বেশি অভিনীত হয়েছে। পেশাদারী মঞ্চের ধারা আজও বদলায়নি, কেউ চেয়েছেন দর্শকদের হাসাতে, কারও বা উদ্দেশ্য দর্শককে আবেগ বন্যায় ভাসাতে। অন্যকে চেয়েছেন রোমহর্ষক হতে কারও বা আসক্তি বাৎস্যায়নে। এখনও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কিছু নাটক হয়, যেমন 'রক্ষিতা বোন'। খবর আছে ১৯৭৭ সালে কোন একটি পেশাদারী মঞ্চ নাটকে ছয়টি ক্যাবারে নাচ ও ধর্ষণ দৃশ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করবেন। যাত্রা শুভ হোক। বছরের শেষ দিকে সমরেশ বসুর হাসির গল্প নিয়ে 'নাটের গুরু' (শৌভনিক) মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় আসরে জনসমাদৃত।

নাটকের প্রাচুর্য সত্ত্বেও প্রকাশনার সংখ্যা খুব অল্প। একটি প্রকাশক 'জাতীয় সাহিত্য পরিষদ' যাঁরা বেশির ভাগ নাটক ছেপে থাকেন, তাঁদের ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত নাটক বা নাট্য সম্পর্কিত প্রকাশনার সংখ্যা মাত্র বারটি। ওর মধ্যে নতুন নাটকের থেকে পুনর্মুদ্রণের সংখ্যা বেশি। আবার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা' হয় প্রযত্নে প্রকাশিত। নাটক প্রকাশিত বহুরূপী, বেশি থিয়েটার পত্রিকায়। এখন থিয়েটার, অভিনয়, নাট্যদর্পণ, এপিক থিয়েটার, গণনাট্য, নাট্যচিন্তা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এ বৎসর নূতন প্রকাশিত

পত্রিকা থিয়েটার বুলেটিন। বুলেটিন আকারের এই পত্রিকা সম্পূর্ণ হাফলিফ থিয়েটারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। বহুরূপীর প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। এ বছর অভিনয় পত্রিকার 'অমরেন্দ্রনাথ স্মৃতি' সংখ্যা চতুষ্কোণ পত্রিকার একটি নাটক সংখ্যা এবং আয়না পত্রিকার ব্রেখটে সংখ্যা উৎসাহী মাত্রেরই আগ্রহ বাড়িয়েছে।

বহুদিন থেকেই থিয়েটার প্রমোদকর মুক্ত। আগে পৌরকর লাগত অভিনয় প্রতি এক টাকা। এখন চারশ পর্যন্ত আসন সংখ্যায় পৌরকর লাগে পঞ্চাশ টাকা, চারশ থেকে এক হাজার পর্যন্ত আসন সংখ্যার মঞ্চে দেয় পৌরকর একশ টাকা এবং এক হাজার আসনের বেশি আসনের মঞ্চে পৌরকর লাগে দুইশত টাকা।

এ বছর শম্ভু মিত্রের ম্যাগসেসে পুরস্কার লাভ বাংলা নাটকের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এবারের সঙ্গীত নাটক আকাদমীর পুরস্কার পেয়েছেন সর্বজন-শ্রদ্ধেয় বিজন ভট্টাচার্য। সঙ্গীত নাটক আকাদমী আরও অনেককে সাহায্য দিয়ে থাকেন। ১৯৭৬ সালে যাঁরা সাহায্য পেয়েছেন তাঁরা হলেন (১) ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস ২০০০ টাকা (বিডন রোস্থিত এই দল দুটি বিভিন্ন নামে দুটি থিয়েটার ওয়ার্কশপ গড়ে তোলার জন্য এই টাকা পেয়েছেন) (২) কবচকুণ্ডল—৫০০০ টাকা (প্রযোজনার জন্য), (৩) অনামিকা (প্রযোজনার জন্য) ৫০০০ টাকা, (৪) পিপলস লিটল থিয়েটার—১০,০০০ টাকা (প্রযোজনার জন্য), (৫) নান্দীকার ৬০০০ টাকা (প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য)। এ ছাড়াও প্রদেশ আকাদমীকে কেন্দ্রীয় আকাদমীর দান ১০,০০০ টাকা। সরকারী দানের মধ্যে সং অ্যাণ্ড ড্রামা ডিভিশনের সাহায্যও কয়েকটি গ্রুপ পেয়ে থাকেন। কয়েকটি সংস্থা বিভিন্ন দূতাবাসের সাহায্য পুষ্ট। অন্যান্য ভাবেও কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। কয়েকটি সংস্থা যাঁরা নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন তাঁদের খরচের হিসেব দাখিল করছি। এই হিসাবে যে বিজ্ঞাপন খরচ দেখান আছে, সেটা ততটুকুই যেটুকু নিদেন পক্ষে না দিলেই নয়। হল অনুপাতে ভাড়াও কমবেশি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৌরকরও। প্রযোজনা ব্যয় নানাভাবে সংকুচিত করা হয়। মঞ্চসজ্জা কত সস্তায় হতে পারে সেটার পিছনে মাথা ঘামাতে হয়। আবহ রচনার জন্য উপযোগী রেকর্ড ব্যবহার করা যায় তাঁর ন্যাও চিন্তা কম করা হয় না। কয়েক বছর আগেও একটি ইংরেজি নাটকের দিদিমা বাংলায় দাদুতে রূপান্তরিত হয়েছিল। নিজেদের আয়োজিত অভিনয়ে দলগুলি যে লোকসান খায়,

কাজল গুপ্ত, সোনালী গুপ্ত/সানাই/ পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত

আমন্ত্রিত অভিনয়ে সেই ঘাটতি কিছুটা পূরণ হয়। কয়েকটি দলের ১৯৭৬ সালের হিসেব দেওয়া গেল।

থিয়েটার কমিউন :—এঁরা বেশির ভাগ অভিনয় আকাদেমি মঞ্চে করেছেন। নিজস্ব অভিনয় ৩১, আমন্ত্রিত অভিনয় ৬, মোট অভিনয় ৩৭। নিজস্ব অভিনয়ে টিকিট থেকে আয় ৩২,৫০০ টাকা, আমন্ত্রিত অভিনয়ে আয়—৭২০০ টাকা। মোট হল ভাড়া ১১১৭৫ টাকা। বিজ্ঞাপন বাবদ ১৮,১১৮ টাকা, পৌরকর ২৭০০ টাকা, অন্যান্য খরচ ১৬৯০৭ টাকা। মোট ব্যয় ৫৬৯০০ টাকা। মোট ঘাটতি ১৭,২০০ টাকা। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে হলভাড়া, বিজ্ঞাপন ও পৌরকর বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩১৯৯৩ টাকা। মোট ব্যয়ের তিন চতুর্থাংশ।

নাট্যায়ণ (এঁরা বেশির ভাগ অভিনয় করেছেন মুক্ত অঙ্গনে) নিজস্ব অভিনয় ১৫, আমন্ত্রিত অভিনয় ২৫, মোট ৪০। নিজেদের অভিনয়ে আয়—১০,৫০০ আমন্ত্রিত অভিনয়ে আয় ২২,৫০০। হল ভাড়া বাবদ ব্যয় ৭৫০০ টাকা, পৌরকর ৩০৫০ টাকা, বিজ্ঞাপন ৭০০০ টাকা, অন্যান্য খরচ ২০,০০০। মোট ঘাটতি ৪৫৫০ টাকা।

থিয়েটার লাভার্স গ্রুপ—(এঁরা বেশি অভিনয় করেছেন আকাদেমি মঞ্চে) নিজস্ব অভিনয় ৫, আমন্ত্রিত অভিনয় ৪, মোট অভিনয় ৯। অভিনয় সংখ্যা কম বলে এঁদের লোকশান কম—১৫৬১ টাকা।

সামান্য কয়েকটি দলের হিসাব থেকে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় প্রায় সব দলের অবস্থাই এর থেকে খারাপ ছাড়া ভাল নয়। মোটামুটি এই হল বনের মোষ তাড়ানোর হিসেব। কলকাতায় কয়েকটি ভাল শিশু নাটক আছে যেমন এ বছরের প্রযোজনা শিশু রঙ্গনের ভালুক নিয়ে ভেলকী, কিন্তু নিয়মিত দেখানোর ব্যবস্থা করা যায় না। এঁদের সাম্প্রতিক শিশুনাটক 'জাদুর দেশে জগন্নাথ'। কয়েক বছর আগে থেকেই কয়েকটি দল নিয়মিত শিশু নাটক অভিনয় করে যাচ্ছেন, যেমন লক্ষ্মণের শক্তিশেল, গুপী গাইন বাঘা বাইন, কাকাজু প্রভৃতি। কিন্তু লোকশানের পরিমাণকে কখনই শিশুসুলভ বলা যায় না।

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ কিছু দলকে আহ্বান করে একটি আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রসদন থিয়েটারের সংকট উপলব্ধি করে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেমন রবীন্দ্রসদনের সহযোগিতায় দীর্ঘ নাট্যোৎসব। কম ভাড়ায় একই ভাড়ায় ডবল শো-এর সুযোগ প্রভৃতি অনেক প্রস্তাবই বিবেচনাধীন। এইসব সৎ পরিকল্পনা থেকে আশা হয়, হয়ত চেরাপুঞ্জী থেকে কিছু মেঘ ধার পাওয়া যাবে গোবি সাহারার বুকে।

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

অঘটন/কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ে বিকৃত রুচির স্থূল ভাঁড়ামো আর অসহনীয় মেঠো রসিকতার দাপটে স্ল্যাপস্টিক কমেডি শব্দের অর্থটাই যখন বদলে যেতে বসে-ছিল তখন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে তিন মুখোপাধ্যায়ের একত্র যোগাযোগ সত্যিই একটা অঘটন ঘটে গেছে বলা যেতে পারে। বনফুল অর্থাৎ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'ভীমপলশ্রী' গল্পটি নিয়ে বীরু মুখো-পাধ্যায়ের নাটক আর জ্ঞানেশ মুখো-পাধ্যায়ের নির্দেশনা—এই ত্রয়ীর যোগাযোগে "অঘটন" এমন একটি প্রযোজনা যেখানে কাতুকুতু দিয়ে দর্শক হাসানোর প্রয়াস নেই, আছে তিনটি ঘণ্টা নির্মল আনন্দ বিতরণের প্রতিশ্রুতি।

অঘটনের অর্থই হল সচরাচর যা ঘটে না। অতএব অবিশ্বাস্য, অবাস্তব ইত্যাদি শব্দগুলির মূলোচ্ছেদ গোড়াতেই করে নিয়ে তবে এই নাটক দেখতে বসতে হয়। যদি এমনটা ঘটত তবে কি হতে পারত। হয়তো যেমনটা নাটকে ঘটেছে তেমনটাই হত। কিংবা অন্য কোনরকমও হতে পারত। অথবা আরও অন্যরকম। অঘটন-ঘটকপটিয়সী যিনি তাঁর ইচ্ছাসূত্রে কত

রকম কিছুই তো ঘটতে পারে। অতএব, "ওটা অমন না হয় যদি এমন হত, কিংবা...অথবা..." ইত্যাকার ইত্যাকার সঙ্গীন উঁচানো প্রশ্নগুলিকে আপাতত খাপে ভরে রাখাই বিধেয়। তবে যে ব্যাপারগুলি ঘটল তা মধ্যে স্টেশনে বউ বদল কিংবা হরিষ্টর পান্থনিবাসে ফদকার ভাঁড়ামো বাদ গেলেই যেন ভাল হত। মূল ঘটনা যেখানে অজস্রধারায় হাসির ঝরনা বইয়ে চলেছে, শিল্পীরা যেখানে কমেডির শর্ত মেনে একটা প্রায়-অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়ে চলেছেন, সেখানে ওই জাতীয় সংযোজনা দর্শকের দোদুল্যমান চিত্তেরই পরিচয়ই য়। ওইসব দৃশ্যে দর্শকের বাইরের হাসিই শেষ কথা নয়, তাঁদের ভেতরের বিরাগও অনুসন্ধানযোগ্য ব্যাপার।

তবু নাটক জমেছে, দারুণভাবে জমেছে। জমবার কা অনেকগুলি। প্রথম কারণ নাটক। উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়ার ম চমৎকার সব সিচুয়েশন—যা ঘটনার শে সেই চূড়ান্ত হাস্য-বিস্ফোরণের মুখে য়ে পৌঁচেছে। আগের যে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম তার বাইরে অতিরিক্ত কোনো ব্যাপার নেই নাটকে। খুব সাবলীল, সচ্ছন্দ এবং অবশ্যই মজার। দর্শককে ক্ষণ নিমজ্জ করে রাখার মতই সে ম নির্দেশক তাতে এনে দিয়েছেন গতি। প্রচন্ড জোরে নাটক দৌড়েছে। চূড় দৌড় সেই ভগ্নস্বাস্থ্য মোটর সাইকেলকে নিয়ে—যেটা তাপস সেনের আর ট রোমাঞ্চকর উদ্ভাবনা। আলো য় এ যেন আশ্চর্য এক মায়ার খেলা।

নির্দেশনার আরও অনেক কাজ দেখা গেছে নাটকে। সুশোভন সান্ত্বনার উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে ি আলাদা জোনে তাড়িৎগতিতে অঙ্কপ্রক্ষেপ, শিল্পীদের মূকাভিনয়, দ্রুত প্রতিক্রিয়ার এই প্রকাশ ঠিক যেন সিনেমার মতই একটা ব্যাপার। কমেডি নাটকে পোশাক-পরিচ্ছদের রঙ নির্বাচন একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাপা সেই সূক্ষ্মতার প্রমাণ জ্ঞানেশ াধ্যায় দিয়েছেন। কমেডির রাস্তা থেকে তিনি নাটককে একটি মুহূর্তের জন্যে সরে যেতে দেন নি। তবে নাটকের প্রথম গানটি—যা বার বার ফিরে ফিরে এসেছে—সেটিকে অন্য রাস্তায় তিনি যেতে দিলেন কেন? গাওয়ার মধ্যে একটা ত্রাস টোন এসে গেছে বলেই অপ্রয়োজনে হয়েছে। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসবী নন্দীর গানটিতে প কমেডির ঢঙ। শিল্পীর গলার নেপথ্যে টেপ চালিয়ে একটা

অনুপকুমার/অঘটন

মত এফেক্ট এসেছে এবং ব্যাপারটা আরও জমেছে।

কমেডি অভিনয়ে অনুপকুমার বোধহয় এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই জাতীয় অভিনয় তো তাঁর কাছে জল-ভাত। তবে তিনি অজস্র সুযোগ পেয়েও একটিবারও যে নাটক থেকে বেরিয়ে গেলেন না—এটাও যেন একটা বড় রকমের অঘটন। ইচ্ছে করলে তিনি সবাইকে কচুকাটা করে তাঁর 'একক আসরে' দর্শককে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটিবারের জন্যও তা করেন নি। তাঁকে সহস্র অভিনন্দন জানাই এই সংযমের জন্য। অভিনয়ে পরের নামটি গীতা দে-র। রসরাজ অমৃতলালের ব্যাপিকার চেয়েও ব্যাপক এই দোর্দণ্ডপ্রতাপশালিনী স্বয়ংপ্রভার চরিত্র। কী অসাধারণ দক্ষতায় তিনি ভুল ইংরেজী শব্দ এবং চরিত্রের উন্নাসিকতা ও সন্দেহপ্রবণতার মধ্যে দিয়ে চমৎকার কমেডি সৃষ্টি করে গেলেন যে সেটা কল্পনাতীত। মঞ্চে তাঁর এত ভাল অভিনয় আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শেষের দিকে একটি জায়গায় তিনি কেন জানিনা একবার হেসে ফেলেছিলেন। তাঁর মত এমন শক্তিশালী অভিনেত্রী এমন ছন্দোপতন ঘটাবেন কেন? বিশেষ করে তাঁকে কেন্দ্র করে যেখানে নাটক দাঁড়িয়ে সেখানে অল্প ত্রুটিও মারাত্মক। নাটকের কেন্দ্রে আর যে দুটি চরিত্র দাঁড়িয়ে আছে তার শিল্পী অমিত দে এবং বাসবী নন্দী। বাসবী যদি এমন সহজ সরল ও সুন্দর অভিনয় না করতেন তো নাটক দাঁড়াতই না। তিনি সেটি করেছেন। আর অমিত দে যদি অতিরিক্ত সিরিয়াস না হতেন তবে ওই চরিত্রও মার খেত এবং নাটকের একটি দিকও ধসে পড়ত। এক অধ্যাপকের চরিত্র, যার প্রচন্ড ব্লাডপ্রেশার, তিনি যদি শোনেন তাঁর স্ত্রী অন্যের সঙ্গে হোটেলে রাত কাটিয়েছেন তবে যে রক্ত মুখে তোলা উচিত—অমিত দে সেটি তুলেছেন। সত্যিই একজন নিপুণ অভিনেতা তিনি। জ্ঞানেশ মুখার্জী তাঁর চরিত্রে একটি টাইপ উপহার দিয়েছেন। তিনি বড় অভিনেতা। ঘন ঘন প্যান্ট ঠিক করে লোক হাসাবার প্রয়োজন তাঁর নেই। ওটা বাহুল্য। দর্শক এমনিতেই তাঁর অভিনয়ে মজা পেয়েছেন। নবাগতা মঞ্জুলাকে ভাল লাগে তাঁর মিষ্টি মিষ্টি চেহারা আর চরিত্রোচিত অভিনয়ের জন্য। অন্যান্য চরিত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অশোক মিত্র, শ্যামল সেন, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম মৈত্র, মণি শ্রীমানী, পুতুল চক্রবর্তী এবং শাশ্বতী রায়। তাপস সেনের আলোর কথা তো আগেই বলেছি। সুরেশ দত্তর মঞ্চসজ্জাও চমৎকার। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে ট্রেনসহ সেটটি প্রশংসা পাবার মত। তবে প্ল্যাটফর্মের উপর ফেলে যাওয়া কলার খোসাটির প্রতি অনুপকুমারের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কারণ ওটির উপর পা ফেলে আছাড় না খেলে কোন অঘটনই যে ঘটবে না।

—রবি বসু

চলচ্চিত্র

চাঁদের কাছাকাছি/বাদল পিকচারস

ভাবুন কলকাতায় হলিউড-এর একটি ছবি এসেছে। নাম, অ্যারাউনড দ্য মুন, কিংবা জারনি টু দ্য মুন। ছবিটি দেখতে গিয়ে বুঝলেন, চাঁদ, স্পেস, মঙ্গলগ্রহ, এ-সবের কোনো বালাই নেই সেখানে, বিজ্ঞান-টিজ্ঞান ওসব কোনো ব্যাপারই নয়। আসলে ছবির প্রধান চরিত্রটির নাম যেহেতু মিঃ মুন, সেই নামের সুযোগ নিয়ে স্রেফ আপনাকে ঠকাবার জন্যে ছবিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আরাউনড দ্য মুন' বা এ ধরনের কিছু, আপনিই বলুন, সহ্য করবেন আপনি? এবং তারপর আরো যদি দেখেন যে, এই ঠকাবার মেজাজ নিয়ে যে ছবিটি শুরু হল তার প্রিটেনশানটা আগাগোড়া সিরিয়াস ছবির তাহলে সেটিকে সোনাপানা মুখ করে মেনে নেবার মত সুশীল দর্শক আমাদের মধ্যেও খুব কম আছেন। কিন্তু আহা বাংলা ছবি—সুতরাং ছবির নাম "চাঁদের কাছাকাছি" হলেই যে সেখানে চাঁদ, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র আসবে এমন বায়না কেন, বিশেষ করে সে ছবির নায়ক যখন উত্তমকুমার আর নায়িকা মিঠু মুখার্জী? আর

সেকথা যদি বলেন, কোন বাংলা ছবিতে না আমরা চাঁদের কাছাকাছি যাই বলুন? নায়ক-নায়িকা যে মুহূর্তে সেই চিরদিনের একঘেঁয়ে ব্যাপরাটা বুঝতে পারেন অমনি তো নেপথ্যে কোনো পরিচিত কণ্ঠে গান, একটি সূর্যমুখীর ক্রমিক ফুটে ওঠা, একটি ডানা-ঝাপটানো প্রজাপতি এবং অবশেষে আকাশের গায়ে একটি নিটোল আলোর রুটি—এর চেয়ে চাঁদের বেশি কাছাকাছি আর কোন বাঙালী পরিচালক গেছেন যে যাত্রিককে যেতে হবে? সুতরাং আসুন যা আমরা হলিউড-এর ছবিতে মেনে নেব না, তা আমরা যাত্রিক-এর ছবিতে মেনে নি। এ-ছবির নাম "চাঁদের কাছা-কাছি", কেন না নায়কের নাম চাঁদ! কেন না মিঠু মুখার্জীর চাঁদ মুখের ক্লোজ-আপে দৃশ্যের পর দৃশ্য আটকে যায়!! কেন না (স্থূলবুদ্ধির [illegible] ব্যাখ্যাটি অবশ্য যাত্রিক ভাবেন নি, এবং [illegible]নেই চূড়ান্ত আয়রনি) এ ছবির নায়ক [illegible] সুস্থ হলেও সারাজীবন পাগলা-গারদে কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেবার মত 'লুনাটিক' এবং সত্যিই সে শেষ পর্যন্ত লুনাটিক অ্যাসাইলাম-এ শান্তি পায়। এর সঙ্গে মিশেছে পরিচালনার পাগলামি। চাঁদের কাছাকাছি নাম তাই একাধিক অর্থে সার্থক। চাঁদের প্রভাবেই তো যত পাগলামি।

এবার দেখা যাক, এ ছবিতে সিরিয়াস ছবির প্রিটেনশনটা কতদূর অসহ্য। ছবির নায়ক চাঁদ দর্শনের অধ্যাপক। ছাত্রীর সঙ্গে (সুব্রতা) তার বিয়ে হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে এই মেয়েটির চরিত্রে আমূল পরিবর্তন আসে (পরিবর্তনটিকে বিশ্বাস্য করে তুলে ছবিটিকে একেবারে অন্য পর্যায়ের করে তোলা যেত) এবং তার ফলে চাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিবাহ বিচ্ছেদ যাতে সহজে হয় সে জন্যে চাঁদ পাগলের ভান করে। সুতরাং সত্যিকার সিরিয়াস ছবিতে চাঁদের সুস্থ মানসিকতার সঙ্গে তার আরোপিত পাগলামির সংঘর্ষে সে কিভাবে বিবর্তিত হচ্ছে সেটা (দয়া করে হ্যামলেট-টামলেট ভেবে সেনটিমেনটাল হয়ে পড়বেন না) দেখানো যেত। কিন্তু যাত্রিক সেদিক দিয়েও না গিয়ে চাঁদের অতীতটা টুকরো টুকরো ফ্ল্যাশ-ব্যাক-এ দেখিয়েছেন। আপাত উদ্দেশ্য : রহস্য সৃষ্টি। মূল উদ্দেশ্য : আবার ঠকানো।

যাত্রিক-এর এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বঞ্চনাটা এই রকম—যখনই ফ্ল্যাশব্যাক-এ চাঁদ তার অতীতের কথা ভাবে তখনই সুব্রতাকে পেছন থেকে দেখানো হয়, এবং একটা ঝিমঝিম বাজনা বাজানো হয়। ফলে, আমাদের ক্রমাগত মনে হতে থাকে যে, চাঁদ তার অতীতের সবটা মনে করতে পারছে না এবং দারুণ কিছু একটা রহস্যের জন্যে আমরা উদগ্রীব হয়ে উঠি। পরে জানতে

উত্তমকুমার/চাঁদের কাছাকাছি

পারি অতীত মনে করতে না পারার কোন কারণ নেই, যেহেতু চাঁদের পাগলামিটাই তো ভুয়ো, আর দৃশ্যের পর দৃশ্যে রহস্যের যে আবহাওয়াটা তৈরি করা হলো সেটাও নেহাৎ মিথ্যে, ডাহা লোক ঠকানো। তবু 'আহা বাংলা ছবি' বলে এ প্রবঞ্চনাটাও আমরা গিলে ফেলি।

এবার ছবিটির কয়েকটি দৃশ্য খুব কাছ থেকে দেখা যাক। (১) একেবারে প্রথমে মানসিক হাসপাতাল থেকে উত্তম-কুমারের খবরের কাগজ মুখে দিয়ে পালানোর দৃশ্যটি পরে রেস্তোরাঁ থেকে মেনুকার্ডে মুখ ঢেকে পালানোর মত বড় বেশি সাজানো ও অবাস্তব। (২) ফার্স্ট ক্লাশ রেলওয়ে কম্পার্টমেন্ট-এর ভিতরটি চোখে লাগার মত অবাস্তব। ব্যাংকের পিছনের পার্টিশনটি কখনো ঘরের দেয়ালের মত হয় না। দ্বিতীয়ত, ঐ ধরনের একটি সস্তা, আলগা আয়না সেখানে দেয়ালে ঝোলানো থাকে না। (৩) চাইবামাত্র, কোনো পাবলিশার লেখককে পঁচাত্তর হাজার টাকার ক্যাশ পেমেনট করবেন—বিশেষ করে যে লেখককে চিনতেই তাঁর প্রথমে কষ্ট হচ্ছিল—এটা ভেবে নিতে বেশ কষ্ট হয়। (৪) স্বপ্নার (মিঠু) প্রেমিক লেখক রঞ্জন (সন্তু মুখার্জী) কোন অর্থে ঐ বড়লোকের ছেলেটির (পিনাকী সেন-গুপ্ত) চেয়ে ভালো? তাকে তো প্রথম থেকেই বেশ ঠাট্টার চোখে দেখা হয়েছে। লিখতে লিখতে হোঁচট খেলেই সে প্রেমিকার কাছে অভিধান চেয়ে পাঠায় এবং প্রথম উপন্যাসের নাম রাখে 'নিঠুর দরদী'! (৫) হঠাৎ সে ছবির শেষে স্বপ্নাকে বিয়ে করে নতুন ফ্ল্যাট নেয় কার টাকায়? আমরা যতটুকু জানি সে তো অনো বেকার!

এ ছবিতে অভিনয় প্রসঙ্গ অবান্তর। মূলত চিত্রনাট্য ও সংলাপের দুর্বলতার জন্য ভালো ও বিশে[illegible] করে সিনেম্যাটিক অভিনয়ের কোনো [illegible]যোগ নেই। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় যে এক[illegible] নড়বড়ে কষ্টকল্পিত চরিত্রকে খাড়া করে [illegible]খেন সে-জন্যে তিনি অভিনন্দনীয়। মি[illegible] মুখার্জীর অতি অভিনয় আমাদের সহ্যশক্তির কাছে বড্ড বেশি দাবি করে। তাঁর উচ্চারণ ও বাচন ভঙ্গির শীলন এক[illegible] প্রয়োজনীয়। উত্তম-কুমারের কাছে আমা[illegible]র সেই পুরোনো প্রশ্ন তাঁর মত অমন দ[illegible]র্ব অভিনেতা কেন বার বার এ ধরনে[illegible] ছবির সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছেন? এ[illegible] তিনি শিল্পী হিসেবে তৃপ্তি পান? সব [illegible]শেষে এ ছবির একটি গানের প্রথম দু[illegible] ছত্রের উল্লেখ না করে পারছি না : [illegible] পেয়েছি আর কি পাইনি/তার হি[illegible] মেলাতে যাইনি।" হায় রবীন্দ্রনাথ, [illegible]পনারি কথা আমরা কত নতুন ধরনে বল[illegible] শিখেছি!

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত

স্বর ও সু[illegible]

রবীন্দ্র স[illegible] সুরমল্লারের তৃতীয় বার্ষিক অনু[illegible] গান ও আবৃত্তির আসর বসেছিল। [illegible] আবৃত্তি করেছিলেন দেবদুলাল ব[illegible]পাধ্যায়; তাঁর কণ্ঠ [illegible]ক-প্রিয়, তাঁর[illegible]গী অনুসরণীয়। [illegible]কে খাদে নামি[illegible] ভাবনাকে ছড়ি[illegible]দেবার কৌশল চ[illegible]র দেখাতে পারেন। বিশেষত, [illegible]নিক কাব্যপাঠের সময়ে কবির উ[illegible] তিনি সহজেই ধরতে পারেন; [illegible]নিক কবির রচনা এখানেও তাঁর ক[illegible] সংযত গাম্ভীর্যে মর্যাদা পেয়েছে।

নীলা [illegible]জুমদার নজরুল এবং গণ-সঙ্গীত [illegible]ছেন। গলায় মিষ্টতা আছে, ভার নেই, [illegible]তার জন্য কোন কোন গানের তেজস্বি[illegible]র কণ্ঠে বাসা খুঁজে পায় না। বিশেষত, [illegible]গঙ্গা' গানটিকেও তিনি উঁচু পর্দায় [illegible]ধেছিলেন কিন্তু মন্দ্রসপ্তকে তিনি [illegible] করেন, সুর আসে না।

পর[illegible] আবৃত্তিকার কাজী সব্যসাচী কবিতা [illegible]র আগে এক দীর্ঘ ভূমিকায় পিতৃদেবে[illegible] মৃত্যু আর শেখ মুজিবের স্মৃতির[illegible] করেন। প্রসঙ্গক্রমে জানালেন, শেখ মু[illegible] নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনা[illegible] তাঁর মস্তকের উপরে, নজরুলের জায়গা [illegible]য়ে। বাংলায় এই ধরনের ক্ষীণ-মূল [illegible]আবেগসজল বাক্যসমুচ্চয় এখনো

সচল? ভাষণশেষে তিনি একটি রাষ্ট্রের অসভ্য বর্বরতার প্রতি শ্রোতাদের ক্ষোভ ও নিন্দাকে স্বাগত জানিয়েছেন। খুবই স্বাভাবিক, এমন অস্বাভাবিক পিতৃবিয়োগ পুত্রকে ক্ষুব্ধ করবেই। কিন্তু দীর্ঘকাল এই ধরনের ক্ষোভ প্রবশে সন্তাপের তাপ ম্লান হয়ে যায়। গভীর শোকও সুলভ হয়ে পড়ে। সব্যসাচী জয়নুলের বিদ্রোহী, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের কবিতা আর মজরুলের রোজনামচার কিয়দংশ পাঠ করলেন। ওঁর কণ্ঠ, উচ্চারণ আর স্বরক্ষেপ, সন্দেহ নেই গরীয়সী।

শেষ শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নজরুল গীতি গেয়েছেন। সংগত করেছেন রাধাকান্ত নন্দী। মানবেন্দ্রর কণ্ঠ সতেজ ছিল, ভঙ্গী ছিল চমকপ্রদ। এখানে সে দুটোই হারালাম অমন লোভনীয় গান 'ভরিয়া পরান' বা 'শূন্য বুকে' কিংবা 'পথিক ওগো, চলতে পথ' ইত্যাদি—সেখানে মানবেন্দ্র তাঁর স্বরোচিত মাত্রা যোগ করেন নি। অথচ সব সুর আছে, সরকারিতে নিখুঁত, সব যথারীতি পরিচ্ছন্ন। তবু যে কেন মানবেন্দ্র এখন ক্লান্ত ; ক্লান্ত করেন আমায়।

—প্রতিম বসু

আমজাদ আলীর একক আসর

ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক আয়োজিত এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বসেছিলেন সরোদীয়া আমজাদ আলী খাঁ গত ২২ ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনে তবলায় ছিলেন বেনারস ঘরানার শিল্পী আনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল বাগেশ্রীতে আলাপ ও জোড় দিয়ে। খণ্ড খণ্ড করে বাজানো আলাপটি নির্ভুল হয় মনোগ্রাহী হয় নি। জোড়ে কিছু নতুন অথচ উল্লেখযোগ্য স্বরের নকশা ছিল যেমন স ণ ধ প, স ণ ধ ম। কিছু দ্রুত ঝালাওও বেশ ভাল হয়েছিল। গমক ঝালা তারপরণ ঝালাতেও আমরা তাঁদের

আমজাদ আলি খাঁ

স্বাভাবিক দক্ষতা ও শিল্পবোধের পরিচয় পেলাম। ঝাঁপতাল গৎটিতে কিছু লয়কারী বিস্তার করেই শিল্পী হঠাৎ একটি মধ্য-দ্রুত গৎ ধরলেন। এতে সামান্য কিছু তান-প্রধান সাথ-সংগত বেজে উঠতে না উঠতেই আমজাদ একটি দ্রুত গৎ ধরলেন। মনে হল তাঁর বাজনায় ঠিক মন বসছিল না। আনন্দ-গোপালের বাজনাও একটু প্রাণহীন লেগেছে।

পরের বেহাগ রাগে বিলম্বিত গৎ অবশ্য ভালই লেগেছে। এতে ঝোঁক ছিল বিস্তারের ওপর এবং বিস্তার আমজাদ আলীর পক্ষে ভালই হয়েছিল যদিও মাঝে মাঝে তিনি ধৈবতের ওপর একটু বেশী জোর দিয়ে ফেলছিলেন। এরপরে পরিবেশিত হল শিল্পীর নিজের তৈরি এক দ্রুত গৎ—একটি পুরোনো খেয়াল বন্দেশ ভেঙে গড়া। এই পর্বে আমজাদ কিছু উঁচুদরের দ্রুত তান তোড়া বাজিয়েছিলেন। এরপরে আমজাদ আলী আরেকটি দ্রুত গতের এক পংক্তি বাজিয়ে ছেড়ে দিলেন এবং ধরলেন তাঁর পিতা হাফিজ আলী খাঁ নির্মিত এক দ্রুত গৎ যেটির আলাউদ্দিন খাঁ নির্মিত আরেক দ্রুত গতের সঙ্গে জায়গায় জায়গায় বেশ মিল আছে।

অনুষ্ঠানের শেষার্ধে শোনা গেল পরজ বসন্ত রাগে একটি দ্রুত একতাল গৎ ও দরবারী কানাড়ায় আওচার ও দ্রুত তিনতাল গৎ। প্রথমটি খুবই আনন্দদায়ক হয়েছিল এবং আমজাদ আলী বেশ কিছু ভাল তান তোড়া বাজিয়েছিলেন। দরবারী আওচার ও গৎ সুসম্বদ্ধতা ও আবেগ-পূর্ণতার দিক দিয়ে অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ নিবেদন ছিল।

—অনিলাভ গুপ্ত

বোম্বাই থেকে

মোহন স্টুডিওতে 'ধরম ইমান'-এর শ্যুটিং। স্টুডিও প্রাঙ্গণে কারখানার একটা গেট তৈরি করা হয়েছে। দেখে একটু অবাক হলাম এই ভেবে যে এ-ধরনের দৃশ্য আজকাল প্রায় সকলেই আসল কোন কারখানাতেই তো তোলে! তখুনি মনে পড়লো 'ধরম ইমান'-এর পরিচালক দেশ মুখার্জি যার আসল পেশা শিল্প-নির্দেশনা। সম্ভবত দেশ মুখার্জি তার পেশার কথা ভুলতে পারেন নি, আর তাই কৃত্রিম সেট তৈরি করেছেন আসলের পরিবর্তে। শ্যুটিংয়ে তখন তিনি এত ব্যস্ত যে তাঁকে কারণটা জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত বলি, বোম্বাই চিত্রজগতে শিল্প-নির্দেশনার কাজে বাঙালীদেরই প্রাধান্য। রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেশ বসাক, কার্তিক বসু, বীরেন নাগ, সুধেন্দু রায়, সৌরেন সেন, দেশ মুখার্জি, শান্তি দাস যাদব ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিন একদা ছিল বা এখনও এঁদের অনেকেই বাজার জাঁকিয়ে আছেন।

—সুরঞ্জন

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাশুল
ত্রিপুরা ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে বাসবদত্তা রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৪০
২৩-৮৫৫৯

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
আমাদের লন্ডন অফিস মাধ্যমে	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

(লন্ডন পর্যন্ত বিমানে)

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

এ কী, আমার বন্ধুকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?
ভাগ, ব্যাটা!

ওটাকেও নিলে হয়!
না, ওটা রোগা-পটকা। কাজে লাগবে না।

সম্রাট নিরুদ্দেশ। রাজ দরবারের লোকেরা তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছে।
'জঙ্গলে ঢুকে তল্লাসি চালাচ্ছে তারা...

...কিন্তু তিনি অনেক দূরে।
বেশী মারিস না.. দুর্বল হয়ে পড়লে কাজে লাগবে না...
বড্ড বেয়াড়া!

এটা বেচে অনেক পয়সা পাব!
আমীর সুলেদি পয়সা ভালই দেয়...

লোকটা তো বেহুঁশ! যা পয়সা দিলাম, তার বেশী পাবি না!
চলি হুজুর।
বড্ড কম পেলাম!
5/30

জ্ঞান ফিরছে!
ভাল করে শেকল পরা।

এ কোথায় এলাম আমি..?
'সম্রাট জুনকর এখন ক্রীতদাস!'

অমৃতাঞ্জন ডারমল্ অয়েন্টমেন্ট শরীরের গভীরে প্রবেশ করে সেজন্য দাদ্, একজিমা, চুলকুনি ও ত্বকের অন্যান্য সাধারণ অসুখে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ। আজই এক টিন কিনে নিন।
Amrutanjan Ltd.
dermal Ointment
for RINGWORM · ECZEMA
অমৃতাঞ্জন
ডারমল্ অয়েন্টমেন্ট
অমৃতাঞ্জন লিমিটেড,
১৪/১৫ লাজ চার্চ রোড,
মাদ্রাজ-৬০০ ০০৪
আপনার
ত্বক সুরক্ষা
করুন।
SAA/AM/1905/BN

কেয়ো-কার্পিন

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ নিশিকান্ত

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ "ঝরনা" (জলরঙ—১৬"×১০")—কবি নিশিকান্ত 'কলাভবনে'র ছাত্র ছিলেন এ খবর খুব অল্প লোকই রাখেন। ছবিতে কলস্বরা ঝরনার শিধারায় অশ্রান্ত সুর আর ছন্দ চিত্রভাষায় বিধৃত। পাহাড়ের গলায় ঝরনা যেন ফুলের মালা। গাছের ঘন ছায়া আর হালকা মেঘ যেন নির্জনতার স্বাক্ষর। হালকা বাদামী, একটু কালোর ছোঁয়া, কিছু সবুজ আর সাদা রঙ—নিশিকান্তের তুলির পক্ষে এই যথেষ্ট।

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৩
শনিবার ৮ মাঘ ১৩৮৩

ভারতজীবনে বিজ্ঞান

এই বছরের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ শুধু ভারতের বিজ্ঞানীদের পক্ষে নয়, সাধারণভাবে ভারতের সর্বজনের পক্ষে কয়েকটী বিশেষ শিক্ষণীয় সত্যের দিগ্‌দর্শন বলে বিবেচিত হতে পারে। বিজ্ঞানের সম্পর্কে ইতিহাসের একটি অভিযোগ এই যে, মানবীয় সংস্কৃতির জীবনে বেশ কয়েক যুগ ধরে বিশেষ এক আভিজাতিক ধারণার প্রভাবে বিজ্ঞানের প্রসন্ন উপহার সর্বাংশে না হোক অধিকাংশে বিশেষ এক সম্পন্ন ও ভোগসুখী সমাজের সেবায় নিয়োজিত হয়ে এসেছে। গ্রীক মনস্বী অ্যারিস্টটল্ মানবতার অনেক নীতির সার্থক সেবক এবং প্রবক্তা হয়েও এই অভিমত উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছেন যে, বিজ্ঞান সমুদয় মানবসমাজের সেবায় ও উপকারে প্রযুক্ত হবার মতো বিষয় নয়। বিজ্ঞান হবে সমাজের বিশিষ্ট উচ্চশ্রেণীর প্রয়োজন, অভিরুচি এবং ভোগসুখের সহায়ক বান্ধব। ইউরোপের প্রায় এক হাজার বৎসরের বিজ্ঞান অ্যারিস্টটলের প্রচারিত ওই অভিজাতিক সংস্কারের অধীনতার মধ্যে নিতান্ত কুণ্ঠিত রূপে কালাতিপাত করেছিল। অবশ্য কোন কোন বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত উদার মনোভাবের কারণে মাঝে-মাঝে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের সেবার ও প্রয়োজনের জন্য চিন্তা এবং চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত ভাষণের একটি মন্তব্য এই যে, ভারতীয় বিজ্ঞানকে দেশের সর্বজনীন কল্যাণের ও প্রয়োজনের বস্তু শুধু আবিষ্কার ও নির্মাণ করতে নয়, সুলভ করতেও হবে। বলতে হয়, এটাই বিজ্ঞানের পক্ষে একমাত্র মাননীয় ও অনুসরণীয় নীতি। বিজ্ঞানকে মানবতার পরিচারক হতে হবে। সাধারণ মানুষের কল্যাণ সুলভ করবার ব্রতে নিয়োজিত হতে হবে। ইংলণ্ডের বেকন ঠিক এই কথাই বলেছেন, যদিও কবি গোল্ডস্মিথের মতে এবং অন্য ঐতিহাসিকেরও বিচারে, বেকন ছিলেন অত্যন্ত হীন প্রকৃতির এক ব্যক্তি, যার বাস্তব জীবনে মানবতার কোন নীতি কখনও সেবিত হয়নি। যা-ই হোক, এহেন ক্ষুরধার প্রতিভার মানুষ সেই হীনস্বভাব বেকনই প্রথম বিজ্ঞানের 'মানবতা'র তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ মানুষের প্রয়োজন কল্যাণ ও সুখের নতুন আবিষ্কার সম্পন্ন করে এবং সুলভ করে সর্বজনীন সন্তুষ্টির মান উন্নত করা।

ভারতে বিজ্ঞানের সমুন্নত অনুশীলনের প্রশস্তি করেও বলতে হয়, ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিভা যেন অভ্যস্ত একটি প্রশ্নহীন সংস্কারের বশে নিতান্ত প্রকারে কিংবা বিশেষভাবে আভিজাতিক প্রয়োজনের নবান্ন সৃষ্টি করবার গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে এসেছে। অবশ্য একথা বলে দিতে হয় যে, এটা একেবারে ঢালাও অভিযোগ হিসাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে না। ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সব দিক বিচার করে নিয়ে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয় যে, ভারতের মতো গরীব দেশের রিক্ত, নিঃস্ব ও নিরৈশ্বর্য সাধারণ মানুষের জীবনে যে প্রয়োজন হলো সবার উপরের প্রয়োজন, এবং যে কল্যাণ হলো সবার আগের কল্যাণ, তার প্রাচুর্য সৃষ্টি করবার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিভাকে সম্যক্ অঙ্গীকার ও অধ্যবসায় স্বীকার করতে হবে। বিজ্ঞানের কর্তব্য এই নয় যে, গৃহের নীচতলার সব প্রকোষ্ঠে অন্ধকার, কালিঝুলির জঞ্জাল এবং যত্নহীন শূন্যতার দুঃখ ছড়িয়ে রেখে দিয়ে দোতলা কিংবা তিনতলার প্রকোষ্ঠকে সুন্দরভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যে শোভায়িত করা, যদিও জানা আছে যে, নীচতলাই হলো গৃহবাসিন্দার শতকরা নব্বইজনের জীবনের ও বসবাসের ঠাঁই। প্রধানমন্ত্রী আরও একটি বিপত্তির অভিসন্ধিময় ক্রিয়ার প্রভাব পরিহার করবার কথা বলেছেন। পশ্চিমের খলাহিত এবং ছলসাহ যোর পয়োমুখ অভিসন্ধির প্রভাব পরিহার করা। ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নের কোন বিষয়ে পশ্চিমের বিশেষজ্ঞতার সাহায্য নেবার চেষ্টা করবার বিষয়ে খুব সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ, এক্ষেত্রে পশ্চিমের উন্নত বৈজ্ঞানিকতা এবং শিক্ষাদীক্ষা ও অভিজ্ঞতার মুখপাত্র হয়ে এমন পরামর্শ বিতরিত হয়ে থাকে যেটা ভারতীয় কৃতিত্বকে চিরকাল খর্ব করে রাখবার মতো কুণ্ঠিত তথা অত্যন্ত সীমিত একটি শিক্ষা।

বিজ্ঞানের সাধনা ও অধ্যবসায়ের আদর্শিক লক্ষ্য ও নীতি সম্বন্ধে এই নিঃসংশয় প্রত্যয় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চিন্তার অধিগত একটি সহজ সত্য হওয়া চাই যে, ভারতের কোটি-কোটি সাধারণ মানুষের জীবনচর্যার মধ্যে প্রয়োজনোচিত কল্যাণ ও সুখের সঞ্চার সম্ভব করতে হবে। প্রশ্ন করা চলে, স্বাধীনতার প্রায় ত্রিশটি বৎসর পরে হতে চলেছে, তবু কেন ভারতের কোটি-কোটি মানুষের তথা লক্ষ-লক্ষ গ্রাম এবং জনপদের অর্থনৈতিক যাত্রার প্রধান পরিবাহক গো-গাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য ও চলচ্ছক্তির কোন সহজ রকমের যান্ত্রিক সংস্কার সাধিত হলো না? গ্রামের গরীবের জন্য শক্তপোক্ত কুটীর নির্মাণের সুলভ উপাদান কেন আজও আবিষ্কৃত হলো না। চিকিৎসায় এবং ঔষধের আবিষ্কারে ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিভাকে অভিনন্দিত করবার মতো বস্তুত কোন যুক্তিই নেই। এক্ষেত্রে অতি সামান্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, এবং যা হয়েছে সেটা গ্রামীণ গরীবদের নির্বিশেষ প্রয়োজনের সহায়ক নয়। সস্তা দামের নতুন জ্বালানী উপাদান সৃষ্টির জন্য, সস্তা দামের নতুন সারের প্রাচুর্য সৃষ্টি করবার জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীর প্রতিজ্ঞা কি সার্থক হয়েছে? বলা বাহুল্য, সাধারণ জনজীবনের প্রয়োজনে নতুন কল্যাণের উপকরণ আবিষ্কার করতে গিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানের ঘরে যদি কিছুটা স্থূল রকমের আকার-প্রকারের হিতযুক্ত ভোগ্যবস্তু প্রসূত হয়, তবু সেটা জাতির বৃহত্তর স্বার্থের দিক দিয়ে অভ্যর্থনীয় বলে বিবেচিত হবে। মায়ের দেওয়া কাপড় মোটা হলেও মাথায় তুলে নিতে হয়।

বৈদেশিকী

একেশ্বর

সিঙ্গাপুরকে ইংরেজরা গড়ে তুলেছিল জিব্রালটার-মল্টা-এডেনের মতো সমুদ্দুরে নিজেদের ঘাঁটি হিসেবে। তাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বানাবার মতলব কস্মিনকালে তাদের ছিল না। আর যে ক্ষুদে দ্বীপের এলাকা কুল্লে ২২৫ বর্গ মাইল, যেখানে মোটে তেইশ লাখ লোকের—তাও আবার চার জাতের—বাস, সে যে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র বনে যাবে তা আর কে ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু কেউ ভাবুক আর নাই ভাবুক, ভুরু কোঁচকাক আর নাই কোঁচকাক ছোট্ট সিঙ্গাপুর পরাধীনতার বাঁধন ছিঁড়ে স্বাধীন হয়েছে, সেই সুবাদে ইউনাইটেড নেশানসের সদস্যও; তার ওপর ফাউ হিসেবে কমনওয়েলথেরও শরিক। সিঙ্গাপুরীরা এক জাতের লোক নয়। তাদের বাপ-পিতেমো এসেছিলেন কেউ চীন থেকে, কেউ ভারত উপমহাদেশ থেকে, কেউ বা ঘরের কাছের মালয় কী ইন্দোনেশিয়া থেকে। তাদের নামেই বোঝা যায় কে কোন্ জাতের বংশধর। তবে ঘরের টান তাদের কারুর বড় একটা নেই—সবাই মিলে গড়ে তুলেছে একটা নতুন রাষ্ট্র কেবল নয় নতুন একটা জাতও। তাই মালয়েশিয়ার সঙ্গে তার গাঁটছড়া বেঁধে দিলেও সে পলকা বাঁধন বাঁধতে না বাঁধতেই ছিঁড়ে গেছে।

বিলিতী সংসর্গের চিহ্ন হিসেবে সিঙ্গাপুরে কায়েম রয়েছে পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্র। কেতামাফিক দেশে সংসদ আছে মন্ত্রিসভা আছে, রাজনৈতিক দল আছে, নির্বাচন আছে। কিন্তু নেতা বলতে সেখানে একজনই, দল বলতেও একটিই। সিঙ্গাপুরের প্রাণপুরুষ হচ্ছেন লী কুয়ান ইউ, দল বলতে বোঝায় তাঁরই পিপলস্ অ্যাকশান পার্টি অর্থাৎ জনগণের কর্ম দল। সিঙ্গাপুর আলাদা রাষ্ট্র হয়েছে ৯ আগস্ট ১৯৬৫তে। তখন শাসক দল ছিল পিপলস্ অ্যাকশান পার্টি, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লী ইউয়ান কিউ। এখনও তাই। তার পর তিন দফা সাধারণ নির্বাচন হয়েছে। তিনবারই কেল্লা ফতে করেছে পিপলস্ অ্যাকশান পার্টি আর দলের নেতা লী কুয়ান ইউ বসেছেন প্রধানমন্ত্রীর গদিতে। বিরোধী দল যে ছিল না তা নয় কিন্তু তারা সবাই গোহারান হেরেছে শাসক দলের কাছে। সতেরো বছর ধরে জোরসে হাঁকিয়ে চলেছেন মনপ্তর জুড়ি লী কুয়ান ইউ। বিদেশীরা তো সিঙ্গাপুরের নামই দিয়েছে লী কুয়ান ইউয়ের দেশ।

লী ক্ষমতা জবর দখল করেননি, ডিক্টেটরও বনে যাননি। তবে কড়া শাসক বলে তাঁর নাম আছে। সংবিধানের কানুন সবই তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন। সংসদের মেয়াদ ফুরোলেই আইন মোতাবেক নির্বাচন হচ্ছে। যে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা হাতে পেয়েছিলেন লী তা হয়েছিল ১৯৬৩ সনে। সেটা সিঙ্গাপুর আলাদা রাষ্ট্র হবার আগে। তারপর নির্বাচন হয়েছে ১৯৬৮, ১৯৭২ আর শেষবার ১৯৭৬-এর ডিসেম্বরে। ফল তিনবারই এক—লী আর তাঁর দলের জয়জয়কার, বিরোধীদের এক নাগাড়ে দারুণ হার। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, সিঙ্গাপুরের সংসদে বিরোধীদের আসন একদম খালি, নির্বাচনী দরিয়া পেরিয়ে তাদের একজনও ঘাটে উঠতে পারেন নি। লড়তে তাঁদের দেওয়া হয়েছে, লড়তে তাঁরা এত হেরেও পেছপাও হননি। কিন্তু ভোটার দেবতা তাঁদের এত সাধাসাধি সত্ত্বেও ফিরেও তাকাননি। তাঁদের নাচনকোঁদন সংসদের বাইরে—ভেতরে তাঁদের ঢোকবার ছাড়পত্তর মঞ্জুর করেন সিঙ্গাপুরের পাঁচমিশেলী ভোটাররা।

তেইশে ডিসেম্বর যে নির্বাচন হয়েছে সিঙ্গাপুরে তাতে কিছুই পালটায়নি—যা ছিল তাই রয়ে গেছে। ৮টা দল যুঝেছিল ভোটের লড়াইয়ে শাসক দলের সঙ্গে। তাকে কুপোকাত করতে পারবে এ আশা কারুরই ছিল না। তারা ভেবেছিল গোটা কয়েক আসন তারা ছিনিয়ে আনতে পারবে পিপলস্ অ্যাকশান পার্টির কবল থেকে যা তারা আগের দুটো নির্বাচনে পারেনি —সে দুটো নির্বাচনে সব কটা আসনই কবজা করেছিল শাসক দল। কিন্তু এবারও বিরোধীদের বরাতে জুটেছে শূন্য—একটা আসনও তারা দখল করতে পারেনি। ৬৯টাই পেয়েছে পিপলস্ অ্যাকশান পার্টি। কেবল তাই নয় তাদের ভোটও কমেছে। আগেরবার তারা পেয়েছিল মোট দেওয়া ভোটের ৩০ শতক এবার তারও কম। ২৫ শতকের ওপরে তারা উঠতে পারেনি। তার মানে অবিশ্যি পাঁচজন ভোটারদের মধ্যে একজন তাদের দিকে। কিন্তু তাতে তো শাসক দলের কিছু এসে যাচ্ছে না, বিরোধীদেরও কোনো লাভ হচ্ছে না, যত দিন যাচ্ছে তত তাদের টেঁকাই দায় হয়ে উঠছে সিঙ্গাপুরে। তাদের দিন কখনও যে ফিরবে তার কোনও আভাস তো এ নির্বাচনে মেলেনি।

লী আর তাঁর দলের বাহাদুরি আছে বলতে হবে। ১৭ বছর একটানা দেশ শাসনের পরও তাদের ভোটের জোয়ারে যে ভাঁটা পড়েনি সে একটা অবাক কাণ্ড বটে। এমন কথা বলা যাচ্ছে না যে, লোকে ভক্তিতে নয় ভয়ে পিপলস্ অ্যাকশান পার্টিকে ভজেছে। বাঁকা কথা অবিশ্যি কিছু কিছু বিরোধীদের কোনো কোনো নেতা বলেছেন। তাঁদের মতে লোকে অন্য দলকে ভোট দেবে কোন্ সাহসে? সিঙ্গাপুর ছোট্ট জায়গা—এখানে কোনো খবরই লুকিয়ে রাখা যায় না। পিপলস্ অ্যাকশান পার্টিকে যদি কেউ ভোট না দেয় তা হলে তা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে আর তখন খোয়ারের শেষ থাকবে না তার। ব্যবসাদার হলে সে দেখবে তার বিরুদ্ধে কর ফাঁকির নালিশ দায়ের হয়েছে, ঠিকাদার হলে দেখবে তার পাওনা মিলছে না, উকিল হলে দেখবে মক্কেলরা সরে পড়ছে, চাকুরে হলে দেখবে তার চাকরি খতম। এ সব বেশীর ভাগই রটানো কথা—বিরোধীদের গায়ের জ্বালা মেটাবার চেষ্টা। গুণ্ডাবাজি করে লী গদি বজায় রাখার চেষ্টা করলে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠতো সিঙ্গাপুরে।

ধাপ্পা দিয়ে নির্বাচনে জেতেননি লী কুয়ান ইউ। সতেরো বছর তিনি যা করেছেন তাতে সিঙ্গাপুরের উন্নতি ছাড়া অবনতি হয়নি। ছোট্ট দেশটার লোকের জীবনযাত্রার মান বেশ উঁচু। সেটা সম্ভব হয়েছে শাসক দলের চেষ্টায়। লোকে কাজও পাচ্ছে, মাইনেকড়িও ভালো। লোকের মনে আত্মপ্রত্যয় জেগেছে, জেগেছে আত্মমর্যাদা। চার জাতের লোকের বসতি সিঙ্গাপুরে থাকলেও দাঙ্গা হাঙ্গামার বালাই সেখানে নেই। লী জাতে চীনে হলেও তাঁর দল পিকিংপন্থী নয়, চীনেদের দিকে নেক নজরও দেয় না। শাসক দল টিঁকে আছে কোনো জাতের দিকে ঢলে নি বলে। দলটা কোনো বিশেষ জাতের নয়, যারা সিঙ্গাপুরে থাকে তাদের সবাইয়ের। লী কমুনিস্ট নন বটে কিন্তু দক্ষিণপন্থীও নন। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী আর সেই আদর্শই তাঁর কাজে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাতে ফল পাওয়া যাচ্ছে বলেই লোকে তাঁর ওপর বিশ্বাস হারায়নি। হাতের সুখে ভাঙার ইচ্ছে যে তাদের নেই এটাই ভোটারদের রায়ে প্রমাণ হচ্ছে।

দেবরাজ

এক নজরে

ফুলের দিন হল রে অবসান

গিরিজাবাবু যখন কৃষিবিজ্ঞানে গবেষণা করে ডক্টর হন, তখনো এদেশে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে কৃষিবিদ্যার চর্চা সম্মানিত হয়নি। গিরিজাবাবু শুধু বিষয়টি নিয়ে ইংরেজী ও বাংলায় প্রয়োজনীয় 'বই-পুঁথিই লেখেননি, রাণাঘাটের কাছে কয়েক বিঘে জমি নিয়ে চমৎকার একটি কৃষি উদ্যানও তৈরি করেছিলেন। দেশ বিদেশের বিচিত্র ফল, ফুল, শস্য ও সবজীর সংগ্রহশালা রূপে সেই বাগানটির জুড়ি সে সময়ে গোটা ভারতবর্ষেই ছিল কিনা সন্দেহ। ঠিক মাঝখানে ডিম্বাকৃতি একটি সরোবর, তাতে সাদা লাল নীল নানা জাতের পদ্ম ও শালুক। বিরাট বিরাট পরাতের মত পাতাওয়ালা ভেনিস্যা পদ্ম। জলে সাঁতার ফিরছে এমডেন পাতিহাঁস, অস্ট্রেলীয় কাল হাঁস। আর এই সরোবরকে বেষ্টন করে মাথা তুলেছে পাইন সিডার এলম ইউ এবং ফার গাছ, সেই সঙ্গে বট অশ্বত্থ শিমুল, মেহগনী আবলুস ও বাওবাব একদিকে, অন্যদিকে আম জাম লিচু জামরুল গোলাপজাম আপেল নাশপাতি মোসম্বী পিচ পেয়ারা ও জলপাই গাছ। যেন বিশ্ব উদ্ভিদের মহা প্রদর্শনী। অনেকের মত আমিও এই বাগানে হাজির হতাম ফুরসৎ পেলেই। তা থেকেই বন্ধুত্ব গিরিজাবাবুর সঙ্গে।

কিন্তু হঠাৎ এক দমকা ঝড় তছনছ করে দিল গিরিজাবাবুর জীবন ও উদ্যান দুটিকেই। গিরিজাবাবুর সহধর্মিণী স্বপ্নময়ী মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারালেন। ঐ স্বপ্নময়ীর নাম অনুসারেই বাগানের নাম দিয়েছিলেন তিনি স্বপ্নপুরী। বাগানের রূপসজ্জার মধ্যেও ছড়িয়ে ছিল স্বপ্নময়ীর স্বপ্নই, কারণ তিনি ছিলেন শিল্পী, নন্দলাল বসুর স্নেহধন্যা ছাত্রী। এই বাগানে আর আকর্ষণ রইল না গিরিজাবাবুর। তিনি এটি বিক্রি করে কলকাতায় চলে এলেন এবং যেহেতু বাগানকে কেন্দ্র করেই আমাদের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মেছিল, তাই বাগানের অন্তর্ধান হতে হতেই তার উপরেও নেমে এল বিরতির পর্দা। বছর আটেক চলে গেল এরপর। কিংবা আরো বেশী হবে। বারাণসী সারনাথ মিউজিয়মে এরপর আকস্মিকভাবে দেখা গিরিজাবাবুর সঙ্গে। আমি চিনতে পারিনি। তিনিই আবিষ্কার করেন আমাকে এবং আচমকা হাত চেপে ধরে অবাক করে দেন। আপনি সুদর্শনবাবু, না? আমি রাণাঘাটের গিরিজা। অ্যাঁ, আপনি গিরিজাদা! তা এই বেশে কেন? তাঁর পরনে গেরুয়া, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পায়ে খাকী রঙের কেডস। পুরো সন্ন্যাসীর সাজ। গিরিজাবাবু বললেন, ঘর গেল, আশ্রয় গেল অবলম্বন গেল, আর কি নিয়ে থাকব? টাকা পয়সা হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কেন, দুটি মেয়ে তো ছিল, তাদের নিয়ে ডোভার রোডের বাড়িতে তো থাকতে পারতেন অনায়াসেই, আমি বললাম আমতা আমতা করে। গিরিজাবাবু শুনে চুপ করে থাকলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, ওরা থাকলে তো ভালই হত, ওরাও নেই। সপাং করে যেন চাবুকের মত মুখের ওপর এসে পড়ল কথাটা। চমকে বললাম, সে কি? কি হয়েছিল তাদের? মনে পড়ল বার-তের বছরের সেই দুটি ফুটফুটে মেয়ে সুমিত্রা আর সুনেত্রার সুন্দর মুখ দুটি!

গিরিজাবাবু বললেন, আজ নয়, শনিবার বিকেলে দশাশ্বমেধে আসুন, বলব সব। দু চারটি সাধারণ কথাবার্তার পর বিদায় নিলেন তিনি। কিউরেটার মহাশয়ের সঙ্গে অসমাপ্ত আলোচনাটা ঝালিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম আবার। কিন্তু মেজাজটা খুঁজে পেলাম না আর। গিরিজাবাবু মনটাকে বড্ডই নাড়া দিয়েছিলেন আমার। সমারোহময় উৎসব-মণ্ড থেকে রিক্ত মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন যেন তিনি শূন্য হাতে। যাই হোক শনিবার বিকেলে সত্যিই এলেন গিরিজাবাবু এবং একটা নিরিবিলি কোণা বেছে নিয়ে নিজে বসলেন, বসালেন আমাকে। বললেন, মেয়েদের কথা বলেছিলেন তো। তারা মারা যায়নি, জীবিতই আছে। হয়ত তাদের আদর্শ অনুযায়ী ভালই আছে। কিন্তু আমার জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাই আমার হিসাবখাতায় আর নেই তারা। বললাম, এ তো হয়ই গিরিজাদা। মেয়েরা খায় দায়, লেখাপড়া শেখে, স্নেহ-ভালবাসায় মানুষ হয়। তারপর চলে যায় একদিন পরের ঘরে এবং সেটাই হয় তাদের আসল ঘর। বাপ-মার কথা মনে কখনো পড়ে, কখনো পড়ে না। কিন্তু বাপ-মা কি বিরূপ হতে পারেন সে জন্যে? তাঁদের তো স্নেহের ঋণ টেনেই যেতে হয় জীবনভোর। গিরিজাবাবু স্থির হয়ে শুনলেন, তারপর বললেন, সাধারণভাবে কথাটা তাই বটে। কিন্তু সুদর্শনবাবু, দেয়ার মে বি থাউজান্ড অ্যান্ড ওয়ান আদার রিজনস, আরো রকমারি কারণ থাকে, যা দিয়ে বিরূপতা দানা বাঁধতে পারে। বলছি আপনাকে, তাহলেই বুঝবেন আমার আর কোন বিকল্প রাস্তা ছিল না।

স্ত্রী চলে যাবার পর বাগানটা আমার অসহ্য ঠেকতে লাগল। মনে হল, এর দিকে বেশীটা মনোযোগ দিয়েছি, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য দিই নি, তারই প্রত্যুত্তর দিয়েছেন তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করে। বিক্রি করে দিলাম বাগান এবং মেয়ে দুটোকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসে বসলাম। সুমিত্রার ভীষণ ঝোঁক সংস্কৃতের দিকে, তাকে দিলাম বিদ্যাপীঠে ভর্তি করে। সুনেত্রা ইংরেজীর ভক্ত, তাকে দিলাম লেডী ব্রেবোর্ন কনভেন্টে। সুমিত্রা আস্তে আস্তে হল নিষ্ঠাবতী শাস্ত্রসন্ধানী বিদুষী। গ্রাজুয়েট হওয়ার পর কান্নাকাটি করে বৃন্দাবনে প্রেম মহাবিদ্যালয়ে গৌড়ীয় দর্শন নিয়ে গবেষণা করতে চলে গেল সে এবং সেখানেই থেকে গেল, ভক্তি দেবী নাম নিয়ে। সুনেত্রা সিস্টার রোজেস দাক্ষিণ্যে বি-এ পাসের পর উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিলেত চলে গেল এবং গেল পুরোদস্তুর একটি মেমসাহেব হয়ে। সেও সেখানেই স্থায়ী আস্তানা পাতল, বিয়ে করল একজন সিন্ধী এঞ্জিনীয়ারকে। অর্থাৎ দুটি মেয়েই চলে গেল আমার নাগালের বাইরে। একজনকে প্রাচ্য ভাবধারায় গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, আর একজনকে প্রতীচ্য ভাবধারায়। দুজনেই হয়ত গড়ে উঠেছে তাদের প্রবণতা অনুযায়ী। কিন্তু আমার সমস্যাটাও ভাবুন, আমি তো তার ফলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম ওদের সংস্রব থেকে। তখন বাধ্য হয়েই সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে নির্মুক্ত হবার তপস্যায় লাগলাম। তার পরেই দাঁড়ালাম পথে এসে। হয়ত প্রচ্ছন্ন একটা অভিমানও ছিল, যা টের পাইনি।

শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, গিরিজাদা, বাবা হিসাবে আপনি এক জায়গায় ভুল করেছেন। ছেলেমেয়েদের নিজ নিজ প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী গড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হয় ঠিকই, কিন্তু কৈশোর যৌবনের সন্ধিকালটার নিয়ন্ত্রণের রাশ আপন হাতে রাখতে হয়। নইলে খেয়ালখুশির হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তারা বাপ-মার এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাবেই। গিরিজাবাবু বললেন, হয়ত তাই। হয়ত ওদের মা পাশে থাকলে সেই জোরটুকু পেতাম। তার অভাবেই ওদের পথে কোথাও বাধা সৃষ্টি করতে মন চায়নি। এখন বুঝতে পারছি ভুলই করেছি, কিন্তু কি আর উপায় আছে? হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবং হন হন করে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলেন অন্ধকার পথের দিকে। বসে বসে ভাবতে লাগলাম, তবে কি অশাসন ও অতিশাসন দুইয়েরই বর্গফল এক?

- সুদর্শন গুপ্ত

সূর্য ও সময়

পূর্ণেন্দু পত্রী

হয়তো সূর্যের দোষে আমাদের রক্ত আর ততখানি অগ্নিবর্ণ নয়।
নিমের পাতার মত নুয়ে গেছে হাত আর হাড়
কবে কবে কমণ্ডলু ভরে গেছে কার্তিকের হিমে, হাহাকারে।
যে সব পাখিরা আগে মারা গেছে আকাশের আলোর উঠোনে ধান খুঁটে
সেই সব পাখিদের পালকের শতছিন্ন আঁশ
সেই সব পাখিদের দুবেলার কথাবার্তা, দুঃখ, দীর্ঘশ্বাস
বাতাসের ভীড় ঠেলে এখন ক্রমশ এসে আমাদেরই কাছে ঠাঁই চায়।
আমাদের প্রতিদিন চুরি হয়ে যায়
জমানো টাকার মত স্বপ্ন, সাধ, সম্ভাবনা, সৎ অভিপ্রায়।
সবই কি সূর্যের দোষে? সময়েরও বহু দোষ ছিল।
সময়ের এক চোখে ছানি ছিল অবিবেচনার
জিরাফের গলা নিয়ে সে শুধু দেখেছে দীর্ঘ অট্টালিকা, কুতুব মিনার
দেখেছে জাহাজ শুধু, জাহাজের মাস্তুলের কারা কারা মেসো পিসে খুড়ো
দেখেনি ধুলো ও বালি, ভাঙা টালি, কাঁথা-কানি, খড় খুদ কুঁড়ো
দেখেনি খালের পাড়ে, ঝোপে ঝাড়ে, ছেঁড়া মাদুরিতে
আরও কি কি রয়ে গেছে, আরো কার ঊর্ধ্বমুখী সূর্যমুখী হতে চেয়েছিল
কাল বৈশাখীর ক্রুদ্ধ বিরুদ্ধতা ঠেলে।
সময়েরই দোষে
আমাদের বক্ষ থেকে সমস্ত আগুন খসে গেল
যে রকম বাগানের ইচ্ছে ছিল পাথরের, কাঁকরের বর্বরতা ভেঙে
যে রকম সাঁতারের ইচ্ছে ছিল জলে স্থলে সপ্তর্ষিমণ্ডলে
যে রকম ভ্রমণের স্বপ্নে ছিল, হৃদয়ের কৌটো ভর্তি ছিল
ক্রমে ক্রমে সূর্য ম্লান
ক্রমে ক্রমে সময়ের সমস্ত খিলান
পোকার জটিল গর্তে, ঘুণে, খুনে জীর্ণ হল বলে
সোজা ঘাড়ে শাল ফেলে আমাদের সে রকম হাঁটা-চলা বাকী রয়ে গেল।
আবার এমনও হতে পারে
আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আলিঙ্গন, অঙ্গীকার, উষ্ণতার তাপ
কিছুই পায়নি বলে সূর্য ও সময়
প্রতিদিন নিজেদের সমুজ্জ্বল প্রতিভাকে ক্ষয় করে করে
বেদগানে যে রকম শোনা গিয়েছিল, আর ততখানি অগ্নিবর্ণ নয়।

মিথ্যা

মানস রায়চৌধুরী

আমি তো মেঘলা দিন বুকে নিয়ে আছি
সূর্য ডোবে প্রতিদিনই, আঁধারে মৌমাছি
গভীর সবুজ ফলে সোনালী রসের স্বপ্ন খোঁজে
আমি ভাবি, এত দুঃখে এই পথে কেন এলো ও যে!
চায়ে মাপি একটি চামচ চিনি, দুঃখে তাকে চিনি
কফির পেয়ালা জুড়ে দুধহীন পানীয় অসীম বিরহিনী
কে কোথায় বলে ওঠে—রামধনু, রামধনু দূরে
সমস্ত শহর যেন জেগে ওঠে দ্রুত অশ্বক্ষুরে
কোথায় রামধনু? কই বৃষ্টি? দূরে কোথায় বর্ণিল
সাতরঙা জলোচ্ছ্বাস—পরিবর্তে মধ্য দিনে ডেকে যায় চিল
একজন মাথা নীচু, মৃদু গলা অকুণ্ঠিত দেখি নেয় মেনে,
"মিথ্যা কিছু প্রয়োজন ছিল" এই সত্য বুকে যায় হেনে।

আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলন : ডি ভ্যালেরা ও নেতাজী

কৃষ্ণা বসু

"প্রকৃতপক্ষে আমার দেশের কত লোক লণ্ডনে যান অথচ ডাবলিনে যেতে তাঁরা কোন উৎসাহ দেখান না। সেখানে গেলে যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং এখনো করে চলেছেন এমন সব নরনারীকে তাঁরা রক্তমাংসে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন।"

মিসেস উডস নামে এক আইরিশ মহিলাকে ভিয়েনা থেকে লেখা এক চিঠিতে নেতাজী দুঃখ করে একথা লিখেছিলেন ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। তার মাস-খানেকের মধ্যেই ১৯৩৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী নেতাজী নিজে আয়ারল্যাণ্ডে এসে উপস্থিত হলেন। ফ্রান্সের 'হাভর' বন্দর থেকে আমেরিকান জাহাজ 'এস এস ওয়াশিংটন' এ চড়ে তিনি আয়ারল্যাণ্ড আসেন। তাঁর এবারের য়ুরোপ সফরের সময় তাঁকে কিছুতেই ইংলণ্ড আসতে অনুমতি দেওয়া হল না। কিন্তু ডি ভ্যালেরার আইরিশ ফ্রি স্টেট তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

আয়ারল্যাণ্ডে পৌঁছেই নেতাজী কর্ক শহরে সেখানকার প্রাক্তন লর্ড মেয়র টেরেনস ম্যাকসুইনির সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। আমাদের দেশে যেমন শহীদ যতীন দাস লাহোরে ইংরেজের কারাগারে আমৃত্যু অনশন করেছিলেন, প্রায় একই রকম ভাবে আইরিশ দেশপ্রেমিক টেরেনস ম্যাকসুইনি আটাত্তর দিন অনশন করে প্রাণত্যাগ করেন। যতীন দাসের আত্ম-ত্যাগের খবর যখন আয়ারল্যাণ্ডে পৌঁছয় তখন এই ম্যাকসুইনি পরিবার তাঁদের নিজেদের সেই ট্রাজেডির কথা মনে রেখে এক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী শোক-বার্তা ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন।

"Family of Terence Macswiney have heard with grief and pride of the death of Jatin Das. Freedom will come."

"টেরেনস্ ম্যাকসুইনির পরিবার বেদনা ও গর্বের সঙ্গে যতীন দাসের মৃত্যুর খবর শুনেছেন। স্বাধীনতা আসবেই।"

এ সব হল ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর মাসের কথা।

সেই কথা স্মরণে রেখে সুভাষচন্দ্র প্রথমেই ম্যাকসুইনির সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন, তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন, তাঁর বোন মিস্ ম্যাকসুইনির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হল। কর্ক শহরের তখনকার লর্ড মেয়র সিয়ান ফ্রেঞ্চ তাঁকে শহরে স্বাগত জানালেন।

নেতাজী পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রের কাছেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। যখনই আমরা নেতাজীর জীবনের এই দিকটির কথা আলোচনা করি আমাদের চোখে ভেসে ওঠে বার্লিন রোম বা টোকিও। কিন্তু য়ুরোপের অনেক ছোট ছোট দেশ যেমন চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া অথবা পৃথিবীর মানচিত্রের এক কোণায় পড়ে থাকা ছোট্ট দ্বীপ আয়ারল্যাণ্ড—

Emerald Isle of Eire —এরাও যে নেতাজীর প্রতি তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি কত বন্ধুত্বপূর্ণ ও কত সহানুভূতিশীল ছিল তা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই।

একদিক থেকে দেখলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আইরিশ বিপ্লবের প্রভাব বিশেষ কৌতূহলজনক। যেমন ভারতীয় বিপ্লবীরা তেমনি সেই বিপ্লব যাঁরা দমন করতেন সেই ব্রিটিশ শাসকেরা উভয়পক্ষই আইরিশদের কাছে অনেক কিছু শিখেছিলেন। আইরিশ বিপ্লবীদের বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠন ও গুপ্ত আন্দোলন থেকে

ডাবলিনে সুভাষচন্দ্র (১৯৩৬)

ভারতীয়েরা এই ধরনের আন্দোলন পরিচালনায় প্রেরণা পেতেন—এ কথা সুভাষচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন।

"বিশেষ করে আমি ভারতের যে অঞ্চলের লোক — সেই বাংলাদেশে—এমন কোন শিক্ষিত পরিবার নেই যেখানে আইরিশ দেশপ্রেমিকদের সম্বন্ধে বই পড়া না-হয়—বলা উচিত গোগ্রাসে পড়া হয়। আজকাল আয়ারল্যান্ডের ওপর বই পাওয়া ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে কারণ গভর্নমেন্ট মনে করে ভারতীয় জনগণের জ্ঞানচক্ষু আইরিশ বিপ্লবীরা খুলে দেবে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি, যে সব বই কষ্ট করে যোগাড় করতে হয় সে সব বই আরো উৎসাহের সঙ্গে পড়া হয়ে থাকে।"

এদিকে ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁদের আইরিশ আন্দোলন দমনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতেন ভারতীয় বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়নে। এর সব চাইতে বড় উদাহরণ স্যর জন এনডারসন। এনডারসন বাংলাদেশে বিপ্লবীদের দমন করতে আসার আগে হাত পাকিয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডে। তিনি ছিলেন কুখ্যাত 'ব্ল্যাক অ্যানড্ ট্যান' সেনাদলের অধিনায়ক। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যখন আইরিশ সিনফিন্ আন্দোলনের নেতা আর্থার গ্রীফিথ ও মাইকেল কলিনস্ স্বাধীন আইরিশ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করলেন এবং আলাদা করে ডাবলিনে আইরিশ পারলামেন্ট স্থাপন করলেন তখন এই আন্দোলন দমন করতে যে ইংরেজ সেনাদল পাঠানো হয়েছিল তারা 'ব্ল্যাক অ্যানড্ ট্যানস্' নামে পরিচিত।

আন্দোলনকারী এবং আন্দোলন দমনকারী দু'পক্ষেরই উৎসাহের কেন্দ্রভূমি ডাবলিন শহরে প্রায় প্রতীকি ভাবে দেখা হয়ে গেল সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এক কালের জেল সুপারিনটেনডেন্ট লেফটেনান্ট কর্নেল স্মিথের সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র উঠেছিলেন শেলবোর্ন হোটেলে। সেই হোটেলেই স্মিথ সাহেবের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। নেতাজী যখন মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন তখন স্মিথ ছিলেন জেলের সুপারিনটেনডেন্ট।

'আইরিশ প্রেস' ফলাও করে এই দেখা হওয়ার খবর ছেপেছিল।

"The two men had a talk and exchanged views on their last meeting in different circumstances."

নেতাজীর এই আইরিশ সফরের সময় অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে পর পর তিনবার ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ডাবলিন ছেড়ে যাবার আগে চতুর্থবার ও শেষবার যে দেখা হওয়ার কথা ছিল তাতে একটা বাধা পড়ল। ব্রায়ান ডি ভ্যালেরার মৃত্যুতে ওঁদের ওপর পারিবারিক শোকের আঘাত এসে পড়ল। কাগজপত্রে দেখছি খবর পেয়ে নেতাজী তৎক্ষণাৎ শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ডি ভ্যালেরাকে এবং খবর কাগজে লিখছে খুব সম্ভবত উনি শোকজ্ঞাপন করতে নিজে একবার যাবেন।

প্রথম সাক্ষাৎ-এর পর খবরের কাগজের লোকেরা সুভাষকে ঘিরে ধরেছে ডি ভ্যালেরা সম্পর্কে ওঁর ইমপ্রেশন কেমন হল জানতে সবাই উৎসুক। সুভাষচন্দ্র ওঁকে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন ওঁর একমাত্র দুঃখ কেন আরো আগে দুজনে দেখা হল না।

"Your President," he said, "is a charming personality. I am very pleased to have had this opportunity of meeting him. My only regret is I could not see him earlier."

ডি ভ্যালেরার সঙ্গে আগে দেখা না হলেও দুজনেই দুজনের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৯৩৫ সালের গোড়ায় অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হবার প্রায় এক-বছর আগে আমরা দেখি ডি ভ্যালেরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সুভাষচন্দ্রের সদ্য প্রকাশিত বই "ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল" পড়ছেন। সে সময় বইটির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বইটি হাতে পেয়ে ডি ভ্যালেরা বলছেন—

"I hope that in the near future freedom and happiness will come to the Indian people."

সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তখন ভিয়েনাতে রয়েছেন। শীগগিরই তার একটা বড় অপারেশন হবে। তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য ডি ভ্যালেরা বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন।

ডি ভ্যালেরা ছাড়াও বিভিন্ন আইরিশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ

হল আয়ারল্যান্ড সফরের সময়। কৃষিমন্ত্রী রায়ানের সঙ্গে আলোচনা হল কিভাবে ভারতকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করা যায় সে বিষয়ে। ভারতীয় পাটচাষীদের অবস্থা নিয়েও অনেক কথা হল। শিল্প ও বাণিজ্য-মন্ত্রী লেমাসের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলো-চনা হল ভারতবর্ষ ও আইরিশ ফ্রি স্টেটের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয় নিয়ে। মিঃ সিয়ান ও কেলি তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল যে ভারতবর্ষ ও আয়ারল্যান্ড য়ুনিভার্সিটি অধ্যাপক বিনিময় করবে। লেবার পার্টির নেতা মিঃ নর্টনের সঙ্গে আলোচনা হল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিয়ে। এরই ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজে ইনটারভিউ দিলেন ভারতবর্ষে মেয়েদের অবস্থা সম্বন্ধে।

একদিন সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়া হল আইরিশ পার্লামেন্ট ডয়েলের (Dial) অধিবেশন দেখতে। স্ট্রেনজারস্ গ্যালারীতে বসে তিনি অধিবেশন দেখলেন। আর এক-দিন ডাবলিনের লর্ড মেয়রের আমন্ত্রণে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্র গেলেন কর্পোরেশনের মিটিং দেখতে।

ইণ্ডিয়ান-আইরিশ ইনডিপেনডেনস লীগ সুভাষচন্দ্রের সম্মানে ব্রডওয়ে রেস্তোরাঁয় এক বিরাট সভার আয়োজন করেছিলেন। এই সভায় লীগের সভাপতি মাদাম ম্যাকব্রাইড সুভাষচন্দ্রকে স্বাগত জানিয়ে বক্তৃতা করলেন। আর ধন্যবাদ দিতে উঠে আলেকস্ লীন্ একটি ভারী সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বললেন, কবে ডাবলিন শহর কলকাতা নগরীর মত সম্মান লাভ করতে পারবে? অর্থাৎ কবে ডাবলিনের মেয়রকে গ্রেট ব্রিটেনে ঢুকতে অনুমতি দেওয়া হবে না!

সুভাষচন্দ্রকে একজন 'বিপজ্জনক ব্যক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করে ব্রিটিশ সরকার কিছুতেই তাকে ইংলণ্ডে আসার অনুমতি দেন নি। লীন সাহেব তারই উল্লেখ করে-ছিলেন। যদি শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে যাবার অনুমতি মেলে এই কথা ভেবে সুভাষচন্দ্র তাঁর আয়ারল্যান্ড সফরের সব ব্যবস্থা একটু গোপনে করেছিলেন। কারণ, ইংরেজরা ভাবতে পারে উনি আয়ারল্যান্ডে গিয়ে হয়ত কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন। তাই চিঠিপত্রে মিসেস উডসকে শুধু একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিচ্ছেন উনি কাদের সঙ্গে দেখা করতে চান— 'You know whom I mean!'

নেতাজীর আয়ারল্যান্ড সফর এত সফল হয়েছিল কারণ তার পিছনে ইণ্ডিয়ান-আইরিশ ইনডিপেনডেন্স লীগের ছিল অক্লান্ত প্রচেষ্টা। এই লীগ গঠন করে-ছিলেন বিঠলভাই প্যাটেল। মাদাম ম্যাক-ব্রাইড এর সভাপতি আর মিসেস উডস এর সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে য়ুরোপে বিঠলভাইর মৃত্যু হল। কিন্তু তিনি সুভাষচন্দ্রকে ভার দিয়ে গেলেন এই কাজ চালু রাখার। শুধু তাই নয়, য়ুরোপে পরাধীন ভারতবর্ষের প্রচার কাজ চালাবার জন্য তাঁর উইলে তিনি সুভাষ-চন্দ্রের নামে আলাদা করে বিপুল অর্থ রেখে গেলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কোন কো-মহলের বিরোধিতার জন্য সে অর্থ সুভাষ-চন্দ্রের হাতে কোনদিন আর পৌঁছয়নি দেখতে পাই মাদাম ম্যাকব্রাইড জানিয়েছেন লীগের কাজের জন্য অর্থাভাব হয়েছে

ডি ভ্যালেরা ও শরৎচন্দ্র বসু

নববর্ষের প্রতিজ্ঞা (ভাঙবার জন্য ?)

১। সি, এম, ডি, এ-কে গাল না দিয়ে জল (অথবা চা) গ্রহণ করবো না—তবে রাস্তার কলে বা বাড়ীর কলে জলের অপচয় বন্ধ করবো। দরকার হলে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পকেট থেকে ২/৫ টাকা খরচ করেও রাস্তার কলে ট্যাপ বসাবো।

২। সিগারেট খাওয়া বন্ধ করবো না—কারণ পারবো না। তবে সিগারেটের টুকরো, প্যাকেট, দেশলাই কাঠি সব পকেটে রাখবো। দিনের শেষে ডাস্টবিনে বা আস্তাকুঁড়ে ফেলবো।

৩। টিকিট কিনে ট্রামে-বাসে চড়বো। তবে পুরোনো টিকিট পকেটে বা ব্যাগেই রাখবো, দিনের শেষে ডাস্টবিন বা আস্তাকুঁড়ে ফেলবো।

৪। খাটালের দুধ কিনবো না—খাবো না। খাটাল উচ্ছেদে সাহায্য করবো। কলকাতায় গরুর সংখ্যা বেড়ে গেছে...কমাতে হবে (সি, এম, ডি, এ-কে অবশ্য হিসেবের মধ্যে ধরা হচ্ছে না)

৫। কলকাতার নিন্দে শুনবো না, হতে দেবো না। রাস্তায়-ঘাটে, বাসে-ট্রামে অক্ষম, দুর্বল আর বাচ্চাদের সাহায্য করবো—এমন কি যদি 'সিট' ছাড়লে সুন্দরী মহিলারা সেই 'সিটে' নাও বসেন বা যদি সহযাত্রীদের কাছ থেকে টিটকিরি খেতেও হয় (সুন্দরী মেয়েদের দেখে সিটকিরি দেবার 'স্বাধীনতা' তো আমাদের আছেই...)

৬। বিদেশী বা অন্য রাজ্যবাসী কলকাতায় বেড়াতে এলে হাঁ করা মুখ দেখে বা হ্যা-হ্যা করা হাসি না শুনে, আমাদের কাছে পাবেন কলকাতার যাত্রা, থিয়েটার, এবং জীবন দেখবার সুযোগ। তাঁদের বলবো, কলকাতা দেখতে চান? দেখিয়ে দেবো?

৭। ফুল, ঘাস, গাছ কেবল গরু-ছাগলের জন্যই নয়, আমাদের জন্যও। দরকার হলে আমের আঁটি বা তেতুল বীচি থেকেও গাছ বানাবো কিন্তু কলকাতাকে সবুজ করবোই...

৮। রাস্তায় পেচ্ছাব করতে বসবো না, শুধু পুলিশের ভয়ে নয়, নিজের ইচ্ছাশক্তি এবং মাসল-কনট্রোলের পরিচয় দেবার জন্যও।

৯। নিজের বাড়ী পরিস্কার রাখবো তবে জঞ্জালটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলবার আগে অন্তত একবার ভাববো। সি, এম, ডি, এ-র মাথা পেলে বা ডাস্টবিন পেলে ভাববার দরকার নেই...

১০। কলকাতার কি কি উন্নতি হচ্ছে, তার ফিরিস্তি না জেনেই সি, এম ডি, এ আর ভোলা সেনের শ্রাদ্ধ করবো, আর যেখানে উন্নতি হয়েছে বা হচ্ছে, সেখান দিয়ে যাবার সময় চোখ বন্ধ করে যাবো (যেমন হাওড়া সুরঙ্গ পথ, চেতলা সেতু, অরবিন্দ সেতু, বিধাননগর বঙ্কিম সেতু, দ্বিতীয় হুগলী সেতু, পাতাল রেল...)

১১। সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপন পড়ে, হাসবো আর বলবো, কাজের চেয়ে প্রচার বেশী (গাজনের চেয়ে বাজন বেশী) একবারও ভাববো না, যে ঢাকটা হচ্ছে কলকাতার জয়ঢাক, ঐ সংস্থার নয়।

সুভাষচন্দ্র দুঃখ করে জানাচ্ছেন, টাকার ব্যবস্থা তো সবই ছিল কিন্তু তা আর হল কই ?

মাদাম ম্যাকব্রাইড ও মিসেস উডস লীগের পক্ষে আইরিশ জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। বলছেন৷ ভারতীয় নেতারা তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজ আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করছেন, তাঁদের যেন শূন্য হাতে ফিরতে না হয়। যে সব লক্ষ লক্ষ আইরিশ আমেরিকাতে এবং পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে তাদের সকলকে আমরা আহ্বান করছি ভারতীয় সংগ্রামের ডাকে সাড়া দিতে।

ওঁরা বুলেটিন প্রকাশ করতেন। আইরিশ প্রেস কাগজে ভারতীয় সংবাদ, বিশেষ করে ব্রিটিশদের অত্যাচার, অবিচারের খবর প্রচার করতেন। সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরবার পর বোম্বাই বন্দরে যখন গ্রেপ্তার হলেন তখন সেই খবর দিয়ে আইরিশ কাগজে প্রকাশের জন্য একটি লেখা পাঠাচ্ছেন ভিয়েনা থেকে শ্রীমতী এমিলি শেংকল। মিসেস উডসকে তিনি লিখছেন, আমি সুভাষচন্দ্র বসুর উপর একটি আর্টিকল পাঠালাম। প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন—

"It is a shame how he is treated by the British."

আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী খবর কাগজ "আইরিশ প্রেস" সুভাষচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল তাঁদের অফিসে। সেখানে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী দৈনিকগুলির সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র এসেছিলেন আমেরিকান জাহাজে। ফিরেও গেলেন আর একটি আমেরিকান জাহাজে "প্রেসিডেন্ট হার্ডিনজ"। কিন্তু পিছনে রেখে গেলেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ আইরিশ বন্ধুবান্ধব এবং আয়ারল্যান্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্র। তিনি ডাবলিনে আর আসেন নি, যদিও ডি ভ্যালেরার সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হল ১৯৩৮-এর জানুয়ারিতে। এবারের দেখা হল ইংলন্ডে।

সুভাষচন্দ্রকে আয়ারল্যান্ড কতটা মনে রেখেছে তা বোঝা যায় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে শরৎচন্দ্র বসু যখন আয়ারল্যান্ডে আসেন তখন। ডি ভ্যালেরা, মাদাম ম্যাকব্রাইড, তখনকার প্রেসিডেন্ট সিয়ান ওকেলি সকলে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের দেখা হওয়ার কথা বলেন। আর এইসব আইরিশ নেতারা জানতে চান ভারত বিভাগ সম্পর্কে সব কথা আর দেশ ভাগের পর ভারতের অবস্থা কি? এ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মতামত তাঁরা ভালভাবেই জানতেন।

যাই হোক, দশ বছর আগের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। সুভাষচন্দ্র সেবার

ইংলণ্ডে যাবার অনুমতি পেয়েছেন। তখন তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদে সবে বৃত হয়েছেন। তিনি অস্ট্রিয়া থেকে চিঠিপত্র লিখছেন একবার ডাবলিনে গিয়ে ডি ভ্যালেরার সঙ্গে দেখা করে আসবেন। সব ব্যবস্থা খুব গোপনে করা হচ্ছে। কারণ, তিনি অনেকদিন পর ইংলণ্ড যাবার অনুমতি পেয়েছেন তা নিয়ে আবার কোন গোলমাল হয় আর চান না। মিসেস্ উডসকে লিখছেন, খুব গোপনে সব ব্যবস্থা করতে হবে। যাত্রা সংক্রান্ত সব চিঠি শীলকরা খামে রেজিস্ট্রি ডাকে যেন পাঠানো হয় ওঁর বাদগাস্টাইনের ঠিকানায়। খামের ওপর ও'র নিজের নাম যেন লেখা না হয়। লিখতে হবে শ্রীমতী এমিলি শেংকলের নাম। আবার একটা শীলকরা খাম মিসেস উডসকে ফেরৎ পাঠিয়ে জানতে চাইছেন ঠিক ঐ ভাবেই শীল ছিল, না কেউ ঘাটা-ঘাটি করেছে মনে হয়।

যাই হোক, সে সময় ডি ভ্যালেরা লন্ডনে আসাতে সেখানেই সাক্ষাৎ-এর ব্যবস্থা হয়। ১৬ই জানুয়ারি লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র জানাচ্ছেন—
"Had a meeting with De Valera last night. We had a long talk."

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের কোন ছবি নেই। দ্বিতীয়বার ডাবলিন যাবার গোপন ব্যবস্থা যখন চলছিল তখন সুভাষচন্দ্র নিজেই বলছেন, গতবার দেশের খবর কাগজ একটা একসঙ্গে ছবি চেয়েছিল, এবার একটা ব্যবস্থা করাতে হবে। কিন্তু লন্ডনে এই শেষ সাক্ষাতের কোন ছবি নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবী জুড়ে। এই যুদ্ধের মধ্যেও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের যোগা-যোগ বিচ্ছিন্ন হল না। ১৯৪৩-এর ২১শে অক্টোবর নেতাজী আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করলেন। জাপান, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি পৃথিবীর নটি রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিল এই সরকারকে। আর আয়ারল্যান্ড পাঠালে অভিনন্দন।

এই যে যুদ্ধের সময় নেতাজী জার্মান সহযোগিতা চাইলেন এর মধ্যেও রয়েছে আইরিশ প্রভাব। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী আয়ারল্যান্ডকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্ত্র সাহায্য দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে এক ঘোষণাপত্রও তারা লিখে দেয়। একইভাবে দেখি নেতাজী হিটলারের কাছে ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে ঘোষণাপত্র দাবী করছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বার্লিনে ব্রিটিশ দূত ছিলেন স্যার রোজার কেসমেট। স্যার রোজার এই ঘোষণাপত্র নিয়ে সাবমেরিন করে এসে আইরিশ উপকূলে নামেন। ইতি-

PROMINENT INDIAN'S VISIT

HOPES TO MEET PARTY CHIEFS

Mr. Subhas Chandra Bose, President of the Bengal Congress, former President of the Indian Trade Union Congress, and former Mayor of Calcutta, arrived in Dublin from Cork yesterday evening. He travelled from Havre to Cork, having been refused a permit to travel to England.

MR. SUBHAS CHANDRA BOSE photographed in his hotel on arrival in Dublin last night.

WEEK-END REST.

NEW CONGRESS PRESIDENT.

RAIL PORTER'S INJURY

INDIA AND IRELAND.

"Irish Independent" 2. 2. 36

"আইরিশ ইনডিপেনডেন্ট কাগজ (২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬)

হাসের মধ্যে যে অস্ত্র সাহায্য জার্মানী থেকে আসছিল তা ইংরেজরা আটকে ফেলে। ১৯১৬ সালে বিখ্যাত ইস্টার অভ্যুদয় এই কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। স্যার রোজার ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন। আইরিশ ইতিহাসের এই অধ্যায় যে নেতাজীকে অনু-প্রাণিত করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বাংলাদেশে যখন দুর্ভিক্ষের হাহাকার, আজাদ হিন্দ সরকার রেডিও মারফৎ খাদ্য পাঠাবার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁদের সেই আগ্রহে কোন সাড়া মেলে নি। এমন সময় খবর পাওয়া গেল আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছে। এ খবরে একান্ত অভিভূত হয়ে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ বেতারে আয়ারল্যান্ডকে ধন্যবাদ দিয়ে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন।

আজাদ হিন্দ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে আয়ারল্যান্ড যখন বার্তা পাঠালো তখনো এক বেতার ভাষণে তিনি ধন্যবাদ পাঠালেন। এই ভাষণে তিনি উল্লেখ করলেন, ১৯১৬ সালে আইরিশ বিদ্রোহের

আগে আইরিশ দেশপ্রেমিকেরা যেমন অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন, আজ আমরাও তেমনি স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেছি।

নেতাজী এক সাবধান বাণী সেদিন উচ্চারণ করেছিলেন যা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন করে আয়ারল্যান্ডকে দ্বিখণ্ডিত করেছে যদি এ যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জয়লাভ করে তবে ভারতের ভাগ্যেও সেই একই দুঃখজনক ব্যাপার ঘটবে। নেতাজীর সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে গেল।

যাই হোক, সেদিন আইরিশ রিপাবলিকান বন্ধুদের প্রতি যে বার্তা উনি পাঠিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন—আমরা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছি, আমাদের জন্মগত অধিকার আমরা দাবী করছি। তার জন্য যেকোন মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত। জয় আমাদের সুনিশ্চিত। স্বাধীনতা আসবেই।

"Our cause is Just. Our demand is for our birthright. We are prepared to pay the price. We shall, therefore triumph. Freedom will come."

॥ ১৩ ॥

এই দু'দিন আগে যে শিউপুজনকে আমি চিনতাম না পর্যন্ত তার জীবনের সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে পড়বো তা কে জানতো! মনে হয়েছিল শিউপুজন যেন আমারই এক রূপান্তর। সকলের জীবনের সব সুখ-দুঃখ নিজের কাঁধে তুলে নিতে পারবো এত বড় কাঁধ আমার নয়। অথচ লেখক যখন হয়েছি তখন তা অস্বীকার করলে চলবে না।

গাড়িটা থামিয়ে পুরুষোত্তমজী বললেন—কে? কে শিউপুজন?

বললাম—এই মরিশাসেরই একজন টিচর—

অপরানন্দজী বললেন—আপনি কেন নামছেন? আমি দেখছি—আপনি গাড়িতে বসুন—

বললাম—বুঝতে পারছি না ঠিক শিউপুজন কিনা। কিন্তু ওকে আমার দরকার।

পুরুষোত্তমজী বললেন—শিউপুজনের সঙ্গে আপনার কোথায় পরিচয় হলো?

বললাম—এখানে।

আমাকে নিরস্ত করে অপরানন্দজী নিজে রাস্তায় নামলেন। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। আখের ক্ষেতের মধ্যে অপরানন্দজী ঢুকে গেলেন।

মরিশাসে এসে হাসিমুখ একটি লোককেই দেখেছি তিনি হচ্ছেন অপরানন্দজী? আর দ্বিতীয় জন হচ্ছে জালিম।

খানিক পরে দেখলাম অপরানন্দজী ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এলেন। কেউ নেই, কোনও মানুষই নেই কোথাও। আর তা ছাড়া আমার মনের ভুলও তো হতে পারে। আমি সমস্ত দিনটা শিউপুজনের কথাই ভাবছিলাম, তাই হয়তো শিউপুজনই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সমস্ত মানুষই তো নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। মানুষের দুটো সত্তা। খানিকটা তার পশুত্ব আর বাকিটা তার মনুষ্যত্ব। মানুষের মধ্যে যে পশুটা আছে সে কেবল বলে তুমি তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকো। তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথাই কেবল ভাবো। তোমার মেয়ের বিয়ে তোমার ছেলের চাকরি, স্ত্রীর গয়নার ভাবনা নিয়েই মত্ত থাকো।

কিন্তু মানুষের মনের ভেতরে যে একটা আস্ত মনুষ্যত্ব থাকে সে বলে তোমার একলার সুখের কথা ভাবলে চলবে না। তোমার আশে-পাশের সকলের মঙ্গলের কথাও ভাবতে হবে। সেই সুখের কথা যারা বর্জন করতে পারে তারাই সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বের মঙ্গল-কামনা করে।

ফরাসী লেখক ভলটেয়ার এমনই এক লেখক যিনি নিজের সুখের চেয়ে বিশ্বের মঙ্গলই বেশি চেয়েছিলেন।

তাই ভলটেয়ারের জীবনী লেখক লিখেছেন—পৃথিবী যে এখনও অমানুষে ভরে যায়নি, পৃথিবীতে এখনও কিছু মুষ্টিমেয় সৎ মানুষ আছেন তার সমস্ত কৃতিত্ব ভলটেয়ারের রচনাবলী।

শুধু ভলটেয়ার সম্বন্ধেই যে একথা প্রযোজ্য তা নয়, পৃথিবীর তাবৎ মুনি-ঋষি লেখক জ্ঞানী-গুণী, সকলের সম্বন্ধেই সেই একই কথা। নইলে চৈতন্যদেব কেন চণ্ডালদের কথা ভেবেছিলেন? হরিজনদের কথা কেন ভেবেছিলেন গান্ধীজী? ব্যারিস্টারি বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে বেশ আয়েশের সঙ্গেই তো দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন গান্ধীজী। তথাগত বুদ্ধদেবকে কে এমন কী মাথার দিব্যি দিয়েছিল যে রাজার ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তাঁকে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে মানুষের মুক্তির উপায় খুঁজে বার করতে হবে।

এই পুরুষোত্তজী আর অপরানন্দজীকে দেখেও আমার তাই-ই মনে হলো। কোথায় কোন সুদূর পাঞ্জাবের অধিবাসী পুরুষোত্তমজী, আর কোথায় কোন বাংলা-দেশের অধিবাসী এই অপরানন্দজী! কে এঁদের এই মরিশাসে এসে সেবা-ধর্মের বোঝা মাথায় তুলে নিতে বলেছিল! সারা পৃথিবীতে যখন স্বার্থের তাগিদে মানুষের পণ্ডশ্রমের সীমা নেই, মামলা মকদ্দমা, প্রবঞ্চনা ; ভণ্ডকতা নিয়ে মানুষে মানুষে দেশে দেশে রেষারেষির কামাই নেই তখনই হয়েছিল একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের আবির্ভাব।

অপরানন্দজী বললেন—শিউপুজনের সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কী করে?

বললাম—নেহাৎই ভাগ্যচক্রে। নইলে দু-দিন আগেও আমি ওকে চিনতাম না—

পুরুষোত্তমজী বললেন—শুনেছি ও খুব কবিতা লেখে—।

বললাম—হ্যাঁ, কবিতাটা ভালোই লেখে। ও যদি ইণ্ডিয়ায় জন্মাতো তো অনেক নাম হতো ওর—

—আপনি ওর কবিতা শুনেছেন?

বললাম—শুনেছি। শুধু শুনেছি নয়, অনুবাদও করেছি বাংলায়—

এ সম্বন্ধে আমি আর কিছু বললাম না। কারণ, কবিতার সমঝদার ক'জনইবা। একমাত্র কবিমনই কবিতার রসোপলব্ধি

করতে পারে। শুধু বললাম—শিউপ্রজনের কবিতা না লিখে উপায় নেই। কবিতা না লিখলে ও পাগল হয়ে যেত—

—কেন?

আমি আর সে কথার কোনও জবাব দিলাম না। গাড়িটা হু হু করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন পুরুষোত্তমজী। বেশ ভালো গাড়ি চালানো শিখেছেন স্বামীজী!

বললেন—এই দেখুন, এই জায়গাটার নাম ডাকোবা—আমাদের আশ্রমটা এই ডাকোবাতেই—

চারদিকে চেয়ে দেখছিলাম। মনে পড়তে লাগলো এই মরিশাসের সৌন্দর্য দেখেই একদিন ফরাসী কবি বদলেয়ার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়া থেকে কুলি-মজুররা প্রথম যেতে আরম্ভ করে ১৮৩৪ সালে। আর বদলেয়ার সাহেব এসেছিলেন ১৮৪১ সালে। দক্ষিণ মরিশাসে একটা জায়গা আছে তার নাম 'বেনারস সুগার এস্টেট'। তিনি সেখানেই দু-দিন কাটিয়েছিলেন। শোনা যায় সেখানে তিনি এক ভারতীয় মহিলাকে দেখে যে কবিতাটা লিখেছিলেন তা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার অন্যতম একটি।

জিজ্ঞেস করলাম—মরিশাস নামটা কী করে হলো বললেন না তো?

অপরানন্দজী বললেন—কেউ কেউ বলে কোথাকার কোন নাটাউ দেশের এক রাজকুমারের নাম ছিল মরিস। তার নাম থেকেই মরিশাস নামের উৎপত্তি। কিন্তু আসলে এই মরিশাস নামের পেছনে একটা কিম্বদন্তী আছে। কিম্বদন্তী বলে রামায়ণের মারীচ থেকে এ দেশের নাম হয়েছে মরিশাস।

কোথায় রামায়ণের মারীচ আর কোথায় এই ইন্ডিয়ান ওশানে ঘেরা মরিশাস।

কী করে এই কিম্বদন্তীটার উৎপত্তি হলো জানেন? রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা তো সবাই জানে। তাড়কা রাক্ষসীর কথাও সবাই জানে। তাড়কা রাক্ষসী লঙ্কার রাজা রাবণের বোন। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাক্ষসদের বড় অত্যাচার হতো। দশরথের পুত্র রামকে নিয়ে বিশ্বামিত্র একদিন তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন। রাস্তায় তাড়কা রাক্ষসীর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলো রামের। যুদ্ধে তাড়কা রাক্ষসীর মৃত্যু হলো রামের বাণে। তাড়কা রাক্ষসীর ছেলে মারীচ মায়ের মৃত্যু দেখে রামের কাছে হাতজোড় করে বললে—তাকে যেন রামচন্দ্র ক্ষমা করেন।

রামচন্দ্র যেমন একদিকে বীর তেমনি আবার আর একদিকে ক্ষমারও অবতার। তিনি মারীচকে ক্ষমা করলেন।

কথাটা কিন্তু সারা জীবন মনে রেখেছিল মারীচ। যে রামচন্দ্র ইচ্ছে করলে মারীচকেও হত্যা করতে পারতেন তা তিনি করেন নি। মারীচ সেইদিন থেকেই রাক্ষস-বংশজ হয়েও রামচন্দ্রের ভক্ত হয়ে গেল।

এর অনেক বছর পরে সীতা-হরণের পালা। সূর্পণখাকে লক্ষ্মণ যখন অস্ত্র দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করলেন তখন সে লঙ্কায় গিয়ে দশাননকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করলেন। এবং বললেন যে, রামের সঙ্গে এক সুন্দরী যুবতী রমণীও আছেন। রাজা দশানন তখন আর লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। তখনই সিদ্ধান্ত করলেন যে, সীতা-হরণ করতে হবে।

তখন রাবণ মারীচকে ডেকে পাঠালেন এবং স্বর্ণ মৃগের রূপ ধারণ করে সীতাকে প্রলুব্ধ করবার পরিকল্পনার কথা বললেন।

মারীচ বললে—কিন্তু মহারাজ, আপনি যে সীতাকে হরণ করবার পরিকল্পনা করেছেন তাতে কিন্তু আপনার সর্বনাশ হবে—

দশানন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেন? রাম কি আমার চেয়েও বড় বীর?

মারীচ বললে—হ্যাঁ মহারাজ, রাম অবধ্য। কেউ রামের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না—

দশানন হুংকার দিয়ে বললেন—মিথ্যা কথা। আমি যা বলছি তুমি তাই করো—

রামায়ণ যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন এর পরে কী ঘটনা ঘটেছিল। রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন এবং মারীচেরও মৃত্যু হয়েছিল রামচন্দ্রের বাণে।

মারীচ যখন মারা যায় তার পূর্ব মুহূর্তে রামচন্দ্রের সামনে দুই হাত জোড় করে একটি শেষ প্রার্থনা জানালেন।

বললেন—প্রভু, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে আজ পূর্ণ হলো। আমি চেয়েছিলুম আপনার হাতেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ হোক। আমি বড় পাপী-তাপী। আপনি আমাকে একটা বর দিন—

রামচন্দ্র বললেন—তুমি কী বর চাও বলো?

মারীচ বললেন—আমার কামনা যে মৃত্যুর পর আমার আত্মা যেন পরলোকে গিয়ে চিরকাল রাম-নাম শুনতে পায়—

রামচন্দ্র বললেন—তথাস্তু!

তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার পর রামচন্দ্র মারীচকে স্পর্শ করলেন। স্পর্শ করতেই মারীচ একটা মুক্তায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। রামচন্দ্র তখন মুক্তাটি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেই মুক্তাটি গিয়ে পড়লো এই মরিশাসে।

গল্প বলতে বলতে অপরানন্দজী থামলেন।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

অপরানন্দজী বললেন—সেই মারীচের আত্মা যেখানে এসে পড়লো সে এই মরিশাসের একটা জায়গায়। জায়গাটার ইংরাজী নাম হলো 'Grand Basin', কিন্তু এখানকার হিন্দুরা সেই জায়গাটার নাম দিয়ে দিয়েছে "গংগা তালাও"। দেখেছেন 'গঙ্গা তালাও' জায়গাটা?

বললাম—হ্যাঁ দেখেছি—

অপরানন্দজী বললেন—সেখানে আপনি যখনই যান দেখবেন রাম-নাম গান হচ্ছে। শিবরাত্রির দিনের তো কথাই নেই, মকর-সংক্রান্তি, পৌষ পার্বণ, ছট-পরব সমস্ত ওখানে হবে। মরিশাসে যত হিন্দু আছে সবাই সেই দিন ওখানে পুজো দিতে যাবে। আর সমস্ত রাত দিন ওই রাম-চরিত মানস পড়বে। এখানকার যত মরিশাসের হিন্দু আছে তারা এই কিম্বদন্তীটা বিশ্বাস করে—

আমি বললাম—এখানে ডাঃ সুরেশ রামফলকে চেনেন তো? কাল রাতে তার বাড়িতে আমাদের ক'জনকে নিয়ে গিয়েছিল। তার টেপ-রেকর্ড করা ওই শিবরাত্রির সময়কার রাম-নাম-গান আমাদের শুনিয়েছিল। এ জিনিস আর কোথাও হয় বলে শুনিনি—

অপরানন্দজী বললেন—জানেন, এখানকার যে-কোনও মন্ত্রী যদি শিবরাত্রির উৎসবের দিনে "গঙ্গা তালাও"তে না যান তো তিনি ভোটে হেরে যাবেন। ভোটের সময় কেউ তাঁদের ভোট দেবে না—

গাড়িটা এসে থামলো মিশনের মন্দিরের সামনে। মন্দিরের আশেপাশে বহুদূর পর্যন্ত কোনও বসতি নজরে পড়লো না। যতদূর চাও কেবল আখ আর আখ। আখের সবুজের ঢেউ।

আগেই বলেছি জায়গাটার নাম ভাকোবা। পাশপাশি দুটি বাড়ি। একটিতে মন্দির। সেখানেই পরমহংসদেবের প্রতিকৃতির সামনে পুজোর জায়গা। আর বাকি ঘর দুটিতে দু'জন স্বামীজীর থাকার জায়গা।

রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

মনে মনে বললাম—তুমি কোথায় জন্মেছিলে ঠাকুর, আর এ কোথায় কতদূরে কোন বিদেশে তোমার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। এ তো গায়ের জোরে হয় নি, অর্থের জোরেও হয়নি। এ তো তোমার ভালবাসা ক্ষমা দয়া ধৈর্যের প্রভাব। তুমি এমন কী একটা যাদু জানতে যার ফলে সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে আমরা তোমাকে প্রণাম করতে এসেছি। আমাদের মধ্যে যারা ঘোর ব্যবসায়ী, যারা স্বার্থপর, যারা পলিটিশিয়ান, যারা বৈজ্ঞানিক, যারা নিজেকে

তারা সবাই আজ কেন তোমার কাছে মাথা নত করে ধন্য কৃতার্থ বোধ করছে। এ কেমন করে তুমি করতে পারলে? তোমার হাতে তো পয়সা ছিল না, ছিল না অস্ত্র। ছিল না কোনও মন্ত্র। তাহলে? লোকে তোমার কাছে খ্যাতি চেয়েছে, বাড়ি চেয়েছে, গাড়ি চেয়েছে, ছেলের চাকরি মেয়ের বিয়ে চেয়েছে। তুমি তো তাদের কাউকেই কিছু দাওনি। দিতে চাওনি। তাহলে কোথায় তোমার মহত্ত্ব? মহত্ত্ব তোমার সত্যবোধে। সত্যবোধ এমনই এক অভ্রান্ত তত্ত্ব যা মানুষকে সুখের পথের সন্ধান দিতে পারে।

প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালাম। মনে হলো যেন পবিত্র হলাম, পরিশুদ্ধ হলাম। আমি জানি, মনের ভেতরে যে মন আছে সেখানে আমি পাপী, সেখানে আমি স্বার্থপর, সেখানে আমি অধৈর্য! আমার চরিত্রের এই দোষের জন্যে আমি যে নিজেকে কতবার ভৎসনা করেছি। আর মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছি।

এই যেমন ধৈর্য। যেমন সহ্যক্ষমতা। আমার নিজের সহ্য ক্ষমতা নেই। একটু সামান্য যন্ত্রণাতেই আমি হা-হুতাশ করি। কিন্তু যখন রামকৃষ্ণ মিশনের তুরীয়ানন্দজীর কথা ভাবি তখন শ্রদ্ধায় মাথা অমনিই নত হয়ে আসে।

তুরীয়ানন্দজী তখন কাশীতে। পিঠে কার্বাঙ্কল হয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণা, কিন্তু মুখে হাসি।

ডাক্তার এলেন।

বললেন—আপনাকে ক্লোরোফর্ম করতে হবে। আপনি তৈরি হয়ে নিন মহারাজ—

তুরীয়নন্দজী বললেন — ক্লোরোফর্ম আমাকে দিতে হবে না, আপনি বিনা ক্লোরোফরমে আমাকে অপারেশন করুন, আমার কোনও যন্ত্রণা হবে না, আপনি দেখে নেবেন—

ডাক্তার বললেন—তাহলে আমি আরম্ভ করি?

তুরীয়ানন্দজী বললেন—তার আগে আমাকে পনেরো মিনিট সময় দিন—

তুরীয়ানন্দজী পনেরো মিনিটের জন্যে চোখ বুজে ধ্যান করলেন। তারপর ডাক্তারকে আরম্ভ করতে ইঙ্গিত করলেন। কার্বাঙ্কলের মত যন্ত্রণাদায়ক রোগের যে কী যন্ত্রণা তা সবাই জানেন। তখনকার দিনে এত ওষুধও ছিল না। তা একঘন্টা পরে যখন অপারেশন শেষ হলো তখন ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন—আপনার কোনও যন্ত্রণা হলো না?

তুরীয়ানন্দজী বললেন—কেন যন্ত্রণা হবে? তোদের অপারেশন তোরা বুঝবি, শরীরের কষ্টটা ভগবান বুঝবে। মনটা তো আমার। সে তো সকলের উঁচুতে—তাকে তো কেউ ধরতে ছুঁতে পারবে না—

আর একটা ঘটনা বলি।

স্বামী বিবেকানন্দ শরৎ মহারাজকে নিয়ে দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গেছেন। যেদিন বক্তৃতা দেবার কথা সেদিন হঠাৎ শরৎ মহারাজের জ্বর হয়ে গেল। বিবেকানন্দ বড় রেগে গেলেন। রাগ হলে বিবেকানন্দের আর কান্ডজ্ঞান থাকতো না একথা সবাই

জানেন। তিনি বলে উঠলেন—জ্বর মাথাব্যথায় আর সময় পেজি না তুই শালা? ঠিক করেছেন দিলেই কিম্বা তোর জ্বর হচ্ছে না?

তারপর বললেন—এখন আমার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক দিকিনি—

শরৎ মহারাজ তাই করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তখন সমস্ত চোখের জ্যোতি দিয়ে একদৃষ্টে শরৎ মহারাজের চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। বিবেকানন্দর চোখ দিয়ে যেন সিনেমায় দেখা ছবির মত তেজ বেরোতে লাগলো। এমনি করে কিছুক্ষণ থাকার পরই শরৎ-মহারাজের জ্বর নির্মূল হয়ে গেল।

এই বরিশালের রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আমার এই সব কথা মনে পড়তে লাগলো। মনে হলো মন্দিরের প্রত্যেকটি ইঁটে যেন ঠাকুরের স্পর্শ পাচ্ছি। আর যত দেখছি ততই নিজে পবিত্র হচ্ছি, পরিশুদ্ধ হচ্ছি—

(ক্রমশ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

স্মরণীয় চরিত্র

আজকাল উপন্যাসে আর চরিত্র থাকে না, চরিত্রের নামে কতকগুলো পুতুল দাঁড় করানো থাকে যাদের কোনো কিছুই পালটায় না, কোনো ব্যাপারেই তাদের সজীব হতে দেখি না, তারা নির্বিকার নিরুত্তাপ। আমরা আজকালকার উপন্যাস থেকে চরিত্র হারিয়েছি, অতীতে যারা ছিল তারা আর ফিরে আসবে না।

ওপরের এই কথাগুলো আমার নয়, জনৈক বিদেশী সমালোচকের। অবশ্য তাঁর কথার পুরোপুরি তর্জমা আমি করি নি, ভাবার্থটুকু লিখেছি। তর্জমা এবং ভাবার্থে এখানে এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে না, কেননা মূল কথাটা এই—আজকালকার উপন্যাসে আমরা আর তেমন কোনো চরিত্র দেখছি না যা স্মরণীয় ও সজীব।

প্রসঙ্গটি এই কারণেই তুললাম যে, আধুনিক লেখা—বিশেষ করে উপন্যাস সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয় তার অন্যতম হল এই অভিযোগটি যে আমরা আর তেমন কোনো চরিত্র উপন্যাসে খুঁজে পাই না যার নিজস্ব কোনো আকর্ষণ ও গৌরব রয়েছে।

প্রসঙ্গটি মনে পড়ার আরও একটি কারণ হল, মাত্র কয়েকদিন আগেই কয়েকজন তরুণ এবং কিঞ্চিৎ প্রবীণ লেখকরা নানা-রকম কথার মধ্যে হঠাৎ এই ধরনের একটি আলোচনাও করেছিলেন। বলছিলেন, লেখার দিক থেকে চরিত্র হিসেবে শেষ পযন্ত কোন চরিত্র কতটা সফল হয়েছে সেটা তর্কসাপেক্ষ হলেও স্বীকার করতেই হবে, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এমন কি তারাশংকর বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায় পর্যন্ত তাঁদের লেখায় এমন এমন চরিত্র সৃষ্টি করে গেছেন যা আমাদের আকর্ষণ করেছে, যাদের ভুলে যাওয়া সহজ নয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে 'কপালকুণ্ডলা' বা 'দেবীচৌধুরানীর' কথা, কিংবা 'রাজসিংহ' বা 'ভবানন্দের' কথা; ধরা যেতে পারে, 'গোরা' অথবা 'শচীশ'কে, বা 'কুমু' বা 'বিনোদিনী'কে; ধরা যেতে পারে 'সুরেশ' 'ইন্দ্রনাথ' 'অভয়া'—এদের কথা।

উদাহরণ হিসেবে এই ক'টি নামই বললাম, আরও কিছু কিছু চরিত্র নিশ্চয় [illegible]

আপাতত তার প্রয়োজন নেই। এই চরিত্র গুলি বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে এসে পড়ে বলেই বললাম। বিদেশী উপন্যাসের কথা আমি তুলব না। সেখানে ভূরি ভূরি চরিত্র আছে যা অবশ্যই স্মরণীয়।

আমরা যদি স্বীকার করে নিই যে, আজকালকার উপন্যাস থেকে চরিত্ররা পলাতক হয়েছে তবে এই আলোচনা চলতে পারে, নচেৎ নয়। এটা সহজ কথা, যে কোনো গল্প উপন্যাস লেখায় চরিত্র থাকবেই, চরিত্র বাদে উপন্যাস হয় না। আজকের বাংলা উপন্যাসে চরিত্র যথারীতি রয়েছে, কিন্তু সেই চরিত্র নিছকই চরিত্র—নির্বিকার নিরুত্তাপ মানুষ, কতগুলো পুতুলমাত্র, নাকি তাও নয়—এটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, আধুনিক উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করা হয় তার মধ্যে খানিকটা সত্য রয়েছে। অন্তত একথা স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই যে, স্মরণীয় চরিত্র বলতে যা বোঝায় সেরকম চরিত্র আর লেখায় থাকছে না। পরিহাস করে কেউ কেউ বলেন, চরিত্ররা মরে যাচ্ছে।

একটা সময় ছিল যখন চরিত্র আর ঘটনা ছিল উপন্যাসের প্রাণ। এখন ঘটনাকে আমরা তেমন প্রাধান্য দিই না। চরিত্রকেও দিচ্ছি না।

কেন দিচ্ছি না? কারও কারও অভিমত এই, ব্যক্তিত্বময় বিশাল চরিত্র সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন আর নেই। দু তিন শো বছর আগে মানুষ যা ছিল এখন সে আর তেমন নয়, তার নিজেরই চরিত্র পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের নিজের চেহারাই এখন ভাঙা, সে কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে তার সংশয় বহু, দ্বিধা অনেক, এই ধরনের মানুষ নিয়ে কোনো স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করা যায় না। তা ছাড়া ওই ধরনের বড় চরিত্র সৃষ্টি করতে গেলে তা কৃত্রিম হয়ে উঠবে। এখনকার দিনে আর-এক 'কপালকুণ্ডলা' চিন্তা করাই অসম্ভব, ধারণাই করা যায় না যে কোনো লেখক 'গোরা' চরিত্রের ধারে কাছে যাবার জন্যে আগ্রহ বোধ করবেন।

প্রশ্নটা এই যে, মানুষের জীবন এখন যেরকম দাঁড়িয়েছে, সর্বদিক থেকেই সেই মানুষ কি বিরাট কোনো চরিত্র হবার [illegible]

ছেলে, হয় অফিসে না হয় অন্য কোথাও কোনো চাকরি করে, থাকে কলকাতার কোনো গলিতে, মা বাবা ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে যার সংসার, যাকে রেশন আনতে ছুটতে হয়, লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয় ট্রামে-বাসে ওঠার জন্যে—সেই মানুষটিই আজকের উপন্যাসের নায়ক যখন তখন মশাই তাকে বিশাল বিরাট করে কী হবে? আদপেই কিছু হবে না।

একজন তরুণ লেখক বললেন, আমাদের চরিত্ররা ভেতরে ভেতরে ছটফট করে, তার মাপ ছোট, তার জীবন সম্পর্কে ধারণাও অস্পষ্ট, আর ঘটনার পর ঘটনা ঘটিয়ে আমরা তো চরিত্রদের নাটকীয় করে তুলতে চাই না—কাজেই আমাদের কাছে যে চরিত্র পাবেন তা হয়ত পুতুলের মতন। কিন্তু ঠিকঠিক পুতুল নয়। শোক দুঃখ, আনন্দ সুখ তারও আছে—কিন্তু তা প্রকাশের চেহারা পালটে গেছে।

আর একজন বললেন, যা বিশাল এবং অতিকায় তা নিশ্চয় ছিল। জীবজগতেও ছিল। কিন্তু আজ তাদের অস্তিত্ব যাদুঘরে। বাস্তবে আর তারা নেই। পুরোনো সাহিত্যে অনেক বড় এবং মহৎ কিছু চরিত্র রয়েছে। আমরা যখনই তা পড়ব, পিছু ফিরে তাকাব। মাথা নিচু করব, বিস্মিত বিহ্বল হব। কিন্তু এখনকার কথা যখন ভাবব, তখন এত ছোট মাপের মানুষকে নিয়ে মাথা ঘামাব যার অতিদীর্ঘ বা স্মরণীয় হয়ে থাকার কোনো সুযোগই নেই।

অভিনন্দ

গানের আসর

খ্রীষ্ট-সঙ্গীত

এবারকার বড়দিন চলে গেল, অথচ কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে খৃষ্ট-সঙ্গীত শোনবার আমন্ত্রণ পাওয়া গেল না। বড়দিনে খৃষ্ট-সঙ্গীত শোনাকে আমি একটি বিশেষ প্রিভিলেজ বলে মনে করি। এবারে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্যবার আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টার খুব সাধাসিধেভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, কিন্তু আয়োজনটি হয় আন্তরিক। কি কারণে জানি না, গত দুই বৎসর যাবৎ এই অনুষ্ঠানটি তাঁরা বন্ধ রেখেছেন। কলকাতার বাঙালী খৃষ্টীয় সম্প্রদায় বড়দিন উপলক্ষে উল্লেখযোগ্যভাবে কোনও সংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করেন বলে জানি না, করলে মন্দ হতো না। গত কয়েক বৎসরই কবি সুনীল দত্ত মহাশয়ের সুন্দর রচনা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এখনও কানে বাজছে তাঁর গান 'তোমরা দুয়ার খুলে রাখ' বা 'ওগো ক্রুশ-বাহী জগতের জ্যোতি তুমি যে চির অনন্য। ক্রুশতরুমূলে শোণিত কুসুম ফোটালে পাপীর জন্য' খৃষ্টসঙ্গীতকে তিনি কাব্য-সঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। সত্যিই যে কোনও সুন্দর গানই তো খৃষ্টোৎসবে গাওয়া যেতে পারে। এমনকি ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়েও খৃষ্টোৎসব পালন করা যায়। দু এক বৎসর আগে খৃষ্টের জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত একটি নৃত্যনাট্য দেখেছিলুম। বেশ ভাল লেগেছিল। যিনি লিখেছিলেন এবং যিনি নৃত্যপ্রয়োগ করেছিলেন তাঁরা কেউই খৃষ্টান নন এবং অভিনেতারাও কেউ খৃষ্টান ছিলেন না, তথাপি এই নিবেদনে ফুটে উঠেছিল পরম শ্রদ্ধা এবং একটি মধুর ভক্তিরস। বড়দিন যেমন আমাদের সকলকার আনন্দের দিন হয়ে উঠছে তেমনি খৃষ্টসঙ্গীতও আমরা ধর্মনিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর এক পরমপুরুষের জীবনগাথা হিসাবে অন্তরে গ্রহণ করতে সমর্থ হচ্ছি।

আমাদের বঙ্গীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় মনে প্রাণে বাঙালী। শুধু আমাদের বাংলাদেশ কেন, অপর ভারতীয়, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ও একান্তভাবেই তাঁদের নিজেদের সমাজের আদর্শকে ধরে রেখেছেন। বাল্যাবস্থায় আমি কয়েক বৎসর ছিলুম। সেখানকার প্রার্থনা অধিকাংশ সন্ধ্যায় বাংলা গান দিয়েই সম্পন্ন হতো। এর মধ্যে একটি ছিল রবীন্দ্রনাথের 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'—এই গানটি। আমাদের ওয়ার্ডেন ছিলেন একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের মালয়ালামভাষী এক ভদ্রলোক—টি টি থারু। আমরা ডাকতুম থারু সাহেব বলে। ইনি ধবধবে সাদা খদ্দরের ধুতি এবং পাঞ্জাবি পরতেন। কখনও কোনও কারণে তাঁকে অন্য কোনও পোশাক পরতে দেখিনি। অথচ সেটা ছিল ব্রিটিশ আমল এবং তখনকার ওয়াই এম সি এ বেশ খানিকটা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রভাবে গড়া ছিল। বাল্যকালের স্মৃতি মনে পড়ে,—একটি খৃষ্টীয় পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমরা বড়দিনের আগে রঙীন কাগজের শিকলি বানাতুম, বিচিত্র রঙের ফুলে ঘর সাজাতুম এবং বড়দিন উপলক্ষ্যে ধবধবে জামাকাপড় পরে তাঁদের সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিতুম। সেই প্রার্থনার প্রায় কোনও গানই আজ আর মনে নেই, তবে সবকটি গানই ছিল বাংলা। এর মধ্যে একটি গানের প্রথম লাইনটি শুধু মনে আছে—মঙ্গল আশীষ মঙ্গল ধারা বহিয়া পড়েছে আজি। গানটির মধ্যে একটি আকর্ষণীয় মেলডি ছিল।

কলকাতার তালতলা অঞ্চলে বহু বৎসর থাকবার সময় দেখতুম বিশুকীর্তনের অনুষ্ঠান। পাঞ্জাবির ওপর উড়নী পরে খোল-করতাল সহযোগে এই কীর্তন আমাকে মুগ্ধ করত।

এই যে একটা এতদিনকার সংস্কৃতি, একটা জাতির মহামিলনের দিনে এইসব সঙ্গীতানুষ্ঠান—এগুলি বিরল হয়ে আসা দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। যত মত তত পথ তো প্রশস্তই আছে—কিন্তু সঙ্গীত তো আমাদেরই ভাষা, আমাদেরই সুরকে বহন করছে,—তা এই আনন্দ উৎসবকে কেন্দ্র করে যত মহান হয়ে আমাদের অন্তরলোকে প্রবেশ করবে ততই তো আমরা গৌরবে অভিষিক্ত হতে থাকব। অতএব প্রতি বৎসর খৃষ্টোৎসবে নতুন নতুন সঙ্গীত রচিত হবে এবং ভক্তিগীতির একটি শাখা উন্মুক্ত হয়ে যাবে এটি আমরা সর্বান্তঃকরণেই কামনা করি।

বছর কয়েক আগে সাধারণ ধর্মগীত নামক একটি খৃষ্টীয় গীত পুস্তক আমার একজন ভূমিকায় খৃষ্টসঙ্গীতের একটি ইতিবৃত্ত প্রদান করা হয়েছে। এই বিবরণ অনুসারে জানা যায় বাংলা ভাষায় প্রথম খৃষ্টীয় গানের বই প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে শ্রীরামপুর থেকে। তাতে মাত্র তেইশটি গান ছিল। এইখান থেকেই ১৮১০ সালে আর একটি বই বেরিয়েছিল তাতে গান ছিল ১৫৭টি। এই গানগুলি সঙ্কলন করেছিলেন একজন ইংরেজ—জন চেম্বারলেন এবং সুরগুলি সবই ছিল ইংরেজি গানের। [illegible]র প্রায়ই দিশি, বিলিতি সুর মিশিয়ে গানের বই বেরুতে থাকে কয়েক বছর অন্তর অন্তর। ভূমিকা থেকে দেখা যাচ্ছে এ পর্যন্ত খৃষ্টসঙ্গীতের ছোট বড় বই নেহাৎ কম বেরোয়নি, কিন্তু এত গানের খুব কমই সর্বজনীন পরিচিতি লাভ করেছে। রেভারেণ্ড উইলিয়াম ক্যারী ধর্মগীত-এর একটি নূতন সংস্করণ বের করেছিলেন। সাধারণ ধর্মগীত নামক বৃহৎ খৃষ্টসঙ্গীতের ভূমিকার শেষভাগ উদ্ধৃত করে এই নিবন্ধ শেষ করছি। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে।

"ভক্তিমূলক গীতাবলী বাঙ্গলা দেশে চিরদিনই প্রচলিত, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মাদর্শ সম্বলিত সঙ্গীতের অপ্রাচুর্য বহুদিনই পরিলক্ষিত হইয়াছে, কারণ খৃষ্টীয় সমাজে স্বভাবকবির অভাব। এবং আরও, নূতন শব্দ ও ভাব একটি ভাষায় পূর্ণাঙ্গীভূত হইতে সময়ের প্রয়োজন। খৃষ্টীয় ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে যে সমুদয় নূতন আদর্শ, শব্দ ও ভাব বাঙ্গালী খৃষ্টীয়ান সমাজে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের বঙ্গভাষায় লিখিত কবিতায় ব্যবহারের উপযুক্ত শব্দরূপে রূপান্তরীকৃত হইতে সময় লাগিয়াছে। আবার ইংরাজী ধর্মগীতগুলি বহু যুগের আধ্যাত্মিক কৃষ্টিসম্ভূত, সুতরাং ইংরাজী অভিজ্ঞ শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নিকটে তাহা স্বভাবতই যে শুধু আদরণীয় হইয়াছিল তাহা নহে, সমাজের সঙ্গীতজ্ঞগণের অনেকে ইংরাজী গানের অনুবাদ ও ইংরাজী সুর প্রচলনের দ্বারা জাতীয় ধর্মসঙ্গীত সম্পদ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। অধুনা কৃতী লেখকের অভাব পূর্বেক্ষ তুলনায় কিছু দূর হইয়াছে; এবং পূর্বে বিরচিত নানা সঙ্গীতও সমাজের উপাসনা জীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।"

কোথায় যাবে তুমি? সামনে পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে কোথাও যাবার রাস্তা নেই। চতুর্দিকে অন্ধকার দেয়াল। দম বন্ধ অন্ধকার। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। চারটে দেয়াল যেন পিষে মারবে। ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল অমলেশ। ঘুম ভাঙতে উঠে বসল। বালিশ ভিজে গেছে। সর্বাঙ্গ ভেজা ভেজা। এত ঘাম!

ততক্ষণে নমিতারও ঘুম ভেঙেছে, "কি হয়েছে, বসে আছ কেন?"

"বিচ্ছিরি একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল, এক গেলাস জল দেবে?"

পাশাপাশি দুটি সিঙ্গল বেড খাট। জোড়া দেওয়া। মশারি একটা। বড় নাইলনের মশারি। মাথার উপরে পাখা ঘুরছে। নাইলনের মশারির ভেতরেও বেশ হাওয়া পাওয়া যায়। নমিতার ওপাশে তিন বছরের বুবাই। আঁচল গুছিয়ে মশারির বাইরে গেল, টিপ করে বাতি জ্বালাল। এবার লক্ষ করল অমলেশ, শুধু ঘাম নয়। ঘামের সঙ্গে সামান্য রক্ত। বালিশে রক্তের দাগ। বাঁ কানের পেছনে হাত গেল। কানের পেছনে বড় সুপুরির সাইজের একটা টিউমার। এটা থেকে এখন রক্ত বেরোচ্ছে। খুব অল্প অল্প।

দিন পনেরো আগে গোঁজ খেলায় সময় হঠাৎ ঘষা লেগে প্রথম রক্তপাত ঘটেছিল। গত পাঁচ মাসে এই টিউমারটা খুব দ্রুত বেড়েছে। মাস পাঁচেক আগে প্রথম খেয়াল হয়েছিল অমলেশের। অফিসে বসে কাজ করছিল। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল দিলীপ। দিলীপ মুন্সী। ছেলেটা থিয়েটার পাগল। অফিসের 'দাদা দাদা' ডাকে। থিয়েটারের রিহার্সাল নিয়ে আলোচনা করে। টিকিট বিক্রির দায়িত্ব দেয়। ঝুঁকে পড়ে একটা ফাইলে জরুরী নোট লিখেছিল অমলেশ। সেদিনের মত সেটাই শেষ ফাইল। পাশের জানালা দিয়ে শেষ বেলার এক চিলতে রোদ এসেছে ঘরে, অমলেশের টেবিলে। ওর বাঁ-পাশে জানালা। ঝুঁকে লেখার জন্য ওর বাঁ-কানে রোদের রেখা! সে সময় লক্ষ হ'ল দিলীপের, "দাদা, আপনার কানের পেছনে ওটা কি হয়েছে, ফোড়া, না আঁচিল?"

বাঁ-হাতের তর্জনী বাঁ-কানের পেছনে নিয়ে গেল অমলেশ। মটরের দানার চেয়ে সামান্য বড় কিছু একটা আঙুলে ঠেকল। না, কোন ব্যথা নেই। সুতরাং ফোড়া নয়।

আঁচিল হবে হয়তো। কিংবা লাল তিল। অমলেশের বুকে একটা লাল তিল আছে। পরক্ষণেই বেমালুম ভুলে গেল। অফিসের কাজ। কাজের পর দিলীপের সঙ্গে 'বিসর্জন' নাটকের রিহার্সাল নিয়ে আলোচনা। তারপর ক্যান্টিনের আড্ডা।

ক্যান্টিন হলের একদিকে তাসের আড্ডা, আরেকদিকে দাবার আসর।

ফিশারীর শম্ভু বাগচী ওস্তাদ দাবা খেলোয়াড়। তাঁর সঙ্গে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলাটি ড্র ক'রে খুশি হ'ল অমলেশ। সিসিলিয়ান ডিফেন্স সাজিয়ে চমৎকার খেলেছে সে। সাদা ঘুঁটি নিয়ে প্রায় হারতে হারতে কোনরকমে ড্র ক'রে ওর খেলার খুব তারিফ করলেন শম্ভুদা! এক ঘণ্টার উপর চলেছিল খেলাটি। আসর ভাঙলো সন্ধ্যে সাতটায়। তারপর দিলীপের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চৌরঙ্গী এসে টালীগঞ্জের ট্রাম ধরল পৌনে আটটায় সময়।

দিলীপ নামল কালীঘাটে। (প্রথম দিনের ঘটনা এইটুকু মনে আছে।)

দু'তিনদিন পরে নমিতার নজরে

বলেছিল। "তোমার ওটা কি হয়েছে গো, কানের পেছনে?"

এই দ্বিতীয়বার বাঁ-হাতের আঙুল ঠেকিয়ে মনে হ'ল আঁচিলটা যেন একটু বড় হয়েছে। অফিসে বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল অমলেশ। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল কানের পেছনে থাকার জন্য আঁচিলটা দেখা যাচ্ছে না। ডান পাশে মুখ ঘুরিয়ে বাঁ-কানের পাতা ভাঁজ করে দেখার চেষ্টা করল। সুবিধে হ'ল না। নমিতার ভ্যানিটি ব্যাগে ছোট একটা গোল আয়না আছে।

"তোমার ছোট আয়নাটা দাও তো।"

"কি করবে?"

"দ্যাখো না, কি করি।" আয়নাটা নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল অমলেশ। বাঁ-হাতের কানের পেছনে ছোট আয়নাটি ধরে সামনের বড় আয়নায় ছায়া দেখল।

বেশ ভালভাবেই দেখা গেল। এই প্রথম জিনিসটা চোখে পড়ল অমলেশের। একটা আঙুরদানার মত টসটসে হয়ে আছে। কানের লতির একটু উপরে মাঝামাঝি মসৃণ জায়গায় চুলের পাশে জন্মেছে জিনিসটা। বাঁ-হাতের মধ্যমা আর তর্জনী দিয়ে টিপে টিপে দেখল। কোন ব্যথা নেই, কেমন তেলতেলে। এটা কি আঁচিল না টিউমার?

কিরকম আঁচিল কিংবা কোন ধরনের টিউমার ঠিক বুঝল না অমলেশ।

আয়নাটা ফিরিয়ে দিল নমিতাকে। আর কোন কথা হ'ল না। দাড়ি কামাল। স্নান করল। রোজের মত ন'টার মধ্যে খেয়ে অফিসে গিয়েছিল।

এখন রাত সাড়ে বারোটা। নমিতা জল এনে দিল। এক নিঃশ্বাসে বড় এক গেলাস জল খেল অমলেশ। গেলাসটা ফিরিয়ে নিতে নিতে বললো নমিতা, "তুলোয় করে একটু ডেটল লাগিয়ে দেব?"

"হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাচ্ছি, ডেটল লাগানো কি ঠিক হবে?"

"ওইসব ওষুধ ছাড়ো তুমি, এটা কত তাড়াতাড়ি বেড়ে যাচ্ছে, ফেটে কেমন ঘায়ের মত হয়েছে, আমার ভয় করছে।" নমিতার ভয়ের কথা শুনে কেমন যেন আরামবোধ করল অমলেশ। এতদিন যে ভয়টা সে একা বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিল। ক্রমশ ভারী হওয়া বোঝার মত একা-একা বহন করেছে। সেই দুর্বোধ্য ভয়টা তা'হলে নমিতার মধ্যেও ঢুকেছে। খাট থেকে নেমে সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরাল। বউয়ের দিক তাকিয়ে একটু হাসল। খাটের পাশে দাঁড়িয়েছিল নমিতা। ভুরু কুচকে বললো, "হাসছো কেন?"

"হাসছি তোমার ভয়ের কথা শুনে।"

"ওটা কি রকম বেড়ে গেছে, এই নিয়ে দু'দিন রক্ত পড়ল, ভয় হবে না।"

"হোমিপ্যাথি খাচ্ছি, আর ক'টা দিন দেখি—"

"আর দেখে কাজ নেই, তুমি নিজে তো দেখতে পাওনা ওটা কি রকম হয়েছে!"

নমিতার আন্দাজ ঠিক নয়। রোজ টিউমারটা লক্ষ্য করে অমলেশ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

প্রথম যেদিন ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখেছিল, সেদিনই অফিস থেকে ফেরার পথে ফুটপাথের এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ছোট একটা আয়না কিনেছিল। অফিসের ব্যাগে লুকিয়ে রেখেছে। অফিসের মুখ ধোয়ার বেসিনের উপর একটা ময়লা ফাটা ফাটা আয়না।

সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কানের পেছনে ছোট আয়না ধরে দেখে অমলেশ। রোজ অন্তত একবার কি দু'বার। অন্য কেউ কাছাকাছি এলেই তাড়াতাড়ি পকেটে লুকিয়ে মুখ ধোয়ার ভান করে।

বাড়িতেও নমিতাকে লুকিয়ে মধ্যে মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের ছায়ায় লক্ষ করেছে। ছোট আয়না কেনার খবর জানে না নমিতা। তার সঙ্গে এই লুকোচুরির কারণটা নিজের কাছেও অস্পষ্ট অমলেশের।

এটা কি নিজের ভয়, নিজের দুর্বলতা গোপন করার চেষ্টা? নাকি, নমিতা ভয় না পায়—সেজন্য পুরো ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করার ভান? আবার ঘরের লোক ছাড়াও বাইরের কেউ না দেখে অন্য কেউ লক্ষ না করে সেদিকেও আস্তে আস্তে সজাগ হচ্ছিল অমলেশ। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, বাস স্টপে দাঁড়িয়ে কিংবা ট্রামে যেতে যেতে মনে হত, ঠিক পেছনের লোকটি হয়তো লক্ষ করছে। অফিসে ঠিক পেছনের টেবিলে বসেন ভবেশ নন্দী। সিনিয়র লোক। রিটায়ারের আর কয়েক বছর বাকি। সারা-দিন ফাইলে মুখ গুঁজে কাজ করেন। কারো সাতে পাঁচে থাকেন না। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। খালি চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। প্রায় মাসখানেক বাদে সেই ভবেশদা' একদিন পেছন থেকে বললেন, "তোমার কানের পেছ[illegible] ওটা কি হয়েছে, অমলেশ, টিউমার [illegible]"

"হবে হয়তো।" মুখ [illegible]য়ে সামান্য হেসেছিল।

"ওরকম হঠাৎ টিউমা[illegible]য়ে ওঠা তো ভাল কথা নয়, তুমি ডা[illegible] দেখাও।"

বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। কি বলতে চাইছেন ভবেশদা[illegible] কিসের ইঙ্গিত করলেন?

তথাপি মুখে হাসি টেনে বলেছিল অমলেশ, "যেমন আছে থাকুক না ব্যথা-টাথা কিছু নেই, অযথা খুঁচিয়ে ঘা করে লাভ কি?"

মুখে বললো বটে, কিন্তু মনে মনে ঠিক করে ফেললো, অফিস ছুটির পর প্রবীরের কাছে যাবে। স্কুলের বন্ধু প্রবীর গুপ্ত ডাক্তার হয়েছে। নাকতলায় থাকে। স্কুলের

পর প্রবীর গেল সায়েন্স লাইনে, আর আর্টস-এর ছাত্র অমলেশ হয়েছে রাইটার্সের কুলীন কেরাণী।

সেদিন অবশ্য যাওয়া হ'ল না। পরের-দিন অফিস ছুটির পর ক্যান্টিনের আড্ডায় না বসে বাস স্টপে এল। তারপর বাড়ির কাছে না নেমে সোজা নাকতলা।

কলকাতার দক্ষিণতম প্রান্ত। সরুখাল টালী নালা সীমানা বটে কিন্তু ওপারেও শহরের শরীর বেড়েছে। নতুন নতুন ঘর উঠছে। নাকতলার বাজারটি বেশ জমজমাট। বাজারের পাশে বাস রাস্তার উপরেই প্রবীরের চেম্বার। ডাঃ গুপ্তস ক্লিনিক। টেবিল ঘিরে কয়েকজন রোগী। ওপাশের চেয়ারে প্রবীর। পাশে পার্টিশান-ঘেরা রোগী পরীক্ষার জায়গা। পেছনের ঘরে দু'জন কম্পাউন্ডার কাজে ব্যস্ত। একটি সাত-আট বছরের ছেলের মুখের মধ্যে টর্চ লাইট ফেলে বোধ হয় টনসিল দেখছিল প্রবীর। দরজার মুখে এসে দাঁড়াল অমলেশ। পরক্ষণেই চোখে পড়ল প্রবীরের, "আরে তুই! কি খবর, আয় ভেতরে আয়।" ভেতরে এল অমলেশ আবার বললো প্রবীর, "ওই চেয়ারে বোস, হঠাৎ এলি কেন, বাড়ির সবাই ভাল আছে তো?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে সবাই।" প্রবীরের শেষ কথাটির জবাব দিয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললো অমলেশ "এমনি এলুম, অনেকদিন দেখা হয় না কিছু কথাও ছিল।"

"ভাল করেছিস, একটু বোস আমি হাতের কাজটা সেরে নিই, ওই কাগজগুলো বরং বসে বসে দ্যাখ।"

অল্প হাসিমুখে বললো প্রবীর। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে রোগী দেখায় মন দিল।

পাঁচ-সাত মিনিট পরীক্ষা। দু'চারটে প্রশ্ন। তারপর ব্যবস্থা-পত্র লিখে পেছনের ঘরে চালান দেওয়া। কমবয়সী ছেলেটি কাগজ নিয়ে যাচ্ছে আর কিছু সময় পর পর ওষুধ এনে রোগীদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। পাশের একটা নিচু গোল টেবিলে কয়েকখানি ইংরেজি বাংলা পত্রপত্রিকা। তার একখানি মুখের সামনে ধরে প্রবীরের কাজকর্ম লক্ষ করছিল অমলেশ। চার পাঁচ মাস পরে দেখা। বেশ ভারিক্কি চেহারা হয়েছে প্রবীরের। মাথার সামনে দিকে চুল উঠে কপাল চওড়া হয়েছে। টাকের আভাস। টাকার সংগে সংগেই নাকি টাক হয়। তা টাকা হচ্ছে প্রবীরের

মোটামুটি সচ্ছল ঘরের। আর এই আট দশ বছরে প্রাকটিসও বেশ জমিয়ে তুলেছে।

সম্প্রতি একটি স্কুটার কিনেছে। দু'চার বছর পরে হয়তো গাড়িও কিনবে।

মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অমলেশ। সে কি ঈর্ষান্বিত? তা কেন হবে।

ছোটবেলার বন্ধু প্রবীর আরো উন্নতি করুক। আরো টাকা, আরো নামডাক হোক। এটাই তো স্বাভাবিক। একজন ভাল ডাক্তার তার প্রাপ্য পাবে না কেন? কিন্তু সে নিজে কি পেয়েছে? গ্রাজুয়েট হবার পর সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা দিয়ে সরকারী দপ্তরে উঁচু দরের কেরানী হয়েছে বটে, কিন্তু মাস গেলে সব কেটেকুটে হাতে যা আসে, তাতে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। নমিতাকে চাকরি নিতে হয়েছে। প্রবীরের বউ নিশ্চয়ই চাকরি করে না। দরকার হয় না। কিন্তু নমিতার দরকার। পাড়ার একটা বিলিতি কেতার বাচ্চাদের স্কুলে পড়ায়।

মাইনে মন্দ নয়, কিন্তু খাটুনিও তেমনি। খুব সকালে উঠেই ছুটতে হয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা বারোটা। রোজ চারটের সময় ওঠে নমিতা। কালও উঠতে হবে। এখন মশারির মধ্যে বসে বুবাইকে ঠিকঠাক করে শুইয়ে দিতে দিতে বললো "তুমি মণ্টু ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করো। ওদের হাসপাতালে দেখাও।"

কোন জবাব দিল না অমলেশ। সিগারেট টানতে টানতে বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। এখন রাত পৌনে একটা। নিঝুম পাড়া। গলির মুখে বাতি জ্বলছে। ঠুনঠুন করে অসময়ের একটা রিকশা চলে গেল। রাস্তার ওপাশে মুখোমুখি তেতলা বাড়িটার চিলেকোঠার কার্নিশে একটা হলুদ ফানুসের মত এক-ফালি আকাশে চাঁদ ঝুলছে। গলির আকাশে ঘোলাটে জ্যোৎস্না। একটা দুটো তারা। পাশের ঘরে মা আর ছোট বোন শিপ্রা।

ওঘরের সামনে কোন ব্যালকনি নেই। অপর প্রান্তে বাড়িওয়ালার শোবার ঘরের সঙ্গে আরেকটি ঝুল-বারান্দা। দোতলায় এই দুখানি ঘর দেড়শো টাকায় ভাড়া নিয়েছে অমলেশ। একতলায় সামনের দিকে দুটি দোকান আর পেছনে দু ঘর ভাড়াটে।

আমি অমলেশ আচার্য। বয়স চৌত্রিশ। গ্রাজুয়েট হবার পর এক বছর বেকার বসে থেকে সরকারী চাকরিতে ঢুকেছি আজ দশ বছর। বিয়ে করেছি পাঁচ বছর। স্ত্রীর বয়স আঠাশ। তিন বছরের ছেলে। দাদা আছেন বরাকরে। এক কোলিয়ারী অফিসের ক্লার্ক। ছোটভাই দুর্গাপুরে। দুজনেরই আলাদা সংসার। ছোট বোন আর মায়ের জন্য দুজনেই মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠায়। এক দিদির বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়ি। নমিতার বাপেরবাড়ি বহরমপুরে। দু বছর যাওয়া হয় নি। গত পুজোর আগের পুজোয় গিয়েছিল। আবার সামনে পুজো আসছে। নমিতার ইচ্ছে এবার পুজোয় যায়। শ্বশুরমশাইও লিখেছেন। আপত্তি ছিল না অমলেশের। কিন্তু কানের পেছনে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই বেয়াড়া ধরনের টিউমার নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে অস্বস্তি লাগে। কি ধরনের টিউমার এটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। অনিশ্চিত আশঙ্কার ভয়। হয়তো ভয়ানক কিছু। হয়তো এটাই শেষ পর্যন্ত ক্যানসারে দাঁড়াবে। কিংবা ঈশ্বর করুন, হয়তো কিছুই হয়নি। কিন্তু পাকাপাকি না জেনে এই কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলবে না। কলকাতায় সবরকম ভাল চিকিৎসা, ভাল ডাক্তার, সেরা হাসপাতাল।

এসব ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি? বরং কলকাতা ছেড়ে গেলে সব আশাভরসা ফুরিয়ে যাবে। সেদিন প্রবীরের চেম্বারের সব কটি রোগী চলে যাবার পর বলেছিল অমলেশ, দ্যাখ তো এটা কি হয়েছে? ভালভাবেই দেখেছিল প্রবীর। আঙুল দিয়ে টিপেটিপে জিজ্ঞেস করেছিল, "ব্যাথা আছে?"

মাথা নাড়ল অমলেশ: তারপর বলেছিল, "আস্তে অত জোরে টিপলে তো লাগবেই।"

"কতদিন হয়েছে?" প্রবীরের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেছিল অমলেশ, "তিন চার মাস।"

"এতদিন আসিস নি কেন?"

"আগে তেমন গুরুত্ব দিইনি, মাস-খানেক ধরে বেশ নজরে পড়ার মত বেড়ে উঠেছে।"

কোন কথা বললো না প্রবীর। মুখ নিচু করে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর একটা লেখার প্যাড নিয়ে বললো, "আমি তোকে একজন স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাচ্ছি, ডাঃ হাজরা, মনোহরপুকুর রোডে বসেন. উনি পরীক্ষা করে যা বলবেন, আমি সেইরকম ব্যবস্থা করবো।"

স্পেশালিস্ট কেন? অমলেশের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যেন হাহা করে উঠল। পা দুটি পাথর। বোধহয় টেবিলের নিচে জমে গেল। আর কোনদিন হয়তো সে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

কী বলতে চাইছে প্রবীর? তার কি ক্যানসার হয়েছে? মুখ নিচু করে চিঠি লিখছে প্রবীর। ছোটবেলার বন্ধু প্রবীর গুপ্ত। অমলেশের মনে হল তার ফাঁসির হুকুম লেখা হচ্ছে। ক্যানসার মানেই তো ফাঁসির হুকুম হয়ে যাওয়া। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর কতদিন, কয় সপ্তাহ, বড়জোর কয়েক মাস। চিঠি লেখা শেষ করে চোখ তুলে তাকাল প্রবীর। চিন্তিত দৃষ্টি। খামের মধ্যে চিঠিটা ভরে উপরে নাম লিখল, ডাঃ কে পি হাজরা।

উলটো দিক থেকে নামটা পড়ল অমলেশ। চিঠিটা ওর হাতে দিতে দিতে বলেছিল প্রবীর, "এই চিঠিটা তুই নিজের হাতে দিবি, তারপর যা বলেন, আমাকে

এসে জানাবি, দেরি না করে কাল সকালেই চলে যাস, সাতটার মধ্যে যাবি, নয়তো ভিড় হয়ে যাবে।"

চিঠিখানি হাতে নিয়ে জানতে চেয়েছিল অমলেশ, "কে, পি হাজরার পুরো নাম কি? কালীপদ, না—"

"কাশীপতি হাজরা।" ড্রয়ার বন্ধ করতে করতে একটু হেসেছিল প্রবীর। নামটা নতুন লাগল। কাশীশ্বর, কাশীকান্ত, কাশীপ্রসাদ শুনেছে। অফিসের বেয়ারা কাশীনাথ। কিন্তু কাশীপতি! নাঃ, এরকম নাম, মরুকগে, ডাক্তারের নামে কি আসে যায়। নামেও নয়, ব্যবহারেও নয়। আসল গুণ চিকিৎসায়। অনেক ডাক্তার-বাবুর ব্যবহার খারাপ। রোগীকে যা-তা বলেন, মুখ খারাপ করেন, কিন্তু ওষুধটি দেন মোক্ষম।

"তুই কি মনে করছিস? এটা কি ক্যানসার?" সোজাসুজি প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়েছিল অমলেশ।

"আমি কিছুই মনে করছি না, হয়তো কিছুই হয়নি, তবু স্যাটিসফাইড হবার জন্য তোকে পাঠাচ্ছি, ভয় পাসনে, এখনো ভয় পাবার মত কিছু হয়নি।" প্রবীরের কথা-গুলি কেমন ফাঁকা, অর্থহীন, মিথ্যে সান্ত্বনার মত শোনাল।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার সময় শুনল পাশের দোকানের রেডিওতে জনপ্রিয় ঘোষকের কণ্ঠে স্থানীয় সংবাদ। অর্থাৎ আটটা বাজেনি। স্টপে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাস এল। ছ'নম্বর বাস সোজা হাওড়া যায়। এখন তেমন ভিড় নেই। তথাপি দুটি স্টপ পার হবার পর বসার জায়গা পেল। ধ্যুৎ প্রবীরটা কিছু জানে না। রোগ ধরতে না পেরে, এখন ভয় পেয়ে স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাচ্ছে। আর স্পেশালিস্টের কাছে গিয়েই বা কি লাভ? যদি সত্যিই খারাপ কিছু হয়ে থাকে, তবে কাশীপতি না কাশীপদর বাবা এলেও কিছু করতে পারবে না। যার নাম ক্যানসার। ইউরোপ-আমেরিকার বাঘা বাঘা স্পেশা-লিস্টরা সব হিমসিম খাচ্ছেন, আর মনোহর-পুকুর রোডের হাজরা-ডাক্তার হিল্লে করে দেবে। কচু করবে! লাভের মধ্যে মোটা টাকা নিয়ে কেওড়াতলা যাবার খবরটা আগে ভাগে জানিয়ে দেবে। তবে আর্লি স্টেজে ধরা পড়লে নাকি ক্যানসার ভাল হয়।

সব বাজে কথা। দু'চার বছর হয়তো টিকে থাকতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি ভাল হয় না কেউ। নিজের চোখেই দুজনকেই দেখেছে অমলেশ। দূর সম্পর্কের শ্যামকাকু। অমন স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, হাসিখুশি মানুষটি কেমন শুকিয়ে কুঁকড়ে কয়েক মাসের মধ্যে ফুরিয়ে গেলেন। আরেকজন পাশের বাড়ির ভাড়াটে অনিলবাবু। চার-পাঁচ বছর ধরে ভুগে ভুগে গেলেন। একজনের লিভারে আরেকজনের মেরুদণ্ডের ভেতর ক্যানসার। সুতরাং মরতে যখন হবেই (দুদিন আগে বা পরে) তখন সাহসের সঙ্গে শান্তভাবে অপেক্ষা করাই ভাল। ছুটোছুটি করে, হা-হুতাশ করে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের করুণার পাত্র হয়ে আধমরার মত বেঁচে থাকতে থাকতে মরে যাবার কোন মানে হয় না।

কিন্তু! পরপর অনেকগুলি 'কিন্তু' এসে গেল। কিন্তু বুবাইর কি হবে? মা আর শিপুকে নিশ্চয়ই দাদা এসে নিয়ে যাবেন। কিন্তু নমিতা যাবে কার কাছে? চাকরি যখন একটা করছে, তখন ভাশুর-দেওরের গলগ্রহ হয়ে নিশ্চয় থাকবে না। প্রায় তিনশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবে না। কিন্তু বুবাইকে নিয়ে একা এই শহরে থাকা কি ঠিক হবে? তবে অন্য ব্যবস্থাও হতে পারে। নমিতার বয়স কম, ফর্সা, লাবণ্যময়ী মুখশ্রী, গড়ন-পেটন ভাল। স্বচ্ছন্দে আবার বিয়ে হতে পারে। অনেক নিঃসন্তান বিপত্নীক এগিয়ে আসবেন! আজকাল তো আকছারই এরকম হচ্ছে। কিন্তু অন্য একজন পুরুষমানুষ এসে নমিতাকে জোগদখল করবে, ভাবতে যেন কেমন লাগে। বুবাই অন্য কাউকে বাবা ডাকবে, ডাকতে বাধ্য হবে, ভাবাই যায় না। এলোমেলো ভাবনার মধ্যে নিজের বাড়ির স্টপ ছাড়িয়ে গেল অমলেশ। খেয়াল নেই। রাসবিহারীর মোড় ছাড়াল। ভবানীপুর ছাড়িয়ে চৌরঙ্গীর কাছাকাছি আসতে হুঁশ হল। এখন আবার উলটোদিকের ট্রাম কিংবা বাস ধরতে হবে। পার্ক স্ট্রীটের মুখে নামল। রাস্তা পার হল। খানিক বাদে দেখা গেল পার্ক স্ট্রীটের ফুটপাথ ধরে পুবমুখো হাঁটছে অমলেশ। হাঁটতে হাঁটতে পরিচিত পানশালার সামনে এসে

[illegible]। আরো কয়েকবার এসেছে এখানে। [illegible]রাই দিলীপ মুন্সী সঙ্গে ছিল। আজ একা। একা একা এসব জায়গায় ঢুকতে কেমন যেন লাগে। একটু ইতস্তত করল অমলেশ। পকেটে তিনখানি দশ টাকার, একখানি পাঁচ টাকার নোট, আর পাশপকেটে কিছু খুচরো। এই মুহূর্তে আর পয়সার হিসেব করতে ইচ্ছে হল না। এখন কিছু কড়া পানীয় প্রয়োজন। চা কিংবা কফি নয়। বিয়ার অথবা রাম। এদিক-ওদিক একবার দেখে নিয়ে টুক করে ঢুকে পড়ল। ঠান্ডা ঘর। নরম নিয়নের আলো। একা একা এই প্রথম নিরিবিলি এক কোণের চেয়ারে বসল অমলেশ। ছোট টেবিলে মুখোমুখি দু'খানি চেয়ার। অন্যটিতে এক মোটাসোটা ফর্সা চেহারার ভদ্রলোক বসে আছেন। গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি সোনার বোতাম। চোখে চশমা এঁটে মনোযোগ দিয়ে রেসের বই পড়ছেন। ভুরু কুঁচকে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর দেখছেন। কোনদিকে লক্ষ নেই।

এমনকি সামনের চেয়ারে অমলেশ বসতেও চোখ তুলে তাকালেন না। সামনে সাদা পানীয়। জলের মত রঙ। জিন খাচ্ছেন ভদ্রলোক। জিন খেলে মুখে গন্ধ হয় না বটে, কিন্তু টকটক আস্বাদটা ঠিক পছন্দ নয় অমলেশের। ঠান্ডা সরবতের মত লাগে। গ্রীষ্মের দুপুরে খাওয়া চলতে পারে। কিন্তু সন্ধ্যার পর কখনোই নয়। আর দীর্ঘদিন ধরে বেশি জিন খেলে নাকি পুরুষত্বহানি হয়। শোনা কথা। সত্যিমিথ্যে ভগবান জানেন।

মুখচেনা বেয়ারাটা এসে দাঁড়াল। রাম আর বিয়ারের অর্ডার দিল অমলেশ।

চারপাশে তাকিয়ে দেখল, মোটামুটি ভর্তি। তবে শনিবারের মত উপচে পড়া ভিড় নয়। মধ্যে মধ্যে দু'একটা ফাঁকা চেয়ারও চোখে পড়ছে। টেবিলে টেবিলে হাসি, গুঞ্জন, কখনো উচ্ছ্বাস। শুধু সে একা। নিঃসঙ্গ, বিপন্ন, অসুস্থ। বেয়ারা পানীয় নিয়ে এল।

গেলাসে এক পেগ রাম আর এক বোতল ঠান্ডা বীয়ার। বোতল খুলে গেলাসে ঢেলে দিল। রামের গাঢ় বাদামী রঙ সোনালী বীয়ারের মধ্যে মিশে গেল, উপরে সাদা ফেনা। দ্রুত কয়েক চুমুকে প্রথম পাত্র শেষ করে, আরেক পেগ আনতে বললো অমলেশ, সঙ্গে ফিশ্ ফিঙ্গার। সিগারেট ধরাল। মিনিট দশেক মধ্যে নেশার মোলায়েম ভাবটি শুরু হল। নিজেই বিয়ার ঢেলে দ্বিতীয় পেগের পাত্রটি পূর্ণ করল। বাদামী বোতলের গায়ে ঘাম জমেছে। ফিস ফিঙ্গারের উপর চিলি সস্ ছড়াল। সিগারেটের শেষটুকু ছাইদানে গুঁজে, আস্তে আস্তে চুমুক দিল। এবার আর তাড়াহুড়ো নয়। বেশ জমে এসেছে।

মনের মধ্যে চেনাশোনা মানুষের চলাফেরা। দাদা, বউদি, মা, বোন, ছোটভাই, অফিসের বন্ধুরা। এদের মধ্যে কে বা কারা নমিতাকে দেখবে, সাহায্য করবে। নমিতা কি আবার বিয়ে করবে? অসম্ভব নয়। কিংবা শেষ পর্যন্ত হয়তো চিত্ত চৌধুরী সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। নমিতাদের স্কুলের মালিক, সেক্রেটারি, হর্তাকর্তা। লোকটা টাকার কুমীর এবং বদের ধাড়ি। বেছে বেছে সুন্দরী মেয়েদের চাকরি দেয়, খাতির করে। মধ্যে মধ্যে চায়ের নেমন্তন্নে বাড়িতে ডাকে। লোকটার চাউনি ভাল নয়, চোখ দিয়ে যেন গিলে খায়। নমিতার মুখেই শুনেছে। গায়েপড়া বিশ্রী ভাব ভাল লাগে না। কিন্তু নিরুপায় নমিতা। এ-বাজারে চাকরি ছাড়া যায় না। চিত্ত চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ আছে অমলেশের। লোকটার চোখ দুটি গিরগিটির মত ঠান্ডা, আধবোজা, লোভী। ভারী মুখ, পুরু ঠোঁটে লদলদে হাসি। দেখলেই পিত্ত জ্বলে যায়। ওই লোকটা হয়তো এগিয়ে আসবে নমিতাকে সাহায্য করার জন্য। হয়তো বলবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বাড়ি ভাড়া আমি চালিয়ে দেব, মাইনে বাড়িয়ে দেব। আপনি যেমন আছেন, তেমনি থাকুন। অর্থাৎ আমার অধিকারে থাকুন। হারামজাদার হুমদোমুখে এক ঘুষি!

টেবিলে একটা কিল মারল অমলেশ। পানীয় চলকে পড়ল খানিকটা। সামনের ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে তাকালেন। ভাগ্যিস গেলাস-টেলাস উলটে যায়নি। বীয়ারের বোতলটা একটু কেঁপে স্থির হল। মনে মনে জিভ কাটল অমলেশ। কি ভাবলেন ভদ্রলোক? তার নেশা হয়েছে।

কিন্তু চিত্ত চৌধুরীকে কোন রকম সুযোগ দেওয়া হবে না, হবে না।

সুতরাং হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। অসুখের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আচ্ছা, হোমিওপ্যাথি করালে কেমন হয়। তাদের সেকশনের মধুসূদনবাবু হোমিওপ্যাথি চর্চা করেন। মধুসূদনদার সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়। মধুসূদন গাঙ্গুলি, না কাশীপতি হাজরা? কার কাছে যাওয়া উচিত। টস্ করে দেখলে হয়। পাঞ্জাবির ডানপাশের পকেটে খুচরো পয়সার মধ্যে একটা সিকি ঠেকল আঙুলে। একদিকে ত্রিসিংহ ছাপ, অর্থাৎ হেড, অন্যদিকে পঁচিশ লেখা। হেড মধুসূদন, টেল কাশীপতি। মনে মনে ঠিক করে ডানহাতের বাঁকানো মধ্যমার উপর সিকিটা রেখে বুড়ো আঙুলে টোকা দিল অমলেশ। কিন্তু দুই হাতের মধ্যে তাড়াতাড়ি ধরতে পারলো না। হাত দুটো ভারী লাগছে। চোখের পাতা ভার-ভার। সিকিটা টুং করে মেঝেয় পড়ে টেবিলের নিচে গড়িয়ে গেল। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে খুঁজতে লাগলো অমলেশ। ওদিকের ভদ্রলোকের চকচকে পাম্পশুর পাশে পড়েছিল সিকিটা। তুলে নেবার সময়, তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে, "কি হয়েছে, কি হয়েছে?" বলে প্রায় উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সিকিটা সন্তর্পণে তুলে দেখল অমলেশ। হেড অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি। নিশ্চিন্ত। নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললো, "কিছু নয়, পয়সাটা পড়ে গিয়েছিল।" অমলেশকে হঠাৎ হামাগুড়ি দিতে দেখে বেয়ারাটা তাড়াতাড়ি কাছে এসে কেমন চোখে তাকিয়ে রইল। কি ভাবছো যাদু? আমার নেশা হয়েছে? মোটেই না।

সেদিন শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরেছিল অমলেশ। বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে। বাড়িওয়ালার ঘরও অন্ধকার। শুধু ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল নমিতা। তাড়াতাড়ি নিচে এসে দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞেস করল, "এত রাত করলে কেন?" পরক্ষণেই মুখের কাছে মুখ এনে জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে বললো,

"আজ তোমাদের রিহার্সাল ছিল নাকি?"

"কেন, বলো তো?" জিভটা কেমন ভারী ঠেকছে। শব্দগুলি কেন জড়িয়ে যাচ্ছে জিভের সঙ্গে, সহজে বেরোতে চাইছে না। সিঁড়ির মাথায় অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছিল।

জবাব দিল নমিতা, "বিলিতি গন্ধ পাচ্ছি যে, দিলীপবাবুর পাল্লায় পড়েছিলে বুঝি?"

"না, আজ আমি একাই, এই এমনি একটু হল আর কি—" বলতে বলতে সামনে ঝুঁকে চুমু খাবার চেষ্টা করল। নাকে আঁচল তুলে এক পা সরে গেল নমিতা, "ছিঃ ছিঃ কি যে করো, মা জেগে আছেন।" তারপর বউ-এর কাঁধে হাত রেখে সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে বলেছিল অমলেশ, (জড়ানো জিভের ডগায় প্রতিটি শব্দ ঠেলে দিতে হচ্ছিল) "এখন আর কিছু খাবো না, পেট ভর্তি, খেলেই বমি হবে, সটান শুয়ে পড়ব।"

এখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে অমলেশ। রাত একটা বাজে। গলি রাস্তাটা একদম নিঝুম, ফাঁকা। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিল।

পেছন থেকে আবার বললো নমিতা, "আমার কথাটা কি কানে গেলো, ওসব হোমিওপ্যাথি-ট্যাথি ছেড়ে দাও তুমি, কালই গিয়ে মন্টু ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বলো, ওদের হাসপাতালে দেখাও।"

নমিতা জানে না। কাউকে জানায়নি। এর মধ্যেই মন্টুর সঙ্গে ওদের হাসপাতালে দুদিন দেখা করেছে। যেদিন গেঞ্জি খোলার সময় প্রথম রক্তপাত ঘটেছিল, সেইদিনই হোমিওপ্যাথিকে মনে মনে বাতিল করেছিল অমলেশ। মধুসূদনদা বলেছিলেন, দিন সাতেকের মধ্যে ওটা শুকিয়ে ছোট হয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। ওটা এই এক মাসে আরো বেড়েছে। এখন সামান্য ঘষা লাগলেই রক্ত পড়ে। খুড়তুতো ভাই মন্টু নতুন ডাক্তার বটে, কিন্তু সার্জারিতে এর মধ্যেই নাকি পাকা হাত।

ভাল নাম কমলেশ আচার্য। প্রথম দিন দেখে শুনে ইউরিন, ব্লাড-সুগার ব্লাড-প্রেসার পরীক্ষার ব্যবস্থা করাল। তিনদিন পরে এসে রিপোর্ট নিতে বলেছিল। তিনদিন পরে আবার গিয়েছিল অমলেশ। মন্টু বলেছিল, 'ভয়ের কিছু নেই মেজদা,' তোমার রিপোর্ট খুব ভাল, শুধু শুধু ভয় পেয়েছিলে তুমি, এটা এক ধরনের ব্লিডিং টিউমার, ডাক্তারী নাম হেমানজিওমা। আজ একটা ইনজেকশন দিয়ে দিচ্ছি, সাতদিন পরে এসো, কেটে পরিষ্কার করে দেব।"

পুরির ভয় কাটেনি। নতুন ডাক্তার, অভিজ্ঞতা কম। কি জানি কি হবে।

সাতদিন পরে অপারেশন টেবিলে ডান কাত হয়ে শুয়েছিল অমলেশ। গায়ে একটা চাদর ঢাকা। বাঁ কানের চারপাশ অসাড়। ইনজেকশন দিয়ে অসাড় করে রাখা হয়েছে। অথচ বেশ টের পাচ্ছিল অমলেশ, কচকচ করে কিছু একটা কাটা হচ্ছে কানের পাশে। কিন্তু কোন বেদনা নেই। একটুও লাগলো না। কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এক গোছা তুলো এঁটে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দিল মন্টু।

"ব্যস হয়ে গেল, লাগলো কিছু?" মন্টুর কথা শুনে বললো অমলেশ, "কিছু একটা কাটছিস মনে হচ্ছিল, কিন্তু লাগেনি।"

"চলো বাইরে একটু বসবে, এখন

মণ্টুর কথায় স্বস্তি পেলেও, পুরো- ট্যাক্সি ডেকে দিচ্ছি, সোজা বাড়ি চলে যেও।

"এত বড় একগোছা তুলো কানের পাশে নিয়ে অফিসে যাব কি করে?"

"তাহলে কয়েকদিন ছুটি নাও, তিনদিন পরে এসো, ব্যান্ডেজ বদলে দেব, তখন আর অসুবিধে হবে না, আরেকটা কথা, ওখানে মোটে জল লাগাবে না, আলগাভাবে মাথা ধুয়ে নেবে, আর এই কটা ট্যাবলেট রাখো, ব্যথার ওষুধ।"

"তুই আমাকে বাঁচালি মণ্টু, যা ভয় পেয়েছিলুম।" অমলেশের চোখে জল এসে গেল।

"শুধু শুধু ভয় পেয়েছিলে তুমি, ক্যানসার কি অত সুখের কথা।"

অনেক বাদে ট্যাক্সির পেছনের সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজল অমলেশ।

শ্রাবণের মেঘলা আকাশ। ঝির ঝির ঠাণ্ডা হাওয়া। মুক্তি, মুক্তি। রোগ থেকে মুক্তি, ভয় থেকে মুক্তি, মনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি। প্রায় পাঁচ মাস পরে যেন নতুন করে মা, বোন, বউ ছেলের সংসারে আবার ফিরে যাচ্ছে অমলেশ।

বিশ্ববিজ্ঞান

উইপোকা এবং চুম্বক

উইপোকার দেহে অদ্ভুত এক ধরনের প্রত্যঙ্গ আছে। প্রত্যঙ্গটি চৌম্বক-ক্ষেত্রের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাদের চারপাশের চৌম্বক-ক্ষেত্রে সামান্যতম পরিবর্তন ঘটলে এই প্রত্যঙ্গটির সাহায্যে সেটা তারা বুঝতে পারে। সম্প্রতি চমকপ্রদ এই তথ্যটি আবিষ্কার করেছেন বার্লিন-ডাহ্‌লেমে অবস্থিত বুনডে সানসটাট ফুর মাটেরিয়েলপ্রুফুংগ-এর বিজ্ঞানী এবং বিশ্বখ্যাত উইপোকা বিশেষজ্ঞ ডঃ গুনথের বেকার। ডঃ বেকারের বক্তব্য, পথ চিনে ঈপ্সিত লক্ষ্যে চলার সময় উইপোকা কখনও কখনও চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্য নেয়।

ডঃ বেকারের কথা শুনে কোন কোন কীট-বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন, তাই যদি হয়, তা হলে কৃত্রিম উপায়ে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে উইপোকাদের তো বিপথগামী করা যেতে পারে? কিংবা ধরুন, তাদের চলাচলের ব্যাপারটাও তো নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

হ্যাঁ, প্রকৃতির বিচিত্র এই প্রাণীর চরিত্রটি সত্যিই রহস্যজনক। বাইরের চাল-চলনে ওরা খুব নিরীহ। ওরা বাস করে দলবদ্ধভাবে। সুষ্ঠু নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। এক একটি দল যেন এক একটি উপনিবেশ। ওদের বেশির ভাগই অন্ধ। কিন্তু অদ্ভুত ওদের সামাজিক ব্যবস্থা। নিজেদের মধ্যে বিরোধ নেই। প্রত্যেকেই এক একটি নীরব কর্মী। খাবারের সন্ধান পেলেই ওরা দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যায়। সে খাবার কাঠের তৈরি আসবাবপত্র হতে পারে। গাছপালাও হতে পারে। অথবা খেত-খামারের ফসল। সেই ফসলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কখন যে তাদের নিঃশেষ করে দেয়, বুঝে ওঠা শক্ত। পৃথিবীর বুকে ওদের এই দৌরাত্ম্য কতকাল ধরে চলছে, কেউ জানে না। বিষুবরেখার উত্তরে পঞ্চাশ ডিগ্রি এবং দক্ষিণে পঞ্চাশ ডিগ্রি—বিস্তৃত এই অঞ্চলের মানুষের কাছে উইপোকা সত্যিই যেন এক সর্বনাশা কীট!

উইপোকার চলাচলের ব্যাপারে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখেছেন, নিজেদের আস্তানা থেকে যেখানে খাবার পাওয়া যায়

ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দেয়। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলা হয় ফেরোমোন। পদার্থটি ওদের দেহ থেকেই নিঃসৃত হয়। কীটপতঙ্গের এবং বিভিন্ন রকমের প্রাণীর আচরণ এ ধরনের বস্তু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই ফেরোমোনকে অনুসরণ করে—খানিকটা গন্ধ শুঁকে পথ চলার মত—উইপোকারা খাবারের দিকে দলবদ্ধভাবে এগিয়ে যায়। কোন কোন গাছ বা কাঠের গন্ধ শুঁকেও তারা লক্ষ্যস্থলে এগিয়ে যেতে পারে। তবে সব চাইতে বিস্ময়কর এই, কখনও কখনও দেখা যায় চৌম্বক এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রও ওদের আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন দেখা গেছে, উইপোকার ঢিবির কোন কোন পাশ ঢালু। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে

সমতলের মত উপরের দিকে উঠে এসেছে। অথবা ম্যাক্রোটারমাইটাইনি নামে এক ধরনের উইপোকার রাণীরা যেমন দেখা যায় বিশ্রাম নেয়ার সময় উত্তর-দক্ষিণ, কিংবা পূব-পশ্চিম বরাবর সারিবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এ ধরনের আচরণের পেছনে কাজ করে পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখার কায়দা কানুন।

ডঃ বেকার পরীক্ষার জন্যে তাঁর গবেষণাগারে একটি বৈদ্যুতিক হিটারকে কাজে লাগিয়েছিলেন। হিটারটি জ্বালানো হয়েছিল পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহের (এ সি কারেন্ট) সাহায্যে। এর ফলে হিটারটির চারপাশে একটি পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট হয় যার কম্পাঙ্ক ছিল ৫০ হার্ৎজ। যথেষ্ট সংবেদনশীল যন্ত্রের সাহায্যেও এত

সচিত্র সংবাদ

বাঁ পাশে : মমির মাথা থেকে চুল সংগ্রহ করছেন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈকা বিশেষজ্ঞ। মমিটি ১৮৯৮ সালে মিশরের রাজা টুট-আঁখ-আমুনের কাছাকাছি একটি সমাধি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। প্রায় ৩,৩০০ বছর আগে টুট-আঁখ-আমুন মিশরে রাজত্ব করতেন। মমিটি আবিষ্কার করার পর ধাঁধায় পড়লেন অনেকে। মমিটি টুট-আঁখ-আমুনের যে কোন আত্মীয় অথবা আত্মীয়ার, সেটা অবশ্য কারোর অনুমান করা শক্ত হয় নি। কিন্তু কেউ সঠিক পরিচয় দিতে পারলেন না। ১৯২২ সালে টুট-আঁখ-আমুনের সমাধির মধ্যে পাওয়া গেল এক গুচ্ছ চুল। এক্স-রশ্মির সাহায্যে সেই চুলের ছবি তুলে এবং ওই মমির চুলের এক্স-রশ্মি-ছবির সঙ্গে ছবিটির মিল খুঁজতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন, মমিটি টুট-আঁখ-আমুনের ঠাকুমা রাণী টাই (Tiy)-এর। ডান দিকে এক্স-রশ্মির সাহায্যে তোলা রাণী টাই-এর পূর্ণাঙ্গ ছবিটি দেখান হল

গেলে মূল উৎস থেকে ওই যন্ত্রের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটারের বেশি হওয়া উচিত নয়। তার বেশি হলে ওই ধরনের চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতি জানা শক্ত হয়। অথচ ড. বেকার লক্ষ করেন, তিন মিটার দূর থেকেও উই পোকারা ওই মৃদু চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব বুঝতে পারে। তাদের নেয়া হয়েছিল প্লাস্টিকের তৈরি একটি থলের মধ্যে। তিনি দেখলেন, হিটারটি জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে যে দিকে হিটার রয়েছে তার বিপরীত দিকে পোকাগুলি দলবদ্ধভাবে সরে গিয়ে এক জায়গায় ভিড় করছে।

তাই যদি হয় যে সব জায়গায় উই-পোকার আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, সে সব জায়গায় উপযুক্ত চৌম্বক-ক্ষেত্র সৃষ্টি করে তো তাদের ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে! দরকার হলে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ওই ভাবে একত্রিত করে বুভুক্ষু অবস্থায় রেখেও তাদের মেরে ফেলা যায়!

উত্তরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ পর্যন্ত গবেষণায় ফলাফল যা দেখা গেছে তাতে মনে হয়, হয়ত ওই ভাবে কিছুটা সুফল পাওয়া যাবে। তবে শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতি কতটা কার্যকর করা সম্ভব হবে বলা শক্ত। কারণ, উইপোকা তো আর এক-আধ রকম নয়? এ পর্যন্ত নানা রকম উইপোকার সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে সব প্রজাতির উইপোকা চোম্বক ক্ষেত্রের সান্নিধ্যে যে এ ধরনের আচরণ করবে এমন তো নাও হতে পারে? অতএব কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থকে এখনই বিদায় দেয়া যায় না।

তা ছাড়া এমন আশঙ্কাও করছেন কেউ কেউ, কৃত্রিম চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে কারোর বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে যাতে উই-পোকা না আসতে পারে তার না হয় ব্যবস্থা করা গেল। কিন্তু এমন যদি হয় ওই একই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পড়ে ওই পোকাগুলি তাদের গন্তব্যপথ পালটে অন্যান্যদের বাড়ি ধাওয়া করে বসল, তখন কি হবে? বিজ্ঞানীরা এদিকটাও এখন খতিয়ে দেখছেন।

গাছও রোগ প্রতিরোধ করে

সহজাত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার দরুন মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী নানারকম ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকজনিত রোগের হাত থেকে রেহাই পেয়ে থাকে।

প্রশ্ন : প্রাণীদের মত গাছপালারও কি রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে?

বিজ্ঞানীদের উত্তর : হ্যাঁ, উদ্ভিদও নিজস্ব ক্ষমতায় অনেক রোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

গাছপালা নিজস্ব ক্ষমতায় এক শ্রেণীর বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ তৈরি করে। যাদের বলা হয় ফাইটোস্লেকসিনস। জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে গাছ এই বস্তুগুলির সাহায্যে তাদের হত্যা করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, এ তথ্য বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুকাল আগে থেকেই জেনে আসছেন। কিন্তু জীবাণুর আক্রমণ ঘটলে উদ্ভিদ দেহে কিভাবে ওই বস্তু তৈরী হয়, সে কথা তাঁদের জানা ছিল না।

সম্প্রতি এ ব্যাপারে খানিকটা আলোক-পাত করেছেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক। ও'রা কয়েকটি রোগাক্রান্ত সোয়াবিন গাছ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণই গাছগুলির রোগের কারণ। ও'রা দেখলেন, গাছগুলির গায়ে ছত্রাক বাসা বেঁধেছে। আর সেই ছত্রাকের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে এক ধরনের শর্করাজাতীয় পদার্থ। নাম বিটা-গ্লুকান। ও'দের বক্তব্য, এই বিটা-গ্লুকানই রোগ প্রতিরোধী বস্তু ফাইটোস্লেকসিন সংশ্লেষণ করার ব্যাপারে উদ্ভিদকে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের গাছগাছড়ার ওপর বিটা-গ্লুকান প্রয়োগ করে ও'রা একই ফলাফল লক্ষ করেছেন। উল্লেখ্য, বিটা-গ্লুকান বিষাক্তও নয়।

এই আবিষ্কারে একদল উদ্ভিদ রোগ বিশেষজ্ঞ খুবই উৎসাহিত। তাঁরা বলছেন, সারা পৃথিবীতে ছত্রাক এবং নানারকম ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে বছরে প্রচুর শস্য এবং বনসম্পদ নষ্ট হয়। উদ্ভিদ রোগ প্রতিরোধ করার জন্যে কাজে লাগান হচ্ছে ডি ডি টি এবং আরও নানা রকম কীট এবং জীবাণু নাশক ওষুধপত্র। এদের প্রত্যেকটিই বিষাক্ত সামগ্রী। এদের প্রয়োগ করার দরুন কখনও কখনও খাদ্যশস্য বিষাক্ত হতে দেখা গেছে। এ ছাড়া পরিবেশ দূষণের প্রশ্ন তো আছেই। এখন পরিস্থিতিতে বিটা-গ্লুকানের ভূমিকা নিশ্চয় আশাব্যঞ্জক। বস্তুটি বিষাক্ত নয়। অতএব গাছ-পালায় প্রয়োগ করলে পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা নেই। অথচ এর সাহায্যে গাছে রোগ প্রতিরোধী বস্তু ফাইটো-স্লেকসিন তৈরি হয়। যা ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারে। যাই হোক, কলোরাডো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই আবিষ্কার দেখে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে ক্ষতিকর নয়, এমন ধরনের কীটনাশক ওষুধ তৈরি করার কাজটা হয়ত সহজতর হবে।

মানসিক রোগীর পছন্দ

একচল্লিশজন মনের রোগীকে বিশেষজ্ঞদের সামনে নিয়ে আসা হোল একে একে। ও'দের কেউ খিটখিটে মেজাজের। কেউ ভুগছেন মানসিক অবসাদে।

বিশেষজ্ঞরা একে একে জিজ্ঞেস করলেন, মন থেকে পর পর কতকগুলি শব্দ বলে যান তো? যে কোন ধরনের শব্দ, এই মুহূর্তে যা যা আপনার মনে আসে, দ্বিধা না করে বলে যান।

প্রত্যেকেই উত্তর দিলেন। যে যে শব্দ মনে পড়ল, বলে গেলেন তাঁরা।

এর পর বিশেষজ্ঞরা স্বাভাবিক মনের কয়েকজনকে পর পর ওই একইভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

অতঃপর উত্তরগুলি পরীক্ষা হল। অদ্ভুত ব্যাপার!

বিশেষজ্ঞরা দেখলেন, যাঁরা স্বাভাবিক মনের মানুষ তাঁরা এমন সব শব্দ বেশি উল্লেখ করেছেন যেসব শব্দ মধুর অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। যেমন, হাসি, আদর করা ইত্যাদি। আর মনের রোগীরা বলে গেছেন সেইসব শব্দ যারা বিরক্তি, ভয়, এমন ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। যেমন, ক্যানসার, লজ্জা ইত্যাদি।

পরীক্ষাটি চালিয়েছিলেন শিকাগোর মাইকেল রিজ হাসপাতালের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ।

সমরজিৎ কর

বাউল গানের সাধনতত্ত্ব

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

বাংলার বিশেষ একটি ধর্ম ও সাধনার মানব সম্প্রদায়ের নাম বাউল। বাউল শব্দটির তিন রকম ব্যাখ্যা প্রচলিত। প্রসঙ্গত বায়ু অর্থাৎ স্নায়বিক শক্তির উত্তর আছে অর্থে 'ল' প্রত্যয় করে হয়েছে 'বায়ুল' এবং বায়ুল থেকেই হয়েছে বাউল। যে সাধনায় মানুষের দেহে স্নায়বিক শক্তির সঞ্চার হয়, তার নাম বায়ুল বা বাউল সাধনা। দ্বিতীয়ত, বায়ু শব্দের অর্থ শ্বাস-প্রশ্বাস। এখানেও ঐ একই অর্থে 'ল' প্রত্যয়টি যুক্ত। অর্থ হচ্ছে, যে সাধনা শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে দীর্ঘায়ু ও শিব-সুন্দর জীবন লাভের সহায়ক, তারই নাম বাউল সাধনা। তৃতীয়ত সংস্কৃত বাতুল শব্দের অপভ্রংশেই বাউল শব্দের জন্ম। যারা বাতুল অর্থাৎ যাদের জীবন ও মনন যাত্রার মধ্যে অনেকখানি বাতুলতা, অসামাজিকতা ও অস্বাভাবিকতা আছে, তাদেরই নাম বাউল। বাউল শব্দের সঙ্গে আউল শব্দটি প্রায় নিত্য সহচর। তৃতীয়, এই আদর্শ বা অভিমত অনুসারে আউল ও বাউল যথাক্রমে আকুল ও বাতুল শব্দেরই প্রাকৃত রূপ।

ব্যুৎপত্তিগত এই তিনটি ব্যাখ্যার যেটিই যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহ্য হোক না কেন, এ সত্যটি সর্বত্রই স্বীকৃত যে, এই বাউল সম্প্রদায়ের জীবন ও সাধনধারা অনেক-খানি অসামাজিক ও অসাধারণ। এ'দের সাজ-পোশাক, আচার-ব্যবহার ও ধ্যান-জ্ঞান প্রচলিত দৃষ্টিতে অনেকখানি বাতুলতা ও ব্যাতিক্রমে ভরা।

তাই আমাদের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা, এই বিশেষ প্রকৃতির ধর্ম ও সাধনা, এই বিশিষ্ট শ্রেণীর সাধক সম্প্রদায়ের উদ্ভবের উৎস কি? বাউল গানের সাধনতত্ত্বের আলো-চনার সূচনাতে যথাজ্ঞান এ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিসাধনের চেষ্টা করছি।

পঞ্চদশ শতকের বাংলায় রাজ সিংহাসনে সমাসীন হলেন অত্যাচারী মুসলমান নৃপতিসমাজ। জনগণের উপর তাঁদের অকথ্য অত্যাচার, উৎপীড়ন শান্তি-প্রিয় ও ধর্মভীরু মানুষের মধ্যে প্রবল সংসার-বিতৃষ্ণা জাগিয়েছিল। জীবিকার অনুরোধে এক প্রকার ভেক ধারণ করে এ'দের মধ্যে কেউ কেউ বৌদ্ধ শ্রমণদের মত স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন। সকলের না হোক্, এ'দের কারও কারও রুচি ও জীবনবোধের মধ্যে শুচিতা শুভ্রতার পরিচয়ও ছিল সবিশেষ। মাধবেন্দ্র পুরী বা পুরী গোসাঞী ছিলেন এমনই একজন পুরুষ, যিনি বিষ্ণুভক্ত ও প্রেমোন্মত্ত চরিত্র। অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীর নীরস ধর্মপথ পরিত্যাগ করে তিনি সহজ প্রেম ও ভক্তির পথকেই ধর্মসাধনার প্রকৃষ্ট পথ বলে সেদিন বেছে নিয়েছিলেন এবং চরিত্রের প্রেম ও ভক্তি সম্পর্কে উচ্ছলতা ও বাতুলতার পরিচয়ে বিচক্ষণ ও দৃষ্টিবান মানুষের কাছে তিনি প্রেম-বাতুল বা বাউল আখ্যা লাভ করেছিলেন। এইভাবে বৈষ্ণব মাধবেন্দ্র বাউল মাধবেন্দ্রে রূপান্তরিত হলেন। মাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রশিষ্য ঈশ্বরপুরীও গুরুর আদর্শে বাউল সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুও মাধব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনু-সরণে বাউল-পন্থী হলেন। এরপর স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও ঈশ্বরপুরীর কাছে দীক্ষিত হয়ে বাউলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আবাল্য সন্ন্যাসব্রত নিয়ে পরিব্রাজকের বেশে মাধবেন্দ্র পুরীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শেষে মহাবাউল বলেই পরিগণিত হলেন।

এইভাবে কালধর্মের প্রয়োজনে একে একে বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজ বাউল ধর্ম ও সমাজে রূপান্তরিত হলো। একদিকে মুসলমান নৃপতিগোষ্ঠীর নিপীড়ন, অন্য-দিকে পুরাণ-কোরাণ ও মন্দির-মসজিদের নির্দেশিত ধর্মের অমানবিকতা, প্রধানত এই দ্বিবিধ পেষণের মধ্যে সেদিনের ধর্মজীবন একান্ত বিপর্যস্ত। তাই বাউলের প্রেম-ধর্ম ও সহজিয়া-সাধন সমসাময়িক ধর্মজীবনের পরম অবলম্বন হয়ে ওঠে।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের মধ্যে মানুষের জাতি, বর্ণ বা ব্যক্তির স্থান ছিল নগণ্য। ভক্তি বা প্রেমই ছিল প্রকৃত ভক্ত বা সাধকের একমাত্র মানদণ্ড ঃ

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

ভক্তিমান চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। আবার ভক্তিহীন ব্রাহ্মণও কুকুরের

অধম। বাউলের সাধনায়ও জাতি ধর্মনির্বিশেষে এই বিশুদ্ধ প্রেম-ভক্তির আদর্শই মূল ও মুখ্য কথা।

ভক্তের প্রেমে ওগো বাঁধা আছে সাঁই
হিন্দু কি মুসলমান বল্যা তোর জাতের বিচার
নাই।
ভক্ত ছিল কবীর জোলা
ও যে পাইয়াছে ব্রজের কালা।
ও তোর সাধন জোরে পায়॥'

'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন বলে, জাতের কি-রূপ দেখলাম না
এই বজরে।'

এখানে এই চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবের প্রেমসাধনা আর লালন-প্রবর্তিত বাউলের প্রেম সাধনায় মানুষের ও মানবতার একটি অভিনব মূল্য ও মান স্বীকৃত হয়েছে। ব্রাহ্মণ-মানুষ অথবা চণ্ডাল-মানুষ। হিন্দু-মানুষ অথবা মুসলমান মানুষ—এ প্রশ্ন একান্তই অবান্তর ও অকিঞ্চিৎকর। ভক্তির মানুষ ও প্রেমের মানুষের কথাই এ সাধনা ও এই সাধন-সঙ্গীতের মূল ও মর্ম কথা। তাই বাউলের গান—

ফুটেছে ফুল শ্বেত-পদ্ম প্রেম-সরোবরে,
ফুল ফুটেছে আপন জোরে—শ্বেতপদ্ম
যারে বলে।
নীল-পদ্ম নীহারে রেখে, লাল-পদ্ম মনোহরে,
কোন ফুলে হয় আল্লার আলী, কোন ফুলে
ফাতেমা বিবি,
কোন্ ফুলেতে বিবি হাসু, চক্ষুদান দিয়েছে।'

বাউল সংগীতের ও বাউল সাধনার এই প্রেম-মন্ত্রের কথা শাক্ত সাধকদের সাধন সংগীতেও সমভাবে ধ্বনিত:—

যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙ্গা পায়,
আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই।

অথবা,

আমায় দে মা পাগল করে (ব্রহ্মময়ি)
আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।
তোমার প্রেমের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা,
ও মা ভক্ত-চিত্তহরা, ডুবাও প্রেম-সাগরে॥

আসল কথা, বিচিত্র শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের পেষণে মানুষের যে সহজ সত্তা, যে প্রেমময় সত্তা এতদিন নির্যাতিত ও নিষ্ক্রিয় হয়েছিল, এ যুগে অর্থাৎ ১৬শ শতকের শেষ পাদ এবং ১৭শ শতকের প্রথম পর্বে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সহজিয়া ধর্ম ও সাধনার মিলনে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সেই সহজ মানুষ ও প্রেমিক মানুষের একটা নতুন মূল্য ও মান স্বীকৃত হলো। মানবতাবোধ ও মানব-দেবত্ব মূলক সাহজিকতার নবতর মূল্যবোধ এ দেশের ধর্ম, সাধনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। বৈষ্ণব সহজিয়া কবি চণ্ডীদাসের বাণী—

'শুন হে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'—

এ যুগের ধর্ম ও সাধনায় নতুন ও বলিষ্ঠ তাৎপর্যে মণ্ডিত হল। সহজ মানবতা বা মানব দেবতাবাদের আদর্শে ধর্ম ও সাধনার চরিতার্থতা সাধনে নিরত হল মানুষ—

'A new philosophy grew up based on the material of human values. It trusted in the latent divinity of the human soul, in the universality of love, and in the dynamic power of emotion. It released powerful spiritual energy hitherto pent up by social barriers among the dumb millions of the soil.

The Cultural Heritage of India
Vol. III page 460

হিন্দু ও মুসলমান বাউল সাধকদের এই হৃদয়াভিত্তিক, প্রেমাভিত্তিক সাধনার প্রকৃত নাম সহজিয়া সাধনা। এই সহজিয়া ধর্ম ও সাধনা প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্ট কোন ধর্মসম্প্রদায় নয় বিশেষ কোন মতবাদ বা বিশ্বাস নয়। হিন্দু, মুসলমান অথবা বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্রের অনুসরণ, অনুবর্তনের প্রশ্নও এখানে আদৌ নেই:—

'Sahaja is not a cult or creed. It is a path or panth which needs no formal convention in faith. Literally, it is a return to what one is born with i.e. to the divine in man.'

Do.—Page 462.

মানুষের আপনারই অন্তর্নিহিত পরম সত্য—নিবাসত্তায় প্রত্যাবর্তনের নামই সহজ সাধনা। মানুষের মধ্যে একদিকে তার অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রমাগত স্ব-স্বরূপে অভিব্যক্তি লাভের জন্য সচেষ্ট। অন্যদিকে বহিঃপ্রকৃতি প্রতিনিয়তই সেই অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমবিকাশের পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করে চলেছে। অন্তর্নিহিত শক্তি ও বহিঃপ্রকৃতির এই নিয়ত সংগ্রামই মানুষের জীবন। সহজ সাধনায় মানুষের অন্তর্নিহিত গাহায়িত এই নিবাসত্তায় প্রত্যাবর্তনই মূল ও মুখ্য কথা। সচরাচর মানুষের মন বহির্মুখী। আপনার বাইরে, দূরে, সুদূর লোকেই মানুষ তার অন্তরের দেবতা, তার অভীষ্টের সন্ধানে ফিরে বেড়ায়। কত না আচার-অনুষ্ঠান, বার-ব্রত পাঁজি-পুঁথির বিধি-নির্দেশ এই অভীষ্ট লাভের আশায় সে পালন করে! বাউলের সহজ-সাধনায় এ-সবই 'এহো বাহ্য'। এ সাধনা মানুষকে নিঃশেষে জানার সাধনা। এ সাধনা অপনার খোল আনা পরিচয়ের সাধনা। তাই বাউলের গান—

আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের
মানুষ যেরে,
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

বাউল তাই গেয়েছেন,—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।
একবার দিব্য চক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবে
সর্ব ঠাঁই॥

স্থানান্তরে দেখি,—

আপন দেশে যে জন বসে
চিনতে পারে আপনারে
ধন্য বলি তারে।

অথবা

ছাড়িলে এই দেশ
পাবিনে উদ্দেশ
কেন ঘুর' দেশ বিদেশ
ঘরে আইলে না।

বাউলের মতে এই স্থূল রক্তমাংসের দেহের মধ্যেই সেই চিদানন্দময় নিত্য-সত্তার বাস। কাজেই এ দেহ উপেক্ষণীয় নয়,—

'কারে বলব কে করবে বা প্রত্যয়!
আছে—এই মানুষে নিত্য সত্য চিদানন্দময়।'

কিংবা,

যারে আকাশ পাতাল খুঁজে মরিস্
এই দেহে সে রয়।'

কাজেই বাউল সংগীত ও বাউলের সহজ সাধনার তত্ত্ব-কথা, মর্ম-কথা—এই ঘরে ফিরে আসার কথা, যাকে তত্ত্বের ভাষায় বলে 'আবৃত্ত-চক্ষু' হওয়া। যেহেতু বাউলের এই সহজ সাধনা, বহিরাভিযানের সাধনা নয়, তাই এখানে 'বিচারের স্রোতপথ' 'তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি' আদৌ রুদ্ধ করে তোলেনি। জ্ঞান এখানে মুক্ত। এঁদের সাজ বেশ, আহার-বিহার, চলন-বলন—সবই সহজ। এঁরা প্রকৃতি-লালিত, প্রকৃতি-পালিত ও প্রকৃতি-পরিবর্ধিত।

'আপনার ভাণ্ড ছেড়ে, কেন খুঁজে বেড়াও
জগৎ জুড়ে?
আপনার ভাণ্ড খোঁজ, রূপ স্বরূপে দেহ মাজ,
যারে প্রেমের অংকুর হয়।'

বাউলের এই আপনার মধ্যে 'মনের মানুষ' বা সকল মনের মানুষের সন্ধানের আদর্শ শাক্ততান্ত্রিক সহজিয়াদের মধ্যেও সুস্পষ্ট :

আপনারে আপনি দেখ, যেওনা মন, কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ—অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি—যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ
দুয়ারে॥

অথবা

ভ্রমে লোকে ভুলে তত্ত্ব, ভ্রমণ করে নানা তীর্থ,
ভব তত্ত্ব ভুলে, ও মা দুর্গা দুর্গা দুর্গা ও মা।

একালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাউল ও তান্ত্রিক সাধকের এই সহজ ভাবের উপাসনার আদর্শকে, এই আত্মদর্শনের আদর্শকে তাঁর সাধন সংগীতে অবিকল রূপায়িত করেছেন :

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ
আপনার আবরণ!
খুলে দেখ দ্বার, অন্তরে তার আনন্দ নিকেতন।
(১৮৪নং-গীতবিতান)

অথবা,

আর রেখোনা আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও॥
(১৯২ নং-গীতবিতান)

কিংবা

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
কাছের জিনিস দূরে রাখে তার থেকে তুই দূরে
রবি॥
(১৮৯ নং—ঐ)

সহজ সাধনার লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই 'আনন্দনিকেতন-'এ গিয়ে পৌঁছানো—আপনার অন্তরের আনন্দময় সত্তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি। বাউল সাধকের সহজ সাধনারও পরিণতি 'আনন্দবাজারে বেহাল মানুষে'র সন্ধান অথবা 'রূপনগর'-এর সন্ধান :

মানুষ আছে গো, আছে মানুষ।
আমার বেহাল মানুষ আছে আনন্দবাজারে
নিঘুম।
এক মানুষ বসে থাকে, আর এক মানুষ
মজা লুটে,
আর এক মানুষ আছে হৃদয় মন্দিরে নিঘুম।
(৬৩নং—হারামণি)

রূপনগর সারোবরে আনকা তরু দুই আছে,
এক ফল ধরেছে রূপনগর কতই থলক মারছে।
(২১নং—হারামণি)

এ-সাধনা নিছক প্রেমের সাধনা, অনুরাগের সাধনা। স্বর্গ বা মোক্ষ এ সাধনায় সাধকের কাম্য নয়,

ফলের আশা করে না সে
ফুলের মধু পান করে যে
রসিক সুজনা।

ও সে অনুরাগের ঘরে, কপাট মেরে
নিহেতু প্রেম বেচা-কেনা
দেখলে যায়রে চেনা॥

বাউল সংগীতে সাধকের এই অহেতুক প্রেমের লীলা এই অবিমিশ্র আনন্দ অনুভূতির আদর্শ তান্ত্রিক সাধনার সহজ সুরের মধ্যেও লক্ষনীয়।

'মা, না করি নির্বাণে আশ, না চাহি
স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।'
(১৬১নং—ভক্তের আকুতি)

অথবা,

যেন ভক্তি থাকে তোমার রাঙা পায়,
আমার মুক্তি-পদেতে কাজ নাই।
(২০৮নং—ভক্তের আকুতি)

বাউল সহজিয়ার এই 'মনের মধ্যে মনের মানুষে'র সন্ধান অথবা 'তোরই ভিতর অতল সাগর'—আপনার জীবন-নদীর আড়ালে এই অতল-স্পর্শ জীবন-সাগরের অনুসন্ধান, মানুষের জীবন-অভিব্যক্তির সহজ পথ ও পদ্ধতি। কারণ মানুষের চিত্ত ও চরিত্রের উৎকর্ষ ও অভ্যুদয়ের সহজ ও সুনিশ্চিত গতি এই আভ্যন্তরীণ গতি। আপনার যে সহজ, নির্মল ও পূর্ণ রূপ বাইরের নানা মত ও বিশ্বাস, আচার ও সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন ও ম্লান মনের মধ্যে মান লুকিয়ে তারই দর্শন স্পর্শন ও অনু-ধ্যান—এ সাধনার সত্য ও সাধ্য বস্তু। তাই বাউলের সাধন—সহজ সাধন—বাউলের দেবতা—সহজ মানুষ মনের মানুষ বা সকল মনের মানুষ। যে সাধনায় এই মনের মানুষ উপেক্ষিত বা অন্তরিত বাউলের কাছে তা অনাদৃত। এখানে বাউলের দৃষ্টি বৃহদারণ্যক উপনিষদের দৃষ্টির সঙ্গে একেবারে সমগোত্রীয় :

'অথ যোহন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে,
অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।'

নিজের ইষ্টদেবতাকে যে আপনার থেকে পৃথক করে দেখে, সে দেবতাকে যে দেবতাদের পশুস্বরূপ এবং সে নিজের ইচ্ছা ও কার্য দ্বারাই আপনার আত্মিক সত্তা থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে রাখে।

সাধনার এ-মত ও পথ সহজিয়া আদর্শের বিপরীত। কাজেই এখানে অশিক্ষিত বাউলদের সাধন-তত্ত্ব ও উপ-নিষদের সাধনা-তত্ত্ব মূলত এক ও অভিন্ন। আগেই উল্লেখ করেছি—

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
কাছের জিনিস দূরে রাখে, তার থেকে তুই
দূরে রবি।

রবীন্দ্রনাথের এ গানও এই উপনিষদ ও বাউলের সাধন তত্ত্বের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা।

এই সহজিয়া সাধনের অন্তরালে যে পরম তত্ত্বটি নিহিত, তা হচ্ছে—'মানুষের দায়, মহামানবতার দায়।' একলা-আমি ও ক্ষণিক-আমিকে নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত থেকে মানুষ প্রতিপদেই, তার সকল-আমি ও নিত্য-আমিকে হারিয়ে ফেলে। তাই,

'আমার' 'আমার করে মত্ত হই মা অনিবার,
* * * *
কিন্তু আমি কোন্‌খানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানে,
কোন্ পথে গেলে ওমা আমি মিলে দে মা বলে?
(১৯৩নং—ভক্তের আকুতি)

তান্ত্রিক সাধকের যেমন এই আকুতি,

গুরু! সব-ভাব দাও আমার মনে,
রাঙা চরণ আমি যেন আমি ভুলিনে।
(৪৭নং—হারামণি)

বাউল সাধকের, সাধন সংগীতের অন্তরেও এই 'আমি'র আড়ালে 'আমি'র সন্ধানের জন্য একই আকুতি ও আকিঞ্চন। এ আকিঞ্চন শাশ্বত কালের, বিশ্ব মানুষের জীবনের আকিঞ্চন। তাই বাউলের এ সাধনা, বাউলের এ মানবিক আরাধনা অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বজনীন।

এখন বাউল সংগীতে কায়সাধন বা দেহতত্ত্বের কথা। বাউলের সাধনা প্রেমের সাধনা, রসের সাধনা সত্য, কিন্তু দেহকে কেন্দ্র করেই এর স্থিতি ও গতি। বাউলদের কাছে এই দেহই প্রকৃত মন্দির। মানব মনই মন্দিরের বেদী এবং এই বেদীর উপরেই বাউলের মনের মানুষ প্রতিষ্ঠিত। বাউল মতে এই দেহ-ভাণ্ডই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, আলো-অন্ধকার—সবই এই দেহের অভ্যন্তরে নিহিত। বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বরের যাবতীয় তত্ত্ব ও রহস্যই এই দেহ-বিজ্ঞানের আয়ত্তে। কাজেই বাউল সাধকদের কাছে দেহ আদৌ উপেক্ষিত নয়, নিপীড়িত বা নিষ্পেষিত নয়। অবশ্য দেহ-সর্বস্বও এঁরা নন। মন্দিরের শুচিতায়, সংস্কারে ও পরিমার্জনায় যেমন দেবতার আবির্ভাব ও অভিব্যক্তি, তেমনি দেহেরও সংস্কার সংযমন ও নিয়ন্ত্রণে দেহ-মন্দিরে মনের মানুষের অনুভব ও উপলব্ধি তাই বাউলের সাধনায় ও সংগীতে কায় সাধনের স্থান সবিশেষ এব সাধনার এই আদর্শে বৌদ্ধ সহজিয়া সুফী সহজিয়া, শাক্ত সহজিয়া—স সহজিয়া সাধনই পরস্পরের সহোদর :

দিল দরিয়ার মাঝে দেখলাম আজব কারখান

দেহের মাঝে বাড়ী আছে,
সেই বাড়ীতে চোর লেগেছে,
ছয় জনাতে সিদ কাটিছে,
চুরি করে একজনা॥
দেহের মাঝে বাগান আছে,
নানা জাতির ফুল ফুটেছে,
ফুলের সৌরভে জগৎ মেতেছে,
কেবল লালনের প্রাণ মাতল না॥

বাউলের এই দেহতত্ত্বের গান এবং প্রসাদী সংগীত—

—এক আসামী ছয়টা প্যাদা বল্ মা কিসে
সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছয়টারে, বিষ খাওয়াইয়ে
প্রাণে মারি॥
(১৬৩নং—ভক্তের আকুতি)

অথবা,

ঘরে আছই বাহিরে পড়ছই।
পই দেক্ থই পাড়িরেণী পড়ছই॥

কিংবা

আসারব কোই শরীরাই লুকো।
জো তাহি জানই সো তাই মুকো॥

বৌদ্ধ সহজিয়াদের এই চর্যাগীতি এবং
পাঁচ তত্ত্বকী পত্তলা সৈবী খেলে সাহি'

সন্ত কবি কবীরের এই তত্ত্বগীতি—এ সবই তত্ত্বত সেই কায় সাধন বা দেহ-তত্ত্বের কথা। সাধনার এই উল্টাগীতি অর্থাৎ আপনার সহজাত বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করে তোলা—বস্তুত বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ও বাউল—সহজিয়া সাধনার সমস্ত ধারাতেই একই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সক্রিয় এবং বাউল সংগীতের অন্তরে একে একে এই বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব ও সুফী সহজিয়া সাধনার ভাব ও তত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়ার মতে যেটি নির্বাণ, সুফী সহজিয়ার মতে তারই নাম ফণা, বাউল সহজিয়ার মতে তারই নাম 'রূপনগর' বা 'আনন্দবাজার'এ পদার্পণ। সাধনার লক্ষ্য সর্বত্রই এক ও অভিন্ন। এমন কি বৈষ্ণব সহজিয়া বাহ্য রূপ-প্রধান বা আবেগ-প্রধান হলেও এবং এই কায়-সাধনার সংগে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলেও তার মূল তত্ত্বে তন্ত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ রাধাতত্ত্ব তন্ত্রের শক্তি তত্ত্বেরই প্রকার ভেদ। আবার বাউল সহজিয়ার সংগে সংগে এই বিচিত্র সহজিয়া সাধনার পরিণতি সর্বত্রই আনন্দ সাগরে অবগাহন ও আত্মোপলব্ধি। এ অবস্থা নেতিমূলক বা শূন্য অবস্থা নয়, পরম ইতি-বোধক ও পূর্ণাবস্থা।

এই দেহতত্ত্ব বা কায়-সাধনমূলক বাউল সংগীতে যে যোগ সাধনার কথা, সে যোগ রূপের সংগে ভাবের যোগ, অবিদ্যার সংগে বিদ্যার যোগ, সান্তের সংগে অনন্তের যোগ, ব্যক্তি মানুষের সংগে মনের মানুষের যোগ—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় জীবনের সংগে জীবন দেবতার সংযোগ। বাউল সাধক তাই সন্ন্যাসীই হোন আর গৃহস্থই হোন এই বস্তু বা রূপ জগৎকে কোনদিনই মায়া বলে পাশ কাটিয়ে রাখেননি—চেয়েছেন শুধু এই সান্ত ও রূপময় জগতের সংগে অনন্ত ও ভাবময় জগতের সংযোগ ও সমন্বয়। পাশ্চাত্য কবি Wordsworth-এর Skylark-এর মত 'true to the kindred points of heaven and home'· তাই বাউলের গান :

"খোল ঘরে বাস্তবী করে কে
আছে নির্গমে শুয়ে।
সে ঘরের আঠার তালা
বাহিরের দরজা খোলা
মটকার উপর দুই বাতি জ্বলে,
যখন আসবে হাওয়া নিভবে বাতি
যেত মানুষ যাবে চলে।"

অথবা,

"অ-ধরাকে ধরবি যদি ধরার সংগ কর।"

প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য, বাউলের এই সাধন-সংগীত রবীন্দ্রনাথের

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে সংগ
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

কিংবা,

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সংগ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।

এই জীবন-সংগীতের সংগে একান্ত সম-গোত্রীয় বস্তু। রবীন্দ্রনাথের সংগীত সাগরে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সাধন-সংগীত-প্রবাহিণীর বিচিত্র ধারার মত বাউল সংগীত-স্রোতস্বিনীর ধারাও স্বতঃই এসে মিলিত হয়েছে।

এরপর বাউলের সাধন সংগীতের ক্ষেত্রে গুরুবাদের কথা। বাউলদের সাধনায় একদিকে বৌদ্ধ সাধক ও নাথযোগীদের ত্যাগ, অপরদিকে সুফী সাধকদের প্রেমের সমন্বয় ঘটেছে এবং এ সাধনা প্রেমের সাধনা ও রসের সাধনা সত্য। কিন্তু এই প্রেম ও রসের অনুভব ও উপলব্ধিতে গুরুর আসন সু-উচ্চে, যদিও এ সাধনায় তান্ত্রিক সাধনার মত শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী—এই ত্রিবিধ দীক্ষার কোনটিই অপরিহার্য নয়। এখানে বস্তুত মনের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা ও বিশেষ একটি জীবন-আদর্শের প্রতি নিষ্ঠারই নাম গুরুবাদ। তবে বৌদ্ধ সহজিয়ার গুরু এবং সুফী সহজিয়ার মুরশীদ বাউল সাধনার জগৎকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। তাই বাউল গেয়েছেন,—

ধরবি যদি অ-ধর মানুষ ধরাকে ধররে মন।
মন ফুলে নয়নজলে পূজল্যা গুরুর শ্রীচরণ॥

অথবা,

মুখে ডাক গুরু বলি কর্ণে শুন গুরুর
গুণাবলী
গুরু ভক্তের পদধূলি ও মন অংগেতে মাখরে।

কিন্তু বাউল সাধনার এই গুরুবাদ বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান ও কোন শাস্ত্র-নির্ভর ক্রিয়া-কলাপের অপেক্ষা রাখে না। ত্যাগঃ-পূত ও প্রেম-গরিষ্ঠ মনোবৃত্তি নিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলা এবং পরিণামে এই চলা ও হওয়ার দ্বারা আপনার পরিপূর্ণ সহজ সত্তাকে পাওয়া—এই হচ্ছে এখানকার গুরুবাদের তত্ত্ব ও তাৎপর্য। নদী যেমন করে শেষ পর্যন্ত সমুদ্র হয়ে যায়, ব্যক্তি মানুষকে তেমনি মনের মানুষের সংগে মিলে যেতে হয়, যে মিলনের ফল সুখে, দুঃখে, লাভ ও অলাভে, আলো ও অন্ধ-কারে মানুষ নির্বিকার ও নির্বিচার থাকে এবং এই অবস্থারই নাম সহজ অবস্থা। এই সহজ অবস্থায় পৌঁছানই সহজ সাধনার লক্ষ্য।

পরিশেষে বৌদ্ধ সাধনতত্ত্ব এবং একালের শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্ম ও সাধন তত্ত্বের সংগে বাউলের সাধন তত্ত্বের বৈসাদৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনায় জীবে দয়া বা জীব-সেবা ভগবৎ সেবার পরম পথ। স্বামীজীর কথা—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর॥

বাউল সাধক জীবমাত্রই শিব—এ তত্ত্বে বিশ্বাসবান। কারণ, 'জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে তার অবতার।' —এ গান বাউলের এই মনোভাব ও বিশ্বাসের অভ্রান্ত সাক্ষ্য। কিন্তু বাউলের সাধনায় মনের মানুষের সেবা-আরাধনাই জ[illegible]-সেবা ও মানব-কল্যাণের পরম ও [illegible]শস্ত পথ। বাউলের সাধনার আদর্শ [illegible]নে ভাগবতের আদর্শের সমধর্মী :

'যথা তারোমূল-নিষেচনেন তৃপ্যাতি
তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব
সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥'

তরুর মূলে জল সেচন করলে যেমন স্বতঃই তার শাখা প্রশাখাদির শ্রী ও পুষ্টি সাধিত হয়, মূল ছাড়া অন্য কোথাও যেমন পৃথকভাবে জল সেচনের প্রয়োজন হয় না, তেমনি বাউলের বিশ্বাস, একমাত্র মনের মানুষের সেবাই সমগ্র জীব সেবার অব্যর্থ সূত্র। তাই বাউল তাঁর সাধন সংগীতের মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের সংগে মনের মানুষের একাত্মতা সাধন করে একান্ত তন্ময়তা ও মন্ময়তার মধ্যেই সাধনায় সিদ্ধি ও সার্থকতা সন্ধান করেন।

এমনিভাবে বাউল গানের সাধন-তত্ত্বের মধ্যে রামধনুর বিচিত্র বর্ণের মত হিন্দু, বৌদ্ধ ও সুফী সহজিয়া সাধনার সহজিয়াতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, কায়সাধন তত্ত্ব ও গুহ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র তত্ত্বের অপূর্ব সমাবেশ ও সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বাংলা ও বাঙালী একদিন 'কীর্তন আর বাউলের গানে মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে'র সমস্ত দ্বার খুলে দিয়েছিল এবং পেয়েছিল সেই পথে তার আপনাকে—আপনার স্বরূপ ও স্বধর্মকে। আত্মপরিচয় ও জাতি পরি-চয়ের সূত্র হিসাবে এই সাধন সংগীত আজও নিঃসন্দেহে বাঙালীর পরম পাথেয়।

আলোচনা

চলতে চলতে

"চলতে চলতে" শীর্ষক ধারাবাহিক নিবন্ধে শ্রীবিমল মিত্র মরিশাস সম্বন্ধে নানা কল্পকথা শোনাচ্ছেন। ১ জানুয়ারী সংখ্যায় তিনি ডাক্তার সুরেশ রামফলের মুখে জানাচ্ছেন—"এখানে পপুলেশন মাত্র আট লক্ষ, এখানে তো রোগটোগ কারো হয় না। তাই ডাক্তারি করি না। আমার ডাক্তারি ডিগ্রী নিয়ে এসে কোনো লাভ হলো না মিস্টার, শুধু আমার বাবার কয়েক হাজার টাকা নষ্ট হলো।" পৃথিবীতে এমন দেশ আছে যেখানে আট লক্ষ অধিবাসীর কারো কখনো অসুখ হয় না, এমন কথা WHO প্রকাশিত কোনো পুস্তিকায় স্থান পায়নি, এ বড় আশ্চর্য কথা। আর এই ডাক্তার সুরেশ রামফলের বাড়িতে "দুখানা মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি বাগানের খোলা আকাশের তলায় পড়ে থাকে।" এই ডাক্তার নিজে রোজ সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত হোটেলে মদ্যপান করেন। এ সবও কী তাঁর বাবার পয়সায়? তা যদি হয়, তবে আর বিশেষভাবে সে কথা উল্লেখের কী আছে?

স্বর্গত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খাবারের যে বর্ণনা বিমলবাবু দিয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি বুঝি চিরকাল এক জামবাটি বার্লি খেয়েই কাটিয়েছেন।

ম্যানহাটান যে আমেরিকার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত জায়গা একথাও বিমলবাবুই প্রথম জানালেন। এতোকাল জানা ছিল যে ম্যানহাটান চোর গুণ্ডা, খুনে, নেশাখোরদের জন্যই বিখ্যাত। ম্যানহাটানের এইসব অপকর্মাদির জন্য ওদেশের কালো লোকদের দায়ী করা হয়ে থাকে। কারণ ম্যানহাটানে মূলত কৃষ্ণকারদেরই বাস।

মরিশাসের সঙ্গে ভারতের তুলনামূলক আলোচনা করার সময় বিমলবাবু স্বদেশের কল্পিত কুৎসা কীর্তনে কম উৎসাহী নন দেখা যাচ্ছে। "আমাদের ইণ্ডিয়াতে এতো রাত্তিরে (ভারতীয় সময় রাত ১১টা) কেউ টাকাকড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরোয় না। আর মহিলারা তো এতো রাত্রে পথেই বেরোবে না—সঙ্গে কিছু থাক আর না থাক, হাতের রিস্টওয়াচ বা ফাউন্টেন পেনটা থাকলেও তা কেড়ে নেবে—।" এটা কী সত্য বর্ণনা? ইণ্ডিয়াতে কী এখনো বা কখনো ওরকম জঙ্গলের রাজত্ব চালু আছে বা ছিল?

এই নিবন্ধে বিমলবাবু এতো অপ্রাসঙ্গিক অযৌক্তিক আশকথা পাশকথা তুলছেন যে রচনাটি সরসতা বিবর্জিত হয়ে দুষ্ট হয়ে পড়ছে। মরিশাসকে তিনি পৃথিবীর স্বর্গ প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন। তিনি বর্ণনা করতে চাইছেন যে সেখানে বেকার নেই, চোর গুণ্ডা খুনে নেই, রোগ-বালাই নেই—ইত্যাদি। এসব কল্পিত স্বর্গসুখ আরোপ করার কী দরকার? প্রত্যেক দেশের সাধারণ মানুষের সাধারণ মনুষ্যত্বের মধ্যেই সে দেশের বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এ পর্যন্ত বিমলবাবু সাধারণ মানুষের মধ্যে এক কৃষি-গৃহিণী যিনি ভারতে এসে সিনেমার নায়িকা হতে চান ও এক বিকৃত মস্তিষ্ক বন্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। এতে মরিশাসকে এখনো স্বর্গীয় মনে করা যাচ্ছে না।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে মরিশাসের জনতা ক্ষমতাসীন সরকারকে গদিচ্যুত করেছেন। তাতেই প্রমাণিত হয় যে, মরিশাসের জনতা স্বর্গসুখ ভোগ করে না।

ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
লখনৌ-৭

॥ ২ ॥

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (দেশ—১০ পৌষ ১৩৮৩) শ্রীবিমল মিত্রের 'চলতে চলতে' পর্যায়ের লেখা পড়ে বিস্মিত হয়েছেন,—ইংরেজরা সিলোন (বা সিংহল বা শ্রীলংকা) কিনল কবে? আমাদের দেশে এশিয়া বা আফরিকার ইতিহাস বা ভূগোল সম্বন্ধে এক বিরাট অজ্ঞতা রয়েছে। শ্রীদাশগুপ্তের এবং পাঠকদের অবগতির জন্যে বলে রাখা ভাল নেপোলিয়ানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়েই The Peace of Amiens (March 1802) এর চুক্তি অনুসারে ইংরেজরা সিলোন পান ওলন্দাজদের কাছ থেকে পাকাপাকি ভাবে (দ্রষ্টব্য :—A History of Europe, W F Reddaway, পৃষ্ঠা-৩৯০, ১৯৫১ সংস্করণ)। ইংরেজদের পূর্বে পর্তুগীজরা ১৫০৫ থেকে ১৬৫৮ পর্যন্ত এবং ১৬৫৮ থেকে ১৮০২ পর্যন্ত ওলন্দাজরা সিলোন অধিকার করে ছিলেন। ভারতের অংশ হিসেবে ইংরেজরা সিংহল পেয়েছিলেন এমন ধারণা প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস-ভূগোল না জানার জন্যেই ঘটে এবং আমাদের পাঠক্রমে তা জানার সুবিধাও নেই।

'দেশ'-এর উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীমধু দে প্রশ্ন করেছেন সাধারণ ম্যাট্রিক পাস শিক্ষক কি করে মরিশাসে দু' হাজার টাকা মাসিক বেতন পান। আমার নিজের আফরিকার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি গত ৮।১০ বছর আগেও জাম্বিয়াতে (আফ্রিকার একটি দেশ) আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের মাসিক বেতন ছিল মাসিক ২,০০০ (দু' হাজার) ভারতীয় টাকা অন্যান্য সুবিধা বাদ দিয়ে। এই সব দেশের লোকসংখ্যা কম এবং খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় এদের আর্থিক অবস্থা ভাল। কিছুকাল আগে কিছু অর্থনীতিবিদ বলেছেন 'তৃতীয় দুনিয়া'র সভ্য হয়েও জাম্বিয়া, সৌদী আরব প্রভৃতি রাষ্ট্রের জাতীয় আয় ভারত প্রভৃতি দরিদ্র দেশের থেকে অনেক বেশী। অবশ্য মনে রাখা দরকার ভারতীয় মুদ্রার মান এই-সব দেশের মুদ্রার চেয়ে কম হওয়ায় ভারতীয় মুদ্রার অঙ্কে সংখ্যাটি সব সময় বড় দেখায়। তাই আরব দুনিয়ার তেল

সম্বন্ধে দেশগুলিতে বাগানের মালির চাকরির জন্যে ২,০০০ টাকা মাসিক বেতনের বিজ্ঞাপন ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতেই দেখা যায়।

শঙ্কর বসু মল্লিক
হাওড়া-১

॥ ৩ ॥

'দেশ' পত্রিকায় বিমল মিত্র মহাশয়ের 'চলতে চলতে' শীর্ষক লেখায় একটি তথ্যগত ভুল প্রত্যক্ষ করলাম। মরিশাসের আধুনিকীকরণ এবং স্বাধীনতার জন্য কয়েকজন প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক বিশিষ্ট অবদান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে "মডার্ন রিভিউ" সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" সম্পাদক ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের নামোল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ডাঃ সিংহ ছিলেন "হিন্দুস্থান রিভিউ" (The Hindustuan Review) পত্রিকার সম্পাদক, আর "ইণ্ডিয়ান রিভিউ"র সম্পাদক ছিলেন জি এ নটেশন (G A Natesan)।

বহু জাতীয়তাবাদী পুস্তকের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করে মাদ্রাজের নটেশন কোং যে এ দেশের (এবং যা পড়লাম মরিশাসবাসীরও) যে উপকার করেছিলেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

শচীন দত্ত
কলিকাতা-৩৪

টেস্ট ও টিকিট

'দেশ' পত্রিকার 'খেলার মাঠে' বিভাগে টেস্ট ও টিকিট নিয়ে লেখা একলব্যের "কেন এই আকাশছোঁয়া আগ্রহ" নিবন্ধটি একান্ত সময়োপযোগী।

একথা খুব সত্য যে, ইদানীং টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে সর্বত্র এত মাতামাতি ও হুল্লোড় শুরু হয়েছে যে, মাঝে মাঝে সেই-সব ক্রিকেট প্রেমিকদের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। এল এস ডি বা মারিজুয়ানার চেয়েও ক্রিকেট খেলা দেখা ও শোনার নেশা এখন তীব্রতর। কলকাতার সৌভাগ্যবান বাসিন্দারা ক্রিকেট খেলার টিকিট যোগাড় করার মাধ্যমে তাঁদের স্ট্যাটাস্, আভিজাত্য, আত্মম্ভরিতা বজায় রাখার চেষ্টা করেন, নইলে স্বজনবন্ধুমহলে মুখ দেখানো যায় না। (যেমন এখন টি ভি সেট শুধু বিলাস-দ্রব্য নয়, সামাজিক মর্যাদা ও কৌলীন্যের পরিচায়ক) কিন্তু আমরা অর্থাৎ মফঃস্বল-বাসীরা এইসব দুষ্প্রাপ্য টিকিট যোগাড় করতে পারি না। তবে আমাদের যেসব ভাগ্যবান আত্মীয়রা এই টিকিট কলকাতায় থাকেন বলে যোগাড় করেন—আমরা তাতেই গর্ব ও আত্মশ্লাঘা অনুভব করি। পাড়ার পাঁচজনকে, বন্ধুবান্ধবকে ডেকে ডেকে সেই কথা একশোবার শোনাই। অবশেষে যতক্ষণ, যতদিন খেলা শেষ না হয়, রেডিওর বুকে কান পেতে রাখি স্নান-খাওয়া ভুলে। একলব্য ঠিকই বলেছেন যে, ক্রিকেট খেলার স্রষ্টা ইংরেজদের এই কাঙালপনা নেই। আসলে বাঙালী জাতটাই হুজুগে।

তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

ভূতের গল্প

দেশ পত্রিকায় ভূতের গল্পের লেখকদের সম্মিলনের যে প্রস্তাব তুলেছেন তা প'ড়ে আনন্দ হল, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তার কোন সম্ভাবনাই নেই। বাংলা সাহিত্যে এখন প্রেমের গল্প ও ভূতের গল্পের কোন চিহ্নই নেই। ঐ দুই জাতের গল্প লেখা কঠিন, কারণ প্রেম ও ভূত দুইই মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোর যে আর্ট তা বেশ পরিশ্রম-সাপেক্ষ। বর্তমান কালের বাম্পার প্রডাকশনের যুগে অত সূক্ষ্ম কাজ করার উৎসাহ এদেশে বা বিদেশে কোন সাহিত্যিকের নেই। এই কারণেই ভূতের গল্পের স্থান নিয়েছে সায়ান্স ফিকসন এবং প্রেমের গল্পের জায়গায় এসে বসেছে পর্নো-সাহিত্য। দুয়েরই ফসল দেখবার মতো। এত প্রাচুর্য এর আগে কখনো দেখা যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ, শরদিন্দু, হেমেন রায় ও বিভূতিভূষণের পর ভূত নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামান নি। জীবিত লেখকদের মধ্যে একমাত্র লীলা মজুমদারই ভূতের গল্প লেখার কৌশল জানেন। আর যারা লেখেন তাঁরা এত কম লেখেন যে তা ভূতের উপর করুণা করা ছাড়া আর কিছু নয়।

অথচ এদেশে মৃত্যু রয়েছে, অন্ধকার রয়েছে, পোড়ো বাড়ি আছে, শ্মশান আছে, তান্ত্রিকরা আছেন, স্কিজোফ্রেনিকরা রয়েছে। বনের ভূত মনের ভূত কোনটারই অভাব নেই। অভাব কেবল ভূতের গল্পের।

কার্তিক মজুমদার

রাজার কুমার

১৩৮৩ দেশ বিনোদন সংখ্যায় রবি বসু লিখিত রাজার কুমার নিবন্ধে ২০৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রমথেশ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বি এস-সি পাস করেন। তিনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে পাসকোর্সে বি এস-সি পাস করেন—অনার্সে নয়। যদি উক্ত নিবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তবে ভুল সংশোধিত হইলে অনুগৃহীত হইব। আমার উক্তির সত্যতা University Calendar 1924 Part-IIতে পাওয়া যাইবে। যাহাতে সেই বৎসরের সমস্ত সফল পরীক্ষার্থীর নাম ছাপা আছে।'

নির্মলচন্দ্র গোস্বামী
কলকাতা-৩৯

প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র

৮ জানুয়ারী 'দেশ'-এর রূপজগৎ-এ "প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র" বিভাগে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় '৭৬-এর বাংলা চলচ্চিত্র পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর এই পর্যালোচনায় কয়েকটা তথ্যগত ত্রুটি থেকে গেছে, এই ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই এই পত্র।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনার শুরুতেই লিখেছেন : "১৯৭৬ শেষ হতে চললো। এ বছর আমাদের দুর্ভাগ্য সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে কোন ছবি পাইনি।' কিন্তু এ তথ্যটি ভুল, '৭৬ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাব—এ বছর মুক্তিপ্রাপ্ত তৃতীয় ছবিটি সত্যজিৎ রায়ের, সে ছবিটি হলো বহু বিতর্কিত এবং বহু আলোচিত 'জন-অরণ্য'। ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬-এ চিত্রটি মুক্তি পেয়েছিল।

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় '৭৬-এর ছবি আলোচনা প্রসঙ্গে 'অসময়' (পরিচালক : ইন্দর সেন) এবং 'সংসার সীমান্তে' (পরিচালক : তরুণ মজুমদার)-কে একই সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন, তার ভাষায় : "মধ্যে মরীচিকার মতো চিকচিক করে উঠেছিল 'অসময়' এবং 'সংসার সীমান্তে' দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম।" কিন্তু 'সংসার সীমান্তে' '৭৬ সালের ছবি নয়। 'সংসার সীমান্তে' মুক্তি পেয়েছিল '৭৫ সালে এবং সেই বছর প্রভূত জনপ্রিয়তা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেশ কয়েকটি পুরস্কার জুটেছিল ছবিটির ভাগ্যে। সরকারের মতে এই ছবিটিই ছিল '৭৫-এর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র।

অগ্নিময় দত্ত
গোবরডাঙ্গা

রবীন্দ্রনাথের জাপানী ভক্ত

বিনোদন সংখ্যা দেশ-এ রবীন্দ্রনাথের জাপানী ভক্তের যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তার ৪৫ পৃষ্ঠায় একটি ফোটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে। তাতে লেখা আছে পিছনের সারিতে মুকুল দে এবং পিয়ার্সন আছেন। চিত্র পরিচিতিটি ঠিক হয়নি সম্ভবত। পিছনের সারির বাঁ দিক থেকে তৃতীয় ব্যক্তিটি পিয়ার্সন নন, এণ্ডরুজ।

সোমেন্দ্রনাথ বসু
কলকাতা-২৯

"বন্দেমাতরম"

ইদানীং আপনাদের বহুল প্রচারিত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বন্দেমাতরম সম্পর্কে প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি এবং অনেক অজানা কথা জেনেছি। এই মহাসঙ্গীতটি সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে—সেটি নিরসনের উদ্দেশ্যেই এই চিঠি লিখছি। শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য একটি পত্রে (দেশ, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৭) জানাচ্ছেন, প্রখ্যাত সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আনন্দমঠের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেন Abbey of Bliss নামে। তাঁর মতে বন্দেমাতরমের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ নরেশচন্দ্রকৃত এই বইয়ের মাধ্যমেই হয়েছিল। এর বহু পূর্বে—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে—An Old Hindu's Hope নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম যদিও ছিল না, কিন্তু এর রচয়িতা ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় রাজনারায়ণ বসু (দ্রষ্টব্য : "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ")। পুস্তিকাটি কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন যেগুলি প্রথমে সেকালের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির নামকরণে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউমসাহেব রচিত সেই যুগে আলোড়ন সৃষ্টিকারী An Old Man's Hope গ্রন্থটির প্রভাব স্পষ্টই নজরে আসে। রাজনারায়ণের An Old Hindu's Hope বইটির শেষাংশে একাধিক স্বদেশী সঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হয়েছে; এবং সর্বপ্রথম গানটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে-মাতরম'। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটিরও ইংরেজী অনুবাদ এই সংকলনে রয়েছে।

অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই বন্দেমাতরমের ইংরেজী রূপান্তর প্রকাশিত হয়। এই তর্জমায় 'কেন মা অবলা এত বলে?' পংক্তিটির অনুবাদ নেই; 'কে বলে মা তুমি অবলে'র অনুবাদ রয়েছে। এমন কথা স্পষ্ট করে লেখা নেই যে প্রবন্ধ লেখকই এই সঙ্গীতটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন; কিন্তু যখন অনুবাদক হিসেবে অন্য কারও নামোল্লেখ নেই, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে স্বয়ং রাজনারায়ণই এর অনুবাদক। হতে পারে মাতামহের অনুবাদেই অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে দৌহিত্র এই সঙ্গীতের নতুন করে ইংরেজী অনুবাদ (পদ্যে ও গদ্যে) প্রকাশ করেন।

এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি গীত হয়। সেই অধিবেশনের মুদ্রিত বিবরণ আমি পড়েছি। তাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে মনে পড়ে না। সেকালে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় বার্ষিক বিবরণীতে স্থান পেত। সুতরাং বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি গাওয়া হলে তার উল্লেখ বিবরণীতে স্থান পাবে না, এমন সম্ভাবনা কমই মনে হয়।

সোমনাথ রায়
বুদ্ধগয়া

সংশোধন

গত ৮ জানুয়ারির দেশ পত্রিকার আলোচনা বিভাগে 'বন্দেমাতরম' শীর্ষক আমার একটি পত্রে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক লিখিত আনন্দমঠের ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থটির নাম দুবার উল্লেখ করেছি, এবং দেখা যাচ্ছে দুবারই মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থটির উপর আক্রমণ করেছে, Abbey-র শেষ Yটিকে সে নির্মমভাবে গ্রাস করেছে। গ্রন্থের যথার্থ নাম Abbey of Bliss।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
শান্তিনিকেতন

পা

আলোক সরকার

একটা পা উপরে উঠছে নেমে আসছে
আর একটা পা
সে এখন পথ চলছে তার দুটো পা

উপরে উঠছে নেমে আসছে নিচে তার
অন্যমনস্ক দুটো পা
চিনে নিচ্ছে সামনের উঁচুনিচু কোনখানে

ভারী ইঁটের টুকরো কেটে-নেওয়া গাছের গুঁড়ি
সে এখন পথ চলছে
আর তার অন্যমনস্ক দুটো পা নিজের থেকেই বাঁক নিচ্ছে

যেখানে বাঁক নেবার কথা—তার অভাব,
তার ভিতরের অভাব, তার পাওয়া
তার ভিতরের পাওয়া, এইসব হিজিবিজি আলো-অন্ধকার

তার ভাবনায় হানছে বিদ্যুৎ, আনছে এলোমেলো বিকেল
সে এখন পথ চলছে
আর তার অন্যমনস্ক দুটো পা তাকে নিয়ে চলেছে

সাদা একটা ঘরের সামনে সেইখানে বিছানা বালিশ আছে
আছে জলের কুঁজো আর একটি জানলা
তাকালে অনেক দূরে দেখা যায় তারপর দেখা যায় না কিছুই।

তবুও কোথাও ভালোবাসা আছে

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

তবুও কোথাও ভালোবাসা আছে বলে এতো বিদ্রূপেও
বেঁচে থাকে

'তোর কিস্সু হলো না, তুই যা
তুই কিস্সু হলি না, যা ভাগ',—এসব সহজে ওরা বলে ফেলে
যার 'কিস্সু' হলো তাকে 'দারুণ চতুর' আখ্যা দিয়ে
শেষ সিগারেট ফেলে খালাসীপাড়ায় চলে যায়।

তবুও কোথাও কিছু আছে বলে এতো বিদ্রূপেও বেঁচে থাকে
যায় না সে, অভিমানে নয়, দাঁড়িয়ে বিদ্রোহে বুক বাঁধে।
নির্যাতনে দৃঢ় হয় ; কঠিন মেধার ঝুঁটি ধরে
মিথ্যা বিদ্রূপের প্রতিবাদে স্তব্ধ অহংকারে স্থির, স্থির হয়ে থাকে
—এই বুঝি থাকা।

খালাসীপাড়ায় সব খুশি তোলে গ্লাসে
বন্ধু ডুবে গেলে বন্ধু খুশি হয়
—এ এক নিয়ম বুঝি ঘন বন্ধুত্বের।
এই বন্ধু নিয়ে ঘরে ঘরে আহ্লাদের সুখের সংসার
—এই বুঝি সুখ!

ডোবে না সে, বরং জলের উচ্ছ্বাসে ভেসে ওঠে
নদীর ঔদার্যে স্নান সেরে ঘরে ঘরে
যা পাওয়ার ছিল না শর্ত, কিংবা যা দেখার
তাই নিয়ে উঠে আসে সমীকরণের জটিল সূত্রের মেধা
—এ প্রজ্ঞায় বুক বাঁধতে হয়।

স্মৃতিসৌধ শিল্পময়

ফণিভূষণ আচার্য

ফুলের বিষয় নিয়ে মফস্বলী ভালোবাসাবাসি অনেক হয়েছে
এবার শরীর নিঙড়ে অশ্রু দাও এক রুমাল স্মৃতিদুঃখময়
শহরের সন্ধেগুলো আরো কিছু অন্ধকার আলো দিয়ে
রিফু করে দাও
গ্রহণের স্নান সেরে উঠে এসো তুমি এই কবরের জ্যোৎস্নার নীরবে

দুঃখ ও বিষাদ থেকে গড়ে ওঠে স্মৃতিসৌধ শিল্পময়
এখন গ্রহণ শেষ পাড়াগাঁর মাঠের ওপাশে
শহরের আকাশের ধারে আর ব্যথা কিংবা বিষণ্নতা নেই
কুমোরের ছাঁচে-গড়া শরীরকে ছিঁড়েখুঁড়ে
এখন কোথাও কেন মানবিক দুঃখবোধ খুঁজেও মেলেনা

নদীর গভীরে নদী ইচ্ছেমতো ঘর-সংসার সাজিয়ে বসেছে
গ্রস্ত এলাকায় কোন পাপ নেই নাগরিক অপরাধবোধ
ক্রমশ কুয়াশা হানটান
স্বর্গীয় চুম্বকে চাঁদ গলে যায় দুচোখের জলে
স্তনের সুবর্ণরেখা ছাপিয়ে গিয়েছে দূরে ধলভূমগড়
গ্রহণের স্নান সেরে শিল্পময় স্মৃতিসৌধে

আমি গম্ভীর মুখে মদনার দিকে নিরাসক্ত দৃষ্টি হানলাম।

মদনা থতমত খেয়ে বললো, "কিন্তু কাটি চোরদের বাজার খুব খারাপ হয়ে গেল। দুখানা কাটি বেচে এক বান্ডিল বিড়ির খরচ উঠতো না মধ্যিখানে। শালা মল্লিক বাজারের দোকানদারগুলো সাপের পাঁচ পা দেখেছিল।"

"তখন তোমার বন্ধু গাড়ির ব্যাক-লাইট চুরি শুরু করলো!" আমি যে কিষটো সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল তা মদনাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই বললাম।

মদনা আমার জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গেল। দাঁতে নোখ কেটে সে বললো, "ঠিক শুনেছেন স্যার। খুব ভাল লাইন—দু সপ্তাহের মধ্যে দুখানা প্যান্ট করে ফেলেছিল কিষটো। আমাকে একদিন 'সিনমা' দেখিয়েছিল।"

মদনা একটু থামলো। তারপর গম্ভীরভাবে বললো, "কিন্তু অত সুখ কপালে সহ্য হলো না, স্যার। এলিট সিনেমার সামনে কিষটো একদিন ধম্মের ষাঁড়ের খপ্পরে পড়ে গেল।"

"ষাঁড়? কর্পোরেশন অপিসের সামনে?"

জিভ কেটে মদনা আমার ভুল ভাঙালে। "রাস্তার ষাঁড় নয় স্যার। ধরমের ষাঁড়—পুলিস!"

॥ ৩৩ ॥

মদনা আমার অন্যমনস্ক ভাব লক্ষ করে কিছুক্ষণ বোধ হয় চুপচাপ ছিল। তারপর বললো, "আমায় কিছু বলবেন, স্যার?"

ডরোথির চিন্তা কাটিয়ে উঠে বললাম, "তোমার সঙ্গে কথা আছে, মদন। কিষ্টো বলে তোমার এক পাজী বন্ধু আছে?"

মদনা বেশ লজ্জা পেয়ে গেল। ঠোঁট কামড় সে পুনরাবৃত্তি করলো, "কিষটো?" মদনা বুঝতে পারছে না কেন আমি এই প্রশ্ন করছি।

মদনা এবার বললো, "কিষটো খুব ভাল ছেলে ছিল, স্যার। কর্পোরেশন ইস্কুল থেকে পেরাইজ পেয়েছিল, লেখাপড়ার জন্যে।"

এই পর্যন্ত খবর পেয়ে আমি যে সন্তুষ্ট নই তা মদনা আমার মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আন্দাজ করে নিল। তারপর বন্ধুর সম্পর্কে ওকালতি করতে গিয়ে খুব দুঃখের সঙ্গে বললো, "পেরাইজ পাওয়া ছেলেও সার শেষ পর্যন্ত দু নম্বরী মাল হয়ে গেল।"

দু নম্বরী বলতে মদনা হয়তো দাগী মাল বোঝাচ্ছে। মদনা এবার বললো, "কিষটো, সার ভাল ছেলেই হতো যদি না বাপের বে দেখতো।"

মদনার মুখে কোনো ব্রেক নেই—ওর কথা শুনে আমার কান লাল হয়ে উঠলো। মদনা তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি সামলাবার জন্যে বললো, "মা কালীর দিব্যি, বলছি, সার—কিষটোর বাপ হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের বোনকে বে করে বসলো। কিষটোর মায়ের শ্বাসের রোগ ছিল, প্রায়ই ভুগতো—তাই একদিন বিম্বাধর রেগে গিয়ে বউকে দেশে পাঠিয়ে দিলে। বাপের বে দেখে কিষটোর সে কি কান্না!"

আমার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করেছে। এই থ্যাকারে ম্যানসনের প্রতিটা মানুষের পিছনেই উপন্যাসের উপকরণ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে নাকি? কিষটোর বাবা বিম্বাধরকে আমি চিনি—আমাদের বাড়ির ছাদেই সে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করে। তার যে আবার বৈবাহিক জটিলতা আছে তা এতদিন আমার জানা ছিল না।

বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যেই বোধ হয় মদনা গভীর দুঃখের সঙ্গে বললো, "মনের দুঃখে কিষটো স্যার গাড়িকালের লাইনে চলে গেল।"

চুরি জোচ্চুরিও যে একটা লাইন তা মদনার কথা থেকেই আমার প্রথম হৃদয়ঙ্গম হলো।

মদনা বললো, "কিষটো প্রথমে কাটি-চোর হয়েছিল।" ফিক করে হেসে ফেললো মদনা। আমি যে তার টেকনিক্যাল টার্মগুলো বুঝতে পারছি না তা তার হঠাৎ খেয়াল হলো।

"সিঁদ কাঠি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"না না, সিঁদ কাঠি নয়। কলকত্তার লাইন—কাটি চোররা স্রেফ মোটর গাড়ির ওয়াইপার চুরি করে।"

পুলিসের এই বিশেষ নামটিও এতোদিন আমার অজ্ঞাত ছিল।

মদনা দুঃখ করলো, "কিষটো বেচারার কপালটাই খারাপ। পড়বি তো পড় একেবারে কাঁচাকলার হাতে পড়লো—সায়েবের হাতে কিছু ধরিয়ে দিতে গিয়ে আরো উত্তম মধ্যম খেলো।"

মদনার কথাগুলোর গভীর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করছি। মদনা বুঝতে পেরে বললো, "ধর্মের ষাঁড় দু' রকম হয়, স্যর—কাঁচাকলা আর কালোমামা। কাঁচাকলা ভীষণ কড়া—একটি পয়সা ঘুষ খাবে না। আর কালোমামা ক্যাশ পেলেই সন্তুষ্ট—আপনার কাজে নাক গলাবে না। দিনে দেড়শ ব্যাক লাইট চুরি করে মল্লিক বাজারে ঝেড়ে দিয়ে এলেও মামার মাথা ব্যথা নেই!"

কারনানি ম্যানসনের সামনে এক কালো মামা গতকাল আমাকেই পাকড়াও করেছিল, স্যর। অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি—ভেবেছি এ-পাড়ার প্যাসেঞ্জার। বাজিয়ে দেখবার জন্যে যেমনি কাছে গিয়েছি, অমনি ক্যাঁক করে পাকড়াও করে নিল আমাকে। ভাগ্যে পকেটে একটা বিলিতী ফুচুকল ছিল।

"সেটা আবার কী জিনিস?" আমাকে জিজ্ঞেস করতে হলো।

"সিগ্রেট লাইটার," এক গাল হেসে উত্তর দিল মদনা। "ওই ফুচুকলটি সেলামি দিয়েই তো মামার হাত থেকে হুড়কে বেরিয়ে এলাম।"

কিষটোর কথায় আবার ফিরে এলাম। "ব্যাক চোর কিষটো জেল থেকে ফিরে এসে আমাদের ওপর নজর দিয়েছেন কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আমার কথা শুনে মদনা বেশ অবাক হয়ে গেল। "কার কথা বলছেন আপনি? কিষটো তো লাইন পাল্টে ফেলেছে। সে এখন ডকে কাজ নিয়েছে।"

"নিজেকে ডকে তুলেছে?" একটু বিরক্ত হয়েই মন্তব্য করি। কারণ মদনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

মদনা ফিক করে হেসে বললো, "কলকাতার কাজ নিয়েছে বেগানা মিঞার আণ্ডারে। আণ্ডা সাফাই করে রাধাবাজারে পৌঁছে দিয়ে আসে। খুব ভাল লাইন।"

"রাধাবাজারে আবার কবে ডিমের পাইকারী মার্কেট হলো?" আমি চিন্তা করি।

জিভ কেটে মদনা বললো, "ডিম নয়! আণ্ডা বাচ্চা—ওই যে আপনার হাতে বাঁধা রয়েছে," বলে আমার রিস্টওয়াচটা মদনা দেখিয়ে দিল।

এবার আমার ধৈর্যচ্যুতি হতে চলেছে। বেশ বিরক্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "তাহলে কার অত্যাচারে এ পাড়ার রিকশওয়ালারা তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে? রাত্রে ওদের গাঁট কাটছে কে?"

মদনা এবার আকাশ থেকে পড়লো। "বহুদিন আগে মাত্র একটা ওই রকম কেস হয়েছিল স্যর। আপনাকে মা কালীর দিব্যি বলছি। কিষটো পাড়ার লোকদের সঙ্গে মামদোবাজী করে না।"

মদনা বুঝতে পারছে আমার কানে কে অভিযোগ তুলেছে। বেশ রেগে গিয়ে সে বললো, "সত্যি কথা বলবো, স্যর?"

"কেন বলবে না? নিশ্চয় বলবে।" আমি সাহস জোগাই।

মদনা এবার বোম ফাটাল। "রিকশওয়ালাদের কাছে পয়সা আদায় করে রামসিংহাসন। এ-বাড়ির মধ্যে রিকশ রেখে রাত্রে ঘুমুতে হলে রামসিংহাসনের রেট হলো চার আনা।

গরীব রিকশওয়ালাকে রাত্রে থাকবার ম্যানসনে ঢুকতে দিয়ে রামসিংহাসন পয়সা আদায় করে। কথাটা ভাবতেও আমার গা রিরি করে উঠলো।

মদনা বললো, "আগে দু আনা করে রেট ছিল। আপনি চার্জ নেবার পরে ডবল হলো। সবাই তো জানে, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই রামসিংহাসন রেট বাড়িয়েছে।"

রামসিংহাসন নাকি এমনও বলেছে, 'আগে একা রামসিংহাসন ছিল—এখন নতুন ম্যানেজার এসেছেন বুঝতেই পারছো।'

রামসিংহাসনের ওপর আমার রাগটা ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। গরীব রিকশওয়ালাদের কাছ থেকে পয়সা নিঙড়োনোর

ব্যাপারেও আমার নাম জড়িয়েছে ভাবতে মনটা কিরকিরিতে ভরে উঠলো।

মদনা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেই বললো, "ফিলপিং চার্জটা আপনি ফ্রি করে দিন, স্যার—গরীব রিকশ-ওয়ালা আপনাকে দু' হাত তুলে আশী-র্বাদ করবে।"

মদনার দেরী হয়ে যাচ্ছে। ওকে ছেড়ে দিলাম। যাবার আগে মদনা একটা মিলি-টারি স্যালুট ঠুকে বললো, "মদনা, সব সময় আপনার পাশে-পাশে আছে, স্যার। কোনো দরকার হলে একবার তু করে ডেকে পাঠাবেন।"

মদনা থাকতে থাকতেই দূরে থেকে চৌত্রিশ নম্বর ফ্ল্যাটের ভাড়াটে আর সি ঘোষকে দেখা গেল। আড়চোখে মদনা দেখলো, ঘোষমশাই দূরে থেকে আমাকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানালেন।

মদনা ফিসফিস করে বললো "খুব কায়দা করে হ্যান্ডেল করবেন এঁদের। গোখরো সাপের পার্টি এই জেন্টল-ম্যাননিরা।"

আমি মদনার কথায় কোনো মন্তব্য করছি না।

মদনা ফিস ফিস করে বললো, "এদের বিজনেস হলো কাতলা ছেড়ে মাগুলা করা!"

শেষোক্ত বাক্যের গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা না করেই মদনা কেটে পড়লো।

"নমস্কার। আছেন কেমন?" চৌত্রিশ নম্বরের অফিসিয়াল ভাড়াটে আর সি ঘোষ আমাকে দেখে সৌজন্য বিতরণ করলেন।

প্রতিনমস্কার জানালাম। কিন্তু কেমন আছি? চার্নক সাহেবের শহরের এক কোণে কালের অবহেলায় জীর্ণ একখানা অখ্যাত ফ্ল্যাট বাড়ির ততোধিক অখ্যাত ম্যানেজার কেমনই বা থাকতে পারে? গত কয়েক দিনে সুলেখার অসহায় জীবনের কিছুটা পরিচয় পেয়ে ভাল আছি একথা বলাটা সত্যের অপলাপ হবে।

আর সি ঘোষ আমার প্রিয় হাওড়ার লোক। তাই হেসে বললাম, "আমরা ভাল থাকলাম আর না থাকলাম তাতে পৃথিবীর কী এসে যায়, মিস্টার ঘোষ?"

মিস্টার ঘোষ দমলেন না। এক গাল হেসে বললেন, "ঠাকুরের আশীর্বাদে আমি কিন্তু খুব ভাল আছি। মেয়ে চিঠি লিখেছে, জামায়ের আরও প্রমোশন হতে পারে। জামাই আর পুত্রের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, বুঝলেন শংকরবাবু। ছেলেপুলেদের আনন্দই আমাদের আনন্দ, ওদের উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি।"

মেয়ের সম্বন্ধে আরও কত কি সব বলে গেলেন মিস্টার আর সি ঘোষ।

মেয়ের সাজানো ঘরসংসার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। চাকরবাকর বাবুর্চি বেয়ারা সিপাই আর্দালি ড্রাইভার সব আছে মেয়ের। মেয়ের ওখানে গিয়ে কয়েক দিন থাকবার প্ল্যান করছিলেন মিস্টার ঘোষ, কিন্তু সেই সময় জামায়ের বদলির হুকুম হয়েছে। জামাই কলকাতায় চলে এসেছেন, সরকারী গেস্ট হাউসে আছেন—এখানকার বাঙলোটা না-পাওয়া পর্যন্ত মেয়ে আসতে পারছে না।

মেয়েরা প্রতিটি ব্যাপারের খুঁটিনাটিতে জড়িয়ে পড়েছেন মিস্টার ঘোষ। কবে কোন তারিখে বাংলো খালি পাওয়া যেতে পারে তাও তাঁর কণ্ঠস্থ।

একটু বিরক্তভাবেই তিনি বললেন, "আগেকার অফিসারের এটা অন্যায় নয়? আপনি বলুন। বদলির অর্ডার যখন পেয়ে গেছিস তখন বাংলো ছেড়ে দে। কিন্তু নানা কায়দা-কানুন দেখিয়ে এখনও বাড়িটা আটকে রেখেছে। কলকাতা শহর তো! এখানে অনেক মধু। যে একবার এখানে আসে সে আর নড়তে চায় না।"

আর সি ঘোষ অনর্গল বলে চলেছেন। "এই মেয়ের জন্যেই আপনার কাছে চলে আসতে হলো।"

"মেয়ের জন্যে?" আমি একটু অবাক হয়ে যাই।

আর সি ঘোষ বললেন, "মেয়েটা একলা থাকবে ওখানে। তাই ভাবছিলুম, দরকার হলে ওখানে কয়েকদিন ঘুরে আসি। মেয়েটার আমার একলা থাকার অভ্যেসই নেই।"

"একলা থাকলেই অভ্যাস হয়ে যাবে", আমি ভরসা দিই মেয়ের বাবাকে। মনে মনে ভাবলাম, একলা থাকার অভ্যাসটা সবারই প্রয়োজন। না হলে ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোনোদিন আমার মত জীবন যাপন করতে হলে শুধু শুধু কষ্ট পাবে।

মিস্টার ঘোষ আমার কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। মুখের ওপরেই বললেন, "কোন্ দুঃখে আমার মেয়ে একলা থাকতে যাবে বলুন? একলা থাকার কপাল করে মা তো আসেনি।"

কাজের কথায় ফিরে এলেন মিস্টার আর সি ঘোষ। বললেন, "আমরা কর্তা-গিন্নী তো মেয়ের কাছে যাওয়ার জন্যে রেডি। ঠিকও করে ফেলেছিলাম, এবার দরকার হলে কিছুদিন থাকবো। কিন্তু বাদ সাধলেন আপনি।"

"আমি?" আর সি ঘোষের মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে আমি বাধা দেবার কে?

"আপনার মুখটাই লাস্ট মোমেন্টে আমার মনে পড়ে গেল।" আর সি ঘোষের কথাবার্তায় কোনো রসিকতার ইঙ্গিত নেই।

ঘোষ বললেন, "এসব গোলমাল তো আগে ছিল না, আপনিই বাধিয়েছেন। হঠাৎ খেয়াল হলো, মেয়ের কাছে থাকতে থাকতেই মাস কাবার হয়ে যাবে—অথচ আপনি অন্য কারুর হাত থেকে ভাড়া নেবেন না।"

জেঠমালানিদের সম্পর্কে মনে মনে আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে। তারা যখন খাতায় কলমে চৌত্রিশ নম্বরের কেউ নন, তখন আমি কেন তাঁদের স্বীকার করতে যাবো?

আমি বললাম, "তাড়াতাড়ির কী
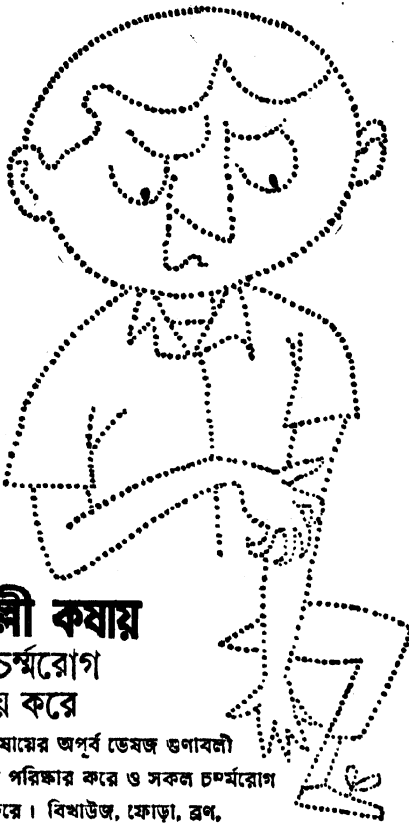
আছে! ফিরে এসেই ভাড়াটা দিতে পারেন।"

আমতা-আমতা করে ঘোষমশাই বললেন, "সত্যি কথা বলবো, স্যর? আপনার সম্বন্ধে কর্তারা এখনও তেমন ভরসা পাচ্ছেন না।"

"আমি অতি সামান্য লোক। আমার ভরসায় আপনার কর্তাদের মতো মান্যগণ্য লোকের কী এসে যায়?" অসতর্ক মুহূর্তে কথাগুলো হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আর সি ঘোষ প্রথমে চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "নিশ্চয় এসে যায়, না হলে বাবুরা কেন আপনার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর রাখেন?"

আমার সম্বন্ধে খোঁজখবর? একটু অবাক হবারই কথা।

আর সি ঘোষ বললেন, "আমাদের বাবুর সঙ্গে আপনার তো আলাপ হয় নি। মিস্টার জগদীশ জেঠমালানি—কলকাতার হাই-সোসাইটিতে ও'র খুব নাম শুনবেন। এতো হাই-সোসাইটিতে ঘোরাঘুরি করেন, কিন্তু ছোটখাট ব্যাপারেও সমান নজর। কোনো ব্যাপার ভোলেন না, সব ঘটনা মাথার মধ্যে জমা করা থাকে।"

প্রমাণ স্বরূপ মিস্টার ঘোষ বললেন, "এই যে আমি, অতি সামান্য কর্মচারি। যেমনি আমি ছুটি চাইতে যাবো, উনি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবেন মাসের গোড়ায় থ্যাকারে ম্যানসনের ভাড়া দেওয়ার কী হবে? আমি যদি বলি, ফিরে এসে দেবো, উনি আপত্তি করবেন। বলবেন, বাড়ি-ওলার সঙ্গে যদি সম্পর্ক খারাপ থাকে, তাহলে ভাড়াটি কখনও ফেলে রাখবে না। ডিফল্টার হওয়া মানেই তো আউট হয়ে যাবার চান্স দেওয়া।"

ঘোষমশায়ের সঙ্গে কথাবার্তায় মনে হচ্ছে জগদীশ জেঠমালানি আমার সম্বন্ধেও সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে রাখছেন। এসব খবর জোগাড়ের সহজতম উপায় হলো রামসিংহাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা। এ পক্ষের এমন কোনো খবর নেই যা সামান্য বকশিসের বদলে জেঠমালানির কানে হাজির হবে না।

এবার আমার জন্যেও টোপ ফেলা হলো। ঘোষমশাই পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালেন। "বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই অফার করলাম না। খাওয়ার অভ্যেস থাকলে নিজেই একটা তুলে নিন।" এই বলে বিড়ির কৌটোটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

বিড়ির ব্যাপারেও মেয়ের প্রসঙ্গ তুললেন আর সি ঘোষ। "এই বিড়ি নিয়ে আমার মেয়ের কাছে খুব বকুনি খাই। বুঝি এতো বড় যার জামাই তার মুখে বিড়ি শোভা পায় না। কিন্তু অভ্যেসটা এমন হয়ে গেছে। বিড়ি ছাড়া অন্য কিছুতে সুখ পাই না।"

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বিড়িটা দাঁতে চেপে আর সি ঘোষ বললেন, "এই যে বলছিলুম না, আমাদের মালিকের সব দিকে নজর। আপনার কথাও ভেবে ফেলেছেন জগদীশবাবু। আপনি তো শাজাহান হোটেলে টাইপ-ফাইপ করতেন। এখানে আর ক'টাকা পাচ্ছেন। ভগবানের ইচ্ছেয় ইয়ং বয়স, পরিশ্রমের 'ক্ষ্যামতা' যখন রয়েছে; তখন বাবুদের আপিসে, সন্ধ্যা-বেলায় পার্টটাইম টাইপিস্টের কাজ করুন। তেমন কিসসু কাজ থাকে না সন্ধ্যা-

... বললায়। শ্রেফ বসে বসে কিছু কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে যাবেন।"

আমার দিকে তাকালেন মিস্টার আর সি ঘোষ। তারপর আরও পরিষ্কার করে বললেন, "অন্য টাইপিস্টদের যাই দিক, আপনাকে পেলে বাবু নিশ্চয় শতখানেক টাকা মাস্থলি দিয়ে দেবেন।"

শতখানেক বাড়তি টাকা আমার বর্তমান আর্থিক অবস্থায় অনেক। কিন্তু সুলেখার কাছ থেকে জেঠমালানিদের সম্পর্কে আমার একটা বিশেষ ধারণা হয়ে গেছে। এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম, "সন্ধ্যেবেলায় এখানে কাজ থাকে।"

"তেমন আর্জেণ্ট কাজ যেদিন পড়বে সেদিন যাবেন না। এই তো কয়হাত দূরে পার্ক স্ট্রীটে আমাদের আপিস।"

আমি নিরুত্তর।

আর সি ঘোষ এবার শেষ চেষ্টা করলেন "হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবেন না, মশায়। এমন চান্স রোজ আসবে না।"

[ক্রমশ]

শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ

গোপালচন্দ্র রায়

॥ ২ ॥

মণীন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর খাতায় 'রাজুদার কীর্তি' নাম দিয়ে রাজুর যে কয়েকটা কাহিনী লিখে গেছেন এবং যে-গুলি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি, এই সংখ্যায় তার আরও কয়েকটা কাহিনী বলছি।

মণিবাবু লিখেছেন—

প্রায় সেকালের কথা। বাল্য জীবনটা তখন ভারি মজার ছিল। ছেলেবেলার কথা মনে করেও সুখ।

রাজুদা আমারই বড় ছিলেন। তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে চলতো না—এমন ছেলেপিলে তখন প্রায় কেহই ছিল না। জিমনাস্টিক, গুন্ডামি ছাড়া দেখতাম তাঁকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোতো। সেই সঙ্গে আমাদেরও কি অবস্থা দাঁড়াত, শুনলে অনেকে হাসবার অবকাশ পাবেন।

অনেক লোকের নানা রকম শখ হয়। আমরা ছিলাম ইঞ্জিনীয়ারের ছেলে। অতএব কলকব্জা, মিস্তিরিগিরি ইত্যাদিতে আমাদের ছুটির দিনগুলি কাটতো। ক্রমোন্নতি হিসাবে আমাদের মাথায় বারুদ নিয়ে খেলার সুবুদ্ধি দেখা দিল। রাজুদার ঘুম ছিল না। যা কখনই হবার নয়—সেইটাই তাঁর কাছে কেন হবে না? তাঁর বিশ্বাস ছিল, গায়ের জোরে সবই সম্ভব।

বন্দুক চিরকালই লোহার। রাজুদা বললেন—বাঁশের কেন হবে না!

দিন দুই আগেই তর্কের খাতিরে তিনি দলের একজনের হাতটা জখম করে দিয়েছিলেন। সেটা যথাসময়ে মনে হওয়াতে আমি বললাম—খুব হবে।

ব্যস, আর যাবে কোথা, তখনি সোজা বাঁশের সন্ধানে আমাকে বেরিয়ে পড়তে হল। আর রাজুদা লেগে পড়লেন দেশী বারুদ নিয়ে পলতে তৈরি করতে তাও আগুনের অতি নিকটে বসে। এইটাই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। পলতে কত শীঘ্র জ্বলে ওঠে, হিসাব হল। আমিও বাঁশ এনে হাজির করলাম। তাতে ফুটো করে পলতে ঢোকানো হল। চোঙ্গে বারুদ ছররা গাদা হল রীতিমত জোরে—যেমন — — — —। শুভকার্যে বাধা দিয়ে তাঁর শ্রীহস্তে মার খেয়ে মরবে।

ঠিক হল, পাখী মারা হবে।

কিন্তু কোন পাখীই তো বেশীক্ষণ থাকে না। নিশানা হওয়ার আগেই উড়ে পালায়। নিশানাও হয় না।

একটা শালিক দয়া করে অনেকক্ষণ রইল।

আমরা দূর থেকে দেখছি, রাজুদা শুয়ে পড়ে একটি ছড়ির ডগায় আটকানো টিকেয় আগুন ধরাচ্ছেন। আর কি জানি কেন মধ্যে মধ্যে টেনে নিচ্ছেন।

ধন্য শালিক! তখনও বসে আছে। দেখলাম, মরার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পলতে জ্বলে উঠলো। আমাদের বুক কেঁপে উঠলো। তারপরেই ফট ফটাস। বন্দুক চিচিং ফাঁক। রাজুদা উল্টে পড়লেন। বাবা রে, গেছিরে, শিগ্গির নারকেল তেল আন, মুখ পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

আমি তো ভয়ে কেঁদে ফেললাম।

যাক, বহু কষ্টে রাজুদার মুখ আবার দুঃখে পড়া ভদ্রলোকের মত হল। যাহোক, শিকারী জীবনের এইখানেই আমাদের হাতে খড়ি। একটু অবসর পেলেই আমাদের এর চাইতে মজায় সময় কাটতো, আর কিছু মনে হত না। তাস ইত্যাদি খেলার প্রচলন ছিল না। ক্রিকেট ফুটবল তো আছেই—সবাই এতেই পায়।

রাজুদা কিন্তু চুপ করেই চলেন। একটা কিছু ভয়ানক না করলে তাঁর কিছুই করা হয় না।

শরৎচন্দ্রের মাতুল এবং ভাগলপুরের সহপাঠী বন্ধু মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সোমেন্দ্রনাথ তাঁর 'মনে পড়ে' নামক একটি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রেরও বাঁশের বন্দুকে দিয়ে একবার এক বিড়াল শিকারের কাহিনী বলেছেন।

সোমেনবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র মামার বাড়ির সমবয়সী সঙ্গীদের নিয়ে অসীম ধৈর্য, চেষ্টা এবং পরিশ্রম করে বন্দুক তৈরি করলেন। এবার সেটা ঠিক হল কিনা পরীক্ষা করা দরকার। কিন্তু বাঘ, ভাল্লুক তো আর যখন তখন যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না।

একজন বললে—তবে বিড়াল শিকার করা যাক।

এটা শরৎচন্দ্রের মনে ধরল। কারণ, কয়েকদিন আগেই তাঁর একটা পোষা শালিখ পাখীকে একটা হুলো বেড়ালে খেয়ে ফেলেছিল। শরৎচন্দ্র বললেন—সেই বিড়ালটাকে খুঁজে নিয়ে আয়, সেইটাকেই শিকার করব।

সোমেনবাবু লিখছেন—বিড়াল এলে শরৎচন্দ্র বললেন—ঠিক, একেই মারব। দেবিন, তুই ওর গলায় দড়ি বেঁধে ওকে ঝুলিয়ে নিয়ে দাঁড়া আমি গুলি করি।

দেবিন ইতস্তত করে বললে—গুলি যদি আমার লাগে?

তাকে অভয় দিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—

গঙ্গাতীরে এই অশথ গাছেই ছিল রাজুর আশ্রম। আর এই গাছেই বাঁধা থাকত

শু, বাবাকে লাগবে না। আমার 'এর' অত সাহস নয়, বাছা।

দৌবনের অবশ্য ভয় গেল না।........ বেড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে তাকে ঝুলিয়ে দিয়ে সে কাঠ হয়ে দাঁড়াল। আর ঝুলন্ত বেড়াল ছাড়া পাবার জন্য শূন্যে পা ছুড়তে লাগল, শরৎচন্দ্র লক্ষ্য স্থির করে বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন। ভীষণ জোরে একটা আওয়াজ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে গেল। ধোঁয়ার ভিতর স্পষ্ট দেখা গেল—এদিকে শরৎচন্দ্র আর ওদিকে দৌবন চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন—আর বেড়াল উধাও হয়ে গেছে।'

সোরেনবাবুর এই লেখার দৌবন হলেন, শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চতুর্থ ভ্রাতা অমরনাথের একমাত্র পুত্র। শরৎচন্দ্র তাঁর মামার বাড়ির সমবয়সীদের মধ্যে যেমন ছিলেন দলপতি, তেমনি ভাগলপুরের বাঙালীটোলা, আদমপুর, খঞ্জরপুর প্রভৃতি পল্লীর কিশোর ও যুবকদের সর্ববাদিসম্মত দলপতি ছিলেন রাজু। শরৎচন্দ্র ছিলেন রাজুর দলেরই একজন এবং তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ অনুচর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শরৎচন্দ্র বাঁশের বন্দুক তৈরির মতলব বা কৌশল রাজুর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন, রাজুর সমাজ শাসনের বীরত্বের বহু কাহিনী এক সময়ে ভাগলপুরের বাঙালীদের কাছে সুবিদিত ছিল।

সুরেনবাবু তাঁর বইয়ে এ সম্বন্ধে দু-একটা কাহিনী লিখেও গেছেন। যেমন, বাঙালীটোলায় গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের স্নানের আলাদা একটা বিভাগ ছিল, সেখানে মধ্যে মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সমাগম হত। এই রকম ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে গীতাকার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে দিয়ে বলিয়েছেন যে, তিনি যুগে যুগে সম্ভব হন। বোধ করি রাজু ছিলেন তাঁর ডেপুটি এজেন্ট। রংটি কালো, তাতে বসন্তের দাগ চিত্রিত। জানু পর্যন্ত লম্বিত বাহু।..........তাঁর বিচার করতে সময়ের প্রয়োজন হতো না।..........শুধু একবার বিদ্যুৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং নিমেষে কাজি সাহেবের মত বিচারের পরিসমাপ্তি—শাস্তিতে।'

মেয়েদের স্নানের ঘাটে ঢুকেপড়া লোককে রাজু কিভাবে শাস্তি দিতেন, সে সম্বন্ধে সুরেনবাবু লিখেছেন—'লোকটির কাঁধ থেকে গামছাখানি কেড়ে নিতেই, সে রক্তচক্ষু হয়ে বলত—কে'ও!

কথার উত্তর না দিয়ে রাজেন্দ্রনাথ গামছাখানি মাথা ভিজিয়ে গলার ফেলে পাকিয়ে শক্ত করে তার শ্বাস কষ্টের অসুবিধের কথা চিন্তা করার আগেই টেনে ডুব জলে নিয়ে গিয়ে তাকে চেপে ধরে—এক দুই তিন গুনে দশো হলেই টেনে উপরে তুলে দিয়ে তর্জনী দেখিয়ে বলতেন—আওর ডুব মাঙতে হো?

—নেহি।

—তব সিধা রাস্তা ধরো, ঘর যাও। দুসরা রোজ ওহি ঘাটমে মৎ যা-না।

—জয়াস্তু বাবা!

রাজুর সমাজ শাসনের একটি কাহিনী মণিবাবুর খাতা থেকে ...

মণিবাবুর পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি

হয়েছি। এখন এখানে মণিবাবুর সেই লেখাটাই তুলে দিচ্ছি—

দুষ্টলোককে শায়েস্তা করতে রাজুদা ওস্তাদ ছিলেন। আমাদের দলের একজনের অতিশয় বদনাম উঠেছিল। তাকে পুলিসেও এঁটে উঠতে পারল না।

রাজুদা শুনলেন—সে নাকি কোন মেয়ের কানের মাকড়ি চুরি করেছিল।

দলের দুর্নাম হয় দেখে সকলেই তাকে কবুল করাতে চেষ্টা করল। সে কোন কথাই শুনল না। অনেককে অপমানিত করল।

রাজুদার আশ্রম ছিল গঙ্গার ধারে এক প্রকাণ্ড গাছের উপর। নিজের হাতে ছোট কাঠের ঘরের মত করেছিলেন। সেইখানেই একটি হাঁড়িতে দুটি গোখরো সাপের বাচ্চা পুষেছিলেন। হাঁড়ির মাথায় ফুটো দিয়ে খড়ের নলে করে তাদের দুধ খাওয়াতেন। হাঁড়ির মধ্যে ... তাদের গর্জন!

আমরা কেউ বড় একটা সেখানে উঠতাম না। জায়গাটি নির্জন। একদিকে গঙ্গার জলকল্লোল ও বাকি জায়গার সবটাই জঙ্গল বড় বড় গাছে অন্ধকার। নীলকুঠীর ভ্যাট এবং নীলের পচা জল নিকাশের বাঁধানো নর্দমা, তার ভেতর মানুষ ঢুকে বসে থাকতে পারে?

দরজায় বসল। রাজন্দারে সমন পেয়ে অপরাধী হাজির।

রাজন্দা তাকে মিষ্ট কথায় অনেক বোঝালেন। কিন্তু সে কেবলি মিথ্যা কথা বলে নিজের জেদ ধরে রইল। তখন রাজন্দা হনুকুম দিলেন—একে নিয়ে যা।

সঙ্কেত মধ্যে দলের দুজন ষণ্ডা তাকে নিয়ে এক হাড়িকাঠের সামনে বসাল। তাতে বড় বড় সিঁদুরের দাগ। চক্ষের নিমেষে আর একজন একটি পুরানো তরোয়াল সামনে এনে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। কারও মুখে কথা নেই।

রাজন্দা ধ্যানে বসলেন। তারপর হনুকুম দিলেন—ঘি ঘস।

বলার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর গলায় এক বাটি ঘি মালিশ আরম্ভ হয়ে গেল।

অপরাধী ভয় পেয়ে বললে—রাজন্ কি হচ্ছে! মাইরি আমি কিছন্ জানি না ভাই, আমায় ছেড়ে দে।

ঘি ঘসা চলছে। কেউ কথা বলছে না।

রাজন্দা আরও গম্ভীর হয়ে বললেন—এবার ওকে একটন্ গঙ্গা জল খেতে দে। আর হাত দুটো পিছ মোড়া করে হাড়ি কাঠে ফ্যাল। আরও ঘি ঘস।

এবার অপরাধী অত্যন্ত জোরে কেঁদে উঠলো এবং মাকড়ির কথা স্বীকার করলো। কার দোকানে বেচেছে তাও বললো।

আমরা সদলবলে গিয়ে সেটি কেড়ে এনে মেয়েটির বাবাকে দিলাম।

এই কাহিনীতে হাড়িকাঠের কথায় শরৎচন্দ্রের 'ছেলেবেলার গল্প' গ্রন্থের 'লালন্' গল্পের কথা মনে আসে। শরৎচন্দ্র রাজনুর কাহিনীকেই তাঁর ঐ বইয়ে লালনুর গল্প হিসাবে লিখে গেছেন। ঐ লালন্ গল্পে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—মনোহর চাটুজ্জের বাড়িতে কালীপুজো। সেখানে কামারের অনুপস্থিতিতে লালনুকে অর্থাৎ রাজনুকে অনুরোধ করে নিয়ে যাওয়া হয় বলির পাঁঠা কাটার জন্য। বলির পাঁঠা ছিল দুটো। ঢাক, ঢোল ও কাঁসর বাদ্যির মধ্যে দুটো পাঁঠাই কাটা হয়ে গেলে, লালন্ হঠাৎ হনুঙ্কার দিয়ে উঠলো আর পাঁঠা কই?

একজন বললে—আর পাঁঠা নেই। দুটো করেই বলি হয়।

লালন্ বললে—আমার খনুন চেপে গেছে। পাঁঠা দাও। নইলে যাকে সামনে পাব তাকেই ধরে নরবলি দোব।

এই কথা শনুনে এবং লালনুর মনুর্তি দেখে যে যেদিকে পারল, ভয়ে পালাল। মনোহর চাটুজ্জে মোটা মানন্ষ ছন্টে পালাতে পারল না। লালন্ বাঁ হাতে তার একটা হাত চেপে ধরে বললে—চলো হাড়ি-কাঠে গিয়ে গলা দেবে। মার আদেশ।

মনোহর কেঁদে বললে—না বাবা মায়ের

মণিবাবনুর পাণ্ডুলিপির আর একটি প্রতিলিপি
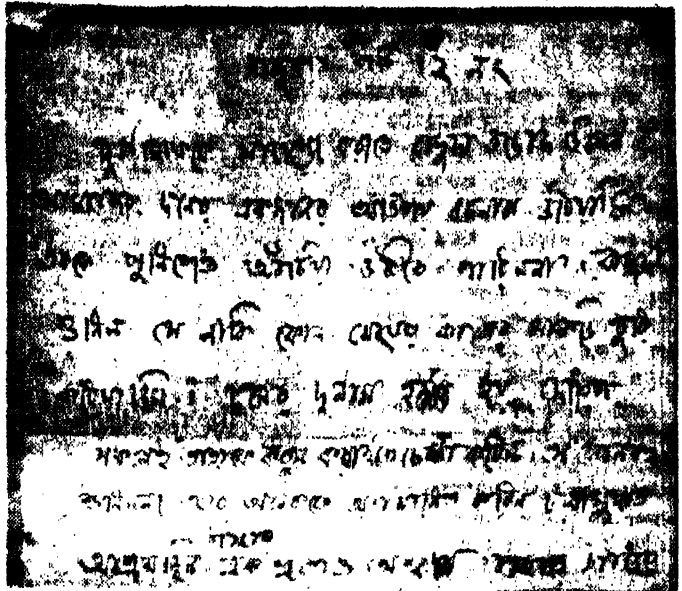
—জগজ্জননী, সে জ্ঞান আছে তোমার? তবে পাঁঠা বলি দাও কেন? আর বলি দেবে?

—না বাবা। আর কখখনো দোব না।

এর পরের বছর থেকে মনোহর চাটনুজ্জের বাড়ির পনুজোয় পাঁঠা বলি উঠে যায়।

মণিবাবন্ লিখেছেন—

একদিন একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের জিমন্যাসটিকের আখড়ায় এসে বললেন—মশাই এখানে রাজনুবাবন্ কে আছেন?

রাজন্দা বললেন—আজ্ঞে, আমিই রাজনু-বাবন্, আপনি কি চান?

আগন্তুক স্কুলের অল্প বেতনের পণ্ডিত। নিজের দনুঃখের কাহিনী বলতে লাগলেন—জলকলের এক সাহেব বিনাদোষে হট্ যাও, বলেই মনুখের উপর চাবনুক মারে।

শনুনে রাজন্দা বললেন—বেশ করেছে, আপনি মার খান কেন?

তখন পণ্ডিত মশায় বুঝিয়ে বললেন—রাস্তা কম চওড়া, সাহেবের টমটম থেকে আর কতদূর যাব, দুধারেই কাটাবন আর নালা।

তাঁর কথা শুনে রাজুদা বললেন—আচ্ছা আপনি অমুক দিন আবার ঠিক সেই জায়গা দিয়ে যাবেন। আমরাও থাকব।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা বার জন সেখানে রাজুদার প্ল্যান মত এক মোটা দড়ি নিয়ে উপস্থিত হলাম। তাতে একটি প্রকাণ্ড ফাঁস গেরো, দিয়ে গেরোটা ঢিল অবস্থায় রাস্তার মাঝখানে রেখে দড়ির দুই প্রান্ত ছজন করে শক্তভাবে ধরে লুকিয়ে বসে রইলাম। একটু পরেই ঘোড়ার পায়ের খটাখট শব্দ শোনা গেল।

সেই শয়তান সাহেব টমটম হাঁকিয়ে উপস্থিত এবং লোকটিকে পুনরায় হট যাও বলে চাবুক মারতে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জয় মা শব্দে ঘোড়ার পায়ে ফাঁস পড়ল। ঘোড়া তো দুই পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে টমটম উল্টে ফেলে দেয় আর কি! তুমুল ব্যাপার! সাহেব নেমে এল ঘুষি বাগিয়ে. রাজুদাও এগিয়ে গেলেন। দুচারটে কথা কাটাকাটির পরই দেখি দুজনে ঘুষোঘুষি বক্সিং আরম্ভ হল। রাজুদা একলাই হাল্কা ভাবে লড়ছিলেন। আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি। একবার দেখি একটা ঘুষি রাজুদার রগে এসে লাগলো। রাজুদা এক মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত, তারপরই সজোরে সাহেবের নাকে এক ঘুষি মারতেই, সাহেব তখন ভীষণ রেগে গিয়ে, পেতল বাঁধানো হাতলটার বাড়ি রাজুদার মাথায় মারতে উদ্যত হল।
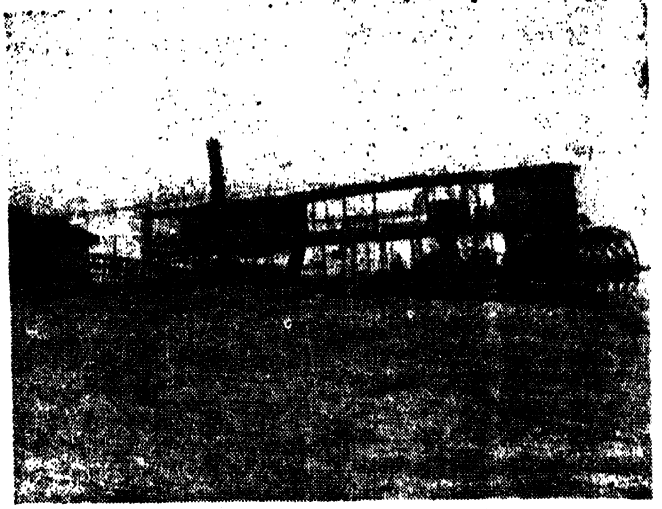
ভগগু সিং-এর 'হোপ' স্টীমার

কিন্তু কি আশ্চর্য কৌশলে রাজুদার 'বডিগার্ড' নীলু খুড়ো চক্ষের নিমেষে বিদ্যুৎ বেগে পেছন দিক থেকে চাবুকটা ফস করে হাত থেকে টেনে নিল।

কি হ'ল বাঝবার আগেই রাজুদার গ্রেট সর্কেল দেওয়া জিমন্যাস্টিকের হাতের প্রচণ্ড ঘুষি সাহেবকে বসিয়ে দিল।

আমাদের দলের কেউ কেউ সাহেবকে অপমান করতে উঠল, কিন্তু রাজুদার অদ্ভুত চরিত্র। তিনি যেরূপ চোখ করে চাইলেন, ভয়ে সবাই পিছিয়ে এল। তবে আগেই এক হতভাগা সাহেবের টুপিতে পেচ্ছাব করে দেওয়ার জন্য রাজুদার কাছে মার খেল। রাজুদা বললেন, হারামজাদা, তুই মারামারি করতে এসেছিস মারামারি কর। ইতরামি করলি কেন?

সহিস দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, তাকে ধমকে সাহেব বললে—এই উল্লু খাড়া হ্যায় কাহে।

সহিসও সমানে প্রত্যুত্তর করল—ত্যব্ ক্যা করেগা, জান দেগা! তুম্হি কো পিটতা তো হামকো কা ছোড় দেগা, লে লেও তুমহারা পাঁচ রুপিয়া কা নোকরি।

আমরাও গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কদিন একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কিন্তু সাহেব নালিশ করেনি। আর সেই ভদ্রলোকটিকেও উৎপীড়ন করেনি।

মণিবাবুর এই লেখাটা পেয়ে, এই বিষয়ে আমার দীর্ঘদিনের সামান্য একটা গোলমেলে ধারণা এখন অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে গেল। ঐ গোলমেলে ধারণাটা হল এই—

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশ করেন ১৩৫৭।৫৮ সাল নাগাদ। এর আগেই শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু করি। এই সাহেব ঠ্যাঙানোর কাহিনীটা সুরেনবাবু তাঁর শরৎ-পরিচয় গ্রন্থে এইভাবে লিখেছেন—পথের 'দুধারে দুটি গাছে কাছির দুটি প্রান্ত টেনে বেঁধে দিয়ে রাজুর দল নিঃশব্দে প্রতীক্ষা' করেছিল। সাহেবের 'ঘোড়া এসে কাছিতে বেধে গেল এবং সাহেব ঘোড়া ডিঙিয়ে পথের মধ্যে চিৎপাৎ।' রাজু কাছি এনেছিলেন, আদমপুর ঘাটের ভগগু সিংএর 'হোপ' স্টীমার থেকে।

সুরেনবাবুর এই লেখা পড়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। এর আগেও অবশ্য অনেক বার তাঁর কাছে গেছি। এই সাহেব ঠ্যাঙানোর কথায় তিনি বলেছিলেন—বইয়ে আমি যদিও শরতের নাম করিনি, কিন্তু শরৎই ছিল রাজুর প্রধান সহায়ক। এই বলে তিনি এ সম্পর্কেই তাঁর বইয়ের বাহিরের আরও কয়েকটা কথা বলেছিলেন।

সুরেনবাবুর কথা অনুযায়ী ১৩৬১ সালে প্রকাশিত আমার শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' গ্রন্থে এই কাহিনীটার প্রসঙ্গে লিখি —রাজু রাস্তায় দু পাশের দুটো গাছে কাছি বেঁধে ঘোড়া আটকে ছিল।

সুরেনবাবু ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আবার লেখেন 'কাছির ফাঁসের মধ্যে হঠাৎ ঘোড়ার পা আবদ্ধ হওয়াতে একটা হৈ হৈ কাণ্ড ঘটিল। ঘোড়া পড়িল।'

১৩৬৬ সালের আগেই সুরেনবাবুর মৃত্যু হয়। তাই এ বিষয়ে তাঁকে আর জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সুরেনবাবু তাঁর এই লেখাতেই 'সাহেব প্রায় নিতাই শিক্ষকটির পিঠে চাবুক মারিয়া চলিয়া যাইত। ইহা একটা খেলার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল'—এই কথাটা বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায়, কাছির ফাঁসে ঘোড়ার পা আটকানোর কথাটা নিয়ে আর চিন্তাই করিনি। কিন্তু এখন মণিবাবুর লেখাটা পড়ে দেখছি—এইটাই হয়ত সত্য। গাছে দড়ি বাঁধার কথাটা ঠিক নয়।

তবে মণিবাবু যে বলেছেন, জল-কলের সাহেব পণ্ডিত মশায়ের মুখে চাবুক মেরেছিল, এবং সাহেবকে ঠ্যাঙানোর দিনও পণ্ডিত মশায়কে সাহেব মারতে উদ্যত হয়েছিল, এ সম্বন্ধে সুরেনবাবু এবং ভাগলপুরের আরও কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তিকে অন্য কথা বলতে শুনেছি। তাঁদের কথাই আমার লেখায় বলেছি।

মণিবাবু লিখেছেন—রাজুদার বডি-গার্ড নীলু খুড়ো। এই কথাটাই সুরেনবাবু লিখেছেন—চাবুকের বাঁট ঘুরাইয়া সাহেব রাজুর মাথায় আঘাত করিবার উপক্রম করিলে রাজুর সহচর নীলাম্বর বেমালুম পিছন হইতে তাহা টানিয়া লইল।

মণিবাবুর লেখা হলেও 'রাজুর বডি-গার্ড নীলু' একথা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। বরং সুরেনবাবু যে লিখেছেন রাজুর সহচর, এইটাই ঠিক।

যাই হোক, অনেক দিনের কথা স্মৃতি থেকে বলতে বসে মণিবাবু বা সুরেনবাবু সামান্য একটু আধটু এদিক ওদিক করলেও, মূল ঘটনার বর্ণনায় কিন্তু উভয়েই এক।

রবীন্দ্র-জীবনীকার মনীষী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হালের একটি লেখায় পড়লাম, তিনি লিখেছেন—'আমার এই কর্মচঞ্চল লাইব্রেরিতে যদি কখনো আসেন দেখবেন, কীভাবে রবীন্দ্র-জীবনী লেখা হয়—কীভাবে ভুল সংশোধন করা হয়, কীভাবে নতুন তথ্য থাপে থাপে বসানো হয়।

প্রভাতবাবুর ন্যায় আমারও কথা, আমার শরৎচন্দ্র গ্রন্থে সামান্যতম ভুলও ধরা পড়লে, তা সংশোধিত হবে, এবং কোন নতুন তথ্য পেলে তাও সংযোজিত হবে।

যাই হোক, আবার রাজুর কথাই বলি। অপরের সোনা চুরি বা টাকা চুরিকে রাজু বিশেষ অপরাধ বলে গণ্য করতেন। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের জন্য কারও বাগানের ফল চুরি করা, বা কোন ময়রার দোকানের খাবার চুরি করা বা জেলেদের মাছ চুরি করা এগুলোকে রাজু আদৌ অপরাধ বলে গণ্য করতেন না। তাঁর মতে এ সব ছোটখাট চুরিতে মালিকের ক্ষতি তেমন তো হবেই না, অধিকন্তু অপরের উপকার হবে। তাছাড়া এগুলোকে তিনি মজা ও সাহসের পরিচয় হিসাবেই গণ্য করতেন। রাজুর এইরূপ কয়েকটা ছোটখাট চুরির কাহিনী—যেগুলি সবই অত্যন্ত দুঃসাহসিকতাপূর্ণ—মণিবাবুর খাতায় পেয়েছি। সেগুলি এখন বলছি—

ভাগলপুরের সেকালের ইউরোপীয়ান ক্লাব

কোরেনের বাগানে লিচুগুলি যেমন বড় তেমনি মিষ্টি। কিন্তু মুশকিল বাগানের দুটো মালীর সজাগ পাহারা, ভিতরে বারান্দায় কুকুরও আছে।

রাজুদা উঁচু পাঁচিলের উপরে উঠে নিঃশব্দে টপাটপ এক কোঁচড় লিচু ভরে ফেললেন। ঠিক এই সময় মালীরা টের পেয়ে গেল এবং দুজন পাঁচিলের দুপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজুদা দেখলেন বেগতিক। তিনি পাঁচিলের উপর দিয়ে দৌড় দিলে মালীরাও দুপাশ থেকে দুজনে দৌড় দেয় এবং রাজুদাকে তাড়া করে। তিনি দেখলেন—পালাবার পথ বন্ধ, আজ তারা ঠিক ধরে ফেলবেই।

হঠাৎ রাজুদা রাস্তার উপর মালীটার সামনেই ধপ্ করে লাফিয়ে নেবেই খপ্ করে এক মুঠো ধুলো রাস্তা থেকে নিয়ে মালীটার মুখের উপর ছুঁড়ে দিলেন। বেচারা চোর ধরবে কি! চোখ-মুখ সামলাতে, ফুঃ ফুঃ করতে করতে রাজুদা ততক্ষণে পগার পার।

রাজুদা একদিন বললেন—চল্ জেলেদের জাল থেকে কিছু মাছ নিয়ে আসি। গেলাম। এইভাবে গিয়ে মাঝে মাঝে বিপদেও পড়তাম।

জেলেরা গঙ্গায় মহাজাল ফেলে বড় বড় মাছ আটকে রেখেছিল। রাজুদা এক ফাঁকে গোটা দুই বড় রুই মাছ তাঁর ডিঙিতে তুলে নিলেন। কিন্তু পালাবার সময় দেখা গেল সামনে সব বড় বড় ভড় রাস্তা আটকেছে। পালাবার পথ বন্ধ করে জেলেরা আমাদের ধরবার তোড়জোড় করতে লাগল।

রাজুদা করলেন কি তাঁর সেই ছোট দাঁড় দিয়েই একবার এ নৌকোয় একবার ও নৌকায় ঠেকা দিয়ে দিয়ে নিজের ছোট ডিঙিটাকে আশ্চর্য কৌশলে বার করে নিয়ে বড় গঙ্গার স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দিলেন।

বড় নৌকার তো নড়তেই কত সময় যায়, চোর ধরবে কি।

এই কাহিনী পড়ে মনে হচ্ছে, শ্রীকান্তে বর্ণিত ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর মাছ চুরির কাহিনী আদৌ অতিরঞ্জিত নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাছাড়া শ্রীকান্তে যে ভুট্টা ক্ষেতের কথা আছে, আমি ভাগলপুরে গিয়ে সেখানকার প্রবীণ ব্যক্তিদের মুখে শুনেছি—কিছু দিন আগেও গঙ্গার চরে ভুট্টার ক্ষেত ছিল।

'শ্রীকান্তে' ইন্দ্রনাথ বলছে—যদি দেখিস্ ঘিরে ফেললে বলে, আর পালাবার যো নেই, তখন টুপ করে লাফিয়ে পড়ে একডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হল। এ অন্ধকারে দেখবার জোটি নেই—তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ি ফেরে গেলেই বাস। হাত ভেরে গেলে চিৎ হয়ে থাকলেই হল। তাছাড়া মড়া পোড়া'না বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।'

এই সতুয়ার চড়া, গঙ্গায় মড়া পোড়ানোর কাঠের গুঁড়ি ভেসে যাওয়া, এ সবও সত্য।

ভাগলপুরের বাঙালি অঞ্চল ছাড়িয়ে তার পরেই মীরাচকের শ্মশান। যে কেউ এখানে গেলেই দেখতে পাবেন, গঙ্গার চরে জলের গায়ে শবদাহ চলছে এবং পাশেই শবদাহের পর অবশিষ্ট পোড়া গুঁড়ি জলে ভেসে যাচ্ছে। আমি নিজে গিয়েও দেখে এসেছি।

এই মীরাচকের শ্মশানের কিছু দূরেই সতুয়ার চড়া।

এবার রাজুর আর একটা মজার অথচ দুঃসাহসের কাহিনী বলছি। মণিবাবু লিখেছেন—

একদিন মাছ চুরি করতে গিয়ে সুবিধা হল না দেখে, রাজুদা বললেন—চল একটু ঘুরে যাই।

দলে আমরা তিনজন ছিলাম। ডিঙিটাকে গঙ্গাতীরে এক জায়গায় রেখে আমরা হেঁটে চললাম।

গাঁয়ের এদিকে গোয়ালারা থাকে। তাদের যেমন লম্বা চওড়া ভীষণ চেহারা, তেমনি ইয়া ইয়া গোঁফ। ওরা সবাই ডাকাতিও করে।

কোন দরকার ছিল না, গাঁয়ের ওদিকে যাবার, তবুও রাজুদার পাল্লায় পড়ে গেলাম। রাজুদা দেখলেন—ওরা নিশ্চিন্তে মাটির হাঁড়িতে রান্নাবান্না করছে।

রাজুদা একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে ওদের একটা হাঁড়ি লক্ষ্য করে ছুঁড়তেই হাঁড়িটা ভেঙে গেল।

ওরা রাজুদাকে উদ্দেশ করে শালাকো মার ডালো—বলে আমাদের তাড়া করল।

আমরা দৌড়তে দৌড়তে এসে ডিঙিতে উঠেই ডিঙি খুলে দিলাম।

গয়ালারা সব বড় বড় ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের দিকে আসতে লাগল, আর বলতে লাগল—মারো শালে কো—ভাগতে হ্যায়।

একটা বড় ঢেলা এসে অন্নদার পিঠে লাগল। মাগো! বলে অন্নদা কেঁদে ফেলল।

রাজুদা বললেন—এখানে কি মা আছে, যে কাঁদছিস!

রাজুদা গয়লাদের ছোঁড়া ঢিলগুলো লুফে নিয়ে ওদের দিকে ছুঁড়তে লাগলেন।

ইত্যবসরে ডাকাতগুলো জলে নেবে শালাকো ডুবা দো, জান মারেঙ্গে—বলে সাঁতরে আমাদের নৌকো ধরবার জন্য আসতে লাগল। ওদের রাগ কী ভীষণ! প্রতিশোধ নেবেই। বড় গঙ্গার প্রবল স্রোতেও দুজন সাঁতরে এসে আমাদের ডিঙি ধরল। রাজুদা তৎক্ষণাৎ সজোরে একজনের মাথায় দাঁড়ের বাড়ি মারলেন। লোকটা হাত ছেড়ে ডুবে গেল।

আর একজন এগিয়ে এলে তাকেও দাঁড়ের বাড়ি মারলেন, কিন্তু বেটার শক্ত জান, হাত দিয়ে ডিঙি দাবাতে লাগলো, ডুবিয়ে দেবে।

রাজুদা বললেন—তোরা একজন ওর হাতের আঙুল গুলোর [illegible] দাঁড়ের বাড়ি মার, আমি ওর টিকি[illegible] দড়ি দিয়ে ডিঙির সঙ্গে বাঁধি।

বাঁধা পড়বার ভয়ে এবার সে মার খেয়ে ডুব দিয়ে পালাল।

রাজু তাঁর এইরূপ নানা খেয়ালী কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও, তিনি গঙ্গা-তীরে অশত্থ গাছের মাথায় কাঠ দিয়ে তৈরি করা তাঁর ধ্যানের ঘরে বসে কিন্তু নিয়মিত ঈশ্বরের ধ্যান করতেন। রাজুর এই ধ্যান ঘরে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে যেতেন।

এই ঈশ্বরের ধ্যান করতে করতেই রাজু হঠাৎ একদিন সংসারে নিরাসক্ত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। সেটা খুব সম্ভব ১৯০১ খৃস্টাব্দের প্রথম দিক। এর কিছু দিন পরেই শরৎচন্দ্র এই বন্ধু ও গুরু রাজুর সন্ধানে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। কিন্তু বহু জায়গায় ঘুরেও রাজুর সন্ধান পাননি।

প্রচণ্ড শক্তিধর, অসীম সাহসী, নির্ভীক, পরোপকারী, অন্যায়ের বিরোধী, অথচ একান্ত খেয়ালী এই রাজুকে স্মরণ করে, শরৎচন্দ্র তাই পরে তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস লিখছেন—'কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বনজঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই।...ভগবান! টাকা কড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি ঢেরও তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?'

—শেষ—

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

সোসাইটি অব ওয়ার্কিং আর্টিস্ট

কলকাতায় এখন শিল্পীদের নানা দল। তার মধ্যে দিল্লির ললিতকলা আকাদমীর স্বীকৃতি এবং বার্ষিক আর্থিক সাহায্য ইতিপূর্বে কলকাতার তিনটে দল পেয়ে এসেছে। সোসাইটি অব ওয়ার্কিং আর্টিস্টও এই বছর থেকে এই বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী হলো।

এবার প্রদর্শনী (১৪—২৬ ডিসেম্বর—বিড়লা আকাদমী) অনেক ভাল হয়েছে আগের চেয়ে। কিন্তু মৌলিক কিছু জিজ্ঞাসা থেকে যাচ্ছে। বড় বড় দলগুলির সদস্য শিল্পীরা হচ্ছেন বাঁচার তাগিদে। একা হল ভাড়া করে নিয়মিত প্রদর্শনী করা অসম্ভব। বিশেষত কলকাতার বাইরে অন্য শহরে। কিন্তু তাঁদের একত্র সমাবেশ কোনো যৌথ শিল্প আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে না। এই দলের জ্যোতিষ ভট্টাচার্য সুনীতা মানচান্দা আর সুকুমার দাস নতুন আগন্তুক এবং তাঁদের মেজাজ এবং ক্ষমতার আকাশপাতাল পার্থক্য।

সুনীতা মানচান্দা দুটি 'রচনার' পটের সাদা জমি কিছুটা ছেড়ে এক জোড়া নগ্নিকা মেয়ে এঁকেছেন—একটাতে হামাগুড়ি দিচ্ছে একটি মেয়ে, তার নীচে আরেকজন, অন্যদিকে দুটি মেয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। তার ওপর সমতল রঙের চতুর্ভুজ ও ত্রিভুজ আরোপ করেছেন। ভীষণ বিজ্ঞাপন-ধর্মী অংকন এবং একধরণের 'লোসিবিয়ন' আবহাওয়া আমার ভাল লাগেনি। তাছাড়া ছবি দুটি পূর্বে প্রদর্শিত।

জ্যোতিষ ভট্টাচার্য বড় বড় দুটি কানভাসে এলোপাথাড়ি রঙ চাপিয়ে জমিয়েছেন। বিমূর্ত রূপবন্ধ গড়ে তোলার জন্যে রঙের জাদুকরী কৌশল প্রয়োগ করে ফুটিয়েছেন হয়তো বসন্তে কোনো বনের আভাসটুকু। বা অন্যটি যেন ঝর্নার ধারা সাদার আর হলুদের কবাক ব্যবহার। বিমূর্ত ছবি সুতরাং এসব আমার কল্পনা। জ্যোতিষের ছবি বহুদিন পর দেখলাম, কিন্তু তাঁর ছবি এই দশ বছরের মধ্যে কিছুই বদলায়নি। দ্বিতীয়ত বিমূর্ত অভিব্যক্তিবাদ ইত্যাদির চল ইউরোপ আমেরিকা থেকে উঠে গেছে কয়েক বছর হলো। সুকুমার দাসের ছবিগুলোর ফ্রেম ফ্রেমগুলো দামী ও সুন্দর। তাই ফ্রেমে ছবির নম্বর না সেঁটে তিনি ছবির গায়ে সেঁটেছেন—এমনটি আমি কস্মিনকালে দেখিনি। সুকুমার যত্ন নিয়ে ছবি আঁকেন—তাও খুবই অপেশাদার ভঙ্গীতে। মিষ্টি মিষ্টি ফুল টব মন্দ আঁকেন না। ঘর সাজাবার উপকরণ হিসাবে খুবই চমৎকার! সুবল পাল পটের বিস্তারে একটি উজ্জ্বল হাল্কা রঙ দিয়ে ভরে তার মধ্যে কিছু রাগবী বল বা পটলের মতো আকার ছেড়ে দিয়েছেন। এই আকারের ওপর বানোটের কারিকুরি করেছেন। ছবির এই ধরনের শুদ্ধ চাক্ষুষ নান্দনিক উপস্থাপনা বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় কুসংস্কার। এমত মাদুলীতে আমাদের নান্দনিক পীড়া সারাবে বলে মনে হয় না। তেমনি আমার মনে হয়েছে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের জলরঙে আঁকা রেখাচিত্রের কোনো কেন্দ্র নেই, চক্র, বৃন্তসদৃশ শায়িত মূর্তি প্রভৃতি প্রচুর জিনিস এনেছেন, কিন্তু ছবি তেমনভাবে টানে না।
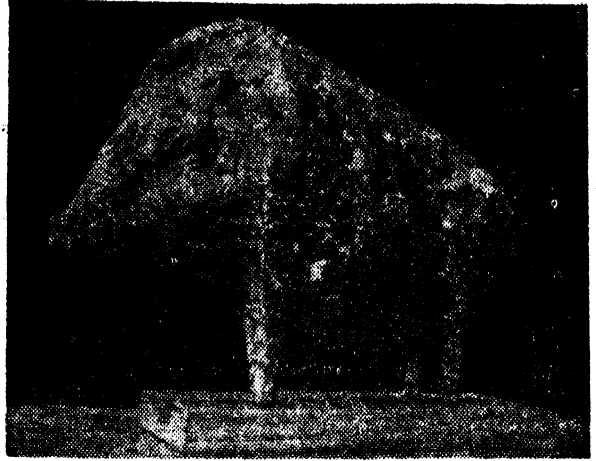
যাঁদের কাজ আমার মোটের ওপর ভাল লেগেছে তাঁদের কথা বলি। সরিৎ নন্দীর 'লোকশিল্পী' নিঃসন্দেহে ভাল ছবি। বৈষ্ণবী বৈষ্ণব ও তাদের চন্দনচর্চিত মুখ, তাদের দেহভঙ্গীর রূপারোপ, আকারকে ধরে রাখার জন্যে বঙ্কিম রেখার ছন্দিত ভঙ্গী মায়া সৃষ্টি করে। গড়ে তোলে

ব্রোঞ্জের তৈরি পশু —নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়

ভাঙ্গা লৌকিক ও আদিম ধরনের মেয়ে-পুরুষ। সাঁরিং অবশ্য মন্ডনের ওপর ঝোঁক দিয়ে মাঝে মাঝে ছবিকে একটু অতিরিক্ত মিষ্টি করে ফেলেন। কমলা ঘোষ মোটা করে রঙ চাপান, কিন্তু বেশ একটা মেজাজে। 'জীবনদর্শন' কোলাজধর্মী এবং এতে তিনি মন্তাজের মতো নানা খন্ড দৃশ্যকে একত্র করেছেন। সেখানে বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধ, মন্দিরের সম্মুখে হাতে খোলকরতাল নিয়ে বৈষ্ণব, জ্যাম সেসন ও একা একা মেয়ের মদ খাওয়া সব আছে। ছবিটি রচনার দুর্বলতার জন্যে সামগ্রিকভাবে গ্রথিত হয়নি। সুবীর সেন প্যাস্টেলের মতো করে রঙ চাপিয়ে ছবিতে একটা আবহাওয়া তৈরী করেছেন। যদিও তৈলচিত্র সুতরাং তেলচকচকে ভাব একটু থেকে গেছে। তার 'হলধর' ছবিতে হালটা বড় হয়ে ছাতার মতো হয়েছে। চাষী উবু হয়ে বসে আছে ষাঁড়ের পেটের নীচে। সবুজ ও হলুদ রঙ ক্রমান্বয়ে চাপিয়ে তিনি তৈরী করেছেন একটা কাব্যিক মোহ। তেমনি 'অন্ধকারে' হাড় জিরজিরে উলঙ্গিনীর কাছে শিশু—ফিকে ফ্যাকাসে হলুদ, লাল, সবুজ চাপিয়েছেন।

এঁদের মধ্যে ওয়াসিম আর কাপুরের সদবাস্তব (সু র রি য়া লি স্ট) ছবিতে একটা চাপা অর্তনাদ আছে। ইউরোপীয় প্রথাগত বাস্তববাদ, আধুনিক বিজ্ঞাপন এবং রঙীন ফোটোগ্রাফির সবটুকু শুষে নিয়ে তিনি কল্পবাস্তবকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে চাইছেন। রঙীন ফোটোগ্রাফি ধরনের নীলিমার নীচে ভূমিকম্প ফাটা ফাটা মাটির মধ্যে একটি রুগ্নাঙ্গী স্তনিকা মেয়ে আর তার সামনে একটি ছেলে—তার চোখে টলটল করছে দু ফোঁটা জল। কিংবা ক্লাউনের মুখ, বড় গোল মার্বেলের মতো নাক—ওপর থেকে নীচে চিড় খেয়ে দু টুকরো হয়ে গেছে। বা ক্লাচের ওপরে একটা পেছন ফেরানো মাথা—নীচে সূর্যোদয়। ওয়াসিমের কব্জীর জোর আছে কিন্তু তিনি হয়তো নিজেকে এখনও খুঁজে পাননি।

ভাস্কর্যে সমরেশ চৌধুরী কাঠের ওপর লাল প্লাস্টিকের বল লাগিয়ে সস্তায় কিস্তিমতে করতে চেয়েছেন। বরং সুধীন গুপ্তের কাজের গাম্ভীর্য অনেক বেশি। কাঠের ওপরে অ্যালুমিনিয়ামের পাত কেটে বসিয়ে বিমূর্ত রূপবন্ধের খেলা জমিয়েছেন ভাল। তেমনি কাঠ কেটে খাড়া নারীমূর্তি খেটে করেছেন।

আকাদমী অব ফাইন আর্টসের বার্ষিকী

তিনশ চল্লিশটা ছবির প্রদর্শনী সুতরাং বিশদভাবে বলা যাবে না। ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ছবি এসেছে। কাঁচা কাজ, অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গীর কাজ ছিল। কিন্তু স্থানীয় তরুণ শিল্পীদের ভাল কাজও ছিল। তরুণ শিল্পীদের কাছে প্রশ্ন, তাঁরা পূর্বে প্রদর্শিত ছবি দিচ্ছেন কেন? নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, হেমন্ত মিশ্র, শানু লাহিড়ী নতুন ছবি দিয়েছেন। তরুণেরা কি এতো কম ছবি আঁকেন যে একই কুমীরছানা বারবার দেখাবার খেলা খেলতে হয়।

আমার ভীষণ ভাল লাগছে যে গীতা মাইতি এবার লাটসাহেবের সুবর্ণ পদক পেয়েছেন—বিশেষত ইতিপূর্বে 'মণিকাঞ্চন' নামক লেখায় এঁর কাজ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত বিবরণ দিয়েছিলাম। এবার সেই প্রদর্শনী থেকে কাঞ্চন দাশগুপ্ত, বিনোদ দাস, তিলক মণ্ডল, বিশ্বপতি মাইতির ছবি এসেছে। তেমনি পৃথ্বীশ সেন, বিকাশ সেনগুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় শিল্পী আগেকার কাজ দিয়েছেন।

ছবি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল কাজের বৈচিত্র্য খুব—কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিল্পীরা যেন ভেতর থেকে কোন জোর পাচ্ছেন না। সামগ্রিকভাবে একটা নান্দনিক বোধের শূন্যতাকে চাপার জন্যে পাশ্চাত্ত্য ধরনের নানা চমকসৃষ্টি ও নানাভাবে লম্ফঝম্ফ করার চেষ্টা এবং এর ফলে তৈরী হচ্ছে বিচিত্র সব ছবি।

কিন্তু আলাদা করে ভাল কাজগুলোর বিষয় আলোচনা করব। এস বাসু রায়-চৌধুরীর 'চা-কর সাহেব' ছবিতে একজন মেদবহুল টী প্লান্টারকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে জলরঙে। স্টীলের খাটে শুয়ে আছে। চারিপাশে নানারকম ইলেকট্রিক তার, সুইচ, মদের বোতল দেওয়ালে স্ত্রীর ছবি। তবে ছবিতে ইঙ্গিতের ভাগটা কম এবং বক্তব্যটা প্রত্যক্ষ। ভারতী চৌধুরীর 'রচনা' লবেনচুসের মতো মিষ্টি হলেও মন্দ লাগে না। জ্যামিতি ও নকশার প্রাধান্যকে তিনি স্নিগ্ধ রঙে চাপা দিতে চেয়েছেন। লাল গাছ, হলুদ গোলাকৃতি মাঠ মাঝখানে। সমতল উজ্জ্বল রঙ। পাহাড়ের আভাস। মাদ্রাজের দক্ষিণামূর্তির আঁকা 'মস্তক' ছবির লোকটার মুখ একটু বেশি আদিম ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। চওড়া অংশে লাল নীল রঙ দিয়ে ভরেছেন। চুলের জায়গাটা তুলি ধরে প্রতিটি চুল আলাদা করে আঁচড়ে দিয়েছেন। নির্মল দত্তের 'গন্তব্য' ছবির পট গাঢ় সবুজে ভরে ওপরে ও নীচে দুটো পাতার মতো আকার আছে। জগন্নাথের মুখ ভাসছে, নীচে যেন আদিম মানুষ গুহার ভেতর উলঙ্গ হয়ে খোল বাজিয়ে নাচছে। একটা তীব্র নৈরাশ্যের সুর আছে। ইন্দোরের ডি সি জয়ন্ত 'জলশক্তি' ছবিতে জলের তোড় এঁকেছেন নীলে। কিন্তু মাঝখানে ফেনিল সাদা অংশ ছেড়েছেন বেশি। মিলন ঘোষাল কালচে লাল প্রতিবেশে অরণ্যের বৃক্ষ এঁকেছেন, কিন্তু মাঝখানে কেন গাছের গুঁড়িতে হঠাৎ সাদা রঙ ছেড়েছেন সেটা বোঝা গেল না। সন্দীপনী জয়সওয়ালের অস্বচ্ছ জলরঙে আঁকা সাদা শহরের অস্পষ্ট আভাস বেশ ভাল।

ওয়াসিম এস কাপুরের 'প্রেমের উষালগ্ন' তৈলচিত্রটির সবুজ হলুদ টেবিলক্লথের ওপর বিরাট আকারের আপেলসদৃশ প্ল্যাটারের অর্ধনারীশ্বর মুণ্ডহীন মূর্তি। ওপরে একটা পিচ্ছিল সাপ গাছ থেকে নেমে আসছে। কাপুরের ধরনধারণ ভীষণ ইউরোপীয়। এর পাশেই সুনীল পালের লাল কালো ছোপ ছোপ রঙ দিয়ে আঁকা দিশী মেজাজটার কথা ভাবুন।

বয়স্কদের মধ্যে শানু লাহিড়ীর 'রাবণ' সাদা, নীল ও কালো রঙের মধ্যে অস্পষ্ট আকার দৃষ্টিকে টানে। তেমনি নীরদ মজুমদারের সিংহবাহিনী 'চণ্ডী' ছোট ছোট নীল, হলুদ, সাদা রঙের ছোপ দিয়ে করা মনোহারী কাজ। কিন্তু নীরদবাবু সম্প্রতি প্রতিকৃতি, সামাজিক বক্তব্যের ছবি, নিসর্গ চিত্র এঁকে ভিন্ন আশা জাগিয়েছিলেন। সেদিক দিয়ে নিরাশ না হয়ে উপায় নেই। কার্তিক পাইনের হলুদ বেগুনী গেঞ্জি পরা এবং সীলের মতো বসে থাকা মেয়ে, পেছনে গাছের মতো দেখতে একটা পুরুষ আর একটা গাছের গুঁড়ি—অঁরি রুসোর ছবির কথা মনে করিয়ে দিলেও মন্দ লাগে না। রথীন মৈত্রের চারটে দাঁত বার করা বুনো কুকুরের ছবির হয়তো তীক্ষ্ন বক্তব্য আছে। তেমনি হেমন্ত মিশ্রের মণ্ডদশার মতো দেখতে ছোট্ট কাজটি অনবদ্য।

ভাস্কর্য বিভাগে গৌতম পালের 'লা ব্যালেরিনা'য় নৃত্যভঙ্গিমা ও ছন্দ ধরেছেন বটে তবে চিন্তামণি করের ঘরানার কাজ। নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের 'শূকর' ব্রোঞ্জের কাজের মধ্যে অধিকতর প্রীতিপ্রদ মনে হয়েছে। বিশেষত রূপারোপের জোরটা চোখকে টানে। চন্দ্রনাথ দত্তের 'শায়িত মূর্তি' নারীর মধ্যে নতুনত্ব না থাকলেও বলিষ্ঠতা আছে। ওড়িশার বি বি মিশ্রের হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা নগ্ন আদিবাসী নারীর যন্ত্রণাটা মন কেড়ে নেয়। রণেন দত্তের কাজটা সে তুলনায় কতো অসম্পূর্ণ—সর্বধর্মের প্রতীক প্লাস্টারের ওপর জড়ো করলেও নতুন দীন ইলাহী তৈরী হবে বলে মনে হয় না। সে তুলনায় দিশী প্রথায় রবি পালের করা হাড় জিরজিরে চাষী ও তার রুগ্ন গরুর দীর্ঘায়িত কাজটা কতো ভাল।

দর্শনীয় কাজ ছিল, চমকে ওঠার মতো কাজ ছিল, আবার চোখ বন্ধ করে ফেলার মতো কাজ ছিল। সব মিলিয়ে মনোজ্ঞ।

সন্দীপ সরকার

পুস্তক পরিচয়

সংকলন : শরৎ পরিচয়

শরৎ-সম্পূর্ট। পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি। ৯/৯এ কলেজ স্কোয়ার: কলকাতা ১২। মূল্য পঁয়ত্রিশ টাকা।

বইটির নামপৃষ্ঠায় মুদ্রিত 'সেকাল আর একালের দৃষ্টিতে শরৎ-সাহিত্যের মূল্যায়ন'। শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থে একালের লেখকবৃন্দের রচনার সঙ্গে সেকালের লেখকদের কিছু রচনা স্থান পেয়েছে। সংকলন গ্রন্থটি আকারে বড়। শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গ্রন্থের বিচার, শরৎ উপন্যাসের চরিত্রসমূহের বিশ্লেষণ, শরৎচন্দ্রের রাজনীতি-সমাজনীতির পরিচয়, তাঁর সাহিত্য জিজ্ঞাসা, শরৎ প্রতিভার মূল্যায়ন এবং শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের জীবনস্মৃতি এ গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। শেষ প্রবন্ধটি 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার' অতীব মূল্যবান। আলোচ্য সংকলনটিতে মোট লেখকের সংখ্যা ছেষট্টি। একটি সংকলনগ্রন্থে এত বিপুলসংখ্যক লেখকের সমাবেশ বিস্ময়কর। শরৎবন্দনামূলক গ্রন্থে এমন সমাবেশ প্রত্যাশিত; কিন্তু যেখানে শরৎ সাহিত্যের মূল্যায়ন অভিপ্রেত সেখানে এ ধরনের পরিকল্পনাহীন প্রবন্ধের সমাবেশ বিসদৃশ। কিছু কিছু প্রবন্ধ নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের রচনা, একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তিও দুর্লক্ষ্য নয়। কেউ কেউ সম্পাদকের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন মাত্র! অবশ্যই উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের অভাব নেই। এই সংকলনে প্রতিষ্ঠিত এবং স্বল্প প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধকারদের রচনা সংগৃহীত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত এবং বিদ্বজ্জনমহলে স্বীকৃত লেখকদের লেখায় কিন্তু গতানুগতিকতা এবং প্রচলিত মতবাদের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপই লক্ষ্য করা যায়। কর্মক্ষেত্রে যেমন লেখকজীবনেও বোধ করি অবসর নেবার সময় আছে। আমরা মনে করি নামী লেখকের রচনায় গ্রন্থের সাম্মানিক মূল্য বাড়ে কিন্তু মূল্য যে কমতেও পারে সে সম্বন্ধে সম্পাদকের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

এই সংকলনেই অনেক অনামী লেখক প্রবন্ধ সাহিত্যের দৈন্য ঘুচাতে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা প্রশংসনীয়। ভাবা ভাবা ধরনের মন্তব্য অপেক্ষা শরৎরচনার অন্তরঙ্গ পরিচয় ও বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য সে পরিচয় ও বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে আছে। 'শরৎ সাহিত্য পাঠের ভূমিকা' প্রবন্ধটি কৌতূহলোদ্দীপক। নারীর যথার্থ মূল্য নির্ণয়ে, রাজনীতিতে নির্ভুল প্রত্যয়ে। সমাজমানসের বিশ্লেষণে, বাঙ্গালীর ধর্মীয়বোধ বিচারে শরৎচন্দ্রের আশ্চর্য দূরদৃষ্টির কথা লেখক সবিস্তারে বলেছেন। লেখকের প্রতি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তমূলক আলোচনা কিন্তু তর্কসাপেক্ষ। এই প্রবন্ধটির বক্তব্য রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ অবতারণার দ্বারা অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণের পরিচায়ক। অকারণে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বক্র মন্তব্য লেখকের মনোভাবের অশোভন দৃষ্টান্ত। 'আখ্যানের ভাষা ও শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু মননদীপ্ত। লেখকের নৈয়ায়িক বিচারপদ্ধতি অভিনব। শরৎ-উপন্যাসের আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু আলোচনা এ সংকলনে কুণ্ঠিতভাবে প্রবেশ করেছে। বিষয়টি স্বল্প আলোচিত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অভাব পাঠকচিত্তে অতৃপ্তি জাগায়। 'শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ' প্রবন্ধটি মূল্যবান। আকাদেমিক আলোচনায় যে সতর্কতা ও ঐতিহ্যশাসন প্রয়োজন এ প্রবন্ধে তা রক্ষিত। 'কমলিনী ও কমললতা' প্রবন্ধটিতে তারাশঙ্করের 'রাইকমল' উপন্যাসের সঙ্গে শ্রীকান্ত চতুর্থ খণ্ডের রচনাকাল নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তা শিক্ষিতমহলে নূতন জিজ্ঞাসা উদ্রেক করবে। 'তরুণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে শরৎচন্দ্রের রাজনীতি চিন্তা, ব্রাহ্মবিদ্বেষ ইত্যাদির পরিচয় আছে।

লেখক শরৎচন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর। কেবল রাজনীতি চিন্তাশ্রিত আলোচনা শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা প্রসঙ্গে। এটিও শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিবিম্বিত বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে সমাজ ও সমকালীন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি উপস্থাপিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা আলোচনাও সময়োপযোগী। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি তথ্যনির্ভর অতএব ধীর বিচারের অপেক্ষা রাখে। 'শরৎ বিদূষণ' শরৎ-বিরোধীদের বিদ্রূপ। শরৎবিরোধী গণোত্তাপের সূত্র তিনি খুঁজে পেয়েছেন শরৎচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ, রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্যের মধ্যে। লেখকের ক্ষোভের উত্তর পাওয়া যাবে এই গ্রন্থেরই অন্য প্রবন্ধে।

বলা বাহুল্য স্বল্প পরিসরে সব প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের ও শরৎচন্দ্রের জীবনের নানাদিক নিয়ে যে আলোচনা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার থেকে শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়। কিছু প্রবন্ধ পরস্পরবিরোধী। এইটিই স্বাভাবিক। সম্পাদক যেন একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছেন। সে আলোচনায় বাদানুবাদ আছে, সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং কখনও কখনও সমস্যা সমাধানের প্রয়াসও লক্ষ্য করা গেছে। এইখানেই সংকলন গ্রন্থটির মূল্য।

বিজিতকুমার দত্ত

উপন্যাস

সজনে নির্জনে। নিখিলচন্দ্র সরকার। রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫-২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। ১২ টাকা।

মিষ্টি, নরম হাতে লেখা একটি উপভোগ্য উপন্যাস। এক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার জীবনের কয়েকটা দিন। বাংলার বাইরে একটি বিশাল বাগানবাড়ি। কয়েকদিনের জন্যে সমবেত পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন। বাকিটা সেণ্টিমেণ্টের ঠাসবুনোনে দিন শেষের দুটি জীবনের অনুপম নিঃসঙ্গতা।

জীবনের সব খেলা যাঁর শেষ, স্মৃতির রোমন্থনই যাঁর একমাত্র করার কাজ সেই বৃদ্ধ ক্ষীরোদবাবু তাঁর দুঃখ-সুখের জীবন সঙ্গিনীকে নিয়ে বহু মানুষের একদা কোলাহল মুখর নির্জন বাসভবন আগলে বসে আছেন। বিবাহসূত্রে তার জীবিকার প্রয়োজনে মেয়ে, ছেলে, ভাইপোরা, সকলেই প্রবাসী। ক্ষীরোদবাবুর নিঃসঙ্গ জীবনে মৃত্যুর ছায়া ক্রমশ গাঢ় হয়ে উঠছে। তাঁরই একান্ত ইচ্ছায়, পুজোর ছুটিতে মেয়ে, জামাই, ছেলে, ভাইপো যে যেখানে ছিলেন সকলেই প্রায় এসেছেন। নির্জনতার আচ্ছাদন সাময়িকভাব সরে গেছে। উপন্যাসের পরিসর উৎসবমুখর এই কয়েকটি দিন। মূল কাহিনী থেকে একটি সাব প্লট উৎক্ষিপ্ত হয়েছে—ছোট মেয়ে কল্যাণী আর এ-বাড়ির আবাল্য স্নেহভাজন প্রণবের মন দেওয়া নেওয়ার ঘটনা। এই ঘটনাই শেষে অপারিসীম তিক্ততায় মূল কাহিনীকে ছেদ টেনেছে। সকলের থাকার মেয়াদ কমিয়ে দিয়েছে। অনেক আনন্দ উপভোগের আগেই যবনিকা নেমে এসেছে। কাহিনীর নায়ক নিঃসঙ্গতা, নায়িকা বিচ্ছেদ।

নিখিলবাবু সারাটা রাস্তাই কাহিনীর ধারা সুন্দর টেনে এনেছেন। তাল আর লয় কোথাও কাটেনি। তবে পড়তে পড়তে বা মনে হয়েছে—প্রণব আর কল্যাণীর সম্পর্কটা গড়ে ওঠার জন্যে আর একটু প্রস্তুতি নিলে মন্দ হত না। একটু সিনেমা, সিনেমা মনে হয়েছে। প্রণবের চরিত্রটি অন্য একজন সুবিখ্যাত সাহিত্যিকের বিশিষ্ট চরিত্রের আদল নিয়ে যেন ফুটে উঠতে চেয়েছে। সংলাপ আর একটু ইন্টারেস্টিং হলে বিভিন্ন ঘটনা বোধ হয় জমাট হত।

'সজনে নির্জনে' পড়তে ভাল লাগে, এর মেজাজের জন্যে, পরিবেশ রচনায় লেখকের সংযত ক্ষমতার জন্যে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

গল্পটা নতুন কিছু নয়। নতুন করে মনে পড়ল শুধু। বাজারের ফর্দ লিখছেন একজন, বলে যাচ্ছেন অন্যজন। হুকুম হল, 'কুষ্মাণ্ড' আনার। শ্রুতিলেখক, একটু থেমে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বানানটা?' 'বানান?' বলিয়ে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন যেন। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললো, 'প, ট আর ল লেখো। পটলই এনো বরং।'

হাসি চৌধুরীর **মণীষা** (পরিবেশক: সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা-৯, আট টাকা) উপন্যাসটি হাতে নিয়ে গল্পটা মনে এল। মনীষা না হয়ে লতিকা হলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু যে-উপন্যাসের নায়িকার নামই মনীষা, আর নায়িকার নামেই উপন্যাসের নামকরণ, সেখানে নায়িকার নামের বানানে সংশয় দেখা দিলে নাম পালটানোই বোধ করি ছিল [illegible]চীন। দেখা গেল, এক্ষেত্রে তা হয় নি। নিঃসংশয় চিত্তে মলাট থেকে শুরু করে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মণীষা রূপে বিরাজমান। শুধু কি তাই? গ্রন্থারম্ভের প্রথম পৃষ্ঠাটি গা ছমছম করে তোলে। সারা বেলা 'খাটুনী', পিসিমার 'কাতরানি'—আরেব্বাস।

এ-সত্ত্বেও উপন্যাসটি যে আদ্যন্ত পড়ে ফেলা যায় এবং পড়তে পড়তে বানান-ভুলের প্রাচুর্য চোখ এড়িয়ে যায় তার জন্য হাসি চৌধুরীর কাহিনী বয়নের কৃতিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। অদৃষ্টকে জানার দুরাকাঙ্ক্ষা জীবনে কখনো কখনো কী ধরনের দুর্ভাগ্যকে বহন করে আনে তারই প্রতিচ্ছবি ফোটাতে চেয়েছেন তিনি। সব

থ:ক ভালো ফ:টেছে, স:লেখার অনবদ্য চরিত্রটি। বস্তুত, এই চরিত্রের গোটাসার ছবিটি এত জীবন্ত যে, হাসি চৌধ:রীর অন্যান্য বহ: দ:র্বলতা ভুলে যেতে হয়।

*

চন্দ্রপ:রের জন্যে (সচ্চিদানন্দ প্রকাশনী, কলকাতা-৫৫, তিন টাকা) লিখেছেন কার্তিক ঘোষ, এ'কেছেন প:র্ণেন্দ: পত্রী। ওস্তাদ বাজিয়ের সঙ্গে ওস্তাদী তবলার এক স:ষম সঙ্গত। দ:-জনই দ:-জনকে ধরে আছেন, অপ্রতিরোধ্য অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে। ছবি দেখলে গল্প শোনার আগ্রহ বেড়ে যায়, গল্প শ:নলে যে-ছবি ভেসে ওঠে, পাতায়-পাতায় তার জ্যান্ত চেহারা দেখে অবাক হতে হয়।

কার্তিক ঘোষ গল্প বলেছেন র:পকথার ঢঙে। তাঁর বেশীর ভাগ গল্পই ভাল, সব লেখা গল্প নয়। যেগ:লি গল্প হয়ে উঠল না, যেমন 'সোনার খাঁচা' অথবা 'নীল আকাশের পাখি' সেগ:লিও অন্য দিক থেকে এক অনন্য স্বাদের রচনা। কল্পনার পাখিকে কীভাবে উড়িয়ে দিতে হয় চেনা আকাশের অনন্তে কার্তিক ঘোষ জানেন। 'টিংকু আর টম' 'ট:কুন'কে নিয়ে বা 'চিঠিমণি' গল্প হিসেবেও চমৎকার। সব থেকে অবাক-করা লেখা 'নীল আকাশের পাখি।' গদ্যের মধ্যে চাপা মিল এই লেখাটিকে আদ্যন্ত স:রেলা ও ছন্দোময় করে তুলেছে।

*

দ:-জনে মিলে এক সঙ্গে রচনা করেছেন কিছ: পদ্যপ্রতিম রচনা। তাই নিয়ে প্রকাশিত আদিত্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালাচাঁদ পাঁজার য:গ্মপ্রয়াস সকালের ফ:ল (বর্ধমান থেকে প্রকাশিত, দ:-টাকা)। প্রেমের ক্ষেত্রেও যেমন, প:জার পর্যায়েও, তেমনি সমস্ত রচনাতেই 'আমি' বা 'আমার' ব্যবহার অবাক করে। কখনো 'আমাদের' বা 'আমরা' চোখে পড়ল না। একেই, বোধ করি, বলা যায়, অভিন্নহৃদয়।

—প্রণবকুমার ম:খোপাধ্যায়

পত্রিকা

বিভাব (১৩৮৩)। সম্পাদক ঃ মনীশ নন্দী। কার্যালয় ৬ সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলকাতা-১৭। দ: টাকা।

সাহিত্য সংস্কৃতি অর্থনীতি বিষয়ক নির্ভরযোগ্য র:চিসম্মত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। স:নীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা ও তার আলোচনা, অক্ষয় বড়ালের উপর আলোক সরকারের নিবন্ধ, সিনেমার পর্যালোচনা, বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ এই সংখ্যার ম:খ্য আকর্ষণ। এ-ছাড়া অন্যান্য লেখাগ:লিও প্রণিধানযোগ্য। কাগজটি স্থায়ী হলে একটি ভাল ত্রৈমাসিকের চাহিদা মিটবে।

খেলার মাঠে

ইডেনে প্রথম টেস্ট জয়ে ইংলণ্ডের গরিমা কোথায়

ইডেনে ইংলণ্ড প্রথম টেস্ট ম্যাচ জিতল। দিল্লিতে প্রথম টেস্টটি জেতার পর দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের সুবাদে সিরিজে ২—০ এগিয়ে রইল এবং ১৯৭৪-এ দেশের মাঠে পর পর তিনটি জয়ের ফলে টানা পাঁচটি টেস্টে ভারতকে পরাজিত করল।

এই পাঁচটি পরাজয়ের মধ্যে তিনটিই ইনিংসে। ৭৪-এ ইংলণ্ডে পরাজয়গুলি ১১৩ রানে, ইনিংস ও ২৮৫ রানে এবং ইনিংস ও ৭৮ রানে। এবার ভারতে প্রথম দুটি খেলায় ইনিংস ও ২৫ রানে এবং ১০ উইকেটে। প্রতিপক্ষ দলের এক ইনিংসের রান দুই ইনিংসে করতে না পারলে হয় ইনিংসে হার। সেটা পরাজিত পক্ষের অগৌরব এবং লজ্জার ব্যাপার। ১০ উইকেটে হারও অনেকটা ইনিংস হারের মতই গ্লানিকর। এক ইনিংসে ১০টিই তো উইকেট। পুরো উইকেট অটুট রেখে জয়, আর ইনিংস জয়ের মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। সেই ১০ উইকেটেই ইংলণ্ড ভারতকে ইডেনে প্রথম হারাল, যে ইডেন একদিন তৈরি করেছিল এই ইংরাজ খেলোয়াড়দের পূর্বপুরুষরা। তবু ইংলণ্ডের এই জয়ে গরিমা কোথায়?

সত্যি কথা, সরকারীভাবে ইংলণ্ড এর আগে ইডেনে যে পাঁচটি টেস্ট খেলেছে তার কোন টেস্টে তো নয়ই, ইডেন মাঠের ইতিহাসেও অন্য কোন টেস্টে ভারত এভাবে বোধ হয় বিপর্যস্ত হয়ে হারেনি, শুধু ১৯৫৮-৫৯এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে শোচনীয়ভাবে হারা ছাড়া। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছিল ইনিংস ও ৩৩৬ রানে। কিন্তু ভারতের সে হারের মধ্যেও দর্শকদের সান্ত্বনা ছিল তারা ক্রিকেট খেলা দেখেছে, ক্রিকেট মাঠে ভীত সন্ত্রস্ত আত্মরক্ষামূলক স্নায়ুযুদ্ধ দেখেনি। বহুদিন তৃপ্তির আবেশে বিভোর ছিল। স্মৃতিভাণ্ডার এখনো ভরে আছে। রোহন কানহাই, গারফিল্ড সোবার্স এবং বেসিল বুচারের ব্যাট থেকে ঝরে পড়া ক্যালিপসো সঙ্গীতের সুর ইডেনের ঘাসে কান পাতলে হয়তো এখনো শোনা যাবে। কিন্তু দর্শকদের কত দিন মনে থাকবে ইংলণ্ড অধিনায়ক টনি গ্রেগের এবারের কষ্টার্জিত শত রানটির কথা? রেকর্ড বইয়ে অবশ্যই লেখা থাকবে। ক্রিকেট রসিক মানুষের মন থেকে অল্প দিনেই হারিয়ে যাবে। "মাতাল করা টেস্ট, ঘুমপাড়ানি ক্রিকেট" শিরোনামায় আগের সপ্তাহেই আমি লিখেছি, যে খেলা দেখার জন্য টিকিটের এত হাহাকার, মানুষ পাগল —সে খেলায় দর্শকরা কি পেল? হতাশা, বিরক্তি এবং ফ্ল্যানেলপরা ভদ্রলোকদের ব্যবসায়িক বুদ্ধির কিছু পরিচয়। কিছুটা ভাঁড়ামিও। সত্যিকার ক্রিকেট, যা দেখে মনের আনন্দ ও চোখের তৃপ্তি তার কতটুকু পরিচয় মিলেছে ইডেনে? খুবই সামান্য।

ভারত হেরে গেছে, বিপর্যস্ত এবং পর্যুদস্ত হয়েই। তবু দর্শকদের একটুখানি আনন্দ দিয়েছে পরাজিত পক্ষের দুই খেলোয়াড় ব্রিজেশ প্যাটেল এবং অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী। ইংলণ্ডের কোন ব্যাটসম্যানের খেলাতেই শৌর্যের পরিচয় ফুটে ওঠেনি। আত্মরক্ষণ ও নেতিমূলক ক্রিকেটে তারা ভারতীয় খেলোয়াড়দের উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে গেছে। কালেভদ্রে দুএকটি কাট ড্রাইভ বা দুচারটি সুইপ এসেই থাকে। বোলারদের হাত থেকে লুজ বলও পড়ে মাঝে মাঝে। ব্যাটসম্যানদের সামগ্রিক আচরণ এবং মানসিকতা নিয়ে খেলাটির মান বিচার করলে বলব সহজ জয় সত্ত্বেও ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের ভূমিকা খুব বড় হয়ে ফুটে ওঠেনি। ভারতের ব্যর্থতাই বেশী করে প্রকট হয়েছে। ইংলণ্ড জিতেছে তাদের প্রোফেশনাল ক্রিকেট মানসিকতার জোরে, যার মূলে কথা যেন তেন প্রকারেণ জিততে হবে—ক্রিকেটের জাত যায় যাক্ মান খোয়াবো না। এম সি সি দলের সঙ্গে সফররত ক্রীড়াসাংবাদিক জন সিকনেস (লণ্ডন ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড) আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় সে কথা স্বীকারও করে গেছেন।

স্লো উইকেটে রান করা অবশ্যই শক্ত ছিল, যদিও ভারতের পছন্দমত তৈরি স্পিন সহায়ক উইকেটে আশানুরূপ বল ঘোরেনি। ওই উইকেটে ভারত টসে জিতে ১৫৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করার পর দীর্ঘ ৩০০ মিনিটে ইংলণ্ডের ১৩৬ রান সংগ্রহ করার না হয় যৌক্তিকতা ছিল। দ্বিতীয় দিনের শেষেই তারা ৪ উইকেটে ওই ১৩৬ রান করেছিল। তৃতীয় দিন ৪ উইকেটেই ভারতের রান পেরিয়ে আরও ৭৫ রানে এগিয়ে গেল এবং ৬ উইকেট হাতে রেখে করল ২৩০ রান। তখনো তাদের ব্যাট বল সংহারে মেতে ওঠেনি। তৃতীয় দিন আর দুটি উইকেট খুইয়ে সংগ্রহ করেছে মাত্র ১৪৯ রান। তখনই বোঝা গিয়েছিল ভারতে পৌঁছে চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত ক্রিকেট খেলার প্রতিশ্রুতি ছিল তাদের লোক-ভোলানো ফাঁকা বুলি। গ্রেগ অকপট বলে রেখেছিলেন, যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলেই তারা নেতিমূলক পন্থা অবলম্বন করবেন। না

ইডেনে সর্বপ্রথম টেস্ট জয়ী ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের মাঠ প্রদক্ষিণ

ফটো—দেশ

ইডেন টেস্ট জয়ের পর দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করেছেন অধিনায়ক টনি গ্রেগ —চিত্র তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হলে নয়। পরিস্থিতি কি ইংলণ্ডের প্রতিকূল ছিল? নাকি উইকেটে শিকড়-আঁটা ব্যাটিংয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল? এ ব্যাপারে প্রধান অপরাধী গ্রেগ নিজেই। তৃতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ড যখন প্রায় ১৫০ রানের লীড নিয়ে ফেলেছে তখনো গ্রেগের ব্যাট নড়েনি। বেদী মেডেনের পর মেডেন পেয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে প্রসন্নও মেডেন পাচ্ছেন। গ্রেগ যাচ্ছেন আত্মরক্ষা করে। অবশ্য তিনি সেঞ্চুরির মুখে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সতর্কতারও প্রয়োজন ছিল। তাই বলে দীর্ঘ ৪০ মিনিটে করবেন মাত্র এক রান? তারপর ২৩ মিনিট পরে আর একটি। হ্যাঁ, তাই করেছেন।

ওই সময় আমাদের প্রেস বক্সের স্কোরার রহমানের একটি কথা আমরা খুবই উপভোগ করেছিলাম। রহমান নানা রংয়ের পেন্সিলে স্কোর লেখে। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, গ্রীন, ভায়োলেট, কালো সব রংয়ে স্কোর বইকে রেখায় ও লেখায় সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে। তাতে চট করে স্কোর জানিয়ে দেবার সুবিধা হয়। কে কত রানে চান্স দিল, কে কখন ক্যাচ মিস করল, কখন বাউণ্ডারি মারল, কখন আউট হল, কত মিনিট খেলল ইত্যাদি পরিসংখ্যান নখ-দর্পণে রাখে নানা রংয়ের লেখনীর টান ও ফুটকি চিহ্নে। বেদী যখন মেডেনের পর মেডেন পেয়ে যাচ্ছেন তখন রহমান মুশকিলে পড়ল। বলল, এইরে এবার রং পাই কোথায়? পর পর ৭টি মেডেনে ৭ রংই তো শেষ হয়ে গেল। ঠিক তখনই টনি গ্রেগ একটি রান করলেন দীর্ঘ ৪০ মিনিট পরে। ৮৯ থেকে ৯০তে পৌঁছলেন। রহমানকে জিজ্ঞাসা করলাম, গ্রেগের ওই রানে কোন্ রং ব্যবহার করলে? রহমানের উত্তর: একটি বড় কালো বিন্দু দিয়েছি। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাশে বসা কয়েকজন ইংরেজ সাংবাদিকও হেসে উঠলেন।

টেস্ট জয়ে টনি গ্রেগের প্রোফেশনাল মানসিকতার প্রশংসা করেও ইংরেজ সাংবাদিকরা কিন্তু এই ধরনের ক্রিকেটে খুশি হতে পারেননি।

পর পর দুটি টেস্টে ইংলণ্ডের সহজ জয় সত্ত্বেও আমি বলব, ভারত পরাজয় এড়াতে সমর্থ না হলেও সমানে লড়তে পারত, যদি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ব্যাট করত। খেলাটি যে শেষ দিন উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে পারত তারও প্রমাণ জয়ের মাত্র ১৬ রান তুলতেই ইংলণ্ডের বার্লো এবং অ্যামিস ক্যাচ দিয়েছিলেন মদনলাল ও বেদীর বলে। বিশ্বনাথের হাত থেকে দুটি ক্যাচ পড়ে যায়। অ্যামিসের ক্যাচটি বিশ্বনাথ ধরতে পারলে বেদীর এই ৫০তম টেস্টে ঠিক ২০০ উইকেট পূরে যেত। আর ক্লোজ ক্যাচে সে বিশেষজ্ঞ, যার জন্য তাকে দলে নেওয়া হয়েছিল সেই সোলকার যদি ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের সূচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ ধরতে পারত তাহলে খেলার চেহারাও হয়তো বদলে যেত। স্কোর বোর্ডে যখন ইংলণ্ডের মাত্র ৪ রান এবং অ্যামিসের শূন্য তখন অ্যামিসের ক্যাচ ফেলে দেন সোলকার। আবার ইংলণ্ডের যখন ৩ উইকেটে ৮২ এবং টলচারডের ১ রান তখন টলচারডও সোলকারের কাছে ক্যাচ তুলে অব্যাহতি পায়। সেই টলচারড জীবনের প্রথম টেস্টে ৬৭ রান করে আউট হয়। যে ওল্ড ৫২ রান করেছে সেও ৩৯ রান করে ক্যাচ দিয়েছিল প্রসন্নর বলে। গালিতে গাভাসকরের হাত থেকে ক্যাচ পড়ে যায়। আরও ক্যাচও ফসকেছে। সুতরাং, ভাগ্য-দেবীও ভারতের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। সংগ্রামে বিমুখতায় ভাগ্যের প্রশ্রয়ও অবশ্য মেলে না। যারা খেলায় সংগ্রামের পরিচয় মিলেছে সেই ব্রিজেশ প্যাটেল কিন্তু ৫৬ রান করে দেখিয়ে দিয়েছে মন্থর উইকেটেও মেরে খেলা যায়। চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটও খেলা যায়। শৌর্য তো শিখের ব্যাটিংয়েও কিছুটা দেখেছি। তবু সামগ্রিকভাবে ইডেন টেস্ট দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর:

ভারত—প্রথম ইনিংস—১৫৫ (বিশ্বনাথ ৩৫, অংশুমান ৩২, কিরমানি নট আউট ২৫, ব্রিজেশ ২১; উইলিস ৫—২৭, ওল্ড ২—৩৭, লিভার ২—৫৭)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩২১ (টনি গ্রেগ ১০৩, টলচারড ৬৭, র‍্যানডল ৩৭, অ্যামিস ৩৫; বেদী ৫—২১০, প্রসন্ন ৪—৯৩, মদনলাল ১—২৪)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস—১৮১ (ব্রিজেশ ৫৬, পার্থসারথী ২০, গাভাসকর ১৮, বেদী ১৮; ওল্ড ৩—৩৮, আনডারউড ৩—৫০, গ্রেগ ২—২৭)।

একলব্য

শীতের ক্রিকেট অতিথি (১০)

ডেরেক র‍্যানডল

নটিংহ্যামের [illegible] যাই এক [illegible] পর অনেকে র‍্যানডল-কে [illegible] দিয়েছিলেন ক্রিকেট যদি নিয়মিত দলের খেলতে চাও তবে শয়নে স্বপনে ক্রিকেটেরু কথাই চিন্তা করো। অভিজ্ঞতা ক্রিকেটের সুনাম অর্জনের আগেই অদ্ভুত [illegible]। নটিংহ্যামের অধিনায়ক বিশ্বখ্যাত গারফিল্ড সোবার্সও র‍্যানডলের ক্রিকেট মানসিকতার পরিমার্জন আনতে পারেননি। কখনো খুব ভাল খেলে আবার কখনো অত্যন্ত বাজে খেলে যে বিশ্বাসই করা যায় না ওর মধ্যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু একটি বিষয়ে সবাই নিশ্চিত ছিল। সবারই ধারণা ছিল ব্যাটিং যাই হোক শুধু ফিল্ডিংয়ের জন্য একদিন র‍্যানডল টেস্ট দলে নির্বাচিত হবার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। করেছেও নিশ্চয়ই। র‍্যানডল সম্পর্কে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞদের অভিমত ছিল : অ্যামংস্ট দি ফাইনেস্ট—

অফ ইংলিশ আউটফিল্ডার্স'। এখনকার অভিমত : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম না হলেও শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়ই।

কিন্তু যত ভাল ফিল্ডারই হোক ব্যাটে বা বলে কিছুটা দক্ষতা না থাকলে শুধু ফিল্ডিংয়ের যোগ্যতায় কেউ কি কোনদিন টেস্ট খেলেছে? ফিল্ডিংয়ের গুণেই টেস্ট দলে ঢুকতে পারে—এটা শুধু কথার কথা। কেউ কোনদিন ঢোকেনি। র‍্যানডলের যে কলকাতায় টেস্ট অভিষেক হল তাও শুধু ফিল্ডিংয়ের জন্য নয়। ৪২·৯৪ গড়ে যে খেলোয়াড় এ মরসুমেই ঘরোয়া ক্রিকেটে ১৫৪৬ রান করে এসেছে নিশ্চয়ই তার ব্যাটিং শক্তি উপেক্ষনীয় নয়। একটি অপরাজিত ডবল সেঞ্চুরিও (২০৪ রান) আছে সামারসেটের বিরুদ্ধে।

আরও ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের কষ্টি-পাথরে। লর্ডস মাঠে জীবনের প্রথম বড় প্রতিনিধিমূলক সেই খেলায় শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৮৮ রান করে র‍্যানডল অপরাজিত ছিলেন। ওটি ছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক খেলা। তৃতীয় আন্তর্জাতিক খেলায় করেছিলেন ৩৯ রান।

বলা বাহুল্য, সারা মরসুমে ধারাবাহিক ভাল ব্যাটিং এবং আন্তর্জাতিক দুটি ম্যাচে ভাল রানের ফলেই ভারত সফরকারী এম সি সি দলে অন্তর্ভুক্তি। ফিল্ডিংয়ে তো যোগ্যতা আগে থেকেই প্রমাণিত। হাতে স্ট্রোকও ভাল আছে। বিশেষ করে সুইপে দক্ষ। তবু হয়তো ২৬ বছর বয়সী ডেরেক র‍্যানডলের কলকাতায় টেস্ট অভিষেক হত না, যদি কিথ ফ্লেচারের পায়ে চোট না থাকত।

জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে তার ৩৭ রান নিশ্চয়ই আগামী দিনের প্রতিষ্ঠার পথ কিছুটা খুলে দিয়েছে। বিশেষ করে ইডেনের দর্শকরা দেখেছে ফিল্ডিং-এ তার কতখানি সিরিয়াসনেস। অথচ ভারতের দুই ইনিংসে কিন্তু একটিও ক্যাচ ধরেননি। বলা উচিত ক্যাচ ধরার সুযোগ পাননি। কিন্তু আমরা দেখেছি বহু রান তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন অসাধারণ তৎপরতায়।

আবার খেলার বাইরে ওই র‍্যানডলকেই দেখেছি খেলা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে ব্যাট বিক্রি করতে।

মাঠের মধ্যে কিন্তু অন্য চেহারা। ইডেনে শেষ দিনের সকালের একটি ঘটনা। বেদির বিরুদ্ধে বল করছেন উইলিস। অপরদিকের ব্যাটসম্যান ব্রিজেশ রান নেবার প্রস্তুতিতে ক্রিজ ছেড়ে একটু এগিয়ে এসেছেন। উইলিস এল বি ডব্লিউ-এর আত্মবিশ্বাসী আবেদন জানাতেই সবাই উন্মনা হয়ে উঠলো। ব্রিজেশের পা তখনো ক্রিজের বাইরে। র‍্যানডল কভার পয়েন্ট থেকে বল হাতে এমনভাবে উইকেটের দিকে ছুটে গেলেন। যেভাবে স্প্রিন্টাররা দৌড়য় অলিম্পিকে। চকিতে ব্রিজেশ পা পিছিয়ে ক্রিজের উপর ব্যাট না রাখলে র‍্যানডল নিশ্চয়ই উইকেট ভেঙে তাকে রান আউট করে দিতেন।

মাঠের বাইরে ক্রিকেট সম্পর্কে যেন নিরাসক্ত। মাঠের মধ্যে দারুণ সিরিয়াস। এই হচ্ছেন ডেরেক উইলিয়াম র‍্যানডল।

মাইক সেলভি

জীবনের প্রথম টেস্টে মাইক সেলভির চেয়ে মসৃণভাবে আর কেউ চমক সৃষ্টি করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ইংলন্ড এ মরসুমে পর্যুদস্ত হয়েছে, সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টারের তৃতীয় টেস্টে সেলভিকে দলে নেওয়া হয়েছিল স্নো এবং ওল্ড আহত থাকায়। মিডলসেক্সের ফাস্ট মিডিয়াম বোলার সেলভি বোলিং শুরু করেই ০ রানে নিলেন ফ্রেডেরিকসকে, মাত্র ৪ রানে বিস্ময়কর ক্রিকেট প্রতিভা ভিভ রিচার্ডস ওর বলে ক্লিন বোল্ড, আলভিন কালীচরন ক্লিন বোল্ড ০ রানে। ১১ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিনটি উইকেট সেলভি ফেলে দিলেন তার প্রথম ৪ ওভারে। শেষ পর্যন্ত ৪১ রানে পেয়েছিলেন ৪ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ১১১ রানে ২টি। পরের টেস্টে ওই সেলভিকে দল থেকে বাদ দেওয়া হল। পঞ্চম টেস্টে আবার দলে এসেছিলেন, কিন্তু

একটিও উইকেট পাননি। ভারতে এসেও পাননি প্রথম টেস্টে খেলার সুযোগ।

পুরো নাম মাইকেল ওয়াল্টার উইলিয়াম সেলভি। জন্ম চিজউইকে, ১৯৪৮ এর ২৫ এপ্রিল। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত খেলেছেন সারে কাউন্টিতে। মিডলসেক্সে এসে কাউন্টি ক্যাপ পান ১৯৭৩এ। মিডলসেক্সের অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলির মতই ক্রিকেট এবং শিক্ষার মধ্যে জীবনের টানাপোড়েন। ম্যাঞ্চেস্টার এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ব্যাটের হাত মোটেও ভাল না হলেও ৭১এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কেম্ব্রিজের পক্ষে করেছিলেন ৪২ রান। বলে অবশ্য কৃতিত্বের বহু নজির। এবারই ইংলিশ মরসুমে ২১·২৫ গড়ে ৯০টি উইকেট পেয়েছেন।

মুকুল

দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসবে হংকং থেকে এসেছেন শার্লি উ, রান রান শ এবং উম উম শ

রঙ্গজগৎ

দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসব—১

শুরুতেই একটু বেসুরো ব্যাপার ঘটে গেল।

দিল্লির ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম সরকারী অনুষ্ঠান ছিল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ফিলম ম্যাগনেট মিস্টার রান রান শ-এর প্রেস কনফারেন্স। সময় দেওয়া ছিল সকাল সাড়ে এগারটা। সাংবাদিকরা সকলেই উপস্থিত। কিন্তু যাঁদের নিয়ে প্রেস কনফারেন্স তাঁদের কেউ নেই। সোয়া বারটা নাগাদ যখন সাংবাদিকরা বিরক্ত হয়ে উঠি উঠি করছেন তখন বিজ্ঞান ভবনের

চলচ্চিত্র

'বি' রুমে এসে উপস্থিত হলেন সদা সপ্রতিভ রান রান শ। সঙ্গে দুই সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রী শার্লি উ এবং উম উম শ (না, মিস্টার রান রান-এর সঙ্গে এঁর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই)। আমাদের এখানকার ফিলম ফেস্টিভ্যালস ডিরেকটোরেট-এর মিস্টার কাপুর এই দেরির জন্য সাংবাদিকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। কারণ হিসেবে জানালেন, দেরিটা অতিথিদের তরফ থেকে হয়নি। গাড়ির গোলমালের জন্যই এটা ঘটেছে।

এতবড় একটা চলচ্চিত্র উৎসব হচ্ছে দিল্লিতে অথচ শহরের চেহারা দেখে আদৌ মনে হবে না যে এটা উৎসবনগরী। ফেস্টি-ভ্যালের কোন পাবলিসিটি নেই। না ঝুলছে ফেস্টুন, না উড়ছে রঙ বেরঙের পতাকা। গত বছর বম্বেতে যে ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল তার তুলনায় এখানকার উৎসব খুবই বর্ণহীন। বিগত পঞ্চম চলচ্চিত্র উৎসবে যে অব্যবস্থা ছিল এবারে তেমন কিছু নেই বললেই চলে। সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এবং ডাইরেকটরেটের পক্ষ থেকে দ্রুত সরবরাহ করা হয়েছে। এটা জেনে রীতিমত আশ্চর্য হতে হয় যে কেবলমাত্র উৎসবের সিজন টিকেট বিক্রি করেই ৪৮ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। যাঁরা টিকেট কিনেছেন তাঁরা কেউই কিন্তু পূর্বাহ্নে জানতেন না যে কি কি ছবি দেখানো হবে। নেহাৎ চোখ বুজেই টিকিট কাটা। টিকিট বিক্রি শেষ হয়ে যাবার পর তবে তা জানানো হয়েছে। এই সব টিকিটই প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। দৈনিক টিকিট বিক্রি হবে প্রত্যেক শো-এর ৪৮ ঘণ্টা আগে। আশা করা যাচ্ছে সব মিলিয়ে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হবে শেষ পর্যন্ত।

ফেস্টিভ্যালের ছবিগুলি সাংবাদিকদের দেখানো শুরু হয় ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখ থেকে। প্রতিদিন পাঁচখানি করে ছবি। তবে তার বেশিরভাগই ইনফরমেশন সেকশনের। এই প্রতিবেদক যখন দিল্লি পৌঁছয় তখন ওইসব ছবি দেখানোর পালা

শেষ। ফেস্টিভ্যালের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবার পর প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছবি-গুলি দেখানো শুরু হয়েছে। প্রতিদিন দুটি করে।

প্রথম প্রেস কনফারেন্সের ঘটনায় ফিরে আসি আবার। সাংবাদিকদের মনে বিরক্তির মেঘ যেটুকু জমেছিল মিস্টার রান রান শ তাঁর স্বাভাবিক হাস্যপরিহাসের

জয়শ্রী রায় / সূর্যকন্যা / পরিচালনা ঃ আলমগীর কবির

মধ্যে দিয়ে সেই গুমোট ভাবটা কাটিয়ে দিলেন। তিনি শুরুতেই বললেন ঃ আমার নাম রান রান—অর্থাৎ আমি ভয়ানক দ্রুত-গামী। মিস্টার শ-এর কর্মজীবন পর্যা-লোচনা করলে কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জুড়ে ১৪১টি সিনেমা তার কর্তৃত্বাধীনে। হংকং-এর বিভিন্ন স্টুডিও থেকে তিনি বছরে ৪০খানি করে ছবি তৈরী করেন। এই কাজে ১৫০০ ব্যক্তির নিয়মিত রুজি-রোজগার। স্টুডিওর অধীনে একটি নাট্য-শিক্ষার স্কুল আছে সেখান থেকে প্রায় চল্লিশজন করে শিল্পী জন্ম নেয় প্রতি বছর। দেড়শো জন বেতনভুক শিল্পী আছেন তাঁদের এবং পারতপক্ষে কোন চুক্তিবদ্ধ শিল্পীর সাহায্য তাঁরা নেন না। মিস্টার শ একবার মাত্র চেষ্টা করেছিলেন বিশিষ্ট কুং ফু বিশেষজ্ঞ ব্রুস লী-কে আনাতে, কিন্তু তিনি ২০ লক্ষ আমেরিকান ডলার দাবী করায় সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গত তিরিশ বছর ধরে তিনি ভারতীয় ছবি নিয়ে যাচ্ছেন ও-দেশে। এতে তাঁর বার্ষিক খরচ হয় চার লক্ষ পাউণ্ডের মত। তবে তিনি আক্ষেপ করলেন যে এটা একান্তই একতরফা ব্যাপার। তাঁর তোলা কোন ছবি আজ পর্যন্ত ভারতে দেখানো হয় নি। হংকং-এর ছবিগুলি কুং ফু-র জন্য আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে খুবই জন-প্রিয়। তবে ইটালীতে তেমন সুবিধে করতে পারে নি। মিস্টার শ তাঁর দুই তরুণী অভিনেত্রীর সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীমতী শালি উ আজ পর্যন্ত আটখানি ছবি করেছেন এবং শ্রীমতী উম উম শ বারোখানি ছবি। শেষোক্ত শিল্পীর একখানি ছবি ফেস্টি-ভ্যালের ইনফরমেশন সেকশনে দেখানো হয়েছে।

৩ জানুয়ারি বিজ্ঞান ভবনের সেন্ট্রাল হলে উৎসবের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দফতরের মন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্লা। তাঁর স্বাগত ভাষণের পর একটি সমবেত সংগীত এবং যামিনী কৃষ্ণমূর্তির নাচ ছিল কর্মসূচীর অন্তর্গত। সবাই অবাক হলেন তখন যখন মঞ্চে উপস্থিত বিদেশী প্রতিনিধি কিংবা আমাদের দেশের শিল্পী এবং চিত্রনির্মাতাদের কারও সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল না। প্রত্যেক দেশের উৎসবেই এটা করা হয়ে থাকে। এখানে কেন হল না বলা মুশকিল।

উদ্বোধন দিনের ছবি ছিল আর্জেন্টিনার 'ফ্রি ফর অল'। ছবিটি নিঃসন্দেহে পরিচ্ছন্ন তবে ফেস্টিভ্যাল স্ট্যাণ্ডার্ডের নয়।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর শ্রীশুক্লা অশোকা হোটেলে স্বদেশী ও বিদেশী প্রতিনিধি এবং জুরীদের আপ্যায়ন করেন। বোম্বাই থেকে অনেক শিল্পী এসেছেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তাঁরা হলেন রাজ কাপুর, মনোজকুমার, শশী কাপুর, সঞ্জীবকুমার, সুনীল দত্ত, নার্গিস, অমিতাভ বচ্চন, সাবানা আজমি, জীনাত আমন প্রভৃতি। কলকাতা কিংবা মাদ্রাজ থেকে দেখলাম কেউই আসেননি। গতবারে দিল্লি ফেস্টিভ্যালে উত্তমকুমার ও শিবাজী গণেশন দুজনেই কিছু [illegible] ব্যবহার পেয়েছিলেন। এটা হয়তো তারই প্রতিক্রিয়া।

এখন পর্যন্ত সব কিছুই বেশ ভাল-ভাবেই চলছে। সত্যজিৎ রায়ের নেতৃত্বে জুরীরা রোজ দুখানি করে প্রতিযোগিতার ছবি দেখছেন। এবারের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ছবি যে কী সেটা এখনো জানা যায়নি। টিকিট বিক্রি নিয়ে কোথাও থেকে কোন গোলমালের খবর এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। ছবির রিপোর্ট বেরিয়ে যাবার পর দৈনিক টিকিটের চাহিদার তারতম্য হতে পারে। যাঁরা উত্তেজক কিছু দেখার জন্য আগ্রহী তাঁরা অস্ট্রেলিয়ান ছবি "ফ্যানটাম"-এর বাতিলের খবরে কিছুটা নিরাশ হবেন। ছবিটি নাকি আদ্যো-পান্ত পর্নোগ্রাফী। ●

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ঠিক আগে যখন বিজ্ঞান ভবনের লবিতে দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখলাম রাজ কাপুর একদল বিদেশী সুন্দরীর দ্বারা পরিবৃত। তাঁরা বোধ হয় এসেছেন সোভিয়েট রাশিয়ার উজবেকিস্তান থেকে। কিংবা ইরান থেকেও হতে পারে। ইনি যে সেই 'আওয়ারা', শ্রী৪২০' এবং বরসাত-এর বিখ্যাত অভিনেতা রাজ কাপুর সেটা জেনে সুন্দরীরা ভারি খুশি। এর পরেই তাঁরা যখন প্রশ্ন করলেন যে তাঁর সঙ্গে শ্রীমতী নার্গিসও এসেছেন কিনা তখন রাজ কাপুরের সত্যিই অস্বস্তিকর অবস্থা। সুন্দরীরা অবশ্য তাঁর কাছ থেকেই জানতে পেরেছেন যে, না, তাঁর সঙ্গে নয়, শ্রীমতী নার্গিস উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন তাঁর স্বামী সুনীল দত্তের সঙ্গে।

—সুরঞ্জন

রাজবংশ/ঊষা ফিল্মস

বোঝা গেল পরিচালক পীযূষ বসু অংকটা বেশ ভালই জানেন। কি কি এবং কত কত যোগ করলে তার সামগ্রিক যোগ-ফল গিয়ে দাঁড়াবে দর্শকের ভালো লাগায়—সে অংকটা তিনি বেশ ভালই কষেছেন তাঁর "রাজবংশ" ছবিতে। এবারেও তিনি স্বরচিত কাহিনী নিয়ে আসরে নেমেছেন। এর আগে "সন্ন্যাসী রাজা"-র কাহিনীও সম্ভবত তাঁরই ছিল। রাজা, মহারাজা, রাজবংশ এই জাতীয় কাহিনীতে উঁচু পর্দায় ছবিকে ধরে রাখার একটা অতিরিক্ত সুবিধা আছে। তাছাড়া রাজা-রাজড়ার খেয়ালখুশির অজুহাতে অনেক অবাস্তব এবং নির্বোধ ব্যাপারও অনায়াসে দর্শকের পাতে দেওয়া চলে। তাছাড়া আরেকটা অজুহাত তো আছেই। দর্শকরা যেহেতু ছবি দেখতে প্রমোদকর দিয়ে থাকেন সেইহেতু তাঁদের প্রমোদ বিতরণ করবার একটা নৈতিক এবং পবিত্র দায়িত্বও তো আছে। অতএব রাজা এবং রাজবংশেরই রমরমা চলুক বাংলা সিনেমায়।

উত্তম। তাই চলুক। এবং উত্তমকে নিয়েই চলুক। এক উত্তমের সঙ্গে আর এক উত্তমের লড়াই—দর্শকের হাততালি ঠেকায় কে! তার উপর এক উত্তম যদি হন জারজ সন্তান এবং বঞ্চিত ও নিপীড়িত, আর এক উত্তম হন স্বেচ্ছাচারী, লম্পট, ক্রূর এবং শয়তান প্রকৃতির তবে তো সে লড়াইয়ের তুলনাই হয় না। ছেলে-উত্তমকে তার মা (নীলিমা দাস) সারা জীবন কত কষ্ট করে, লোকের বাড়ি ঝি-গিরি ইত্যাদি করে মরবার আগে সেই যে উপদেশ দিয়ে গেলেন —তুই তোর দাবী আদায় করে নিস, ভিক্ষে চেয়ে ও জিনিস পাওয়া যায় না, আদায় করে নিতে হয়—তখন থেকেই খেলা জমে

উত্তমকুমার, প্রেমা নারায়ণ / রাজবংশ

গেল। আর সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রও নেপথ্যে যুদ্ধের দামামা বাজাবার একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে গেলেন।

ছেলে-উত্তম ছোটবেলা থেকে বঞ্চনা ও নিপীড়নের নানা রূপ দেখতে দেখতেই অনেক লেখাপড়া শিখে দাবী আদায়ের যে পন্থাটি আবিষ্কার করল সেটা বাপ-উত্তমকে টিটেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে হত্যা এবং সরলপ্রাণ ভাইকে (দিলীপ রায়) সাপের বিষের ইঞ্জেকশন দিয়ে হত্যা। এই দুটি বিদ্যা শেখার জন্য তাকে অজস্র টাকা ব্যয়ে মোটা মোটা কেতাব রাত জেগে জেগে পড়তে হয়েছে। হত্যা অবশ্য সে নিজে হাতে করেনি, করিয়েছে তার ডাক্তার শ্বশুরকে (বিকাশ রায়) দিয়ে। ওই জ্ঞান-টুকু অর্জন করতে এত মোটা মোটা বই পড়ার দরকার হয় এটা সত্যিই আগে জানা ছিল না। আর ডাক্তারও যে ছেলে-উত্তমের সঙ্গে এই হত্যাযজ্ঞে হাত মেলাল—তারও একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস ছবিতে দেখানো হয়েছে। অনেক বছর আগে এই ডাক্তারের স্ত্রীর প্রতি পাশবিক অত্যাচার করেছিল লম্পট জমিদার অর্থাৎ বাপ-উত্তম। ডাক্তার নিশ্চয় কোন জ্যোতিষীর কাছে জেনে রেখে-ছিলেন যে পনের-কুড়ি বছর পরে ছেলে-উত্তম আসবে জমিদারীর অংশের দাবী নিয়ে, তার সঙ্গে বাপ-উত্তমের লড়াই বাধবে এবং তুমি তখন তোমার মেয়ের (আরতি ভট্টাচার্য) সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে শ্বশুর-জামাই একত্রে মিলে ষড়যন্ত্রের দাবার ঘুঁটি সাজাবে। চমৎকার পীযূষ বসুর অংক।

ছেলে-উত্তম বাপের জমিদারীতে দাবী আদায়ের জন্য আসবার পর ওখানকার ডোমপাড়ার অধিবাসীরা তাকে রাজকীয় সম্মান জানিয়েছে। তখন একবার মনে হয়েছিল ছেলে-উত্তম হয়তো জনগণের নেতা হয়ে দাঁড়াবেন। নিজের বঞ্চনার সঙ্গে এইসব মানুষের বঞ্চনা মিশিয়ে একটা গণজাগরণের শরিক হয়ে পড়বেন। কিন্তু না, ওটা একটা ব্ল্যাংক ফায়ার। ডোমপাড়ার ঘটনার অবতারণা বোম্বাই থেকে আনীত প্রেমা নারায়ণের কিছু নাচ-গান এবং মদ্যপান করে উত্তম-কুমারের হৈ-হল্লা দেখানোর জন্যেই। সেই "অমানুষ" ছবির উত্তম-প্রেমা-শ্যামল মিত্র যখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় আবার একত্র হয়েছেন তখন এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। ওই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পরই ডোমপাড়ায় আগুন। মিটে গেল ঝঞ্ঝাট। কিন্তু অত দামী তারকা প্রেমা নারায়ণকে কি ওইটুকু দেখিয়ে বিদায় দেওয়া চলে। ওই জমিদারীতে বোধ হয় নারীহত্যা নিষিদ্ধ। তাই জমিদারের লোকেরা প্রেমাকে কলকাতায় বেশ্যাপল্লীতে তুলে দিয়ে গেছে। তারাও নিশ্চয় জানতে পেরেছিল যে ছেলে-উত্তম একদিন ঘটনাচক্রে এখানে আসবে এবং প্রেমার ঘরে বসে একখানি মাতৃবন্দনার গান গাইবে : "মা আমি কথা তোমার রেখেছি/দাবী আমার করতে আদায়/প্রতিশোধ নিতেই হল/যাতে তোমার বুকের আগুন/যায় মা নিভে যায়...।" সাবাস !

উত্তমকুমারের দুটি চরিত্র। তিন রকমের ভূমিকা। বাপ-উত্তম প্রথম জীবনে ক্রূর, লম্পট; পরবর্তী জীবনে দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক এবং মা-কালীর ভক্ত। এই দ্বিতীয় পর্বে, উত্তমবাবু, আপনার অভিনয় অসাধারণ। একই সঙ্গে আপনার মুখে দম্ভ, স্নেহ, অস্থিরতা এবং অসহায়তার যে অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া গেল তা তুলনাহীন। নিঃসন্দেহে আপনি ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। কিন্তু লম্পট রূপে, কিংবা ছেলে রূপে আপনি বড্ড নাটুকে, বড়ই স্থূল। জানি আপনি অসহায়, দর্শকরা যে আপনাকে ওইভাবেই দেখতে চান, একথা তো আপনাকে ধর্মতলাপাড়া থেকে চিরকাল শুনিয়ে আসা হচ্ছে। তবু, ওরই মধ্যে একেবারে শেষে চোখে জল আনা এবং চকিতে সামলে নেওয়া—অপূর্ব। তবে আপনি একটি বেশ ভাল কাজ করেছেন। একই ছবিতে যতগুলি ভাল চরিত্র থাকবে সবই নিজের হাতে রেখে দেবেন। এমন কি, চাকর-বাকরের ভূমিকাও যদি কোন চিত্রনাট্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেটাও ধরে রাখবেন নিজের

হচ্ছে। এতে বাংলা ছবির একটা বড় উপকার হবে। প্রোডাক্ট, কাস্টিং কস্ট কমে যাবে, শিল্পীরাও যারা ছবি জুড়ে বহুরূপে সম্মুখ তোমার হবে আপনি বিরাজ করবেন। তাছাড়া আমরাও কত নতুন নতুন জিনিস দেখতে পাব। এই দেখুন না, এই ছবিতে ছায়া দেবীকে আপনার ছোট বোন রূপে আমরা দেখতে পেলাম। এটা কি আগে কখনো ভাবতে পেরেছি।

এ ছবিতে উত্তমকুমারই আদ্যন্ত। তবু ওরই ফাঁকে ফাঁকে দিলীপ রায়, অল্প অবকাশে, আশ্চর্য অভিনয়ের ক্ষমতা দেখিয়ে গেলেন। আরতি ভট্টাচার্যও তাই। ছায়া দেবী তো চিরকালই ভাল অভিনয় করেন। একটা নড়বড়ে চরিত্র পেরেও বিকাশ রায় তাঁর ক্ষমতা কিছুটা দেখিয়েছেন। আর সুন্দর অভিনয় করেছেন তরুণকুমার। প্রেমা নারায়ণ তো বাঙালী। তবে তাঁর বাংলা উচ্চারণ অমন কেন!

ছবির টেকনিক্যাল কাজ পরিচ্ছন্ন। বিশেষ করে বিজয় ঘোষের ক্যামেরা। বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা এবং সূর্য চট্টোপাধ্যায়ের সেটও প্রশংসা পাবে। শ্যামল মিত্রের গানের সুর ভাল, বেশ ভাল, কিন্তু আবহ নিয়ে সমালোচনা হবে।

আর পীযূষবাবু, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি একখানি দর্শকের উপভোগ্য ছবি করেছেন। এতে আপনার অর্থাগম হবে, আরও বেশি কন্ট্রাক্ট পাবেন, ইন্ডাস্ট্রিতে বহু সম্মানিত হবে। তবে একটা কথা, আপনার কি এখনো মনে পড়ে আপনি একদা অনুষ্টুপ ছন্দ-র মত একখানা অসাধারণ ছবি করেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের উপর একটি ছবি করে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন? সেই আপনি কিনা পুরোপুরি অর্ডার সাপ্লায়ার হয়ে গেলেন? আচ্ছা, এর জন্যে আপনার মনে কোন কষ্ট হয় না? কোন কোন দিন রাতে আপনার মাথার বালিশ ভিজে ভিজে ঠেকে না?

—রবি বসু

[illegible]

জাঁ-লুক গোদার সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বিতর্কিত চিত্র-পরিচালক। কেউ কেউ মনে করেন চিত্র-পরিচালনায় গোদার তর্কাতীতভাবে নতুন যুগের। আবার কারো-কারো মতে তিনি সহনাতীত দেখানোপনায় আক্রান্ত। যাঁরা মনে করেন গোদারের সঙ্গে সূচিত হয়েছে চিত্র-পরিচালনার এক নতুন পরিচ্ছেদ তাঁরা গোদারের চিত্রের ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটাকে বেশি জোর দেন। এবং বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন গোদার-এর সৃষ্টিশীল প্রতিভার কাছে

স্ত্রী আনা কারিনার সঙ্গে গোদার

আধুনিক চলচ্চিত্রের বিবর্তন কতদূর ঋণী। অন্যধারে বিরোধী শিবিরের অধিভাষকেরা যে প্রতিযোগী তর্ক গড়ে তোলেন তার মূল কথাটা হলো, গোদার সিনেমার ভাষা ও আঙ্গিক নিয়ে বড্ড বেশি ভাঙচুর করেছেন এবং ফলে তিনি আমাদের ইনটেলেকট-কে দীর্ণ করেন সত্য, কিন্তু আবেদনের সহজতায় আমাদের মনপ্রাণ ভরিয়ে দেন না।

যে পাঁচিলটি সচরাচর গোদার ও আমাদের মধ্যে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে সেটি হলো হেগেলিয়ান ডায়ালেকটিসিজম-এর। গোদার-এর প্রায় সব ছবির শিকড়ই হেগেলিয়ান প্রতিন্যাসে সংলগ্ন। অবশ্য সাধারণভাবে দেখতে গেলে ফরাসি পরিচালকেরা তাঁদের অ্যাংলো-স্যাকসন সহকর্মীদের তুলনায় অনেক বেশি দর্শনভাবনায় ভরপুর। কিন্তু গোদার এর কথা একেবারেই আলাদা, কেন না তাঁর প্রসঙ্গে হেগেল অনেক বেশি অনিবার্যভাবে এসে পড়েন, যেমন জেমস জয়েস-এর প্রসঙ্গে আসেন ভিকো।

গোদার জন্মেছিলেন ১৯৩০-এ। লেখাপড়া শিখেছিলেন উজ্জ্বল সরবন-এ। সময়টা ছিল চল্লিশ দশকের শেষাশেষি; যখন হেগেলিয়ান দর্শন সার্ত্রে ও মারলো-পন্‌টির ভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে জগৎ কাঁপানো একজিসটেনশিয়ালিজম-এ। গোদার এই রেনেশাঁর সন্তান। আরও একটি চোরা স্রোত যা গোদার-এর ছবিগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তার উৎস নির্ভুলভাবে মার্কস এবং উইটজেনসটিন।

ঠিক কোথায় গোদার-এর ছবিগুলি হেগেল-এ আশ্রিত সেটা প্রথমে ছোটো কথায় বুঝে নেয়া দরকার। হেগেল-এর মতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই নিহিত আছে তার বিপরীত সত্তা (অল থিংস আর ইন দেমসেলভস কনট্রাডিকটারি)। এবং গোদার বলেন, সমস্ত বস্তুর মধ্যেই রয়েছে সত্যের প্রকাশ, এমনকি মিথ্যের মধ্যেও। জীবনের প্রতি মুহূর্তের মধ্যে এই যে কনট্রাডিকশন, অ্যামবিভ্যালেনস, বা বৈপরীত্যের সমাবেশ সেটাই গোদার তাঁর ছবিতে বার বার তুলে ধরেন। এখানেই তিনি মূলত হেগেলিয়ান। এবং এজন্যেই তাঁকে বুঝতে আমাদের এত পরিশ্রমী সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা।

গোদার-এর প্রথম ছবির নাম 'ব্রেথলেস' (১৯৫৯)। ছবির মূল বিষয়বস্তুর মধ্যেই রয়েছে কনট্রাডিকশন—হতাশার আনন্দ। ছবির নায়ক (অভিনয়ে বেলমন্দো) একজন সাইকোপ্যাথিক খুনী। অর্থাৎ তার অপরাধের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। তার মতে প্রেমিকের ধর্ম যেমন প্রেম, খুনীর ধর্ম তেমনি খুন। এই ছবিটি গোদার এর প্রথম হলেও এতে তাঁর ভবিষ্যৎ ছবিগুলির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবনের খণ্ডিত রূপটি এবং এলোমেলো মূল্যবোধের শিকার পশ্চিমী সমাজের চেহারাটা ধরতে গোদার পরিচালনার স্টাইল-এ এনেছেন অনেক উপযোগী ভাঙচুর।

কিন্তু স্টাইল নিয়ে এই ধরনের ভাঙচুরের জন্যেই পিটার হারকোর্ট-এর মতে গোদার-এর ছবিগুলি ক্রমেই হয়ে পড়েছে আত্মঘাতী। কিন্তু গোদার আমাদের সবচেয়ে স্পর্শ করেন যখন তিনি তাঁর ছবিতে নিজের বিরুদ্ধেই করেন কটাক্ষ। আর এক জায়গায় গোদার আমাদের সহজে ছুঁয়ে যান—যখন তিনি রাজনীতি ও প্রেমকে পরস্পরের বিরোধী করে দাঁড় করান। হয়তো

শেষ পর্যন্ত তিনি মার্কসবাদ থেকে সরে আসেন, কিংবা বলা যেতে পারে অবচেতনার অস্পষ্ট আলোয় তিনি অন্য এক সত্যের সন্ধান পেলেন এবং তাঁরই এক নায়িকা শারলট-এর মুখে আমরা শুনতে পাই : "দীর্ঘ অন্ধকারে মাঁধ্যখান। আশা, কিছু হবে, কিছু ঘটবে......ছবি, কোনো তরুণীর ছবি। কিন্তু আমি কে? কোনোদিন কখনো তা জানতে পারিনি।...সব সময় স্বপ্ন, সব সময় বাস্তব। এবং এক বিষণ্ণ, তিক্ত পরিতৃপ্তি। ফিরে আসবো আগামীকাল। শুক্র কিংবা শনিবার। আমাকে সে ভয় পেয়েছিলো। কিন্তু সে আমাকে ভালো-বাসে, আমি জানি, আমি জানি। যদিও বড় কঠিন কিন্তু এখন আমার দীর্ঘ ছুটি এবং দিন কেটে যায়। আর এরই মধ্যে আকস্মিক মুখোমুখি, হঠাৎ দেখা। এরই নাম প্রেম? সুখ?"

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্য

অন্তরবি লাগাক পরশমণি

১৮ জুন ১৯৩৩-এ কি একজন তরুণ ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীবাহীকে কলকাতায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল? সেই সভায় গান করেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী সতী দেবী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সভামুখ্য। সেই গানটি সেই সভার অভ্যর্থনাকে উদ্বোরিত করে দিয়েছিল : নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ।

দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পরে ৫ জানুয়ারি কলামন্দিরের বৃহৎ কক্ষে প্রতিধ্বনিত হল সেই গান : তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত। এবং পর্দা উঠে গেল তারপর, দেখা গেল সেই প্রবীণ যুবাকে। মঞ্চের দুধারে সারি দিয়ে বসে আছেন সংস্কৃতিম্মন্য সাংবাদিক, প্রধান বিচারপতি, মাননীয় মন্ত্রী, সদাশয় শিল্পপতি এবং ভি জি যোগ আর এ কানন গুণীদ্বয়। মাঝখানে পেস্টবোর্ডের সাজানো মিনার; সেখানে লেখা প্রতিষ্ঠানের নাম সৌরভ, তার নিচে ইংরেজিতে চক্ষুপীড়ক অক্ষরে লেখা ভূয়ালকা অ্যাওয়ার্ড। তার নিচেই একটি বেদীতে বসে আছেন কেন্দ্র পুরুষ; পরনে তাঁর ঘি-রঙের পায়জামা, পানজাবি আর নস্যিরঙের জহরকোট। চোখে রিমলেস চশমা, কামানো মুখে মাঝে মাঝেই নড়ে উঠছে নিদন্ত মাড়ি, ব্যাকব্রাশ করা চুলে সাদা রেখা, দুটি হাত কোলের উপর জড়ো করা। সব ভাষণের অবান্তর কলকোলাহল আর মঞ্চসজ্জার স্থূলতাকে দলিত করে বসে রয়েছেন প্রস্তরীভূত অভিজাত মূর্তি। সুন্দর তাঁর সুঠাম দেহরেখার পাশে এক জ্যোতির্বলয় তৈরি করেছেন।

এই অভিনন্দনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে

উদয়শঙ্করকে অর্ঘ্যদান করছেন অনুরাধা

সুব্রত মুখারজি বললেন, উদয়শংকরের উপর একটি ডকুমেন্টারি এ বছরই তৈরি হবে। শংকরপ্রসাদ মিত্র সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংযত শ্রদ্ধা জানালেন, আর উদয়শংকরকে সৌরভের পক্ষ থেকে প্রথম ভূয়ালকা পুরস্কার দশ হাজার টাকার একটি চেক দিলেন। প্রতি বছরই সংগীত-নৃত্যে এই পুরস্কার দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে। পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যান ভি জি যোগও কিছু বললেন। মানপত্র পাঠ করলেন কল্যাণ রায়। ধন্যবাদ জানালেন রামকুমার ভূয়ালকা।

এই অনুষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ অদ্রিজা মুখোপাধ্যায়ের সদ্য প্রয়াণে তাঁর কথা বারেবারে এসেছে।

সবশেষে টেলিভিশনের প্রখর আলোয় সমস্ত সভার উদ্‌গ্রীব কর্ণে বেজে উঠল উদয়শংকরের কোমল কণ্ঠ, আই কনভে মাই হারটফেলট থ্যাংকস টু অল অফ ইয়ু। একটি নমস্কারে তিনি প্রত্যুত্তর দিলেন। তেতাল্লিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কথা মনে পড়ছিল 'উদয়শংকরের জয়ধ্বনি করতে আমার ভাল লাগে।'

বিরতির পর বিচিত্রানুষ্ঠান-নামা কোনো সাড়ে বত্রিশ ভাজার উপকরণ ছিল না। শুধু অনুরাধা লোহিয়া কুচিপুড়ি নৃত্য দেখালেন। ধ্রুপদী নৃত্যানুষ্ঠানে তিনি এখনও সর্বজনপরিচিত নন। নৃত্যে তাঁর সমাজ বা বক্তপ্রবাহে আসেনি। মাড়বার নন্দিনী তিনি, মাড়বার বধু; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজির ছাত্রী। তথাচ এই বিংশতিবর্ষীয়া যখন 'পূর্বাঙ্গ' অনুষ্ঠানে দেববন্দনায় নত হলেন—তাঁর বেণীবন্ধন থেকে শুরু করে তাঁর ছন্দোদীপ্ত দণ্ডায়মানা ভঙ্গীটি চোখকে প্রতারণা করে। দাক্ষিণী মন্দিরের ভাস্কর্য থেকে বাহির হয়ে এলেন এই প্রতিমা। এবং এই বিস্ময়কর ভণিতা অনুরাধা বরাবর বজায় রেখেছেন। ১০ মাত্রার তালে 'পুজো নৃত্যম' অনুষ্ঠানে তিনি নিবেদিতা, আবার, পরে 'স্বরজাতি সংমিশ্রণে সুকঠিন পদক্ষেপে এবং স্থাপত্যশৈলীর আঙ্গিকে অনুরাধা আমাদের জানিয়েছেন তাঁর প্রজ্ঞান কী গভীর। তিল্লানা অংশে তাঁর নৃত্যে সেই পাদম্ আর আঙ্গিকের হাত ধরে চলা; এই শৈলীতেও তিনি স্বচ্ছন্দ। তবে মূলত অনুরাধা 'অভিনয়ম্' অংশে আরও কৃতী। সেই কারণে ভামা কলাপম্ বা জয়দেব অষ্টাপদী অথবা দশাবতারম নৃত্য আরও দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে। শুধু একটি কথা, কামনার রূপায়ণে তাঁর চুলনটি বড় হালকা।

সূত্রধার ছিলেন তদীয় গুরু মনরো স্বামী বেদান্তকৃষ্ণ। এবং দাক্ষিণী নৃত্যে যথারীতি দৃষ্টির সঙ্গে শ্রুতিও প্রসাদ পায়, এক্ষেত্রে আরাবি রাগ (আরোহীতে দুর্গা, অবরোহণ বিলাওল) বা কাফি ঠাটের মুখারি অথবা মোহানার—উত্তর ভারতীয় ভূপালীর স্বজাতি—চমকপ্রদ রূপায়ণ করেছে শ্রীমতী লক্ষ্মীনারায়ণস্বামীর কণ্ঠ। মৃদঙ্গ বেহালা আর বাঁশিতে ছিলেন কানন আয়ার, হরিগণেশ এবং হরিহরণ। এঁদের সকলের ভূমিকা স্মরণযোগ্য।

আপাতত নিবেদন কমি, অনুরাধা লোহিয়া আমাদের মধ্যে নৃত্যবিদদের সিংহাসন স্পর্শ করতে চলেছেন; এই তরুণী নৃত্যের ভঙ্গীতে প্রথম পর্বে উদয়শংকরকে অর্ঘ্যদান করলেন; নৃত্যগুরু তাঁকেই আশিস জানালেন। একদা উদয়-শংকর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বচন এ প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে : 'আমার মালা বসন্তের শেষবেলাকার মালা, এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে —উদয়শংকরের নৃত্যকলা কিশোরী, সে মাঘের হাওয়ায় ওড়না উড়িয়েছে।...' (২৫ আষাঢ় ১৩৪০)।

—অপ্রতিম বসু

রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে রবিশঙ্কর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি ১লা জানুয়ারীতে এক রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন ক রে ছি লে ন রবীন্দ্রসদনে। [illegible] শিল্পী ছিলেন দুজনই—পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও ভীমসেন যোশী, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের দুই দিকপাল। পরে অবশ্য এক স্থানীয় শিল্পীকেও মঞ্চে বসাতে হয়েছিল।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর বাজাতে শুরু করেন রাত ১২টা নাগাদ। বাজনা শেষ হয় সকাল ৫টা নাগাদ। কাজেই বিরতি, যন্ত্রমেলানো ইত্যাদির জন্য ঘণ্টাখানেক বাদ দিলেও তিনি কম করে চার ঘণ্টা বাজিয়েছেন।

তাঁর প্রথম নিবেদন ছিল বেহাগ রাগে আলাপ, জোড় ও ঝালা। প্রথমদিকে তাঁকে একটু অস্থির লাগছিল, যন্ত্রটিও তাঁকে অসুবিধায় ফেলছিল—খরজ পঞ্চম তারটি নেমে যাচ্ছিল। কিন্তু খাদের কাজ সেরে মধ্য সপ্তকের সা-তে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আলাপ জমে উঠল। এর পরে মধ্য সপ্তকের গান্ধার, দুই মধ্যম ও পঞ্চমকে কেন্দ্র করে শিল্পী যে বিস্তার রচনা করেছিলেন তা তাঁর শ্রেষ্ঠ বাজনার সমকক্ষ। শুদ্ধ মধ্যম দাবার সবচেয়ে দুর্বল ঘাটি বেঞ্জের ব্যবহারই এই খেলাতে পরিপক্কতার এক নির্ভরযোগ্য লক্ষণ। বেহাগের দুই দুর্বল স্বর ঋষভ ও ধৈবতের ব্যবহারও যোগাসিক্তার এক নিখুঁত নিদর্শন। রবিশঙ্করের এই দুই দুর্বল স্বরের ব্যবহারে এটাই লক্ষ করলাম। এই রাগের ছোটো গণ্ডিকে বড় করার পন্থা এটি এবং শিল্পী নতুন করে প্রমাণ করে দিলেন যে, এই পন্থাটি তাঁর খুব ভাল করে জানা আছে। খালি একবার ঋষভ একটু প্রবল হয়ে উঠেছিল অন্যায়ভাবে—প ম স গ স র স (প ও ম মন্দ্র সপ্তক)—এইভাবে। অবশ্য অত তাড়াতাড়ি অন্তরার সা-তে চলে না গেলেই বোধ হয় ভাল হত। আর একটু ঘুরে ফিরে, ওঠা নামা করে, অন্তরায় পৌঁছোলে যে রসের সৃষ্টি হয় পণ্ডিতজী তা সৃষ্টি করতে পারেন নি। জোড় যখন শুরু হল তখন রাত ১২-৪০। এই অংশে বেজে উঠলো পণ্ডিতজীর বীণা-অঙ্গ খরজ-লরজের গম্ভীর, দোদুল্যমান সংবাদ। হ্যাঁ, বিলম্বিত জোড়ে সেই পুরোনো রবিশঙ্করকে ফিরে পেলাম যার তুলনা তিনি নিজেই। মধ্য-দ্রুত জোড়ে ছিল দুর্লভ লড়ি-জোড়, লড়-লপেট ও লড়-গুথাওয়ের কাজ। এই পর্বে স্বরের ঘূর্ণিঝড় বওয়াতে বওয়াতে রবিশঙ্কর হঠাৎ একটি লম্বা প ধ প ম গ মীড় বাজিয়ে গান্ধারে দাঁড়ালেন।

পণ্ডিত রবিশঙ্কর

একেই বোধ হয় ইংরেজী কলাসমালোচনার ভাষায়— "আর্টিস্টিক ইনএভিটেবিলিটি" বলে। একই স্বরে সারা প্রেক্ষাগৃহ 'আহা' বলে উঠলো। দ্রুত জোড়ের তান-তোড়া সত্যই অপূর্ব হয়েছিল। পণ্ডিতজীর হাতে বহুদিন এত ভাল তান-তোড়া শুনিনি। তারপরণ ও মীড়যুক্ত ঝালা বাজিয়ে রবিশঙ্কর যখন থামলেন তখন রাত ১-১০।

এর পরে পণ্ডিতজী শোনালেন মারু বেহাগ রাগে এক বিলম্বিত তিনতাল গৎ। বিস্তার ভালই হল কিন্তু পণ্ডিতজী উত্তরাঙ্গে খাস কল্যাণ অঙ্গের কাজ একেবারেই করলেন না। অন্তরার সাতেও গেলেন প ন স দিয়ে। লয়কারী উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। আড়ি, দেড়ি আর বিআড়ির খেলা তো ছিলই, বড় পাল্লার চক্রধর তেহাইও ছিল। সবচেয়ে বড় কথা লয়কারীর মহত্ত্ব কখনও সুরের মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করেনি। রবিশঙ্করের মত শিল্পীর কাছে আমরা এটাই আশা করি। তবলিয়া ওস্তাদ আল্লারাখা চমৎকার বাজিয়েছেন। তিনি প্রায় সকল ছন্দেরই জবাব দিয়েছেন। এই রাগেই দ্রুত একতাল গৎটি তুলনায় ভাল লাগেনি।

প্রায় ৪০ মিনিট বিরতির পর রবিশঙ্কর ললিত রাগে আলাপ শোনালেন। আগের আলাপের তুলনায় এটি একটু অস্থির মনে হয়েছে। প্রথমার্ধে উত্তরাঙ্গ বড় বেশী প্রাধান্য পেয়েছে এবং ন ধ ম কেন্দ্রিক বিস্তারের ওপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় নি। মধ্য সপ্তকের ধৈবত ছুঁতে না ছুঁতেই পণ্ডিতজী বড় বেশী সঞ্চারী বর্ণের কাজ করতে আরম্ভ করেন। এতে আলাপের স্থায়ীভাব ও গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়। জোড়টি মোটামুটি ভালই হয়েছিল। রূপক তালে নিবদ্ধ গৎটিও মোটামুটি ভালই লেগেছে।

এর পর পণ্ডিতজী ভাটিয়ার রাগে একটি ছোট্ট আওচার, জোড় ও ঝাঁপতাল গৎ বাজিয়ে শোনান। আওচার ও জোড় সংক্ষিপ্ত হলেও সুখশ্রাব্য ও আবেগপূর্ণ হয়েছিল। গৎকারীও ভালই লেগেছে। সিন্ধু ভৈরবীতে দাদরা ও দ্রুত তিনতাল গৎ বাজিয়ে শিল্পী অনুষ্ঠান শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম শিল্পী ভীমসেন যোশী অপ্রকৃতিস্থ ও আপাত দৃষ্টিতে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মঞ্চে বসেছিলেন। কাজেই তাঁর পুরিয়া, কলাশ্রী ও বাগেশ্রী কানাড়া খেয়ালগুলিতে সুর ও লয়ের কোন বালাই ছিল না। শ্রোতৃবৃন্দ উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠায় কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত যবনিকা ফেলে দিয়ে শিল্পীকে রক্ষা করেন। ভীমসেন যোশী ভারতবর্ষের অন্যতম খেয়াল গায়ক, এ জাতীয় ঘটনা তিনি আগে ঘটালেও সম্প্রতিকালে তিনি এত খারাপ অবস্থায় মঞ্চে ওঠেন নি। আশা করি আর ভবিষ্যতে উঠবেনও না কারণ এইভাবে আর কিছু দিন চললে তাঁর শিল্পী জীবনেরও যবনিকা পতন হবে। এটা কেউই চায় না।

—নীলাক্ষ গুপ্ত

স্বাধীনতা/থিয়েটার স্টাডি গ্রুপ

ঊনচাল্লিশ জন কুশী[illegible] সাতাশ জন নৃত্যশিল্পী আঠার জন নেপথ্য কর্মী এবং থিয়েটার স্টাডিগ্রুপ 'স্বাধীনতা' নাটক প্রযোজনায় যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞ, তার সংখ্যা সাতাশ। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের নির্বাচিত উপযুক্ত মঞ্চ রবীন্দ্রসদন।

শুধু বিরাটত্বই যে শিল্পের মাপকাঠি হতে পারে না সেই সত্য আর একবার নির্ভুল ভাবে প্রমাণিত হল। প্রথম শ্রেণীর কলাকুশলী এবং প্রতিভাবান প্রচুর শিল্পী নিয়েও একটি বিরাট সম্ভাবনা শুধু নাটকীয় দৈন্যে প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে গেল। মহান বক্তব্যের সঙ্গে যদি কিছু লেখনী

নৈপুণ্যে যুক্ত হত তবে আক্ষেপের কারণ থাকত না। (নাটক : জনজ গুপ্ত)।

বিভিন্ন সময়ের পাঁচটি শিবিরকে নাটকে একই সংগে ধরা হয়েছে। সবাই এক উদ্দেশ্যে নিবেদিত, সংগ্রামী স্বাধীনতা ফৌজের বাঁ দিকে মণিগ্রামম লিপিকার, ডান দিকে আমেরিকান বার্তা-প্রেরক। প্রতিটি দৃশ্যাংশের পরেই ওরা কিছু প্রাচীন ও সমকালীন সংগ্রামের ভাষ্য শুনিয়েছেন। 'তুলনার' ব্যাপারটা পরীক্ষার খাতার ব্যাখ্যার সংগে যোগ করলে কাজ দেয় কিন্তু নাটকে এই টেকনিকের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ আজকের রাষ্ট্রীয় পরিবহনের মতই মন্থর গতি করে তোলে। শ্যামবাজার থেকে রাসবিহারী মোড় পর্যন্ত সময় লাগে কম পক্ষে সওয়া ঘণ্টা। নাটকীয় উদ্দেশ্য ও বিধেয়র দূরত্ব সমানুপাতিক (নির্দেশক : বিনয় গাঙ্গুলী)।

বিপ্লবের কথা বলতে গেলেই কতকগুলি বাঁধা সংলাপ শুনতেই হয়। 'কুত্তার বাচ্চা' 'সাম্রাজ্যবাদীর পা চাটা কুকুর' 'ঘরে মা বোন নেই?' এক ঘণ্টা প'য়তাল্লিশ মিনিটের এই নাটকে কতবার 'রক্ত' কথাটা উচ্চারিত হয়েছে, সেটা শোনা প্রায় আকাশের তারা গোনার মতই দুঃসাধ্য কাজ। ভাষ্যকার লিপিকার ছাড়াও একজন সূত্রধার প্রয়োজন হয়েছে নাটকের অসংলগ্নতা, ছেলেমানুষী সংলাপকে চাপা দেওয়ার জন্য। কিন্তু যেখানে গোড়ায় গলদ, সেখানে শেষরক্ষা খুব মুশকিল। এই দুর্বল নাটকের কাছে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় মজুমদার, কাজল চৌধুরী, ইন্দ্রাণী লাহিড়ী, সূর্য সেন, নির্মল ব্যানার্জী অনির্বাণ সেনগুপ্ত, মুকুল দত্ত প্রভৃতি অভিজ্ঞতাও অসহায়। এই নাটকে রসিকতার জন্য কণ্ঠের বিকৃতি অথবা সেনাপতির বিরাট বপু দেখানোর প্রবণতাটাই হাসির খোরাক জুগিয়েছে। নাটকে আমেরিকান শিবিরে সেনেটর বলেন 'রটিয়ে দাও কম্যুনিস্টরা মানুষের মাংস খায়'। ভিয়েতনাম শিবিরে একজন বিপ্লবী বলে 'জানিস, বাবুরা নিয়ম করে রোজ

অনির্বাণ সেনগুপ্ত, কাজল চৌধুরী / স্বাধীনতা

আমেরিকান সোলজার খুন করে, তার পর তার কলজে পুড়িয়ে খায়।' জানি না এতে কার গৌরব বাড়ল!

এই নাটকের সব সংগীত পাশ্চাত্য সংগীত থেকে সুসম্পাদিত। বিভিন্ন শিবিরে লেখকের অদল-বদল হলেও, সংগীতের চরিত্র বদল হয় না। ভিয়েতনাম শিবিরে এবং প্রাচীন মণিগ্রামম শিবিরে 'শালা' শব্দটি ব্যবহৃত। সম্বন্ধী যুগে যুগে।

এই নাটকের মঞ্চ (মনু দত্ত) এবং আলো (তাপস সেন) তাঁদের পূর্বকৃতিত্বের উপর নতুন মাত্রা আরোপ করলেন। এই বিশাল মঞ্চের একটা সেটেই সীমাবদ্ধ নয়, অথচ সমস্ত কিছুই পরিবর্তন ঘটেছে তড়িৎগতিতে যাকে 'রকেট' দর্শন রীতি বলা অযৌক্তিক হবে না। নাটকের শেষে সাতাশ জন নৃত্যশিল্পী নিয়ে এক বিরাট

ক্যানো নাচ আছে যার তুলনা বাংলা নাটকের ইতিহাসে বোধহয় খুঁজতে হবে। আদিত্য মিত্রের পরিকল্পনায় এই সম্মেলক নৃত্য যে-কোন একক ব্যালের অথবা অজন্তা নৃত্যের থেকে অনেক বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, শিল্পশোভন, রুচিস্নিগ্ধ এবং বিস্মিত হওয়ার মত পরিশ্রমসাধ্য। উপরন্তু এই নৃত্য পরিকল্পনা শুধু অবাকই করে না, 'চোখে আমার বীণা বাজায়'।

—দেবাশিস দাশগুপ্ত

মাইম অ্যাকাডেমির প্রচার ও প্রসার-কল্পে বিশিষ্ট মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত আমেরিকা ও কানাডা সফর করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। নিউইয়র্ক, শিকাগো, ওয়াশিংটন, ক্লিভল্যান্ড, ফিলাডেলফিয়া, বস্টন, অটোয়া, বাফেলো, মন্ট্রিল, টোরন্টো প্রভৃতি শহরে শ্রীদত্ত তাঁর মূকাভিনয় দেখিয়ে বিদেশী দর্শকদের মুগ্ধ করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁর অনুষ্ঠান লোকপ্রিয় হয়। আমেরিকার দ্বিশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমাবেশেও শ্রীদত্ত মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন। রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র-পত্রিকাও তাঁর সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বর্ষণ করে।

*

সম্প্রতি তারাশংকরের 'দুইপুরুষ' নাটক সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করলেন এ টি দেব প্রাঃ লিঃ অ্যালায়েড কনসার্নে এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। রংগনা রংগমঞ্চে অভিনীত এই নাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীদের টিমওয়ার্ক ছিল সুন্দর। বিশেষ করে নুটুবিহারী, ধাজেন উকিল ও বিমলার চরিত্রাভিনয়ে যথাক্রমে দেবদাস সরকার, সত্যেন্দ্রনাথ পাল ও কাজল মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয়। অন্যান্য শিল্পীদের অভিনয়ও নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাসুল
ত্রিপুরায় ১৫ পয়সা
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ, ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে বাদল্যাদিত্য রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮৫৫৯

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬.০০ টাকা	২৩.৫০ টাকা	১১.৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭.০০ টাকা	৪৯.৫০ টাকা	২৪.৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯.০০ টাকা	৫৯.৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে (লণ্ডন পর্যন্ত বিমানে)	২৫২.০০ টাকা	১২৬.০০ টাকা	৬৩.০০ টাকা

অরণ্যদেব ✯ লী ফক

কী বলেছিল?

তোমাদের মদে ওরা ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল।

আমার সেই বন্ধু কোথায়?

ওরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে!

জুলবকের লোকেরা আমার পূর্বপুরুষ সপ্তম অরণ্যদেবের কাছে এল..

কোথাও তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না...

সাংকেতিক বার্তা পাঠাও... এক্ষুনি...!

সম্রাট জুলবকের নিরুদ্দেশ, সবাই তাঁকে খোঁজো.. অরণ্যদেব...

'দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল সেই সাংকেতিক বার্তা'

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

৪৪ বর্ষ

(১ম সংখ্যা হইতে ১০ম সংখ্যা পর্যন্ত)

— অ —

— আ —

— এ —

— ক —

— খ —

— গ —

— ঘ —

— চ —

— ছ —

— জ —

— ত —

— দ —

— ন —

প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর
নেসক্যাফে® স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়
NESCAFÉ
instant coffee
শতকরা ১০০ ভাগ
খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইন্সট্যান্ট কফি
বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত কফি

প্রকাশিত হলো

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

ঈশ্বরীতলার রূপোকথা ১৪৲

বিমল মিত্রের

একক দশক শতক ২০৲
যে অঙ্ক মেলেনি ১২৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

শত রূপে দেখা ২০৲
পঞ্চতপা ১৬৲

শংকর-এর

সীমাবদ্ধ ৮৲
স্থানীয় সংবাদ ৮৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের পথে পথে ১৬৲
কাবেরী কাহিনী ১০৲

তরুণকুমার ভাদুড়ীর

কাগজের নৌকো ১০৲
সন্ধ্যাদীপের শিখা ৫৲

জরাসন্ধের

তামসী ১৪৲
নিশানা ৮৲

প্রমথনাথ বিশীর

সদ্য প্রকাশিত নবতম রাজনৈতিক উপন্যাস

বঙ্গভঙ্গ ১৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর

পলাতক সৈনিক ৭॥
যে যার দর্পণে ৮৲

সমরেশ বসুর

অবরোধ ১০৲
সূর্যতৃষ্ণা ৯৲

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কীর্তিহাটের কড়চা ৩০৲
সন্দীপন পাঠশালা ৯৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

ভুমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ১০৲
ভক্ত বিবেকানন্দ ৭॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

আর এক সাবিত্রী ৫৲
দোলগোবিন্দের কড়চা ৮৲

শংকু মহারাজের

গহন গিরি কন্দরে ১০৲
তমসার তীরে তীরে ১৬৲

সীতা দেবীর ঃ শান্তা দেবীর

কিশোর সাহিত্য

হিন্দুস্থানী উপকথা ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

অমর সৃষ্টি

ছেলেদের আরব্য উপন্যাস ৬৲

প্রকাশিত হলো

প্রমথনাথ বিশীর

গান্ধী জীবনভাষ্য ৭৲

গান্ধী জীবনভাষ্য শুধুমাত্র জীবনী নয় — আবার জীবনী-নির্ভর প্রবন্ধও নয়। দিব্যজীবনের দীপ্যমান জ্যোতির চলচ্চিত্র বলা যায়। জীবনী ও তার টীকা অর্থাৎ পরম আবির্ভাবের পরমতর তাৎপর্য — যা একমাত্র প্রমথনাথ বিশীর পক্ষেই রচনা সম্ভব।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা–৭৩/৩৪-৩৪৯২
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা–৯/ ৩৪-৮৭৯১

সূচীপত্র

আপনার
রান্নাঘরকে ক'রে তুলুন
মনোহর ও চমকদার
৭ বছরের গ্যারান্টী
IS 2347
সিজলার
Sizzler রঙীন-ঢাকনি প্রেসার কুকার
রান্নার একঘেয়ে মুহূর্তগুলিকে স্ফূর্তিতে ভরে তোলে।
অনেক বছর সুন্দর ও মনোহর থাকে—সময় ও জ্বালানী বাঁচায়—
চোখ-ধাঁধানো, রঙীন ঢাকনিগুলি রান্নার সময়কে ক্লান্তিহীন করে।
★ দুর্ঘটনা-নিবারক সেফটী ক্যাপ্
★ বায়ু-নির্গমনের স্টেনলেস্ স্টীল পাইপ ও ফেরুলের ওপর পিতলের নাট
★ মরিচা ও ক্ষয় হতে সুরক্ষিত
★ স্বচ্ছন্দে কাজ করে
বিনামূল্যে অতিরিক্ত ভালভ ও প্যাকেট
পরিবেশক :
স্বর্ণালয়
৫৬/১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন : ৩৪-৭৭২৮, ৭৭৮২, ২৮০৮
স্টকিস্ট চাই—আবেদন করুন
iaa 245

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : রথীন মিত্র

প্রচ্ছদ পাশ্চাত্ত : "বসন্ত"—কুসুমের মাসে লাল ও হলুদ সাঙ্গিক বনপথে যদি কোনো নীল শাড়ি পরা ব্রীড়াবতী নারীর সঙ্গে সহসা দেখা হয়, তাহলে বলব, এই রৌদ্রছায়া, এই পত্রপুষ্প, এই ফুল্লন্ত বৃক্ষ এসবই তোমার উপমা।

সম্পাদকীয়

৪৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৪
শনিবার ১৫ মাঘ ১৩৮৩

জাতির মর্যাদার সম্বল

'তোমার চরণতীর্থে মাগো জগৎ করে যায়া আসা'—কবি অতুলপ্রসাদের একটি গানের বাণীতে বাংলা ভাষার সাংস্কৃতিক সার্থকতার যে উপলব্ধির পরিচয় বিবৃত হয়েছে, তারই প্রকার অনুসরণ করে আধুনিক ভারতজীবনের একটি আত্মিক সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বললে খুব বেশী অতিশয়োক্তি হবে না যে, আধুনিক ভারত আন্তর্জাতিক জীবনের সকল চিন্তা ও চেষ্টার প্রতিপালক একটি আধারিক আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে। বলা চলে তোমার চরণতীর্থে সকল রকমের আন্তর্জাতিক আগ্রহ এবং প্রয়াস যাওয়া-আসা করছে। স্বাধীন ভারতের জাতিক রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের সবচেয়ে বড় এবং স্পষ্ট ঐতিহাসিক লক্ষণ এই যে, ভারত আজ বিশ্বের সেরা সেরা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আহ্বায়ক এবং আশ্রয়। বিজ্ঞান অর্থনীতি রমাকলা ও রাজনীতি—যাবতীয় মানবিক চিন্তার বিষয়ে আন্তর্জাতিক অভিমতের প্রকাশ এবং বিনিময় সম্ভব করবার আনুষ্ঠানিক প্রযত্নের মধ্যে বস্তুত আন্তর্জাতিক শান্তি এবং মৈত্রীর একটি প্রধান অঙ্গীকার পরিপোষিত হয়ে থাকে। আদর্শিক ভাষায় বলা চলে, 'একবিশ্ব' নির্মাণের ভূমিকা রচনা করা। ক্রীড়া এবং চলচ্চিত্র, সাংস্কৃতিক অধ্যবসায়ের যে দুই প্রধান সৃষ্টি বর্তমান বিশ্বজীবনের পক্ষে নূতন এক সামাজিক সদাচারের প্রকাশ হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে, বর্তমান ভারত তাদেরও আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং সমাবেশের আধার হয়েছে।

আধুনিক ভারতের জীবনে এধরনের আন্তর্জাতিক স্পর্শের সম্বন্ধ প্রশস্ত হতে দেখে মনস্তাত্ত্বিকের বিচার এবং ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ কখনই সামান্যতম নিন্দোক্তিও করতে পারবে না। কারণ, আন্তর্জাতিক আগ্রহ চিন্তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ভারতীয় সাংস্কৃতিক কৌতূহলের এই প্রশস্ত সম্বন্ধ জাতীয় প্রাণবত্তারই একটি বড় পরিচয় বলে বিবেচিত হবে। ভারতীয় দার্শনিকের কাছে 'ভূমা' যেমন তার একটি প্রিয় উপলব্ধির সত্য বলে প্রশস্তি পেতে পারে, তেমনই প্রশস্তি নিশ্চয় পেতে পারে আধুনিক ভারতীয় জীবনে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের বৃহৎ পরিচর্যা। ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণে এই সত্যেরই স্বরূপ প্রকট হয়ে পড়বে যে, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের সঙ্গে বহুতর প্রকারে একাত্মক হবার আগ্রহ ভারতীয় মনীষার একটি স্বাভাবিক সৃষ্টি। রামমোহন-বিবেকানন্দ - রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী, প্রত্যেকেই ভারতীয় চিন্তাকে কূপমণ্ডূকতা পরিহার করে বৃহতের সঙ্গে সংযোগ লাভ করবার বস্তুত একটি সামাজিক দর্শন প্রচারিত করে গিয়েছেন।

সাম্প্রতিক কয়েকটি স্মৃতিদিবস এবং সাংস্কৃতিক উৎসবের প্রসঙ্গ অনুসরণ করে, জাতির আত্মমর্যাদার প্রসঙ্গে উপনীত হতে পারা যায়। নেতাজী দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, এমন কি বাংলার সরস্বতী পূজার আনুষ্ঠানিক সমারোহ, ঘটনা হিসাবে বিভিন্ন সত্যের পরিচয় সংকেতিত করে বটে, কিন্তু খুব সাধারণ বিচারে এই উপলব্ধিই সহজে সম্ভব হয়ে ওঠে যে, এই তিন অনুষ্ঠানই ভারতের পক্ষে তার জাতিক আত্মমর্যাদার স্মৃতিচর্যা। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের সঙ্গে উদার আত্মীয়তা স্বীকার করে নিয়েও জাতির পক্ষে একটি উদার অহমিকার পরিচর্যাও চাই, যে অহমিকা প্রাচীন গ্রীক মনস্বী অ্যারিস্টটলের মতে সঙ্গত গর্ব (ইংরাজী অনুবাদ—লেজিটিমেট প্রাইড) বলে কথিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত জাতিক সংস্কৃতি-তত্ত্বের মধ্যে এই উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায়। জাতির জাগ্রত আত্মমর্যাদার বোধ, যে মনোভাব উদার অহমিকা বলে কথিত হয়েছে, তার প্রবলতা জাতির সাংস্কৃতিক শক্তি সদাচার ও বৈচিত্র্যের উপর কোন মারাত্মক পরিণাম ক্রিয়ান্বিত করতে পারে না। জাতির জনজীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যে ব্যক্তির চিন্তাগত কোন সংযোগ নেই, জাতির ঐতিহাসিক জীবনের বিভিন্ন মহত্ত্বের সম্পর্কে যার মনে কোন তৃপ্তিময় স্বীকৃতি এবং উপলব্ধি নেই, তার পক্ষে আন্তর্জাতিক বোধে অনুপ্রাণিত হবার কী অর্থ হতে পারে সেটা অনুমান করা যায়। সেটা [illegible] এক প্রকারের মানসিক হীনতা প্রশ্ন [illegible]রা চলে, এরকম ব্যক্তির পক্ষে কি সত্যই যথার্থ আন্তর্জাতিকতার বোধে অনুপ্রাণিত কোন রকমের মানসিক গুণপনার অধিকারী হওয়া সম্ভব? পরিতাপের বিষয়, আমাদের এই ভারতেই রাজনীতিক দলীয়তার দৃশ্যপটের কোন কোন অংশে এমন কুৎসিত মতবাদের মুখচ্ছবি দেখতে পাওয়া গিয়েছে, যেটা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ঘৃণার বাণী হেঁকে হেঁকে সুখী হবার মতো একটি অদ্ভুত রূপের মুখ। তারা নেতাজী সুভাষের মতো মহান্ দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে অবমাননার পঙ্কোৎক্ষেপ করেছে। ভারতের অতীত, ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তার যাবতীয় মহত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে বিশেষ এক মতবাদের অনুগত রাজনীতিক দল ও তাঁদের অনুচর সম্প্রদায়। এসব কিছুকাল আগের বিশেষ ঘটনা হলেও বর্তমানে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। বরং দেখা যায় যে, চাপা দেবার চেষ্টা করলেও পেঁয়াজের ঢেকুর মাঝে মাঝে বের হয়ে পড়ছে। শ্রীসঞ্জয় গান্ধী এদেরই অনাচারিতার সমালোচনা করেছেন। দেশের সাহিত্যকেও বিপন্ন বোধ করতে হয়েছে। বিশেষ একটি রাজনীতিক মতবাদের উপাসক বলে নিজেকে চিহ্নিত করলেই সেই লেখক-ব্যক্তিকে একজন যথার্থ প্রগতিশীল লেখক বলে ব্যাখান করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরাই বিশেষ এক অসত্যতা সঞ্চারিত করেছে। ফলে সাহিত্যেরই ক্ষতি হয়েছে। এর সঙ্গে তুলনায় আর একটি ক্ষতি, যেটা আদর্শিক আন্তর্জাতিকতার মানসিক আবেশের কারণে নয়; বিদেশের প্রতি দাস্যতাপূর্ণ একটি অদ্ভুত কারণে দেশের শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রের অনেক জনের চিন্তায় ও আচরণে একটা মেরুদণ্ডহীন প্রণত অবস্থার প্রকোপ সৃষ্টি করেছে। বিদেশের এবং বিদেশীয়ের কাছ থেকে সামান্য একটুকু প্রশংসাবাণীর জন্য একশ্রেণীর শিল্পীর তৃষ্ণাতুর অবস্থাও এক ধরনের মানসিক হীনতার প্রমাণ। বিদেশীয় সমালোচকের নিন্দা এবং প্রশস্তি, উভয়ই ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের কোন কৃতিত্বের কাছে চরম ও পরম সত্য বলে বিবেচিত না হলেই জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে আত্মমর্যাদার বোধ শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য বিরচিত করবার অবাধ সুযোগ পাবে।

রক্তের টান

রোডেশিয়াকে খুব একচোট কড়কে দিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ ১৪ জানুয়ারি। তাতে তার পনেরো জন সদস্যই এক কাট্টা হয়ে রোডেশিয়ার নিন্দে করেনি। কড়কানি দিয়েছে তেরো জন আর বাকী দু জন হাঁও বলেনি, নাও নয়। সে দুজন হচ্ছে ব্রিটেন আর আমেরিকা। তাদের মনে এক, মুখে আর। লোকদেখানি গাল পাড়লেও ও দুটো দেশই ধলা রোডেশিয়ার মস্ত খুঁটি। ওদের জোরেই লড়ে যাচ্ছেন তার ধলা প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথ দেশের কালা আদমীদের সঙ্গে। ধলাদের জুতোর শুকতলা হয়ে থাকতে কালারা আর রাজী নয়। চোদ্দই জানুয়ারি রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে যে নালিশ দায়ের হয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে তার সঙ্গে দেশের কালা-ধলা কারোর কোনো সম্বন্ধ নেই সেটা পেশ করা হয়েছিল রোডেশিয়ার লাগোয়া স্বাধীন দেশ বোটসোয়ানার তরফ থেকে এই বলে যে তার সীমানায় ওস্কানি দিচ্ছে আর হামলা চালাচ্ছে ধলা রোডেশিয়ার সেনা সামন্ত।

ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো তুচ্ছ নয়। রোডেশিয়ার পুবে মোজাম্বিক, পশ্চিমে বোটসোয়ানা, উত্তরে জাম্বিয়া, দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা। তার গুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বর্ণবিদ্বেষের দীক্ষা দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু ধলা সরকারের কাছ থেকেই নিয়েছে রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু ধলারা। দু সরকারের মধ্যে তাই গলাগলি ভাব। বাকী তিনটেই বেয়াদব কালা আদমীদের দেশ। তাদের সঙ্গে ইয়ান স্মিথ সরকারের বনাবনি তো নেই-ই, ওদের তাঁরা মনে করেন শত্তুর। সেগুলোকে দখল করে কালা চামড়ার মানুষদের শায়েস্তা করবেন এতটা বুকের পাটা তাঁদের নেই। এটুকু তাঁরা বিলক্ষণ জানেন দিনকাল এখন পাল্টে গেছে—নতুন করে কালাদের দেশ কব্জা করতে গেলে পস্তাতে হবে। যেটুকু তাঁদের হাতে আজও আছে সেটুকুও যাবে। আপাতত তাই মনের রাগ মনেই পুষে সাদা সরকার ঝাল ঝাড়ছেন আশেপাশের কালা দেশগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে। বোটসোয়ানা স্বাধীন হয়েছে দশ বছর হলো। ওই দশ বছরে সীমান্ত পেরিয়ে হামলা চালিয়েছে রোডেশিয়া ৩৬ বার।

ও রকম কান্ড অন্য কোথাও হলে হই হই পড়ে যেত তামাম দুনিয়ায়। আর ব্যাপারটা উলটো হলে—একটা কালা চামড়ার দেশ একটা সাদা চামড়াদের দেশের ওপর হামলা চালালো—হয়তো তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধই বেধে যেতো। ধলাদের মাকড় মারলে ধোকড় হয়। তাই ধলাদের যারা চাঁই তাদের টনক নড়েনি। বোটসোয়ানার নালিশ শুনে। ইংরেজ-মার্কিন প্রতিনিধিরা সব শুনেও মুখে চাবি এঁটে বসেছিলেন ভোটের সময় হাত তুলেও জানাননি হামলাবাজিতে তাঁদের সায় নেই। বোটসোয়ানা স্বাধীন দেশ। তার এলাকায় চড়াও হওয়ার মানে তার সার্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ করা। তার চেয়ে বড় অন্যায় আন্তর্জাতিক আইনে আর নেই। তবুও ব্রিটেন আর আমেরিকা তৃতীয় দুনিয়ায় ভারত, মরিশাস, রুমানিয়া, লিবিয়া, পানামা আর ভেনেজুয়েলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে রোডেশিয়ার ধলা সরকারের কুকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়নি—বরঞ্চ তাঁদের এক রকম মদতই দিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে চুপ করে বসে থেকে।

বেপরোয়া হামলা ইয়ান স্মিথের চেলা-চামুণ্ডারা কেবল বোটসোয়ানার এলাকাতেই চালায়নি, জাম্বিয়া আর মোজাম্বিককেও তারা সমানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ফৌজী পর্তুগীজ উপনিবেশ মোজাম্বিকের ওপর তার সমানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ফৌজী হামলা তো চলছেই নাশকতামূলক কাজও চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হাওয়াই জাহাজ থেকে বোমাও ধলা রোডেশিয়ার ফৌজ ফেলছে মোজাম্বিকে। রেহাই জাম্বিয়ারও নেই। তারও অপরাধ সে রোডেশিয়ার কাছের দেশ। সাদা চামড়াদের সাফাই হলো তারা আশেপাশের দেশে হানা দিচ্ছে কালা গেরিলাদের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে। তাদের খুঁজতেই রোডেশিয়ার ধলা সেনা সীমান্তে ঢুকে পড়ছে বোটসোয়ানায়, মোজাম্বিকে, জাম্বিয়ায়। মনে হচ্ছে এ সাফাই ইংরেজ আর মার্কিন সরকার মেনে নিয়েছেন। তাঁরা রোডেশিয়াকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন বলেই নিরাপত্তা পরিষদে তার নিন্দে করেননি কিংবা বোটসোয়ানা থেকে তফাত যাও বলে হাঁকও পাড়েননি অন্য তেরোটা দেশের সঙ্গে গলা মিলিয়ে।

আমেরিকার সঙ্গে রোডেশিয়া-জাম্বিয়া-বোটসোয়ানার না হয় কোনো সরাসরি যোগ নেই, কিন্তু ব্রিটেনের বেলা সে কথা তো বলা যায় না। তিনটে দেশই এককালে তার উপনিবেশ ছিল। জাম্বিয়া আর বোটসোয়ানা স্বাধীন হলেও কমনওয়েলথের ভেতরেই রয়েছে। তাদের ওপরে হামলার বিরুদ্ধে ব্রিটেন মুখের কথা খসিয়েও প্রতিবাদ জানালো না এ কী ব্যাপার? তার ওপর রোডেশিয়ার ইয়ান স্মিথ যে কী চিজ তা তো ব্রিটিশ সরকার ভালই জানেন। ধলা রোডেশিয়া যখন ১৯৬৫ সনে এক তরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন সেটা তাঁরা মেনে নেননি। তাঁদের চোখে আজও সেখান-কার সরকার বে-আইনী—তাকে তাঁরা দুনিয়ায় একঘরে করে রেখেছেন। সে সরকারের অনাচার তাঁদের কাছেই অসহ্য হওয়া উচিত। তা না করে তাঁরা এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন বোটসোয়ানা-মোজাম্বিক-জাম্বিয়ার ওপর চড়াও হয়ে রোডেশিয়ার বে-আইনী সরকার কোনো বে-আইনী কাজ করেনি—কোনো আন্তর্জাতিক আইন ভাঙেনি।

ওই দুমুখো নীতিই ইয়ান স্মিথ আর তাঁর সাকরেদদের শেষ ভরসা। তাদের দিন যে ঘনিয়ে এসেছে এটা তারা বুঝেও বুঝছে না ইংরেজ আর মার্কিন মিত্রদের মুখের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু ওদের ভরাডুবি থেকে বাঁচাবে এমন সাধ্য কী আর ইংরেজ-মার্কিনদের আছে? দেশটা ধলাদের নয়, কালাদের। অত্যাচারের চাবুক মেরে কালা-দের দাবিয়ে রেখেছিল ধলারা। কিন্তু কালা-দের ভয় এখন কেটে গেছে, তারা চাইছে নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে। তাদের দাবি যে অন্যায় নয় তা ইংরেজরাও কবুল করেছে, আমেরিকানরাও। তবুও তারা চেষ্টা করছে যদ্দিন পারা যায় ধলাদের চূড়ান্ত বিপদ ঠেকিয়ে রাখতে। মীমাংসার উপায় বাতলেছিলেন ডঃ কিসিংগার, তা মঞ্জুর করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার। পাঁচ হপ্তা ধরে জেনিভাতে বৈঠকও চলেছিল মিটমাটের। কিন্তু তা ভেস্তে গিয়েছে ইয়ান স্মিথের অন্যায় জেদে। রোডেশিয়ার সংগ্রামী মানুষদের ক্রমশ প্রত্যয় হচ্ছে যে আপসে কিছু হবে না। স্বাধীনতা আদায় করতে হবে লড়াই করে। আশেপাশের পাঁচ কালা দেশের প্রধান লুসাকায় বৈঠকে বসে ওই রায়ই দিয়েছেন—বিনা রক্তপাতে রোডেশিয়ার মুক্তি সম্ভব নয়।

দেবরাজ

এক নজরে

সুদর্শনের জবানবন্দী

এক নজরে দুনিয়ার কতটুকু আর দেখা যায়? সামনে পিছনে ও আশেপাশে বেশীর ভাগটাই ত অদেখা থেকে যায়। তবু এই সীমায়িত দৃষ্টিটুকুর ওপরই ভরসা মানুষের। খানিকটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অনেকটা অনুমান মিশিয়ে গড়ে তোলে সে তার বিশ্ববোধ এবং তাকেই প্রচার করে সত্য, অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র সত্য বলে। এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেছি অনেকবারই, আরো একবার করলাম এক নজরে দেখা দেশ ও দুনিয়ার চিত্র পরিবেশন করতে গিয়ে। গত ছ মাস ধরে যে যে জায়গা, জিনিস ও মানুষের কথা লিখেছি, তা কি সত্য, না কল্পিত, যদি সত্য হয় ত কোনটা কত টুকু সত্য, কতটুকু বানানো, জানতে চেয়েছেন বহুজন। চিঠির পর চিঠি এসেছে দেশের দপ্তরে এবং সহৃদয় সম্পাদক সবই সযত্নে পাঠিয়ে দিয়েছেন এই লেখকের কাছে। আজ বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে এগুলি সম্বন্ধে একটি সোজা উত্তর দেবার সময় এসেছে।

সবিনয়ে জানাই যে সত্যের ভিত্ত আছে সব প্রসঙ্গেরই। তবু নিছক সত্য নয় কোনটাই। কিছু দেখার সঙ্গেই কিছু না-দেখার মিশাল ঘটিয়েছি আমি এক একটি আলেখ্য তৈরি করতে। জানি গল্পের গন্ধ পাচ্ছে ওঠে। তব, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তা বলে আজগুবীর আসর বিছিয়ে বসি নি আমি। সম্ভাব্যতার চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে আমার বক্তব্যগুলি, কারণ আমি ত গল্প বলতে বসিনি, গল্পের নৈচা আড়াল দিয়ে আরো কিছু বলতে চেয়েছি। সেই কিছুটা চলতি জীবনের চালচিত্র থেকেই নেওয়া, কারণ তার গলদ, ফাঁকি ও মেকীর স্বরূপ উদঘাটন ত তা ভিন্ন করা যায় না। আসলে কি জানেন? চিনির তবকে মুড়ে না বিলালে তেত বড়ির খরিদ্দার মেলে না। তাছাড়া রসবোধের রসনা পাঠকের যদি শুরুতেই বিরূপ করে দেওয়া হয়, তাহলে ওষুধে ফলও কিছু হয় না। সেই জন্যেই একটা করে খোস গল্পের খোলস দরকার হয়েছে আমার, আসল কথাটা তুলে ধরার জন্যে। মজা লাগছে দেখে যে কৌশলটা অনেকে ধরতে পারেন নি লেখকের।

তাঁরা সত্য বলেই বুঝেছেন কাহিনীগুলো। আজ বলতে বাধা নেই যে, ঘেণ্টু দত্ত, বলহরি ডাক্তার, অরিন্দম কবি, হারাধন দোকানি, রঞ্জা রায়, প্রফুল্ল নলিনী সাঁতরা, দোলগোবিন্দ চৌধুরী, চামেলী চাটুজ্যে, জগানন্দ বাবা...কেউ বাস্তব মাটির মানুষ নন। সবাই তাঁরা নাস্তি দেশের বাসিন্দা। মগজের মুল্লুক থেকে তাঁরা সরাসরি কাগজের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। কিন্তু তা হলে কি তাঁরা মিথ্যা? না তাও নন। তাঁদের প্রত্যেককে আমি দেখেছি। দেখেছেন আপনারাও অনেকে। হয়ত খেয়াল করেন নি। তবে বলে রাখি যে কারোকেই একক রূপে এক জায়গায় দেখি নি। হাটে বাজারে, রেল স্টেশনে, অফিস আদালতে, ঘরে বাইরে ছড়িয়ে থাকা খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিত্বের টুকরো কুড়িয়ে একত্র করেই আমার এক-একটি মূর্তি তৈরি হয়েছে, তাই প্রত্যেকটাই সত্য, আবার সত্যের অতিক্রান্তও! কাজেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের কারো নামধাম বা ঠিকানা চাইলে, তা জোগান আমার পক্ষে অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে হাত কচলে দুঃখ প্রকাশই করতে হবে আমাকে। বলতে হবে, জানি না ত! কিন্তু সত্যই কি জানি না? জানি যে তাতেও সন্দেহ নেই।

হয়ত মনে হবে আপনাদের, হেঁয়ালির জাল বুনছি: দোহাই আপনাদের, বিশ্বাস করুন, হেঁয়ালি করার বয়স বহু কাল আগে বিদায় নিয়েছে। মিথ্যার কুয়াসা ভেঙে সত্যের কিনারায় পাড়ি জমানই এখন হয়েছে একমাত্র লক্ষ্য আমার কারণ দিগন্তে অপরাহ্নের লাল আভা ফুটেছে। তার পিছনেই আছে নিশ্ছিদ্র কালো। মিথ্যা বিলিয়ে মানুষ ভোলান তাই আজ আর শ্রেয় নয় কোন মতেই। কিন্তু সত্য ও মিথ্যার মাঝখানকার সীমারেখাটা আমাদের ভাল করে চিনে নিতে হবে, কারণ আমাদের বুদ্ধি কতকগুলো চিরাচরিত ধারণার গ্রন্থিতে জট পাকিয়ে আছে এমন ভাবেই যে দুইয়ের ভেদ কোনখানে, তা আমরা সব সময় ধরতেই পারি না। আসলে যাকে আমরা সত্য বলি, তার একটা নির্বিশেষ ও নির্বিকার রূপ ত নেই। একই জিনিসকে উপর থেকে দেখলে একরকম দেখি, অন্যরকম দেখি নীচে থেকে দেখলে। পরিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে রূপও বদলায় বস্তুর। তাই খাঁটি সত্য কি ও কোথায়, তা কোনদিন প্রমাণিত হয়নি। যিনি যেভাবে দেখেছেন, সত্য তাঁর কাছে সেইরকম।

সবশেষে বলি যে সাহিত্য ও শিল্পকলা সত্যাশ্রয়ী না হলে কখনোই সার্থক হয় না। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্য নিয়েও কি সাহিত্য বা কলাকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে? সংবাদপত্রের বিবরণ যেমন আদ্যন্ত বিশ্বস্ত হলেও ত সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। নিখুঁত আলোকচিত্রও কোনদিন সৃষ্টিমূলক শিল্পের গৌরব লাভ করে না। সত্যের কাঠামোতেই আর একটু কিছু মেশাতে হয়, যা দিয়ে তৈরি হয় সাহিত্য ও শিল্প। সেই মশলা হল কল্পনা। তারই অনুরঞ্জনে বস্তুর কঙ্কালে আসে রক্ত মাংস, আসে প্রাণস্পন্দন। এতখানি সঞ্জীবনী শক্তি যে জিনিসের, তাকে কি মিথ্যা বলবেন, শুধু তা অদৃশ্য বলেই? তাহলে ত যাকে আমরা প্রাণ বলি, তাও মিথ্যা! অর্থাৎ এক নজরের পর্যবেক্ষণগুলিতে আমি কল্পনার রঙ ও তেল লাগিয়েই তাদের সত্য থেকে অধিকতর সত্যে উন্নীত করেছি। এতে কারো উপকার নাও যদি হয়ে থাকে ত ক্ষতিও অবশ্যই হয়নি। অন্তত এই ভরসাটুকু নিয়েই আমি পাঠক পাঠিকার কাছ থেকে আপাতত বিদায় চেয়ে নিচ্ছি। কারণ স্বচিত্ত কল্পিত গর্ব নেই কার দুনিয়ায়?

সুদর্শন গুপ্ত

কালো প্রায়শ্চিত্ত

শামশের আনোয়ার

আমি চাই ঈশ্বরের হাতের বাজ এসে আঘাত করুক আমাকে ;
আমার ঠোঁটেও ছড়িয়ে যাক ঈশ্বরের ঠোঁটের কুষ্ঠ।
আমি চাই একটি কৃমি খেয়ে ফেলুক আর একটি কৃমি :
অহংকারের
গায়ে বসুক অহংকার, অস্ত্র-চালকের দেহে অস্ত্র।
কোথাও ঈশ্বর নেই ; আছে কুষ্ঠ ও মমত্বহীন বাজ—
ঈশ্বরের হাতের
শিকল পড়ে আছে .... এবং নিহত খরগোসদের
রক্ত লেগে আছে
আমাদের খাবারের প্লেটে !
সারাক্ষণ ভুল, অবিশ্বাস ও গঞ্জনা আর গঞ্জনা,
অবিশ্বাস ও ভুল বাজছে
আমাদের ঘিরে, :

আমারো খঞ্জনিতে বাজুক একটানা, কালো প্রায়শ্চিত্ত।
মৃত হাসি, মৃত কথা ও মৃত আপ্যায়ন ঝুলুক
আমাদের বসার ঘরে ;
আমাদের [illegible] ঈশ্বরের হাতের শিকল ॥

রিলে-রেস

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

হাত থেকে হাতে লোফালুফি করতে করতে
ওরা একটা লাল বল-কে এগিয়ে নিয়ে আসছে,
আঃ, এই তো জীবন ! মসৃণ, রঙিন, গোল—
যেন আস্ত কোনো গ্রহ আজ মানুষের
খেলার বিষয় হয়ে গেছে,
সবাই হাসছে, খেলছে, দৌড়ে যাচ্ছে মাঠের ভেতরে,
বলছে—প্রস্তুত হও, তোমাকেও বল লুফে নিয়ে
আরেকজনের হাতে দিয়ে দিতে হবে,
যা দীর্ঘদিন আগে শুরু হয়ে গেছে, তাকে
এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে
ভবিষ্যতের দিকে ছুঁড়ে দেয়া ভালো—
এখন দু'হাত পেতে অপেক্ষায় থাকো,
অন্তত একটিবার, জীবন তোমার হাত স্পর্শ করে যাবে

খিড়কি দিয়ে এলে

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

খিড়কি দিয়ে এলে স্বপ্ন, খিড়কি দিয়ে ফিরে চলে গেলে
ছুঁয়ে দেখলে একটি দুটি রান্নার বাসনপত্র, আর
অন্দরের প্রাত্যহিকতার চূর্ণগুলি
(কত খুঁত সেসব জায়গায়, এত অপ্রস্তুত আমি),
তারপর পেছন উঠোন দিয়ে চলে গেলে মাটির রাস্তায়।

সাজানো মহল সামনে—বইপত্র, পিকাসোর প্রিন্ট
আবদুল করিম কিংবা জন গিলগুড
পড়ে রইলো শূন্য ঘরে, তোমার ভ্রূক্ষেপহীন, বৃথা।
স্বপ্ন, তুমি দেখে গেলে ভুলে ভরা জৈবিক নির্মাণ
উপেক্ষা ছড়িয়ে গেলে সে-আত্মপ্রসাদে
যে আমার ঐকান্তিক সপ্রেম রচনা।

গাধা

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

সমস্ত জীবন, আমি খুঁজে বেড়িয়েছিলাম আর এক জোড়া চোখ,
যার ভেতর আমি দেখতে পাবো আমার আস্ত চেহারাটাকে। একা
দাঁড়িয়ে থাকি রাস্তার পাশে। একা একা
বাবার মলিন মুখ, ম্লান মুখ মনে পড়ে। একঘেয়ে এক শব্দ
ভেসে আসে সারাদিন—মানুষ চুল কাটে, দাড়ি কাটে,
নখ কাটে, বৌ
মাছ কাটে, গলা কাটে, ছেলে করাত চালায়—
আর তার শব্দ ভেসে আসে।
এসব কিছুই খুব কাছাকাছি থেকে জানার সুযোগ হয়েছিলো।
আর
একটা চাবুকের গল্প বাবা বলতেন আমাকে, একটা চাবুকের গল্প
আমি বলেছিলাম আমার ছেলেকে, যে আছে আজ দূরে, খাটছে
গাধার খাটুনি। পালিয়ে এসেছিলাম একদিন,
সঙ্গে এনেছিলাম সেই চাবুক। নেশা ধরে গিয়েছিলো,
রোজ তাই নিজেই নিজের পিঠে......। শুধু মাঝে মাঝে
স্বপ্নের ভেতর
দেখি সেই এক জোড়া চোখ,
যাকে আমি পাইনি কখনো,
যার চোখ জলে উঠেছে ভরে, সেই জলে পড়েছে
আমার মুখের ছবি, ঘন কুয়াশার মেঘ এগিয়ে আসছে
মাথার ওপর দিয়ে, আর
সমস্ত আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে আমার চোখের রক্তে!

চলতে চলতে

বিমল মিত্র

॥ ১৪ ॥

সহ্য-ক্ষমতা বা সহনশীলতা মহা-[illegible]ষদের জন্মগত অধিকার। আমার [illegible]ম হাজার চেষ্টাতেও আমি তা আয়ত্তে [illegible]তে পারিনি। 'সুখেষু বিগতস্পৃহ [illegible] দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ'—কথাগুলো আমার কণ্ঠস্থ। কিন্তু আদর্শ আর আচরণের মধ্যে আমার আসমান-জমিন ফারাক।

আগে তুরীয়ানন্দজী ও স্বামী বিবেকানন্দর কথা বলেছি। এবার আর একজনের কথা বলি। তিনি হলেন সক্রেটিস।

সক্রেটিস হাটে-বাজারে রাস্তায় মাঠে ঘুরে ঘুরে সমস্ত মানুষকে একটা কথাই বার বার বলে বেড়াতেন যে তোমরা সৎ হও, সৎ-জীবন যাপন করো, কারণ যে সৎ তার কখনও কোনও বিপদ হয় না। ভগবান তাকে আজীবন দেখেন।

সক্রেটিসের এই ব্যবহারে দেশের কর্তারা খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। প্রমাদ গনলেন। ভেবে দেখলেন সক্রেটিসের প্রভাব যদি প্রজাদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে দেশের রাজার সর্বনাশ। তাঁরা তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজ-দ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড দিলেন।

সেদিন সেই বিচারক আর জুরীদের সামনে সক্রেটিস যে-সাহস যে-বুদ্ধিমত্তা যে-নির্ভীকতা ও যে-যুক্তি প্রকাশ করে-ছিলেন তা আজও প্রত্যেক সত্যবাদী ও সৎ মানুষদের প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে।

তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি সেদিন মাথা উঁচু করে বলেছিলেন—আমাকে আপনারা প্রাণদণ্ড দিন হুজুর, আমাকে যদি আপনারা আজকে মুক্তি দেন, তাহলে যে-অপরাধে আমাকে আপনারা শাস্তি দিচ্ছেন, সেই অপরাধ আমি আবার করবো—

তিনি সেদিন আরো বলেছিলেন—"And this one thing hold fast, gentlemen of the jury as to death, that to a good man no evil can happen, whether alive or dead.."

বিষ খাইয়ে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার কথা সর্বজন-বিদিত। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করলে সেই মানুষটিকে আরো স্পষ্ট করে চেনা যাবে!

সক্রেটিস প্রতিদিন অপরাহ্নে যখন শিষ্য-পরিবৃত হয়ে বাড়ি ফিরতেন তখন তাঁর স্ত্রী জেনথিপি (Zentheppe) ছাদের ওপর থেকে স্বামীকে লক্ষ্য করে এক বালতি ময়লা জল তাঁর মাথার ওপর ফেলে দিতেন।

এমনি রোজ!

সক্রেটিসের শিষ্যরা এই ঘটনাতে বড় মর্মাহত হতেন। তাঁদের গুরুদেবের এ-অপমান তাঁরা চোখে দেখতে পারতেন না।

একদিন এক শিষ্য আর থাকতে না পেরে বললেন—আচ্ছা গুরুদেব, আপনার স্ত্রীর এ কী আচরণ? আপনি কোনও দিন প্রতিবাদ করেন না বলেই আজ আপনার স্ত্রী এত বাড়াবাড়ি করবার সাহস পেয়েছে—

সক্রেটিস বললেন—না হে, তোমরা কিছু ভুল বুঝো না, আসলে আমার স্ত্রী আমার উপকারই করছে।

সবাই অবাক। জিজ্ঞেস করলেন—আপনার মাথায় ময়লা জল ফেলে আপনার কী মহা উপকার করছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

সক্রেটিস বললেন—তবে বলি শোন, তোমরা হয়ত জানতে না, আমার চরিত্রের একটা মস্ত দোষ আছে। সহ্যশক্তিটা বড় কম আমার। আমার স্ত্রীর জন্যে আমার সহ্যশক্তিটা একটু একটু করে বাড়ছে—

রামকৃষ্ণ মিশনের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদিন যে কত কথা মনের মধ্যে ঘুর-পাক খেতে লাগলো তার ইয়ত্তা নেই। কোথায় ইন্ডিয়া, আর ভারত-মহা-সাগরে বেষ্টিত এই দ্বীপ মরিশাস। এখানে কার প্রয়োজনে ঠাকুর এসে হাজির হলেন?

প্রধান কারণ হলো ফরাসী লেখক রোঁমা রোলাঁ। ফরাসী ভাষায় রোঁমা রোলাঁই প্রথম রামকৃষ্ণকে ফরাসীভাষীদের কাছে পরিচিত করিয়ে দেন। শুধু রামকৃষ্ণ কেন, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী সকলের

...তিনি, প্রথম প্রথার সংগে ও ক-গ্রন্থে উল্লেখ করলেন। ১৯৪৮ সালে রোমা-রোলাঁর এক বন্ধু, জর্জেস ইংহাসেল 'গান্ধীজী এবং মরিশাস' সম্বন্ধে একটা বই লিখতে লাগলেন। তখন সবাই বলতে লাগলেন—খোঁজ, খোঁজ, মহাত্মা গান্ধী কবে মরিশাসে এসেছিলেন। পুরোন কাগজ-পত্র ঘাটাঘাটি হতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল ...কগুলো ইংরিজি ভাষায় গান্ধীজীকে লেখা চিঠি আর গান্ধীজীর হিন্দিতে লেখা জবাব। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরই বলতে গেলে গান্ধীজীকে নিয়ে বেশি হই-চই হতে লাগলো। তখন দেখা গেল গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীর একটা পরিচ্ছেদই শুরু করেছেন তাঁর মরিশাস-ভ্রমণ প্রসঙ্গ নিয়ে।

শুধু তাই-ই নয়, আরো আশ্চর্য ঘটনা হলো এই যে ১৯০১ সালে মরিশা... অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করবার মূলে ছি... হিন্দু নয়, খৃষ্টান নয়, বৌদ্ধ নয়, আ... সমাজী নয় এক মুসলমান যুবক। ... নাম আব্দুল কাদির।

আবদুল কাদিরের কাছে আজ সম... মরিশাস-বাসী কৃতজ্ঞ। কারণ সে... তিনিই তাদের দেশবাসীর মুখরক্ষা ক... ছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থে... গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে তিনি ১৯০১ সালে... আগেই মরিশাসে এসেছিলেন। তাঁর কা... হঠাৎ কথাটা গিয়ে পৌঁছুলো যে একজ... ইণ্ডিয়ান ব্যারিস্টার এম-কে-গান্ধী মরি... শাসের জাহাজ-ঘাটায় এসে হাজি... হয়েছেন।

আবদুল কাদির সাহেব এত বড় একা... সুযোগ ছাড়বার পাত্র নন। সোজা জাহাজ ঘাটায় গিয়ে হাজির হলেন। সেলাম করলে... গান্ধীজীকে।

বললেন—এখানে আপনাকে একা... নামতে হবে—

গান্ধীজী বললেন—এ জায়গাটার না... কী?

আবদুল কাদির বললেন—এ দ্বীপের নাম মরিশাস—

আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল নিতান্ত... ঘটনাচক্রে। আসলে তিনি ব্যারিস্টার হিসেবে... প্র্যাকটিস করতে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য... এসেছিলেন। এবং দু... চক্রে পড়ে তাঁ... জাহাজ এসে ঠেকেছি... রিশাসে।

দুর্ঘটনা যে ... সময়েই শুভ-সূচনার ইঙ্গিতবহ ...না তারই প্রমাণ।

গান্ধীজী ত... "Satyagraha in South Africa" নামক গ্রন্থে তিনবার মরিশাসের নাম উল্লেখ করেছেন।

যাঁরা গান্ধীজীর মরিশাসে যাওয়া সম্বন্ধে ...সন্ধান তাঁদের জন্যে এখানে শিব ক... প্রাপ্ত ইংরিজী রেকর্ড থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"Abdul Kddir, a graduate of the Bombay university, had reached the island before 1901 was instrumental in getting a reception organised in honour of the young Barrister M. K. Gandhi who stayed in the midst of Maritians for three weeks in that year."

গান্ধীজী সেখানে সেই সভাতে যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন তারও কিয়দংশ রেকর্ড থেকে তুলে দিচ্ছি।

"He said that the sugar industry of the island owed its unprecedented prosperity mainly to Indian Immegrants. He stressed that indian should regard it their duty to acquaint themselves with happenings in their motherland and should take interest in politics. H

..laid much emphasis on the ..t need to pay attention to the ..cation of their children."

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই কোটেশান ..কত লেখা লিখতে বা পড়তে ভালো-.. না। কিন্তু শুনতে পাচ্ছি কিছু-.. পাঠক নাকি আমার এই রচনার ..ত্ততায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

যা' হোক, যদি প্রয়োজন বুঝি তার ..ও আমি 'দেশে'র পাতায় দেব। আমি ..র মতন করে ভ্রমণ কাহিনী লিখছি, .. আমি নিজে যেমন পণ্ডিত নই, ..নি লেখার মধ্যেও এতদিন কোথাও ..ও পাণ্ডিত্য ফলাতে যাইনি। কঠিন .. সহজ করে বলার আর্টটাকেই ছোট-.. থেকে কষ্টে আয়ত্ত করার চেষ্টা করে ..ছি। এই 'চলতে চলতে'ও সেই ..তেও লিখছি।

এখন যারা ওপরের ওই ইংরিজি ..গুলো পড়তে নারাজ তাদের আমি ..লো পড়তে বারণ করি। আপনারা ..রা সাধারণ মানুষ, আসুন আবার ..রা আগেকার মত গল্প আরম্ভ করি।

*

অসমাপ্ত মন্দিরটি ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে ..টিয়ে দেখছি। যখন মন্দিরটি সম্পূর্ণ .. তখন এটি একটি যে দ্রষ্টব্য-স্থানে ..রিণত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ..পরানন্দজী আর পুরুষোত্তমজী মন্দিরটি ..ম্পূর্ণ করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করছেন .. লক্ষ করলাম।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বা স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে আমি একটু বেসামাল হয়ে পড়ি। সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ি। অথচ এ-কথা কি আজ এযুগে কেউ বিশ্বাস করবে যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহের সংকার করবার সময় মাত্র বারোজন শবযাত্রী শ্মশানের সহযাত্রী হয়েছিলেন। তার বেশি সেদিন লোক জোটেনি। অথচ আজ বেলুড়-মঠে উৎসবের দিনের লক্ষ-লক্ষ প্রসাদ-প্রার্থীর ভিড় দেখে সে-কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? আর আজ যে থিয়েটার বা যাত্রাতেই হোক তাতে রামকৃষ্ণের চরিত্র অভিনীত হলেই আর দেখতে হবে না। সেখানকার মালিকরা টিকিট-বিক্রি করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। আবার বলতেও লজ্জা হয়, 'রামকৃষ্ণ হেয়ার কাটিং সেলুন' আছে আমাদের পাড়ায়, সেখানে দিবারাত্রি খদ্দেরের ভিড়। এরই নাম নাম-মাহাত্ম্য! আর স্বামী বিবেকানন্দ! তাঁর কথাও এবার বলি।

যেদিন তিনি স্পেশ্যাল ট্রেনে করে বজ-বজ থেকে শেয়ালদায় এলেন সেদিন হ্যারিসন রোডে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে ল্যান্ডো-ঘোড়ার গাড়ির বন্দোবস্ত ছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে বাগবাজারের বিখ্যাত পশুপতি বোসের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

ঠিক ছিল স্যার গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়কে অনুরোধ করা হবে সেই সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্যে।

কিন্তু তিনি বললেন—আমি সভাপতিত্ব করতে পারি তবে স্বামী বিবেকানন্দের সংবর্ধনা-সভায় নয়, যদি শুধু নরেন দত্তকে সংবর্ধনার জন্যে সভা ডাকা হয়, সেই সভায় আমি সভাপতিত্ব করতে রাজি—

এই ঘটনা সম্বন্ধে যদি কেউ কোনও লিখিত প্রমাণ চান তাহলে আমি তা পেশ করতে পারবো না। তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে এ-কথা আমি খুব বিশ্বস্ত-সূত্রেই শুনেছি।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এটাও নয়।

কথাটা হলো পশুপতি বোসের বাগ-বাজারের বাড়িতে যে সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল তার খরচ তোলবার জন্যে দু'আনা করে টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব টিকিট বিক্রি হয়নি সেদিন। সভার খরচ ওঠেনি। সে-লজ্জা স্বামী বিবেকানন্দের নয় সে-লজ্জা সমগ্র বাঙালী জাতির। যে-জাতি ক্রিকেট-খেলার মত একটা অপদার্থ খেলা-দেখার জন্যে উন্মাদের ন্যায় আচরণ করে থাকে সে-জাতি দু' আনার টিকিট কেটে সংবর্ধনার উদ্যোক্তা-দের সাহায্য করবে এমন আশা করা অন্যায়।

স্বামীজীর জীবনের শেষ দিনে তাঁকে যেন অন্য দিনের চেয়ে একটু গম্ভীর-গম্ভীর

দেখা গেল। একজন সন্ন্যাসী দেখলোম তিনি গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে নিচের মন্দিরে নামছেন—

শ্যামা মা কি আমার কালো রে।
কালোরূপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম আলো করে।

আর তারপরেই তাঁর মুখ দিয়ে একটা স্বগতোক্তি বেরিয়ে এল—'আর একজন বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারতো, এই বিবেকানন্দ কী কাজ করে গেল।

হঠাৎ দেখি কমলা রত্নম দিদিও মন্দির দেখতে এসেছেন।

দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক। বললেন—মরিশাসে এমন মহাপুরুষের দর্শন করবো না তা কি হয়?

বললাম—মরিশাসে দর্শনীয় বস্তু তো আরো অনেক আছে। প্যামপামনেল বোটানিক্যাল গার্ডেনস, শ্যামারেল, গ্র্যান্ড বেসিন, আমাদের দলের তো দেখছি সবাই সেই দেখছে। শুধু আপনি আর আমি যা এই মিশনে এসেছি—

রত্নম দিদি বললেন—ওগুলো হচ্ছে বিউটি স্পট্, ক্যামেরায় ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে ইণ্ডিয়ার লোককে দেখাবে। এই রামকৃষ্ণ মন্দিরের ছবি আমি বুকের ভেতরে করে ছেপে নিয়ে যাবো—

কমলা রত্নম বললেন—আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি, দাদা। কিন্তু এই রামকৃষ্ণ মিশন যেখানে যেখানে আছে সেখানেই আমি গিয়েছি। সেখানে গিয়ে আমি যা শান্তি পেয়েছি আর কোথাও তা পাইনি।—

কমলা রত্নম দিদি সেদিন আরো অনেক কথা বলতে লাগলেন মন্দিরে বসে বসে। দেশাইজী বলে এক ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর যাবতীয় ধন-সম্পত্তি মিশনের নামে দান করে একদিন দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। দুটি ছোট ছোট বাড়ি একটিতে ঠাকুরের পুজো হয়, আর একটাতে অবৈতনিক স্কুল চলে।

মনে পড়ছে উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপে তিনজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীর মুখের চেহারা বদলে দিয়েছিলেন। পুরোন ধ্যান-ধারণা সব পালটে ফেলেছিলেন। একজন হলেন—'চার্লস ডারুইন'। ইভলিউশন তত্ত্বের আবিষ্কারক। দ্বিতীয়জন ছিলেন কার্ল-মার্ক্স আর তৃতীয়জন হচ্ছেন ফ্রয়েড।

অর্থাৎ দ্বিতীয়জন তাঁর সমস্ত গবেষণার ভিত্তি করেছিলেন—সম্পত্তিকে—

আর ফ্রয়েড গবেষণার ভিত্তি করেছিলেন—মানুষের যৌন-চেতনাকে—

কিন্তু সেই একই উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাঙলাদেশে আর একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁর প্রথম কথাই হলো 'কামিনী-কাঞ্চন'। অর্থাৎ সেক্স এবং প্রপার্টি। ফ্রয়েড এবং কার্ল মার্ক্স।

আলোচনার মধ্যে হঠাৎ বাধা পড়লো।

জালিম এসে হাজির। বললে—স্যার, আপনি এখানে? ওদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কীসের কী সর্বনাশ?

জালিম বললে—আপনি কি বাঙালী ব্রাহ্মণ?

—আমি তো শুনে অবাক।

বললাম—কে বললে ব্রাহ্মণ? আমি তো বাঙালী কায়স্থ, নিচু জাত

জালিম বললে—তা হোক স্যার, তবু আপনাকেই যশোবন্ত নাথমল্ সাহেব ডেকেছেন। তিনি মরো মরো। মরার আগে তিনি আপনার পায়ের ছোঁওয়া গঙ্গা-জল মুখে দিতে চান, নইলে পরলোকে গিয়ে তাঁর নরক বাস হবে—

বললাম—কিন্তু আমি যে [illegible] গো জালিম। তুমি ভুল করছো

জালিম বললে—সেদিন যে সেই আপনি এসেছিলেন। সাহেবের ছেলেও তো দেখেছে কিনা আপনাকে। আপনি বাঙালী তাই আপনাকে ডাকছেন। বাঙালী ছাড়া আর কাউকে দিয়ে চলবে না যে—

সত্যি, আমি কী করবো?

বললাম—আজকে যে কনটিনেন্টাল হোটেলে ব্যাঙ্ক অব্ বরোদা লাঞ্চ পার্টি দিচ্ছে, সেখানেও তো যেতে হবে!

জালিম বললে—আগে মানুষের জীবন না আপনার খাওয়া। আপনি একটা পাথরের বাটিতে রাখা গঙ্গা জলে বুড়ো আঙুলটা ছুঁয়ে দেবেন আর তিনি সেটা তাঁর ভরে খেয়ে নেবেন—

—কিন্তু গঙ্গাজল এখানে পাবে কোথায়?

জালিম বললে—কেন 'গঙ্গা-তালাও'তে—

(ক্রমশঃ)

শিল্পকলা প্রসঙ্গে

বিমূর্ত মার্কিনী

সম্প্রতি ইউসিস চিত্রশালায় জন ফ্রাংকলিন কোয়েনিগের একটি প্রদর্শনী দেখলাম (জানুয়ারী ৩—৭)। অন্য দর্শকদের কথা জানি না, আমার মনে মোটেও দাগ কাটেনি। কারণগুলো বলার আগে সমালোচনা প্রসঙ্গে পিকাসোর একটা উক্তি বলব। বয়সকালে কোথায় যেন তিনি বলেছেন আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না যে, ইদানীং সমালোচকরা কোনো ছবিকে খারাপ বলতে ভয় পান, কারণ ইম্প্রেসনিস্টদের বিষয় ভুল করেছিলেন বলেই কোনো সমালোচক আর ঠিক সাহস করে কোনো শিল্পীকে বা ছবিকে খারাপ বলার ঝুঁকি নিচ্ছেন না। তাঁর ছেলেবেলায় খারাপ ছবি দেখে সমালোচক বলতে পারতেন, কানভ্যাস খুলে পাপোস হিসাবে ব্যবহার কর। ভুল করলেও এমন উক্তি করার সাহস সমালোচকের থাকা উচিত, কারণ প্রথম শ্রেণীর ছবি তৈরী করার কোনো অ্যাসেমব্লী লাইন নেই।

মার্কিনী মুলুকে হয়েছে এর উলটো ব্যাপার। সংগ্রহশালার অধিকর্তা, শিল্প বিপণীর মালিক, সমালোচক মিলে একটা চক্র গড়ে তুলেছেন। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক টম উলফ এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। (Modern art reaches the vanishing point : The Painted Word, Harper's Magazine, April 1975) এমন কী রয় ম্যাকমুলান একথা খুব গর্বের সংগে বলেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধান্তে সকল বৈপ্লবিক শিল্প আন্দোলনের জন্মভূমি হচ্ছে আমেরিকা—অ্যাকসান পেনটিং, হার্ড এডজ অ্যাবস্ট্রাকসান, পপ আর্ট, মিনিমাল আর্ট, প্রসেস আর্ট, আর্থ আর্ট, বডি আর্ট, কনসেপচুয়াল আর্ট, ফোটো রিয়ালিজম থেকে হাইপার রিয়ালিজম পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে আধুনিক কালে তা মার্কিনী। প্যারী প্রবাসী এই মার্কিন শিল্প সমালোচক কিন্তু স্বীকার করেছেন 'Our post-war artists have had the benefit of lot of shrewd, vigorous,. sometimes rough American salesmanship.' (Saturday Review Dec. 13, '75,

বিমূর্ত শিল্পকলাকে যেমন মার্কিন সরকার, তেমন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদকে রুশীরা রপ্তানীযোগ্য শিল্পকলা আদর্শরূপে দেখেছে।

কোয়েনিগের ছবি দেখতে দেখতে এমন চিন্তা মাথার ভেতর দিয়ে খেলে যাচ্ছিল। কোয়েনিগ দক্ষ কারিগর। অন্তত প্রদর্শিত ছত্রিশটা কাজের মধ্যে—মিশ্র মাধ্যম, কাটা কাগজ জোড়া, পাথরছাপ—হরেকরকমবা আমার তাই মনে হয়েছে। তাঁর মণ্ডন বা ডিজাইন সম্বন্ধে একটা বোধ আছে, রঙের ওজন এবং বুনোটের তারতম্য ঘটিয়ে বিস্তার ও ছন্দ রচনার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে। রঙকে অনায়াসে ছড়িয়ে দিতে পারেন, গড়িয়ে দিতে পারেন, তারপর অদ্ভুত নৈপুণ্যে রাশ টেনে টানাপোড়েনের নানা বাহারী নকশা কাটতে পারেন। বেশ বোঝা যায় যখন তিনি রঙ ছাড়ছেন তখন অদ্ভুত সব আকস্মিক ঘটনা ঘটছে যা পূর্বপরিকল্পিত নয়—দুর্ঘটনা বা অঘটন—শিল্পীর তাতে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কখনো আলতোভাবে এসেছে জ্যামিতিক নকশা। কখনো অপরিকল্পিত আঁকিবুকি। সাদৃশ্যের অস্পষ্ট সুদূরবর্তী প্রতিবিম্ব। কিন্তু দৃশ্যের মধ্যে খুঁজে পাইনি আমি এমন কোনো সুর বা ব্যঞ্জনা যা আমাকে উত্তেজিত বা উদ্বুদ্ধ করতে পারে। বরং ছটা ছবির ছত্রিশটা পুনরাবৃত্তি দেখতে দেখতে ক্লান্তিই লাগে।

এ বি সি বদ্বীপ ১৯৭৫ — জন ফ্রাংকলিন কোয়েনিগ

মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনী

২৮ই ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রবেশ করার সময় শুনলাম হিন্দী আর বিলিতী পপ মিউজিক তারস্বরে বাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা ভবিষ্যতে শিল্পী হতে যাচ্ছেন তাঁদের কাছে আরও সূক্ষ্ম রুচি আশা করেছিলাম। বরোজোর্স্ট চিত্রাবলি কর থেকে বর্ণোজ্জ্বল অবনী রায়চৌধুরী

পর্যন্ত শিল্পীদের সঙ্গীতপ্রেম সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে।

প্রদর্শনীতে প্রচুর ছবি ছিল ভালোয় মন্দয় মিলিয়ে। নির্বাচনের ব্যাপারে আর একটু কড়াকাড়ি করলে ভাল হতো। কলেজী প্রদর্শনীতে যে ধরনের কাজ থাকে তা যথারীতি ছিল। অর্থাৎ প্রথাগত প্রতিকৃতি, স্থিরবস্তু চিত্র (still life), নিসর্গদৃশ্য, জলরঙ, তেলরঙ, রেখাচিত্র। কাজের মধ্যে এবার গুরুদের প্রভাব একটু যেন বেশী। কারও কাজে বিরাজমান অশেষ মিত্র। কারও কাজে ঈশা মহম্মদ বা বিকাশ ভট্টাচার্য। যেমন ধরা যাক স্থিরবস্তু চিত্র ইত্যাদি কাজগুলোর মধ্যেকার ধরনটা অশেষবাবুর। সে তুলনায় বরং নিজস্ব রচনার দিকটা জোর পায়নি। কেউ যেন মন খুলে আঁকতে পারেননি। তৈলচিত্রের মধ্যে সমীর দাসের প্রতিকৃতির কাজটি নেহাৎ মন্দ ছিল না। প্রসূনকান্তি ভট্টাচার্যের পুরোনো কোর্ট টেনিস মাঠে ধুরেধুরে সেটটা অতীত বৈভবের বহু ইতিহাসের সাক্ষী যেন। অচিন্ত্য ভট্টাচার্যের পিচের রাস্তায় আটকে যাওয়া দৃশ্যটায় মধ্যে বিলম্বিত বিস্তার আছে কিন্তু এতে তাঁর গুরুর ছায়া আছে। প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে কল্পনার মাত্রা আছে। মানুষগুলো যেন মিশরী, প্ল্যাস্টারের তৈরী একটা মেয়ে শুয়ে, কিছু সাপ আছে। তেলরঙ প্যাস্টেলের ধরন ব্যবহার করেছেন। সুব্রত চৌধুরী দুর্গের খিলানের মধ্যে বর্ম পরিহিত যবনসদৃশ সৈনিক এঁকে আবহাওয়া তৈরী করেছেন। অনুপ রায় কারখানা অঞ্চলের পরিবেশ তৈরী করেছেন 'ইস্তাহার' ছবিতে (অবশ্য অচিন্ত্য ভট্টাচার্য জলরঙে কলিয়ারীর উঁচু টিলা ট্রলি রোপওয়ে দিয়ে জমিয়ে এঁকেছেন)। আসলে তৈলচিত্র বিভাগে নাড়া দেবার মতো কাজ তেমন দেখিনি।

এবার ভারতীয় চিত্ররীতি বিভাগে

ধীরাজ চৌধুরী

বেশ ভাল কয়েকটি কাজ ছিল। সবুজ ঘাসের মধ্যে কয়েকটি হাঁসের ভংগী সুন্দর এঁকেছেন পরেশ হাজরা। জগন্নাথ সরকারের আলতো তুলির চিত্রলেখ ভাল লাগল 'খাদ্যের সন্ধানে' ছবিতে। একটা ময়ূর মাটিতে চঞ্চু দিয়ে খাবার খুঁজছে। মনোজ মিত্রর হাল্কা হলদাভ পটভূমিতে 'গিরগিটি' একটা পোকা ধরতে আসার দৃশ্যটা জমিয়েছেন। যদিও পোকাটাকে যেন বিরাট পটভূমি গিলে খেয়েছে। এঁর একটা ছবিতে মন্দিরের প্রতিমা ও মানুষজন দর্শনার্থীর ব্যাপারটা ফুটিয়েছেন যদিও অঙ্কনের দিকে আর একটু নজর দেওয়া উচিত ছিল। এঁর ম্যুরালের কাজটির মধ্যে মাটির গন্ধ আছে, যদিও একটু হোর্ডিং-এর মতো মনে হয়।

বাণিজ্যিক শিল্পবিভাগে কাজ ছিল ভাল, কিন্তু স্বদেশীর চেয়ে বিদেশী কাজের প্রভাব বেশি। বিলিতী বিজ্ঞাপন হুবহু অনুকরণের হাত পরিষ্কার। কিন্তু যেটার অভাব সেটা হলো মৌলিকতা। বাথরুম ফিটিংস থেকে মদের বিজ্ঞাপন, সাবান থেকে উড়ো জাহাজের দেশ দেশান্তরের দৃশ্য দেখার আমন্ত্রণ—মুন্সীয়ানা যথেষ্ট, কিন্তু মৌলিকতা কই?

ভাস্কর্য বিভাগে কয়েকটি প্রতিকৃতি ছিল—প্রবীর ব্যাপারী, স্বপন শেঠ, গোপীনাথ রায় এবং অদিতি মজুমদারের কাজ মন্দ লাগেনি। গোপীনাথ রায়ের 'সীতা হরণ' লৌকিক রূপারোপের সারল্যের জন্য দৃষ্টি কেড়ে নেয়। প্রদীপকুমার সুরের 'রথ' কাজটির মধ্যে বেশ ওজন আছে যদিও রথী ও সারথি দুর্বল। মহীপালের মাছের রূপবন্ধের গতিময় মসৃণতা ভালই লাগে। এছাড়া গোপালপ্রসাদ মণ্ডলের কতগুলো ভাল কাজ ছিল।

বছর কয়েক ধরে প্রদর্শনী দেখলে একটা কথা স্পষ্ট হয় প্রতি বছর যেন একই প্রদর্শনী দেখছি। প্রথাগত কাজের সংগে সংগে স্বকীয়তা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে তো!

ধীরাজ চৌধুরীর প্রদর্শনী

সম্প্রতি ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৪ঠা জানুয়ারী এর প্রদর্শনী হয়ে গেল পার্ক হোটেলের প্রদর্শনী কক্ষে। কাজের ধরনটা পরিবর্তিত হয়নি এবং তিনি নিজেও মণ্ডনধর্মী এবং চিত্রধর্মী কাজের মধ্যে দোলায়মান। যেটা প্রথমে নজরে পড়ে সেটা হলো রঙ শুদ্ধ টটকা উজ্জ্বল এবং নানা রঙ দিয়ে তিনি নানারকম মজাদার বুনোট করেছেন। কখনো হয়তো ধরে ধরে শান্তভাবে রঙ চাপিয়েছেন, আবার অন্য ক্যানভাসে রেগে গিয়ে ছেড়ে ছুঁড়ে রঙ লাগিয়েছেন। কখনো অবশ্য ছাটা ফাটা বুটিক (Boutique) ধরনের ব্যাপার হয়ে গিয়ে মূল কাজটার ক্ষতি করেছে।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে গ্রাম আর সেখানকার মানুষগুলো যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে শহুরে পরিবেশে দ্রুত বিশৃঙ্খল জীবনধারা। নারী দেহ সেখানে মাংসের মতো পণ্য এবং দাঁত বের-করা খেঁকী কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাঁয়ের মানুষ শহরকে যেভাবে আতঙ্কিত হয়ে দেখে ধীরাজ এ সবের সুন্দর চিত্রকল্প খুঁজে পেয়েছেন।

সাধারণত ক্যানভাসের মধ্যে চৌকো ঘর কেটে তার মধ্যে কাটা কাটা দৃশ্য রেখে সামগ্রিকভাবে রচনাটা গড়ে তুলতে গিয়ে কখনো দৃশ্যগুলো আলাদা থেকে গেছে, আবার কখনো ছবি হয়ে উঠেছে। তবু মোটের ওপর প্রদর্শনীতে বহু ভাল কাজ ছিল।

বিধানসভার বাগানে ভাস্কর্য প্রদর্শনী

শ্রীচিন্তামণি কর,
৩।১ রামচাঁদ দে স্ট্রীট,
নরেন্দ্রপুর।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

মাস্টারমশাই,

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার প্রাঙ্গণে ফুলের সঙ্গে ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থার অভিনবত্বে দর্শকমাত্রই মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিশেষত শীতের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে ব্যাপারটা জমেছিল খুব। সি এম ডি এ-কে দিয়ে আপনি এমন একটি পরিকল্পনায় হাত দেওয়াতে পেরেছিলেন, এ জন্যে আমি অন্তত খুবই কৃতজ্ঞ। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণের আলোগুলো জ্বলে উঠে একটা রহস্যময় পরিবেশ তৈরী করেছে।

প্রথমেই ছোট্ট একটা অনুযোগ করব। মীরা মুখোপাধ্যায়, ফুলচাঁদ পাইন এবং মাধব ভট্টাচার্যের কোনো ভাস্কর্য না থাকায় প্রদর্শনী কিছুটা অসম্পূর্ণ। বিশেষত মীরা মুখোপাধ্যায় কলকাতার একমাত্র ভাস্কর যিনি [illegible] বছর শুধু ভাস্কর্য করেই রোজগার করছেন। এই তিনজনের কাছে আহ্বান লিপি না পৌঁছবার ব্যাপারটা সত্যিই দুঃখের।

সবাইয়ের কাজের একটা মান ছিল এবং সব মিলিয়ে ভাস্কর্যগুলো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে সব ভাস্কর্যই যে খুবই ভাল হয়েছিল তা কিন্তু বলতে পারি না। বিশেষত ইউরোপীয় ভাস্কর্যের গতি-প্রকৃতি অনুকরণের চেষ্টাটুকু আমার ভাল লাগেনি। রদাঁকে ছাড়িয়ে পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের যে রাজ্যপাট বিস্তার তার সঙ্গে পশ্চিমী সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরিস্থিতির একটা নাড়ির সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং পুরোপুরি জ্যামিতিক কাজগুলো—যেমন কলা[illegible]র অধ্যাপক সুরেন দে'র কাজ—আমার [illegible] কিছুই মনে হয়নি। তেমনি সুবেণ ঘোষের মাটি[illegible] পাত্র বড়ো আর ঘোড়ার আকারের গুটিগুলো হয়তো শিশু উদ্যানের খেলাধুলোর মজাদার আসবাব হতে পারে, কিন্তু ভাস্কর্য বলতে অপারগ—ক্ষমা করবেন।

সম্ভবত রদাঁই বলেছিলেন, 'আমাকে সুন্দর রূপবন্ধ দাও, আমি তোমাকে সুন্দর ছায়া দেবো' (Give me beautiful forms, and I shall have beautiful shadows)—, সেই অর্থে সুন্দর রূপবন্ধ সকলে গড়তে পারেন নি। আমি অবশ্য সবাইকে ভুলতে পারব না শর্বরী রায়চৌধুরীর 'স্বর্গের সিংহদরজা'। এই কাজটাকে ৩০ ফুট তোরণ

জোয়ান্দ্র — সুধীররঞ্জন ধর

করলে এর মধ্যেকার বিরাটত্ব আমাদের অভিভূত করবে। নারীর উরু থেকে কোটিতটতল তিনি এক উষ্ণ অনুরাগে সহস্র সম্ভাবনার আধার হিসাবে আমাদের সামনে রেখেছেন। তেমনি আমার ভাল লেগেছে নিরঞ্জন প্রধানের খাড়া আধা বিমূর্ত জ্যামিতিক রূপবন্ধের সারল্য। তাঁর ডানা মেলা পাখির রূপবন্ধ নরম আর হালকা—উড়ে চলেছে। সে-তুলনায় গৌতম পালের 'মুক্তি' নামক পক্ষীসদৃশ রূপবন্ধ একটু ভারী, যদিও এয়ারপোর্টের সামনে বিরাট করে রাখলে এটা ভালই যাবে। পাখির কথা যখন উঠল তখন বলতে হয় রামকিংকরের পক্ষী 'মিথুন' নামক কাজটির মধ্যে একটা মাটিঘেঁষা কাক আছে যা আমাকে অভিভূত করে।

ঘোরানো সিঁড়ির মতো ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে যাওয়ার কাজের মধ্যে একমাত্র করবী ঘোষের বাঁদরগুলো একটু ভাল লেগেছে। আপনার 'জাতীয় সংহতি' কাজটির থেকে আমি অস্বস্তি বোধ করেছি। কারণটা বলি—আপনার দক্ষতা আর নিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রবল শ্রদ্ধা আমি দেশের পৃষ্ঠায় স্বীকার করেছি। কিন্তু এই গ্রেকো-রোমক পুরুষ নারী এবং সবচেয়ে উপরে একটা বাচ্চার হাতে সূর্য এক ধরনের রাশী ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। বরং ফোয়ারার জন্যে তৈরী জলকন্যা (দেশের প্রচ্ছদে প্রকাশিত) আমার মন কেড়েছিল।

আমার নিজের খুব ভাল লেগেছে বিপিন গোস্বামীর 'পরিবার' (এটিও দেশের প্রচ্ছদে প্রকাশিত)। বিশেষত এর ভাব-গাম্ভীর্য বিকৃতকরণ ও দৈর্ঘ্যায়িত করার রীতি আধুনিক অথচ নারী, পুরুষ এবং শিশুটি যেন দেশের মাটির মধ্যে থেকে উঠে এসেছে।

সুধীররঞ্জন ধরের 'জোয়ান্দ্র—একটি মোটর সাইকেলের চালক আর তাঁর পেছনে একটি মেয়ে—গতিশীলতাকে ধরেছে। এছাড়া তিনজনের আধাবিমূর্ত কাজ আমার ভাল লেগেছে। অনীত ঘোষ 'থাবুক' [illegible]

রূপ ভেঙে ভেঙে আকারকে বের করে এনেছেন। তেমনি দিলীপ সাহার দুটি গোল আনুভূমিক আকারের খাড়া উঠে যাবার মধ্যে নিহিত শক্তি আছে। মৈনক তালুকদারেরও চতুষ্কোণ এবং চ্যাপটা পটলের দ্বৈত রূপবন্ধের মধ্যে একটা প্রবল আদিম বর্বর দীপ্ত তেজ আমাকে আকর্ষণ করেছে।

উমা সিদ্ধান্তের ফণিমনসা গাছের পাতার আকারে মা আর শিশুকে কল্পনা করা যদিও ভাল লেগেছে ছন্দিত রেখার বাঁকগুলোর জন্যে, তবুও এর মধ্যে আয়তন অনুপাতে ভার নেই। প্রভাস সেনের হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মেয়েটির বাচ্চাকে মাথার ওপর তুলে ধরা কাজটির বুকের কাছ থেকে পেট পর্যন্ত দুর্বল। স্বপনকুমার রায়ের 'ব্যালেরিনা' আপনার ১৪শ অলিম্পিকের কাজটা মনে করিয়ে দিল। জিতেন রায়ের বেহালাবাদকের মৌল রূপে ভাস্কর্যের গাম্ভীর্যের অভাব রয়েছে। অজিত চক্রবর্তীর 'নগর রাক্ষস'-কে স্থাপত্য হিসাবে কল্পনা করা গেলেও ভাস্কর্য হিসাবে পারলাম না।

আর একটি আশ্চর্য কাজ ছিল। শর্বরী রায়চৌধুরীর পাশ ফিরে শুয়ে থাকা মূর্তি। এই মধ্যবয়স্কা নারীর দেহের প্রতিটি মাংসল ভাঁজ, অস্থি আর পেশীর রূপ-রেখা সংবেদনশীল আঙুলের ছোঁয়ায়

তিনি মূর্ত করে তুলেছেন। কাজটি চ্যাপটা কিন্তু প্রতি অংশের আকারের বিন্যাস যে চাক্ষুষ অনুভূতি তা তিনি মূর্ত করেছেন।

বহুজনের কাজ দেখে অবশ্য ভাল লেগেছে কমবেশি। প্রধানত আপনার প্রেরণা এবং প্রচেষ্টায় এত বড় প্রদর্শনী ললিতকলার সঙ্গে সি এম ডি এ অনুষ্ঠান করতে পারল এ জন্যে আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মুক্তাঙ্গনে এত বড় ভাস্কর্য প্রদর্শনী আগে পৃথিবীর আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমি জানিনি। কারণ এতে পঁয়তাল্লিশটা কাজ ছিল।

পুরাতনী

সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা মনে হলো (মহাবিদ্যালয়ের চিত্রশালা ১৮-২৬শে অক্টোবর)। এই মহাবিদ্যালয়ের জীবিত এবং সক্রিয় কিছু প্রাক্তন ছাত্রদের কাজ নেই কেন? তাছাড়া শিল্পীরা অনেকেই নতুন কাজ দেননি। কিছু কাজ বাদ গেলে প্রদর্শনীর পক্ষে ভালই হতো।

তবু মোটের ওপর প্রদর্শনীতে কিছু ভাল কাজ ছিল। যদিও সামগ্রিকভাবে ছাত্রদের কাজ দেখছি এমন একটা ধারণা হচ্ছিল, পরিণত শিল্পীদের কাজ নয়। অবশ্য ছবির চেয়ে ভাস্কর্য বিভাগটা কিছুটা দায়সারা ও দুর্বল মনে হচ্ছিল। প্রথমত বিপিন গোস্বামীর সুন্দর কাজটা অনেকেই আগে দেখেছেন, আর অন্যদের কাজগুলো দেখলে মনে হয় চিন্তামণি করের করা। অন্য কাজগুলো ওঁর ছাত্রদের করা কিন্তু এতদিন গুরুর প্রভাব তাঁদের কাটিয়ে ওঠা উচিত ছিল।

সে-তুলনায় চিত্রকলা বিভাগটায় ভাল কাজের সংখ্যা বেশি। যদিও দু চারটে ক্যালেন্ডারে আঁকা মা কালী মার্কা ছবি

মিশ্র মাধ্যম গণেশ হালুই

ছিল, যা বাদ দিলে প্রদর্শনীর ক্ষতি হতো না। বস্তুত গতবারের তুলনায় প্রদর্শনী খারাপই হয়েছে।

সুনীল পালের ছোট্ট সুন্দর একটি টেম্পারার কাজ ছিল। প্যান্ডেলের আলোর রোশনাইয়ের পরিবেশে একটা বিয়ে বাড়ির ছবি এঁকেছেন। আনন্দের মধ্যেও কেমন যেন বিষাদের সুর আছে। গণেশ পাইনের জলরঙের খুব পরিচ্ছন্ন কাজ দেখলাম ছাত্রজীবনে করা কিন্তু খুব যত্ন নিয়ে একটা সেলুনের ভেতরটা দেখিয়েছেন— একজন আমাদের দিকে পিছন ফিরে চুল ছাঁটছেন অন্যজনকে দেখছি পাশ থেকে আর দুইজনের মাঝখানে এক ভদ্রলোক নিজের পালার জন্যে অপেক্ষা করবার সময় কাগজ পড়ছেন। তেমনি চীনা কালি আর জলরঙে করা গণেশ হালুইয়ের মেয়ের মুখটি খুবই সংবেদনশীল। সলিল ভট্টাচার্যের চতুষ্কোণ পরিবেশে 'মিথুন মূর্তির' ভাস্কর্যের গঠনভঙ্গিমা ভাল লাগে। যদিও রঙ ব্যবহারে তিনি কেন অকুণ্ঠ হননি তা বোঝা গেল না।

অলোক ভট্টাচার্যের নিজস্ব জগতে সদ-বাস্তবের অনুপ্রবেশ বিপজ্জনক ইংগিত বলে মনে হলো। জলাভূমির একপাশে অর্ধ ইন্দ্রলুপ্ত ভদ্রলোকের মুখটা বিকাশ ভট্টাচার্যের ক্যানভাস ছেড়ে উঠে এসেছে ব'লে মনে হলো। জ্যোতিরিন্দ্র রায়ের কালো কাকের বাচ্চা মন্দ নয়। ত্রিদিব চন্দ্র প্রথাগত বাস্তবে আঁকা একটি নারী ও একটি পুরুষের পাশে এনেছেন একটি গতিশীল অশ্ব আর সমস্ত পরিবেশটা জ্যামিতিক আকার এঁকে বেঁধেছেন। এই ছবিটির রঙের বুনোট এবং সাদার ব্যবহার প্রীতিপ্রদ মনে হয়। বিনোদ দাসের নিসর্গচিত্রের মধ্যে নির্মিতির প্রাধান্য আছে, যদিও কাজটি খুবই ছোট। বিশ্বপতি মাইতির 'লাল ফুলের' ঔজ্জ্বল্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। রামলাল ধরের প্রাকৃতিক পরিবেশে চালাঘরগুলো সুন্দর, কিন্তু ওঁর ভংগীটা জলরঙের ব্যবহারের মতো। এছাড়া বহু ভাল কাজ ছিল।

সন্দীপ সরকার

বেগম আবিদা আহমেদ মোদি সুতো কল আয়োজিত সূচি শিল্পের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ২৬ অক্টোবর মোর্যাদীনগর অশোকা হোটেলে। এই প্রদর্শনীতে ১০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার পান কুমারী বিজয়মালা বি পেণ্টার ও অন্যান্য পুরস্কার পান ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের মহিলারা। শ্রীসতীশ মোদি বেগম আবিদাকে প্রথম পুরস্কৃত কাজটি দেখাচ্ছেন

সোনালী দিন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

অপূর্ব অনবদ্য এক-একটা দিন আসে জীবনে। ভাবা যায়! বৌবাজার-শিয়ালদার মোড়ে ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা ফাঁকা ট্রাম পেয়ে গেলেন।

তা-ও কেমন গাড়ি। ভিতরে পা দিয়ে তাঁর মনে হল শৌখিন মেজাজী মানুষের খাস ড্রয়িং রুম। যেমন মোলায়েম গদি আঁটা কৌচ, বাঁশগন পাখা, চোখ জুড়নো জানালা সিলিং, ঝকঝকে পাটাতন—আহা! বোধ করি এর নামই 'সুন্দরী ট্রাম', না কি 'ড্রিম-লাক্স গাড়ি' বলে একে—যাই হোক, চারুবাবু সবচেয়ে অবাক হলেন এ দিনে কলকাতা শহরে দুপুরবেলা এমন ফাঁকা গাড়ি চলে? প্রায় হতভম্ব তিনি। অলৌকিক ঘটনা আর কাকে বলে! যুদ্ধের আগের, সেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগের নিরীহ ভালমানুষ শহরটা তাঁর দুম করে মনে পড়ে গেল। এমন ভরদুপুরে বৌবাজার হ্যারিসন রোড সার্কুলার রোড ধরে ঢং ঢং শব্দ করে খালি ট্রাম ছুটোছুটি করেছে। হলে হবে কি, সেদিন হুটহাট গাড়ি চড়া হত না। চাকরি খুঁজতে হেঁটে হেঁটে জুতোর তলা ক্ষয়ে গেছে। ট্রাম বাসের পয়সা ছিল কোথায়।

আজ অবস্থা অন্য রকম। তা হলেও, তিনি চিন্তা করেন, এক হিসাবে আজ আবার তাঁকে একটি বেকারই বলা যায়। চল্লিশ বছর চাকরি করার পর রিটায়ার করেছেন —দেখতে দেখতে তাও প্রায় ছ' সাত বছর হয়ে গেল।

কিন্তু কেবল বেকার কেন। আজ তিনি পুরোপুরি বাতিলও বটে। হুঁ, বাতিল, কথাটা পরে আসছে। পরে কেন, এখনি এসে গেছে। মন খারাপ করে যেমন স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন। চট করে ট্রামটা পেয়েই উঠে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর মন রীতিমত চাঙ্গা হয়ে উঠল। মনমরা ভাবটা একেবারে কেটে গেল। তক্ষনি তাঁর যেন মনে হল আজকের আবহাওয়ার কোনো তুলনা নেই। এক পশলা হয়ে গিয়ে এখন হীরের মতন রোদ জ্বলছে।

যখন জোর বৃষ্টি পড়ছিল বৌবাজার ইস্টার্ন অপটিক্যাল হাউসের ঝোলা বারান্দাটার নিচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ছাতা বর্ষাতি কিছুই বাড়ি থেকে নিয়ে আসেননি। ডাক্তার চোখের নতুন পাওয়ার লিখে দিয়েছে। চশমা পাল্টাতে দোকানে এসেছিলেন।

এখন এই নির্ভেজাল ফাঁকা গাড়ি, সুন্দরী ট্রামের ঝকঝকে কামরায় বসে তাঁর মনে হল হাওয়ায় হাওয়ায় ফূর্তি, জলের কণায় কণায় খুশি। মুষলধারা থেমে গিয়ে ঝকঝকে রোদ উঠেছে ঠিকই। আবার মাঝে মাঝে চিকচিকে ইলশেগুঁড়িও ঝরছে! শরৎকালে যা হয়। নীল আকাশে ছেঁড়া-খোড়া উড়নচণ্ডী মেঘের বিরাম নেই।

বাস্তবিক একটা দিন।

এধারের জানালা ঘেঁষে তিনি বসে-ছেন। ও-পাশের জানালা ঘেঁষে একটি তরুণী। বুঝুন! এত বড় একটা গাড়ির ফার্স্ট ক্লাস কামরায় তাঁর মতন পাকা চুলের এই এক বুড়ো কণ্ডাক্টার। এ ছাড়া আর তৃতীয় প্রাণী নেই।

কাজেই জানালার বাইরে প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য যেমন তিনি দেখছিলেন, তেমনি দুবার তিনবার করে ঘাড় ফিরিয়ে গাড়ির ভিতর তাঁর বাঁয়ে লেডীজ সীটের আশ্চর্য মানুষটিকে দেখছিলেন।

ছেলেদের মতন টাইট পোশাক। হরদম এখন যা চোখে পড়ে। কাউবয় শার্ট প্যারালাল প্যান্ট। তা হলে হবে কি। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায়! শার্ট প্যান্ট পরা সত্ত্বেও সারা শরীর লাবণ্য ছোপছোপ। আঠারো উনিশ বয়স হবে। আর একটু বেশি হলে ক্ষতি কি। এক মাথা আলুথালু বাদামী চুল নিয়ে একমনে জানালার বাইরে দোয়েল পাখির মতন তাকিয়ে আছে। জল

দেখছে রোদ দেখছে। এলোমেলো হাওয়ায় চুল উড়ছে, কপালে নাকে এসে উড়ে পড়ছে। হাত দিয়ে মাঝে মাঝে সরিয়ে দিচ্ছে। আবার এসে উড়ে পড়ছে। কেবল কি এলোমেলো হাওয়া, চারুবাবুর মনে হল, কেউ যদি ওর কাছে দাঁড়িয়ে জোরে নিশ্বাস ফেলে, ওই মিহি ঝিলমিলে চুলে, যা কিনা ক্লোগেনভিলিয়ার পাপড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়, আলিয়ার ঝড় তুলবে।

চারুবাবু একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছিলেন। দুধে ডোবানো কমলার কোয়ার মতন গায়ের রং।

না, এত কাছে বসে, এমন নিবিড় নিশ্চিন্ততা নিয়ে অনেক দিন কোনো তন্বঙ্গীকে তাঁর দেখার সুযোগ হয়নি। সুযোগ হবে কি, ঐ যে বলা হয়েছে, বাতিল মানুষ তিনি আজ।

দিনের মধ্যে কতবার কতভাবে যে অপমানিত লাঞ্ছিত হচ্ছেন। বিশেষ করে যারা তাঁর আপনজন, কাছের মানুষ—বাড়ির লোকদের দিয়েই তিনি বেশি পীড়িত নিগৃহীত হচ্ছেন। উঁহু, কোনোরকম কামনা-বাসনা হৃদয়ে পোষণ করা তাঁর পক্ষে এখন ঘোর পাপ। কবে ষাট পার হয়েছেন, সত্তর ছুঁই ছুঁই করছে, সুতরাং যত শিগগির তুমি নিমতলা কি কেওড়াতলার টিকিট কাট তত মঙ্গল। তোমার পক্ষে সেটাই শোভন হবে। খাট পালঙ্কে তুলে ফুলে ধূপে সাজিয়ে আর পাঁচটা মানুষ ডেকে ঘটা করে তোমাকে আমরা শ্মশানে নিয়ে যাই। এই তাদের মনের ভাব? স্ত্রী-পুত্র কন্যা—সকলের কাছে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। পৃথিবীর রিটায়ার্ড মানুষদের যা দশা হয়।

সব দেখেশুনে তিনি চুপ করে থাকেন। অথচ তিনি টের পান জগতের আনন্দ যজ্ঞে এখনও হঠাৎ এক-একদিন তার নিমন্ত্রণ আসে। আত্মার অংগনে একটি দুটি রঙ্গন ফুল ফোটে। মুখ ফুটে কাউকে এসব বলেন সাধ্য কি। বাড়িতে ছেলের বান্ধবী এলে তার ত্রিসীমানায় তিনি ঘেঁষতে পারেন না। চোরের মতন কোথাও লুকিয়ে থাকতে হয়। এমন কি নিজের স্ত্রীর সংগে কখনও যদি ঘনিষ্ঠ হয়ে একটা দুটো কথা বলতে যান, মাছির মতন কি করে টের পেয়ে তাঁদের ষোড়শী কন্যাটি যথাসময়ে সেখানে এসে দাঁড়াবে।

একদিনের ঘটনা। পুরোনো কাপড় নিয়ে বাসন বেচতে আসে ছুঁড়ি। চিকন শ্যাম গায়ের রং, টানা চোখ, ছিপছিপে গড়ন। দুপুরবেলা সদর খুলে দিয়ে বেশ একটু রসাবিষ্ট হয়ে দুটো কথা বলতে গিয়েছিলেন চারুবাবু। ব্যাস, যেন এখানেও একটা মাছি উড়ে গিয়ে খবর দিয়েছিল। চামুণ্ডা মূর্তি হয়ে গিন্নী সদরের কাছে ছুটে আসে। তারপর যেমন করে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল—তাড়াতাড়ি তিনি বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েন।

এখন? স্বপ্নের মানস সরোবর তাঁর সামনে। বলা যায় রূপসায়রের তীরে তিনি বসে আছেন। ঘাড় ফেরালেই সোনার মূর্তি চোখে পড়ছে। তার অর্থ যত খুশি তুমি চোখ ভরে রূপসুধা পান করে নাও। কেউ তোমায় বাধা দিচ্ছে না।

চিন্তা করে তিনি প্রতি মুহূর্তে পুলকিত রোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন। কামনা করছিলেন সুন্দরী ট্রাম এভাবে একদম ফাঁকা থেকে আশ্বিনের খেয়ালী রোদ্দুর ও ঝিকমিকে ইলশেগুঁড়ি মাথায় নিয়ে অনন্তকাল ছুটে চলুক।

তবে এও সত্য, এভাবে বার বার ওদিকে তাকাচ্ছেন বলে ভিতরে ভিতরে তিনি লজ্জিত কম হচ্ছিলেন না। তাঁর যেন মনে হচ্ছিল চুরি করে একটা অপরাধ করছেন। বুড়ো বয়সে এক ফোঁটা মেয়ের দিকে রাক্ষসের মতন তাকাবার কি হয়েছে হে।

তবে অপরাধবোধের কামড় নিয়েও তাঁর মনে একটা সান্ত্বনা ছিল—অশালীন অভদ্র কিছু ব্যবহার তিনি করছেন না। মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন, যদি কখনও যুবতী এদিকে চোখ ফেরায়, তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে নেবেন। কিন্তু যতক্ষণ সেটা হচ্ছে না ততক্ষণ শুধু দৃশ্যের সুখ, অনুভবের রসাস্বাদন নিয়ে মগ্ন থাকতে ক্ষতি কি। তাঁর কাছে এই লাখ টাকার আনন্দ।

একটা বেশ মজা হচ্ছিল। তিনি টের পেলেন তাঁর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে গাড়িতে। তাঁর মতন পুরু লেনস-এর চশমা চোখে সাদা চুলের ঐ কণ্ডাক্টারটিও ঘনঘন এ ধারের জানালার কাছের মানুষটির দিকে তাকাচ্ছিল। দেখে চারুবাবু ভাবছিলেন এখনও কি বুড়োর রিটায়ার করার সময় হয়নি। না কি ট্রামের নিয়ম কানুন অন্যরকম। এদিকে যতবার তিনি মেয়েটির দিকে চোখ রাখতে গেছেন, কি করে যেন বেটা টের পায়, কটমট করে তাঁকে দেখে, যেন ভীষণ বিরক্ত হয় তাঁর ওপর চারুবাবু তক্ষনি তাঁর ডাইনের জানালায় দৃষ্টি সরিয়ে আনেন। উপায় কি। তারপর কয়েক সেকেন্ড পার করে মুখটা ঘুরিয়ে যেই না আবার ওদিকে তাকান দেখেন জ্বলজ্বল করে বুড়ো মেয়েটিকে দেখছে। এমতাবস্থায় ইচ্ছে করেই চারুবাবু একটু জোরে কেশে ওঠেন। আর তখন হকচকিয়ে ওঠে কণ্ডাক্টার ঘাড়টা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ট্রামের দড়ি টেনে জোরে ঘণ্টি বাজায়। এণ্টালি মার্কেট জেম সিনেমা পিছনে রেখে গাড়ি একটা স্টপে পৌঁছে গেছে। খামোকা গাড়ি দাঁড় করানো। কেউ উঠল না। কেউ নামল না। এর আগেও পর পর দুটো স্টপে গাড়ি বেঁধেছে—একটি প্যাসেঞ্জার ওঠেনি বা ভিতর থেকে একজন নামেনি। যেন এই জন্যই বুড়ো চটে গেছে। মনে মনে হয়তো সে চাইছিল—নতুন কোনো যাত্রী গাড়িতে উঠুক বা না উঠুক, একজন অন্তত নেমে যাক। চারুবাবু নেমে গেলেই যেন সে খুশি হয়। কিন্তু চারুবাবু যে অনেক দূরের যাত্রী বুড়ো কি তা জানে না। একটু আগে তিনি টিকিট কেটেছেন। কণ্ডাক্টর নিজের হাতে টিকিট দিয়েছে। এর মধ্যে ভুলে গেছে?

তা হলে এবার বোধ করি বুড়ো চাইছিল, অন্তত মেয়েটি নেমে যাক—একেবারে পাশাপাশি সীটে বসে আছেন চারুবাবু আর মজা করে চোখ আড় করে বার বার রূপসী সহযাত্রিণীকে দেখছেন—এই জিনিস সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। তাই রেগে গিয়ে এমন গায়ের জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাল। কেউ নামল না দেখে আবার জোরে দুবার ঘণ্টি মেরে গাড়ি ছেড়ে দিল।

কথা হচ্ছে, যাকে নিয়ে মনে মনে এত আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি ঈর্ষা বিদ্বেষ চলছিল সে কিন্তু এ সবের কিছুই টের পাচ্ছিল না। ওর দিকের জানালায় চোখ রেখে চুপচাপ একভাবে বসে আছে। অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি নেই। কেবল বাইরের রোদ বৃষ্টির দৃশ্য দেখছে। না কি এবার বান্ধব-ভিলার নতুন গজিয়ে ওঠা চৌদ্দতলা বাড়িটা দেখছে। আকাশ অন্ধকার করে দিয়েছে।

দেখতে দেখতে ট্রাম সাঁ করে ব্যাপটিস্ট চ্যাপেলের কাছাকাছি এসে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘের আড়াল এসে রোদ নিবে গেল। ফলে গাড়ির ভেতরটা কেমন একটা গোধূলির ছায়ায় ভরে উঠল। তখন ওই সুন্দর মানুষটিকে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। চারুবাবুর মনে হল কোনো মায়াবিনী ওখানে বসে আছে। ভাল করে তিনি ঘাড় ফেরাতে পারছিলেন না যদিও। কারণ পিছন থেকে বুড়ো কন্ডাক্টার শকুনের মতন তাঁকে খুঁটিয়ে দেখছে, একটা চাপা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

ব্যাপটিস্ট চ্যাপেল পার হয়ে যায়। একটু পরেই সাহেবদের কবরখানার স্টপ এসে গাড়ি দাঁড়ায়। এবারও কেউ ওঠে না নামে না। গাড়ি ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আবার রোদ উঠল। জানালা গলিয়ে কনক-চাঁপার মতন টাটকা এক আঁজলা রোদ এসে মেয়েটির বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ওর রঙের টিয়ে রঙের শার্ট ঝলমল করে উঠল। সেই সঙ্গে ওর বাদামী চুল থেকে একটা সোনালি দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে মাথার চারদিক ঘিরে একটা উজ্জ্বল বলয় তৈরী করে। চারুবাবু চোখ ফেরাতে পারেন না।

কিন্তু একটা জিনিস তাঁকে মর্মাহত করল। এখন আর কেবল জানালায় চোখ না রেখে মুখটা সামনের দিকে সরিয়ে এনেছে যুবতী। দু হাতে হ্যান্ডেল চেপে ধরে ড্রাইভার ট্রাম চালায়। একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তাই কি দেখছে ও। চারুবাবু সঠিক বুঝতে পারেন না। এখন ওর পুরো প্রোফাইলটা তাঁর চোখে পড়ে। তাঁর মনে হয় অত্যন্ত নিস্তেজ ম্রিয়মান হয়ে আছে ও। না কি এইমাত্র এতবড় একটা কবর-খানা পিছনে ফেলে এসেছে সেই কবরের কথা মৃত্যুর কথা ভাবছে।

না, তা হবে কেন। চারুবাবু চিন্তা করেন। একেবারে ফুলের বয়স। অসামান্য রূপ নিয়ে গর্বিত এক জোড়া ভুরু, স্মার্ট চিবুক, টসটস করছে দুটো ঠোঁট। শার্ট-প্যান্ট পরে আছে, যেন ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে সর্বদা তৈরী। মৃত্যুর কথা ভাববে কেন ও।

এদিকে তাকাও লক্ষ্মীটি, চোখ ঘুরিয়ে এই বুড়ো মানুষটাকে দেখ, আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হোক। রুগ্ন ষাঁড়ের মতন ড্যাবড্যাব চোখ করে চারুবাবু তাকিয়ে থাকেন। এদিকে কণ্ডাক্টার বুড়ো কটমট করে তাঁকে দেখছে, চটছে—টের পেয়েও চারুবাবু তা গ্রাহ্য করেন না।

হঠাৎ গাড়িটা একটু ঝাঁকুনি খেল, সামান্য দোলা খেল। বোঝা গেল সার্কুলার রোড ছেড়ে ট্রাম এবার পার্ক স্ট্রীটে বাঁক নিয়েছে। ঠিক এমন সময়। চমকে উঠলেন তিনি। একজোড়া হরিণ চোখ টলটল করে তাঁকে দেখছে। তাই বলো, যদি আজ তাঁর যুবক বয়স থাকত, বুকের ভিতর সোনার ঘণ্টা বাজত। কিন্তু এখন বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। এমন মায়া ধরান কালো গভীর দৃষ্টি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁর দিকে সরাসরি কেউ নিক্ষেপ করেছে তিনি মনে করতে পারলেন না। এই অবস্থায় হঠাৎ অতিমাত্রায় বিব্রতবোধ করেন তিনি।

'কদ্দুর যাবেন আপনি?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'বালিগঞ্জ'। চারুবাবু উত্তর করলেন। থামলেন। না, থেমে থাকাটা কিছু না, তিনি চিন্তা করলেন। ও সাহস করে কথা বলেছে, আমি বা চুপ থাকি কেন। প্রশ্ন করলেন : 'তুমি?'

'আমি বেকবাগানের মোড়ে নামব।'

'অ—' বলে চারুবাবু সামান্য মাথা ঝাঁকান। আবার থেমে থাকেন। ভিতরে ভিতরে হতাশ হন। তবে তো তাঁর আগেই ও ট্রাম থেকে নেমে যাচ্ছে। তাঁর নিজের গন্তব্য গড়িয়াহাট।

আর ঝুঁকে থাকেন না, সোজা হয়ে বসেন চারুবাবু। হাই তোলেন।

কিন্তু যুবতী এমন ফ্যালফ্যাল করে তাঁকে দেখছে, যেন কিছু একটা জানতে চাইছে।

'আমায় কিছু বলবে?' চারুবাবু আগ্রহী হয়ে ফের প্রশ্ন করেন।

'আচ্ছা, ঝাউতলা রোড থেকে হলে আমাকে বেকবাগানে নামতে হবে, তাই না?' ঘাড় ঝুঁকিয়ে ও প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ'। চারুবাবু মাথা নাড়লেন।

মুখ নিচু করে তরুণী হাতের নখ খুঁটতে থাকে। দু হাতের দুটো বুড়ো আঙুলের নখ রং করা। দুটোই কালচে। দেখে চারুবাবুর ভাল লাগল। সবকটা নখে রং থাকলে সৌন্দর্যটা একঘেয়ে ঠেকত।

'তুমি কোথায় থাক?' চারুবাবু তক্ষুণি বুঝতে পারেন এদিকের মেয়ে নয় ও।

'কদমতলা।' যুবতী মুখ তুলল।

'ওরে বাবা! সে তো অনেক দূর, হাওড়া হয়ে যেতে হয়, তাই না?'

'হুঁ।'

'তাহলে তাহলে—' চারুবাবু আমতা আমতা করেন। 'ঝাউতলা রোডে তোমার কোনো আত্মীয় থাকেন বুঝি? বান্ধবী কেউ!'

'না', আস্তে বলল ও, 'ঝাউতলা রোড ধরে আরো খানিকটা এগোতে হবে আমাকে, দিলখুশা স্ট্রীটের দিকে, খানিকটা হাঁটলে একটা আকাশী রঙের বাড়ি চোখে পড়বে। চারতলা।'

'তা হবে।' চারুবাবু ঘাড় বেঁকালেন। 'সেখানে কি?'

'ঐ আকাশী রঙের বাড়ির নাক বরাবর একটা ছোট্ট রাস্তা বেরিয়ে গেছে। শিপ্রা রাস্তার নামটা বলেছিল আমাকে। ভুলে গেছি।'

'শিপ্রা কে?'

'ও-ও স্কটিশের মেয়ে। আমরা এক সঙ্গে পড়ি।'

'বুঝতে পেরেছি—তারপর?'

'ঝাউতলার ওই সরু রাস্তাটায় একটা শিবমন্দির আছে। ভীষণ জাগ্রত ওই বুড়ো শিব। শিপ্রা বলছিল, খুব পুরোনো মন্দির।'

এই সেরেছে! চোখের তারা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল চারুবাবুর। 'তুমি কি শিব-মন্দিরে যাচ্ছ?'

অল্প করে ও মাথা নাড়ল। হাওয়ার ঝাপটায় আবার কিছু চুল ওর চোখে মুখে এসে উড়ে পড়েছে। হাত দিয়ে ও সরিয়ে দেয়।

চারুবাবু মনে মনে হাসেন। স্কটিশে পড়ছ। ছেলেদের মতন তোমার পোশাক। বব করা চুল। চমৎকার রং করা দু'হাতের দুটো লিটল ফিঙ্গার। তাহলে হবে কি। বাঙালী মেয়ের ভক্তিটুকুটা ঠিক আছে। মনের মতন বর পাবে বলে বুড়ো শিবের কাছে ধন্না দিতে ছুটে এসেছ নাকি!

■ কি চারুবাবুর ভিতরের হাসিটা টের পায়। একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায় যেন। মনে হয় হরিণ চোখে থমথমে খানিকটা মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার ও জানালার দিকে চেয়ে থাকে। মুখটা অতিশয় করুণ দেখায়।

সেই মুহূর্তে ট্রাম আর একটা স্টপে এসে দাঁড়ায়। কেউ উঠল না। কেউ নামল না। জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে কণ্ডাক্টর গাড়ি ছেড়ে দিল। ইতিমধ্যে বুড়ো যে আরও বেশি রেগে গেছে চারুবাবুর বুঝতে কষ্ট হয় না। এক নাগাড়ে এতক্ষণ চারুবাবু অত সুন্দর চেহারার মেয়েটার সঙ্গে কথা বললেন। অথচ সে কোনো সুযোগই পাচ্ছে না। বেচারার মনে কষ্ট হবার কথা।

যাই হোক, কণ্ডাক্টারের কথা আর না ভেবে চোখ আড় করে চারুবাবু সহ-যাত্রিণীকে শুধু দেখেন। ভীষণ চুপ করে আছে ও। এর পর কি বলা যায়, কি বলতে পারলে ভাল হয় চারুবাবু চিন্তা করেন। তারপর বলার মতন কথা খুঁজে পান। আগের মতন বাঁয়ে ঝুঁকে বসেন।

'সামনে আর দুটো স্টপ, তারপর আমরা বেকবাগান পোঁছে যাব।'

'ও, তবে তো প্রায় এসে গেছি।' ব্যস্ত হয়ে মেয়েটি এদিকে মুখ ফেরাল। 'স্টপটা এলে কাইণ্ডলী আমাকে বলবেন কিন্তু।'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' চারুবাবু খুশি হন। তারপর গম্ভীর হয়ে বলেন, 'অচেনা জায়গা—এই প্রথম তুমি এদিকে আসছ, তোমার সেই বান্ধবীর, কি যেন নাম, শিপ্রাকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভাল হত নাকি?'

'সেরকম কথা ছিল। কিন্তু ও আসতে পারলে না। শরীর খারাপ করেছে। কাল আমায় ফোন করেছিল।' একটা ঢোক গিলল যুবতী।

কথাটা বলার সময় ওর কান গাল লাল হল না। দেখে চারুবাবু তৃপ্তি পান। এখনকার মেয়েরা বড্ড সরল।

'শিপ্রা বলছিল', যুবতী আবার বলল, 'এখানে পুজো দিলে খুব ফল পাওয়া যায়। ওর কাঁকুলিয়া রোডের মাসিমা ওকে এই মন্দিরের খোঁজ দিয়েছে। এই শিবকে প্রণাম করে মনে মনে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।'

বটে! চারুবাবু আর অবাক হন না। মনে মনে হাসেন। নিশ্চয় তোমার গুরুতর কিছু চাওয়ার দরকার পড়েছে থুকি। শিব ঠাকুরকে তুষ্ট করে অভীষ্ট বরটি আদায় না করা তক তোমার আহার নিদ্রা বন্ধ। তাই কদমতলা থেকে ঝাউতলা ছুটে আসা।

না, এই জন্য এদের নিন্দা করা যায় না। চারুবাবু তক্ষুনি আবার ভাবেন। এ যুগের মেয়েরা সব কিছুতেই আছে। সবই এদের ভাল লাগে। নিত্য চোখে তো দেখেন। মড হিপিনীদের মতন পোশাক পরতে যেমন এদের উৎসাহ, তেমনি মা মাসিদের কাছে উপহার পেয়ে বেনারসীও বেশ খুশি হয়ে পরে। সুআকছার সিভিল ম্যারেজ করছে, বাড়িতে অনুমতি পেলে আহ্লাদে হয়ে ছাদনাতলায়ও বসছে।

তাই সেদিন বালিগঞ্জ পার্কে রিটায়ার্ড ভদ্রলোক আর এক রিটা বুড়োকে বলছিলেন। পাশের একটা চারুবাবু তখন বসা। 'সব কিছুর পেতে চায় এরা। বুঝলেন মশাই, ছাড়ে না। একটা বিয়েই দুভাবে সা পারলে এখনকার মেয়েরা খুশি হয়।'

'হুঁ, খুশি হয়।' দ্বিতীয় ভদ্র বলছিলেন, 'এরা গাছেরও খায় তল খায়। ছেলেদের মতন চুল ছাঁটছে, নাক ছেঁদা ক'রে ফুলও পরছে। রেস্তোরাঁয় ঢুকে চিকেন চাউলিন আবার শনিপুজো সত্যনারায়ণ পু ডাকুন, দেখবেন লক্ষ্মী মেয়ে সেজে বেঁধে কেমন প্রসাদ নিতে আসে। প বন্ধুদের সঙ্গে পুরী দীঘায় প্লেজার সেরে এসে পরদিনই ঠাকুমা দিদিমা সঙ্গে তারাপীঠ বক্রেশ্বর তীর্থে ক ছুটল। এ-ও দেখা গেছে। এদের ধ ধারণ দেখে তাজ্জব বনতে হয়।'

'স্বাভাবিক।' প্রথম ভদ্রলোক হা লাঠিটা মাটিতে ঠেকিয়ে। 'এদের প্রাণ বেশি। হুঁ প্রাণশক্তি যা আমাদের গি বান্ধবীদের মধ্যে [illegible] দম নেই। চিব উনিরা জবুথবু [illegible] মানুষ হয়েই থাকলেন। চিনতে কেবল নিজেদের বাস আর শোবার ঘর। এখনকার নানাভাবে জীবনটাকে দেখছে। তাই ঝল করছে সারাক্ষণ। চারদিকে ছড়িয়ে আ সব কিছুতে দারুণ উৎসাহ।'

'দারুণ উৎসাহ, রসে টসটস করছে প্রা দ্বিতীয় ভদ্রলোক মুখ বেঁকিয়েছিলে [illegible] বেঁকিয়েছিলেন। 'বলুন আগ ভেতরে আগুন নিয়ে অষ্টপ্রহর টগবগ ফুটছে একালের বিদ্যেধরীরা। তুবড়ির হয়ে ফেটে পড়ছে কোনোটি। এদের স গ্রাসী ক্ষুধা মশাই, এদের সব কিছু চ দেখলেন না একটা আন্তর্জাতিক নারী ফেঁদে কী হুলুস্থুল কাণ্ডটাই না বাধি তুলেছিল। দুনিয়ার বেটাছেলেদের বি সিম খাইয়ে ছেড়েছে।'

এর মধ্যেও আগুন আছে, ছটফট আছে। কিন্তু চাপা। ঝলমলে ভাবটা নেই। বরং মনে যেন একটা বিষাদ-দ এসে বাসা বেঁধেছে। তাই বুঝি ক্ষণে ক্ষ এমন বিমনা হয়ে যাচ্ছে। বাঁয়ে লেডি সীটের দিকে চোখ রেখে চারুবাবু প্র থেকে লক্ষ্য করছেন।

ভাল কথা, তক্ষুনি আর এব জিনিসও তাঁর মনে পড়ে যায়। আজ ত

...ক এ শীল্ডের ফাইন্যাল ম্যাচ-খেলা। ...জার দোকানে বসে দেখছিলেন সেই খেলা ...রোটা থেকে। ছেলেদের সঙ্গে মেয়েরাও ...তারে কাতারে ছুটছে ময়দানে খেলা ...খতে। ট্রামে বাসে কী সাংঘাতিক ভিড়! ...ই জন্যই এদিকের গাড়িগুলি আজ এক-...ম ফাঁকা। সব যাচ্ছে মাঠের দিকে। চশমার ...দোকানেই একজন বলছিল, ছেলেদের মতন ...জার গণ্ডা ছুঁড়ি সেই শেষ রাত থেকে ...য়দানে লাইন দিয়েছিল খেলার টিকিটের ...জন্য। দিন দিন খেলার উৎসাহ এদের ...অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যাচ্ছে। তা কেবল ...তা খেলা দেখা নয়, কদিন আগে চারুবাবু ...কাগজে দেখেছিলেন কলকাতায় মেয়েদেরও ...ফুটবল টিম তৈরী হয়ে গেছে। হাফ প্যান্ট ...পরে মাঠে নেমে তারা জোর ফুটবল ...প্র্যাকটিস করছে।

কাজেই ভয়ানক কৌতূহল হল চারু-...বাবুর। আজ ময়দানের এমন হই-রই ব্যাপার ...ফেলে এই ভরদুপুরে একা একটা ফাঁকা ...ট্রামে চেপে এই শ্রীমতী ছুটছে কোন এক ...বুড়ো শিবের কাছে। কারণ কি! কথাটা ...জানতে ভীষণ উসখুস করছিলেন তিনি। ...সরাসরি জিজ্ঞেস করেন আর কি করে। তাই ...বেশ একটু সতর্ক হয়ে শেষ পর্যন্ত ঠোঁট ...দুটো সামান্য সরু করে মুখে একটা ...হাসির আভাস ফুটিয়ে তুললেন।

'আমার মনে হয় সামনে তোমাদের ...এগজামিন। তাই ঠাকুর দেবতায় ওপর হঠাৎ ...ভক্তিটা বেড়ে গেছে।'

যুবতী গম্ভীর চোখে চারুবাবুর মুখটা ...দেখল। বুদ্ধিমতী সন্দেহ কি। এই পাকা ...চুলের ঝানু মানুষটি যে মনে মনে এক ...জিনিস ভাবছে, এবং চালাকি করে মুখে ...আর এক কথা বলছে—টের পেতে ওর এক ...সেকেণ্ড দেরি হয় না। এবার সরষের দানার ...মতন ওর ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি উঁকি ...দিল। তারপর উদাস গলায় বলল, 'সত্যি ...খুব ভয় করছে। সামনে একটা টার্মিন্যাল ...পরীক্ষা। আমাদের ইংলিশের প্রফেসার জে ...এন যা কড়া না! কি যে করি, একদম ...প্রিপারেশন নেই।'

চারুবাবু একেবারে জব্দ। আজকের ...মেয়েদের সঙ্গে চালাকি করে তুমি পারবে ...কেন হে বুড়ো। নিজের মনে বলেন।

কাজেই এই নিয়ে আর ঘাটাঘাটি না ...করে মুখের হাসিটা বজায় রেখে সঙ্গে ...সঙ্গে বললেন, 'আমার খুব ইচ্ছে করছে ...শিবমন্দিরটা একবার দেখে যাই। এত কাছে ...এমন এক জাগ্রত শিবঠাকুর বসে আছেন।'

'খুব ভাল হয় তা হলে,' ও খুশি হয়। ...'আপনার সময় হবে?'

'নিশ্চয়, রিটায়ার্ড মানুষ—আমার আর ...কাজ কি। সারাদিন বেড়িয়ে বেড়াই।' চারু-...বাবু এবার আহ্লাদে গদগদ হন। 'আর দুটো স্টপ পরে আমি নামতাম—গড়িয়া-হাট। না হয় এখানেই তোমার সঙ্গে নেমে যাই।'

বেকবাগান এসে গেল।

ওর সঙ্গে যখন ট্রাম থেকে নামেন চারুবাবু টের পান পিছন থেকে বুড়ো কণ্ডাক্টার ফুটবোর্ডের কাছে ঝুঁকে ওয়াক থু করে এতটা থুথু ফেলল, তারপর জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। তিনি ফিরেও তাকান না।

সত্যি এ দিনের তুলনা নেই। ওর কম বয়সের তেজী হাঁটার সঙ্গে তাঁর ভারি বয়সের হাঁটা পাল্লা দিতে পারে না। কষ্ট হচ্ছিল। তা হলেও চেষ্টা করছিলেন ওর কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলতে। তাঁর মনে হচ্ছিল কি কোনোরকম কসমেটিকস-এর গন্ধ না, সদ্য পেকে ওঠা আতা ফলের গন্ধের মতন একটা মিষ্টি দুধ দুধ গন্ধ ওই ঝকমকে শরীর থেকে উঠে আসছে। কী যে ভাল লাগছিল। তার ওপর টাটকা ভাজা ভুট্টার খৈ-এর মতন ফুরফুরে রোদ চার-দিকে ছড়িয়ে। ইলশেগুঁড়িটা একেবারে থেমে গেছে। বাতাসে তিজে ঠাণ্ডার আমেজ। তাসের মতন অগুনতি সাদা ছোট ছোট মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়।

একটা কথা, যুবতীকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার তাঁর মনে হল, এ যেন সেই চিরকালের গর্বিতা নারী মুনিঋষি-রাও যাকে দেখে প্রলুব্ধ হয়। পরমুহূর্তে তাঁর মনে হল নিজের সন্তানের মতন মেয়ের মতন একটি খুকি।

বস্তুত কী চোখে যে একে দেখলে

মন, প্ল্যরোপুরি ভরে উঠবে তিনি কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলেন না। পৃথিবীর তাবৎ বাতিল বিকৃত বঞ্চিত বৃদ্ধেরই বোধ করি এই দশা হয়, তিনি চিন্তা করলেন। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কোনো নারীর খুব কাছাকাছি চলে এলে বাৎসল্য রসের সঙ্গে আদিম কামনা বাসনাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা সৃষ্টি করে বুকের ভিতর।

ও রিকশার প্রস্তাব করে। তিনি তা আমল দেন না। তার মানে ঐ জ্বলন্ত যৌবনের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রিকশায় বসতে সাহস পান না। হেসে বলেন, 'ওইটুকুন রাস্তা—দিব্যি হেঁটে যাওয়া যাবে।'

ওর বান্ধবী যেমন বলেছিল। ঝাউতলা রোড ধরে খানিকটা এগিয়ে মস্ত আকাশী রঙের বাড়ি পাওয়া গেল। বাড়ির সামনে দিয়ে একটা সরু রাস্তা বেরিয়ে গেছে। ঐ রাস্তায় ঢুকে কয়েক পা হাঁটতেই তাঁরা শিব মন্দিরে পৌঁছে গেলেন। উঁহু, ইট সিমেন্টের পাকা মন্দির নয়। খড়ের ঘর।

তাজ্জব শহর কলকাতায় সবই সম্ভব। চারদিকে পাঁচতলা ছতলা—আরও বেশি, আট দশতলা নিয়ে জাঁদরেল সব বাড়ি। ওদিকের রাস্তায় অনবরত ট্রাম বাস ছুটছে। এদিকের রাস্তায় লরী প্রাইভেট ট্যাকসি রিকশার আনাগোনা, লোকজনের হৈচৈ। মাঝখানে ছিমছাম নিরিবিলি এক গলির ভিতর একটা খড়ের চালা দাঁড় করিয়ে চমৎকার শিবমন্দির বানান হয়েছে। খাঁটি পাড়াগাঁ-র ছবি মনে করিয়ে দেয়।

মন্দিরের দরজা খোলা। ভিতরে কালো কুচকুচে শিবলিঙ্গ চোখে পড়ল। এই বুঝি জাগ্রত ঠাকুর। চারুবাবু মনে মনে হাসেন। এখন কোনো লোকজন নেই এখানে। জায়গাটা দারুণ ফাঁকা। হয়তো সন্ধ্যার দিকে আরতিটারতি হয়। তখন মন্দিরের সামনে ভক্তেরা ভিড় করে। নিশ্চয় কাঁসরঘণ্টাও বাজে। কাছেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ ডালপালা ছড়িয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া ফেলেছে। ওই ছায়ায় বসে দুটো ছাগল নিশ্চিন্তমনে পাতা চিবোচ্ছে। সামান্য বাতাস বইছে কি অশ্বত্থ পাতার সরসর শব্দ হচ্ছে।

এক ফেরিয়ালা কুলপি বরফ হেঁকে হলদে রঙের একটা তিন চাকার গাড়ি চালিয়ে গলির রাস্তা ধরে চলে গেল।

তারপর জায়গাটা আরও বেশি নির্জন মনে হতে লাগল।

ওর দেখাদেখি জুতো ছেড়ে চারুবাবু মন্দিরের দাওয়ায় ওঠেন। এখন ভিতরটা পরিষ্কার দেখতে পান। কোষাকোষি রয়েছে, কিছু শুকনো ফুলবেলপাতা ছড়ান। একটা থালায় কটা খুচরো পয়সা পড়ে আছে। পুজারী বামুন কখন পুজো করতে আসে কে জানে। চারুবাবু চিন্তা করেন। রাস্তার ধারের আর পাঁচটা মন্দিরের মতন এই মন্দিরেরও একজন নির্দিষ্ট পুজারী থাকবে জানা কথা।

প্রণামটা সেরে তিনি সোজা হয়ে বসেন। ওর জন্য অপেক্ষা করেন। কিছু সময় তাঁকে অপেক্ষা করতেই হবে—এটা তিনি জানতেন। কারণ তাঁর মতন মন্দিরের দরজায় একবার শুধু কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে এখান থেকে চলে যেতে যুবতী এতটা পথ ছুটে আসেনি। এই শিবের কাছে ওর অনেককিছু, হয়তো সাংঘাতিক কিছু চাওয়ার আছে, বলার আছে।

মেঝেটা মাটির। তাহলেও রীতিমত আসনপিঁড়ি হয়ে স্থির হয়ে বসে চারু-বাবু ওর দিকে চেয়ে থাকেন। ধ্যানমগ্না হয়ে আছে যুবতী। আশ্চর্য ছবি। পাথরের বিগ্রহের সামনে নিটোল সোনার মূর্তি চোখ বুজে। এখানে হাওয়া নেই। বোগেনভিলার পাপড়ির মতন ওর ফুরফুরে পাতলা চুলের একগাছিও এখন নড়ছে না। বুকের কাছে ঠেকান অঞ্জলিবদ্ধ দুটো হাত। রং করা ছুঁচলো নখের আঙুল দুটো অবিকল রক্তকরবীর পাপড়ির মতন দেখায়।

এই জীবনে শিবমন্দির কালীমন্দিরে খুব একটা এসেছেন কি, কালেভদ্রে যদি এসেও থাকেন ঠাকুরদেবতার সামনে এতটা সময় বসে থেকেছেন চারুবাবু মনে করতে পারলেন না। আজ তিনি ধৈর্যে পাহাড় হয়ে এখানে বসেছেন। বসতেই হবে। ওর ধ্যান ভাঙুক। তারপর তিনি উঠবেন। তারপর মেয়ে বাড়ি ফিরবে। ওকে ট্রামে তুলে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত।

আসলে কি তাই। মিথ্যুক কাহাকার! বুড়ো বয়সে বুজরুকি রাখ তো হে চারু-চন্দ্র। ধমক লাগান নিজেকে। চকচকে মৌরালা মাছের মতন এক ঝাঁক কৌতূহল তোমার বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ ঝিলিক দিচ্ছে। ওই কাঁচা বয়সের মানুষটির মনে গোপন কোন্ কামনা লুকোনো আছে না জানা তক বুড়ো ঘোষ তুমি ঠান্ডা হচ্ছ না। ওর শরীরে বসন্তের কলকাকলি আরম্ভ হয়েছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ, নতুন লতাপাতা ফুল কুঁড়ির গন্ধ নিয়ে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ও সুগন্ধী হয়ে উঠেছে। কাজেই—

তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না কেবল কলেজের এগজামিনের দু[illegible] ওর—আর তাই উথালপাথাল হয়ে [illegible]র ধ্যান করতে এসেছে।

কিন্তু ভিতর থেকে ধমক ও গালাগাল খেয়েই কি নিজেকে সংশোধন করতে পারলেন তিনি। পারলেন না। ভীমরতি ধরার বয়স হলে যা হয়। একটা ছেলে-মানুষি জেদ নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নবযৌবনার ভুরু নাক কাঁধ চিবুক স্তন পিঠ ঊরু—এইসব দেখতে লাগলেন। যেন ওপর থেকে ভিতরটা বুঝতে চাইছিলেন। মাঝে মাঝে হাতের ঘড়ির দিকে তাকান।

তারপর এক সময় চমকে ওঠেন। যুবতীর চোখের কোনায় জল। অবিকল দুটো মুক্তা হয়ে টলটল করছে।

দৃশ্যটা ভারি সুন্দর। পবিত্রও বটে। চারুবাবু রীতিমত অভিভূত হন। চোখের পলক ফেলতে ভুলে যান।

ঠিক সেই মুহূর্তে এক সঙ্গে দুটো ব্যাপার ঘটল। ও চোখ মেলে তাকাল, শিবলিঙ্গের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চারুবাবুর মুখটা দেখল এবং কোমর থেকে ছোট্ট রুমালটা টেনে নিয়ে চোখ মুছল।

ঐ লাল টুকটুকে সিল্কের রুমালটাই দায়ী। চারুবাবু পরে চিন্তা করেছেন। যখন চোখের জল মোছে তখন ওর শরীরের মিষ্টি দুধ দুধ গন্ধ, মন্দিরের ফুলবেলপাতার গন্ধ, এমন কি পাথরের বিগ্রহ থেকে এতক্ষণ যেমন ধূপচন্দনের একটা ঠাণ্ডা সৌরভ উঠে আসছিল—সব রুমেবের মধ্যে চাপা পড়ে গিয়ে কসমেটিক অর্থাৎ স্নো পাউডারের একটা মিষ্টি আঁখীন গন্ধ নাকে লাগে। ফলে পুজো আচ্চা ধ্যান অশ্রু ভয় ভক্তি দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদি মিলিয়ে যেমন একটা গুরুগম্ভীর আবহাওয়া এতক্ষণ থমথম করছিল সেটা কেটে গেল। তার জায়গায় চড়ুই পাখির মতন কোথা থেকে একটা হালকা পরিবেশ উড়ে এল।

তাই না চোখমোছা শেষ করে রুমালটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে অল্প করে মেয়েটি হাসল। বাঁধান দাঁত ছড়িয়ে চারুবাবু হাসেন।

'হাসছেন কেন?' ও প্রশ্ন করল।

'তুমি ধরা পড়ে গেছ।'

'কি রকম?' সামনের ভুরু কুঁচকোয়। ঠোঁটের হাসিটা ফুটল।

'হুঁ হুঁ।' চারুবাবু তাঁর বাঁধান দাঁতের হাসি আরও উজ্জ্বলতম করে তোলেন। আমি ঠিক ধরেছি—সব বুঝে গেছি।'

'তাই বুঝি মন্দিরে এসে শিবঠাকুরকে দেখে এতক্ষণ কেবল আমাকে দেখছিলেন।'

'তুমি টের পেয়েছিলে?'

'খুব। এখন কেন। ট্রামে আসতে আসতে টের পেয়েছি। তুমি বড্ড লোভী বুড়ো।' যেন খুব পরিচিত আদুরে গলায় মনের সুরে বলল ও।

হঠাৎ 'তুমি' সম্বোধন! চারুবাবুর বুকের ভিতর প্রথম ধড়াস করে উঠল পরক্ষণে অবশ্য তৃপ্তি পান। ভাবেন, এতক্ষণ এক সঙ্গে আছি দুজনে। ইতিমধ্যে বুড়ো 'তুমি' ইত্যাদি বলার রাইট জন্মেছে কি এর। এখানেই আন্তরিকতা। খুশি হয়ে তিনি তখন ঘাড় নাড়েন।

'সেটা কি দোষের হল। ব্রাইট গার্ল, এমন গ্রেসফুল ফিগার তোমার, আর ঐ নবদ্য রং। তোমাকেই তো দেখব। পাথরের শিবলিংগ দেখে আমি করবটা কি। আমার অত ভক্তিছেদ্দা নেই।'

'উঠুন।' আসন ছেড়ে ও উঠে দাঁড়ায়। অসামান্য গম্ভীর। কিন্তু চোখে মুখে একটা লজ্জা মেশানো ভাব। রূপের প্রশংসা শুনলে সব মেয়ের যা হয়। দেখে চারুবাবু খুশি।

'এখন বাড়ি ফিরবে?'

'সেরকম ইচ্ছে, আমার কাজ হয়ে গেছে।' আস্তে বলল ও।

'চলো তোমায় ট্রামে তুলে দেই।'

'চলুন।'

দাওয়া থেকে নেমে ও ওর বেঢপ মোটা সোলের জুতোটা পরে নেয়। এতক্ষণ খালি পা, পায়ের পাতা দুটো কত সুন্দর দেখাচ্ছিল। কোনো কোনো মেয়ের পা-ও যে এত লোভনীয় তাঁর ধারণা ছিল না। চারুবাবু নুয়ে তাঁর বেল্টের জুতোর হুক আটকান এবং সেই অবস্থায় বলেন, 'তুমি যে আমার কাছে কি ধরা পড়ে গেছ তা শুনলে না কিন্তু।'

'হুঁ, শুনব বৈকি, বা—রে। এই জন্যই তো এক সঙ্গে বেরোনো।' ঠোঁটে মোচড় দিয়ে আবার একটু হাসল ও।

'কিন্তু বলব যে—যদি শুনে তুমি আমার ওপর রাগ করো?' চারুবাবু সোজা হয়ে দাঁড়ান। ওর চোখ দেখেন।

'তা হলে বলবেন না।'

'না, তা আমাকে বলতেই হবে— না বললে আমি শান্তি পাব কেন।'

'বলুন তবে।' ও অপেক্ষা করে।

চারুবাবু গুজগুজ করে হাসেন।

চশমার ভিতর চোখের মণি চিকচিক করে। তারপর গম্ভীর হয়ে যান। এদিক ওদিক দেখেন। তারপর, যেন ভারি গোপন কথা, খাটো গলায় বলেন, 'আসলে এগজামিন ফেগজামিন কিছু না। তোমার মনে অন্য কষ্ট। তোমার বয়-ফ্রেন্ড তোমার কথা শুনছে না। তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে। তাই শিবের কাছে এসে নালিশ করছিলে।'

প্রথমটা থমকে থাকে ও। হরিণের মতন টলটল করে তাকায়। যেমন ট্রামে একবার তাকিয়েছিল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সেই সঙ্গে ঠোঁটে একটা বিষাদের হাসি ঝুলিয়ে দিল।

'ইস, কী ভীষণ দুষ্টু তুমি বুড়ো। এই বয়সেও এত রস তোমার। পাইন্-অ্যাপল্-এর মতন রসে টসটস করছে ভেতরটা।'

'মিছে বললাম?' চারুবাবু উৎসাহে গদগদ হয়ে ওঠেন।

'খবরদার! আর বলবে না।' ও চোখ পাকায়। 'তা হলে এক্ষুনি ওই শুকনো নাকটা কানটা ঠিক মলে দেব।'

'তাই দাও তাই দাও।' চারুবাবু সামনের দিকে গলাটা বাড়িয়ে দেন। 'ওই ফরসা নরম হাত আমার শুকনো নাকের

ওপর কানের ওপর রাখো। একটু বেশিক্ষণ ধরে রাখো। আমার চল্লিশ বছর বয়েস কমে যাবে। আমি আবার গাট্টাগোট্টা জোয়ান ছেলে হয়ে উঠি।'

'ওরে ব্বাস্, তবেই হয়েছে!' যেন ও ভয় পায়, শিউরে ওঠে, এমন একটা ভঙ্গি করল। যেন হাত বাড়িয়ে বুড়োর নাক কান ডলতে যাচ্ছিল, হাতটা তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে নিল। 'দরকার নেই তোমাকে জোয়ান করে। এই নিরালায় ইনোসেণ্ট গার্ল পেয়ে তক্ষান তুমি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, আমাকে মলেস্ট করতে চাইবে, রেপ করতে চাইবে।' বলে ও হাসল। চারুবাবু টেনে টেনে হাসেন।

'এই দ্যাখো। যেন আমরা সেই বারবেরিয়্যান এজ-এ রয়ে গেছি—যেন জল থেকে উঠে আসা এক দুর্ধর্ষ পাইরেট হব আমি—কামোন্মত্ত টার্টার। উঁহু, টুয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরি শেষ হতে চলল। তোমার হাতের ছোঁয়া পেয়ে আমি যে তখন একটি ফাইন ইয়াংম্যান—চুল থেকে নখ পর্যন্ত আমার ভদ্রতার পালিশ। বড়জোর তোমার হাতে একটু চাপ দিয়ে একটা কিস্ করবার জন্য রিকোয়েস্ট জানাব—'

'স্টপ।' ভুরু টান করে যুবতী আস্তে ধমক দেয়। জোরে হাসতে গিয়ে চারুবাবু থেমে যান। আড়ষ্ট হয়ে পড়েন। কেউ এসেছে বুঝি! আইসক্রীমের গাড়ি নিয়ে সেই ফেরিওয়ালাটা? না, ঘাড় ঘুরিয়ে অবাক হন। অশ্বত্থ তলায় এক পাখিওয়ালা এসে দাঁড়িয়েছে। তার কাঁধের বাঁকের দুদিকে ছোটবড় নানারকম খাঁচা। রঙবেরংয়ের পাখিতে বোঝাই। ব্যস্ত হয়ে যুবতী সেদিকে পা বাড়ায়।

মুশকিল! ক্ষুণ্ণ হন তিনি। এমন রসাল প্রসঙ্গটা ছেড়ে ও ছুটল পাখি দেখতে। একেই বলে চপলমতি বালিকা। চারুবাবু বিড়বিড় করেন।

উঁহু, শুধু পাখি দেখা নয়, রীতিমত দরদাম করছে মেয়ে। চোখ গোল করে চারুবাবু তাকিয়ে থাকেন। একটা ময়না পছন্দ হল ওর। পাখিওয়ালা দাম বলতে পকেট থেকে ও টাকা বের করে দেয়। খুশি হয়ে খাঁচাসুদ্ধ ময়নাটা ওর হাতে তুলে দিয়ে পাখিওয়ালা চলে যায়।

আর ও সেখানে দাঁড়িয়েই ওর ময়নাকে আদর করতে থাকে। পাতলা লাল ঠোঁট সরু করে চুমু খায়। দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলে। চুম্বনের অপূর্ব ভঙ্গি।

চারুবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটেন। মোগল আর্টে আঁকা একটা ছবি কবে যেন দেখেছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে। নূরজাহান না যেন মমতাজের হাতে বুলবুলি। এমন করে আদর করছে।

তারপর খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে ও ফিরে এল।

'হঠাৎ ময়না!' চারুবাবু শুধোন।

'হুঁ, চলুন হাঁটতে হাঁটতে বলা যাবে।'

গলি থেকে বেরিয়ে দুজন বড় রাস্তায় উঠে আসে। রাস্তার ওধারে রোদ এপাশে ছায়া। ছায়া ধরে ধরে তারা ট্রাম লাইনের দিকে এগোয়। এখন রোদের তেজ কম। হাওয়ার জোর বেশি।

'হঠাৎ ময়নার শখ?' চারুবাবু আবার বলেন।

'হুঁ এই আমার বয় ফ্রেণ্ড।' চোখ ঘুরিয়ে ও এদিকে তাকায়, হাসে। 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন তখন। বয়-ফ্রেণ্ড কাল বিকেলে খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। মনের কষ্টে সারারাত কেঁদেছি। আজ দেখুন শিবঠাকুরের কাছে এসেই ওকে পেয়ে গেলাম।'

'ভারি চমৎকার! ভারি চমৎকার!' চারুবাবু গলার নিচে খুকখুক শব্দ করে হাসেন।

'কেন, আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?'

'খুব খুব।' চারুবাবু মাথা ঝাঁকান। 'বিশ্বাস না করে পারি? চোখের ওপর তো দেখলাম তোমার বয় ফ্রেণ্ড ফিরে এসেছে। আমি বেজায় খুশি।'

'উঁহুহুহু, উম্হুহুহু, মানিক আমার সোনা আমার—' আবার ও লাল টুকটুকে ঠোঁট বাড়িয়ে দেয়। খাঁচার ভিতর হাত ঢুকিয়ে পাখিটাকে টেনে এনে করে এক সঙ্গে দু-তিনটে চুমো খায়।

সোহাগ করতে জানে বটে! ড্যাবড্যাব করে চারুবাবু চেয়ে থাকেন। চুমো খেতে গিয়ে ওর মাথার চুল ঝড়ো বাড়ি খাওয়া কেয়াঝোপ হয়ে এলোপাথাড়ি উড়ছে নড়ছে, শরীরে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলছে। এই দৃশ্য কতকাল দেখেন না তিনি। পর পর দুটো চাপা গরম নিশ্বাস ফেলেন চারুবাবু।

আদর করা সেরে আবার ও হাঁটে। চারুবাবু হাঁটেন।

'এবার থেকে আমি ওকে বেশি করে আদর করব, ভালবাসব, এদিকে মুখ না ফিরিয়ে বলে ও।

'বাসতেই হবে। বেশি করে আদর দিয়ে বেটাকে বশ করতে হবে।' সরস গলায় চারুবাবু বলেন, 'তবেই তো আর পালাবে না।'

উঁ হু হু হুঁ উঁ হু হু হু মানিক আমার সোনা আমার ডিয়ার ডার্লিং। কানের কাছে ঘুঙুর বাজে। চারুবাবু চুপ করে হাঁটেন।

হাঁটতে হাঁটতে দুজন ট্রাম-স্টপে এসে গেল। ফাঁকা। ট্রাম ধরতে এখানেও লোক নেই।

'বুঝলেন', আবার ও বলে, 'মন্দিরে আপনার কথা শুনে তখন ভয়ানক চমকে উঠেছি। ভাবলাম আপনি বুঝি সেই সব বয়-ফ্রেণ্ডের কথা বলছেন। শুনে আমার গা শিরশির করছিল।'

'তাই নাকি!' অবাক হবার চেহারা করেন চারুবাবু।

'হুঁ, তাই।' এদিক ওদিক তাকায় ও। টিপটিপ হাসে। 'বয়-ফ্রেণ্ড—ছেলেবন্ধু! কেন কোন দুঃখে ওদের দিকে হাত বাড়াব।' বলতে বলতে ওর চোখের কোণা চিকচিক করে উঠল।

এবার চারুবাবু টিপে টিপে হাসেন। জুলজুল করে শ্রীমতীকে দেখেন। কাউবয় সার্টপ্যাণ্ট, ছেলেদের মতন চুল। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা! দামোদরের বন্যা হয়ে যৌবন উপচে পড়েছে। কিছু বলতে গিয়ে তিনি থেমে যান। শুকনো ঠোঁটের কাছে লালা জমতে থাকে।

'আমি জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না বুড়ো।' চোখে জল নিয়ে ও হাসে, অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে। 'বড্ড নোংরা ছেলে তুমি। বয় আর গার্ল—ছেলে ও মেয়ে—লভ কিস—তোমার মগজে কেবল এইসব।'

অপরাধীর চোখ করে চারুবাবু হাসেন।

'মাইয়োলজী, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি এখনো সেকস-কনশাস হইনি। একটি বয় ফ্রেণ্ডও আমায় টানছে না। না!'

ট্রাম এসে যায়। এই হাতে খাঁচা। ঐ হাতের পিঠ দিয়ে ও চোখ মুছল। এবার আর রুমাল না।

'বাবা আমায় ডাকে ডলু—কখনো বলে বিগ ডলু, মা ডাকে বেবি—কখনো খুকু।' খসখসে শোনায় ওর গলার স্বর। যেন শরবনের ভিতর দিয়ে খরগোস পালায়। কথা পাওয়া দার্জিং অর্গ্যানের সুর চারুবাবু টের পান।

'চলি!' শেষবারের মতন তাঁর চোখের দিকে তাকায় ও। যেন আড়াই বছরের শিশু তিনি। জুঁইফুলের মতন আবার এক মুঠো হাসি উপহার দিল। 'বাই বাই—টা-টা।'

ওর দেখাদেখি চারুবাবু হাত তোলেন, ঘাড় কাত করেন। কাঠবেড়ালীর মতন একটা লাফ দিয়ে ও ট্রামে উঠে পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তারপর ফুটপাথে উঠে আসেন। আর গাড়ি চড়া নয়। খানিকটা এগোলে গড়িয়াহাট। ছায়া ধরে ধরে হাঁটেন। মনটা ফাঁকা ঠেকে। তা হলেও একটা অপূর্ব দিন। অস্বীকার করতে পারেন না। অনেক কিছু পেলেন, অনেক কিছু লাভ হল তাঁর। একটা সোনালি চিল বুকের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে।

সালারজং জাদুঘর এবং 'একটি অদৃশ্য কবিতা'

সুদেব রায়চৌধুরী

কোথাও কোন শব্দ খোদাই করা নেই। শুভ্র মর্মর মূর্তিটির দিকে তাকালেই চোখের সামনে কবিতা ভেসে ওঠে। শব্দ অদৃশ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুভব করতে কোন কষ্ট নেই। বরং এতে আনন্দটাই বেশি। 'অবগুণ্ঠনের আড়ালে তরুণী রেবেকার' এই মর্মর মূর্তিটির শিল্পী ইটালির জি এম বেনজোনি। শুধু ভারতে নয়, হায়দরাবাদে সালারজং জাদুঘরের এই মূর্তিটি সারা বিশ্বের বিস্ময়। একখানি শ্বেতপাথরের গাত্রে এত সূক্ষ্ম কাজ সত্যিই বিরল।

তাজমহল পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য বস্তু। ভাস্কর বেনজোনির সৃষ্ট এই মর্মর মূর্তিটিকে যদি তাজমহলের পরে স্থান দেওয়া যায় তা হলে শিল্প-পিপাসুদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিতর্কের ঝড় উঠবে না। বিতর্কের ঝড় উঠুক আর না উঠুক, 'অবগুণ্ঠনের আড়ালে রেবেকা' চিরকালীন শিল্প হিসাবে অনন্তকাল আমাদের চোখের সামনে ভেসে থাকবে।

তরুণী রেবেকা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের একটি ছোটখাট চরিত্র। বিয়ের আগেই কুমারী রেবেকা উটের পিঠে যেতে যেতে হঠাৎ মাঠের ভিতর তাঁর ভাবী স্বামী ইসহাককে দেখতে পেলেন। স্বামীর নাম শুনেছেন, কখনও দেখেননি। তাই লজ্জায় মাথার উপর থেকে আবরণটা ফেলে দিলেন। আবরণটা দেখতে অনেকটা এখনকার বোরখার মত। ভাস্কর বেনজোনি পাথরের বুকে ছেনির আঁচড়ে রেবেকার সেই মুহূর্তের মুখাবয়বের রূপান্তরটি জীবন্ত করে তুলেছেন। ঘোমটার আড়ালে ঢাকা পড়ায় তরুণী রেবেকার মুখমন্ডল আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। মূর্তিটির ভিতর দিয়ে শিল্পী নারীর চিরন্তন রূপটি ধরে রেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাস্কর বেনজোনির এই মর্মর মূর্তিটি গড়তে সময় লেগেছিল চল্লিশ বছরের মত। শুরু করেছিলেন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে। আর শেষ করেন বার্ধক্যে—মৃত্যুর কয়েক বছর আগে। সারা জীবনের এই একটি মাত্র কাজ। এবং একটিতেই কিস্তিমাৎ। বিশ্বজুড়ে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।
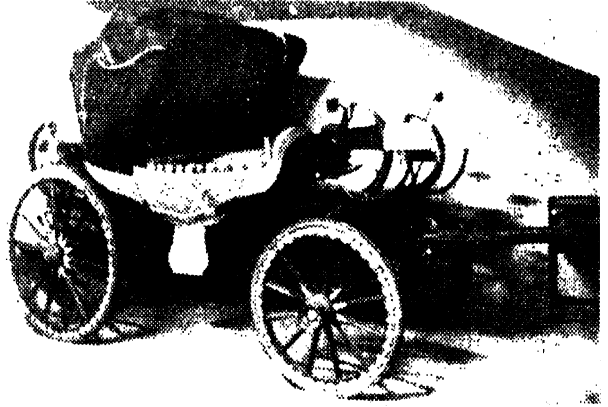
ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ হাতির দাঁতের তৈরি অশ্বচালিত এই গাড়িখানিতে চেপে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে সংসদে যান। ভরতপুরের রাজার দেওয়া এ গাড়িখানি রাষ্ট্রপতি সালারজং জাদুঘরকে দান করেছেন।

হায়দরাবাদে সালারজং জাদুঘরের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় এই মর্মর মূর্তিটি সংগ্রহের কৃতিত্ব প্রথম সালারজংয়ের। হায়দরাবাদের নিজামের দেওয়া টাইটেল সালারজংয়ের অর্থ প্রধানমন্ত্রী। প্রথম সালারজং কোন্ জায়গা থেকে এই মর্মর মূর্তিটি এনেছিলেন তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে অনেকের ধারণা এটি তিনি প্যারিস থেকে বহু টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করেন। তদানীন্তনকালে বিশ্বের অন্যতম ধনী হিসাবে হায়দরাবাদের নিজামের খ্যাতি ছিল। সুতরাং তাঁর প্রধান-মন্ত্রীর কাছে টাকাটা কোন সমস্যাই ছিল না। জিনিস পছন্দ হলে আর রক্ষা নেই। যেভাবেই হোক তা হায়দরাবাদের প্রাসাদ দেওয়ান দেওদিতে আনতে হবে।

কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপুঞ্জের শিশু-শিক্ষা তহবিল সংস্থার আমন্ত্রণে সাংবাদিক

প্রতিনিধি হিসাবে হায়দরাবাদে গিয়েছিলাম। হায়দরাবাদে এর আগে কখনও আসবার সুযোগ হয়নি আমার। ইউনিসেফের আলোচনাচক্র থেকে দু-তিন ঘণ্টার ছুটি নিয়ে সালারজং জাদুঘরটি দেখতে যাই। হায়দরাবাদ শহরের প্রাণকেন্দ্র মুসি নদীর পাড়েই তেতলা এই জাদুঘর। নদীর উপরে সেতুতে দাঁড়ালেই গোটা ভবনটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

তখন বেলা বারটা হবে। পরিচয় দিতেই গাইড জি কৃষ্ণস্বামী বললেন, 'আপনারা বড্ড কম সময় হাতে নিয়ে এসেছেন। সালারজং জাদুঘরের ৩৫টি হল ঘরে ৪৫ হাজারের বেশি সংগ্রহ আছে। এক দিন তো দূরের কথা, এক মাসেও সব ভালভাবে দেখা হয়ে ওঠে না।' এই বলে বয়সে তরুণ কৃষ্ণস্বামী আমাদের নিয়ে প্রায় ছুটে চললেন প্রদর্শনী-কক্ষগুলির দিকে। আমাদের সঙ্গে আরও দুজন সাংবাদিক ছিলেন। একজন হলেন চণ্ডীগড় ট্রিবিউনের সহকারী সম্পাদক বলবন্ত সিং, অপর ব্যক্তি জলন্ধরের একটি কাগজের রাজনৈতিক সংবাদদাতা। নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

কৃষ্ণস্বামী নীচের তলায় ঢুকেই একখানি তৈলচিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই দেখুন সালারজং তৃতীয় এর ছোটবেলার ছবি। এই ৪৫ হাজার সংগ্রহের মধ্যে ৪০ হাজারটির সংগ্রহের কৃতিত্ব সালারজং তৃতীয়ের। সালারজং কথাটির অর্থ প্রধানমন্ত্রী। তৃতীয় সালারজংয়ের নাম মির ইউসুফ আলি খান। মাত্র তেইশ বছর বয়সে হায়দরাবাদের প্রধানমন্ত্রী হন। তিন বছরের বেশি ক্ষমতার লোভ তাঁকে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেনি। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন। দেশবিদেশের প্রাচীন জিনিসপত্র, তৈলচিত্র পাণ্ডুলিপি, ভাস্কর্য শিল্প এক কথায় সুন্দর জিনিস যা তাঁর দৃষ্টিপথে পড়েছে তাই তিনি সযত্নে তুলে নিয়ে এসেছেন। সংগ্রহ-পিপাসা তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে পিতামহ সালারজং প্রথমের জীবন থেকে। ওই দেখুন, তৃতীয় সালারজংয়ের শৈশবসঙ্গী পুতুল ও অন্যান্য খেলনা। সব কিছু এখনও আছে। সালারজংয়ের তৈলচিত্রটি ভালভাবে দেখা শেষ না করতেই কৃষ্ণস্বামী এগিয়ে চলেন। ওই দেখুন, সে যুগের পাল্কি। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর। দুজন মুখোমুখি স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। রাজা-মহারাজারা এই সব সুসজ্জিত পাল্কি ব্যবহার করতেন। বর-কনেকেও বিয়ের পর এই পাল্কিতে চেপে আসতে হত। পাল্কির দু পাশের পর্দা ফেলা থাকত। যেতে যেতে পাল্কির ভিতরই দুজনে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা

বিশ্বের বিস্ময়! হায়দরাবাদে সালারজং জাদুঘরের ৪৫ হাজার সংগ্রহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন, 'অবগুণ্ঠনের আড়ালে রেবেকা'র মর্মর মূর্তিটি। ইটালির ভাস্কর জি বেনজানির সারাজীবনের শিল্প সাধনার ফল। এটি সংগ্রহ করে এনেছি[illegible]। হায়দরাবাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সালারজং প্রথম।

করতেন। ঘোমটা তুলে বর কনেকে আদর করতেন। কথাবার্তা বলতেন। পাল্কি চলা থেকেও শব্দের ভিতরে তাঁদের দুজনের মিষ্টি মধুর সম্ভাষণের কথাগুলি তৃতীয় কারও কানে পৌঁছত না।

হাতির দাঁতের গাড়িখানিও এখানকার অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু। [illegible] ভরতপুরের রাজা বীরেন্দ্র সিংহ এই মূল্যবান গাড়িখানির মালিক ছিলেন। ভারত স্বাধীন হবার পর রাজা গাড়িখানি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে উপহার দেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ অশ্বচালিত এই গাড়িতে চেপেই প্রথম দিন সংসদে যান। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি এটি সালারজং জাদুঘর কর্তৃপক্ষের নিকট দান হিসাবে পাঠিয়ে দেন। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর দেওয়া একটি সোনার পকেট ঘড়িও এখানে আছে।

কৃষ্ণস্বামী দ্রুতপায়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন। চীন, জাপান, পারস্যদেশ, মিশর—এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন জায়গার সংগ্রহ স্থান পেয়েছে এই জাদুঘরে। চীনে মাটির বাসন যে কত সুন্দর হতে পারে তা চোখে না দেখলে কল্পনাতেও ভাবা যায় না। এগুলির দামের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। জাপানী শিল্পকলা যেখানে আছে সেই ঘরে

ঢুকলে প্রথমেই একখানি ছবি চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ছবিটি ঘরের অভ্যন্তরে একটি জলপ্রপাতের। কাছে যেতেই গাইড আমাদের ভুল ভাঙলেন। ওটা জলপ্রপাত ঠিকই। তবে কোন বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পীর তোলা ছবি নয়। কিংবা এটি আঁকাও নয়। ওটি জাপানী মেয়েদের হাতে সুতো দিয়ে এম্ব্রয়ডারি কাজের একটি অপূর্ব নিদর্শন। জাপানী ফুলদানিগুলিও দেখবার মত। দু-একটি ফুলদানির মধ্যে মুক্তা-মানিক্য বসানো। বাইরে থেকে অপূর্ব লাগে।

পাশ্চাত্যের সংগ্রহশালায় মৃন্ময়ের তৈরি জিনিসপত্র, মেরি আনটোনিয় মেটের অত্যাশ্চর্য ড্রেসিং টেবল, সেফসটৌফিলিজ ও মারগারেটার মূর্তি—সব কিছুই থরে থরে সাজানো। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যে টেবিলে বসে লিখতেন এবং লুই পঞ্চদশ-এর অধীনে কাজ করায় আমাদের অনেক কিছু বলাটা সহজ ছিল।

দেশবিদেশের তৈলচিত্র, প্রাচীন জিনিস-পত্তর দু চোখ দিয়ে দেখেও শেষ করা গেল না। নানান দেশ ঘুরে নিলাম মাত্র এক ঘণ্টায়। দ্রুতগামী অশ্ববাহী বিমানও বোধ হয় এত অল্প সময়ে এতগুলি দেশের উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারবে না। বিদেশের মায়া কাটিয়ে কৃষ্ণস্বামী আমাদের নিজেদের দেশের মধ্যে নিয়ে গেলেন। এ ভারত কয়েক শো বছর আগেকার। শক, হূন, কিম্বা পাঠানদের তেমন কোন চিহ্ন না থাকলেও মুঘল সাম্রাজ্যের একাধিক নিদর্শন সালার-জং জাদুঘরকে আলোকিত করে রেখেছে। জাহাঙ্গীরের ব্যবহৃত তলোয়ারখানির দিকে তাকালে জাহাঙ্গীরের ছবিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইতিহাসের ভারতীয় দৃষ্টি-পথে আরও অনেক কিছুরই উদয় হবে। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান যে ছোট ছুরিখানি দিয়ে আম, আপেল, তরমুজ, পিয়ারা কেটে খেতেন সেটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে কাচের আলমারির ভিতর। খয়েরি রংয়ের ছুরিখানির হাতলে মণিমুক্তা বসানো। দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় এটা চিক চিক করছে। হ্যাঁ, আওরংগজেবের সযত্নে তরবারিখানিও স্থান পেয়েছে এই জাদুঘরে। সাজাহানের একখানি ছোট ছুরিও দেখলাম।

কৃষ্ণস্বামী এ সব কিছু দেখাতে গিয়ে ভারতের অতীত ইতিহাসের পাতায় ডুব দেন। এই দেখুন, 'ইয়াকুটি-উল-মাসতা-সামির' (Yakuti - ul - Mastasami's) দ্বাদশ শতাব্দীর পবিত্র কোরাণ। শুধু তত্ত্ব মুসলমানদের নয়, প্রাচীন পুঁথিপত্রের অনুরাগীমাত্রের কাছেই এর একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। জাহাঙ্গীর ও সাজাহান এই কোরাণখানি থেকে কয়েকটি লাইন লিখে রেখে গিয়েছেন। সোনার পাথরের বাটি

কথাটি এখানে এলে আর অকল্পনীয় বা অবাস্তব বলে মনে হবে না। এখানে মোঘলদের সময়কার ২৪ ফুট দীর্ঘ একখানি সোনার কাপড়ও আছে। কেউ আবার সোনালী রংয়ের কাপড় বলে যেন ভুল ক'রে বসবেন না। এটা খাঁটি বাইশ ক্যারেট সোনার তৈরি। নানান ধরনের কার্পেটের মধ্যেও স্বর্ণের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আবার ইংলণ্ডের সেই ঘড়িটি যাতে পুতুলের মত একটি মানুষের আবির্ভাব ঘটে প্রতি ষাট মিনিট অন্তর। এবং সেই ছোট মানুষটিই ঘণ্টা বাজায়। সত্যিই দেখবার মত।

সালারজং তৃতীয় লন্ডনের ক্রিসটিজ এবং সাউথ অ্যাবের নীলাম কেন্দ্র থেকে বেশির ভাগ জিনিস সংগ্রহ করেন। টিপু-সুলতানের ব্যবহৃত চারখানি হাতির দাঁতের চেয়ারও সালারজং তৃতীয়ের সংগ্রহ। ১৯৪৯ এ সালারজাংয়ের মৃত্যুর পর এই চেয়ারগুলি জাদুঘরকে দেওয়া হয়। ওই সময় তৃতীয় সালারজং মির ইউসুফ আলি খানের 'দেওয়ান-দেওদি' প্রাসাদে ৭৭টি প্রশস্ত কক্ষ জুড়ে ৪০ হাজার সংগ্রহ ছিল। শুধু ঘরে নয়, প্রাসাদের বারান্দায় গড়াগড়ি যেত এই সব মূল্যবান সংগ্রহ। উৎসুক দর্শকবৃন্দ প্রাসাদে ঢুকে প্রথমে সেই হারিয়ে ফেলতেন। গাদা গাদা মূল্যবান জিনিস এলোমেলোভাবে চারদিকে ছড়ানো। কোন সময়ের কোনটা তা চট করে বোঝা সম্ভব নয়।

ইউসুফআলি খান যখন রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে অবসরগ্রহণ করেন তখন তাঁর আয়কর মুক্ত বাৎসরিক আয় ছিল ২১ লক্ষ টাকা। পর্যটকের মত সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। এই মানুষটির লোভ ছিল তাঁর একটি জিনিসে। এবং [illegible] হল [illegible] যে জিনিসটি [illegible] গেছে সেটি নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রা[illegible]। সব [illegible] অর্থের বিনিময়ে।

সালারজং তৃতীয়ের মৃত্যুর পর তাঁর এই বিরাট সম্পদের অনেক ভাগীদার জুটে গেল। প্রত্যক্ষ বংশধর না থাকাতেই এই গোলমালের সূত্রপাত। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার সালারজংয়ের এই বিপুল সম্পদ-রাজির দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করেন একটি কমিটির উপর। খ্যাতিমান শিল্প সমালোচক জি ভেঙ্কটাচলমকে এই সম্পদরাশি নিয়ে একটি জাদুঘর করতে বলা হয়। জাদুঘর শেষ হতে দু বছর কেটে যায়। রাজপ্রাসাদ 'দেওয়ান-দেওদি'র নাম পরিবর্তন করে 'সালারজং জাদুঘর' নামকরণ হয়। ১৯৬১ সনে সংসদে আইন পাশের ফলে এই জাদু-ঘরটি সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আসে। এখন এটি ভারতের অন্যতম জাতীয় সংগ্রহ-

সালারজং যাদুঘরের স্রষ্টা ইউসুফ আলি খানের আবক্ষ মূর্তি

শালার মর্যাদা পেয়েছে। অন্য চারটি হল : কলকাতা, বোমবাই, দিল্লি ও মাদ্রাজ।

সালারজংয়ের এই প্রভূত সংগ্রহ রাজ-প্রাসাদ 'দেওয়ান-দেওড়ি'তেও নিরাপদ ছিল না। কোন-না-কোন ভাবে তখনও কিছু কিছু মূল্যবান জিনিস এদিক ওদিক হয়েছে। ভারতের সম্পদ লুণ্ঠনের ঘটনা নতুন নয়। ইতিহাসই তার প্রমাণ। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন, কোহিনূর ও ময়ূর সিংহাসনও ছিল এককালে ভারতের। আজ সেই কোহিনূর ব্রিটেনে। আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো সাহেব রাতারাতি কোহিনূরের দাবিদার বলে ঘোষণা করতে এতটুকু লজ্জা বোধ করছেন না। আসলে এ সব কিছুই আমাদের ভারত-বর্ষের ইতিহাসের সামান্য জ্ঞান যার আছে তিনিই এই সহজ সত্যটি মেনে নেবেন। ১৯৩০ সনে পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশের সম্পদশালী ব্যক্তি অসাধু ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ভারতের মূল্যবান সংগ্রহ কিনে নিয়েছেন।

গাইড কৃষ্ণস্বামী বলে চলেন। সামনের একটি ঘরে বন্দুকধারী জনৈক পাহারাদারকে দেখিয়ে বললেন, দিন রাত্রি এই সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা আছে। স্বাধীনতার পর অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন শিল্প-সামগ্রী বাইরের দেশের কোন লোকের কাছে বিক্রি করা নিষিদ্ধ। ১৯৪৯ সনে সালারজংয়ের মৃত্যুর পর থেকে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে আসার মধ্যবর্তী সময়ে বড় বড় ব্যবসায়ীর উসকানিতে বহু রত্নরাজি সালারজং জাদু-ঘর থেকে বাইরে পাচার হয়েছে। ওই সময়ের কোন রেকর্ড নেই। ভারতের চার পাশে রাতারাতি শিল্প-সামগ্রী চুরির হিড়িক পড়ে যায়। সেই চুরি এখনও অব্যাহত। ১৯৬৭ সনের জুন মাসে ৪৯টি মূল্যবান সংগ্রহ উধাও হয়ে যায়।

ভারতের আধুনিক তৈলচিত্র বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রবি বর্মার প্রচেষ্টাতেই সালার-জং জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। রাণী ভিকটোরিয়ার স্বাক্ষর সম্বলিত ছবিগুলি, রূপোর বেসিন এবং সোনার কাসকেট এখনও জাদুঘরের একটি গ্যালারির শোভা বর্ধন করে চলেছে। সাদারল্যান্ডের ডিউকের আমন্ত্রণে ১৮৭৬ সনে স্যার সালারজং (প্রথম) ইংলন্ডে গেলে এই উপহারসামগ্রী লাভ করেন। ওই সময় জাহাজে তাঁর দলে আরও ৫০ জন আমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলেন। ওই বছর ২১ জুন তারিখে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডকটর অফ সিভিল ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। একই অনুষ্ঠানে লরড নরথব্রুক এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অন্যতম কর্ণধার ডঃ বারচকেও অনুরূপে উপাধি দেওয়া হয়েছিল সেদিন। বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিখ্যাত শ্যালাডোনিয়ান থিয়েটারে উপস্থিত থেকে সালারজং প্রথম ওই উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ সনের ২৫ জুলাই তারিখের 'লনডন টাইমস'-এও খবরটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর তিনি লনডনের 'অনারারি ফ্রিডম'-এর সম্মান লাভ করেন।

জাদুঘরের একটি ঘরে 'দুওয়ান রাণী-খিজির খানের' সচিত্র পাণ্ডুলিপিটিও শিল্প-রসিকদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক বস্তু। আলাউদ্দিন খিলজির ছেলে খিজির খানের জীবনকে কেন্দ্র করেই ওই পাণ্ডুলিপিটি লেখা। এটি একটি প্রেমের কবিতা। খিজিরখান এবং দেবলদেবী ও দুবলরানীর ভালবাসার অভিব্যক্তি আজও অমর হয়ে আছে ওই জীর্ণ পাণ্ডুলিপির মধ্যে। পাণ্ডুলিপিতে একথা পরিস্কারভাবে লেখাও আছে। দুবলরানী গুজরাটের রাজকন্যা। আসল নাম ছিল করানা থেলো। এবং রানী কমলাদেবী। কবিতাটি প্রখ্যাত কবি আমির খসরুর লেখা। বাবর ভারতে আসবার কিছুদিন আগে এই কবিতাটি লেখা। অর্থাৎ ১৫২৪ সনে হবে। পাণ্ডু-লিপিখানির চারদিক কালো, গোলাপী এবং সোনালী রঙে সজ্জিত। করুণাময় ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত এই কবিতাটির

[illegible] মধ্যবর্তী জায়গাটি শূন্য। এর চিত্রশিল্পীর নাম মোহাম্মদ মুকুইম। পারস্য দেশের অনুকরণে এই সব ছবি আঁকা। এ ধরনের আরও অনেক জিনিসই মনকে কেড়ে নেয়।

১৯৬৭ সনের ৭ জুন জাদুঘরটি মুসি-নদীর গায়ে বর্তমান তেতলা বাড়িটিতে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু জাদুঘরের ভবনে যে শিল্পমাধুর্য থাকা উচিত তা এখানে অনুপস্থিত। ১৯৭২ সনের জুন মাসে এই নতুন বাড়িতে ভিতরের ঘরে তালা খোলায় চিহ্ন পাওয়া যায়। তদন্তে প্রকাশ পায়, মোটা টাকার ঘুষ খেয়ে কিছু কর্মী এই অপকর্মে লিপ্ত হন। প্রাচীন জিনিসপত্র চুরি হলে তা ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে ভারত জেনেভা সম্মেলনের চুক্তির স্বাক্ষরকারী নয়। কিন্তু কোন দেশে ভারতের অপহৃত শিল্পসামগ্রী চলে গেলে সে ব্যাপারে ওই দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করার কোন বাধা নেই। মেক্সিকো এ ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে উপকৃত হয়েছেন।

তেতলা থেকে নীচ নামার আগে কৃষ্ণনামী তৈলচিত্রের কক্ষটিতে নিয়ে গেলেন। দেখলাম সেখানে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তৈলচিত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুখানি চিত্র স্থান পেয়েছে। বাংলা থেকে আর একজন শিল্পীর ছবি চোখে পড়ল। তিনি হচ্ছেন এ এন রায়। স্নানের পর ভিজে কাপড়ে গ্রামবাংলার বধূর সেই বিখ্যাত তৈলচিত্রটি অনেকেরই চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেয়।

নীচে নামতেই গাইড বললেন, 'আপনারা যাবার সময় ভেইলড রেবেকা দেখেছেন। কিন্তু ওর সামনা-সামনি কাঠের উপর খোদাই করা মূর্তিযুগল কি দেখেছেন? এই বলে তিনি একখানি কাষ্ঠখণ্ডের বিপরীতমুখী একটি মানুষ ও একটি মহিলাকে দেখিয়ে বললেন হল মহাকবি গেটের বর্ণনার সেই মেফেস্টোফেলিস ও মারগারেটা।'

মেফেস্টোফেলিস — ক্ষমতা, লোভ, অহংকারের প্রতীক আর তার বিপরীত দিকে মারগারেটা—দয়া, মমতা ও কমনীয়তার আদর্শ। পরস্পরবিরোধী এই দুটি চরিত্র কাষ্ঠখণ্ডের দু পিঠে ফুটিয়ে তুলেছেন জারমানির ভাস্কর ভং ফসটেজ। এটিও তাঁর সারা জীবনের শিল্পসাধনার ফল স্বরূপ। এটিও আর একটি বিস্ময়। বেরিয়ে আসার সময় দেখলাম এই জাদুঘরের স্রষ্টা সালারজং তৃতীয়ের বৃহদাকৃতিটি শুভ্র পুষ্পের নীচে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি তুলেছেন অলক মিত্র।

বিজ্ঞান কংগ্রেস : ১৯৭৭

অনেকেই স্বীকার করবেন, গত বছর জানুয়ারি মাসে ওয়ালটেয়ারে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে সাধারণ অধিবেশন বসেছিল, এক কথায় তা ঐতিহাসিক। বিগত কয়েক বছর সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অনেক বিজ্ঞানীকেও পৃথিবীর বৃহত্তম এই বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করতে শুনেছি। তাঁদের মূল বক্তব্য, বিজ্ঞান-টিজ্ঞান কিছু নয়। আসলে বিজ্ঞানের নাম করে বছরে একবার কয়েক হাজার বিজ্ঞানী দেশের এক একটা অঞ্চলে এসে বেড়িয়ে যান, আর কিছু নয়। এ ধরনের অধিবেশন পেশার দিক দিয়ে অথবা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ব্যাপারে কোন কাজেই আসে না।

কথাটা যে ঠিক নয়, যথাযথ মন নিয়ে প্রতি বছর বিজ্ঞান কংগ্রেসে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন। এ ধরনের অধিবেশনে দেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা প্রবীণদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মেলামেশা এবং ভাব বিনিময়ের যে ধরনের যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে থাকেন, অন্য কোন সমাবেশে তা পাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। পেশাগত জীবনে এটা নিশ্চয় বড় একটা লাভ। দেশ-বিদেশের সমসাময়িক বিজ্ঞান-চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে একটা ব্যাপক আভাসও পাওয়া যায় একমাত্র এই অধিবেশনেই। অনেক বিজ্ঞানী বিজ্ঞান কংগ্রেসে এসে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের ভবিষ্যৎ কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকিত হন, কারোর কারোর মুখে এমন কথাও শুনেছি।

আত্মতৃপ্তি পাওয়ার জন্যেই যে এসব কথা বলছি, তা অবশ্য নয়। সংগঠনমূলক সমালোচনার ব্যাপারেও বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিচালকমন্ডলী যে সব সময় নীরবতা পালন করেছেন সে কথাও বলব না। সমালোচকদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। দেশের বিজ্ঞানীদের এত বড় সমাবেশ! গবেষণা এবং ব্যক্তিগত দিক ছাড়াও এই সমাবেশে মিলিত হয়ে দেশের বৃহত্তর জনস্বার্থে বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলকে কতটা ফলপ্রসূ করে তোলা যায়, সে ব্যাপারে আমাদের বিজ্ঞানীরা কি কিছুই আলোকপাত করতে পারেন না?

মূল সভাপতি

ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডঃ হোমি এন শেঠনা। জন্ম ২৪ আগস্ট, ১৯২৩। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এস-সি এবং বি এস-সি (টেক)। ১৯৪৬ সালে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস ই ডিগ্রি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে ১৯৪৯ সালে তিনি ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেডে যোগ দেন। সেখান থেকে ১৯৫৯ সালে ট্রম্বের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে চীফ সায়ান্টিফিক অফিসার এবং অবশেষে সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপের ডাইরেকটার। ১৯৬৬ সালে ওই কেন্দ্রের ডাইরেকটরও হয়েছিলেন তিনি। রাজস্থান এবং মাদ্রাজ পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপনেরও দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। বর্তমানে ভারতের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ভারত সরকারের শক্তি দপ্তরের সেক্রেটারি।

ধীর, বিনয়ী, কথা বলেন কম। যেটুকু বলেন তার ভেতর ফাঁক থাকে না। দূরদর্শী বিজ্ঞান প্রশাসক হিসেবে তিনি এখন শিরোনাম।

ওয়ালটেয়ারের অধিবেশনকে ঐতিহাসিক বলছি এই কারণে যে, এই শেষোক্ত প্রশ্নটি সামনে রেখেই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস একটি নজির স্থাপন করেছিল এই অধিবেশনেই। অধিবেশনের মূল-সভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান পরিকল্পক ডঃ এম এস স্বামীনাথন ঘোষণা করলেন, বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের অন্যান্য কার্যসূচী যেমন চলছে, চলুক। তবে একটি বিষয়ের ওপর জোর দিতে হবে। ইংরেজিতে যার নাম দেয়া হয়েছে 'ফোকাল থীম'।

ডঃ স্বামীনাথন বললেন, বিজ্ঞান শুধু গবেষণাগারের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। বিজ্ঞান কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক সমাবেশ। আসুন, এখানে বসে, বিজ্ঞানী, চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং সংগঠন কাজে যাঁদের দক্ষতা রয়েছে তাঁরা—সবাই মিলে এই অধিবেশনে বসে বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলকে দেশের অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং জীবনের মান উন্নয়নে যাতে কাজে লাগান যায় সে ব্যাপারে চিন্তা করা যাক। শুধু চিন্তা নয়, যাতে ফলপ্রসূ কিছু করা যায় তার উপায় অনুসন্ধান করি। এক এক বছর আমাদের লক্ষ্য থাকুক এক একটি মূল বিষয়বস্তুর ওপর নিবদ্ধ।

ফোকাল থীম বলতে এই মূল-বিষয়বস্তুকেই বলা হয়েছে। ওয়ালটেয়ার কংগ্রেসে মূল বিষয়বস্তু ছিল বিজ্ঞান এবং সার্বিক গ্রামীণ উন্নয়ন। ওই কংগ্রেসের মূল সভাপতি ডঃ স্বামীনাথন ওয়ালটেয়ারে বসেই বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদদের নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা এবং ওই সমস্যার সমাধানের জন্যে যে যে ব্যবস্থাপনা করা উচিত সেসব সম্পর্কে কিছু কিছু পরিকল্পনা এবং কর্মপন্থা রচনা করে কেন্দ্রীয়

সরকারের কাছে উপস্থাপনাও করেন। সমস্যাবলীর মধ্যে ছিল পুষ্টি, জনস্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহ সমস্যা, ভূগর্ভস্থ জল সম্পর্কিত পরিকল্পনা, বনসম্পদ, ভারতের জলবায়ু, প্রাণিসম্পদ, পরিবেশ দূষণ, জন্মশাসন, গ্রামীণ বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি।

*

এ বছর জানুয়ারি ৩ থেকে ৭ পর্যন্ত ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসে ফোকাল থীমের আলোচ্য বিষয় হিসেবে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। বিষয় তিনটি যথাক্রমে সমীক্ষা, সংরক্ষণ এবং সংগতি। এ সম্পর্কে মূল আলোচনার সূত্রপাত করেন এ বছরের বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি এবং ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের চেয়ারম্যান ডঃ এইচ এন শেঠনা।

ডঃ শেঠনার মূল বক্তব্যটি ছিল খুবই স্পষ্ট। এবং তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নও যথেষ্ট সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যেমন ধরুন, ভারতীয় জনবলের কথা। ডঃ শেঠনার প্রশ্ন, বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে প্রতিটি মানুষেরই উচিত নিজেকে যথাযথ যোগ্য করে তোলা। দরকার সুস্পষ্ট মানসিকতার স্ফুরণ যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে দক্ষ করে তুলতে পারে। এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত কতটুকু কি আমরা করতে পেরেছি? এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ আবহমান কাল থেকে একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে তার যাবতীয় কাজকর্মের গতি সীমাবদ্ধ অবস্থায় রেখে এসেছে। এরই ফাঁকে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের আবির্ভাব। এই আকিভাব তার সনাতনী ভাবনা-চিন্তা এবং কর্মকৌশলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বেমানান। অথচ মুশকিল এই, বর্তমান অবস্থায় নতুনকে বাদ দিয়ে জাতীয় অগ্রগতি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভাবা সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে প্রতিটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। ব্যাপকভাবে এই পরিবর্তন আনতে গেলে স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে সরকারী বেসরকারী নানা রকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংগতি রেখে কাজে নামা দরকার।

অথবা কৃষিক্ষেত্রের কথাই ধরা যাক। চাষবাসের ব্যাপারে মাঠেঘাটে শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু ওই সব শ্রমিকের পুরোপুরি দক্ষতা এবং কর্মক্ষমতার কতটুকু অংশ মূল কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনে এ পর্যন্ত আমরা কাজে লাগাতে পেরেছি? আমরা দেখছি, নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের কাছ থেকে যতটা কাজ পাওয়ার কথা, শেষ পর্যন্ত ততটা কাজ কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। এর কারণ কি? এর জন্যে শুধু শ্রমিকদের অবশ্য দায়ী করা চলে না। দরকার উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সাহায্য, পরিচালন ব্যবস্থা এবং দরকার মত পুরনো আইনগুলির সংস্কার।

সারা ভারতে বছরে বর্ষার জলের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ কোটি একর-ফুটের মত। এর মধ্যে ১০০ কোটি একর-ফুট জল বাষ্পীভবনের ফলে আমরা হারিয়ে ফেলি। ৬৫ কোটি একর-ফুট জল ভূগর্ভে সঞ্চিত হয় আর অবশিষ্ট ১৩৫ কোটি একর-ফুট জল প্রবাহিত হয় নদী নালার মাধ্যমে। এই অবশিষ্টের মধ্যে মাত্র ৪৫ কোটি একর-ফুট জল সেচের কাজে লাগান সম্ভব। ভাসমান রাসায়নিক স্তর ব্যবহার করে সঞ্চিত জলাধারের বাষ্পীভবন কমান সম্ভব। তা যদি হয়, দেশের জল সম্পদ তো এভাবেও খানিকটা বাঁচান যায়? এই

পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে শতকরা ৩৩ ভাগ বাষ্পীভবন রোধ করা যেতে পারে।

আর একটি বড় সমস্যা, শক্তির ক্রমাম্বয় চাহিদা। ধরা যাক, পশ্চিমী দেশগুলিতে মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তির এখন যতটা চাহিদা, বর্তমান শতাব্দীর শেষে আমাদের দেশে মাথাপিছু চাহিদা গিয়ে দাঁড়াল তার অর্ধেকের মত। এমন একটি হিসেব ধরলে, বর্তমান শতাব্দীর শেষে এ দেশে বিদ্যুৎ-শক্তির মোট উৎপাদন হওয়া উচিত ১৮০,০০০ মেগাওয়াটের মত। ওই সময়ে আমাদের সম্ভাব্য জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪০,০০০ মেগাওয়াট দাঁড়ালে অবশিষ্ট ১৪০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হবে মুখ্যত কয়লা, অংশত পারমাণবিক শক্তি, ভূ-তাপ শক্তি, বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি প্রভৃতির ওপর।

একটি হিসেবে দেখা যায়, এ দেশে বছরে ঘুঁটে পোড়ে ৪৬ কোটি মেট্রিক টনের মত। এই ঘুঁটের মধ্যে থেকে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার টন নাইট্রোজেন এবং ৬ লক্ষ ৯০ হাজার টন ফসফেট। শুধুমাত্র জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার না করে এই বিপুল পরিমাণ ঘুঁটে সার হিসেবে কাজে লাগিয়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যেত।

প্রশ্ন এখানেই। যে ঘুঁটের সাহায্যে দেশের শতকরা ৭০টি বাড়িতে জ্বালানির কাজ চলে তা দিয়ে সারের কাজ চালালে ওই সব বাড়ির জ্বালানি সমস্যার কি হবে?

সুখের কথা, এটা এমন যে একটা সমস্যা নয়, গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট তার উত্তর। এই প্ল্যাণ্টের সাহায্যে গোবরের জ্বালানি অংশ গ্যাস হিসেবে সংগ্রহ করে যে গৃহস্থালির কাজ থেকে শুরু করে আলো বা যন্ত্রপাতি চালান যায়, ইতিমধ্যে অনেকেই তা লক্ষ করেছেন। জ্বালানি গ্যাস সংগ্রহ করার পর গোবরের অবশিষ্ট অংশ উচ্চ মানের নাইট্রোজেন সার হিসেবে কাজে লাগান যায় সে অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন কেউ কেউ। বলা বাহুল্য, দেশের বিশেষ একটি সম্পদকে চেষ্টা করলে আরও কত বেশি লাভজনক করে তোলা সম্ভব, গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট তার বড় রকমের একটি উদাহরণ।

অর্থাৎ বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে ডঃ শেঠনা যা বোঝাতে চেয়েছেন তার সার কথা, মানুষ থেকে শুরু করে দেশের যাবতীয় সম্পদ সম্পর্কে প্রথমে একটি পরিপূর্ণ সমীক্ষার দরকার। যার ভেতরে কোন ফাঁক থাকবে না। সমীক্ষার পর জানা যাবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সম্পদের সম্ভাব্য পরিমাণ কতটা। তারপর দেখতে

হবে, সুষ্ঠ পদ্ধতির সাহায্যে ওই সম্পদের কতটা আমরা সঞ্চয় করে রাখতে পারি এবং যে পরিমাণ কাজে লাগান হবে তার যতটা সম্ভব যেন অপচয় না ঘটে সেদিকে লক্ষ রাখা।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডঃ শেঠনার সঙ্গে কথা বলেছি কয়েকবার। বার বার তিনি একটি বিষয়ের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি : সমীক্ষা। উই গট টু হ্যাভ এ পারফেকট সারভে রিপোর্ট।

গত বছর ওয়ালটেয়ার বিজ্ঞান কংগ্রেসে গ্রামীণ উন্নয়ন প্রসঙ্গে যেসব পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল সে সম্পর্কে কতটা কি করা হচ্ছে?

ভুবনেশ্বরে ডঃ স্বামীনাথন বললেন, ভারতের কুড়িটি অনগ্রসর জেলায় গ্রামীণ উন্নয়নের জন্যে বিজ্ঞানীদের নিয়ে সেল তৈরি করা হবে। এ ব্যাপারে ভারত সরকার পনের কোটি টাকা খরচ করবেন বলেছেন। কয়েকটি সংস্থাও সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

'সাহায্য যে ভাবেই আসুক, বিজ্ঞানীদের ভূমিকা একমাত্র 'অনুঘটক' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে কিভাবে জীবনের মান উঁচু করা যায় শুধু এটুকুই শেখাতে পারেন বিজ্ঞানীরা। এর পরের দায়িত্ব গ্রামবাসীদের। নিজেদের মঙ্গলের জন্য, কি করা দরকার, কিভাবে তা করতে হবে সে সব তাঁদের নিজেদেরই দেখতে হবে।' এ মন্তব্য ডঃ শেঠনার।

*

প্রসঙ্গত বিজ্ঞান কংগ্রেসে বি সি গুহ স্মৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বসুর দু একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য তুলে ধরা যাক। অধ্যাপক বসু দেশের অপুষ্টি সমস্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : এ দেশে এখনও দরিদ্র পরিবারগুলির শতকরা ৮০ ভাগ শিশুর দৈহিক উচ্চতা এবং ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম, শতকরা ২৫ ভাগ অপুষ্টিতে ভুগছে এবং শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ বিপজ্জনক অপুষ্টি রোগের আকর। এ দেশে অপুষ্টিজনিত রক্তাল্পতা রোগের শিকার হয়ে প্রতি এক লক্ষে ২৫০ জন মা মৃত্যুর কবলে পড়েন।

অধ্যাপক বসুর আর একটি মন্তব্য : ভারতের উত্তরাঞ্চলের মানুষের খাদ্যে স্নেহপদার্থ, লোহা এবং নিকোটিনিক অ্যাসিডের পরিমাণ দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলের মানুষের খাদ্যের চেয়ে অনেক বেশি। অথচ তাদের খাবারে ভিটামিন-সি-র পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। ভারতের মধ্যাঞ্চলের মানুষেরা মাথা পিছু ক্যালোরি, প্রোটিন, শর্করা এবং ভিটামিন সি খান সবচেয়ে বেশি। খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-এ, ভিটামিন বি-১ এবং রাইবোফ্লেবিন-এর দিক দেখলে এ দেশে পশ্চিমাঞ্চলের স্থান প্রথম। পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতের মানুষ অপুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে থাকেন বেশি।

কেন এই ব্যতিক্রম? খাদ্যের অভাব? না কি খাবার আছে, অর্থনৈতিক কারণে কেনার ক্ষমতা নেই বলেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে? পুষ্টি-বিজ্ঞানীদের মতে, সংস্কৃতির সঙ্গে কখনও কখনও খাদ্যাভাসের সম্পর্ক রয়েছে দেখা যায়। ধর্মীয় প্রথার সঙ্গেও অঞ্চল অথবা গোষ্ঠী বিশেষে নানা রকম খাদ্যাভাস গড়ে ওঠে। ডঃ শেঠনার মন্তব্য থেকে পরিষ্কার, অঞ্চল বিশেষে পুষ্টির ব্যাপারে পার্থক্য কেন ঘটে সে উত্তর দেবেন বিজ্ঞানীরা। তার সমাধানের পথও দেখাবেন হয়ত তাঁরা। কিন্তু সমাধানের দায়িত্ব নিতে হবে সাধারণ মানুষকেই।

খুব শক্ত কাজ। এ সব কাজের দুটি দিক আছে। সাধারণ মানুষের সমস্যা জানা এবং সে সব সমস্যার সমাধানের জন্যে সাধারণ মানুষকে কি করতে হবে তাদের সে সব জানান। এ কাজে গ্রামের স্কুল কলেজগুলির ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের কাজে লাগানর ব্যাপারে পরিকল্পনা রচনা করছেন বিজ্ঞানীরা। ডঃ স্বামীনাথন বললেন, এ কাজে দরকার হলে পি এইচ ডি, এম এস-সি, এ সব আমরা দেখব না। নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং অধ্যবসায় নিয়ে যাঁরা কাজ করতে পারেন, তাঁরাই এ কাজ যাতে করতে পারেন, আমরা দেখব।

বিজ্ঞান কংগ্রেস উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন, এ দেশের প্রতিটি পরিবার খুদে কর্মশালায় পরিণত হোক, তাকে বাস্তবায়িত করার এটাই একমাত্র পথ।

এ ধরনের প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

আর একটি কথা।

ফোকাল থীমের মাধ্যমে যেমন গ্রামীণ মানুষের কথা ভাবছেন বিজ্ঞান কংগ্রেস, ঠিক তেমনি বিজ্ঞানীদের স্বার্থেও তো আরও একটি দিক তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন?

বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে কি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁরা কয়েকটি সরল-বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করতে পারেন না? পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা প্রভৃতি এক একটি বিষয়ের ওপর একাধিক বক্তা থাকতে পারেন। যাঁদের কাজ হবে সহজে, যে বছরে কংগ্রেস বসছে তার আগের বছরে দেশে (উল্লেখযোগ্য বিদেশেও) পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কি কি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে সে সব তুলে ধরা। দরকার হলে পদার্থবিদ্যার কোন কোন কাজ রসায়ন, উদ্ভিদ অথবা প্রাণিবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা যায়, অথবা প্রাণিবিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানে পদার্থ বিজ্ঞানের কোন বিশেষ গবেষণালব্ধ ফলাফল সাহায্য করতে পারে, এ সবের ওপরও ওই ধরনের সমাবেশে আলোচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রের গবেষক যাতে ওই ধরনের বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন তারও ব্যবস্থা থাকবে। এতে করে দেশের সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞানীরা (বিশেষ করে তরুণেরা) অবহিত হতে পারেন। ভুবনেশ্বরে কয়েকজন প্রবীণ এবং নবীন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। প্রস্তাবটি সবাই সমর্থন করেছেন।

কেউ কেউ এমনও বলেছেন, পেপার পড়ার প্রহসন থেকে বরং এটা অনেক ভাল। অন্তত দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা উদ্ভাবনা কোন পর্যায়ে আছে সেটা তো আমরা জানতে পারব। এই অবহিতি নিজেদের কাজে অনেকটা আস্থা যোগাবে বলেই তো মনে করি।

সমরজিৎ কর

সংশোধন : ১৫ জানুয়ারি **বিশ্ববিজ্ঞান** রচনার শিরোনাম **হবে সুপার হেভী।**

তীর্থযাত্রার স্মৃতি ঃ প্রসঙ্গ অবনীন্দ্রনাথ

শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মাত্র দু বার দেখেছি তাঁকে। অবনীন্দ্রনাথকে। প্রথম বার বরানগরের 'গুপ্ত নিবাসে' খুব কাছে বসে, তাঁর কথা শুনতে শুনতে। দ্বিতীয় বার নিমতলা শ্মশানে—দূরে থেকে দাঁড়িয়ে। এই দুই দেখার ব্যবধান মাত্র এক বছর।

সেটা ১৯৪৮ সাল। কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে (তখনও কলেজে রূপান্তরিত হয়নি) প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। শিক্ষকমশায়দের কাছ থেকে হাতে-কলমে শিক্ষে নেয়ার ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের উপদেশ শুনেছি—'পারফেক্ট ড্রয়িং-এর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দেশী ও বিদেশী ভাল ভাল ছবি দেখবে—সম্ভব হলে অরিজিনাল, তা না পেলে প্রিন্ট এ পাবলে ভাল ছবির কিছু প্রিন্ট সংগ্রহ করবে। ভাল ছবি না দেখলে ছবি চেনা ও বোঝার শক্তি তোমাদের তৈরী হবে না।' ইতিমধ্যে পুরনো 'ভারতবর্ষ' ও প্রবাসী থেকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, গগনেন্দ্রনাথ, মুকুল দে, ক্ষিতীন মজুমদার, দেবীপ্রসাদ, যামিনী রায় প্রমুখ অনেক নামী শিল্পীদের কিছু কিছু ছবির প্রিন্ট আমার সংগ্রহের খাতায় এসে গিয়েছিল। তাছাড়া ইটালিয়ান রেনেসাঁ থেকে শুরু করে ইয়োরোপীয়ান এবং চীন ও জাপানের মাস্টার আর্টিস্টদের ছবির প্রিন্ট সম্বলিত কিছু বইও কেনা হয়ে গিয়েছিল।

যে সময়ের কথা তখন একটা বিষয় লক্ষণীয়—তখনো বিদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মডার্ন আর্টের ঢেউ আজকের মতো এত প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়নি আর্ট স্কুলের দেয়ালে। তখন বিদেশী শিল্প-শৈলীর চেয়ে দেশীয় প্রথা-পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে আমাদের সকৌতূহল মনোযোগ আকর্ষণ করার আগ্রহ শিক্ষকমশায়দের মধ্যে বেশী লক্ষ করেছি। শিক্ষণ-পদ্ধতি হিসেবে এটা যথার্থ কি ভুল সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়—অনেকটা এর ফলেই ব্যক্তিগত রুচি মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারী শিল্পী-সমাজের দ্বারা তখন আমরা অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, সে তুলনায় আজকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এ ভাবেই আমাদের ছবির প্রিন্ট সংগ্রহ পরিকল্পনায় অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রবর্তিত 'নব্য বেঙ্গল স্কুলের' শিল্পীদের ছবির প্রিন্টের অ্যালবাম বেশী ভারী হয়ে উঠেছিল। অবনীন্দ্রনাথের 'সাজাহানের মৃত্যু', 'ভারতমাতা' বা কৃষ্ণলীলা ও আরব্য রজনী সিরিজের ছবির প্রিন্টগুলি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতাম—কী গভীর তাদের ভাবব্যঞ্জনা।

তবু ভরিল না চিত্ত, কারণ, আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত ছবির প্রিন্টগুলি আজকের মতো এত উন্নত মানের ছিল না। অনেক সময় তাতে 'কালার স্কীম' স্পষ্ট বোঝা যেত না, পরন্তু কিছু ছবির প্রিন্ট বেশ বিকৃত ছিল রঙের দিক থেকে। পরে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত ছবির প্রিন্ট অরিজিন্যালের সঙ্গে মিলিয়ে এ সিদ্ধান্তে এসেছিলাম। তবে সে সময়ে খুব বেশী অরিজিন্যাল ছবি দেখার সুযোগও আমাদের ছিল না। তাই আমাদের

অবনীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত উপদেশ বাণীর প্রতিলিপি

দ্বিতীয় অভিযান হয়েছিল কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীর অরিজিন্যাল ছবি কোথায় কোথায় দেখতে পাওয়া যায় খুঁজে বার করা এবং তাঁদের রচনা-শৈলীর ইতিহাস জানা বিভিন্ন বই-পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আর শিক্ষকমশায়দের স্মৃতিচারণে। কার্যত আমাদের সেই সোৎসাহ অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি।

সে সময়ে সমধর্মী চিন্তা ও আগ্রহের ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষার্থীদের একটি গ্রুপ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সময় পেলেই আড্ডায় বসা হত, আলোচনার বিষয় থাকত অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যদের রচনা-শৈলীর স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। তখন কিঞ্চিৎ অবনীন্দ্র-চর্চায় মেতে জেনেছি অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথের গুণমুগ্ধ প্রশংসা বাণী—'আমার জীবনের প্রান্তভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে, তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্ম-নিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাক নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। ...আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলার আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারত-বর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। তাই আমি তাঁকে বাংলা দেশের সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে বরণ করি।' আরও জেনেছি—অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-চিন্তায় ভারত-আত্মা-সন্ধানী স্বাদেশিক পটভূমি, যার উল্লেখ আছে নন্দলালের উক্তিতে—'আধুনিক ভারত শিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন, আরম্ভের কারণটা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষ-নজরে। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভরে গেছে। সেই শুভ-লগ্নেই নবজন্ম হল একালের ভারতকলা লক্ষ্মীর।'

একদিন আমাদের সে আড্ডায় এক অবনীন্দ্র-মনস্ক অধিবেশনে সম্ভবত সুমঙ্গলই—সুমঙ্গল সেন—খবরটা দিয়ে প্রস্তাবটা রাখলো ঃ 'অবনবাবু কলকাতাতেই আছেন এখন, তবে শরীর খুব খারাপ, চল না, আমরা একদিন গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসি।' তাঁর শরীর খারাপের কথা শুনে আমাদের এখন যাওয়া সঙ্গত হবে কিনা বা এখন বাইরের কারুর যাওয়াতে চিকিৎসাগত নিষেধ আছে কিনা ভেবে দ্বিধান্বিত হলাম প্রথমে, পর-মুহূর্তে ভেতরের এক উৎসাহের ধাক্কায় বাকি সবাই রাজি হয়ে গেলাম। দিন-ক্ষণও ঠিক হল—সামনের ছুটির দিন ২৩শে মে, সকালের দিকে। আর্ট স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা শুরু হবে। তীর্থযাত্রা—যাত্রী আমরা চারজন—সুমঙ্গল সেন, শান্তি দাস, বিনয় ব্যানার্জী ও আমি।

আজ থেকে ঠিক আঠাশ বছর আগেকার এই পরম স্মরণীয় তীর্থযাত্রার কথা লিখতে গিয়ে স্পষ্ট মনে পড়ছে সেদিন একান্ত নবীন শিল্প-শিক্ষার্থী হিসেবে আমাদের ভেতরের উৎসাহ-উত্তেজনা, অনিশ্চয়তার দ্বিধা ও ভয় মেশা ছটফটানি আর্টস্কুল থেকে 'গুপ্ত নিবাস' পর্যন্ত যাত্রাপথে আমরা যেন চাপতে পারছিলাম না, প্রতি মুহূর্তেই বিভিন্ন আচরণে আমাদের উত্তর-কৈশোরসুলভ চঞ্চলতা পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল। আমাদের স্বপ্ন-লোকের রাজাকে দেখতে চলেছি।

যদিও আর্ট স্কুল থেকে পাওয়া ঠিকানায় জেনেছি—অবনীন্দ্রনাথ আছেন বরানগরের 'গুপ্ত নিবাসে', তবু কলকাতায় নতুন আসা মফঃস্বলের ছেলে হয়ে পথটা আজকের মতো স্পষ্ট ও সহজ-অতিক্রম্য মনে হয়নি সেদিন। তা ছাড়া মনে আছে—মে মাসের সেই তেইশ তারিখে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। সবাই ভেজা জামা-কাপড়ে এস-প্লানেড থেকে খুঁজে খুঁজে বরানগরের বাসে উঠলাম। টিকিট কাটতে গিয়ে মুশকিল হল—কোথাকার টিকিট কাটবো, 'গুপ্ত নিবাস' বাড়ির নামে তো আর কোন বাস-স্টপ নেই, তা ছাড়া সে বাড়ির নিকটবর্তী কোন স্টপ তাও আমাদের জানা নেই। সৌভাগ্যক্রমে বাসেরই এক ভদ্রলোক খবরটা দিয়ে সাহায্য করলেন—বরানগরের রেল-ব্রীজের স্টপে নামলেই চলবে। বাস বরানগর এলাকায় এসেছে শুনেই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। তখনো রেল ব্রীজ চোখে পড়েনি, তবুও কেমন যেন অধৈর্য হয়ে পরের স্টপে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়লাম। বেশ অনেকটা দূরে রেল ব্রীজ চোখে পড়লো। আমরা দারুণ উৎসাহে ছুটে চলার মতো এগিয়ে চলেছি। বিনয় যেকে তার ক্ষ্যাপাটে স্বভাবের জন্য পাগলা দাদু বলে ডাকতাম। মনের আনন্দে গান ধরলো। রেল ব্রীজ পেরিয়ে এলাম, কিন্তু কোথায় 'গুপ্ত নিবাস'। বুঝলাম—সেটা গুপ্তই রয়েছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। রাস্তার দু পাশে চোখ ফেলে চলেছি। একটু পরেই 'ইউরেকা'—রাস্তার বাঁ পাশে একটা পুরনো প্রাচীর সংলগ্ন প্রবেশপথের দেয়ালে সাদা পাথরের ওপর লেখা 'গুপ্ত নিবাস' বের করে ফেললাম। কাঠের ফ্রেমের গেট, দড়ি দিয়ে বাঁধা। গেটের কাছে গিয়ে ফাঁক দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারলাম, কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। শেষে সাহস করে গেট খুলে ঢুকে পড়লাম। ভেতরে নানা গাছ-গাছালী ঘেরা বাগান বাড়ি, ডান হাতে টলটলে জল-ভরা পুকুর, ধারে ধারে বেনা ঘাসের ঝাড়—মৃদু বাতাসে দুলছে। গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে সাবেক আমলের একটা বাড়ি দেখা গেল। বাড়ির কাছাকাছি যেতে দেখি ডান দিকে পুকুর-ঘাট, বাঁধানো পৈঠা। সিঁড়ির শেষ ধাপে একজন লোক ছিপ ফেলে বসে আছে। আমাদের সাড়া পেয়ে সে উপরে উঠে এলো। বললাম, 'আমরা অবনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' লোকটি জানাল, 'এখন উনি বিশ্রাম করছেন, চারটের সময় এলে দেখা হবে।' অগত্যা আমরা এদিক-ওদিক ঘুরে ঐ সময় আবার আসব ঠিক করে গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ভাবলাম, তীর্থযাত্রার পথে শেষ ধাপে এসে বিশ্রামের আয়োজনের মতো হল। এখন বিগ্রহ-দর্শন সুনিশ্চিত।

মনের দ্বিধা-ভয় আমাদের অনেকটা তখন কেটে গিয়েছে। চারদিককার পরিবেশ থেকে যেন একটা খুশির হাওয়া বইছে মনের মধ্যে। বড় রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে শোরগোল করে চা খেতে বসে গেলাম। বিনয়ের উচ্ছ্বাস সব-চেয়ে বেশী—চায়ের দোকানের মধ্যেই আবার গান ধরলো। আমরা বেশ সংকোচ বোধ করছিলাম, ওকে থামাতে চেষ্টা করছিলাম, যদিও আমাদের মনেও আনন্দের একতারা নীরবে বেজে চলেছিল যার সুর ছিল 'একটু পরেই দেখা পাব তাঁর—কথার তারে বাঁধা।'

বেলা চারটের কাছাকাছি আবার সেই পথ ধরে গেটের কাছে আসতেই ভিতর থেকে একজন মালী গোছের লোক গেট খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকে সেই পুকুর ঘাটের পৈঠার কাছে এসে কাউকে দেখতে পেলাম না, এমন কি যে লোকটি ছিপ ফেলে ঘাটে বসেছিল সেও নেই। সবাই পৈঠার ওপর বসে গেলাম। সামনে একটা কাঁঠাল গাছের গুঁড়িতে হেলান দেয়া ভাঙ্গা একটা মূর্তি পড়ে আছে—শান্তি দাস তার স্কেচ করতে লেগে গেল। আমি বিস্ময়ে চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। বন-বাদাড় ঘেরা নিঃশব্দ একটি বাড়ি, তার সংলগ্ন নিঃঝুম একটি জলাশয়, গাছ-পালার ঘন-শীতল ছায়া, ঘন দূর্বার কোমল সবুজ বিস্তার, বেনা ঘাসের স্ফূর্ত উচ্ছ্বাস, বৃষ্টি-ধরা বেলাশেষের নরম গৈরিক আলো—সব মিলে মনের মধ্যে একতারার সেই সুর আরও চড়া পর্দায় বাজছে। হঠাৎ চমক ভাঙলো 'আপনাদের ডাকছেন, আসুন' পেছন থেকে কথাটি কানে যেতেই দেখি অল্প বয়সী এক ভদ্রলোক অদূরে দাঁড়িয়ে।

আমরা তাকে অনুসরণ করে বাড়িতে ঢুকছি। দোতলার সিঁড়ির দিকে যেতে ডান পাশে উঁচু বেদীর ওপর সম্ভবত দেবীপ্রসাদের তৈরী অবনবাবুর জোব্বা পরা দাঁড়ানো একটি মূর্তি রয়েছে। চওড়া সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে দেয়ালে সার দিয়ে টাঙানো ছবিগুলোর মধ্যে মুকুল দে-র সেই বিখ্যাত এচিং—অবনবাবুর প্রতিকৃতি প্রথমে চোখে পড়লো। দোতলায় উঠে গেলাম। রেলিঙ দেয়া প্রশস্ত বারান্দা, অনেকটা দক্ষিণের বারান্দার মতো দেখতে। তারপরেই তাঁকে দেখলাম ঃ চওড়া হাতলওয়ালা লম্বা হেলান-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তিনি বসে আছেন, গায়ে ঢোলা জোব্বা, ব্যাধি-জরায় জীর্ণ-শিথিল দেহ—চোখের দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে নিবদ্ধ, আত্মস্থ মৌন মূর্তি—উন্নত ললাট, তালুতে শুভ্র চুলের বলপতা, নীচের দিকে ঘন কোঁকড়ানো চুল, বুদ্ধদেবের মতো ঝুলে পড়া দীর্ঘ কান, চবুকের তলায় শিথিল চামড়া ঝুলে পড়েছে, টেবা চোখ—যে চোখের ছিল কী অসাধারণ ক্ষমতা—রূপের মাঝে অরূপকে দেখেছেন—সব মিলিয়ে যেন এক সিদ্ধ যোগীপুরুষের মূর্তি।

আমরা এগিয়ে গিয়ে একে একে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে মেঝেতে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লাম। সঙ্গের ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?' বললাম—'আমরা সবাই আর্ট স্কুলের ছাত্র, তবে এখন কেউ এসেছি ঠাকুরিয়া, কেউ কালীঘাট ও কেউ ভবানীপুর থেকে।' এর পর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলাম, স্বর বসে গেছে, কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট, ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় বললেন, 'এত দূর থেকে এসেছ তোমরা?' একটু থেমে আবার বললেন, 'আর্ট স্কুলে সেই Donkeyগুলো এখনো আছে?'

লম্বা পা-ওয়ালা কাঠের তৈরী ছবি আঁকার উচু আসন, সামনে আঁকার বোর্ড হেলান দিয়ে রেখে বাচ্চাদের কাঠের ঘোড়া চাপার মতো দু-ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ছবি আঁকতে হয়—আর্ট স্কুলে এ ধরনের Donkeyর ব্যবহার চলে আসছে অনেক দিন থেকে, তিনি এখনো তা মনে রেখেছেন। বললাম, 'হ্যাঁ, আছে এখনো।'

'কত বছর তোমাদের আর্ট স্কুলে থাকতে হবে?' প্রশ্ন করলেন আবার। বললাম, 'পাঁচ বছর।' 'পাঁচ বছর! এত দিন থাকতে হবে?' টেনে টেনে বললেন, বিস্মিত হলেন যেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে অস্পষ্ট আবার কি যেন বললেন তিনি। উঠে আরও কাছে গিয়ে শুনলাম, হাত দুখানি চিং করে বলছেন, 'কি এনেছ দাও।' শুনে সবাই হকচকিয়ে গেলাম—পাততাড়ির পড়ুয়া, কি দিতে পারি আমরা, কি আমাদের সামর্থ্য, আমাদের দুর্বল ছেলেমানুষী তো ও'র সামনে তুলে ধরার নয়। আমরা একটি করে সাদা খাতা এনেছি সঙ্গে; শুধু আমাদের পাগলা দাদু আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও একমুঠো ছবি ঝোলা ভরে এনেছে। এক অস্বস্তিকর অবস্থা, পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। আবার ভাঙ্গা অস্পষ্ট স্বর—'ঘাটে বসে কি করছিলে সব, কই দেখি।' অবাক হয়ে গেলাম, ঘাটে বসে শান্তি দাস একটু-আধটু দাগ দিচ্ছিল খাতায়, উপর থেকে তাও তিনি লক্ষ করেছেন। বড় বিপন্ন বোধ করছিলাম—কি করা যায় এখন। ইতিমধ্যে দেখি বিনয় তার ঝোলা থেকে ছবির মুঠো বের করে তার হাতে তুলে দিচ্ছে। এই মরেছে—যে ভয় করেছিলাম তাই হল। ওর সেই কিম্ভূত ছবি, ওরই আবিষ্কৃত পদ্ধতির ছবি, নাম দিয়েছে টেপ পেইনটিং—গভীর জোরাল রেখায় ড্রইং করে তাতে নানা স্বচ্ছ রঙের পটি দিয়ে ভরাট করে যেন রঙ-বেরঙের স্বচ্ছ ফিতায় ছবিটি বাঁধা।

তিনি এক একটি করে ছবি দেখলেন, তারপর বললেন, 'এ সব কি এঁকেছ বুঝতে

পারছি না, বুঝিয়ে দাও।' বিনয় এগিয়ে গিয়ে সোৎসাহে বলতে থাকে—'এ হচ্ছে টেপ পেইনটিং—আমার নিজস্ব পদ্ধতি।' তিনি বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। বিনয় আবার বোঝাতে থাকে—'এই নীল বর্ণ হল বিষাদের প্রতীক, লাল ভয়ের—সংসারে দুঃখ, ভয়, আশা আনন্দ... তারই প্রতীক হিসাবে বিভিন্ন রঙের ব্যবহার...।' আমরা লজ্জায় মরে যাই আর কি। আমি পাশ থেকে ওর হাত ধরে মৃদু হেচকা টান মারি। সুমঙ্গল চাপা স্বরে ধমকে ওঠে—'এ সব কি হচ্ছে বিনয়!' শান্তি দাসও বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে থাকে। অতি কষ্টে বিনয়কে ওখানেই থামানো গেল, কিন্তু এতক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমরা মরমে মরে যাচ্ছিলাম এই ভেবে, যিনি রূপ-রঙের রাজা তাঁকে কিনা বোঝানো হচ্ছে রঙের ভাব-ব্যঞ্জনা—ছেলেমানুষী আর কাকে বলে!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে তিনি বলতে থাকেন, 'রঙ নিয়ে তো অনেক দিন ঘেটেছি, কিন্তু এমন সিদ্ধান্তে তো কখনো আসিনি। এ তো রামধনু শাড়ি—মেয়েরা পরে দেখনি।' একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরে বললেন, 'দেখো, রামধনু শাড়ির মতো কিনা।' তারপর একটু মুচকি হেসে বললেন, 'আর্টিস্টদের মাথায় এমনিতে একটু গন্ডগোল থাকে, এসব আবোল-তাবোল ভেবে মাথাটি একেবারে খারাপ করে ফেলো না। চারদিকে কত রূপ কত রঙ ছড়িয়ে আছে, ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখো।' একটু চুপ থেকে আবার বললেন, 'সবচেয়ে কি আঁকা কঠিন বল তো?' আমরা চুপ করে থাকি, সব কিছু আঁকতেই আমাদের কঠিন মনে হয়। তিনি নিজেই জবাব দিলেন, 'আকাশ, আকাশে কত রঙের খেলা দেখো ভাল করে।'

—'কোন রঙ সেরা রঙ বল তো?' আবার প্রশ্ন করেন। এবারেও চুপ থাকি, ও'র কাছেই সব শুনবো; উনিই জবাব দিলেন, 'কালো, কথায় বলে জগতের আলো, জান না? দেখো জাপানীরা চীনারা রঙ ছেড়ে কালি ধরেছে; শুধু কালি দিয়ে কি চমৎকার সব ছবি আঁকছে।'

অসমর্থ শরীর, বার্ধক্য-ব্যাধিতে প্রায়-পঙ্গু, সে অবস্থায় সস্নেহে কত কথা, কত উপদেশ দিলেন, আবার বিনয়ের ছবি নিয়ে মস্করা—এ তাঁর পক্ষেই সম্ভব। জরা-ব্যাধি অতিক্রম করে, পার্থিব সুখ-দুঃখের অতীত রসের জগতে যিনি সিদ্ধকাম, আনন্দলোকে যাঁর বসতি, শারীরিক ক্লেশকে উপেক্ষা করে ছেলে-মানুষীকে পিতামহের দৃষ্টিতে দেখা, অসঙ্গতিকে বিমল হাস্যরসের উপাদানে পরিণত করা—এ সব তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তিনি চুপ করে আছেন দেখে আমি আস্তে আস্তে খাতাখানা ও কলমটি তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিলাম, আশা যে একটি দাগ নিয়ে যাবো, স্মারক-চিহ্ন, তীর্থের স্মৃতি। তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন খাতাটা এবং ধীরে ধীরে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে খাতার এক পাতায় লিখে দিলেন যার আলোক-চিত্র এখানে দেয়া হল।

আমরা কেউ ও'র সামনে মুখ খুলিনি বলেই উনি হয়তো ধরে নিয়েছিলো—আমরা সবাই বিনয়ের 'টেপ পেইনটিং'র সমর্থক। খাতা ফেরৎ পেয়েও তেমনি চুপচাপ রইলাম। তা হোক, তাঁর নিজের হাতের লেখা তো পেয়েছি—তার মধ্যে দুটি অমূল্য কথা আছে—একটি, শিক্ষার্থী থাকা কালে শিক্ষাগত শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে তার পরেই শিল্পীর স্বাধীনতা—স্বকীয় চিন্তার বিকাশ; দ্বিতীয়, ছবি কি এবং কেন? এর চেয়ে সুন্দর করে আর কি বলা যায়?

তারপর শান্তি দাসের খাতায় লিখলেন, 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট—ছবিটা আঁকতো, দেখবো কত বড় আর্টিস্ট হয়েছো।' সুমঙ্গলের খাতায় আঁকা-লেখা নিয়ে অনেক কথা লিখে দিয়েছিলেন।

আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তাঁকে দেখলাম, তাঁর কথা শুনলাম। অসুস্থ তিনি, তাঁকে আর ব্যস্ত করা ঠিক হবে না। কাছে থাকলে আরও কথা বলবেন, ক্লান্ত হবেন। আমরা একে একে প্রণাম করে চলে আসছিলাম। সুমঙ্গল নত হয়ে প্রণাম করার সময় জামার ওপর পকেট থেকে পেন্সিল-তুলি তাঁর পায়ের ওপর পড়ে গেল। তিনি সহাস্যে বললেন, 'দেখো ওগুলো আর যেতে চাইছে না, আমার কাছে থেকে যেতে চায়।' তাঁর এই সরল-সুন্দর পরিহাসটুকু উপভোগ করে আমরাও হেসে উঠলাম। তারপর ফেরার পথ ধরলাম।

তার প্রায় এক বছর পর আর একবার তাঁকে দেখেছিলাম—মহাযাত্রায়, নিমতলা শ্মশানে, এক অপরাহ্নে—এক সূর্যাস্তের সাথে আর এক সূর্যাস্ত। আকাশের বর্ণ-সমারোহ আঁধারের গাঢ় বর্ণের পর্দায় পর্দায় এক সমুদ্র কোন গভীরে হারিয়ে গেল।

আলোচনা

নবীন মেধাবী

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'নবীন মেধাবী' বিষয়ে একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী আলোচনার সূত্রপাত করাতে সর্বাগ্রে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে বহু কথার অবতারণা করে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার প্রতি কৃপণতা প্রকাশ করেছেন। এই পত্র-লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের দেশে মেধাবী নির্বাচন ও নির্বাসন এই দুই প্রহসনের পালা কিভাবে বিজ্ঞানগোষ্ঠী গড়ে তোলার পরিপন্থী তার প্রতি অগণিত সুধী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(১) আমাদের দেশে স্কুল থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত্তি রচনা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন ছাত্র বিজ্ঞান নেবে না কার নিলে ভাল হয় তার কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় না। যদিও শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে এসব পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে বহু মেধা অকালে বিনষ্ট হচ্ছে বা ঠিক মত বিকশিত হচ্ছে না।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সসম্মানে অর্জন করে কিছু ভাগ্যবান ছাত্র-ছাত্রী স্নাতকোত্তর স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা শুরু করেন। আর একই যোগ্যতাসম্পন্ন বাকী ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন কারণে সে সুযোগ পায় না। অথচ দেখা যায় যে যারা স্কলারশিপ পেয়ে গবেষণা শুরু করল, তাদের মধ্যে অনেকেই একটা চাকরি পাওয়া-মাত্র চলে গেল। তার কারণ গবেষণার প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়ে তারা বোকা বনতে রাজী নয়। অথচ যারা প্রকৃতই গবেষণায় ইচ্ছুক তারা সে সুযোগ পায় না।

(৩) স্কলারশিপগুলির পরিমাণ এত অল্প ও অনির্দিষ্ট যে গবেষণায় মন দেওয়ার চেয়ে ছাত্র তার হিসাব-নিকাশ রাখার ও দৈনন্দিন জীবনের খরচ সংগ্রহের দিকেই বেশী মন দিতে বাধ্য হয়।

(৪) যারা সত্যিকার গবেষণা করার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক, কর্তৃপক্ষ কি তাঁদের কোনোরূপ সাহায্য করেন? আর একটা অন্তরায় হচ্ছে আন্ত-র্বিষয়ক সহযোগিতার অভাব। যেমন ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি গবেষণায় জীববিজ্ঞানী, রসায়ন-বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী এবং অন্যান্য সম্পর্কিত বিজ্ঞানীদের একযোগে কাজ করা দরকার। কিন্তু তা হয় না। যিনি প্রকল্প তৈরী করেন, তিনি নিজের মত করেই করেন। তাও আবার কর্তৃপক্ষ অনুদান হিসাবে যা দেবেন সেটা ফিরিওলার কাছে জিনিসের দাম কমানোর মত।

বিভিন্ন যে সব সরকারী প্রতিষ্ঠান গবেষণা কাজে লিপ্ত, সেখানেও নবীন মেধাবীদের পরিস্ফুরণের সুযোগ কেউ দেন না। প্রতিষ্ঠাবান বিজ্ঞানীরা সেখানে কে কোন্ শ্রেণীর অফিসার তাই দিয়ে চিহ্নিত। সুতরাং গবেষণার চেয়ে প্রশাসনের কাজেই তাঁদের অধিক সময় ব্যয়িত হয়।

এই সব বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের কি কর্তব্য নয় পরবর্তী বিজ্ঞানী জেনারেশন তৈরী করে যাওয়া? মুষ্টিমেয়কে পুরস্কার দিন, ক্ষতি নাই—কিন্তু যাদের মধ্যে সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে রয়েছে তাদেরকে পূর্ণতার পথে আলোক প্রদর্শন না ক'রে অন্ধকারে নির্বাসন দিলে কি সমগ্র জাতির ক্ষতি করা হবে না?

সুপ্রিয় ঘোষ মৌলিক
ভুবনেশ্বর-৪

ছবির দাম

৮ জানুয়ারী ৭৭ "দাম দিয়ে কেনার মত ছবি" শীর্ষক পত্রটি পড়লাম। লেখিকা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পষ্টতই বিষয়টি প্রতি-কূল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। সচেতন হলে এতগুলো মোটা মন্তব্য অন্তত প্রকাশ পেত না। যখন দেখি তিনি রোরিক সম্বন্ধে খুবই উচ্ছ্বসিত তখন এ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক পিকাসো মাতিস বা ডালির ছবি যতটা তাঁকে স্পর্শ করে, তার চেয়ে তাঁদের খ্যাতিতে তিনি অধিক বিভ্রান্ত। তিনি না-বুঝেছেন পিকাসো মাতিস, ডালি না দেখেছেন নীরদ মজুমদার, প্রকাশ কর্মকার, গণেশ পাইন।

"নগ্নতাই জীবন" নয় জীবনে নগ্নতা। যুদ্ধ, দাঙ্গা, মহামারী, দেশভাগ যে জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাকে কৃত্রিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঘেরাটোপে ঢাকা যায় না। প্রকাশ কর্মকারের ছবির নগ্নতাটুকু বড় ভয়ংকর। "নগ্নতাই জীবন" এরকম রোমান্টিক ধারণা হয় কি করে!

হাল আমলের সমস্ত শিল্প সৃষ্টির প্রয়াসকে ইয়োরোপের নকল বলে খারিজ করার আগে পত্র লেখিকাকে আর একটু ভেবে দেখতে বলছি। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে মহেঞ্জদারো হরপ্পার কাল থেকে আজ পর্যন্ত শিল্পকর্মের যে ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার সবটাই দেশজ মেধা ও প্রজ্ঞার প্রকাশ নয়। তার অনেকখানি বাইরের আলো হাওয়া ও ভিন্নতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যের ফলে ঘটেছে। ইংরেজরা ইয়োরোপ তথা পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের গাঁট ছড়া বেঁধে দিয়ে এই তো সেদিন বিদায় নিল। বাঙালীর গৌরব এক খণ্ড 'রেনেসাঁ' সে তো পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে ঢুকেছে। গৌরবের নয় কী? পিকাসো মতিস্ বা ডালির সঙ্গে নব্য ভারতের শিল্পীদের আত্মীয়তা থাকলে গায়ত্রী দেবী রাগ করবেন না। একটা সভ্যতা বা সংস্কৃতি পুষ্ট হয়ে ওঠে চিন্তা ও ভাবনার নতুন নতুন সংযোজনের দ্বারা। তা তার ভেতরে ভেতরে ঘটতে পারে কিংবা বাইরে থেকে আসতে পারে। সুতরাং এখনি হতাশ হওয়ার মত অবস্থা কি? তাছাড়া পশ্চিমের কাছ থেকে এমন অনেক কিছুই আমরা গ্রহণ করেছি যা ভারতের মননে ছিল, হাত বদল হয়ে ফিরে এসেছে মাত্র। ছবির ক্ষেত্রে ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। বিমূর্ত শিল্পের জনক ক্যান-ডিনিস্কী যে "ইনার আই" (inner eye) কথা বলেন তা ধ্যানস্থ বুদ্ধ মূর্তির চেয়ে বেশী কিছু শেখায় না।

গায়ত্রী দেবীর বক্তব্য কিছুই হচ্ছে না। না কবিতায়, না শিল্পে, না সাহিত্যে। তাই ভয় হয়, গায়ত্রী দেবীদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে বিপুল প্রতিকূলতার মধ্যেও যে সব শিল্পী সৃষ্টির কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন তাঁদের কপালে অশেষ দুর্গতি আছে।

শিবপ্রসাদ কর চোধুরী
কলকাতা-৬।

॥ ২ ॥

গত ২৪শে পৌষ দেশ পত্রিকায় গায়ত্রী চক্রবর্তীর চিঠি পড়ে মনে হল তিনি যে শুধু আধুনিক শিল্পীদের ছবির আর্থিক দাম দিতেই কুণ্ঠিত তা নয়, শিল্পগত মূল্য দিতেও নারাজ। তিনি ব্যক্তিগত অভিরুচিকেই তাঁর শিল্পবিচারের মাপকাঠি হিসেবে খাড়া করেছেন। শিল্প-বিচারের অনেকখানি যদিও ব্যক্তিগত ভাল লাগার উপর নির্ভরশীল, তবু বিচারের গোড়ার কথা যুক্তি এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সত্যকে উপেক্ষা করার ফলে তাঁর আলোচনা কাল্পনিক, স্ববিরোধী হয়ে গেছে। যেমন প্রথমেই বলতে হয় যে আলোচিত শিল্পীত্রয়ের কাজ বিমূর্ত নয়। তাই শিল্পরচনার অক্ষমতা চাপা দেওয়ার সুযোগও লেখিকার যুক্তি অনুযায়ী এখানে নেই। অবশ্য অঙ্কনের ভাঙাগড়াকে যদি শিল্পী দুর্বল অঙ্কন হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন তাহলেও বলতে হয় কি পাশ্চাত্যের পিকাসো প্রমুখ শিল্পীদের শিল্পধারা, কিংবা প্রাচীন ভারতের চিত্রবীথিতে কোথাও অনুকৃতির বিশুদ্ধতা নেই। দ্বিতীয়তঃ এই তিনজন শিল্পীর কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের, তাই রঙের ব্যবহারে শুধু ধূসরতা, তিনি কিভাবে আবিষ্কার করলেন তা বোঝা দুরূহ, ভাবের দিক থেকেও এই তিন শিল্পীর মিল নেই। নীরদ মজুমদারের ছবি যে তন্ময় রূপকল্প সৃষ্টি করে, প্রকাশ কর্মকারের ছবিতে জীবনের যন্ত্রণা, গণেশ পাইনের ছবিতে যে স্বপ্নময় অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে দুঃখের গোধূলি ধ্বংসস্তূপ ইত্যাদির সংযোগ খুঁজে পাওয়া কঠিন। মোটের উপর আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রসিক যদিও সহজেই শিল্পগুণকে ধরতে পারে বেরসিকের বা অনধিকারীর শিল্পের অ-আ-ক-খ শিক্ষা প্রয়োজন, তা না হলে চোখ থাকলেও দৃষ্টি ঝাপসা থেকে যায়। শেষে এটুকুই বলা চলে যে একান্তই যাঁরা ছবি কিনতে অসমর্থ, তাঁরা অমূল্যে বলে অমূল্যে কেনার চেষ্টা করতে পারেন কিন্তু সোনাকে ভাঙা পেতল বলে ঠকিয়ে কিনতে চাওয়ার উদ্দেশ্যটা অসাধু।

ডঃ দেবাশীষ ভট্টাচার্য
কলকাতা-৩৪

চলতে চলতে

শ্রীযুক্ত বিমল মিত্রের 'চলতে চলতে' খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি, কারণ মরিশাস সম্বন্ধে অনেকদিন ধরে হিন্দী 'ধর্মযুগ' পত্রিকায় বিস্তর লেখা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় তেমন কিছু এ যাবৎ চোখে পড়েনি, তাই মিত্র মহাশয়ের লেখা পড়ে প্রথম জানা গেল যে তুলসীদাসের রামচরিত মানস মরিশাসকে স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছে। বাঘা বাঘা হিন্দী লেখকেরা মরিশাস সম্বন্ধীয় কোন লেখায় এমন কথা যদিও বলেন নি। শুরু থেকে মিত্র মহাশয় যেভাবে তুলসীদাস প্রশস্তি শুরু করেছেন তাতে লেখাটি মরিশাস সম্বন্ধীয় না তুলসীদাস রামচরিত মানস সম্বন্ধীয় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ১লা জানুয়ারী ১৯৭৭ সংখ্যা দেশে এই প্রশস্তি একেবারে তুঙ্গে পৌঁছেছে। লেখকের ভাষায় বলছি—"রামফল এর জবাবে হাজার মাতাল হলেও একটা খাঁটি কথা বললে আমেরিকার লোকেদের কি রামচরিত মানস পড়া আছে যে তারা চুরি করবে না?"

কী অপূর্ব আবিষ্কার! হায় তুলসীদাস সুদূর মরিশাসকে তুমি এমন রাম চরিত্র করে দিলে আর নিজের জন্মভূমিকে কী করলে!

লেখক কি জানেন যে এই ভারতেই জনসমাকীর্ণ বহু পার্বত্য এবং বনাঞ্চল আছে যেখানকার অধিবাসীরা সততা এবং সত্যনিষ্ঠায় প্রায় দেবতুল্য এবং তারা তুলসীদাস বা রামচরিত মানসের নামও শোনেনি? অপরদিকে ভারতের চোর ডাকাত খুনী এবং কালোবাজারীদের বৃহদংশেরই সেরা পীঠস্থান হলো ঐ তুলসীদাসীয় অঞ্চল। যদিও বিরাট হিন্দী ভাষী অঞ্চলের অবশ্য পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ হ'ল রামচরিত মানস।

উক্ত সংখ্যায় মিত্র মহাশয়ের আর একটি উক্তিও হতবুদ্ধিকর। 'ভারতের যে কোন শহরাঞ্চলে নানা কাজে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত লোকজনকে চলাচল করতে হয়। কিন্তু রাত দশটায় পথে বেরোলেই গাড়ি থামিয়ে এ দেশে তাদের সর্বস্ব চোর ডাকাতে লুটে নেয়, এমন কথা শুনিনি।

লুটপাটের ঘটনা যে ঘটে না তা নয়, তবে তা সর্বদাই বিক্ষিপ্ত। রাতের চেয়ে দিনেই বেশী ঘটে।

এ কথা লিখে লেখক ভারতীয় জনতার যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তাতে মনে হয় আমরা এক চরম অসভ্য এবং অরাজক দেশে বাস করছি।

অমিয়া সেন
নতুন দিল্লি ২৪

'চলতে চলতে' সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য

'দেশ' পত্রিকার বিগত কয়েকটি সংখ্যায় আমার 'চলতে চলতে' রচনাটি সম্বন্ধে কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু

পত্র অপ্রকাশিত অবস্থায় আমার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই জানিয়ে রাখা ভালো যে এই পত্র-প্রাপ্তি আমার বিশেষ আনন্দের কারণ হয়েছে। আনন্দের কারণ এই জন্যে যে আমার ধারাবাহিক রচনাটি যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে এই পত্রগুলি তারই প্রমাণ স্বরূপ। কিংবা এও হতে পারে যে রচনাটি পাঠক পাঠিকাদের আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়েছে।

এখন প্রশ্নগুলির জবাব দিতে শুরু করি।

একজন পত্র লেখক লিখেছেন যে ব্রিটিশ-গভর্মেণ্ট সিলোন দেশটি কেন পয়সা দিয়ে কিনতে যাবে! কারণ তাঁর মনের ধারণা সিলোন দেশটি নাকি চিরকালই ভারতবর্ষের অঙ্গ বিশেষ। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে সিংহল বার্মা প্রভৃতি দেশগুলি ভারতবর্ষের যে অংগ বিশেষ ছিল সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু পত্র-লেখক একটা ভুল করছেন যে ইতিহাসের মত ভূগোলও বদলায়। আর তা ছাড়া নিকট-অতীত আর দূর-অতীত বলেও তো কথা আছে। যে-কথা সপ্তদশ শতাব্দীতে সত্য, সে কথা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও যে সত্য হবে এ কথা কে বললে?

সামান্য এই সত্যটির উদ্ঘাটনের জন্যে আমাকে চিঠি লিখে বিরত না করে যে-কোনও পাড়ার লাইব্রেরিতে গিয়ে ইতিহাসের বই অনুসন্ধান করলেই তো এর জবাব পাওয়া যেত। সে কষ্ট স্বীকার যখন তিনি করেন নি তখন উত্তর দেবার দায় আমারই।

যে ইতিহাসের বই থেকে আমি আমার বক্তব্য গ্রহণ করেছি সেটি কোনও দেশীয় লেখকের লেখা বই নয়। খাস ইংরেজের লেখা। সুতরাং পত্র-লেখকের অবিশ্বাস করবার আর কোনও অবকাশ থাকবে না নিশ্চয়ই।

বইটির নাম "A History of Modern Times From 1789" লেখক: D M KETELBEY প্রকাশক: George G Harrap & Co. Ltd. London, Toronto, Wellington, Sydney.

এই গ্রন্থের ৪৬৯ পৃষ্ঠায় যা লেখা আছে তার অংশ বিশেষ আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

"The fourth extension of the British Empire at this time consisted of conquests from France and her allies made during the Revolutionary and Nepleonic wars. The most notable gains were won from Holland, who surrendered the Cape of Good Hope, Ceylon and part of Guiana."

এই ৪৬৯ পাতার নিচের ফুটনোটে লেখক লিখছেন—

"Great Britain in 1815 paid Holland £ 6000,000 in compensation for the Cape of Good Hope, Ceylon and Demerara.

আশা করি পত্র লেখক এই উদ্ধৃতিতে তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে গান্ধীজী ১৯০১ সালে মরিশাসে গিয়েছিলেন কিনা।

যে গ্রন্থ থেকে আমি এই তথ্য পেয়েছি সেটির নাম

"The Truth About Mauritius"

লেখক একজন মরিশীয়। নাম—B Bissoondayal. প্রকাশক: Bharatiya Vidya Bhavan", Bombay.

ডঃ প্রিয়রঞ্জন সেনের একটি ভূমিকা সম্বলিত এই গ্রন্থটির ৪র্থ পৃষ্ঠা থেকে একটি পংক্তির অংশ বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি। সেই পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"It is the neighbouring waterfall that the late Mr A. I. Atchia showed the young lawyer M. K. Gandhi in 1901 during the latter's historic stay...."

এ সম্বন্ধে আর একটি উদাহরণ:—

১৭৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"Abdul Kadir, a graduate of the Bombay University had reached the island before 1901 and was instrumental in getting a reception organised in honour of the young barrister M. K. Gandhi who stayed in the midst of Mauritians for three weeks in that year."

পত্র লেখক বলেছেন মরিশীয়দের লেখা-পড়া শেখবার কথা গান্ধীজী বলতেই পারেন না। ২০০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত দিচ্ছি—

"on his way to India Gandhiji stopped at Port Louis, where the Indian Community gave him a reception. The following version of his speech is based on the local press reports. Mr Gandhi thanked the guests at the gathering and specially the host. He said that the sugar industry of the island owed its unprecedented prosperity mainly to Indian Immigrants. He stressed that Indians should regard it their duty to acquaint themselves with the happenings in their motherland and should take interest in politics. He also laid much emphasis on the urgent need to pay attention to the education of their children."

১৯৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।

"It is a happy accident that drove the Mahatma to our shores. He had not yet attracted the attention of the world to himself when he was going back home from Africa in 1901. His ship reached Port Louis. He has himself made mention of this fact. The thirteenth chapter of 'The Story of My experiments with Truth" opens thus: "So I sailed for home. Mauritius was one of my ports of call, as the boat made a long halt there I went ashore and acquainted myself fairly well with the local conditions. For one night I was the guest of Sir Charles Bruce, the Governor of the Colony."

এ সম্বন্ধে আরো অনেক উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু এর বেশি দিলে মশা মারতে কামান দাগা হয়ে যাবে।

আমার বাবা ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর আগে তিনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন—"আমি চললুম ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো বাবা, তোমার কোনও ভয় নেই।"

তার পরে যখন যন্ত্রণা খুব বাড়লো তখন ডাক্তারবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন—ডাক্তারবাবু, বড় কষ্ট হচ্ছে বুকে—

আর তারপরেই বাবার মৃত্যু হয়।

এখন কোনটা বাবার শেষ কথা আপনারাই বলুন! মৃত্যুর আগে আমাকে তিনি ডেকে যা বলেছিলেন সেইটেই আমি মনে করি বাবার শেষ কথা। ডাক্তারবাবুকে বাবা যা বলে ছিলেন সেটা সময়ের দিক দিয়ে শেষ কথা হলেও আমাকে বলা কথাগুলোই আমি বাবার শেষ কথা বলে এখনও স্মরণ করি।

একজন পত্র লেখক আমার inbreed কথাটির অনুবাদে ভুল ধরেছেন। পত্র লেখককে অনুরোধ করি তিনি Chambers 20th century Dictionaryটা একবার খুলে দেখুন। ৫৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে Inbreed এর অর্থ To breed or generate W[illegible]n."

A T Dev এর ইংরেজী বাংলা অভিধানে লেখা আছে—ভিতরে উৎপাদন করা।" (পৃ. ৬৯৪) পত্রলেখক বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি আমি বার্নার্ড শ'র উক্তিটির অনুবাদ না করে ভাবানুবাদ কথাটা ব্যবহার করেছি।

এ সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু লেখা যেত। বিদ্যাবুদ্ধি-যুক্ত প্রশ্ন হলে প্রশ্ন-কর্তা ও উত্তরদাতা দুজনেরই আনন্দ হয়। কিন্তু সম্প্রতি আমি কলকাতার একটি হাসপাতালে কেবিন-বন্দী হয়ে পড়ে আছি। তারই মধ্যে এই সব অযৌক্তিক প্রশ্ন আমাকে বড় বিব্রত করছে। আমার বিশেষ অনুরোধ যদি সত্যিই কোনও প্রশ্ন করতে হয় আমাকে তো যেন তা যুক্তি-পূর্ণ হয়। ইতি—

বিমল মিত্র

যায় মাসাঞ্জোর কিংবা তারাপীঠের দিকে। শীতের মিঠে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ভ্রমণার্থীরা গায়ে মাখে লাল ধুলো। বাড়ি ফিরেই তারা মেতে ওঠে আনন্দের হাটে। এবার এম সি সি-র খেলোয়াড়রা এসে বুড়ো আইবুড়ো সকলকেই পাগল করে তুলেছিল। একটি বহু প্রতীক্ষিত হিন্দী বইয়ের মুক্তি উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন দুপুরের কার্তিক দিলীপকুমার ও সায়রাবানু। গ্র্যান্ড হোটেলের বাইরে সাবানের ফেনার মতো উপছে পড়েছিল ভিড়। এরই মাঝে প্রদর্শনী। ফুল ও ভাস্কর্যের। কিন্তু ছবি-আঁকিয়েরা গেলেন কোথায়? তারা কি দুয়ো রাণীর ছেলে যে তাদের ডাক পড়লো না? শুধু কিছু ভাস্কর্যই কি সুন্দর এক্সিবিট হিসেবে মানুষের মন ভরাবে? মুরাল বা ফ্রেস্কো নয়? আমার ধারণা, সি এম ডি এ ছবি-আঁকিয়েদের নিয়েও কিছু পরিকল্পনা করেছেন, যার রূপ প্রিন্ট এই মুহূর্তে আমরা জানতে পারছি না। তা ক্রমশ প্রকাশ্য।

ভাস্কর্যের সাহায্যে মানুষের মন ভরিয়ে তোলার কথা বললাম একটু আগে। রামকিংকরের 'মিথুন' ভাস্কর্যটির সামনে দাঁড়িয়ে কিন্তু এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো আমার। সদ্য বিবাহিত এক দম্পতির অনভ্যস্ত চোখ বিমূর্ত ওই ভাস্কর্যটির মাথামুণ্ডু কিছুই ঠাওর করতে পারছিলো না। স্ত্রী বোধহয় জানতে চেয়েছিলেন স্বামীর কাছে—ব্যাপারটা কী? ইংরেজি ক্যাপশন দেখে নিজস্ব অধিকারবোধ থেকে সবজান্তা স্বামী বললেন, স্পষ্ট শুনতে পেলাম,—'বুঝতে পারছো না হূণ আক্রমণের ব্যাপার, আর কি?' ক্যাপশনটি ছিলো এরকম—Mithun, 'Hun' শব্দাংশ দেখে হূণ আক্রমণের কথা চিন্তা একমাত্র বাঙালীর সুদূরপ্রসারী কল্পনাশক্তির পক্ষেই সম্ভব! কে বলে আমাদের কল্পনা-শক্তি নেই? এই 'জিনিস' খুব বেশী মাত্রায় আমাদের মাথায় গিজগিজ করে বলেই তো আমরা বৈচিত্র্যময় পুষ্প প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসেবে বিজেতাদের হাতে অবলীলাক্রমে তুলে দিয়েছি মহার্ঘ [illegible] লক্ষ প্রতিযোগিতায় লভ্য সহজ, সস্তা নিকেলের কাপ ও ট্রফি।

চারুকলার দুটি বার্ষিক প্রদর্শনী

ক্যাথিড্রাল রোডের আকাদমী অফ ফাইন আর্টস এমন একটি জায়গা যেখানে সারা বছর ধরে লেগে থাকে প্রদর্শনীর ভিড়। গ্যালারিগু[illegible] কক্ষে কক্ষে তালা ঝুলতে [illegible] না। প্রদর্শনীতে [illegible] কত রকমের বৈচিত্র্য। ছবি ও ভাস্কর্য তো আছেই, এছাড়াও দর্শকেরা [illegible] হয়ে [illegible] হস্তশিল্পের কারিকুরি কিংবা কাউমবার্ডুম, গ্রাফিক প্রিন্টস, [illegible] আমলের দেশি বিদেশী লিথোগ্রাফ, [illegible] পুতুল ও আরো কত কী। প্রতিটি প্রদর্শনীই হয় আকর্ষণীয়। শুধু কি কলকাতার শিল্পীরা, সারা ভারতের নামী দামী শিল্পীদের হাতের কাজও দেখা যায় এখানে। এমনও হয় যে পাশাপাশি [illegible] [illegible] গ্যালারিতেই চলে বহিরাগত ও স্থানীয় শিল্পীদের চারুকলার প্রদর্শনী, কোনটা ছেড়ে [illegible] লিখবেন [illegible] ক্রিটিকরা। [illegible] কিন্তু লিখতেই হয়। অচেনা প্রতিভাকে তাঁরা যেমন জনসমক্ষে পরিচয় করিয়ে দেন, তেমনিই আবার পরিণত প্রতিভার কাজের পুনর্মূল্যায়নের দায়িত্বও তাঁদের।

এই দায়িত্ব তাঁরা যত্নে [illegible] সম্পন্ন করতে পারেন তাই আকাদমী অফ ফাইন আর্টস তাঁদের সংগ্রহশালায় রেখেছেন প্রাচীন ও হাল আমলের উল্লেখযোগ্য সব কাজের নমুনা যা দেখে সকলেই সম্যক শিক্ষিত হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পেন্টিং এখানের যাদুঘরে দেখা যায়, দেখা যায় রবি বর্মার ছবি। সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের, গগনেন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সব চিত্রকলা। সেমিনার, শিল্প বিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতি আয়োজনে ক্লান্তি নেই কর্তৃপক্ষের। অডিটোরিয়ামে সারা বছর ধরে লেগে থাকে একটার পর একটা নাটকের অনুষ্ঠান যা কলকাতার বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারগুলো বিশেষ যত্নের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। এছাড়াও আছে শিল্পশিক্ষার ক্লাস, যেখানে তরুণ তরুণীরা হাতেকলমে শেখেন চারুকলা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনা কালো একটি মোবাইল আর্ট ভ্যান হাতে এসেছে আকাদমীর। গ্রামের মানুষ যাঁরা আধুনিক শিল্পকলার সঙ্গে [illegible] থাকলেও কখনো পরিচিত হবার সুযোগ

পান না, তাঁদের জন্যে কর্তৃপক্ষ এই শিল্পযানের ব্যবস্থা করেছেন। প্রখ্যাত শিল্পী নীরোদ মজুমদারের 'ত্রিপুরা সুন্দরী' সিরিজের কিছু ছবি নিয়ে এই গাড়িটি শীঘ্রই তার প্রথম গ্রাম-পরিক্রমা শুরু করবে।

সব দিক থেকে সম্পূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান এই চারুকলা আকাদমী। এর বাগানে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বেশ কিছু আধুনিক ভাস্কর্যের নমুনা। বিকেলের সুন্দর নরম পরিবেশে কিংবা সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে তরুণ-তরুণীরা এখানে রত হন বিশ্রম্ভালাপে। যে-জীবন অবহেলা অপমান ও গ্লানির কালিঝুলি মেখে মানুষকে বিষাদের পাতালের দিকে ঠেলে দেয়, সে-জীবন যেন এখানে এলে মুহূর্তের মধ্যেই রঙচঙে হয়ে ওঠে। প্রাণে আসে আনন্দের জোয়ার। সব মালিন্য আর সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়। আর কিছুতেই যদি মন খারাপের কালো বেড়ালটাকে দূর করতে না পারেন ক্যান্টিনে খেয়ে নিন কিছু খাবার, চা বা কফি, নাটক দেখতে পারেন, কিংবা ছবির জগতে হারিয়ে ফেলুন নিজেকে। কোনো আয়োজনেরই ত্রুটি রাখেননি লেডি রাণু মুখার্জী, যিনি এই প্রতিষ্ঠানের হাল ধরে বসে আছেন। কি করে এই প্রতিষ্ঠানকে আরো সুন্দর করে তোলা যায় সে-বিষয়ে তাঁর চিন্তার শেষ নেই। ব্যক্তিগত শিল্পসংগ্রহের অনেকখানিই তিনি দান করেছেন আকাদমীকে, এর পিছনে খরচ করেছেন জীবনের বহু সুসময়। তাই না এই আকাদমী আজ সব দিক থেকে সুন্দর হয়ে উঠেছে, আরো সুন্দর হয়ে উঠছে প্রতিদিন, কালক্রমে তিলোত্তমা রূপে নিজের শ্রেষ্ঠত্বকে পরিগণিত করার জন্যে।

আকাদমীর বৈশিষ্ট্য কিন্তু তার **বার্ষিক চারুকলা প্রদর্শনী।** সারা ভারতের **শিল্পী ও ভাস্করগণ তাঁদের সৃষ্ট শিল্পসম্ভার পাঠান এই প্রদর্শনীতে।** এত ছবি **ও ভাস্কর্য এসে হাজির হয় যে** সবগুলোকে **ঠাঁই দিতে পারেন না কর্তৃপক্ষ; বাছাই করে শেষ পর্যন্ত** যা দাঁড়ায় তার **সংখ্যাও কয়েক শত।** ছবির পর ছবি, **ভাস্কর্যের পর ভাস্কর্য** ঝুলে বা দাঁড়িয়ে **থাকে** মানুষের সমাদর পাবার আশায়। **বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয়** শিল্পী বিকাশ **ভট্টাচার্য ও গণেশ** পাইনের **ছবি ছিলো না প্রদর্শনীতে,** কিন্তু **ছিলো** নীরোদ মজুমদার, **সুনীলমাধব ও ইন্দ্র** দুগারের **ছবি।** যথা**রীতি দর্শকের ভিড় ছিলো তাঁদের** ছবির **সামনে। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় তরুণ শিল্পীরাও।** অন্যান্য রাজ্যের **শিল্পীরা কি ভাবছেন,** কেমনভাবে চালাচ্ছেন **ছেনি,** বাটালি বা **তুলি জানার আগ্রহ তাঁদের স্বাভাবিক। স্বাভাবিক আগ্রহ নিয়েই গিয়েছিলেন অন্যান্য দর্শকরা। তাঁরা** যে সবাই চারুকলার উৎকৃষ্ট নমুনাসমূহের মুখোমুখি হয়ে শিল্পীর **মনের ভাব কিছু** বুঝতে পারলেন তা নয়। এমনও নয় যে তাঁরা ছবি বোঝেন। কিন্তু গলির পোকার **জীবন** থেকে **ক্ষণিকের** মুক্তি পেতে তাঁরা যদি ময়দানে বায়ুসেবনে আসেন এবং এসে দেখেন প্লেয়ারে বাজছে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত এবং ঝকঝকে পরিবেশে সাজানো আছে বেশ কিছু ক্যানভাস ও কাঠ-মাটি-পাথরের বিমূর্ত অবয়ব, তাঁরা কি দূরে থাকতে পারেন? চারুকলার **এমনই** আকর্ষণ যে তখন টিকিট কেটে তাঁদের ঢুকে পড়তে হয় গ্যালারিতে এবং সুখের **কথা** যে, গ্যালারির স্থায়ী বাসিন্দা যে **সব** টিকটিকি, যারা রাতের নির্জন প্রহরে অবলীলাক্রমে চিত্রার্পিত রমণীর বুক, নাভি, তলপেট প্রভৃতি প্রদেশের ওপরে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে কিন্তু ছবির মর্মমোচন

করতে পারে না, তাদের চেয়ে কলকাতার এই তৃপ্ত সুখী নাগরিকবৃন্দ অনেক বেশী চিত্রভুক। কলকাতার পথেঘাটে ছড়ানো আছে চিত্তবিনোদনের অঢেল উপকরণ। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে নাগরিকরা দু' বেলা রেশনের তণ্ডুল বা শর্করার চেয়েও বেশী পান মুঠো মুঠো সস্তা গল্প উপন্যাস। ভালো যে বিনোদনের অঢেল উপকরণকে গৌণজ্ঞান করে তাঁরা ছবির গ্যালারিতে আসেন, ছবি দেখেন এবং অনেকখানি মূল্যবান সময় কাটান অ্যাকাদেমির নন্দন কাননে। এই অভ্যাস আর কিছুদিন বজায় রাখলে, তাঁরা শুধু উপকৃত হবেন না, লাভবান হবেন আমাদের শিল্পীরাও।

শিল্পীদের কথা যখন উঠল এবার আসুন যাই কলকাতা শহরে শিল্পী সৃষ্টির এক অতি পুরাতন 'কারখানা', সেই সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। চৌরঙ্গী রোড তথা আজকের জওহরলাল নেহরু রোডের এই মহাবিদ্যালয়ের আছে এক গৌরবজনক অতীত ইতিহাস, যার মূল্য বঙ্গসংস্কৃতিপ্রেমীর কাছে অপরিসীম।। বিশিষ্ট ভারত পথিক হ্যাভেল ছিলেন এখানে অধ্যক্ষ যিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিক্ষকদের, ফলে সম্ভব হয়েছিলো নব্য বাঙলা রীতির অবিস্মরণীয় সব চিত্রমালার জয়যাত্রা। এক সময়ে এই রীতি সারা ভারতের চিত্রকলার নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যান ধারণাকে বিভাবিত করেছিলো। আজ এই মহাবিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করেন বিকাশ ভট্টাচার্য, গণেশ হালুই, লালুপ্রসাদ সাউ প্রমুখ শিল্পীরা যাঁদের খ্যাতি ভারতীয় ভূগোল পেরিয়ে বাইরেও ছড়িয়ে পড়তে চলেছে। এবার ছিলো এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃষ্ট চারু-কলার ১১৩তম প্রদর্শনী। খুব ভিড় হয়েছিলো প্রদর্শনীতে। এখনকের ছাত্র-ছাত্রীরাই তো আমাদের ভবিষ্যতের শিল্পী। আমাদের বুকের আশা, মনের বল ওরাই। ওদের অনেককেই দেখলাম প্রদর্শনীর আনাচে কানাচে, প্রবেশ দুয়ারে চোখে মুখে প্রবল উৎসাহ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে। গল্পগুজবের মধ্যেও তাঁরা লক্ষ্য রাখছিলেন দর্শকদের, ছবি দেখে কি তাদের প্রতিক্রিয়া তা জানতেও তাঁরা ছিলেন সমান সক্রিয়। দর্শক-রুচি অনুযায়ী কি তাঁরা ছবি আঁকবেন? তা নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু দর্শকের দিকে তো পিঠ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না শিল্পীরা। শিল্পীদের কাছে দর্শকের কি প্রত্যাশা ছাত্রছাত্রীরা জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ভাবের আদান প্রদান হয়েছিলো সাবলীল। এরপর তাঁদের ছবি ও ভাস্কর্য কি চেহারা নেয় আমার জানার আগ্রহ থাকল।

বড়দিন

'বড় হওয়া ভালো, আরও বড় ভালো হওয়া।'—বিশাল এই মহানগরীর বুকে এ রকম একটি চমৎকার বাণীসম্বলিত সাইন-বোর্ডের নিচে, ছড়ানো ঘাসের বুকে এবার আমি অযত্নে ফুটতে দেখেছি বাঙালীর অতি পরিচিত গাঁদা ফুল। কলকাতায় শীতের কথা লিখতে গেলেই, কেন জানি না, বার বার আমার এই দৃশ্যটির কথা মনে পড়ে। শীতের আনন্দ তুঙ্গে ওঠে বড়দিন ও নববর্ষের উৎসবে। দুটি উৎসবের কোনোটিই বাঙালীর নিজস্ব নয়। কিন্তু সাহেবী দুটি উৎসব আজ পরিণত হয়েছে বাঙালীর উৎসবে। বিশেষ করে বড় দিনে বাঙালী বাবু থেকে শুরু করে এমন কি ভিখারী পর্যন্ত নানা স্তরের মানুষ কেক খাওয়ার আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে চান না। কলকাতার বড়দিনের কথা ভাবলেই মনে পড়ে শ্যামবাজার থেকে শুরু করে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র নানা দোকানে কেকের আমদানি। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কিন্তু কথাটা সত্য যে, বাঙালীর প্রিয় পিঠে পার্বণের চেয়েও বেশী জনপ্রিয় কলকাতায় বড়দিনে বাবুদের কেকের উৎসব। বড়দিন অথচ কেক খাবো না—এ যেন আমরা আজ কেউ ভাবতেই পারি না। বস্তুত আজ কলকাতায় বড়দিন মানেই কেক পার্বণ—এমন ধারণা যদি কেউ পোষণ করেন তাঁকে আমরা খুব একটা দোষ দিতে পারবো না।

কিন্তু শুধু কেকের আনন্দে পরিতৃপ্ত থেকে বাঙালী বড়দিনকে ফুরিয়ে যেতে দেয় না। বড়দিন মানে ভ্রমণেরও দিন। তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে তাই সবাই বেড়িয়ে পড়েন। বিড়লা তারা-মণ্ডল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠ রূপান্তরিত হয়ে যায় অঘোষিত মেলার প্রাঙ্গণে। মাস দুয়েকের গোলাপী শিশুকে কোলে নিয়ে এমন কি নতুন প্রসূতিকেও আমি দেখেছি এই মানুষের ভিড়ে। আকাশে আলো বাতাসের রঙই সেদিন বদলে যায়। নানা বর্ণের উলের পোশাকের রঙে মিশে যায় বেলুনের চাকচিক্য। মাঠ ময়দানের সব কিছুই তখন পরম আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন তারামণ্ডলে সৌরজগতের খোঁজ খবর নিতে, তাঁদের অনেককেই দেখেছি বেমালুম ভ্রমণের উদ্দেশ্য ভুলে পাতাল রেল নিয়ে যে ময়দানবিক কাণ্ডকারখানা চলছে সেদিকে মনোযোগী হতে।

নিছক বেড়াতে বেড়াতেই অনেকে এসে পড়েন পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গীপাড়ায়। চোখ কচলে তাঁরা ভাবেন—য়ুরোপে এসে
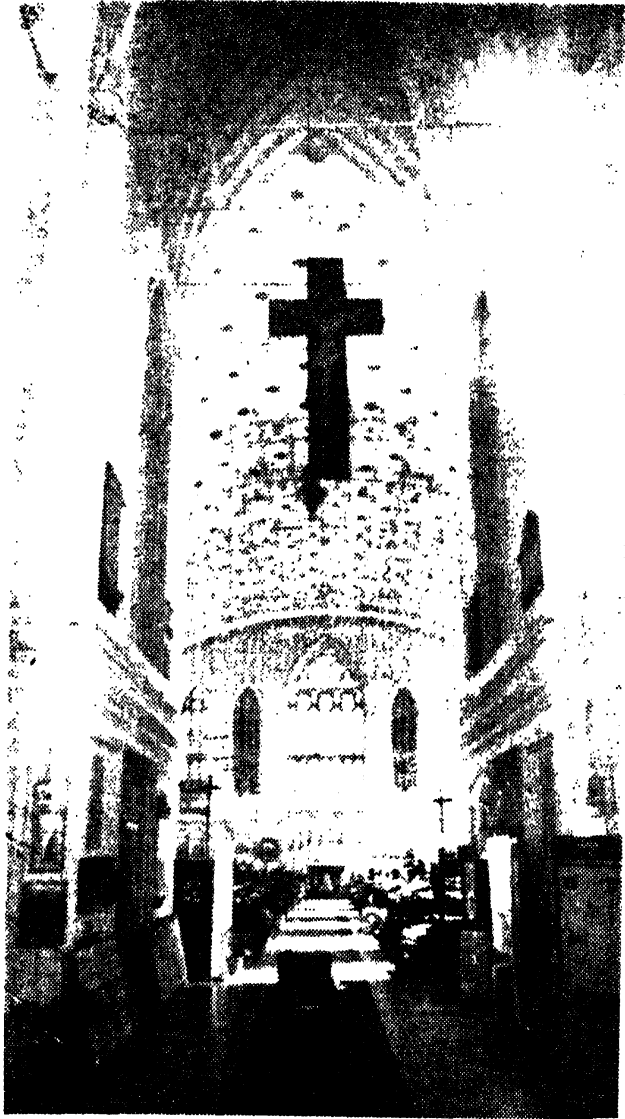
পুণ্য বড়দিনে সেনট পলস্ ক্যাথিড্রাল চারচের অভ্যন্তর। —নিজস্ব চিত্র

পড়িনি তো? হিচহাইকে অভ্যস্ত, সদ্য-দেশে ফেরা বাঙালী যুবক ভিড়ের মধ্যে আপন মনে, চীৎকার করে ওঠেন—'চাংক অফ য়ুরোপ!' সবাই অবাক হয়ে তাকান তাঁর দিকে। হেসে বলে ওঠেন,—মেট্রোয় য়ুরোপের কোনো ছবি টবি দেখে এল বোধ হয়, কিন্তু 'চাংক' শব্দের ওপর এত জোর দিলো কেন?

বার, রেস্টুরেণ্ট, নু-মার্কেট, শো-কেসে উরু ও বক্ষ প্রদর্শনরত ডামি-নারী, বিলাসবহুল, ঝকঝকে নারী পুরুষ, ভুড়ো আতরের গন্ধ, বিলিতি গাড়ি, মাঝে মধ্যে ছড়ানো ছিটনো কিছু সাহেব-মেম, যাদের শুভ্র ধবল হাতে হাত আঙুলে আঙুল—এই বায়োস্কোপের জগত চাক্ষুষ দেখতে দেখতে সস্ত্রীক বাড়ির পথে পা বাড়ালেন সওদাগরী অফিসের প্রৌঢ় এক কেরাণী!

ভুল হবে কি যদি বলি য়ুরোপ সদৃশ ভূখণ্ড কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়া। অনেক রাতে পানশালা থেকে ভেসে আসছিলো মত্ত কলরব। একটি নৈশ ক্লাবের জমাট, ভারী দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন এক বাঙালী সাহেব। দরজা আধখানা খুলল। ভিতর থেকে হৈ হৈ করে ছড়িয়ে পড়ল

বিদেশী গানের উত্তেজনা। গানের কলি বোঝা গেল না। এমন সুর যে শীৎকার বলে ভুল হয়। শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল অনেকের। কিন্তু ওদিকে তখন বন্ধ হয়ে গেছে দরজা। হাওয়া গাড়ি চেপে অন্তর্হিত হয়েছেন সাহেব। নৈশ ক্লাবের কাচের দরজায় ভিখারি বালক শুধু দেখল ভৌতিক ছায়া নৃত্য।

এ রকমই এক ভিখারি বালকের সঙ্গী হয়ে সেদিন আমি দেখেছিলাম এক ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন উদ্যানে যিশু ও মাতা মেরীর অভিনব মূর্তি সংস্থান। ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীতে যে ধরনের কংক্রিটের বিশাল ফাঁপা পাইপ ব্যবহার করা হয়, অনেকটা সে রকম একটা পাইপের ভিতর আশ্রিত হয়েছিলো যিশু ও মা মেরীর অসাধারণ মূর্তি। অগ... শরণার্থীকে এক সময় সাময়িকভাবে কয়েক দিন এ রকম কিছু বড় বড় পাইপে আশ্রয় নিতে দেখেছিলাম। বড় দিনে আবার সে-কথা মনে পড়ল। শুধু মনে পড়ল না, সব শ্রেণীর দুঃখীদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম সবাই।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের মধ্যে ঘর

শংকর

॥ ৩৪ ॥
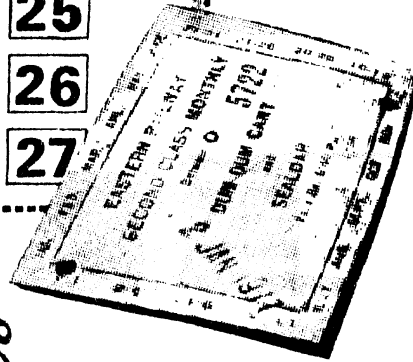
পার্ট টাইম চাকরির প্রলোভনটা আমার নাকের কাছে নিষিদ্ধ ফলের মতো মোহজাল বিস্তার করছে। অতি সামান্য পরিশ্রম, দু' একদিন কামাই হলেও কিছু এসে যাবে না—তার ওপর আমার টাকার প্রয়োজন রয়েছে। সেই কৈশোর থেকে ভাগ্য সন্ধানে দিনরাত্রি বিনা ব্যক্যব্যয়ে সাধ্যমতো পরিশ্রম করে চলেছি—কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত উপার্জন আজও করতে পারি নি। বিপদ-আপদ এবং চাকরির অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো সামান্য সঞ্চয়ও নেই। জেঠমালানি ট্রেডিং কোম্পানির সান্ধ্যকালীন চাকরিটা এই মুহূর্তে আমার সামনে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

কিন্তু এটা চাকরি না টোপ? সাদামাটা এই প্রশ্নটি সোজাসুজি আর সি ঘোষের কাছে তুলে ধরবার মতো সাহসও এই অবস্থায় খুঁজে পাচ্ছি না।

বিড়িতে আর একটা লম্বা টান দিলেন আর সি ঘোষ। "কী এতো ভাবছেন মশায়? রাণীর মন্ত্রী হবার আগেও তো ইংলণ্ডের সায়েবরা এতো ভাবেন না।"

আর সি ঘোষের পলিটিকাল সায়েন্সে জ্ঞান দেখে আমি একটু অবাক হলাম। মনে মনে বললাম, "বড় লোকরা সব সময় বড় চাকরি পায়—ছোটখাট ব্যাপারে তাদের মাথা ঘামাতে হয় না। আমাদের মতো ছোটমানুষের যাত্রাপথে ছোটখাট বিপদগুলোই বিরাট পাথরের মতো পথ বন্ধ করে বসে থাকে।"

আমার মাথায় এখন অন্য চিন্তা তোলপাড় করছে। ঘোষমশায়ের কৃতী এবং প্রবল শক্তিমান জামাতার কাল্পনিক মুখখানা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। হাওড়াবাসী হিসেবে হাওড়ার জামায়ের ওপর আমার স্বাভাবিক দাবিও একটা রয়েছে।

"কী ভাবছেন এতো?" আর সি ঘোষ এবার প্রশ্ন না করে থাকতে পারলেন না।

"আপনার জামায়ের কথা।"

একটু অস্বস্তি বোধ করলেন ঘোষ মশাই। ওঁর জামায়ের কথা অন্য লোক কেন ভাববে, এই রকম কোনো প্রশ্ন হয়তো ওঁর মনের মধ্যে উঁকি মারছে।

একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়তো হলো। আর সি ঘোষ গম্ভীরভাবে বললেন, "অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে, অনেক সাধনা করে, নিজের প্রতিভায় ওরা আই এ এস হয়েছে মশাই। ওদের সঙ্গে কী আর অর্ডিনারি লোকের তুলনা করে চলে?"

আর সি ঘোষ অন্যায় কিছু বলছেন না। ওঁর সঙ্গে দ্বিমত হবার কোনো কারণ নেই।

আর সি ঘোষ সগর্বে বললেন, "বালি ধুয়ে ধুয়ে সোনার দানা কটি গভরমেন্ট বছরের পর বছর তুলে নেয়। লাখে একটা আই-এ-এস হয় না, মশাই।"

লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম, ঘোষ মশাইয়ের জামাই যদি আমাকে একটা সরকারী চাকরি জোগাড় করে দেন।

এই অনিশ্চিত ত্রিভুবনে সরকারী চাকরির মতো নিরাপত্তা আর কোথাও যে নেই তা আমি বিভিন্ন মহল থেকে শুনে ফেলেছি। বেসরকারী উদ্যমের গোলকধাঁধায় সেই কৈশোর থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমি এবার সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু নিয়ম-কানুনের দুর্লংঘ্য গোপন ব্যূহভেদ করে কীভাবে সরকারী চাকরি জোগাড় করতে হয় তা আজও কেউ আমাকে বলে দেয়নি।

অন্য সময় হলে ঘোষমশাই বোধ হয় রেগে উঠতেন। বলতেন, 'হাতের লক্ষ্মী আপনি পায়ে ঠেলছেন, অথচ চাকরির জন্যে হা-পিত্যেশ করছেন।' কিন্তু জামাইয়ের প্রসঙ্গ তোলায় ঘোষমশায় রাগতে পারলেন না। বললেন, "ঠিকই ধরেছেন। ওদের মুখ থেকে কথা বেরোলেই ডজনখানেক লোকের চাকরি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওদের সব সময় জজদের মতো নিরপেক্ষ থাকতে হয়—খুকীকে পর্যন্ত এমন ট্রেনিং দিয়েছে যে, কাউকে কোনো ব্যাপারে সেও রেকমেণ্ড করে না। শুনতে খুব ভাল—আই এ এস-এর বউ; কিন্তু আসলে হাজার অসুবিধে।"

আমার আবেদনের উত্তরটা মিস্টার ঘোষ নিজেই এড়িয়ে যাচ্ছেন নাকি? কিছুক্ষণ কী ভাবলেন তিনি। তারপর বললেন, "ঠিক আছে, তেমন চান্স পেলে একবার বুড়ী ছুঁইয়ে রাখবো। তবে কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবো না—ওই চাকরির আশায় হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না যেন।"

হাত তো দিনরাতই চলছে—চলতে চলতে ক্লান্তিতে কখনও কখনও দেহমন অবশ হয়ে ওঠে। সুতরাং, হাত গুটিয়ে রাখবার অবকাশ কোথায়?

আর সি ঘোষ আমার মনোভাব বোধ

হয় এবার বুঝতে পারছেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন, "বাবুকে তা হলে কী বলবো?"

অপ্রিয় সত্যটা মুখের ওপর ছুড়ে দেবার দুঃসাহস সঞ্চয় করতে পারলাম না। কোনো রকমে বললাম, "জগদীশবাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন। মালিকের অনুমতি না নিয়ে দু' নম্বর চাকরি করতে গিয়ে একুল-ওকুল দুকুলই যেতে পারে। সুতরাং, ওপর মহলে ম্যানেজ না করা পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না।"

আর সি ঘোষ এখনও বোধ হয় তাঁর পুরনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন। জগদীশ জেঠমালানি সম্পর্কে আমার যতই ঘৃণা থাক, তার জন্য আর সি ঘোষের কন্যাগৃহ গমনে আমি বাদ সাধতে চাই না। আমি বললাম, "ভাড়ার জন্যে চিন্তা করবেন না। মেয়ের বাড়ি ঘুরে আসবার জন্যে আপনাকে কোন বিপদে ফেলবো না। আপনার মালিক জিজ্ঞেস করলে সোজা বলে দেবেন আমার সঙ্গে আপনি বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন—আপনাকে নিশ্চিন্তে ছুটি দিতে পারেন তিনি।"

আর সি ঘোষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সামান্য একটি সমস্যার জন্যে মেয়ের কাছে যাওয়াটা তাঁর বন্ধ হবে ভাবে এটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না। আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন মিস্টার ঘোষ, তারপর দুঃখ করে বললেন, "চিরকাল এই চিন্তার বলদ হয়েই রয়ে গেলাম, শংকরবাবু। সন্তানভাগ্য ভাল না হলে এতদিনে আমার হিসেবের খাতায় চোখের জল ছাড়া কিছুই জমা থাকতো না।"

ঘোষের পরবর্তী কথায় জেঠমালানিদের অন্য একটা রূপও প্রকাশ পেলো। মুখে কাটা সুপুরির কুচি পুরতে পুরতে তিনি বললেন, "আপনি আমার হাওড়া কাসুন্দের লোক—আপনার কাছে কিছু চেপে রাখাটা ঠিক হবে না। আমার মালিকদের এতো টাকা—সোনা রুপোয় ছাতা পড়ছে বললেও বাড়ানো হবে না। তবু জগদীশবাবু এ বাড়ির ভাড়াটা একবারের জন্যেও আগাম দেবেন না। কদিন আগে টাকাটা ছাড়লেই তো আমাকে এতো হাঙ্গামা পোয়াতে হত না—গট গট করে এসে আপনার হাতে আগাম ভাড়াটা ফেলে দিয়ে আমি গট গট করে রসিদখানি নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু যেমন মালিক তেমন মুনিবজী। আমাকে বলে কি জানেন?"

মুনিবজী নামক দিশী প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা বিধাতা সম্পর্কে আমার যথেষ্ট আগ্রহ। তাই তাঁর সুবচন শ্রবণের জন্যে ঘোষমশায়ের মুখের দিকে তাকালাম। ঘোষ মশায় চোখ বড় বড় করে বললেন, "পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি। মুনিবজী আমার মুখের ওপর বললেন, আগাম ভাড়া দিয়ে গোলমাল মিটিয়ে মেয়ের বাড়ি যেতে হলে, নিজের পকেট থেকে টাকাটা অ্যাডভান্স করতে হবে।"

"বুঝুন মশাই, এই সব দিশী কোম্পানিতে আমাদের ওপর কী বিচার। বেনামা ভাড়ার টাকাও আমাকে পকেট থেকে আগাম দিতে হবে।"

সুপুরিগুলো মুখের মধ্যে যথাসাধ্য জোরে নিষ্পেষণ করতে করতে ঘোষ বললেন, "এক এক সময় কী ইচ্ছে করে জানেন? গিন্নিকে সেদিন শুয়ে শুয়ে বলছিলাম, জামাইবাবাজীকে রিপোর্ট করে দিয়ে ওই মুনিবজীকে একবার শিক্ষা শেখিয়ে আনি।" কিন্তু এমনই কপাল, গিন্নী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "কথায় কথায় জামাই দেখানোটা তোমার বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। যে অফিসে এতদিন চাকরি করছো, যারা তোমার অন্নদাতা তাদের মুনিবজীকে বিপদে ফেলবার কথা তুমি ভাবছো কী করে?"

দুপুরের একটু পরেই সুলেখা সেনকে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

সুলেখা যে অনেকক্ষণ ধরে সযত্নে প্রসাধন করছে তার প্রমাণ ওর মুখে চোখে ছড়িয়ে রয়েছে। হাতে একটা কাল নরম চামড়ার দস্তথলিকা। প্রচন্ড দামী নয়নমোহন কোনো শাড়ি দেহে জড়ায়নি। একটা হালকা বাদামী রঙের পোস্টকার্ড ইজিপ্সিয়ান কটনের মিলশাড়ি পরেছে সুলেখা। সঙ্গে মানানসই কাপড়ের ব্লাউজ—একেবারে সাদা। রোদকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে চোখে একটা রঙীন চশমা পরে নিয়েছে সুলেখা।

মুখ চোখ ভাব ভঙ্গী ও বিনম্র চলন দেখে এই মুহূর্তে কে তার প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পারবে? তার নিঃসঙ্গ গাম্ভীর্য তাকে রীতিমত ব্যক্তিশালিনী করে তুলেছে। যেন পার্ক স্ট্রীট পাড়ার কোনো ইংলিশ মিডিয়াম কলেজের অধ্যাপিকা সময় সংক্ষেপের জন্য এই ধাকাতে মানুষদের মধ্য দিয়ে শর্টকাট করছেন। অথবা কেন্দ্র আপিসের কোনো আধুনিকা মহিলাকর্মী নির্ধারিত সময়ের আগেই আপিস থেকে বেরিয়ে পদব্রজে নিউ মার্কেট চলেছেন।

হাতে ক্যামেরা থাকলে শ্রীমতী সুলেখার এই চলমান শোভন রূপটি ধরে রাখতাম। কিন্তু কোথায় ক্যামেরা? তাই মনের পটেই একটা অস্পষ্ট ছবি এঁকে রাখতে হলো।

আপিস ঘরের গেটের কাছেই সুলেখার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাল ব্যাগটা ছাড়াও সুলেখার হাতে দু'একখানা বই রয়েছে মনে হলো। সুলেখা তা হলে কী এই দ্বিপ্রহরে কোথাও চাকরি সন্ধানে চলেছে? সিনেমা যাবারও সময় এটা। কিন্তু সাজপোশাকের প্রকৃতি দেখে সিনেমার কথা আমার মাথাতেই আসছে না। চাকরির ইণ্টারভিউ-

র ব্যাপারটাই সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। সুলেখার দিকে আর একবার তাকিয়ে থলাম। ওর সুষম তনুদেহে কোথাও দের বাহুল্য নেই। এ পাড়ার বড় বড় পিসের রিসেপশনে যে সব রমণীদের র্বরত দেখি তাদের কেউই সুলেখার মতো ক্তিত্বশালিনী নন। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে রিসেপশনে কাজ পাওয়া উচিত সুলেখার।
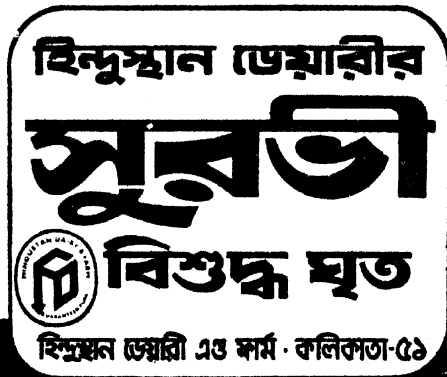
সুলেখাকে একটু অবাক করে দেবার নেই বলে বসলাম, "কোথায় চললেন? ইন্টারভিউতে?"

আশ্চর্য! সুলেখা প্রতিবাদ করলো না। গাম্ভীর্য যথাসম্ভব বজায় রেখেই ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল আমার আন্দাজ ভুল হয় নি।

অন্য যে কোনো সময়ে সুলেখা হয়তো আমার সামনে এসে দাঁড়াতো—কিছুক্ষণ সুখ-দুঃখের কথা বলতো। কিন্তু আজ সে রঙীন কাঁচের আড়াল থেকে মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে নজর দিল, তারপর ওর মুখে ব্যস্ততার চিহ্ন ফুটে উঠলো। বললো, "আর্জেণ্ট।"

এই আমাদের মুশকিল! পৃথিবীর কিছু অভাগা ও অভাগিনীকে সব সময় সময়ের সঙ্গে লড়াই করে টিঁকে থাকতে হয়—তাদের দৈনন্দিন কর্মধারায় সব সময় 'আর্জেণ্ট'-এর রবার স্ট্যাম্প পড়ছে। নিজের ইচ্ছে মতো, সময়মত খেয়ে-দেয়ে শিস দিয়ে ঘোরাফেরার সময় তাদের জীবনে কখনও আসে না।

হয়তো শেষ মুহূর্তে আর্জেণ্ট কোনো চাকরির খবর এসেছে। এই সব শুভ কাজে আর্জেণ্ট স্ট্যাম্প থাকলে আমার আপত্তি নেই।

সুলেখাকে উৎসাহিত করা এবং ভরসা দেওয়া আমার কর্তব্য। মৃদু হেসে তাই বললাম, "ইন্টারভিউয়ের সুখবরটা যেন সন্ধ্যেবেলাতেই পাই।"

রঙীন কাঁচের নিরাপদ আড়ালে ওর চোখগুলোর কী পরিবর্তন হলো তা বোঝা গেল না। কিন্তু এবার তেমন সহজভাবে হাসলো না সুলেখা। একটু থতমত খেলো সে, তারপর ঘাড় নেড়ে সে যেন যথাসময়ে আমাকে সমস্ত খবরাখবর সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিল।

মুহূর্তের ওই থতমত ভাবটা আমার চোখ এড়ায়নি। প্রতিশ্রুতি দেবার এই সামান্য বিলম্ব আমার মনের মধ্যে সাময়িক ছন্দপতন ঘটিয়ে গেল। কর্মহীন অলস অপরাহ্ণে আমার মানসলোক সেণ্টিমেণ্টের বন্যায় প্লাবিত হলো।

সুলেখা আমার কেউ নয়। সামান্য জীবনের সপ্তসুরের সঙ্গে কেন আমি জড়িয়ে পড়ছি?

সুলেখার জন্য আমি প্রার্থনা করছি—ইন্টারভিউটা যেন ওর সফল হয়, ওর সব সমস্যার এবার যেন সমাধান হয়।

কিন্তু এবারেও গোলমাল করে ফেলেছি। সন্ধ্যার আগেই সুলেখাকে ফিরে আসতে দেখা গেল। একটু ক্লান্ত বলে মনে হলো ওকে।

ওকে দেখেই ফলাফল জানবার লোভ হচ্ছিল। কিন্তু নিজে ডেকে প্রশ্নটা করা গেল না—আমার আপিসঘরে তখন অনেক লোক। কর্পোরেশন আপিসের একটা বেয়াড়া লোক এসে নানা রকম কোশ্চেন করে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। ইচ্ছে হয়েছিল লোকটাকে সোজা বিদায় করে দিই, কিন্তু তেলকালিবাবুর উপদেশ মনে পড়ে গেল—জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া এবং কলকাতায় বাড়ি করে কর্পোরেশনের লোকদের সঙ্গে মনোমালিন্য একই জিনিস। ও'রা যতই অন্যায় আবদার করুন, কিছুতেই আমাদের মেজাজ খারাপ করা চলবে না। তেলকালিবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, "প্রপার্টি থাকলেই ক্যালকাটার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে রেগুলার পেন্নাম ঠুকতেই হবে। এই তিনজন দেবতা হলেন : কর্পোরেশন, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং ক্যালকাটা টেলিফোন!"

যাবার পথে সুলেখা আড়চোখে একবার আপিসঘরের দিকে তাকিয়েছিল মনে হল। কিন্তু কাজের চাপে সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারি নি।

কাজের পালা চুকিয়ে ঘরে ফিরে স্নান পর্ব সমাধান করার পর আবার সুলেখার কথা স্মরণ হলো। এই সময় এক বিচিত্র স্যাঁতসেঁতে নিঃসঙ্গতা মাঝে মাঝে এপাড়ার মশক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একযোগে আমাকে আক্রমণ করে। কবে কোথায় কোন্ স্বপ্ন নিয়ে জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলাম এবং ভাগ্যের প্রবাহে অবশেষে কোথায় এসে পড়লাম?

ছোট বেলার সেই রঙীন দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ইস্কুলের মাস্টারমশায় ক্লাসে জিজ্ঞেস করতেন, "তুমি কী হতে চাও?" আমি বলতাম, "আমি খুব বড় হতে চাই। এত বড় যাতে সবাই আমাকে চিনতে পারে। মাস্টারমশায় বিশ্বাস করতেন আমাদের স্বপ্ন সফল হবে, সত্যিই একদিন মস্ত লোক হবো আমরা। তারপর বাবার হাত ধরে যখন মাঝে মাঝে হাওড়া কোর্টে যেতাম তখন মত পালটে ফেলতাম। স্পেশাল ড্রেস-পরা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত জজসাহেবদের দেখে ওই রকম হতে ইচ্ছে করতো আমার। ...আমি জজ হয়েছি—আমি আদালতে প্রবেশ করা মাত্রই পিন-ড্রপ নীরবতা। উকিল মোক্তার পেশকার থেকে আরম্ভ করে পুলিস ও আসামী পর্যন্ত সকলে সসম্ভ্রমে আমার দিকে অর্থাৎ ধর্মাবতারের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু সেই সব স্বপ্ন ঠিকানাবিহীন কোন অরণ্যে লুকিয়ে পড়ে, সংসার সমরাঙ্গণে রেখে গেল সহায়সম্বলহীন, প্রায়-কর্মহীন এক ব্যারিস্টারের সন্তান শংকরকে। জীবনতীর্থের ঘাটে ঘাটে নিরন্তর পরিক্রমা করেও তার দুঃখের অবসান হলো না। পাকেচক্রে অন্ধকার অধঃপতনের আরও কোনো গভীর বিবরে হয়তো আমি বিলুপ্ত হতাম যদি না গণপতিবাবু করুণাভরে আমাকে এই থ্যাকারে ম্যানসনের আশ্রয় খুঁজে দিতেন।

নিজের দুঃখ ভুলবার জন্যেই এই মুহূর্তে আমি চৌত্রিশ নম্বরের সেই অসহায়া সুলেখার কথা স্মরণে আনলাম। সুলেখার কী হলো শেষ পর্যন্ত? একবার খোঁজ করলে মন্দ হতো না। কিন্তু সময় সন্ধ্যা—বিনা নোটিশে এই সময় চৌত্রিশ নম্বরে পদার্পণ অবাঞ্ছনীয় বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে।

কিন্তু আমার আশঙ্কা ভুল। দত্তে সহদেব একটু পরেই একটুকরো চিঠি এনে হাজির করলো, সুলেখা আমার দর্শন-প্রার্থী।

চৌত্রিশ নম্বরের নরম সোফায় সুলেখা সেন সান্ধ্য স্নানের পর প্রস্ফুটিত হয়ে বসে আছে। কিন্তু মুখের ক্লান্তি দূর হয়নি।

সুলেখা বললো, "এত আপনার জন্যে ঢাকার বাখরখানি কিনে এনেছি। চায়ের সঙ্গে খাবেন।"

এই বিশেষ খাবারটি যে আমার প্রিয় তা কথাপ্রসঙ্গে কবে যেন সুলেখাকে বলেছিলাম। কিন্তু খাবারটা যে সব জায়গায় পাওয়া যায় না তাও সুলেখাকে বলেছিলাম।

সুলেখা বললো, "আপিসপাড়ার সামনেই এক বুড়ো বাক্স নিয়ে বসেছিল। দেখে মনে হয় সদ্য পাকিস্তান থেকে ভিটে মাটি ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।"

চায়ের সঙ্গে বাখরখানির আস্বাদ নিতে নিতে ইণ্টারভিউয়ের কথা তুললাম। জানতে চাইলাম, ফলাফল কী হলো?

বুকের কাছে হারের লকেটটা অন্যমনস্কভাবে নাড়তে নাড়তে সুলেখা বললো, "ইণ্টারভিউ দিলেই কি সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল জানা যায়?"
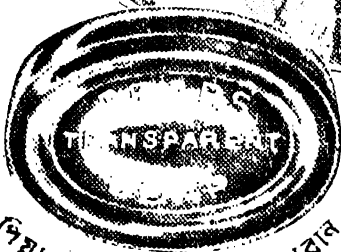
এর পরেই আমি বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ইণ্টারভিউতে ক'জন ছিলেন?"

এবার সুলেখা বেশ দুঃখ পেলো। পকেটখানা ছেড়ে দিয়ে, চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো, "রসিকতা করছেন? এ সব ইণ্টারভিউতে ক'জন থাকেন? একজন—সব সময় একজন। এবং তিনি একাই একশ।"

হিসেবের কোনো একটা বড় ভুল করে ফেলেছি বুঝতে পারছি। বেশ অস্বস্তি অনুভব করছি। চায়ের কাপটা প্রায় পুরো না থাকলে কোনো একটা ছুতো করে সংগে সংগে বেরিয়ে পড়তাম।

মুখটা ঈষৎ বিকৃত করে সুলেখা আমার দিকে তাকালো। সেও বোধ হয় আন্দাজ করছে আমি ভুল বুঝে বসে আছি।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, "ইণ্টারভিউ বলতে আপনি কী বুঝেছেন?"

"কেন চাকরি?"

সুলেখা বেশ বিরক্ত হলো। "চাকরি! আপনার ধারণা বিশ্বসুদ্ধ লোক আমার মতো মেয়েকে চাকরি দেবার জন্যে অফিস খুলে বসে আছে?"

সুলেখা এবার নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "খুলে দেখুন।"

মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ নিজের হাতে খোলা! ওর থেকে চারশ চল্লিশ ভোল্ট এসি লাইনে সুইচ হাত দেওয়া অনেক সহজ। ছোট বেলায় আমার দিদি একবার আমাকে খুব বকুনি লাগিয়েছিলেন, ঠাকুরের সামনে দিব্যি করিয়ে নিয়েছিলেন, মরে গেলেও কখনও মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগে হাত দেবে না। মেয়েদের ব্যাগে হাত দিতে নেই।

আমি হাত গুটিয়েই বসে রইলাম দেখে সুলেখা ব্যাগটা নিজের দিকেই টেনে নিল এবং পট করে বোতাম টেপার শব্দ হলো।

ব্যাগ খুলে ফেলে সুলেখার হাতে বেরিয়ে এল দু'একখানা ছোট বই যা লাইফ ইনসিওর এজেণ্টদের হাতে দেখা যায়। ব্যাপারটা আমার কাছে আরও জটিল হয়ে উঠছে। সুলেখা তা হলে কি কোনো বীমা অফিসে চাকরির চেষ্টা করছে?

সুলেখা এবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। "আমি এখন লাইফ ইনসিওরের এজেণ্ট। করবেন নাকি লাখ টাকার ইনসিওর?"

লাখ টাকা কেন হাজার টাকার বীমা করবার মতো চাকরি-নিরাপত্তা আমার নেই একথা সুলেখা জানে। সুলেখা বললো, "ভ্যালুয়েবল লাইফের পিছনে আমাদের মত মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়।"

পর্যন্ত আমি জানি না। বুদ্ধিটা মিস্টার জগদীশ ঝুনঝুনওয়ালার। উনিই আমার নামে এই এজেন্সিটা করিয়ে দিয়েছেন। কোথা থেকে দু'একটা কেসও আমার নামে কোম্পানির দপ্তরে পাঠিয়ে দেন মাঝে মাঝে। এতে আমার এবং ওঁর দুজনেরই খুব কাজের সুবিধে।"

আমি এখন জীবন বীমার নিগূঢ় রহস্যটা হৃদয়ংগম করতে পারছি না। সুলেখা বললো, "আমার সুবিধে, আমার একটা পরিচয় হইলো। লোকে জিজ্ঞেস করলে বলা যাবে, আমিও কোম্পানির উমেদার—আমারও একটা ভদ্র পেশা আছে। কিন্তু ওঁর লাভ আরও অনেক বেশী। প্রথমে আমিও ভেবে-ছিলুম, এত কাজ থাকতে ইনসিওরেন্স এজেন্সি কেন? কেন এত তাড়াতাড়ি তিনি

আমার নামটা কোম্পানির খাতায় লিখিয়ে এলেন?"

"বিজনেস, বুঝলেন মশায়, বিজনেস!" সুলেখার গলা থেকে বিদ্বেষের তীব্র বিষ ঝরে পড়লো।

"এত বিজনেস করছেন, তবুও মন ভরছে না। আপনার নামে একটা বেনামা ইনসিওরেন্স এজেন্সি রেখে টাকা কামাতে চান ভদ্রলোক?"

মাথা নেড়ে সুলেখা জানিয়ে দিল ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক আন্দাজ করে উঠতে পারি নি।

সুলেখা বললো, "মিস্টার চট্টরাজকে ওই যে এ'টো ভাঁড়ের মতো ধানবাদে ফেলে রেখে আর্জেন্ট কাজের জন্যে কলকাতায় চলে এলাম। হুকুম মতো আসর সাজিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছি। কিন্তু আর্জেন্ট কাজ আর আসেন না। নাম ধাম পরিচয় কিছুই জানি না—রোজ রেডি হয়ে থাকি। রাজাবাবুকে টেলিফোন করি, আর্জেন্ট কাজের কী হলো? রাজাবাবু সব খুলে বললেন না। শুধু জানালেন, মিস্টার আর্জেন্ট কাজ মস্ত লোক, মস্ত চাকরি তাঁর, খুব আর্জেন্টলি তাঁকে দরকার।"

একবার ঢোক গিললো সুলেখা। তারপর বলে চললো, "বুঝলাম, জগদীশবাবু নিজেই কাউকে আমার এখানে নিয়ে আসবার সুযোগ খুঁজেছেন। কিন্তু ঠিকমতো ব্যবস্থা হয়ে উঠছে না। গতরাত্রে জগদীশবাবু অন্য খবর পাঠালেন। টেলিফোনে বললেন, সুলেখা, তোমাকে খুব আর্জেন্ট কাজটা দিতে চাই। তোমার ইনসিওরেন্স এজেন্সিটা এবার একটু কাজে লাগাও।"

দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসারটির নাম ঠিকানা ও পরিচয় দিয়েছেন জগদীশ জেঠ [illegible]। পর্বত যখন মহম্মদের কাছে আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না, তখন মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে! ইনসিওরেন্স এজেন্টের সর্বত্র গমনাগমনের অধিকার আছে, সকলের সঙ্গেই তার দেখা করবার সম্ভাবনা।

জগদীশবাবু টেলিফোনে বলেছেন, সুলেখা, ব্যাপারটা খুব ইমপর্টান্ট এবং খুব আর্জেন্ট। দোর্দণ্ড ওই অফিসারকে আমাদের এই ফ্ল্যাটে আনতেই হবে, এবং এই সপ্তাহেই। সামনের সোমবার উনি কতকগুলো পারমিট ইস্যু করবেন। মোটা টাকা ইনভল্‌ভড।"

সুলেখা বললো, "ইনসিওরেন্স এজেন্সির ব্যাপারটা এবার বুঝছেন?"

আমি কোনো উত্তর দিতে পারছি না। মদনার মুখেই আজ সকালে যে-কথাটা শুনেছিলাম, সেটাই আবার মনে প'ড়ে গেল : কাতলা ছেড়ে মাতলা ধরা।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

নবোকভ

আমরা বলি নবোকভ, বা নাবোকভ। লেখক নিজের নামের নানা উচ্চারণ নানা মুখে শুনতে অভ্যস্ত, রাগ করেন না, বরং ঠাট্টাই করেন, বলেন ঠিক উচ্চারণটা হয় না আপনাদের। তিনি যে উচ্চারণ বলেন বাংলায় তা অনেকটা হবে নাবোকভ্‌অফ। আমি কতটা শুদ্ধ সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ থাকায় যা বলতে আমরা অভ্যস্ত তাই বলি —বলি নবোকভ।

নাবোকভ সম্পর্কে একটি ছোট লেখা পড়লাম বিদেশী পত্রিকায়। অবশ্য লেখাটি সাক্ষাৎকার। পাঠকের যদি কোনো কৌতূহল থাকে হয়ত এই লেখাটি নবোকভ সম্পর্কে কিছু সাধারণ তথ্য প্রকাশ করতে পারে।

নবোকভ খানিকটা বিচিত্র ধরনের মানুষ। থাকেন আল্পস পাহাড়ের নীচে লেক জেনেভার পাশে, সুন্দর, বড় এক হোটেলের ছ ঘরের এক স্যুইট ভাড়া করে। ঘরগুলো ছোট ছোট কিন্তু হোটেলটি চমৎকার। ১৯৬১ সাল থেকে সস্ত্রীক এখানেই আছেন। তাঁর বয়েস এখন সাতাত্তর, মানে যথার্থ বৃদ্ধ। নবোকভ বলেন, নির্বাসিতের পক্ষে এই জায়গাটা চমৎকারই বলতে হবে। বলা বাহুল্য নবোকভ রাশিয়ায় জন্মালেও আমেরিকার নাগরিক।

কাগজের লোকজনের সঙ্গে বড় একটা দেখাশোনা তিনি করেন না, ইন্টারভিউ চাইলেই পাওয়া যায় না। তবু যাঁদের উৎসাহ প্রবল তাঁরা নিশ্চয় একবার আধবার দেখা করার ব্যবস্থা করে ফেলেন।

চেহারায় বেশ ভারিক্কী নবোকভ, বয়েস যথেষ্ট হয়েছে, মুখ দেখলে কতটা যে রুগ্ন ঠিক বোঝা যায় না। শারীরিক ব্যাধি কিছু আছে, যেমন অনিদ্রা, যেমন স্নায়ু-বেদনা। নিজের মুখে এ-সব উপসর্গের কথা বললেও মানুষটিকে ঠিক পঙ্গু বা অথর্ব মনে হয় না। অনেক সজীব দেখায়। মৃদু হাসির সঙ্গে মাঝে মাঝে উচ্চ হাস্য করে ওঠেন।

নবোকভ বলেন যে, তিনি মাছ ধরতে পারেন না, রান্না করেন না, নাচেনও না, তাঁর কোনো জনচাহিদা নেই ব্যক্তি হিসেবে। আনন্দ বলতে তিনি লেখাই বোঝেন। অবশ্য প্রজাপতি ধরাও তাঁর বেশ বলেছেন, রাশিয়ায় তাঁর জন্ম, ইংল্যাণ্ডে তাঁর শিক্ষা, সেখানে তিনি ফরাসী সাহিত্য পাঠ করেছেন যত্ন করে।

নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, আমি উপন্যাসের বিভিন্ন অংশ ধারাবাহিকভাবে লিখি না, কখনো বাড়িতে বসে লিখি, কখনো বাথটাবে শুয়ে, কখনো বনে জঙ্গলে বেড়াতে বেড়াতে। বসার ঘরে প্রজাপতির জাল আর মাইক্রোস্কোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু টেবিলের ওপরও আমি লিখি। তারপর ইনডেক্স কার্ডে পেনসিলে লিখে নি। আমি টাইপরাইটারে লিখি না, টাইপরাইটার যন্ত্র দেখলেই আমার বিরক্তি ধরে।

নিজের লেখা চরিত্রদের সম্পর্কে নবোকভ বলেছেন, আমার অনুমতি ছাড়া আমার চরিত্রদের একটা পাও বাড়াবার উপায় নেই, এমন কি তারা নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিতেও পারে না।

নিজের স্ত্রী সম্পর্কে নবোকভের প্রগাঢ় মমতা। আজ ৫১ বছর তাঁরা বিবাহিত। নবোকভের সমস্ত লেখাতেই তাঁর স্ত্রীর প্রচুর সাহায্য রয়েছে নানাভাবে।

নবোকভের উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলেন, বলেন তাঁর চরিত্র বা স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকে, তারা বিকৃত, খেপা অপরাধী, বগচটা; নিঃসঙ্গ আরও কত কি। লেখক নিজে বলেন আমি তো আমার চেয়ে সুস্থ মস্তিষ্ক কাউকে দেখি নি।

নবোকভ

যে 'লোলিটা' উপন্যাস লিখে নবোকভ রাতারাতি বিখ্যাত ও নিন্দিত হয়েছিলেন সেই উপন্যাসটি কিন্তু আমেরিকার প্রকাশকরা ছাপতে রাজী হন নি। একজন প্রকাশক বলেছিলেন, নবোকভ নিঃসন্দেহে লেখক কিন্তু এই বই আমি ছাপতে পারব না। ১৯৫৫ সালে নবোকভ পাণ্ডুলিপি প্যারিসে পাঠিয়ে দেন, সেখান থেকেই ছাপা হয় উপন্যাসটি।

এ-যাবৎ সতেরোটি উপন্যাস লিখেছেন নবোকভ; নতুন একটিতে হাত দিয়েছেন।

অভিনন্দ

পুস্তক পরিচয়

ভারতের ইতিহাসে ইসলাম

ভারতবর্ষ ও ইসলাম। সুরজিৎ দাশগুপ্ত। শঙ্কর প্রকাশন, ১৫।১ যুগল কিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। দাম পঁচিশ টাকা।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' গ্রন্থে ভারতবর্ষে ইসলামের আগমন ও ভূমিকার একটি নূতনতর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এতাবৎকালের ঐতিহাসিকগণ ইসলামের উপর সুবিচার করেন নি। সেই সুবিচার ও ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাবের পূর্ণ মূল্যায়নের সুকঠিন দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নিয়েছেন।

এ ধরনের দায়িত্ব নেওয়া ভাল। দেশ ও জাতির পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু কিছু মুশকিল আছে। ছিদ্রান্বেষী লোকেরা অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্নটা তুলতে পারে। তার উপর গ্রন্থের সুদৃশ্য জ্যাকেটে লেখক-পরিচয়টা যখন বেশ লম্বা করে দেওয়া আছে। পেশা যাঁর চলচ্চিত্র নেশা যাঁর কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা—এমন একটা জটিল ঐতিহাসিক বিষয়ে এমন একজন লেখকের কথা ইতিহাসের ছাত্ররা শুনবে তো?

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকরা নিরলস গবেষণায় যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তাতে অল্পবিস্তর মতানৈক্য থাকলেও ভারতবর্ষে সুলতান মামুদের তথা ইসলামের অনুপ্রবেশের কারণ উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি সম্পর্কে মোটামুটি কোন মতভেদ নেই। তাহলে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে ডিঙিয়ে আবার আলোচনার প্রয়োজন হল কেন? তবে কি নূতন কোন তথ্য পাওয়া গিয়েছে? অভাবিত কোন প্রমাণ জুটেছে? কোনো অনালোকিত অধ্যায়ের উপর আলোকসম্পাত হয়েছে?

না, তা কিছুই হয়নি। শুধু কথা আর কথা দিয়ে ইতিহাস রচনা। গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সোর্স সম্পর্কে লেখক নীরব। সুলতান মামুদের ভারতবর্ষে আসার অনেক আগেই নাকি মুসলমান সাধকরা উত্তর ভারতে এসেছিলেন। লেখক কোথায় এ তথ্য পেলেন জানান নি। উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে না আছে গ্রন্থের নাম, না আছে পৃষ্ঠা সংখ্যা। পদে পদে সূত্রের উল্লেখ ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থে করতেই হবে। রূপকথা লিখলে সে কষ্ট আর করতে হয় না।

ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কতগুলি মন্তব্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি অনেকের কাছেই আপত্তিকর মনে হতে পারে। সুলতান মামুদ জয়পালকে 'বিধ্বস্ত' করে আরো এগিয়ে থানেশ্বর কনৌজ গোয়ালিয়র কালিঞ্জর প্রভৃতি বিধ্বস্ত করলেন। এবং মথুরার মন্দির জ্বালিয়ে সোমনাথ মন্দির লুট করে দেশে ফিরলেন শুধুই 'পিতৃসত্য' পালনের জন্য—এটা গল্প হিসাবে যতই মুখরোচক হোক, ইতিহাস নয়। যে ভাষায় লেখক সুলতান মামুদের ধ্বংসলীলার বর্ণনা করেছেন, তাতে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নখ ও দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। সুলতান মামুদ নাকি ভারতবর্ষের বদলে চীনও আক্রমণ করতে পারতেন। শুধু "জয়পাল প্রমুখ ভারতীয় রাজন্যদের স্পর্ধা, শঠতা ও সন্ধিভঙ্গের অপরাধে ভারতবর্ষের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। তারপর "গণহত্যা করে ও মন্দিরে আগুন লাগিয়ে ভারতীয়দের উপর তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রতাপের ছাপ গভীরভাবে ফেলতে চেয়েছিলেন এবং সোমনাথ লুট করে তাঁর সামরিক অভিযোগগুলি বাবদ খরচ ও তাঁর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধদের ঔদ্ধত্যের দাম তুলে নিয়েছিলেন" (পৃঃ ৩১)—এটা কি ইতিহাস পড়ছি না সুলতান মামুদের কোনো বংশধরের গ্রাস ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি!

মন্তব্যগুলির মধ্যে এই ধরনের উচ্ছ্বাসের ছড়াছড়ি (১) 'এটা একটা প্রচলিত ধারণা যে এক হাতে কোরান ও অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে (ভারতবর্ষে) ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়েছে' (পৃঃ ১৫)। (২) 'মুসলমানরা যদি সত্যি এক হাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচারের অভিযানে নামতো, তাহলে ইয়োরোপের মত ভারতবর্ষেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চিহ্ন থাকত না' (পৃঃ ১৬)। (৩) 'হিন্দুত্বের সংজ্ঞা ইসলামের উত্থানের ফলে সূচিত হয়েছে' (পৃঃ ৩৫)। (৪) 'এদিক থেকে ইসলামের পর হিন্দু ধর্মের উদ্ভব' (পৃঃ ৩৫)। (৫) কোরানে কাফেরদের ধ্বংস করার জন্য যে জেহাদ আছে তা নাকি গীতায় দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে ঈশ্বরের আবির্ভাবের যে কথা বলা হয়েছে, তার সমতুল্য। ইত্যাদি

মন্তব্য ঐতিহাসিক সত্য উদ্ঘাটনের পরিপন্থী। ভিতিহাসে মামুদ শরীফকে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রতিভূ দেখিয়ে এবং মুকুন্দরামকে কায়েমী স্বার্থরক্ষার প্রতিনিধি বানিয়ে লেখক যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হাস্যকর। এই রকম একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের মাঝখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে টেনে এনে তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' ও 'ব্রিটিশ স্বার্থের অভিজ্ঞ সিন্ধকারী' বলে গালি দেওয়ার মধ্যে লেখক রুচি ও শালীনতা অতিক্রম করে গিয়েছেন।

অমল মুখোপাধ্যায়

কিশোর সাহিত্য

পাতাল আর কতদূরে। সুধাংশু ঘোষ। সিগনেট বুকশপ, কলকাতা-১২। দাম ঃ চার টাকা।

সুধাংশু ঘোষ এমনিতেই একটু ভিন্ন জাতের লেখক। ছোটদের নিয়ে তিনি বেশি লেখেন নি, যদ্দুর মনে হয় এইটিই বড় লেখা। কিন্তু প্রথম হলেও মনে হয় না প্রথম লিখছেন. এতই রপ্ত। শিশু জগতের রহস্য তাঁর চোখের সামনে ভরদুপুর, পথ চিনে নিতে একটুও ভুল হয়নি এবং সহজেই শিশুদের ভালো-লাগা মন্দলাগার জমিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পেরেছেন। তাই 'পাতাল আর কতদূরে' একটি সার্থক রচনা। এর মধ্যে এমন একটি গল্প আছে, যা শুরু থেকেই ভীষণভাবে কৌতূহল জাগায়, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতন। চৌধুরীদের ধসে পড়া বাড়ি ও তার রহস্য, সেই বাড়িতে সংঘটিত এক ভয়ানক ডাকাতির কাহিনী এবং পঁচাত্তর বছর পরে খাতের, যেখানে আগে নদী ছিল, বালি খুঁড়ে লুণ্ঠিত ধনরত্ন উদ্ধারের ইতিবৃত্ত, মাটিতে ডুবে থাকা মোটা লোহার শেকলের সূত্র ধরে একটা নিমজ্জিত চৌধুরীদের বিশাল ময়ূরপঙ্খী নাও-এর অস্তিত্ব খুঁজে বার করা সব কিছুই তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করে পাঠকমনে। এই অভিযানের নেতা তরুণ ইঞ্জিনীয়ার বরুণ, তার সহযোগী সেভেন এইটের ছাত্র রণো, চন্দন, অংশু, সুমন—যাদের কেউ ভাল ফুটবল খেলোয়াড়, মনোযোগী পড়ুয়া বা কবিতা লেখায় অভ্যস্ত। এদের কথাবার্তা, চাল-চলন, কাণ্ডকারখানা সব কিছুই দামাল অথচ সহজ স্বাভাবিক, কোথাও তা অবাস্তব বা কষ্টকল্পিত মনে হয় না। লেখক তারাপদর মত একাধিক চরিত্রের মুখে মজার মজার গল্প বলিয়ে মূল কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিয়েছেন, যা এক নম্বরী

কদাকার নাতি গল্পের মস্ত সম্পদ। গ্রামজীবন ও গ্রাম-প্রকৃতির বিস্তর বর্ণনা আছে, বিশেষ করে প্রকৃতি যেন এই উপন্যাসের প্রেক্ষিত। লেখকের গদ্য চমৎকার, গল্প বলার বৈঠকী মেজাজ সে-গদ্যের প্রাণ। ছোটরা বৈঠকী মেজাজে মাতোয়ারা হয় লেখক জানেন। উপন্যাসের শেষে যে অংশে

রহস্য সমাধান করল কি করে বরুণ তার বর্ণনা দিচ্ছে, সে অংশ পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে। তবে এই অংশে হঠাৎ বুড়ো তাঁতীর নাতির আবির্ভাব ও তার কৃতকর্মের জন্যে বরুণদের কাছে ক্ষমা চাওয়া বেখাপ্পা বা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। মানে খটকা লাগে সুমনের নাকে নিয়েও, তিনি প্রায় সব

উত্রেই এত গম্ভীর বা বিষণ্ণ কেন? এছাড়া ক্ষেত্রেই এত গম্ভীর বা বিষণ্ণ কেন? এছাড়া উপন্যাসটি নিখুঁত। সুখপাঠ্য। এবং শিশু-মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির পর প্রতিষ্ঠিত। ভাল লাগবে সকলের।

অমল আচার্য।

ছোট গল্প

অবিরত চেনা মুখ। অমলেন্দু চক্রবর্তী। আশা প্রকাশনী, ৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ দশ টাকা।

'অবিরত চেনা মুখ' পঞ্চাশ দশকের চিহ্নিত গল্পকার অমলেন্দু চক্রবর্তীর একালে প্রকাশিত গল্পের বই। তাঁর লেখা সুস্পষ্টভাবে বক্তব্যধর্মী, যা একটি বিশেষ সমাজচেতনা, জীবনবোধ এবং কখনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে। বিষয়ের দিক থেকে বইয়ের ন'টি গল্পকে লেখক তাৎপর্যমূলক শিরোনাম সহ চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। মধ্যবর্তী দুটি পর্যায়ের রচনাগুলির কেন্দ্রবিন্দু যথাক্রমে একাত্তর সালের বাংলা দেশ এবং কলকাতা শহর। এই দুটি পর্যায়ের 'ইছামতী রহমান' এবং 'রোহিতাশ্বের নামে' গল্প দুটি বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। প্রথম গল্পটিতে বিভক্ত বাংলার দুই সত্তাকে এক আশ্চর্য নস্টালজিক বেদনার মধ্য দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছেন লেখক। এবং গল্পটির গভীরে এমন এক প্রতিকারহীন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ লুকিয়ে আছে যা পাঠককে অভিভূত করে। দ্বিতীয় গল্পটিতে কলকাতার এক তরুণের হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে স্কুল শিক্ষকের রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিপর্যয় এবং এক নতুনতর উপলব্ধির স্তরে উত্তরণ সার্থক প্রতীকে আভাসিত হয়েছে। অপর দুটি পর্যায়ের গল্পগুলি এতটা সুচিহ্নিতভাবে কাল-নির্ভর নয়। জিজ্ঞাসাও আরো ব্যাপক। 'অবিরত চেনামুখ' গল্পে একটি বয়স্কা মেয়ের রাত করে বাড়ি ফেরাকে কেন্দ্র করে সামগ্রিকভাবে একটি সংসার ও তৎসহ সমাজের অবক্ষয়-অনিশ্চয়তা এবং ভাঙনের ছবিটিকে অব্যর্থভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন লেখক। শুধু শহর নয়, সুদূর গ্রাম-জীবনের মানুষের চিত্র-চরিত্র আঁকার ব্যাপারেও শ্রীচক্রবর্তী সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'কিংবদন্তি' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। দুর্দান্ত খরা এবং তার প্রতিকারের জন্য শ্মশানকালীর পুজোর আয়োজনকে কেন্দ্র করে যে ভয়াল পরিবেশ রচনা করা হয়েছে গল্পটিতে তা লেখকের অভিজ্ঞ দৃষ্টি-ভঙ্গীরই ফসল। ডিটেলস-এর ব্যবহারে শ্রীচক্রবর্তীর হাত রীতিমত পাকা। তবে মাঝে মাঝে তিনি আবেগতাড়িত; যা রচনাকে সুখপাঠ্য করে তুললেও বিষয়কে কখনো কখনো অস্বচ্ছ করে তোলে।

প্রলয় সেন

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শরৎ-সাহিত্যের কোনো নিজস্ব মূল্যায়ন নয়, নয় তাবৎ সমালোচকবৃন্দের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি তুলে শরৎ-সমীক্ষার হুজুগে গা ভাসানো, রমেশ সরকার-এর **শরৎ-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র ও প্রসঙ্গত** (পরিবেশক : দে বুক স্টোরস, কলকাতা-**১২,** দশ টাকা) এক-কথায় বলতে পারা যায়, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। শরৎ-সাহিত্য সমালোচনায় শরৎচন্দ্রকেই তিনি প্রধান উকিল বলে মেনে নিয়েছেন। শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের নানান নিজস্ব ব্যাখ্যা, আত্ম-সমালোচনা, আত্মপক্ষ সমর্থক উক্তি বিভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। শরৎ-চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের কাছে লেখা চিঠিতে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় এবং সভা-সমিতিতে প্রদত্ত নানা সময়ের অভিভাষণের মধ্যে ছড়ানো সেই সব উপকরণ। এগুলি জোগাড় করে, মুখ্যত এরই ভিত্তিতে রমেশ-বাবুর এই বই।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে পড়বে অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল রচিত বিপুল আয়াস-সাধ্য সেই বইটির কথা, যেখানে অবিনাশ-বাবু আরও বড়ো পরিপ্রেক্ষিত বেছে নিয়ে-ছিলেন। শরৎচন্দ্রের যাবতীয় গ্রন্থ-রচনার নেপথ্য লোকের চিত্র, সংক্ষিপ্তসার, শরৎ-চন্দ্রের উক্তি ও ব্যাখ্যার হদিশ—এ-সমস্ত তো ছিলই, এ-ছাড়াও ছিল শরৎ সাহিত্য-জিজ্ঞাসুর যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্যের নির্দেশ। বইটির নাম 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী।' সেই বইটিকে মনে রেখেও রমেশবাবুর এই প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিতে হয়। কেননা, কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থ-কেন্দ্রিক এই নতুন সংগ্রহ কয়েক ক্ষেত্রে বস্তুত অবিনাশবাবুর গ্রন্থটিরই পরিপূরক। পূর্বর্তী গ্রন্থে নেই এমন কিছু উপাদান রমেশবাবু সংগ্রহ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পাশে শরৎ-সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা, শরৎ-সাহিত্যের উন্মেষ, উদ্যোগ ও আত্ম-প্রকাশ পর্ব এবং শরৎচন্দ্রের শিল্প ভাবনা —তিনটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত। সূত্রাকারে শরৎ-জীবনীও সব শেষে জুড়ে দিয়েছেন লেখক।

এই বই পড়ে কোনো-কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যে, এই তথ্যাবলী সবই জানা। কিন্তু সমস্ত জানা তথ্য দুই-মলাটের মধ্যে পেয়ে যাওয়াই বা কম কী?

✻

"পুণ্যে পুত্র, তবে আর ভাগ্যে? ...ভাগ্যে ভার্যা।" এই প্রচলিত প্রবচনকে গল্পের যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এক নবীন ঔপন্যাসিক।

তহশিলদার অনন্ত এই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র। ছোট ভাইদের বিয়ে হয়ে গেছে, ভাই-ভাই- পৃথক ঠাঁই। বোনেদেরও দায়িত্ব কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছে অনন্ত। একলা থাকে এক বাড়িতে, নিজেই রান্না করে খায়দায়। বড়োসড়ো ভাড়াটে বাড়ি। বাড়িঅলার মেয়ে লক্ষ্মী অনন্তকে আত্ম-নিবেদন করতে চায়। প্রায় একপক্ষীয় প্রস্তাব। সরাসরি নাকচ হয়ে যায় লক্ষ্মী। কমবয়েসী কাজের লোক চন্দ্রা অনন্তর মনে সুপ্ত ইচ্ছেকে জাগিয়ে চলে যায়। অবশেষে অনন্ত রাজী হল বিয়ে করতে। বিয়েও হল। কিন্তু ভাগ্যে ভার্যা না থাকলে যা হয়। আকস্মিক এবং মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল অনন্তর স্ত্রী-র। এই কাহিনী।

বক্তব্য যেহেতু পূর্ব কল্পিত, শেষের পরিণতি যত আকস্মিকই হোক—মেনে নিতে হয়। না হলে গল্প শেষ হয় না। কাহিনীর এই শেষাংশ বেশ দুর্বল। অথচ আকারে মাঝারি এই উপন্যাসটিকে মোটা-মুটি স্বচ্ছন্দভাবেই টেনে নিয়ে গিয়েছেন লেখক মৃণাল গুহঠাকুরতা। উপন্যাস হিসেবে **ভাগ্যে ভার্যা** (পূর্ণ প্রকাশন, কলকাতা-৯, দশ টাকা) তাঁর প্রথম রচনা নয়। আরো দু-তিনটি ইতিপূর্বে লিখেছেন। লেখায় এক ধরনের মসৃণ গতি সঞ্চার করতে জানেন তিনি। এই বই-রচনায় মধ্য পথে পারিবারিক একটি চরম আঘাত কীভাবে তাঁকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে, ভূমিকা এবং উৎসর্গ পত্রে তার উল্লেখ রয়েছে। উপন্যাসটি হয়তো এই কারণেই দানা বাঁধতে পারেনি। তাঁর জন্যে নিশ্চিত সমবেদনা বোধ করবেন পাঠক।

—প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

খেলায় বাংলার মেয়েরাই এগোচ্ছে

বাংলায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই লেখাপড়ায় বেশী আগ্রহী বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই তার প্রমাণ মিলছে বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল থেকে। সামগ্রিক হিসাবে অবশ্য কৃতকার্যতায় ছেলের সংখ্যাই বেশী। কিন্তু সংখ্যানুপাতে বাহাদুরিটা বেশী মেয়েদেরই। বাংলার খেলাধুলোয়ও কি এখন সেই হাল?

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ২২তম জাতীয় ভলিবলের ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার মধ্যে বাংলার মেয়েরা কেরালাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতেই প্রাক্তন পুলিস কমিশনার প্রণবকুমার সেন তাঁর পাশে বসা বর্তমান কমিশনার সত্যব্রত বসুর সহ-ধর্মিণীকে চুপি চুপি বললেন, আর দেরী কেন, ওকে মুক্তি দিয়ে আপনি গিয়ে লাল-বাজারে বসুন। এখন তো আপনাদেরই জয়জয়কার। আমরা পিছু হটে যাচ্ছি।

পরের দিন খবর এল বাঙ্গালোরে জাতীয় কবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার মেয়েরা ২০ বছর টানা চ্যাম্পিয়ন মহা-রাষ্ট্রকে ৫—৪ পয়েন্টে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। মেয়েদের এই কৃতিত্বের পাশে আমাদের ছেলেদের কৃতিত্ব মোটেই গৌরবের নয়। জাতীয় ভলিবলে বাংলার ছেলেরা গ্রুপ লীগ পার হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালেই পৌঁছতে পারেনি, অন্ধ্র ও উত্তরপ্রদেশের কাছে হেরে গিয়ে। আর কবাডিতে ছেলেরা সেমিফাইনালে হেরেছে কেরালার কাছে।

দুটি প্রতিযোগিতায় মেয়েদের খেতাব জয় এই কারণে আরও কৃতিত্বপূর্ণ যে, তারা অনমনীয় দৃঢ়তা এবং সংকল্প নিয়ে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করেছে। জাতীয় ভলিবলে কেরালা গত দু বছরের চ্যাম্পিয়ন। ফাইনালে বাংলাকে হারিয়েই খেতাব জেতে। কবাডিতে, আগেই লিখেছি, মহারাষ্ট্র চ্যাম্পিয়ন টানা ২০ বছর ধরে, ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত। এবং শেষের তিন বছর ফাইনালে বাংলাকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়ন হয়। কিন্তু এবার কবাডিতে যেমন বাংলার দীপ্তি ভট্টাচার্য, মণিকা নাথ, গৌরী মজুমদার, রমা সরকার, মীনা সিকদার, চীনা গল, মানসী দাস প্রভৃতি শুরু থেকেই মহা-রাষ্ট্রকে হারাবার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল,—তেমন ভলিবলে দীপ্তি মল্লিক, তপতী মণ্ডল, পুরবী চৌধুরী, লক্ষ্মী সিকদার, মুক্তি বসু, মিতা ঘোষ প্রভৃতির পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা ছিল কেরালাকে হারাবই। উল্লেখ্য ভলিবলে গ্রুপ লীগের চারটি এবং নক আউটের তিনটি মোট ৭টি খেলার মধ্যে বাংলার মেয়েরা ফাইনালে ছাড়া প্রতি খেলা জিতেছে স্ট্রেট গেমে। ফাইনালে গত দু-বারের চ্যাম্পিয়ন কেরালা শুধু বাংলার কাছ থেকে একটি গেম পায় বাংলা পায় তিনটি গেম।

ভলিবলে কেরালার মেয়েরা যথেষ্ট নিপুণ। বিশেষ করে ওদের অধিনায়িকা এলামাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা যায়। লম্বা দোহারা গড়নের মেয়েটির যেমন স্ম্যাশ তেমন সুনিয়ন্ত্রিত লিফটিং। কিন্তু ওকে এড়িয়ে খেলার চমৎকার পরিকল্পনা নিয়ে বাংলার মেয়েরা ৮০ মিনিট ধরে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করে। ফাইনালে নিঃসন্দেহে উওম্যান অফ দি ম্যাচ ছিল পুরবী চৌধুরী। যেখানে স্ম্যাশ বা প্লেস করলে প্রতিপক্ষের কেউ তুলতে পারবে না সেই জায়গায় বল চালিত করে বিস্তর পয়েন্ট আনে পুরবী। অধিনায়িকা দীপ্তি মল্লিকের সার্ভিস, মুক্তি, তপতীর জোরালো এবং চকিৎ মার, সুনিতা ও মিতার ব্লক ও স্ম্যাশ—সব মিলিয়ে বাংলার খেলা ছিল উঁচু তারে বাঁধা। নেতাজী স্টেডিয়ামের ১২ হাজার দর্শক প্রতি পয়েন্ট সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে ওদের উৎসাহিত করে। ঘন ঘন হাততালি দিয়েছেন রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীও। কলকাতায় ভলিবলের ইতিহাসে এমন উত্তেজনাপূর্ণ এবং আনন্দ-দায়ক খেলা আর হয়েছে কিনা সন্দেহ।

জাতীয় ভলিবলে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সার্ভিসেস ফাইনালে

গত বারের রানার্স রেলওয়েজকে ১৫—৫, ১০—১৫, ১৫—১১ ও ১৫—১০ পয়েন্টে হারিয়ে। গত বারের চ্যাম্পিয়ন তামিলনাড়ু এবার গ্রুপ লীগ উতরে কোয়ার্টার ফাইনালেও যেতে পারেনি।

২৭টি পুরুষ দল এবং ২২টি মেয়ে দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভলিবলের অনেক খেলাই এবার দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক এবং উন্নত মানের খেলা দেখা গেছে গ্রুপ লীগে সার্ভিসেস ও রাজস্থানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। দু দলেই ছিল নামী খেলোয়াড়রা। খেলেছেও চোখ ধাঁধানো ভলিবল। বেশ কয়েকবার দেড় দু মিনিট ধরে র‍্যালি হয়েছে। এদের হাত থেকে ওদের হাতে বল ঘোরাফেরা করেছে, স্ম্যাশ উঠে এসেছে অবিশ্বাস্যভাবে। কেউ পয়েন্ট পাচ্ছে না। একবার তো একটি র‍্যালি স্থায়ী হয়েছিল সাড়ে তিন মিনিট। তার চেয়েও বড় কথা, মীমাংসাসূচক শেষ গেমে দৈহিক পটু সামরিক খেলোয়াড়রা যখন শ্রান্ত ক্লান্ত রাজস্থানী খেলোয়াড়দের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পয়েন্টের পর পয়েন্ট সংগ্রহ করছে, ১৪—২ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও রাজস্থান তখনও হাল ছাড়েনি। মরণপণ লড়াই করেছে। ওই ২—১৪ পয়েন্টে তারা পিছিয়ে থাকা কালেও সাইডওভার হয়েছে ৭ বার।

ব্যক্তিগতভাবে অনেকের খেলাই নজর কেড়েছে। সার্ভিসেসের হেম সিং, ইন্দার সিং, নেকিরাম, মহীন্দার সিং, রাজস্থানের সুরেশ মিশ্র, যশজিৎ সিং, রেলওয়েজের অশোক রেড্ডি, জামিৎ খাঁ, এবং চিরতরুণ রিয়াজ আমেদ—কেউ যেন কারো চেয়ে কম নয়। ৩৯ বছর বয়সী রিয়াজের লিফটিং এবং সাপ্লাই এখনো উদীয়মানদের হিংসার ব্যাপার।

মহীন্দার সিং, নেকিরামের মারের গতি প্রচণ্ড। খেলে ঠিক জাপানী স্টাইলে। হিসাব নিয়ে দেখা গেছে নামী জাপানী খেলোয়াড়দের গতিবেগ এরা প্রায় ধরে ফেলেছে। জাপানীদের গতি ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার, এদের ১০০ কিলোমিটারের মত।

দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানের হার

অ্যাডিলেডের প্রথম টেস্ট ড্র হবার পর মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাকিস্তানের ৩৪৮ রানে পরাজয়ের মূলে ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলির অসাধারণ বোলিং এবং দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তান ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা।

টসে জয়ী হয়ে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ৫১৭ রান তুলে দান ছেড়ে দেবার পর পাকিস্তান যোগ্যতার সঙ্গেই বড় রানের জবাব দিতে শুরু করে। ২ উইকেটে সংগ্রহ করে ২৭০ রান। কিন্তু শেষ ৮টি উইকেট পড়ে মাত্র ৬৩ রান যোগ হয়ে। প্রচুর রানে পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানের ৩ উইকেটে ১০৪ রান ওঠার পর শেষ ৭টি উইকেট পড়ে ৪৭ রানের মধ্যে।

অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার আহত জেফ টমসনের অনুপস্থিতি [illegible] করতে দেয়নি অপর ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি। ম্যাচে পেয়েছেন ১২৫ [illegible] ১০টি উইকেট। এ ম্যাচে অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেলের জীবনের ত্রয়োদশ টেস্ট সেঞ্চুরি (১২১), কোজিয়ারের দ্বিতীয় (১৬৮), ম্যাককস-কারের তৃতীয় (১০৫) এবং সাদিক মহম্মদের পঞ্চম সেঞ্চুরি (১০৫) অবশ্য উল্লেখ করার ঘটনা। তার চেয়েও বোধ হয় উল্লেখ্য অস্ট্রেলীয়দের দ্রুত রান সংগ্রহের কথা। চ্যাপেল কোজিয়ারের পঞ্চম জুড়িতে ১৭১ রান যোগ হয় ১৩৯ মিনিটে, কোজিয়ার ওকিফির অষ্টম জুড়িতে ৮১ মিনিটে যোগ হয় ১১৭ রান।

পাকিস্তানের তরুণ বাঁ-হাতি স্পিনার ইকবাল কাসিম ৭টি উইকেট পেয়েছে ২৩০ রানে। প্রথম ইনিংসে সে এক ওভারে মাত্র ২ রান দিয়ে ৩টি উইকেট পায়। ফিরিয়ে দেয় চ্যাপেল, গিলমোর ও মার্শকে।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ৫১৭ (গ্রেগ চ্যাপেল ১২১ কোজিয়ার ১৬৮, টার্নার ৮২, ডেভিস ৫৬, ওয়াল্টার্স ৪২, ইকবাল কাশিম ৪—১১১, আসিফ ইকবাল ৩—৫২)

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস ৩৩৩ (সাদিক মহম্মদ ১০৫, মজিদ খাঁ ৭৬, জাহির আব্বাস ৯০, আসিফ ইকবাল ৩৫, লিলি ৬—৮২, গিলমোর ২—৭৮)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (৮ উইঃ ডিক্লেঃ) ৩১৫ (ম্যাককসকর ১০৫, ডেভিস ৮৮, গ্রেগ চ্যাপেল ৬৭, ইমরান খাঁ ৫—১২২, ইকবাল কাশিম ৩—১১১)।

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস ১৫১ (মজিদ খাঁ ৩৫, জাহির আব্বাস ৫৮, ইমরান খাঁ ২৮, লিলি ৪—৫৩, ওকিফি ৪—৩৮)।

(পাকিস্তান ৩৪৮ রানে পরাজিত)

একলব্য

ম সি সি দলের ১৬ জন খেলো-
: মধ্যে যে পাঁচজন ভারতে আসার
টেস্ট খেলেননি, তাঁদের মধ্যে চার-
টেস্ট অভিষেক হয়ে গেছে ভারতে
র পর। কিন্তু যে ১২ জন ইংলণ্ডের
টেস্ট খেলে এসেছিলেন তাঁদের
ীয় টেস্ট প[র্যন্ত]) দুজন এখনো
র সুযোগ পাননি। একজন মাইক
ড, গত সপ্তাহে যাঁর কথা লেখা
। আর একজন জিওফ মিলার, যাঁর
এ সপ্তাহে লিখছি। এই লেখার
ই শীতের ক্রিকেট অতিথিদের কথা
শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাকি থাকছে
তের খ্যাতকীর্তি ব্যাটসম্যান এবং এম
স দলের ম্যানেজার কেন ব্যারিংটনের
একদিক দিয়ে ব্যারিংটনকে প্রধান
থিও বলা যায়। তাঁর ক্রীড়া-জীবনও
ঘটনাবহুল যে অল্প কথায় এই মহা-
য়াড়ের চরিত্রাঙ্কন সম্ভব নয়।

ক্রিকেট প্রাজ্ঞ এবং বহু অভিজ্ঞতা-
ন একজন খেলোয়াড় দলের ম্যানেজার
স্বাভাবিক কারণেই খেলোয়াড়রা অনু-
া পায়। ভুল-ত্রুটি শুধরে নেবার
গ পায়। প্রয়োজনে পায় উৎসাহ এবং
র্শ। সফল সফরের ক্ষেত্রে ম্যানেজারের
কা অনেকখানি। বিগত গ্রীষ্ম মরসুমে
ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের
ৎ প্রাধান্যের মূলে বোধ হয় ম্যানেজার
ড ওয়ালকটের ভূমিকা কম ছিল না।
শে পর্যন্ত ইংলণ্ড দলকে ভারতে
এসে বাজি মাৎ করছেন কেন ব্যারিং-
ব্যারিংটনের কথায় পরে আসছি।
রের কথাটা সেরে নেওয়া যাক।

ফ মিলার

ভারত সফরকারী দলে মিলারের স্থান
র পটভূমিকা কি? ইংলণ্ড মরসুমে
৫৫ গড়ে ৭৭টি উইকেট এবং ২৫·৬২
৮২০ রান। সুতরাং অলরাউণ্ডারের
য়ে ফেলা যায়। তার উপর ওভালে
নের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের
ইস, হোল্ডিং, হোল্ডার ও ড্যানিয়েলের
র বিরুদ্ধে করেছিলেন ৩৬ ও ২৪ রান।
ণ থাকতে পারে, ওই খেলায় হোল্ডিং
য়েছিলেন ১৪টি উইকেট। ওয়েস্ট
ডজের পাহাড় প্রমাণ প্রথম ইনিংসে (৮
ডিঃ ৬৮৭ রান) মিলার ১টি উইকেটও
য়েছিলেন ২৭ ওভার বল করে। যদিও
টি টেস্টে ৩০ রান গড়ের হিসাব প্রায়
কর ফাঁকি, তবু অধিনায়ক টনি গ্রেগের
০·৩৭) পাশেই ছিল মিলারের গড়
০·০০)।

শীতের ক্রিকেট অতিথি (১৪)

কাউণ্টিক্যাপ না পেতেই এই অফ স্পিনারের উপর ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের নজর পড়ে প্রধানত ভারতের বেংকটরাঘবনের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে সমান তালে বল করায়। সে বছর বেংকট ৩০·৭৫ গড়ে পেয়েছিল ৩১ উইকেট, মিলারের ৪০টি উইকেটের গড় ছিল ২২·০৭। তার পরের তিন

জিওফ মিলার

মরসুমে মিলারের বল পিচে আরও বেশী ঘুরেছে, নিজের সঞ্চয় বেড়েছে, বিপক্ষ ব্যাটসম্যান বেশী সমীহ করেছে। স্কুলের প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড় হিসাবে মিলার ১৯৭০-৭১ মরসুমে ইংলণ্ড স্কুল ক্রিকেট টিমের সঙ্গে আর একবার ভারত সফর করে গিয়েছিল।

আগে নীচের দিকে ব্যাট করত। সাত, আট কিংবা নয় নম্বরে। এখন উপরের দিকে ব্যাট করাচ্ছেন ডার্বিশায়ারের অধিনায়ক এডি বার্লো। টেবল টেনিসেও মিলারের ভাল হাত। গল্ফেও মন্দ নয়।

কেন ব্যারিংটন

নভেম্বরের ২৪ তারিখের ভোরে বোম্বাইয়ের শান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে বোয়িং বিমান থেকে ব্রিটিশ খেলোয়াড়রা নেমেই দেখেন বেশ কিছু ক্রিকেট ভক্তের হাতে কেকের ডালি। বড়দিনের তো এখনো টনের জন্য। ২৪ নভেম্বর ব্যারিংটনের জন্মদিন। ভারতীয় ভক্তদের আপ্যায়নে ব্যারিংটন মুগ্ধ।

দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের পর এক সাংবাদিক অধিনায়ক টনি গ্রেগকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মতে কে এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান? গ্রেগের উত্তর : কেন ব্যারিংটন। সাংবাদিক বললেন, আমি এখনকার কথা বলছি। গ্রেগ বললেন, আমিও বলছি এখনকার কথা।

ব্যারিংটন পাশেই ছিলেন। গ্রেগের উত্তরে অবশ্যই রসিকতা ছিল। কিন্তু ওই উক্তির গূঢ় অর্থও নিশ্চয়ই আছে। সে কথা আমি মুখবন্ধেই বলেছি।

যিনি ৮২টি টেস্টে ৬৮০৬ রান করেছেন, প্রথম শ্রেণীর খেলায় করেছেন ৩১৭১৪ রান ৭৬টি সেঞ্চুরি সহ, তিনি কত বড় ব্যাটসম্যান ছিলেন সে কথা আগামী সপ্তাহের জন্য মুলতুবী রেখে আজ তাঁর ২০টি টেস্ট সেঞ্চুরির হিসাবটা তুলে দিচ্ছি।

শতরান	মাঠ	মরসুম
	অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	
১৩২ *	অ্যাডিলেড	১৯৬২-৬৩
১০১	সিডনি	১৯৬২-৬৩
২৫৬	ম্যানচেস্টার	১৯৬৪
১০২	অ্যাডিলেড	১৯৬৫-৬৬
১১৫	মেলবোর্ন	১৯৬৫-৬৬
	ভারতের বিরুদ্ধে	
১৫১ *	বোম্বাই	১৯৬১-৬২
১৭২	কানপুর	১৯৬১-৬২
১১৩ *	দিল্লি	১৯৬১-৬২
	পাকিস্তানের বিরুদ্ধে	
১৩৯	লাহোর	১৯৬১-৬২
১৪৮	লর্ডস	১৯৬৭
১০৯ *	নটিংহাম	১৯৬৭
১৪২	ওভাল	১৯৬৭
	ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে	
১২৮	ব্রিজটাউন	১৯৫৯-৬০
১২১	পোর্ট অফ স্পেন	১৯৫৯-৬০
১৪৩	পোর্ট অফ স্পেন	১৯৬৭-৬৮
	নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে	
১২৬	অকল্যাণ্ড	১৯৬২-৬৩
১৬৩	লীডস	১৯৬৫
১৩৭	বার্মিংহাম	১৯৬৫
	দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে	
১৪৮ *	ডারবান	১৯৬৪-৬৫
১২১	জোহানেসবার্গ	১৯৬৪-৬৫

অরণ্যদেব ✡ লী ফক

দাস-ব্যবসায়ীরা তোমার বন্ধুকে ধরেছে। ঐ রকমের একটা নৌকোয় নিয়ে গেছে ...
!
তোমাকেও নিয়ে যেত। কিন্তু তুমি তো রোগা-পটকা। ওরা জোয়ান ক্রীতদাস চায়।

ঐ যে, ঐ লোক দুটো!
আমার ভাগ আমি নিলুম!
আমার ভাগটা এ-বারে দাও!

জুলকরের লোকজন ও অরণ্যবাসীরা বৃথাই তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ...

'জুলকর এখন ক্রীতদাস... দাঁড় টানছেন ...'
চালাকি করলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব! আঃ!

আর চালাকি মারবি?
!!
বাঁচাও—!

উঃ!

লোকটাকে বেচে অনেক পয়সা পেয়েছি।
কালকেও কাউকে ধরব!

'জুলকরের বন্ধু জোরি...'
কোথায় বেচেছিস আমার বন্ধুকে?
চলো.. চলো.. দেখাচ্ছি...
৭

আনন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়/ নয়ন পরিচালনা ঃ সুখেন দাস

রঙ্গজগৎ

আলী আকবর-বিলায়েৎ যুগলবন্দী

সংগীত

গত ১৫ই জানুয়ারি এক রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন আচার্য আলাউদ্দিন মিউজিক সারকেল নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। প্রধান আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ ও ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁর পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী যুগলবন্দী। এই ভিন্ন ঘরানার প্রখ্যাত দুই শিল্পী পর্যায়ক্রমে বাজিয়েছিলেন (১) ইমন কল্যাণে আলাপ, জোড়, ঝালা ও বিলম্বিত ও দ্রুত তিনতালে নিবদ্ধ দুটি গৎ (৩ ঘণ্টা ২৭ মিনিট); (২) বিহারী রাগে আওচার, সিতারখানি গৎ ও দ্রুত তিন তালে গৎ (১ ঘণ্টা ৮ মিনিট) ও (৩) ভৈরবীতে আওচার ও মধ্যলয় সিতারখানি ও তিন তাল মিশ্রিত গৎ। তবলা সংগতে ছিলেন মহাপুরুষ মিশ্র ও স্বপন চৌধুরী। একটা কথা আগেই বলে রাখা ভাল— উদ্যোক্তারা দাবি করেছিলেন যে গত কুড়ি বছরের মধ্যে এটিই ছিল প্রথম আলী আকবর-বিলায়েৎ যুগলবন্দী। কথাটা ঠিক হয়েছিল কলামন্দির বা রবীন্দ্র সদনে, বোধহয় ১৯৭২-এ। যা হোক, এ জাতীয় অনুষ্ঠান নিশ্চয় সংগীত প্রেমিকদের কাছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

আলী আকবরই আলাপ শুরু করলেন কিছু গম্ভীর ধ নি-র মীড় দিয়ে। বিলায়েৎ খাঁ একই জাতীয় মীড় বাজাতে গিয়ে দু-দুবার এই রাগের পরিচিত স্বর কোমল নিষাদ লাগিয়ে ফেললেন, অনিচ্ছাকৃত ভাবে বলে তো মনে হল না। কথিত আছে সেনী মতে দুই মধ্যম যুক্ত যে কোন রাগে একটু আধটু কোমল নিষাদ লাগান যায়। এই প্রখ্যাত সেতারী কি এই বিরল প্রথাই অনুসরণ করছিলেন? বোধ হয় না, কারণ এই দুবার ছাড়া আর কোথাও কোমল নিষাদের প্রয়োগ হয়নি। কাজেই আলাপের প্রথমেই এই রসিকতাটুকুর প্রশংসা করা গেল না।

আলী আকবর তাঁর সরোদে মর্মস্পর্শী ন গ র ধ ম স নে মন্দ্র সপ্তক। মীড় বিস্তারে মগ্ন হলেন। বিলায়েৎ খাঁ কয়েকটি গান্ধারস্পর্শী মীড় বাজিয়েই জোরদার ড্রে-ডা বোলযুক্ত মীড়-বিস্তার আরম্ভ করলেন। আলী আকবর দু-একটি সুন্দর র গ র মীড় বাজিয়ে একটা আনন্দদায়ক ধাঁধার সৃষ্টি করলেন (একটু দেশ-দেশ লাগছিল যেন) এবং সংগে সংগে ন র গ পকড় লাগিয়ে [illegible] একেবারে আলী আকবরী ব্যাপার।

এর পর এল কিছু দামী লপেট অঙ্গের মীড়। বিলায়েৎ খাঁ মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চমে নেমে গিয়ে কিছু প ধ, প ধ হ্ম প বিস্তার করলেন। তারপর মধ্যসপ্তকের ষড়জে ফিরলেন খাঁটি কল্যাণ অঙ্গের প হ্ম প স দিয়ে। কিছু সঞ্চারীবর্ণের কাটা কাটা কাজও করলেন। আলী আকবর তাঁর র প হ্ম গ, র গ হ্ম গ র গ বিস্তারে সেই পুরনো মাধুর্য ও জাদুকরী আবেগ ভরে দিলেন। শুদ্ধ মধ্যমও লাগালেন এই আলাপে প্রথমবার। বিলায়েৎ খাঁ লম্বা লম্বা র-হ্ম মীড় দিয়ে র হ্ম গ বিস্তার করলেন। আলী আকবর সঙ্গে সঙ্গে খাদের তারে বাজিয়ে চললেন, অনুকরণ করে নয়, সংযোজন করে। বিলায়েৎ খাঁ এবার তাঁর ম হ্ম গম র গ ন র কেন্দ্রিক ছন্দযুক্ত মীড়-খণ্ডের বাহার মেলে ধরলেন, গ ম র গ (শুদ্ধ মধ্যম) বাজালেন অকারণে। গ ম ও র গ দুই-ই ইমন কল্যাণে আছে। কিন্তু দুটি জুড়লে একটি গ ম র বিন্যাসও এসে যায়। কাজেই ইমনি বিলাবলের ছায়া আসে। বাজিয়েই অবশ্য খাঁসাহেব একটু হাসলেন।

আলী আকবর অবরোহী বিস্তার করতে করতে মন্দ্র পঞ্চমে নেমে গেলেন ও বিলায়েৎ খাঁ মধ্যসপ্তকের পঞ্চমে উঠে গিয়ে মদত দিতে লাগলেন। আলী আকবর কিছু প হ্ম কৃন্তন বিস্তার করে একটি অদ্ভুত চার স্বরের ছবি আঁকলেন যা আমার খাতা-কলমকে হারিয়ে দিল। আনন্দে ঘেমে উঠলাম—একেই বলে জিনিয়াস!

এরপর শুরু হল মনমাতানো হ্ম ধ ন ও প ধ ন বিস্তার। সত্যই চিরস্মরণীয় হয়েছিল এই অংশ আলী আকবরের বিচিত্র স্বরপ্রয়োগে ও বিলায়েৎ খাঁর আশ্চর্য দীর্ঘস্থায়ী মীড়ের মাধ্যমে। আলী আকবর দু-একবার বেসুরো হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তাতে এই অংশের মহত্ব ক্ষুন্ন হয়নি।

এর পর দুই শিল্পী অন্তরার ষড়জে যাব যাব করে আবার খাদের দিকে নেমে যাওয়ার খেলায় মাতলেন। বিলায়েৎ খাঁ নিষাদ অবধি উঠে গিয়ে ধ প হ্ম প স (প্রথম তিন স্বর মন্দ্রসপ্তক) দিয়ে মধ্য-সপ্তকের সা-তে দাঁড়াতে থাকলেন। আলী আকবর মজাটা বুঝে হাসলেন, মাথা নাড়লেন, শুদ্ধ মধ্যমও লাগালেন কয়েক বার বড় সুন্দর ভাবে। কিছু আশ্চর্য দীর্ঘ মীড় ও লপেট বেরিয়েছিল তাঁর সরোদের খাদের তার থেকে, কিন্তু তাঁর অন্তরা পর্বে যাওয়ায় কোন মজা ছিল না, বুঝতেই পারলাম না কখন তিনি অন্তরার সা-তে গেলেন।

বিলায়েৎ খাঁ অবশ্য চরিত্রগত নাটকীয়তার সঙ্গেই অন্তরার সা-তে গিয়েছিলেন প ধ প স ও হ্ম ধ প স (স তারসপ্তক) দিয়ে। বেশ কিছু আশ্চর্য তারসপ্তকের মীড়ও বাজিয়েছিলেন এর-পরে।

আলী আকবর অতি-তারসপ্তকে গিয়ে বেসুরো হয়ে পড়লেন ও বিলায়েৎ খাঁ চকিতে অতি তার-ষড়জ, এমন কি পঞ্চমে, গিয়ে সেই বেসুরকে শ্রোতার মনে দাগ কাটতে দিলেন না। অবশ্য একটু পরেই তিনিও এই সপ্তকে বেসুরের খপ্পরে পড়েছিলেন একই ভাবে উঠেছিলেন একই ভাবে। এরপর তিনি নিপুণভাবে আলাপটিকে গুটিয়ে নিলেন।

জোড়ও আলাপের মতই বিস্তৃত ও মহত্বমণ্ডিত হয়েছিল এবং তার বর্ণনাও ন্যায্যত আলাপের বর্ণনার সমান হওয়া উচিত। কিন্তু তা করতে গেলে দেশ পত্রিকার আরেকটি সংখ্যা লেগে যেতে পারে, কাজেই সংক্ষেপে লিখছি।

প্রথমার্ধে ছিল কৃন্তন, লপেট ভিত্তিক চিমে ছন্দের কাজ। খাদের তারে আলী আকবরের বিখ্যাত সুরের নকশা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছিল বিলায়েৎ খাঁর জুড়ির পিয়ানোধর্মী স্বরের আলপনা।

নেতাজী স্টেডিয়ামে যুগলবন্দীর আসরে আলী আকবর খাঁ ও বিলায়েৎ খাঁ

ফটো : দেশ

চার-পাঁচ স্বরের নকশায় সওয়াল-জবাব শে ভাল হয়েছিল। মীড় তারপরণ অঙ্গের জও ভাল হয়েছিল। জায়গায় জায়গায় নে হচ্ছিল একই শিল্পী দুই যন্ত্র জাচ্ছেন।

বিলায়েৎ খাঁ দুর্ধর্ষ দিবসপ্তকব্যাপী মক, সপট ও জমজমা তান করেছিলেন। আলী আকবর নিপুণ ভঙ্গিতে বাজিয়েছিলেন লড়-লপেট, লড়ি-কুন্তন ও কুন্তনভিত্তিক দ্রুত মীড়খণ্ড ও তোড়া। বিলায়েৎ র তানের জবাবে তিনি কিছু বোলপ্রধান তোড়া বাজিয়েছিলেন হাসতে হাসতে, যেন লছিলেন বাজনার মধ্যে দিয়ে 'সরোদে তো ব্যাপারটা করা আবশ্যক নয়, কাজেই বাল দিয়েই যা করতে পারি করছি।'

ঝালাপর্বও বেশ ভাল হয়েছিল। ঠোক্ ঝালা অঙ্গের তান-তোড়ায় আলী আকবরের সুবিধা হচ্ছে না দেখে বিলায়েৎ ঘষিৎ ও ছন্দভিত্তিক কাজের দিকে চলে যান। শেষের দিকে বিলায়েৎ খাঁ আর কিছু তানকারি করেন—তাঁর কাছেও এত ভাল তান শুনিনি।

বিলম্বিত গৎ বেশ ভাল হয়েছিল। আলী আকবর অতুলনীয় ঢঙে ছন্দ ও স্বরের আশ্চর্য মিশ্রণ করেছিলেন। ভাল মধ্যলয়ে মীড়খণ্ড ও উপেজ বাজিয়েছিলেন। বিলায়েৎ খাঁর তান-তোড়াতে স্বাভাবিক নিপুণতা তো ছিলই, সুরেলা বিআড়ি ছন্দের কাজও ছিল। জবাবে আলী আকবর বিআড়ি ও আড়ি ছন্দ মিশিয়ে লয়কারির এক বিচিত্র নিদর্শন রেখেছিলেন। পরে নিপুণ কুট ছন্দের খেলা দেখিয়েছিলেন।

দুই তবলিয়ার মধ্যে মহাপুরুষ মিশ্রের বাজনাই বেশী ভাল লেগেছে। স্বপন চৌধুরীও যথেষ্ট ভাল বাজিয়েছেন কিন্তু মহাপুরুষ তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞতাও অনেক বেশী, কাজেই মহাপুরুষের বাজনায় বেশী শিল্পবোধ, মাধুর্য ও মাদকতা থাকাই তো স্বাভাবিক।

দ্রুত গৎটি ছিল বিলায়েৎ খাঁর পিতা ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁর। এতে বিলায়েৎ খাঁর বাজনাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল এবং তাঁর তান ও তোড়ার নিপুণ জবাব দিয়েছিলেন মহাপুরুষ মিশ্র। তাঁর দ্রুত 'না ধিন ধিন না' ও 'ধেনে নাড়া' ঠেকার প্রশংসা না করে থাকা যায় না। চার শিল্পী প্রবল সাথসংগত বাজিয়ে গৎকারি শেষ করেন।

বিরতির পরে শুরু হয় ঠুমরী চালে বাজানো বিহারী রাগে আওচার। দেশ ও তিলক কামোদ অঙ্গের উপর জোর দিয়েই রাগ বিস্তার হয়েছিল, ঝিঁঝোটি অঙ্গটি বিশেষ শোনা যায়নি। অবশ্য এই কায়দায় বাজালে রাগকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব শিল্পীর থাকে না। তিলক কামোদ অঙ্গে ফইয়াজ খাঁর কায়দায় একটু আধটু কোমল গান্ধার লাগালেও আওচারে সৌন্দর্য বাড়ে, কমে না। আলী আকবরই এই স্বরটি প্রথম ব্যবহার করেন, পরে বিলায়েৎও করতে থাকেন।

এই পর্বে দুই শিল্পীর মিঠে বিস্তার সৌন্দর্যের বৈকুণ্ঠে পেশছেছিল। শ্রোতাও মুগ্ধ হয়ে সুর সাগরে ডুবে গিয়েছিল। সিতারখানি গৎকারিও সুন্দর হয়েছিল। পরে এটি রাগমালার রূপ ধারণ করে। যথাক্রমে শোনা গেল হামীর, গৌড়মল্লার, দরবারী কানাড়া, মুলতানি, মারুবেহাগ, পরজ বসন্ত, সোহিনী, গৌরী মঞ্জরী ও শ্রী।

এই গতের শেষার্ধে ও দ্রুত তিন তাল গতে ঝিঁঝোটি অঙ্গ বলিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয়টিতে আলী আকবরের অতুলনীয় কর্ডভিত্তিক স্বর প্রয়োগ ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিলায়েৎ খাঁর ঘাত-অনাঘাতের খেলা। পিলু, গারা ও জয়জয়ন্তীর কিছু কাজও বেজে ওঠে। শেষের ভৈরবী গৎটিও হয়েছিল মনোরম।

গিরিজা দেবীর পরজ বসন্ত বিলম্বিত খেয়ালটিতে সরল অথচ মেজাজী বিস্তারের কাজ ও 'সরগম' ছিল। দ্রুত খেয়ালটিতে ভাল তানকারি ছিল। কাফী টপ্পা, হোরি ঠুমরী ও ভৈরবী ঠুমরীগুলি তিনি তাঁর সর্বজনস্বীকৃত দক্ষতা ও শিল্পবোধের সঙ্গে গেয়েছিলেন। তবলা ও সারেঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে কেরামত খাঁ ও মহম্মদ সাগিরুদ্দিন।

অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাপ তেমন ভাল হয়নি। আরোহী বর্ণে বেশী জোর দেওয়ায় তাঁর কোমল ঋষভ আশাবরী একটু শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত দীর্ঘ মীড়গুলোও শুনলাম না। সময় অভাবে তিনি জোড় বাজাননি।

বিলম্বিত তিন তাল গৎ এর চেয়ে খানিকটা ভাল হয়েছিল এবং কিছু তানভিত্তিক লয়কারি, লপেট, তারপরণ ও গমকের কাজ ভাল হয়েছিল। দ্রুত গৎটি সবচেয়ে ভাল লেগেছে। এতে উঁচুদরের দৌড়, আড়ি ও দুনিতান ছিল। জুড়িনায়াক মেলানো তানগুলি ও বিআড়ি ছন্দের তান ভাল লেগেছে। ঝালাও ছিল পরিষ্কার ও সুরেলা। স্বপন চৌধুরীর তবলা সঙ্গত নিষ্প্রাণ লেগেছে।

সংশোধন : ১৫ই জানুয়ারির দেশ এ আমার লেখা 'আমজাদ আলীর একক

'আসর' নিবন্ধে একটি সরগম ছাপায় ভুল হয়েছে। ছাপা হয়েছে প ধ প, স প ধ ম, হওয়া উচিত প ধ প, স প ধম।

—নীলাক্ষ গুপ্ত

একগুচ্ছ ইতালিয়ান ছবি

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চারখানি ইতালিয়ান ছবির প্রদর্শন চিত্ররসিকদের কাছে একাধিক কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম ও প্রধান কারণ—নিও-রিয়্যালিজম-এর কেন্দ্রবিন্দু থেকে ওদেশের আধুনিক চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের একটি প্রামাণিক পরিচয় ছবিগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

ভিসকনতির প্রথম ছবি "ওসেসিয়ন" (১৯৪২) দিয়ে এই উৎসবের শুরু। নিও-রিয়্যালিজম পদ্ধতির শুভ সূচনা এই ছবি থেকেই। গতানুগতিক ধারায় কল্পিত কাহিনী ও কৃত্রিম পরিবেশ পরিহার করে চলচ্চিত্রকে কতখানি বিশ্বাসযোগ্য ও জীবনানুগ করা যেতে পারে "ওসেসিয়ন" তারই এক দিকচিহ্ন। ছবিটির গুরুত্ব এইখানে।

ছবির নায়ক জিনো একজন ভবঘুরে। এক সরাইখানায় মালিকের তরুণী স্ত্রী জিওভানাকে দেখে তার মনে রং ধরে। পরস্পরের আসঙ্গ-লিপ্সা ও অবৈধ প্রণয় কীভাবে সর্বনাশ ডেকে এনেছিল তাই নিয়ে ছবির গল্প।

ভিসকনতির কেটা বৈশিষ্ট্য—চরিত্রের বিশ্লেষণ—তা তাঁর এই প্রথম ছবিতেই কার ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে রয়েছে বাস্তবের প্রতিফলন—নিও-রিয়্যালিজম-যেটা প্রধান লক্ষণ।

জিনো জিওভানাকে নিয়ে পালিয়ে চ চেয়েছে। নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে যেতে ওভানা রাজি হয়নি। এক মেলায় নের অতর্কিত সাক্ষাৎ জিওভানার ন্ত প্রতিরোধ ভেঙে দিয়েছে। পথের । নির্মূল করতে জিনো তার স্বামীকে র মুখে ঠেলে দিয়েছে।

জিওভানাকে নিয়ে সংসার পাততে গিয়ে না দেখে একটা কাঁটা তুলতে সে অনেক । সৃষ্টি করেছে। প্রতিবেশী থেকে লস সবাই যেন সন্দেহ করে তাদের। জর অপরাধ-বোধ তাকে কষ্ট দেয় সব । বেশী। যেদিন জিওভানার মুখে নে তার স্বামী তার নামে ইনসিওরেনস পসি রেখে গেছে, সেদিন জিনোর নিশ্চিত গা হয় জিওভানা নিজের স্বার্থসিদ্ধির য় তাকে প্ররোচিত করেছে স্বামীকে খুন তে।

রাগের বশে জিনো জিওভানাকে ছেড়ে যায়। ইতিমধ্যে হত্যাকারীকে ধরতে লস সর্বত্র জাল পেতেছে। জিওভানাকে র পালিয়ে যাওয়াই তখন বাঁচবার একমাত্র য়। তাই জিনো ফিরে আসে ওভানার কাছে। প্রথমে অবশ্য "কি নি'র হিসাব মিলাতে পরস্পরের মধ্যে ল বাগযুদ্ধ। তারই মধ্যে প্রকাশ কী র্বার, কতখানি নিবিড় তাদের বন্ধন। রাং পলাতকদের যাত্রা শুরু হয়েছে রে। কিন্তু সে যাত্রায় ছেদ পড়েছে দুর্ঘটনায় জিওভানার মৃত্যুতে। ওদিকে পাশের পুলিসবেষ্টনি ছোট হতে হতে শেষে জিনোকে ঘিরে ধরেছে।

প্রণয়ী যুগলের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মে জৈবিক প্যাশানের যে চণ্ডরূপ এ তে ফুটে উঠেছে, সামগ্রিকভাবে তার বাস্তবতা মনকে নাড়া দেয়, সমাজকে ক্ষত করে তোলে। "ওসেসিয়ন" রবেই ইতালিয়ান সিনেমায় নবযুগের না করেছিল। আত্মতুষ্ট উচ্চ সমাজের ম জীবনধারা থেকে ছবির কাহিনীকে করে এনে প্রাত্যহিক বাস্তবতায় তাকে ষ্ঠিত করে এইভাবেই ভিসকনতি নিও-লিজম-এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ফেলিনির "লা দলচে ভিতা" (১৯৫৯) সেসানের দ্বিতীয় ছবি। বহু-র্কিত ও বহু-প্রশংসিত এবং ন্দেহে যুদ্ধোত্তর ইতালিয়ান সিনেমার চম দিকচিহ্ন।

সকলেই জানেন, পূর্ণাঙ্গ কোন গল্প রেকেই ফেলিনি কীভাবে এক

ইতালীর ছবি **ওসেসিয়ন** / পরিচালনা : ভিসকন্তি

সাংবাদিকের চোখ দিয়ে পঞ্চাশ দশকের রোম্যান সোসাইটির অন্তর্নিহিত গরমিল-গুলি সকলের সামনে তুলে ধরে চিত্রজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তী-কালের অনেক প্রগতিবাদী পরিচালকই ফিল্মে গল্পহীন "গলপো" প্রচলনের প্রেরণা পেয়েছিলেন এই ছবি থেকেই। ফেলিনির হাতে অবশ্য এই গল্প-হীন ছবি সিনেমার অন্যতম মাস্টারপিস হয়ে উঠেছে।

অগাসতো জেনিন পরিচালিত "চিয়েলো সুলা পালুদে" (১৯৪৯) ছবিটিতে নিও-রিয়্যালিজমের সব গুণই বর্তমান। ভিসকনতির "ওসেসিয়ন"-এর মতই সমাজের নীচের তলার মানুষের কামনা বাসনা ও ব্যর্থতার প্রতিফলন ঘটেছে এর গল্পে ও তার বিন্যাসে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অপেশাদার শিল্পীরা—ক্যামেরার সামনে যাঁদের এই প্রথম অবতরণ।

এক চাষী মেয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার। যে নিদারুণ ঘটনা-চক্রের শিকার মেয়েটি, তার মূলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইতালির এক শ্রেণীর অবজ্ঞাত মানুষের ওপর ছবিটির ফোকাস পড়েছে। তাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, যৌন ব্যর্থতা কীভাবে তাদের সুবিধাভোগী সমাজের শিকার করে তুলেছে তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নিপুণভাবে।

উৎসবের শেষ ছবি "ইও লা কনসেভো বেনে" (১৯৬৫) অপেক্ষাকৃত হাল আমলের সম চিত্র। এক উঠতি সিনেমাশিল্পী আত্মহত্যা করে তার জীবন-সমস্যার সমাধান করেছে। এর কী ও কেন খুঁজতে পরিচালক পিয়েত্রানজেলি ফিল্ম শিল্প ও স্টুডিও-জীবনের অনেক অলিগলি ঘুরেছেন এবং দেখিয়েছেন নায়িকার ব্যর্থতার মূলে আশপাশের বন্ধুবেশী অন্যদের অবদান কতখানি। নায়িকার হার-না-মানার অভিলাষ যেভাবে আত্মহননে পর্যবসিত হয়েছে তা অন্তরকে স্পর্শ করে।

—অনুজেন্দ্র ভক্ত

আপ বীতী/এমকে ফিলমস

আপ বীতী শব্দের অর্থ সম্ভবত আত্মোপলব্ধি। তা সেই উপলব্ধি তো আর শুধু ছবির খল চরিত্র অজিত, আসরানি, সুজিতকুমার এবং অরুণা ইরানীরই ঘটেনি, সেই সঙ্গে ঘটেছে দর্শকদেরও। তাঁরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন এক শ্রেণীর হিন্দী ছবির এতদিন যে রমরমা চলছিল সেটা কিসের জোরে। সেকস আর ভায়োলেন্সে আদ্যন্ত ভরপুর যে সব উদ্ভট কাহিনী নিয়ে একদল পরিচালক এতকাল দর্শক ঠকিয়ে আসছিলেন, এখন তাঁদের স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে। ছবি করতে গেলে একটি ভাল "কহানী" যে অতি অবশ্য প্রয়োজন সেই উপলব্ধি কেন যে ঘটেও ঘটছে না তাঁদের সেটাই বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

এই "আপ বীতী" ছবির কথাই ধরুন না। এর কাহিনী, চিত্রনাট্য, প্রযোজনা, পরিচালনা ইত্যাদি সব কিছুই মোহন-কুমারের। গল্পে কি যে নেই তা বলা মুশকিল। গরীব-বড়লোকের ব্যাপার আছে, বউয়ের (অরুণা ইরানী) আবদারে শিক্ষিত ছেলের (সুজিতকুমার) বাপ-মাকে (অশোক-কুমার ও নিরুপা রায়) পর করে দেওয়া আছে, শ্রমের মর্যাদা দেখানোর জন্যে হেমা মালিনীর জুতোর দোকানে কাজ করার ঘটনা আছে, চোরাচালানের ব্যাপার আছে, পাহাড়ী মানুষের (প্রেমনাথ) সঙ্গে সমতলের

মানুষের ভাই-বোন সম্পর্ক পাতানো এবং রাখীবন্ধন আছে (জাতীয় সংহতি?), প্রেমের মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে বড়লোক বাপের (অজিত) আশ্রয় ছেড়ে শশী কাপুরের গৃহত্যাগ আছে এবং শেষ পর্যন্ত আয়কর বিভাগকে বাপের ব্ল্যাক-মানির সন্ধান দিয়ে জেলবন্দী করা আছে, অন্ধ স্ত্রীকে স্বামীর চক্ষুদান আছে (প্রমোদকর মুক্ত হবে নাকি?) এবং সর্বোপরি লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলালের সুরে শশী-হেমার ডুয়েট নাচ-গান, অশোককুমার-প্রেমনাথের মদ্যপ অবস্থায় সংগীত সহযোগে উল্লম্ফন (সেটা আবার পুলিসের সামনেই), এবং বাপের চার পাশে ঘুরে ঘুরে শশী কাপুরের টাকা উড়িয়ে (চাকরবাকরদের সামনেই) গান ইত্যাদি তো আছেই। আর চোখের জল? নিরুপা রায় যে পরিমাণ ওই বস্তুটি ঝরিয়েছেন সেটা একত্র করে ধরে রাখলে অনেককে আর কষ্ট করে কুম্ভ মেলা পর্যন্ত ছুটতে হত না। সব শেষে অশোককুমারের প্রতি একটি সবিনয় নিবেদন আছে। বোমবাই ফিল্মে উনি তো একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং ভালো অভিনেতা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। উনি কি করে এই জাতীয় মাথামুণ্ডুহীন কাহিনীতে অভিনয় করতে রাজী হলেন! বিশেষ করে মাত-লামির দৃশ্যটিতে।

সুরজিৎ ঘোষ, জয়শ্রী রায়/**আবির্ভাব**/পরিচালনা ঃ অমিতাভ দাশগুপ্ত

তবে কি ছবিতে ভালো কিছুই নেই? নিশ্চয় আছে। দারুণ ফটোগ্রাফি আছে, চমৎকার এডিটিং আছে, অন্যান্য টেকনিক্যাল কাজকর্মও উঁচুদরের। কিন্তু ১৮ রিলের এমন একটি ছবি দেখতে গিয়ে যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তার কাছে এই কলাকৌশলগত চমৎকারিত্বটুকু তো সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্যের মতই।

—রবি বসু

দিল্লির চলচ্চিত্র উৎসবে—২

দিল্লিতে যে সব হলে ষষ্ঠ আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ছবি দেখানো হচ্ছে তার একটির নাম পরশ। ওই হলের পরিচালক শ্রীজগদীশ ভাটিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উৎসব কেমন চলছে টলছে বলুন। সেটা ছিল উৎসবের পঞ্চম দিন। শ্রীভাটিয়া একটু হেসে বললেন, গতকাল সন্ধ্যায় আমার এখানে হাউস ফুল ছিল। এগার শো সিটের সবগুলিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছবি দেখেছে কতজন জানেন? মেরেকেটে জনা পঞ্চাশেক।

এই একটি উদাহরণ থেকেই আন্দাজ করে নেওয়া যেতে পারে এবারের চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে দিল্লিবাসীদের প্রতিক্রিয়া কি? একটা অনুচ্চারিত স্লোগান যেন অনেকেরই চোখে মুখে ঃ নো সেকস নো ফেস্টিভ্যাল!

চিত্রতারকাদের তিনটি প্রেস কন-ফারেন্স হয়েছে এখন পর্যন্ত। প্রথমটি পেটিট অলিভিয়া হাসিকে নিয়ে—যিনি তারকা হিসেবে চিহ্নিত হন মাত্র পনের বছর বয়সে ফ্রাংকো জেফারেলির তোলা "রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট" ছবিতে অভিনয় করে। তিনি যখন শাড়ি পরিহিতা অবস্থায় কনফারেন্সে এলেন তখন তাঁকে পুরোপুরি ভারতীয় মনে হচ্ছিল। একজন সাংবাদি[ক] তো জিজ্ঞেস করেই ফেললেন যে তি[নি] কতদিন যাবত শাড়ি পরছেন। জানা গে[ল] চার বছর আগে যখন তিনি স্বামী মু[ক্তা]নন্দের সংস্পর্শে আসেন তখন থেকেই তাঁ[র] এই ভারতীয় সাজ। সে সময় তিনি মানসি[ক] ভাবে ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। ডি[ন] মার্টিনের (বিশিষ্ট হলিউড তারকা ডি[ন] মার্টিনের পুত্র) সঙ্গে তখন তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। ওই সময় লন্ডনে স্বামী মুক্তানন্দের সঙ্গে একজন তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। প্রথম প্রথম তিনি নেহাত কৌতূহলের বশেই স্বামিজীর প্রার্থনাসভায় যোগ দেন। পরে তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অলিভিয়া বললেন, স্বামীজীই তাঁ[র] বিপর্যস্ত মনটিকে শান্ত করলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের মুখোমুখি হবার সাহস যোগালেন এবং সঠিক পথের নির্দেশ দিলেন। সে

কই তাঁর শাড়ি পরা শুরু। এখানকার স্টিভ্যাল শেষ হয়ে যাবার পর অলিভিয়া ম্বাই যাবেন। সেখানে স্বামী মুক্তানন্দের টি আশ্রম আছে।

অলিভিয়া সম্প্রতি 'লাইফ অফ যিশাশ ইস্ট" ছবিতে ভার্জিন মেরীর রোল রছেন। অলিভিয়া জানালেন ওই রোল পকে' তিনি ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। র অভিনীত জুলিয়েট এবং মেরী তার মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল াছে। দুজনেই খাঁটি মানুষ। তিনি রও জানালেন তিনি কদাচ সেক্স-র্স্ব কোন ভূমিকায় অভিনয় করবেন না। বে তিনি "রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট" বির ব্যালকনি দৃশ্যে ওরকম পোশাক রেছেন কেন? উত্তরে অলিভিয়া জানালেন, ত্রনাট্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি একটি াত্রিবাস পরেছেন—এইমাত্র। অন্য কোন দেশ্য নেই। উৎসবের তথ্য বিভাগে 'ব্লাক স্টমাস' নামে যে ছবিখানি দেখানো হচ্ছে, ালিভিয়া সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন টি না দেখতে। ছবিখানি যে প্রতি-যাগিতায় দেওয়া হয়নি সে জন্য তিনি শী। তাঁর প্রিয় চিত্রতারকা কে—এই শ্নের উত্তরে অলিভিয়া জানান—মার্লন ্রেন্ডো।

প্রতিযোগিতায় তুরস্কের ছবি ফ্যামিলি অনার'-এর অন্যতম শিল্পী রিস অ্যাকম্যান নিজেকে চিত্রতারকা বলে অভিহিত করা পছন্দ করেন না। তিনি তুরস্কের চিত্রশিল্পের ইতিহাস বলতে করতে জানান যে, তাঁদের দেশে প্রথম ছবি ছিল একটি ডকুমেন্টারি—১৯১৪-তে আর্মি ইউনিটের তোলা। প্রথম কাহিনীচিত্র তোলা হয় ১৯১৮-তে এবং সটা ছিল সরাসরি একটি মঞ্চনাটকের চিত্রূপ। ১৯৩০ পর্যন্ত সরকারী প্রচেষ্টায় ছরে একখানি ছবি তোলা হত। কিন্তু াজ বেসরকারী প্রচেষ্টায় বছরে তৈরি হয় ২৫০ খানি ছবি। তুরস্কের সবচেয়ে খ্যাতিমান পরিচালক ইলমাজ গুনে—রাজনৈতিক অপরাধে কারাবাস করছেন। অ্যাকম্যান জানান যে চিত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারকা-প্রথা দুর্নীতির আকার ধারণ করে এবং ১৯৭৪-এ টেলিভিসনের াপ চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রচণ্ড আঘাত হানে। এই অবস্থার অবসানে 'গ্রুপ ফিলম' তোলার রীতি প্রবর্তিত হয় যার একটি ফসল ফ্যামিলি অনার'। এ হচ্ছে সমবায় ভিত্তিতে তোলা এবং বক্স অফিসেও এসব ছবির ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। অ্যাকম্যান জানান এর পূর্ববর্তী ছবি 'আওয়ার ফ্যামিলি' গত বছরে জনপ্রিয়তম ছবির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ওদেশে আমদানিকৃত ছবির প্রভাব সম্পর্কে অ্যাকম্যান জানান যে

ছায়া দেবী, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়/এই পৃথিবী পান্থনিবাস।/ পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ফটো : দেশ

বিদেশী ছবির দর্শকগোষ্ঠী ভিন্ন। তবে বিদেশী ছবির মধ্যে রাজ কাপুরের 'আওয়ারা' ওদেশে সকলশ্রেণীর দর্শকের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই ছবিখানি ওদেশে ভারতীয় ছবির বেশ একটা বাজার গড়ে তুলেছিল কিন্তু ভারত থেকে পাঠানো নিরেস ছবি সে-সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। এরিস অ্যাকম্যান লণ্ডনের মণ্ট ভিউ থিয়েটার স্কুলে শিক্ষালাভ করেন এবং চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন। অ্যাকম্যান নিজের দেশের বাইরে ইতালীয় 'সারোসা' এবং মার্কিন ছবি 'মারাট/সাদে'-তে অভিনয় করেছেন।

—সুরঞ্জন

প্রসঙ্গ : চলচ্চিত্র

ঘন সবুজ রঙের নিভাঁজ নিখুঁত স্যুট, শাদা তেজী কলার, মেরুন রঙের ঝিকিমিক আলগা-বাঁধা টাই, কিন্তু ঘাড়ের ওপর মাথাটি নেই! সেটি আছে কাঁধের ওপর একটি বৃহৎ চামচেতে বসানো। মুখে এমন একটি ভাব যা মোনালিসার চেয়েও রহস্যময়—নিজেরই কাঁধে বসানো চামচে থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন হিচকক। পৃথিবীর অন্যান্য চিত্র-পরিচালকদের কার ঘাড় কটি মাথা আমাদের সঠিক জানা নেই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এ-পর্যন্ত একজনই নিজের একটি মাত্র মাথাকে ঘাড় থেকে আলাদা করে চামচে করে বয়ে বেড়াবার কথা ভাবতে পেরেছেন। এবং সেই উদ্ভট ভাবনার ছবি আমরা তাঁরই সংকলিত একটি গল্প-গুচ্ছের প্রচ্ছদে অনেকেই দেখেছি। কোথায় যেন সেদিন পড়লাম হিচকক্ নিজের বাড়িতেও কোনো সিঁড়ির কোণে কিংবা ড্রয়িং রুমে তাঁর নিজের মুখটি—ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত—স্টাফ করে রেখে দিয়েছেন, যেমন করে শিকারী বাঘ রেখে তার ভাগ্যে-জোটা প্রথম নেকড়েটিকে। সুতরাং হিচকক্ বাড়িতে না-থাকলেও আপনাকে একেবারে হতাশ হয়ে ফিরতে হবে না, আপনি এই অবিকল মুখোশের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়াকে একটি মোটামুটি দেখা-হওয়া হিসেবে ভেবে নিতে পারেন।

এবং আসল মানুষটির সঙ্গে কোনোভাবে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে ঐভাবে মুখোশের সঙ্গে মুলাকাৎ করে ফিরে আসা আপনার পক্ষে অনেক নিরাপদ, বিশেষ করে যদি আপনি সবরকম ছোঁয়া-ছোঁয়া সংস্কারে বিশ্বাস করেন, এই যেমন ধরুন বিস্যুদবারের বারবেলা, কিংবা বেরুবার সময় হাঁচি, কিংবা কালো বেড়ালের কান্না ইত্যাদি। কেন হিচকক-এর কাছ থেকে দূরে থাকা আপনার পক্ষে ভালোই হতে পারে, এই ব্যাপারটা এবার একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। কিছুদিন আগে হিচকক কয়েকজন হলিউড তারকাকে একটি নৈশ পার্টি দিলেন। নিমন্ত্রণের কার্ডে লেখা ছিল পার্টির সময় বেশ গভীর রাত, এবং প্রত্যেককে পরে আসতে হবে শাদা পোশাক। কিন্তু পার্টিটা হবে কোথায়? ঠিকানা থেকে বোঝা গেল জায়গাটা হিচকক-এর বাড়ি, কিংবা কোনো ক্লাব বা রেস্তোরাঁ নয়। ঠিকানাটা কারো-কারো কাছে অবশ্য পরিচিত মনে হল। তাদের রক্ত প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এল, অথচ হিচকক-এর পার্টিতে না গেলেই নয়।

শীতের রাত। খোলা আকাশের তলায় পার্টি শুরু হল এক শহর-থেকে দূরের কবর-খানায়, চারধারে জ্বলছে মৃদু আলো

এমনভাবে যাতে শাদা-পোশাক পরা মানুষগুলিকে মনে হয় অশরীরী, কোথা থেকে যেন ভেসে আসতে লাগলো রক্ত-জল-করা বাজনার সুর। এবং অনেক দূরে-দূরে এক-একটি কবরের পাশে পাতা হল শাদা-কাপড়ে ঢাকা এক-একটি নিছক একলা টেবিল যেখানে এক-একজন চিত্র-তারকার নাম লেখা। সেই টেবিলে পৃথিবীর কিছু সেরা খাবার আর মদ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে যার স্বাদ আপনি জীবনে ভুলবেন না। শুধু আপনার টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে যে-মানুষটি আপনার পাত্রে বার বার মদ ঢেলে দিচ্ছে, তার হাতের দিকে তাকাবেন না, কেননা সেখানে চামড়ার একটুকু প্রলেপ পর্যন্ত নেই, এবং কংকালের হাতে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা মদও আপনার বিস্বাদ লাগতে পারে। তাই বলছিলাম, হিচকক-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব না-হয়ে আপনার পক্ষে হয়তো ভালোই হয়েছে।

কিন্তু তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে সাত-সমুদ্র-তের-নদী পেরিয়ে হিচকক-এর ছবি কলকাতায় এসে পৌঁছলে শহরে হট্টগোল পড়ে যায়। এই সেদিনও তো ফ্রেনজি ছবিটি কি দারুণ চললো। কিন্তু শুধু ফ্রেনজি কেন, ভারটিগো, নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট, বার্ডস, রিয়ার উইনডো, সাইকো প্রভৃতি যে-কোনো ছবির কথা ভাবুন। এদের যে-কোনো একটি যে-কোনো রবিবার সকালে আমরা দেখতে রাজি আছি।

হিচকক-এর ছবিগুলি নিয়ে কিন্তু এদেশে এবং বাংলা ভাষায় খুব বেশি আলোচনা হয়নি। এবং আজকের এই অল্প পরিসরে ইচ্ছে থাকলেও সেটা সম্ভব নয়। তবু আসুন দু-চার কথায় ভেবে দেখি—যতোখানি পরিষ্কার করে সম্ভব—কেন হিচকক-এর ছবি আমাদের ভালো লাগে, কেমন করে ছবিগুলি আমাদের ভাবায়।

হিচকক হলিউড-এর সফলতম চিত্র পরিচালকদের একজন। যদিও জাতে তিনি ইংরেজ। পঞ্চাশটির ওপর ছবি করেছেন তিনি। তাঁর একেবারে প্রথম দিকের ছবিগুলির নাম দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ, দ্য থার্টি নাইন স্টেপস ইত্যাদি। একেবারে প্রথম ছবিগুলি থেকে ফ্রেনজি পর্যন্ত চলে এলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে।

এক, হিচকক একজন পাকা গল্প বলিয়ে। সিনেমায় কি করে গল্প বলতে হয় এটা তিনি এতোটাই ভালো জানেন যে তাঁর ছবি দেখতে-দেখতে গল্প আর ঘটনার মধ্যে ডুবে না গিয়ে আমাদের উপায় থাকে না। তাঁর ছবিতে ঘটনা খুব দ্রুত এগিয়ে চলে, সুতরাং কোথাও একঘেঁয়ে লাগবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

দুই, সেই চির-পরিচিত নায়ক-নায়িকার ব্যাপারটা তাঁর ছবিতে কদাচিৎ আসে। নারী-পুরুষকে নতুন-নতুন পরিবেশে, নতুন লোমাপড়ার মধ্যে দেখানো হয়। আর একটা কথা, হিচকক জানেন ঠিক কোথায়, কিভাবে সেকস-এর আবেদন খুব জোরালো হতে পারে। সেকস কিন্তু তাঁর ছবিতে সব সময় অনিবার্যভাবে আসে।

তিন, তাঁর ছবির কোনো-কোনো দৃশ্যের ব্যাকগ্রাউন্ড অতি-নাটকীয় হলেও আশ্চর্যভাবে আমাদের নাড়া দেয়। যেমন, স্যাবোটিয়োর ছবিতে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি থেকে পড়ে গিয়ে ভিলেন-এর মৃত্যু কিংবা নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট ছবিতে মাউণ্ট রাশমোর ন্যাশানাল মনুমেণ্ট-এর চূড়ান্ত দৃশ্যটি।

চার, হিচকক-এর ছবিতে মৃদু বিদ্রুপের সুরটি আমাদের অনেকেরই ভালো লাগে। বিশেষ করে ছবির পর ছবিতে ইংরেজ গৃহকর্ত্রীদের যে-মূর্তিটি তিনি দেখান সেটি ভারি মজার।

পাঁচ, হিচকক খুব বড়-বড় ব্যাপার নিয়ে রহস্যসৃষ্টি করেন না বলে তাঁর ঘরোয়া ধরনটি আমাদের ভালো লাগে। দ্য লেডি ভ্যানিশেস এবং নর্থ বাই নর্থওয়েস্ট ছবিতে তো যথাক্রমে একটি ছোট্ট সুর এবং একটি মাইক্রো ফিলম নিয়ে রহস্য সৃষ্টি হয়েছে।

ছয়, হিচকক-এর রহস্য বা ভয় সৃষ্টি করার ধরনটি এমনি টানটান ও নিখুঁত আমাদের মনযোগ আলগা হয়ে যাব কোনো উপায় নেই। এই ধরনটি সম্পূ নির্ভর করে তাঁর গল্পবলার কায়দার ওপর

সাত, হিচকক-এর বিরুদ্ধে একম সমালোচনা হল তাঁর ছবিতে জীবন ভাবনার গভীরতা নেই। এই সমালোচন প্রতিপক্ষ সমালোচনাটি এসেছে কিথা চিত্র-পরিচালক শ্যাবরল-এর কাছ থেকে শ্যাবরল-এর মতে হিচকক-এর ছবি জীবনের গভীরতা নিশ্চয় আছে। এ হিচকক জীবনকে দেখেন সন্দেহ, অপর ও বিশ্বাসঘাতকতার আবহাওয়ার মধ্যে দুই, জীবনকে তিনি মৃত্যু ও হত্যার সঙ্গে সর্বদা সম্পৃক্ত দেখেন। সেখানেই হিচক এর জীবন দর্শন একটি গভীর প্যারাডক এ আশ্রিত। তিন, হিচকক দেখান অ বিশ্বাস কেমনভাবে জীবনের বিরুদ্ধাচ করে। চার, হিচকক-এর চূড়ান্ত বিস্ম হল এই যে অকপট স্বীকারোক্তির মধ্যে আছে অপরাধীর মুক্তি এবং আত্মার শান্তি শ্যাবরল-এর সব কথা মেনে না নিলেও কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে সা কোর মত ছবি জীবনের ওপর ভাবনার অনেকগুলি বন্ধ জানলা খুলে দেয়।

—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংস্কৃতিক

বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলামন্দিরের বাৎসরিক উৎসবে শ্যামা নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামা, বজ্রসেন ও উত্তীয়র চরিত্রে প্রশংসা পান যথাক্রমে শুক্লা সেনগুপ্ত, ফণিভূষণ সেনগুপ্ত ও সর্বাণী দাস। সংগীত পরিচালনা করেন কমল বসু। স্বপ্না সেনগুপ্তের পরিচালনায় নৃত্যবিচিত্রা মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহী হয়। অন্যান্য নৃত্যে কস্তুরী দত্ত, শিপ্রা সেন, সুজাতা সেন, সঞ্চিতা সোম, কল্যাণী সাহা ও ব্রততী মান্না দর্শকদের প্রশংসা পান।

বাংলা ভাষার সর্বাধিক
প্রচারিত একমাত্র
প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

সম্পাদক
সাগরময় ঘোষ

দাম ৮০ পয়সা
বিমান মাসুলে
ত্রিপুরা ১০ পয়সা,
পূর্বাঞ্চলে অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা লিঃ,
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০০০১ থেকে
বাদল বসু
কর্তৃক মুদ্রিত ও
প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-২২৮০
২৩-৮০৫১

দেশ পত্রিকার চাঁদার হার

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
ভারতে ও বাংলা দেশে (ভারতীয় মুদ্রায় সডাক)	৪৬·০০ টাকা	২৩·৫০ টাকা	১১·৭৫ টাকা
ভারতে (বিমান ডাকে)	৯৭·০০ টাকা	৪৯·৫০ টাকা	২৪·৭৫ টাকা
বিদেশে (জাহাজ ডাকে)	১১৯·০০ টাকা	৫৯·৫০ টাকা	×
আমাদের লণ্ডন অফিস মাধ্যমে	২৫২·০০ টাকা	১২৬·০০ টাকা	৬৩·০০ টাকা

(অন্যান্য পত্রিকা দ্রষ্টব্য)

শুভদৃষ্টি বিনিময়ের আগেই চোখ কেড়ে নেয়—এমন কী হতে পারে

শিল্পের প্রকাশ নানান রূপে—কখনো চিত্রকলায়, কখনো সঙ্গীতে, কখনো বা ভাস্কর্যে। বেনারসে, বছরের পর বছর ধৈর্য আর অনুশীলনের বিনিময়ে শিল্প পেয়েছে প্রকাশের এক স্বতন্ত্র মাধ্যম—অসংখ্য নিপুণ হাতের পরিশ্রমে যেখানে সিল্কের ওপর ফুটে ওঠে আশ্চর্য রূপের কারিগরি। নববধূর বেনারসী শাড়ি।

এখন কথা পালাবদলের। এসেছে 'আনন্দ', যেখানে খোদ বেনারসে বোনা নিখুঁত সিল্কের জমির ওপর একে-একে অসংখ্য নতুন ডিজাইন ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী গোষ্ঠকুমার। কল্পনার অভিনবত্বে নতুন আর অনন্য প্রতি[illegible] ডিজাইন।

বেনারসের কারিগরি [illegible] আর গোষ্ঠকুমারের কল্পনাশক্তি—এই অপূর্ব জোটে তৈরি বহু ও বিচিত্র রকমের বেনারসী শাড়ির সমাবেশে ভ'রে উঠেছে কলকাতার রাসেল স্ট্রীটে আনন্দ'র শো-রুম।

আজই চ'লে আসুন। দেখেশুনে ঠিক মনের মতনটি বেছে নিন।

নতুন ধাঁচের বেনারসী ছাড়াও পাবেন চোখ-জুড়নো নানারকম ছাপা শাড়ি—সিল্ক, সুতী, টাঙ্গাইল, ধনেখালি আর কাঞ্জিভরম।

ANANDA

যেখানে নববধূর রূপ-লাবণ্যের সঙ্গে মানানসই বেনারসীর মেলা।

ANDC-146EN